কেননা দেখা যায়, "সংবাদ-প্রভাকরে" যখন বঙ্কিমের বাঙ্গালারচনায় হাতে খড়ি হয়, তখন ঐ পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমের "সুবঙ্কিম ভাবকৌশলে"র প্রশংসা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে তাঁহাকে ভাষার বঙ্কিমতা পরিহার করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, বঙ্কিম তাঁহার প্রথম দুই-তিনখানি উপন্যাসে সরলতার যে গ্রামে উঠিয়াছিলেন, সেইখানেই পড়িয়া থাকা সমীচীন মনে করেন নাই। তাঁহার রচনায় সরলতার, ও সঙ্গে সঙ্গে, সরসতার ক্রমোন্নতির একটা ধারা স্পষ্টই দেখা যায়। ৺জগদীশনাথ রায়ের নিকট এক চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, "ভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা; অনেক কষ্টে আমি সরলতাকে পাইয়াছি।" সাহিত্যের ভাষার এইরূপ একটা উন্নত আদর্শ নিজে যথোচিত নিষ্ঠার সহিত সাধন করিয়া সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিম অন্যকেও উহা অবলম্বন করিতে নির্দেশ করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ—"প্রচার"-পত্রে প্রকাশিত তাঁহার "বাঙ্গালা নব্যলেখকদিকের প্রতি" শীর্ষক প্রবন্ধ, যাহা পরে "বিবিধ প্রবন্ধ" ২য় ভাগে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন, "কাহারও অনুকরণ করিও না", "সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা", "অলঙ্কারপ্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে প্রয়োজন মত আপনি আসিবে"। আধুনিকগণের অনেকেই এই সকল নির্দেশ বা উপদেশ গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই। তাঁহারা "আগে চলা"র অভিমানে বঙ্কিমের এই সকল অমূল্য উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে যে পরমকৃতী পুরুষের ভাষা ও বাক্পদ্ধতির অনুকরণ অন্যের পক্ষে বিড়ম্বনা বই আর কিছু নহে, তাঁহারই অনুকরণে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ডারে কাব্যরস ও সূক্ষ্মকলাকৌশল স্বভাবতঃই অত্যন্ত অধিক; এবং তাঁহার রচনায় ব্যক্তিত্বের মুদ্রাও অতি স্পষ্ট। তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব্ব ও বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ববশে যাহা লিখেন, তাহা সর্ব্বত্র সরল না হইলেও মনোরম হয়; এমন কি, স্থলে স্থলে একটু আয়াসস্বীকার করিয়া অর্থবোধ করিতে হইলেও, সে আয়াসের উপযুক্ত [illegible] যায়। কিন্তু তাঁহার [illegible]গণের ভাষায় গঠনের জটিলতা ও ভাবের আবিলতাই পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে উপভোগযোগ্য বস্তু অতি অল্পই মিলে। তাঁহাদের মধ্যে ইদানীং অনেকে আবার বিদেশী শব্দের ও বিদেশী বাক্রীতির ছড়াছড়ি করিয়া ভাষার বিশুদ্ধি একেবারেই নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন। আধুনিকদিগের উকিল শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসু করি, ইহাই কি বঙ্কিমের ভাষা [illegible] ত্যাগ করিয়া তাঁহার মক্কেলগণের "আগে চলা"? ভাষার এইরূপ বিড়ম্বনা না ঘটিলে বাঙ্গালাসাহিত্য যে গতির অভাবে ঘরে মরিয়া থাকিত, ইহা শরৎবাবু ওকালতির উৎসাহে খুব জোর-গলায় বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না। ভাষাসম্বন্ধে তিনি নিজে একজন বঙ্কিমপন্থী ব্যতীত আর কিছু নহেন। তিনি যাঁহাদের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও এমন দুই চারিজন আছেন, যাঁহারা বঙ্কিমের ভাষার আদর্শ পরিত্যাগ করেন নাই। ইঁহারা যদি ভাষাকে বঙ্কিমের ভাষা অপেক্ষা আরও একটু সরস ও সরল করিতে পারিয়া থাকেন, বঙ্কিমানুরাগী আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি। যাঁহারা তাহা না করিয়া বিপথে গিয়াছেন তাঁহারাই নিন্দনীয়। বাঙ্গালা সাহিত্য যে তাঁহাদের কৃতি অধিকদিন বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিবে ইহা তাঁহাদের দুরাশা।

বঙ্কিমের ভাষার আদর্শ দেখিলাম; এখন ভাবের আদর্শ বুঝিতে চেষ্টা করিব। যে কেহ তাঁহার উপন্যাসগুলি একটু মনোযোগ করিয়া পড়িয়াছেন, তিনিই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তাঁহার ভাবগুলি প্রথমতঃ অকৃত্রিম, দ্বিতীয়তঃ সার্ব্বজনীন, তৃতীয়তঃ দেশের চিরন্তন আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ এইসকল গুণেই সেই উপন্যাসগুলি, সে যুগের অতি নূতন বস্তু হইলেও, প্রাচীন ও নবীন সকলকে তৃপ্তি দিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং এযুগেও সেগুলি পুরাতন হইতেছে না। বাঙ্গালায় অন্য কোনও উপন্যাসিক [illegible] এমন সর্ব্বজনসাধারণ আদর ও প্রতিষ্ঠা [illegible]। কথাটা শুনতে যতই অপ্রিয় হউক, তথাপি [illegible] যে, রুচির বিশিষ্টতা, সহানুভূতির [illegible] এবং [illegible] স্থলে প্রেরণার কৃত্রিমতা হেতু আধুনিক [illegible] লেখকেরও খ্যাতি ও আদর এক[illegible]টি [illegible] মধ্যে নিবদ্ধ। গভীর জন্য লেখাতে যে বিপদ্ ও [illegible]

আধুনিকগণ তদ্বিষয়ে খুব সচেতন কিনা জানিনা। কিন্তু আমরা—যাহারা বাহির হইতে খেলা দেখি তাহারা—বেশ দেখিতেছি, ঐ বিপদ্ ও বিড়ম্বনায় তাঁহারা উত্তরোত্তর অধিক বিপন্ন ও বিড়ম্বিত হইতেছেন। একজন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন, "Deliberately to incur neglect by writing for the few involves the further [illegible] of more and more deserving it. Whoever makes a boast of writing for a coterie, sooner or later finds himself writing for a coterie of a coterie, and at last for himself alone. * অর্থাৎ "অল্পসংখ্যক লোকের জন্য লিখিতে গিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের অনাদর যাচিয়া লওয়ার একটা অতিরিক্ত বিপদ্ এই যে, তাহাতে উত্তরোত্তর ঐ অনাদরের অধিকতর যোগ্যই হইতে হয়। যিনি কেবল কোন গণ্ডীবিশেষের জন্য লেখেন বলিয়া গর্ব্ব করেন, তিনি শীঘ্র বা বিলম্বে দেখিবেন যে, তিনি সেই গণ্ডীর অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর জন্য লিখিতেছেন, এবং পরিশেষে হয়ত কেবল নিজের জন্যই লিখিবেন।" বঙ্কিম কোনও গণ্ডীর মনোরঞ্জনে, কোনও সঙ্কীর্ণ সত্যের সেবায় আপনার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার সহানুভূতি ছিল অতি ব্যাপক। যে সত্য প্রত্যক্ষানুভূত অথচ বৃহৎ, যে ব্যথা বহুজনসাধারণ অথচ কলুষলেশশূন্য, যে আনন্দ কেবলই রক্তমাংসের আনন্দ নয়, যে তৃপ্তি কেবলই ভোগের তৃপ্তি নয়, কিন্তু অবস্থাবিশেষে ভোগ বা ত্যাগের মধ্য দিয়া মানুষকে উন্নততর ও পবিত্রতর জীবনের অধিকারী করিতে সমর্থ, তাহাই তিনি বিচিত্র বর্ণে ও সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট রেখাপাতে অঙ্কিত করিয়া তাঁহার দেশবাসীর সম্মুখে ধরিতেন। তাঁহার সৃষ্টির যাথার্থ্য ও মাহাত্ম্য বুঝাইতে কোনও কালেই কোনও উকিলের প্রয়োজন হয় নাই, কোনও নূতনতর দর্শন বা কলা-শাস্ত্রের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে হয় নাই, কিংবা নজীরের জন্য স্বল্প-পরিচিত কোনও বিদেশী গ্রন্থের দিকে ধাবিত হইতে হয় নাই। আজ-কাল একটা নূতন আদর্শের কথা প্রায়ই শুনা যাইতেছে—আমাদিগকে বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত যোগ রাখিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে।" ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, য়ুরোপের কোনও কোনও দেশে বা সমাজে একটা সাময়িক ভাবসঙ্ঘাত, সমস্যা, বা খেয়াল বশে যখন যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে বা হইবে, আমাদের সমাজে প্রত্যক্ষরূপে সেই সকল সমস্যা বা ভাবের উদ্ভব হউক বা না হউক, আমাদিগকে কেবল আধুনিকতার খাতিরে সাহিত্যের মধ্যে তাহার অনুকরণ করিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে যাহা সৃষ্ট হইবে, তাহা আর যাহাই হউক, প্রকৃত সাহিত্য হইবে না ইহা নিশ্চিত। লেখকের ক্ষমতা থাকিলে তিনি পাঠক-পাঠিকার মনে তাৎকালিক একটা প্রবল বিস্ময় বা ব্যথার সৃষ্টি করিতে পারিবেন; কিন্তু ঐ মোহের ঘোরটুকু কাটিয়া গেলে তাহাদের মনে হইবে—লেখক কেবল তাঁহার বিদ্যা বা হাতের কৌশল দেখাইবার নিমিত্ত তাহাদের ভাবের ঘরে দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। দেশবাসীদিগকে সাহিত্যের দ্বারা অন্য দেশের ভাব বা চিন্তার নূতনতম বিলাসের সঙ্গে পরিচিত করান দূষণীয়—এ কথা কেহই বলিবে না; কিন্তু তাহার প্রকৃষ্টতম উপায় হইতেছে—তত্তদ্দেশীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠগ্রন্থগুলি অবিকল স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করা। এইরূপে স্বদেশীয় সাহিত্য-পরিপোষণের একটা বিশেষ গুণ এই যে, তাহাতে আবেষ্টনের বিপর্য্যয় হেতু রসাভাসের সৃষ্টি হয় না। য়ুরোপের সকল দেশেই অনুবাদ দ্বারা নিরন্তর সাহিত্যের পুষ্টি ও নূতন-ভাবের প্রচার হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা হয় না; কেননা এখানে সকলেই নিজকে মৌলিকপ্রতিভা-সম্পন্ন মনে করেন। তাহা ছাড়া অনুকরণ অপেক্ষা অনুবাদ কাযটিও বোধ করি একটু অধিক কঠিন। ইদানীং আমাদের সাহিত্যিকেরা 'বিশ্ব-সাহিত্য' কথাটি এমন ভাবে ব্যবহার করেন যে, তাহাতে মনে হয়—য়ুরোপটাই বিশ্বের সবখানি, বাঙ্গালা বা ভারতবর্ষ উহার বাহিরে। বিশ্বের সকলদেশের সাহিত্যিকগণ অকৃত্রিমপ্রেরণাবশে সত্য ও উচ্চতম আদর্শের সহিত সুসঙ্গতভাবে সাহিত্য-সৃষ্টি করিবেন, এবং এই ভাবে বিশ্বসাহিত্য পরিপুষ্ট হইবে, ইহাই ত স্বাভাবিক ব্যবস্থা। অন্ততঃ বিশ্ব-সাহিত্য বলিতে আমরা ইহাই বুঝি। উন্নত উদার সত্যের সহিত যথার্থ-যোগই বিশ্বসাহিত্যের সহিত যোগ; বিশ্বজনীন ভাবই বিশ্বসাহিত্যের প্রাণ। "শকুন্তলা" কি বিশ্বসাহিত্যের বস্তু

* "[illegible]ers and Writers" (1917-21) by R. H. C.

নয়? তাহা না হইলে হিন্দুভাবে একান্তরূপেই ওতপ্রোত ঐ নাটকখানির লাটিন অনুবাদ পড়িয়া অন্ততঃ বারশত বৎসরের ব্যবধানেও বিদেশী কবি গেটে তেমন ভাবে আত্মহারা হইলেন কিরূপে? রামায়ণ বা মহাভারত বা গীতা—যাহা যুগে যুগে হিন্দুকে অপার আনন্দ ও শান্তি দিয়া আসিয়াছে, এবং যাহা হিন্দু-জাতির বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ দুর্গতির দিনেও বিদেশীয় মনীষিগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে,—তাহাও কি কেবল ভারতীয় সাহিত্যের সম্পদ্, বিশ্বসাহিত্যের কিছু নয়? "গীতাঞ্জলি"র কোনও কবিতার কোনও ভাবই হিন্দুর পক্ষে নূতন নয়; অন্ততঃ বৈষ্ণব যুগ হইতে ভগবৎপ্রেমপিপাসু বাঙ্গালীর তাহা নিত্যানুভূত রসময় বস্তু। রবীন্দ্রনাথ সে বস্তু পাইয়াছেন তাঁহার দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে, দেশীয় আবেষ্টনের মধ্যে, এবং অবশ্য নিজ হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির মধ্যেও। মধ্যযুগের খৃষ্টীয় সাধনার সহিত সার্ব্বজনীনধর্ম্মগুণে উহার কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য থাকিলেও, আধুনিক য়ুরোপীয় চিন্তার সহিত উহার প্রত্যক্ষ কোনও সামঞ্জস্য নাই। তথাপি ঐ বস্তুটি কেমন করিয়া য়ুরোপে তেমন আদর লাভ—বিশ্বসাহিত্যে (অর্থাৎ আমি যাহাকে বিশ্ব-সাহিত্য বলিয়াছি তাহাতে) তেমন বরণীয়স্থান অধিকার করিল? তার পর রবীন্দ্রনাথের যে সৃষ্টিগুলি তথাকথিত বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত যোগসাধনের উদ্দেশ্যে কল্পিত, অর্থাৎ যাহা আধুনিক য়ুরোপীয় চিন্তার প্রতিধ্বনিমাত্র, সেগুলিই বা কি স্বদেশে কি বিদেশে তেমন ব্যাপক আদর পাইল না কেন? তাহার কারণ ইহাই নয় কি যে, "গীতাঞ্জলি"র মত, "শকুন্তলা"র মত, রামায়ণ মহাভারত-গীতার মত সত্যে ও স্বভাবে উহাদের প্রতিষ্ঠা হয় নাই,—উহাদের পশ্চাতে যে প্রেরণা তাহা অনেকাংশেই কৃত্রিম? সমসাময়িক য়ুরোপের চিন্তা ও ভাব-ধারার সহিত বঙ্কিমের যথেষ্ট পরিচয় ছিল; তাহার প্রমাণ তাঁহার সকল রচনায় জাজ্জ্বল্যমান। কিন্তু তাঁহার কোনও উপন্যাসেই বিদেশীয় সমাজের তদানীন্তন কোনও সমস্যার একটা দেশীয় রূপ খাড়া করিয়া রস-সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় না। কেননা তিনি বেশ জানিতেন, সে রসটা হইবে কৃত্রিম। তিনি "সাম্যে" য়ুরোপীয় কতকগুলি নূতন ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোনও উপন্যাসে ঐ সকল ভাবের অবতারণা করেন নাই, শেষে সমাজের মুখ চাহিয়া "সাম্য" বইখানির প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অতি-আধুনিক লেখকগণ তাঁহাদের বিদ্যার (অর্থাৎ য়ুরোপের নূতনতম নাটক-নভেলগুলির সহিত পরিচয়ের) গর্ব্বে অম্লানবদনে পূর্ব্বোক্তরূপ কৃত্রিম রসের ছড়াছড়ি করিতেছেন। "গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।" এই কৃত্রিমতাকে, রুচির সঙ্কীর্ণতাকে, স্বভাব হইতে বিচ্যুতিকে কি "আগে চলা" বলিব, না অপথে চলা বলিব? এখনও সময় আছে, তাঁহারা ফিরিয়া আসুন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ক্ষমতার অভাব নাই, অবসরও প্রচুর আছে, এবং কাহারও কাহারও দ্রুত-রচনাশক্তি সত্যই অতি বিস্ময়কর। তাঁহারা নিজেদের গণ্ডীর জন্য লিখিবেন না, আমাদের জন্য অর্থাৎ তাঁহাদের গণ্ডীর বাহিরে যে বৃহৎ বাঙ্গালা দেশ পড়িয়া রহিয়াছে, (বঙ্কিমের ন্যায়) তাহার সকলের জন্য লিখুন। সমস্ত জাতি তাঁহাদের দান মাথায় তুলিয়া লইবে।

ভাষা ও ভাবের পর "পদ্ধতি, চরিত্রসৃষ্টি, ধরণ-ধারণে"র কথা। নাটক উপন্যাসের পদ্ধতি বা ধরণ-ধারণ উহাদের প্রাণভূত রসের ন্যায় নিত্যবস্তু নয়। "শকুন্তলা"র পদ্ধতি গ্রীক নাটকের পদ্ধতি নয়। সেক্সপীয়রের পদ্ধতি উক্ত উভয়পদ্ধতি হইতে ভিন্ন। আবার সেক্সপীয়রের পদ্ধতিও আধুনিক কালের ইংরাজী নাটকে অনুসৃত হয় না। একই দেশে একই কালে ভিন্নভিন্ন শিল্পীর পদ্ধতিতেও কিছু কিছু ইতরবিশেষ হয়। পদ্ধতিসম্বন্ধে বঙ্কিমের আদর্শ ছিল আখ্যানবস্তুকে যথাসম্ভব সরল ও সুসংহত করা। তাঁহার সকল উপন্যাসেরই আখ্যানবস্তু সরল, সুসংহত ও সর্ব্বাবয়বে সুবিন্যস্ত। আখ্যানবস্তুর নিবিড়তা রক্ষার জন্য কোনও কোনও স্থলে তাঁহাকে দুই-একটি অপেক্ষাকৃত অসাধারণ উপায়ও অবলম্বন করিতে হইয়াছে। "চন্দ্রশেখরে" যোগবলের প্রয়োগও ঐরূপ একটি অসাধারণ উপায়। ঐ উপায়টি অবলম্বন না করিলে শৈবলিনীর মানসিক-পরিবর্ত্তন সাধন করিতে বঙ্কিমকে অনেক অবান্তর ঘটনা ও পাত্রের অবতারণা করিতে হইত। অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, অতিপ্রাকৃত উপায় অবলম্বন করাও কি উপন্যাসের একটা গুণ? হয়ত গুণ নয়, যদিও একথা স্বীকার্য্য যে, বঙ্কিম যোগবলে বিশ্বাস করিতেন। আর

"শকুন্তলা"র আলোচনায় দুর্ব্বাসার শাপ-সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একপ্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এ স্থলে স্মরণ করা যাইতে পারে। দুর্ব্বাসার শাপ দুষ্মন্ত-চরিত্রের অসুন্দর দিক্‌টার সবিস্তরবর্ণনের দায় হইতে কালিদাসকে নিষ্কৃতি দিয়াছে। সে যাহা হউক, বঙ্কিম প্লটের নিবিড়তা বা সুসংহততার পক্ষপাতী ছিলেন; আর তিনি নিতান্ত আবশ্যক স্থল ব্যতীত পাত্র-পাত্রীর মনোভাবের সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ করিতে বসিতেন না। বাঙ্গালা উপন্যাসে ভাব-বিশ্লেষণের বাহুল্য বোধ হয় রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। বঙ্কিমের রীতি ও রবীন্দ্রনাথের রীতি দুই-ই শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ঔপন্যাসিকদিগের অবলম্বিত রীতির অনুগত। একরীতিতে ঘটনাবলীবর্ণনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয় অধিক, অন্যরীতিতে ঘটনা অপেক্ষা পাত্রপাত্রীগণের মনোভাবের ছবি তোলার দিকে দৃষ্টি থাকে অধিক। কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ রীতি তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইংরাজী উপন্যাসে এককালে প্রথম রীতি অধিক অনুসৃত হইত, পরে দ্বিতীয় রীতির প্রাবল্য হয়। উহারই বিবর্ত্তনক্রমে যাহাকে বলে novel of character, problem psychology ইত্যাদি, তৎসমুদয়ের উদ্ভব হইয়াছে। ইদানীং আবার প্রথমরীতির গুণাবলীর প্রতি যেন ইংরেজ ঔপন্যাসিকগণ অধিক আকৃষ্ট হইতেছেন মনে হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন,—উপন্যাসের সার হইতেছে গল্প, মনোভাববিশ্লেষণ নয়। পাত্র-পাত্রীর আচরণের মধ্যে তাহাদের মনোভাবের প্রকাশ থাকিবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। পাতার পর পাতা-ভরা ভাববিশ্লেষণের ভারে গল্পের গতি ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাহার সৌন্দর্য্যের হানিও অল্প হয় না। পনের পৃষ্ঠাব্যাপী ঘটনাবর্ণন অপেক্ষা and she thought (এবং তাহার মনে হইল) বলিয়া আরম্ভ করিয়া পনের পৃষ্ঠাব্যাপী মনোভাব বিশ্লেষণের অবতারণা অনেক সহজ ব্যাপার। যাহা হউক, এই নূতন মতটা যখন বিলাতী মত, তখন মনে হয় আমাদের দেশেও যথাকালে ইহার প্রাবল্য ঘটিবে, এবং তখনকার লেখকগণ যথারীতি ইহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের নূতনতর আধুনিকতার গর্ব্ব করিতে বসিবেন। তখন অন্ততঃ এই লাভ হইবে যে, শরৎচন্দ্রের কথায় বঙ্কিমের রীতি আপাততঃ যত সেকেলে মনে হয় তখন হয়ত তত মনে হইবে না।

ঘটনা ও চরিত্রকল্পনায় বঙ্কিমের পদ্ধতির একটি বিশেষত্ব—উহাতে একটু কাব্যধর্ম্ম ও একটু নাটকীয় ধর্ম্মের আধিক্য। এই দুইগুণে রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমের উপন্যাসের সাফল্য এত অধিক। আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ এই দুই ধর্ম্ম উপন্যাসোচিত মনে না করিয়া তাহা বর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী, এবং সে পক্ষপাত দূষণীয়ও নহে। কিন্তু এই স্বাভাবিকতার সাধনে (অবশ্য য়ুরোপেরই আধুনিক নভেল ও নাটকের অনুকরণে) তাহাদের সমগ্র চেষ্টা হইতেছে পাপকে পাঠযোগ্য করার দিকে, পুণ্যকে নহে। সমাজে কি কেবল পাপই আছে, পুণ্য নাই? পাপই কি মানুষের স্বভাব, পুণ্য নয়? বস্তুতঃ পুণ্যই স্বভাব, পাপ বিকার। আধুনিকগণ যদি স্বভাবকে সাহিত্যে বড় করিতে চান, তবে পুণ্যকে পাঠযোগ্য করুন। তাহা হইলে, যদি তাঁহাদের যথার্থ সৃষ্টিনৈপুণ্য থাকে, তবে তাঁহারা কেবল স্বদেশকে নয়, বিদেশকেও—তাঁহাদের "বিশ্ব"-কেও—এমন কিছু দান করিতে পারিবেন, যাহা হয়ত তাহারা স্বেচ্ছায় নষ্ট হইতে দিবে না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যাহাকে স্বভাব মনে করিয়া সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, বাঙ্গালীর বাস্তবজীবনের সহিত তাহার কতখানি যোগ আছে, তাহা কি তাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আমরা অসাহিত্যিকেরা ত দেখিতেছি—তাঁহাদের সৃষ্টি বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির ন্যায় অপ্রতিষ্ঠ,—উহার স্থান উর্দ্ধলোকেও নাই, অধোলোকেই নাই। তাই তাঁহারা "রোমান্টিক" না হইলেও যথার্থ "রিয়ালিষ্ট" নহেন। কেহ বা অল্পাধিক পরিমাণে অস্বাভাবিক এক-একটা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য কল্পনা করিয়া সাহিত্যে প্রভূত পরিমাণে অলীক ব্যথার সৃষ্টি করিতেছেন; কেহ বা ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত মনস্তত্ত্বের কয়েকটা উৎকট উদাহরণ-কল্পনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; আবার কাহারও বা নবসৃষ্টির প্রেরণা আসিতেছে বিলাতী অপরাধীর মনস্তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্র হইতে। বাঙ্গালীর বাস্তব জীবন হইতে রসসৃষ্টির প্রেরণা পাইয়াছেন, বা পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছেন অতি অল্প কয়েকজনেই।

বঙ্কিমের চরিত্র-সৃষ্টি (এবং সাহিত্য-সেবার সত্য মূল্য) সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহাকে কেবল নিত্য-নবসৃষ্টিকুশল শিল্পিরূপে দেখিলে চলিবে না ; তিনি তাহা ত ছিলেনই ; কল্পনার বিপুলতা—ইংরাজীতে যাহাকে বলে largeness of design তাহা—তাঁহার যত ছিল, বাঙ্গালা উপন্যাসে আর কাহারও মধ্যে তত দেখা যায় না ; কিন্তু ইহাই তাঁহার সর্ব্বস্ব নয়। কবি ও শিল্পীর উপরে ছিলেন তিনি ভক্তিপ্রবণ দার্শনিক, দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন স্বদেশ-প্রেমিক, এবং ধীর ও শ্রদ্ধাশীল সমাজ-সংস্কারক। রস-সৃষ্টির প্রেরণাই অবশ্য সাহিত্যের মৌলিক-প্রেরণা। কিন্তু সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তি-বশে ঐ প্রেরণা প্রকাশ এক-একটা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। রাস্কিনই বোধ হয় বলিয়াছেন, স্কটের রচনাগুলির ভাব যে এত পবিত্র, তজ্জন্য প্রত্যেক ইংরেজের ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমরাও বলি, বঙ্কিমের মধ্যে যে দেশের ও সমাজের জন্য এত দরদ ও পবিত্রতার প্রতি এত অনুরাগ ছিল, তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর ভগবানের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সাহিত্যকে যে সমাজনিরপেক্ষ একটা বস্তু হইতে হইবে এমন সংস্কার বঙ্কিমের ছিল না। সাহিত্য তাঁহার সমাজসেবার ও স্বদেশসেবার উপকরণ ছিল। সেদিন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী একপ্রবন্ধে এইরূপ একটি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা বলিয়া ইদানীং যে একটা কথা উঠিয়াছে, তাহা একেবারেই অর্থহীন ; যাহারা উহা বলে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে সমাজের স্বাস্থ্যের কথাই ভাবে ; সাহিত্যের স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য কিছু নাই। কথাটা কি ঠিক ? রসই সাহিত্যের প্রাণ ইহা সকলপক্ষই স্বীকার করেন। অলঙ্কার শাস্ত্রে ঐ রসের অনুভূতিকে "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর" "সত্ত্বোদ্রেক হেতু অখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়" ইত্যাদি অতি মহৎ মহৎ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। অপবিত্র, পঙ্কিল ন্যাক্কারজনক প্রসঙ্গে তাদৃশ অনুভূতি সম্ভব কি ? বস্তুতঃ সাহিত্য নিজ উন্নতত্ব-স্বভাবসিদ্ধ নির্ম্মল, আনন্দময়, কল্যাণগুণময় ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেই স্বস্থ (বা সুস্থ যাহাই বল,—কেননা স্বস্থতাই সুস্থতা) হইল। তাহার বিপরীত ভাবই তাহার অস্বাস্থ্য। সাহিত্যের অস্বাস্থ্যে হয় সমাজের অস্বাস্থ্য প্রকাশ পায়, না হয় উহাতে সমাজের ভয়ের কারণ আছে। বঙ্কিম ইহা জানিতেন এবং মানিয়া চলিতেন। তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রমাণ দেওয়া এস্থলে সম্ভব নয়। শরৎবাবু যেমন বলিয়াছেন, আধুনিকদিগের যদি বঙ্কিমের প্রতি যথার্থই শ্রদ্ধাভক্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ভাষা বা পদ্ধতিসম্বন্ধে বঙ্কিমের আদর্শ অনুসরণ করুন আর নাই করুন, সমাজের প্রতি তাঁহার দরদের, স্বদেশের প্রতি তাহার ভক্তির আদর্শ হইতে কখনই বিচ্যুত হইবেন না। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কিছুকাল পূর্ব্বে একপ্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যের লক্ষ্যনির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—"আমরা চাই modern হইতে"। বঙ্কিমও তাহাই চাহিতেন, কিন্তু যে আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব এতকাল শত অবস্থা-বিপর্য্যের মধ্যে হিন্দুজাতি ও হিন্দু সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহা বিসর্জ্জন দিয়া নহে। রুশ ঔপন্যাসিক টুর্গেনিফ্ (Turgenev) তাহার "রুডিন" (Rudin) নামক সুবিখ্যাত নাটকখানিতে এক পাত্রের মুখে একটি কথা দিয়াছেন, যাহা ঐ নাটকখানির শিক্ষা বলিলে ভুল হয় না। তাঁহার সময়ের রুশিয়ার সামাজিক অবস্থা অনেকাংশে আমাদের সামাজিক অবস্থার মতই ছিল। সুতরাং ঐ শিক্ষাটি আমাদের বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য। কথাটি এইরূপ—"Russia can do without everyone of us, but not one of us can do without Russia. Woe to him who thinks he can, and woe two-fold to him who actually does do without her. Cosmopolitanism is all twaddle ; the cosmopolitan is a nonentity. Without nationality is no art, nor truth, nor life, nor anything. You cannot even have an ideal face without individual expression. Only a vulgar face can be devoid of it." অর্থাৎ "আমাদের প্রত্যেককে ছাড়িয়া রুশিয়ার চলে, কিন্তু রুশিয়াকে ছাড়া আমাদের একজনেরও চলে না। যে মনে করে যে, সে রুশিয়াকে ছাড়িয়া চলিতে পারে, সে হতভাগ্য ; এবং যে ছাড়িয়া চলিতে যায়, সে দ্বিগুণ হতভাগ্য। সার্ব্বজাতিক ভাব একটা নিরর্থক কথা ; সার্ব্বজাতিক মানুষ একটি অবস্তু। জাতীয়ধর্ম্মবর্জ্জিত শিল্প অসৎ, সত্য অসৎ, জীবন অসৎ, সব অসৎ। একখানি মুখকে পর্য্যন্ত আদর্শ-সুন্দর মুখ বলা যায় না, যদি তাহাতে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ না

থাকে। অসুন্দর মুখেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ থাকে না।" সাহিত্যে যাঁহারা বঙ্কিমকে ছাড়াইয়া আগে চলিতে চান, তাঁহারা আদর্শ-সৌন্দর্য্যের এই উন্নত প্রশস্ত রাজপথ—যাহা স্বয়ং বঙ্কিমও অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই—ধরিয়া দূরে—আরও দূরে—অগ্রসর হইতে চেষ্টা করুন; তাঁহাদের সাহিত্যসেবা সার্থক হইবে, দেশবাসী ধন্য হইবে, এবং নিজ সাহিত্যশিষ্যগণের নিকট পরাজয়ের গৌরবে অমরলোকে বঙ্কিমের আত্মাও তৃপ্তিলাভ করিবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত-গুপ্ত

"জন্মাষ্টমী"

(দাশু রায় অবলম্বনে)

ভাদ্র মাসে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র পাঠক-পাঠিকাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা শুনাইতে ইচ্ছা হইতেছে।

কংস, নিজ পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মথুরায় প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছেন। যে ব্যক্তি নিজ পিতার সহিত এরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতে পারে, তাহার প্রতাপে প্রজাদিগের কিরূপ দুরবস্থা, তাহা সহজেই অনুমেয়। একদিন নারদ আসিয়া কংসকে ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া গেলেন—দেবকীর অষ্টম গর্ভে স্বয়ং ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার হাতেই কংসের নিধন নিশ্চিত। একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ;—একেই ত অত্যাচারী রাজা সর্ব্বদা ভয়ে-ভয়ে থাকেন, তাহার উপর এই দুঃসংবাদ, কংস রোষে-ভয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। কংস ভাবিল, যদি বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করা যায় এবং দেবকীর সন্তানকে জন্মমাত্র বিনষ্ট করা হয়, তাহা হইলে আর ভয় কি? এই ভাবিয়া কংস, বসুদেবের সহিত ভগিনী দেবকীকে কারারুদ্ধ করিল। ভগবানের আবির্ভাবের ভয়ে কংস এতই ভীত হইয়াছিল যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা তাহার সাহসে কুলাইল না। সে একে-একে দেবকীর সাতটী সন্তানই ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রেই বধ করিয়াছে। এইবার দেবকীর অষ্টম গর্ভ, সুতরাং পাহারার আরও কড়াক্কড় বন্দোবস্ত হইল।

ছিল কংস-দৈত্য মথুরায়, রসাতল করি ধরায়,
হইয়ে পাতকীর অগ্রগণ্য।
যেমন স্বয়ং তেমনি সভাসত জনেক নাহিক সৎ
ভবিষ্যৎ ভয়-মাত্র শূন্য॥
কৃষ্ণেতে কেবল দ্বেষ, কৃষ্ণনাম-শূন্য দেশ
করিয়া করিল পাপ রাজা,
যে জন কৃষ্ণগুণ গায়, কংস শুনলে কৃষ্ণ পায়,
কৃষ্ণদ্বেষী জনে করে পূজা॥
নাম ছিল যার কৃষ্ণদাস, কংস রাজ্যে উঠিয়ে বাস,
পলায়ে গেল সমুদ্রের ধারে।
তুলসী মঞ্চ যার ঘরে, হরিমন্দির নাসায় করে
অমনি যমমন্দিরে কংস পাঠান তারে॥
ত্যেজে অগ্নি পিপুল শুঁট, তখন দিলে হরির লুট,
ছেলে শুদ্ধ পোয়াতীর কপাল কাটতো।
ছেলেকে দিয়ে যমের বাড়ী তখন ছেলের বাপের নাড়ী
টেনে কংস চেয়াড়ি দিয়ে কাটতো॥

এদিকে নারদের ভবিষ্যদ্বাণী রাজ্যে প্রচারিত হইতে হইতেই অত্যাচার-পীড়িত প্রজাবর্গ ভগবানের আবির্ভাব হইবে ভাবিয়া ভক্তিরসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু কংসের রাজত্বে ভগবানের নাম লইবারও যো নাই—

প্রজারা ত এইরূপে ভয়ে-ভয়ে, চুপে চুপে ভগবানের নাম করিয়া কাল কাটাইতে থাকিল; কিন্তু ধরণী, কংস ভারে অধীর হইয়া উঠিলেন। উপায়ার্থ তিনি মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলে, পৃথিবীর দুঃখ—

শুনে কন পশুপতি, বসো বসো বসুমতি!
ভোগ শুন আমার ললাটে॥
আমি, মৃত্যুকে করিয়া জয়, নাম ধরেছি মৃত্যুঞ্জয়,
মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু এখন ভাল।
আমি লব কি তোমার ভার, আমারি মুখ দেখান ভার
কাশীতে আমার ভূমিকম্প হলো॥

আমি শুণ আর কিসে প্রকাশি, ত্রিশূলের উপরে ছিল কাশী
কলি বেটা ক্রমে নড়িয়ে দিলে!
দৈত্য-নাশিনী ঘরে নারী, তিনি বলেন, আমি কলিকে নারি,
অবাক্ হয়ে আছেন দুটী ছেলে॥
শুন শুন ভূতল! যাও তুমি উৎকল
জানাও গিয়ে জগন্নাথের স্থানে।*
শুনি কাশী পরিহরি করিলেন শ্রীহরি,
সিন্ধুকূলে শ্রীহরি যেখানে॥
মনের যত বেদন অভয় পদে নিবেদন
করিলেন ধরা, অভয়-পদ ভাবি!
গত মাঘে হলো ব্যাঘাত জবাব দিলেন জগন্নাথ,
বল্লেন, আমার হাত নাই, পৃথিবি॥
একে আমার নাইক হাত, তাতে আমি অনাথ
অকূল সমুদ্র-কূলে আছি।
ছিল কয়জন প্রিয়পাত্র, কলির অধিকার মাত্র
পাণ্ডব আদি স্বর্গে পাঠায়েছি॥
কতকগুলি ভোগ গ্রহণ করতে আছি দশহাজার বর্ষ মর্ত্তে:
এই কথা শুনে বসুমতী—
প্রণাম ক'রে বিদায় ল'য়ে, মেদিনী বেদনা পেয়ে,
জানায় গিয়ে যথা ভাগীরথী॥
গঙ্গা ক'ন, শুন পৃথ্বি! ঘুচিল ভগীরথের কীর্ত্তি
গঙ্গার এখন গঙ্গালাভ গণ্য।
গেছে সে তরঙ্গ প্রবল মহাপ্রাণীটে আছে কেবল
পাঁচ হাজার বর্ষ নিয়ম জন্য॥
আমার আর নাইক বল; জোয়ার আছে, তাইতে কেবল,
যোগে-যাগে যেতেছি।
ক্রমে হয়ে এলাম ক্ষীণ, বাড়িছে দুঃখ দিন দিন,
গণ্‌তির দিন কটা মর্ত্তে আছি॥
আমার সর্ব্বাঙ্গে ঘেরেছে চড়া, সাধ্য নেই আর নড়া চড়া
যেমন চড়া তেমনি পড়া, বলিব দুঃখ কাকে।
তোমার ভার কি লব, ধরণি! এলে একশত মণের তরণী
চালাতে নারি, চরে আটকে থাকে॥
(যদি বল কিছু পাপ ছিল।)
আমার পরম গুরু কৃত্তিবাস তাঁর শিরে করেছি বাস
সতীনের দ্বেষ করেছি সদাই।
সতীন কি সামান্য নিধি, তিনি দুর্গতি হারিণী দিদি;
তাইতে এত মনস্তাপ পাই॥

সতীনের উপর ক'রে দ্বেষ, স্বামীকে দিয়েছি ক্লেশ,
সেই ফল মোর ফলিল এতদিনে।
স্বামী আমার সদানন্দ, কত শত বলেছি মন্দ,
একটী কথা রাখেন নাইক মনে॥
বুঝি সেই পাপেতে শূলপাণি, এখন দলে মিশায়ে হন্ কোম্পাণী,
লজ্জা দেন আমাকে।
নৈলে কাটি-গঙ্গা ক'রে তারা, ফিরিয়ে দেয় আমার ধারা,
এ লজ্জা ম'লে কি মোর ঢাকে?
নরে করে এত মন্দ, কালীঘাট দিয়ে পথ বন্ধ,
দিনে দিনে সন্দ বাড়িছে মনে।
মানে না কেউ গঙ্গা ব'লে, মল-মূত্র দেয় ফেলে,
মর্ত্তলোকে তত্ত্ব-কথা কে শুনে?

এদিকে ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রিতে কারাগারে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন। ভাগবতী মায়ায় বসুদেব-দেবকী সন্তানের বিভূতি দেখিয়া বিমুগ্ধ,—

রূপ দেখে কমল-আঁখির, বসুদেব দেবকীর,—
অনিমেষ হয় আঁখির, জন্মিল বিস্ময়।
উঠিল অঙ্গ শিহরি, দেখে ভব-আরাধ্য হরি,—
হয়েছেন উদয়॥
চরণ দুটী শোভাকর, প্রভাতের প্রভাকর,
প্রভাকর-সুতের কর, এড়ায় যৎপদ-স্মরণে।
জগৎ-পিতা পীতাম্বরে,— মরি কি শোভা পীতাম্বরে,
স্থির সৌদামিনী করে, যেমন শোভা ঘনে॥
কিবা শোভা, কর চারি, কৈলাস-গিরি-বিহারী,—
ফণিহারীর মণিহারী, বনকুসুম-হারী।
কটির বেড়িয়ে বন্ধ, সিংহেতে কোটী কলঙ্ক,
শঙ্কাযুক্ত হয় শঙ্খ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী॥

দেবকী, কংসের নির্য্যাতন কাহিনী কহিতে থাকিলে, যেন এই অভয় বাণী তাঁহাদের কর্ণে গেল—

ভয় নাই আর কংস ভয়ে, আমি রাখিলাম অভয়ে,
নির্ভয় হইয়ে সব থাক।
ত্বরায় আসি কংসালয়, করিব আমি কংসে লয়,
নন্দালয়ে আশু আমাকে রাখ॥
যশোদা নন্দের জায়া, প্রসবিয়ে যোগমায়া,
নিদ্রাযোগে আছেন যে ঘরে।
মোরে পরিবর্ত্ত করি, আন গে সেই শুভঙ্করী,
শুভ যাত্রা করহ সত্বরে॥

তখন,—

* রস রচনায় কালানৌচিত্য (anachronism) দোষ ধর্ত্তব্য নহে।

শুনে বাণী সুধা-মাখা, শ্রেয় হলো গোকুলে রাখা,
বসুদেব উঠেন ত্বরা করি।
কংস-পুরী পরিহরি, বদনে বলি শ্রীহরি,—
কোলে লয়ে শ্রীহরি, করেন শ্রীহরি ॥

আশ্চর্য্য! সেই রাত্রিতেই দেবী মায়ায় কংসের প্রহরীগণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। কংস ভাবিয়াছিলেন, প্রহরী রাখিয়া ভগবান্‌কে কারাগারেই অবদ্ধ রাখিবেন। কিন্তু "মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থা"। বসুদেব শিশুকে কোলে লইয়া অবাধে বহির্গত হইলেন। কিন্তু ভীষণ দুর্য্যোগ!—ঘোরা তিমিরা রজনী, আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, অট্টহাসে চপলা চমকিয়া যাইতেছে, মুষলধারে বৃষ্টি! যমুনাতীরে গিয়া বসুদেবের চক্ষু স্থির! বসুদেব ভাবিতেছেন;—

এ তরঙ্গ হয়ে পার, ওপারে গিয়ে এ ব্যাপার,
রেখে এ ধন লওয়া করা ভার ॥
দরিদ্রের মনোবাসনা, লঙ্কায় গিয়ে আনি সোণা,
সেটা মাত্র মনের বিকার ॥
নাই নাবিক, নাই তরী, কেমনে দুর্গমে তরি,
দুর্গে! যদি রাখো মা দুস্তরে।
শোক নাই নিজ পতনে, বাঁচাই বংশরতনে,—
কেমনে কুবংশ কংস-করে ॥

গান

কেঁদে আকুল বসুদেব, দেখে অকূল যমুনা।
বহে দুনয়নে বারি, কোলে অকূল-কাণ্ডারী
তা' জানেন না।
বসু বলে, শিশু রক্ষ, গো জননি।
এমন অকূলে কুলকুণ্ডলিনী বৈ, কূল আর কৈ?
হ'লো প্রতিকূল বিধি, দিয়ে লয় বা নিধি।
কৃপানিধি বিনে, (দীনের) কূল আর রৈল না।
একবার ভাবেন, যদি ধরতাম কংসের পদে;—
দেবে দয়া যদি হতো পাষাণ-হৃদে,—
তা হয়না আর;—
গেল একূল-ওকূল দুকূল, অকূল পাবে গোকুল,—
কুলের তিলক রাখ্‌তে কূল পেলাম না ॥

যাঁহার ক্রোড়ে শিশু ভগবান্‌, তাঁহার এই ঘোর সঙ্কটে সঙ্কটহারিণী কি নিশ্চিন্তা থাকিতে পারেন? তারিণী—

হয়ে মূর্ত্তি শৃগালিনী, পার হন শুভদায়িনী;
বসুদেব পাইলেন অভয়।
বক্ষে ক'রে নীলবরণ, জলে দিলেন চরণ
নন্দনে রাখিতে নন্দালয় ॥

বসুদেব শিশু কোলে লইয়া নন্দালয়ে উপস্থিত;—

দেখেন, সূতিকাঘরে নন্দজায়া, প্রসবিয়ে যোগমায়া,
মৃতকায়া-তুল্য নিদ্রা যান।
নিদ্রাবস্থায় হয়ে প্রসব, নাই দুঃখ, নাই উৎসব,
না জানেন হ'লো কি সন্তান ॥
পুত্রের বদলে কন্যে, ল'তে হবে, সেই জন্যে,—
পূর্ব্বে বড় ছিল মনঃকষ্ট।
নয়ন-মন উথলিল, পুত্রমায়া পাসরিল,
মায়ার বদন করি দৃষ্ট ॥

যোগমায়ার রূপ কেমন?—

যেমন তীর্থের শেরা কাশীধাম, কর্ম্মের শেরা নিষ্কাম,
নামের শেরা রামনাম তারকব্রহ্ম জানি।
খাদ্যের শেরা ঘৃত ক্ষীর, দেশের শেরা গঙ্গাতীর,
বেশের শেরা শ্রীপতির গোষ্ঠ-বেশ খানি ॥
বলের শেরা যোগবল, ফলের শেরা মোক্ষ-ফল,
জলের শেরা গঙ্গাজল, থলের শেরা [illegible]।
পুরাণের শেরা ভারত, রথের শেরা পুষ্পকরথ,
পুত্রের শেরা ভগীরথ, বংশ-চূড়ামণি ॥
মুনির শেরা নারদ মুনি, ফণীর শেরা অনন্ত ফণী,
নদীর শেরা মন্দাকিনী, পতিতপাবনী।
পূজার শেরা আশ্বিনে পূজা, মূর্ত্তির শেরা দশভুজা,
যুক্তির শেরা, শেষ থাকে যার, সেই যুক্তি শুনি।
চুলের শেরা চাঁচর-চুল, কুলের শেরা ব্রহ্ম-কুল,
ফুলের শেরা কমলফুল, করেন কমল-যোনি।
তন্ত্রের শেরা নির্ব্বাণ-তন্ত্র, মন্ত্রের শেরা হরি-মন্ত্র
যন্ত্রের শেরা বীণাযন্ত্র, বাজান নারদ মুনি ॥
তিথির শেরা পূর্ণিমা তিথি, ব্রতীর শেরা যজ্ঞে ব্রতী,
স্মৃতির শেরা হরি-স্মৃতি, বিপদ নাশিনী।
মেষের রৌদ্র ধূপের শেরা, * রামচন্দ্র ভূপের শেরা,
যেমনি দেখেন রূপের শেরা, হর মনোমোহিনী ॥

যাহা হউক, কন্যা লইয়া রাত্রি থাকিতে থাকিতেই বসুদেবকে কংসপুরে প্রত্যাগত হইতে হইবে; সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করিয়া—

* মেষ-রাশিতে যখন সূর্য্য থাকেন, অর্থাৎ বৈশাখ-মাসের রৌদ্র!

যশোদার কোলে সঁপে শিশু কন্যাটি লয়ে বসু
আশু যান পূর্ব্ব পথে চলে।
গিয়ে মথুরা-নগরে, সুনিদ্রা সুতিকা-ঘরে,
কন্যা দেন দেবকীর কোলে॥

তখন প্রহরীদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; পুরীদ্বার যথা-বিধি বদ্ধ। কারাগার হইতে সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া প্রহরীগণ তৎক্ষণাৎ কংসকে সে সমাচার জ্ঞাপন করিল।

শুনি কংস, যেমন শমন, সত্বরে করে গমন,
কারাগার মন্দিরে উদয়।
নয়নে দেখে প্রকৃতি, না যায় মন-বিকৃতি
নাশিতে উদ্যত নিরদয়।
কাঁদিয়ে দেবকী বলে, ইন্দ্র কাঁপে তব বলে
ভবে তব তুলা কেবা বলো।
এই সাহসে মোর বলা, জন্মেছে কন্যা অবলা,
দুর্ব্বলারে বধ করায় কি ফল?
নারদের কথায় চল্‌লে, সাত পুত্র লয় করলে,
শুনলে না, মান্‌লে না বেদ-বিধি।
অষ্টমে জন্মিবে পুত্র সে কথা রহিল কুত্র
বিধি পুত্র * সদা মিথ্যাবাদী॥
যে হোক আজি হয়ে শিষ্ট রাখ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট,
পুরাও ইষ্ট কৃপাদৃষ্টি করি।
কুমারী বধো না—রাজা! কুমারী করিলে পূজা
সে পূজা পান গিরিরাজ-কুমারী॥

কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"—

শুনে কথা দেবকীর রাগে হইল দু-আঁখির
বর্ণ যেন জবা কোকনদ।
আরে পাপিনি! বলিস্ কিরে একেবারে করেছি কিরে
যা হয় গর্ভে তাই করিব বধ॥
কন্যা ত মানবী বটে, ফেলিতে পারে সঙ্কটে
পাপিনি! তোর ও পাপ উদরে—
যদি এক ভেক জন্মে তথাপি না বিশ্বাস জন্মে
অস্ত্র করা আছে মোর অন্তরে।
তোর জ্বালাতে পাইনা খেতে, রাতে নিদ্রা পাইনা যেতে,
দিনে-রাতে থাকি ঘড়ি পেতে নিয়ত॥
ঘটাতে পারি তোর মরণ, থাকি ক'রে রাগ সম্বরণ,
নৈলে, ঢাকী-সহ সহমরণ হতো॥

* নারদ।

ব'লে কন্যা ধরিতে যায়, দেবকী যতনে তায়,
হৃদে রেখেছিল মনসাধে।
প্রাণভয়ে দিল ছাড়িয়ে, পাষাণেতে আছাড়িয়ে,
পাষাণ হইয়ে কংস বধে॥

তখন, যোগমায়া মানবীকায়া ত্যাগ করিয়া গগন মণ্ডল হইতে কহিলেন:—

ডাকিয়ে কহেন শিবে, তুমি যারে বিনাশিবে,
বাঞ্ছা করো—সেই তোমায় নাশিবে।
নিকটে আছে সে জন, নিকট হলে শমন,
সে তোমার নিকটে আসিবে॥

ভগবানকে বিনষ্ট করিবার এত বুদ্ধি ও কৌশল, সব বৃথা হইল এবং যিনি কংসকে বিনাশ করিবেন, তিনি স্বচ্ছন্দে গোকুলে বাড়িতে থাকিলেন!

হেথায় গোকুল নগরে সুনিদ্র সুতিকাগারে
চৈতন্য পাইয়া নন্দজায়া।
সুন্দর সুত প্রসব দে'খে ধরেনা উৎসব
মনে-মনে ভাবেন নন্দপ্রিয়া।

*　　*

নীল জলধর নিধি যোদিত করিয়া বিধি
নির্ম্মাইয়া মোরে দিয়ে গেল॥
পুলকে অঙ্গ মোহিতে বলে আমি এ মহীতে
এত দিনে হলাম ভাগ্যবতী।
নীল-কমলে—হৃদ কমলে লইয়ে বদন-কমলে
শত-শত চুম্বন দেন সতী॥
নন্দ এসে, নীলমণি কোলে তুলে নিল অমনি
সুরমণির পদ তুচ্ছ গণে।
আনন্দে বিলায় ধন শত-শত গোধন
বলে, ধন সার্থক এত দিনে।
এ নৈলে ধন কি নিমিত্তে রাজা নাম কিনি মিথ্যে
এত দিনে রাজা হ'লাম গোকুলে।
গোকুল বাসীরা সব ঐ কথারি উৎসব
সব কর্ম্ম সবে গিয়েছে ভুলে॥

*　　*　*

গোকুলের কুলরমণী আনন্দে চলে অমনি,
নন্দরাণীর নীলমণিকে দেখতে।
হেরিতে নন্দ তনয় জটিলের আনন্দ নয়
যায় প্রেম মৌখিকেতে রাখতে॥
রোগী যেন রোগের দায় নয়ন মুদে নিম্ব খায়
সেই রূপে সুতিকা-ঘরে গেল।

পরের সুখে জ্বলে গাত্র জুড়ায়নাক থল মাত্র
পুত্র মাত্র দেখে পলাইল ॥

জটিলা মূর্ত্তিমতী ঈর্ষা। নন্দরাণীর সুখের সংসার; কিছুরই অভাব নাই; এক অভাব ছিল পুত্রাভাব, আজ সে অভাবও দূর হইয়া রাণীর সুখের মাত্রা পূর্ণ হইল। জটিলার ইহাই দুঃখ! জটিলা ফিরিতেছে, এমন সময়ে গর্গমুনির পত্নী নন্দালয়ে যাইতেছেন। তিনি—

পথে যেতে জটিলাকে সুধান অতি পুলকে
যশোদার ছেলেকে দেখে এলে?
অপরূপ শুনেছি রাই! জটিলে বলে, পোড়া কাঠ
জানি কৃষ্ণবর্ণ বটে ছেলে॥
এই গোকুলের অভাগীরে জয়কেতে যত মাগীরে
সেই ছেলের রূপ বলিছে চমৎকার!
ধরিনে সেটা ছেলে ব'লে কিন্তু সেটা মেয়ে হ'লে
কেউ ছুঁত না বিকান হত ভার॥
যাহোক্, হয়েছে বংশ রক্ষা নাই মামা, তা অপেক্ষা
লোকে বলে, কাণা মামাটা ভাল।
নাই মৎস্য, দুগ্ধ, দধি, সিদ্ধ পক্ক হ'ল যদি
তবু ত ভাল উপবাসটা গেল॥
বস্ত্রাভাবে কটিতটে যদি কারু কপনি ঘটে
উলঙ্গ হতে তো ভাল দৃষ্ট।
যদি গেলাস ঘটি না যোগায় ভাঁড়ে যদি জল খায়
ঘাটে খাওয়া অপেক্ষা ত শ্রেষ্ঠ॥
চোখে দৃষ্টি ছিল না যার ঝাপসা নজর হ'ল তার
অন্ধ হতে ভাল ত শতগুণে।
সেইরূপ নন্দের হ'ল সম্প্রতি মন্দের ভাল
সোজা বলিব,—রাজা বলে বুঝিনে॥

গোকুলের নরনারীদের মুখে যে ছেলের রূপের কথা ধরিতেছে না, জটিলা সেই ছেলের ঐরূপে নিন্দা করিল শুনিয়া, মুনি-পত্নী অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন।—

কথা শুনে ব্রাহ্মণীর দুটী চক্ষে বহে নীর,
বলে, জটিলে! তুই বড় পাপিনী।
গিয়ে ছিলি অভক্তি করি আঁখিতে দেখিতে হরি
পা'স নাই তুই ভাবেতে আমি জানি॥
শুনেছি কথা মিথ্যা তাকি যে পুরুষ অতি পাতকী
যে রমণী ব্যভিচারিণী হয়।
সাধ করে ঘর তেয়াগিয়ে জগন্নাথ দেখতে গিয়ে
শ্রীমন্দির দেখে শূন্যময়॥

মর্ত্ত্যে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া শিশু-ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য দেবগণ গোকুলের গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন। দেব-দৃষ্টিতে তাঁহারা দেখিলেন,—ভগবান নবীন-নীরদ-কান্তি শিশু-মূর্ত্তিতে নন্দরাণীর ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছেন; এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে নন্দপুরী জ্যোতির্ম্ময়ী এবং গোকুল যেন আনন্দ-সলিলে ভাসিতেছে!—

গান

নিত্য-গোপাল হেরে, নেত্রে বারি ঝরে
প্রেমে নৃত্য করে গোকুল বাসিগণ।
কি আনন্দ নন্দ, পেয়ে নিত্যানন্দ,
হয় না নন্দের চিত্তে, নৃত্য-নিবারণ!
ইত্যাদি

ওঁ শ্রীবাসুদেবায় নমঃ।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

পূর্ণিমার চাঁদ

পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ সুবর্ণের দীপ,
জোছনার কেশর ছড়ায়,
নীলিমার তীরে তীরে তারকার দীপ
একে একে ম্লান হয়ে যায়।
কিরণ কেশর মালা নিস্তরঙ্গ নীলে,
কভু স্থির কভু কাঁপে আকাশ অনিলে!

বনের তোরণ শিরে সে আলো কেশর,
চন্দন প্রলেপ সম জাগে,
অন্ধকার কৃষ্ণসার রক্কুর আসর,
নিয়ে কে বিছায় অনুরাগে।
তারি'পরে জোনাকীর চলে লাস্য লীলা,
তারি তালে দোলে ধীরে বনরাজি নীলা॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

তারাবাস

সহজিয়া মত

সহজিয়া মত তান্ত্রিক মতেরই এক শাখা মাত্র। হিন্দু শাস্ত্র হইতে তন্ত্রের উদ্ভব, এবং হিন্দুদিগের এক সম্প্রদায়ের মধ্যেই তন্ত্রের আলোচনা আবদ্ধ ছিল। এই সম্প্রদায় শক্তির উপাসনা করিতেন, এবং তান্ত্রিক নামে পরিচিত ছিলেন। হিন্দু বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে তান্ত্রিক ভাব ক্রমে প্রবেশলাভ করে। উক্ত বৈষ্ণবদিগের নিকট রাধাই বিষ্ণুশক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। পরবর্ত্তী তান্ত্রিক গ্রন্থেও শাক্ত এবং বৈষ্ণব, এই দ্বিবিধ ভাবেরই উপাসনা প্রণালী কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বৈষ্ণব তন্ত্রের উল্লেখ আছে। শিব এবং শিব-শক্তির, বিষ্ণু এবং বিষ্ণু-শক্তির, মিলন রসাত্মক। পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। তিনি রসস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ।" তাঁহার আনন্দভাব সৃষ্টিতে প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার এবং তাঁহার প্রকৃতির সংযোগ বা সহযোগেই সৃষ্টি। এই প্রকৃতিই শক্তি, তিনি রসস্বরূপা। এই রসময়ীর বা আনন্দময়ীর উপাসনাই তান্ত্রিক উপাসনা। শাক্ত এবং বৈষ্ণব উভয়েই স্ব স্ব প্রণালীতে এই শক্তির উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান প্রকৃতিরই নামান্তর। প্রকৃতিই প্রধান এবং প্রধান বা প্রধানাই রাধা।

বুদ্ধদেব হিন্দুসন্তান। তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা হিন্দু ধর্ম্মেরই এক শাখা। তাঁহার ধর্ম্মের সহিত সাংখ্য এবং বেদান্ত শাস্ত্রের অতি নিকট সম্বন্ধ। তিনি নির্ব্বাণ সাধনা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়া কিরূপে নির্ব্বাণ বা মোক্ষ লাভ করা যাইতে পারে তাহারই পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। নির্ব্বাণ (annihilation) শূন্যে মিশাইয়া যাওয়া নহে। ইহাই মুক্তি, মোক্ষ, কৈবল্য। নির্ব্বাণ শব্দটী ভগবদ্গীতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। (গীতা ২।৭২ ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ব্রহ্মণি লয়ম্ শ্রীধর স্বামীর টীকা ; ৫।২৪-২৬ "ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ মোক্ষম্" ; ৬।১৫)। বুদ্ধদেব যে গীতার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু এখানে সে বিষয় আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তিনি যাগযজ্ঞের পশুবলির বিরোধী ছিলেন, এবং পূজা হোম প্রভৃতি যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ নহে, তাহাই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি কঠোর জ্ঞানপন্থী ছিলেন—ভক্তি এবং প্রেমকে উচ্চাসন দিয়া যান নাই। তাহার মতে জীবের প্রতি দয়া বা প্রেম চরিত্রের উন্নতিসাধক—ভক্তি, প্রেমকে সাধনার প্রধান অঙ্গ বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন নাই। যাহা আমাদিগের "পরম পদ", তাহা ভাবাভাবের অতীত, তাহা তাহার বুদ্ধত্ব, বাক্যের অতীত বলিয়া এক প্রকার শূন্য। এই শূন্যের অর্থ nihil নহে। এই শূন্যই পরে ধর্ম্মপদবাচ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি কেবল জ্ঞানযোগসাপেক্ষ, ইহাই তাঁহার মুখ্য উপদেশ। সর্ব্ব সাধারণের নিকট জ্ঞানপন্থা বড়ই আয়াসসাধ্য-"অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে" (গীতা ১২।৫)—সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পর হইতেই তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করা অনেকের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিল। ক্রমে মূর্ত্তিপূজা আসিয়া পড়িল—তাঁহার মূর্ত্তি এবং সিদ্ধদিগের মূর্ত্তি উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল। বৌদ্ধদিগের এক দল, হিন্দু-তান্ত্রিকতার অনুরাগী হইয়া উঠিল। বৈদিক যাগযজ্ঞ-বিরোধী বুদ্ধদেব হিন্দুর নিকটও দশ অবতারের এক অবতার হইয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বের বিদ্বেষভাব অপগত হওয়ায় হিন্দু আপনার লোককে আপনার করিয়া লইলেন। ইহার পর হইতে হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলিতে লাগিল।

বুদ্ধদেবের উপদেশ যাঁহারা মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাহারা ঐ উপদেশগুলির মধ্যে কোথাও তান্ত্রিকতার, তান্ত্রিক সাধনের মূল অনুসন্ধান করিয়া পাইবেন না। সুতরাং বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম হইতে যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা বিচারসহ নহে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা যে হিন্দু তান্ত্রিকতার এক শাখামাত্র, আমাদের বিবেচনায় তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এ বিষয়ে এস্থলে সবিস্তারে আলোচনা করার আবশ্যকতা নাই। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা হইতে হিন্দু তান্ত্রিকতার উৎপত্তি, ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের উক্তি। আমাদিগের

মধ্যে অনেকেই অবনত মস্তকে এবং বিনা বিচারে এই মত বহুদিন গ্রহণ পোষণ এবং প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়, ইহাই সংক্ষেপে প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য। সুখের বিষয় যে সম্প্রতি সুর ফিরিয়াছে এবং কেহ কেহ পাশ্চাত্য মতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া এম-এ, ডি-লিট বিবেচনা করেন যে নাথ সৃষ্টি কাহিনীর মূল বৈদিক সাহিত্য বা বেদান্ত। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ প্রভৃতির মতে তন্ত্রে এবং অদ্বৈতবাদে কোন পার্থক্য নাই। এতদ্দেশীয় আর একজন পণ্ডিতও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে হিন্দুতন্ত্র বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার ভিত্তি।

হিন্দু এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় এরূপ মিশামিশি হইয়া গিয়াছে যে কতটা বৌদ্ধ হইতে হিন্দু গ্রহণ করিয়াছে, এবং কতটা হিন্দু হইতে বৌদ্ধ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সকল সময়ে এবং সকল ক্ষেত্রে নিরূপণ করা কঠিন দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু তান্ত্রিকতার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া বৌদ্ধগণ তাহাদের মতের উপযোগী করিয়া, এবং তাহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া, নূতন আকারে গড়িয়া তুলিয়াছে। হিন্দু শিবের স্থানে বৌদ্ধগণ বুদ্ধ, ধর্ম্মকে বসাইয়াছে। এই ধর্ম্মঠাকুরকে হিন্দুরা পরে পুনরায় শিবঠাকুর করিয়া তুলিয়াছেন। হিন্দুর সরস্বতীই বাগীশ্বরী। বৌদ্ধগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন—বাগীশ্বরী বাইশরী, বাশুলি হইয়া গিয়াছেন। সরস্বতী পূজায় কোন স্থানে বলিদান হইয়া থাকে—অন্যত্র হয় না। বাগীশ্বরী চণ্ডীর ও (২) মূর্ত্তি বিশেষ হইয়া গিয়াছেন। হিন্দুর গণেশ, হিন্দুর লোক-পালগণ প্রভৃতি বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রবেশলাভ করিয়াছে। হিন্দু তান্ত্রিকতায় কখনও তাঁহাদিগের প্রাচীন মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়—কখনও বৌদ্ধ ছাঁচও দৃষ্ট হয়। বুদ্ধ হেবজ্র হিন্দু তান্ত্রিকতায় স্থান পাইয়াছে। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সহজিয়া ধর্ম্ম তান্ত্রিকতারই প্রকার ভেদ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহা শিব ও শক্তির, পুরুষ ও প্রকৃতির সহযোগ জনিত, অর্থাৎ রতিক্রিয়া জনিত যে আনন্দ, ঐ আনন্দ উপভোগ। ইহাই সহ+জ=সহজ। ইহাকে যুগনদ্ধ বা যুগলরূপেরও উপাসনা বলা হইয়া থাকে। বৌদ্ধের নিকট তাহা বুদ্ধ ও তৎশক্তির মিলন বা রতিজনিত আনন্দ। যে রসের বিকাশ সৃষ্টিতে, মনুষ্য দেহেও তাহার আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিন্দুরা বলিতেন যে আমাদের দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড—যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। অতএব আমাদের দেহেই ঐ রসের বা আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যাইতে পারে—অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। বৌদ্ধেরা সেই তত্ত্বই গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য সহজ তত্ত্ব ভাণ্ডতত্ত্ব নামেও অভিহিত হইয়াছে। "নরদেহ বিনু নহে রসের আস্বাদন"—দীপকোজ্জ্বল। সৃষ্টিতে যে শক্তির বিকাশ মনুষ্য দেহেও সেই শক্তির বিকাশ। আমরা যোগবলে দেহের মধ্যে অবস্থিত শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারিলে অনেক ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি, এবং অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি। কিন্তু তাহাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নহে। শক্তিগুলির সাহায্যে যাহাতে চৈতন্যরূপ আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার, এবং অখণ্ড চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া অখণ্ড আনন্দে আত্মোৎসর্গ করিতে পারা যায়, তাহাই শৈব, শাক্ত, সহজিয়া এবং বৈষ্ণব সকলেরই উদ্দেশ্য। দেহচক্রের কোন্ কোন্ চক্রে কি কি শক্তি রহিয়াছে, তাহাই তন্ত্রগ্রন্থাদিতে বর্ণিত আছে। এই শক্তিগুলিরই নাম ডাকিনী, রাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি। শক্তির প্রবাহ নাড়ী দিয়া হয়। কোন্ কোন্ নাড়ী দিয়া কি কি শক্তির কি ভাবে সঞ্চার হয়, তাহার তন্ত্র গ্রন্থাদিতে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। হিন্দুর গ্রন্থে আলি-কালি প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে, প্রাচীন সহজিয়া গ্রন্থেও তাহাদের বর্ণনা রহিয়াছে, নব্য সহজিয়া গ্রন্থেও তাহাদের উল্লেখ রহিয়াছে। দেহতত্ত্ব এক শাস্ত্রে এক প্রকার, অন্য শাস্ত্রে অন্য প্রকার, হইতে পারে না। চণ্ডী শক্তিরূপিণী, তাঁহারও এক নাম ডাকিনী। প্রধানা বা প্রকৃতিই শক্তি ;

১ ডাকার্ণবের বারাহী এবং হেরুক এবং হরগৌরীর মধ্যে সামান্য প্রভেদ। বর্ণনার মধ্যে স্পষ্টই "হরগৌরী সমাক্রান্ত" উক্ত হইয়াছে। (সাঃ পঃ পঃ, ১৩৩৩, ১সংখ্যা, ৩৯ পৃ)

২ চণ্ডী যখন "বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা" তখন তিনি সরস্বতী।
—সাঃ পঃ পঃ, ১৩৩৩, ৩ সং, ৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতিই নারী। পুরুষ নর, পুং। নারী বা প্রকৃতির ভিতর দিয়াই শক্তির এবং আনন্দের বিকাশ। এই জন্যই কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় তন্ত্রেই "যোষিৎ হইতে যে আনন্দ সেই আনন্দই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সে-ই আনন্দই আসল আনন্দ" বলা হইয়াছে (নারায়ণ, সন ১৩২২, ১৭৮ পৃঃ মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ)। প্রকৃতি আনন্দময়ী, নারীও আনন্দ বা রসস্বরূপা। প্রাচীন এবং নব্য সহজিয়া গ্রন্থে এই রস বা আনন্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইবে। হিন্দুর শিবই, বৈষ্ণবের বিষ্ণু বা কৃষ্ণ। হিন্দুর শিব-শক্তি গৌরী, দুর্গা বা চণ্ডীই, বৈষ্ণবের রাধা। যে নারী সাধনা বলে আপনাকে শক্তির সহিত মিলিত করিয়া সেই পরম আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিতেন, যিনি শক্তিই হইয়া যাইতেন—"ব্রহ্মৈব ভবতি" এই অবস্থা লাভ করিতে পারিতেন, তিনিই সিদ্ধা, ডাকিনী হইতেন। শাক্তদিগের যিনি ভৈরবী, সহজিয়া দিগের তিনিই প্রকৃতি। যাঁহারা একটুকু নিম্নস্তরে থাকিতেন, তাঁহারাই বোধ হয় যোগিনী নামে অভিহিত হইতেন—শ্রীযুক্ত বাবু রমেশ বসুর এই উক্তি আমাদের নিকট অনেকটা সত্য বলিয়া বোধ হয়। (সা, প, প, ১৩৩৩, ১ সং, ৪০) কিন্তু কোন কোন যোগিনী সময়ে সময়ে উচ্চ স্তরে আরোহণ করার আভাসও প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় "হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ" প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"বৌদ্ধেরা—আমরা সেই সেই মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছি, এই বিভাবনা বা ধ্যান করিয়া পূজা করেন, আমরা তাহা করি না। (সাঃ পঃ পঃ ১৩৩১, ২সং ৪৬ পৃঃ) আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের এই কথা, স্বীকার করিতে পারি না। 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' আমাদেরই কথা, গীতায় বহু স্থানে তাহার উল্লেখ আছে। "স্বরূপ প্রতিষ্ঠা" না হইলে বৈকল্য হয় কিরূপে? স্বরূপ প্রতিষ্ঠার অর্থই—"তাহাই হইয়া যাওয়া"। আত্ম-বলিদানই রাসলীলা। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই যে রাসলীলা আছে, তাহা নহে। কৌলদিগের মধ্যেও রাসপ্রসঙ্গ রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু এ স্থলে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

ডাকিনী, যোগিনী, ভৈরবী আপনাদিগকে 'শক্তি' বা 'প্রকৃতি'তে পরিণত করিতে পারিতেন, এই জন্য সাধকেরা তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কখনও তাঁহারা সাধকের 'গৃহিণী' হইয়াছেন, কখনও তাহাদের 'সঙ্গিনী' হইয়াছেন। যিনি 'শক্তি' হইতে পারেন, তিনিই অপর ব্যক্তিতে শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। যিনি প্রকৃত প্রেম বা আনন্দের স্বাদ পাইয়াছেন, তিনিই অপর ব্যক্তিকে তাহার স্বরূপ বুঝাইতে পারেন। গোপিনীই প্রেমের গুরু হইতে পারেন। বৈষ্ণবের নিকট এইরূপই রাধা প্রকৃতি। চৈতন্যদেবের মধ্যে যে গোপীভাব আসিত, তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? গোপী না হইলে রাস-রসিকের সহিত সাক্ষাৎ-কার বা মিলন কিরূপে হইবে? রাসলীলাকে অনেকে রূপক ভাবিয়া থাকেন, কারণ তাঁহাদের আশঙ্কা যে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নির্ম্মল চরিত্রে অন্যথা দোষ স্পর্শিবে। ইহাই সাধনার দুর্ব্বলতার পরিচয়। রাসলীলা প্রকৃত ঘটনা, শুদ্ধ প্রকৃত ঘটনা নহে—নিত্য ব্যাপার। যাঁহারা প্রকৃত সাধক হইতে পারিবেন, তাঁহারা এই নিত্য লীলা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবেন। নিজের শক্তিতে সাধনার এই উচ্চ স্তরে উঠিতে না পারিলে, পুরুষই হউক আর নারীই হউক, তাহার আশ্রয় লইতেই হইবে। যাঁহারা সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিতে না পারিবেন, তাঁহারাই বলিবেন "শ্রীকৃষ্ণের বেলাই লীলা-খেলা, আমাদের বেলাই সব দোষ।" শ্রীকৃষ্ণ কি, প্রকৃত সাধক এবং ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি কি, যাঁহাদের জ্ঞান নাই, তাঁহারা তাহাদিগের সমকক্ষ হইতে চাহেন। মনুষ্যের অহঙ্কারের, হঠকারিতার কি সীমা আছে? রামী রজকিনী কাহারও নিকট রজকিনী, কাহারও নিকট আদর্শ রমণী। সহজিয়া গ্রন্থে তাঁহাকে রাগময়ী, রাধিকার অন্তরঙ্গা বলা হইয়াছে। এই রজকিনীর সংসর্গেই চণ্ডীদাস কি মধুর রসেই বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। প্রাচীন সহজিয়া গ্রন্থেই আছে—"জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।" যোগীর প্রাণের কি তীব্র উচ্ছ্বাস, বুঝিয়া দেখুন। সহজিয়া ধর্ম্ম এবং হিন্দু তান্ত্রিকতাকে অনেকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এই জন্য এত কথা বলিতে হইল। দেখিতে জানিলে, প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিলে এ গুলিতেও যে কত উচ্চ ভাব আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে এই পথও দুর্গম, এবং বাধা-বিঘ্ন সঙ্কুল। এই জন্য পূর্ব্বেও অনেকের পদস্খলন হইয়াছিল, এই জন্যই অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তাঁহাদের নিন্দা পাওয়া যায়।

ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন—অভিচারাদি কর্ম্মেও তাঁহাদের নৈপুণ্য ছিল, কিন্তু যাঁহারা উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সকল কর্ম্মে লিপ্তা ছিলেন না। সকলেই জানেন যে নিম্ন দরের সাধকেরাই "ঐশ্বর্য্য" দেখাইয়া থাকে। এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে যোগ-ভ্রষ্ট হইতে হয়। মনুস্মৃতিতে আভিচারকের নিন্দা আছে। অথর্ব বেদের সময় হইতে অভিচারাদি অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। মনু স্মৃতিতে আভিচারিকদের উল্লেখ আছে, কৌটিল্যের সময়ও তাহারা বিদ্যমান ছিল, হর্ষচরিতেও তাহাদের অস্তিত্বের সংবাদ পাওয় যায়। রাজতরঙ্গিণী, মালতী-মাধব প্রভৃতি গ্রন্থেও তাহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং তান্ত্রিক অনুষ্ঠান যে অথর্ব্ববেদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। গ্রীস, রোম, ইজিপ্ট প্রভৃতি স্থানেও তান্ত্রিক সাধনা প্রচলিত ছিল। সেখানেও মন্ত্র, কবচ, মাদুলী প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। ঝাড়, ফুঁক, ওঝা (wizard), ওঝাইন (witch), বা ডাকিনী প্রভৃতি ছিল। গ্রীক Sibylএর কথা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং তন্ত্র যে অতি প্রাচীন, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। *

ডাকিনী যোগিনীদিগের মধ্যে অনেকে দেবতার সেবিকা হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহারাই "দেয়াসিনী" নামে পরিচিত ছিলেন। ইহা হইতে দেবদাসী প্রথার উদ্ভব হয়। অনেকে তাহাদের কন্যাগণকে দেব সেবার জন্য উৎসর্গ করিত, এবং এখনও করিয়া থাকে, এবং ইহা পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। দেবদাসীগণ দেবতার সম্মুখে তাঁহার প্রীতির জন্য নৃত্য-গীত করিত এবং করে। অনেকেই এক্ষণে বেশ্যাবৃত্তি করে—প্রাচীন কালে সকলেই যে তাহা করিত বোধ হয় না।

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশ বসু রাধাকৃষ্ণ সাহিত্যে মনুষ্যোচিত সুখ-দুঃখ, মান অভিমান, অভিসার-লীলা আনিয়া ফেলা একটি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বলিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্য হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপিনীর পতি এবং একান্ত আপনার হইলেন, তখন তাঁহার বিচ্ছেদে মান, অভিমান, সুখ দুঃখ প্রভৃতি আসিবেই। নায়িকার সমস্ত ভাবই তাহাতে আসিবে। যিনি গোপী-ভাবে ভজনা করিবেন, তিনি এই সকল ভাবে বিভোর হইবেনই। সাধকের নিকট সাধনার ধন যখন নিতান্ত আপনার হইয়া যায়, তখন এই সকল মনুষ্যোচিত ব্যাপার ঘটিয়াই থাকে। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদও কখনও মার প্রতি রোষের ভাব, কখনও অভিমানের ভাব, তাঁহার মধুর গীতে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। সরল প্রাণের সরল উচ্ছ্বাস বলিয়াই তাঁহার গীত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের প্রাণ কাড়িয়া লয়। আমাদিগের প্রাচীন সাহিত্যেও অনেক সময়ে দেবতার সম্বন্ধে ঈদৃশ ভাবের ব্যঞ্জনা দৃষ্ট হয়। "চণ্ডীমঙ্গল", "শীতলা মঙ্গল" প্রভৃতি এখন আমাদের নিকট সাহিত্য-মন্দিরে প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এক সময়ে এই গুলি সমগ্র বঙ্গ দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। তখন দেবতা হিন্দুর আপনার প্রাণের ধন ছিল—তখন আমরা সুখ দুঃখ সকলই তাঁহাকে জানাইয়াছি, তাঁহার প্রসাদলব্ধ সামগ্রী তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি, দুঃখে তাঁহার নিকট বেদনা জানাইয়াছি, শান্তি লাভ করিয়া "সুখে দুখের পসরা" বহিয়াছি। তখন এদেশে প্রাণ ছিল, প্রাণের সাড়াও ছিল। উড়িষ্যায় দাঁতন কাঠি, অভ্যঞ্জন, স্নান, অঙ্গরাগ, ভোগ, শয্যাদান সকলই আছে। আমাদের দেশেও ঈদৃশ অনেক ব্যাপার আছে। শীতকালে শীতবস্ত্র পর্য্যন্ত প্রদান আছে। এই সকল দেখিয়া নবীন নবীনারা উপহাস করেন। তাঁহারা এই সকল ব্যাপারে অনভ্যস্ত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন যুগের নিদর্শন মনে করেন, বর্ব্বরতার গন্ধ পান। তাঁহারা বুঝেন না যে ভক্তি ও প্রেমের রাজ্য স্বতন্ত্র, সেখানে Anatomy, Physiology নাই। এখন সকলে "অনন্তের দিকে" ছুটিতেছেন, অথচ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন অনন্তের জ্ঞান হইতেই পারে না। যাহা হউক, বৌদ্ধ সাহিত্যে যে এ ভাব ফুটিয়া উঠে নাই, তাহার কারণ আমাদের বোধ হয়—১ম তাঁহারা প্রাণের ভাব সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিতে চাহিতেন না, ২য়, তাঁহারা একটুকু দার্শনিক ছিলেন। হিন্দু শাক্ত এবং বৈষ্ণবেও কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। শাক্তগণ শক্তিকে মাতৃরূপেই দেখিতেন · প্রেম অপেক্ষা ভক্তির ভাবই তাঁহাদিগের মধ্যে বেশী ছিল—প্রেম

* ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার, মন্ত্রপ্রয়োগ ঋগ্বেদেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অপেক্ষা ভক্তিতে কবিত্বের স্ফূর্ত্তির মাত্রা অল্পই হইয়া থাকে। শৈবদিগের মধ্যে পাশুপত ভাবই অধিক, সেখানে রসের প্রসার এবং অভিব্যক্তি আরও অল্প। মায়াবাদ কিরূপে এই সকল ধর্ম্মে আসিয়া মিশিয়াছে, তাহার নিম্নলিখিত কারণ আমরা নির্দ্দেশ করি। মায়াবাদের সহিতই অদ্বৈতবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সমস্ত 'ব্যক্ত' জগৎকে নঙ্ বা শূন্য না করিলে অদ্বৈত ফুটিয়া উঠিবে কিরূপে? জগৎ নঙ্ অর্থে জগতের মূলে যে সত্তা আছে, তাহা উড়াইয়া দেওয়া নহে—'ব্যক্ত' রূপটাই উড়াইয়া দেওয়া। দ্বৈত, অদ্বৈত দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব। খাঁটি অদ্বৈতে দ্বৈতের স্থান নাই। বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণকে "ইদং সর্ব্বং" করিলে "ইদং সর্ব্বং" উড়িয়া গিয়া তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" থাকেন—সকলই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে লীন হইয়া যায়। পরা প্রেমে সব একে পরিণত হইয়া যায়—রাধা রাধা থাকেন না—শ্রীকৃষ্ণ হইয়া যান। কোকিল, মস্তকের কেশ, নয়নের তারা সকলই কালো-রূপে মিশিয়া যায়—সকলই কৃষ্ণময় বা কৃষ্ণ হইয়া যায়। রাধা, শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, কিছু হাতে রাখেন না। হাতে রাখিলে শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড বা পূর্ণ হইতে পারেন না। পরা প্রেম বা প্রকৃত প্রেমের পূর্ণ মন্ত্রই আত্মোৎসর্গ। শাক্ত তন্ত্রশাস্ত্রেও সেই অদ্বৈত তত্ত্ব রহিয়াছে—শাক্তেরও উদ্দেশ্য ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মোক্ষ। শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির প্রতিবাদ আমরা কেন করিয়াছি, তাহা অতঃপর সকলেই বুঝিতে পারেন। যিনি বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই বৌদ্ধের শূন্য বা বুদ্ধ। শূন্যই পরম তত্ত্ব—খাঁটি—'অভাব' বা 'নঙ্' নহে।

আমরা সহজিয়া ধর্ম্মের স্থূল কথাগুলি মাত্র বলিলাম। বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে গেলে বিবিধ রসের বিশ্লেষণ করিতে হয়, যোগশাস্ত্রের, বিশেষতঃ ষট্‌চক্র তত্ত্বের, বিবরণ দিতে হয়। রতিতত্ত্বের গূঢ় তান্ত্রিক ভাব ব্যাখ্যাও করিতে হয়। একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের আলোচনা সম্ভবপর নহে, এবং তাহা অনেকেরই বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। রতিতত্ত্ব আলোচনা অনেকে অশ্লীল বলিয়াও ভাবিতে পারেন। সুতরাং আমরা তাহা পরিবর্জ্জন করিয়া এক্ষণে বঙ্গদেশের সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালীর দিগ্বিজয় যাত্রা

[stamp]

"নাসীর-ধূলী-ধবল-দশদিশাং প্রাগপশ্যন্নিয়ত্তাং
ধত্তে মান্ধাতৃসৈন্য-ব্যতিকর চকিতোধ্যান
তন্দ্রীম্মহেন্দ্রঃ।
তাসামপ্যাহবেচ্ছা-পুলকিত বপুষাম্বাহিনীনাম্বিধাতুং
সাহায্যং যস্য বাহ্বো নিখিল-রিপুকুলধ্বংসিনো-
নবিকাশঃ॥
ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদু যবনাবন্তি-
গান্ধার কীরৈ-
ভূপৈর্ব্যালোল-মৌলি প্রণতি পরিণতৈঃ
সাধু-সঙ্গীর্য্যমাণঃ॥"
—খালিমপুর লিপি—

পুনর্ভবার তীরে
বঙ্গবীরের ডঙ্কা বাজিল
গুরু গুরু গম্ভীরে।
সাজিল অশ্ব সাজিল হস্তী
সাজিল সমর-তরী।
বর্ম্মে চর্ম্মে সাজিয়া দাঁড়ালো
নাসীর ভল্ল ধরি।
ঝিকি মিকি করে তপনের করে
কিরীট তাদের শিরে,
পুনর্ভবার তীরে।

পুনর্ভবার তীরে
শত বরণের পতাকা উড়িল
দেবমন্দির-শিরে।
শঙ্খ বাজিল, ভেরী নিনাদিল
গরজে বঙ্গবীর—
কে যাইবি আয় করিবারে জয়
গঙ্গা-ধৌত তীর।
হিমালয় যদি পথ আগুলায়,
হেলায় হইব পার।
জিনিয়া আনিব কাঞ্চন মণি
জয় গৌরব ভার।
মিথিলা হইতে গান্ধার জিনি
ফিরিব উচ্চ শিরে
পুনর্ভবার তীরে।

৩

পুনর্ভবার তীরে
বীর্য্যের আজি মহা উৎসব
কোলাকুলি করে বীরে।
কম্পিত হ'লো আর্য্যাবর্ত্ত
কাঁপিয়া উঠিল কীর।
যদু ও যবন, মৎস্য, মদ্র
কাঁপিল সাগর তীর।
ঘনাঘন-যূথ ধাইল যখন
মনে হ'লো চলে গিরি,
অশ্ব-সেনার চরণের ধুলি
রহিল আকাশ ঘিরি।
বিজয়ী বঙ্গবাহিনী ধাইল
জয়গান সবে করে
পুনর্ভবার তীরে। *

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

* নাসীর—ধর্ম্মপাল দেবের অগ্রগামী পদাতিক সৈন্য।
কীর—বর্ত্তমান জ্বালামুখী।
যদু ও মদ্র—বর্ত্তমান পাঞ্জাব প্রদেশ।
যবন—সিন্ধুনদের তীরস্থ প্রদেশ।
মৎস্য—বর্ত্তমান রাজপুতানার অংশ বিশেষ।
ঘনাঘন-যূথ—ঘনাঘন নামক যাতুক রণ হস্তীর দল।

ফাঁসের দড়ি

(গল্প)

কুসুমপুর হাই স্কুলে মাষ্টারী করিবার সময় গ্রামের বাহিরে একটা পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকায় বাস করিতাম। গ্রামের জমিদার মহাশয় ঐ বাড়িটা আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে বাসের সময় আমার জীবনে যে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল নিম্নে সেইটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহ। অত্যন্ত গুমোট করিয়াছে। ঘরের ভিতর টেকা যায় না, সমস্ত রাত্রি ছাদে পড়িয়া ছটফট করিতে হয়। সকাল সকাল আহার সারিয়া ছাদে শুইয়া এক মনে রহস্যপূর্ণ নভেল পড়িতেছিলাম। পড়িতে পড়িতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম মনে নাই—অকস্মাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি চোখের সামনে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী নত-বদনে দাঁড়াইয়া আছে।

স্বপ্ন দেখিতেছি না তো? ভাল করিয়া চোখ রগড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দেখিলাম—নাঃ, স্বপ্ন নহে সত্যই চোখের সামনে এক অপূর্ব্ব-শোভনা পরমাসুন্দরী নারীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

বিস্মিত-নেত্রে তার পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে আপনি?"

অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে সে কহিল, "আমি—আমি একদিন এই বাড়ির ছোট বউ ছিলাম—কিন্তু সে সব কথা আজ স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে—"

তখন সাহস পাইয়া আমি কহিলাম, "একদিন এই

বাড়ির তুমি ছোট বউ ছিলে, তা হলে এখন তুমি কি ?"

আমার কথা শুনিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—এমন মধুর মন-ভুলানো হাসি তো কখনো দেখি নাই ! অবাক হইয়া জিজ্ঞাসু-নেত্রে তার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। আমাকে নিষ্পলক-নেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সে কহিল, "এখন আমি কি ? তা কি তুমি এখনো বোঝনি ? আর বুঝেও কায নেই—আমি আমার সেই গলার দড়িটা খুঁজতে এসেচি-

তার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, "তোমার গলার দড়ি ? এখানে কোথায় ?"

সে তখন আঙুল দিয়া সামনের কুঠারীটা দেখাইয়া কহিল, "ঐ ঘরের ছাদের কড়িতে দড়ি লাগিয়ে আমি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলাম।" তারপর নিজের গলায় হাত দিয়া একটা নীলবর্ণের স্থূল রেখা দেখাইয়া কহিল, "এই দেখ, সে ফাঁসের দাগ এখনো মিলায় নি।"

এইবার বিরক্ত হইয়া আমি কহিলাম, "যাও, তুমি তোমার দড়ি খোঁজ গে—আমাকে এখন ঘুমতে দাও।"

ঈষৎ হাসিয়া কুন্দদন্তে অধর চাপিয়া সে কহিল, "আমার মুখের পানে চেয়ে সত্যিই যে তোমার চোখের পাতা বুজে আসচে—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। পুরুষজাতকে জানতে তো আমার বাকী নেই ! তারা মনে যা ভাবে মুখে তা বলে না—"

আমি কহিলাম, "আমাকে তুমি যে সে পুরুষ মনে কো না। তুমি খুব সুন্দরী তা স্বীকার করি, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য আমার মনে বিন্দুমাত্র মোহ উৎপাদন করতে পারে না।"

ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সে কহিল, "বল কি ? তুমি যে অবাক করলে ! পরকীয়া প্রেম নইলে আজ-কাল তোমাদের যে দিন চলাই ভার হয়েছে—"

বাধা দিয়া আমি কহিলাম, "তাই বলে দেশে পত্নীবৎসল স্বামী এবং পতিব্রতা স্ত্রীর যে একান্ত অভাব হয়েছে তাও মনে কোরো না। এমন পুরুষও আছে যারা পরস্ত্রীর পানে উচু নজরে যে কেউ তাকাতে পারে—এ কথা ভাবতেই পারে না—এবং"

সে কহিল, "আর তোমার 'এবং'এ কায নেই। পুরুষ জাত যে কেমন ধূর্ত্ত সে সম্বন্ধে বলি শোন—

সে আমারই ঐ গলার দড়ির সকর আমার স্বামী অসম্ভব সন্দিগ্ধ স্বভাবের লে আমাকে তিনি ভালবাসতেন খুবই—কিন্তু সন্দেহ না করেও থাকতে পারতেন না। সন্দিগ্ধ স্ব তাঁর একটা ব্যাধির মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি আড়াল থেকে প্রায়ই আমার চলা-ফেরা লক্ষ্য করতেন, পাছে কখন কি ক'রে বসি এই চিন্তায় তাঁর ক্ষুধা-ত লোপ পাবার উপক্রম করেছিল। এক এক সময় এই ক্ষুদ্রতায় বিষম রাগ হতো—কিন্তু সংশোধনের উপায় নেই ভেবে মনের রাগ মনেই চেপে থাকতাম। সেও খুব কষ্টকর।

মন ভরে উঠলো।
পা দিয়ে মাড়িয়ে
নালা গলিয়ে
ন একটা
লকা

এইখানে একটু পূর্ব্ব কথা বলার প্রয়োজন। আমার দাদার বন্ধু অপূর্ব্ববাবু যখন দাদার সঙ্গে কলেজে পড়তেন তখন মাঝে মাঝে আমার পিত্রালয়ে এসে দশ বারো দিন করে থাকতেন। আমি তাঁকে অপূদা বলে ডাকতাম—তিনি আমাকে রাধে বলে ডাকতেন। আমার নাম রাধারাণী।

আমার প্রতি তাঁর যথার্থ মনের ভাব কি ছিল সে কথা আমি বলতে পারবো না—কিন্তু সে সময় তিনি যে আমাকে খুবই স্নেহ করতেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আমার প্রতি তাঁর মনের ভাব যাই থাক—কিন্তু তিনি যে হীন কাপুরুষ ছিলেন না, তার প্রমাণ আমি অনেক পেয়েছিলাম। এক একদিন একলা তাঁর কাছে বসে আমার বুক দুরু দুরু করে উঠতো, ভয় হতো হয়তো তিনি কিছু বলে বসবেন। কিন্তু তিনি কিছুই বলতেন না—নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন। আমার প্রথম যৌবনে এই ব্রাহ্মণ যুবক যথার্থই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে-ছিলেন। জাতে আমরা কায়স্থ ছিলাম—আর তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ।

বিয়ের সময় অপূদা একছড়া সোণার হার এবং তাঁর এক খানি ফটো আমায় উপহার দিয়েছিলেন। সেই ফটোর নীচে স্বহস্তে লিখে দিয়েছিলেন—

"অপূর্ব্ব স্নেহের নিদর্শন—"

সেই ফটোখানি আমি বাক্সের তলায় লুকিয়ে রেখে

পরও দাদার সঙ্গে অপূদা দু'একবার বাড়ী এসেছিলেন। কিন্তু আমার স্বামী শ লোক ছিলেন না ব'লে তাঁদের একেবারেই না। এ কারণ বিয়ের পর তাঁদের সঙ্গে ক্ষাৎ আমার খুব কমই হতো। দাদার সঙ্গে র্ণা জড়িত ছিলেন ব'লে স্বামীর কাছে তাঁদের সম্বন্ধে কোন রকম ঔৎসুক্য দেখাতে পারতাম না। কেবলই ভয় হতো পাছে কিছু অন্যায় ভেবে বসেন। অপূদার প্রদত্ত সেই 'ফটো' ও স্বর্ণহারের গোপন তথ্যও স্বামীর কাছে একেবারে লুকিয়ে রেখেছিলাম। এবং বিয়ের পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে যে সামান্য একটু খানি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—এ কথাটাও একেবারে চেপে ছিলাম। অপূদার কথাটা কেন যে স্বামীর কাছে সম্পূর্ণ ভাবে খুলে বলি নি—সে কথা আমি নিজেই ভাল বুঝতে পারিনে। পরে বুঝেছিলাম—বল্লেই ভাল হতো। বোধ করি স্বামীর সন্দিগ্ধ স্বভাবটাই আমার মুখ চেপে ধরতো। তিনি এ ব্যাপারটার কদর্থ ছাড়া আর কিছুই করবেন না—কেবলই এই ভয় হতো।

অনেক মাসিক পত্রে অপূদা কবিতা লিখতেন। তাঁর কবিতা লেখায় বেশ হাত ছিল। যে সব কাগজে তাঁর কবিতা প্রকাশ হতো তার এক এক সংখ্যা স্বামীর নামে পাঠিয়ে দিতেন। কবিতাগুলি পড়ে মনে হতো এ সব কবিতা তিনি যেন আমাকে উদ্দেশ করেই লিখেছেন।

আমার মনের ভেতরকার একটা বন্ধ জানালা হঠাৎ যেন খুলে গেল। আমার প্রতি তাঁর সেই স্নেহ কি এই ভাবেই রূপান্তরিত হয়েচে? তিনি কি এমন নীচ হবেন? সেই সরলহৃদয় উন্নতমনা ব্রাহ্মণ যুবকের মনের ভিতর কি এত বিষ সঞ্চিত ছিল? বিশ্বাস হতো না।

এক এক সময় মনে হতো একজন পরপুরুষ সম্বন্ধে এ ভাবে চিন্তা করা আমার অন্যায় হচ্ছে। তার পরেই ভাবতাম আমি তো কিছু অন্যায় চিন্তা করি না—তবে এতে দোষ কি? এই সব অনুকূল যুক্তি দিয়ে নিজের মনকে বারংবার প্রবোধ দেওয়া সত্ত্বেও সময় সময় মনটা কেমন গভীর বিষাদে ছেয়ে যেত—স্বামীর কাছে নিজেকে কেবলি অপরাধিনী ব'লে মনে হতো। আচ্ছা, তুমি বল তো এ অবস্থায় কি করা আমার উচিত ছিল?

একটু খানি চিন্তা করিয়া আমি বলিলাম, "সমস্যা খুব জটিল করে তুলেচ। নিজের মন নিয়ে এতটা পাক খাওয়া ঠিক নয়—"

সে বলিল, "ঠিক বলেছ! নিজের মন নিয়ে এতটা পাক খাওয়া ঠিক নয়। কেবলি মনে করতাম চুলোয় যাক তাঁর কথা ভাববো না। কিন্তু তাঁর কবিতাগুলি পড়ে মনে হতো—কাকে উদ্দেশ করে ঐ কবিতাগুলি লিখেছেন—সে নারী কে? আমি কি? ছি ছি, ভগিনী স্নেহ কি এই কবিতার প্রলাপে পর্য্যবসিত হয়েচে? তার পরেই মনে হতো এ সব কথা সত্যি নাও হতে পারে। হয় তো আমারি ভুল ধারণা। বল দেখি মনের এই অবস্থায় কি আমার কর্ত্তব্য ছিল?

আমি বলিলাম, "কেবল নিজের মন নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা ছাড়া তো কোনো অপরাধের কায কিছুই করনি! স্বামীকে সমস্ত খুলে ব'লে মনটাকে সাফ করে নেওয়াই সাধ্বী স্ত্রীর একমাত্র কর্ত্তব্য।"

সে কহিল, "হাঁ, তাই আমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু এই সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত স্বামীর ভয়েই তা পারি নি। একে মনসা তাতে ধুনোর গন্ধ! পাছে হিতে বিপরীত হয় এই আশঙ্কাটাই আমার সর্ব্বনাশ করেছিল—"

আমি বলিলাম, "সে কথা চুলোয় যাক! গল্পটার রসভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে—শেষাংশটুকু শেষ করে দাও, রাতও এ দিকে শেষ হয়ে আসচে—"

সে বলিল, "হাঁ, তারপর শোন। অকস্মাৎ একদিন প্রলয় কালের মেঘের মতো গম্ভীর মুখ করে স্বামী এসে বললেন, "ঐ অপূর্ব্বটার সঙ্গে তোমার কিসের সম্বন্ধ?"

স্বামীর রক্তবর্ণ মুখের পানে তাকিয়ে আমার বুক কেঁপে উঠলো—প্রাণপণ বলে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বল্লাম, "সম্বন্ধ আবার কি? তিনি আমার দাদার বন্ধু, তাই তাঁকেও আমি দাদা বলি। তোমার ছোট মন—তাই তুমি সবাইকে মন্দ ভাবো—"

আমার এই কথা শুনে স্বামী বললেন, "তার 'ফটো' তোমার কাছে আছে?"

আমার বুকে কে যেন গুলি মারলে—বহু কষ্টে আমতা আমতা করে বললেম, "হাঁ, আমার বিয়ের সময় তিনি আমায় তাঁর একখানা ফটো উপহার দিয়েছিলেন।

বোধ হয় সেটা বাক্সের তলায় পড়ে আছে—তাতে হয়েছে কি ?"

ফটোর কথা শুনে স্বামী যেন পাবক-শিখার মতো জ্বলে উঠলেন। বল্লেন, "হাঁ, ফটোও দিয়েচে—কবিতাও ছুড়ে মারে—তা এই নাও, প্রেমিকবর তোমায় একখানা চিঠি দিয়েচে, সেই ফটোখানি পাঠিয়ে দেবার জন্যে। কবিতার বই ছাপাবে—তার সঙ্গে নিজের ছবিখানিও ছেপে দেবে, গীতি-কাব্যখানি বোধ করি তোমাকেই উৎসর্গ করবে! তা বেশ, এ বেশ, মন্দ না—"

ব'লে আমার পায়ের গোড়ায় একখানা চিঠি ছুড়ে দিয়ে দ্রুতপদে বাইরে চলে গেলেন।

চিঠিখানা তুলে নিয়ে পড়লেম তাতে লেখা ছিলো—রাধে !-

তোমার অপূদাকে কি তুমি ভুলে গেছ ? ভোলবার জন্যে এত চেষ্টা করেও আমি তো ভুলতে পারলাম না। ভুল করে কায়স্থের ঘরে জন্ম নিয়েছিলে ? হাঁ ভুল বৈকি ? এ ব্যথার পূজার অবসান কবে হবে—কে জানে ?

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী।
অ্চল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।"

কবিতাগুলি একত্র সংগ্রহ ক'রে একখানি বই ছাপিয়ে আমার মানসীকে উৎসর্গ করবো। তোমার বিয়ের সময় যে ফটোটা তোমায় উপহার দিয়েছিলাম—দয়া করে সেটা একবার পাঠিয়ে দেবে ? সেইটেই দরকার। আশা করি কুশলে আছ।

তোমার—অপূদা।

এই চিঠি আমার স্বামীর হাতে পড়েছিল। যাকে দেবতা বলে জানতাম—সে যে কত বড় জানোয়ার তা ঈশ্বর যেন আমায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। হতভাগাটা কি একেবারেই জাহান্নমে গেছে ? না কবিতা লিখে লিখে মাথা খারাপ করে ফেলেচে ? এ উন্মাদ নয়তো কি ? এমনি চিঠি কি কাউকে লেখে ? তার প্রতি ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় আমার সমস্ত মন ভরে উঠলো। তখনি উঠে বাক্স খুলে তার ছবিখানা পা দিয়ে মাড়িয়ে পুড়িয়ে ফেললাম এবং স্বর্ণহার ছড়াটা জানালা গলিয়ে রাস্তার ও-ধারে ছুড়ে ফেলে দিলাম।

এই কাজ দু'টি করে প্রাণের মধ্যে যেন একটা অনাস্বাদিত আরাম অনুভব করলাম; বুকটা যেন হালকা বোধ হলো। অন্ধকার অন্তস্তল যেন মঙ্গল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো—যোড়হাত করে বিশ্বদেবতার উদ্দেশে নতি জানালাম।

এই সময় কে যেন আমার কাণে কাণে বললে, "স্বামীর কাছে একজন পরপুরুষের দুষ্ট বুদ্ধির কথা গোপন করায় যে পাপ তোকে স্পর্শ করেছিল, তা এই অনুশোচনার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এখন স্বামীর কাছে মার্জ্জনা চাইলেই সব চুকে যাবে।"

হাঁ, স্বামীকে সমস্ত খুলে ব'লে ক্ষমা চাইতে হবে—তা ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্য কোনো উপায় দেখি নে। নিজের হৃদয়কে তারই জন্যে প্রস্তুত করেছি—এমন সময় একজন ঝি ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে, "বউ-মা, সর্ব্বনাশ হয়েচে—ছোটবাবু সিঁড়ি থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন—মাথা একেবারে ফেটে গিয়ে রক্তগঙ্গা বইচে। ওমা গো, কী হবে গো—এসো গো—ছুটে এসো গো—"

সে যাত্রা স্বামীকে রক্ষা করতে পারা গেল না। সহরের বড় বড় ডাক্তার এসে হাল ছেড়ে দিলেন, লুপ্ত জ্ঞান আর ফিরে এলো না। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিকারের ঘোরে কেবলি সুর করে বলতে লাগলেন—

"অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী।"

তাঁর এই অপঘাত মৃত্যুতে আমার প্রাণে বিষম আঘাত লাগলো। আমার মনে হলো এই মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। বিয়ের পরই যদি তাঁকে অপূর্ব্ব ঘটিত সমস্ত কথা খুলে বলতাম—তা হলে এ অনর্থ ঘটতো না। সন্দিগ্ধমনা ব'লে যাঁকে বরাবর এড়িয়ে চলেছিলাম—আজ মনে হলো তাঁর কিছুই দোষ নেই, আমিই সম্পূর্ণ দোষী। আমাকে ক্ষমা চাইবার অবসর না দিয়ে তিনি আগেই ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন, আমিও যাবো শীগ্‌গির তাঁর কাছে, গিয়ে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব এই

সঙ্কল্প করে একটা উঁচু টুলে উঠে ঐ ঘরটার কড়িকাঠে শক্ত নারকেলের দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়লাম—তারপর আর কি!—আমার সেই দড়িটা—সেই ফাঁসের দড়িটাই আজ খুঁজতে এসেছি—"

* * * *

"ওগো, সারা রাত কি এমনি করে ছাদে পড়ে থাকতে হয়? হিম লেগে অসুখ করবে যে! এসো এসো নেমে এসো—রাত শেষ হয়ে এল যে—ঐ দেখ শুকতারা উঠেছে—"

স্ত্রীর ডাকাডাকিতে দুঃস্বপ্ন ছুটিয়া গেল। উঠিয়া বসিলাম—তখনো ঘুমের ঘোর একেবারে কাটে নাই। স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া কহিলাম, "তোমার গলার দড়িটা খুঁজে পেলে কি?"

অবাক হইয়া স্ত্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "পাগল হলে না কি? গলার দড়ি আবার কিসের?"

তাঁহার এই কথায় বাস্তব চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তখন তাঁহাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলাম।

সমস্ত শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া স্ত্রী বলিলেন, "সত্যি ঐ পড়ো কুঠরীটাতে বহুদিনের পুরণো একটা লম্বা টুল আর কড়িকাঠে একটা নারকেলের দড়ি ঝোলানো আছে দেখেছি। সে যাক—কি ভয়ানক স্বপ্ন! শুনে অবধি বুক কাঁপচে—কালই এ ভূতের বাড়ী ত্যাগ কর—"

"তথাস্তু" বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম।

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গীতায় পরলোক-সংবাদ

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে জীবের মৃত্যুর পর মোটামুটি দুই রকম গতি হইয়া থাকে। এক পুনর্জ্জন্ম, দুই মোক্ষ। সংসারের অধিকাংশ জীবের হৃদয়ে অহরহ সহস্র প্রকার বাসনার উদয় হয়। কতকগুলি বাসনা জীবিতকালেই পূরণ হয়, কতকগুলি হয় না। তাহা ছাড়া জীব নানারূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে—কতক ভাল, কতক মন্দ; কতকগুলি কর্ম্মে পরের উপকার হয়, কতকগুলি কর্ম্মে পরের অনিষ্ট হয়। এই সকল বাসনা এবং কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য জীবকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। আবার সংসারে এরূপ লোক আছেন,—তাঁহাদের সংখ্যা অবশ্য অল্প,—যাঁহাদের সাংসারিক সুখভোগের তৃষ্ণা নিরস্ত হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে সংসারে আসিলে কতকগুলি দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে,—যেমন জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে সংসারের জীব সুখ অপেক্ষা দুঃখই বেশী ভোগ করে,—তাহার কারণ জীব ভাল অপেক্ষা মন্দ কাযই বেশী করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা অসৎকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন। যে সকল গ্রন্থে ভগবানের কথা আছে তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করেন, সর্ব্বদা ভগবানের রূপ ও গুণ চিন্তা করেন, এবং মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করিয়া রাখেন, যেমন করিয়াই হউক ভগবানকে লাভ করিতেই হইবে। এই সকল ব্যক্তিকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ইঁহারা মৃত্যুর পর ভগবানের নিত্যধামে গমন করেন,—সেখানে গিয়া ইঁহারা ভগবানকে লাভ করিয়া চিরকাল অনন্তসুখ পাইয়া থাকেন। হিন্দুর পরলোক সম্বন্ধে ইহাই স্থূল কথা। ইহা ছাড়া সূক্ষ্ম কথা অনেক আছে। দুইটি জন্মের মধ্যে জীব কি অবস্থায় থাকে, স্বর্গ ও নরক কি, মৃত্যুর পর কোন্ পথে যাইলে জীবকে সংসারে আর ফিরিতে হয় না, কোন পথে যাইলে আবার ফিরিতে হয়, প্রলয় কাহাকে বলে, সে সময় জীব কিরূপ অবস্থায় থাকে ইত্যাদি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় হিন্দুর পরলোক সম্বন্ধে স্থূল সূক্ষ্ম উভয় রকম কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

দেহ হইতে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে পরলোক সম্ভব হয় না। এজন্য গীতার প্রারম্ভেই ভগবান পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে দেহ এবং আত্মা দুইটি বিভিন্ন বস্তু, জন্ম এবং মৃত্যুর সময় দেহেরই আবির্ভাব এবং তিরোভাব হয়, আত্মা জন্মের পূর্ব্বেও থাকে, মৃত্যুর পরও থাকে।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়ং অতঃপরম্‌ ॥২।১২

"আমি, তুমি বা এই সকল নৃপতিগণ যে (জন্মের পূর্ব্বে) ছিলেন না, এরূপ নহে। পরে (মৃত্যুর পরে) আমরা সকলে যে থাকিব না এরূপও নহে।"

আমি এবং আমার দেহ যে এক বস্তু হইতে পারে না একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা ভগবান সেকথা সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

দেহিনোঽস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥২।১৩

"এই দেহেই দেহীর যেরূপ কৌমার, যৌবন ও জরা হয়, সেইরূপ দেহীর দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়। বিজ্ঞজন তাহাতে অভিভূত হন না।"

একই মানুষের শৈশবের ছবি দেখুন, এবং তাহারই বার্দ্ধক্যের ছবি দেখুন। এই দেহ দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু উভয়ের আত্মা এক। শৈশবে যে ব্যক্তি নিজেকে আমি বলিত, বার্দ্ধক্যে সেই ব্যক্তিই ত নিজেকে আমি বলিতেছে। অতএব দেহ ছাড়া এমন একটা জিনিষ আছে শৈশবে এবং বার্দ্ধক্যে যে জিনিষ একই থাকে। শিশু এবং বৃদ্ধ অবস্থায় বিভিন্ন দেহের মধ্যে যে এক বস্তু বিদ্যমান থাকে, মৃত্যুর পর দেহ বিনষ্ট হইলেও সেই বস্তু অপর দেহের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, ইহা কল্পনা করা কঠিন নহে। দেহ এবং পরিচ্ছদের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, আত্মা এবং দেহের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ। অমুক লোকটির কথা ভাবিলেই আমাদের মনে একজন ধুতি পাঞ্জাবি পরা লোক, অথবা হ্যাটকোটধারী লোকের ছবি আবির্ভূত হয়। কিন্তু ধুতি পাঞ্জাবী অথবা হ্যাটকোট সেই লোকটির কোন অংশ নহে। সেইরূপ একটি লোকের বিষয় ভাবিলে আমরা যদিও একটি শীর্ণ শরীর বা স্থূলকায়ের বিষয় চিন্তা করি, তথাপি সেই শীর্ণ অথবা স্থূল শরীর সেই লোকটির স্বরূপ নহে, বাহিরের আবরণ মাত্র। একটি আবরণ ত্যাগ করিয়া অপর একটি আবরণ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২।২২

"মানুষ যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ গ্রহণ করে।"

সাধারণতঃ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই পুনর্জন্ম হয় না। মধ্যে কিছু কাল ব্যবধান থাকে। সেই সময় কর্ম্ম অনুসারে জীব স্বর্গ বা নরকে বাস করে। যাহারা শাস্ত্রবিহিত পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছে তাহারা স্বর্গে বাস করে, যাহারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপ করিয়াছে তাহারা নরকে বাস করে। এই স্বর্গ বা নরকে বাস করিয়া কতকগুলি কর্ম্মের ক্ষয় হয়। স্বর্গ ও নরক ভোগের পর যে কর্ম্মগুলি অবশিষ্ট থাকে, সেই কর্ম্ম অনুসারে জীব উত্তম বা অধম যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। স্বর্গবাস যদিও সুখকর, তথাপি ইহা পরিমিতকাল স্থায়ী বলিয়া এবং ইহার পরে পুনরায় সংসারে আসিয়া অনিবার্য্য দুঃখভোগ করিতে হয় বলিয়া ইহা শ্রেষ্ঠ গতি নহে।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্‌
অশ্নন্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥৯।২০

যাহারা বেদ পাঠ করিয়া বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ প্রার্থনা করে, তাহারা ইন্দ্রলোকে গিয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ প্রাপ্ত হয়।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥৯।২১

বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর যখন তাহাদের পুণ্য ফুরাইয়া আসে তখন তাহারা মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। এই প্রকারে বেদোক্ত সকল কর্ম্ম দ্বারা বারবার সংসারে যাতায়াত করিতে হয়।

পুণ্য কর্ম্ম বিভিন্ন রকমের আছে, তাহার ফলে পুণ্যবানদের গতিও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের উপাসনা করিলে স্বর্গলোকে গমন

হয়। পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে পিতৃলোকে গমন হয়।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্
যাজিনোঽপি মাং ॥৯।২৫

যাঁহারা দেবতাদের উপাসনা করেন তাঁহারা দেবতাদের নিকট যান, পিতৃগণের উপাসনা করিলে পিতৃগণের নিকট গমন হয়, মহাপুরুষদের উপাসনা করিলে তাঁহাদের নিকট গতি হয়, যাঁহারা আমাকে (শ্রীভগবানকে) উপাসনা করেন তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

যাঁহারা যোগমার্গে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হন তাঁহাদের গতি বর্ণনা করিবার সময় ভগবান বলিয়াছেন,—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৬।৪১

পুণ্যবানদের লোক (স্বর্গাদিলোক) গমন করিয়া সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

যতক্ষণ না ভগবানকে লাভ করা যায় ততক্ষণ সংসারে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। স্বর্লোক, মহর্লোক, জন, তপঃ ও সত্যলোক ইহারা কেহই চিরস্থায়ী নহে।

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনো জনাঃ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥৮।১৬

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবন বিনাশশীল। অতএব সেই সব লোকে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। কেবল যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয় তাহাদিগকে কখনও ফিরিয়া আসিতে হয় না।

গীতায় ভগবান পুণ্যবানের বিভিন্ন সদ্গতির যেমন উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ পাপীদের অধোগতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। ষোড়শ অধ্যায়ে দৈব এবং আসুরিক স্বভাবের বর্ণনা করিয়া, আসুরিক স্বভাব সম্পন্ন জীবদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

অনেকচিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ।১৬।১৬

অনেক প্রকার বস্তু পাইবার আশায় তাহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া উঠে, তাহাদের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়, ইন্দ্রিয় সুখভোগে তাহাদের অত্যন্ত আসক্তি থাকে। এবম্বিধঃ পুরুষগণ অপবিত্র নরকে পতিত হয়।

নরক বাসের পর তাহারা যখন পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে তখন তাহারা ব্যাঘ্রাদিরূপে অথবা তাদৃশ ক্রূর স্বভাব-সম্পন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ।১৬।১৯

পরের অনিষ্টকারী ক্রূর স্বভাব সম্পন্ন এই সকল নরাধমকে আমি আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।

কেন জীব নরকে যায় এ সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন —

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ।১৬।২১

তিনটি প্রবৃত্তি জীবের অত্যন্ত অনিষ্টকর, এ জন্য ইহারা নরকের দ্বার স্বরূপ—ইহাদের নাম কাম, ক্রোধ এবং লোভ। ইহাদিগকে ত্যাগ করা উচিত।

গীতায় শ্রীভগবান বারবার বলিয়াছেন যে জীব ভগবানকে প্রাপ্ত না হইলে সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবে, তাঁহাকে পাইলে আর ফিরিতে হইবে না। ইহাই মোক্ষ। এই মোক্ষ সম্বন্ধে গীতায় নিম্নলিখিত উক্তিগুলি পাওয়া যায়।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং ।২।৫১

যাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে তাঁহারা কর্ম্ম ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন এবং পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত হইয়া সকল দুঃখ কষ্টের অতীত স্থানে গমন করেন।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ং ।১৮।৫৬

কর্ম্ম ত্যাগ না করিলেও যদি জীব ভগবানেই আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভগবানের প্রসাদে চিরকালস্থায়ী স্থান লাভ করে।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং
প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং ।১৮।৬২

হে অর্জ্জুন তুমি সকল প্রকারে ঈশ্বরের শরণ লও।

তাঁহার প্রসাদে তুমি শ্রেষ্ঠ শান্তি এবং অবিনাশী স্থান লাভ করিবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পৃথিবী, স্বর্গ এমন কি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকলই বিনাশশীল। মোক্ষ লাভ করিলে জীব এই সকল বিনাশশীল স্থান ছাড়াইয়া এমন স্থানে উপস্থিত লয় যাহার কখনও বিনাশ হয় না; সৃষ্টি এবং প্রলয় যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রুতি এই স্থানকে "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং" (বিষ্ণুর সেই শ্রেষ্ঠ স্থান) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গীতায় ভগবান ইহাকে তাঁহার "পরম ধাম" বলিয়াছেন।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।৮।২১

উৎপত্তি ও বিনাশশীল জীবকুলের অতীত যে অব্যক্ত ভাব, তাহাকে অক্ষর বলা হয়। ইহাকেই ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ গতি বলেন। এই ভাব প্রাপ্ত হইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। ইহা আমার পরম ধাম।

এই স্থানের একটু বিবরণ আমরা নিম্নের শ্লোকে পাইয়া থাকি।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।১৫।৬

সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নি সেই স্থান আলোকিত করে না। সেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। তাহাই আমার পরম ধাম।

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর এরূপ প্রকৃতি যে তাহাদের উপর আলোক না পড়িলে, তাহাদিগকে দেখা যায় না। সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নির আলোক তাহাদের উপর প্রতিফলিত হইলে তাহারা প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিষ্ণুর "পরম ধাম" জড় বস্তুর দ্বারা রচিত নহে। সেখানে সকলই চিন্ময়। নিজস্ব আলোকে সকলই প্রকাশিত। বৈষ্ণবেরা এই স্থানকে মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বলিয়া থাকেন।

মুক্তপুরুষেরা বিষ্ণুর পরম ধাম বা বৈকুণ্ঠে গিয়া শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবানকে পাইবার কথা গীতায় বারম্বার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার লীলার কথা আলোচনা করিলে, দিবা-নিশি তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক ডাকিলে, সকল কর্ম্ম তাঁহার উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করিলে, তাঁহাকে পূজা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।৪।৯

আমার অলৌকিক জন্ম এবং কর্ম্ম যে যথার্থরূপে জানে, দেহত্যাগ করিবার পর তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।৭।২৩

যাহারা ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করে, তাহারা ইন্দ্রাদি দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। যাহারা আমার পূজা করে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ।৮।৭

ই হেতু সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করিবে এবং যুদ্ধ করিও। আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিলে আমাকে পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।৯।২৮

(এইরূপে সকল কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিলে) কর্ম্মের শুভ এবং অশুভ ফলরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। এবং সন্ন্যাস যোগ দ্বারা আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।৯।৩৪

আমাতে মন নিবিষ্ট রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে প্রণাম কর। এই ভাবে আত্মাকে আমার সহিত যুক্ত করিয়া মন্নিষ্ঠ হইয়া থাকিলে আমাকে পাইবে।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।১১।৫৪

যে ব্যক্তি অপর সকল বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আমাকেই* ভক্তি করে সে আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারে, আমাকে জানিতে পারে এবং আমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।*

* উদ্ধৃত শ্লোকগুলি ব্যতীত ১১ অধ্যায় ৫৫শ্লোক, ১২ অধ্যায় ৪ শ্লোক, ১৮ অধ্যায় ৫৫ ও ৬৫ শ্লোকেও ভগবানকে পাইবার কথা আছে। বাহুল্য ভয়ে সেগুলি এখানে উদ্ধৃত হইল না।

মোক্ষলাভ করিলে জীবের কিরূপ অবস্থা হয় ? সে কি ভগবানের সহিত এক হইয়া যায়, না, কিছু প্রভেদ থাকে ? এই বিষয়ে অদ্বৈতবাদীর সহিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি অপরাপর সম্প্রদায়ের ঘোর মতভেদ দৃষ্ট হয়। শঙ্কর প্রমুখ অদ্বৈতবাদী বলেন, মোক্ষলাভ করিলে জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। রামানুজ প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী তাহা মানেন। গীতার এ বিষয়ে মীমাংসা কি তাহা বলা দুরূহ। তবে বোধ হয় অপর সকল প্রশ্নের গীতা যেরূপ উদার সাম্প্রদায়িক মীমাংসা করিয়াছেন, এই প্রশ্নেরও সেইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, —

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।৪।১১

আমাকে যাহারা যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি। হে অর্জ্জুন, মনুষ্যগণ আরাধনার যে পথই গ্রহণ করুক, তাহারা আমার ভজনমার্গই অনুসরণ করে।

এই শ্লোক হইতে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে যাহারা অদ্বৈতবুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া নির্গুণ অব্যক্ত ব্রহ্মের ভজনা করে, তাহারা মোক্ষলাভ করিয়া নিজেদের সর্ব্ব-প্রকার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জ্জন করিয়া অব্যক্ত ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। যাহারা সগুণ ঈশ্বরকে প্রভু বা স্বামী রূপে ভজনা করে, তাহারা সেইরূপেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, তাহাদের স্বতন্ত্র অহংজ্ঞান থাকে। পঞ্চম অধ্যায়ের ২৩ ও ২৪ শ্লোকে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাইবার কথা আছে বলিয়া বোধ হয়।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।৫।২৪

যে যোগী অন্তর মধ্যে সুখ এবং আরাম প্রাপ্ত হয়, অন্তর মধ্যেই জ্যোতি দর্শন করে, সে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়।

যে সকল স্থানে ভগবানকে পাইবার কথা আছে, "মাম্ এতি" "প্রাপ্নুবন্তি মামেব" "মাং এষ্যসি" এইরূপ প্রয়োগ আছে, সেখানে যে ভগবানের সহিত এক হইয়া যায় ইহা মনে হয় না। কয়েক স্থানে "মদ্ভাবমাগতাঃ" এইরূপ উল্লেখ আছে।* মুক্ত জীব "আমার ভাব" অর্থাৎ ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হয়। শ্রীধর স্বামী ইহার অর্থ করিয়াছেন "মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তাঃ" অর্থাৎ ভগবানের সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু ইহার এরূপ অর্থও করা যায় যে মুক্ত পুরুষ ভগবানের ন্যায় চিদানন্দময় রূপ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্তজীবের স্বরূপ বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, মুক্ত জীব ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞত্ব, সত্যসংকল্পত্ব, অপহতপাপত্ব প্রভৃতি সকল গুণ প্রাপ্ত হন, (অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হন, যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন তাহাই পান, তাঁহাদিগকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না।) কিন্তু মুক্ত জীবের সহিত ভগবানের কেবল এইটুকু প্রভেদ থাকে যে, তাঁহারা জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না। বোধ হয় মুক্ত জীবের সহিত ভগবানের এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া গীতায় "মদ্ভাবমাগতাঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে। গীতার কয়েক স্থানে মোক্ষ লাভ করিয়া ভগবানের মধ্যে বাস করা বা তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করার কথা আছে।+ কিন্তু সে সকল স্থানে যে অদ্বৈত মতানুযায়ী একীভূত হওয়াকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ইহা বলা যায় না। জ্ঞান স্বরূপ ভগবান এবং তাঁহার চিন্ময় ধাম উভয়কে একরূপে ভাবিয়া এই সকল কথা বলা হইয়াছে বোধ হয়।

মৃত্যুর পর জীব যে পথ দিয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়, এবং পরে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, তাহাকে দেবযান বলা হয়। অগ্নি, জ্যোতি, দিবসের দেবতা, শুক্লপক্ষের দেবতা, উত্তরায়ণের দেবতা, এই সকল দেবতা দেবযান পথে জীবকে লইয়া যান। (গীতা ৮।২৪) এই পথে গেলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। স্বর্গ যাইবার পথের নাম ধূম দেবতা, রাত্রির দেবতা, কৃষ্ণ পক্ষের দেবতা, দক্ষিণায়নের দেবতা ইহারা জীবকে স্বর্গ লোক বা চন্দ্রলোকে লইয়া যান। (গীতা ৮।২৫) চন্দ্র-লোকে পুণ্যের ফলে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। উপনিষদেও এই দুই পথের উল্লেখ আছে।

---

* ৪।৮ ; ৮।৫ ; ১৩।১৯।

+ ১১।৫৪ ; ১২।৮ ; ১৮।৫৫

ভগবানের পরম ধাম ব্যতীত জগতের যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি এবং ধ্বংস হয়। ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইলে জীব সমূহ অব্যক্তে (ভগবানের প্রকৃতিতে) বিলীন হইয়া যায়, সৃষ্টির সময় পুনরায় তাহাদের উৎপত্তি হয়।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ।৮।১৮

ব্রহ্মার যখন দিবস হয় তখন সকল জীব অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হয়, আবার ব্রহ্মার যখন রাত্রি হয় তখন তাহারা অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়।

গীতায় এ সকল কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ অন্য শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাদল জ্যোৎস্না

আজি বরষায় এত হাসি কেন
ওগো ও নিলাজ চাঁদ ?
রাখো রাখো রাখো ও হাসি তোমার
দেখিতে নাহিক সাধ !

আজি নাহি হায় বসন্ত বায়,
নাহি আজি ফুল মালা,
কোকিলের গান নাহি তোসে প্রাণ
আজি কাঁদিবার পালা।

ভাল লাগেনাকো আজিকে তোমার
হাসিটি সরমহীন
আজি বরষায় হাসি নাহি হায়,
আজি কাঁদিবার দিন !

আজিকে আষাঢ়ে যমুনারি পারে
কাঁদে বিরহিণী রাধা
আজি মানবের হৃদয় তন্ত্রী
সকরুণ সুরে বাঁধা।

আজিকে যক্ষ কাঁদিছে একেলা
গিরিশিরে প্রিয়াহারা,
তারি মাঝখানে ভাল লাগেনাকো
রজত হাসির ধারা !

ওগো বরষার মেঘমালা, ঢাকো
ঢাকো ও নিলাজ হাসি
শূন্য কক্ষে বরষা নিশীথে
বিরহ সলিলে ভাসি ॥

শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত

চিতাগ্নি

(চিত্র)

দুর্ব্বলতা হেতু যার খুব পুরু বিছানাতেও শুতে শরীরে ব্যথা বোধ হত, আজ সে একখানি লাল পেড়ে শাড়ী প'রে শুধু কাঠের উপর কেমন করে শুয়ে আছে আমি এক দৃষ্টে দেখছি আর ভাবছি। ক্ষীণ ব্রততীর মত তার দেহটী আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। পায়ে টুকটুকে আল্‌তা পরা, কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ, পরিধানে চওড়া লালপেড়ে শাড়ী, আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। কুঞ্চিত কেশদামে ললাট আবৃত, ক্ষীণ ভ্রূযুগে শোভিত, প্রাণ ভ'রে একদৃষ্টে মুখখানি দেখছি, আর কি আকাশ পাতাল ভাবছি ঠিক মনে নেই। এমন সময় রমেশ

আমার গায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বল্‌লে, "বলি হাঁ করে কি দেখছ ? এস এদিকে এস।" এই বলে সে আমার হাত ধ'রে যেখানে ছিলাম তার অনেকটা দূরে নিয়ে গিয়ে বসালে। আমি পূর্ব্বস্থানের দিকে পশ্চাৎ ফিরে বসে ভাবতে লাগলাম।

এই সেদিনের কথা—প্রসাদ আর আমি তাকে দেখতে গেলাম। শুনেছিলাম মেয়েটী বেশ বড় এবং দেখতে বেশ সুন্দরী। দেখলামও ঠিক তাই।

কিছু দিন পরেই শ্রীমতী সানাইয়ের মধুর রাগিণীর সঙ্গে আমার গৃহলক্ষ্মী রূপে এসে হাজির হলেন। গরীবের মেয়ে, বেশ শান্ত শিষ্ট, অল্পেই সন্তুষ্ট। আমার আদর যত্নে সে আনন্দে অধীর হয়ে আপনাকে কৃতার্থ মনে করলে। আমিও বেশ তৃপ্তিলাভ করলাম। বিবাহ করতে গেলে ভদ্রবংশের গরীবের মেয়েই বিবাহ করা উচিত। তাদের প্রকৃতিও ভাল হয় এবং অল্পে সন্তুষ্ট হয়। আমি ঠিক তাই পেয়েছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টে সুখ সইল না—ভাল জিনিষটি দেখে যমের শীঘ্রই লোভ হল।

মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে তাকে ভাল বুঝতে পারা যায় না। যখন চলে যায়, তখন তার কথা মনে হয়ে শুধু চোখের জলে বুক ভেসে যায়, আর প্রাণের মাঝে গুমরে ওঠে।

সে যে কি ছিল তা মোটেই বুঝতে পারিনি। যখন যাবার সময় হল, দ্বারে এসে রথ দাঁড়ালো, তখন একটু একটু চিন্‌তে পারলাম। সে যে ঘরে শুয়ে থাকত, আমি সেই ঘরের সম্মুখের ঢাকা বারান্দায় রাত্রে নিদ্রা যেতাম। আশ্বিন মাস। একটু একটু শীত পড়তে সবে সুরু হয়েছে। শেষ রাত্রে শীত করছিল ব'লে বোধ হয় আমি কষ্ট বোধ করে আমার অজ্ঞাতসারে কোনরূপ ক্ষীণ কাতর ধ্বনি করেছিলাম। সে বোধ হয় সে সময়ে জেগে ছিল, আমার কাতরধ্বনি শুনে এরূপ দুর্ব্বল অবস্থাতেও নিকটে একখানা আলোয়ান পেয়ে, সেখানা আমার গায়ে দেবার জন্যে উঠে এসে আলোয়ানখানা বেশ করে আমার গায়ে দিয়ে, সম্ভবতঃ মাথা ঘুরে, আমার বিছানা-তেই পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দুটো মিষ্টি কথায় তাকে একটু ভর্ৎসনা ক'রে আস্তে আস্তে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এলাম। সে একবার বল্লে, "আমি তোমার কাছে এই থামেই থাকিনা কেন ?" ইচ্ছাসত্বেও সেই ঠাণ্ডায় এরূপ দুর্ব্বল রোগীকে বারান্দায় রাখতে সাহস হ'ল না। হিন্দুস্ত্রী ছ'ড়া স্বামীর প্রতি এ ভক্তি, এ ভালবাসা আর কোন্ জাতির আছে ? এ love নয়, এ প্রেম নয়, এ হিন্দু রমণীর স্বামী দেবতাকে আপনার সমস্ত দেহ মন উৎসর্গ করা।

ক্রমশই তার অসুখ বাড়তে লাগ্‌ল। কিছুতেই কোন উপকার হয় না। অনেক অর্থ ব্যয় কর্‌লাম, কিন্তু কিছুই কর্‌তে পার্‌লাম না। কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিটা আর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম আমার পক্ষে বড় খারাপ। কিছু বৎসর আগে এই ১লা অগ্রহায়ণ গৃহ-দেবতার সঙ্গে সংসারের শ্রেষ্ঠ রত্ন ভাগীরথীর জলে বিসর্জ্জন দিয়ে ছিলাম।

সেদিন কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি। সকালবেলা হতেই তাকে কেমন অবসন্ন বলে বোধ হতে লাগ্‌ল। একটু চিন্তিত হয়ে আমার বিশেষ বন্ধু, স্থানীয় শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে একবার দেখ্‌তে ডাক্‌লাম। সে এসে দেখে বল্‌লে "Begining of the end !" কি যে এবার তোমাদের দুর্ম্মতি হল আমাকে দিয়ে কেছুতেই দেখালে না।" তার কথা শুনে কেবল জোরে একটা নিঃশ্বাস পড়্‌ল। কার্ত্তিকের মত একমাত্র শিশু পুত্রটার দিকে চেয়ে ভাব্‌লাম, কি দুর্ভাগ্য ! বন্ধুর ইঙ্গিতে বাইরে গেলাম। মনটা সমস্তদিন বড় খারাপ হয়ে রইল। দিনটা একরকম কাট্‌ল। রাত্রি ৮ টার সময় হতে যেন আরও একটু খারাপ হতে আরম্ভ হল। যে ডাক্তার চিকিৎসা কর্‌ছিলেন তিনি আমার বন্ধুকে ডেকে পরামর্শ করে ব্যবস্থা কর্‌লেন। আজ যেন একটা ভয় এসে কোথা হতে উপস্থিত হল। রাত্রি ১২ টার সময় সে আমাকে ডেকে বল্‌ল, "তুমি কেবল পালিয়ে বেড়াও। দেখ আমি বেশ বুঝেছি স্ত্রীলোকের স্বামী ছাড়া আর কেউ নেই। বাপ মা, ভাই বোন সব সুখের বন্ধু। দেখ আজ তিন চার মাস পড়ে' ভুগ্‌লাম, বাপের বাড়ীর একটি প্রাণীও দেখ্‌তে এল না। আর আমার দিদি! তিনি ত সুখের পায়রা। সুখের সময় খুব আত্মীয়তা দেখাতে আসেন। যাক্, তুমি যথেষ্ট করেছ। আমার জন্যে শরীর পাত কর্‌লে, অর্থের শ্রাদ্ধ কর্‌লে

আর কি করবে বল! দেখ আজ আমার বড় ভয় করছে। মনে হচ্ছে, আমি আর বাঁচবনা। তুমি আমার এই মাথার কাছে বসে থাক। যাতে না পালাতে পার, তাই আমি তোমার হাত ধ'রে থাক্‌ব।" এই ব'লে সে আমার হাতখানি ধরবার অছিলায় আমার পায়ে হাত দিয়ে মাথায় দিলে, এবং পরে আমার ডান হাতখানি চেপে ধরে বল্‌লে, "আমার বড় ঘুম আসছে। রাত অনেক হয়েছে, এখন একটু ঘুমোই। যতক্ষণ ঘুম না ভাঙ্গে তুমি আমার কাছে বসে থাক।" এই ব'লে আমার হাত খানি নিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরলে। দুই এক মিনিট পরেই দেখি, সব ঠাণ্ডা। আমাদের বাড়ীর ঝি দেখেই বুঝতে পেরে আমাকে বল্‌লে, "আপনি এখান থেকে উঠুন, একটা কাপড় ঢাকা দিয়ে দেন।" আমি বল্‌লাম "কেমন করে উঠ্‌ব? সে যে বলে গিয়েছে, যতক্ষণ তার ঘুম না ভাঙ্গে, আমার এইখানে বসে থাক্‌তে হবে। সে যে এখনও আমার হাত ধরে আছে।" এর অল্পক্ষণ পরেই, আমার বন্ধু ডাক্তার ত্রিপুরারী বোধ হয় বাড়ীর কান্নার শব্দ শুনে এসে, আমার এই অবস্থা দেখে আর আমার কথা শুনে বল্‌লে, "Sentimentality তোমার রেখে দাও। এদিকে উঠে এস। ছেলেটা যদি জেগে ওঠে, তা হলে ভারি মুস্কিল হবে।" কি করব! অগত্যা উঠে এলাম। কিন্তু মনে হতে লাগল সে যেন তখনও আমার হাত-খানা ধরেই আছে।

পরদিন ১লা অগ্রহায়ণ। শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা। ভোর বেলা যখন আমরা যাত্রা করছি, তখন পূজার ঘট ভাগীরথী হতে পূর্ণ ক'রে—শঙ্খ, ঘণ্টা রোলে নিয়ে আসছে। আমার বন্ধুরা ঠিক সেই সময় "বল হরি হরিবোল!" ব'লে যাত্রা করলেন। আমার মুখ থেকে কেবল একটা কথা বেরিয়ে এল,—'মা তুমি কি করলে!"

ভ্রাতা রমেশের কাছে এসে বসলাম। কিন্তু যেখানে ছিলাম, রমেশ আমাকে আর সেদিকে চাইতে দিলে না। কিছুক্ষণ পরে আমার ছোট ভাই ডাক্‌লে, "দাদা এক বার এদিকে উঠে আসুন।" তার ডাকে আমার চৈতন্য ফিরে এল। ফিরে দেখি সে নেই। কেবল একটা আগুনের স্তূপ পড়ে আছে মাত্র। সবাই জল ঢাল্‌চে। আমি রমেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, "রমেশ, সে গেল কোথায়?" রমেশ বল্‌লে "ও রকম পাগলামি ক'রো না।" ভ্রাতার কথায় পূর্ব্বস্থানে গিয়ে চিতায় জল ঢাল্‌লাম, এবং অবশেষে চিতা নিবলো, কিন্তু আমার প্রাণের মধ্যে যে চিতা জ্বললো তা কেমন করে নিববে! আজ এক বৎসর রাত্রিদিন চিতা জ্বল্‌ছে! বোধ হয় মৃত্যুর পূর্ব্বে এ চিতা আর নির্ব্বাপিত হবে না।

তাকে একলা রেখে বাড়ী ফিরে এলাম। সোণার কার্ত্তিকের মত শিশুটি এসে দেখি কেঁদে কেঁদে চোখ দু'টো লাল করেছে। আমাকে দেখবা মাত্র এসে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা মা কোথায় গেল?" বড় কঠিন প্রশ্ন। মানুষ মরলে যে কোথায় যায় তাতো কেউ ঠিক বল্‌তে পারে না। শিশুকে কি জবাব দেবো? শুধু বুকে ক'রে চেপে ধরে কোলে তুলে নিলাম। দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু শিশুর গায়ের উপর পড়লো। সে বল্‌লে, "বাবা তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?"

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিশীথ মিলন

হে অনন্ত, খোল তব রুদ্ধ আবরণ
আজি এ প্রশান্তি-মগ্ন নির্জ্জন নিশীথে,
ফুটিতেছে চন্দ্র তারা তনু আভরণ,
আকাশ করিছে ধ্যান একান্ত নিভৃতে।
সাগর তুলিছে মন্ত্র উদাত্ত কল্লোলে,
হিল্লোলে ধ্বনিয়া যায় উচ্চারিত বাণী,
বনের পল্লবে লাগি' গীতিখানি দোলে
নিখিল প্রকৃতি বুকে যুগান্তর হানি'।
আমি আছি যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে,
মুক্ত কর নগ্ন শোভা উদার মর্ম্মের;
পবিত্র জ্যোৎস্না আসি পড়িতেছে ছেয়ে,
আঁকিতেছে মোর মুখে হাসিটি স্বর্গের।
প্রেমের আলোকে হেরি অমৃত মিলন,
যেথানে অনন্ত এসে খুলেছে গুণ্ঠন।

শ্রীকরুণাময় বসু।

রঙ্গলাল

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হাবড়ায় রাজকার্য্য ও অবসর গ্রহণ। 'কাঞ্চীকাবেরী' ও অপ্রকাশিত রচনাবলী। শেষজীবন।

(১৮৭৯-৮৭)

'কাঞ্চী কাবেরী'। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত নবীনচন্দ্রের জীবনস্মৃতি পাঠে পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন যে কটকে অবস্থান কালেই রঙ্গলালের অভিনব কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী'র রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় "কটক, ২০ কার্ত্তিক ১৭৯৯ শকাব্দা" তারিখ থাকিলেও কাব্যটি শশীভূষণ দাস দ্বারা গণেশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে (১২৮৬ বঙ্গাব্দা) বি, মিত্র এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা গেজেটে উহার প্রকাশকালে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হয়।

"An epic story from the history of Orissa. Gives much legendary, mythological and antiquarian information regarding that Province."

"কাঞ্চী কাবেরী"র ভূমিকায় রঙ্গলাল উৎকল-দেশীয় বীর রসাত্মক এই আখ্যায়িকা বর্ণনার দুইটী কারণ দেখাইয়াছেন :—

"উৎকল দেশ ঘৃণার্হ দেশ নহে। অত্রত্য লোকের পূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দর্শনে সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে উৎকলীয় লোকের মানসে অনেক গুলি গৌরবভাজন শক্তিবীজ নিহিত আছে, এবং তাহারা এক সময়ে বীরত্ব এবং ধীরত্বভূষণে ভূষিত ছিল। বঙ্গপ্রদেশের সহিত এ প্রদেশের প্রতিবেশিতা সম্পর্কবশতঃ বহুকাল পর্য্যন্ত সুপরিচয় আছে।*** কিন্তু উভয় দেশীয় লোকের মধ্যে এই সৌহার্দ্য যত বর্দ্ধিত হয়, ততই সুখের বিষয়। সেই সৌহার্দ্য-রজ্জুর খণ্ডৈক ক্ষীণসূত্র বা তৃণবৎ আমি এই ঐতিহাসিক কাব্যখানি বঙ্গীয় এবং উৎকলীয় বন্ধুগণের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

এই কাব্য প্রণয়নের অন্যতর কারণ কতিপয় উৎকলীয় বন্ধুর উত্তেজনা। তাঁহারা বলেন যেখানে আমি বহুকাল পর্য্যন্ত এই দেশে প্রবসতি করিলাম, সেখানে এদেশ-সম্বন্ধে লেখনী সঞ্চালন করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। এই উত্তেজনা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। ফলে সুহৃদানুরোধ রক্ষণ করা সমাজের একটী সুনীতি।"

কাব্যবর্ণিত আখ্যানটী রঙ্গলাল ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মেজর কলনেট কর্ত্তৃক রামকমল মুখোপাধ্যায়কে উপহৃত ষ্টর্লিং লিখিত উড়িষ্যার বিবরণে প্রথমে পাঠ করিয়াছিলেন। আখ্যায়িকাটী সংক্ষেপে এই—

কাঞ্চীনগরের অধিপতির পদ্মাবতী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। তাঁহার রূপের খ্যাতি উড়িষ্যাধিপতি পুরুষোত্তমের কর্ণগোচর হয় এবং তিনি পদ্মাবতীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। কাঞ্চী অধিপতি বীরত্বে ও সম্মানে অতুলনীয় উড়িষ্যাধিপতিকে জামাতা রূপে প্রাপ্ত হওয়া গৌরবের বিষয় বিবেচনা করেন, কিন্তু কন্যা সম্প্রদানের পূর্ব্বে উৎকলবাসীদের আচার ব্যবহারাদি অবগত হইবার জন্য পুরীধামে আগমন করেন। এখানে রথযাত্রার সময় মহারাণা পুরুষোত্তমকে সুবর্ণ মার্জ্জনী দ্বারা চণ্ডালের ন্যায় জগন্নাথের পথ পরিষ্কৃত করিতে দেখিয়া, তিনি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই জানিয়া, এবং জাতিভেদ নাই দেখিয়া তিনি কন্যা সম্প্রদানে অস্বীকার করেন। গণেশ-পূজক কাঞ্চী রাজ জগন্নাথের অশেষ নিন্দা করিয়া এবং চণ্ডালকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না বলিয়া নিজধামে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইষ্ট দেবতার অবমাননায় ক্ষুব্ধ হইয়া পুরুষোত্তম সৈন্যসামন্ত সহ কাঞ্চী বিজয়ে যাত্রা করেন। কিম্বদন্তী এরূপ যে গণেশ কাঞ্চী-রাজের জন্য এবং স্বয়ং কৃষ্ণ ও বলরাম কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় অশ্বে আরোহণ করিয়া উৎকলাধিপতির পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজা

তাঁহার ইষ্ট দেবতা দ্বারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতিলাভ করিয়াও পথিমধ্যে মাণিকপত্তম গ্রামে এই প্রতিশ্রুতির কোনও নিদর্শন প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এমন সময়ে মাণিক নাম্নী এক গোপবালা তাঁহার নিকট একটী অঙ্গুরীয় আনিয়া দিয়া বলে যে একজন কৃষ্ণকায় অশ্ব ও একজন শ্বেতকায় অশ্বে আরূঢ় বীর কাঞ্চী বিজয়ের জন্য যাত্রা করিয়াছেন, পথিমধ্যে তাহার নিকট দুগ্ধ পান করিয়াছেন এবং এই অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে উহা উৎকলাধিপতিকে দিয়া তাঁহার নিকট হইতে দুগ্ধের মূল্য লইতে হইবে। পুরুষোত্তম সেই অঙ্গুরীয় শিরে ধারণ করতঃ মাণিক গোয়ালিনীকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলেন এবং তাহার নামে সেই গ্রামের নূতন নামকরণ করিলেন—মাণিকপত্তম। এই গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে। অতঃপর তিনি কাঞ্চীরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যাকে অবরুদ্ধ করিলেন এবং মন্ত্রীকে বলিলেন যে কোনও চণ্ডালের সহিত উহার বিবাহ দিতে হইবে। মন্ত্রী রাজকন্যার দুঃখে কাতর হইলেন। অবশেষে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সময়ে রাজা যখন সম্মার্জ্জনী হস্তে চণ্ডালের কার্য্যে প্রবৃত্ত তখন মন্ত্রী রাজকন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই আখ্যায়িকাটী রঙ্গলাল বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। উড়িষ্যায় আসিবার পর দুর্গোৎসবের বন্ধ উপলক্ষে একদা শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের একদিকে দেখিলেন, শ্বেত ও কৃষ্ণ তুরঙ্গারোহী সৈনিকদ্বয়ের আকার খোদিত আছে, পার্শ্বে এক তরুণী ক্ষীর সর লইয়া তাহাদিগকে প্রদানোন্মুখী। দেখিবামাত্র পূর্ব্ব পঠিত আখ্যানটী তাঁহার মনে পড়িয়া যায়। গ্রন্থ রচনার এক বৎসর পূর্ব্বে তালপত্রে লিখিত একখানি কাঞ্চীকাবেরী পুঁথী তাঁহার হস্তগত হয় এবং উহার পাঠসমাপনান্তে তিনি এই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কতিপয় দিবস মধ্যে উহা সমাপ্ত করেন। উহা উৎকল দেশীয় কাব্যটীর অনুবাদ নহে, আখ্যানটী মাত্র উহা হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সমগ্র নহে। রঙ্গলাল লিখিয়াছেন ঃ—

"শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, দেশবর্ণন, উৎকলদেশের পৌরাবৃত্তিক ঘটনা প্রভৃতি কোন বিষয়েই আমি উক্ত মূল কাব্যের নিকট ঋণী নহি। দুই এক স্থলে সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা' কিন্তু এ প্রকার সাদৃশ্য অপরিহার্য্য।"

এইরূপ আখ্যায়িকা বর্ণনে রঙ্গলাল যে কিরূপ নিপুণ ছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যসমূহের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এই কাব্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কাব্য খানি তাঁহার কবিযশঃ বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করে নাই। ইহার অনেকগুলি পদ বাঙ্গলার সুভাষিত রত্নাকরে স্থান পাইবার যোগ্য। যথা—

"হায় যেই ভানুকরে ফুটে শতদল।
সেই ভানুকরে তার শরীর বিকল॥"

"সেই দেশ ধন্য হয় যেই দেশে নারীচয়,
সদাকাল আদরে অর্চ্চিত "

"যিনি নিরাকার, কি আকার তাঁর সাকার কল্পনা-সার।
সাধকের হিত তাহে সমাহিত, কহে বেদ বার বার॥
পুন কহে বেদ, ভেদ জ্ঞান ছেদ সেই জ্ঞান সার মাত্র।
বিভু সন্নিধান, সকলে সমান, জ্ঞান ভাব পাত্রাপাত্র॥
কিবা হরিহর, ব্রহ্মা পুরন্দর, সকলি আমার প্রভু।
পাত্র-ভেদে পর, নানাবর্ণ হয়, বস্তু ভিন্ন নয় কভু॥
নহে বহু অণু, একই হিরণ্য, সকল ভূষার মূল।
কিঙ্কিনী কঙ্কণ, কিরীট শোভন, ললাটিকা কর্ণফুল॥
যেবা যেই ভাবে, মনে তাঁরে ভাবে, সেই ভাবে পাবে সেই॥"

গ্রন্থ মধ্যে রঙ্গলাল নানাপ্রকার ছন্দেরও অবতারণা করিয়াছেন এবং সেগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আচার্য্য লালবিহারী দে তৎসম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগেজিনে' এই গ্রন্থের সমালোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"Babu Rangalal Banerjee is ackaowledged to be one of the best Bengali poets of the day, and the present poem will no doubt add to his reputation. The tale is taken from the annals of Orissa where the Babu resided for some years. The versification is throughout spirited."

'ঋতুসংহার'। 'কুমার সম্ভবের' অনুবাদে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিবার পর রঙ্গলাল কালিদাসের 'ঋতুসংহারের' অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ঋতুসংহার কাব্যটী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। কেবল উহার অন্তর্গত 'শরৎ' শীর্ষক কবিতাটী 'মানসী'তে (৩য় বর্ষ,

আষাঢ়, ১৩১৮) মুদ্রিত হইয়াছিল। অনুবাদটী অতি সুন্দর—

শরদী কুমুদী সঙ্গে শীতল পবন।
দিগঙ্গনা সুপ্রসন্না হাসে মেঘগণ॥
পঙ্কহীন বসুন্ধরা, সুবিমল জল।
স্ফুটদ্যুতি চন্দ্র তারাচিত্র নভস্তল॥

অসিত নয়ন শোভা হেরি ইন্দীবরে।
কণিত কনক কাঞ্চী, মত্ত হংসস্বরে॥
অধর রুচির শোভা বাঁধুলীর ফুলে।
কাঁদিতেছে ভ্রান্তমতি প্রবাসীর কুলে॥

শশাঙ্কের শোভা রাখি বনিতা বদনে।
মণি মঞ্জীরেতে চারু মরাল নিস্বনে॥
মধুর অধরে রাখি বাঁধুলীর শোভা।
কোথা যায় শরতের রূপ মনোলোভা॥

'রতনচুর'। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রঙ্গলাল ভারতীয় বহুভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি অনুবাদেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায়, বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে, সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায়, উড়িয়া হইতে বাঙ্গালায় তিনি যে সকল অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এইবার আমরা রঙ্গলালের আর একটী অপ্রকাশিত রচনার উল্লেখ করিতেছি। হিন্দী হইতে অনুবাদ করিয়া তিনি রতনচুর নামক একটী কাব্যগ্রন্থ এই সময়ে রচনা করিয়াছিলেন। কোন গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে তিনি উহা প্রকাশের ঔচিত্য সম্বন্ধে সাহিত্যবন্ধুগণের পরামর্শ লইতেন। এই গ্রন্থখানি রাজেন্দ্রলাল প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন নাই বলিয়া উহা প্রকাশিত হয় নাই। রাজেন্দ্রলাল কেন নিষেধ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিয়োদ্ধৃত পত্র পাঠে প্রতীত হইবে ঃ—

My dear Rangalal,

I should have returned the accompanying M.S. long ago, but I was overwhelmed with work and could not think of correspondence. I am no better now but I have stolen to-day for correspondence.

I have now the whole of your translations and admire greatly the elegance with which you have rendered uncouth Hindi into charming Bengali. You fully deserve the title of the Bharatachandra of this century. But I most frankly tell you that you must not print them at all, certainly not in your name. There is a great deal too much of pruriency and not unoften of positive indecency in the originals which your art has failed to gloss over, and people will for certain condemn you and justly for giving them currency. You may accuse me of prudery, but at my time of life I cannot help it and as a friend well conversant with the world I am bound to warn you of the consequences. Your name and fame are public property and every care should be taken of them.

Niru expected you much and went away disappointed. Why did you not come? You are getting unkind.

Yours sincerely
Rajendralala Mitra.

রাজেন্দ্রলালের পরামর্শ অনুসারে রঙ্গলাল উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং উৎকৃষ্ট প্রাচীন কাব্যাদির রস বর্ত্তমান রুচির বিরোধী হইলেও উপভোগ্য বিবেচনা করিতেন। আমরা রঙ্গলালের 'রতনচুর' কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি এবং তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে উহার ভূমিকার খস্‌ড়ারও কিয়দংশ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। সেই কীটদষ্ট খণ্ডিত ভূমিকার যতটুকু পাওয়া গিয়াছে নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"* * ইহাতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন ; কি উদ্দেশ্যে এই হিন্দী কবিতাবলীর ছায়া ধরিয়া বঙ্গীয় সমাজে প্রকাশ করিতেছি।

এই পুস্তক তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হইবে। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম রস পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম ব্যবহার পরিচ্ছেদে ; তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম বৈরাগ্য পরিচ্ছেদ।

এইক্ষণে রুচি রুচি বলিয়া যে একটী কথা উঠিয়াছে তাহাতে অনেকে প্রথম পরিচ্ছেদের কবিতা সকল পাঠ করিয়া ন্যক্কার করিতে পারেন। যদি ন্যাকরা শব্দ ন্যক্কার শব্দের অপভ্রংশ হয়, তবে তাঁহাদিগের ঐ ন্যক্কার ন্যাকরা মাত্র। বাস্তবিক আদিরসে কিছুই মন্দ নাই, তাহা সর্ব্বদেশীয় সাহিত্যের জীবন,—মনুষ্য তদ্বিরহে থাকিতে পারেন না। তবে অনধিকার প্রয়োগ না হয়, তাহাই......"

রতনচুরের কবিতাগুলি সংস্কৃত আদিরসাত্মক উদ্ভট শ্লোকগুলির মত এবং অনেকটা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রস-তরঙ্গিণীর ন্যায়। রস পরিচ্ছেদের কবিতাগুলিই অধিকতর অশ্লীলভাবাপন্ন। আমরা ব্যবহার পরিচ্ছেদ হইতে দুই চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।—

"ইন্দ্রিয়ের স্রোত রোধ সমুচিত নহে।
বাঁধা জলে অবিরত কি দুর্গন্ধ বহে॥"

"বাঁকার নিকটে কেহ নাহি যায় ত্রাসে।
বাঁকা চন্দ্রমায় কভু রাহু নাহি গ্রাসে॥"

"যে খুঁজে সে পায় সুগভীর জলে পশি।
ডুবিবার ভয়ে তীরে রহিলাম বসি॥"

"নেত্র-হীন দেহ যথা নিশি চন্দ্রহীনা।
মেঘ বিনা ধরা যথা, বিপ্র বেদ বিনা।
সেইরূপ হীন প্রাণী হরিনাম বিনা॥"

"পক্ষী পক্ষ বিনা, যথা দন্তী দন্ত চ্যুত।
পতিহীনা সতী, পিতৃ-হীন বেশ্যাসুত॥
সেইরূপ হীন প্রাণী হরিনাম চ্যুত॥"

"নীরহীন কূপ আর ধেনু ক্ষীরহীনে।
দীপহীন গৃহ, তরুবর ফলহীনে।
সেইরূপ হীন প্রাণী হরিনাম হীনে।
স্মর হরিনাম মন কিবা নিশি দিনে॥"

"তরণীতে জলবৃদ্ধি ঘরে বৃদ্ধি ধন।
দুহাতে সেচন কর এই তো শোভন॥"

"দোতলা তেতলা ঘর রথ অশ্ব গজবর
ত্যজ ত্যজ প্রিয় পরিজন।
ত্যজহ সুশীলা দারা ধরি সারমেয় ধারা,
স্বর্গপথে উঠ ওরে মন॥"

"কোথা হতে এলে তুমি যাইবে কোথায়।
কিছু নাহি নিরূপণ হইল হেথায়॥
কেবল এ মধ্য গতি আছে নিরূপণ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য শুন ওরে মন॥"

পদাবনতি ও অবসর গ্রহণ। হাওড়ায় দুই বৎসর কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই রঙ্গলালের কাছারির কতকগুলি নথিপত্র হারাইয়া যায়। শুনিয়াছি তাঁহার নিম্নপদস্থ কোনও কর্ম্মচারীরই দোষে উহা হারাইয়া যায় কিন্তু রঙ্গলালকে ইহার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হয়। তিনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর পুনরায় suspended হন এবং পাঁচশত টাকা মাসিক বেতনের পরিবর্ত্তে তাঁহার জন্য ২০০ মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। রঙ্গলাল দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত রাজকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে এতাদৃশ অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি হইতে এক বৎসর তিন মাসের ছুটী লইয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১১ই এপ্রিল হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ। রঙ্গলাল দীর্ঘ অবকাশ গ্রহণ করিয়া খিদিরপুরে নিজ বাটীতে অবস্থানকালে অলস ভাবে জীবন যাপন করেন নাই। যতদিন লিখিবার শক্তি ছিল তিনি বাণীসেবা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে হুগলীতে অবস্থানকালে তাঁহার মাতুল পুত্র ডাক্তার অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় একটি যাত্রার দল সংগঠিত করিয়াছিলেন এবং রঙ্গলাল তাহার জন্য গীত রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের ও অন্যান্য পারিবারিক দুর্ঘটনার পর অঘোর নাথ যাত্রার দল তুলিয়া দেন। কিন্তু হাওড়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রঙ্গলাল দেখিলেন শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় খিদিরপুরে একটী যাত্রাদল সংগঠিত করিয়া 'সীতার বনবাস' অভিনয় করিতেছেন। রঙ্গলাল শৈশবাবধি যাত্রার পক্ষপাতী

ছিলেন। তিনি নেপালচন্দ্রকে তাঁহার অনুষ্ঠানে উৎসাহ দিতেন এবং সীতার বনবাস নাটকে "অশ্বমেধ যজ্ঞ" তথা 'চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ' সংযোজিত করিয়া দেন। সংস্কৃত কাব্যাদিতে যেরূপ ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগের (onomatopoeia) নিদর্শন পাওয়া যায়, রঙ্গলালের রচনাতেও অনেক স্থলে সেইরূপ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'অশ্বমেধ যজ্ঞে' একটি গানে অশ্বের লম্ফধ্বনি ভাষায় কিরূপ ঝঙ্কৃত হইয়াছে দেখুন—

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল

চলে অশ্ববর দম্ভে, সবেগে লম্ফে ঝম্পে,
অধরাধরা কম্পে, ধরে কে তোরে।
আমি মরদ সেই, ধরে রেখেছি তেই,
অন্যে কে পারে কবে দেখিলে ডরে।
ঝক্ ঝক্ ঝক্, ঝক্ ঝক্ সাজে,
কুলিশ সম তেজে পবন গতি অতি বিবতি অন্তরে।

চন্দ্রকেতু ও লব যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান করিলে রঙ্গলাল বিরচিত নিম্ন লিখিত সংগীত গীত হইত—

মরি কি ঘোর রণ, ছুটিছে প্রহরণ
উঠিছে অনুক্ষণ বিজলী মুখে তার।
দেখ প্রখর রাগে, রঞ্জিত রক্ত রাগে,
যুগল আঁখি ভাগে অরুণ কমলাকার॥
নাচিছে ভ্রূযুগল, যেন ভ্রমর দল,
কমল দলে বিহার করিছে অনিবার।
স্খলিত কেশজাল, গলিত পুষ্পমাল,
ঘর্ম্মে শোভিত ভাল কিবা সে মুক্তাহার॥
প্রহৃত তার সঙ্গে জবা কি ফুটে রঙ্গে
বহিছে সব অঙ্গে রুধির একধার।
বন্ বন্ বন্ বন্ বন্ ঘোরে বিষম সমর ঘোরে
ছাইল খর শরে বনের চারিধার॥

হোলির গান। দোল-যাত্রার সময় নেপালচন্দ্রের অনুরোধে যাত্রায় গীত হইবার জন্য রঙ্গলাল কয়েকটি হোলির গানও বাঁধিয়া ছিলেন। দুইটী সঙ্গীত পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ

হোরির দিনে শ্যাম যদি তোমায় পাই হে—
বনমালী বনফুলে সাজাই হে—
চম্পক সেবতি মল্লিকা মালতী, ফুলেরি পাংখা বানাই হে,—
পাঁচ রাঙ্গা ফুল দিয়ে, বালোর লাগাইয়ে, সোহাগে পাশে বসি
পাংখা হিলাই, আর সাধ মিটাই হে—।

সুর ও তাল - ঐ

কেন গেলাম সই আনিবারে বারি।
দাঁড়ায়ে যমুনাতটে ত্রিভঙ্গ মুরারী॥
আবির গুলাব মারে নন্দলাল, আঁখি হল লাল তারি—
খসিল বসন, কাঁচলি কষণ, লাজ সম্বরিতে নারি—
কি করি মারে পিচকারী।

লক্ষ্মণ বিজয়। রঙ্গলাল এই সময়ে যাত্রার জন্য দুই তিনখানি নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। একখানি নাটকের নাম 'লক্ষ্মণ-বিজয়।' উহা সীতার বনবাসের ন্যায় ভবভূতির উত্তররামচরিত অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। উহার পাণ্ডুলিপি আমরা এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার অপর একখানি নাটক চন্দ্রহংসের পাণ্ডুলিপি ঈষৎ খণ্ডিত অবস্থায় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

চন্দ্রহংস নাটক। বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই নাটক খানির সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার স্থান নাই। আমরা উহা হইতে কয়েকটি গান মাত্র পাঠকগণকে উপহার দিব।

বেহাগ—ধ্রুপদ

পরব্রহ্ম পরমেশং বিভো নির্ব্বিশেষং ত্বংহি আদ্য মধ্য শেষং
নিরাকার নির্ব্বিকার নিরাধার সর্ব্বাধার পরিব্যাপ্ত সর্ব্বদেশং
করুণাময় করুণাবরুণালয় দেহি করুণালেশং
সৃজন পালন লয়, ইচ্ছাধীন সমুদয়, তাপহর ত্রিলোকেশং।

রাগ ছায়ানট—তাল একতালা

শুধু ভাঙ্গা গৃহ দিলি। কালি মা গো!
দিনে দিনে বাঁধন ছিঁড়ে খুলে ঝিলি মিলি॥
এক ঘরে নটী দ্বার, তবু অহে অন্ধকার।
জ্ঞানের আলো নাহি জ্বলে—আঁধারে রাখিলি॥

মালকোষ—একতালা

চলে রঙ্গে ভঙ্গে রঙ্গিণী সঙ্গে লইয়ে সঙ্গিনী,
যেন চঞ্চলতা গেল উদিত হইল সৌদামিনী।
মত্ত মাতঙ্গ গামিনী ধনী, চম্পক বরণী রমণীর মণি,
ঈষদ হাসিনী মধুর ভাষিণী, রূপে রতি সতী অরুন্ধতী জিনি॥

ইমন জলদ তেতালা

ঐ এলো যামিনী নাগিনী, দংশিবারে বিরহিণী।
আকাশের নীল কায়, তারাগণ শোভা পায়,
তারা কভু নহে তারা, চিত্র করা ভুজঙ্গিনী।

শ্বাস ছলে মৃদু বায়ু, হবে বিরহীর আয়ু,
হিমবিন্দু বিষবিন্দু বরিষে কামিনী ॥

বেহাগ একতালা

কি শোভা হেরি, আমরি! কে দেখেছে হেন শোভা গো।
মেঘের শোভা সৌদামিনী, চাঁদে শোভে যামিনী,
এ যে শোভে চাঁদের কোলে তড়িৎ লহরী!
কে ছোট কে বড় রূপে, ভিন্ন নহে কোন রূপে,
সোণাতে মিশিল সোণা, দেখ সবে নয়ন ভরি ॥

হিন্দী দোঁহা। রঙ্গলাল হিন্দী দোঁহাবলীর বড় অনুরাগী ছিলেন। সম্পাদককুলতিলক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় স্মৃতি কথায় লিখিয়াছেন —"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মাতামহকুলের সহিত সংবদ্ধ ছিলেন। আবার অন্য পক্ষে আমার পিসতুতো ভাইয়ের পিসতুতো ভাই ছিলেন। আমি তাঁহাকে 'রঙ্গদা' বলিয়া ডাকিতাম। একবার ভাগলপুর হইতে আসিবার সময়ে হুগলীতে রঙ্গলাল দাদার বাসায় আমরা ছিলাম। তখন তিনি হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আমার কিন্তু সে কথা তেমন ভাল মনে নাই। পরে আমার পৈতার সময় তাঁহাকে সজ্ঞানে প্রথম দেখি। তিনি আমার মুখে হিন্দী দোঁহা চৌপায়ী প্রভৃতি পদ্য ও গাথা শুনিতে ভালবাসিতেন। হিন্দী কবি নরহরি ও ভূষণের দেশাত্মবোধ জ্ঞাপক কবিতা সকল যখন আবৃত্তি করিতাম, তখন বৃদ্ধের সেই রোগক্লিষ্ট মুখও যেন জ্বলিয়া উঠিত। এত তেজ, এত ঝাজ যে বাঙ্গালীর মধ্যে হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে কখনও জানিতাম না।"

রঙ্গলাল অবসর কালে হিন্দী দোঁহা বা কবিতার অনুবাদ করিতেন। আমরা তাঁহার অপ্রকাশিত রচনার মধ্যে প্রায় দুই শত এইরূপ দোঁহার সুললিত পদ্যানুবাদ দেখিতে পাইয়াছি। দুই চারিটী নমুনা দিতেছি—

গঙ্গাস্নান করি যদি মুক্ত হও ভাই।
মৎস্য আর মণ্ডুকেরা বিমুক্ত সদাই ॥
মুণ্ড মুড়াইয়া যদি সিদ্ধ হও ভবে।
লোম ছিন্ন মেষগণ সিদ্ধ হয় তবে ॥

উপবাসে পড়ে থাক আপন আলয়ে।
অনাহারে দিন দশ যায় যাক্ বয়ে।
তুলসী কহেন তবু উদরের তরে।
কখন যেওনা ভাই কুটুম্বের ঘরে ॥

যদবধি অসি না ভেদয়ে তরু তদবধি রহে ছায়া।
কহেন তুলসী উপদেশ বিনা কেমনে কাটিবে মায়া ॥

কেন কাজী উচ্চৈঃস্বরে দিতেছ আজান।
তবে বুঝি, নাই ভাই ঈশ্বরের কাণ ॥
জান নাকি পিপীড়ার পাদক্ষেপ ধ্বনি।
ধ্বনিত তাঁহার কর্ণে দিবস রজনী ॥

নবদ্বার যুক্ত এক সুচারু পিঞ্জরে।
পবনে রচিত পক্ষী সতত বিহরে ॥
কিমাশ্চর্য্য দেখ ভাই! কহেন কবীর।
এতক্ষণে কেনই বা না হয় বাহির ॥

প্রেমের পিয়ালা সেই জন পিয়ে যে দেয় দক্ষিণা শির।
লোভী নাহি পারে,—প্রেম প্রেম করে, কহেন কবি কবীর ॥

নিবেদিকা। রঙ্গলালের এই সকল অপ্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে "নিবেদিকা" শীর্ষক কতকগুলি রসপূর্ণ প্রহেলিকা কবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি, পাঠকগণকে তাহাও উপহার দিতেছি—

অপরূপ কিবা সখি! দেখ কলিকালে।
আকাশেতে এক পদ দ্বিপদ পাতালে ॥
শূন্য হ'তে পুষ্পবৃষ্টি, মন্দাকিনী ধারা।
হে সখি! বামন সে কি?—না সখি!—ফুয়ারা ॥

তাপে তপ্ত চতুর্বর্ণ, করে তাঁর পূজা।
সর্ব্ব শিরোপরে কিবা শোভে অষ্টভুজা ॥
বিপদে বিপদে তাঁরে না চায় কে সাথী।
হে সখি! অম্বিকা না কি?—না সখি, সে ছাতা ॥

প্রশ্ন—হে সখি! শুনহ অই ঘন গরজন।
উত্তর—কহনা সজনি! সে কি হয় নবঘন ॥
প্রঃ আবার দেখহ সখি! উঠে জ্বলি জ্বলি।
উঃ বুঝিলাম, ওলো সই! সেতো বিজলী ॥
প্রঃ আলো আলি! করে সেই কর সুশোভন।
উঃ তবে বুঝি হবে সেই বলয় কঙ্কণ ॥
প্রঃ আবার দেখহ ওষ্ঠোপরি শোভাকর।
উঃ এইবারে বুঝিলাম হইবে বেসর ॥
উপপন্নঃ কেমন চতুরা তুমি! বুদ্ধির ধুকুড়ী।
যা বলিলে কিছু নয়, হয় গুড়গুড়ী ॥

বৈমাত্রেয় বংশ প্রতি অহিত আচারী।
যাহার নির্দ্দেশে মেঘ বরিষয়ে বারি ॥
সহস্র লোচন শোভা অঙ্গেতে প্রচুর।
হে সখি! বাসব সে কি? না সখি ময়ূর ॥

তাহার প্রতাপে তাপে তাপিত সংসার।
কত শত শত গৃহ করে ছার খার॥
জলে না নিভায় তেজ, কাটে তার ঠাঁণ্ডি।
হে সখি অনল সে কি? না সখি সে ভ্রাণ্ডি॥

নীলনিভ ঘটাধারে বান্ধা আছে বারি।
অতি সুশীতল সেই সর্ব্ব তাপহারী॥
অই শুন বজ্র শব্দে বর্ষে অনর্গল।
হে সখি নীরদ সে কি? না লো সোডাজল॥

লজ্জাবতী লজ্জাবশে, প্রচ্ছন্ন কুটীরে।
কতই অমৃত ধরে, সুবর্ণ শরীরে
সহজে সম্ভোগ তার নাহি লভে বঁধু।
হে সখি! নবোঢ়া না কি? না সখি! সে মধু॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে আমি শ্যাম অবতার।
লোকের সুরুচি হেতু আর সদাচার॥
পরেতে গৌরাঙ্গ হই ভক্তির নিধান।
জগতেরে তৃপ্ত করি, করি রসদান॥
গড়াগড়ি ধরাতলে, এই পরিণাম।
হে সখি। কেশব সে কি? না সখি! সে আম॥

সর্ব্ব বর্ণ ভুক্ত সেই নানা দেশে জাত।
ঝলমল তনুরুচি, বিভায় বিভাত॥
মম লজ্জা সজ্জা সই, সেই রক্ষা করে।
দিবানিশি আলিঙ্গিয়ে আছে কলেবরে॥
জন মনোমোহনের সেই মাত্র অস্ত্র।
হে সখি। বল্লভ সে কি? না সখি। সে বস্ত্র॥

অলঙ্কার শাস্ত্র। রঙ্গলাল আর একটা মহা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তারিত ভাবে লিখিত ঐরূপ গ্রন্থ একখানিও নাই দেখিয়া রঙ্গলাল অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটী বিস্তারিত গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই কিন্তু তাঁহার অপ্রকাশিত রচনার মধ্যে এই বিরাট গ্রন্থের যে টুকুর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তাঁহার সঙ্কল্পিত গ্রন্থের বিরাটত্ব উপলব্ধ হয়। কেবল নায়িকাদের প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত প্রকার বিভিন্ন ভাব প্রস্তাবিত গ্রন্থ মধ্যে মনোহর শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে সকল প্রকার অলঙ্কারের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে তাহা দুর্লভ। সুতরাং রঙ্গলাল সংস্কৃত শ্লোক হইতে অনুবাদ করিয়া বা স্বয়ং নূতন নূতন বাঙ্গালা শ্লোক রচনা করিয়া অলঙ্কারের এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা দুই চারিটি নিদর্শন দিতেছি—

যমকালঙ্কার। ভিন্নার্থ বোধক এক প্রকার শব্দ সকল যদ্যপি ক্রমে ক্রমে অর্থের সহিত কথিত হয় তবে যমক হইবেক। উদাহরণ—

রসাল রসাল বনে, আমোদ আমোদ বনে,
পরভৃত রুত তরু তমালে॥
করি গুণ গুণ গুণ, গাইছে বসন্ত গুণ,
মধুব্রত রত ব্রততমালে॥

লেশ। গুণে দোষের আরোপ এবং দোষে গুণের আরোপ হইলে লেশ হইবেক।—

স্বচ্ছন্দে কাননে চরে যে বিহঙ্গচয়।
কথন কি কহে তারা কথা রসময়॥
পিঞ্জরে হইয়া বদ্ধ হে শুক বিহঙ্গ।
কত শত মিষ্ট বাক্যে বিতরিছে রঙ্গ।

বক্রোক্তি। শ্লেষ বা কাকু দ্বারা যদ্যপি পরস্পর কথোপকথনে অন্যার্থ আরোপিত হয়,—তবে বক্রোক্তি হইবেক।—

শ্লেষ—

প্রশ্ন। বলহে পথিক হেথা কি কার্য্যেতে আশা।
উত্তর। কহিতেছি ধ্রুব মম নাহি কোন আশা॥
প্রশ্ন। ভাল ত বুঝিলে প্রশ্ন, কোথায় উত্তর।
উত্তর। যে দিকেতে ধ্রুবতারা সে দিক্ উত্তর॥
প্রশ্ন। মরি মরি কি চাতুরী কত জান ছন্দ।
উত্তর। ছন্দ মঞ্জরীতে মম জ্ঞান নহে মন্দ॥
প্রশ্ন। থাক থাক কাজ নাই অত বাঁকা চাল।
উত্তর। টেনে সোজা কর যদি বাঁকা থাকে চাল॥

ব্যাঘাত। যে বস্তু কর্ত্তৃক যাহার অন্যথা হয়, সেই বস্তু কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার তাহার সংস্থান হইলে তাহাকে ব্যাঘাত কহা যায়।—

যে নয়নে দগ্ধ হেতু হত মনসিজ।
সেই নয়নেতে পুনঃ প্রাণ প্রাপ্ত নিজ॥
অতএব মহেশ জয়িনী যারা ভাই।
হেন বামনেত্রাগণে বলিহারি যাই॥

ব্যাজস্তুতি। নিন্দা দ্বারা স্তুতি এবং স্তুতি দ্বারা নিন্দা বুঝাইলে ব্যাজ স্তুতি হইবেক।—

যে হয় তোমার ভক্ত অনুরক্ত জন।
সে পায় অনন্ত সুখ স্বর্গে নিকেতন॥
অসহায় যদি তুমি না হও সহায়।
তবে তব দীননাথ নাম কেন হায়॥

বিষম। কারণ হইতে যদি বিরুদ্ধ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, এবং কার্য্যারম্ভ পরে তাহা নিষ্ফল হওনান্তে যদ্যপি অর্থোৎপত্তি হয়, এবং দ্বিবিধ বিরূপ পদার্থের একত্রে সমাবেশ হয় তবে বিষমালঙ্কার হইবেক।—

নিধি নিধি জলনিধি সৃজন করিল বিধি,
রত্নাকর নাম ভূমণ্ডলে।
ডুবিলাম সাধ করে, রত্নলাভ থাক দূরে,
মুখ পুড়ে গেল লোণা জলে॥

এই গ্রন্থে রঙ্গলাল সংস্কৃত কাব্যে প্রচলিত নানা প্রকার ছন্দের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা শ্লোকাদিও রচনা করিয়া ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য রঙ্গলালের এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ এবং প্রকাশিত হয় নাই।

পক্ষাঘাত ও পরলোক গমন। রঙ্গলাল রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর মাতৃভাষার সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করিবার যে সাধু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, নিয়তি তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। মধ্যে একটু সুস্থ হইয়া ইনভ্যালিড চেয়ারে বসিয়া একটু একটু বেড়াইতেন এবং অভ্যাসমত কবিতাদিও লিখিতেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হইয়া তিনি একবারে শয্যাগত হইলেন এবং দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১২৯৪ সালের ৩১শে বৈশাখ শুক্রবার গঙ্গাতীরে নয় রাত্রি বাস করণানন্তর অমৃত-ধামে প্রস্থান করিলেন।

উত্তর পুরুষগণ। রঙ্গলালের দুই পুত্র জহরলাল ও পান্নালাল তাঁহার মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই এখন পরলোকে।

জহরলালের পুত্র চিক্কণলাল বেঙ্গল নাগপুর রেল-ওয়ে অফিসে হিসাবরক্ষক ছিলেন এবং কয়েক মাস হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। চিক্কণলালের দুই পুত্র শিবলাল ও শঙ্করলাল বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে অফিসেই কর্ম্ম করেন। রঙ্গলালের কনিষ্ঠ পুত্র পান্না-লালের এক পুত্র মোহনলাল এখনও জীবিত আছেন। তিনি আলিপুর জজ আদালতে ওকালতী করেন। রঙ্গলালের পুত্র কন্যা ও তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত বংশলতা হইতে পরিদৃষ্ট হইবে :—

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

CALCUTTA
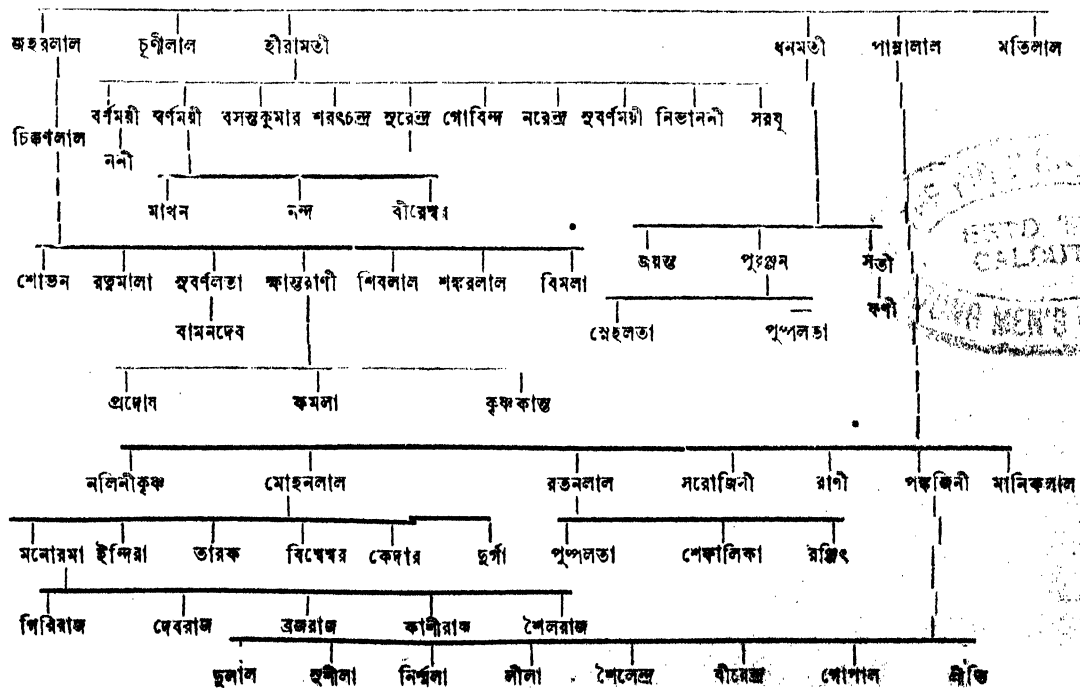
চরিত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাস। রঙ্গলাল সরল, অমায়িক ও উদারপ্রাণ ছিলেন। তিনি অসাধারণ বন্ধুবৎসল ছিলেন এবং পরকে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার আতিথেয়তার পরিচয় নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং আমরাও তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের গোচরীভূত করিয়াছি। সাহিত্য ও সঙ্গীতের আলোচনায় তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। নানা দেশের ইতিহাস ও কাব্যপাঠে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ভারতের নানা ভাষা ও নানা জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন এবং সাহিত্যের উন্নতিবিধান করিয়া জাতিকে ও দেশকে গৌরবের সমুচ্চ শিখরে স্থাপন করিতে আজীবন চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ধর্ম্ম-বিশ্বাসে তিনি প্রকৃত হিন্দু ছিলেন কিন্তু আচারে তিনি অতি রক্ষণশীল ছিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগের প্রভাব তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনার কোনও কোনও স্থলে নিরাকার একেশ্বরবাদিতায় বিশ্বাসের নিদর্শন পাওয়া যায়; যথা,—

"যিনি নিরাকার কি আকার তাঁর" ইত্যাদি
"যিনি হরি, তিনি হর, তিনি প্রজাপতি।
তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী তিনিই পার্ব্বতী॥

বঙ্গসাহিত্যে রঙ্গলালের স্থান। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ সমূহে রঙ্গলালের কাব্যাদি বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। নির্ভীক, সমপক্ষপাতী, ও সুপণ্ডিত সমালোচকগণ তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের মন্তব্যসহ যথাস্থানে প্রকটিত হইয়াছে। ঈশ্বরগুপ্ত, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রামগতি, রাজনারায়ণ, চন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথ, কৃষ্ণদাস, লাল-বিহারী, সীটনকার প্রভৃতি মহামনীষিগণ রঙ্গলালের কাব্য সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে বাঙ্গালার কিরূপ শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আজ বাঙ্গালী যদি রঙ্গলালের কবিতার উপযুক্ত সমাদর না করেন, সে দোষ রঙ্গলালের নহে, সে দোষ আমাদেরই।

রঙ্গলাল বাঙ্গালা সাহিত্যকে কি দিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান কোথায় আজি তাহা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে।

রঙ্গলাল সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডীয় কাব্যের সুরুচিপূর্ণ রসধারা আনিয়া মুমূর্ষু বাঙ্গালা কাব্যকে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে আর কেহ এরূপ সাফল্যসহকারে এই কার্য্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বরেণ্য কবিগণ তৎপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যল্প কালের মধ্যে কিরূপ অপূর্ব্ব সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। রঙ্গলালকে সেই জন্য বহু কবির গুরু স্থানীয় বলিতে পারা যায়। তিনি 'কবির কবি'।

দ্বিতীয়তঃ, রঙ্গলাল প্রতীচ্য কাব্যের নিকট তাঁহার ঋণ অসঙ্কোচে স্বীকার করিলেও তিনি এমন কোনও বিজাতীয় ভাব স্বদেশীয় সাহিত্যে আনয়ন করেন নাই যাহাতে আমাদের জাতীয়তা নষ্ট হয়। যে দিনে আধুনিক সাহিত্যিকগণ বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকরণে নবসাহিত্য রচনার চেষ্টায় নিযুক্ত, এবং প্রতিভাশালী লেখকগণও স্বদেশীয়গণকে তুচ্ছ করিয়া বিদেশীর যশোমাল্য লাভ করিবার ও তাঁহাদের মনোহরণের জন্য উন্মত্তপ্রায়, তখন রঙ্গলালের এই বিশেষত্বটুকুর বিষয় সুধীগণের সতর্ক আলোচনার যোগ্য বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত যাঁহার কোনও পরিচয় নাই তিনি রঙ্গলালের কাব্য পড়িয়া ধারণাই করিতে পারিবেন না রঙ্গলাল বিদেশীয় সাহিত্যের নিকট ঋণী। মাইকেল, নবীনচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক রচনা পড়িলেই বুঝা যায় তাঁহারা বিদেশীয় সাহিত্যের নিকট কতদূর ঋণী। ইহার কারণ এই যে, যে সকল ভাব বিশ্বজনীন বা যে সকল ভাব আমাদের জাতীয়তার পরিপন্থী নহে তাহা বিদেশীয় হইতে স্বদেশীয় সাহিত্যে আনয়ন করিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাষায় বলিতে গেলে—সাহিত্যের জাতি মারা যায় না। "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" প্রভৃতি পদ যে সাহিত্য হইতেই আনীত হউক না কেন আমরা বলিব উহা বাঙ্গালীর জাতীয় কবির হৃদয়-কন্দ হইতে ধ্বনিত হইয়াছে!

তৃতীয়তঃ, স্বদেশীয় সাহিত্যে, কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যে নহে, সংস্কৃত, উৎকলীয়, হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় সাহিত্যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রঙ্গলালের কাব্যকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বগামীদের অনেকের রচনা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। রঙ্গলাল বিশুদ্ধ সুরুচিসম্পন্ন রচনাদ্বারা অশ্লীলতার স্রোতে ভাসমান কাব্য-সাহিত্যের গতি ভিন্নমুখে প্রধাবিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কাব্যের জাতীয় ধারা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের সলীলগতি ছন্দঃ সমূহ, নানা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার সমস্তই দেশীয় সাহিত্যের ধারার অনুসরণ করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, রঙ্গলাল এমন কোনও রচনা প্রকাশ করেন নাই, যাহাতে পাঠকের মন উন্নত না হইয়া ক্ষণকালের জন্যও মলিন হয়। তাঁহার কাব্য পাঠ করিয়া কাহার হৃদয় স্বদেশ প্রেমাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিবে না, কাহার হৃদয় সতীর মহিমময়ী মূর্ত্তির নিকট অবনত হইবে না? রঙ্গলালের কাব্য পাঠে কত পাঠকের হৃদয়ে দেশাত্মবোধ ও আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে!

আচার্য্য লালবিহারী দে

শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

THE BOYS' AND YOUNG MEN'S INSTITUTE ESTD. 1900 CALCUTTA
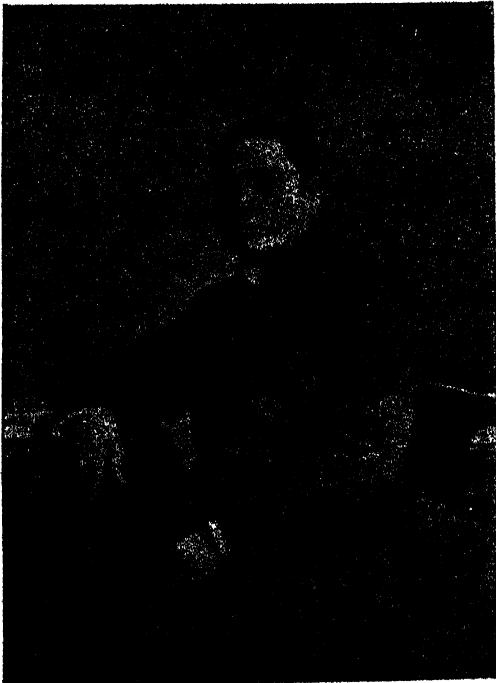
বাঙ্গালার সৌভাগ্য তাহার নবযুগের প্রারম্ভে এইরূপ কবির আবির্ভাব হইয়াছিল—যিনি প্রেমের পরিবর্ত্তে ছদ্মবেশ ধারিণী লালসার স্তুতিগান না করিয়া, সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ চণ্ডীদাসের দেশে আন্তরিকতা শূন্য ও অর্থহীন প্রলাপের অবতারণা না করিয়া, জাতিকে মহান্ ভাবে প্রবুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—যিনি প্রকৃত কবিদের ন্যায় বলিতে পারিতেন—

"আমরা জীবন গড়ি
মরণে মধুর করি,—
নিরাশায় দেই আশা,
শিশুরে হৃদয়ে টানি,
রমণীরে দেবী মানি,
যুবজনে ভালবাসা।"

আমরা প্রস্তাবারম্ভে রঙ্গলালকে উষার সহিত তুলনা করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের এক অন্ধকারময় যুগের অবসানে তিনি উষার পবিত্রতা, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য ও শান্ত মাধুর্য্য আনিয়াছিলেন। কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল একটি সনেটে রঙ্গলালের প্রতিভার এই স্নিগ্ধ আলোককে সুধাকরের নির্ম্মল কিরণের সহিত তুলনা করিয়াছেন—

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

"মথিয়া কবিত্ব-সিন্ধু বঙ্গ-কবিগণ
লইল বাঁটিয়া সুধা, অমরা-বিভব।
রঙ্গলাল নিল শশী—নির্ম্মল কিরণ,
নিল ঐরাবতে মধু দ্বিতীয় বাসব;
হেম নিল উচ্চৈঃশ্রবা—গতি অতুলন,
নবীন ধরিল বক্ষে কৌস্তুভ দুর্ল্লভ;
বিহারী করুণা-লক্ষ্মী—করুণ লোচন,
রবি নিল পারিজাত—ত্রিদিব-সৌরভ।"

কিন্তু কবি-প্রতিভার তুলনামূলক সমালোচনায় কোনও ফল নাই। বাঙ্গালা-কাব্য-সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রারম্ভে, অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত কাব্য-সাহিত্যের উদ্ভবকালে, যাঁহার প্রতিভা কাব্য-সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, তিনি চির দিনই সাহিত্যের অগ্রণীর সম্মান প্রাপ্ত হইবেন। যখন ইংরাজী শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালী বাঙ্গালা কাব্যের সেবা দূরে থাকু, বাঙ্গালা কাব্যকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন, যখন মাইকেলের ন্যায় প্রতিভাশালী কবি ইংরাজী কাব্য রচনায় উন্মুখ হইয়া ছিলেন, তখন যাঁহার সাধনা নব্য-বাঙ্গালীকে মণি-পরিপূর্ণ মাতৃ-

রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ নিত্যকালী দেবী | প্রপৌত্র শিবলাল প্রপৌত্রী সুবর্ণলতা | পৌত্র চিকণলাল প্রপৌত্রী-পুত্র বামনদেব | প্রপৌত্র শঙ্করলাল প্রপৌত্রী বিমলা | চিকণলালের সহধর্ম্মিণী যোগমায়া দেবী

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল

ভাষারূপ খনির প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাঁহার নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন সসম্মানে উল্লেখিত হইবে। নির্ভীক সংবাদপত্র সম্পাদনে, জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুমধুর সঙ্গীত রচনায়, বাঙ্গালার প্রথম (Mock-heroic) কবিতা, নানা ভাষা হইতে সদ্ভাব পূর্ণ কবিতার অনুবাদ দ্বারা মাতৃ-ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করণে, স্বদেশ-প্রেমিক বীর ও সতী রমনীগণের কীর্ত্তি কাহিনী শুনাইয়া জাতিকে সুমহান ভাবে উদ্বোধিত করণে রঙ্গলাল যে অদ্ভুত কৃতিত্ব, অপূর্ব্ব ক্ষমতা ও মুগ্ধকরী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা চিরদিন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে সগৌরবে লিপিবদ্ধ হইবে তিনি বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম যুগে যে অতি উচ্চ আসন প্রতিভাবলে অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, কোন ঐতিহাসিক যদি আজি তাহার পরিচয় দিতে বিস্মৃত হন তাহা হইলে তিনি সত্যের ঘোর অমর্য্যাদা ও অপলাপ করিবেন।

উপসংহার। বাঙ্গালা কবিত্বের ধারা বহুধা বিভক্ত হইয়া এক্ষণে নানা দিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং নানা রূপ ধারণ করিয়া কাব্যরসিকগণের আনন্দ বর্দ্ধিত করিতেছে। প্রথমে যে সংকীর্ণ পথে উহা গিরি-নির্ঝরিণীর ন্যায় রজত-সূত্রাকারে ঝরিতেছিল, এখন তাহা লোকের আর কৌতুহল দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এখন শত শত নদ-নদী সাগরোদ্দেশে প্রধাবিত হইয়া দশ দিক প্লাবিত করিতেছে। লোকের দৃষ্টি স্বভাবতঃ নূতন বস্তুর অন্বেষণে ব্যাপৃত। নূতন নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাই সকলে কৌতূহলের সহিত দর্শন করিতেছে। যাহা পুরাতন তাহা পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে এবং ক্রমশঃ দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত হইতেছে। যাহা এক কালে অতি আদরের বস্তু ছিল, তাহা ক্রমে আবর্জ্জনার মধ্যে পতিত হইতেছে। যাহা নূতন তাহাই প্রিয়, যাহা পুরাতন তাহাই হেয় বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু যাহা বহু দিনের পুরাতন তাহা আবার কালের গতিতে কখন কখন পরিচয়াভাববশতঃ নূতন হইয়া দেখা দেয়। তখন তাহা আবার সমাদর লাভ করে। যাহা যথার্থ সুন্দর তাহা কখনও একেবারে লুপ্ত হইবার নহে। আমাদের বিশ্বাস, কবি রঙ্গলালের কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া চিরদিন পরিগণিত হইবে। আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেও পুনরাবিষ্কৃত হইয়া পুনরাদৃত হইবে। আজি কালিকার ক্ষণভঙ্গুর জড়োয়া গহনার ন্যায় বিবিধ বর্ণের মণি-খচিত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য-সমন্বিত কবিতার সহিত একাসন না পাইলেও, সেকালের খাঁটি সোণার মোটা গহনার ন্যায় উহার মূল্য কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না।

সমাপ্ত

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

পাথর-পুরীর পথে

বহুদিন হইতে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে অজন্তা ও ইলোরা দেখিয়া আসিব। ভগবৎ কৃপায় বহুদিনের আশা ফলবতী হইল। দক্ষিণ বেরারে আমার পুত্রের স্থিত কার্য্যস্থান। স্থানটী রেলওয়ে হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে। অজন্তা এখান হইতে ২১০ মাইল। রেল না থাকিলেও পূর্ব্বে এস্থানটী জেলার সদর ছিল। এখন ইহা একটি মহকুমা মাত্র।

১২ই জুন আমাদের অজন্তা যাওয়ার দিন স্থির হইল। দুইটী ভাল মোটর লরী ভাড়া করা হইল। সঙ্গে রান্নাবান্নার বাসন পত্র, চাল ডাল নুন, মশলার গুঁড়া, তেল, ঘি, আলু, ষ্টোভ সব গুছাইয়া লইলাম। থালার পরিবর্ত্তে শাল পাতা লইলাম। তা ছাড়া অনেক খানি খাবার তৈরী করিয়া লইলাম। একটী ছোট তাঁবুও সঙ্গে লওয়া হইল।

আমাদের গাড়ী দুই খানি বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া লইয়া, তাহার মাঝখানটী তক্তা দিয়া জুড়িয়া তাহার উপরে সুকোমল বিছানা পাতা হইয়াছিল। ১২ই জুন রবিবার বেলা দেড়টার সময় আমরা দুর্গা স্মরণ করিয়া মোটরে উঠিয়া বসিলাম।

১২ মাইল দূরে মাল গাঁও। এখানে প্রকাণ্ড একটি কলাবাগান দেখা গেল। এদেশে পুষ্করিণী নাই বলিলেই চলে, দুই একটী প্রাচীন মন্দির সংলগ্ন বাঁধানো পুষ্করিণী দেখিয়াছি মাত্র। কিন্তু তাহার জল ব্যবহার করা দূরে থাকুক, স্পর্শ করিতেও ইচ্ছা হয় না। এ দেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইঁদারা, তাহা হইতে বলদ দ্বারা চামড়ার মশকে করিয়া উত্তোলিত জল এই সকল বৃহৎ কলা পেঁপে ও কমলা লেবুর বাগানে সেচন করা হয়। কূপকে এ দেশে বাউড়ী বলে।

পথের দুই পার্শ্বে বাবলার শ্রেণী, মাঝে মাঝে নিম বট, শিরিষ বৃক্ষও আছে। দুই দিকের বিশাল প্রান্তর পলাশ বৃক্ষে পূর্ণ। এখন ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, নিদাঘ-তাপে পাতা গুলিও পিঙ্গল বর্ণ হইয়া ক্রমে ঝরিয়া পড়িতেছে।

মনসা ও ফণি মনসার বেড়া দিয়া বাগান গুলি ঘেরা, এত ঘন যে ছাগলটীও ঢুকিতে পারে না। কিন্তু শুনিতেছি, ইহার মধ্যে শূকর বাঘ ও সাপ বাস করে।

মাল গাঁও হইতে ৮ মাইল দূরে চান্দস নামে একটী গ্রাম। এখানে একটী ডাক বাংলা আছে। চান্দসের প্রকৃত নাম চণ্ডেশ্বর। চণ্ডেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি একটী কুণ্ডের মধ্যে। একটি ছোট স্রোতঃস্বিনীর এখানেই উৎপত্তি হইয়াছে। স্থানটী ছায়াশীতল, অতি মনোরম, দেখিলে তপোবনের কথা মনে হয়। শুনিলাম কুণ্ডের মধ্যে সাপ থাকে। দেবতার মাহাত্ম্য এমন যে গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা সাপকে হাত দিয়া সরাইয়া জল নেয়, সাপ কোন অনিষ্ট করে না।

মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তর মধ্যে শ্যামল ছায়া বেষ্টিত লোকালয়—বেশ সুন্দর বোধ হইতেছে। যদিও গৃহ গুলির কোনও সৌন্দর্য্য নাই, তবুও অজানার মোহে আকৃষ্ট করিতেছে।

বেলা ৩টার সময় মেহকর নামে একটী মহকুমা পড়িল। ৪০ মাইল আসিয়াছি। সেদিন প্রকাণ্ড হাট ছিল। বেলা ২টা ২॥টার সময় হাট বসে। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরে তাতিয়া পুড়িয়া অনাবৃত স্থানে সকলে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। এমন অসময়ে হাট বাজার আর কোথাও দেখি নাই। বাজারে বিস্তর পাকা আম দেখিলাম।

এখানে আমাদের মন্দির দেখার কথা ছিল। এ দেশে মন্দিরগুলি দুর্গের মত সুউচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত।

আমাদের গাড়ী দুই খানি মন্দিরের সিংহদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। নদীর উচ্চ পাড়ে বিস্তৃত স্থান ঘিরিয়া মন্দির প্রাঙ্গণ। মন্দির-চূড়া স্বর্ণ-মণ্ডিত। স্থাপয়িতা একজন ধনী মাড়োয়ারী। তিনি নাকি দেব-সেবার জন্য এক লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দিয়াছেন। মন্দির-সংলগ্ন একটী দাতব্য ঔষধালয় আছে। মন্দির দ্বারে যাইয়া দেব দর্শন করিলাম।

কৃষ্ণবর্ণের কষ্টি পাথরে নির্ম্মিত শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম

শোভিত অতি সুন্দর, বৃহৎ বিষ্ণু মূর্ত্তি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। এদেশে বিষ্ণু দেবের নাম বালাজী। বৃহৎ মূর্ত্তির অনুরূপ একটী মাঝারি ও একটী ছোট মূর্ত্তি দুই পার্শ্বে রক্ষিত আছে।

সম্মুখে তিন চারি শত লোক বসিতে পারে এরূপ বৃহৎ নাট মন্দির। কাষ্ঠ নির্ম্মিত, কারুকার্য্য করা উচ্চ স্তম্ভের উপর ছাদ দেওয়া আছে। এদেশে মন্দিরে প্রায়ই কীর্ত্তনাদি হয়, সেই জন্য এই রূপ বন্দোবস্ত। আশ্চর্য্যের বিষয়, মন্দিরে চারিটী জানালা আছে। ঠাকুরের দুই পার্শ্বে দুটী কবাট বিশিষ্ট জানালা, দর্শনের সময় খুলিয়া দেওয়া হয়। সম্মুখের দ্বারের দুই পার্শ্বে পাথরে জালি কাটা পুরাতন প্রথায় নির্ম্মিত গবাক্ষ থাকায় দেব-দর্শনার্থী বহু লোকের সমাগম হইলেও দর্শনের অসুবিধা ঘটে না।

মেহকরের বিষ্ণুমূর্ত্তি

প্রণামীর জন্য একটা কাঠের বাক্স রাখা আছে, উপরে কাটা, দোকানে যেমন থাকে। শুনিলাম ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কোনও ব্যক্তি বাড়ী নির্ম্মাণ জন্য বনিয়াদ খনন করিবার সময় একটী বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত সিন্দুক পান, তাহার ভিতর এই দেবমূর্ত্তি সযত্নে রক্ষিত ছিল। পরে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ায় পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সম্ভবত মুসলমানদিগের অত্যাচার কালে এই মূর্ত্তি মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত করা হইয়াছিল। আমরা কিছু প্রণামী দিয়া দর্শন প্রদক্ষিণ সারিয়া মোটরে আসিয়া উঠিলাম। খুব উচ্চ স্থানে অবস্থিত বলিয়া মন্দিরটি অনেক দূর অবধি দেখা গেল। সহরখানি বেষ্টিত, অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণে মণ্ডিত মন্দিরটি গাছ পালার আড়ালে চমৎকার দেখাইতেছিল। ভাবিতেছিলাম কবে কতদিন পূর্ব্বে কোন্ ভক্ত শিল্পী এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কত মহোৎসবের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কত প্রার্থনা কত অশ্রু নিবেদন ভক্তেরা আশ্রিতেরা জানাইয়াছে, কত পূজা করিয়াছে। যখন চারিদিকে অত্যাচারের প্রবল বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, বিধর্ম্মীরা শুধু ধন মান প্রাণ লইয়াও তৃপ্ত হয় নাই, আরাধ্য দেবতাকে পর্য্যন্ত ভগ্ন চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছে, মল মূত্রে অপবিত্র করিয়াছে, সে কঠিন অগ্নি পরীক্ষা মধ্যে, কোন্ ভক্ত তাহার প্রিয়তম আরাধ্য দেবতাকে রক্ষা করিয়াছিল, মা যেমন নিজের শিশুটীকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করে তেমনই করিয়া। তার মনে এই আশা ছিল এই দুর্দ্দিনের মেঘ কাটিয়া গেলে, ভবিষ্যৎ কালে নিশ্চয় আবার দেবতা উঠিবেন, আবার ভক্ত পূজকে তাঁহার পূজা করিবে।

নানা চিন্তায় তন্ময় হইয়া ছিলাম, ইতিমধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র কহিয়া উঠিল, "বড় দা, হরিণ হরিণ।"

দুইখানি মোটরই পথিমধ্যে থামিয়া গেল। হরিণের দেখা পাইলে শিকার করা হইবে, এই উদ্দেশ্যে একটী বন্দুক ও একটী রাইফেল প্রস্তুত ছিল

বড় ও মেঝ ছেলে দুইটী নামিয়া পড়িয়া অস্ত্রসহ পাহাড় পথে চলিল। ২২।২৩টী হরিণ দুই ভাগে প্রান্তর মধ্যে চরিতেছে দেখা গেল।

মোটর দুখানি দুধনা নদীতে আটকাইয়া গিয়াছে

আমি একবার ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করিলাম, অনর্থক নিরীহ জীব হত্যার প্রয়োজন নাই। পুত্র জানাইল, মায়েদের এইরূপ দুর্ব্বলতাতেই নাকি ভারতবর্ষ রসাতলে গিয়াছে, বৈষ্ণবী মত ত্যাগ করিয়া এখন আমাদের শক্তি-উপাসক হওয়ারই অধিক প্রয়োজন।

মৃগযূথের অনুসরণ করিয়া পুত্রদ্বয় ক্রমে পার্ব্বত্য-প্রান্তরের ঢালু পথে অদৃশ্য হইয়া গেল। হরিণরাও বঙ্কিম-গ্রীবা হেলাইয়া বোধ করি মোটর দেখিতে পাইয়াছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া পলায়নপর হইল। তাহারা লম্ফে লম্ফে নয়নান্তরালে চলিয়া গেল। প্রায় ২০ মিনিট অতীত হইলে দুইটী বন্দুকের শব্দ পাওয়া গেল। আমাদের অন্য মোটর চালক ছোটে মিঞা জাতিতে মুসলমান, "সাবাস্" বলিয়া উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল। এবং হরিণের প্রাণ বিয়োগের পূর্ব্বে তাহার গলদেশ ছিন্ন করিয়া "হালাল" করিয়া খাইবে, এই সদিচ্ছা লইয়া ছুরিকা হস্তে প্রান্তর পথে দ্রুতগতি নামিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রান্ত পুত্রদ্বয় ঘর্ম্মাপ্লুত দেহে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের বিশ্বাস, হরিণের গাত্রে গুলি নিশ্চয় লাগিয়াছে, তবুও হরিণ পলাইয়াছে। যাহাই হউক আমি মনে মনে একটু খুসীই হইয়াছিলাম, একটা মৃত দেহ সঙ্গে করিয়া পথ চলা বড়ই গ্লানিকর হইত।

আবার মোটর চলিল। সায়াহ্নের রক্তিম আভায় আকাশ পথে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে।

গোল গোল ক্ষুদ্র বৃহৎ ধূসর বর্ণের প্রস্তরখণ্ড দুই পার্শ্বের পার্ব্বত্য প্রান্তরে যেন ছিটানো রহিয়াছে। মোটর উচ্চ পথে ক্রমে উঠিয়া চলিতেছে। কিছুদূর আসিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় পূর্ণা নদীর সেতু পার হইলাম।

অনেকগুলি মাল বোঝাই গরুর গাড়ী তখন পুলের উপর দিয়া এপারে আসিতেছে। পুলের দুইধারে কোন বেড়া নাই, সে জন্য আমার মনে অতিশয় ভয় হইয়াছিল। মোটরের শব্দে বলদগুলি যদি ভয় পাইয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠে, নদীবক্ষে পড়িয়া একটা শোচনীয় কাণ্ড ঘটিবে। ঈশ্বর কৃপায় আমরা নিরাপদে পার হইয়া চলিলাম।

এখন আমরা বুলদানার ভিতর দিয়া যাইতেছি। দৃশ্য বেশ মনোরম। খেজুর বৃক্ষের শ্রেণী দেখা যাইতেছে। এ দেশের লোকে ইহা হইতে গুড় প্রস্তুতের প্রণালী জানে না। ছিন্দি বলিয়া এক প্রকার হাল্কা মদ বা তাড়ির মত জিনিষ প্রস্তুত করে। আর ইহার পাতা হইতে চাটাই, সমার্জ্জনী, বিবাহের বর কনের টোপর প্রভৃতি প্রস্তুত করে শুনিলাম।

দুইটী শুষ্ক নদী পার হইলাম। মাঝে মাঝে গ্রাম পড়িতেছে। এ দিককার প্রত্যেক গ্রামেই মৃত্তিকা নির্ম্মিত কেল্লা দেখিতেছি। বৃহদাকারে নির্ম্মিত। দেখিয়া মনে হয় বহু পুরাতন। বেরারের প্রতি গ্রামে ছোট বড় মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গ আছে, এদেশে ইহার নাম "গড়ি" বলে। বহু পরিশ্রমে এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কারণ জল এ দেশে দুর্লভ। এদেশের লোক সাধারণতঃ অলস প্রকৃতির। কাযেই কত বড় অরাজকতা যে এই সকল বিরাট কার্য্যকে সম্ভব করিয়াছিল, তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে। মন্দিরগুলিও

বোধ হয় মুসলমান ও পিণ্ডারী দস্যুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুরক্ষিত করা হইয়াছিল।

অস্তাচলে তপন দেবের ক্ষীণ রক্তিম রশ্মিটুকু ধীরে ধীরে ডুবিয়া গিয়া রাত্রি সমাগত হইল। আজ শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইলেও চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিল। সেইজন্য আকাশ ম্লান জ্যোৎস্নায় আধো অন্ধকার হইয়া আছে। মোটর দুইটী একটী জনপূর্ণ স্থানে উপস্থিত হইল। নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, স্থানটীর নাম "দেওলগাঁও রাজা"। শুনিলাম, ইহা মহারাষ্ট্র আমলের একটী পুরাতন সহর।

এখানে রাত্রে আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। এখানকার থানার সাব ইনস্পেক্টরের সহিত দেখা করার জন্য ও পথের সংবাদ জানার জন্য মোটর থানার কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিল।

উনি ও বড় ছেলে সাব ইনস্পেক্টরের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁর মুখে শোনা গেল অজন্তা আরও ১১০ মাইল দূরে। ইতিমধ্যে আমরা ১০৬ মাইল আসিয়াছি।

মোটর ঠেলার চিত্র

দারোগা জাতিতে মুসলমান, বেশ হাসি হাসি শান্ত চেহারা। তিনি আমাদের খুব খাতির অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি থানায় প্রকাণ্ড একটী ঘর আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। আমরা বিশ্রাম আশায় মোটর হইতে নামিয়া পড়িলাম। জিনিষপত্র মেঝেতে নামানো হইল। ঘরের মেঝেতে আমাদের ও ছোট ছেলেদের জন্য বিছানা পাতা হইল। বড় ও মেঝ ছেলে এবং উনি বাহিরে দড়ির খাটে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। আধ মাইলের মধ্যে পাহাড়, থানার অতি নিকটে বলিয়া মনে হইতেছে। শীত অনুভব হইতেছে। রাত্রে ব্রাহ্মণ খিচুড়ী ও আলু ভাজা রন্ধন করিল। তাহাই আহার করিয়া সকলে শয়ন করিলাম।

ভৃত্যদের বলিয়া রাখা হইল, ভোর পাঁচটায় উঠিয়া আবার অতি শীঘ্র আহারাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সঙ্গের এলার্ম ঘড়িতে রাত্রি চারিটায় সময় নির্দ্দেশ করিয়া এলার্ম দেওয়া ছিল, এলার্ম্মের ঘণ্টায় অন্ধকার থাকিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা একে একে সকলে উঠিয়া পড়িলাম। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া সকলে স্নান করিয়া লইলাম। থানার কম্পাউণ্ডেই বৃহৎ ইঁদারা, জল তত ভাল নয়। এবং জ্যৈষ্ঠ মাস বলিয়া সামান্য জল আছে। ঠিক ৮টার সময় আহারাদির পরে মোটরে জিনিষপত্র তুলিয়া লওয়া হইল।

অজন্তার পথ প্রদর্শক একটী ভাল লোক দিবার জন্য সাব ইনস্পেক্টর ঔরঙ্গাবাদ থানার সাব ইনস্পেক্টারের নামে পত্র দিলেন।

আমরা এখানকার সহর ও শিবাজীর মাতৃবংশ স্থাপিত দেবমন্দির দেখিতে চলিলাম।

সহরের প্রবেশ পথে ও বহির্গমন পথে দুইটী পুরাতন সিংহদ্বার আছে। চতুর্দ্দিকে ধ্বংসাবশেষ পুরাতন প্রাচীর। সিংহদ্বারের উপরে নহবৎখানা গৃহ ভগ্নপ্রায় হইয়া আছে। বৃহৎ প্রাচীন কেল্লা ইষ্টক ও প্রস্তরে নির্ম্মিত। একদিক ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সেই স্থানটী মৃত্তিকা দ্বারা পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছিল মনে হয়।
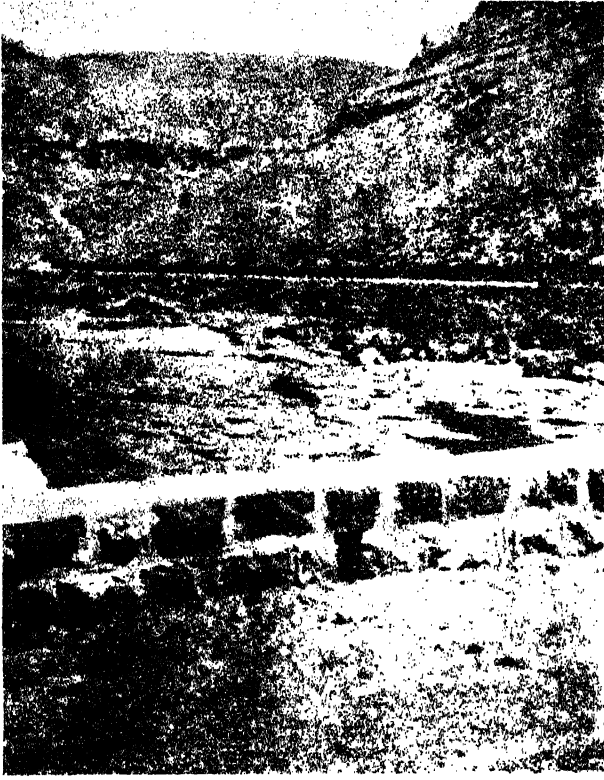
অজন্তা গুহায় যাইবার পথ—পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া নদীর ধার দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে

আমাদের কেল্লা দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কেল্লার সিংহদ্বারে তালা বন্ধ দেখিলাম। শিবাজীর মাতুল বংশের দত্তাজী রাও যাদব বংশের রাজা কেল্লাতে বাস করিতেন। সম্প্রতি এখন নাকি অন্যত্র বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। শিবাজীর মাতা জীজাবাই "দেওলগাঁও রাজা" হইতে ৬ মাইল দূরে সিন্দখেড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাদব বংশের রাজধানী তখন সেখানেই ছিল।

মন্দিরটী বাজারের মধ্যে অবস্থিত। বাজারের পথ পুরাতন আমলের চৌকা পাথর দিয়া বাঁধানো। মন্দির-তল শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত। তাহাতে পুরাতন আমলের টাকা গাঁথা আছে। দেবমূর্ত্তি ক্ষুদ্র, ঠাকুরের মস্তকে একটী সবুজ রঙের মণি আছে। অনেক স্বর্ণালঙ্কার পরানো আছে। পূজার বাসন পত্র রৌপ্য নির্ম্মিত। শুনিলাম এদেশে অনেক ব্যবসায়ী বালাজীর নামে ব্যবসা চালায়, ও নিষ্ক্রিয় অংশীদারের অংশ স্বরূপ লাভের কিছু অংশ দেবতার নামে রাখে। দেওয়ালীর পর নূতন খাতা খুলিবার সময় বহু অর্থ এই ভাবে মন্দিরের ভাণ্ডারে আসিয়া পৌঁছায়। বালাজী এখানে একটী দোকানদার। সুতরাং মন্দিরকে তাঁর গদী বলা চলে।

আমরা প্রণাম ও দর্শন করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। পূজারী কিছু প্রসাদ আনিয়া দিলেন।

বাজারে এক আনায় তিনটী সুপক্ক কৎবেল কেনা হইল। শুনিলাম এই বিগ্রহের সেবার জন্য কোনও সম্পত্তি দেওয়া নাই। বৎসরে একবার করিয়া একটী বৃহৎ মেলা হয়, তাহারই আয়ে সমস্ত বৎসরের খরচ চলে।

আমরা এখন ঔরঙ্গাবাদের পথে চলিয়াছি। ঔরঙ্গাবাদ এখান হইতে ৭৫ মাইল দূরে। এখানে ।০ আনা টিন জল কিনিতে হয়। দুই পার্শ্বে ধূসর বর্ণের পাহাড়। তার কোলে বিশাল প্রান্তর, সীমাহীন, তার মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া পথ চলিয়াছে। কোথাও উঁচু কোথাও নীচু, মোটর কখনও চড়াইতে উঠিতেছে, কখনও ঢালু পথে নামিয়া যাইতেছে। এখন আমরা ইংরাজ রাজের সীমানা ছাড়াইয়া নিজাম রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি।

মাঝে মাঝে নূতন কমলা নেবুর বাগানের পত্তন করা হইতেছে। চারাগুলি দুই আড়াই হাত উচ্চ, বায়ুভরে হিল্লোলিত হইতেছে। সতেজ গাছগুলি দেখিয়া এখানকার ভূমি বেশ উর্ব্বরা বলিয়া মনে হইল।

প্রায় ৯৷৷ টার সময় জালনা নামক একটী ছোট সহরে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। এঞ্জিনের জন্য জল লওয়া হইল। নিজাম রাজের একটী ছোট জেলখানা এখানে আছে, তার পাশ দিয়া গাড়ী চলিল। এই জেল হইতে বিখ্যাত ঠগী আমীর খাঁ পলাইয়াছিল।

কিছু দূর আসিয়া রেল লাইনের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল।

নিজাম নিজের রেল করিয়াছেন। গাউকি নামে একটী নদী পার হইলাম। নদীর মধ্যে শিবমন্দির আছে। এদিকে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বাতাস বেশ স্নিগ্ধ। স্থানে স্থানে জল জমিয়া আছে।

বেলা প্রায় ১১॥ টার সময় আমাদের গাড়ী দুইখানি, একটী নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। এদিকে বৃষ্টি হইয়াছে, নদীতীর কর্দ্দমাক্ত, এবং নদীতে ঘোলা জল বহিতেছে।

আমাদের মোটর চালক হিন্দু, তাহার নাম রাম সিং। আমাদের গাড়ীখানি অগ্রে ছিল, রাম সিং নদী বক্ষে নামিয়া কতখানি জল পরীক্ষা করিল, এবং মোটর পার হইয়া যাইবে কহিল। সে উঠিয়া আসিয়া গাড়ীখানিকে নদীবক্ষে চালাইয়া দিল। কিন্তু মনে হয় বান আসিয়া নদীর বালুকার উপরে কর্দ্দম জমিয়া গিয়াছিল। এবং ঠিক জোরে না চালানোতে, নদীবক্ষে চাকা বসিয়া গিয়া মোটর থামিয়া গেল। এবং অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আর তাহাকে নড়ানো গেল না।

অন্য গাড়ীতে আমার ছোট ছেলেরা ওঁর সহিত বসিয়া ছিল। তাহারা আমাদের মোটরের দশা দেখিয়া হাসিতেছিল। তাহাদের লরীর চালক ছোটে মিঞা একটু পাশ কাটাইয়া বাঁকা ভাবে নদী বক্ষে মোটর সবেগে নামাইয়া দিল। এ মোটরটীও আমাদের নিকটে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। এবং এঞ্জিন চালাইবার চেষ্টাতে, মত্ত হস্তী পাঁকের ভিতরে পড়িলে যেমন জল আন্দোলিত করিয়া তোলে, সেইরূপ আন্দোলিত হইয়া স্থির হইয়া গেল। নদীর পাড়ে ইতি-মধ্যে বিস্তর লোক জমা হইয়াছিল। তাহাদের চাকা ঠেলিয়া তুলিয়া দিতে বলা হইল। তাহার সকলে ও আমাদের ভৃত্যবর্গ সকলে মিলিয়া অবশেষে গাড়ী দুই খানিকে ঠেলিয়া একে একে অন্য পারে পৌঁছাইল। বলা বাহুল্য এঞ্জিনও আপনার শক্তি নিয়োগ করিয়া-ছিল। আমরা অন্য পারে আসিয়া পৌছিলাম। এঞ্জিনের জন্য নদী হইতে জল সংগ্রহ করা হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম নদীর নাম দুধনা। স্থানটীর নাম বদনাপুর। রাস্তার বাম পার্শ্বে একটী বৃহৎ মৃত্তিকা নির্ম্মিত কেল্লা দেখিলাম। পথ ঘুরিয়া চলিয়াছে। পশ্চাতের মোটর খানি বাঁকের অন্তরালে পড়িয়া আর দেখা যাইতেছে না।

একটী নদীর ধারের গ্রামের পার্শ্ব দিয়া চলিয়াছি। আম্র খর্জ্জুর জাম নানা ফলবৃক্ষ ফলভারে নত হইয়া এখানকার ঐশর্য্য সম্পদ দেখাইতেছে। একখানি মনোহর চিত্রের মত গ্রাম খানি আমাদের নয়নে প্রতি-ভাত হইয়া উঠিল।

গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল ঔরঙ্গাবা আর পাঁচ মাইল মাত্র দূরে আছে। মনের ভিতরে আনন্দ আশা কৌতূহল, সকল একাগ্রতা লইয়া সম্মুখবর্ত্তী পথ প্রান্তে চাহিয়া আছে। ক্রমে দূর হইতে পাহাড়ের উপর দেবগিরির দুর্গ অস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল পাহাড়ের কোলের মধ্য দিয়া সহরের প্রাসাদ, সৌধ, গৃহ, মন্দিরগুলি বেশ সুন্দর দেখাইতেছে। তাজের অনু-করণে নির্ম্মিত রাবেয়া বেগমের সমাধি "বিবিকা মক্বরা"র উচ্চ চূড়া দূর হইতে দেখিতে পাইলাম।

মোটর দেড়টার সময় ঔরঙ্গাবাদ সহরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। এখান হইতে অজন্তার পথ প্রদর্শক সঙ্গে লইতে হইবে।

এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। প্রথমে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও পুলিশ থানা কোথায় জানা গেল না। তার পর একজন কহিল, "আমীন কছেরী" অমুক রাস্তায়, সোজা যাও। সাব ইন্‌স্পেক্টরকে এখানে আমীন সাহেব বলে, থানার নাম আমীন কাছারী। বলা বাহুল্য এই সব ইঃ মহাশয়ও মুসলমান। তিনি বেশ খাতির যত্ন করিলেন, এবং আমাদের অজন্তা হইতে ফিরিবার পথে, নামিয়া থাকিবার জন্য বাড়ী স্থির করিয়া রাখিবেন, কহিলেন। আমাদের সহিত একজন মুসলমান হেড কনেষ্টবলকে দিলেন, সে পথ ঘাট বেশ ভাল জানে ও চেনে।

আকাশে নিবিড় কালো মেঘ জমিয়াছে। মনে হইতেছে, এখনি মুষলধারে বৃষ্টি নামিবে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ ছটা আকাশ প্রান্ত উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশ হইতেছে। এই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া আমরা কোথায় চলিয়াছি, এই কথা মনে হইয়া মনটা দমিয়া গেল।

ঠিক তিনটার সময় পথ প্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া আমরা

অজন্তার পথে অগ্রসর হইলাম। এখান হইতে অজন্তা ৫৫ মাইল। আমাদের আজ অজন্তায় পহুঁছিতেই হইবে।

কিছুক্ষণ বৃষ্টির পর, আমরা বৃষ্টি ছাড়াইয়া আসিয়াছি। এদিকে বৃষ্টি নাই। পাহাড়ে পাহাড়ে মেশামিশী করিয়া এমন ভাবে দাঁড়াইয়া আছে যে তাহার মধ্য দিয়া কোথা দিয়া পথ গিয়াছে, দেখা যাইতেছে না। বাঁকের পরে বাঁক ঘুরিয়া পথ। গিরিজা নাম্নী নদী পার হইলাম। তে সামান্য জল আছে। ২৫।৩০টী নালা পার হইলাম, কোনটীর উপরে পুল নাই।

মোটর ক্রমশ উচ্চ পার্ব্বত্য প্রান্তরে উঠিয়া চলিয়াছে। পর্ব্বত প্রাকার বেষ্টিত পার্ব্বত্য প্রান্তরে ৫।৬ মাইল দীর্ঘ আম্র কানন, তাহার মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি। জ্যৈষ্ঠ মাস, আম্রবন ফলৈশ্বর্য্যে সম্পৎ-শালিনি। বৃক্ষতলে কুটীর বাঁধিয়া রক্ষক নিযুক্ত আছে। কোনও বৃক্ষতলে গোগাড়ী লইয়া আম্র ব্যবসায়ী ফল সংগ্রহে আসিয়াছে। স্থানটীর নাম "ফুল মেরি"। ১৫ মাইল আসিয়াছি। দুরে পাহাড়ে খুব ঘন ঘটা করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে।

এদিককার গ্রাম গুলি প্রাচীর বেষ্টিত। তখনকার কালে অরাজকতা ছিল বলিয়া এইরূপে গ্রাম রক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছিল মনে হয়।

নদী পড়িল। জল থাকিলেও মোটা বালি থাকায় মোটর স্বচ্ছন্দে পার হইয়া গেল। পূর্ণা নদীর কিছু দুরে গিলোদ নামে একটী স্থানে ডাক বাঙ্গলা আছে। এখান হইতে ১১ মাইল দুরে আসাইর যুদ্ধক্ষেত্র। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে জেনারল ওয়েলেসলি (ডিউক অব ওয়েলিংটন) সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সমবেত ৬০,০০০ সৈন্যকে মাত্র ৪৫০০ সৈন্য লইয়া পরাজিত করিয়াছিলেন। আসাইর যুদ্ধক্ষেত্রে এখনও নাকি গোলা গুলি পাওয়া যায়। আমাদের দেখার ইচ্ছা থাকিলেও যাওয়ার সুবিধা ছিল না। আবার মোটর চলিল।

কিছু পথ চলিয়া আর একটী নদী পার হইলাম। পুল তৈয়ারী হইতেছে, বহু লোক কার্য্যে নিযুক্ত আছে। নিজাম-রাজ তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে পথ প্রস্তুত করাইতেছেন। এদিকে পথ অত্যন্ত খারাপ! মোটরে খুব ঝাঁকানি লাগিতেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীউমা দেবী।

বাদল-গীতি

আকাশ পথে হাওয়ার রথে
বাদল এল বর্ষ পরে,
কমল কুমুদ ঢেউএর তলে
লুকিয়ে হাসে হর্ষভরে।
মেঘের ফাঁকে কিরণ রাশি,
তরুর শিরে ফুটায় হাসি,
চাতক শিশুর আনন্দস্বর
মর্ম্ম সবার স্পর্শ করে।

কৃষক বধূর ঠোঁটের কোণে
চাপা হাসির লহর খেলে,
বিলের বুকে সাঁতার কাটে
গাঁয়ের যত দুষ্টু ছেলে।
বিজ্‌লী ছটায় স্বরূপ ঢেকে
ফিরছে দেয়া ধমক হেঁকে,
দেবের আশীষ পল্লীবুকে
ঝরণা ধারায় দিচ্ছে ঢেলে।

মেঘ বাদলের উৎসবে আজ
বিশ্বনিখিল আত্মহারা,
আনন্দেরি জোয়ার ছোটে
বাঁধন টুটে পাগল পারা।
বিরহীরেদ মনের মাঝে
বীণার তারে বেদন বাজে,
সিক্ত ভুবন তাতিয়ে তোলে
উষ্ণ গাছের নয়ন ধারা।

শ্রীসতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

বিশ্ব-সমবায় তিথি

(International Co-operator's dayতে লেখক কর্তৃক Albert Hallএ পঠিত)

বাঙ্গলা দেশে সমবায় নীতির প্রসার ও পরিপুষ্টির জন্য অনেকে অনেক চেষ্টা ক'রেছেন। কেউ দিয়েছেন তাঁর ধন ভাণ্ডার মুক্ত ক'রে, কেউ দিয়েছেন তাঁদের অক্লান্ত কর্ম ও চেষ্টা, কেউ তাঁদের গবেষণা—আমি দিয়েছি সুধু বাক্য। কিন্তু এই বাক্যবীরেরই তলব হ'য়েছে আপনাদের কাছে আজকের দিনে বিশ্বসমবায়ীদের স্মারক উৎসবে আপনাদের প্রস্তাব * সমর্থন ক'রতে। এ সম্মানে আমার আনন্দের চেয়ে লজ্জা ঢের বেশী; কেন না, আজকের এই সম্মিলনে উপস্থিত বিপুল কর্ম্মপ্রবৃত্ত কর্ম্মীদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাগাড়ম্বরে লজ্জা বোধ না ক'রতে পারে সুধু সেই যার দু'কাণ কাটা।

* প্রস্তাবটি এই :—

This meeting of co-operators assembled on the Seventh Anniversary of the International Co-operator's Day reaffirms the unity of co-operators throughout the world, and proclaims anew the sincerity of their fraternal relations. It declares its profound conviction that the system of co-operative economic development and social well-being for which the Movement stands is the best means of raising the standard of life; of combating the evils of individual profit-making and the international agreements of profiteers; and of assuring the peace of the world.

It, therefore, calls upon co-operators in every land to press forward their economic organisation; to strengthen the social and intellectual bonds which exist between them; and to use every means in their power to promote understanding, fraternity and peaceful relations between the peoples.

এসম্বন্ধে বিশ্বরাষ্ট্রীয় সমবায় সম্মেলন নিম্নলিখিত আহ্বান পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

যে প্রস্তাব আপনাদের কাছে আমি প'ড়েছি তার টীকা ক'রেছেন বিশ্বরাষ্ট্রীয় সমবায় সম্মেলন তাঁদের বিশ্বব্যাপী আহ্বান পত্রে। যাঁরা সমবায় নীতির মোটা কথাগুলো জানেন তাঁদের কাছে সেই আহ্বান পত্রের পর আর কোনও কথাই বলবার দরকার নেই। কিন্তু যাঁরা সমবায় নীতি সম্বন্ধে মোটা কথা গুলো জানেন না, তাঁদের কাছে আজকের দিনের ও আজকের এই প্রস্তাবের মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট ক'রে জানাবার জন্যে আমি দুচারটে কথা ব'লবো।

To the Co-operators of the World.

THE SEVENTH ANNUAL CELEBRATION of the INTERNATIONAL CO-OPERATOR'S DAY will he held in all the countries of the Alliance on SATURDAY, 6th July, when it is expected that a larger manifestation of co-operative solidarity than has yet been displayed will be revealed.

CO-OPERATION, national and international, continues to grow in membership, trade enthusiasm, and economic force in practically every civilised country in the world. Its aim is to establish a new civilisation based upon the principles of justce, equity, and fraternity, and the inalienable right of every citizen to work out his own enancipation from every social evil in voluntary association with his, fellows.

CO-OPERATION pursues its purpose by organising, on a mutual basis, the production and distribution of commodities of the highest quality and at a just price; by sharing the gains or savings of its enterprise amongst those who made them; by the exercise of a free and open democracy

আমাদের দেশে সমবায়ের কথা ব'লতে গেলে আমাদের সবার মনে পড়ে আমাদের ঋণদান সমিতিগুলোর কথা। এ গুলি খুব ছোট জিনিষ, এদের প্রত্যেকের সার্থকতার ক্ষেত্র খুব প্রশস্ত নয়। এদের সবগুলির সম্মিলিত কার্য্যের পরিমাণ যে সামান্য নয় তা' আমরা জানি—কিন্তু তবু এই ঋণদান সমিতিগুলিই

the direction and control of all its undertakings; by the cultivation of the social virtues and the highest standard of citizenship.

The CO-OPERATION OF CONSUMERS has definitely reduced the cost of living to its members; increased the real value of wages; reduced the hours of labour; raised the standard of education of the workers and has become a bulwark of defence of the liberties of the people.

INTERNATIONALLY, the CO-OPERATIVE MOVEMENT stands for the removal of all economic barriers and other hindrances to the free intercourse of the peoples of every land; for the establishment of economic co-operation between the nations; and as a natural corollary UNIVERSAL PEACE.

On the occasion of its SEVENTH FESTIVAL the International Co-operative Alliance hails with satisfaction the steady advance of its principles and the progressive realisation of its aims; it calls upon its constituent members to demonstrate everywhere the unity of our movement, confidence in its power to raise the standard of life and civilisatipn to a still higher plane and ultimately, to realise the co-operative commonwealth.

On behalf of the International Co-operative Alliance,

(Sd.) VAINO TENNER,
President.

(Sd.) HENRY J. MAY
General Secretary.

কো-অপারেশনের চরম কথা নয়—তার কাছা-কাছিও কিছু নয়। সুধু এরই জন্য একটা এতবড় বিশ্বব্যাপী আয়োজন, বিশ্বব্যাপী উৎসবের ব্যবস্থা করা হয় নি।

সমস্ত বিশ্বের সমবায় চেষ্টাকে একসূত্রে গ্রথিত করবার জন্য, এক প্রাণে প্রাণদান করবার যে চেষ্টায় বিশ্বরাষ্ট্রীয় সমবায় সম্মেলন যে বৃহৎ চেষ্টায় নিযুক্ত র'য়েছেন, যার একটা পরিচয় আজকের সারা বিশ্বব্যাপী এই উৎসব, তার মানে এই ঋণদান সমিতির চেয়ে অনেক বেশী গভীর, অনেক বেশী এর পরিসর! এ চেষ্টা জগৎকে ভেঙ্গে গড়বার চেষ্টা, মানুষের সমাজকে নূতন সূত্রে বাঁধবার চেষ্টা—তাই সম্মেলন তাঁদের আহ্বান পত্রে ব'লেছেন :—

"Its aim is to establish a new civilisation based upon the principles of justice, equity and fraternity and the inalienable right of every citizen to work out his own emancipation from every social evil in voluntary association with his fellows."

এই কথাটাই একটু বিশদ ক'রে বোঝাবার চেষ্টা ক'রবো, কেন না, এইটেই হ'চ্ছে কো-অপারেশনের মূল কথা, এই খানেই এর বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব—এই কথা স্মরণ রেখে যদি আমরা কাযে অগ্রসর হই তবে যত ছোটই হোক না কেন আমাদের কায, আমরা অনুভব ক'রতে পারবো যে, যে কাযে আমরা লেগে আছি, ছোট নয় এ কায, জগতের আর কোনও বড় জাঁকাল কাযের পাশেই এর মাথা হেঁট ক'রে থাকবার দরকার নেই।

ডারউইন্ ও স্পেন্সারের অভিব্যক্তিবাদের কথা আপনারা সকলেই শুনেছেন। আজ সকলেই জানে যে বিশ্বের জীবজীবন, মনোজীবন, সমাজজীবন সবারই একটা গতি আছে, পরিণতি আছে। জীবজগতের আদি যুগে এক ছোট অদৃশ্য জীবাণু থেকে এই বিবর্ত্তনের ফলে কত না জীব জন্মেছে, কত জীব লোপ পেয়ে গেছে; মনের অস্পষ্ট বিকাশের মূল থেকে গড়ে উঠেছে ক্রমে আজ মানুষের প্রকাণ্ড চিত্তজগৎ; আর ছোট্ট একটা পরিবারের ভিতর জন্মেছিল যে পরস্পর সম্মিলনের বীজ, তাই আজ একটা বিশ্বব্যাপী বৃহৎ মানব সমাজ গড়ে ওঠার চেষ্টা ক'রছে।

এই বিবর্ত্তনের ইতিহাস অনুসন্ধান ক'রে পণ্ডিতেরা এর একটা মূলসূত্র বের ক'রেছেন এই যে, জগৎ জোড়া চলছে একটা জীবন সংগ্রাম, সবাই সবার সঙ্গে লড়ছে পাল্লা দিচ্ছে, টি'কে যাচ্ছে তারাই যারা সব চেয়ে যোগ্য বা শক্তিমান, তাদের শক্তি ও আচার উত্তরাধিকার-ক্রমে তাঁর বংশে পর্য্যন্ত হ'চ্ছে।

এই যে খাওয়া-খাওয়ির নিয়ম—এই struggle for existence and survival of the fittest—এটা যে জীব জগতের একটা প্রাকৃত বিধি সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। আর এ নিয়মটা যে সুধু প্রাণী জগতের নিয়ম তা নয়, সমাজ জীবনে এই নীতির নাম competition, আন্তর্জাতিক সমাজে এর নাম যুদ্ধ।

কিন্তু পণ্ডিতেরা এও আবিষ্কার ক'রেছেন যে এই খাওয়া খাওয়ির নিয়মই প্রকৃতির একমাত্র নিয়ম নয়। জীব বা মানুষ যে পুষ্টি ও পরিণতি লাভ ক'রেছে সে শুধু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যুদ্ধ চালিয়ে নয়—জীবন সংগ্রামে যে জয়লাভ হ'চ্ছে সে কেবল মাংস পেশীর জোরে নয়—ব্যক্তিগত শক্তির চেয়ে বড় শক্তি হ'চ্ছে দল বাঁধবার শক্তি, সম্মিলনের শক্তি, অন্যোহন্য সেবার শক্তি।

মানুষ যে তার ক্ষুদ্র শৃঙ্গ-নখ-দংষ্ট্রা-বিহীন হিংসায় অশক্ত দেহ নিয়ে আদিম কালের অতিকায় মহাশক্তিমান জীব জন্তুদের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়ে জগতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, তার এক কারণ যে সে যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রে তার শরীরের ক্রটিটুকু সারিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ এই যে, সে অন্য মানুষের সঙ্গে দল বেঁধে পরস্পরের আনুকূল্য করে একটা সমবেত শক্তি গড়ে তুলছে, যার জোরে সে বিশ্বের সব জীবের উপর আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পেরেছে।

মানুষের সমাজের ভিত্তি এই সম্মিলনে—এই অন্যোন্য সেবায় এর সূত্রপাত হ'য়েছিল মানুষের জন্মের আগে। আরও অনেক জীবের ভিতর এর পরিচয় দেখতে পাই। কিন্তু মানুষের মধ্যে আদিম সম্মিলন ছিল পরিবার। সেই পরিবার থেকে ক্রমে গ'ড়ে উঠল জ্ঞাতি, গোত্র, গোষ্ঠী, গ্রাম, জন, রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য—আর আজ সূত্রপাত হ'য়েছে—কিন্তু সুধু সূত্রপাতই হ'য়েছে—বিশ্ব-সমাজের। মানব সমাজের বিবর্ত্তন মুখে এই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সমাজের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির মূলে হ'চ্ছে ক্রমোন্নতিশীল সংগঠন শক্তি। এই শক্তির প্রয়োগ হয়েছে মানুষের জীবন রক্ষায়, তার অন্নবস্ত্র সংগ্রহে, তার সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানে, তার চিত্ত ও চরিত্রের উন্নতি সাধনে, ও সর্ব্বাঙ্গী কল্যাণ সম্পাদনে।

এই যে পরস্পরের চেষ্টা সমবায় যার উপর সমা[জ] প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে ও যার উন্নতি-সাধন ক'রেই মানুষ ক্রমে উন্নতি লাভ ক'রছে, এটা গোড়া থেকে যে ভাবে চলছে সেটা হ'চ্ছে প্রাধান্য-মূলক। যার শক্তি বেশী বা বুদ্ধি বেশী সে প্রধান হ'য়ে বাকী সকলকে তার আজ্ঞায় পরিচালিত ক'রেছে। নেতা ও নীতের সমবায়ে সবগুলি প্রতিষ্ঠান আদিতে গড়ে উঠেছিল, আজ পর্য্যন্তও সেই নিয়মেই জগতের বেশীর ভাগ সমাজ ও প্রতিষ্ঠান চ'লছে। এতে শক্তি থাকে কতকগুলি লোকের হাতে, বাকী লোক তাদের হুকুম তামিল করে। এই অসম সমবায় দেখতে পাই পরিবারে, রাষ্ট্রে, সমাজে, কারখানায় ব্যবসা বাণিজ্যে—সর্ব্বত্র।

সমবায় হ'লেই শক্তি বাড়ে, সমৃদ্ধি বাড়ে, তা সে অসম সমবায়ই হোক আর সম-সমবায়ই হোক। তফাৎটা হয় সেই শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রয়োগে। যাঁরা নেতা, সমস্ত সমবায়ের শক্তিটা যাঁদের হাতে এসে জমে, তাঁরা যদি রামচন্দ্র হন, তবে হয় রামরাজত্ব। কিন্তু মুস্কিলটা এই যে রামচন্দ্র জন্মেন যুগে একজন, বেশীর ভাগ লোক শুধু তোমার আমার মত স্বার্থপর। প্রজার হিতের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রতে পারেন এমন রাজা বড় দেখা যায় না। অধ্যধীনের হিতার্থে সর্ব্বত্যাগী নায়কও দুর্ল্লভ এবং শক্তি বা সম্পদ পেলে সেটাকে ষোল আনা নিজের সুখ-সমৃদ্ধি বর্দ্ধনের জন্য ব্যবহার করবার চেষ্টাই হয় বেশী লোকের।

ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, সমবায়ের পরিপুষ্টি ও পরিণতির ফলে যতই শক্তি ও সম্পদ বেড়ে যাচ্ছে, ততই সুখ সুবিধা বাড়ছে তাদেরই, যাদের হাতে শক্তি আছে —বাকী লোক 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'—হয় তো বা আরও গাঢ় তিমিরে থাকছে। এই ব্যাপারটা বর্ত্তমান

যুগে দেখা যাচ্ছে সব চেয়ে বেশী ক'রে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে।

শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে সংগঠনের অবসর অতিমাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্রমেই বেশী প্রকাণ্ড শিল্প বা ব্যবসায় সমবায় গ'ড়ে উঠেছে। আর এক একটা সমবায়ের হাতে এত শক্তি ও সম্পদ এসে পড়ছে যার কাছে কুবেরের সম্পদ ছেলে-খেলা ব'লে মনে হয়, পশুপতির শক্তি লজ্জা পায়। কিন্তু যাদের শক্তির সমবায়ে এই বৃহৎ শক্তি জন্মাচ্ছে তারা এর কোনও সুবিধাই পাচ্ছে না। জগৎ জোড়া ধনিকের যে সম্পদ ও বিলাসিতার স্তূপ হিমালয়কে লঙ্ঘন ক'রে চ'লেছে, তার ছিটে-ফোঁটাও পৌঁছুচ্ছে না শ্রমজীবীর করে। যে সহস্র মার্ত্তণ্ডের আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে ধনীর বিলাস-গৃহ, তার ক্ষীণ রেখাটুকুও পৌঁছুচ্ছে না শ্রমিকের অন্ধকার গৃহে।

এটা না ধর্ম্ম না নীতি-সঙ্গত। যারা খেটে সম্পদ সৃষ্টি ক'রেছে তাদের বঞ্চিত ক'রে যে বণিক সুধু তার টাকার জোরে সে সব সম্পদ আত্মসাৎ ক'রবে, এটা সংসারের চলতি বিধি ব'লে মানতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মের চরম মানদণ্ডে একে মাপ ক'রলে এ নীতিকে তুচ্ছ না ক'রে পারি না।

কো-অপারেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই অসম-সমবায়ের মূলোচ্ছেদ ক'রে জগতের সর্ব্বত্র সব প্রতিষ্ঠানকে সম-সমবায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, সমাজকে নূতন ক'রে সম-সমবায়ের ভিত্তিতে গড়ে তোলা।

জগতের বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে উল্টে দিয়ে, আজ-কালকার যে সব বিরাট কারবার বা কারখানা আছে সে সব সাবেক কালের মত ছোট ছোট স্বপ্রতিষ্ঠ গ্রামের সৃষ্টি করবার কল্পনা অনেকে ক'রে থাকেন, কিন্তু তা সম্ভবও নয়, আর সম্ভব হ'লেও তা সঙ্গত হবে না। কেন না যে সব অতিকায় ব্যবসার সঙ্ঘ গড়ে উঠে আজ-কাল সমস্ত জগতের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থার ভার নিয়েছে, তার ভিতরে দোষ যতই থাকুক, অত্যাচার অবিচার যতই থাকুক, সেগুলির মূলে একটা প্রকাণ্ড সত্য আছে। সে সত্যটা এই যে, বিশ্ব মানবের জীবনকে সব চেয়ে বেশী শক্তিমান ও সুখ সমৃদ্ধিশালী ক'রতে হ'লে জগদ্ব্যাপী সব চেষ্টাকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলে সংগঠন ক'রতে হ'বে। সুদূর অতীতে প্রত্যেক লোককে খাট্‌তে হ'ত তার নিজের প্রত্যেক অভাবটি মোচন করবার জন্য। তারপর গ্রামের মধ্যে কর্ম্মবিভাগ হ'ল, কিন্তু প্রত্যেক গ্রামকে চেষ্টা ক'রতে হ'ত তার অধিবাসীদের প্রত্যেকটি অভাব মোচন করবার জন্য। কিন্তু এখন সমস্ত জগৎ খাটছে সমস্ত জগতের অভাব মোচনের জন্য। এখনও যে সব চেষ্টা বিচ্ছিন্ন আছে সেগুলির পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত ক'রে যে দিন এমন অবস্থা হবে যখন সমস্ত জগতের সব চেষ্টা ঠিক সমবেত হ'য়ে জগদ্বাসীর সব অভাব মোচনের জন্য সুনিয়ত ভাবে নিয়োজিত হবে, তখনই হবে মানব সভ্যতার চরম পরিণতি। এই পরিণতির দিকে চেয়েই আমাদের কায ক'রতে হবে, এই বিশ্ব সংগঠনের স্বপ্নই দেখতে হবে। বিশ্ব-সমাজের এই দিককার গতির মুখ ফিরিয়ে দিয়ে ভাঙ্গনের পথে যাত্রা ক'রে স্বপ্রতিষ্ঠ গ্রামকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলে আমরা মানব-সমাজের চরম পরিণতি লাভে বাধাই দেবো।

সুতরাং সমস্যাটা এ নয় যে, এই সব বিরাট প্রতিষ্ঠানকে—বিশ্বব্যাপী এই চেষ্টা সমবায়কে—কেমন ক'রে ভাঙ্গা যাবে। সমস্যা হ'চ্ছে এর ভিতরকার যে সব অন্যায় ও অসমতা আছে সেগুলি কি ক'রে দূর করা যাবে। একে কেমন ক'রে এমন ভাবে পুনর্গঠন করা যাবে যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পেতে পারে, প্রত্যেকের মনুষ্যত্ব স্ফুরণের পর্য্যাপ্ত অবসর পেতে পারে, প্রত্যেকের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে, এই সমস্ত সমবায় থেকে অন্যায় ও অধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করা যেতে পারে।

সেই উপায় হচ্ছে কো-অপারেশন বা সম-সমবায়। এর সূত্রপাত হ'য়েছিল যে দিন Rochdale গ্রামের কয়েকটি দরিদ্র অধিবাসী তাদের দৈনিক প্রয়োজনের জিনিষ সরবরাহ করবার জন্য ছোট্ট একটি ষ্টোর প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল। সে দিনকার সেই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে এই নীতি যে সফলতা লাভ ক'রেছিল তার ফলে আজ সারা বিশ্বে ছোট বড় অনেকগুলি প্রকাণ্ড বড়—বহু সমবায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এ কথা প্রমাণ হ'য়ে গেছে যে এই ক'রে সম-সমবায়ের মূলে প্রত্যেক শিল্প

ও প্রত্যেক ব্যবসায় সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবে, অতিকায় ভাবে চালান যেতে পারে, শিল্প বাণিজ্যের ধনিক-নীতি-মূলক সংগঠনে যে অধর্ম্ম ও দুর্নীতির বাহুল্য আছে তা সম্পূর্ণ বর্জ্জন ক'রে এই সব কারবার চালান যেতে পারে।

এখন সুধু দরকার চেষ্টার। সেই চেষ্টার জন্য আহ্বান এসেছে আজ সমস্ত বিশ্বের সমবায়ীদের কাছ থেকে—আহ্বান এসেছে আজ আমাদের কাছে সমস্ত বিশ্বের সমবায়ীদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তাদের সহকর্ম্মী হ'য়ে "to demonstrate the unity of our movement, confidence in its power to raise the standard of life and civilisation to a still higher plane, and ultimately to realise the Co-operative commonwealth."

আজ জগতের কোনও চেষ্টাই রাষ্ট্রের সীমায় আবদ্ধ নেই। সমাজ আজ রাষ্ট্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে প'ড়েছে। তাই কি জ্ঞানে কি কর্ম্মে মানবের উন্নতির জন্য যা কিছু চেষ্টা হ'চ্ছে তার কোনওটাই আর কোনও বিশিষ্ট সমাজ কোনও বিশিষ্ট রাষ্ট্রের ভিতর আবদ্ধ থাকছে না। বিশেষ ক'রে চিন্তার জগতে ও অর্থ-নীতির জগতে এই বিশ্বরাষ্ট্রীয়তা একেবারে অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠেছে। ধনিকতন্ত্রমূলক ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলি এখন ক্রমেই বেশী পরিমাণে আন্তর্জাতিক সমবায় বা সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে জগৎ জোড়া হ'য়ে উঠছে। কো-অপারেশনকে যদি বাঁচতে হয়, যদি যথেষ্ট শক্তিমান হ'য়ে তার আদর্শ আয়ত্ত ক'রতে হয়, তবে তাকে জাতীয়তার গণ্ডী রাষ্ট্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বের হাটে বিকি-কিনি ক'রতে হ'বে। জানতে হবে যে, যে যেখানে সমবায়ী আছে সবাই এক এক মহা লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে। সে লক্ষ্য হ'চ্ছে জগতের সংগঠন নীতির একটা প্রকাণ্ড বিপর্য্যয় সাধন করা। সেই লক্ষ্যকে আয়ত্ত ক'রতে হ'লে বিশ্বের সর্ব্বত্র এই মন্ত্রের সাধনা ক'রতে হবে, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নয় স্বতন্ত্র হ'য়ে নয়, সবার হাতে হাত ধ'রে। অন্তরে অন্তরে সবার মিলন হ'তে হবে, কর্ম্মে সমবায়ে সবার মিলিত হ'তে হবে, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ক'রতে হ'বে, দুর্ব্বলকে টেনে তুলতে হ'বে, নিরুৎসাহকে উৎসাহ দিতে হবে—জগৎ জোড়া এই সমবায়ী সমাজকে এক সমাজ ব'লে জানতে হবে, এক সমাজ ক'রে গ'ড়তে হবে।

এই একত্ব বোধে আমাদের শক্তি বেড়ে যাবে, উৎসাহ বেড়ে যাবে, বিশ্বের সমবায়ী সমাজে আমরা যাতে পিছে প'ড়ে না থাকি সে চেষ্টায় আমরা প্রেরণা পাব —আর যত ছোট হোক না আমাদের কায, যত সামান্য হোক আমাদের সফলতা, তাকে ছোট ক'রে আমরা দেখতে পারবো না। আমরা জানবো যে একখানা ইটও যদি আমরা গেঁথে দিয়ে থাকি তবু তা নিষ্ফল হয় নি, মানবের চরম মঙ্গল সাধনের উপায় যে সমবায় তার মহা-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনে আমার সে ইটখানা সহায়তা ক'রছে। জানবো আমরা সুধু নিজের সেবা বা দরিদ্রের সেবা বা দেশবাসীর সেবা ক'রছি না, বিশ্ব-মানবের জীবনে চরম সার্থকতা লাভের সহায়তা ক'রছি। অপরিসীম গৌরবে মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে আমাদের সে কায।

এইটাই হ'চ্ছে আজকের দিনে বিশ্বের সর্ব্ব দেশের সমবায়ীদের সঙ্গে এক সঙ্গে এই উৎসব অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য ও সার্থকতা। এই অনুভূতি যদি আজ আমাদের প্রাণে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে, এই উৎসাহ নিয়ে যদি আমরা কাযে লেগে যেতে পারি, তবে আমাদের সব কায অপূর্ব্ব সাফল্যে মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে, অপূর্ব্ব সার্থকতা আমরা অনুভব ক'রতে পারবো।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।

THE BOYS' OWN LIBRARY
ESTD. 1908.
CALCUTTA.
YOUNG MEN'S INSTITUTE
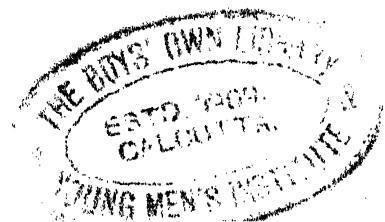
হিন্দুর মেয়ে

(উপন্যাস)

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মানব হৃদয়ে আশা অনন্ত, আকাঙ্ক্ষা অপরমিত, না অফুরন্ত। কিছুতেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই। কটি আকাঙ্ক্ষা আজ যদি পূর্ণ হইয়া যায়, কা'ল আবার আর একটি আকাঙ্ক্ষা মনের দ্বারে উপনীত হইয়া তোমায় উন্মনা করিয়া তুলিবে। আজ একটি, কা'ল একটি—নিত্য নূতন আকাঙ্ক্ষা মানব হৃদয়ে একবার জাগে, আবার বিলীন হয়।

অসীমের ধারণা ছিল কিয়ৎকাল মুকুলের সাহচর্য্যে কাটাইলে তাহার অদম্য আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে, চোখের ক্ষুধা মিটিয়া যাইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত হইতে দেখিয়া অসীম বিস্মিত হইল। হায় মানব-হৃদয়, হায় তাহার পরিণাম! রাজ্যোদ্যানের যে নয়নরঞ্জন পুষ্পটি পথিককে বর্ণে গন্ধে লুব্ধ করিয়াছিল—তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রান্ত পথিকের প্রবল তৃষ্ণা মিটিল না। দেখিতে দেখিতে দেখার তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া উঠিল। দেবপূজার অনাঘ্রাত কুসুমটিকে স্পর্শ করিয়া ঘ্রাণ লইতে সাধ হইল। বেগবতী হৃদয়-নদীর স্রোতের রোধ করিতে গিয়া অসীম শ্রান্ত ক্লান্ত হইল।

বোম্বাই প্রবাসে কয়েকদিন মুকুলিকার সহিত যাপন করিবার পর অসীম হৃদয়ঙ্গম করিল, শুধু চোখের দেখা দেখিয়াই তাহার চিত্ত প্রসন্ন নহে। হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় পাইবার নিমিত্ত তাহার অন্তর যেমন অধীর তেমনি উন্মুখ। তাহার নব প্রেমোচ্ছ্বাস পার্ব্বতীয় নদীর ন্যায় জন্ম-শিখরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছিল না—যে কোন উপায়ে সে বাহির হইতে চাহিতেছিল। কিন্তু হৃদয়ের ভাব অসীমের প্রকাশ করিবার শক্তি ছিল না। যিনি পরমাত্মীয়ের মত নিঃসন্দেহে তাহাকে কন্যার শিক্ষার ভার দিয়াছেন, যিনি মাতার স্নেহে তাহার প্রবাস জীবন স্নেহ সিক্ত করিয়া রাখিয়াছেন; আর যে বিশ্বাস ভরা নির্ম্মল হৃদয় খানি লইয়া তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া সেবা যত্নে হাসি গানে তাহার প্রাণে স্বর্গের পারিজাত ফুটাইয়া তুলিয়াছে, অসীমের দীন হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয়ে তাঁহারা কি ভাবিবেন? এখন যে ক্ষেত্রে স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা বিরাজ করিতেছে—সেই ক্ষেত্রই অবিশ্বাস ও ঘৃণার লীলা-ভূমি হইবে। তাহার দুর্ব্বলতা, উন্মাদনা কাহারও নিকটে উপেক্ষণীয় হইবে না, হওয়া সম্ভবও নহে। কারণ অসীম বিবাহিত, সাধারণের নিকটে শিক্ষিত নামে সমাদৃত, এবং সদ্‌বংশজাত। তাহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়, তাহার পতন লজ্জাজনক।

অসীমের ভয় হইতেছিল তাহার যত্নে নির্ম্মিত ধৈর্য্যের বাঁধ কখন্ বা মুকুলিকার সম্মুখে ভাঙ্গিয়া গিয়া স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। এমন ভাবে, এত কাছে থাকিয়া সে যে নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারে না। এখন তাহার স্থান ত্যাগই শ্রেয়, পলায়নই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কোথায় সে যাইবে? কোথায় জুড়াইবার স্থান? মিথ্যা অহঙ্কারে চিরন্তন স্থানটিও সে দুর্ল্লভ করিয়া ফেলিয়াছে। এখন সুব্রতা যদি ডাকিয়া তাহাকে তাহার হৃদয়ে স্থান দিবার আগ্রহ দেখায়, হিন্দু রমণীর আদর্শ স্মরণ করিয়া যদি ক্ষমার চক্ষে দেখে, পত্রে লিখিত তাহার যুক্তি খণ্ডন করিয়া সে যদি অসীমকে আকুল আহ্বান করে—তাহা হইলে অসীম যাইতে পারে, সুব্রতার প্রেম সাগরে অবগাহনের নিমিত্ত যাইতে পারে,—নহিলে তাহার কাছে যাইবার পথ তো সে আপনার হাতেই বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

অসীম যখন প্রতিমুহূর্ত্তে মুকুলের নিকট হইতে পলায়নের সংকল্প করিতেছিল, সেই সময় সুব্রতার চিঠি আসিল। অসীম আশাপূর্ণ হৃদয়ে চিঠির প্রতি ছত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহার প্রার্থিত 'আকুল আহ্বান' পাইল না। সে অকপট হৃদয়ে উদারতার সহিত পত্নীকে যাহাই লিখুক না কেন, কিন্তু তাহার অন্তস্তলে একটি ক্ষীণ আশা বাসা বাঁধিয়াছিল—সুব্রতা ডাকিবে, নিশ্চয় ডাকিয়া পাঠাইবে। তাহার ব্যতিক্রমে অসীমের হৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ হইল। অভিমানে চোখে জল আসিল। সেই সুব্রতা, নিমেষের অদর্শনে যাহার মুখচ্ছবি ম্লান হইয়া যাইত,

দূরে আসিবার প্রসঙ্গে যাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইত, আজীবন নিকটে রাখিয়া সংসারের শত দুঃখ দরিদ্রতা সহিবার জন্য যে প্রস্তুত হইয়াছিল—এ কি সেই সুব্রতার পত্র! এ কি সুব্রতার অন্তরের কথা—"শ্যাম সুন্দরের নাম লইবার পর কিরূপে আমি তোমাকে আসিতে লিখিব?" স্বামী যদি মিথ্যা মহত্ত্ব দেখাইতে গিয়া সত্যই একটা অভিনয়ের অবতারণা করিয়া থাকে, তাই বলিয়া স্ত্রী কি এমনি ভাবে তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতে পারে? কবেকার কোন্ তুচ্ছ শপথ স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী বড় করিয়া দেখে? ইহা কি পতিপ্রাণা পত্নীর উচিত, না কর্ত্তব্য?

অসীম স্ত্রীর উচিত অনুচিতের বিচার করিতে গিয়া নিজের পত্রে লিখিত শাস্ত্রীয় বিধান, অন্যে অনুরক্ত স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে থাকিবার নজীর—সমস্তই ভুলিয়া গেল। হিন্দুর মেয়ে যে স্বামীর মঙ্গল কামনায় স্বামীর চির-বিরহ অম্লান বদনে বরণ করিয়া লইতে পারে, স্বামীর নিমিত্ত আপনার ইহলোকের সুখ শান্তি তুচ্ছ করিতে পারে, অসীম তাহা বিস্মৃত হইল।

অসীম স্থির করিল, মুকুলকে ভুলিতে সে কোথাও ঘনগুল্ম দুর্গম বনখণ্ডের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইবে। সুব্রতার নিকটে যাইবে না; সুব্রতা কবেকার কোন তুচ্ছ কথার সূত্র ধরিয়া শ্যামসুন্দরের দোহাই দিয়া একক জীবন অতিবাহিত করিতে থাকুক। নিজের পথ সে নিজে দেখিয়া লইবে। তাহার কল্যাণ কামনায় মঙ্গল কামনায় কাহারও মাথা ব্যথা করিতে হইবে না।

হঠাৎ অসীমের অজানা পথের সাথী মিলিয়া গেল। তাহার পরিচিত কয়েকটি বাঙ্গালী বাবু পূজাবকাশে সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনে যাইতেছিলেন, অসীম তাঁহাদের সঙ্গী হইল। মিঃ রায় ও যমুনাদেবী আপত্তি করিলেন। মুকুল অনুযোগ করিয়া কহিল, "না তা হবে না। রামেশ্বর রেখে আপনি বাড়ী যান অসীমবাবু, সেখানে সবাই আপনার আশায় রয়েছেন। এবার বোম্বাই দেখা হ'ল, অন্য বার রামেশ্বর দেখা হবে।"

এ অনুরোধেও অসীম বিচলিত হইল না। তাহার সংকল্প অপ্রতিহতই রহিল।

রাত্রি দশটায় রামেশ্বরের গাড়ী। অসীম বিছানা বাঁধিয়া দ্রব্যাদি গুছাইয়া অপরাহ্ণে মিঃ রায়দের সহিত সমুদ্র তটে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল।

সোণার বাংলার মত শরতের শ্যামল সুষমা এখানে প্রীতির অরুণালোক বহিয়া না আনিলেও, মেঘশূন্য আকাশে সমুদ্রের নীলবুকে ও তরু পল্লবে শরৎ মধুর বেশে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সুদূর বাংলা হইতে শারদলক্ষ্মী তাঁহার প্রবাসী তনয় তনয়ার নিকটে শরতের স্নিগ্ধ সমীরণকে বার্ত্তাবহরূপে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাই শরতের চির-পরিচিত, চির মধুর বাতাসটি প্রত্যেকের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া হৃদয়ে শিহরণ তুলিয়া কাণে কাণে সন্ সন্ শব্দে পল্লী-জননীর নীরব আহ্বান জানাইতেছিল। শুভ্র সুন্দর নীলাকাশের সাদা সাদা মেঘশিশুগুলি ক্রীড়াচ্ছলে হাত ছানি দিয়া ইঙ্গিত করিতেছিল "ওরে প্রবাসী পরগৃহবাসী, ঘরে ফিরে যা।"

অসীমের হৃদয় এ আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু মনের সহিত হৃদয়ের যোগ ছিল না। মন ও হৃদয়ের অহর্নিশি দ্বন্দ্বে বিরোধে অসীমের শান্তি সুখ দূরে—বহুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

অসীম নির্জ্জনে এক খানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া অশ্রান্ত সমুদ্রের তরঙ্গলীলা দেখিতেছিল। সমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গের ন্যায় শত শত চিন্তা তাহার অন্তরে একবার উত্থিত হইয়া পরক্ষণে বিলীন হইতেছিল।—কোথায় স্বদেশে স্বজনের স্নেহে অভিষিক্ত হইয়া শান্তির জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ, আর কোথায় অনির্দ্দেশের উদ্দেশে এই অভিযান! অসীমের বিক্ষিপ্ত জীবন তরণীটি কূল হারাইয়া সীমা হারাইয়া, কোন্ অজানায় ভাসিয়া যাইতেছে তাহা সে জানে না, এ তরণী অনুকুল পবনে আবার কখনও তীরে ফিরিবে কি না তাহাও সে জানে না। কিন্তু না জানিলেও তাহার চির-পরিচিত শ্যামায়মান তীরভূমি, তটের মনোরম কুঞ্জবীথিকা, তীরবাসিনীদের স্নেহসুকোমল মুখচ্ছবি রহিয়া রহিয়া প্রাণের তারে ঘা দিয়া তাহাকে ব্যথিত বিহ্বল করিতে লাগিল।

"অসীম বাবু!"

অসীম আপনার চিন্তা ভুলিয়া স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিল। মুকুল পিতামাতার নিকট হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে কখন যে অসীমের পার্শ্বে আসিয়া-

ছিল, চিন্তাচ্ছন্ন অসীম তাহা বুঝিতেই পারে নাই। অসীম ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমায় ডাকছিলে মুকুল?"

মুকুল অসীমের অধিকৃত বেঞ্চের একপাশে বসিয়া জবাব করিল, "আজ তো আপনি একটুও বেড়ালেন না অসীম বাবু, বসে বসে কেবলি ভাবছেন। দেশেও গেলেন না; এখানেও রইলেন না। এখনি আপনার তীর্থ করবার এত সাধ? আপনি ভারী পুণ্যাত্মা!"

অসীম মনে মনে হাসিল—পুণ্যাত্মা বটে! যে নারকী হৃদয়কে শান্ত করিতে পারে না; শাসন করিতে পারে না; সে যদি পুণ্যাত্মা তাহা হইলে পাপাত্মা কে?

মুকুলকে একান্তে পাইয়া, মুকুলের মুখে পুণ্যাত্মা শুনিয়া অসীম আর নিজেকে সংযত করিতে পারিল না। তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভীষণ তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। অসীম সহসা উত্তেজিত হইয়া দুইহস্তে বক্ষ চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিল—"আমি পুণ্যাত্মা নই মুকুল, পাপিষ্ঠ, মহা পাপিষ্ঠ। আমার তীর্থে যাওয়া বিড়ম্বনা; আমার তীর্থ নাই; ধর্ম্ম নাই; পাপ পুণ্যের জ্ঞান নাই, আমার হৃদয় নরকের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে, তাই আমি আগুন নিবাতে যাচ্ছি, তীর্থ করতে নয়।"

মুকুল বিস্মিত হইল, ভীত হইল; এ আবার কি কথা? এ আবার কি ভাব, ইহার সহিত তো তাহার পরিচয় নাই। এই শান্ত, মধুর প্রকৃতি মানুষটি অকস্মাৎ এমন হইল কেন? কিসে ইহাকে উত্তেজিত করিল,—ইহা কি আশু রোগের আক্রমণ? না—অন্য কিছু? অন্য কিছুর অনুসন্ধানের নিমিত্ত অসীমের প্রতি উৎসুক দৃষ্টিটা তুলিয়াই মুকুলের চক্ষু আনত হইল। এ কি চোখ, এ কি দৃষ্টি! অসীমের চোখের ভিতর দিয়া অগ্নিশিখা যেন ঠিকরিয়া বাহিরে আসিতেছে। মুখখানি অস্বাভাবিক রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। ললাটের শিরা দপ্ দপ্ করিতেছে। অসীম প্রাণপণ বলে কি যেন চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে—তাহার সেই অকথিত বাণী বন্যার স্রোতের মত উচ্ছ্বসিত বেগে বাহিরে প্রকাশের জন্য আকুলি ব্যাকুলি করিতেছে।

কিয়ৎকাল নত মস্তকে থাকিয়া মুকুল মুখ তুলিতেই তাহার চোখে পড়িল, অসীম পলকহারা দৃষ্টিতে তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। মুকুল চাহিতেই উভয়ের চোখে চোখে মিলিত হইল। এমন মিলিত কত দিন হইয়াছে, কিন্তু এমনটি বুঝি আর কখনো হয় নাই। অসীমের এ নীরব দৃষ্টিটা রূপকথার 'সোণার কাঠির' মত মুকুলের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া নিদ্রিতা নারী-প্রকৃতিটিকে সহসা জাগ্রত করিয়া তুলিল।

এতদিন যাহার নিকটে আপনার যৌবনের খবর অজ্ঞাত ছিল, নারীত্বের খবর অজ্ঞাত ছিল, শরতের স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় এক মুগ্ধ যুবকের নেত্রতলে সেই কিশোরী নিমেষের মধ্যে সঙ্কোচে সম্ভ্রমে নারীত্বের পূর্ণতায় যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। কিশোরীর মধ্যে নারী সজাগ হইয়া প্রথমেই উপলব্ধি করিল—এ বিশাল বিশ্ব বড়ই বিশাল, বড়ই বৃহৎ, পিতামাতার স্নেহবেষ্টনে আবদ্ধ হইয়া ইহার সীমা অতিক্রম করা সহজ নহে। এখানকার পথযাত্রায় পদে পদে সাথী চাই, সঙ্গী নহিলে এখানকার পথ যেমন দুর্গম, তেমনি জটিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহার সহিত এত দিন অবাধে মিশিয়া মুকুল কত বর্ণমুখর দিবা, অলস সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়াছে; যাহার নিকটে ভ্রমেও সঙ্কোচ আসে নাই, সংশয়ের স্থান ছিল না, আজ তাহারই পানে চোখ তুলিয়া কথা বলিতে মুকুলের হৃদয় অস্ফুট মুকুলের মত ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিতে চাহিল না। মুকুলের সদ্যো-জাগ্রত হৃদয় অসীমকে শুধু 'অসীম' ভাবিতে পারিল না, অসীম সহসা তরুণীর হৃদয়ের সুগোপন প্রান্তে অপরিসীম রূপে প্রতিভাত হইল। কিন্তু হৃদয়ের এ ভাবটি মুকুল ধরিতে পারিল না, ধরিবার চেষ্টাও করিল না।

এতক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকা ভদ্রতা বিরুদ্ধ ভাবিয়া মুকুল নিজেই প্রথমে কথা কহিল। নত মস্তকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ক'দিন পর এখানে ফিরে আস্‌বেন? বাবা পুণায় বেড়াতে যেতে চেয়েছেন, আপনি ঘুরে এলে তারপর সকলে একসঙ্গে বেড়াতে যাব।"

মুকুল ইচ্ছাপূর্ব্বক নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করিল। এই দণ্ডে অসীম যে বেশে যে ভাষায় মুকুলের নিকটে কি কতকগুলা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহারই সূত্র ধরিয়া সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতে মুকুলের ইচ্ছা হইল না। কি জানি কেন তাহা স্মরণ করিবামাত্র লজ্জায় মুকুল ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিল।

অসীম উত্তেজনার বশে মুকুলের কাছে নিজেকে একটু-

খানি ধরা দিয়া কম অনুতপ্ত হইল না। তাহার চোখের ভাষায় যাহাই কেন ফুটিয়া উঠুক না, মুখের প্রতি রেখায় যাহাই প্রকাশ হউক না কেন, কিন্তু সে তো মুকুলকে কিছুই জানাইতে চাহে না! মুকুল পাছে জানিতে পারে, পাছে বুঝিতে পারে, সেই ভয়েই না তাহার দূরে পলায়নের প্রয়াস। মুকুল তাহার উন্মাদনাপূর্ণ বাক্যবলীর বিষয়ে কোনই প্রশ্ন করিল না দেখিয়া অসীম যেন বাঁচিয়া গেল, মুক্তিলাভ করিল।

কিয়ৎকাল পর অসীম উদ্বেলিত হৃদয় সংযত করিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমাদের সঙ্গে আমার পুণায় বেড়ান হবে না মুকুল, সমস্ত ছুটিটাই আমি রামেশ্বরে থাকবো স্থির ক'রেচি। রামেশ্বর থেকে আমি এখানে আর ফিরবো না; কলেজ খোলবার দিন একেবারে কানপুরেই যাব।" বলিতে বলিতে অসীম উঠিয়া পড়িল। নির্জ্জন সন্ধ্যায় মুকুলের সহিত একাসনে বসিয়া থাকিতে তাহার সাহস হইল না। মিঃ রায় যমুনা দেবীর সহিত যে দিকে বেড়াইতেছিলেন অসীম সেই দিকে চলিয়া গেল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুই মাস অতিবাহিত হইয়াছে। ধরণীর দ্বার হইতে শরতের বিদায়ের পর হেমন্ত আসিয়াছিল, হেমন্তের পালাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শীত নিকটবর্ত্তী— প্রভাতের কুহেলিকা, মৃদু মৃদু শীতল বাতাস শীতের আসন্ন বারতা প্রচার করিতেছে।

বোম্বাই পুণা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণান্তে মিঃ রায় স্ত্রী কন্যা-সহ কানপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ছুটী শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অসীম রামেশ্বর হইতে কানপুর আসিয়াছে। এতদিন মিঃ রায়ের সহিত তাহার নিয়মিত পত্র ব্যবহার হইয়াছে।

দেড় মাস পর রায় পরিবারের সহিত অসীমের দেখা। মিঃ রায় অসীমকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, যমুনা দেবী দুঃখ করিতে লাগিলেন। সব চেয়ে ব্যথানুভব করিল মুকুল। এই কি সেই অসীম? সেই হাস্যময় উজ্জ্বল চক্ষের কোলে কালী মাখা হইয়াছে। ললাট চিন্তায় কুঞ্চিত; মুখ শুষ্ক পাণ্ডুর; শরীর শুকাইয়া অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। গায়ের বর্ণ মলিন। লম্বা লম্বা রুক্ষ চুলের না আছে যত্ন, না আছে পারিপাট্য। অসীম সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন, অন্যমনস্ক। এ অসীমকে অসীম বলিয়া চেনাই যায় না।

কেন অসীমের এমন হইল, ইহার কারণ কি, মুকুলের জানিতে ইচ্ছা হইলেও মুকুল জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। কিসে যেন তাহার সহজ কণ্ঠ রোধ করিয়া ফেলিয়াছিল। এ দেড়মাসে অসীমের যেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, মুকুলের হইয়াছিল তদধিক। মুকুল এখন জ্ঞানশূন্যা কৌতুকময়ী বালিকা নাই। তাহার মুকুলিত মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, কিশোর জীবনের অনাবিল আনন্দ কৌতুক তরুণীর হৃদয় হইতে 'যাই যাই' করিতেছে। নারীর কুণ্ঠা, নারীর লজ্জা ধীরে ধীরে তাহাতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। শরতের এক মধুর সন্ধ্যায় অবারিত আকাশতলে, অনন্ত সমুদ্রকূলে নেত্রের তড়িৎ স্পর্শে যে নারী-প্রকৃতির প্রথম জাগরণ হইয়াছিল, সে সমানে সজাগ অবস্থাতেই রহিয়াছে। মায়া নিদ্রা তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। সুপ্তির ঘোর আর তাহাকে স্বপ্ন-বিভোরা বালিকায় রূপান্তরিত করে নাই। তাই পূর্ব্বের ন্যায় অকুণ্ঠিত হৃদয়ে মুকুল অসীমের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে পারিল না।

মুকুল না পারিলেও যমুনাদেবী নীরব রহিলেন না। মাতৃসম্বোধনে যে মাতৃহারা তাঁহার মাতৃহৃদয়ে স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহার ম্লান মুখচ্ছবি তার শীর্ণমূর্ত্তি তাঁহাকে উদ্বেলিত করিল।

স্বাগত সম্ভাষণের পর যমুনা অসীমকে নিকটে বসাইয়া অনুযোগের সহিত বলিলেন, "রামেশ্বর ভাল জায়গা, সেখানে তুমি বেশ ছিলে বলছ, কিন্তু তোমার তো বেশ থাকার কোন প্রমাণ আমি পাচ্ছি না বাবা! তোমার শরীর এ কি হয়ে গেচে? দেখে চেনাই দায়। শরীর এমন হয়েছে অথচ প্রতিপত্রেই তুমি শরীর ভাল থাকার সংবাদ ওঁকে দিয়েছ—এর মানে কি অসীম?"

অসীম ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া স্মিত মুখে বলিল, "আপনি বিশ্বাস করছেন না মা, কিন্তু আমি বেশ ছিলাম, কিছু অসুখ বোধ করি নি। আজ দিন চারেক হল সন্ধ্যা

বেলা একটু একটু জ্বর মতন হচ্ছে, সেই জন্যেই বুঝি আপনাদের চোখে আমায় খারাপ লাগছে।”

যমুনা উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন, “দিন চারেক হল জ্বর বোধ করচ, অথচ তাই নিয়েই কলেজে যাচ্ছ, ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাবার নামটও নেই। জ্বর জিনিসটি উপেক্ষার নয় অসীম, সময়ে অল্প জ্বরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।”

মিঃ রায় গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “ও সব ভাল নয় অসীম। তুমি কদিন হল জ্বর অনুভব করছ? আমার মনে হয় তোমার এ জ্বর দিন চারেকের নয়, অনেক দিন থেকেই হচ্ছে তুমি গা করনি, নইলে এমন বিশ্রী চেহারা হবে কেন।”

যমুনা স্বামীর কথায় সায় দিয়া বলিলেন, “আমারও তাই মনে হয়। রোগ ভোগ না হলে মানুষের চেহারা এত খারাপ হতেই পারে না।”

পিতা মাতার মন্তব্যে মুকুল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার চুপচাপ থাকা শোভন নহে ভাবিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “ডাক্তার সাহেবকে ডেকে ওঁকে একবার দেখাও না মা সেবার তোমারও এমনি ঘুসঘুসে জ্বর হয়েছিল, একটা মিক্‌শ্চার খেয়েই তুমি সেরে উঠেছিলে।”

মুকুলের আগ্রহে অসীমের হৃদয় আর্দ্র হইল। এত দয়া এত করুণা! বিধাতা একাধারে এত রূপ গুণের আধার করিয়া ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অসীম দীপ্তচোখের মুগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা মুকুলকে অভিনন্দন করিয়া আপত্তির স্বরে কহিল, “আপনারা শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন, এমন একটু আধটু জ্বর আমাদের মত ম্যালেরিয়া দেশের বাসিন্দাদের হয়েই থাকে। ওতে ভাবনার কিছুই নেই, ও জ্বর আপনা আপনিই সেরে যাবে, ডাক্তার ওষুধের দরকার হবে না।”

যমুনা বলিলেন, “ও তোমার ম্যালেরিয়া নয় অসীম। তুমি অনেকদিন দেশে যাও নি, এখনও কি তোমার সেই পুরাণো ম্যালেরিয়া শরীরে বাসা বেঁধে রয়েছে? তা নয়, আমার মনে হয় ও নিশ্চয় অন্য জ্বরের বিষ শরীরে ঢুকেছে। দিন কতক রোগীর মতন সাবধানে থেকে ওষুধ পত্র খেলেই ভাল হয়ে যাবে।”

অসীম হাসিয়া জবাব করিল, “এতদিন মার হাতের খাবার খাইনি বলে আমায় রোগা দেখচেন মা। এখন থেকে সেইটে পেলেই আবার আমি তাজা হয়ে উঠবো। ও আমার জ্বর টর নয়, আমি জ্বর গ্রাহ্য করি না।”

মাতৃহীন ছেলেটির স্নেহ আদায়ের দাবীতে সকলের চক্ষুই অশ্রুসিক্ত হইল। অনেক দিনের পর পূর্ব্বের ন্যায় হাসি গল্পে নীরব সন্ধ্যা মুখর হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

শ্রীগিরিবালা দেবী।

গজল গান

(কবি নজরুলের—“কে বিদেশী মন উদাসী”—ইত্যাদি সুরে)

এ ভুবনে পাই কেমনে জীবন ধনে জীবন মাঝে!
ঘোর বিরহে অশ্রু বহে, হৃদয় দহে, দুখ বিরাজে!
ফুরিয়ে গেছে স্বপন আশা,
বুকের তলে শোকের বাসা,
শমন ভয়ে ভুলেছি হাসা,
রই একেলা লোক সমাজে!
মিথ্যা মোহে মোহিত হয়ে,
দিবস রাতি চলেছি বয়ে,
অমিয় ভেবে গরল পিয়ে
রয়েছি আজো সব অকাজে!
রমণী মাঝে সুধা যে খুঁজি,
র'বে না যাহা তাহারে পূজি,
কাঁদি নিশীথে নিশুতি রাতে,
কাঁদি গো একা সকাল সাঁজে।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ

বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞানের উপর রবীন্দ্রনাথের মতামত লইয়া যে আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে গিরীন্দ্রশেখর বাবু সম্বন্ধে আমার প্রধান অভিযোগের কোনও উত্তর পাই নাই; পুনরায় "প্রবাসী"র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় প্রতিবাদের আসরে নূতন করিয়া যোগদান করিয়া, মাত্র কথার কলহ বাড়াইয়াছেন ও অশিষ্ট মন্তব্য প্রকাশে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান আলোচনায় আমি দেখাইতে চাই Pycho-analysis সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নাই; গিরীন্দ্রশেখর বাবু ও তাঁহার অনুচরবর্গ কবিকে ভুল বুঝিয়া অনর্থক আলোচনার সৃষ্টি করিয়াছেন।

"প্রবাসী"র আষাঢ় সংখ্যায় (১৩৩৫), রবীন্দ্রনাথ Psycho analysis সম্বন্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন, সে গুলির কোনও উত্তর না দিয়া গিরীন্দ্রবাবু বলিয়া বসিলেন--"রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞান-নির্জ্ঞানের পার্থক্য ভুলিয়া কথা বলিয়াছেন।" ইহার উত্তরে বলি, গিরীন্দ্রবাবুর এই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন হইতে কোথাও প্রমাণিত হয় না। উক্ত সংখ্যা "প্রবাসী"র ৩১৯ পৃষ্ঠায় (১ম স্তম্ভে) রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ যে কতদূর সত্য তাহা নিম্নলিখিত মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে প্রমাণিত হয়।

"As a further complication we have to note that in addition to the constant symbolism which belongs says Freud, to unconscious thinking as a whole……There is also *the individual factor.*" (Psycho Analysis p. 112—113 by Barbara Low).

Freud বলিতেছেন—Only it is necessary to keep in mind *the curious plasticity of psychic material.* Now and then a symbol in the dream content may have to be interpreted not symbolically but according to its real meaning; at another time the dreamer owing to a peculiar set of recollections may create for himself the right to use anything whatever as a sexual symbol. ("Interpretation of Dreams p. 246).

এই 'individual factor' ও 'curious plasticity of the psychical material" ফ্রয়েড্ বর্ণিত Free Association Methodএর সাহায্যে কিছু কিছু ধরা যাইতে পারে; অন্য উপায়ে নহে। এক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী নির্জ্ঞান জানিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র; কিন্তু রঙীন হালদার মহাশয়ের "The working of an unconscious wish in the creation of Poetry and Drama." প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার এইরূপ চেষ্টাই আছে; সুতরাং এই প্রবন্ধকে উচ্চাঙ্গের Psycho-analytic প্রবন্ধ বলায় গিরীন্দ্রবাবুর Psycho-analysis সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রমাণিত হয়।

উক্ত সংখ্যা "প্রবাসী"র ৩৪২ পৃষ্ঠায় (২য় স্তম্ভে) রবীন্দ্রনাথের আপত্তি যে সত্য তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃত বাক্যে প্রমাণিত হয়ঃ—

"Further it must be borne in mind that resistance is not a monopoly of the patient; *the analyst himself has his own complexes* and it is therefore regarded as desirable that he should himself submit to analytical examinatiou."—Ainsley's Psycho-anlysis, p. 84.

'The key to the dream lies in free association. The association cannot be really free if it is *influenced by pre-conceived theories.*" (Ibid, p. 57).

নির্জ্ঞানের প্রতিশব্দ 'Sub-conscious' লিখিয়াছিলাম বলিয়া যোগীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন আমি Psycho-analysisএর বিষয় কি তাহাই জানি না। কিন্তু Sully তাঁহার 'Outlines of Psychology'র ৭৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলিতেছেন "Unconscious"এর পরিবর্ত্তে "Sub-conscious" কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু

গিরীন্দ্রবাবু স্বয়ং তাঁহার পুস্তকে 'unconscious'এর পরিবর্ত্তে Sub-conscious ব্যবহার করিয়াছেন; তাঁহার প্রণীত "Concept of Repression" পৃঃ ১০, ১১, ১৩-১৪ দ্রষ্টব্য। সুতরাং যোগীন্দ্রবাবুর কথামত ইহাই দাঁড়ায় যে গিরীন্দ্রবাবুও Psycho-analysisএর বিষয় কি তাহাই জানেন না! যোগীন্দ্রবাবু কি গিরীন্দ্রবাবুর পুস্তকখানি না পড়িয়াই ডঙ্কা বাজাইতেছেন?

Psycho analysis বলিতে কি বুঝায় তাহা যে সরসীবাবু জানেন তাহার প্রমাণ সরসীবাবু লিখিত 'মনের কথা' নামক মনোবৈশ্লেষিক বিজ্ঞানের পুস্তকে গিরীন্দ্রবাবুর লিখিত ভূমিকা।

আলোচনা শেষ করিলাম। "প্রবাসী"র সুধী পাঠকবর্গ বিচার করিবেন Psycho-analysis সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ সত্য কি না, এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গিরীন্দ্রবাবুর অভিযোগ শিষ্ট কি না। *

৺অনিলকুমার বসু।

* ডাঃ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় প্রথমে আমার প্রবন্ধের যে প্রতিবাদ লেখেন, তাহার প্রতিবাদ আমি প্রবাসীতে পাঠাইয়াছিলাম এবং উহা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির একটী প্রতিবাদ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। আমার বর্ত্তমান আলোচনা তাহারই প্রতিবাদ। ইহাও প্রথমে 'প্রবাসী'তে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় ইহা না ছাপাইয়া ফেরৎ দিয়াছেন।—লেখক।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণম্ প্রণীত ইংরাজী হিন্দুদর্শনের ইতিহাস

ভগবদ্গীতা (৩)

(অনুবাদ)

যে সময়ে গীতার উপদেশ প্রদত্ত হয়, তৎকালে পরমাত্মা ও জীবাত্মা সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আত্ম-সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত উপনিষদুক্ত প্রাচীন মতবাদ, প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিলেই মুক্তি-লাভ সম্ভব—সংখ্যের এই সিদ্ধান্ত, মীমাংসক দিগের মতে, কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলেই মনুষ্য জীবন সার্থকতা লাভ করিতে পারে, একনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারা মুক্তির বিমল আনন্দ প্রাপ্তি, ভক্তিবাদিগণের এই মত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তি গুলিকে সমাধি বলে শান্ত করিতে পারিলেই মনুষ্যঃকৃতকৃত্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয়,—যোগ-শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত—এগুলি সমস্তই, তৎকালে প্রচলিত ছিল। পরমাত্মাকে, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম এবং সগুণ পরমেশ্বর—এই দুই প্রকারেই সিদ্ধান্ত করা হইত। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত-বাদকে গীতা সামঞ্জস্য করিয়া একটী সুপ্রতিষ্ঠিত বন্ধন-সূত্রে গাঁথিয়া লইয়া পরস্পর অম্বিত করিয়া লইয়াছেন। এই কারণেই আমরা গীতায় মুক্তি ও তাহার সাধন সম্বন্ধে আপাততঃ বিরোধী সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই। এইরূপ পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত গীতায় নিবদ্ধ আছে দেখিয়াই, ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন রূপে সেই বিরোধ পরিহারের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পার্ব্বে ও হপ্‌কিন্স সাহেব মনে করেন যে, গীতায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হস্তস্পর্শ পড়িয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে, সাংখ্য যোগের অনুসরণে, মূল গীতা একখানা ধর্ম্মগ্রন্থরূপে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহাকে, পরবর্ত্তী দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদের উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছিল, পার্ব্বে সাহেবের এইরূপ ধারণা। অপেক্ষাকৃত নবীন উপনিষদে যাহা বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত ছিল, তাহাকেই কৃষ্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া গীতা রচিত হইয়াছে —ইহাই হপ্‌কিন্স সাহেবের সিদ্ধান্ত। শ্রীযুক্ত কিথ্ সাহেবের মতে, গীতা মূলতঃ শ্বেতাশ্বতরের শ্রেণীর একখানা উপনিষদ ছিল, তাহাকেই পরে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মের অনুযায়ী করিয়া লওয়া হইয়াছে। হোলজ্‌ম্যান বলেন যে, অদ্বৈত মতের গ্রন্থকে বৈষ্ণব-মতানুযায়ী পুনঃসংস্কৃত করিয়াই

গীতার উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে আগত মত বাদের বিভিন্ন মুখিনী ধারা গুলি একত্র মিশিয়া গিয়া গীতাকারের মনে ক্রিয়া উৎপাদন করিয়াছিল,—বার্ণেট সাহেবের এইরূপ মত। ডয়সনের মতে গীতা, ঔপনিষদিক অদ্বয়-বাদের পতনাবস্থার গ্রন্থ বলিয়াই অনুমান করা হইয়াছে!

কিন্তু এই সকল অনুমানের কোনটীই গ্রহণ করিবার আমাদের কোন আশুক নাই। কালের পরিবর্ত্তন বশতঃ, মহাভারতের সময়ে, যে অবস্থান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, সেই অবস্থান্তরের সহিত মিলাইয়া লইয়া, গীতায়, উপনিষদের আদর্শের কার্য্যতঃ পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হইয়াছিল। উপনিষদে যে দার্শনিক ব্রহ্মবাদ কথিত হইয়াছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পন্ন লোকদিগের হিতার্থ সেই ব্রহ্মবাদকেই ধর্ম্মমতে পরিণত করিয়াই গীতার উৎপত্তি হইয়াছে। এতদ্ দ্বারা বুঝা যায় যে, উপনিষদের গভীর ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের মধ্যেই, জাগ্রত সরস সগুণ পরমেশ্বর ভক্তির উপাদান রহিয়াছে। উপনিষদে যাহা নির্গুণ পরম-তত্ত্ব তাহাই মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও প্রেম পিপাসার পরিপূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত। উপনিষদের দৃষ্টি শুষ্ক বিজ্ঞান ও কঠোর বিচারে পর্য্যবসিত ছিল; গীতা সে দিকে জোর না দিয়া মানুষের যাহা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নিষ্পাদ্য, সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে। পরবর্ত্তী কালের কোন কোন উপনিষদেও ইহা দেখা যায়। এখানে, বিশ্বাসের আহ্বানে, ভক্তির দেবতা ভক্তের ডাক শুনিতে পান। গীতার বিশেষত্ব কি? গীতা কি করিয়াছে? গীতা এমন একটা মিলন-ক্ষেত্র দেখাইয়াছে, যেখানে উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা ও আচার-ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই তত্ত্বই গীতা ভারতের নরনারীর অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে।

চিন্তার বিভিন্ন-মুখী ধারাগুলিকে গীতা একটী মাত্র কেন্দ্রে প্রবাহিত করিয়া তুলিতে কতটা সাফল্য লাভ করিয়াছে, সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। ভারতীয় লোকের চিরকালের বিশ্বাস এই যে, সর্ব্বপ্রকার মত বিরোধের সামঞ্জস্য গীতার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কিন্তু মনে করেন যে, গীতাকারের সুনিপুণ করস্পর্শেও, পরস্পর বিরোধী বাদ-গুলি—উহারা যতই গরিমোজ্জ্বল হউক না কেন—একটা মিলন ভূমিতে ঐক্য-লাভ করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে আমরা, এই আলোচনার প্রারম্ভ-মুখেই, কোন কথা জোর করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি না।

জীবনের যে সকল রহস্য আছে তাহাদের সমাধান, এবং কিরূপে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ হইতে পারা যায় তদ্বিষয়ে প্ররোচনা,—ইহাই গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য। স্পষ্টতই গীতা একখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ, যোগ-শাস্ত্র। সামাজিক ধর্ম্ম কর্ম্মের, বর্ণ-ধর্ম্মের প্রতিপাদনই গীতার উদ্দেশ্য; সুতরাং গীতার উপদেশ, সমাজের সহিত সংস্পর্শ রাখিয়াই প্রদত্ত হইয়াছিল। কর্ম্ম অর্থেই, 'যোগ' শব্দটী গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এই জগতের নিয়ামক ও পালক যিনি পরমেশ্বর, তাঁহাকে লাভ করাই যোগের উদ্দেশ্য। আত্মার সমস্ত শক্তিকে পরমেশ্বরের প্রতি অভিমুখীন করা, -ঈশ্বরে যুক্ত করা; জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি—লইয়াই ত আত্মা;—এই আত্মাকে, যিনি আত্মার পরমাত্মা,—তাঁহাতে যুক্ত করিতে পারাই যোগের প্রকৃত অর্থ। সমগ্র জীবনের গতিকে এমন করিয়া পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, এমন একটা দৃঢ় অটল, অপ্রকাশ্য শক্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে যে, তাহার বলে কামনা বাসনাদির উপরে প্রভুত্ব করিতে পারা যায়। সংসারের সর্ব্বপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতে আত্মার কোন ক্ষতি হইবে না, আত্মা অপ্রকম্পিত থাকিতে,—আত্মাকে তাদৃশ শক্তি সম্পন্ন করাই যোগের উদ্দেশ্য। সংসারের সুখ-দুঃখ জয়-পরাজয়—কিছু আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, কাতর করিতে পারিবে না। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যোগকে তাহার উপায় বা সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। পতঞ্জলি কথিত যোগ, চিত্তবৃত্তির একটা সাধন বিশেষ, যদ্দ্বারা আমাদের অধ্যাত্ম্য-জ্ঞান প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে, চিত্ত বিপর্য্যয়াদি শূন্য হইয়া যায়, এবং পরমাত্ম তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। ইহার প্রভাবে আমরা চিত্ত সংযমে সমর্থ হইতে পারি এবং সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ঈশ্বর লাভে কৃতার্থ হইতে পারি—যেন আমাদের সমগ্র জীবন ভগবৎ কর্ম্মে একান্ত ভাবে নিয়োজিত থাকিতে পারে। ইহার বলে, আত্মার মধ্যে পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়, তাঁহাতে একান্ত নিষ্ঠা ও ভক্তি উপস্থিত

হয়, এবং পরিশেষে এই সান্ত স্ফুলিঙ্গটী অনন্ত পরমাত্ম-জ্যোতিতে পরিণত হইয়া যায়। সমুদায় যোগ-সাধন গুলি, আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কোন সাধনই কার্য্যকরী হইতে পারে না, তাহার মূলে যদি দার্শনিক ভিত্তি না থাকে। এই জন্যই গীতোক্ত যোগ সাধন, ব্রহ্ম বিদ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সত্যানুসন্ধানার্থ বিচার এবং সেই সত্যকে জীবনের কার্য্যের উপযোগী করিয়া লওয়া, জ্ঞান-নিষ্ঠা ও কর্ম্ম-নিষ্ঠা,—এ উভয়ই গীতায় সুপ্রণালীবদ্ধ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচক বাক্যে,—যাহা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাতে,—এই জন্যই, আমরা "ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদি যোগশাস্ত্রে"—এই উক্তিটী দেখিতে পাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

বর্ষা-মঙ্গল

এ মধু বরষা আজি
হরষ আনে।
পুলকিত তনু মন
কাজরী গানে!
আজ নব বরষায়,
হিয়া কার ভরসায়
নূতন নবীন-আশা
জাগাল প্রাণে!
এ মধু বরষা আজি
হরষ আনে।

দাদুরীরা ডাকে সবে
আজি সঘনে,
গুমরি গুমরি মরে
দেয়া গগনে।
পথ-ঘাট নিরজন,
আঁধিয়ার এ ভবন
উজল করিলে তুমি
শুভ লগনে।
দাদুরীরা ডাকে সবে
আজি সঘনে।

বনের আড়ালে মরি
শেফালী জাগে।
মনের আড়ালে কার
পরশ লাগে!
পরিয়া ফুলের দুল,
শিহরিয়া নীপকুল
শ্যাম-পরশন মধু
মাধুরী মাগে।
বনের আড়ালে মরি
শেফালী জাগে।

মেলিয়া অলস-আঁখি
চাহে করবী,
কেতকী আজিকে হল
রূপ গরবী।
ভুঁইচাঁপা বেল জুঁই,
মাথায়ে তুলিল ভুঁই
চকিতে আঁধার ভেদি
হাসিল রবি।
মেলিয়া অলস আঁখি
চাহে করবী!

জাগিল প্রকৃতি-বুকে
কোন্ খেয়ালী,
হৃদয়ে হৃদয়ে জাগে
রূপ দেয়ালী।
নাহি বাধা নাহি ভয়,
নাহি জয় পরাজয়
আকাশে বাতাসে ভরা
শুধু হেঁয়ালী।
জাগিল প্রকৃতি বুকে
কোন্ খেয়ালী!

শ্রীহরিপদ গুহ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ

(নাটক)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত। শ্রীসরস্বতী প্রেস, কলিকাতা, পৃঃ ১৩১, মূল্য ১৲

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি কতকগুলি প্রামাণিক গ্রন্থে চৈতন্যদেবের সুমধুর লীলা বর্ণিত আছে, কিন্তু সে সকল গ্রন্থের ভাষা সাধারণের কাছে সহজবোধ্য নয়। ভাগ্যবান ভক্ত ব্যতীত সেই দুর্ব্বোধ ভাষার কঠিন ত্বক ভেদ করিয়া ভিতরের সুদুর্লভ বস্তু আস্বাদন অন্যের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই জন্যই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর তত্ত্ব ও লীলা গ্রন্থগুলি সাধারণের নিকট সুপরিচিত নহে। ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সেই বাধা দূর করিয়া সাধারণ পাঠককে সুমধুর ও সুপবিত্র গৌর-লীলায় রসাস্বাদন করাইবার সাধু উদ্দেশ্যে সমালোচ্য গ্রন্থখানি সরল ভাষায় ও নাটকাকারে রচনা করিয়াছেন। বেশ চিত্তাকর্ষক ভাবেই গৌরাঙ্গলীলার একটি অংশ গ্রন্থখানিতে বর্ণিত হইয়াছে। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা অগাধ অপার সমুদ্রবৎ, সে সমুদ্রের এক অঞ্জলি মাত্র আস্বাদনেই মানব কৃতার্থ হয়। ভক্ত গ্রন্থকার পাঠককে সেই অমৃতাঞ্জলিই পান করাইয়া ধন্য করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ভক্তিভরে পাঠ করিলে পাঠক শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের মূল কারণ ও প্রয়োজন, শ্রীঅদ্বৈতের একাগ্র সাধনা ও আকর্ষণ, শ্রীগদাধরের শ্রীহরিদাসের অপরূপ ভক্তি ও মাধুর্য্য প্রভৃতি অনেক কথাই মোটামুটি জানিতে পারিবেন ও গোস্বামিগণ বিরচিত আদি ও মূল গ্রন্থগুলি পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থ-রচনার ইহাই সার্থকতা। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিশু-পুত্র কৃষ্ণমিশ্রের চিত্রটি বড়ই স্বাভাবিক ও মনোহারী হইয়াছে। অন্যান্য পার্ষদ ভক্তগণের চরিত্র-মাধুর্য্যও বেশ হৃদয়গ্রাহী রূপে প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীশচীমাতা, সীতা দেবী, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতাও সুচারুরূপে অঙ্কিত। পুস্তকের নাটকাকারটি কিন্তু উপযোগী হয় নাই, রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলে পুস্তকখানি দর্শককে মুগ্ধ করিবে বলিয়া আমাদের মনে না। নাটকীয় কলা-কৌশলও বেশ সঙ্গত ও উচ্চাঙ্গের হয় নাই। বোধ হয় সরল গদ্যে রচিত হইলে পুস্তকখানি গৌরাঙ্গ-লীলা প্রচারের কার্য্যে আরও বেশী সহায়তা করিতে পারিত। কাগজ, ছাপা মন্দ নয়।

বন-ফুল

(কাব্য) ২য় সংস্করণ—শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কাশিমবাজার প্রতিভা প্রিন্টিংওয়ার্কস। পৃঃ ৭৮, মূল্য ৷৷০

কবিতাগুলি পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। সমস্ত কবিতার মধ্যেই জাহ্নবীর পূতধারার মত একটি স্বচ্ছ পবিত্র ও হৃদয়-মন-স্নিগ্ধকারী ভাব স্রোত অবিরাম গতি-ভঙ্গীতে চরম ও পরম আশ্রয় সেই ভগবচ্চরণ-সিন্ধু উদ্দেশেই চলিয়াছে। ভাবে ভাষায় ছন্দে অনেকগুলি কবিতাই অনবদ্য সুন্দর। প্রথম কবিতা "কৃষ্ণার্পণং" হইতেই সমগ্র পুস্তকখানির প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তু পরিস্ফুট। আজ-কাল পঙ্কিল কবিতা-স্রোতে বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্র কলুষিত, এমন দিনেও যে এই রকম কাব্য-গ্রন্থের ২য় সংস্করণ হইয়াছে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি। কাগজ ছাপা ভাল।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, আধ্যাত্মিক ও সাধারণ অর্থ-সম্বলিত – শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। আর্য্যমিশন প্রেসে মুদ্রিত, আদিনাথ আশ্রম, কলিকাতা ৪।১ কাশী ঘোষ লেন হইতে প্রকাশিত। কাগজে বাঁধাই মূল্য ২৲

গ্রন্থকার গীতার প্রত্যেক শ্লোকেরই একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ভাষা ও ভাবের সংমিশ্রণ তেমন হৃদয়গ্রাহী না হওয়ায় গ্রন্থ প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বহু স্থলেই কষ্ট কল্পনা আছে, কাযেই দার্শনিক হিসাবে গ্রন্থের বিশেষ কোনও মূল্য নাই। দার্শনিক গ্রন্থে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে অনুভূতির দিক্‌টা এমন ভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতে হয় যে পাঠকের আর কোনরূপ প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। প্রস্তাবিত গ্রন্থে মাঝে মাঝে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু অনুভূতির দিক্‌টা প্রায়ই বাদ পড়িয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার নিজের ভাবে সব কথা একধারায় লিখিয়া গিয়াছেন, পাঠকের হৃদয়ে উহা কিছু কায করিতে পারে কিনা মোটেই ভাবিয়া দেখেন নাই। গ্রন্থে ভাষার সরলতা ও ভাবের যথাযথ সমাবেশ থাকিলে গ্রন্থখানা সাধারণের পাঠোপযোগী হইতে পারিত। ছাপা কাগজ মন্দ নহে।

APPLIED THEOLOGY

শ্রীঅমরনাথ সিংহ বি-এল প্রণীত। ২৪০,২ অপার সারকুলার রোড, শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত। মূল্য ১৲

এই ইংরাজী গ্রন্থে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ভিতর দিয়া প্রকৃত সত্যের পথ নির্দ্দেশ করাই গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য। ইহাতে ভগবানের মাহাত্ম্য, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বরের অনুভূতি, কর্ম্মমার্গ প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। আলোচনায় গ্রন্থকারের গবেষণা শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও মোটামুটি বিষয় বুঝানোর পক্ষে গ্রন্থকার যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ভাব ও ভাষার উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা সাধারণের উপযোগী হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। গ্রন্থকারের যুক্তি-তর্কে

বিশেষ কিছু নাই, অবান্তর কথাই বহুল পরিমাণে গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, সুতরাং দার্শনিক হিসাবে গ্রন্থের তেমন মূল্য নাই। পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত হিন্দু দর্শনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া গ্রন্থকার অনেক স্থলেই ভুল করিয়া বসিয়াছেন। 'Pantheism'কে "সোঽহংবাদ" বলিয়া ব্যাখ্যা করায় গ্রন্থকারের দার্শনিকবুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। ফল কথা, এই গ্রন্থে বিষয়ীদের কতকটা উপকার সাধিত হইতে পারে, কিন্তু দার্শনিকের কাছে ইহা মূল্যহীন।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন

বঙ্গভাষায় "গ্রীক্‌দর্শন" প্রণেতা শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী প্রণীত। "মানসী" প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ২৲

ইংরেজ লেখকগণের এই একটা বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইউরোপীয় কোনও ভাষায় একখানা কোনও গবেষণামূলক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই, ইংরেজ জাতি আপন ভাষায় সেই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন। এই কার্য্যে ইংরেজী লেখকেরও অভাব হয় না; পাঠকেরও অভাব লক্ষিত হয় না। ইংরেজ জাতির এটা একটা বিশেষত্ব-সূচক গৌরব। এইরূপে ক্রমেই ইংরেজী সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের এই বঙ্গদেশ নিতান্তই পশ্চাৎ-পদ হইয়া পড়িয়াছে। ক্যাণ্ট ও হেগেলের বিশ্ব বিশ্রুত দার্শনিক গ্রন্থ ইংরেজেরা বারংবার নানা ভাবে অনুবাদ করিয়া আপন ভাষার ও জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সাধিত করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলার কোন্ লেখক স্বীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টির নিমিত্ত, বাঙ্গলা ভাষায় এই দার্শনিক দ্বয়ের গ্রন্থ অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? এরূপ না করিলে দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার চির-দরিদ্র হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে এ দেশে উৎসাহদাতার কেবল যে নিতান্ত অভাব তাহা নহে; পাঠকেরও অত্যন্ত অভাব। এই কারণেই এ দেশে ভিন্নদেশীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থেরও অনুবাদ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে কেহ সাহস করেন না। আমরা শ্রীযুক্ত দিগ্বিজয় রায় চৌধুরী মহাশয়ের এই উদ্যমের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। গ্রীক্ দর্শনের বিবিধ মতবাদ ও অমূল্য তত্ত্বগুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গলা ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। আজ আবার "মধ্য যুগের ইউরোপীয় দর্শন" শাস্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার, বঙ্গভাষাকে বিশেষ ভাবে অলঙ্কৃত করিয়া তুলিলেন। ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে, এই গ্রন্থ বিশেষ উপকারে আসিবে। মধ্যযুগের দর্শন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার্থী দিগের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থখানি এম-এ পরীক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দেরও বিশেষ উপকারে আসিবে। দিগ্বিজয় বাবুর ভাষা সরল ও সরস; লিখন-ভঙ্গীও হৃদয়গ্রাহী। মধ্যযুগের দর্শনের ইতিহাসকে গ্রন্থকার তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম বিভাগে খ্রীষ্টীয় দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তির কথা; দ্বিতীয় বিভাগে তাহার স্ফূর্ত্তি এবং তৃতীয় বিভাগে তাহার পরিণতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঠক, ইহাতে সেণ্ট আগষ্টাইন, অ্যাবিলার্ড, বেকন্ প্রভৃতি বিশ্ব-বিখ্যাত দার্শনিকগণের মত-বাদ দেখিতে পাইবেন। রহস্যবাদ (Mysticism) নাম বাদ (Nominalism) প্রভৃতি তত্ত্বেরও বিবরণ বুঝিতে পারিবেন। প্রসঙ্গতঃ এই উপাদেয় গ্রন্থে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার বিস্তার, মার্টিন্ লুথার প্রভৃতি মনীষীদিগের প্রারব্ধ ধর্ম্মসংস্কারের আলোচনা প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে। বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের বিরোধের প্রকৃতি ও তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও ইহাতে কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা একাদশ অধ্যায়—বিশ্বরূপ দর্শন

অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এম্ এ সম্পাদিত। আই এ পরীক্ষায় পাঠ্য। মূল্য ৸৹

গ্রন্থখানি প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠোপযোগী করিয়া লিখিত হইলেও অধ্যাপক বেদান্ততীর্থ মহাশয় ইহাতে অনেক মৌলিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়া গীতার মূল উদ্দেশ্য দার্শনিক সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। গীতা, বেদান্ত উপনিষদের সার—এই কথা কেবল শোনাই যাইত, প্রাচীন বা নব্য কোনও টীকাকারই এ পর্য্যন্ত গীতার শ্লোকের সহিত উপনিষদ্ বাক্যের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। অধ্যাপক বেদান্ততীর্থ মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ হইতে বেদান্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রত্যেক শ্লোকের বেদান্ততা এমন ভাবেই প্রমাণ করিয়াছেন যে তাহা দেখিলে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই ভাবে গীতার বেদান্ততা সপ্রমাণ করার পথ তিনিই সর্ব্বপ্রথম দেখাইলেন। গীতা যে বেদান্তের স্মৃতি প্রস্থান, গীতার ব্যাখ্যা যে বেদান্তানুগত না হইয়া সাংখ্য বা অন্য কোনও দর্শনানুগত হইতেই পারে না, তাহা এই গ্রন্থে সম্যক্ প্রমাণিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী বেদান্ততীর্থ মহাশয় ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও শঙ্করমতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া গীতার ব্যাখ্যা করায় ব্রাহ্মণকুলোচিত আস্তিক্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোকের সংস্কৃত টীকায় গ্রন্থকার নিজের বহুদর্শিতা ও শব্দ বিন্যাসের ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ ছাড়া ইংরাজী অনুবাদ, ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা তাৎপর্য্য, ব্যাকরণগত ও দর্শন শাস্ত্রানুমোদিত টীকা টীপ্পনী সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় গীতার দার্শনিকতত্ত্ব, গীতার উপদেশ, গীতার কাল নির্ণয়, গীতার উদ্ভব প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীন ভাবে অকাট্য যুক্তি প্রয়োগে পাশ্চাত্য ভ্রান্ত মতবাদের

অতি সুন্দর খণ্ডন করিয়া অধ্যাপক বেদান্ততীর্থ মহাশয় বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

পরিশিষ্টে ছন্দ ও বিশ্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সরল অথচ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা সন্নিবিষ্ট করিয়া অধ্যাপক মহাশয় পাঠকদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। এক কথায় গ্রন্থের বিষয়-বিন্যাস এমন সুন্দর ও সুসম্বদ্ধ যে যকল শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। গীতায় অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন সুপ্রসিদ্ধ, এই সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে মূল সংস্কৃত শ্লোক সহ কোনও ভাল গ্রন্থ আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বাঙ্গালীর এই দুঃখ কষ্টের দিনে অধ্যাপক বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের গীতা বিশ্বরূপ দর্শন পাঠ করিলে সকলেই কতকটা শান্তিলাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই গ্রন্থের [illegible]

অভিভাষণ

শ্রদ্ধেয় মা, কন্যাগণ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

এখন আমরা কার্য্যসূচীর যে জায়গায় এসে পৌঁছেচি সেটা হচ্ছে সভাপতির অভিভাষণ। দেশে এত লোক থাকতে আমাকে কেন সভাপতি করা হ'ল, তা আমি বুঝতে পারি না। আমায় মনে হয় হরিহর ভায়ার এর ভিতরে হাত আছে। স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতির আসন গ্রহণ করবার দাবী আমার কাণা কড়িও নেই। খেলা ধুলা আমি কখনই করিনি, খুব ছোট বেলায় গ্রামে থাকতেও নয়। আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের গোপাল। গোপাল বড় সুবোধ বালক; সে যাহা পায় তাই খায়, যাহা পায় তাই পরে; কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না। আমার মা আমাকে গোপালের মতই হতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আমিও গোপালের মতই হয়েছিলুম। তাই এখনকার ছেলেদের বিচারে আমি নির্ব্বোধ। আজ কাল ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত যে তাস খেলে সেই তাস খেলার গোলাম নহলার জ্ঞানও আমার নেই। এখনকার ছেলেরা স্কুল থেকে এসেই বই ফেলেই, আট দশ আনা পয়সা নিয়েই ছুটল মোহনবাগানের খেলা দেখতে। আমার ন বছরের পৌত্রটিও গড়ের মাঠে খেলা দেখে এসে ঘুমের ঘোরে চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে "গোও-ওল।" আমাদের খেলার ধার ছেলেরা যায় সুদ সুদ্ধ উসুল করে দিচ্ছে। এ হেন আমাকে কেন সভাপতি করা? তবে আপনারা বলতে পারেন বছর তিন চার আগে এই স্পোর্টিং ক্লাবেরই উৎসব সভায় এসেছিলুম আমারই এক দাদার তল্পি কাঁধে করে। তিনি আমার পরমপূজনীয় অমৃতলাল বসু। তিনি আজ কত দূরে! পর্ব্বতের আড়ালে এসেছিলুম; সঙ্গে [illegible] মনিতরে [illegible] ও হয়েছিল।

এঁরা যে খেলাটা বেশী করে খেলেন সেই ভেল দিগ দিগ বা কপাটি খেলাটা সম্পূর্ণ স্বদেশী। এই স্বদেশী খেলার আমি পক্ষপাতী। আমার পরিধানে যে খদ্দর রয়েছে সেই খদ্দর দেখেই আমাকে যেন মনে করবেন না যে আমি বিদেশী মাত্রেরই বিরুদ্ধে। আমি স্বদেশী বটে, কিন্তু বিদেশের যেটা ভাল সেই ভাল জিনিসটাকে না নেবার মত উৎকট স্বদেশী আমি নয়। বিশ্বজীবনের আন্দোলনে কত নূতন বাণী ঘোষিত হচ্ছে, সে সব না শুনে কাণে আঙুল দিয়ে চলে আসতে আমি রাজী নই। বিদেশে যে দর্শন বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে সে উন্নতির ফলটা বিদেশী বলে গ্রহণ করব না, তেমন স্বদেশী আমি নই। আমরা বিদেশের ভাল জিনিসটাকে দেখি না। আমরা গরমের দিনেও সাহেবদের কোট প্যাণ্ট, নেকটাই মোজা প্রভৃতি নিয়েছি, কিন্তু তাদের একতা, একনিষ্ঠতা এবং কর্ম্মপটুতাকে আমরা গ্রহণ করিনি। আমাদের রাজা পর্য্যন্ত আভিজাত্যের গৌরব না রেখে মাঝিমাল্লার কাযও করে থাকেন, সেই মহৎ জিনিসটাকে আমরা নিই না। আমি কলকাতারই কোন জায়গায় একজনদের এই খেলাটাকে (ভেল দিগ দিগ) গ্রহণ করতে ব'লেছিলুম। তাতে তারা আমায় উত্তর দিয়েছিল, "মশায় আদুড় গায়ে খালি পায়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে যে খেলা সেটা বর্ত্তমান সভ্যসমাজের অনুমোদিত নয়। নীচ শ্রেণীর লোকের মত প্রায় অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় খেলা এখন চলতে পারে না।" আমরা "স্বদেশী" "স্বরাজ" বলে চেঁচাই, কিন্তু আমাদের অস্থি মজ্জায় যে বিদেশী ভাব সেটা ভুলে

যাই। ফুটবল খেলা নয়, ফুট কিক খাবার অভ্যাস করা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় যখন পড়ি তখন মনে হয় সেই চটি পায়ে লোকটি আমাদের কি শিক্ষাই দিয়েছেন। প্রথমেই ঐক্য, তার পরই বাক্য। ঐক্য সৃষ্ট হ'ল, তার পরেই বাক্য আরম্ভ হ'ল। এঁদের এখন বাক্য আরম্ভ হয়েছে অর্থাৎ এই রকম সভা করে বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ভয় হয় পরে অনৈক্যে না ভেঙ্গে যায়। এঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্যে খুব চেষ্টা করছেন। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ হতে গেলে প্রথমেই Humbugism ত্যাগ করতে হবে। তা যদি না করতে পারা যায়, তবে এই এত বড় নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরও ভেঙ্গে পড়ে যাবে। এই First personal Pronoun 'I' ত্যাগ করতে হবে, বলতে হবে আমি কেউ নই, সব তুমি। তা হলেই সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারা যাবে। প্রত্যেকেই যদি নেতা হয়ে তাদের আমিত্বকে জাগিয়ে তোলে তা হলে সে নেতা নেতিয়ে পড়বে। কর্ম্মীরা সব ভুলে যান না যেন, তাঁদের কর্ম্মেই কেবল অধিকার আছে। গীতার কথা মনে রাখতে হবে। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। সর্দ্দারি করা ছাড়তে হবে।

এঁদের এটা স্পোর্টিং ক্লাব। খেলার বিশেষ দরকার, খেলা চাই-ই। খালি লেখাপড়া করলেই চলবে না। ছেলে পড়ে গেলেই মা যে বলবেন, "আহা ছেলের আমার গায়ে ব্যথা হল" তা হবে না। আজকালকার দিনে Tit for tat শিখতে হবে; এক কিলের বদলে ডবল কিল দিতে হবে। ননীর পুঁতুল হলে চলবে না। আমি দেখেছি সন্দেশ খেকো ব্যাটারা সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড় থেকে হেয়ার কি হিন্দু স্কুলে যাবে, তার জন্যে হাঁ করে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখেছি তাদের মধ্যে কারও বাপ হয়ত ৭৫৲ টাকা মাইনের চাকুরী করে। বাড়ীতে খেতে হয়ত মা বাপ তিন চারিটি ভাই ভগিনী; আবার ভগিনীদের বিয়েও হচ্ছে না। আমার ইচ্ছা হত সেই বাপটাকে যদি হাতে পেতুম, তা চাই কি তাকে বাপান্তও করে দিতুম। ঐরকম ছেলের দ্বারা স্বরাজ লাভ হবে না। বুকে বল, মুষ্টিতে বল, হাঁটুতে বল না হলে হবে না। এঁদের সঙ্ঘের ছেলে এবার ১০ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে আমি তাকে প্রশংসা করি। আমি গুণ্ডামি করতে বলি না। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে A healthy mind in a healthy body. আমাদের ছেলেরা Universityর পড়া শেষ করে যখন বেরুল তখন এমন ব্যাধিই নেই যে ব্যাধি তাকে আক্রমণ করে নি। চোখ ত তাদের নেই। সকলকারই চোখে চশমা। তবে সেটা ফ্যাসান না আর কিছু তা বলতে পারি না।

এঁদের সঙ্ঘে একটি সেবা-বিভাগ আছে। সেবা বিভাগের কায এঁরা বেশী কিছু করতে পারেন নি; তবে সে জন্য এঁরা খুব চেষ্টা করেন। সেবা মহৎ কায, সেবারও বিশেষ দরকার আছে।

সাহিত্য আলোচনাও এঁরা করে থাকেন। আমাকে এঁরা "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে বলেছিলেন; কিন্তু আমি বর্ত্তমানে সাহিত্যের একটি ভূষণ্ডি—নবীন প্রবীণ নিয়ে আমার কায—সকলকেই আমি চাই। তাই সে বিষয়ে আমি আমার মতামত ব্যক্ত করতে পারি না।*

শ্রীজলধর সেন।

* চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে জালপাড়া স্পোর্টিং ইউনিয়নের গত বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর দ্বারা অনুলিখিত।

সাহিত্য ও 'হিউমার'

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি হইতে ধরিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে হাস্যরসের ইতিহাস আলোচনা করিলে, আমার মনে হয়, মোটামুটি হাস্যরসের চারিটী যুগ বা স্তর দেখা যাইবে। এই যুগগুলি অবশ্য পরস্পরকে খানিকটা করিয়া আচ্ছাদন করে, কিন্তু তাহা হইলেও প্রত্যেক যুগটীর কিছু না কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই হিসাবে ধরিলে বাঙ্গালা হাস্যরসের প্রথম যুগে আক্রোশ ও

আক্রমণের জোরটা যেন বড় বেশী বলিয়া মনে হয়। (ঈশ্বর গুপ্তকে বাদ দিলে) রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব', দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী', মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'মদ খাওয়া বড় দায়' এই যুগে পড়ে। ইন্দ্রনাথের 'ভারতোদ্ধার কাব্য' ও 'পাঁচুঠাকুর' এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ভূত ও মানুষ', 'কঙ্কাবতী', 'ফোকলা দিগম্বর', 'ডমরুচরিত' প্রভৃতিকেও এক হিসাবে (ঠিক সময়ের হিসাবে না হইলেও আক্রমণের প্রচণ্ডতার হিসাবে) এই যুগে ফেলা যাইতে পারে। (১) আবার, ঠিক সময়ের হিসাবে অনেক পরবর্ত্তী হইলেও আক্রমণের প্রকৃতি (spirit) ধরিয়া বিচার করিলে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের শ্লেষ-বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলি, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অনেকগুলি উপন্যাস এবং ইন্দ্রনাথের শেষ দিককার অনেক রচনা (যথা 'পিসিরায়ের মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার') এই যুগে পড়ে। শেষোক্ত রচনাগুলির মধ্যে আক্রমণটাও অনেক সময় যেমন তীব্র, আক্রমণ করিবার প্রণালীটাও, সাধারণতঃ, সেইরূপ সুরুচি ও শ্লীলতার সীমা ছাড়াইয়াছে। ইহাতে ব্যক্তিগত আক্রমণও সময় সময় কম নাই। এই ধরণের আক্রমণকে লক্ষ্য করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ 'লুল্লু' নামক গল্পের ষষ্ঠ ও একাদশ পরিচ্ছেদে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠকমাত্রেরই পড়া উচিত। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর বিদ্রূপ (satire) গুলির উপকারিতা কতটা, এবং এ ধরণের ব্যঙ্গসাহিত্যের লেখক(satirist)গণ 'moral agent' বা 'social scavenger' এর কার্য্য করিতে কতটা সমর্থ, এসব কথার মীমাংসা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এটুকু বলিতেই হইবে যে, যে রসিকতা সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করে, যাহা ব্যক্তিগত আক্রমণে দুষ্ট, যাহা শুধু আঘাত করিতে জানে কিন্তু সমবেদনা করিতে শেখে নাই, তাহা 'হিউমার' নহে। আমরা অনেক সময় humour বলিতে satire, sarcasm, comic, wit, সবই বুঝি বলিয়াই এরূপ রসিকতাকে humorous নামে অভিহিত করিতে দ্বিধা বোধ করি না। (George Meredith প্রণীত The *Idea of Comedy* ও John Palmer প্রণীত *Comedy* গ্রন্থে humour ও comic এর পার্থক্য সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে।)

বঙ্গীয় humourএর দ্বিতীয় যুগে বা দ্বিতীয় স্তরে আক্রমণের ভিতর করুণা ও সমবেদনা যেন ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই দ্বিতীয় যুগের প্রবর্ত্তক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। Thackeray, Dickens, Lamb ও Addisonএর সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত, আমেরিকান সাহিত্যিক ও হাস্যরসিক Oliver Wendell Holmesএর প্রায় সমসাময়িক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংমিশ্রণের মধুর ও শ্রেষ্ঠ ফল বঙ্কিমচন্দ্র যে 'হিউমার' যে শুভ্র, অনাবিল, উদার, স্বচ্ছ হাস্যরস সৃষ্টি করিলেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে অতুল। 'হিউমার' তাঁহার হাতে সত্যই "উজ্জ্বলে মধুরে" মিশিল। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে যাহা সূচিত, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও রজনীকান্ত যাহার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (২)

১। টেকচাঁদ ঠাকুর ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় আক্রমণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও তাহা কোথাও অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট নহে ও সুরুচি-বহির্গত নহে। টেকচাঁদ ঠাকুরের বাবুরাম, মতিলাল, বাঞ্ছারাম, বিদ্যানিধি, বাচস্পতি প্রভৃতি চরিত্র তদানীন্তন কোন কোন সত্যকার ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট কিনা তাহা আমার জানা নাই। এরূপ Typical চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তদানীন্তন টেকচাঁদ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রচলিত জুয়াচুরী, দুর্নীতি, কুসংস্কার, ভণ্ডামী ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি যে তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন তাহা সুরুচি-বহির্গত না হইয়াও দীনবন্ধু ও ইন্দ্রনাথের কশাঘাতের অপেক্ষা কম জোরালো নহে। ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্ট ব্যাঙ্ সাহেব, মশাপ্রভু, ফোকলা দিগম্বর, ডমরুধর, ঘ্যাঁঘো খাঁদাভূত, প্রভৃতি চরিত্রগুলি realistic হইয়াও সুরুচির বাহিরে যায় নাই; অথচ রূপকের (allegory) আবরণে ত্রৈলোক্যনাথের শ্লেষ, বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ কম তীক্ষ্ণ নহে। তাঁহার ভাষা ও বলিবার ভঙ্গিও অপরূপ। বর্ত্তমান যুগে এক প্রভাতবাবু ছাড়া অমন সহজ ও মনোরম ভঙ্গিতে 'humour' সৃষ্টি করিতে কেহ নাই বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।

২। ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সমালোচনার ভিতর যে অম্লমধুর হাস্য-রস সদাই দেখা যাইত, তাহা তৎসম্পাদিত "সাহিত্য" পাঠকের নিকট সুপরিচিত। "Brevity is the soul of wit" ইহা সমাজপতি মহাশয় খুব বুঝিতেন। তাঁহার তীব্র ও (অন্ততঃ তাঁহার চক্ষে) নিরপেক্ষ সমালোচনা কখনও তীক্ষ্ণধার lancetএর ন্যায় কাটিত, কখনও ছুঁচের ন্যায় বিধিত, কখনও আবার সম্মার্জ্জনীর ন্যায় সাহিত্যের অসার

(সমালোচনার ভিতর দিয়া) যাহার গৌরব রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, বাঙ্গালার পরম গৌরব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তাহার পরিসমাপ্তি। এই দ্বিতীয় যুগের প্রভাতে এক মনোরম সূর্য্যোদয়, সায়াহ্নে এক মধুরতর সূর্য্যাস্ত। এমন কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সুসংযত অথচ স্বাভাবিক, নিয়ন্ত্রিত অথচ অন্তঃপ্রসূত, উজ্জ্বল অথচ মধুর, সংক্ষিপ্ত অথচ সসার, নিগূঢ়ার্থ-সমন্বিত অথচ ব্যক্তিগত শ্লেষবিদ্রূপের গন্ধবিহীন, মহৎ, উদার, নির্ভীক, বিশ্বজনীন humour বুঝিতে অক্ষম? রবীন্দ্রনাথের অপরূপ হাস্যরসের নমুনা দেওয়া অনাবশ্যক। সমালোচক চূড়ামণি Saintsbury কবি Shelley সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ("The worst utterance of Shelley is better worth reading than the best panegyric of his commentators".) তাহা রবীন্দ্রনাথের 'হিউমার' সম্বন্ধেও ঠিক প্রযুজ্য।

এই দ্বিতীয় ধারার ঠিক পাশাপাশি চলিয়াছে আর একটী ধারা—গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ (রায়), অতুলকৃষ্ণ (মিত্র), অমৃতলাল, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সমসাময়িক নাট্যকারগণের যুগ—যে যুগে অনেক সময় ব্যঙ্গবিদ্রূপের আক্রমণটা করুণরসে সিক্ত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ আক্রমণের ন্যায় তাহা সদয় ও মার্জ্জিত নহে। ইহাকে নাট্যসাহিত্যে satire এর যুগ বলা যাইতে পারে। গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল প্রভৃতির satire ও প্রহসনগুলি এই যুগে পড়ে। ফরাসী নাট্যকার Molière ও Elizabethan ও Restoration যুগের অনেক ইংরেজী Comedyর প্রভাব এগুলির উপর পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ যুগের অধিকাংশ প্রহসন, নক্সা ও পঞ্চরংগুলির মধ্যে (বিশেষতঃ তৎকালীন বড় দিনের উপলক্ষ্যে রচিত প্রহসন ও পঞ্চরংগুলিতে) যে স্থূল ও অর্দ্ধনগ্ন রসিকতা আছে তাহার অনুরূপ রসিকতা Middleton, Tournier, Wycherley, Vanbrughর সাহিত্যে যথেষ্ট মিলিলেও, তাহা যে সুরুচি-সঙ্গত নহে, তাহা গিরিশচন্দ্রের 'বড়দিনের বক্‌সিস', 'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন', 'সভ্যতার পাণ্ডা' বা অতুল কৃষ্ণের 'বুড়ো বাঁদর', 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না', 'বক্রেশ্বর' বা রাজকৃষ্ণ রায়ের 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র', 'টাট্‌কা টোট্‌কা' বা অমরেন্দ্রনাথের 'থিয়েটার', 'কাজের খতম', 'মজা' পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। আধুনিক ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যেও স্থলে স্থলে 'বেআব্রুতা' ও 'অলজ্জতা' কম নাই। কিন্তু, অন্ততঃ ভাষার দিক্ দিয়া ধরিলে, তাহা এতটা অসংবৃত (bald) নহে। ভাষাকে অতিমাত্রায় স্বাভাবিক করিতে গিয়া গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অতুলকৃষ্ণ, অমরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সময় সময় সুরুচি ও শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন তাহা কে অস্বীকার করিবে? এ সময়কার satire গুলিতে ব্যক্তিগত আক্রমণ কতটা আছে তাহার বিচারের সময় আসিয়াছে। ব্যক্তিগত আক্রমণ এখানে কিছু কিছু থাকাই সম্ভব, তবে তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। আর এ বিষয় বেশী উৎসাহ দেখাইতে গেলে রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত 'রসিকতার ফলাফল' হাতে হাতে ফলিয়া যাইতে পারে। আমার মনে হয়, ব্যক্তিগত আক্রমণ এখানে খুব বেশী নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, দীনবন্ধু ও ইন্দ্রনাথের চাবুকের ন্যায়, অমৃতলাল ও দ্বিজেন্দ্রলালের চাবুকও সমসাময়িক রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম-শিক্ষা-দীক্ষা-সম্পর্কীয় ভণ্ডামি ও সংকীর্ণতার পিঠে কম জোরে পড়ে নাই। 'বাবু', 'অবতার', 'তাজ্জব ব্যাপার', 'কল্কিঅবতার', 'প্রায়শ্চিত্ত' বিদ্রূপ (satire) করিতে প্রায় তুল্যমূল্য। এই যুগের satire গুলির উপর টীকা লিখিতে বোধ হয় শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু মহাশয় কয়দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন। রসরাজ বসু মহাশয় নিজে যে শুধু একজন বড়দরের satirist ছিলেন তাহা নহে, অধিকন্তু তিনি সুপণ্ডিত ও তাঁহার সমসাময়িক নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে কথা কহিবার পক্ষে অদ্বিতীয় authority ছিলেন। এক কথায় এ বিষয়ে তিনি, মাত্র কয়দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, একটী

হইতে জঞ্জাল পরিষ্কার করিত। সমসাময়িক মাসিক সাহিত্য আলোচনা করিবার কালে তিনি প্রায়ই বেশী কথা বলিতেন না; কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্যগুলি, সমালোচিত লেখকগণের নিকটে না হউক, "সাহিত্যে"র পাঠকগণের নিকট উপাদেয় ছিল।

living oracle ও একাল ও সেকালের মধ্যে সেতু-স্বরূপ ছিলেন। অমৃতলাল যদি তাঁহার নিজের ও গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি সমসাময়িক নাট্যকার-গণের সাহিত্যের উপর একটু একটু টীকা লিখিয়া রাখিয়া যাইতেন তাহা হইলে তিনি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগের সমালোচক ও পাঠকবর্গের অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া যাইতেন সন্দেহ নাই। (৩) (বড়ই দুঃখের বিষয়, অমৃতলালের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিল। এই প্রবন্ধে হাত দিবার পর হইতে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া যে কয় জন হাস্যরস-স্রষ্টার মৃত্যু ঘটিল, তাহার মধ্যে অমৃতলাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।)

যাক্, কথায় কথায় আসল ব্যাপার হইতে অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়াছি। বঙ্গীয় হাস্যরসের চতুর্থ যুগের কথা এইবার একটু বলিতে হইবে। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রারম্ভ হইতে বঙ্গীয় হাস্যরসের চতুর্থ যুগ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এখন হইতে আন্দাজ ২০ বৎসর আগে হইতে ইহার সূচনা। এ যুগের "নব-সাহিত্য" যে, 'অব্যবস্থায় ও সস্তা, বিশেষত্বহীন, চটক ও নকল' নহে তাহা "বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ, (ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্, সমালোচক ও প্রবন্ধ লেখকগণকে বাদ দিলে) যে যুগের নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের (৪) শেষ রশ্মি পড়িয়া তাহাকে মাধুর্য্য-মণ্ডিত করিয়াছে ও যে যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার শেষ উপন্যাস ও নাটকগুলি বঙ্গ-সাহিত্যকে দান করিয়া গিয়াছেন—যে যুগে রবীন্দ্রনাথ এখনও সাহিত্যের আসর অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন—যে যুগে জলধর সেন, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ বসু, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, সীতা দেবী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (অধুনা পরলোকগত), খগেন্দ্রনাথ মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কথা-সাহিত্যকগণের রচনা বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি-সাধন ও শোভা বর্দ্ধন করিতেছে—যে যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, রজনীকান্ত সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির কবিতাগুলিই বাঙ্গালার শেষ কবিতা নহে, পরন্তু কবিতার অপেক্ষাকৃত ক্ষীণধারা করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, রসময় লাহা, (৫) কালিদাস রায়, কান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির লেখনী-মুখে এখনও প্রবাহিত হইতেছে—সে যুগ বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে কম গৌরবের যুগ নহে। "আমাদের পক্ষে নব সাহিত্যের নিন্দা করা যেমন সহজ প্রশংসা করা তেমনি কঠিন" বলিয়াই, বোধ হয়, অনেকে এ সাহিত্যকে বড় করিয়া দেখেন না। এ যুগে হাস্য রচনায়ও অনেকে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, অমৃতলাল ছাড়া, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "বীরবল" বা প্রমথ চৌধুরী, "পরশুরাম", কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র

৩। হিউমারের উপর প্রবন্ধগুলির উপলক্ষ্যে রসরাজ অমৃতলালের সহিত আমার সম্প্রতি কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সমসাময়িক ইঙ্গিত ও সেগুলির মূল নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু লিখিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে তিনি প্রথমটা রাজি হইয়াছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আমাকেই, তাঁহার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া, এ বিষয় লিখিতে আদেশ করেন। তিনি আমাকে আশা দিয়াছিলেন যে, শুধু তাঁহার নিজের নাটকগুলির উপরে নহে, গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির উপরেও তিনি অনেক জ্ঞাতব্য কথা, যাহা আজকালকার সাধারণ পাঠক ও সমালোচকের পক্ষে জানা কঠিন, বলিবেন। কিন্তু হায়! কঠোর কাল অকস্মাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া লইল। আচম্বিতে বজ্রাঘাত হইল। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু আমার উপরি উক্ত কার্য্যই অঙ্কুরে বিনষ্ট হইল না, বাঙ্গালার পাঠক ও সমালোচকগণের নাট্য-সাহিত্য আলোচনার পথেও সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা বাধা পড়িল। তবু আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, "অমৃত মদিরা" নামক কাব্যে তিনি বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের গোড়ার অনেক কথা এবং নিজের ও গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকের কথা প্রসঙ্গতঃ কিছু কিছু বলিয়া গিয়াছেন। "অমৃত মদিরার" মত সরস ও অকপট আত্মকথা কাব্যে বিরল। এ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ বাঞ্ছনীয়।

৪। দ্বিজেন্দ্রলালের ও ক্ষীরোদপ্রসাদের ক্ষেত্রে ঠিক শেষ-রশ্মি না হইলেও তাঁহাদের পাকা হাতের লেখা নাটকগুলি বটে—লেখক।

৫। অধুনা পরলোকগত লাহা মহাশয় হাস্য-রসাত্মক কবিতা রচনায়ও বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

ঘটক, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস হালদার প্রভৃতি অনেকেই (নামের ফিরিস্তি এখানে ছোট হইবে না, কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব? যাঁহাদের নাম করিলাম না তাঁহারা আমায় ক্ষমা করিবেন) এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন ও পাঠকবর্গের চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বাঙ্গালার এই হাস্য-রস-স্রষ্টাদের সমালোচনার সময় এখনও ঠিক আসে নাই তবে বিলাতের Jerome, Oscar Wilde, Barrie, Bernard Shaw, W. W. Jacobs, P. G. Wodhouse এবং আমেরিকার "Artemis Ward", "Mark Twain" ও Bret Harte প্রভৃতি হিউমারিষ্টদের সহিত ইঁহাদের তুলনা-মূলক আলোচনা হইলে সাহিত্যানুরাগী পাঠক যথেষ্ট আনন্দ পাইবেন সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার শিক্ষিত তরুণ লেখকগণ এ সম্বন্ধে আলোচনা করুন। ১৬ বৎসরের উপর শিক্ষকতা করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, বাঙ্গালার শিক্ষিত তরুণগণের নিকট এ সম্বন্ধে অনেক আশা করা যায়। অবশ্য হইতে পারে কোন তরুণ সাহিত্যিক (?) আধুনিক সাহিত্যের, বিশেষতঃ আধুনিক বৈদেশিক সাহিত্যের, আলোচনা করিতে গিয়া স্থলে স্থলে ভুল-ভ্রান্তি করিয়া বসিবেন (কিন্তু ভুল-ভ্রান্তি কাহার না হয়?); হইতে পারে কোনও তরুণ লেখক ভাল করিয়া না পড়িয়াই কোনও গ্রন্থকার সম্বন্ধে এমন কিছু বলিবেন, যাহা শুনিয়া কোনও প্রবীণ সমালোচকের Doctor Johnsonএর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হইবে, "Criticism disdains to chase a schoolboy to his composition"; হইতে পারে এ ক্ষেত্রে অনেকের কাছে এমন কাঁচা হাতের লেখা পাওয়া যাইবে, যাহা শুধু নামকে ওয়াস্তে লেখা;—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইঁহাদের মধ্যেই অনেকে পরে বড় সমালোচক হইয়া উঠিতে পারেন। আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে, সহৃদয়তা, আন্তরিকতা ও সাহিত্যানুরাগ লইয়া যিনিই কিছু লিখিবেন তিনিই আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

৬

কোনও একজন বড় ইংরেজ লেখক (বোধ হয় Meredith) বলিয়াছেন, কোনও জাতি বিশেষের চরিত্র পাঠ করিতে গেলে অগ্রে সে জাতির comic সাহিত্য পড়া উচিত। Carlyle একস্থলে বলিয়াছেন, "How much lies in laughter the cipher-key wherewith we decipher the whole man!" আমরা বলি শুধু একজন গোটা মানুষ (whole man) কেন, একটা গোটা জাতিকেও তাহার হাসির প্রণালী দেখিয়া ধরা যাইতে পারে। একজন ইংরেজ যাহাতে প্রাণ খুলিয়া হাসেন, একজন ফরাসীর তাহাতে সব সময় হাসি পায় না, আবার ফরাসীরা যাহাতে হাসিয়া লুটোপুটি খান, একজন জার্ম্মাণ তাহার মর্ম্মানুধাবন করিতে হয়তো পারেন না। প্রত্যেক জাতিরই (এক এক যুগে এক এক রকম) একটা হাসির কায়দা ও একটা হাসির উপাদান আছে, যাহা অন্য জাতি হইতে বিভিন্ন। (বঙ্গীয় হাস্যরসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি, তাহার কিছু বিস্তৃত আলোচনা করিতে শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্প্রতি আমায় অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাহা পারিলাম না।) বস্তুতঃ, "Laughter is the real frontier between races and kinds of people." এক জাতি হইতে অপর জাতির পার্থক্য শুধু জাতীয় আচার, ব্যবহার, সাধনা-সংস্কারের পার্থক্যে লক্ষিত হয় না, তাহাদের হাসির পার্থক্যেও তাহা বেশ বুঝা যায়। তাই জাতির 'ধাত' বুঝিয়া না লিখিতে পারিলে বড় humorist বা বড় satirist হওয়া যায় না। নাট্যকারগণকে অনেক সময়ই দর্শকের মন যোগাইয়া চলিতে হয়। Shakespeare, গিরিশচন্দ্রকেও ইহা করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের comedyগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ যুগের নিজ নিজ দেশবাসীর হৃদয়কে অনেকটা প্রতিবিম্বিত করিয়াছে। এইরূপ Etherageএর *She would if she could* Wycherleyর *The Country Wife*, Congreveএর *The Way of the World*, Vanbrughর *The provoked Wife* পড়িলে Restoration যুগের জন-সাধারণের স্বৈরাচার, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা ও সাহিত্যিকগণের ফরাসী সাহিত্যের (অনেক সময়ই ব্যর্থ) অনুকরণেচ্ছা (নাট্যকার Shadwellএর মতে কিন্তু, "It is not barrenness

সুজান ও বৃদ্ধদ্বয়

শিল্পী—পল্ ভেরোনিজ

of wit or invention that makes us borrow from the French, but laziness") স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। Bernard Shaw ও Galsworthyর comedy গুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় কিছু কাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় সমাজের বক্ষকে কোন্ কোন্ সমস্যা আলোড়িত করিয়াছিল। এইরূপ অতুলকৃষ্ণ, অমৃতলাল, অমরেন্দ্রনাথের প্রহসন গুলির মধ্যে স্থূল, 'গ্রাম্য' রসিকতা তাৎকালিক সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দর্শকগণের রুচির কতকটা পরিচায়ক। যে যুগে গিরিশচন্দ্রের "ম্যাক্‌বেথ" (১৮৯৩) যোগ্য আদর পাইল না, অথচ তাঁহার 'আবুহোসেন' (১৮৯৩)ও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' (১৮৯৭) দেখিতে রঙ্গালয়ে লোক ধরিত না, সে যুগের সাধারণ theater-goerদের রুচি অনুযায়ী পঞ্চরং ও প্রহসনগুলি আর কত সূক্ষ্ম ও উচ্চ ধরণের হইবে? গিরিশচন্দ্রকে বাহাদুরী দিতে হইবে যে, 'নসীরাম', 'বিল্বমঙ্গল, 'চৈতন্যলীলা', 'প্রফুল্ল' লিখিয়া এ: যুগেও তিনি ব্যর্থকাম হন নাই। অমৃতলালের আধুনিক যুগের প্রহসন ও নাটকগুলির সহিত তাঁহার ২৫।৩০ বৎসর আগেকার প্রহসনগুলির তুলনা করিলেই তখনকার ও এখনকার জনসাধারণের রুচির পার্থক্য কতখানি তাহা বেশ বুঝাইবে। আমার মনে হয় 'খাস দখলের' ন্যায় একখানি নিখুঁত নাটক (artistic production) 'তাজ্জব ব্যাপার' বা 'বিবাহ বিভ্রাটে'র যুগে যোগ্য আদর পাইত না। আবার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জোর বরাত', 'কৃতান্তের বঙ্গদর্শন' ও 'বাঙ্গালী'র সহিত অতুলকৃষ্ণের 'বুড়ো বাঁদর ও 'বক্কেশ্বর' কিংবা অমরেন্দ্রনাথের 'কাজের খতম' বা 'দুটীপ্রাণ' কিংবা গিরিশচন্দ্রের 'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন' ও 'সভ্যতার পাণ্ডা'র তুলনা করিলে এখনকার ও তখনকার জনপ্রিয় রসিকতার তারতম্য আরও বুঝা যাইবে। অশেষ নাট্যপ্রতিভা থাকা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র তাঁহার যুগকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে রচিত 'শাস্তি কি শান্তি'র ভিতরও এত কুরুচি, কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা আসিয়া পড়িয়াছে, তাঁহার 'অশোক' ঐতিহাসিক হইয়াও পৌরাণিকে দাঁড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলি অবশ্য এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের রস-রচনার ভিতর যে সার্ব্বজনীনত ও সুরুচি দেখা যায় তাহা বিশ্ব-সাহিত্যেও বিরল।

বস্তুতঃ, খুব উচ্চ ধরণের humour, উচ্চ ধরণের সাহিত্যের মত, দেশ-কাল-পাত্র, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণকে অতিক্রম করিলেও, (৬) এক একটা যুগে প্রত্যেক দেশের হাস্যরচনায় এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে, যাহা তাহার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়। Joke বা রসিকতা অনেক সময়ই অনুবাদ করিয়া বা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার জিনিস নহে ("cannot be translated or interpreted")। গোলাপ ফুল তো ফুলের সেরা, কিন্তু তাই বলিয়া আসল বসরাই গোলাপ, ইংলণ্ডের উদ্যানজাত Monte Cristo ও Black Prince এবং স্বচ্ছন্দ বনজাত পাহাড়ী গোলাপ কি এক জিনিস? নীলকমল ও শ্বেত শতদল কি এক পদার্থ? আগ্রার তাজ, ভুবনেশ্বরের মন্দির ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কিংবা কুতবমিনার, বেণীমাধবের ধ্বজা ও অক্টারলনী মনুমেণ্ট কি এক শ্রেণীর বস্তু? এথেন্সের 'Old comedy'র মুখপত্র Aristopanesএর রসিকতায় যে আস্বাদন পাই (Aristophanesএর *The Clouds*, *The Bee*, *The Birds* প্রভৃতি হাস্য-রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'সাহিত্যে সমালোচনার স্থান' নামক প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। Meredithএর *The Idea of Comedy* ও John Palmerএর *Comedy*তে প্রসঙ্গতঃ ইহার যথেষ্ট আলোচনা আছে) তাহা কি Cervantesএর *Don Quixote* (*Don Quixote*এর humour লইয়া Freud তাঁহার *Wit and the Unconscious* গ্রন্থে অনেক আলোচনা করিয়াছেন) বা Rabelaisএর *Gargantua and Pantagruel* (হাস্যর উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম ও কুরুচি বাদ দিলেও রাবেলের রসিকতার ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে কৌতুক, কাণ্ডজ্ঞান ও বিদ্রূপের পরিচয় পাওয়া যায়) বা Swiftএর *The Tale of a Tub*এর ভিতর পাই? Shakespeareএর Falstaff, Touchstone, Ariel, Puckএর রসিকতা তাঁহার Jaques, Kent, Iagoর রসিকতা হইতে বিভিন্ন হইলেও,

৬। "At bottom humour is an elemental fact, independent of nationality, it derives from a sense of incongruity, an instinctive realisation of the clash between the Ideal and the Real, of the poetry of life and the prose of life."

Sir Arthur Compton-Rickett.

Shakespeareএর রসিকতার ভিতর যে সংযম,(৭) কারুণ্য তিতিক্ষা ও সার্ব্বজনীনতা দেখি, তাহা কি Lambএর *Essays of Elia*, Washington Irvingএর *Rip Van Winkle*, Thackerayর *Vanity Fair* বা *Dickens*এর *David Copperfield*এর অন্তর্নিহিত রসিকতায় বর্ত্তমান কারুণ্য ও সহৃদয়তা (৮) হইতে পৃথক্ নহে ? গিরিশচন্দ্রের যৌবনে রচিত নাটকাবলীর রসিকতা ও 'তপোবল' 'শঙ্করাচার্য্য', 'অশোক', 'গৃহলক্ষ্মী'র রসিকতাই যখন আলাদা জিনিস, অমৃতলালের 'কৃপণের ধন', 'অবতার', 'রাজাবাহাদুর' যখন 'খাস-দখল', 'যাজ্ঞসেনী' হইতে এত পৃথক্, তখন এক যুগের ও এক দেশের রসিকতা যে আর এক যুগ ও আর এক দেশের রসিকতা হইতে বিভিন্ন হইবে ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। তাই দেখি Chaucerএর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ইংরেজী humour প্রায়ই সরস, শাঁসালো ও মধুর ; আমেরিকান humour ইংরেজী humourএর তুলনায় অনেক শুষ্ক, নীরস, কঠোর ও কটু-তিক্ত-কষায় ; আবার, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা হাস্যরস, ইংরেজী humour দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইলেও, স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন করে নাই।

বাঙ্গালার হিউমার আলোচনা করিবার কালে মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজী সাহিত্য ভারতে প্রচলিত হইবার আগে হইতেই বাঙ্গালী হাসিতে জানিত, ইংরেজী সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যে হাস্য-রস ছিল। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও কবিকঙ্কণ সময় সময় হাসিতে জানিতেন ; ভারতচন্দ্র ও রামনারায়ণের রচনায় ও হাস্যরস কম নাই ; (৯) বাঙ্গালায় চলিত খোস গল্পগুলি 'Made in England' মাল নহে, বাঙ্গালার 'কবি'গণও 'তরজার লড়াই'-ওয়ালারা যে মোটা ধরণের রসিকতা করিতেন, তাহা বিদেশ হইতে ধার করা নহে, বাঙ্গালার গোপাল ভাঁড় কোনও পাশ্চাত্য Harlequinএর কাছে অঙ্গভঙ্গি ও হাস্য-রস ধার করিতে যান নাই। তবে, ইংরেজী সাহিত্য যেমন Celtic সাহিত্যের নিকট humour ও pathosএর জন্য ঋণী, Latinএর নিকট যেমন শব্দসম্ভারের জন্য ঋণী, ফরাসী সাহিত্যের নিকট স্বচ্ছন্দ ও সলীল গতির জন্য (অন্ততঃ এক সময়) ইটালীয় সাহিত্যের নিকট কবিতায় গল্প বলিবার ভঙ্গি শিক্ষার জন্য মূলতঃ ঋণী— বাঙ্গালা সাহিত্যও সেইরূপ ইংরেজী ও আধুনিক Continental সাহিত্যের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। কিন্তু তাই বলিয়া, বাঙ্গালা হস্যরস ইংরেজী সাহিত্যের হুবহু অনুকরণ নহে, বাঙ্গালা হিউমার ইংরেজী humourএর ব্যর্থ অনুকরণ নহে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন, "পরের ঢঙের নকল করে শুধু সঙ", "আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নহে, সৃষ্টি।" সব দেশের সাহিত্যেরই একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা "বিশেষ ধর্ম্ম" আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে, তথা বাঙ্গালা হিউমারেও, তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বাঙ্গালার জাতীয় ও সামাজিক জীবন, বাঙ্গালার আদর্শ, বাঙ্গালার শিক্ষা-দীক্ষা, বাঙ্গালার নিজস্ব শক্তি, আবার বাঙ্গালার দৌর্ব্বল্য, দৈন্য, অভাব, আকাঙ্ক্ষা— সবই বাঙ্গালার হাসির কথায়, বাঙ্গার comic সাহিত্যে, বাঙ্গালার 'হিউমারে' প্রতিফলিত হইয়াছে।

সমাপ্ত

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ।

৭। Brevity is the soul of wit ও Restraint is the soul of art ইহা Shakespeare বিলক্ষণ জানিতেন বলিয়াই তাঁহার humour কোথাও উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম, অসংগত রসিকতায় পরিণত হয় নাই।

৮। Thackerayর হাস্যরসে Irony এবং Dickensএর হাস্যরসে Caricature (সময় সময় ব্যক্তিগত আক্রমণও) যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও তাহার ভিতর করুণ-রস ও সহৃদয়তার অভাব নাই।

৯। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন মহাশয় "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় সম্প্রতি প্রাচীন বঙ্গীয়-সাহিত্য হইতে হাস্য-রসের নমুনা দিতেছেন। কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী', বংশীদাসের 'পদ্মপুরাণ', ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' ক্ষেমানন্দের 'মনসা মঙ্গল', রামেশ্বরের 'শিবায়ন,' গোপীচন্দ্রের 'ময়নামতীর গান' প্রভৃতি বহু প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে তিনি হাস্য-রসের নমুনা দিয়া যথেষ্ট সাহিত্যানুরাগ ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিতেছেন।

যৌবন-সিন্ধু

উথলে যৌবন-সিন্ধু—তরঙ্গে তরঙ্গে তুলি' তার
সীমাহীন উন্মাদনা! আছাড়ি' পড়িছে বারবার—
উদ্বেল আনন্দ-গাথা, উৎসবের উচ্ছল ধারায়,
বিচ্ছুরিয়া দিকে দিকে আপনারে পলকে হারায়
উদ্দাম ঝড়ের বুকে। কে রে রুদ্ধ মনো-দুর্গ তলে
পরিখা-বেষ্টিত ভীরু, সীমার অন্তরে খুঁজি' পলে
গোপন সঞ্চিত রস?—আজি ওরে এসেছে জোয়ার!
ছাপাইয়া সীমারেখা—কাঁপাইয়া স্তব্ধ পারাবার,
আবর্ত্তে আবর্ত্তে রচি' কামনার অযুত শৃঙ্খল—
উথলে যৌবন-সিন্ধু; কাঁপিয়া, ফুলিয়া উঠে জল!
এখনো কে গৃহকোণে, অন্যমনে নীরস পাষাণ?
জোয়ার এসেছে আজি! তটে তটে জাগে শত গান;—
ওরে রিক্ত! অনাসক্ত! ওরে ক্লীব, ভীত, ক্ষীণপ্রাণ!
যৌবন মেগেছে তোরে—শঙ্কায় যাপিয়া দিনমান
আজো কি রহিবি মগ্ন, বদ্ধ এই প্রাচীরের মাঝে?
কোন্ সে যৌবন-ভীতু কিশোরীর মত নত লাজে!
জোয়ার এসেছে আজি—জোয়ার উঠেছে আজ ডাকি
—যৌবন সিন্ধুর জলে!
　　　　কার অই লুব্ধ দুটী আঁখি
কিসের আকাঙ্ক্ষা ভরে আকাশের দিকে রহে চাহি?
কার অই ব্যগ্র দুটী বাহু তরঙ্গে তরঙ্গে উঠি' বাহি'
আকুল আগ্রহ ভরে! আঁকড়িতে চাহে বারে বারে
সমস্ত পরাণ দিয়ে; তিলে, তিলে ডুবায়ে পাথারে
লুপ্ত করি' চূর্ণ করি' এই পঙ্গু, বিশীর্ণ জীবন—
ফেনিল উচ্ছ্বাসে গড়ি বিশ্ব ভরি' অপূর্ব্ব মিলন
তরঙ্গ সঙ্ঘাত মাঝে!
　　　　আজি তোরে দিবে রাজটীকা—
রে মূঢ় লুকাস কোথা? জীবনের নব জয়-লিখা
লিখেছে রে ভাগ্যে তোর! মত্ত করী ছুটেছে দুর্জ্জয়,
সিংহাসন শূন্য বুঝি—একি তোর জাগিছে বিস্ময়!
আয়! আয়! আজি আয়! এই মুক্ত চন্দ্রাতপ তলে
নির্ভয়ে, চঞ্চল পদে, আকুল আগ্রহে দলে দলে!

কোথা চিন্তা?—কোথা ভয়? যৌবন ডেকেছে
　　　　তোরে আজ
জীবনের বাস্তব স্বপন!
　　　　অই দুটী ব্যগ্র বাহু মাঝ
সঞ্জীবন রস ক্ষরে; সমস্ত পরাণ জাগি' উঠি'
অধীর আগ্রহে পুনঃ তরঙ্গিয়া পড়ে লুটি' লুটি'
কি সে স্পর্শ! আকর্ষণ! পূর্ণ হয় রিক্ত প্রাণ মন—
মনে হয়, সত্য নয় সত্য নয়—একি রে স্বপন?
উত্তাল চপল বক্ষে পুলক-বেপথু ক্ষণে ক্ষণে
কে থাকিবে গৃহকোণে, কে রহিবে আজি অন্যমনে?
অই যে বক্ষের দোলে তরঙ্গে ছাপিছে তটরেখা
অই যে নিটোল বাহু, কুসুম-পেলব স্মৃতিলেখা
নিমেষে লুটিয়া পড়ে! আয়! আয়! আজি ওরে আয়
উথলে যৌবন সিন্ধু, তরঙ্গে তরঙ্গে শিহরায়
মিলনের স্পর্শ মাগি'! কামনার অনন্ত গরল
মিশিয়া সিন্ধুর জলে, আজি তারে করেছে উতল!
তাই রে জেগেছে বক্ষে কলকণ্ঠে কামনা দুর্ব্বার!
তাই রে জেগেছে অই, লীলায়িত চপল ঝঙ্কার;
সৃষ্টির আগ্রহ মাঝে দেহের বন্ধন নাহি মানে
জড়ায়ে ধরিতে চায়, জীবনের নব অভিযানে
যে আসে সম্মুখ বাহি'। একি দোল!
　　　　একি মহাদোল!
স্রোতের ফুলের প্রাণে ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে লেগেছে হিল্লোল!
উথলে যৌবন-সিন্ধু; তটরেখা হয়েছে বিলীন
জোয়ারের বক্ষোমাঝে।
　　　　আয় পঙ্গু, রিক্ত, দীন হীন!
আজিকে ঝাঁপায়ে পড়ি এ উত্তাল ক্ষুব্ধ দরিয়ায়
হয় পুনঃ জেগে উঠি, মৃত্যুঞ্জয়ী সুধার ধারায়;—
নয়, যাই—ডুবে যাই অতলান্তে—গভীর পরশে,
এ দুর্ব্বার কালাবর্ত্তে। প্রাণ যদি বন্দী পরবশে,
কোথা তৃপ্তি? কোথা সুখ?—হয় মৃত্যু—নয়
　　　　মুক্তি এই—
যৌবন-সিন্ধুর স্রোতে ইহা ছাড়া অন্য কিছু নেই!
আজিকে চঞ্চল সিন্ধু;—জলে তার দিব বিসর্জ্জিয়া—
এ মোর তৃষিত-আত্মা, নিঃশেষিয়া সব সমর্পিয়া!

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বালুর দেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ফেরা যখন স্থির হইয়া গেল তখন এক মুহূর্ত্ত অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মন উধাও হইয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। তিনটি দিন যেন আর কাটিতে চায় না। মন এখানকার অন্ন জল হইতে উঠিয়া গিয়াছে। অধীর-ভাবে কয়েদীর খালাস দিনের জন্য অপেক্ষা করার মতই মিনিট, ঘণ্টা, সেকেণ্ড পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে আমার ধৈর্য্যকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। সকল প্রয়োজন, সকল কর্ত্তব্য-জ্ঞান, সমস্ত উদ্বেগ ও চিন্তা সারি দিয়া পল্‌টনের মত মনের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে এক দিন মদনের পিতা বলিলেন, "দেখুন আপনি যাবার জন্য অকারণ ব্যস্ত হচ্ছেন। যা হবার তা ত হয়ে গেছে। গিয়ে তার ত আর কোন উপায় করতে পারবেন না! দিন কতক থেকে গেলে অনেক জায়গা দেখিয়ে আনতাম।"

বিনয় সহকারে জানাইলাম, তাঁর সহৃদেশ্যের কথা আমি অন্তরের সহিত অনুভব করি। কিন্তু মন আমার কিছুতে মানিতেছে না। আর একবার আসবার ইচ্ছা রহিল।

ইহার পর ডাক্তারবাবু নিমন্ত্রণ আসিল। তিনি বলিলেন, "আপনাকে পেয়ে বেশ আনন্দে এই বালুর দেশে দিন গুলো কাটছিল—দিন কতক থেকে গেলে ভালই হতো, একসঙ্গে যেতাম। আমিও ছুটির জন্য আবেদন করেছি।"

"আমার মনের অবস্থা আপনি বেশ বুঝতে পারছেন—থাকতে পারলে, আপনার সঙ্গ ও অনুরোধ কোন মতে ত্যাগ করে যেতাম না।"

এই কয়েক দিন বাসায় যা রাত্রি টুকু মাত্র ঘুমাইয়াছি। অবশিষ্ট সময় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া কাটাইয়াছি।

অবশেষে আমার ফিরিবার দিনের প্রভাত-সূর্য্য যখন রক্তিমচ্ছটা ছড়াইয়া পূর্ব্ব গগনে প্রকাশিত হইল তখন আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল। সকাল হইতে আমার সামান্য জিনিসপত্র যাহা কিছু ছিল তাহা গুছাইয়া ঠিক ঠাক করিয়া রাখিলাম—গাড়ি কিন্তু বৈকাল ৫টার সময়। তারপর ডাক্তারবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম। তাঁহার সহিত অনেক গল্প হইল। তিনি বলিলেন, দেশে ফিরিবার পথে আমার সঙ্গে কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন।

মন খুবই উতলা হইয়া উঠিয়াছিল। সকালেই মদনলাল আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "সত্যই কি যাবেন? দিন কতক থাকলে অনেকগুলো জায়গা আপনার দেখা হতো—এ তো আপনার কোন কিছুই দেখা হ'লো না!"

"আবার আসা যাবে—তখন দেখলেই চলবে।"

"আপনি বাড়ী যাবার জন্য ও কথা বলতে পারেন, কিন্তু আমার মন ত তা মানে না।"

"এতে তোমার দোষ কি? থাকতে পারলাম না, সে অপরাধ আমার। তোমরা আর কত দিন এখানে থাকবে?"

"এখনো কলকাতা ফিরতে আমাদের এক মাস দেরী হবে বলে মনে হয়। আপনি পৌঁছে একটা টেলিগ্রাম করবেন। চিঠিতে সব কথা খুলে লিখবেন।"

এই সময় গোয়ালা দুধ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। চিনি মিশ্রিত গরম দুধ পান করিতে করিতে মনে হইল—আজ হইতে দুধের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিল।

গাইয়ের বাঁট হইতে দোয়া নির্জ্জলা দুধ অদৃষ্টে জোটার সৌভাগ্য বোধ হইল—আজি হইতে অবসান। এমন করিয়া নিত্য সকালে কে আর দুধ জোগাইবে? মামুলী চা নামধারী গরম জলের অদূর অভ্যুদয়ের যে অধিক বিলম্ব নাই, সেই কথাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল। সেদিন বেশ মনে হইল, অনায়াসলব্ধ কোনও বস্তুর প্রতি মানুষের টান তেমন হয় না, যেমন পরিশ্রম করিয়া লাভ

করা জিনিসে ভিতর পাওয়া যায়। হোক না সে অতি তুচ্ছ, হোক না কেন সামান্য ও মূল্যহীন, তথাপি সে পাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ ও সুখ থাকে তা অন্যের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত তাড়াতাড়ি যে যাব এ কথা যেমন আমার জানা ছিল না, তেমন আপনাদেরও জানা ছিল না। সুতরাং এ যাত্রায় আমার আর শ্বেত পাথরের বাসন নিয়ে যাওয়া ঘটবে না?"

"যেদিন যাবার কথা প্রথম শুনেছি, সেই দিনই বাগানের মালীকে 'মাক্‌রাণা' পাঠিয়েছি আপনার বাসন আনবার জন্য। মালীর বাড়ী সেই খানে। সে বসে থেকে ভাল করে মনোমত জিনিস তৈরী করিয়ে নিয়ে আসবে। তেমন জিনিস তৈরী বিক্রী হয় না।"

"সে কবে আসবে তার ঠিক কি?"

মদনলাল হাসিয়া উত্তর করিল, "বাসন গুলোর জন্য কি এক দিন বিলম্ব করা অসম্ভব হবে?"

"আপনি কলকাতা যাবার সময় নিয়ে যাবেন। সেখান থেকে আমি নেবো এখন।"

"তার মানে আর এক্‌ দিনও বিলম্ব করা সম্ভব নয় এই ত আসল কথা? বেশ আমি না হয় নিয়ে যাব—কিন্তু কোন কারণে যদি ভুল হয় ত দোষ দিতে পারবেন না।"

দোষ দেওয়া আর না দেওয়া ত সে সুদূর ভবিষ্যতের কথা। উপস্থিত যাওয়াই আমার সব চেয়ে বড় দরকার। সেজন্য বলিলাম, "সে দোষ আপনার হবে কেন? সে দোষ হবে আমার।"

মদনলাল কোন উত্তর না করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর বলিল, "চলুন বাজারে বেড়িয়ে আসিগে।"

তখন উভয়ে বাজার অভিমুখে চলিলাম—কয়েক দিনের পরিচিত পথ, ঘাট, বাড়ী, দোকান ও মন্দির ছাড়িয়া যাইতে মন কেমন যে করিতে ছিল না, সেকথা বলিতে পারি না। এই অল্প দিনের বসবাসে তাহাদের উপর অজ্ঞাতে একটী মায়ার বন্ধন কখন যে ধীরে ধীরে পড়িয়াছিল—তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু আজ বিদায় বেলায় তাহা স্পষ্ট অনুভব করিলাম।

আহারাদির পর সে দিন বিশ্রাম করিবার যথেষ্ট সময় থাকিলেও বিশ্রাম করার কোন প্রয়োজনই রহিল না। বেলা দুইটার সময় শেঠজি আমাকে ডাকিয়া আমায় পথ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন—আমার কিছুই দেখা হইল না, বলিয়া বারবার তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ষ্টেশনে যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল—মনও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল—পাছে গড়িমসী করিতে করিতে ট্রেণ ফেল হইয়া যাই।

গাড়ির জন্য তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলাম—মদনলাল বলিল, "কোন চিন্তা নাই—গাড়ি ধরিয়ে দিলেই হ'লো?"

"ঐ এক খানা বইত আর ট্রেণ নাই—সেই যা ভয়।"

এই সময় ডাক্তারবাবু ও কম্পাউণ্ডারবাবু উভয়ে আমাকে গাড়িতে তুলিয়া দিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা ততক্ষণ আস্তে আস্তে এগুই, আপনি মদনবাবুর সঙ্গে আসুন।"

অল্প পরেই রথ আসিয়া দেখা দিল। তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। গোয়ালা জিনিসপত্র তুলিয়া দিল। মদনলালের মাতা আমার রাত্রির খাবার একটী কাপড়ে বাঁধিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এবং জল খাইবার কোনরূপ পাত্র আমার সঙ্গে ছিল না, আসিবার সময় উহা তাঁহার লক্ষ্য এড়াই নাই, সেজন্য একটী লোটাও সঙ্গে দিলেন। উহার উপর হিন্দীতে তাঁহাদের নাম খোদাই করা ছিল।

সকলের নিকট বিদায় লইয়া ষ্টেশনে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন গাড়ি আসিতে পনের মিনিট বিলম্ব ছিল। ইতি মধ্যে মদনলাল কখন টিকিট কিনিয়াছিল জানিতে পারি নাই। প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহাদের সহিত নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলাম। ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন, "বর যেমন পথ বদলাইয়া যায় আপনি ঠিক দেখছি তাই করলেন। এপথে কি এর পূর্ব্বে কোনদিন এসেছিলেন?"

বলিলাম, "না। আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন—তবে আনন্দ—একটা নূতন দিক দেখে যাওয়া হবে।"

মদনলাল বলিল, "এগাড়ি কিন্তু গাধা বোটের মত যাবে। এমন কি পথে ইচ্ছা করলে চলতি গাড়িতে লোক উঠতে

পারে। আপনি খুব সাবধানে যাবেন। এ ট্রেণে বড় বেশী রকম চুরি হয়। প্রায় চুরির কথা শুনতে পাওয়া যায়।”

একথা শুনিয়া মনের মধ্যে একটা চিন্তা দেখা দিল। কিন্তু ভয় করিলে ত আর রাস্তায় বাহির হওয়া চলে না। তারপর ভাবিলাম, এ না হয় জিনিসপত্র চুরি করিয়া লইয়া যাইবে—আর প্লেগ, সে যে, মা-বাবা বলিবার অবসর টুকু পর্য্যন্ত দিবে না।

আসন্ন সন্ধ্যার আলোছায়ার ছায়াবাজীর মধ্যে ট্রেণ আসিয়া হাজির হইল। এখানে এঞ্জিন জল লইল সুতরাং গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াইল। তারপর মরুভূমির বালু-তরঙ্গ বিকম্পিত করিয়া বংশীর ধ্বনি করিতে করিতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা গেল জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম—ধীরে ধীরে তাহারা দৃষ্টির বাহিরে যখন চলিয়া গেল তখন গাড়ির মধ্যে গিয়া বসিলাম।

এতক্ষণ দেখি নাই গাড়ির মধ্যে কোনও সহযাত্রী আছে কিনা। দেখিলাম, আমার সম্মুখের বেঞ্চে একটী মাড়োয়ারী যুবক বসিয়া আছেন। দেখিতে সুপুরুষ। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মত।

জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কোথায় যাবেন ?”

“বোম্বাই ?”

“সেখানে কি আপনার কারবার আছে ?”

“হাঁ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ থেকে সেখানেই কারবার। আপনি এখানে কোথায় এসেছিলেন ? আপনি বোধ হয় ডাক্তার ?”

“বেড়াতে এসেছিলাম। ডাক্তার নই। তনসুকবাবুকে বোধ হয় জানেন ? তাঁদের সঙ্গে এসেছিলাম।”

“সুখদেও দাস রামপ্রসাদদের তনসুকবাবু ?”

“হ্যা।”

“খুব চিনি। তাঁদের বোম্বাইয়েও ফারম আছে। এখানে কি রঙ্গলালবাবু আছেন ?”

“তাঁর আসবার কথা ছিল—কিন্তু কাযের ঝঞ্ঝাটে আসতে পারেন নি। মতিবাবু, মদনলাল অপর সকলে আছেন।”

“আপনার বেড়াবার সখ্ ত খুব দেখছি ! এই বালির দেশে—ফুলকা, কড়ী, আমাদের তরকারী খেয়ে—থাকতে ভাল লেগেছিল ? মাছ না হ'লে ত আপনাদের খাওয়াই হয় না !” বলিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

“সে কথা ঠিক। কিন্তু আমি মাছ মাংস খাই না—আমার কোন অসুবিধা হয় নি।”

মাছ মাংস খাই না—এ কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ে আমার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলেন। তারপর বলিলেন, “আপনি তা হ'লে অনেকখানি মাড়োয়ারী হ'য়ে গেছেন বলুন ?”

হাসিয়া উত্তর করিলাম, “মাছ মাংস যারা না খায় তারা কি তবে সবাই মাড়োয়ারী ?”

বলিলেন, “না, সে কথা বলছি না। তবে না খাওয়া খুব ভাল।”

“যেটা আপনার পক্ষে ভাল, হয় ত সেটাই অন্যে পক্ষে একেবারে ভাল না হ'তে পারে।”

ইতিমধ্যে কথায় কথায় আমরা দুই তিনটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলাম। তখন বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। গাড়ির মধ্যে যে আলো দেওয়া হইয়াছিল তাহা এত অপর্য্যাপ্ত যে ভাল করিয়া পরস্পরের মুখ দেখা যায় না। হঠাৎ মাঠের মাঝখানে গাড়ির আলো নিবিয়া গেল। গাড়িও থামিয়া গেল। ব্যাপার কি ? আমার সঙ্গী ভদ্রলোক বলিলেন, “এমন ঘটনা প্রতি দিনই এই রেলে ঘ'টে থাকে। এ সব আমার মনে হয় গার্ড-ড্রাইভারের বদমাইসী ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনি করে গাড়িতে চুরি হয়। অনেক লেখা-লেখি ক'রেও এর কোন প্রতিকার হয় নি।”

বলিলাম, “রাজা মহারাজার রেল কি না, হবার কথাই।”

“যা বলেছেন ; অনেক জিনিস আমরা করতে ছুটে যাই, কিন্তু তা পরিচালন করবার মত শক্তির যে যথেষ্ট অভাব তা প্রতি পদে পদে ধরা পড়ছে। আপনি কি বলেন ?”

“সেটা শুধু অভ্যাস ও অনুশীলনের অভাব ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না।”

তিনি বলিলেন, “দেখছেন গাড়ির ধারে ধারে লোক সব ভিক্ষা করতে সুরু করে দিয়েছে। অথচ নিকটে কোন গ্রাম নাই। তারপর রাত্রি-বেলা কেউ কোথাও কি ভিক্ষা

করে ? এরাই হচ্ছে চোর ডাকাত। আপনার জিনিস-পত্রগুলো সব সাবধান করে রাখুন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এরা এল কোথা থেকে ? নিকটে ত কোন বসবাস দেখছি না।"

"এদের চুরিই ব্যবসা। এরা গাড়িতে গাড়িতে আরোহী সেজে ঘুরে বেড়ায়—কাযেই ধরা বড় শক্ত। কিন্তু এদের পক্ষে চুরি করে নেমে যাওয়াও খুব সহজ। তারপর মাঝে মাঝে গাড়ির আলো, কোথাও কিছু নেই অমনি নিবে গেল—সেই অবকাশে এরাও কায হাসিল করে বসে।"

"ভয়ানক কথা ত! নূতন যাত্রী যারা এ পথে কোনও দিন আসে নি তাদের পদে পদে বিপদ বলুন !"

"নিশ্চয়, তার আর ভুল আছে !"

প্রায় এক ঘণ্টা কাল গাড়ি এখানে নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময় মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বাক্স হইতে বাতি বাহির করিয়া গাড়ির মধ্যে জ্বালিলেন। হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তিনি বলিলেন, "অকারণ চুপ করে বসে থেকে কোন লাভ নাই—আসুন এই ফুরসুতে রাত্রির আহারটা সেরে ফেলা যাক।"

মাড়োয়ারীরা সন্ধ্যায় আলো দেখিলেই আহার করিয়া থাকেন, সুতরাং এক্ষেত্রেও সে প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন ? তিনি তাঁহার পাচককে ডাকিলেন। পাশের গাড়িতে সে ও 'গোয়ালা' ছিল। মনিবের আহ্বানে আসিয়া খাবার দিবার আয়োজন করিল।

আমিও আমার খাবার বাহির করিতে উদ্যত হইলে, তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে যথেষ্ট খাবার আছে। আপনাকে আর কষ্ট করে বার করতে হবে না।" কিছুতেই তিনি আমার আপত্তি মানিলেন না। সুতরাং মদনের জননীর দেওয়া খাবারগুলি বন্ধন অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ভাবিলাম, পথে সদ্ব্যবহার করিলেই চলিবে। যা আপন হইতে আসিতেছে তাহাকে বাধা দেওয়া মোটেই সমীচীন বলিয়া মনে হইল না। অপরিচিত লোক হইলেও ইতিমধ্যে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছিলাম—তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে ও শিক্ষিত।

এবার তিনি বলিলেন, "সমস্ত খাবার আমার বাড়ীর প্রস্তুত। বাজারের বা পথে কেনা খাবার আমরা কোন দিন খাই না। কারণ যারা ষ্টেশনে খাবার বিক্রী করে তাদের মধ্যে পনেরো আনা লোকের কিছু মাত্র দায়িত্ব জ্ঞান নাই। যখন আমরা সফর করি তখন সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে করে আনি। এমন কি জল পর্য্যন্ত সঙ্গে থাকে।" তারপর তিনি বলিলেন, "আপনি বোধ হয় চামেরীয়ার নাম শুনেছেন—হাওড়া ষ্টেশনের কাছে যার প্রকাণ্ড ঘড়িওয়ালা বাড়ী ? চামেরীর হাউস আছে—"

উৎসাহভরে বলিলাম, "সে বাড়ী কে না জানে ?"

"সে বাড়ী আমাদেরই—আমার পিতার বাড়ী। কলকাতায় আমার ভাই কায দেখেন, আমি বোম্বাইয়ের কারমে থাকি। বিবাহ উপলক্ষ্যে বাড়ী এসেছিলাম। এ সব লাড্ডু, পেড়া সেই বিয়ের সময় প্রস্তুত।"

ঠাকুর দুই খানি রূপার থালায় আমাদের দুই জনের খাবার দিল। দুই তিন রকম শাক ছিল, পাঁচ ছয় রকমের চাটনী, মিষ্টির অভাব কিছুই ছিল না, প্রচুর খাওয়া হইল। এমন রাজভোগ পথের মাঝে যে জুটিবে তা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

হাসিয়া বলিলাম, "পথের মাঝে আপনার 'ব্রহ্মপুরী' হয়ে গেল দেখছি ?"

তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সুজানগড়ে বুঝি দেখেছেন ?"

বলিলাম, "হ্যাঁ।"

"এটা পরিবর্ত্তনের যুগ ভুললে চলবে না। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বের আচার ব্যবহার যেমন বদলে চলেছে, তেমন আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তন না ঘটে উপায় নেই। এ দোষ শুধু আমাদের দিলে চলবে না ; ব্রাহ্মণদেরও আছে। তারা দিন দিন যেমন হীন হয়ে পড়ছে—আমরাও তাদের ঠিক তেমনি ভাবে নীচের দিকে টেনে নিয়ে চলেছি। কারণ পূর্ব্বে তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা আমরা করতাম, এখন তারা আমাদের কাযটা কেড়ে নিয়েছে। অনেক দিন ধ'রে যা পেয়েছ এসেছিলেন এখন তারা সুদে আসলে তাই ফিরিয়ে দিচ্ছেন।"

"তার মানে ?"

"এখন আর তাঁরা পূর্ব্বের মত যেজ্ঞ মন—লোভী ও ভোগী হয়ে পড়েছেন। টাকাই এখন তাঁদের মান-ইজ্জৎ

ইষ্ট-মন্ত্র হয়ে পড়েছে। ব্যভিচার যথেষ্ট পরিমাণে তাঁদের অধিকার করে বসেছে।"

"একথা শুধু এ দেশের পক্ষে কেন, সর্ব্ব দেশেরই পক্ষে খাটে।"

রাত্রি আন্দাজ ১০টায় গাড়ি ডিগানা জংসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এটী একটী বড় জংসন। এখান হইতে নানা দিকে লাইন গিয়াছে।

তিনি বলিলেন, "এ গাড়ি আর আজ যাবে না। এখানেই নামতে হবে। এখান হ'তে রাত্রি বারটার সময় বোম্বাইয়ের গাড়ি ছাড়বে। আপনার গাড়ি ভোর পাঁচটার সময়।"

আমরা প্লাটফরমে বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিলাম। ভদ্রলোক খুব সদালাপী। তাঁহাকে আমার বেশ লাগিয়াছিল। এতখানি পথ, মুখ বুজিয়া আসিতে হইবে এ আশঙ্কা আমার যাত্রার পূর্ব্ব হইতে মনে উদয় হইয়াছিল। তাঁহাকে পাইয়া এতক্ষণ সারা পথটি বেশ আনন্দে কাটিল। বোম্বাইয়ের সম্বন্ধে তিনি অনেক আলোচনা করিলেন। সেখানে মাড়োয়ারীর বিশেষ প্রতিপত্তি নাই এবং জোর ব্যবসা করিতে পারেন না। সেখানকার কারবার সমস্তই ভাটিয়া পার্শি, ও মুসলমানদের হাতে। তবে এ কথাও বলিলেন, ভারত-বর্ষের মধ্যে বোম্বাই একটা প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ব্যবসার ক্ষেত্র সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

সেদিন আকাশে শুক্লপক্ষের নির্ম্মল চন্দ্র পরিপূর্ণ গৌরবে বিরাজ করিতেছিল। দূর দিগন্ত প্রসারিত শুভ্র বালু-তরঙ্গের উপর যেন জ্যোৎস্নার অফুরন্ত জোয়ার আসিয়াছিল। সে এক অভিনব, অপূর্ব্ব দৃশ্য! মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নালোক-তরঙ্গ উল্লাসে মাতাল হইয়া লুটাইয়া লুটাইয়া চলিয়াছে। মনে হইতেছিল, যেন গগন প্রাঙ্গণ হইতে কোন একজন রসিক পুরুষ জ্যোৎস্না লইয়া মরুভূমির বাধাহীন বক্ষের উপর লোফালুফি করিতেছেন। রাত্রি চারটার সময় গাড়ি আসিল। তাঁহার চাকর জিনিস পত্র গাড়িতে তুলিল। গাড়ি না ছাড়া পর্য্যন্ত তিনি প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেক কথা বলিলেন,—"সামান্য সময়ের জন্য আপনার সঙ্গে পরিচয়, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিনের জানা-শোনা। আপনি বোম্বাই হ'য়ে বাড়ী ফিরলে খুব আনন্দ পেতাম।"

বলিলাম, "এবার যখন বেরোব তখন কথা রইল আপনার ওখানে যাব।"

"বেশ। কিন্তু আমাকে পূর্ব্বে পত্র দেবেন—আমার নাম দুর্গাপদ চামেরীয়া।"—নামটা বোধ হয় এইরূপই বলিয়া ছিলেন।

গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। তিনি গাড়িতে গিয়া উঠিলেন। জানালার বাহিরে মুখ লইয়া বলিলেন, "খুব সাবধান, এই ষ্টেশন ভীষণ চোরের জায়গা।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। পথের পরিচয়ের যে কতখানি মূল্য তা ঠিক বলা যায় না। আজ তাহার স্মৃতি কিন্তু ভুলিতে পারি নাই।

ষ্টেশন-মাষ্টারকে ডাকাইয়া "ওয়েটিং রুম" খুলাইয়া লইলাম। তিনি ষ্টেশনে চাবি দিয়া বাসায় যাইবার উপক্রম করিলে, তাঁহাকে ওয়েটিং রুমে আলোর ও খাবার জলের ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। কথায় কথায় কৌশলে এ কথাও জানাইয়া দিলাম, যে আমি কলিকাতা হইতে এক জন পলাতক আসামীর অনুসন্ধান করিতে এ অঞ্চলে আসিয়াছি।

এই উদ্ভাবনীশক্তি সে রাত্রিতে আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল। বার বার "অশ্বথামা হত ইতি গজ" কথাটা সেদিন খুব বেশী করিয়া তার কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় দিয়াছিল। সুতরাং আলো ও পাহারা দিবার জন্য মাষ্টার মহাশয় বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। জিনিস-পত্র ওয়েটিং রুমের মধ্যে রাখিয়া দরজার সম্মুখে বেড়াইতে লাগিলাম। এই সময় এ অঞ্চলের একজন স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারী কোনও ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া আগ্রা যাইবার জন্য ভোরের গাড়ীর প্রতীক্ষায় ওয়েটিং রুমের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত ষ্টেশন মাষ্টারের কি কথা হইল, তারপর তিনি একখানি 'চারপাই' আনিয়া দিলেন। আমার সহিত তাহার দুই একটী মাত্র কথা হইল। তিনি ছিলেন মুসলমান। যাহা হউক দুই জন পাহারওয়ালা পাহারায় প্লাটফরমে নিযুক্ত রহিল। আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

একটা চলতি কথা আছে "অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়" আমার পক্ষে ঠিক তাহাই খাটিল। আমার সঙ্গে যে খাবার ছিল রাত্রি প্রায় একটার সময় সেগুলি

সদ্ব্যবহার করিতে গিয়া দেখি একটা বাঘের মত কুকুর শেল্ফের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে আহার করিতেছে। ভাবিলাম, এখন যদি তাহাকে তাড়া দিতে যাই, তাহা হইলে বিশেষ কোন লাভ নাই বরং কামড়াইয়া দিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। মুখ বুজিয়া চলিয়া আসিলাম। সারা রাত্রি এক বিন্দু নিদ্রা হইল না। সকালের গাড়িতে আগ্রা যাত্রা করিলাম। মুখ হাত ধুইবার মত এক ফোঁটা জল ষ্টেশনে পাইলাম না। অবশেষে এঞ্জিনের খালাসীকে চারি আনা পয়সা দিয়া গরম জলে কোন মতে সকালের কায সারিয়া লইলাম।

বেলা আন্দাজ নয়টার সময়, মানচিত্রে যে সম্বর হ্রদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, আজ তাহাকে প্রত্যক্ষ করিলাম। সে কি বিশাল দৃশ্য! সমুদ্র বলিলেই হয়। অনেক দূর হইতে দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলাম। এই হ্রদের মধ্য দিয়াই রেল লাইন আসিয়াছে। দুই ধারে হ্রদ। এক একটী নুনের পাহাড় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। সেই সমস্ত পাহাড়ের গায়ে নুন প্রস্তুতের তারিখ ও সাল লিপিবদ্ধ করা এক একখানি লোহারপ্লেট আঁটা আছে। তাহাতে নুনের পরিমাণও দেওয়া আছে। চাষের জমি যেমন আল দিয়া কৃষকগণ ঘেরিয়া নিজ নিজ সীমানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখে, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই। যে যতখানি নুন প্রস্তুতের জন্য জলকর বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, সে তাহা বেড়া দিয়া সীমা রেখা টানিয়া রাখিয়াছে। এখানে এমন একটা বিশ্রী আঁষটে দুর্গন্ধ ছাড়ে যে নাকে কাপড় দিয়া থাকিতে হয়। সম্বরে একটি ষ্টেশন আছে। দুই তিন মিনিট গাড়ি দাঁড়ায় তাহাতেই মনে হয় অন্ন-প্রাশনের অন্ন বুঝি বা উঠিয়া যায়। এখানে নুন প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই হ্রদ জয়পুরের অধীনে ছিল, এখন গভর্ণমেণ্ট মহারাজার নিকট হইতে "লিজ" লইয়াছেন না কি? এই হ্রদের আয়ও শুনিলাম খুব বেশী।

বেলা আন্দাজ তিনটার সময় জয়পুর আসিয়া পৌছিলাম। জয়পুরে নামিয়া অন্ততঃ এক দিন থাকিয়া আসিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু আর নামিতে ইচ্ছা হইল না। বাড়ীর দিকে মন ছুটিয়াছে। এক রাত্রি আগ্রার হোটেলে অতিবাহিত করিয়া পর দিন সকালের গাড়ীতে বাড়ী মুখো হইলাম। সত্য কথা বলিতে কি এ যাত্রায় তাজমহল পর্য্যন্ত দেখিবার ইচ্ছা হইল না।

রথ-যাত্রার দিন প্রভাতে বেলা ৫টার সময় বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্বেত-পাথরের বাসন পশ্চাতে আসিতেছে এই আশ্বাস-বাক্য দিয়া গৃহিণীর সহিত সন্ধি করিলাম। তাহার মধ্যে একটি সর্ত্ত রহিল, এই যে, অদূর ভবিষ্যতে যদি উক্ত বাসন না আসিয়া পৌঁছায় তাহা হইলে তুমুল সংগ্রাম বাধিবে। ভবিষ্যতের উপর কোন দিনই আমার বিশ্বাস নাই, সে কারণ বর্ত্তমানে সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলাম।

সমাপ্ত

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দায়মল

(গল্প)

নৈকষ্যকুলীন সন্তান হইয়াও হরিহর বাঁড়ুয্যে কুসংসর্গে পড়িয়া বাল্যকালেই যখন স্কুল-পলাইতে এবং মদ গাঁজা খাইতে অভ্যাস করিল, তখন বৃদ্ধ পিতামাতা তাহাকে সুপথে আনিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন। সফলকাম হইতে না পারিয়া নিজেরাই ক্রমে ক্রমে অজানা পথে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু সেই জন্য হরিহরের বিবাহে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। উঁহাদেরই মেলের ঘরের বয়স্কা এক কনে প্রমদার সহিত শুভবিবাহ শুভলগ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল।

প্রমদা পতিকে পাপপথ হইতে ফিরাইতে বিশেষ চেষ্টা করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। নেশার দায়ে হরিহর অবশেষে চৌর্য্যবৃত্তি আরম্ভ করিল; এবং ধরা

পরিয়া উপর্য্যুপরি তিনবার জেলে গেল। কিছুতেই নিরস্ত করিতে না পারিয়া সতী মনোদুঃখে ছয়মাসের একটী শিশু কন্যা রাখিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল। মরিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে হরিহর জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছিল। কাজেই হতভাগিনী মৃত্যুকালে অপদার্থ স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া হিন্দুসতীর চিরাকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্যলাভ করিয়া মরিতে পারিয়াছিল! মরিবার পূর্ব্বে শিশুকন্যার মুখ চাহিয়া এবং তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পুনরায় স্বামীকে পাপপথ হইতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছয়মাস সাধুভাবে জীবন যাপন করিয়া পুনরায় হরিহরের পাপবাসনা প্রবল হইল। ব্যাঙ্ক হইতে একব্যক্তি দুই হাজার টাকার একটী তোড়া লইয়া যাইতেছিল। হরিহর পথিমধ্যে দিবা দ্বিপ্রহরের সহর রাজপথে তাহাকে লগুড়াঘাতে ধরাশায়ী করিয়া টাকার তোড়া লইয়া ছুট দিল। একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই এক পাহারাওয়ালা তাহাকে বামাল সহিত গ্রেপ্তার করিল। হাজতে গিয়া সে জানাইল যে, তাহার ঘরে তাহার এক বৎসর বয়স্কা শিশুকন্যা আছে, সেই কন্যাকে তাহার নিকট না আনিয়া দিলে সে অনাহারে মারা যাইবে। অগত্যা পুলিশ হরিহরের শিশুকন্যাকেও তাহার নিকট আনিয়া দিল।

এই শিশুকন্যাটী সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না ছিল। গ্রামের পথে যাইতে এক সন্ন্যাসী এই শিশুকন্যাকে দেখিয়া হরিহরকে বলিয়াছিল, "এই কন্যাটী বড়ই ভাগ্যবতী হইবে; ইহার নাম 'রাজলক্ষ্মী' রাখিও।" হরিহর এই কথা শুনিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়াছিল। সন্ন্যাসী সেই হাসি দেখিয়া হরিহরকে বলিয়াছিল, "আমার কথা বিশ্বাস হইল না? আচ্ছা! আমি এই কন্যার অঙ্গে বাবার ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিতেছি। ভবিষ্যতে আমার কথা সত্য কি মিথ্যা বুঝিতে পারিবে।" বলিয়া রাজলক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধের নিকট একটী ক্ষুদ্র ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। আজ হাজতে রাজলক্ষ্মীকে দেখিয়া হরিহর পুনরায় সেই অবিশ্বাসের হাসি হাসিল।

যথাসময়ে হরিহরের বিচার হইয়া গেল। আসামী বলিয়া এবং প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথের উপর লুট্ করাতে মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিচার না হইয়া হরিহর দায়রায় সোপর্দ্দ হইল, এবং বিচারে চৌদ্দবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। রাজলক্ষ্মী বিচারকালে কাঠগড়াতে আসামীর নিকটেই ছিল। এখন বিপদ হইল রাজলক্ষ্মীকে লইয়া। উহাকে ত আর পিতার সহিত কারাগারে পাঠান যায় না। অথচ সেইরূপ নিরাশ্রয়া শিশুকে রাখিবার কোন আশ্রয়ও সেই নগরে ছিল না। জজ্ সাহেব দয়াপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আদালতে এমন কেহ আছেন কিনা যিনি এই কন্যাটীর লালন পালনের ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক।

দায়রা জজের পেস্কারের নাম কেদার বাঁড়ুয্যে। তিনি নিঃসন্তান। অনেক তুক্‌তাক্ করিয়া, বহু মাদুলি ধারণ করিয়া, তেত্রিশকোটী দেবদেবীকে বহু মানত করিয়াও কেদার বাবু কোন সন্তান লাভে সমর্থ হন্ নাই। রাজলক্ষ্মীকে কাঠগড়ায় দেখিয়াই কেদার বাবুর কেমন একটা স্নেহের টান্ পড়িয়া গিয়াছিল। পাপীর ঘরে কি করিয়া এমন সুন্দর সুলক্ষণ-সম্পন্না দেবকন্যার আবির্ভাব হইল, তাহা তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। জজ্ সাহেবের প্রশ্ন শুনিয়া কেদার বাবু কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন; এবং অবশেষে বলিলেন, "হুজুর, আমি নিঃসন্তান, আমি এই শিশুকে নিজ কন্যার মত লালন পালন করিব।" জজ্ সাহেব সম্মত হইলেন। প্রথমতঃ রাজলক্ষ্মী পিতার কোল হইতে কেদার বাবুর কোলে আসিতে অস্বীকৃতা হইল, পরে যখন অনেক অনুনয় বিনয়ে রাজলক্ষ্মী কেদার বাবুর কোলে আসিল তখন হরিহর একটী আরামের নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পাহারাওয়ালা-দিগকে বলিল, "আর দেরী কেন? আমাকে নিয়ে চল।" পাহারাওয়ালাগণ হরিহরকে হাতকড়ি লাগাইয়া দায়রা আদালতগৃহ পরিত্যাগ করিল। কেদার বাবু রাজলক্ষ্মীকে লইয়া নিজ গৃহে গেলেন। বহুলোক কেদার বাবুর গৃহে আসিয়া রাজলক্ষ্মীকে দেখিয়া গেল। অনেকেই বলিল, "কি দিব্যি মেয়েটী, বংশও ভাল।

কেদার বাবু এতদিন যাহা চাহিতেছিলেন, তাহা পাইয়াছেন। সকলই ভগবানের লীলা।"

এই ঘটনার পর চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। চৈত্র মাস, দ্বিপ্রহর, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এমন সময় মলিন বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া দ্বারে দ্বারে একমুষ্টি খাদ্য চাহিতেছে। সকলেই তাহাকে দুর দুর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে। অবশেষে সে একটী সুদৃশ্য দোতালা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর গিন্নি পনের বছরের বালিকা। সে ঝিকে পাঠাইয়া খবর লইল, লোকটী কি চায়? ভিখারী উত্তর দিল সে ব্রাহ্মণ, যদি ব্রাহ্মণের বাড়ী পায়, তবে সে শুধু দুটী ভাত খাইতে চায়। বলিকা গিন্নির লোকটীকে দেখিয়া কেমন একটা মমতা হইল, সে ঝিকে বলিল, লোকটীকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আনিয়া উহাকে ভাত দাও। লোকটী এই প্রকার অপ্রত্যাশিত দয়ায় বিস্মিত হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ঝি রোয়াকে খাইবার জায়গা করিয়া একটি আসন, একগ্লাস জল রাখিয়া পাচক ঠাকুরকে ডাকিতে গেল। গিয়া দেখিল পাচক ঠাকুর কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ঝি গিন্নিকে ডাকিয়া সেই সংবাদ দিল। বালিকা গিন্নি ইহা শুনিয়া সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল, "ক্ষতি নাই, আমি উহাকে নিজ হাতে খাইতে দিব।" বলিয়া নীচে নামিয়া পাকের ঘরে প্রবেশ করিল, থালায় ও বাটিতে অন্নব্যঞ্জন পরিবেষণ করিয়া ঐ ক্ষুধার্ত্ত লোকটীর সম্মুখে রাখিল। এমন সময় বাটীর দরজায় তাহার স্বামীর মোটর হর্ণ বাজিয়া উঠিল। ছুটিয়া বালিকা সদর দরজার পার্শ্বে উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইল। মোটর গাড়ী হইতে একটী গৌরবর্ণ সুন্দর যুবক অবতরণ করিল, এবং বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই বালিকা গৃহিণীকে সাদরে আলিঙ্গন করিল। রোয়াকের উপর যে লোকটী বসিয়া খাইতেছিল, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। লোকটীকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া গৃহিণীকে বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া, ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিল। গৃহিণী সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া বলিল যে, পাচক ঠাকুর গৃহে না থাকাতে সে নিজেই উহাকে খাইতে দিয়াছে। যুবক হাসিয়া বলিল, "আজ যে স্বয়ং অন্নপূর্ণা সাজিয়াছ! এখন পাগ্‌লা ভোলাকে কি খাইতে দিবে দিয়া যাও।" বলিয়া সিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। গৃহিণীও স্বামীর পশ্চাতে পশ্চাতে উপরে উঠিল, এবং তাহাকে মধ্যাহ্ন-কালীন জল খাবার দিয়া পুনরায় নীচে আসিল, এবং লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার আর কিছু চাই কি না? লোকটী খাইতে খাইতে আড়চোখে এই স্বর্গীয় দৃশ্য—এই নবযুবক দম্পতীর প্রেমলীলা দর্শন করিয়াছিল, এবং গৃহিণী নিকটে আসিলে বিহ্বলের মত একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রইল। বালিকা লোকটীর চাহনীতে কিয়ৎ পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—তাহার আর কিছু লাগিবে কি না? লোকটী উত্তর দিল, "না মা, আমার আর কিছু লাগিবে না। পরম পরিতোষ সহকারে আহার করিয়াছি। আমাকে আর একটু খাবার জল দিন।" বালিকা রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া একগ্লাস খাবার জল নিয়া লোকটীর গ্লাসে ঢালিয়া দিতে গেল। লোকটী দেখিল,—বালিকার দক্ষিণ হস্তে মণিবন্ধের নিকট একটী ক্ষুদ্র ত্রিশূল চিহ্ন। দেখিয়া উহার শরীরে মনে কেমন একটা উন্মাদনা আসিল, সে দক্ষিণ হস্তে বালিকার হাত চাপিয়া বলিয়া উঠিল, "মা রে রাজলক্ষ্মী!" বালিকা আতঙ্কে অস্ফুট চিৎকার করিয়া উঠিল। এমন সময় যুবকটী জল খাওয়ার শেষ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেছিল। তখনও সেই লোকটী বালিকার হস্ত পরিত্যাগ করে নাই। সেই দৃশ্য দেখিয়া যুবকের সুন্দর আনন ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "সয়তান, সদ্ব্যবহারের এই প্রতিদান?" বলিয়া সোফারকে আদেশ করিল,—লোকটীকে ধরিয়া থানায় লইয়া যাইতে। আমাদের দেশে স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে লোকে যেমন করে, যুবকও তাহাই করিল। তাহার স্ত্রীর হাত চাপিয়া ধরিয়াছে বলিলে লোকে নানা প্রকার কথা বলিবে, এই জন্য থানায় এমন এজাহার লিখিয়া পাঠাইল যে, লোকটী খাওয়ার পরে থালা ঘটী বাটি লইয়া পলাইতে-ছিল। বালিকা যখন জানিতে পারিল যে, উহাকে চোরের অভিযোগে থানায় পাঠান হইতেছে, তখন

স্বামীকে উহাকে ছাড়িয়া দিতে অনেক অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু যুবক সেই কথায় কর্ণপাত করিল না। বলিল যে,—লোকটী নিশ্চয়ই কোন দাগী বদমাস হইবে। লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল যে সে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল নানা জেলে ঘুরিয়া অবশেষে সেই দিন মাত্র মেদিনীপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অবশেষে এই বাড়ীতে আহার করিয়াছে।

পাঠকের বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই যে জেলমুক্ত লোকটী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সেই হরিহর বাঁড়ুয্যে। বালিকাটী তাহারই কন্যা, যাহার নাম রাজলক্ষ্মী; এবং যাহার প্রতিপালনের ভার কেদার বাঁড়ুয্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুবকটীর নাম নীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল। ইনি এখন মেদিনীপুরের ৩য় মুনসেফ এবং রাজলক্ষ্মীর স্বামী। কেদার বাবু রাজলক্ষ্মীকে নিজ কন্যারই মতন লালন পালন করিয়াছিলেন; এবং বহুব্যয়ে সৎপাত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। রূপেগুণে অনুপমা বলিয়া রাজলক্ষ্মীর তিনি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'অনুপমা' রাখিয়াছিলেন। নীহার প্রতিদিন ২টার সময় টিফিন খাইতে বাসায় আসিত। সমস্ত দিন অনুপমাকে চক্ষুর আড়াল করিয়া রাখিতে সে কষ্ট বোধ করিত। এই জন্যই কাছারীতে টিফিন না খাইয়া বাসায় আসিয়া টিফিন খাইয়া যাইত। আজও সে টিফিন খাইতে বাসায় আসিয়াছিল এবং তাহার আসার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। অনুপমার বিবাহের এক এক বৎসরের মধ্যেই কেদার বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী একে একে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। সকলেই অনুপমাকে কেদার বাবুর কন্যা বলিয়া জানিত। হরিহর বাঁড়ুয্যে কে এবং তাহার সহিত অনুপমার কি সম্বন্ধ তাহা কেহই জানিত না। হরিহরও ইহা নিজ স্পষ্ট অনুভব করিল। কিছুক্ষণ অধোবদনে নীরব থাকিয়া সে স্বেচ্ছায় সোফারের সহিত থানায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার রুক্ষ-গণ্ড বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝড়িয়া পড়িল।

সেদিন হাজতে হরিহরের নিদ্রা আসিল না। চৌদ্দ বৎসরের দুর্ব্বিষহ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষ বয়সে একটু শান্তি একটু স্বচ্ছন্দতার লোভ তাহার প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আবার পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, সে যদি সত্য প্রকাশ করে তবে চিরজীবনের জন্য তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা হইলেও তাহার কন্যার সুখের সংসারে দুঃখের অনল জ্বলিবে, শান্তির কুটীরে অশান্তি প্রবেশ করিবে। তাহার জামাতা রাজলক্ষ্মী ওরফে অনুপমাকে পেস্কার কেদার বাঁড়ুয্যের কন্যা বলিয়াই জানে। সে আত্মসুখের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য কন্যা জামাতার এত সুখ, এত শান্তি, এত মর্য্যাদা নষ্ট করিবে না, তাহাদের উঁচু মাথা হেঁট করিবে না। সে চুরি করিয়াছে স্বীকার করিবে, মনকে দৃঢ় করিবে। কন্যা জামাতার সুখ শান্তি ও মান রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করিবে।

যথাকালে পুনরায় হরিহরের দায়রায় বিচার হইল। চৌদ্দবৎসরের কারাবাস দণ্ডের পর মুক্তি পাইয়া সেই দিবসই পুনরায় চুরি করিয়াছে শুনিয়া জজসাহেব ও জুরীরা নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মুনসেফ বাবুর বাড়ী হইতে থালা ঘটি বাটি চুরি করিয়া পালাইতেছিলে?" প্রশ্ন শুনিয়া হরিহর কিয়ৎকাল নীরবে রহিল। সর্ব্বশরীর বিশেষতঃ ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইল। উদাস নয়নে সে কাছারীর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। হস্তদ্বয় যুক্ত করিয়া এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপর দিকে মস্তক উত্তোলন করিল; তারপর দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ হুজুর, আমি চুরি করিয়া পলাইতেছিলাম।"

জজ সাহেব। চৌদ্দবৎসর কারাগারে থাকিয়াও তোমার চরিত্রের উন্নতি হয় নাই? তোমাকে নিয়া কি করা যায় বল দেখি?

হরিহর। হুজুর, এ বয়সে আর আমার চরিত্রের উন্নতি হইবে না। আমাকে ফাঁসীর হুকুম দিন।

জজ্ সাহেব। আইন মতে তোমাকে ফাঁসীর হুকুম দিতে পারিনা। তবে আর যাহাতে তুমি জনসমাজকে উত্যক্ত করিতে না পার তজ্জন্য তোমাকে শাস্তি দিব। তোমার দায়মল অর্থাৎ যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড দিলাম।

অবিচলিত চিত্তে এবং প্রসন্নমুখে হরিহর এই দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিল। প্রহরীরা উহাকে হাত কড়ি দিয়া কাছারী হইতে জেলের দিকে লইয়া চলিল। পথে মুনসেফ্ বাবুর বাড়ী উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল রাজলক্ষ্মী জানলা দিয়া তাহাকে দেখিতেছে। রাজলক্ষ্মীর চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত। দেখিয়া হরিহর জোর করিয়া মুখ ফিরিয়া অন্যদিকে চাহিল।

শ্রীভুপেন্দ্রনাথ দাস।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

সাহিত্য

মাসিক বসুমতী—আষাঢ়।

বিলাতের স্মৃতি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। এবারে দক্ষিণ-ফ্রান্সের মনীষীদের দেখিয়া যে সত্যটা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই—সে কথা ভারতের বহু-প্রাচীন কথার প্রতিধ্বনি মাত্র এবং সে কথা তিনি নিজেও বহুবার বলিয়াছেন। কথাটা হইতেছে এই:—"পশ্চিম দেশ বড় হয়ে উঠেচে অর্থ সংগ্রহের দ্বারা নয়, আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা। এত বহুলোক এখানে ভাবের জন্য বস্তুকে, ভাবীর জন্যে উপস্থিতকে ত্যাগ করেচে যে, তার সংখ্যা নেই। সেই রকম অনেক লোককে দেখচি। যতই দেখচি, ততই মানবাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাচ্চে। জগতে যত কিছু উন্নতি ঘটেচে, মানুষের সেই আত্মদানের দ্বারা—ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা নৈব নৈব চ।"

পুরাণ-প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ। 'বেদের সহিত পুরাণের সম্বন্ধ', 'পুরাণের প্রয়োজনীয়,' 'পুরাণ কিরূপে গ্রথিত হইল', 'পুরাণের সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ', 'পুরাণ পদের নিরুক্ত', 'পুরাণের প্রাচীনতা', 'পুরাণের কাল-নির্ণয়' প্রভৃতি বিষয় এবারে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনার পদ্ধতি যেমন সুন্দর, বর্ণন-ভঙ্গীও তেমনই মনোহর।

সতীত্ব—এই ক্রমশঃ-প্রকাশ্য সুন্দর প্রবন্ধ বেশ্ই চলিতেছে। এবারের দশম পরিচ্ছেদটা—'ভূমা সুখ'—বাগ্‌বিতণ্ডায় পূর্ণ। না থাকিলেও প্রবন্ধের কিছুমাত্র অঙ্গ হানি হইত না। নবম পরিচ্ছেদে 'মাতৃত্বের' বিষয় আলোচিত হইয়াছে। যে সকল নবীন লেখক 'মাতৃত্ব বুভুক্ষা' অর্থে 'কামনা চরিতার্থ করা' বোঝেন তাঁহাদের সে ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন।

নীলকর জে, পি, ওয়াইজ—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী। সংগৃহীত প্রবন্ধ হইলেও লেখক ওয়াইজের চিত্র সুন্দর ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন।

তিব্বত—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায়ের ক্রমশঃ-প্রকাশ্য ভ্রমণ কাহিনী। লেবং হইতে আরম্ভ করিয়া মাত্র 'সং' গ্রাম পর্য্যন্ত লেখক আসিয়াছেন, মাত্র তিন দিনের কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রচনায় এখনও কোনরূপ বৈশিষ্ট্য বা আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা দেখিতে পাইলাম না।

দেশপ্রাণ-গিরিশচন্দ্র—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু। অল্প পরিসরের মধ্যে কর্ম্মবীর দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষের পরিচয় সুন্দর ভাবে দিয়াছেন। ইনিই 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকার প্রবর্ত্তক ছিলেন। প্রবন্ধের ভাষার মাধুর্য্য উপভোগ্য। প্রারম্ভের কয়েক ছত্র নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—"বাঙ্গালায় তখন জন্ কোম্পানীর আমল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল প্রভাব। দুরন্ত রাজ্যলিপ্সায় সমগ্র ভারত ছিল এই অর্থ-গৃধ্নু ব্যবসিকগণের অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্র। তখনও জাতির আত্ম-চৈতন্য উদ্বোধিত হয় নাই। যে কয়জন শিক্ষিত বাঙ্গালী দিনের পর দিন ইঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা, অত্যাচার উৎপীড়ন কাহিনী বিবৃত করিয়া সেই সুপ্ত-চৈতন্যের উদ্বোধন করিয়াছিলেন—গিরিশ তাঁহাদের অন্যতম। সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া এই দুর্জ্জয় দুঃসাহসিকতা যে তাঁহার বিপুল স্বার্থত্যাগ, সহৃদয় সহানুভূতি, অতি উদার স্বজাতি প্রীতি, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন, তাহা সহজেই অনুমেয়।"

সাহিত্য ও সমাজ—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু। সাহিত্যের আদর্শ ও লক্ষ্য যে বীভৎস রস-সঞ্চার করা নয়, প্রকৃতির নগ্নতার অনুসরণ করা, যে সভ্যতা শালীনতা ও ভব্যতার অনুমোদিত নয়, সমাজ-সংস্থিতির জন্য যে মানবের সংযম প্রয়োজন, 'সংযমহীন, বাধাহীন মনোবৃত্তি, সমাজবদ্ধ জীব মানুষের পক্ষে স্বাধীনতার পর্য্যায়-ভুক্ত নহে, উহা স্বেচ্ছাচারের নামান্তর'—লেখক তাহা আলোচ্য প্রবন্ধে সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন। রমণীর স্বাধীনতার নামে মিথুনাসক্তি বা ছাগবৃত্তির প্রচারে যাঁহারা আমাদের সাহিত্যকে কলুষিত করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যের ফল যে কি বিষময় হইবে তাহাও দেখাইয়া দিতে ত্রুটী করেন নাই। লেখক, পরিশেষে বলিয়াছেন—'Venus and Adonis,' Rape of Lucerce, ঋতুসংহার, মেঘদূত আদি অমরগ্রন্থে শ্লীলতার সীমা বহুস্থলে অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে সেই রস কোথাও 'গাঁজিয়া' যায় নাই। তাহাতে রস-সাহিত্যের মর্য্যাদা

আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোথাও বীভৎস পাপের জঘন্য চিত্র মনকে পীড়িত ও ভারাক্রান্ত করে না, সমাজে শৃঙ্খলা ও সংযম-ভঙ্গের প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলে না।

ভারতবর্ষ—শ্রাবণ।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্যের ভূমিকা—শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম-এ। এই সুচিন্তিত সুলিখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কোথায় লেখক তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ঘটনাকে লইয়া সন্তুষ্ট নন, তিনি ঘটনার 'পশ্চাতে যে অতীন্দ্রিয় ভাব বস্তুটী' আছে তাহার সন্ধান লইতেই ব্যস্ত। লেখক সত্যই বলিয়াছেন, facts-এর ভিতর দিয়া তাঁহার কবিধর্ম্ম ততটা বিকশিত হয় নাই যতটা হইয়াছে abstractionএর ভিতর দিয়া—যখন পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্য্যানুভূতির মধ্যেও ডুবিয়া আছেন তখনও যাহা দৃশ্য, যাহাকে ধরিতে ছুঁইতে ভোগ করিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে তিনি আনন্দ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই ; খুঁজিয়াছেন Symbolকে, অরূপকে, রূপাতীতকে। এই Sybbolical বা mysticalএর দিকটা তিনি মেটারলিঙ্ক, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদের নিকট হইতে ধার করেন নাই—এ রীতি আমাদের প্রাচীন উপনিষদেরই রীতি—ভারতবর্ষের ইতিহাসের সমস্ত মর্ম্মকে উদ্ঘাটন করিয়া এই আদর্শ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—উপনিষদেরই উহাই মর্ম্মকথা। আর এই অরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রূপক নাট্যেই সমধিক দিয়াছেন। এই শ্রেণীর নাটক গুলিতে সত্যই কোন প্লট নাই—কোন গল্প নাই—আছে কেবল অনুভূতির প্রকাশ।—'তাঁহার সব রূপক-নাট্যেই, পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রে যাহাকে বলে action তাহা নাই।' তিনি দেখাইয়াছেন শুধু কাব্যেই যে অসীম ও অতীন্দ্রিয়ের আভাসকে ফুটাইয়া তোলা যায় তাহা নয়—নাটক রচনায় ও অভিনয়ের ভিতর দিয়াও সে ভাবকে স্ফূর্ত্ত করা যায়। তাহার পর লেখক রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্যের যে রূপ (form) দিয়াছেন তাহা তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে খুব কমই দেখিয়াছেন। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে Spirit (মর্ম্ম কথা) এর প্রসঙ্গে তিনি এ কথা বলেন নাই। লেখক পরে প্রশ্ন করিয়াছেন, এ সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি কি না? এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে গিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক রূপক-নাট্যের বৈশিষ্ট্য ও অসীমের ভিন্ন রূপ ও ভাবের প্রকাশ ভঙ্গী দেখাইয়াছেন এবং মেটারলিঙ্ক, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বাদীদের রচনার সহিত তাঁহার রচনার পার্থক্য দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরা নিম্নে লেখকের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—"ডাকঘরে'ও দেখি ডাক হরকরা কোথাও নাই, রাজা কোথাও দেখা দেন না, অথচ তাহারই অমলের মনকে আমাদের মনকে টানে। এই যে নাটকের কেন্দ্র-বস্তুটিকে এমন করিয়া নাটক হইতে বাহির করিয়া দিয়া দূরে নাগালের সীমার বাহিরে বসাইয়া রাখিয়া আমাদের মনকে টানা, এই ভঙ্গিমাটীও যেন রবীন্দ্রনাথের অসীমের তৃষ্ণাকে এমন সুন্দর করিয়া ফুটাইবার কৌশলটি পাশ্চাত্য রূপনাট্য রচয়িতাদের কাহারও মধ্যে থাকিলেও এমন তীব্র হইয়া কোথাও বোধ হয় নাই। সেই জন্য বলিতেছিলাম, রূপনাট্যের বিশেষ ভঙ্গিমার ছায়াটিকে হয়ত রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য নাটক হইতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু কায়া তাঁহাকে নিজে সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, এবং তাহার বিকাশের পথ তিনি নিজেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।" পরিশেষে লেখক বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ "অমর হইবেন, নাটকের মধ্যে তিনি আমাদের জীবনকে যে পূর্ণ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার জন্য, যে অরূপ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আভাস দিয়াছেন তাহার জন্য।" আলোচ্য প্রবন্ধে লেখকের চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু কয়েকস্থল পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট বলিয়া মাঝে মাঝে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। অতি বিস্তৃতির ফলে রচনা মাঝে মাঝে তরলও হইয়াছে। অবান্তর কথার চাপে প্রবন্ধও অযথা ভারাক্রান্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন, রূপক কাব্যের অন্তর-রহস্য বুঝাইতে গিয়া 'পাঁচ' অধ্যায়ে উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন ইত্যাদি ও 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্' ইত্যাদি বলিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার আবশ্যকতা কি ছিল? যাহা হউক তাঁহার এই ভূমিকা পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যরস—শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন এম এ। পূর্ব্বের মতই সুন্দর ভাবে চলিতেছে।

স্বর্ণলালী—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-রত্ন। বীরভূমের মহিলা কবি স্বর্ণলালী দেবীর তিনটী পদ উদ্ধার করিয়া লেখক যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছেন। জানিবার বিশেষ কিছুই নাই।

এই তিনটী নিছক সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়া, একটি সংকলিত ভ্রমণ-কাহিনী চিত্রের অনুরোধে ছাপা হইয়াছে। চিত্রগুলির পরিচয় প্রবন্ধে আদৌ নাই, চিত্রের নিম্নে মাত্র যৎসামান্য বিবরণ আছে। এই সংকলিত প্রবন্ধটি হইতেছে শ্রীযুক্ত ভারতকুমার বসুর 'গ্রীস'।

এ মাসে দুইটী সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী আছে। একটী শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র লাল বসুর 'জুরিক থেকে মনট্রো'। প্রবন্ধটীর ভাষা যেমন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাও তেমনই মনোরম। অপরটী কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের 'সিংহল দ্বীপ' ভ্রমণ। এবারে সিংহলীদের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এখানেও পূর্ব্বোক্ত গ্রীস প্রবন্ধের অবান্তর চিত্র-সংযোগের মত অনেকগুলি চিত্র অযথা সংযুক্ত হইয়াছে, প্রবন্ধের ভিতর সেগুলির আদৌ উল্লেখ নাই।

বিচিত্রা—আষাঢ়।

বেদনার মূল্য—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৩০ সালে লিখিত একখানি পত্র হইতে গৃহীত। কবি বলিয়াছেন, "জীবনে যাহাকে আমরা মর্ত্ত্য লোকের বৈচিত্র্যের মধ্যে পাইয়াছি, মৃত্যুতে তাহাকে আমরা অমৃত লোকের ঐক্যের মধ্যে পাই। সেই পাওয়ায় আমাদের মর্ত্ত্য দেহ মনের কান্না মেটে না বটে, কিন্তু অশ্রু তরঙ্গের তলে তলে আমাদের অন্তরাত্মায় একটি শান্তির ধারা বহিতে থাকে।" এই বাক্যে গভীর দার্শনিক অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাব অবশ্য নূতন নয়, তবে

বলিবার ধরণটিতে কিছু নূতনত্ব আছে। সম্পাদক প্রথম পৃষ্ঠায় এই ছোট সামান্য রচনাটি প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বন্দ্ব—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই প্রবন্ধে কবি ভারতের চক্ষু দিয়া আমাদের সাংসারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। আলোচনা সাময়িক। বর্ত্তমান যুগের বর্ণনা প্রাঞ্জল ও কবিজনোচিত। সর্ব্বত্র কবির সূক্ষ্মদর্শিতা ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। আধুনিক বিদেশীয় মতবাদ সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষির কথাই উক্ত হইয়াছে। রচনা উপাদেয়। আধুনিক বিদেশীয় মতবাদের মধ্যে যাঁহারা মুক্তির বার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছেন তাঁহাদের দৃষ্টি আমরা এই রচনার দিকে আকর্ষণ করিতে চাই।

মেঘদূতে রমণী—শ্রীযুক্ত হরি সেন।

কালিদাস মেঘদূতে যে সকল রমণীদের বর্ণনা করিয়াছেন, লেখক তাহাদের একটি তালিকা ও তাহাদের সম্বন্ধে কবির মন্তব্যগুলিও একত্র সংকলন করিয়াছেন। প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা কিছু উপকৃত হইতে পারে। আমরা কিন্তু রচনার কোন বৈশিষ্ট্য দেখিলাম না। বিষয়টিকে ফেনাইয়া যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার মূল্য সামান্য। লেখকের পরিশ্রমও ব্যর্থ হইয়াছে। সূক্ষ্মদর্শিতার প্রমাণ কোথাও নাই।

কর্ত্তব্যের কথা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক।

লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহা Ehicsএর কয়েকটি অতি পুরাতন কথা। বলিবার ভঙ্গী সরল ও সুস্পষ্ট হইলে ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকের উপযোগী হইতে পারিত। মনে করিয়াছিলাম লেখক মহাশয় কোন নূতন কথা শুনাইবেন, কিন্তু প্রবন্ধটি পড়িয়া নিরাশ হইয়াছি। তবে একটা আশা আছে—তিনি পরে এবিষয়ে আরও কয়েকটি কথা বলিবেন।

মধ্য এশিয়ায় হিন্দু সাহিত্য—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী।

মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ প্রভাবের বর্ণনা, ঐতিহাসিক প্রমাণ ও চিত্রের যোগে সুপাঠ্য হইয়াছে। বর্ণনা আরও বিশদ হওয়া আবশ্যক।

ডিঙ্কেলস্‌ব্যুল—শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রলাল বসু।

জার্ম্মানীর একটি পুরাতন সহরের কথা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ণনা সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক।

রবীন্দ্র কাব্যের অধ্যাত্ম সম্পদ—শ্রীযুক্ত বিনায়ক সান্ন্যাল।

লেখক নূতন কথা বিশেষ কিছু বলেন নাই, তবে প্রবন্ধটি সুলিখিত। বিদেশীয় কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনাটুকুও হৃদয়গ্রাহী। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা কতকটা ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পদ বর্ণিত হয় নাই।

তিব্বতের কথা—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল।

লেখক তিব্বতের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু রচনার একটা শৃঙ্খলা বা সুরীতি লক্ষিত হয় না। কতকগুলি বিষয় জোড়া তাড়া দিয়া একটা অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন রচনা তিনি পাঠকদিগকে দিয়াছেন।

কিন্নর—শ্রীযুক্ত অষ্টাবক্র। কিন্নর সম্বন্ধে একটি সুন্দর সুরচিত প্রবন্ধ, চিত্রসহযোগে বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বিষয় মাঝে মাঝে আরও স্পষ্ট ও বিশদ হওয়া উচিত।

প্রবাসী—শ্রাবণ

রবীন্দ্রনাথের চিঠি—

রবীন্দ্রনাথের দুখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তবে মাসিক-পত্রিকায় এগুলির স্থান আছে কি না তাহা বিচার্য্য। আমাদের মনে হয়, পত্রগুলি প্রবাসীতে প্রকাশিত না হইলেই ভাল হইত। মাসিক সাহিত্যে যাঁহারা বাণীর সেবক তাঁহাদের সাময়িক সাধনা আনন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে। যাহা পুরাতন, যাহা ব্যক্তিগত,তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করুক। মাসিক পত্রিকায় সাহিত্য সাধকদের রচনা দু একখানি সামান্য পত্র সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যের সঙ্গে ভেজাল দিলে ব্যবসা চলিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য চলে না। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পত্র দুখানি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রকাশ করিতে দেন নাই। সম্পাদক মহাশয় কিন্তু মাসিক সাহিত্যের হাটে এই সব কুড়ানো জিনিস চালাইতে চেষ্টা করিয়া শুধু নির্ব্বাচন শক্তির নয়, সদ্‌যুক্তিরও পরিচয় দেন নাই। রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলির মূল্য কেহই অস্বীকার করিবে না, তবে তাহাদের মধ্যে যেগুলি নিকৃষ্ট তাহা মাসিক পত্রে প্রকাশ করা আমরা সঙ্গত মনে করি না।

নেপালী কবি ভানুভক্ত—শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু। এই নেপালী কবির পরিচয়টুকু বাঙ্গালী পাঠকের শ্রোতব্য, পঠিতব্য ও জ্ঞাতব্য সন্দেহ নাই; তবে আমরা আশা করিয়াছিলাম লেখক তাহা সহজ সরল সরস ও নিবিড় করিয়া তুলিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সে আশা আমাদের ফলবতী হয় নাই। রচনা খুবই ছোট। আমরা যে পরিচয় পাই তাহা যেমন দীর্ঘ, যে পরিচয় লই তাহাও সেইরূপ—শুধু নাম ধাম ঠিকানায় আমরা তৃপ্ত হই না, আমরা চাই মেল, গাঁই, গোত্র ইত্যাদি। সেই জন্য এই প্রবন্ধটি কোন অ-ভারতীয় পত্রে প্রকাশিত হইলে যেরূপ সুশোভন হইত, এস্থলে সেরূপ হইতে পারে নাই। তারপর কবির কবিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অতি সামান্য।

মুদ্রিত পুরাতন পুস্তক—শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধে দুখানি পুরাতন বাংলা গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থ দুখানির রচয়িতা নীলকণ্ঠ হালদার ও ডব্‌লু অব্রায়েণ স্মিথ। দুখানি গ্রন্থই প্রায় বাট বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। তখনকার সাহেব ও বাঙ্গালীর ভাষার কিছু নমুনাও উদ্ধৃতি হইয়াছে। যাঁহারা বাংলার ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকট রচনাটির বিশেষ সমাদর হইতে পারে।

হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস-সরোবর—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। এবারের বিবরণ সুন্দর, রেখাচিত্রগুলিও মন্দ নয়, তবে এ সব প্রবন্ধে ফটোই অধিকতর উপযোগী।

শ্রীসূর্য্যের পাহাড় গোয়ালপাড়া—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

প্রবন্ধটী পড়িয়া যাহা অবগত হওয়া যায় তাহা সামান্য। ঐতিহাসিক তথ্য, বিচারশক্তি বা সাহিত্য-রস এই তিনের মধ্যে কোনটারও পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে দুচারিটি নূতন কথা আছে, তাহা পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইতে পারে।

কথা-সাহিত্য

প্রবাসী—শ্রাবণ।

পিতৃদায়—শ্রীমতী স্বর্ণলতা চৌধুরী।

একটি বিদেশী গল্প ভাষান্তরিত হইয়াছে। বিষয়-নির্ব্বাচনে কোন কৃতিত্ব নাই। বাঙ্গালী পাঠক ইহার রসাস্বাদ হয়ত কিছু করিতে পারেন, কিন্তু জিনিসটা পুরাদস্তুর বিদেশী। ইহার জন্য এত শ্রম স্বীকার পণ্ডশ্রম বলিয়াই মনে হয়। বিষয়টা কতকটা জাল প্রতাপচাঁদের মত—নূতনত্ব নাই বলিলেও চলে।

রাণুর প্রথম ভাগ—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

রাণুর গৃহিণীপনার চিত্রটি সুন্দর। উপসংহারও বেশ করুণ; কিন্তু সমাজকে একটু আঘাত করিতে গিয়া লেখক নিজেও অল্প আহত হন নাই। কারণ তাঁহার এই রচনা বিষয় বস্তুর সরল অপ্রতিহত অভিব্যক্তির অভাবে কতকটা ব্যর্থ হইয়াছে। বিষয় পুরাতন হইলেও লেখকের রচনা-ভঙ্গী মন্দ নয়। মোটের উপর গল্পটি সুপাঠ্য।

সাঁচ্চা ও ঝুটা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

এক জুয়াচোর ও তাহার সদলবলে গ্রেপ্তারের কথা। লিপিকুশলতায় বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও চিত্তাকর্ষক। ঘটনাটি গোয়েন্দা-কাহিনীর মত—এক শ্রেণীর পাঠক ইহার সমাদর করিবেন। আমাদের আশা কিন্তু লেখক মিটাইতে পারেন নাই।

নারীর দেবতা—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত।

পতিব্রতা স্ত্রী ও দুর্বৃত্ত স্বামীর চিরপুরাতন কথা। রচনা-ভঙ্গীতেও নূতনত্ব নাই। করুণরস ফুটাইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

বিচিত্রা—আষাঢ়।

এই সংখ্যায় তিনটি ছোট গল্প আছে।

"নেকী" শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি। লেখকের গল্প লিখিবার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় এই রচনার মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আগা গোড়া গল্পটি নেকীর অপূর্ব্ব সংযম ও আত্মসম্রম বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনখানেও একটু খানি অস্বাভাবিকতায় সীমা অতিক্রম করে নাই। শিক্ষিতা নেকীচরিত্র লেখক পল্লী পুষ্করিণী তীরে সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহার মধ্যে, বক্তব্যের মধ্যে এতটুকু ইতরামী কোথায় নাই।

ম্যাট্রিকুলেসন পাশ নেকীর মুখের লেখক একটী দিনের জন্য ইংরাজি বিদ্যার পরিচায়ক একটীও শব্দ দেন নাই, নেকীর শিক্ষার উজ্জ্বল দীপ্তি প্রয়োজনমত কৌশলে স্থানে স্থানে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাষা ও বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর ও স্বাভাবিক।

"মহাশক্তি রসায়ন"—শ্রীযুক্ত অনসল মুখোপাধ্যায় রচিত একটী হাস্যরসাত্মক ছোট গল্প। আরম্ভে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "দুষ্টগ্রহ" উপন্যাসের স্পষ্ট ছায়াপাত হইয়াছে। মধ্যভাগ Jerome এর Three men in a Boat হইতে গৃহীত, এমন কি প্রেস্ক্রপসন খানি পর্য্যন্ত। এ অংশ কতকটা রসাল হইয়াছে। সমাপ্তি লেখকের নিজস্ব। নিজস্ব অংশে বৈচিত্র্যও নাই, রুচিরও সৌষ্ঠবের অভাব।

ব্যর্থ প্রতিশোধ—শ্রীযুক্ত কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। গল্প বেশ সুন্দর হইতেছিল, কিন্তু শেষের দিকে লেখক আখ্যানবস্তুর নূতনত্ব করিতে গিয়া গল্পটির সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। মেয়েটির না-মাঞ্জুর বিবাহের পর যদি যূথীর দাদা সৎসাহস দেখাইয়া মেয়েটিকে বিবাহ করিতে পারিত তাহা হইলে গল্পটি জমিত ভাল।

ভারতবর্ষ—শ্রাবণ।

মৃত্যুঞ্জয়—শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার ধর। এবার ভারতবর্ষে এই একটী মাত্র গল্প। ইহা একটী করুণ চিত্রমাত্র। আর বিশেষ কিছু নাই। মনের উপর কোন ছাপ দেয় না।

মাসিক বসুমতী—আষাঢ়

শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষের 'কৃতজ্ঞ' গল্পটীর তাৎপর্য্য বোধগম্য হইল না। নায়কের বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণ ও ঘোরালো বুদ্ধি লইয়া পরীক্ষা সাগর উত্তীর্ণ হইতে বার কয়েক নৌকাডুবি হইলেও, কবিতা ও কথা সাহিত্যের স্তূপ তাহার পুঞ্জীভূত হইতেছিল। বন্ধুবর "কল্পনা"-সম্পাদকের মাজা ঘষার কিছু কিছু চলিতেছিলও বটে। কিন্তু দুর্ব্বলতা-পুষ্ট নায়ক তাঁহাকে শিক্ষা দিতে ভুলেন নাই। নূতন মাসিক বাহির করিয়া নূতন বন্ধু সাহায্যে বন্ধুতা প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি যে দৌর্ব্বল্য ও কাপুরুষতা ইহাই প্রমাণ করাইতে থাকিলেন। অবশ্য দেনাও বাড়িয়া চলিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় বিধবা শ্যালীকে অস্পষ্ট উপলক্ষ করিয়া 'গৃহিনী সচিবঃ সখী'র মরকিয়া সেবনের কারণ বুঝা গেল না। পরে দেনার দায়ে বেলিফের আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিলেন অল্পবয়স্ক কল্পনা-প্রবণ ও গভীর বিষয়ী 'দৈনিকের' স্বত্বাধিকারী। উদ্ধার হইয়া বন্ধু সম্পাদক স্বত্বাধিকারীকে ডুবাইতে নায়কের বেশী সময় লাগিল না। শেষে ভুল ভাঙ্গিলে স্বত্বাধিকারী একদিন স্বার্থের জন্য সত্য মিথ্যার পার্থক্যে অবিশ্বাসীকে তাড়াইয়া দিলেন। গল্পটী কোনও জীবন্ত "কৃতজ্ঞতা'' রাজ্যের হেঁয়ালী নাকি? মাসিক বসুমতীতে স্থান পাইয়াছে দেখিয়া নানা কথা মনে হয়। গল্পটী মোটেই জোটে নাই।

শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্যের "অমৃত" গল্পটীতে করুণ রস ফুটিয়াছে। জমিদার রাজেন্দ্র ও তাঁহার যুবতী সুন্দরী স্ত্রীর মধ্যে অকারণ বিপুল ব্যবধান দূর করিল পুত্র অমৃত। ডাক্তারের নির্দ্দেশে পুত্রের রোগশয্যাপার্শ্বে দুই ধারে দুই জনের নির্ব্বাক বসিয়া একই কামনা একই প্রার্থনার ফলে বালকের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। পুত্র পিতা ও মাতার পুনর্ম্মিলন সংঘটন করাইল। বহু দিনের বাঁধ আনন্দাশ্রু ধারায় কোথায় ভাসিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত সতীপতি বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ছেঁড়া কাঁথা" গল্পে ডার্ব্বি টিকিটের সনাতন প্রসঙ্গ লইয়া একটা বাস্তব স্বপ্ন রচিয়াছেন। প্রতি বৎসর ঘরে ঘরে বহু নরনারীর সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্যের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার যে বৃথা চেষ্টা লক্ষিত হয় গল্পটীতে তাহা বেশ ফুটিয়াছে।

কবিতা

বিচিত্রা—আষাঢ়।

সাগরিকার ব্যথা—শ্রীমতী কল্পনা দেবী। রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ কতকগুলি রচনা হইতে মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া এই কবিতা-স্তূপ প্রস্তুত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্য-ভোজের কখনও আস্বাদ পান নাই এমন হতভাগ্য পাঠক যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি রন্ধন-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এই স্তূপকে স্তূপের মনে করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু অভিজ্ঞ পাঠকের কাছে এই সুমিষ্ট ও সুগন্ধি রচনাটি "অস্বাদিত মধু বা অনাঘ্রাতা যূথী" বলিয়া মনে হইবে না।

সায়াহ্নিকা—শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ। রচনাটি ধাপে ধাপে বেশ শক্ত হইয়া উঠিয়া শেষকালে একেবারে granite প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। শেষ দু লাইন তুলিয়া দিই :—

মর্ত্ত্য বিচ্ছেদেরে ভরে আমার জ্যোতির নির্ঝর—
দিয়ো দোঁহে একটি প্রহর॥

এর পর বলিতে ইচ্ছা হয়—হে পাঠক,

অর্থ মিলাবার তরে ভাগ্য 'পরে করিও নির্ভর—
এযে দগ্ধ কঠিন প্রস্তর।

ছন্দ-পতনের কথা এর কাছে অতি তুচ্ছ।

অপচয়—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই, সি, এস্। ১৬ লাইন রচনা, যদি ৪ লাইনে stanza ধরা যায় তবে প্রত্যেক stanzaর তৃতীয় লাইন হইতেছে—

"দিনে থাকি আনমনা রাত্রে অচেতন"

কবিতাটি পড়িয়া আমরা ইহার রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম না।

বর্ষার গান—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। কবি প্রথমেই আশা দিলেন যে এবার বর্ষায় 'ভিন্ সুরে' গান গাহিবেন। কিন্তু আমাদের কপাল গুণে সেই 'খোড়-বড়ি-খাড়াই' জুটিল। তবে হাঁ, একটু 'ভিন্ সুর' হইয়াছে বৈকি, নব বরষার স্থলে আছে 'নয়া বরিষা' দু লাইন পরে আবার এই 'নয়া' নূতন হইয়া 'নও' এ দাঁড়াইয়াছে; দুয়ার আগলের সঙ্গে 'হিয়ার পাগল' মিলিয়াছে। শেষকালে এই 'ভিন্ সুর' কিন্তু একেবারে চরমে উঠিয়াছে, যথা :—

কেতকী গন্ধে দিশি যায় ভয়ে'
নিশি তায় করে পান।

হাসি-কান্না—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার সরকার। হাসি ও কান্না পাশা-পাশি বেশ ফুটিয়াছে। কোন রকম কায়দা বা কসরত করিতে না গিয়া কবি ভালই করিয়াছেন। কিন্তু ছন্দের সমতা রক্ষা না করায় কোন সঙ্গত কারণ পাইলাম না।

তৃষিত যৌবন—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস এম্ এ। কবিতাটির সুন্দর রচনা। প্রকাশভঙ্গী বেশ হৃদয়গ্রাহী, ছন্দের গতিও অপ্রতিহত। কল্পনার প্রসার আছে। সবই ভাল কিন্তু 'তৃতীয় যৌবন' প্রিয়ের বা প্রিয়ার বা উভয়েরই এটা ঠিক বুঝা গেল না। 'প্রতিটি'র প্রতি কবির প্রীতি আমাদের অপ্রীতিকর লাগিল।

প্রবাসী—শ্রাবণ।

মায়া—শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এটি কবিতার কায়া নয় ছায়াও নয়, একেবারে মায়া! বার বার পড়িয়াও ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলাম না। ভাল ভাল কথা আছে, পৃথক ভাবে তাহাদের মানেও আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহারা এমনভাবে সংযুক্ত যে সমগ্র রচনাটি একেবারে ঝাপ্সা হইয়া উঠিয়াছে। প্রয়োগ-কৌশলের এই খানেই বাহাদুরী।

আজি সে পাখী, মেলিলো আঁখি, মেলিলো পাখা তার,
শ্যামল ঘাসে চুমিছে যেথা নিঃসীমা-ঝিলিমিল্
ছন্দ-হারা ঘুমানো কবি খুঁজিয়া পেলো মিল্
বাঁধন টুটি ছুটিলো পথে পাথার পরপার।

সমগ্র কবিতাটিই এই রকম। এর নামই 'মায়া'। কাজেই বলিতে হয় আর কিছু না হ'ক কবিতাটি সার্থক-নামা হইয়াছে। প্রবাসীর কাব্য-গগনে এবার যাজে নক্ষত্রের ঝিকিমিকি নাই—এই কবিতা চন্দ্রই তমোনাশ করিয়াছে।

ভারতবর্ষ—শ্রাবণ।

বেণুছায়ার "বেণুবন"—শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়। ভাবের পারম্পর্য্য নাই, রস-সৃষ্টি ত দূরের কথা,—তাহার চেষ্টা আছে বলিয়াও মনে হয় না। একেবারে ছন্ন-ছাড়া বে-পরোয়া রচনা। বেণু বনের মর্ম্মর ধ্বনির চেয়ে বাঁশতলার শুক্না পাতা ও কঞ্চির কথাই মনে পড়ে। ভাব, ভাষা ও অভিব্যক্তির একেবারে ত্র্যহস্পর্শ; একটু নমুনা দিলাম :—

বাঁশীতে মজি করুণ সুরে,
সাপটি লাঠি এখনো পুরে
শক্তি-কাঙাল বাঙালীর
গর্ব্বে তনু মন!

"হে মোর অপরিচিতা"—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। শিক্ষানবীশোয়া

একটু প্রণিধান করিয়া রচনাটি পাঠ করিলে অদ্ভুত অন্তঃমিল যুক্ত লম্বা পদ্য লেখার কৌশলটি আয়ত্ত করিতে পারিবেন। প্রথম লাইনের শেষের শব্দ হইতেছে—"অপরিচিতা", ১২টি stanzaর প্রত্যেকটিতে বার বার ৩ বার করিয়া এই 'অপরিচিতা'র সঙ্গে মিল দেওয়া হইয়াছে, এ কি কম কসরত! এই মিল গুলি বাছিয়া একধারে রাখিয়া—যেখানে ভাগ্যক্রমে যেমন মিল জুটিয়াছে সেই মেকদারের কতকটা অর্থ বজায় রাখিয়া শব্দ-যোজনা করিয়া গেলেই দেখিতে দেখিতে একটা চমকপ্রদ পদ্য গজাইয়া উঠিবে। আলোচ্য কবিতাটি এই ধরণেরই রচনা, তবে আনাড়ির রচনা নয় বলিয়াই স্বরূপটি একটু ঢাকা আছে। "অপরিচিতার" সহিত যে যে শব্দ মিলিয়াছে তাহার দু' চারিটির উল্লেখ করিলাম, যথা:—'মিতা', 'পিতা', 'গীতা', 'সীতা' 'জিতা' 'প্রীতা' (!) আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি—যে যখন যায়গায় অভাব নাই তখন 'ফিতা', 'ভীতা', অন্ততঃ 'চিতা'ও স্থান পাইল না কেন? কবিতাটির organic growth নাই, যাহাকে বলে mechanical তাহারই ইহা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। খাস তালুকেই এই রকম খেয়াল শোভা পায়। কবিতাটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষে যে ফাঁকটুকু আছে তাহা'তে এই কয় লাইন জুড়িয়া দিলে কেমন হয়?—

নহে ত অপরিচিতা
লেখনী তোমার অমর ওমার
অনুবাদে নহে ভীতা,
রুবায়েতে, ভাই, পাকাইলে হাত,
মেঘদূতে তাই বসাইলে দাঁত,
না জানি কাহারে মাপিবে, সাক্ষাত,
এবার ধরিয়া ফিতা,
কাব্য-শ্মশানে জ্বলে দিন রাত
তব তর্জ্জমা-চিতা!

মাসিক বসুমতী—আষাঢ়।

কণ্ঠবাণী—৺মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ। সরস গম্ভীর রচনা। অভিমানে রুদ্ধকণ্ঠা প্রেয়সীকে কথা কওয়াইবার আকুল আগ্রহ ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দীপা—শ্রীযুক্ত রাধারমণ চক্রবর্ত্তী। দীপা দীপ হাতে পথ দেখাইয়া চলিবে অন্ধকার রাত্রে আর আঁকা-বাঁকা পথে, কবি চলিবেন দীপার পিছনে, রাস্তায় আর কেহ থাকিবে না। দীপার দীপের আলোকে শুধু অন্ধকার দূর হইবে না, অন্ধকার রঙিন হইয়া উঠিবে। এই রকম অনেক আবদার রচনাটির মধ্যে পাওয়া গেল। কবি কল্পনা বলে যে রসটি পাঠকের মনে উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন, রচনায় ভাব-প্রকাশের সঙ্গতির অভাবে বা ধারণার অস্পষ্টতার দরুণ সে রস জমে নাই। অনির্দ্দিষ্ট ভাব ও অসম্পূর্ণ প্রকাশ রচনাকে কতকটা হেঁয়ালীর মত করিয়া তুলিয়াছে।

শিশু—শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। শিশুকে সবাই ভালবাসে, আবার শিশুর দৌরাত্ম্যে সবাই মাঝে মাঝে জ্বালাতন হয়, এই বিষয়টা পদ্যে না বলিলেও চলিত। কিন্তু কবি বলিয়াছেন, এবং শিশু পাঠ্য এতগুলি মাসিক থাকিতেও বসুমতী ছাপিয়াছেন। তবে একটা বিশেষত্ব এই যে, সমদর্শী কবি শিশু চিত্রের 'দু-পিঠ'ই দেখাইয়া শিশুর পিতা মাতাকে সাবধান করিয়াছেন:—

ওর মাঝে হয়ত বা রয়েছে গোপন
ভবিষ্যের কবি, যোগী, গায়ক, ভাস্কর,
দার্শনিক, চিত্রকর, সুধী, মহাজন, (money-lender)
কপট, লম্পট, শঠ, দস্যু কি তস্কর।

ভিক্ষা ও দীক্ষা—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়। একটি প্রচ্ছন্ন গভীর ভাবের আভাস কবিতাটির মধ্যে পাওয়া যায়, সেই জন্যই রচনাটি পুরা-দস্তুর 'হেঁয়ালী' হয় নাই। কবি কালিদাস কিন্তু এরকম সীমান্ত রেখায় পদক্ষেপ প্রায়ই করেন না। ভিক্ষা কে কাকে দিল এবং কি ভিক্ষা দিল তাহা ত মালুম হইল না, তবে আন্দাজে বুঝিলাম ভিক্ষা গ্রহণের পর হইতেই ভিক্ষুক ভিক্ষাদাতার কল্যাণ কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন—এই বোধ দীক্ষা! যাহা হউক, ভিক্ষা ও দীক্ষা পড়িয়া আমরা এই শিক্ষা লাভ করিলাম যে বিশেষ কিছু দিবার না থাকিলেও মাসিকের ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করা যায়, যদি ভিক্ষা দাতার 'দাতা' বলিয়া নাম ডাক থাকে।

আয় ফিরে সে কাল!—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ। বিগত কালের মহিমা বর্ণনা, সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে আভাসে আধুনিক কালের নিন্দা, তবে গদ্যে নয় পদ্যে। কাব্য নাই থাক্ ধারণার সত্যতা আছে। যাহা ফিরিবে না, ফিরিবার নয়, তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। "ফিরিবে না, ফিরিবে না অস্ত গেছে সে গৌরব শশী"। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই রকম একটানা গোঁ-ভরে অনেকগুলি লিখিয়া ফেলিলেন আর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গুণমুগ্ধ বিরাট কলেবরা বসুমতীও দেখিতেছি রচনাগুলিকে বক্ষে ধরিতে কুণ্ঠিতা নন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "বিদ্যাভূষণ এমনই ভীষণ বিজ্ঞানে দুর্দ্দান্ত"—আমরা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে পারি—

"বিদ্যাভূষণ তেমনি ভীষণ কাব্যেও উদ্‌ভ্রান্ত।"

মেনকা দর্শনে বিশ্বামিত্র—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কুণ্ডার। তপোভঙ্গের পর বিশ্বামিত্র যদি এইরূপ আধো আধো ভাষায় ভাঙা ভাঙা ছন্দে মেনকাকে প্রেম নিবেদন করিতেন তবে মেনকা কাল বিলম্ব না করিয়া আকাশ পথে উড্ডীয়মানা হইয়া অপ্সরোলোকে প্রত্যাগমন করিতেন সন্দেহ নাই।

"হে গুরু! তোমারে প্রণাম করি"!—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। দীক্ষা লাভান্তে শিষ্য যেন শান্তিময় নূতন জগতে উপনীত, এই ভাবটি বেশ সুন্দর রূপেই প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় গুরুর প্রতি শিষ্যের কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত এবং কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করা শিষ্যের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। রচনাটিতে কাব্য রস নাই, কিন্তু ভক্তি র

আছে। শিষ্যটি বোধ হ একটু জ্যাঠা ধরণের, অথবা "সব-জান্তা" গোছের, নচেৎ এমন কথা তার মুখ দিয়া কি করিয়া বাহির হইল ?—

আজ মনে হয় জগৎ মায়া।
অরূপের রূপে ডুবে গেছে ছায়া,
ওগো সুন্দর! তুচ্ছ এ কায়া
স্বপনের মত গিয়েছে মরি
অন্তরে মোর একি অনন্ত আনন্দ আজি উথলে মরি!
হে গুরু! তোমারে প্রণাম করি!

গুরুদেব বোধ হয় সদ্যো দীক্ষিত শিষ্যের মুখে এই তোতা পাখীর মত বাঁধা বুলি আওড়ান শুনিয়া বলিয়া উঠিবেন :—

থাক্ থাক্ বাপু, কোরোনা জ্যাঠামো,
লম্ফ দিওনা—একটুকু থামো,
রং দিতে চাও না গড়ি কাঠামো.
হয়নি যে আজো ও হাতে খড়ি,
অন্তরে মোর তাই হে শিষ্য
বিষাদ সিন্ধু উথলে মরি,
তোমার প্রণাম লইতে ডরি।

দর্শন

ভারতবর্ষ—শ্রাবণ ।

"গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্"—শ্রীঅরবিন্দ লিখিত নবম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য নির্ণয়।

প্রথমতঃ দেখান হইয়াছে যে মানুষ দুই ভাবে কর্ম্ম করিতে পারে। এক রিপুর বশে, বাসনার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সুখ দুঃখ ও কর্ম্মের ফল ও পরিণাম চিন্তায় বিভোর থাকিয়া সংসারে জড়াইয়া পড়িয়া কর্ম্ম মানুষ করিতে পারে। কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিলে উচ্চ ভাবুক রূপে যোগীরূপে—জ্ঞানের কর্ম্মও করিতে পারে। আমাদের মধ্যে যে পরমাত্মা আছেন, তিনি বাহিরের কর্ম্মজালে বদ্ধ নহেন, কিন্তু উহার বিধাতা অন্তর্য্যামী রূপে উহাকে পর্য্যাবেক্ষণ করে, অথচ উহাতে জড়িত হয় না। প্রকৃতির পরিবর্ত্তনই জগতের সবটুকু নহে ; এমন কিছু সনাতন, কালাতীত সত্তা আছে, যাহাকে কাহারও কর্ম্ম স্পর্শ করে না, নিজেও কোন কর্ম্ম করে না। এই জন্যই অর্জ্জুনকে কর্ম্মের সমস্ত ফল ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ কর্ম্মীরূপে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে—এই কথা বলা হইয়াছে। সকল ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া তাহাকে দেখিতে হইবে যে, নিখিল বুদ্ধি, ইচ্ছা, মন প্রাণই—তাহার মধ্যে এবং অপর সকলের মধ্যে কর্ম্ম করিতেছে। তার কর্ম্ম প্রকৃতিরই কর্ম্ম—ঠিক যেন তার মধ্যে প্রকৃতির কর্ম্মের রূপ তার চেয়ে এক মহত্তর শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মহান ফলসমষ্টির অংশ মাত্র। অর্জ্জুনকে দেখিতে হইবে যে একই ভগবান—প্রকৃতির ও তাহার ব্যক্তিত্বের উচ্চতর সত্য—একই সঙ্গে ব্যক্তির ও বিশ্বের নিগূঢ় তত্ত্ব—প্রকৃতির কর্ম্ম, মানুষের কর্ম্ম—সকল কর্ম্মের ফল—সবই তাঁহার। প্রকৃতিই কর্ত্রী ; কিন্তু প্রকৃতি ভগবানের শক্তিমাত্র—ভগবানই প্রকৃতির সকল কর্ম্মের ও চেষ্টার একমাত্র প্রভু। এই জ্ঞান হইলেই আমরা আমাদের প্রকৃতি ও সত্তাকে সমর্পণ করিয়া জীবন্ত ভাবে যুক্ত হইতে পারি। যে জীব এই উপরের সত্তা ও কর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহাকে মৃত্যু, ভ্রান্তি, অশুভের অধীন সাধারণ মানব জীবনের পথে চলিতেই হইবে। যে ভাগবত সত্তাকে অস্বীকার করে, তাহার পক্ষে তাহাতে গড়িয়া উঠা সম্ভব নহে। ইহারই অনুসরণে জীবনকে গঠিত করিতে হইবে। নীচের প্রকৃতির অপূর্ণতা ও অমঙ্গল হইতে মুক্তি লাভ করা যায় কেবল এক উর্দ্ধের জ্ঞানকে স্বীকার করিয়া। প্রধানতঃ এই প্রকারে গীতার নবম অধ্যায়ের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ইহা শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদটী যে বড় পরিষ্কার হইয়াছে, তাহা নহে। একটু জটিল ও ঘোরাল হইয়াছে। পরমাত্মা প্রকৃতির অতীত হইয়াও যে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত—এই তত্ত্বটি পরিষ্কার হয় নাই।

বিজ্ঞান

মাসিক বসুমতী—আষাঢ়

যুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয় 'সুরাজাত ইন্ধন' প্রবন্ধে দেশে সুরা-উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে আমাদের দেশীয় ধনিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পান ব্যতীত অপরাপর কার্য্যেও সুরা ব্যবহৃত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশে সুরা প্রস্তুতের ফলে যদি সুরা সুলভ হয় তবে তাহার পরিণাম যে কি হইবে তাহা নিকুঞ্জ বাবু ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ?

সাময়িক প্রসঙ্গ

সাহিত্য-সম্মেলন।

এবারের "প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন" আগামী বড় দিনের সময় নাগপুরে হইবে। এখন হইতেই তাহার উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ইন্দোরের সম্মেলনে একটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল ; তাহা এই যে, বঙ্গের বাহিরে যে

সকল স্থানে অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী আছেন, সেখানেই বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের একটী করিয়া শাখা স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নাগপুর সম্মেলনের কর্ম্মকর্ত্তারা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং এজন্য একটী কার্য্যকরী সমিতিও গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও নাগপুর অধিবেশনের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয় নাই এবং মূল ও সভাপতিগণ নির্ব্বাচিত হন নাই। সময় অধিক নাই, এখন হইতেই নাগপুরবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। এদিকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের আগামী অধিবেশন সরস্বতী পূজার সময় ভবানীপুরে হইবে। তাহার জন্য আয়োজন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদক হইয়াছেন; একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিও গঠিত হইয়াছে। সরস্বতী পূজার অনেক বিলম্ব আছে; কিন্তু ভবানীপুরের সাহিত্যিকগণ এখন হইতেই চাঁদা সংগ্রহ ও উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। ভবানীপুর-বাসী সাহিত্যিকগণের এই আগ্রহ দেখিয়া মনে হয়, এবারের সম্মেলন সর্ব্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইবে এবং তিনদিন পূর্ব্বে সভাপতি বিভ্রাট উপস্থিত হইবে না।

ধর্ম্মঘট।

এমন সপ্তাহ যায় না, যখন শুনিতে পাই না যে, কোথাও না কোথাও ধর্ম্মঘট হয় নাই। ওটা যেন নৈমিত্তিক না হইয়া নিত্য হইয়াছে। আবার এই সকল ধর্ম্মঘটের মধ্যে কলের ধর্ম্মঘটই প্রধান। অন্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই বাঙ্গালা দেশে যেখানে যেখানে কল আছে সে সকল স্থানেই ধর্ম্মঘট লাগিয়াই আছে এবং তদুপলক্ষে দাঙ্গা হাঙ্গামা গোলযোগ হইবেই। সম্প্রতি কলিকাতার আশে-পাশে একেবারে নৈহাটী পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় তীরে যে সকল পাটের কল আছে, তাহার শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে এবং এই লইয়া মারামারি খুনাখুনি হইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ শ্রমিক ও ধনিকদিগের মধ্যে মিল নাই। ধনিকেরা চান যাহাতে অল্পব্যয়ে অধিক লাভ হয়; শ্রমিকেরা বলে, তাহাদের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে; তাহারা ভিক্ষা চায় না; তাহাদের যে পরিমাণে খাটিতে হয়, তদনুরূপ পারিশ্রমিক দিতে হইবে। কলওয়ালারা পূর্ব্বে কখনও এ সমস্যার সম্মুখীন হন নাই: তাঁহারা দয়া করিয়া যাহা পারিশ্রমিক দিতেন সামান্য হইলেও দরিদ্র শ্রমিকদল তাহা গ্রহণ করিত। কিন্তু, এখন আর সে দিন নাই। এখন শ্রমিক বুঝিতে পারিয়াছে যে, মূলধন ও পরিশ্রম এই দুইই সমভাবে লাভের কারণ; সুতরাং শ্রমিক তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক চায়। ইহাই গোল-যোগের কারণ। ইহার নিরাকরণের জন্য শ্রমিক সঙ্ঘের প্রতি ধনিকদিগের সহানুভূতি দেখাইতেই হইবে; তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিতেই হইবে। অবশ্য অন্যায় আবদারের সমর্থন করিতে আমরা বলি না। যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহা করিলেই আজ এখানে কাল সেখানে গোলযোগ, কার্য্য ক্ষতি প্রভৃতি দেখিতে হয় না।

ক্রয় বিক্রয়।

দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতি ১৯২৮ অব্দে বিলাতের সঙ্গে এদেশের কেনা বেচার একটা হিসাব দিয়াছেন। সে হিসাবটী আমরা পাঠকগণের গোচর করিতেছি। ১৯২৮ অব্দে আমরা বিলাতের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি— কাপড় প্রায় ৪৫ কোটি টাকার, সূতা প্রায় ৪ কোটি টাকার, সিগারেট আড়াই কোটি টাকার, সাবান দেড় কোটি টাকার, সৌখীন ও অন্যান্য দ্রব্য চল্লিশ কোটি টাকার। দেখিবেন, ইহার মধ্যে কোটি ব্যতীত অঙ্ক নাই। আরও দেখিবেন, আড়াই কোটী টাকার সিগারেট আমরা ভস্ম করিয়াছি। আর বিলাতকে আমরা বিক্রয় করিয়াছি আড়াই কোটি টাকার গম, প্রায় এককোটী টাকার ধান। অন্য দ্রব্যের হিসাব আর উল্লেখ করিলাম না, সুধু গম ও ধান, আমাদের দুইটী প্রধান খাদ্যদ্রব্যের কথাই বলিলাম। ইহার উপর টীকা টিপ্পনি নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। এই হিসাব দেখিয়াও যিনি কর্ত্তব্য

নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না বা চাহিবেন না, তাঁহাকে কিছু বলিয়া লাভ নাই।

বার্ণাড্‌ শ ও মিস মেয়ো

ফ্রী প্রেসের লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা, মিঃ জর্জ্জ বার্ণার্ড শর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে মিস মেয়ো তাঁহার 'মাদার ইণ্ডিয়া' বইতে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন আপনি তাহা সমস্তই সমর্থন করেন বলিয়া মিস মেয়ো যে প্রচার করিতেছেন, তাহা সত্য কিনা? মিঃ বার্ণার্ড মিস মেয়োর উক্তিই সমর্থন করেন এবং ফ্রী প্রেসে রপ্রতিনিধির নিকট নিম্নলিখিত বর্ণনাপত্র প্রদান করিয়াছেন "আমি সর্ব্বদাই বলিয়া আসিয়াছি যে, ভারতে গিয়া একজন ইংরাজের যাহা কিছু খারাপ মনে হয়, অকপটে তাহার তীব্র নিন্দা করাই উক্ত ইংরাজের পক্ষে ভারত সেবার একমাত্র কার্য্য হইবে। যে সমস্ত সাহিত্যিক প্রাচ্যের মহিমা ঘোষণা করেন এবং ভারতীয় দর্শনের গভীরতা ও মহনীয়তার উচ্চ প্রশংসা করেন, তাঁহারা তেলা মাথায় তেল দিয়া থাকেন মাত্র। তাঁহাদের পুস্তক ইংলণ্ডে যতই বিক্রী হউক না কেন, তাহাতে ভারতের কোন লাভ নাই। কিন্তু উইলিয়ম আর্চ্চারের মত নির্দ্দয়-হৃদয় স্কট কিংবা মিস মেয়োর মত সরলহৃদয় বুদ্ধিমতী মার্কীন রমণী যখন ভাবের চশমা নাকের ডগায় না পরিয়া একবারে খাঁটি পাশ্চাত্য চোখে ভারতে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন এবং নাসারন্ধ্রে আংটিপরা ইংরাজ শূকর ও ষাঁড়ের মত পৌত্তলিক ভারতীয়দিগকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়া থাকেন, মন্দির হইতে বলির পশুর মত নোংরা জিনিষকে দূর করিয়া দিবার জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগকে আহ্বান করিয়া থাকেন, যখন বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে রোষ প্রকাশ করেন এবং যখন সতীদাহের মত একটা পাশবিক কুসংস্কারকে উচ্ছেদ করিতে বলেন, তখন তাঁহারা বাস্তবিকই ভারতের উপকার সাধন করেন। এই জন্যই আমি মিস্ মেয়োর গুণ কীর্ত্তন করি এবং তাঁহার কার্য্যকে সমর্থন করি যেমন আমি মিঃ উইলিয়াম আর্চ্চারকে সমর্থন করিয়াছিলাম। এই স্পষ্টবাদিতায় যদি কোন ভারতবাসী ক্ষুণ্ণ হন তবে তিনি সহজেই প্রতিশোধ লইতে পারেন। তিনি স্বচ্ছন্দে ইংলণ্ডে আসিয়া আমাদের ব্যক্তিগত আচার ব্যবহারে কি দোষ, আমাদের সামাজিক রীতি নীতির কোনগুলি তাঁহার নিকট হাস্যোদ্দীপক ও কুৎসিত বোধ হয়, তাহা তিনি খোলাখুলি ভাবেই প্রকাশ করিতে পারেন। আমরা পরস্পরকে যথারীতি অযথা প্রশংসা ও বাহবাও দিতে পারি, কিন্তু আমাদের পক্ষে দরকার হইতেছে তীব্র সমালোচনা এবং বিশেষ ভাবে ভারতের পক্ষে দরকার হইতেছে সেরূপ সমালোচনা, যাহা বাহ্যতঃ সঙ্গত ও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।"

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মিঃ বার্ণার্ডশ যে কথা কয়টি বলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের যে সকল রীতি নীতি আচার ব্যবহার মন্দ, তাহার সংশোধনের জন্য সেগুলির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বুদ্ধিমান ও বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য;কিন্তু মিস্ মেয়ো কি তাহা করিয়াছেন? যাহা সামান্য তাহা তিনি অতিরঞ্জিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, বিরল কোন একটী গর্হিত ব্যাপারকে তিনি সর্ব্বজনীন ব্যবহার বলিয়াছেন, তিনি অযথা কুৎসা কীর্ত্তন করিয়াছেন; ইহারই জন্য দেশ বিদেশে মিস্ মেয়ো নিন্দাভাজন হইয়াছেন, তাঁহার লেখনী পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া বিশেষিত হইয়াছে। অথচ, এমন একজন কুৎসাকারিণীকে প্রশংসা করিলেন কে?—না প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বার্ণার্ডশ! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

বাঙ্গালী যুবকের পৃথিবী ভ্রমণ।—

চারিজন বাঙ্গালী যুবক প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে দ্বিচক্র যানে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। প্রথম কিছুদিন তাঁহাদের সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যাইত; তাহার পর অনেকদিন তাঁহাদের কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি বিলাত হইতে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক উপরিউক্ত ভ্রমণ-কারী যুবকগণের অন্যতম শ্রীমান্ বিমল মুখোপাধ্যায়ের কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন; বিমল এখন বিলাতে আছেন। সেই ভদ্রলোক যাহা লিখিয়াছেন, তাহার পরে মর্ম্ম এই—

দীর্ঘকাল যাবৎ মিঃ মুখার্জ্জী প্রবল বাধা-বিঘ্নের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আসিতেছেন, কারণ তিনি সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করিয়াই চলিয়াছেন।

জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তিনি নানাপ্রকার কায়িক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ড, ওয়েলস্ ও আয়র্লণ্ডের প্রত্যেক প্রধান সহরে তিনি ঐভাবে ভ্রমণ-কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ২৫ বৎসরের একজন বাঙ্গালী যুবক যে এই প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া ১২ হাজার মাইল পথ সাইকেলযোগে পৃথিবীর বিঘ্নসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিতে পারেন, ইহা ভারতবাসীর পক্ষে কম গর্ব্বের কথা নহে। বিমল মুখার্জ্জী এখনও নিরুৎসাহ হন নাই, তিনি আশা রাখেন যে ফ্রান্স, ইটালী, মিশর, সুদান এবং মধ্য আফ্রিকায় ভ্রমণ করিবেন। তিনি আফ্রিকার বন্যভূমি এবং আবিসিনিয়ার বন্ধুর পথ অতিক্রম করিবেন। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত পরিদর্শন করিয়া সোজা কেপটাউনে যাইবেন এবং তথা হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় গমন করিবেন। আন্দেস পর্ব্বত শ্রেণী ও মধ্য আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া তিনি নিউইয়র্ক পৌঁছিতে আশা করেন। তথা হইতে তিনি স্যানফ্রান্সিস্কো, জাপান ও চীন হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সিরিয়া মরুভূমির বিপজ্জনক অভিযান, তরাস পর্ব্বতের ত্রাসসৃষ্টিকারী উচ্চতা, আইসল্যাণ্ড এবং গ্রীনল্যাণ্ডের জমাটবাঁধা ভীষণ বরফ প্রভৃতি কিছুই বিমল মুখার্জ্জির দুঃসাহসিক উদ্যমকে দমাইতে পারে নাই। ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, তুরস্ক, বুলগেরিয়া, ইরাক এবং অন্য যে কোন স্থানেই তিনি গিয়াছেন, সেখানকার সর্ব্বপ্রধান বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মিঃ মুখার্জ্জিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অন্যতম। মুস্তাফা কামাল পাশা, ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ সম্রাট কাইজার, জেনারেল হিণ্ডেনবার্গ, যুগোশ্লাভিয়ার রাজা এবং ইরাকের রাজার নাম তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যে তিন জন বন্ধু মিঃ মুখার্জ্জির সহচর ছিলেন, তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত যদিও তাঁহার সহিত চলিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি যথেষ্ট ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সাহস, অধ্যবসায় এবং উদ্যমের পরিচয় দিয়াছেন। প্রধানতঃ টাকার অভাব বশতঃই তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্য সঙ্গী মিঃ ঘোষ এক ভীষণ দুর্ঘটনায় পড়িয়াছিলেন। তিনি ব্যাভেরিয়ার আল্পস পর্ব্বত হইতে ১৪০০ ফিট নীচে পড়িয়া যান, গড়াইতে গড়াইতে পড়িবার ফলে তাঁহার নাসিকা ভাঙ্গিয়া যায় এবং মুখমণ্ডলের নিম্ন অংশ বিকৃত হইয়া যায়। এই প্রকারে তিনি ভ্রমণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অন্য দুইজন ইংলণ্ড পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের একজন ব্রেজিলে এবং অপরজন আর্জ্জেনটাইনে জাহাজযোগে গমন করিয়াছেন। মিঃ বিমল মুখার্জ্জি এক বৎসরের অধিক কাল যাবৎ তাঁহাদের কোন সংবাদ পাইতেছেন না। ইঁহারা চারি জন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, একজন কোনও কারণে ভ্রমণে অসমর্থ হইলে অপরজন ভ্রমণ শেষে করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। বিমল মুখার্জ্জি সেই শপথের কথা ভুলেন নাই। তিনি যে সমস্ত দেশের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সেই দেশের ভৌগোলিক বিবরণ এবং লোকদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতেছেন। আগষ্ট মাসের শেষ তিনি আবার ভ্রমণে বাহির হইবেন।

চরকায় লক্ষ টাকা।—

শ্রীযুক্ত মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েসন উৎকৃষ্ট চরকার জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। চরকার সঙ্গে তুলা পিঞ্জিবার সরঞ্জামও থাকা চাই। চরকাটী মোটের উপর ছোটখাটো হওয়া চাই, যে কোন পল্লীর সাধারণ লোকেও হাতের বা পায়ের সাহায্যে চালাইতে পারে, ৮ ঘণ্টাকাল সেই চরকার কায করিয়াও কোন স্ত্রীলোকে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে না, ৮ ঘণ্টা ক্রমাগত সূতা কাটিলে সেই চরকার ৮ হইতে ১০ নম্বরের সূতা ১৬ হাজার গজ উৎপন্ন হওয়া চাই। চরকার মূল্য যেন ১৫৲ টাকার বেশী না হয়; মেরামতের খরচে যেন বৎসরে অতি সামান্য লাগে। বিদেশীদিগের প্রস্তুত চরকা গৃহীত হইবে না, এদেশী শিল্পীর প্রস্তুত উৎকৃষ্ট চরকার জন্যই পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। আগামী ১৩৩০ অব্দের অক্টোবর মাসের মধ্যে সবরমতি

আশ্রমে চরকা পাঠাইতে হইবে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীদাস, শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ও শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারিয়া চরকার পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যাঁহার চরকা পুরস্কার যোগ্য বিবেচিত হইবে, তিনি এসোসিয়েসন হইতে একলক্ষ টাকা ত পুরস্কার পাইবেনই, তাহার পর তাঁহার চরকা পেটেণ্ট করিয়া লইয়া তিনি বিক্রয় করিতে পারিবেন।

পদক পুরস্কার।

রোমের ইটালীয় বিজ্ঞান-পরিষৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার সার বেঙ্কটরমণ এফ- আর-এস মহোদয়কে ম্যাটোচ্চি স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছেন। আলোক-রশ্মির বিকীরণ সম্বন্ধে সার রমণ মহোদয় সে বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন এবং যাহা 'রমণ এফেক্ট' নামে জগতের বৈজ্ঞানিক মহলে সুপরিচিত, তাহার জন্যই ইটালীর বৈজ্ঞানিক সমাজ তাঁহাকে এই ভাবে সম্মানিত করিয়াছেন। বিগত ১৯২৮ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি তাঁহার এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করিলে ইটালীর বৈজ্ঞানিক-গণ সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং উহা শারীর বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উন্নতিতে কিরূপ কার্য্য করিবে, তাহারও গবেষণা করেন। অধ্যাপক রমণের এই গবেষণা সম্বন্ধে ইটালীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ অনেক প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক রমণের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনে ভারতবাসী মাত্রেই, আনন্দিত হইবেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ গৌরব অনুভব করিবেন।

দেব-দেউল

(উপন্যাস)

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শিব যেমন সতীদেহ বহন করিয়া উন্মত্তের মত ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই অনুচর এই ঘণ্টাবাদক বিকটকায় ভৈরব তেমনি উন্মত্ত হইয়া পান্নাকে দেব দেউলের নিরাপদ স্থানে বহিয়া আনিল। যতক্ষণ সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছিল, ততক্ষণ পান্নার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। দুই একবার এই কথাটাই শুধু তাহার মনে হইল যে সে যেন একটা ঘূর্ণিবায়ুর ভিতর দিয়া আকাশে উঠিতেছে—সে যেন শূন্যে ভাসিতেছে—কে যেন তাহাকে ধূলিমলিন ধরণী হইতে তুলিয়া লইয়া অনন্ত নীলে সাঁতার দিতেছে। কখনো বা সে শুনিতে পাইল ভৈরবের অট্টহাস্য—সে যেন দরীমুখে সিংহের গর্জ্জন। শুনিতে পাইল ভৈরবের উচ্চ কণ্ঠে নিনাদ—দেবদেউল, দেবদেউল—সে যেন কাল বৈশাখীর জীমূতমন্দ্র। পান্না একবার চক্ষু খুলিল। দেখিল, পদ-নিম্নে তাম্রলিপ্তের অসংখ্য গৃহাবলী, আর তাহার মুখের উপর ভৈরবের পুলকদীপ্ত বিকট মুখ। পান্না ভয়ে চক্ষু মুদিল। তাহার বিশ্বাস হইল, সব শেষ হইয়াছে—ফাঁসির অন্তে যমের দূত যেন তাহার প্রাণটা উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে। পান্না প্রথমে সাহস করিয়া সেই যমদূতের দিকে চাহিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পর পান্না যখন বুঝিল যে যমদূতটা তাহার হাতের বাঁধন দাঁতে কাটিল, তখন তাহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পান্না ধীরে ধীরে সম্বিত ফিরিয়া পাইল, একে একে সেদিনের সকল কথাই তাহার মনে পড়িয়া গেল। যখন মনে পড়িল, অংশুমান মরে নাই—কিন্তু তাহাকে আর ভালবাসে না, তখন পান্নার দুইটী চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সে তখন ভীত দৃষ্টিতে ভৈরবের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তুমি আমায় বাঁচালে? মরণই ত আমার মঙ্গল ছিল।"

ভৈরব ব্যস্ত হইয়া পান্নার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পান্না যে কি কহিতেছে, তাহাই সে বুঝিতে চেষ্টা

করিল। পান্না আবার বলিল, "কেন তুমি আমায় বাঁচালে ?"

ভৈরব কাতর দৃষ্টিতে পান্নার দিকে চাহিয়া সেস্থান ত্যাগ করিল।

পান্না ভৈরবের আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সে ত জানিত না যে ভৈরব বধির—ছোট কথা শুনিতে পায় না।

কিছুক্ষণ পরে একটী পোঁটলা আনিয়া ভৈরব সসম্ভ্রমে পান্নার পদনিম্নে রাখিল এবং মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল। পান্না দেখিল, পোঁটলায় কিছু কিছু পরিধেয় আছে। এতক্ষণে পান্নার দৃষ্টি নিজের দেহের পড়িল। তাহার মুখ খানি একেবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

একটু পরে ভৈরব যখন আবার ফিরিল, তখন পান্না দেখিল, তাহার এক হস্তে কিছু খাদ্য-সামগ্রী, অপর হস্তে জল ও কুক্ষিতলে একখানি মাদুর। খাবার রাখিয়া ভৈরব যথাসম্ভব কোমল কণ্ঠে কহিল, "খাও।" মাদুরটী বিছাইয়া দিয়া কহিল, "ঘুমোও।"

কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য পান্না ভৈরবের দিকে একবার চাহিল বটে, কিন্তু মুখে কথা সরিল না। সত্য সত্যই ভৈরবের মূর্ত্তি ছিল এতই বিকট। ভীত হইয়া পান্না মুখ নামাইল।

ভৈরব তখন ধীরে ধীরে বলিল, "আমায় দেখে তোমার ভয় হচ্ছে—তাই না ? তা' দেখ, তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ো না, শুধু আমার কথাটা শোনো। দিনের বেলা তুমি আর কোথাও যেয়ো না, এই ঘরটীতেই থেকো। রাত্রে দেব-দেউলের যেখানে খুসি যেতে পার। কিন্তু সাবধান, দেউল থেকে বেরিও না। তোমায় ধরবে বলে ওরা পথে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। ধরলেই ওরা তোমায় ফাঁসি দেবে। আমিও তা'হলে মরবো।"

ভৈরবের কথা কয়টী পান্নার অন্তরে বড়ই বাজিল। উত্তর দিবার জন্য মুখ তুলিয়া দেখিল, ভৈরব সেখানে নাই —কিন্তু তাহার কর্কশ কণ্ঠস্বর তখনো পান্নার কাণে বাজিতে লাগিল।

এই বিস্তীর্ণ বিশ্বে পান্না যে একেবারেই একা, সেই কথাটা পান্না যখন ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিল তখন সেই মুক্ত কক্ষেও সে হাঁপাইয়া উঠিল। চারিদিকের ভীষণ নির্জ্জনতা একটা প্রকাণ্ড পাথরের মত তাহাকে চাপিয়া ধরিল। পান্নার মনে হইল, যেন তাহার শ্বাসরোধ হইতেছে। এমন সময় ছাগল মতিয়া আসিয়া পুচ্ছ নাড়িয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। উহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া পান্না বলিল, "মতিয়া, মতিয়া ! সবাই আমায় ছেড়েছে, ছাড়িস্‌নি কেবল তুই।" যে ভারি পাথরটা এতক্ষণ পান্নার চোখের দুয়ার বন্ধ রাখিয়াছিল, মতিয়ার সস্নেহ স্পর্শে তাহা সরিয়া গেল। সেই মুক্ত দ্বার দিয়া তখন ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—সে যেন অগ্নি-পর্ব্বতের গৈরিক নিস্রাব।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া পান্না বুকের বোঝাটা লঘু করিল।

যখন সন্ধ্যা হইল, চারিদিকে চন্দ্রকর ছড়াইয়া পড়িল, পান্না তখন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া চতুর্থ তলের বারান্দার উপর দিয়া অষ্টকোণ দেব-দেউল বেড়িয়া ঘুরিতে লাগিল। সেই উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে চাহিয়া পান্নার মনে হইতে লাগিল, সবই যেন শান্ত, স্নিগ্ধ ও মধুর—কোথাও যেন ঝঞ্ঝার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু তাহার অন্তরের মধ্যে তখন এক দারুণ মরু ঝটিকা হা-হা করিতে করিতে ছুটিয়া যাইতেছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পান্না যখন আসিয়া কক্ষতলে বসিল, তাহার বহু পূর্ব্বেই নিদ্রাতুর তাম্রলিপ্ত ঘুমে অচেতন হইয়াছে, সঙ্গী খণ্ডচন্দ্র ঢলিয়া পড়িয়াছে। দেউলের প্রাঙ্গণে, গায়ে, বারান্দায় তখন আলোক ও আঁধার মিশিয়া স্বপ্নালোক সৃষ্টি করিয়াছে।

পরদিন প্রাতে পান্না বুঝিতে পারিল, রাত্রে সে খানিকটা ঘুমাইয়াছিল। পান্না বিস্মিত হইয়া গেল ! এত কাল সে নিদ্রা যায় নাই, সে নিদ্রা যে কেমন তাহা সে এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। উজ্জ্বল রবির কয়েকটী পথভ্রান্ত কর স্তম্ভের গায়ে গায়ে আহত হইয়া তখন মুক্ত বাতায়ন-পথে তাহারই কাছে আসিয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতে-ছিল। সেই দিকে চাহিতেই পান্না দেখিল, ভৈরবের বিকৃত মুখ। সে চক্ষু বুজিয়া রহিল। শুনিল, ভৈরব তাহার জড়িত জিহ্বাকে যথাসম্ভব সহজ করিয়া বলিতেছে, "ভয় পেও না, আমি তোমার শত্রু নই—বন্ধু। তুমি যতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলে, আমি ততক্ষণ তোমার দেখছিলাম। তোমার ঘুমের মধ্যে যদি আমি তোমায় দেখি, তাহ'লে বোধ হয় তুমি রাগ করবে না—ভয়ও কিছু পাবে না। তোমার চোখ ত তখন বন্ধই থাকে—তখন তুমি আমায়

দেখতে পাও না। এখন তবে আমি যাই। এই যে দেওয়ালটার আড়ালে আমি লুকিয়েছি, এইবার তুমি চোখ খোলো, এইবার চাও—আর আমার মুখ দেখতে পাবে না।"

ভৈরবের কথায় যে ব্যথা প্রকাশ পাইল, তাহার অনেক বেশী বাজিয়া উঠিল সেই কথার সুরে। পান্নার বড় দুঃখ হইল। সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দেখিল, ভৈরব জানালার কাছে নাই। যে ছোট ঘরটীতে পান্না ছিল তাহা দেব-দেউলের একটা কোণে! সেইখান হইতেই দেওয়ালটা অন্য দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বারান্দাও ঘুরিয়াছে। উঠিয়া জানালার ভিতর দিয়া মুখ বাহির করিয়া পান্না দেখিতে পাইল, বিষাদ ভারাক্রান্ত ভৈরব দেওয়ালের অন্তরালে নতমুখে বসিয়া আছে। ভৈরবকে দেখিলেই পান্নার মনে যে বিরক্তি ও ভয় আসিত তাহা দূর করিবার সঙ্কল্প করিয়া পান্না কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "এসো, ভিতরে এসো।"

ভৈরব কিছু বুঝিতে পারিল না। পান্নার ওষ্ঠ নড়িতেছে দেখিয়া মনে করিল, সে যেন তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছে। ভৈরব ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাড়িত নিরাশ ভিখারী যেমন ধীরপদে প্রস্থান করে, দাতার মুখের দিকে আর চাহিতেও সাহস করে না—ভৈরবও ঠিক সেই ভাবে অন্য দিকে অগ্রসর হইল।

পান্না আবার বলিল, "যেওনা এইখানে এসো।"

ভৈরব শুনিতে পাইল না, যাইতেই লাগিল।

পান্না তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া ভৈরবের দিকে ছুটিয়া গেল এবং তাহার বাহু স্পর্শ করিল। সেই স্পর্শে ভৈরবের কেশ হইতে নখ পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—সে যেন নব বর্ষ সমাগমে বসন্তের আহ্বান।

সেই আহ্বানকে শিরোধার্য্য করিয়া ভৈরব পান্নার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল এবং দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। উহাকে দ্বার বলিতে হয় বল, অথবা বৃহদাকার একটী মুক্ত বাতায়ন বলিতে হয় বল। উপরতলায় দেব-দেউলের কোনো জানালা বা দুয়ারই বন্ধ করিবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পাথরের চৌকাঠ ধরিয়া ভৈরব দাঁড়াইয়া রহিল, যেন একটি কর্কশ মৌন গণ্ডশৈল। পান্নাও নীরবে বসিয়া রহিল, যেন কক্ষতলে স্থাপিত একখানি পাষাণ প্রতিমা।

পান্না যতই দেখিতে লাগিল, ততই তাহার চোখে পড়িল ভৈরবের ভীষণ অঙ্গ-বিকৃতি—সেই তাহার পদে, জঙ্ঘায়, নয়নে, সেই তাহার পৃষ্ঠে, মেরুদণ্ডে, বদনে। এত কুরূপ যে, সে-ও আবার বাঁচিয়া থাকে—এই ভাবিয়া পান্না হত-বুদ্ধি হইয়া গেল! কিন্তু সেই বিকৃত অঙ্গ ঢাকিয়া ঘোর বিষাদের অশ্রুসিক্ত যে প্রলেপটি স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পাইতেছিল, উহা পান্নার অন্তরকে স্পর্শ করিল। পান্না দেখিল, শুধু বিষাদ নয়—সেখানে নম্রতাও আছে যথেষ্ট।

ভৈরবের প্রতি অনুকম্পায় পান্নার মন গলিতে আরম্ভ করিল।

ভৈরব প্রথমে কথা কহিল, "তুমি কি আমায় ডাক্‌লে?"

পান্না মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ ডেকেছি।"

ভৈরব এই ইঙ্গিতটা বুঝিল। সে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "আমি শুধু কুরূপ নই, আমি কালাও বটে। ছোট কথা শুনতে পাইনে।"

ভৈরবের দুঃখে পান্না আপন মনে কাতর কণ্ঠে কহিল, "আহা বেচারির কি দুর্ভাগ্য!"

ভৈরব একটু হাসিল। সে-ত হাসি নয়, চোখের জল! কহিল, "ভগবান আমায় এমনি করেই গড়েছেন। এ বড় ভীষণ, তাই না? আর তুমি হ'লে অমন সুন্দর।"

ভৈরবের সুরে এমন একটা গভীর দুঃখ ও দীনতা প্রকাশ পাইল যে পান্নার মুখে কথা ফুটিল না। ভৈরব বলিতে লাগিল, "আমি যে এত কুৎসিৎ, আজকের আগে তা' বুঝতে পারি নি। যখনই তোমায় দেখি তখনি বেশ বুঝতে পারি আমি একটা বিকলাঙ্গ রাক্ষস। আমায় দেখে তুমি যে মনে করবে—এটা কখনো মানুষ নয়, একটা বন্য জন্তু, সে আর বেশী কি! বল—বল—সত্যিই কি তুমি তাই ভাবো? তোমায় দেখি যেন ঐ রবির কিরণটি, যেন শিশিরের একটা বিন্দু। আর আমি? আমায় দেখলে ভয় হয়—পথে গেলে ছেলে-মেয়েরা দৌড়ে পালায়। আমি মানুষও নই বন্য পশুও নই। এই যে মেঝের পাথরখানা দেখছ, আমি ওরই মত কদাকার। ওর উপরে পা ফেলতেও হয়ত বা কারো একটু মমতা হয় কিন্তু আমায় পায়ে দল্‌তে তা'ও হয় না! তুমি ত জান না, আমায় দেখলে লোকে ধূলো কাদা ছুঁড়ে মারে! পথের

একটা কুকুরকে আদর করে তারা, কিন্তু আমার পেছনে তালি বাজিয়ে ছুটে' বেড়ায়।"

ভৈরব আবার একটু হাসিল। সে তাহার বুক-ভাঙ্গা হাসি। পান্নার চক্ষু দুইটি একটু চক্‌চকে হইয়া উঠিল। ভৈরব বলিতে লাগিল, "আমি সত্যিই পাথরের মত কালো। আমার সঙ্গে ইঙ্গিতে ত কথা বলতে পার। তুমি মুখ নাড়লে আমি বুঝতে পারি, কি চাও। আমি যাঁর ভৃত্য তিনি ত তাই করেন। তোমার চোখে চাইলে আমি বুঝে নেবো কি চাও তুমি।"

একটু হাসিয়া পান্না উচ্চকণ্ঠে বলিল, "বেশ তাই হবে। বল দেখি, কেন তুমি আমায় বাঁচালে?"

কম্পিত কণ্ঠে ভৈরব বলিল, "মনে পড়ে কি একদিন রাত্রে একটা দস্যু তোমায় চুরি করতে চেষ্টা করেছিল? আর তার পরদিনই সেই চাকার উপর তুমিই তার শুষ্ক মুখে তৃষ্ণার বারি ঢেলে দিয়েছিল? আর সকলে যখন দিয়েছিল ধূলো বালি, ইঁট পাথর তুমি তখন দিয়েছিলে একটুখানি করুণা! আমার জীবনটা দিলেও কি সে করুণার ঋণ শোধ হয়?"

ভৈরবের চক্ষে এক বিন্দু জল দেখা দিল। সে বারি বিন্দু চোখের কোণেই লাগিয়া রহিল। ভৈরব উহাকে ঝরিতে দিল না। বলিল, "আমি কেবলই ভাবছি, তুমি এত সুন্দর, আর ওরা তোমায় হত্যা করিতে চায় কেন? ওদের কি করেছিলে তুমি?"

শূন্যে চক্ষু তুলিয়া পান্না পূর্ব্ববৎ বলিল, "কৈ কিছু ত করিনি।"

কর্কশ কণ্ঠে ভৈরব কহিল, "যা ভেবেছি তা-ই। ওরা অমনি বটে!"

ভৈরবের কণ্ঠ আবার কোমল হইল। সে কহিল, "শোনো বলি। আমাদের ঘণ্টা-ঘর এই দেউলের সব চেয়ে বেশী উঁচু।' তার উপরে আছে শ্রীকাল-ভৈরবের ত্রিশূল। সেখান থেকে লাফিয়ে পড়লে, মাটী ছোঁবার আগেই তার মৃত্যু নিশ্চিত। তোমার যদি ইচ্ছে হয় যে আমি তেমনি করে' নীচে লাফিয়ে পড়ি, তাহ'লে মুখ ফুটে অত কথাও বলতে হ'বে না। শুধু তোমার আঙ্গুল তুলে' ত্রিশূলের দিকটা দেখিয়ে দিও!"

ভৈরব চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। পান্না, দেখিল, হতভাগিনী সে—কিন্তু ভৈরবের ব্যথা তাহার অপেক্ষা কম নয়। আরও কিছুক্ষণ থাকিবার জন্য সে ভৈরবকে ইঙ্গিত করিল। ভৈরব অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "না না, তা' হবে না। তোমার কাছে আমার বেশী-ক্ষণ থাকা হবে না। আমার মনটা কাল থেকে যেন কেমন এলো-মেলো হয়ে যাচ্ছে। কত কি যে ভাবছি, তার ঠিকানা নেই। মনে হচ্ছে সবই স্বপ্ন। আমি বুঝতে পারছি, আমার দুর্ভাগ্যে তোমার দয়া হয়েছে। শুধু সেই জন্যেই এখনো তুমি আমায় দূর ক'রে দাওনি, পাথর ছুড়ে' মারনি! সেই দয়াটুকু আমি হারাতে পারবো না। আমি সরে গিয়ে এমন যায়গায় থাকবো যেখানে তুমি আমায় দেখতে পাবে না বটে, কিন্তু আমি তোমায় কেবলি দেখবো। সেই ভাল—আমার সে-ই ভাল।"

ভৈরব তাহার আংরাখার ভিতর হইতে ছোট একটী বাঁশী বাহির করিয়া ফুঁ দিয়া বাজাইল। বংশীর অতি তীক্ষ্ণ দীর্ঘ রব চতুর্থ তলের প্রাচীরে প্রাচীরে, স্তম্ভে স্তম্ভে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বাঁশীটা পান্নার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া ভৈরব বলিল, "আজই তোমার জন্য এটা এনেছি। তুলে রাখো যখনই, দরকার হ'বে, জোর করে একটা ফুঁ দিও। যেখানেই থাকি, ছুটে আসবো আমি। ছোট কথা কাণে যায় না বটে, কিন্তু এই বাঁশীর শব্দ বেশ শুনি। যখন মনে করবে যে আমায় দেখলে তোমার আর ভয়ও হবে না, বিরাগও হবে না, দয়া ক'রে তখন এই বাঁশীটা একবার বাজিও।"

পান্না মূকের মত চাহিয়া রহিল। ভৈরব ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রুষ্ট রাজশক্তির রোষ প্রথমে খুবই তীব্র থাকে, কিন্তু কাল উহার তীব্রতা হরণ করে। যদি ইন্ধন যোগাইবার লোক না থাকে, তাহা হইলে উহা হয়ত নিবিয়াই যায়। বেদেনীকে ধরিবার জন্য তাই প্রথম কয়েকদিন দেব দেউলের চারিদিকে যেমন প্রহরী পাহারার ব্যবস্থা ছিল, পরে আর তাহা থাকিল না। তখন রাজ-পুরুষদের মধ্যে অনেকেই বলিলেন, অংশুমান ত মরে

নাই, তবে আর কি? যেদিন বেদেনী আপনা হইতেই ধরা পড়িবে, রাজদণ্ডের মর্য্যাদা সেইদিন রক্ষা করিলেই চলিবে।

পান্নাও ক্রমেই বুঝিতে লাগিল যে সে অনেকটা নিরাপদ হইয়াছে। তখন আশা আসিয়া আবার তাহার হৃদয়ের দ্বারে উঁকি দিতে লাগিল। পান্না ভাবিল, দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ—দিন ত কাটিয়া গেল মানুষের সমাজের বাহিরে—বন্দিনী দশায়। আবার কি সে দিন আসিবে না, যেদিন সে যক্ষ রক্ষ ছাড়িয়া আবার মানুষের মধ্যেই যাইয়া বাস করিতে পারিবে। মানুষের সমাজ! অংশুমানই যদি তাহার না হইল, সে-ই যদি মনে করিল যে পান্না তাহাকে ছুরি মারিয়াছে তবে আর নর-সমাজে বাস করিয়া সুখ কি? এতদিন পান্না যত রকম আঘাত পাইয়াছিল, তাহাতে তাহার সকল মনোবৃত্তিই ওলোট পালোট হইয়াছিল। স্থির ছিল কেবল অংশুমানের প্রতি তীব্র প্রেম। বলিতে কি, উহাই পান্নাকে সকল সঙ্কটের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। প্রেম একটা গাছের মত। উহা নিজেই নিজেকে বলীয়ান করিয়া তোলে। উহার মূল অত্যন্ত গভীরতলে যাইয়া জীবনকে বেড়িয়া রহে। যে হৃদয় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াছে, যে হৃদয় একটা ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে—এমন কি সেখানেও প্রেমের মূল বেশ তাজা হইয়াই বাঁচিয়া থাকে। সেই প্রেম যতই বেশী অন্ধ হয়, ততই প্রবল হয়—একেবারে অপ্রমেয়।

সেই অপ্রমেয় প্রেমের বলে বন্দিনী পান্নার সাধ হইল, আবার নরসমাজে যাইয়া বাস করে। সে ভুলিয়া গেল যে রাজরোষ নিদ্রিত মাত্র—নির্ব্বাসিত নয়, দেব দেউলের বাহিরে পা দিলেই তাহার মরণ নিশ্চিত! যতই দিন যাইতে লাগিল, পান্নার মন আবার ততই সুস্থির হইয়া উঠিল। তীব্র আনন্দের মত অতি-তীব্র দুঃখও বেশী দিন থাকে না—মানুষের হৃদয় অতিরিক্ত কিছুই সহ্য করিতে পারে না।

পান্না জানিত যাঁতার নির্ম্মম পেষণে সে অসম্ভব মিথ্যাটাকেও নিতান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল,—আপন মুখে বলিয়াছিল, সে-ই অংশুমানকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু অংশুমান ত বাঁচিয়া আছে। তবুও কি সে বিশ্বাস করিবে যে পান্না তাহাকে আঘাত করিয়াছিল? ইহা কখনো সম্ভব নয়। বেশী নয়—একটীবার অংশুমানকে কাছে পাইলেই ত পান্না তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে পারিত—চোখের একটা ইঙ্গিতে পান্না তাহার ভ্রমটা দূর করিতে পারিত! অংশুমান যে তাহাকে ভালবাসে, সে-ও যে অংশুমানের পায়ে দেহ মন সবই দান করিয়াছে।

অংশুমানের কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত হইয়া পান্না এক একবার ভৈরবকে মনে করিত। বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে ভৈরবই ছিল পান্নার একমাত্র যোগসূত্র। ভৈরবও ত নরসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত ছিল, কিন্তু পান্না মধ্যে মধ্যে বুঝিত যে তাহার নির্ব্বাসন ভৈরবের দণ্ড অপেক্ষা অনেক ভীষণ—সমস্ত বিশ্বই ভৈরবের জন্য মুক্ত, কিন্তু দেব দেউলের চতুঃসীমার বাহিরেই পান্নার জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছে! ভবিতব্যতা পান্নাকে এই যে একটী নবীন বন্ধু মিলাইয়াছিল, পান্না তাহাকে লইয়া সে কি করিবে, বুঝিতে পারিল না। ভৈরবকে দেখিবা-মাত্র তাহার বিকটাকার, পান্নার অন্তরে এমন একটা ভাব আনিয়া দিত যে, তাহার চক্ষু দুইটী আপনা হইতেই বুজিয়া যাইত। পান্না বুঝিত যে এর চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা আর হইতে পারে না। নিজের চরিত্রের এই গভীর দীনতা যে পান্না না বুঝিত তাহা নয়, কিন্তু বুঝিয়াও পান্না কিছু করিতে পারিত না। ভাবিত, ভৈরব নিকটে না আসিলেই সে বাঁচিয়া যায়! ভৈরব প্রথমে কয়েক-দিন বার বার পান্নাকে দেখিতে আসিল, কিন্তু যখন তাহার অস্পষ্ট অন্তরও তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে পান্না তাহার দর্শন সহিতে পারে না—তখন সে আর আসিত না। নিকটে লুকাইয়া থাকিয়া পান্নাকে দেখিত—কেবলই দেখিত। দিনের পর দিন পান্নার অসাক্ষাতে তাহার এবং মতিয়ার ভোজ্য পেয় রাখিয়া যাইত। পান্না যখন দেব দেউলের মধ্যে নীরবে ঘুরিয়া বেড়াইত তখন সুযোগ বুঝিয়া কোন কোন দিন ভৈরব তাহার শয্যার উপর ফুল ছড়াইয়া রাখিত।

ভৈরবের সেবা যতই প্রাণময় হইতে লাগিল, তাহাকে লইয়া পান্নার বিড়ম্বনা ততই বাড়িতে আরম্ভ করিল। একদিন ভৈরব আসিয়া পান্নার প্রকোষ্ঠের দ্বারে উপস্থিত

হইল—সে কখনো ভিতরে আসিত না। পান্না তখন আপন মনে গান গাহিতেছিল।

ভৈরব আসিতেই পান্নার গান থামিয়া গেল। ভৈরব অমনি নতজানু হইয়া করযোড়ে কহিল, "দোহাই তোমার, গান থামিও না।"

ভৈরবকে ব্যথা দিবার ইচ্ছা পান্নার ছিল না। সে আবার গান আরম্ভ করিল। গানের করুণ সুরটা সেই প্রকোষ্ঠের মধ্যে এক একবার যেন কাঁদিতে লাগিল। ভক্ত যেমন তাহার দেবীর সম্মুখে বসিয়া যোড়করে বর প্রার্থনা করে, ভৈরবও তেমনি ভাবে বসিয়া রহিল। গানের সকল কথা তাহার কাণে গেল না বটে, কিন্তু মুখে নয়, পান্নার চোখে সে সেই গানের অর্থ বুঝিতে লাগিল।

আর একদিন নিতান্ত অপরাধীর মত পান্নার সম্মুখে আসিয়া অনেক ইতস্তত করিয়া ভৈরব বলিল, "তোমায় একটা কথা বলবো, শুনবে ?"

পান্না তখন মতিয়ার গা ঝাড়িতেছিল। মাথা তুলিয়া বলিল, "কি কথা ?"

ভৈরব একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার ওষ্ঠ দুইখানি একবার খুলিল। মনে হইল, সে যেন এখনই কিছু বলিবে। ভৈরব পান্নার মুখের দিকে একবার চাহিল এবং মাথা নাড়িয়া জানাইল যে সে কিছুই বলিতে চাহে না। দক্ষিণ করে নিজের কপালটা টিপিতে টিপিতে ভৈরব ধীরপদে প্রস্থান করিল। পান্না হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিল।

যাইতে যাইতে প্রস্তর নির্মিত বিরাটাকার যক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভৈরব বলিল—"আমি যদি মানুষ না হ'য়ে তোমারই মত পাথরে গড়া হতেম !"

এই ভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল।

একদিন পান্না দেব দেউলের মুক্ত চত্বরে দাঁড়াইয়া নীচে রাজপথে লোক চলাচল দেখিতেছিল। ভৈরব যে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে পান্না তাহা জানিত না। ভৈরব সে সময়ে পান্নার পশ্চাতে থাকিতে পারিলে সম্মুখে আসিত না। সে জানিত যে তাহার কুৎসিত মূর্ত্তি দেখিলেই পান্নার মুখ অপ্রসন্ন হয়। ভৈরবের ইহা সহ্য হইত না।

পান্না সহসা চমকিয়া উঠিল। তাহার নয়ন এক সঙ্গে হাসিল আবার কাঁদিল। আবেগে হাত তুলিয়া পান্না ডাকিতে লাগিল—"অংশুমান, অংশুমান ! এই যে আমি এখানে।"

পান্নার কাতর কণ্ঠ তখন নৌকাডুবীর যাত্রিদের কাতর কণ্ঠের আর্ত্তনাদের মত চারিদিকে বাজিতে লাগিল।

ভৈরব দেখিল, পান্না যাহার জন্য এমন করিয়া অন্তরের ব্যথা নিবেদন করিতেছে, সে দেখিতে পরম সুন্দর। যোদ্ধার সুসজ্জিত পরিচ্ছদে সুশোভিত সে—তেজস্বী অশ্বের পৃষ্ঠে বসিয়া উন্নত মুখে মণিকার শ্রেষ্ঠীর গৃহের দ্বিতল বারান্দার দিকে চাহিয়া আছে এবং একটী সুন্দরী নারীর সহিত কথা কহিতেছে।

সুন্দর পুরুষ পান্নার কাতর আহ্বান শুনিল না, কিন্তু উহা ভৈরবের বিশাল বক্ষটা কাঁপাইয়া দিয়া মর্ম্মচ্ছিন্ন দীর্ঘ নিশ্বাসের মত বাহির হইয়া গেল। ভৈরব মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, কারণ তাহার নয়নের শত ধারা তখন গিরিনদীর বেগে বাহির হইতে চাহিল। অসাধারণ বলে ভৈরব সে বেগকে থামাইল। সেই চেষ্টার ফলে তাহার দেহের মাংশপেশী গুলি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে এমনই বলে মাথার কেশ ধরিয়া টানিল যে উহা পট্ পট্ করিয়া হাতে সঙ্গে উঠিয়া আসিল।

দন্তে দন্ত ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে আপন মনে ভৈরব বলিল "হায়রে দুনিয়া ! এখানে প্রাণের দাম নেই, রূপই শুধু বিকায়।"

পান্না তখন সেইখানে নতজানু হইয়া বসিয়া ছিল। সেই ভাবেই থাকিয়া বলিতে লাগিল, "ওই যে—ওই যে অংশুমান। ঘোড়া থেকে নামছে। শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে গেল কে ? অংশুমান—অংশুমান !"

ভৈরব তাহার হৃদয় দিয়া পান্নার কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহার চোখে আবার জল আসিল। পান্নার শ্বেত ওড়নাটা ধরিয়া ভৈরব টানিল। পান্না মুখ ফিরাইয়া দেখিল—সম্মুখে বিকটাকার ভৈরব, কিন্তু তাহার চোখে জল !

পান্নাকে কোন কথা কহিতে অবসর না দিয়া ভৈরব বলিল, "যদি বল, আমি ওঁকে ডেকে আনি।"

পান্না আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। কহিল—"যাবে ? যাবে তুমি ? যাও যাও, ছুটে যাও তবে ! যদি আনতে পার আমি দাসী হয়ে থাক্‌বো।"

পান্না ভৈরবের পায়ের উপর পড়িয়া গেল।

বিষণ্ণ মুখে তাহাকে সরাইয়া দিয়া ভৈরব দেউলের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

জন্মাষ্টমী

গুরু গুরু গুরু গরজে নীরদ
গম্ভীর নাদে অম্বরে,
গগনের পথে ঝলসিয়া আঁখি
এঁকে বেঁকে চলে দামিনী
ঘন বরিষণ, মত্ত পবন,
রণ কেহ নাহি সম্বরে,
অসিত বরণী ভাদ্রাষ্টমী
নিবিড় নিশীথ যামিনী।

নিখিল বিশ্ব ঊর্দ্ধ আকাশে
হেরিছে অবাক বিস্ময়ে,
দেবতার রোষ, দেবতার কৃপা
এক সাথে পড়ে ঝরিয়া,
চক্র গদায় মৃত্যু ঘনায়,
কিবা বিচিত্র দৃশ্য এ,
পাণির পদ্মে জাগায় জীবন,
শঙ্খে শঙ্কা হরিয়া।

হেরি শর্ব্বরী প্রলয়ঙ্করী
কংস ভাবিছে সংশয়ে
হবে কি ছিন্ন সুন্দর এই
সৃজন পুষ্প মালাটি,
কর্ম্ম আমার হ'ল গুরুভার
সারা জীবনের সঞ্চয়ে,
আ'সল এবার হিসাব দিবার,
ঋণ শুধিবার পালা কি?

লৌহ নিগড়ে বাঁধা বাসুদেব,
জননী দেবকী বন্দিনী,
ভাবী সন্তান কল্যাণ মাগি'
ডাকেন জগন্নিবাসে।
একি অপরূপ, জাগিল হৃদয়ে
স্বরূপ শক্তি সন্ধিনী,
মানস কারার তিমির বিদারি'
কৃষ্ণচন্দ্র বিকাশে।

অধীর শিলার তৃষ্ণা মিটাতে
উষ্ণ রুধির তর্পণে
হস্ত বাড়ায়ে দাঁড়ায়ে ঘাতক
শ্বাস স্পন্দন রোধিয়া,
শিশুমেধে হবে পূর্ণ আহুতি
অষ্টম বলি অর্পণে,
কংস অদ্য হবে নির্ভয়
সদ্য-প্রসূতে বধিয়া।

সহসা প্রহরী ঘুমে অচেতন,
কোন মায়াবীর মন্ত্র এ?
কারাগার হ'ল মুক্ত দুয়ার,
শৃঙ্খল গেল টুটিয়া,
কোন মহাবল করিল বিকল
কংস শাসন যন্ত্রকে,
শৃঙ্খলাহীনা ধরণী কি আজি
ভুল পথে চলে ছুটিয়া?

আর্ত্ত জনের দুঃখ নাশিতে,
শাসিতে কংস দম্ভেরে,
দেবকী অঙ্কে নিষ্কলঙ্ক
শশী হাসে ধরা উজলি,
শান্তি সলিলে স্নিগ্ধ অবনী
দুন্দভি বাজে অম্বরে,
অশনির স্বনে ধ্বনিছে শঙ্খ,
আরতি করিছে বিজলী।

জয় জয় জয় মঙ্গলময়,
জয়তু জন্ম অষ্টমী,
গৌরব-স্মৃতি পুণ্য জড়িত
মহিমান্বিত হে তিথি,
হৃদয় সিংহ-আসন পাতিয়া
ডাকিতেছি হয়ে সংযমী
কারার দুয়ার ভাঙিতে আবার
পাঠাও সে মহা অতিথি।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চক্ষুদান

(গল্প)

পাষাণের বুক চিরে ছোট্ট নির্ঝর ঝর্ ঝর্ করে বয়ে যাচ্ছে। বন কুসুম ফুটে পাষাণের বুকে আনন্দের হাট বসিয়েছে। নির্ঝরের পাশে ছোট্ট কুটীর, তাতে থাকে অন্ধ ও তার কন্যা 'স্নেহ'। অন্ধ তার সব অন্তর খানি নিয়ে তার কন্যা স্নেহকে মানুষ করে এসেছে। স্নেহের পায়ের শব্দ থেকে ছোট্ট হাসিটুকু পর্য্যন্ত অন্ধের বুকে আনন্দের তরঙ্গ তুলে দিয়ে যায়। স্নেহ যখন পাহাড়ের উপর ঘুরে ঘুরে বন্যফল আহরণ করতে যায়, তখন অন্ধ শুধু একটু চিরপরিচিত পায়ের শব্দের আশায় তার সমস্ত হৃদয় খানা দিয়ে কর্ণ সজাগ করে রাখে। কত অমৃত যে সেই পায়ের শব্দে আছে—তা শুধু সেই অন্ধই জানতে পারে।

পাহাড় থেকে ফিরতে স্নেহের দেরী হচ্ছে। যেদি কোন অমঙ্গলই হয়ে থাকে—অন্ধের বুকের মধ্যে দুরু দুরু ক'রে উঠল। হঠাৎ তার কর্ণে সেই পরিচিত পায়ের শব্দ। কিন্তু সেই পায়ের শব্দের সঙ্গে যেন অন্য লোকেরও পায়ের শব্দ!

অন্ধ জিজ্ঞাসা করলে, "মা, আর যেন কার পায়ের শব্দ শুনছি; —আর কেউ কি এসেছে?"

স্নেহ একটু ঢোক গিলে বললে—"বাবা, এই আমার সঙ্গে এসেছেন রাজকুমার 'অভি'। তুমিত দেখতে পাচ্ছনা বাবা, শিকার করতে এসেছিলেম, পথে দেখা, পাহাড়ের উপর পথ হারিয়েছেন।"

অন্ধ ব্যাকুল হয়ে বললে, "বাবা, তুমি এসেছ আমাদের কুটীরে? কি দিয়ে তোমার অভ্যর্থনা করব?"

অভি বললে—"কিছুই দরকার নেই। আমি যে আশ্রয় পেয়েছি এই বড় আনন্দের কথা। মুখের কথার চেয়ে যে প্রাণের অভ্যর্থনার মূল্য বেশী! আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

স্নেহ রাজকুমারের দুই খানা হাত হাতের মধ্যে নিয়ে বুড়োর হাতে দিয়ে বল্লে—"বাবা, এই রাজকুমার তোমার সম্মুখে।"

অভি ও স্নেহ দুজনের হাতই ঈষৎ কেঁপে উঠলো।

অভি প্রত্যহই আসে—স্নেহের সঙ্গে দেখা করতে—অন্ধের খবর নিতে। সেই নির্ঝরের পাশে পাষাণ বেদীর উপর ব'সে দুই জনে কত গল্প করে। নির্ঝরের লহর-লীলা দেখে যেন আনন্দ শেষ হয় না। অভি ফুল তুলে এনে স্নেহের সারা অঙ্গে ফুলের গহনা পরায়—যেন তৃপ্তি হয় না। কত দেশ বিদেশের কাহিনী শোনায়, স্নেহের সে গল্প শুনে আর আশা মেটে না। সূর্য্য পাটে বসেন—তাঁর রাঙা আলো গাছের শিরে রঙীণ হয়ে ফুটে উঠে, অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান আভা তাদের মুখে প'ড়ে স্বর্গ সৃজন ক'রে দেয়।

দুইজন সেই রাত্রির মত বিদায় নিয়ে—অভি তাঁবুতে যায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে,—আর স্নেহ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে মাথা নীচু ক'রে।

৪

এমনি করে তাদের দিন যাচ্ছে। রাজকুমারাকে তার সৈন্য সামন্তগণ কিছু বলতে পারে না—রাজকুমারের এই বনটাই যে এত পছন্দ হ'ল কেন তাও তারা বুঝতে পারে না। তাদের আর শিকার করতে বাহির হতে হয় না। শুধু ছাউনি ফেলে খায় দায় আর আনন্দ করে।

রাজকুমারের আর শিকার করবার স্পৃহা মোটেই নেই। শিকার ভাল লাগে না। প্রাণিবধ করা নাকি উচিত না। শুধু নির্ঝরের দিকে একা একা বেড়ানই তাকে আনন্দ দেয়, আর ঐ বনের প্রাকৃতিক শোভা নাকি দেখে তৃপ্তি হয় না। স্বাস্থ্যও নাকি খুব ভাল।

একদিন রাজবৈদ্য কুমারকে নিভৃতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার স্বাস্থ্য যদি এখানে না টেঁকে তবে চলুন অন্য বনে কি রাজধানীতে ফিরে যাই। আর—আপনার স্বাস্থ্যেরও বিশেষ উন্নতি দেখছি না।'

রাজকুমার মন্ত্রী, সামন্ত, বন্ধুদের পর্য্যন্ত বাইরে যেতে ব'লে বৈদ্যের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

অন্ধ, রাজবৈদ্যের চিকিৎসাধীন আছে। সে নাকি ক্রমে চক্ষুর দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে। বৈদ্য বলেছে আর এক পক্ষ পরে তার সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরবে। অন্ধের কত আনন্দ সে চক্ষু ফিরে পাবে। সংসারের সৌন্দর্য্য প্রাণ ভ'রে দুই চক্ষু দিয়ে পান করবে। ভগবান! এ আনন্দ কি তার ভাগ্যে আছে?

কিন্তু এই আনন্দের মাঝে তার চিরসাথী, অন্তরের মণিকোঠায় সঞ্চিত মাণিক যেন একটু দূরে চলে যাচ্ছে। সে যেন আজকাল তার সঙ্গে কথা কইবার কালে কার প্রতীক্ষায় মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়। অভির সঙ্গে বেড়াতেই যেন তার হৃদয় নেচে ওঠে। সে আনন্দ-সঙ্গীত যেন আর স্নেহের কণ্ঠে ধ্বনিয়া ওঠে না। চলনের শব্দে যেন সে ব্যস্ততা, সে আগ্রহ নেই।

মহা সমারোহ—অন্ধ চক্ষু পেয়েছে। রাজকুমারের আর আনন্দ ধরে না। মুখে চোখে আনন্দ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ছে। স্নেহ কিছু গম্ভীর। রাজকুমার তাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্যে অন্ধের অনুমতি চাইবে। সেই চিরপরিচিত স্থান ত্যাগ করে রাজপুরী! স্নেহের চক্ষে জল গড়িয়ে পড়লো।

রাজকুমার এসে বল্লে—"আপনি ও 'স্নেহ' রাজধানীতে চলুন আমার অনুরোধ, স্নেহও রাজী আছে। আর বলতে কি—আমি—তাকে বিবাহ করেই গ্রহণ করবো—নইলে এ জীবন অর্থহীন হবে। এখন আপনার অনুমতি চাই।"

অন্ধ যা ভাবছিল—তাই।

সে বল্লে, "এখন আমি চক্ষু ফিরে পেয়েছি, কারও সাহায্য আর লাগবে না। এই গাছের ফল আছে, নির্ঝরের জলে আছে, আর পাখীর গান, পল্লব দলের নৃত্য—এরাই আমার চিরসাথী। বেশ ত, তোমরা সুখী হও—এই আশীর্ব্বাদ করি।"

বৃদ্ধের হৃদয় মথিত ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

রাজকুমার শত অনুরোধেও বৃদ্ধকে সঙ্গে নিতে পারলে না।

সমস্ত লোক লস্কর নিয়ে—অভি ও স্নেহ রাজপুরীর দিকে রওনা হল। তাদের শত কোলাহল ও নানা কাযকর্ম্মের মধ্যেও অভি ও স্নেহ এসে শেষ বিদায় গ্রহণ ক'রে গেল। কত করুণ সে প্রণাম! স্নেহের বুক বৃদ্ধের বিদায় ব্যথায় কেঁদে উঠল। হু হু ক'রে কান্না এসে তাকে পাগল করে তুল্‌লো। স্নেহ শেষ প্রণাম ক'রে বিদায় নিলে। ক্রমে তারা চক্ষুর অন্তরালে গেল।

বৃদ্ধ নির্ব্বাক হয়ে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। —তারপর—তারপর পাগলের মত চিৎকার করে কেঁদে উঠিল—"স্নে-হ"-- "অ ভি"।

প্রতিধ্বনি যেন নির্ম্মম ভাবে উত্তর দিল

"স্নেহের—অভিশাপ"।

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার।

সংবাদ

মির্জ্জাপুর সৎসাহিত্য সম্মিলনী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা।

১। "জগজ্জ্যোতি" রৌপ্য পদক—বিষয়—নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র সমালোচনা।

২। "সুধীরাজ" রৌপ্য পদক—বাংলার অবনত জাতির অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায়।

৩। "কার্ত্তিকচন্দ্র" রৌপ্য পদক—জাতি গঠনে নাটাকলা।

৪। "সরোজিনী" রৌপ্য পদক—জাতি গঠনে যুবক-শক্তি।

৫। "ক্ষেমঙ্করী" রৌপ্য পদক—বঙ্গ দেশে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা।

৬। "শ্রীমন্ত" রৌপ্য পদক—বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা।

৭। "সরলা" রৌপ্য পদক—মাতৃজাতির উন্নতির উপায়।

বিঃ দ্রঃ—প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। প্রথম পাঁচটী প্রবন্ধ সর্ব্ব সাধারণের জন্য, ৬ষ্ঠ প্রবন্ধ কেবল স্কুলের ছাত্রদের জন্য ও ৭ম প্রবন্ধ কেবল মহিলাদের জন্য নির্দ্ধারিত হইল। ছাত্রদিগকে প্রমাণ স্বরূপ প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সার্টিফিকেট দিতে হইবে। সমস্ত প্রবন্ধ ৩০শে ভাদ্রের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। যোগ্য বিবেচিত না হইলে কোন প্রবন্ধ লেখকই পদক পাইবে না। ইতি—

শ্রীহরিপদ বাগুলি—সম্পাদক
মির্জ্জাপুর সৎসাহিত্য সম্মিলনী—
পোঃ বাসন্তিয়া, মেদিনীপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"র আশ্বিন সংখ্যা ২৪শে ভাদ্র প্রকাশিত হইবে, এবং কার্ত্তিক সংখ্যা শারদীয় সংখ্যা হইয়া ১২ই আশ্বিন মহালয়ার ৩ দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইবে।

আশ্বিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন ১৮ই ভাদ্রের মধ্যে এবং শারদীয়া সংখ্যার বিজ্ঞাপন ৭ই আশ্বিনের মধ্যে দিতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

কলিকাতা ১৩।১এ বিডন ষ্ট্রীট মানসী প্রেস হইতে শ্রী বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কীর্ত্তনানন্দ

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

২১শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৩৬ | ২য় খণ্ড
২য় খণ্ড | | ২য় সংখ্যা

স্বধর্ম্ম

গীতায় বলা হইয়াছে,

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩।৩৫

স্বধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ভালরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেয়ঃ; স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়; কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

এখানে স্বধর্ম্ম বলিতে কি বুঝাইতেছে?

আজকাল ইংরাজী রিলিজন (Religion) শব্দের অনুবাদস্বরূপ ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই অর্থ গ্রহণ করিলে গীতার উক্ত শ্লোকের অর্থ হয় যে, হিন্দুর পক্ষে হিন্দুধর্ম্ম ভাল, মুসলমানের পক্ষে মুসলমান ধর্ম্ম ভাল, খৃষ্টানের পক্ষে খৃষ্টান ধর্ম্ম ভাল, নিজের নিজের ধর্ম্ম দোষযুক্ত ত্রুটিযুক্ত হইলেও তাহা ছাড়িয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত নহে। কিন্তু, এখানে ধর্ম্ম বলিতে বুঝাইতেছে ভগবান সম্বন্ধে কোনও সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস এবং সাম্প্রদায়িক রীতি নীতি অনুসরণ করিয়া পূজা, উপাসনা ইত্যাদি অনুষ্ঠান।

জগতে নানা রিলিজন (Religion) প্রচলিত আছে। প্রত্যেক রিলিজনই বলে যে, তাহাদের শাস্ত্রই সুখবরের বাক্য, তাহাদের রীতি নীতি অনুসরণ করিয়া পূজা উপাসনা করিলেই সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকে লাভ করা যায়। সাধারণ লোকের

ভগবান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, তাহারা অজ্ঞানভাবে কোনও রিলিজনের মতবাদ গ্রহণ করে, অন্ধ বিশ্বাসের বশে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, পূজা উপাসনা করে। এই অর্থে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, জৈন, খ্রীষ্টান প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম আছে। এমন কি হিন্দুদের মধ্যেই নানা বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন ধরণের পূজা পদ্ধতি অতএব বিভিন্ন ধর্ম্ম আছে—কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ ব্রাহ্ম। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভগবানকে ধারণা করে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভগবানের উপাসনা করে, আর সকলেই মনে করে যে তাহাদের নিজেদের মতটিই শ্রেষ্ঠ। মাঝে মাঝে মহাপুরুষেরা আসিয়া দেখাইয়া দেন যে, এই সব বিভিন্ন মত, বিভিন্ন পথ মাত্র, আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ করিলে প্রত্যেক পথটি ধরিয়াই ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। আর যদি আন্তরিকতা না থাকে, খাঁটি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে চিরজন্ম ধরিয়া নমাজ পড়িলে বা গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করিলে, বা গঙ্গাতীরে বসিয়া মন্ত্র জপ করিলেও ভগবানের দিকে একটি পদও অগ্রসর হওয়া যায় না, অন্ধভাবে গতানুগতিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই ঘুরিয়া মরিতে হয়।

সহজেই বুঝা যায় যে, গীতা ধর্ম্ম শব্দ এইরূপ সঙ্কীর্ণ রিলিজন (Religion) অর্থে ব্যবহার করে নাই। বস্তুতঃ ভারতে ধর্ম্ম শব্দ আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত, উহা শুধু ভগবদুপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। যে সব আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক আদর্শ অনুসারে, নিয়মানুসারে, জীবনকে পরিচালিত করিতে হইবে তাহাদের সাধারণ নামই ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়কে যে আদর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে তাহা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণকে যে আদর্শ অনুসারে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা ব্রাহ্মণধর্ম্ম, এইরূপ যে আদর্শ যে নিয়মকে ধরিয়া কর্ম্ম করিতে হয় ভারতে ধর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ তাহাই বুঝায় এবং গীতা এখানে সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম্ম শব্দের আর একটি মৌলিক অর্থ আছে, কোনও জিনিষের যাহা প্রকৃতি স্বরূপ তাহাই ঐ জিনিষের ধর্ম্ম। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম দাহন করা, জলের ধর্ম্ম শৈত্য, বাষ্পের ধর্ম্ম ঊর্দ্ধদিকে গমন ইত্যাদি। ঐ জিনিষের স্বরূপের পরিবর্ত্তন হয় না, অতএব, ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন হয় না। অগ্নি সত্যযুগে দাহন করিয়াছে, কলিযুগেও করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম বলিতে ঠিক এইরূপ ধর্ম্ম বুঝায় না। পুরাকালে ব্রাহ্মণ যেরূপ ছিল এখন আর সেইরূপ নাই। প্রাকৃতিক বস্তুর যে ধর্ম্মের কথা বলা হয়, তাহাতে বলা হয় যে ঐ বস্তুটী বস্তুতঃ কিরূপ ব্যবহার করে। আর ক্ষত্রিয়াদির ধর্ম্মের কথা যে বলা হয়, তাহাতে বলা হয় যে, ক্ষত্রিয়াদির কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। একটা বুঝায়, things as they are, অপরটা বুঝায় things as they ought to be। অগ্নি নিজের ধর্ম্ম ছাড়িতে পারে না। বস্তুতঃ উল্লিখিত শ্লোকে যে বলা হইয়াছে যে, স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত নয়, ইহাতেই স্বীকৃত হইয়াছে যে, মানুষের পক্ষে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব। অগ্নির কোনও ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই সে দাহ করিবেই; কিন্তু, মানুষের ধর্ম্ম কি, সে সম্বন্ধে ভুল হইতে পারে, ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে হইতে পারে, অর্জ্জুন নিজেই যেমন বলিয়াছিলেন,—

কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম-সংমূঢ়চেতাঃ।

অতএব, প্রাকৃতিক বস্তুর ধর্ম্মের সহিত মানুষের ধর্ম্মকে এক করিয়া ভাবিতে গেলে পদে পদে গোলমাল হইবে, যদিও এই দুই প্রকার ধর্ম্মেই মূলতঃ যে সাদৃশ্য আছে তাহা আমরা পরে দেখিব। গীতায় উল্লিখিত শ্লোকে অর্জ্জুনকে যে স্বধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে ক্ষত্রিয়ের সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আদর্শ। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয় তাহার পক্ষে ঐ আদর্শের অনুসরণ করাই কল্যাণকর। তাহা না করিয়া সে যদি ব্রাহ্মণের আদর্শ অনুসরণ করিতে যায়, এবং ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত অধ্যায়ন অধ্যাপনা খুব ভাল করিয়াও করে, তাহা হইলেও ঐ ব্যক্তির আত্মার অকল্যাণ হয়।

কেন অকল্যাণ হয়? প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের ও জন্মের বিশেষ লক্ষ্য আছে, সার্থকতা আছে। প্রত্যেক মানুষই ভগবানের অংশ, ভগবানের পরাপ্রকৃতিই জীব হইয়া প্রত্যেক মানুষের সত্তা হইয়াছে। কিন্তু, সকলের

মধ্যে ভাগবত প্রকৃতির বিকাশ সমান নহে, কেহ উচ্চতায় উঠিয়াছে, কেহ এখনও নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। সকলের মধ্যেই ভাগবতের পূর্ণ বিকাশ হইবে, কিন্তু ক্রমশঃ জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মের ভিতর দিয়া মানুষ সেই পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এক জন্মে মানুষ তাহার কর্ম্মের দ্বারা যতটুকু আত্মবিকাশ করিতেছে, পরজন্মে তদনুসারে জন্মলাভ করিতেছে, প্রকৃতিলাভ করিতেছে, এক জন্মে যাহা অবিকশিত থাকিতেছে, পর-জন্মে তাহা বিকাশের যোগ্য হইতেছে, এক জন্মে যাহা পরিস্ফুট হইতেছে, পরজন্মে হয়ত তাহা চাপা থাকিয়া অন্যান্য অংশের বিকাশের সুবিধা করিয়া দিতেছে। এই-রূপে জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মের ফলে, বিকাশের ফলে এ জন্মে মানুষের জীবনের মূল ধারা যাহা নির্ণীত হইয়াছে, সেই ধারা অনুসরণ করাই তাহার পক্ষে কল্যাণকর। নতুবা নিজের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যকে বর্জ্জন করিয়া সে যদি পরের অনুকরণে, পরের আদর্শ গ্রহণ করে তাহা হইলে ভাগবত প্রকৃতি তাহার আত্মবিকাশের যে স্বাভাবিক ব্যবস্থা করিতেছে, তাহাতে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা হইয়া যাইবে, ক্রমবিকাশে আবার তাহাকে অনেক পিছাইয়া পড়িতে হইবে। এজন্য নিজের প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া যদি মৃত্যুও হয়, তাহাতে কোনও ক্ষতিই নাই, কারণ মৃত্যু কেবল এক দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে গমন ভিন্ন আর কিছুই নহে। জীবকে অনেক জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া গিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে হয়। প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া মৃত্যু হইলে আমার আত্মার বিকাশেরই সহায়তা হইবে। কিন্তু, আমার স্বাভাবিক বিকাশের পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিয়া যদি আমি বহুদিন বাঁচিয়া থাকি, সাংসারিক জীবনে উন্নতিও করি, তথাপি আমার আত্ম-বিকাশ ক্ষুণ্ণ হইবে, ভাগবত জীবন লাভ, অধ্যাত্মসিদ্ধি লাভ আমার পক্ষে কঠিন হইবে, এই জন্যই গীতা বলিয়াছে,—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

কেমন করিয়া মানুষের আত্মার বিকাশ হইবে, মানুষ ক্রমশঃ অধ্যাত্মজীবনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে, ইহাই ভারতীয় সভ্যতার, ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষার চিরন্তন লক্ষ্য। এই রকম লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই প্রাচীন ভারতে সমাজের সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যাহাতে মানুষ আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম করিবার সুযোগ পায়, সেই জন্য সমাজ মানুষকে তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে চারিভাগে ভাগ করিয়াছিল, এবং কোন্ প্রকৃতির লোকের পক্ষে কিরূপ কর্ম্ম উপযোগী, ঋষিগণ দিব্য দৃষ্টিতে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাই কর্ম্মানুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগের মূল কথা। মানব সমাজে মোটামুটি চারি প্রকার লোক দেখা যায়। কাহারও প্রকৃতির ঝোঁক জ্ঞানের দিকে, আবার কাহারও ঝোঁক শারীরিক পরিশ্রম করিয়া সেবা পরিচর্য্যাদি কর্ম্মের দিকে। যাহার যেদিকে স্বাভাবিক ঝোঁক সেই অনুসারেই তাহাকে কর্ম্ম করিতে দিতে হইবে। কিন্তু, কাহার প্রকৃতি কিরূপ সে হিসাব করিয়া সমাজের শ্রেণী বিভাগ কে করিয়া দিবে? ফলে কার্য্যতঃ জন্মের দ্বারাই বর্ণ নির্ণীত হয়, বর্ণ বিভাগ জাতিবিভাগে পরিণত হয়। যে যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে সেই বংশানুযায়ী কর্ম্ম করিতে হয়। ফলে আর প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্মের ব্যবস্থা হয় না, কারণ পিতার যে প্রকৃতি, পুত্রেরও যে সেই প্রকৃতি হইবে এমন কোনও কথা নাই। তথাপি পূর্ব্বে শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা এই ত্রুটি অনেকটা দূর করা হইত। যে যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই বংশের ব্যবসা বা বৃত্তিতে সে বাল্যাবধি শিক্ষা দীক্ষা পাইত, ফলে ঐ বংশের বৃত্তি অবলম্বন করা তাহার পক্ষে অনেকটা সুবিধাজনক হইত এবং সমাজেরও একটা সুশৃঙ্খল কর্ম্ম বিভাগ হইত। এরূপ ব্যবস্থায় প্রাচীন বর্ণাশ্রম প্রথার অত্যুচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শ বজায় না থাকিলেও সমাজের দিক দিয়া তাহা কল্যাণকর ছিল। কিন্তু, এখন তাহাও নাই। এখন আর কেহ জাতি ব্যবসা অনুসরণ করিতে বাধ্য নহে। যাহার যেমন সুবিধা, যেমন সুযোগ, সেই-রূপ বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, ফলে জাতিভেদের যে একটা সামাজিক ও অর্থনীতিক সার্থকতা ছিল তাহাও সম্পূর্ণভাবেই দূর হইয়াছে। আগে ছিল গুণ কর্ম্ম অনুসারে বিভাগ; এখন হইয়াছে আচারের কঠিন প্রাচীরের দ্বারা বিভাগ। কাহার কি গুণ, কি শক্তি তাহার হিসাব কেহ লয় না, কে কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই অনুসারেই সমাজকে শত শত ভাগে ভাগ

করিয়া অনর্থক ভেদ বৈষম্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে। জাতিভেদের সমর্থন করিতে গীতার দোহাই, ধর্ম্মের দোহাই কখনই দেওয়া চলে না। গীতার কথার এমন অর্থ কেহই করিতে পারেন না যে, লোকের ব্যক্তিগত স্বভাব, ব্যক্তিগত প্রকৃতি যাহাই হউক তাহাকে পিতার বা পূর্ব্ব পুরুষগণের ব্যবসা বা বৃত্তি অবলম্বন করিতেই হইবে।

গোয়ালার ছেলেকে দুধের ব্যবসা করিতেই হইবে, ডাক্তারের ছেলেকে ডাক্তার হইতেই হইবে, জুতা নির্ম্মাতার ছেলেকে জুতা নির্ম্মাতা হইতেই হইবে এবং বংশানুক্রমে ধরিয়া এই ব্যবসা চলিবে! এই ভাবে নিজের প্রকৃতি, নিজের গুণ ও প্রেরণার দিকে না চাহিয়া অন্ধ-ভাবে, গতানুগতিকভাবে পরধর্ম্মের অনুসরণ করিলেই আপনা হইতেই আত্মার বিকাশ হইবে, অধ্যাত্ম সিদ্ধিলাভ হইবে, ইহা কখনই গীতার শিক্ষা নহে, সে শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত।

গীতার আমরা ধর্ম্মের দুই প্রকার অর্থ পাই—একটি নৈতিক আর একটি আধ্যাত্মিক। নৈতিক অর্থে ধর্ম্ম হইতেছে সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আদর্শ। শাস্ত্র ও দেশাচার হইতে এই ধর্ম্ম জানা যায়। মানুষ বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে শাস্ত্রবিধি রচনা করে। ভারতে জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্যই শাস্ত্র ছিল—ধর্ম্ম শাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র চিকিৎসা শাস্ত্র, রণনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি মানব সমাজের প্রয়োজনীয় কোন জিনিষই বাদ পড়ে নাই। কোন্ ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে কিরূপ আচরণ করা কল্যাণকর, তাহাই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু, মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যেমন বর্দ্ধিত হয়, সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার যেমন পরিবর্ত্তন হয়, তেমনিই শাস্ত্র বিধানেরও পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হয়। এইভাবে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এক কালে যাহা নিষিদ্ধ ছিল, পরে তাহাই আদিষ্ট হইয়াছে, একক।লে যাহা আদিষ্ট ছিল পরে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অন্যান্য দেশে প্রকাশ্য ভাবেই সামাজিক আইন কানুন রীতি নীতির পরিবর্ত্তন করা হয়। ভারতে পরিবর্ত্তনের ধারা অন্য রকম। ধীরে ধীরে অবস্থানুযায়ী ব্যবহার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা এমনভাবে হইয়াছে যে সমাজ জীবনে কোনও বিপ্লব বা বিপর্য্যয় ঘটে নাই। শাস্ত্রবাক্য সাক্ষাৎভাবে অমান্য করা হয় নাই, কিন্তু, এক শাস্ত্র বাক্যেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যার দ্বারা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। কোথাও বা নূতন শাস্ত্র রচনা করিয়া প্রাচীন মুনি ঋষিদের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও দেশাচারকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে সামাজিক আদর্শের, রীতি নীতির, ধর্ম্মের বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গেলেও লোকে মনে করিতেছে যে, বৈদিকযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত লোকে একই ধর্ম্ম, একই শাস্ত্র অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ এটা ভ্রম, যুগে যুগে যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ও বিকাশের দ্বারাই মানুষ ক্রমশঃ অধ্যাত্মজীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

গীতা এই নৈতিক ধর্ম্মের উপর ঝোঁক দেয় নাই, গীতা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছে। অর্জ্জুনকে যখন বলা হইল—

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি,

তখন নৈতিক ধর্ম্মের কথাই বলা হইয়াছে। সামাজিক আদর্শ অনুসারে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ ধর্ম্ম তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু, অর্জ্জুন এই উত্তরে সন্তুষ্ট হন নাই, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনে শ্রেয়ঃ কি হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাই গীতার প্রকৃত শিক্ষা। সে ধর্ম্ম নিত্য সনাতন, সে ধর্ম্মের কখনও কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সে ধর্ম্ম কি? গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে সে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—

স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্!

মানুষের যাহা স্বভাব, মূল প্রকৃতি, তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মই ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন যে, চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগের এইটিই মূল সত্য। বস্তুতঃ গীতার শিক্ষা যখন প্রচারিত হয়, তখন বৈদিক বর্ণাশ্রম প্রথা ঠিক বজায় ছিল না! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য যুদ্ধ করিতেছিল, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কার্য্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছিল, চারি বর্ণের বাহিরে পঞ্চমের উদ্ভব হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের মহাধ্বংসের ফলে এই বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়া যায়; অর্জ্জুন এই বর্ণসাঙ্কর্য্যের ভয়েই যুদ্ধ করিতে চান নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই।

চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগের যে মূল সত্য অর্জ্জুনকে তাহাই অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। ভগবান বলিয়াছেন—

হে অর্জ্জুন, সর্ব্বভূতের যে বীজ, তাহা আমিই। প্রত্যেকের মধ্যে বীজরূপে ভগবান রহিয়াছেন, ঐ বীজেরই বিকাশ করিতে হইবে, স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করিয়াই ঐ বীজের বিকাশ হয়। সংসারে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইয়াছে, সর্ব্বভূতানাং প্রত্যেকের মধ্যে ভগবানের শক্তির এক একটি অংশ ঠিক একটি ধারা বিকশিত হইতেছে, ভাগবত শক্তির এই বিশিষ্ট ধারাই প্রত্যেক জীবের স্বভাব। যেমন অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু সমূহের বিশেষ বিশেষ স্বভাব আছে, ধর্ম্ম আছে, তেমনিই প্রত্যেক মানুষেরই বিশিষ্ট স্বভাব, বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে। তবে জড় পদার্থের সহিত মানুষের তফাৎ এই যে, জড় পদার্থ নিজের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না মানুষ পারে। শেষ পর্য্যন্ত মানুষও পারে না, মানুষ যাহাই করুক ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে নিজের ধর্ম্ম ফিরিয়া আসিতেই হইবে নতুবা তাহার মুক্তি নাই। তবে, মানুষকে এ বিষয়ে কতকটা স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। কারণ মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সর্ব্বভূতের মধ্যে মানুষই ভগবানের নিকটতম।—মানুষকে সজ্ঞানে ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে হইবে, ভগবানের ন্যায় স্বরাট্, সম্রাট্ হইয়া দিব্য জীবনের লীলা করিতে হইবে।

মানুষের সত্তার পূর্ণতম বিকাশের জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন, তাই ভগবান মানুষকে ভুল করিতে এমন কি পাপ করিতেও কতকটা স্বাধীনতা দিয়াছেন। এই ভাবে সে নিজের শক্তির পরিচয় পাইবে, সত্য পথের সন্ধান পাইবে। দুঃখের বিষয় ভগবান মানুষকে যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, সমাজ তাহা দিতে চায় না, বিধিনিষেধের অসংখ্য বন্ধনে বদ্ধ করিয়া মানুষের আত্মার বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করে।

স্বভাব বলিতে মানুষের কাম ক্রোধাদি রিপুকে বুঝিলে চলিবে না। কামের বশে চলিয়া স্বভাবের অনুসরণ করিতেছি বলিলে হইবে না। বস্তুতঃ গীতা পুনঃ পুনঃ কামক্রোধকে সংযত করিতে বলিয়াছে। কাম, ক্রোধ আমাদের স্বভাব নহে, স্বভাবের বিকৃতি। এই বিকৃতিরও প্রয়োজন আছে। যাহারা তামসিকতার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষে কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার প্রয়োজনীয়! এসব না থাকিলে তাহারা কর্ম্মই করিবে না, তহাদের উর্দ্ধগতি সম্ভব হইবে না। কিন্তু যাহারা তামসিকতার উপরে উঠিয়াছে, রাজসিক কাম,ক্রোধ, অহঙ্কারের দ্বারা চালিত হইতেছে, তাহাদিগকে আরও উপর উঠিতে হইবে এবং সেজন্য কাম ক্রোধাদিকে সংযত করিতে হইবে। এই জন্যই গীতা নিয়তং কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে। এইরূপ সংযত কর্ম্মের দ্বারাই মানুষের মধ্যে সত্য নিষ্ঠার বিকাশ হয়। কিন্তু কর্ম্ম কিসের দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে? কাম ক্রোধের বশে কর্ম্ম না করিয়া সত্য নীতি সত্য আদর্শ অনুসারে কর্ম্ম করিতে হইবে, বুদ্ধির দ্বারা ভাল মন্দ পাপ পুণ্য বিচার করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে —ইহাই নিয়তং কর্ম্ম এবং শাস্ত্র ইহার সহায়। কিন্তু অন্ধ ভাবে গতানুগতিক ভাবে দেশাচার বা শাস্ত্রের অনুশাসন পালন করিলে সাত্ত্বিকতার বিকাশ হয় না। নিজের বুদ্ধির দ্বারা ভাল মন্দ বিচার করিয়া ভালকে গ্রহণ করিতে হইবে, মন্দকে বর্জ্জন করিতে হইবে, এই ভাবেই চরিত্রের বিকাশ হইবে। আবার যাহা একজনের পক্ষে ভাল তাহা অপরের পক্ষে মন্দ হইতে পারে, অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তবের নির্ণয় করিতে মানুষকে নিজের মূল স্বভাবের অনুসরণ করিতে হইবে। স্বভাবের দ্বারা নিয়মিত কর্ম্মই ধর্ম্ম। নিজের প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম করিলে যদি ত্রুটি হয় তাহাও ভাল, তথাপি পরের আদর্শ দেখিয়া পরের অনুকরণ করিয়া বা বাহ্যিক বিধিনিষেধের নির্দ্দেশ মানিয়া কর্ম্ম করা ঠিক নহে—

• শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

কাহার স্বভাব কি তাহা সে নিজেই ঠিক করিয়া লইতে পারে যদি তাহাকে স্বাধীন ভাবে তাহার চরিত্র বিকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু, মানুষ সমাজে সেই স্বাধীনতা পায় না, সমাজ পদে পদে বিধি নিষেধের বন্ধন দিয়া মানুষকে পরধর্ম্ম অনুসরণ করিতে বাধ্য করিতেছে। তাই সমাজে এত অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার।

কিন্তু, স্বধর্ম্মের অনুসরণই গীতার চরম কথা নহে। আপন আপন স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সেই কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে উৎসর্গ করিতে হইবে, তবেই মানুষ পরমা গতি লাভ করিতে পারিবে।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

এইভাবে যে কোন কর্ম্মই করা যাউক না কেন, তাহা যদি স্বভাবের অনুযায়ী হয় এবং ভগবানে উৎসর্গীকৃত হয়, তাহার দ্বারাই মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। যাহা হইতে সব আসিয়াছে, যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, আমাদের হৃদ্দেশে অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহাকে আমাদের সমস্ত কর্ম্ম সমস্ত জীবন সমগ্রভাবে সমর্পণ করিতে পারিলে তিনিই আমাদের ভার গ্রহণ করেন, তখন আমাদের সকল কর্ম্ম তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত হয়, তাঁহার দিব্য শক্তির দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন আমরা সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের উপরে উঠি, সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, তখন আর কোনও বিশেষ নীতির, বিশেষ গুণের অনুসরণ করিতে হয় না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যে জ্ঞান, শক্তি সামঞ্জস্য, সেবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,শূদ্রের গুণ রহিয়াছে সে সব পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে, পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে, মানুষের মধ্যে ভাগবতের প্রকাশ পূর্ণ হয়, মানুষ পরম অধ্যাত্মসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীঅনিলবরণ রায়।

সবাই রবে আমি যাব চলে

এই বসুন্ধরা
যেন এক সুন্দরী অপ্সরা
ফুল্ল ফুল ফলে
তৃণ গুল্ম লতা পত্র দলে,
অগণিত—
পুঞ্জীভূত তুষার ভূষিত
তুঙ্গ শৃঙ্গ পর্ব্বত শিখরে,
কলতান ঝঙ্কারিত সহস্র নির্ঝরে,
শস্যক্ষেত্রে শ্যামল প্রান্তরে,
হ্রদে, সরোবরে
উত্তাল সাগরে
রূপ তার পড়িতেছে ঝরি
দিবস শর্ব্বরী।
ও ত রবে চিরদিন এমনি সুন্দর
জনমনোহর।
ঝরিবে ঝর্ঝর ধারা নির্ঝরের প্রায়,
গুরু গুরু গুরু
বাদল বাজাবে নভে মাদল ডমরু,
শারদ পূর্ণিমা শশী উদিবে আকাশে,
দুলিবে কাশের গুচ্ছ হিমেল বাতাসে,
ফুটিবে শেফালী
শরৎ দুলালী,
বসন্তের কুঞ্জে, মল্লী চম্পক চামেলী
গন্ধরাজ বেলী
বিলাবে আতর, বহিবে মলয়,
অলিকুল গুঞ্জরিবে ফুলবনময়,
সুধাবৎ
বাজাবে কোকিল বৃন্দ সদা নহবৎ।
কত গুণী গাবে হেথা গান
ঢালি মন প্রাণ।
ললিত ঝঙ্কারে আর সুরের লহরে
গড়ি দিবে সুরপুরী মরতের পরে।
কবিতা কুসুম তুলি কত কবি কল্পনা কাননে
দিবে অর্ঘ্য ভারতী চরণে,
আমি শুধু পাইব না এ সৌন্দর্য্য হায় ভুঞ্জিবারে
ডুবে যাব চিরতরে মৃত্যুর পাথারে।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

গিরিশ-স্মৃতি

(গ)

ইংরাজী ১৯১০ খৃষ্টাব্দ, জুলাই মাস। বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কিছু গুমোট গরমও আছে। সন্ধ্যার পর ধীরে ধীরে গিরিশবাবুর বাসভবনে গেলাম। গিয়া দেখি গিরিশবাবুর নিকট অনেকে উপবিষ্ট আছেন, কেহ পরিচিত কেহ বা অপরিচিত। ভূতনাথ বাবু, ডাক্তার অক্ষয় বাবু, অসীম বাবু, অবিনাশ বাবু প্রভৃতি বসিয়া আছেন। গিরিশ বাবু বলিতেছিলেন "শুধু কল্পনা ক'রে আমি চরিত্র সৃষ্টি করিনি, প্রত্যক্ষ দেখেছি তবে লিখেছি। যদি এতে কেউ অস্বাভাবিক বলে তবে আমি নাচার। আমাদের দোষ হয় কি জান? যা আমাদের অভিজ্ঞতা নেই, তাই অস্পৃশ্য তাই অস্বাভাবিক! এই জীবনে এত রকমারি বিভিন্ন চরিত্রের সংশ্রবে এসেছি তা গল্প কর্ত্তে গেলে আশ্চর্য্য হতে হবে। অতি পাষণ্ড নীচ দুর্জ্জন হ'তে, অবতার চরিত্র পর্য্যন্ত দেখেছি। বোধ হয় তিনি আমাকে নাটককার কর্ব্বেন বলেই গোড়া থেকে নানাবিধ ঘটনার ভিতর দিয়ে নানা situation-এ রকম রকম বিভিন্ন চরিত্রের সংস্পর্শে এনেছিলেন। নিজে ইচ্ছে ক'রে নাটক লিখিনি, বাধ্য হয়ে লিখেছি। ভাল নাটক পাব ব'লে পুরস্কার ঘোষণা ক'রে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। একখানিও অভিনয়োপযোগী নাটক পাইনি। ভেবেছিলাম নিজে নাটক না লিখে অপরকে শিখিয়ে নিজে রঙ্গমঞ্চ হতে অবসর নিয়ে থাকবো। ঠাকুর তা হতে দিলেন না। তারা ঠেলে রাখলে, ষড়যন্ত্র ক'রে কুব্যবহার কর্লে, অপমান কর্লে। কলাপাহাড়, মায়াবসানের মত নাটক তারা বটতলার বই ব'লে প্রচার কর্ত্তে লাগলো। তখন বুঝলাম ঠাকুর এই জীবনে আমাকে অবসর নিতে দেবেন না। আমাকে কায কর্ত্তে হবে। তাঁর কায জেনে নাটক লিখেছি, অভিনয় কর্চ্ছি। যদি জানতাম নিজের ইচ্ছায় কর্চ্ছি তবে সেদিনই ছেড়ে দিতাম স্বামিজী * যখন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে মঠে বসতে আমাকে জিদ কর্ত্তে লাগলেন, তখন তাঁকে বলেছিলাম, আমাকে থিয়েটার ছাড়াতে তোর বাপ পার্লে না—আবার তুই তো তুই! এই কথা বলেছিলাম জোর করে—কারণ আমার বিশ্বাস ঠাকুর আমাকে এই কাযে রেখেছেন, আমার সাধ্য কি যে আমি ছাড়বো! আর যে দিন থেকে ঠাকুর বকল্‌মা নিয়েছেন, সেদিন থেকে আমার নিজের আলাদা করে ভাববার দফারফা। এই জোরেই স্বামিজীকে বলেছিলাম। নতুবা স্বামিজীর কাছে আমি কোন ছার যে তাঁকে অত জোর করে বলবো? ঠাকুর যাঁকে জগদ্‌গুরু, জগতের আচার্য্য করে গড়েছিলেন, ঠাকুর যাঁকে ব'লতেন সপ্তর্ষির অংশ, সাক্ষাৎ লোকপাবন বিবেকানন্দকে আমার বলবার একমাত্র জোর ঠাকুরের দয়া, ঠাকুরের অহৈতুকী ভালবাসা!

আমি। আচ্ছা স্বামীজির সঙ্গে আপনার একটা গভীর ভালবাসা ছিল, একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল, তার কারণ কি?

গিরিশবাবু। ঠাকুর দয়া করেছিলেন, ঠাকুর ভাল বেসেছিলেন তাই স্বামীজি ভালবাসতেন। আমার মত লোক এই সব ত্যাগী ছেলেদের ভালবাসার বস্তু—তার একমাত্র কারণ ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা। আর আমার বিশ্বাস কি জান? যে শক্তি রামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হ'য়ে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ হ'য়েছিলেন, সেই শক্তিই আবার বিবেকানন্দের ভিতর আচার্য্যরূপে, জগদ্‌গুরুরূপে প্রকাশ পেয়েছিলেন। আর স্বামীজির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কি ভাব ছিল, তা যে না দেখেছে সে ঠিক বুঝতে পার্ব্বে না।

আমি। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের শ্রীমুখে শুনেছি যে যদি কেউ সকাম করে কোন খাবার জিনিষ ঠাকুরকে দিতেন কিংবা কোনও ফলাকাঙ্ক্ষী মাড়োয়ারীরা পাঠাতেন, তবে ঠাকুর তা নিজেও স্পর্শ কর্ত্তেন না, অপরকে স্পর্শ কর্ত্তে দিতেন না—স্বামীজির জন্য তা তোলা থাকতো। ঠাকুর নাকি ব'লতেন, "নরেনের ভিতর যে ব্রহ্মাগ্নি

* স্বামী বিবেকানন্দ

জ্বলছে তাতে সব আহুতি পড়্‌তে পারে, ওতে সব ভস্ম হ'য়ে যাবে। কোন দোষ ওকে স্পর্শ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না!" যে জল স্বামীজি স্পর্শ ক'র্ত্তেন সে জলে ঠাকুর কথনও পা ধুতেন না।

গিরিশবাবু। আবার এই স্বামীজি আক্ষেপ ক'রে আমাকে শুনিয়েছেন, "ভাল ভাল লোক বেছে আমি তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছি, তিনি সবাইকে কৃপা করেন নি। আর গিরিশ ঘোষ বাছাবাছি না ক'রে যাকে তাকে নিয়ে গিয়েছে—আর ঠাকুর তাকেই কৃপা করেছেন।" তার মানে কি জান? যার যা ভাব ঠাকুর তাই দেখতেন। স্বামীজি যাদের ভাল পবিত্র স্বভাব ব'লে জান্‌তেন, তাদের নিয়ে যেতেন। তাদের ভিতরের স্বভাব দেখে ঠাকুর স্বামীজিকে জানিয়ে দিতেন—এর ভিতরে এই মলিনতা রয়েছে। স্বামীজি যে লোক শিক্ষক জগতের আচার্য্য হবেন—তাই তাঁকে সেইভাবে শিক্ষা দিতেন, তাই এত বাছ বিচার ক'র্ত্তেন। আমি নিয়ে যেতাম যারা পতিত, তাপিত—আমাদের মত নিরাশ্রয়। তাই পতিত-পাবন তাদের বাড়ীতে পদাশ্রয় দিতেন। যার যা ভাব। বাগবাজারে নন্দ বোসদের ঠাকুর একবার গিয়েছিলেন। নন্দ বোস পাণ দিতে গেল, ঠাকুর নিলেন না। নন্দ বোসেরা বল্‌লে কাঁচা সাধু—অর্থাৎ এখনও নিয়ম মেনে চলেন। আমার তা শুনে হৃদয়ে তীরের মত বিঁধ্‌লো। আমি নিজে পাণ নিয়ে পরে একটা পাণ ঠাকুরকে দিয়েছি, তিনি নিলেন। তখন ঠাণ্ডা হলাম। রামদা ঠাকুরের জন্য জিলিপি নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথে একটী বালক চাইলে, রামদার গাড়ীর পিছনে পিছনে ছুট্‌তে লাগলো। রামদা ভাবলেন কে জানে ঠকুরই যদি বালকের রূপ ধরে পরীক্ষা করবার জন্যে আমার কাছে চেয়ে থাকেন, এই মনে ক'রে একখানি জিলিপি সেই বালককে দিলেন। ঠাকুর সেই চেঙ্গারী ছুঁয়ে বল্‌লেন—চল্‌বেনা, এঁটো হ'য়েছে। আর আমি তা শুনে জগুর দোকানের কচুরী, অন্যান্য মিষ্টি নিজে খেয়ে পরখ ক'রে সব নিয়ে গেলাম, ঠাকুর অমনি তা নির্ব্বিচারে খেলেন। যার যা ভাব, ভগবান্ তাই রক্ষা করেন"

এমন সময়ে ডাক্তার কাঞ্জিলাল আসিলেন। অন্য প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। উপস্থিত যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা অনেকেই উঠে গেলেন।

ডাক্তার কাঞ্জিলাল বলিলেন "মশায়! আজকাল মানুষ এত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হ'য়েছে যে ভগবচ্চিন্তা বা সাধু দর্শন করা কিংবা মন্দিরে যাওয়া একটা উপহাসের বিষয় হ'য়েছে।"

আমি। অনেকে বলেন যে এগুলো medieval institutions। মধ্যযুগের ব্যাপার বিংশ শতাব্দীতে মানায় না।

গিরিশবাবু। বটে! পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হওয়া মন্দ নয়, যদি ঠিক ঠিক হয়; তবে তার একটা principle আছে, আদর্শ আছে। পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য করে—তাদের মত জ্ঞানের পিপাসা, অদম্য সাহস, বীরত্ব, জাতীয় গর্ব্ব, একতা কোথায়? তা তো নয়। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন এদেশের লোকের কথা যখন বল, তখন বুঝি এক খিচুড়ী ভাবাপন্ন unprincipled পরানুকরণপ্রিয় বিলাসী দুর্ব্বল ভীরু, জাতীয় গর্ব্ব শূন্য একতাহীন এক অদ্ভুত জীব। এরা সমাজকে ভালেবসে নিজের সমাজ ব'লে সংস্কার কর্ত্তে চায় না। বহুকালগত সমাজের প্রকৃত আচার ব্যবহার জান্‌তে চায় না। ইংরাজ বা ইউরোপী যে যে দোষ তাঁদের চক্ষে দেখেন—সেই বুলি এঁরা আওড়ান, আর দেশকে গালাগাল দেন। আর এদেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা চলিত হ'য়েছে—তাতে তো এদেশীয় আদর্শ কিছু নেই। আর আমরা মনে মনে এঁচে রেখেছি—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কথা শুনে—যে ধর্ম্ম আমাদের পতনের প্রধান কারণ। ধর্ম্মে নাকি আমরা কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিচ্ছি, পৌরোহিত্যকে, ব্রাহ্মণত্বকে প্রশ্রয় দিচ্ছি, আর মন্দিরে গিয়ে পৌত্তলিকতার উৎসাহ দিচ্ছি। প্রটেষ্টাণ্ট্ ইউরোপীয় এক কথা ব'লে তাঁদের দেশের মধ্যযুগের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করেন যখন রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের এই দোষগুলির বিরুদ্ধে লুথার দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা কর্লেন। কিন্তু ভারত—ভারত, ইউরোপ—ইউরোপ! যাঁরা ইউরোপের আদর্শ ধ'রে ভারতের বিচার কর্ব্বেন তাঁরা ভুল দেখবেন, আবার ভারতের আদর্শে ইউরোপকে দেখতে গেলে ভুল দেখা হবে। দুটী স্বতন্ত্র সভ্যতা, তাই তাদের গতি বিভিন্ন, প্রকাশ বিভিন্ন, আদর্শ বিভিন্ন।

যাঁরা সংস্কারক হবেন, তাঁদের স্বদেশপ্রেমিক হওয়া চাই। মৌখিক নয়—আন্তরিক।

আমি। এখন যাঁরা স্বদেশ-হিতৈষী সংস্কারক, তাঁরা কি আন্তরিক নন?

গিরিশবাবু। দুঃখের সঙ্গে ব'লবো—না। ভাব-বিলাসী ভাবে দেশকে ভাল-বাস্‌লে চলবে না। খাঁটী ভাবে দেশকে ভালবাসা চাই।

আমি। তাঁদের দেশপ্রেম আন্তরিক নয় কেন বলছেন?

গিরিশবাবু। কারণ তাঁদের whole outlook European। ভারতীয় ভাবের সাধনা নেই, ভারতের শাস্ত্র, ভারতের ঋষি ভারতের জাতীয় জীবন গতির সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। যদি তা থাক্‌তো তবে নিজের জাতের নিজের শাস্ত্রের নিজের ধর্ম্মের নিন্দা কর্ত্তো না। তারা প্রাণ দিয়ে চেষ্টা ক'র্ত্তো বুঝতে, কোথায় কোন্ গলদ্ প্রবেশ ক'রেছে, কেমন ভাবে উচ্চ আদর্শ বিকৃত হ'য়েছে, কেমন ক'রে এই আবর্জ্জনাকে দূর করা যায়। আজকালকার সংস্কার—অতি স্থূল কথা, বাহ্যিক কথা নিয়ে টানাটানি কর্চ্ছে।

আমি। কোন্‌টা স্থূল কথা?

গিরিশবাবু। সব ক'টাই। সংস্কারকদের বুলি জাতিভেদ তুলতে হবে, স্ত্রী স্বাধীনতা দিতে হবে, বাল্য বিবাহ ওঠাতে হবে, বিধবা বিবাহ প্রচলন ক'র্ত্তে হবে, বামুন পণ্ডিতকে গলাধাক্কা দিয়ে ভারতের বাইরে ফেলে দিতে হবে, মন্দির বিগ্রহ ভেঙ্গে দিতে হবে—এই তো আধুনিক তন্ত্র, না আর কিছু?

আমি। হাঁ! কিন্তু এই সংস্কারগুলি কি আবশ্যক নয়?

গিরিশবাবু। আবশ্যক অনাবশ্যকের কথা হ'চ্ছে না এইগুলি অত্যন্ত বাজে কথা। যে দোষগুলি ব'ল্‌ছো তা অনেক স্বাধীন জাতের ভিতরও ছিল। এখনও আছে। এই নিয়ে জাতের ছোট বড় বিচার হয় না।

আমি। কেন, ধরুন জাতিভেদ? এ তো আর কোনও দেশে নেই।

গিরিশবাবু। কে বল্লে? কোন্ দেশে নেই, তাই আগে বল? এই মাত্র ব'ল্‌তে পার ঠিক বামুন শূদ্র ক'রে নেই, অন্য ভাবে আছে। মানুষের ভিতর যতদিন দম্ভ অভিমান আছে, যতদিন স্বার্থপরতা, ক্ষমতা-প্রিয়তা, লোকমান্য প্রতিষ্ঠার, যশোলিপ্সা আছে—ততদিন এই বৈষম্য, এই বিভাগ থাক্‌বে। স্বভাবের গতিতে শ্রেণীবিভাগ আপনি হ'য়ে পড়ে। যদি প্রকৃত দেশপ্রেমিক সংস্কারক হও, তবে আগে বিবেচনা ক'রে দেখ্‌বে যে কি আদর্শে ঋষিরা এই বর্ণবিভাগ সৃষ্টি ক'রেছিলেন, কি প্রণালীতে তা চালিত ক'রেছিলেন, কি আদর্শে তা গঠিত হয়েছিল। কি কি কারণে দেশ কাল পাত্রের নিয়মে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে, কোন্ কোন্ বিজাতীয় বিদেশীর সংস্পর্শে বর্ণবিভাগের আদর্শ সঙ্কীর্ণ হয়েছে।—বর্ত্তমান কালে এই বর্ণবিভাগ তুলে দেওয়া সম্ভব, অথবা তার নূতন আকার দিয়ে নূতন উদার ভাবে তাকে পুনর্গঠন ক'র্ত্তে হবে। এইগুলি কে বিবেচনা করে? বিচার ক'রে, নিজের ভাবে নিজের sentiment-এ carried হ'য়ে নয়—প্রকৃত বুদ্ধিমানের মত বিবেচনা ক'রে কেউ এ বিষয়ে আন্দোলন করে নি। শুধু আড়াআড়ি। গোঁড়ারা বলেন যা আছে সব ভাল, আর সংস্কারকেরা বলেন যা আছে সব মন্দ—সব ধ্বংস ক'র্ত্তে হবে। দুই পক্ষে উত্তেজনা থাক্‌তে পারে। প্রকৃত দেশপ্রেম থাকে অনেক দূরে। ধর, স্ত্রীস্বাধীনতা। ক'জন স্ত্রীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন? শুধু স্বাধীনতা স্বাধীনতা ব'ল্‌লে কি হবে? স্বাধীনতারও শিক্ষা আছে, নিয়ম প্রণালী আছে। তা না হ'লে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায়। এখন এই শিক্ষা কি? ভারত ও ইউরোপ এই দুইটী জাতির সম্মিলন ঘটেছে। খৃষ্টান ইউরোপ কোন্ সভ্যতা, কোন্ শিক্ষার আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে তার জাতীয় পতাকা উঁচু ক'রে তুলেছে? বিচার ক'রে দেখ। সেই শিক্ষা আমাদের আরও ক'র্ত্তে হবে নরনারী নির্ব্বিচারে। আমাদের সনাতন আদর্শ ত্যাগ ক'রে নয়, আমাদের সনাতন আদর্শের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিতে হবে। ভগবানের ইচ্ছায় এই সম্মিলন—ঠিক তা পূর্ণ না হ'লে এর হাত কেউ এড়াতে পার্ব্বে না।

আমি। ইউরোপের সে আদর্শ কি?

গিরিশবাবু। Morality। নীতিবাদী ইউরোপের

সঙ্গে ধর্ম্মভূমি ভারতের মিলন। Morality and religion এর মিলন। কিন্তু দুইটীর ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা। যীশুখৃষ্টের আধ্যাত্মিক জীবনের উত্তালতরঙ্গে সমগ্র ইউরোপ আন্দোলিত হ'য়েছে—তার প্লাবনে শত শত শতাব্দীর আবর্জ্জনা সংস্কার দূর হ'য়েছে—সেই বন্যায় ইউরোপে যে মৃত্তিকাস্তর প'ড়েছিল তাতে উদ্ভূত হ'ল নীতি। তার হিল্লোলে সমগ্র ইউরোপীয় চরিত্র নীতিবিদ্ হ'লো। এই Moralityর সাহায্যে তাঁরা আধ্যাত্মিক অনুভূতি ক'র্ত্তে লাগ্‌লেন। কিন্তু অভাব ছিল ধর্ম্মের, ধর্ম্মানুষ্ঠানের, যা ভারতীয় শিক্ষার মূল।

আমি। ধর্ম্ম আর আধ্যাত্মিকতা কি এক বস্তু নয়?

গিরিশবাবু। না। তবে আমরা অনেক সময়ে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে এক ক'রে গুলিয়ে ফেলি। ধর্ম্ম আমাদের ঈশ্বরমুখীন্ করায়। ভগবানের জন্য তপ, জপ, ধ্যান ধারণা। ভগবানের সেবা পূজা, বারব্রত উপবাস, যত প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন, যোগযাগ, নিরাহার পঞ্চতপা—এই সব ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই সকলের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোনও সম্পর্ক নাই।

আমি। এই ভাবটা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। এইগুলোই তো আধ্যাত্মিকতা?

গিরিশবাবু। একদম নয়। মনে কর একজন নিয়মিতভাবে বিগ্রহসেবা কর্চ্ছে, জপ ধ্যান ক'র্চ্ছে। কিন্তু যদি তার স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগে তবে তা সে সহ্য ক'র্ত্তে পারে না। হরিনাম ব'লতে চ'খে জল ঝ'রে যায়, ভগবৎপ্রেমের কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আত্মহারা হ'য়ে যায়, কিন্তু সাম্‌নে মানুষ না খেয়ে ম'র্‌ছে, কি রোগে ভুগ্‌ছে—তা আদৌ লক্ষ্য নেই। এমন লোক দেখেছি দুর্গা প্রতিমার আরতির সময়ে 'মা' 'মা' ক'রে সত্যি সত্যি চ'খের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে, অতি সরলভাবে ভক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে পূজো ক'র্‌ছে, কাঙ্গালী ভোজন, অতিথিসেবা আছে; অথচ আদালতে মিথ্যে সাক্ষী দিতে, কি কারুর জমী ছিনিয়ে নিতে, কি টাকা ঠকিয়ে নিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। ডাকাতেরা ডাকাতি ক'র্ব্বার আগে হয়তো কালীপূজো ক'রে বেরোয়—এইগুলো আধ্যাত্মিকতা নয়।

আমি। এই সব তো মিথ্যাচার, কপটাচার, ভণ্ডামী।

গিরিশবাবু। ঠিক তা নয়।—তারা যা করে তা সরল নিষ্ঠা ভক্তির সঙ্গেই করে—তা তো মিথ্যা কপটতা ভণ্ডামী নয়। দেখ, ঘরকন্নার ব্যাপারে স্ত্রী জানে স্বামী দেবতা—স্বামীর উচ্ছিষ্ট ভক্তি ক'রে খাবে, স্বামীকে না খাইয়ে নিজে কিছু দাঁতে কাঁট্‌বে না, স্বামীকে একান্তভাবে ভালবাসে, পরের মুখে স্বামীর নিন্দে শুনে কোন্দল করে আস্‌বে। কিন্তু সেই স্বামীর ত্রুটি পেলে মুখের ঝালে বিষ ঝাড়্‌বে, হয়তো খেংড়া নিয়ে তেড়ে যাবে। এখানে সে স্ত্রী সতী হ'য়ে সতীধর্ম্ম পালন কর্ত্তে পারে, কিন্তু সতীত্বের যে আধ্যাত্মিকতা আছে, সতীত্বের যে divinity and spirituality সীতা সাবিত্রীর চরিত্রে পরিস্ফুটভাবে দেখা যায়, তা এখানে নিতান্ত অভাব। এইখানে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রভেদ।

আমি। কিন্তু আপনি ব'লেছেন যে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর ধর্ম্ম স্থাপিত।

গিরিশবাবু। তাতো বুঝতেই পাচ্ছো! বড় বড় মহাপুরুষ কিংবা প্রতিভাশালিনী মহীয়সী নারী তাঁদের আধ্যাত্মিক আদর্শ জীবনে যা দেখিয়ে যান তাতেই একটা সমাজ বা জাতির আদর্শ গ'ড়ে ওঠে। সেই আদর্শকে ঘিরে ভক্তির আবহাওয়ায় একটা সংস্কার জন্মে যায়। সেই আদর্শের অনুভূতি সমাজে বা জাতের মধ্যে যতটা ব্যাপক হ'য়ে ওঠে, সাধারণের ভিতর সেই সংস্কার ততটা দৃঢ়ীভূত হয়। সীতা সাবিত্রীর আদর্শে ভারতবর্ষে এত বড় বড় সতী নারী জন্মগ্রহণ করেছেন যে ভারতের আবাল বৃদ্ধ নারীই সতীত্বের নামে মাথা নামায়। সতীত্ব যে কথার কথা, বাজে জিনিষ নয়, সেটা যে একটা সত্যিকার বস্তু, তা হিন্দু মেয়ের একটা অটল সংস্কার হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু তাও ব'ল্‌ছি—এই যে সংস্কার তা এক দিনে হয় নি। হিন্দুর পারিবারিক শিক্ষা দীক্ষা এর মূল। ঠাকুরমা, দিদিমা, মা, মাসি, পিসি, দিদি ক্রমাগত শুধু মুখে নয়, জীবন দিয়ে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। সেই শিক্ষাই ছিল ধর্ম্ম শিক্ষা। হিন্দুপরিবার ছিল এই বিষয়ের একটা শিক্ষা মন্দির। ধর্ম্ম জিনিষটা হ'চ্ছে ঈশ্বরমুখী—ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে একটা সম্বন্ধ আছে, তার কল্পনার নাম ধর্ম্ম। সেই সম্বন্ধ স্মরণ করাবার যে সব

ক্রিয়া কলাপ করা যায় তা ধর্ম্মানুষ্ঠান—আর ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের অনুভূতির নাম আধ্যাত্মিকতা। এই সম্বন্ধের অনুভূতি বিশেষভাবে প্রকাশ হয়েছে যুগাচার্য্য অবতার পুরুষদের দ্বারা। তাঁদের অনুভূতিকে অবলম্বন ক'রে ভক্ত-হৃদয়ে যে সংস্কার বদ্ধমূল হয়—তাই ছড়িয়ে যায় সমস্ত সমাজের ভিতর, সমস্ত জগতের ভিতর। সেই সংস্কার থেকেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। এই ধর্ম্মের যখন গ্লানি হয় তখন অবতার পুরুষ আবির্ভূত হন ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য। এই ধর্ম্মের দ্বার দিয়েই আবার আধ্যাত্মিকতার মণি-মন্দিরে প্রবেশ কর্ত্তে হয়।

আমি। নীতি বা morality'ও ব'লেছেন আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর স্থাপিত—তা কি ক'রে হবে ?

গিরিশবাবু। মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের জ্ঞানই নীতিবাদের মূল। যীশু খ্রীষ্ট এই নীতিবাদের বিশেষ প্রচার করে গেছেন।

"Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you and pray for them which dispitefully use you and persecute you."

"Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."

ঈশ্বরের পিতৃত্ব, মানুষের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব খ্রীষ্টীয় নীতির আসল তত্ত্ব। এই নীতির উপর ভিত্তি ক'রেই খ্রীষ্টীয় সভ্যতার বিকাশ ও প্রচার হয়েছে। শুধু তাই নয়—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিশেষ সম্বন্ধ তাও এই নীতিবাদ শিখিয়েছে। শান্তি ও সুখ নীতিবাদের উদ্দেশ্য। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ যখন তার সম্বন্ধ খুঁজতে গেল—তখন সে সন্ধান পেলে বিজ্ঞানের। নীতিবিদ্ তাই জীবসেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, বিদ্যাহীনকে বিদ্যাদান, দরিদ্রকে ধনদান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুললেন। সামাজিক আচার ব্যবহারে মানুষ মানুষের সহায়তা কর্ত্তে লাগলো—কেন না মানুষ এক পরম পিতা ঈশ্বরের সন্তান—সকলেই ভ্রাতৃত্বের স্নেহ-কোমল সূত্রে গাঁথা। ইউরোপের সাহিত্য সমাজ, আচার ব্যবহার এই moralityর প্রভাবে রূপান্তরিত হ'ল। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ এই নীতির সম্বন্ধ। যীশু তাই পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রথম যে বাণী প্রচার ক'রেছিলেন—তাতে প্রথমেই নারীর প্রতি ব্যভিচার সম্বন্ধে কঠোর আদেশ কর্লেন। তিনি প্রথমে বল্লেন, পুরাকালে মহাপুরুষেরা বলে গেছেন ব্যভিচার কোরো না। কিন্তু "I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart." স্ত্রীলোকের প্রতি সতৃষ্ণ কাম-দৃষ্টিও ব্যভিচারের নামান্তর—যীশু এই বাণীর দ্বারা স্ত্রী-জাতিকে শ্রদ্ধা কর্ত্তে শিক্ষা দিলেন। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে হ'লে পুরাকালে আইন ছিল, স্বামী তা লিখে তার স্ত্রীর হাতে দেবেন। সেই লিখিত দলিলের জোরে পরিত্যক্তা স্ত্রী অপরের পত্নী হ'তে পারতো। কিন্তু যীশু বল্লেন "I say unto you that whosoever shall put away his wife for the cause of fornication, causeth her to commit adultery and whosoever shall remarry her that is divorced, committeth adultery." যীশুর এই বাণীর নূতন আলোকে সেণ্ট পল নর-নারীর সম্বন্ধ প্রচার করলেন। তিনি সবার চেয়ে ব্রহ্মচর্য্যকে প্রধান আসন দিলেন। It is good for a man not to touch a woman। কিন্তু এই আদর্শ সংযমের পাছে ব্যতিক্রম হয়, তাই তিনি বিবাহের বিধি দিয়েছিলেন। তখন বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেণ্টপল প্রচার কর্লেন—"The wife is bound by the law as long as her husband liveth, but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will ; only in the Lord, But she is happier if she so abide after my judgment ; and I think also that I have the spirit of God." সেণ্টপলের প্রচারের ফলে খ্রীষ্টান ইউরোপে সন্ন্যাস সন্ন্যাসিনীর শত শত মঠ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। সমগ্র খৃষ্টান জাত মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায্য ব্যবহার করবার জন্য মেতে উঠলো—সহস্র দুর্ব্বলতা আদর্শচ্যুতির মধ্যেও খ্রীষ্টান নীতি প্রবল ভাবে সমগ্র ইউরোপীয় জাতের মধ্যে ফুটে উঠলো। তার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ-নীতি, রাজ-নীতির মূল ভিত্তি এই morality। সাহেব বিবির পরিণয়ের প্রতিজ্ঞার চুক্তিতে এই নীতি প্রকটিত। মেম-সাহেব তাঁর স্বামীকে যত্ন করেন তাঁকে সর্ব্বতোভাবে সুখী কর্ব্বার জন্য। বাবুর্চ্চি খানসামা

রেখে খুব কম ইউরোপীয় গৃহস্থ চলতে পারে। প্রায় গৃহে মেম-সাহেব নিজে বাজার করেন, রান্না করেন, ঘর-দ্বার পরিষ্কার করেন, কাপড়-চোপড় ধবধবে রাখেন। ধবধবে টেবিলে বসে স্বামীর সঙ্গে আহার করেন, কিন্তু সর্ব্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাঁটা চামচে দিয়ে স্বামীকে পরিবেষণ কর্চ্ছেন। পুত্র-কন্যাকেও হাসিমুখে আহার পরিবেষণ কচ্ছেন—মূল দৃষ্টি যাতে স্বামী তৃপ্তি পান। মেম-সাহেব নিজের হাতে ফুল দিয়ে তোড়া বেঁধে ঘর সাজান—স্বামীর প্রীতির জন্য। মেম-সাহেব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হন স্বামীকে আনন্দ দিতে। এই যে moralityর শিক্ষা—এই নীতি আমাদের ধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। এই যে নৈতিক আদর্শ ও নৈতিক সভ্যতা—যা সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূল—তা আমাদের গ্রহণ কর্ত্তে হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমরা বিচার ক'রে গ্রহণ ক'রে মানানসই করে নেব। এইখানটা আমাদের ইউরোপের কাছে শিখতে হবে। কিন্তু ইউরোপ শিখবে আমাদের কাছে ধর্ম্ম। কি ভাবে মানুষ তার সমুদয় আবহাওয়াকে ভগবদ্‌ভাবে অনুরঞ্জিত ক'র্ব্বে, কি ভাবে মানুষ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন কর্ব্বে, সমগ্র মানবজাতি, সমগ্র পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব-জগৎ কেমন ক'রে এক সূত্রে গাঁথা রয়েছে—তা ইউরোপ শিখবে ভারতের কাছে। এই দুইয়ের পূর্ণ মিলন যখন হবে—তখন জগতের আধ্যাত্মিকতার প্রবল তরঙ্গ উঠবে—প্রেম ও শান্তির হিল্লোলে সবাই আন্দোলিত হবে।

আমি। নীতিবাদ্ যে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর স্থাপিত তা তো বুঝলাম না।

গিরিশবাবু। আধ্যাত্মিকতার ধারণা তোমার কি? আধ্যাত্মিকতা বল, spirituality বল—তা communion with God। ঈশ্বরের অহেতুকী দয়া ও ভালবাসা নীতিবাদী খৃষ্টান জগৎ ভোলে নি। যীশুর সেই অভয় বাণী স্মরণ কর "Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin."

"And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to-day is and tomorrow is cast in the oven, shall He not much more clothe you, oh ye of little faith!"

কি সুন্দর অভয়-বাণী! "Much more clothe you" এই গুলি নীতি নয়, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা!

"The spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God."

"And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ" সেণ্টপলের এই উক্তি আধ্যাত্মিকতার অনুভূতি। এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির ফল খ্রীষ্টীয় নীতিবাদ।—বুঝেছ?

আমি। আজ্ঞে হাঁ! কিন্তু এই moralityর উপর কি ইউরোপীয় রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি?

গিরিশবাবু। আমার outlook তো তাই। বর্ত্তমান যুগে religion এবং moralityর সম্মিলন আবশ্যক। স্বামীজি তাই ইউরোপে religion and spirituality দিতে গিয়েছিলেন বেদান্তের ভিতর দিয়ে। এই বেদান্ত সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শে। আর আমাদের দেশে স্বামীজী প্রচার কর্লেন আধ্যাত্মিকতা-ধর্ম্ম ও নীতির সমন্বয়। কিন্তু এই তত্ত্ব স্বামীজি দিয়েছেন সহজ ভাবে—আধ্যাত্মিকতার গাঢ় রঙে অনুরঞ্জিত করে'—উজ্জ্বল জীবন্ত রূপে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলনের বীজ স্বামীজি দিয়ে গিয়েছেন। কালে তাই ফল ফুলে মণ্ডিত মহা বৃক্ষরূপে পরিণত হবে।

আমি। কিন্তু দেশের তো সংস্কার কর্ত্তে হবে?

গিরিশবাবু। মনে নেই স্বামীজি বলে গেছেন শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! শিক্ষা দাও। শিক্ষার প্রচার কর, আপনি যেখানকার যা সংস্কার হ'য়ে যাবে!

আমি। আপনি তো পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষার বিরোধী!

গিরিশবাবু। আমি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী নই। কোন শিক্ষাই নিন্দনীয় নয়। তবে শিক্ষা দেবার প্রণালী ঠিক হওয়া চাই, তবে শিক্ষা ঠিক হয়, জ্ঞান সহজে আয়ত্ত হয়। ইউরোপে শিক্ষা প্রণালী যে ভাবে যে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে, যে জাতীয় চরিত্রের উত্থান পতনে উদ্ভূত হয়েছে, বিদেশী বিজাতীয় ভারতবাসীর তা উপযোগী না হতে

পারে। ভারতীয় শিক্ষার প্রণালীর সঙ্গে মিল রেখে ইউরোপীয় শিক্ষা চলিত হলে ভারতবাসীর জ্ঞান ভাণ্ডার যথার্থ ভাবে পূর্ণ হবে। মনে কর নারীর শিক্ষা শুধু সেকেলে রাখ্‌লে চলবে না, বর্ত্তমান যুগোপযোগী তা করে নিতে হবে। সে বর্ত্তমান যুগ বলতে ইউরোপীয় ভাব নয়—ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্মের সঙ্গে খৃষ্টীয় নীতি শিক্ষা। বর্ত্তমান পাশ্চত্য শিক্ষার মূলে আছে morality বা নীতি—তা আমাদের আয়ত্ত কর্ত্তে হবে, আর সঙ্গে ঘরে ঘরে ভারতীয় সনাতন আদর্শের শিক্ষা দিতে হবে। এই শিক্ষা দিলে নারী তখন আপনার অধিকার দাবী কর্ব্বে, নারীই তখন নারী জাতির সংস্কার কর্ব্বে—পুরুষের ইঙ্গিতে তা চালিত হবে না। প্রকৃত শিক্ষা পেলে ভারতবাসী বুঝতে পার্ব্বে জাতিভেদ থাকবে কি যাবে, থাক্‌লে এখনকার মত থাক্‌বে, না আমূল পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে, পৌরোহিত্য থাকা দরকার, না একেবারে বর্জ্জন করা প্রয়োজন। তবে এইগুলি প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক শিক্ষিত ভারতবাসী বিচার কর্ব্বে। স্বামীজিও এই কথাই বলে গেছেন। ইউরোপীয়রা বলেছে বলে ওগুলো বর্জ্জনীয়, না তোমার বিচার বুদ্ধি বর্জ্জনীয় বলছে? সে বিচার-বুদ্ধি স্বামীজি বল্‌তেন শুধু খাজা আহাম্মকের মতো হলে হবে না। সমস্ত দেশটা ঘুরে ফিরে সমাজকে আগা পাস্তলা দেখে, শাস্ত্র পুঁথি তন্ন তন্ন করে প'ড়ে—তারপর বিচার দৃষ্টিতে দেখ। যদি দোষ দেখতে পাও, তবে তার প্রতিকার কর্ব্বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। যাঁরা বাক্যবীর, তাঁরা শুধু তাঁদের বাহাদুরী দেখাবার জন্য দেশকে জাতকে গালাগালি দিয়ে পরের কাছে বাহবা নিতে চান। কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেমিক তা কর্ব্বেন না। তিনি হিমালয়ের মত শান্ত গম্ভীরভাবে, সমুদ্রের মত বিশাল হৃদয় নিয়ে প্রতিকার কর্ব্বেন। সেই সংস্কারকের পথ দেখিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বাণী ধ্যান কর চিন্তা কর, কার্য্যে পরিণত কর্ব্বার চেষ্টা কর। ভারত যত শীগ্‌গির তা কর্ব্বে ততই তার উন্নতি দ্রুতগতিতে চলবে। এটা ভুললে চলবে না এটা সমন্বয়ের যুগ—শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ মহাপ্রেমের যুগ!

গিরিশবাবু নীরব হইলেন। পরে অন্যান্য প্রসঙ্গের পর রাত্রি ১২ টার সময় বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন।

তৃতীয়া কন্যার শুভাগমে

কম্পমান সুখস্বপ্ন ক্রমে ক্রমে জমিয়া জমিয়া,
ভূমিষ্ঠ হয়েছে ধরি' কমনীয় রমণীয় রূপ!
কন্যা হেরি সারা বাড়ী আছে করি একেবারে চুপ!
বহির্গৃহ হতে যেয়ে পশিলাম মস্তক নমিয়া।
'এবারো তোমার কন্যা!' কহে মাতা ঈষৎ দমিয়া
'দুঃখ কি, মা, উলু দাও! নারী নহে নরকের কূপ!
আনন্দে ফুকারো শঙ্খ! লক্ষ্মী এ যে! জ্বালো গন্ধধূপ!'
'এ যে মোর অশ্রুকণা!' পত্নী কহে বরষি' অমিয়া।
বর্ণবর ব্রাহ্মণেরা, বঙ্গে বর-বিক্রয় ব্যবসা,
কাঞ্চন কৌলীন্যে করি করিছে কি কঠোর কলুষ!
পুত্র তাই চিরপ্রিয়, আজীবন কন্যার দুর্দ্দশা!
নারীকে নরক ভাবি ধ্বংসপ্রায়, তবুও বেহুঁস।
মর্ত্ত্যে স্বর্গ রাখে ধরি পেতে নারী মোহনিয়া ফাঁদ;
এসো এসো ত্রয়ী কন্যা! শুক্লপক্ষে চতুর্থীর চাঁদ!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সহজিয়া মত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

খৃঃ ৮ম হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এদেশে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বড়ই প্রভাব ছিল। শাক্ত এবং বৈষ্ণব দুইটী হিন্দু সম্প্রদায়েই ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বগুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ অঞ্চলেই বৌদ্ধ এবং হিন্দু তান্ত্রিকগণের সংখ্যাধিক্য ছিল। এই অঞ্চলেই প্রাচীন তান্ত্রিক দেব-দেবীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশের পরিগুদির মধ্যে অনেকগুলিই এই অঞ্চলে বিদ্যমান আছে। সহজিয়া ধর্ম্ম কে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, তাহা জানা না গেলেও ঐ ধর্ম্মটা ৭ম শতাব্দী হইতেও প্রাচীন, তাহা অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মও ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। মহারাজ বল্লাল সেন এবং জয়দেব উভয়েই এই রাঢ় অঞ্চলবাসী ছিলেন। বল্লাল সেন যে নীচ জাতীয়া শূদ্রা রমণী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এই তান্ত্রিকতার ফলে। জয়দেব গোস্বামী যে সহজিয়া ভাবাপন্ন ছিলেন, তাহা তাঁহার অমূল্য কাব্য "গীত-গোবিন্দ" হইতেই বুঝা যায়। এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থেও তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাঁহার শক্তি বা প্রকৃতির নাম পদ্মাবতী বা তাঁহার সহোদরা রোহিণী এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় জয়দেবকে খাঁটি সহজিয়া বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় আমরা বুঝি না। জয়দেব বৌদ্ধভাবাপন্ন শাক্ত এবং বৈষ্ণব ছিলেন, এই মাত্র আমরা বলিতে পারি। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু জয়দেব তাঁহার প্রধান সভাসদ থাকায় মনে হয় যে তিনি সহজিয়া ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না। তাঁহাদের পর আমাদের প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের আবির্ভাব। দুইটী চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" সম্বন্ধে যে সকল বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ উক্ত গ্রন্থের রচনা-কাল ধরিয়া লইলে, দেখা যায় যে ৩ জন চণ্ডীদাস বিদ্যমান ছিলেন। "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" রচয়িতা চণ্ডীদাস (১) কবি বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাঁহার সময়ে জীবিত থাকাও অসম্ভব নহে। তিনিই আদি চণ্ডীদাস বাশুলীগণ। তিনি শাক্ত এবং বৈষ্ণব উভয়ই ছিলেন, এবং বৌদ্ধ সহজিয়া ভাবও তাঁহার মধ্যে ছিল। তাঁহার বাশুলী শক্তি হইয়াও বৈষ্ণবী, এবং শ্রীকৃষ্ণকে "গুরু" বলিয়াছেন। দ্বিতীয় চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ হুসেন সাহের রাজত্ব কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার আনুমানিক সময় ১৩৪৫—১৪৮০ খৃঃ। তিনি নান্নুরবাসী, রামী রজকিনী তাঁহার প্রকৃতি। গোবিন্দদেব বা দাসের মতে তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান। রায়শেখরও তাঁহাকে দ্বিজকুলইন্দু বলিয়াছেন। তাঁহার পদবলী অতি মধুর, বিদ্যাপতি ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার পদাবলী শুনিয়া চৈতন্য মহাপ্রভুও বিভোর হইয়া যাইতেন কথিত আছে। "সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়" এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহাকে বিদ্যাপতির অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রামীর নামও নাই, নান্নুরের নামও নাই (সা, প, প, ১৩২৬, ২সং, ৮৪ পৃঃ শাস্ত্রী মহাশয়ের "চণ্ডীদাস" প্রবন্ধ)। তাহার পদাবলীতে প্রথম চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির প্রভাব দৃষ্ট হয়। তিনি যে সহজিয়া ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। তিনিই গৌড়েশ্বরের রাণী বা বেগমের প্রেমে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। তিনিই বোধ হয় বড়ু চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস (২)। তৃতীয় চণ্ডীদাসের কথা আমরা পরে বলিব। বড়ু উপাধি এই সময়েই দেখিতে

১। ইঁহার প্রকৃত নাম অনন্ত,—চণ্ডীর সেবক বলিয়া বোধ হয় "চণ্ডীদাস" নামে পরিচয় দিয়াছেন।

২। এই চণ্ডীদাসের বন্দনাই নরহরি সরকারের ঠাকুর রচিত। (ভারতবর্ষ ১৩৩৩, পৌষ, ১৩৯ পৃঃ)। তরুণী রমণ তাঁহারই উল্লেখ করিয়াছেন (ঐ, ১৪০ পৃঃ)

পাই। গৌরীদাস পণ্ডিতের পুত্র "বড়ু বলরামা", বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে "রাঙ্গা বড়ু রামভদ্রের" উল্লেখ আছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু যে সহজিয়া অনুরাগী ছিলেন, এরূপ অনুমানও নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। নানা বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহাদের সহজিয়া ভাবের উল্লেখ আছে।

"নিতাই কহেন তুমি ভরসা কর মনে।
চৈতন্য লেখাবে তোরে আসিঞা আপনে॥"
"চৈতন্যের গূঢ় তত্ত্ব স্বরূপ গোসাঞি জানে।
রঘুনাথে শিখাইল করিঞা যতনে॥"—অমৃতরসাবলী
"ঋষি কন্যা ধন্যা সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
যাহাতে চৈতন্যচন্দ্র সদাই বিহরে।"
চৈতন্য-প্রেমতত্ত্ব নিরূপণ।

"রসভাব প্রাপ্ত" গ্রন্থেও এইরূপ উক্তি আছে।

নিত্যানন্দ প্রভুর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "অমৃত-রসাবলীতে" অন্যত্র লিখিত আছে—

"দিবা-রাত্রি বঞা গেল কিছুই না জানে।
আপনে নিতাই আসি কহিলা স্বপনে॥"

নিত্যানন্দ প্রভু রাঢ়বাসী ছিলেন, তিনি দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী। তিনি যে সহজিয়া ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই। তিনি অবধূত গোঁসাঞি নামেও পরিচিত। তিনি যে যোগশাস্ত্র কথিত প্রণালীতে সাধনা করিতেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, সহজিয়াদিগের মধ্যে সাধকদের "অবধূত" উপাধি দেখা যায় (সাঃ পঃ পঃ, ১৩৩৩, ১সং, ১৩৯ পৃঃ)। ইহা দৃষ্টেও তাঁহাকে সহজিয়া বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার সহজিয়া ভাবের জন্যই বোধ হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতা শ্যামদাস তাহার নিন্দা করিতেন, তাহাতে নিত্যানন্দ-ভক্ত রামদাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন, এবং তিনি কবিরাজ গোস্বামীর নিকট অভি-যোগ করিলে গোস্বামী তাঁহাকে ভৎর্সনা করেন। চৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ব্বে জ্ঞানবাদী ছিলেন, পরে গোপীভাবে উন্মত্ত হন। এই পরিবর্ত্তনের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, কিন্তু তাহা জানিবার উপায় নাই—নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গ গুণে তাঁহার সহজিয়া ভাব পুষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। "সিদ্ধি-পটল" গ্রন্থে লিখিত আছে—চৈতন্য মহাপ্রভুর সিদ্ধি নাম মনোহর, সাধ্য নাম নায়ক চূড়ামণি ও নিত্যানন্দ প্রভুর সিদ্ধি নাম চক্রবিম্ব, সাধ্য নাম লীলাবিম্ব। স্বরূপ দামোদরের কথা অমৃতরত্নাবলীতে আছে—তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং তাঁহাকে সহজ তত্ত্ব শিক্ষা দেন। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ছিলেন। রামানন্দ রায়ও মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। উভয়েই সহজিয়া ছিলেন। রামানন্দ রায় (৩) "চৈতন্য-প্রেমতত্ত্ব নিরূপণ" গ্রন্থের রচয়িতা। রামানন্দ রায় সম্বন্ধে "রসভাব প্রাপ্ত" গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

"রামানন্দ রায় মহাশয় সভে জানে।
মহাপ্রভুর স্মরণ ইৎসা হইল যার স্থানে॥
তিঁহো দেবাঙ্গনা সহ রসের বিলাস।
তিঁহো সে হইল তার রসের নির্য্যাস॥"

রামানন্দ রায়ের বংশোদ্ভব মনোহর দাস "দীনমণিচন্দ্রোদয়" গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিও সহজিয়া।

ষট্‌ গোস্বামীর সকলেই যে সহজিয়া ভাবে ভজনা করিতেন, তাহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। বৃন্দাবনে সকলেই যে গোপনে সহজিয়া ভাবে উপাসনা করিতেন, তাহা তৎকালের এবং তৎকালের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত আছে। "রসভাবপ্রাপ্ত" গ্রন্থ মতে মীরাবাই রূপ গোস্বামীর প্রকৃতি এবং অন্যান্য গোস্বামী মহাশয়দিগের গুরু ছিলেন। মীরাবাই যে গোপীভাবে উন্মত্তা ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহার প্রেম ভাবে যে গোস্বামিগণ আকৃষ্ট হইবেন তাহা অসম্ভব ব্যাপার নহে। রূপ গোস্বামীর উল্লেখ "অমৃত-রত্নাবলী," "স্বরূপ বর্ণন" প্রভৃতি বহু গ্রন্থে আছে। এক খানি গ্রন্থে তাঁহাকে "শুদ্ধ রতিতত্ত্বের" মূল দল হইয়াছে। তিনি "রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব নিরূপণ" এবং একখানি কারিকা রচনা করেন। সনাতন গোস্বামীর উল্লেখ "শিক্ষা-পটল" গ্রন্থে আছে। তিনি "সিদ্ধরতিকারিকা" গ্রন্থ রচনা করেন। জীব গোস্বামীর উল্লেখ কৃষ্ণদাস কবিরাজের "রাগময়ী কণাতে" আছে—

৩। কথিত রাছে যে নির্য্যাসতত্ত্বের সাধ্যনির্ণয় সম্বন্ধে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কেয় এক প্রশ্ন করেন। তিনি তাহার উত্তর না দিয়া একটী পদ গান করেন। মহাপ্রভু ঐ পদের নিগূঢ় অর্থ বুঝিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরেন।

"এতেক লক্ষণ কহিলা শ্রীজীব গোসাঞি।
শ্রীরূপ চরণ বিনু গতি যার নাই।
গ্রন্থ রাগময়ী তার চুম্বক করিনু।"

তিনি "রাগমালা", "ব্রজকারিকা", "উপাসনাসার", "নিত্যবর্ত্তমান" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। জীব গোস্বামী সম্ভবতঃ পূর্ব্বে সহজিয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না, পরে মীরাবাই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে বৃন্দাবনে পুরুষ কেহ নাই, সকলেই রমণী, সেই সময় হইতে তিনি সহজিয়া হইয়া উঠেন। গোপাল ভট্টের কোন সহজিয়া গ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর উল্লেখ "গোষ্ঠী কথায়" আছে। "গোষ্ঠী কথা" হইতে অবগত হওয়া যায় যে তিনি "সনন্দসন্দীপিকা" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নাম বহু সহজিয়া গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত সহজিয়া কোন গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইনি রূপ সনাতনের সুহৃদ ছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ(৪) গোস্বামী রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্য। তিনি অনেক সহজিয়া গ্রন্থ রচনা করেন— "স্বরূপবর্ণন", "স্বরাগনির্ণয়", "সিদ্ধিনাম", "রাগময়ী কণা", "শুদ্ধরতিকারিকা", "আত্মজিজ্ঞাসা" (জিজ্ঞাসাতত্ত্ব-সারাৎ-সার), "গুরুশিষ্য সংবাদ", "আশ্রয় নির্ণয়" "রসমঞ্জরী", "আলম্বন চন্দ্রিকা", "রসরত্নাবলী", "দণ্ডাত্মিকা", "গুরুতত্ত্ব" প্রভৃতি। তিনি রূপ গোস্বামীরও ভক্ত ছিলেন। "রূপমঞ্জরী" গ্রন্থখানিও তাঁহার রচিত।

বংশীদাস "দীপকোজ্জ্বল", "নিকুঞ্জরহস্য" এবং "ভজন-রত্ন" রচনা করেন। সম্ভবতঃ, ইনি বংশীবদন ঠাকুর —একজন পদকর্ত্তা। গোপীবল্লভ দাসের খুল্লতাতও বংশী মথুরাদাস ছিলেন।

চৈতন্যদাস "আশ্রয় নির্ণয়", "রসভক্তিচন্দ্রিকা" রচনা করেন। ইনি বংশীবদন ঠাকুরের পুত্র।

যদুনাথ দাস "তত্ত্বকথা" রচনা করেন। ইঁহার উল্লেখ "সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়" গ্রন্থে আছে।

জগন্নাথ দাস "রসোজ্জ্বল", "তিন মানুষের বিবরণ" রচনা করেন। ইনি একজন পদকর্ত্তা। (সা-প-প, ১২২৬, ৪ সং, ২১৪ পৃষ্ঠা)। ইনি গোবিন্দ দাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী (আনুমানিক সময় ১৫৩০-১৫৯০ খৃঃ)। অচ্যুত দাস "গোপী ভক্তিরস গীত" রচনা করেন। সম্ভবতঃ, ইনি অদ্বৈত প্রভুর পুত্র। ইনি কোটবার অচ্যুত পণ্ডিতও হইতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ দাস "মীরাবাই কড়চা" রচনা করেন। ইনি কি বড়গাছী নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ দাস?

লোচন দাস "প্রেমবিলাস" বা "চৈতপ্রেমবিলাস", "দেহনিরূপণ", "আনন্দলতিকা" প্রভৃতি রচনা করেন।

বৃন্দাবনের কথা এবং ষট্‌গোস্বামীদিগের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীনিবাস প্রভু, নরোত্তম দাস ঠাকুর, এবং শ্যামানন্দ কয়েক বৎসর বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহারাও যে সহজিয়া ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া আমাদের বোধ হয় না।

শ্রীনিবাস প্রভুর রচিত কোন গ্রন্থের সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হই নাই বটে, কিন্তু নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার গুণে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহার স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে যদুনাথ দাসের (৫) উল্লেখ আমরা করিয়াছি—সম্ভবতঃ, তিনি মানিহাটী-বুধুইপাড়া-বাসী এবং সহজিয়া। সহজীয়াদিগের মধ্যেই "দীন" প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। তিনিই "রসকদম্ব" প্রণেতা।

গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য। তিনিই "নিগম" গ্রন্থখানি রচনা করেন। এ কথা অনেক বৈষ্ণব মহোদয়ই স্বীকার করেন। তিনি জীব গোস্বামীর প্রিয় ছিলেন—জাহ্নবা দেবীর সহিত বৃন্দাবনেও গিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র দাস "সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা" এবং "স্মরণদর্পণ" রচনা করেন। তিনি নরোত্তম ঠাকুরের বন্ধু ছিলেন, এবং শ্রীনিবাস প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনিই

---

(৪) কৃষ্ণদাস চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—
"তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার।"

৫। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যদুনাথকে কাটোয়াবাসী এবং "সংগ্রহতোষণী"র রচয়িতা বলিয়াছেন। এটী তাঁহার অনুমান কি না জানি না। যদি কাটোয়ার স্পষ্ট উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে আমাদের অনুমান ভ্রমাত্মক।

রামচন্দ্র কবিরাজ নামে খ্যাত, এবং গোবিন্দদাস কবিরাজের ভ্রাতা।

রামচন্দ্র ঠাকুরও (চৈতন্যদাসের পুত্র) রামচন্দ্র দাস হইতে পারেন। তিনিও বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা এবং পিতামহ সহজিয়া ছিলেন। আউলিয়া মনোহরের নাম অনেকেই জানেন। শ্রীনিবাস প্রভু, নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্যামানন্দের সংসর্গেই তিনি এতদূর ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে তিনি "আউলিয়া" নামে পরিচিত হন। কথিত আছে যে তিনি খেতুরীর মহোৎসবে যোগদান করেন। আউল, সহজিয়া সম্প্রদায়ের এক শাখা।

প্রেমদাস গোবিন্দদাসের সখা। সম্ভবতঃ, ইনিই "উপাসনাপটল" ও "আনন্দ ভৈরব" রচনা করেন। এই দুইখানি গ্রন্থ রঘুনাথদাস গোস্বামীর শিষ্য প্রেমদাসের রচিতও হইতে পারে। তিনি "মনঃশিক্ষার" অনুবাদ করিয়াছিলেন।

নরোত্তম ঠাকুর "চমৎকার চন্দ্রিকা" "ভক্তিকল্পলতিকা" বা "ভক্তিলতিকা," "সারাৎসার কারিকা", "প্রেম বিলাস", "তত্ত্বনিরূপণ", "অমৃত রসচন্দ্রিকা" "সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা" "দেহকড়চ", "নাগমালা", "শিক্ষা পটল", উপাসনা পটল", "প্রেমভাবচন্দ্রিকা", "স্মরণমঙ্গল" প্রভৃতি রচনা করেন। অপর কোনও নরোত্তম দাসের সংবাদ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এগুলি যে নরোত্তম ঠাকুরে রচিত নহে, এই অনুমান অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয়।

দীন চণ্ডীদাস নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ইনি "চৈত্যরূপ প্রাপ্তি," "শ্রীনির্য্যাস" রচনা করেন। "গীতিকাব্য" "শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা", "রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন", "রাগাত্মিকা পদ", চৌতিশা পদ" বা "চিত্ররত্নাবলী", "নরোত্তম বন্দনা" প্রভৃতিও রচনা করেন। "সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে" ইঁহার উল্লেখ নাই, তাহাতে বোধ হইতেছে ইনি মুকুন্দদেব গোস্বামীর কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী। এই গ্রন্থখানি অনুমান ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রচিত। "চৈত্যরূপ প্রাপ্তি"তে রজকিনী এবং দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে—"জিহ রজকিনী তিহ রাগময়ী জিহ চেতনরূপ তিহ চণ্ডীদাস।" ইনি 'নাড়ী' স্থলে 'নারী' লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় ইনিই শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের ছাতিনার চণ্ডীদাস। "চৈত্যরূপ প্রাপ্তি" চণ্ডীদাস ঠাকুর প্রণীত বলিয়া কথিত হইয়াছে, সুতরাং ইনিও ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব মনে করা যাইতে পারে। ইনিই "দীনহীন দাস" উপাধি কোন কোন স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার পরিচয়ই শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু দিয়াছেন (সা-প-প, ১৩৩৩, ৪নং, ২১৩-২৩৭ পৃঃ)। ইঁহাকেই আমরা তৃতীয় চণ্ডীদাস বলিয়াছি। ইঁহার আবির্ভাব কাল অনুমানিক ১৫৬০--১৬৩০ খৃঃ। এই চণ্ডীদাসের পদে রূপ গোস্বামীর উল্লেখ আছে। ("ভারতবর্ষ" ১৩৩১ ভাদ্র পৃঃ)। ইঁহার গুরু সহজিয়া ছিলেন না, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? তরুণীরমণ সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য। ইনি একদিন পদকর্ত্তা। ইঁহার সহিত শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইনি একজন সহজিয়া। ইঁহার কতকগুলি পদ তারকেশ্বর বাবু "পদসংগ্রহ" নামক একখানি পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। (সা-প-প, ১৩২৬, ৪নং, ২০৯ ২২০ পৃঃ)। তরুণীরমণ লিখিয়াছেন—

"বেদ মহোদধি মথন করিল
যতনে গোসাঞি রূপ
পীরিতি রতন তাহে উপজিল
সকল মতের ভূপ॥"

ইঁহার কতকটা বিবরণ পরে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি যে পদটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও ইঁহাকে সহজিয়া দেখা যায়। ইঁহার অনুমানিক সময় ১৬১০ খৃঃ। ইনি গোবিন্দদাসের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী। ইঁহার উল্লেখ সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে আছে।

রায়শেখর একজন পদকর্ত্তা এবং সহজিয়া। তাঁহার একটী পদ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন (ভারতবর্ষে ১৩৩৩, পৌষ মাসে১০৯-পৃঃ)। তিনি চণ্ডীদাসকে "রামিনী সঙ্গিনী প্রেমরস ভোর"

৫। ইনিই সম্ভবতঃ "কিরণদীপিকা" রচয়িতা। ইহা কবিকর্ণপুরের "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" অনুবাদ। হরেকৃষ্ণ বাবু যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়া চণ্ডীদাসের পদগুলির এবং সহজিয়া তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, তাহাতে তিনি সাহিত্যসেবী মাত্রের ধন্যবাদার্হ।

বলিয়াছেন, এবং তাঁহার পদ বন্দনা করিয়াছেন। একটী পদে আছে—

"যা'ক অমিয় গীত গম্ভীরা মাহ।
রায় স্বরূপ সঙ্গে রস নিরবাহ॥

ইহাতে কি স্বরূপ দামোদর গোসাঞির ইঙ্গিত আছে? তিনি জ্ঞানদাসের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী, এবং জগন্নাথ ও গোবিন্দদাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী (আনুমানিক সময় ১৫২৫-১৫৯০ খৃঃ)।

মুকুন্দদেব গোস্বামী কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য। তিনি "সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়", "নিত্যলীলা", বস্তুতত্ত্বসার", 'প্রেমরত্নাবলী", "রাগরত্নাবলী", "বৈষ্ণবামৃত", "সহজামৃত", "রসসাগরতত্ত্ব" প্রভৃতি রচনা করেন। ইঁহার আনুমানিক সময় ১৫৫০-১৬১৫ খৃঃ। ইঁহার সম্বন্ধে "ভৃঙ্গরত্নাবলী"তে উক্ত হইয়াছে—

"দেখ দেখি মুকুন্দদেব রাজপুত্র ছিলা।
সকল ছাড়িয়া তিঁহ আশ্রয় লইলা॥"
"ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া তিঁহ বৈরাগ্য লইলা।
তবে কৃষ্ণদাস তাহে বহু কথা কৈলা॥"

রাধাবল্লভ দাস (৬) "সহজতত্ত্ব" এবং "ভক্তিরত্নাবলী" "রচনা করেন। তিনি শ্রীনিবাস শিষ্য রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী বা রাধাবল্লভ বা বল্লভীদাস কবিরাজ হইতে পারেন। তিনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য রাধাবল্লভও হইতে পারেন। তিনি বল্লভ নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনিও "রসকদম্ব" রচনা করেন, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। তিনি বৃন্দাবন দাসের সমসাময়িক ছিলেন—"রায় রঘুপতি বল্লভ সঙ্গতি।"

বৃন্দাবন দাস "রসকল্পসার", "তত্ত্ববিলাস", "ভজন নির্ণয়", "ভক্তিচিন্তামণি", "রিপুচরিত্র", প্রভৃতি রচনা করেন। ইনি শ্রীনিবাস প্রভুর পুত্র বৃন্দাবন আচার্য্যও হইতে পারেন।

প্রেমানন্দ "চন্দ্রচিন্তামণি" রচনা করেন। ইনি এক জন পদকর্ত্তা।

শ্যামানন্দ (দুঃখী কৃষ্ণদাস) (৭) হৃদয় চৈতন্যের শিষ্য। ইনি "সহজরসামৃত" এবং "উপাসনা সার সংগ্রহ" রচনা করেন। ইনি রসিকানন্দের গুরু এবং একজন পদকর্ত্তা। "শ্যামানন্দ প্রকাশ" রচয়িতা এক কৃষ্ণদাস ছিলেন। তিনি কি "গতামঞ্জুরী", "মনোরত্তি পটল" প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন?

রাধামোহন দাস "রসকল্পতত্ত্বসার" রচনা করেন। ইনি সম্ভবতঃ গোবিন্দ দাস কবিরাজের সখা মোহনদাস, এবং এক জন পদকর্ত্তা।

গোপীনাথ দাস "সিদ্ধসার" রচনা করেন। ইনি কি রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা?

মুকুন্দদাস মুকুন্দদেব গোস্বামীর শিষ্য। তিনি "অমৃতসারাবলী" "পরতত্ত্ব", "সাধনোপায়" "ভৃঙ্গরত্নাবলী" "আত্মসারস্বত, কারিকা", "সারাৎসার, কারিকা" প্রভৃতি রচনা করেন।

নৃসিংহানন্দ মুকুন্দদেব গোস্বামীর শিষ্য। ইনিই সম্ভবত "দর্পণ চন্দ্রিকা","পদ্মশৃঙ্গার", "প্রেমদাবানল" প্রভৃতি রচনা করেন, এবং নরসিংহ দাস নামে পরিচিত। ইনিই শ্রীনিবাস-শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজ। ইঁহার ভ্রাতা শ্রীনারায়ণ কবিরাজ বা নারায়ণ দাস।

মথুরানাথ মুকুন্দদেব গোস্বামীর শিষ্য। ইনি "আনন্দ লহরী" রচনা করেন।

মুকুন্দদেব গোস্বামীর শিষ্য রাধাচরণ এবং গোকুল বাউলও বটেন, কিন্তু তাঁহারা কোন্ কোন্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা জানা যায় নাই।

গৌরীদাস মুকুন্দদাসের শিষ্য। তিনি "নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী" রচনা করেন। "সজাদি নিগূঢ়তত্ত্ব" নামে একখানি গ্রন্থ আছে, তাহা বাউল চাঁদের লেখা। এই বাউল চাঁদ কি গোসাই আনন্দ চাঁদ (ক্ষেপাচাঁদ বাউল)? (ভারতবর্ষ, ১৩৩০, আশ্বিন, ৬৩১ পৃঃ)। "তত্ত্বকথা" "আত্মতত্ত্ব" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ বাউল সম্প্রদায়ের লিখিত।

সুন্দরানন্দ মুকুন্দদেব গোস্বামীর শিষ্য। তাঁহার শিষ্য শ্রীপর্ণি গোপাল বা পানুয়া ঠাকুর, নিবাস বীরভূমের মঙ্গলা-

৬। রসিক মঙ্গলে এক রাধাবল্লভের উল্লেখ আছে—"বল্লভের সুত রাধাবল্লভ বিখ্যাত। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যার পিতামাতা।"

৭। কৃষ্ণদাস নামের অন্যান্য সহজিয়া গ্রন্থ কয়েক খানি ইহার রচিত। কোন কোনটী গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা দীন কৃষ্ণদাসের অথবা অপর কৃষ্ণদাসের হইতে পারে।

ডিহি। (ভারতবর্ষ, ১৩৩০, আশ্বিন, ৫৩০ পৃঃ)। যুগল কিশোর দাস "প্রেমবিলাস" রচয়িতা, "চৈতন্যরস কারিকা"ও ইঁহার রচিত।

নিত্যানন্দ দাস "রাগময়ী কণা" "রসকল্পসার" রচনা করেন। ইনি জগদানন্দ ঠাকুরের পিতা হইতে পারেন, চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র হইতে পারেন, চৈতন্যদাসের পুত্র হইতে পারেন।

বলরাম দাস "হাটবন্দনা", "বৈষ্ণবাভিধান", "কৃষ্ণ-লীলামৃত প্রভৃতি রচনা করেন। এই নামের বহু ব্যক্তির সংবাদ পাওয়া যায়।

ব্রজেন্দ্র কৃষ্ণদাস "গোপী উপাসনা" রচনা করেন। ইনি একজন পদকর্ত্তা, পীতাম্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী।

রসময় দাস (৮) নারায়ণ দাসের গুরু। নারায়ণ দাসের গ্রন্থে কাঠাইনিবাসী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কাঠাই কাঁদি না কাঁথি? তিনি "ভক্তিতত্ত্বসার" রচনা করেন। (সা-প-প, ১৩১৬, ৩সং, ১৪৩ পৃঃ)

নারায়ণ দাস "সহজ উজ্জ্বল" ও "রসভাবাস্ত" রচনা করেন। "ঠাকুরবংশীয় বংশ বাঘনাপাড়ায় বাস। কৃষ্ণ-বলরাম যাঁহা স্বরূপ প্রকাশ।" ইহাতে জানা যাইতেছে যে ইনি রামচন্দ্র ঠাকুরের বংশোদ্ভব। ইঁহার এক শিক্ষা-গুরুর নাম রামদাস বৈরাগী গোঁসাঞি।

রসিক দাস "রতিবিলাস পদ্ধতি" রচনা করেন। ইনি রসিকানন্দ (শ্যামানন্দ শিষ্য) অথবা গোপীবল্লভের ভ্রাতা রসিকানন্দ হইতে পারেন। ইনি একজন পদকর্ত্তা।

গোবিন্দ দেব বা গোবিন্দ দাস "রসভাবপ্রাপ্ত" রচনা করেন। ইহার প্রকৃতির নাম মুঞ্জরী। "শ্রীমতী মুঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।"

"শ্রীমতীর মানভঞ্জন" কি ইঁহার রচিত?

জীবনাথ "রসতত্ত্ববিলাস" রচনা করেন। ইনি সম্ভবতঃ "শ্যামানন্দ বিকাশ" রচয়িতা জীবদাস। কুলিয়ায় এক জীব পণ্ডিত ছিলেন, তিনি ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।

দীন কৃষ্ণদাস গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা। সম্ভবতঃ তিনি "ভক্তিরসাত্মিকা" রচনা করেন। আর একখানি গ্রন্থে অকিঞ্চন দাসের নাম দৃষ্ট হয় তিনিই কি "অকিঞ্চন?" শঙ্কর ঘোষ সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বন্দনায় উক্ত হইয়াছে "বন্দিব শঙ্কর ঘোষ অকিঞ্চন রীতি।" তিনিও অকিঞ্চন দাস হইতে পারেন।

আনন্দ দাস "রসসুধার্ণব" রচনা করেন। ইনি কি "জগদীশ পণ্ডিতের চরিত্র বিচার" রচনা করেন?

রামগোপাল দাস "চৈতন্যতত্ত্বসার", "রসকল্পবল্লী" রচনা করেন। ইনি শ্রীখণ্ডবাসী।

পীতাম্বর রামগোপাল দাসের পুত্র। তিনি "রসমঞ্জরী" রচনা করেন। ইনিও শ্রীখণ্ডবাসী।

নন্দকিশোর দাস "বৃন্দাবনলীলামৃত" এবং "রসপুষ্প-কলিকা" রচনা করেন। ইনি চুনাখালী নিবাসী।

সহজিয়া বৈষ্ণবদিগের আরও বহু সংখ্যক গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার তালিকা দেওয়া অনাবশ্যক। আমরা কেবল পূর্ব্ব-ষোড়শ শতাব্দীতে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত লিখিত গ্রন্থগুলির এবং গ্রন্থকারদিগের উল্লেখ করিলাম। প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহানুভব ব্যক্তিগণ যে সহজিয়া অনুরাগী ছিলেন, একথা নবীন বৈষ্ণব মহোদয়েরা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা সহজিয়া নামে শিহরিয়া উঠেন। তাঁহাদিগের ধারণা যে পরবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, ষট্ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীনিবাস প্রভু, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতির নির্ম্মল চরিত্রে অযথা কালিমা অর্পণ করিয়াছেন, এবং নিজেদের রচিত গ্রন্থগুলি তাঁহাদের নামে চালাইয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা যে ভ্রান্ত, এবং তাঁহারাই যে সত্য গোপনের চেষ্টা করেন, ইহাই প্রমাণ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। চৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, কিংবা গোস্বামী প্রভুরা যে সহজিয়া রীতির সকলগুলিই অনুসরণ করিতেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু সহজিয়া ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে তাঁহারা এবং তাঁহাদিগের শিষ্য এবং ভক্তগণের মধ্যে অধিকাংশই সহজিয়া ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মুকুন্দদেব গোস্বামী, তরুণীরমণ, রায় শেখর প্রভৃতির ন্যায় উন্নত চরিত্র এবং প্রকৃত ভক্ত কয়জন পাওয়া যায়? ইঁহারা যে পূর্ব্ববর্ত্তী পূজ্যপাদ বৈষ্ণবদিগের চরিত্রে দোষারোপ করিয়া প্রত্যবায়-

(৮) রসময় দাস গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থের ভণিতা "অতি দীন অতি হীন রসময় দাস"।

গ্রস্ত হইবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতেই পারে না। পরবর্ত্তী কালে সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এবং হিন্দু তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কোন কোন দলে রিপুপরতন্ত্রতা এবং অসদাচার প্রবেশ লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কি সহজিয়া ধর্ম্ম বা তান্ত্রিক ধর্ম্মকে ঘৃণা করিতে হইবে? বৌদ্ধ প্রাধান্যের সময়ে অসংখ্য খ্যাতনামা পণ্ডিত এই ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই চরিত্রহীন ছিলেন, এই অনুমান করা কি সঙ্গত? হিন্দু তান্ত্রিকদিগের মধ্যেও বঙ্গদেশে এবং অন্যত্র বহু দিগ্‌গজ পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহারা সকলেই নিজেদের চরিত্র কলুষিত করিয়াছিলেন, এবং সমাজকে কুপথগামী করিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে সত্যানুরাগী কয়জনের সাহস হইবে? আমরা পূর্ব্বে যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় বৈষ্ণব মহাজনদিগের নামোল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারাও কি চরিত্রহীন ছিলেন? ধীরভাবে চিন্তা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে সহজিয়া এবং হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম্মে এরূপ উচ্চ তত্ত্ব সমূহ আছে, যাহা এই দুই ধর্ম্মের সাধকগণ ভিন্ন অপরে কেহ বুঝিতে পারে না। যাহারা বুঝিয়াছে, তাহারাই মজিয়াছে। উচ্চ দরের সাধক, সরলচিত্ত এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের নিকট এই দুই ধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যক্ত করা যাইতে পারে না। সহজিয়া শাস্ত্র এবং তন্ত্র শাস্ত্র উভয়ই গুহ্য শাস্ত্র। সহজিয়া গ্রন্থ এই জন্যই সন্ধ্যে ভাষায় লিখিত হইত। বহুদিন ধরিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ—দিনাজপুর হইতে ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম, মুরশিদাবাদ হইতে মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যা এবং আসামেও সহজিয়া ও তান্ত্রিকধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব ছিল। অনেক মুসলমানও এই দুই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। নেপাল এবং তিব্বতের কথা ছাড়িয়া দিলাম। যে দুইটী ধর্ম্মের এরূপ মহিমা, তাহাদিগের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে ধৈর্য্য এবং নিরপেক্ষতা আবশ্যক।

সমাপ্ত

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিবস বিদায় মাগে

দিবস বিদায় মাগে
তরুণীর দীপ্ত অনুরাগে
জড়াইয়া ধরে তারে,
ভালবেসে বলে বারে বারে
পাটনা।

এখনি যেওনা তুমি,
বুকখানি আরবার চুমি,
প্রণয়ের অভিজ্ঞান
দিতে চাই ভরিয়া পরাণ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

দেব-দেউল*

(উপন্যাস)

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রকোনা এখন ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত সামান্য একটী গ্রাম। কিন্তু এক সময়ে উহা মল্লরাজের রাজধানী ছিল। পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে রাজপুত রাজকুমার চন্দ্রকেতু চন্দ্রকোণার নিকটবর্ত্তী দেবগিরির বনে শিবির স্থাপন করিলেন। মল্লরাজকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া চন্দ্রকেতু রাজা হইয়া বসিলেন এবং নগরের নাম রাখিলেন, চন্দ্রকোনা। পার্শ্ববর্ত্তী জাড়ার রাজা এই অত্যাচার সহ্য

* পরিচ্ছেদ গুলির সংখ্যা দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন,—এ মাসে প্রকাশিত পরিচ্ছেদ গুলি গতমাসে এবং গত মাসের গুলি এ মাসে ছাপা হওয়া উচিত ছিল। আমাদের অনবধানতা বশতঃ এই ভুল হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত এবং পাঠকগণ ও লেখক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থী। মাঃ মঃ-সম্পাদক।

না করিয়া চন্দ্রকেতুর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাম্রলিপ্ত হইতে বহু সেনা প্রেরিত হইল। গণ-নায়ক অংশুমান ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে মাঝিপাড়ায় আহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মরে নাই। তাম্রলিপ্তের বাহিরে একটী গোপন স্থানে তখন অংশুমানের চিকিৎসা হইতেছিল। এ সংবাদ জানিত শুধু নগরপাল নাগার্জ্জুন। তবুও অংশুমানের হত্যা-কারিণী বলিয়া বেদেনীর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সে বিরত হইল না। সে মনে করিল, অংশুমান না হয় বাঁচিয়াই উঠিয়াছে, কিন্তু পান্না ত বেদেনী, তাম্রলিপ্তের কলঙ্ক সে—যাদুকরী সে! সে বাঁচিয়া থাকিলে তাম্রলিপ্তের মঙ্গল নাই, একথা শতমন্যু ঠাকুরই ত কতবার বলিয়াছেন। বেদেনীর ফাঁসি হওয়াই উচিত! হত্যা করা এবং হত্যার চেষ্টা করা—ও দুই ই এক।

অংশুমান যে দিন শুনিল যে তাহারই গণসেনা যুদ্ধ-জয়ের গৌরব লইবার জন্য জাড়ার দিকে গিয়াছে, সে ভাবিল, জাড়ায় গেলে মন্দ হয় না—লুঠের ভাগটা ত মিলিবে। যুদ্ধ যাহা করিবার, তাহা ত আগেই করিবে সেনারা! কাহাকেও কিছু না বলিয়া অংশুমান একদিন জাড়ার দিকে চলিয়া গেল। তাম্রলিপ্ত হইতে জাড়া অনেক দূরের পথ। অংশুমান তখনো তেমন সবল হয় নাই। কিন্তু লুটের লোভে সে পথ চলিতে বিরত হইল না। গুপ্তচরের মুখে যে দিন নগরপাল নাগার্জ্জুনের নিকট সংবাদ গেল যে অংশুমানকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তখন একটী স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে পরম উৎসাহে বেদেনীর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে মন দিল।

জাড়ায় পৌঁছিয়াই অংশুমান শুনিতে পাইল, চন্দ্রকেতুকে জাড়ার রাজা পরাজিত করিয়াছিলেন কিন্তু নিজ রাজধানীতে ফিরিবার পূর্ব্বেই তাঁহার দুইটী শিক্ষিত পারাবত রাজনগরে উড়িয়া আসে। রাণীরা সেই পারাবত দেখিয়া পূর্ব্ব কথামত মনে করিলেন, যুদ্ধে রাজার পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিয়াছে! তাঁহারা অবিলম্বে চিতা প্রস্তুত করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। জাড়ার রাজা রাজপুরীতে আসিয়া দেখিলেন, সে ত তাঁহার সাধের রাজভবন নয়—শ্মশান সে। তিনি সেই শ্মশানের তপ্ত ভস্ম বুকে করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। সমস্ত অঞ্চলটাই রাজা চন্দ্রকেতুর রাজ্য হইয়া গেল। প্রাচীন রাজ্যের ধ্বংস এবং নবীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কালে যেরূপ অরাজকতা ঘটে, জাড়া-অঞ্চলেও তাহাই ঘটিল। অংশুমান নিজেকে গোপন রাখিয়া লুঠেড়াদের সঙ্গে যোগ দিল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই যথেষ্ট ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া একদিন গভীর নিশায় গণসেনার আগে আগে গোপনে তাম্রলিপ্তে প্রবেশ করিল।

পরদিন সে যখন এষার কাণে কাণে প্রেম নিবেদন করিতেছিল, এষা তখন একটী ছবি আঁকিতেছিল। তুলিটা রংএর পাত্রে ঘষিতে ঘষিতে এষা বলিল—"এতদিন তুমি কোথায় ছিলে অংশুমান? প্রায় দু'মাস তোমায় দেখিনি।"

একটু গর্ব্বের হাসি হাসিয়া অংশুমান বলিল—"জাড়ায় যুদ্ধ করতে—"

বিস্মিত হইয়া এষা বলিল, "যুদ্ধে গেলে, যাবার সময় কি একটিবার দেখাও করতে নেই? আমি কি তোমার এতই পর?"

অংশুমান ভাবিল, যাক্ বাঁচিলাম। মাঝি পাড়ায় বেদেনী যে আমাকে ছুরি মারিয়াছিল, এষা সে কথা শুনে নাই! সময়োচিত মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া অংশুমান কহিল, "এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হল যে সময় করতে পারিনি। ভেবেছিলাম যুদ্ধটা জয় ক'রে এসেই তোমায় বল্‌বো।"

এষা গর্ব্বপূর্ণ প্রেমসিক্ত নয়নে অংশুমানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অংশুমান তখন সুবিধা বুঝিয়া জাড়ার কল্পিত প্রকাণ্ড যুদ্ধে তাহার বীরপণার কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে একটানে নিজের বক্ষস্ত্রাণটা খুলিয়া ফেলিয়া বলিল—"এই দ্যাখ এষা, শত্রুর তলোয়ারের চিহ্ন আমার এই বুকে দ্যাখ। তখন এ পৃথিবীর আর কিছুই মনে পড়েনি, কেবল চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল তোমার ঐ মুখখানি।"

মাঝিপাড়ার সেই আঘাতটা অংশুমানের বক্ষে যে দাগ দিয়াছিল, তাহা আজ কাযে লাগিয়া গেল দেখিয়া অংশুমান পুলকে ভরিয়া উঠিল। ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া এষার মাথা ঘুরিয়া গেল, করের তুলি মেঝের উপর খসিয়া

পড়িল। এষা অতিশয় করুণ ও কোমল কণ্ঠে কহিল, "আহা হা! দেখি দেখি দেখি।"

এষা অতি সাবধানে তাহার দক্ষিণ করে সেই শুষ্ক ক্ষতটা স্পর্শ করিল এবং পর মুহূর্ত্তেই অংশুমান তাহাকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিল।

ঠিক সেই সময়ে দেবদেউলের সম্মুখে যে একটা ভিড় জমিয়াছিল, এষা এবং অংশুমান তাহা বুঝিতেই পারিল না। তাহাদের দেহ ও মনের ভিতর তখন কালবৈশাখীর বিদ্যুৎমাখা ঝড় চলিতেছিল। ধীরে নিজেকে মুক্ত করিয়া এষা কহিল, "এখানে বড় গরম। চল চাতালে যাই।"

মুক্ত চাতালে আসিয়া অংশুমান জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এখানে এত লোক কেন?"

এষা বলিল, "ঠিক জানিনে। শুনেছি একটা যাদুকরী বেদেনীর নাকি ফাঁসি হ'বে। তাই বুঝি তাকে কাল-ভৈরবের চরণামৃত দিতে এনেছে।"

অংশুমানের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, এতদিনে পান্নার বিচারের পালাটা শেষ হইয়াছে, হয়ত বা দণ্ডও হইয়া গিয়াছে। সে তাই সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ফাঁসি! কে সে যাদুকরী?"

"নাম ত জানিনে। ঐ দেখ, ঐ বুঝি ওরা তাকে দেউলে এনেছে।"

কম্পিত কলেবরে অংশুমান দেখিল, অর্দ্ধনগ্ন দেহে প্রহরীপরিবেষ্টিতা পান্না, তাহার বাহু দুইটী পিঠের দিকে বাঁধা, বৃহৎ কৃষ্ণ কেশরাশি আলু থালু হইয়া পিঠ ঢাকিয়াছে। সেই কেশগুচ্ছের উপর দিয়া কণ্ঠ বেড়িয়া মোটা চকচকে একগাছি শণের দড়ি জড়ানো—নাগিনী যেন ফলকে বেড়িয়াছে। একজন চণ্ডাল সেই দড়ি ধরিয়া বেদেনীকে কারাগার হইতে দেবদেউলে আনিয়াছিল।

বেদেনীর কণ্ঠের কবচটার গায়ে সূর্য্যাভা পড়ায় উহার সবুজাভ কাচখানা তখন এক একবার জ্বলিতে লাগিল।

ব্যগ্রকণ্ঠে এষা বলিল, "চিনতে পারলে না? এ যে সেই বেদেনী!"

জড়িত কণ্ঠে অংশুমান বলিল, "সে-ই? কে সে? সে-ই যার একটা ছাগী ছিল? হাঁ হাঁ—ঐ ত ছাগীটাও দেখছি বাঁধা।"

অংশুমানের ভয় হইল, পাছে কথা প্রসঙ্গে তাহার প্রতি বেদেনীর টানের কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। অংশুমান সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল।

এষা কহিল, "কোথায় যাচ্ছ? লোকে দেখলে বলবে, বেদেনীটা বুঝি গণপতিকে চঞ্চল করে' তুলেছে!"

কথাটা অংশুমানকে তীক্ষ্ণ তীরের মত হানিল; বলে নিজের মুখে একটু হাসি আনিয়া অংশুমান বলিল, "ইস! বলুক ত কেউ!"

নিরুপায় হইয়া অংশুমান সেইখানে দাঁড়াইয়া র'হল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, পান্না তাহার জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আজ সে লাঞ্ছিতা ধিক্কৃতা, কিন্তু অসামান্য রূপবতী। তাহার কাছে এই এষা! সাগরের কাছে গোষ্পদ?

পান্না তখন মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ছিল, যেন প্রস্তর প্রতিমা। দুই বিন্দু জল তাহার নয়নকোণে লাগিয়া রহিল—গড়াইয়া পড়িল না। সে ত জল নয়, যেন তুষারের কণা।

সেকালে নিয়ম ছিল, কোনো বেদিয়ার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলেই তাহাকে শ্রীকাল ভৈরবের মন্দিরে আনা হইত। তাহার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য প্রধান মোহান্ত দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। প্রার্থনার অন্তে শ্রীকালভৈরবের পাদোদক দিলে পর অপরাধীকে গোফার মাঠে ফাঁসিতলায় লইয়া যাইত। বেদিয়ার দণ্ডের পূর্ব্ব আয়োজন দেখিবার জন্য পথে ও মন্দিরপ্রাঙ্গণে জনতা হইয়াছিল বটে, কিন্তু পান্নাকে অনেকেই ভালবাসিত। আজ তাই তাহাদের চক্ষু ভিজিয়া উঠিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "চল, ছিনাইয়া আনি। কয়েকটা ত প্রহরী! উহাদের সাধ্য কি যে বাধা দেয়।"

কেহ কেহ বলিল, "কয়েকটা হোক্, তবু ত ওরা প্রহরী! ওদের গায়ে হাত দেয় কে? চল, স'রে পড়ি।"

কাল ভৈরবের মন্দিরে তখন অকালে আরতি বাজিয়া উঠিল। শৃঙ্গারান্তে নিদ্রিত দেবতাকে অসময়ে জাগ্রত করিবার জন্য ধূপের ধূম মন্দিরের ভিতরটা অন্ধকার করিয়া তুলিল। আরতির রোল থামিলে পর শুনা গেল প্রধান মোহান্ত শতমন্যু ঠাকুরের উচ্চ বিকৃত কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ।

চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য লইবার সময় যখন আসিল, তখন রক্ষীরা বেদেনীর বন্ধন খুলিয়া দিল। তাহারা শুনিতে পাইল, বেদেনী বিড়বিড় করিয়া কেবলই বলিতেছে —"অংশুমান—অংশুমান!" বেদেনীর হাত খুলিয়া দিয়া রক্ষীরা তাহাকে মন্দিরের দিকে লইয়া চলিল। যে দড়িটা এতক্ষণ সাপের মালার মত বেদেনীর গলা বেড়িয়া ছিল, তাহা সাপের মতই বেদেনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

বেদেনী মন্দিরের সম্মুখে আসিতেই মন্ত্র পাঠ থামিয়া গেল। রক্ষীরা সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। পান্না দেখিল, মোহান্ত শতমন্যু এক হস্তে রক্তজবার একটী মালা ও অপর হস্তে চরণামৃত লইয়া আসিতেছেন। কাঁপিয়া উঠিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলিল—"এখানেও সে-ই—!"

শতমন্যু বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে মন্থর পদে বেদেনীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল—যেন পা আর চলে না! লোকে দেখিল, মোহন্তের মুখ এতই পাণ্ডুর হইয়াছে যে সে যেন বহুদিন ভূগর্ভে সমাধিতে থাকিয়া আজ এখনই উঠিয়া আসিল—এই মহাপথের যাত্রীর আত্মাকে শান্তি দিবে বলিয়া।

শতমন্যুকে আরো নিকটে আসিতে দেখিয়া বেদেনীর সমস্ত শোণিত ফুটিয়া উঠিল এবং দুই চক্ষে দারুণ ঘৃণার অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। পান্না বুঝিতে পারিল: এখনো মোহান্তের লোলুপদৃষ্টি তাহার নগ্নদেহের দিকে বুভুক্ষিতের মত চাহিতেছে।

মোহান্ত শতমন্যু কহিল, "বেদিনী, ভগবানের কাছে কি ক্ষমা ভিক্ষা করেছ?"

বেদিনী উত্তর দিল না।

মোহান্ত আরো নিকটে আসিয়া অতিশয় লঘু বাক্যে বলিল, "এখনো সময় আছে—এখনো তোমায় বাঁচাতে পারি। বল বেদিনী—এখনো বল—"

ঘৃণাপূর্ণ তীব্রদৃষ্টিতে শতমন্যুর দিকে চাহিয়া পান্না কহিল, "পিশাচ! দূর হও। এখনি আমি সব কথা প্রকাশ ক'রে দেবো।"

মোহান্ত হাসিয়া উঠিল। সে হাসি কি বিকট! সে কহিল, "যত ইচ্ছা বল—কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না! তুমি কেবল পাপের উপর অপমানের বোঝা চাপাবে! এখনো যদি আমায় কিছু বলতে চাও, বল।"

পান্না উত্তর দিল, "তুমি আগে বল, আমার অংশুমানের কি করেছ তুমি?"

"তুমিই ত তার বুকে ছুরি মেরেছ!"

"মিথ্যা কথা! সে যে আমার অংশুমান।"

কথাটা মেঘের ডাকের মত বাজিয়া উঠিল। মোহান্ত শতমন্যু চমকিয়া মাথা তুলিতেই দেখিতে পাইল, মণিকার শ্রেষ্ঠীর মুক্ত বারান্দার উপর এষার পার্শ্বে অংশুমান দাঁড়াইয়া আছে! মোহান্ত আহতের মত পিছু হটিয়া গেল—দুইকরে চক্ষু মাজিয়া আবার চাহিল। আবার দেখিল অংশুমান ও এষা! মোহন্তের মুখখানা সহসা কালো হইয়া গেল, মুখে একটা তীব্র অভিসম্পাত বাহির হইল। দন্তে দন্ত ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সে কহিল, "মর তবে। আমিও চাইনে—ওকেও পেতে দেবো না!"

মোহান্ত উন্মত্তের মত পান্নার নিকটে আসিয়া তাহার মাথার উপর শ্রীকালভৈরবের চরণামৃত ঢালিয়া দিল এবং বিদ্যুতের বেগে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চরণামৃতের পাত্রটা আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিল।

রক্ষীরা যখন দেখিল, শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, তখন বেদেনীকে বধ্যভূমে লইবার জন্য অগ্রসর হইল।

বেদেনী বুঝিল, তাহার শেষ সময় নিকট। মৃত্যুকে একেবারে সম্মুখে দেখিয়া, বাঁচিবার জন্য তাহার মনে একটা অত্যন্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। সে তখন তাহার শুষ্ক রক্ত-চক্ষু দুইটী তুলিয়া স্বর্গের দেবতার দিকে চাহিল—অপরাহ্নের তপনদেবের কাছে জীবন ভিক্ষা মাগিল—আকাশের গায়ে মন্থরগতি লঘু মেঘের কাছে মিনতি করিল।

রক্ষীরা ত তাহাকে বাঁধিতে আসিয়াছে—কৈ? কোনো দেবতাই ত পান্নাকে বাঁচাইতে আসিল না। সে তখন রাজপথের সেই চঞ্চল জনসমুদ্রের দিকে কাতর নয়নে চাহিল এবং সহসা গভীর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। এ ত ব্যথার রোদন নয়। এ যে উল্লাসের উন্মত্ত প্রলাপ! সে দেখিতে পাইল, শ্রেষ্ঠীর চত্বরের উপর তাহারই অংশুমান তাহারই জীবন-দেবতা অংশুমান! সে তখনই বুঝিল, পৌরমুখ্য মিথ্যাবাদী, মোহান্ত মিথ্যাবাদী, নাগার্জ্জুন মিথ্যাবাদী। তাহারাই তাহাকে

ফাঁসিতে ঝুলাইবার জন্য প্রমাণ দিয়াছে, তাহারা সকলেই মিথ্যাবাদী। ওই ত সে-ই অংশুমান—ঐখানে দাঁড়াইয়া আছে, তেমনি সুন্দর—তেমনি সুস্থ—তেমনি মনোহর—সেই মিলন সন্ধ্যায় সে যেমন ছিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পান্না প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "অংশুমান—অংশুমান—"

যদি সে পারিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরমাগ্রহে অংশুমানের দিকে ছুটিয়া যাইত। পান্না দেখিতে পাইল যে অংশুমানের পার্শ্বে যে নারী দাঁড়াইয়া আছে, সে যেন রোষলিপ্ত নয়নে তাহার দিকেই চাহিতেছে।

পান্না পূর্ব্ববৎ কহিল, "তুমিও কি বিশ্বাস কর অংশুমান যে আমি তোমায় আঘাত করেছি?"

অংশুমান কিছু বলিল কি না তাহা পান্না শুনিতে পাইল না, কিন্তু দেখিতে পাইল, তাহার দিকে একটীবারও না চাহিয়া অংশুমান অনায়াসে চলিয়া গেল! পান্নার বুকে এমন একটা প্রবল আঘাত লাগিল যে সে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

রক্ষীরা হতভম্ব হইয়া এ উহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। কি যে করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহারা দেখিতে পাইল, সেই বিশাল জনতার মধ্যে একটা চঞ্চলতা আসিয়াছে। বুঝি বা উহারা আক্রমণই করিবে।

দেব-দেউলের তেতলার একটা চত্বরের প্রস্তর-বেষ্টনীর পাশে ভৈরব যে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহা এতক্ষণ কেহই দেখে নাই। প্রাঙ্গণে যাহা যাহা ঘটিল, ভৈরব নির্নিমেষ নয়নে সে সমস্তই দেখিতেছিল। তাহার বিকট মুখ তখন এতই বেশী বিকট হইয়াছিল যে মানুষের মুখে তেমন হয় না। দেব-দেউলের গাত্রস্থ একটা প্রস্তরময় ভীমদর্শন দানব বলিয়া তখন ভৈরবকে ভ্রম করা বিচিত্র ছিল না। তেমন অনেকগুলি দানবমুণ্ড চত্বরে চত্বরে জলনির্গমনের পথরূপে বসানোই ছিল। চণ্ডাল জল্লাদ যখন পান্নাকে লইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াছিল তখন হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিল, ভৈরবের তীক্ষ্ণ চক্ষু হইতে তাহার কিছুই বাদ গেল না। কেন যে বেদেনীর অমন অবস্থা হইয়াছে তাহা ভৈরব জানিত না, বুঝিতেও পারিল না। তবে ইহা সে বুঝিল যে উহার কোন একটা বিষম সঙ্কটকাল আসিয়াছে। ভৈরবের অন্তরটা বড়ই ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। দেব-দেউল মেরামত করিবার জন্য সেই স্থানে কতকগুলি দড়া-দড়ি, সীসার তার ও অন্যান্য জিনিষপত্র তোলা ছিল। ভৈরব এটা-ওটা করিয়া নানা জিনিষ টানাটানি করিল, কিন্তু কোনটাই কাযের মত বলিয়া বোধ হইল না। ভৈরব তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পাগলের ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিল। কেবল তাহার চক্ষুটী আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল।

মূর্চ্ছিতা বেদেনীর হাত বাঁধিয়া তাহাকে তুলিবার রক্ষীরা যখন হাত বাড়াইল, ভৈরব তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে একগাছি দীর্ঘ মোটা শক্ত রশি লইয়া প্রস্তর স্তম্ভের গায়ে বাঁধিল এবং পরক্ষণেই প্রস্তরবেষ্টনীর উপর উঠিয়া বসিয়া বিলম্বিত দড়ি ধরিয়া চকিতে নিম্নে নামিয়া পড়িল—একখানা কাচের গা বাহিয়া জলের বিন্দুটী যেমন অনায়াসে নামে, ঠিক সেইরূপ। গৃহের ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া ধূর্ত্ত মার্জ্জার যেমন দৌড়ায়, ত্রিতল হইতে প্রাঙ্গণে নামিয়া ভৈরব তেমনি তীব্রবেগে দৌড়াইল এবং চক্ষের পলকে রক্ষীদের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল। যাহারা তখন অচেতন পান্নাকে বলে তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল, ভৈরব তাহাদিগকে এমন ভীষণ মুষ্টি-প্রহার করিল যে তাহারা দেউলের প্রাঙ্গণে ভাঁটার মত গড়াইয়া গেল! নিমেষে পান্নাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া ভৈরব দুই চারি লম্ফে দেউলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল। শত সহস্র দর্শক তখন করতালি দিতে দিতে চীৎকার লাগিল—"দেব দেউল!"

ভৈরব একথার অর্থ বুঝিল না, কিন্তু সকলের সঙ্গে সে-ও গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"দেব দেউল, দেব দেউল!" তাহার বিকট গর্জ্জনটা তখন দেউলের পাষাণ প্রাচীরে আহত হইয়া গম্ গম্ করিতে লাগিল। তাহার একটী মাত্র চক্ষু—তখন সেই চক্ষে এক বিন্দু বারি গড়াইয়া পড়িল, চক্ষের তারা পুলকে দীপ্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

সকলেই ইহা জানিত যে যেদিন শ্রীকাল ভৈরবের মূর্ত্তি দেবদেউলে স্থাপিত হয়, পরম শৈব মহারাজ শশাঙ্ক সেদিন এই আদেশ দিয়াছিলেন যে অতি-বড় শত্রুও যদি কোনো ক্রমে দেউলে আশ্রয় লয়, দেউলে প্রবেশ করিয়া কেহই তাহাকে ধরিতে পারিবে না, স্বয়ং শ্রীভৈরব নিজের মন্দিরে যাহাকে আশ্রয় দিলেন, রাজশক্তির সাধ্য থাকিবে না যে সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শরণাগতকে বলে আশ্রয়হীন করে।

বৌদ্ধধর্ম্মের উপর গর্ব্বস্ফীত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তখন যেমন দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়াছিল, ভৈরবও তেমনি দৃঢ়পদে দেবদেউলের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া শত সহস্র নাগরিকের অভিনন্দন লাভ করিল। অসংযত অবিন্যস্ত কেশে আচ্ছাদিত তাহার বৃহৎ মস্তকটী তখন যেন রুষ্ট সিংহের মুণ্ডের মতই মনে হইতে লাগিল। কোমল কুসুম স্তবক লোকে যেমন পরম যত্নে ও অতি সাবধানে লইয়া যায়—পাছে উহার একটীও পর্ণ খসে, ভৈরবও তেমনি করিয়াই বেদেনীকে বহিয়া লইয়া গেল। একথা তাহার মনে হইল বটে যে সেই কোমল সুন্দর অমূল্য নলিনী তাহার কঠিন করের কর্কশ স্পর্শের জন্য নহে। তাহার তপ্তশ্বাস লাগিয়া পাছে সেই হেমনলিনী শুকাইয়া যায়, ভৈরবের মনে সে শঙ্কাও জাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই কি এক তীব্র আবেগে ভৈরব বেদেনীর দেহলতাটী নিজের বুকের সঙ্গে দুই একবার চাপিয়া ধরিল—যেন উহাই তাহার অমূল্য নিধি—যেন উহাই তাহার একমাত্র শিব-সম্পদ। ভৈরবের বর্ত্তুলাকার নয়ন নত হইয়া বেদেনীর মুখখানি একবার দেখিল। সে নয়ন তখন কত কোমলতা, কত ব্যথা, কত অনুকম্পা বর্ষণ করিতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তেই ভৈরব যখন চক্ষু তুলিল, তখন উহা অগ্নি গোলকের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। বিকটাকার ভৈরবের মধ্যে এমন একটা অপূর্ব্ব ও অলৌকিক সৌন্দর্য্য তখন সহসা বিকাশ পাইল যে তাহা লক্ষ্য করিয়া নাগরিকেরা উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিল। সেই পিতৃমাতৃহীন, সেই ঘৃণিত পরিত্যক্ত অনাথ সেই চিরনির্ব্বাসিতও তখন লোকের চক্ষে সুন্দর দেখাইল। তাহার তখন একবার মনে হইল, আত্মশক্তির প্রাচুর্য্যে সকলেরই উর্দ্ধে যেন তাহার শির। কুব্জ ভৈরব একবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইল এবং সেই নরসমাজ, যাহা তাহাকে মড়কের মত দূরে রাখিয়াছে, তাহারই দিকে নির্ভয়ে চাহিয়া রহিল! সেই সমাজ, যাহার উদ্যত তীক্ষ্ণ খড়্গকে সে আজ এমনি করিয়াই হেলায় ফিরাইয়া দিল, যাহার রক্ত-রাঙ্গা বিচারের মুখের গ্রাস সে আজ এমনি ভাবেই কাড়িয়া লইল—সেই হিংস্র শার্দ্দুলের দল যাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িতে উদ্যত হইয়াছিল, ভৈরব আজ তাহাদিগকে লাঞ্ছনা দিয়া এমনি করিয়াই সে শিকারটা রক্ষা করিল যে অসীম গর্ব্বে সকলের মুখের দিকে চাহিতে আজ আর তাহার কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ রহিল না। সেই অস্ত্রধারী রক্ষীর দল—তাম্রলিপ্তের ধর্ম্ম অবতারের সেই ভীষণ মণ্ডলী—রাজতন্ত্রের সেই অপরিসীম শক্তি সকলকেই আজ এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া, সকলের মুখের উপর ভৈরব দেউলের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল! আজ যেন সে আর শোভাযাত্রার ধর্ম্মরাজ-নয়—সর্ব্বপাপহন্তা স্বয়ং ধর্ম্ম সে আজ।

অল্পক্ষণ পরেই লোকে দেখিল, বেদেনীকে স্কন্ধে লইয়া দ্বিতলের বারান্দা দিয়া ভৈরব উন্মত্তের মত ছুটিতেছে এবং গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতেছে—"দেবদেউল, দেবদেউল।" ঐ সে ত্রিতলে উঠিল। ঐ যে ভৈরব উল্কার মত ছুটিতেছে। ঐ-ঐ ভৈরব চতুর্থ-তলে উঠিয়া নিনাদ করিল—"দেবদেউল, দেবদেউল।"

প্রত্যুত্তরে জনসমুদ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "দেবদেউল! দেবদেউল!"

সেই ধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতেই ভৈরবকে একেবারে দেউলের চূড়ায় দেখা গেল। মনে হইল, যেন বিস্তীর্ণ তাম্রলিপ্তকেই সে দেখাইতে চায়—আজ সে কোন্ নিধিকে দৈত্যের কবল হইতে বাঁচাইল! দেউলের চূড়া হইতে ভৈরব যখন গর্জ্জন করিল—"দেবদেউল দেবদেউল!" তখন সে ধ্বনি শ্রীকালভৈরবের কনকশূলে বিদ্ধ হইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। যাহারা বেদেনীর ফাঁসি দেখিবার জন্য ফাঁসিতলায় ভিড় করিয়াছিল তাহারা চমকাইয়া উঠিল। রাক্ষসী বেদেনীর দেহাবসান দেখিবার জন্য গোফার সন্ন্যাসিনী সমস্ত দিন গবাক্ষে মুখ দিয়া বসিয়া ছিল, এক পাও নড়ে নাই, সে যে আজ বেদেনীর রক্তে তাহার মাতৃহিয়ার জ্বালা জুড়াইবে! মত্ত নাগরিকদের বিপুল হলুহলারবে তাহারও আজ চমকভাঙ্গিল।

কি একটা অনর্থপাত হইল ভাবিয়া নগরপাল নাগর্জ্জুন দেউলের দিকে ছুটিলেন। নগররক্ষী সেনাদল তাঁহার পশ্চাতে ধাইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শেষমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মোহান্ত শতমন্যু পাগলের মত দেবদেউলে প্রবেশ করিয়াছিল, গুপ্তদ্বার দিয়া সে পাগলের মতই ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, কোন পথে কোন্ দিকে যাইতেছে—শতমন্যু তাহা বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার জন্য চেষ্টাও করিল না। সে কখনো চলিল, কখনো দৌড়াইল, কখনো না হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। এই কথাই শুধু তাহার মনে হইতে লাগিল, গোফার মাঠের ফাঁসির স্তম্ভটা যেন প্রাণ পাইয়া তাহাকেই ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে! নিজেকে বাঁচাইবার জন্য শতমন্যু প্রাণপণে ছুটিল। এইরূপে ছুটিতে ছুটিতে সে যখন তাম্রলিপ্তের বাহিরে একটা বনের সম্মুখে আসিল, তখন থমকিয়া দাঁড়াইল। পিছনে চাহিল দেখিল, তাম্রলিপ্ত সহরের কোনো কিছুই আর দেখা যায় না। শতমন্যু একটা শ্বাস ত্যাগ করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। মনে হইল ফাঁসির রশিটা এতক্ষণে বহু যোজন দূরে পড়িয়াছে।

ললাটের স্বেদধারা মুছিতে মুছিতে শতমন্যু তাহার অন্তরের দিকে একবার চাহিল। দেখিতে পাইল, হতভাগিনী বেদেনী নিজেও মরিল, তাহাকেও বধ করিয়া গেল! ভবিতব্যতা তাহাদিগকে দুইটা ভিন্ন পথে টানিয়া আনিয়া শেষে এমন একটা স্থানেই মিশাইয়াছিল, যেখানে পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে উভয়েই রেণু রেণু হইয়া গেল! শতমন্যুর মনে হইতে লাগিল—জপ তপ আরাধনা কিছুই কিছু নয়—দর্শন, বিজ্ঞান, শাস্ত্র সবই মিথ্যা—ভগবান বলিয়া কেহ নাই, কিছু নাই! আছে শুধু কামনার সীমাহীন সাগর! উহাই শুধুই সত্য—আর সব মিথ্যা। শতমন্যু শুনিতে পাইল, কামনা পিপাসাই তাহার মনের উপর পা রাখিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে। সেই হাসি দেখিয়া শতমন্যুও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মানুষ যে প্রেমে দেবতা হয়—শতমন্যু দেখিল, মোহান্ত সেই প্রেমে পিশাচ হইয়াছে। সে যতদিন মানুষ ছিল ততদিনই ছিল ভাল। কিন্তু মোহান্তের সন্ন্যাস তাহাকে দানব করিয়াছে! শতমন্যু শিহরিয়া উঠিল। উঃ তাহার প্রেমের মূর্ত্তিটা কি ভীষণ কদাকার—সে যে সপ্ত সাগরের বিষে মাখা, সে যে মূর্ত্তিমতী হিংসা, সে যে প্রাণান্তকরী। উহাই ত শেষে একজনকে ফাঁসির স্তম্ভে তুলিল, আর একজনকে প্রচণ্ড রৌরবে নিক্ষেপ করিল—উহা একজনকে দিল মানুষের বিচারাভিনয়ে চরম দণ্ড, আর আর একজনকে দিল ভগবানের বিচারে অনন্ত নরক!

শতমন্যুর হাসিটা আবার ফিরিয়া আসিল—পূর্ব্ববৎ তেমনি উৎকট! মনে পড়িল, গণপতি অংশুমান এখনো জীবিত—সে যে পূর্ব্বের মতই আনন্দে মত্ত, পূর্ব্বের মতই সুখী সে। তাহার যোদ্ধৃবেশ পূর্ব্বের চেয়ে আজ যেন অনেক বেশী উজ্জ্বল। নূতন প্রণয়িনীর হাত ধরিয়া সে যে আজ পূর্ব্ব প্রণয়িনীর ফাঁসি দেখিতে দাঁড়াইয়াছে!

নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সহসা শতমন্যুর মনে পড়িল রাজপথে, দেবদেউলের অঙ্গনে, গৃহের ছাদে, বৃক্ষের শাখায় শত শত নাগরিকের দল। যে নারীকে শতমন্যু ভালবাসিত, তাহার নগ্নদেহ কিনা শেষে শতমন্যুর জন্য সহস্র চক্ষুর গোচর হইল! নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও সে রূপের কণাটুকু অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়িলে শতমন্যু মনে করিতে পারিত, সুখের শ্রেষ্ঠ স্বর্গে তাহার বাস—হায়রে! আজ কিনা সেই অপরিমিত রূপসাগর তাহার জন্যই জীবন্ত রবিকরে সহস্রের সম্মুখে প্রকাশ পাইতে বাধ্য হইল! তাহার অন্তর বলিতে লাগিল—মোহান্ত! তুমি এ কি করিলে? প্রেমের সকল রহস্যকে আজ তুমি এমনি করিয়া নগ্ন করিলে—সে দেব অর্ঘ্যটী আজ তুমি এমনি করিয়া মলিন করিলে? আজ লক্ষ নয়ন সেই অনাবৃত কুসুমের সুষমা লুটিয়া লইল—আজ কত কলুষিত অন্তর এই পরিপূর্ণ হেমপাত্রের সুধা অনায়াসে পান করিল!

শতমন্যু আর ভাবিতে পারিল না। রোষে ও ক্ষোভে কাঁদিয়া ফেলিল।

হায়রে! সে যদি বেদেনী না হইত, শতমন্যু যদি না মোহান্তের সন্ন্যাস লইত, পৃথিবীতে অংশুমান বলিয়া যদি কেহ না থাকিত—বেদেনী যদি শতমন্যুকেই ভালবাসিত

তাহা হইলে আজ শতমন্যুর সুখের পার দেখিত কে? আজও ত কত প্রেমিক প্রেমিকা কুসুমকুঞ্জে প্রেমের গুঞ্জন শুনিতেছে, নদীতীরে জলের বুকে আলোকের লীলা দেখিতেছে, মুক্ত চত্বরে বসিয়া আকাশের দীপ্ত নক্ষত্র গণিতেছে। শতমন্যুর জীবনটাও ত আজ তেমনি মধুর, তেমনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিত। শতমন্যুর হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠিল।

সে! সে! এখনো সেই বেদেনী পান্না! একমাত্র তাহার চিন্তাটাই শতমন্যুকে নিয়ত মর্ম্মান্তিক আঘাত করিতে লাগিল, মাথার ভিতর খুঁড়িয়া ঘা করিল, অন্তরকে সহস্রবার শল্যবিদ্ধ করিল! শতমন্যু বিন্দুমাত্র অনুতাপ করিল না। সে মরিল বলিয়া বিন্দু মাত্র চোখের জল ফেলিল না। গণপতি অংশুমানের বুকে বেদেনীকে দেখা অপেক্ষা তাহাকে জল্লাদের হাতে অর্পণ করা যে শতগুণে ভাল ইহাতে আর শতমন্যুর কোনো সন্দেহ ছিলনা। এইবার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সেই ফাঁসিতলার কথা, বেদেনীর কণ্ঠের সেই কঠিন রজ্জুর কথা! এতক্ষণে—এতক্ষণে বোধ হয় জল্লাদ ফাঁসিটা আঁটিয়া দিয়াছে! দিয়াছে? নিশ্চয়ই দিয়াছে। তাহার ত দয়া মমতা নাই, সে যে নরঘাতক! সে যে জল্লাদ!

শতমন্যুর প্রতি লোমকূপ দিয়া অবিরল তপ্ত স্বেদ ঝরিতে লাগিল!

মনে পড়িল সেই প্রথম দর্শন। সেদিন সে অধ্যয়নে রত থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একবার চাহিয়া দেখিল—দেবদেউলের অঙ্গনে নৃত্যশীলা প্রজাপতি! পাখীর মত গীতিমুখরা, পাখীর মতই পুলকমগ্না, মক্ষিকার মত চঞ্চল সে—ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে; তাহার পেশোয়াজ ভাঁজে ভাঁজে কাঁপিতেছে, মাথার রঙ্গীণ রেশমী রুমাল আগুল্ফলম্বিত কেশরাশির উপর রামধনুর বর্ণে মাখা পতাকার মত দুলিতেছে। তখনই আবার মনে পড়িল—মহাযাত্রাপথে সেই বেদেনীর অর্দ্ধনগ্নদেহ, রজ্জুজড়িত কণ্ঠ,—সে যে ভাঙ্গা সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে ফাঁসির মঞ্চে উঠিতেছে!

শতমন্যু যাতনার চীৎকার ধরিয়া উঠিল। একটা গাছের সঙ্গে কপাল ঠুকিল।

এইরূপে কখন যে সন্ধ্যা হইল তাহা শতমন্যু জানিতে পারিল না। একটা পক্ষীর অতি কর্কশ রবে শতমন্যুর যখন চমক ভাঙ্গিল তখন সে দেখিল, মাথার উপর নীলাকাশ চন্দ্রকরে কেমন উজ্জ্বল, বাতাসে লঘুমেঘের গতি কেমন লীলাময়, দূরে অনন্ত বিস্তৃত বারিধি কত প্রশান্ত। প্রকৃতির প্রত্যেকটী শোভা শতমন্যুর হৃদয়ে শেল বিঁধিতে লাগিল। শতমন্যু আবার উন্মত্তের মত রুদ্ধশ্বাসে নদীতীর ধরিয়া ছুটিল। দূরে দূরে—আরো দূরে সকল শোভা ও রূপ হইতে অন্তরে। ছুটিতে ছুটিতে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া সে বালুময় নদীসৈকতে বসিয়া পড়িল। দেখিল, প্রকৃতি তাহাকে ছাড়ে না! জ্যোৎস্নালোকোদ্ভাসিত বারিবক্ষ, মৃদু তরঙ্গের চঞ্চল লীলা, নদীস্রোতের অবিরাম কলতান সবই সুন্দর, সবই সুন্দর। শতমন্যু চক্ষু মুদিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—সমস্ত বিশ্বে আর কিছু নাই, কেবল আছে বেদেনী পান্না আর গোফার মাঠে ফাঁসির মঞ্চ। সেই একই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে শতমন্যুর বোধ হইল, ক্ষুদ্র এতটুকু পান্না ক্রমেই জ্যোতির্ম্ময়ী হইতেছে। উজ্জ্বল—আরো উজ্জ্বল—আরো, আরো উজ্জ্বল! কি সে মোহিনী মূর্ত্তি! কি সে মূর্ত্তির অপূর্ব্ব মাধুরী।

ও কি? ও আবার কি? শতমন্যু শিহরিয়া উঠিল—কাঁদিতে লাগিল। দুই করে নয়ন ঢাকিল, কিন্তু তবুও ত নিস্তার নাই! দেখিতে লাগিল সেই ফাঁসির মঞ্চটা ক্রমেই ভীষণ কদাকার হইতেছে। শেষে যেন একখানা যোজন বিস্তৃত বিরাট বাহুর কঙ্কালে পরিণত হইল। আর জ্যোতির্ম্ময়ী পান্না উড়িতে উড়িতে আকাশে উড়িয়া সন্ধ্যাতারার মত জ্বলিতে লাগিল। নিয়ত বর্দ্ধমান সেই বাহুর কঙ্কাল আকাশ পথে ধাইয়াও তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিল না! সন্ধ্যাতারা নদীর বুকে ভাঙ্গিয়া শতখান হইতেছে। এ দৃশ্য আর সহিতে না পারিয়া শতমন্যু বেগে অগ্রসর হইল।

শতমন্যু ভাবিয়াছিল, তাম্রলিপ্ত ছাড়িয়া সে যেন কোন্ এক অজানা দেশে আসিয়াছে—এইখানেই তাহার মহাযাত্রাপথের আজ আরম্ভ মাত্র! কিন্তু কিছুদূর যাইতেই সে বুঝিতে পারিল, এ ত অজানা দেশ নয়—মাঝিপাড়ার জাহাজ ঘাট—শ্মশান তুল্য নীরব। দূরে কয়েক খানা জাহাজ বাঁধা। তীরে কম্পিত নৌকাগুলি হইতে প্রদীপের আলোক বাহির হইয়া জলে পড়িতেছে। সম্মুখে যে পথ

দেখিল, শতমন্যু সেই পথেই অগ্রসর হইল। যাইতে যাইতে শুনিল, রক্ষছায়ার অন্তরালে একটা দোকান হইতে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ আসিতেছে। শতমন্যু বুঝিতে পারিল না যে কাঠের বেলুনীর সঙ্গে পবনান্দোলিত বেলুনী লাগিয়া ঐরূপ শব্দ হইতেছে। অস্পষ্ট আলোকে তাহার মনে হইল, বিলম্বিত নর কঙ্কালের গায়ে নর কঙ্কালের আঘাত লাগিয়া বাজিতেছে!

বিভ্রান্ত চিত্তে চলিতে চলিতে শতমন্যু দেখিতে পাইল, বিরাট অশোক স্তম্ভটা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন ভীষণ একটা যমদণ্ড। স্তম্ভের গায়ে স্থানে স্থানে চন্দ্রকর পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। শতমন্যু ভাবিল, যমদণ্ডটা অগ্নিময়, তাহারই মাথায় পড়িবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে! নিদ্রামগ্ন তাম্রলিপ্তের নির্জ্জন পথে আসিতে আসিতে দেবদেউলের নিকটে আসিয়াই শতমন্যু থমকিয়া দাঁড়াইল! উহার দিকে চাহিতেও তাহার আর সাহসে কুলাইতেছিল না; সে মনে মনে কহিল 'আজ কি এই খানেই এমন একটা নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়া গেল! না-না সে ত সম্ভব নয়! এ যে দেবতার মন্দির!"

যে গুপ্তপথে দেবদেউলের বাহিরে হইয়াছিল, শতমন্যু পুনরায় সেই পথে দেউলে প্রবেশ করিল। সূচিভেদ্য অন্ধকার সেখানে ভূগর্ভের ন্যায় নীরব। তাহার বড় ভয় হইল। মনে হইল, দেউল যেন প্রাণ পাইয়াছে, যেন পাথরের বৃহৎ বৃহৎ চরণ ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, যেন সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে সমস্ত বিশ্ব! সে যেন ঘোর ধ্বংস-লীলার একটা ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য! শতমন্যুর দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল বেদেনীর ছায়া সেই অন্ধকারে চলিয়া বেড়াইতেছে। শতমন্যু ভয়ে বসিয়া পড়িল! চক্ষের উপর যেন দেখিতে লাগিল, গোফার মাঠে বেদেনীর শবদেহ ফাঁসির স্তম্ভে ঝুলিতেছে!

শতমন্যু কতক্ষণ এই ভাবে বসিয়াছিল জানে না, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। চীৎকার করিয়া ডাকিল—ভৈরব! ভৈরব! কিন্তু মুখে শব্দ বাহির হইল না! তখন সে উর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। ভাবিল চতুর্থ তলে ভৈরবের কাছে গিয়া আশ্রয় লইবে। অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে যখন সে চতুর্থ তলে আসিয়া পৌঁছিল তখন দেখিতে পাইল, দেউলের যেদিকে চন্দ্রকর তত উজ্জ্বল হইয়া পড়িতে পায় নাই, সেই দিক হইতে একটী শ্বেতাম্বরা ছায়া মূর্ত্তি আসিতেছে! সে ছায়ার যেন কায়াও আছে—সে যেন একটী নারীমূর্ত্তি। আর সেই মূর্ত্তিটার পাশেই একটা ছাগী! পেচকের রব শুনিয়া ছাগীটা তখন কাতর কণ্ঠে ডাকিয়াও উঠিল। শতমন্যু সাহস করিয়া দাঁড়াইল—সাহস করিয়া সেই নারীমূর্ত্তির দিকে চাহিল। চিনিল—এ যে সেই বেদেনী!

এইবার শতমন্যু সেই খানে একেবারে পাথর হইয়া গেল। দৌড়িতে চাহিল, কিন্তু চরণ উঠিল না। শ্বেতাম্বরা এক পা এক পা করিয়া সেই দিকেই আসিতেছে দেখিয়া শতমন্যু প্রাণপণে নিজের দেহকে টানিয়া তুলিল এবং এক পা এক পা করিয়া পিছু হটিতে হটিতে চতুর্থ তলের দরজা দিয়া আবার অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল। তাহার মাথার কেশ খাড়া হইয়া উঠিল, চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ধর্ম্মবিশ্বাস

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলেন (১) যে কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ-কৃত ও তাৎকালিক বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা করিলে কবিকঙ্কণের বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হয় না।

কবিকঙ্কণ সম্ভবতঃ ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল প্রকাশ করিয়া আরড়ার রাজসভায় গান করিয়াছিলেন। ঐ কালে বৈষ্ণবের প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহা জানিতে

১) ভারতী, ১৩২৭, অগ্রহায়ণ ও চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী।

হইলে ঐ কালেরই বৈষ্ণব সাহিত্য ঘঁটিয়া দেখিতে হয়। ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ ১৪৯০ শকে অর্থাৎ ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। (২) এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই উপাখ্যানটা আছে। একদিন দিব্য সিংহ রাজার পুত্র ও কমলাক্ষ (অদ্বৈতপ্রভুর বাল্যনাম) উভয়ে শিলাময়ী কালিকার মণ্ডপে গমন করেন। রাজপুত্র দেবী বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া কমলাক্ষকে বলেন, প্রণাম কর। কমলাক্ষ তাঁহার কথা শুনিয়াও শুনেন না। রাজপুত্র কমলাক্ষের এইরূপ অন্যমনস্কতায় রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তাহাতে কমলাক্ষেরও রজোগুণাশ্রয় ও ক্রোধ সঞ্জাত হয়।

প্রভু রজঃ স্বীকারিয়া হুঙ্কার করিলা।
রাজসুত মূর্চ্ছা হই ভূতলে পড়িলা॥ (৩)

তৎক্ষণাৎ এই দুঃসংবাদ রাজসমীপে প্রচারিত হইল। কমলাক্ষ 'উই পোতার' মধ্যে লুকাইয়া রহিল। কমলাক্ষের পিতৃদেব কুবের তর্কপঞ্চানন রাজা দিব্যসিংহের সহিত সেই স্থানে আসিয়া কমলাক্ষকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। রাজা কমলাক্ষকে পুত্রহন্তা ভাবিয়া ভৎর্সনা করিলে কমলাক্ষ নারায়ণের চরণামৃতে অভিষিক্ত করিয়া মুৰ্চ্ছিত রাজপুত্রের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

রাজা কহে কমলাক্ষ তুমি দ্বিজরাজ।
কি লাগি কৈলা এই সাংঘাতিক কাজ॥
লজ্জা পাঞা প্রভু বৈল ইহোঁ মরে নাই।
আছয়ে মূৰ্চ্ছিত হঞা এখনি জীয়াই॥
এত কহি নারায়ণের শ্রীচরণামৃতে।
অভিষিক্ত করি জীয়াইলা রাজসুতে॥

রাজা মৃত বলিয়া বিবেচিত পুত্রের পুনৰ্জ্জীবন লাভে আনন্দিত হইয়া বহু দ্বিজ ও দরিদ্রকে ধনদান করিলেন। কিন্তু পুত্রের এবম্বিধ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেও কুবেরাচার্য্য রাজপুত্রের পুনৰ্জ্জীবনলাভে আশ্বস্ত হইয়া পুত্রের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন না। তার পর দীপান্বিতা উৎসব উপলক্ষে নৃত্য গীত সভায় দেবীর মণ্ডপে গ্রামের ইতর ভদ্র সকলে সমবেত হইল। কমলাক্ষ সেই সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া মধ্যস্থলে উপবেশন করিতেই রাজা রুষ্ট হইলেন।

রাজা কহে কমলাক্ষ এ কি ব্যবহার।
কালিকা না প্রণমিলা কি ভাব তোমার॥
প্রভু কহে পরংব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্।
তিহোঁ মোর সাধ্য বস্তু নহে কেহ আন॥
নানা মতে যেই যায় তার বিড়ম্বনা।
বিজ্ঞজনে এক ইষ্ট করয়ে ভাবনা॥

পুত্রের এই ব্যবহারে কুবের রাজপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক তর্ক করিতে লাগিলেন। বলিলেন—

অহে কমলাক্ষ তুমি না পাইলা অন্ত।
এক ব্রহ্মের নানারূপ বেদের সিদ্ধান্ত॥
দেব দেবী দ্বেষ সেহি মহা পাপকর।
পূজিবে দেবতা সবে হইয়া তৎপর॥
ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র সাক্ষান্নারায়ণ।
সীতা উদ্ধারিতে কৈলা দেবীর পূজন॥
জগন্মাতা ভগবতী অতি দয়াবতী।
তাঁরে ভজি মুক্তি পায় যত জ্ঞানী ব্রতী॥
অতএব কালী মায়ে করহ প্রণাম।
না রহিবে বিপৎ সিদ্ধ হবে মনস্কাম॥

কমলাক্ষ পিতার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। কালী মাতাকে প্রণাম করিলেন না।

প্রভু কহে শুন পিতা না করিও রোষ।
একনিষ্ঠ না হইলে হয় বহু দোষ॥
যৈছে বৃক্ষমূলে জল করিলে সেচন।
শাখা পল্লবাদ্যে হয় তৃপ্তির সাধন॥
তৈছে সর্ব্ব দেব দেবীর মূল নারায়ণে।
পূজিলে সকল পূজা হয় সমাধানে॥ (৪)
বিষ্ণুমায়া ভগবতী বহিরঙ্গা বলে।
যাঁহার মায়াতে জীব তত্ত্বজ্ঞান ভুলে॥
প্রাণি হিংসা যজ্ঞে যেই হয় উল্লাসিত।
সে দেবী উপসনা না হয় উচিত॥
তেহোঁ যদি জগন্মাতা জগৎ তাঁর পুত্র।
সন্তান বধিতে কিবা আছে যুক্তি শাস্ত্র॥

পিতা-পুত্রের তর্ক শ্রবণে সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। পিতা পুত্রের নিকট পরাজিত হইয়াও পরাজয়

(২) চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে। লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে॥ ২২শ অধ্যায়।

(৩) সতীশচন্দ্র মিত্রের সংস্করণ ১৫-১৯ পৃষ্ঠা।

(৪) যথা তরোর্মূল নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধ ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণ মচ্যুতেজ্যা॥ শ্রীমদ্ভাগবত, ৪।৩১।১০

স্বীকার করিলেন না। পিতৃ-আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে দেবীর নিকট প্রণাম করিতে হইল। কিন্তু তাহার পরে যে ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহাতে শাক্তের সহিত যুদ্ধে বৈষ্ণবের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল।

প্রভু কহে পিতা মম অপরাধ ক্ষম।
এখনি দেবীরে মুঞি করিমু প্রণাম॥
এত কহি দেবীর আগে কৈলা নমস্কার।
হেন কালে হৈল এক অতি চমৎকার॥
দেবী অন্তর্দ্ধানে সেই প্রতিমা ফাটিল।
তাহা দেখি লোক সব বিস্মিত হইল॥
ইহার কারণ সেই প্রতিমা চেতনা।
নিজ প্রভু দেখি ঐছে করিল ঘটনা॥

এই আখ্যায়িকা হইতে বেশ বুঝা যায় যে কবিকঙ্কণের সমসাময়িক বৈষ্ণবগণ শাক্তের দেবতা মানিতেন না, শাক্তের দেবতাকে প্রণাম করিতেন না, এবং শাক্তের দেবতার গান নিশ্চয়ই গাহিতেন না। যদি কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব হইতেন, তবে তিনি কখনও দেবীর গান গাহিতেন না, দেবীকে প্রণাম করিতেন না। কিন্তু 'উমাপদাহিতচিত্ত' শ্রীকবিকঙ্কণ 'চণ্ডীপদ ভাবিয়া' 'নূতন সঙ্গীত' রচনা করিয়া চণ্ডীর মহিমা গাহিয়াছেন। চণ্ডী 'মায়ের বেশে কবির শিয়র দেশে' বসিয়া তৎপ্রদত্ত 'শালুক পোড়া' নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া কবিকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। কবি সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

ঈশান নাগরের সময়ে ও তৎপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতেও এক বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেব দেবীর অর্চ্চনা অনুমোদিত হয় নাই।

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বলে সেই ছার শোচ্যতর॥
দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।"

চৈতন্য ভাগবত, আদি, ৭৯ পৃঃ, শিশির ঘোষের দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে কলির প্রতাপে পৃথিবী পাষণ্ডীর গণে ভরিয়া উঠিয়াছে।

ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সব এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহারে সেবেন সবে মহা দম্ভ করি॥
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোকে আনন্দিত॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩৩৪ পৃঃ

ঐ গ্রন্থের অন্ত্য খণ্ডে হিরণ্যপণ্ডিত নামক চণ্ডী-উপাসক একজন ব্রাহ্মণের আখ্যান আছে। ঐ ব্রাহ্মণ চণ্ডী পূজা করিয়া ডাকাইতি করিতে যায়। কিন্তু বৈষ্ণবের বাড়ীতে ডাকাইতি করিতে গিয়া ঐ 'দস্যু-সেনাপতি ব্রাহ্মণ' বিপদে পড়িয়াছিল। অবশেষে সে বৈষ্ণবের অনুগ্রহে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক চরিত্র সংশোধন করে। (৫)

চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে শ্রীবাসের দ্বারে এক পাষণ্ডী ভবানী পূজা করিয়াছিল। শ্রীবাস নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, তিনি 'হাড়ি' আনাইয়া তাহার সাহায্যে ঐ ভবানী পূজার উপকরণ সমূহ দূর করাইয়া গোময়াদি লেপন দ্বারা তাঁহার দ্বারদেশ সংস্কৃত করাইয়া ফেলেন। এ দিকে দিনত্রয় মধ্যে ঐ ভবানী পূজাকারী পাষণ্ডী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া শ্রীবাসের শরণাপন্ন হয়। বলা বাহুল্য শ্রীবাসের অনুগ্রহে তাহার রোগমুক্তি হয়। (৬)

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" লেখক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও এই কালের শাক্ত-বৈষ্ণবের বিবাদের সরস বর্ণনা করিয়াছেন।

"শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে যত পেট ভরিবার আশ॥
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
পরম উদ্ধতপনা কোন ব্যবহার॥
কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিল পথ॥
ধীরে ধীরে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়ে।
নাচিলে গাহিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়॥"

চৈঃ ভাঃ আদি।

"এত কহি হাসি হাসি পাষণ্ডীর গণ।
চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে আস্ফালন॥
প্রণমিয়ে চণ্ডীয়ে কহয়ে বারে বার।
অদ্য রাত্রে এ গুলিরে করিবে সংহার॥" ভক্তিরত্নাকর।

---

(৫) ৩২৪—২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৬) আদিলীলা, বঙ্গবাসী সংস্করণ।

"লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে।
অনল জ্বালিয়া দিব তার মাঝ মুখ পানে ।।"
"এত পরিহারে যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে ।।" চৈ: ভাঃ
"করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে ।।
কেহ কেহ মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া।
খড়্গ করে করয়ে নর্ত্তন মত্ত হৈয়া ।।
সে সময় যদি কেহ সেই পথে যায়।
হইলেও বিপ্র তার হাতে না এড়ায় ।।
সভে স্ত্রী লম্পট জাতি-বিচার রহিত।
মদ্য মাংস বিনে না ভুঞ্জয়ে কদাচিত।।"

নরোত্তমবিলাস, ৭ম বিলাস।

বৈষ্ণব সাহিত্যে এই প্রকার শাক্ত বৈষ্ণবের বিবাদ বিষয়ক আখ্যান অনেক আছে। এই বিবাদের ফলে বৈষ্ণবগণ 'দুর্গা' শব্দের পরিবর্ত্তে 'হাতী শুঁড়োর মা', 'বিল্ব' শব্দের পরিবর্ত্তে 'তে-ফেরেঙ্গা গাছ', 'রক্ত' শব্দের পরিবর্ত্তে 'আঁটা' প্রভৃতি বহু শব্দ নিজেদের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ঈশ্বর গুপ্ত এই বিবাদের শ্রুতি রোচক বর্ণনা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে চণ্ডীর গানের রচয়িতা মুকুন্দ রায় কবিকঙ্কণকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বৈষ্ণবগণের চারি সম্প্রদায়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে "ভক্তি কল্পতরু" বলা হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মালাকার এবং তরুরূপী। এই বৃক্ষের নয়টী মূল।

পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী
বিষ্ণু পুরী, কেশব পুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ ।।
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ।।

এই নয়টী মূলের মধ্যে পরমানন্দ পুরীই মধ্যমূল। বৃক্ষস্কন্ধে অসংখ্য শাখা। সেই শাখার বিশ বিশটী লইয়া এক একটী মণ্ডল। প্রতি শাখায় আবার শত শত শাখা। উপশাখা গুলিরও উপশাখা আছে। এইরূপে ভক্তিকল্পতরু সমগ্র বঙ্গ এবং উৎকল দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
অষ্ট দিকে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল স্থির ।।
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ।।
বিশ বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল ।।
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত ।।

এই বৃক্ষের দুই স্কন্ধ, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। এই দুই স্কন্ধে শাখা প্রশাখা গজাইয়াছে।

বৃক্ষের উপরে শাখা হইল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম, আর নিত্যানন্দ ।।
সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল।
তার উপ শাখাগণে জগৎ ছাইল ।।
বড় শাখা, উপশাখা, তার উপশাখা।
যত উপজিল তার কে করিবে লেখা ?
শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল—তার নাহিক গণন ।।
উড়ুম্বর বৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব্ব অঙ্গে।
এই মত ভক্তি বৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ।।
মূল স্কন্ধের শাখা আর উপশাখা গণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ।।
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্য মালী—নাহি লয় মূল ।।

আদি লীলা, নবম।

কোনও বৈষ্ণবের পরিচয় দিতে হইলে এই ভক্তি কল্পবৃক্ষের শাখাদি নির্দ্দেশ করিতে হয়। নতুবা সে বৈষ্ণবের পরিচয় হয় না। যেমন ভক্তিরত্নাকরে—

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ব বাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে ।।
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ।।
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস, আর দাস ঘনশ্যাম ।।
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহা পাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রি দিন ।।
দয়ার সমুদ্র শুহে বৈষ্ণব গোসাঁই।
যেন পায় তুয়া কৃপা বিনা গতি নাই ।।

নরহরি কহে এই কৃপা কর মোরে।
নিরন্তর ডুবি যেন ভক্তি-রত্নাকরে॥

বল্লালসেন-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় (রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর) ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয় দিবার যেমন একটী গাঁই গোত্রাদি যুক্ত বিশিষ্ট ধারা প্রচলিত আছে, চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও সেইরূপ গুরু ও শাখাদি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আত্মপরিচয় দানের একটী বিশিষ্ট প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। চণ্ডীমঙ্গলের কবিও আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রণালীতে নহে, বল্লালী রীতিতে। গাঁই গোত্র সহ সাত পুরুষের পরিচয় আছে, কিন্তু গুরুর উল্লেখ নাই। এটি বৈষ্ণবী প্রণালী নহে। সুতরাং এ হিসাবেও কবিকে বৈষ্ণব বলা যায় না।

কাঞ্জারি কুলের সার মহা মিশ্র অলঙ্কার
শব্দকোষ কাব্যের নিধান।
কয়ারি কুলের রাজা সুকৃতি তপন ওঝা
তস্য সুত উমাপতি নাম॥
তনয় মাধব শর্ম্মা সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা
তার নয় তনয় সোদর।
উদ্ধরণ পুরন্দর নিত্যানন্দ সুরেশ্বর
বাসুদেব মহেশ সাগর।
গর্ভেশ্বর অনুজাত মিশ্রনাথ জগন্নাথ
এক ভাবে সেবিলা শঙ্কর।
বিশেষ পুণ্যের ধাম গুণীরাজ মিশ্র নাম
কবিচন্দ্র তার বংশধর॥
অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা সুকবি সুকৃতকর্ম্মা
নানা শাস্ত্র মিশ্রয়ে বিদ্যান।
শিবরাম বংশধর কৃপা কর মহেশ্বর
রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান॥

কবির এই আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বৈষ্ণব কবিগণ আত্ম প্রসঙ্গে যে প্রকার বৈষ্ণব বিনয়ের অবতারণ করিয়াছেন, চণ্ডীর কবি তাহা করেন নাই। বৈষ্ণব বিনয়ের উদাহরণ ইতিপূর্ব্বে একটী (নরহরিদসের) উদ্ধৃত হইয়াছে, আর একটী এখানে দিলাম।

সেই সব লীলারস আপনে অনন্ত।
সহস্রবদনে বর্ণে—নাহি পায় অন্ত॥
জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তাহা কে পারে বর্ণিতে।
তার এক কণ স্পর্শি আপনা শোধিতে॥
যত চেষ্টা, যত প্রলাপ, নাহি তার পার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার।
বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥
তার ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল॥
অতএব সে সব লীলা নারি বর্ণিবারে।
সমাপ্ত করিল লীলাকে করি নমস্কারে॥
যে কিছু কহিল এই দিগ দরশন।
এই অনুসারে হবে আর আস্বাদন॥
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে।
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্য চরিত বর্ণন কৈল সমাপন।
আকাশ অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ।
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার।
যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি, তাবৎ বলিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল।
নিত্যানন্দ কৃপা পাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্য-লীলার তেঁহো হয় আদি ব্যাস।
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর।
'যে কিছু বর্ণিল সেহো সংক্ষেপ করিয়া
লিখিতে না পারি গ্রন্থে রাখিয়াছে লিখিয়া।
চৈতন্য মঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিব বর্ণনে।
চৈতন্য-মঙ্গল ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহে—'ব্যাস আগে করিব বর্ণনে।'
চৈতন্য লীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণারূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈল পান।
তাঁর ঝারী শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা।
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গা টুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী।
তৈছে আমি এক কণ ছুইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥

'আমি লিখি' এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান ॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥
নানা রোগগ্রস্ত, চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চ রোগের পীড়ায় ব্যাকুল,—রাত্রি দিনে মরি ॥
পূর্ব্ব গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে শুন ইহার কারণ ॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত (আর) শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীব চরণ ॥
ইহা সভা চরণ কৃপায় লেখায় আমারে।
আর এক হয়—তেঁহো অতি কৃপা করে ॥
শ্রীমদন গোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায় তভু রহিতে না পারি ॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ ॥
তোমা সভার চরণধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্য লীলা হৈল যে কিছু লিখন ॥

চৈঃ চঃ বঙ্গবাসী সংস্করণ ৩৬১-৬২ :

বৈষ্ণব সহিত্যের এই দৈন্যই শিষ্টাচার, এবং এই শিষ্টাচারই আত্মমর্য্যাদার জ্ঞাপক। এইজন্য এই প্রকার দৈন্য প্রকাশ কেবল যে নিজের সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা নহে। বৈষ্ণব কবিরা অন্যের সম্পর্কেও এই দৈন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সেইরূপ দৈন্যপ্রকাশের ফলে সেই সেই ব্যক্তির সম্মান বর্দ্ধন করাইয়াছেন। উদাহরণ দেখুন —

"শ্রীরূপ বল্লভ দোহে আসিয়া মিলিল ॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥"

চৈঃ চঃ মধ্য, ১৯৮ পৃঃ।

এই বিনয় ও এই প্রকার দৈন্য প্রকাশ করিতে যে না জানে, সে কি শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভের ন্যায় সম্মান লাভের যোগ্য? সুতরাং এই বিনয় বৈষ্ণব শিষ্টাচারে একান্ত আবশ্যক। এই বিনয় যার নাই সে বৈষ্ণব সমাজে প্রবেশাধিকার লাভের যোগ্য নহে। কিন্তু কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে যেখানে যম বিপাকে পড়িয়া দাঁতে কুটা করিয়া ক্ষমা চাহিতেছে, সেখানে যমের কোনও মহত্ত্ব সূচিত হয় না, তাহার নীচত্বই সূচীত হয়। * বৈষ্ণবসাহিত্যের ভাষায় দন্তে তৃণ করা প্রভৃতি পদসমষ্টিতে অপমানের কোনও অর্থ ত নাই-ই, উপরন্তু বৈষ্ণব শিষ্টাচারে ইহাই আত্মমর্য্যাদা ও গৌরবের বাচক। যে এই শিষ্টাচার না জানে সে বৈষ্ণব নহে। এই বৈষ্ণব বিনয়ের চরম উদাহরণ তৎকালের বৈষ্ণবগণের দাস উপাধি। বিপ্র জগন্নাথের পুত্র নরহরিদাস। আমাদের মুকুন্দরাম কিন্তু চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।

এই প্রকার বৈষ্ণব বিনয় কবিকঙ্কণের গ্রন্থে দেখা যায় না। কবিকঙ্কণ নিজে এই প্রকার দৈন্যপ্রকাশক ভাষার সহিত পরিচিতই নহেন। সুতরাং এ হিসাবেও তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

রাম ও কৃষ্ণ উভয় নামই বিষ্ণু পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও বৈষ্ণব সাহিত্যে রাম অপেক্ষা কৃষ্ণের মহত্ত্ব অনেক বেশী। যদিও গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য হইলেই তিনি যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন, তথাপি শ্রীমদ্ ভাগবতাদিতে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম এবং অবতার গুলি অংশ অবতার বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। চৈতন্য চরিতামৃতে বিষ্ণু মায়া যেখানে বারবিলাসিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ শ্রীহরিদাস গোস্বামীকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, সেই খানে রাম অপেক্ষা কৃষ্ণের অধিক মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে। রাম তারকব্রহ্ম, মুক্তিদান করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পাবক, তিনি পাপীর চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা ভক্তি দান করেন। বৈষ্ণবসাহিত্যে মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির মাহাত্ম্য অনেক বেশী। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ রাম নামের যতই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন না কেন, বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন অন্য কোনও দেবতার উপাসনা করেন না।

কবিকঙ্কণ তাঁহার গ্রন্থারম্ভে নানাদেবদেবীর বন্দনা করিয়াছেন, এবং সেই প্রসঙ্গে রাম বন্দনাও করিয়াছেন।

---

* পরাণে কাতর যম পড়িলা ভূমিতে।
শিবের কিঙ্কর বলি কুটা নিল দাঁতে।

কলিঃ বিশ্বঃ সং ৫১ পৃঃ

তিনি বৈষ্ণব হইলে রামবন্দনা না করিয়া কৃষ্ণ বন্দনা করিতেন। এই কৃষ্ণ বন্দনার অভাব হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না।

কবিকঙ্কণের বৈষ্ণবত্বের আর এক অন্তরায় তাঁহার দুই কুলদেবতা—চক্রাদিত্য শিব ও সিংহবাহিনী দেবী। যে সংসারে বহু পুরুষ ধরিয়া এই দুই কুলদেবতা প্রতিষ্ঠিত সে সংসারে বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্রোত বহিয়াছিল বলিয়া মনে করা যায় না। যদিও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া শিবকে বৈষ্ণবগণ দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহার উপাসনা করিতে বা কুলদেবতার আসনে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারেন না। সিংহবাহিনী দেবী ত তাঁহাদের নিকট উপাস্যা হইতেই পারেন না। সুতরাং এই হিসাবে বিবেচনা করিলেও কবিকঙ্কণকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যানা।

কবিকঙ্কণের পূর্ব্বপুরুষগণের কাহারও নাম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিবিধ বংশ তালিকার কোনওটিতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। কাশীনিবাসী তপন মিশ্রের সহিত কবিকঙ্কণের পূর্ব্বপুরুষ "সুকৃতি তপন ওঝার" অভিন্নত্ব কল্পনা বাতুলতা মাত্র। কবিকঙ্কণও তাঁহার অমর গ্রন্থে বহু প্রাচীন সাহিত্যিক ও তাঁহাদর গ্রন্থাদির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্য সম্প্রদায়ের কোনও বিশিষ্ট সাহিত্যিক বা তাঁহাদের গ্রন্থাদির উল্লেখ তিনি করেন নাই। রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, কবিকর্ণপুর এবং কুলীন গ্রামের খাঁবংশের অনুল্লেখ কবিকঙ্কণের বৈষ্ণবত্বের অনুকূল নহে।

"প্রণাম করিয়া বন্দ ব্রাহ্মণ চরণ। বৈষ্ণব চরণ বন্দ হরিসংকীর্ত্তন॥
আদ্যকবি বাল্মীকিরে করিল প্রণতি। পরাশর, শুক, ব্যাস, বন্দ বৃহস্পতি॥
জয়দেব, বিদ্যাপতি, বন্দ কালিদাস। করজোড়ে বন্দিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥
মাণিক দত্তেরে আমি করিনু বিনয়। যাহা হেতু হৈল গীত পথ পরিচয়॥
এত সব কবিদের বন্দিয়া চরণ। দণ্ডবৎ হয়্যা বন্দ শ্রীকবিকঙ্কণ।"

(অর্থাৎ বলরাম কবিকঙ্কণ)।

ক, ক, চ দিগ্ বন্দনা।

"পড়য়ে সাধুর বালা, ক খ গ আঠার ফলা, সুবিহানে করিয়া যতন।
রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা, অমরকোষ নাটিকা, গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ॥
পড়িল কথন দণ্ডী, করিতে কবিত্ব খণ্ডী, নানাছন্দ পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগে, পড়িল ভারবি মাঘে, বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল॥
জৈমিনি ভারতামৃত, ব্যাস পড়ে মেঘদূত, নৈষধ কুমারসম্ভব।
দিবানিশি নাহি জানি, পড়ে রঘু খেতমুনি, রাঘব-পাণ্ডবী জয়দেব॥
অব্যাহত বুদ্ধিগতি, পড়ে দুই সপ্তসতী, পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী।
হিত উপদেশ কথা, পড়িল বাসবদত্তা, কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী॥
কাব্য প্রকাশ পড়ি, অভ্যাস করিল খড়ি রত্নাবলী সাহিত্য দর্পণে।

* * *

বৈদ্যক জ্যোতিষ যত, বিশেষ বলিব কত, একে একে পড়িল শ্রীপতি॥"
"ব্যবহারে বড় ঋজু, নিত্য পড়ে বেদ যজু, বেদ বিদ্যা পড়ে অবিরত॥"
"কেহ পড়ে ভারত পুরাণ।"
"দীপিকা ভাস্বতী ধরে, শাস্ত্র বিচার করে।"
"বেদ-অন্ত দরশনে, ব্রহ্ম করি যাঁরে ভণে, অন্তে বলে পুরুষ প্রধান।"

কবিকঙ্কণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সুবর্ণবণিক কুলের অতি বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব বংশের সেরূপ কোনও বিবরণ দেন নাই। কবি বৈষ্ণব হইলে নবপ্রতিষ্ঠিত নগরে অন্যান্য জাতির সহিত বৈষ্ণবগণেরও সসম্মানে বাসের ব্যবস্থা করিতেন এবং সেই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণাদির ন্যায় বৈষ্ণবগণেরও একটা বংশতালিকা ও বিবরণ দিতেন।

কুলে শিলে নহে নিন্দ, মুখটি চাটাতি বন্দ্য, কাঞ্জীবিল্ব গাঙ্গুলি ঘোষাল।
পুইতণ্ড বৈসে হড়, বাগাঞ্চি কেশর গড়, ঘণ্টেশ্বরী বৈসে কুলিলাল॥
পারীঘাতী পীতমুণ্ডী, ঝিকরাজি মালখণ্ডী, ঘুঘুড়ি বলাল কুশুমাল।
চোটখণ্ডী পলশাঞী, দিগাড়ি কুসুমগাঞী, শাগাঞি, কুলভি পারীয়াল॥
কড়িয়াল কুলথাল, সিহলাহি কুলিয়াল, পিপিলাই বৈসে পূর্ব্বগাঞী।
ধনে মানে অতি চণ্ড, বাপুলী পিশাচখণ্ড, কর্ণাই সেড়ো বৈদগাঁই॥
পালধি হিজলগাঞি মাসচটক দিণ্ডীসাঞী, করড়ি দানড়ি ভুরিষ্টাল।
বটগ্রামী নন্দীগাঞি, ভাট্যাতি শীতল শাঞী, লালসী কোঙরী মতিলাল॥
গাঞী নাহি গোত্র আছে, বসিলা বাড়ীর কাছে, বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ নয় শত।
ব্যবহারে বড় ঋজু, অনুদিন পড়ে যজু, বেদবিদ্যা মুখে অবিরত॥

—বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণ ২৬৩ পৃঃ

কুলে শীলে হীন দোষ কেহ মাইসিয়া ঘোষ, বসুমিত্র আদি কুলজন॥
তব গুণে হৈয়া বন্দী, পাল সে পালিত নন্দী, সিংহ সেন দেব দত্ত দাস।
কর নাগ সোম চন্দ, কুণ্ড বিষ্ণু রাহা বন্দ্য য়েক স্থানে করিব নিবাস॥

ঐ ২৬৮ পৃঃ।

বেষা চাঁদ সদাগর, তার নাতি আছে বর, ঘর যার চম্পক নগরী।
তার সনে কৈলে কাজ, সভাতে পাইবে লাজ, জাতিনাশ কৈল বিষহরি॥
বর্দ্ধমানে ধুষ দত্ত, যার বংশে সোমদত্ত, মহাকুল বেণের প্রধান।
বাশুলীর প্রতিবাদী, দ্বাদশ বৎসর বন্দী, বিশালাক্ষী কৈল অপমান॥
মহাস্থান সাতগাঁ, যথা বৈসে রাম দাঁ, তার শুন কুলের বাখান।
মড়ায়ে পূর্ব্বিত বাড়ী বাসা দিয়া লয় কড়ি, তার ঘর শ্মশান সমান॥

হরি দত্ত বড় কুলে, তব সম নহে কুলে, রাজা তার কৈল অপমান।
কস্তেপুরে রাম কুণ্ডু, সেই বেটা লুণে ভণ্ড, সেহ নহে তোমার সমান ॥
কর্জ্জনায় হরি লা, নাহি পোষে বাপ মা, প্রভাতে না করি তার নাম।
ভাল্লুকির সোমচন্দ, সেজন কপট ছন্দ, দীক্ষাপথে শূন্য তার ধাম ॥
যে যে বেণ্যা আছে যথা সবাকার জানি কথা, সবে হয় দোষের আকর।
গঙ্গার দু কূল কাছে, গন্ধবেণে যত আছে, খুল্লনার যোগ্য নাহি বর ॥
ইং পাং সংস্করণ ২২২ পৃঃ।

ইহা ছাড়া বল্লাল সেনীয় ব্রাহ্মণ জাতির প্রশংসাও আছে—

"ব্রাহ্মণের সমান জাতি নাহি বল্লাল সেনীরা।"
ইং পাং সং ২২১ পৃঃ।

কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বৈশ্য প্রভৃতি জাতির যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণসেবি গণের প্রতি তাঁহার সম্মান প্রকাশ পায় না।

"কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ, দান করে নানা ধন।"
"বৈষ্ণ বৈসে মহাজন, কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ, কৃষিকর্ম্ম করে গো-রক্ষণ।
কেহ কলন্তর লয়, বৃষে কেহ ধান্য বয়, কাসে কিনে রাখে কোন জন ॥
কেহ দর করি তোলা, হীরা নীলা মতি পলা, নানা দেশ ভ্রমে স্থানে স্থানে
সাজন করিয়া নায়, নানান সহরে যায়, আনে শঙ্খ চামর চন্দনে ॥
চামর চমরী ভোট, সগলাদ গজ ঘোট, করভ পটিশ অঙ্গরাখি।
এক বেচে এক কেনে, নিতি নিতি বাড়ে ধনে, গুজরাটে বৈশ্যজন সুখী ॥"

কবিকঙ্কণ মৎস্য-সহযোগে অসংখ্য ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে জানিতেন। কিন্তু বৈষ্ণবের গৃহে মৎস্য ভোজন বিধি সঙ্গত নহে।

"রোহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল"
"পোড়া মীনে জামীরের রস" "পোড়া মাছে জামীরের রস"
"ভাজে চিতলের কোল, রোহিত মৎস্যের ঝোল, মানকচু মরিচ ভূষিত"
'করিয়া কণ্টকহীন, আম্র যোগে শোল মীন, ধর লোণ ঘন দিয়া কাঠি"
"আমি যেন পাই সোনা, শকুল মৎস্যের পোনা, গোটা কাসন্দি দিয়া তথি"
"বদরী শকুল মীন" "শকুল বদরী ঝোল"
"ভাজ কিছু রাই খরা, চিঙ্গড়ির কর বড়া"
"রান্ধিল পাঁকাল ঝব, দিয়া তেঁতুলের রস"
"আমার সাধের সীমা, হেলকা কলমী গিমা, বোয়ালি কাটিয়া কর পাক।
ঘন কাঠি খর জ্বালে, সম্ভোলিবে কটু তৈলে, তাতে পলতার শাক ॥"
"মীন চড়চড়ি কুমড়া বড়ি" ইত্যাদি

কবিকঙ্কণের বৈষ্ণবত্বের প্রতিকূল ছোট ছোট যুক্তি অনেক দেওয়া যায়। কিন্তু এবিষয়ে একটা প্রধান যুক্তি এই যে, কবিকঙ্কণ চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সঠিক সংবাদ রাখেন না। তাই তিনি তাঁহার চৈতন্য বন্দনায় লিখিয়াছেন ঃ—

"মুকুতির দেখাল্য শরণী" (কলি বিশ্বঃ সংস্করণ, ৩ পৃষ্ঠা) কিন্তু চৈতন্যদেব ভক্তিকল্পতরু; তিনি ভক্তি প্রচার করিয়াছেন, মুক্তির পথ দেখান নাই। চৈতন্য ধর্ম্মে 'মুক্তি' অপেক্ষা ভক্তির মূল্য অনেক বেশী।

"ভক্তি দেবীর দাসী মুক্তি শাস্ত্র পরমাণে।"
অদ্বৈতপ্রকাশ, ২০

রঘুনন্দনের যুগ হইতে বঙ্গদেশে যে স্মৃতি শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারেই আজ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। এই ব্যবস্থায় গণেশাদি পঞ্চদেবতা, সূর্য্য বা দ্বাদশ আদিত্য, শিব,দুর্গা (এবং দুর্গার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা) এবং বিষ্ণুর পূজা বঙ্গদেশে গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের শাসনে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। কারণ সকল সম্প্রদায়কে একত্র বাঁধিতে না পারিলে হিন্দু সমাজ টিকিতে পারে না। সেই জন্য আমাদের দেশের স্মৃতি ও পুরাণাদিতে এবং মহাভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। এই সকল কারণে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, আমাদের দেশের স্মার্ত্ত পণ্ডিত-গণের অনেকেই পঞ্চোপাসক ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা গণেশ, সূর্য্য, শিব, দুর্গা ও বিষ্ণু,—এই পাঁচটী দেবতার পূজার্চ্চনাদি করিতেন। আধুনিক যুগের ব্যবস্থাতেও তাহাই দেখা যায়। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের প্রারম্ভে আমরা গণেশ, সূর্য্য, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও রাম-চন্দ্রের বন্দনা পাইতেছি। এই সকল দেবতাই স্মৃতি শাস্ত্রানুমোদিত দেবতা। সুতরাং এই প্রমাণ হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে কবিকঙ্কণ স্মার্ত্তমতাবলম্বী ছিলেন। এই যুগে যে সকল কবি বৈষ্ণব ছিলেন না, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্মার্ত্তমতাবলম্বী ছিলেন। কৃত্তি-বাসও স্মার্ত্ত মতাবলম্বী ছিলেন। বিদ্যাপতি ত স্বয়ং স্মৃতিশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই অনুমানের

আর একটা অনুকূল প্রমাণ এই যে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আমাদের দেশে বহু স্মার্ত্ত পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছেন, এবং তাঁহারা প্রাচীন পুরাণাদি ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিবিধ গ্রন্থের চর্ব্বিত চর্ব্বণ দ্বারা অসংখ্য স্মৃতি গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় এই সকল স্মৃতি গ্রন্থের একটী বিস্তৃত বিবরণ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

আমার মনে হয় বঙ্গ ও মিথিলার অপরাপর স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের ন্যায় কবিকঙ্কণও স্মার্ত্ত মতাবলম্বী এবং 'পঞ্চোপাসক' ছিলেন। বেদান্ত দর্শনের 'ব্রহ্ম'কেই তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং অন্যান্য দেবদেবীগণকে সেই ব্রহ্মেরই অংশ মূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাই তিনি কোনও দেবতার সহিত বিরোধ করিতে সাহসী হন নাই। গ্রন্থারম্ভে নানা দেবদেবী বন্দনা করিবার পূর্ব্বেই তিনি "ব্রহ্মবন্দনা।" করিয়াছেন।

"বেদ-অন্ত দরশনে, ব্রহ্ম করি যারে ভণে, অন্যে বলে পুরুষ-প্রধান।
বিশ্বের পরম গতি, হেতু অন্তরায় পতি, তাঁরে মোর লাখ পরিণাম॥"

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সকল সংস্করণেই এই চারিটী পংক্তি দিয়া গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সম্পাদকগণ এই অংশটীকে গণেশবন্দনার সহিত মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সামান্য একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে এটী গণেশ-বন্দনা নহে, ব্রহ্মবন্দনা। ইহার পরেই 'বন্দো দেব গণপতি' বলিয়া গণেশ বন্দনা আরম্ভ হইয়াছে। সম্পাদকগণের নিকট এই চারিটী পংক্তির অর্থ পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া এই চারি পংক্তির অর্থ আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

"যিনি বেদান্ত দর্শনের 'ব্রহ্ম', সাংখ্য দর্শনে যাঁহাকে পুরুষপ্রধান বলে, যিনি এই বিশ্বের পরমগতি স্বরূপ, এবং যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, বিনাশ ও পালনের অধিদেবতা, সেই পরম পুরুষ পরমাত্মাকে আমি লক্ষ লক্ষ প্রণাম করি।"

কবি এখানে সাংখ্য দর্শনের নামোল্লেখ করেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, প্রাচীন সাংখ্য দর্শনে 'পরমাত্মা' বা ব্যষ্টি নিরপেক্ষ 'পুরুষ' বা 'প্রধান পুরুষের' সত্তা স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু উত্তর কালে সাংখ্য দর্শনেও 'ব্রহ্ম' বা 'পরমাত্মা' স্বীকৃত হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, 'অন্যে বলে পুরুষপ্রধান' বাক্য দ্বারাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় সাংখ্য দর্শনের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার গ্রন্থারম্ভে সৃষ্টিতত্ত্ব উপাখ্যানেও তিনি সাংখ্য মতের অবতারণা করিয়াছেন।

"এক দেব নানা মূর্ত্তি হৈলা মহাশয়। হেম হৈতে বস্তুতঃ কুণ্ডল ভিন্ন নয়॥
প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিলা আধান। রূপবান্ হৈলা তাতে তনয় মহান্॥
মহতের পুত্র হৈলা নাম অহঙ্কার। যাহা হইতে হইল সৃষ্টি সকল সংসার॥
অহঙ্কার হইতে হইল এই পঞ্চজন। পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন॥
এই পঞ্চজনে লোকে বলে পঞ্চভূত। ইহা হইতে প্রাণিবর্গ হইল বহুত॥
গুণভেদে এক দেব হৈলা তিনজন। রজোগুণে দেবরাজ মরাল-বাহন॥
সত্ত্বগুণে বিষ্ণু রূপে করেন পালন। তমোগুণে মহাদেব বিনাশ কারণ॥
ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈলা চারিজন। সনৎকুমার আর সনক সনাতন॥
সনন্দ হইলা তথা চারির পূরণ।"

উদ্ধৃতাংশে অবিকৃত সাংখ্য মত রক্ষিত হয় নাই। দর্শন, উপনিষদ্, পুরাণ বা মহাভারতে এ মত পাওয়া যাইবে না। অথচ এই সকল মূল হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য এই নানামতের খিচুড়ি আমাদের স্মার্ত্তগণেরই সৃষ্টি। উত্তরকালে মহাভারত ও পুরাণাদিতেও এই বিকৃত মতবাদ নানারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও ইহার উদাহরণ বিরল নহে। সাংখ্যের 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি', 'নর' ও 'নারী' রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, নতুবা সাধারণ লোকে দর্শনের জটিল তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি'কে 'পিতা' ও 'মাতা' রূপে কল্পনা করিলে তাঁহাদের পুত্র হইল 'মহৎ'। আবার 'মহৎ' নিজেও পঞ্চ পুত্রের পিতা বলিয়া পরিকল্পিত হইল। সাংখ্যমতের এই বিকারের ফলেই সম্ভবতঃ 'বজ্রযান' ধর্ম্ম ও 'সহজ' ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল।

সে যাহাই হউক, কবিকঙ্কণকে স্মার্ত্তমতবাদী ও পঞ্চোপাসক বলিয়া ধরিয়া লইলে বোধ হয় তাঁহার ধর্ম্মমত বিষয়ে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়। কারণ তিনি গণেশ, সূর্য্য, শিব, দুর্গা ও (রামরূপী) বিষ্ণুর বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন; এবং কোনও কোনও স্থানে দুর্গা ও কোনও কোনও স্থলে বিষ্ণুকে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। আমাদের পুরাণকারগণ ও স্মার্ত্তপণ্ডিত-

গণও যখন যে দেবতার স্তব করিতেন, তখন সেই দেবতাকে অন্যান্য সকল দেবতা অপেক্ষা বড় করিয়া ফেলিয়াছেন। কবিকঙ্কণ যেখানে চণ্ডীকে বলিতেছেন—

"হরি-হর-হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল"

তখন তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিতে প্রবৃত্তি ত হয়ই না, বরঞ্চ তাঁহাকে শাক্ত বলিয়াই দৃঢ় ধারণা জন্মে। কিন্তু গ্রন্থশেষে যখন 'গোবিন্দ-নামে'র সর্ব্ব-তীর্থ-ময়ত্বের কাহিনী চণ্ডীর মুখে বিবৃত করেন, তখন তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া মনে করিবার প্রলোভন সম্বরণ করা যায় না।

একদিন ভিক্ষাছলে দেব পঞ্চানন। বৈকুণ্ঠে মাগিতে ভিক্ষা করিলা গমন॥
পারিজাত মালা দিল ক্ষীরোদক বাস। বিদায় হইয়া হর আইল কৈলাস॥
মালা গলে দেখি গুহ বলে শুন বাপা। এই মালা মোরে দিবা যদি থাকে কৃপা॥
গণেশ ডাকিয়া দেয় মাথার শপথ। এই মালা মোরে দিয়া পুর মনোরথ॥
সর্ব্বতীর্থ করি যেবা আইসে একদিনে। অন্তে নাহি পায় মালা সেই জন বিনে॥
ইহা শুনি কার্ত্তিকের বাড়ে অনুরাগ। ময়ূর চড়িয়া গেল দক্ষিণ প্রয়াগ॥
গজানন বলে প্রভু শুন পঞ্চানন। সর্ব্বতীর্থ হরিনাম দৃঢ় কৈলু মন॥
যেখানে করয়ে ভক্ত গোবিন্দের গান। সেইখানে সর্ব্বতীর্থ হয় অধিষ্ঠান॥
হরিকথা প্রেমালাপে দোঁহে কুতূহলে। কৃপা করি দিলা মালা গণেশের গলে॥

কিন্তু কবিকে কৃত্তিবাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি পূর্ব্ব কবিদিগের ন্যায় স্মার্ত্তমতবাদী বলিয়া স্বীকার করিলে কবিকঙ্কণের ধর্ম্মমত বিষয়ে এই আপাত-বিরুদ্ধতার খণ্ডন হয়।

কবিকঙ্কণের পিতামহের ধর্ম্ম বিশ্বাস বিষয়ে দুইটী বিভিন্ন ভণিতি পাওয়া যায়। এই দুইটী ভণিতা পরস্পর-বিরুদ্ধ হইলেও এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত ও কোন্‌টী অপ্রকৃত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কাযেই সমালোচকগণ স্থির করিয়া লইয়াছেন যে কবিকঙ্কণের পিতামহ প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। অবশ্য উপরি-উক্ত প্রমাণ হইতেই ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি প্রথমে বৈষ্ণব ছিলেন, পরে শৈব হইয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, তিনি তাঁহার কুলদেবতা চক্রাদিত্য শিব ও সিংহবাহিনী দেবীকে ত্যাগ করেন নাই। উক্ত কুলদেবতাদ্বয় একাল পর্য্যন্ত দামুন্যা নামে অধিষ্ঠিত আছেন। এই সকল কারণে অনুমান করা যায় যে জগন্নাথ মিশ্রও স্মার্ত্তমতাবলম্বী ছিলেন এবং সকল দেবতার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিজ ধর্ম্মমত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। যদি তিনি 'কবিত্ব' বর মাগিয়া 'গোপাল'-মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার কোনও কাব্য অদ্যাবধি আমাদের গোচর হয় নাই। যাহাই হউক, পিতামহ যে ধর্ম্মাবলম্বীই থাকুন না কেন, কবিকঙ্কণ যে বৈষ্ণব ছিলেন না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অপ্রচলিত অভিধানিক শব্দের ব্যবহার কবিকঙ্কণের কাব্যের একটী বৈশিষ্ট্য। তিনি স্বর্ণকারকে 'পশ্যতোহর', আকাশকে 'বিষ্ণুপদ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত—

"বিষ্ণুপদ-তলে আসি উরিলা ভবানী"

বাক্যটীকে কবির বৈষ্ণবত্বের অকাট্য নিদর্শন বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু মূল উপাখ্যানে যখন 'বিষ্ণু পদ তলে' শব্দের 'আকাশে' অর্থই সঙ্গত, তখন ইহা হইতে আলঙ্কারিক ধ্বনি মাত্রের সাহায্যে কবিকঙ্কণের ধর্ম্ম বিশ্বাস বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

ঔষধ গ্রহণ কালে বিষ্ণুনাম স্মরণ, বিপৎকালে মধুসূদনের নামগ্রহণ, শয়নকালে পদ্মনাভ-চিন্তন, যাত্রাকালে 'শ্রীহরি' স্মরণ প্রভৃতি বঙ্গদেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বঙ্গভাষার শব্দ সম্পদ্‌ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বলে 'রাখে হরি, মারে কে?—মারে হরি, রাখে কে?', সে বৈষ্ণব না হইতেও পারে। গানের পালা সমাপ্ত হইলে হরিধ্বনি করা সম্প্রদায় নিরপেক্ষ রীতি। 'দুর্গাধ্বনি' করার রীতি নাই। পাশ্চাত্য রীতি করতালির পরিবর্ত্তে হরিধ্বনি করাই বঙ্গীয় রীতি ছিল। সুতরাং এই হরিধ্বনি প্রভৃতিকে বৈষ্ণবত্বের প্রমাণ বলিয়া ধরা যায় না।

অতএব নানা কারণে দেখা যাইতেছে যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বৈষ্ণবও ছিলেন না, শাক্তও ছিলেন না, সৌরও ছিলেন না, গাণপত্যও ছিলেন না, শৈবও ছিলেন না। অথচ তিনি সবই ছিলেন। অর্থাৎ তিনি স্মার্ত্তমতাবলম্বী পঞ্চোপাসক ছিলেন এবং বেদান্ত দর্শনের 'ব্রহ্ম'কেই একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তা বলিয়া মানিতেন।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

তুমি নাকি যাবে চলে

তুমি নাকি যাবে চলে ?
এতদিনকার দেখা শোনা সখি, একটি নিমেষ দলে।
একটানা স্রোতে কেটেছে জীবন কত কাঁদা কত হাসা,
জোয়ার আসেনি, ভাটাও পড়েনি, সমানই সে ভালবাসা।
বলনি কখনো আহা !
ছেড়ে যেতে তুমি পারো কোন দিন ভুলেও ভাবিনি তাহা।
দুজনে চলেছি পাশাপাশি বয়ে দুটি বুঝি ছোট নদী,
মিলিতে পারিত, কাণায় কাণায় ছাপিয়া উঠিত যদি।
আমরা ছিলাম বিরহ কাতর ব্যথাতুর চখাচখী
মিলন লগ্ন কত ফিরে গেছে দিনান্তে এসে সখী—
জানি তা সকলি জানি
কি দিয়ে মুছিব অনুতাপ ভরা জীবনের যত গ্লানি।
পুরুষ পরুষ, তবু সে মানুষ, আছে তারো দয়ামায়া।
অমলিন তারো বুকে ফুটে ওঠে সুখের দুখের ছায়া।
যেয়ো না যেও না যেয়োনাক বঁধু—অমন করিয়া চ'লে
বিচ্ছেদ-ভীতু কাতর জনের বুকের পাঁজর দ'লে।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

একটি বৌদ্ধ গল্প

ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বর্ত্তমান কালে অনেক বিষয়ে বৈষম্য থাকিলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বহু বিষয়ে ঐক্য ও সাদৃশ্য দেখা যায়। পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন চিন্তাস্রোতের উৎপত্তি হইয়াছিল একই ভাবসমষ্টি আশ্রয় করিয়া। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যেও ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। "নির্ব্বাণ" শব্দটি কিছু পূর্ব্বে ভারতের ধর্ম্মসাহিত্যে ব্যবহার হইত কিন্তু এখন দেখিতে পাই যে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ও বৌদ্ধশাস্ত্রে "নির্ব্বাণ" শব্দটি ঠিক এক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। জৈন রামায়ণ ও হিন্দু রামায়ণে যদিও পার্থক্য আছে, তথাপি উভয়েরই আখ্যানভাগ এক। একই মশলা দ্বারা কিরূপে ভিন্ন রকমের মাল প্রস্তুত হইতে পারিত তাহার একটি উদাহরণ দিব।

বাল্মীকি রামায়ণে আছে যে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হইলে বিলাপ করিতে রাম বলিয়াছিলেন

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

অর্থাৎ সব দেশেই স্ত্রী মিলে, সব দেশেই বন্ধু মিলে, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা মিলে এমন দেশ দেখি না। "উচ্ছঙ্গ-জাতক" নামক একটি বৌদ্ধ গল্পে এই শ্লোকটির দ্বিতীয় পাদ পালিতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

গল্পটি এই—

কোশল রাজ্যের তিন জন চাষী, গ্রামের বাহিরে চাষ করিতেছিল। বন হইতে ডাকাতেরা বাহির হইয়া সেই গ্রাম হইতে কয়েকটি মানুষ ধরিয়া লইয়া পলাইয়া যায়। গ্রামের লোকে ডাকাতদের খোঁজে আসিয়া চাষী তিনজনকে দেখিয়া ভাবিল, সেই ডাকাতেরাই নিশ্চয় চাষী সাজিয়া চাষ করিতেছে। তাহারা চাষী তিনজনকে ধরিয়া রাজার কাছে লইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে শুনা গেল রাজার বাড়ীর সামনে একটি স্ত্রীলোক "আচ্ছাদনং মে দেথা" অর্থাৎ "আমার আচ্ছাদন দাও" বলিয়া কাঁদিতেছে। রাজবাড়ীর লোক তাহাকে বস্ত্রাদি দান করিতে গেল, কিন্তু সে তাহা লইল না। রাজার কাছে খবর পাঠান হইলে তিনি স্ত্রীলোকটিকে তাঁহার সামনে আনিতে হুকুম দিলেন। রাজার সামনে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকটি বলিল "সহস্রমুদ্রা মূল্যের বস্ত্রাদি পরিধানে থাকিলেও স্বামীহীন স্ত্রীলোক উলঙ্গই থাকে, কারণ জলহীন নদী, রাজ্যহীন রাজা এবং দশটি ভাই থাকিলেও স্বামীহীন স্ত্রীলোক উলঙ্গই বটে। আমাকে আমার স্বামী

ফরাইয়া দাও।" চাষী তিনজন তাহার কে হয় রাজা তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল যে, একজন তাহার স্বামী, একজন পুত্র ও একজন ভাই। তিন জনের মধ্যে একজনকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া স কাহাকে চায় জিজ্ঞাসা করিলে, স্ত্রীলোকটি তাহার ভাইএর মুক্তি প্রার্থনা করিল। স্বামীপুত্রের মুক্তি না চাহিয়া ভাইয়ের মুক্তি প্রার্থনা করায় রাজা একটু আশ্চর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে,স্ত্রীলোকটি বলিল যে, জীবিত থাকিলে সে আবার বিবাহ করিতে পারিবে এবং পুত্রলাভও করিতে পারিবে, কিন্তু তাহার মাতা পিতার মৃত্যু হইয়াছে. কাযেই ভাই সে আর পাইবে না। রাজা তাহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া স্বামী পুত্র ও ভাই তিনজনকেই মুক্তি দান করিলেন।

ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বসিয়া উপরের ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া, কেমন করিয়া একজনের দ্বারা তিনজনের মুক্তিলাভ হইল এই কথা আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় বুদ্ধদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা কি কথা আলোচনা কবিতেছে। ভিক্ষুরা ঐ চাষী তিনজন ও স্ত্রীলোকটির বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইল। তিনি শুনিয়া বলিলেন "শুধু এবার নয়, পূর্ব্বেও আর একবার ঐ স্ত্রীলোকটি তিনজন লোকের প্রাণ বাঁচাইয়াছিল।" এই বলিয়া তিনি ভিক্ষুদিগকে একটি গল্প বলিলেন, তাহাতে চাষীদের চাষ করা ও গ্রামের লোকদের তাহাদের ধরিয়া রাজার কাছে লইয়া প্রভৃতি ব্যাপার ঠিক পূর্ব্বে ঘটনার মত। কিন্তু এ গল্পে তিন জনের মধ্যে সে কাহাকে চায় এ প্রশ্নের উত্তরে স্ত্রীলোকটি বলিল, সে তিন জনকেই চায়। ইহা অসম্ভব জানাইলে সে ভাইএর প্রাণভিক্ষা করিল। রাজা আশ্চর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্রীলোকটি বলিল –

উচ্ছঙ্গে দেব মে পুত্তো পথে ধাবন্তিয়া পতি।
তঞ্চ দেসম্ ন পস্‌সামি যতো সোদরিয়ম্ আনয়ে॥

অর্থাৎ "হে রাজন্! পুত্র আমার বুকেই আছে, পথে কত লোক যাইতেছে তাহাদের যে কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করিতে পারি. কিন্তু যে দেশে সহোদর ভাই মিলিবে এমন দেশ আমি দেখিনা।" রাজা এই কথার যথার্থতা স্বীকার করিয়া তিন জনকেই মুক্তি দিলেন। শেষে বুদ্ধদেব বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটি পূর্ব্বজন্মে সেই স্ত্রীলোক ছিল, চাষী তিনজন সেই তিনজন চাষী ছিল এবং আমি ছিলাম রাজা।"

বাল্মীকি রামায়ণের ও বৌদ্ধ জাতকের এই দুইটি দৃষ্টান্ত তুলনা করিলে মনে হয় যে, সহোদর ভাইএর মত হিতৈষী লোক মিলে এমন দেশ দুর্ল্লভ এই মর্ম্মে একটি প্রবাদ লোকমুখে সমাজে প্রচলিত ছিল। সেকালের সাহিত্যের অনেক জিনিষ লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বহুবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সহোদর ভাইএর প্রশংসাসূচক এই প্রসিদ্ধ প্রবাদটি একদল রামের উক্তি বলিয়া বাল্মীকি-রামায়ণে চালাইলেন, আর একদল আর এক জনের মুখে বৌদ্ধ সাহিত্যে চালাইলেন। বৌদ্ধজাতকের শ্লোকাংশগুলির রচনা পদ্ধতি দেখিয়া মনে হয় যে উহার রচনা কাল গল্পাংশের রচনা কালের অনেক পূর্ব্বে। এই উক্তিটি যে অনেক পূর্ব্বকাল হইতে দেশে প্রচলিত ছিল ইহাতে তাহাই প্রমাণ হয়।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন।

গেল দিন

গেল দিন সন্ধ্যা হয়ে আসে,
উজল অমল আলো, আরক্ত আয়াসে,
শ্রান্ত যেন কত ক্লান্তি ভারে!
যে কথা বলেছে বারে বারে,
কেহ তার বুঝিল না ভাষা,
ব্যর্থ হল আশা ভালবাসা।
এখন নিদ্রার শ্রান্তি নামে নেত্র ভরি,
তারকা স্বপন মগ্ন অমা বিভাবরী,
স্তব্ধ মৌন অন্তিম সাধনা,
স্তবহীন মুক্তি আরাধনা॥

পাটনা

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ সেন

বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়া মহকুমায় অবস্থিত আলমপুর গ্রাম হেমেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের পৈতৃক বাসভূমি। আলমপুর একখানি গণ্ডগ্রাম। ইহার অবস্থান মনোরম। গ্রামের পার্শ্বেই একটি বিল। এই বিলের পরপারে শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিপূত শ্রীখণ্ড। গ্রামের গৌরব সেন (বরাট) পরিবার। হেমেন্দ্রনাথের অগ্রজ, বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল, এক্ষণে পরলোকগত রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ও তাঁহার কনিষ্ঠ হেমেন্দ্রনাথ গ্রামের উন্নতি-সাধন-কল্পে নানারূপ চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রামবাসীদিগের সুবিধার জন্য পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দেবায়তন সংস্থাপন, বিদ্যালয় ও চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠা এসকলই ইঁহাদিগের উদ্যোগে ও অর্থে হইয়াছে।

বৈকুণ্ঠনাথ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রাচুর্য্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন—হেমেন্দ্রনাথের যখন জন্ম হয়, তখন সংসারে আর অভাব নাই। বহরমপুরে পাঠান্তে হেমেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আগমন করেন এবং পটলডাঙ্গার এক বাসায় থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে থাকেন।

কলিকাতায় পাঠ শেষ করিয়া তিনি বহরমপুরেই অগ্রজ বৈকুণ্ঠনাথের কাছে ওকালতীতে শিক্ষানবিশী করেন। দ্বাদশবর্ষকাল তথায় ওকালতী করিয়া তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন।

তাঁহার সতীর্থদিগের মধ্যে কয়জন তখন ব্যবহারাজীব-রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ও জে, সি, দত্ত—এই কয়জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাইকোর্টে আসিয়া হেমেন্দ্রনাথ অল্প দিনের মধ্যেই আইনজ্ঞ বলিয়া যশোলাভ করেন এবং মিষ্টস্বভাব হেতু সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠেন। তিনি উকীল লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের সম্পাদক হইয়াছিলেন।

অগ্রজ বৈকুণ্ঠনাথের মত হেমেন্দ্রনাথও রাজনীতি চর্চ্চায় অবহিত ছিলেন। অনেকে হয়ত জানেন না, বৈকুণ্ঠনাথ কংগ্রেসের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন এবং তাঁহারই আহ্বানে তিনবার বহরমপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সম্মিলনকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া যখন তাহাকে যাযাবর-রূপ প্রদান করা হয়, তখন আনন্দ-মোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বহরমপুরেই তাহার প্রথম অধিবেশন হয়। সে সব কার্য্যে হেমেন্দ্রনাথ অগ্রজের দক্ষিণহস্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীমতী অ্যানি বেশান্টের নেতৃত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহা পূর্ব্বপর্য্যন্ত হেমেন্দ্রনাথ প্রায় সকল অধিবেশনেই উপস্থিত থাকিতেন। কলিকাতায় অধিবেশন হইলে তিনি প্রায়ই অতিথিদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনার ভার পাইতেন। তিনি ভারত সভার সভ্য ছিলেন এবং তাহার কার্য্যে মনোযোগ দিতেন।

হেমেন্দ্রনাথ সামাজিক শিষ্টাচারের আদর্শ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গত ত্রিশ বৎসরে কলিকাতায় যে স্থানেই সভা সমিতি সম্মিলন হইয়াছে, প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। তিনি নিমন্ত্রণ সভায় যাইলে বহুজনের কেন্দ্র হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার স্নিগ্ধ ও সরস আলাপ সকলকেই আকৃষ্ট করিত।

দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা হেমেন্দ্রনাথের কালজয়ী কীর্ত্তি। এ বিষয়ে তিনি এক দিকে দানবীর মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের আর এক দিকে অগ্রজ রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের সহকর্ম্মী ছিলেন। বঙ্গদেশে যখন বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ করিয়া স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের সঙ্কল্প প্রবল হয়, তাহার পূর্ব্বেই বৈকুণ্ঠনাথ কংগ্রেসে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র বিপুল সম্পত্তি দেশবাসীর কল্যাণকর কার্য্যের জন্য ন্যায়রূপে ব্যবহার করিয়া দেশে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কৃত করিয়াছেন। ইঁহাদিগের সম্মিলিত চেষ্টার ফল—

বঙ্গদেশে চীনামাটির দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই আজ বেঙ্গল পটারিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য হেমেন্দ্রনাথ অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে বিচলিত না হইয়া মৃত্যুকালেও তিনি তাহার জন্য নূতন দায়িত্ব গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বেঙ্গল গ্লাসওয়ার্কস্ তাঁহারই চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়াছে। তিনি কেবল কারখানা পর্য্যবেক্ষণের ভার লইয়াই নিরস্ত হয়েন নাই; পরন্তু স্বীয় তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ অনাদিনাথকে কাচশিল্প শিখিবার জন্য য়ুরোপের শিল্পকেন্দ্রে পাঠাইয়া সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ ঐ প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ কামনায় হাইকোর্টের ওকালতী ত্যাগ করিয়াছেন।

হেমেন্দ্রনাথের আট পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও তৃতীয় কাচের কারখানার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; দ্বিতীয় শ্রীমান্ প্রিয়নাথ ব্যারিষ্টার; চতুর্থ শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ডাক্তার হইয়া শিক্ষার জন্য বিলাতে গিয়াছেন; পঞ্চম শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ এটর্ণী এবং ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম এখনও বিদ্যার্জ্জন করিতেছেন। হেমেন্দ্রনাথের দুই কন্যা। জীবিতকাল মধ্যে কখনও তাঁহাকে অপত্য বিয়োগ জনিত শোক পাইতে হয় নাই।

তাঁহার মত স্নেহশীল লোক সচরাচর দেখা যায় না। পুত্রগণ যে যাহার কায হইতে গৃহে প্রত্যাগত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন এবং তাহারা ফিরিয়া আসিলে তবে যেন স্থির হইতে পারিতেন।

স্বগ্রামের প্রতি তাঁহার যে আধারণ অনুরাগ ছিল, তাহা বর্ত্তমান কালে দুর্লভ। তিনি যে স্থানেই কেন থাকুন না, দুর্গোৎসবের সময় আলমপুরে যাইতেন। তখন বরাটগৃহে যেন আনন্দের মেলা বসিত। আত্মীয় স্বজনে বন্ধু-বান্ধবে অতিথি অভ্যাগতে গৃহ কলরব-মুখরিত ও হাস্যোজ্জ্বল থাকিত। এ বিষয়ে বৈকুণ্ঠনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর প্রাচীন ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ অতি সরল ভাবে বালকদিগের

হেমেন্দ্রনাথ সেন

আমোদের অনুষ্ঠানেও যোগ দিতেন। স্নেহের ধারায় প্রবীণ ও তরুণের মধ্যে ব্যবধান ধৌত হইয়া যাইত।

তাঁহার স্বাস্থ্য ভালই ছিল। বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ তাঁহার মৃত্যু হয়। পূর্ব্বদিন তিনি যথারীতি কায কর্ম্ম করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে অসুস্থ বোধ করিয়া আর বাহির হয়েন নাই। পরদিন প্রভাতে তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েন। তাঁহার একটি কথায় মনে হইয়াছিল বিলাত-প্রবাসী পুত্রের দিকে তাঁহার চিত্ত ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি চিত্ত সংযত করিয়া পারলৌকিক চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিয়া ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে থাকেন। সংসারের চিন্তাকে আর মনে স্থান দেন নাই। তিনি যে ভাবে মৃত্যুকে অনিবার্য্য জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এই জড়বাদজর্জ্জরিত যুগে ইহকালসর্ব্বস্ব লোকের পক্ষে বিস্ময়কর।

রজনীর দ্বিতীয় যাম উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কাহাকেও কোনরূপ কষ্ট না দিয়া, রোগ-যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া তিনি যেন হাসিমুখে জীর্ণদেহ ত্যাগ করিয়া গমন করেন।

শ্রী——।

পাথর-পুরীর পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬॥ টার সময় অজন্তা আমরা গ্রামে আসিয়া পঁহুছিলাম। প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত গ্রাম। পরিখার উপর সেতু আছে, আলো দেওয়ার নিমিত্ত প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ আছে, সবই পুরাতন। গেটের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া কর্দ্দমাক্ত পথ দিয়া আমাদের মোটর দুখানি চলিল। ইহা স্যর সালর জঙ্গের জায়গীর। গ্রামের শেষ প্রান্তে ঔরঙ্গজেবের তৈয়ারী প্রাচীর বেষ্টিত সরাইখানা, বা ধর্ম্মশালা। অনেক লোক স্থায়ী ভাবে সংসার পাতিয়া বাস করিতেছে। বহির্গমনের পথটী এই বৃহৎ ধর্ম্মশালার গেট। আমাদের পথ প্রদর্শক নামিয়া দুই একটী স্বজাতির সহিত আলাপ করিয়া আসিলেন। কিছু দূর আসিয়া একটী ক্ষুদ্র বাড়ীর সম্মুখ হইতে একটী পতাকাধারী প্রহরী ইঙ্গিতে গাড়ী থামাইল। এবং কার গাড়ী, কোথা হইতে আসিতেছে, জানিয়া লইল।

এই স্থান হইতে ৫।৬ মাইল পথে পাথর ভাঙ্গিয়া ছাড়ানো হইয়াছে। শীঘ্রই রোলার চলিবে।

সম্মুখের বিরাট পাহাড় শ্রেণীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছি, কোথায় চলিয়াছি! সম্মুখে সন্ধ্যা, মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন। পথপ্রদর্শক ইঙ্গিতে হস্তদ্বারা পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। এইবার আমাদের যান দুখানি পাহাড়ের চড়াইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিতেছে। বাঁকের পর বাঁক, মোড়ে ধীরে চালাইবার সাবধান বাক্য লেখা বিজ্ঞাপন। পাহাড়ের গা কাটিয়া নূতন প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইয়াছে। দুই খানি মোটর পাশাপাশি অনায়াসে চলিতে পারে। পথের পার্শ্বদেশে ছোট করিয়া প্রাচীর দেওয়া হইয়াছে।

বহু উচ্চে আমরা উঠিয়া চলিয়াছি। এক পার্শ্বে অতল খাদ। তখন ঠিক সন্ধ্যা, বিরাট নীলাকাশ নব নীরদ-মালায় ঢাকা পড়িয়াছে, মনে হইতেছে যেন মেঘ সকল পর্ব্বতগাত্র স্পর্শ করিয়া আছে, অস্তগামী তপনের রক্তিম ছটা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উকি মারিতেছে। অনন্ত অসীম সৌন্দর্য্য লইয়া এই পর্ব্বতমালা আমাদের নয়নে শোভার ভাণ্ডার খুলিয়া দিল। আমার ক্ষুদ্র শক্তি, সে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতে অক্ষম। শুধু নির্নিমেষ নয়নে স্তব্ধ মুগ্ধবৎ বসিয়া দেখিতে দেখিতে চলিলাম।

গুহাগুলির সাধারণ দৃশ্য—সম্মুখে প্রাচীন সোপানশ্রেণী নদীতে নামিয়া গিয়াছে

চড়াই পথ শেষ করিয়া মোটর এই বার নামিতে আরম্ভ করিল। সমতল ভূমিতে ডাক-বাঙ্গলা, সেখানে আমরা আজ রাত্রে অবস্থান করিব। ভয়ানক ঢালু পথ, মোটর যেন গড়াইয়া নামিয়া চলিয়াছে। পাহা-

অজন্তা ২৬নং গুহা চৈত্য

ড়ের দিকে চাহিয়া দেখি—উঃ কি ভীষণ উচ্চস্থান হইতে আমরা নামিয়া আসিলাম! তবুও তো বিদেশী ভ্রমণকারী ও উচ্চ রাজ পুরুষেরা প্রায়ই এখানে বেড়াইতে আসেন। নিজাম বাহাদুর পথটি সুগম করিয়া তুলিয়াছেন। মন তখন আশা আনন্দে দুলিতেছে, এই দুর্গম পথ অতিবাহিত করিয়া যাহা দেখিতে আসিয়াছি, না জানি তাহা কত সুন্দর।

পাহাড়-বেষ্টিত উচ্চ সমতল ভূমিতে ডাক বাঙ্গলায় আসিয়া আমরা নামিলাম। দশ ঘণ্টা মোটরে দৌড়িয়া শরীর টলমল করিতেছে। ডাক বাঙ্গলা হইতে আধ মাইল দূরে ফর্দাবাদ নামে গ্রাম আছে, সেখানে জিনিষপত্র পাওয়া যায়। আমরা স্নিগ্ধ বাতাসে যে যেখানে পাইলাম বসিয়া পড়িলাম।

বাবুর্চ্চীখানায় আমাদের রান্না হইলে চলিবে না, সেই জন্য সঙ্গে ছোট রাউটি তাঁবু ছিল, তাহা খাটানো হইল। ভৃত্য ও ব্রাহ্মণ রন্ধনের উদ্যোগ করিল, পথ প্রদর্শক মহাশয় দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিলেন। একজন সংবাদদাতা কহিল, গত কল্য রাত্রে দুইটা চিতা বাঘ ডাক বাংলার নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হাঁ ইহা তাঁহাদের উপযুক্ত স্থান বটে। এখানে যদি তাঁরা মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসেন, কিছুই দোষ দেওয়া যায় না! তবুও বন্দুক প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। রাত্রে আমাদের ডাল ভাত রুটী আলুর তরকারী ঢ্যাঁড়স ভাজা রান্না হইল। আমরা প্রায় কুড়িজন লোক, পর্ব্বত বেষ্টিত সুরম্য স্থানে নিশাকালে লণ্ঠনের আলোতে বসিয়া বনভোজন বা পিকনিক করিয়া আহার সমাধা করিলাম।

মধ্য রাত্রি হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ নিবিড়জলদ মালায় আবৃত হইয়া আছে। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ কোথায় ঢাকা পড়িয়া আছে, অনুমানও করা যায় না। আকাশের অবস্থা

অজন্তা—১৭নং গুহা বারাণ্ডা—অপ্সর ও অপ্সরীগণ

অজন্তা ১৭নং গুহা—প্রাসাদের দৃশ্য

যেন যাদুমন্ত্র বলে দেড় ঘণ্টার মধ্যে আকাশের নীল রথের মাঝখানে সূর্য্যদেবকে দেখিতে পাওয়া গেল। দূরে পাহাড়ের উপরে রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রৌদ্রের মুখ দেখিয়া সকলেই প্রফুল্ল চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

অজন্তার ডাকবাঙ্গলার চতুর্দ্দিকে নালা আছে, স্থানটী একটী দ্বীপের মত দেখায়। চারিদিক পাহাড় দিয়া ঘেরা। মনে হয় ইহার বাহিরে যেন আর কিছুই নাই। পাহাড়ের উপরে অনেক গুলি ছোট ছেলে গরুর পাল চরাইতেছে।

দেখিয়া আমাদের মন নিরাশায় ভরিয়া উঠিল। উনি বলিলেন সম্মুখে মনসুন, এসময় আমাদের এই দুর্গম স্থানে আসা বড়ই ভুল হইয়াছে; যদি পাঁচদিন বৃষ্টি হয়, তবে দেখা শোনা তো হওয়াই কঠিন। পর্ব্বত প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া নদী নালা পার হইয়া ফিরিয়া যাওয়াও কঠিন হইবে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইল না। খুব ভোরে সকলে জাগিয়াছি। আকাশের অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত হইতেছে। একটু বেলা হইলে পথ প্রদর্শক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, এই মেঘলায় অন্ধকারে অজন্তার কিছুই দেখা যাইবে না, এবং সেখানে যে বিদ্যুতের ব্যাটারী ছিল, তাহাও খারাপ হইয়া গিয়াছে; নহিলে বিদ্যুতের আলোতেও দেখা চলিত। আমার ছোট মেয়েটী মেঘ তাড়াইবার উল্‌টা মন্ত্র আবৃত্তি করিল, "আয় বৃষ্টি হেনে কাপড় দিব মেনে।" ইত্যাদি।

বেলা প্রায় ৮টা। আকাশের দিকে চাহিতেছি, মনে হইতেছে, মেঘ ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। মনে ক্রমেই আশার সঞ্চার হইতেছে। বাস্তবিক

অজন্তা ২৬নং গুহা—সম্মুখের দৃশ্য

অজন্তা ১ গুহা—প্রথম শতাব্দীর একটি বিহার

বেলা ১০টা। আমরা আহারাদি সারিয়া মোটরে উঠিয়া বসিলাম। অজন্তার গুহা এখান হইতে তিন মাইল। পথ প্রদর্শক কহিলেন, অজন্তা পর্য্যন্ত মোটরে যাইতে পারিত, কিন্তু রাত্রের বৃষ্টিতে নদীতে খুব জল বাড়িয়াছে মোটর পার হইবে না। নদীর তীরে আসিয়া আমরা মোটর হইতে নামিয়া পড়িলাম। পার্ব্বত্য নদী, রাত্রের বৃষ্টিতে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। গৈরিক বর্ণের জল প্রস্তর খণ্ডে প্রতিহত হইয়া অপূর্ব্ব শব্দ ঝঙ্কারে ছুটিয়া চলিয়াছে।

অত্যন্ত স্রোত, আমাদের পার হওয়া কঠিন। একটী খালি গো গাড়ী অন্য পার হইতে এ পারে আসিতেছিল, তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আমরা গোযানে চড়িয়া তিন চারিবারে সকলে অন্য পারে পহুঁছিলাম।

খানিকটা চড়াই পথে চলিবার পর পাহাড়ের কোলের পথ বাহিয়া আমরা চলিলাম।

ছোট ছেলে মেয়ে সহ উনি ও আমি গোযানে আরোহণ করিয়া চলিলাম। অন্যান্য ছেলে মেয়ে ও ভৃত্যবর্গ হাঁটিয়া চলিল।
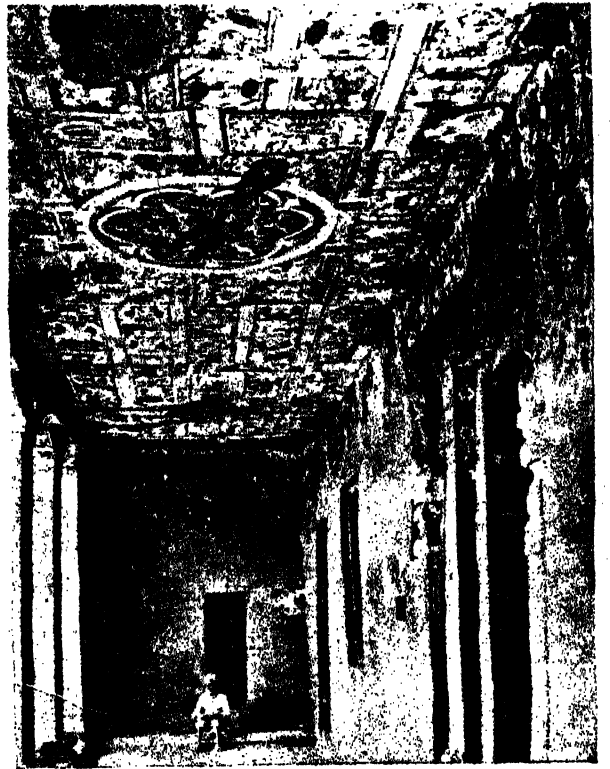
অজন্তা ১৭নং গুহা—বারাণ্ডার ছাদের কারুকার্য্য

অজন্তা ১নং গুহা —ভিতরের দৃশ্য

পাহাড় শ্রেণী এই স্থানে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহা যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে, সু-উচ্চ স্থান হইতে ঝরণার জল পর্ব্বত পাত্র বাহিয়া পড়িতেছে। এই জলই নদীর আকার ধারণ করিয়াছে।

চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি, "অজন্তার গুহা"। ইহাকে গুহা কি করিয়া বলা যায় ধারণা করিতে পারিলাম না। সম্মুখে স্তম্ভযুক্ত

অজন্তা ১নং গুহা—ছয়দন্ত হস্তী জাতকের দৃশ্য

মেঘান্তরিত রৌদ্র বেশ প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। পথের এক প্রান্ত বাহিয়া নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া আমাদের সঙ্গে চলিয়াছে। আমরা পাহাড়ের কোলে কোলে যে পথ প্রস্তুত হইয়াছে তাহার উপর দিয়া চলিয়াছি।

পথ ক্রমেই উচ্চ হইয়া চলিয়াছে। ক্রমে তিন মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা অজন্তার সোপান-শ্রেণীর পাদদেশে উপস্থিত হইলাম।

অজন্তায় উঠিবার পুরাতন পথ অন্য দিকে আছে, পরে দেখিয়াছি। এই সিঁড়ি কিছু দিন হইল নিজাম বাহাদুর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ১২৫টি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আমরা উপরে উঠিয়া পড়িলাম।

উপরে উঠিতেই অজন্তা পাহাড়-পুরীর গুহাশ্রেণী নয়নগোচর হইল।

ছাদ, তার পর প্রকাণ্ড বারাণ্ডা, তার পর প্রাকণ্ড হল। হলের দুই পার্শ্বে শ্রমণ ভিক্ষুদের বাস-কক্ষ। হলের সম্মুখের ঘরে বুদ্ধমূর্ত্তি। বৃহৎ হল-গৃহটী সু-উচ্চ কারুকার্য্য খচিত, ১৮ টী স্তম্ভের উপর ছাদ দেওয়া আছে। প্রবেশ পথের দ্বার বেশ প্রশস্ত। দ্বারের উভয় পার্শ্বে জানালা আছে।

উচ্চ বেদীর উপরে বৃহৎ ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, দুই পার্শ্বে মাল্য হস্তে উড়ন্ত অপ্সরা। সেখানকার রক্ষক, বৃহৎ আয়নায় সূর্য্যালোক প্রতি-

অজন্তা ১নং গুহা—ছাদের কয়েকটি চিত্র

অজন্তা ১৯নং গুহা—পার্শ্বের কারুকার্য্য
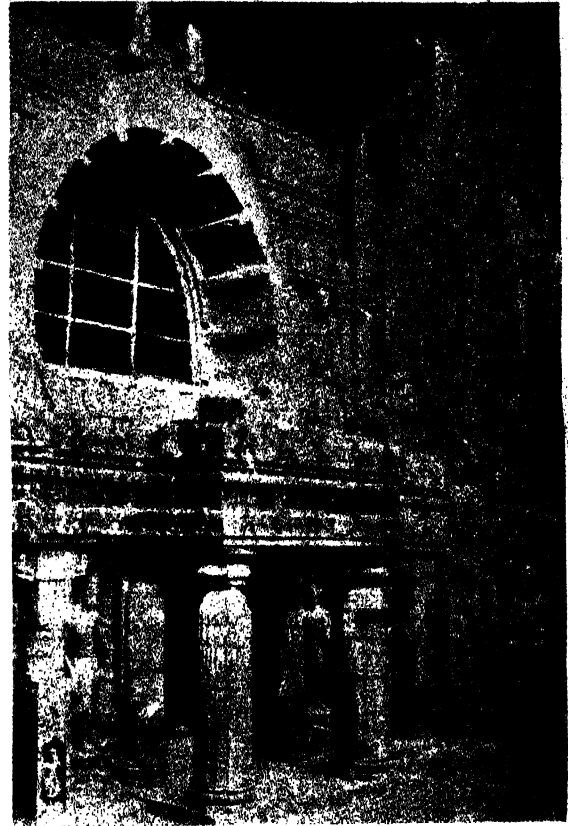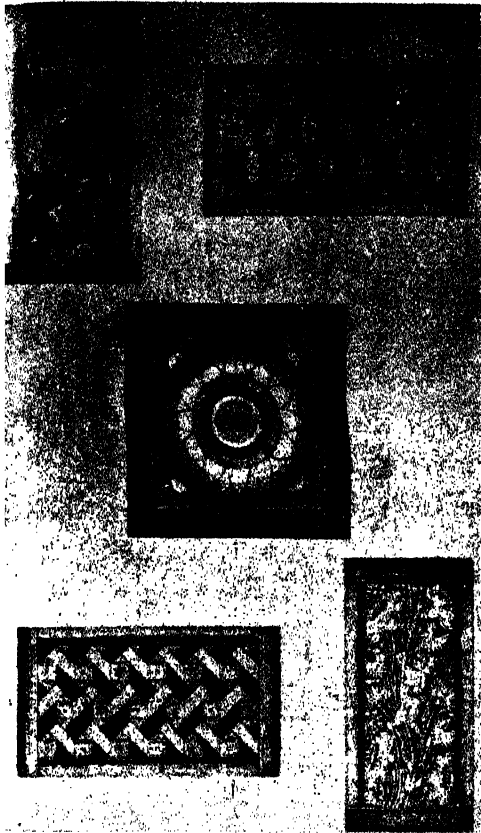
ফলিত করিয়া আমাদের দেখাইতে আরম্ভ করিল। কি বিরাট কি মহান্ কল্পনা, কি অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ, ইহা যাহাদের হাতের কায তাহারা কি আমাদের মতই মানুষ ছিল? নির্ব্বাক হইয়া আমরা সব দেখিয়া ফিরিতেছিলাম। এখানে জুতা পায়েই সকলে প্রবেশ করে। আমরা হিন্দু, জন্মজন্মান্তরের সংস্কার আমাদের মজ্জাগত। ভগবান্ বুদ্ধদেবের মন্দিরে সে জন্য আমরা কেহ জুতা পায়ে প্রবেশ করি নাই।

রাজার সাহায্য ব্যতীত এইসকল গুহা প্রস্তুত হইতে পারিত না। সহস্রলোক অনায়াসে অজন্তার গুহাগুলিতে বাস করিতে পারিত, তাহাদের জন্য সাহায্যের ভাল ব্যবস্থাও নিশ্চয় ছিল। প্রসিদ্ধ চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাং নাকি সপ্তম শতাব্দীতে অজন্তার গুহা দেখিতে আসিয়াছিলেন।

ছোট বড় ২৯টি গুহা আছে। চৈত্য পাঁচটি, অন্যগুলি বিহার। ছাদের সিলিংয়ে নানা প্রকার পদ্ম, লতাপাতা, ফুল, পাখী অঙ্কন সুন্দর। বারাণ্ডার ও হল গৃহের ভিত্তি গাত্রে নানা প্রকার তৎসাময়িক চিত্র—প্রায় সব গুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় অগ্নি দ্বারা এ গুলি নষ্ট করা হইয়াছিল এবং জল পড়িয়াও অনেক নষ্ট হইয়াছে।

ভিত্তি ও ছাদে প্রথমে কুঁদিয়া লইয়া তাহার উপর আঁকা হইয়াছিল, সেই জন্য নানা রূপে চিত্র নষ্ট হইয়া গেলেও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, এখনও যাহা আছে তাহা অতি সুন্দর, অতুলনীয়।

না জানি কতদিন ধরিয়া এই সব কারুকার্য্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, কত লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল! সূর্য্যালোক প্রতি ফলিত করিয়া আমাদের যাহা দেখিতে হইল, তাহারা কিরূপ আলোকে এই অপূর্ব্ব তক্ষণ শিল্পের

পরিসমাপ্তি করিয়াছিল? কারুকার্য্যের এই অপূর্ব্ব পরিকল্পনা কাহার?

চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত সু উচ্চ পর্ব্বত প্রাচীর ক্ষোদিত করিয়া এই বিশাল প্রাসাদ, সে কি সামান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুর গুহা? প্রত্যেক বুদ্ধমূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে গঠিত। প্রত্যেক বৃহৎ হল শত শত লোকের বসিয়া উপাসনা করিবার মত করিয়া প্রস্তুত। হয়তো এখানে শ্বেতসরোজবাসিনী দেবী ভারতীর আরাধনাও হইত।

প্রকৃতি দেবীর এই সুন্দর নিভৃত রাজ্যটি সাধনার উপযুক্ত স্থান। বিশ্বনাথের উপাসনার মতই বটে। নির্ব্বাচনটী বেশ হইয়াছিল। কিন্তু এই নিরালা স্থানও হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। বুদ্ধমূর্ত্তির প্রায় সকলগুলিই অঙ্গহীন করা হইয়াছিল। হস্ত পদ নাসিকা উদর বক্ষ এই সকল স্থান ভগ্ন করিয়াছে। ইহার চেয়ে অধিক ক্ষতি করা বোধ হয় সম্ভব ছিলনা। মনটা সেই অতীত যুগের ভক্ত উপাসকদের মনোবেদনায় যেন কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

আমার পুত্রকন্যাগণ—তাহাদের মনেও বোধ হয় একটা অনুভূতির সাড়া জাগিয়াছিল। তাহারা বুদ্ধ মূর্ত্তির সন্নিকটে দাঁড়াইয়া কহিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরং গচ্ছামি।"

বুদ্ধদেব মূর্ত্তিগুলির প্রত্যেকটী বিভিন্ন প্রকারে নির্ম্মিত। কোনটীতে মৃগযূথ, কোনটীতে কোনটীতে বানরের দল, কোনটীতে ভক্ত উপাসক, স্তব স্তুতি করিতেছে। দেব মূর্ত্তির পাদপীঠে এই সকল ক্ষোদিত আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের কাহিনীর সহিত যাঁহারা

অজন্তা ১৭নং গুহা রাণীর প্রসাধন

অজন্তা ১৯নং গুহা সম্মুখের দৃশ্য
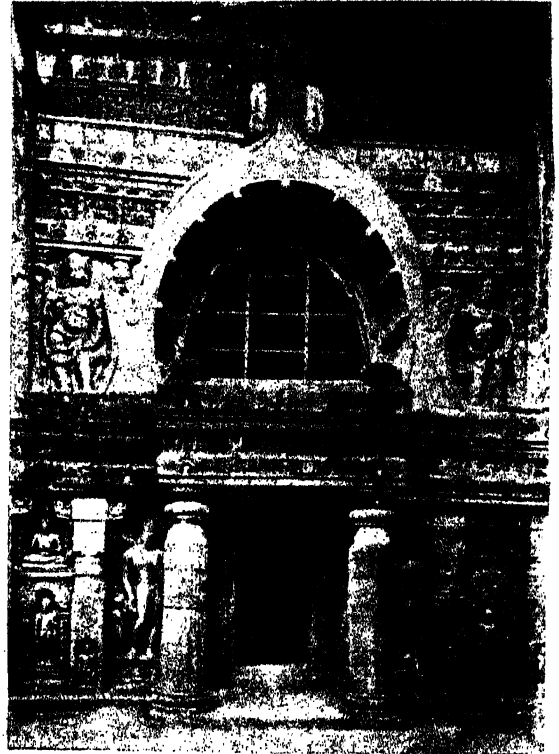
পরিচিত তাঁহারা অনেক বিষয় বুঝিতে পারেন। এ বিষয়ের গবেষণা আলোচনা সুধীজন অনেকেই করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন।

খিলান করা চৈত্য মন্দির এত চমৎকার করিয়া ক্ষোদিত, যে গাঁথিয়া তোলা খিলান বোধ হয় এত সুন্দর হয় না।

শুনিয়া আসিতেছি, আমাদের দেশের কোন ইতিহাস নাই। কিন্তু নয়ন সমক্ষে এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিসৌধ দেখিতেছি, দুর্গম পর্ব্বত-অন্তরালে ইহা রচিত হইয়াছিল।

কোনও স্থানে অক্ষরগুলি স্পষ্ট নাই। সবই অনুমান করিয়া লইতে হয়। তাহারা শুধু হৃদয় ভরিয়া এখানে সেই অনাদি অনন্ত পরমপিতার উপাসনা করিয়াছেন। যশঃ কীর্ত্তির ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের হীন করে নাই। আমাদের শীঘ্র ফিরিতে হইবে, সেই জন্য তাড়াতাড়ি সকল দেখা শেষ করিতে হইল।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম। ঝরণার জল এক স্থানে কুণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত আছে, তাহাই সকলে পান করিলাম। জল অপূর্ব্ব মিষ্ট। সম্ভবতঃ পরিশ্রান্ত পিপাসিত হওয়াতে আরও মিষ্ট লাগিয়াছিল। কিছুক্ষণ সেই পাথর পুরীর উন্মুক্ত অলিন্দে দাঁড়াইয়া প্রকৃতি ও মনুষ্যহস্ত রচিত শিল্প সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীঊষা দেবী।

ভিখারিণী

"জয় হোক বাবা তব, ভিক্ষা কিছু চাই,
উপবাসী তিনদিন পেটে কিছু নাই।
মহারাজ তুমি বাবা, মহৎ হৃদয়
দয়া করি দাও কিছু যাহা মনে লয়!"
দাঁড়াল ভিখারী দ্বারে বাড়াইয়া কর,
মনে কত আশা নিয়ে কত না নির্ভর।

অমনি কণ্ঠের স্বর সপ্তমে তুলিয়া
"হবে না হবেনা" বলি দিনু দেখাইয়া
বাহিরের সোজাপথ। ভগ্ন-আশ বুকে
তবু গেল আশীষিয়া "থেকো বাবা সুখে;
দারিদ্র্যের জ্বালা যেন না দহে তোমায়
ভগবান তোমা পরে থাকুন সহায়।"

নিরালা বসিয়া আজি ভাবি মনে হায়,
ভিখারিণী নারী—সেও কত না হেলায়
কল্যাণ কামনা খানি করে গেল দান।
তবু সে-ই ভিখারিণী, আমি ধনবান্!

শ্রীপরেশ সেনগুপ্ত।

পরিচয়

(গল্প)

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন। তালতলা বাজারের নিকটবর্ত্তী একটী বাড়ীর দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া কয়েকটি বালিকা একমনে ঘুঁটি খেলিতেছিল। সম্মুখের গৃহ হইতে একটি কিশোরী মেয়ে একখানা বই হাতে করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বালিকা কয়টির খেলা দেখিতে লাগিল।

একজন বালিকা বলিল "প্রতিমা দি' খেলবে?"

প্রতিমা অবজ্ঞা ভরে কহিল, "ঘুঁটি খেলা আবার খেলা! আমাদের ইস্কুলের মেয়েরা শুনলে হেসেই অস্থির হ'ত!"

একজন বলিল, "তবে দশ পঁচিশ, কি গোলকধাম?"

প্রতিমা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোদের বাতে ধরবে দেখছি, তার চেয়ে ভাল কোনও খেলা বুঝি আর তোদের মনে এল না ?"

একটি বালিকা বলিল, "তবে লুকোচুরী খেলবে চলো। ঐ নতুন বাড়ীর ভাড়াটেরা চলে গেছে, খালি বাড়ীতে বকবার কেউ নেই।"

কথাটা প্রতিমার মনোমত হইল। সে ইহাদের অপেক্ষা বেশ একটু বড়, অন্য সময় সে ইহাদের সহিত কখনো খেলা করে না। কিন্তু সম্প্রতি তাহার স্কুল বন্ধ, গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দ্বিপ্রহর কাটিতে চাহেনা, আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা মেয়েটি বয়সে যাহাই হউক, স্বভাবে এখনো সে বালিকাই আছে।

প্রতিমা খুশী হইয়া বলিল, "তোরা এগিয়ে যা, আমি একটু দেখে যাই মা কি করছেন, নইলে এখুনি ডাকাডাকি সুরু করে দেবেন।"

প্রতিমা মায়ের ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল তাহার মা, কাকীমা এবং পাড়ার দুটি রমণী তাস খেলিতেছেন। প্রতিমা দেখিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গেল। মা ডাকিয়া বলিলেন, "এই প্রতিমা, খোকাটাকে নিয়ে যা দেখি, বড় জ্বালাতন করছে।"

প্রতিমা বিরক্ত ভাবে বলিল, "একটু খেলা করবো তাও তোমাদের জ্বালায় হয় না।"

মা ধমক দিয়া বলিলেন, "কোন্ কাযটা তুমি করছো বাছা ? এত বড় মেয়েকে দিয়ে যদি কোন কায হয় !"

"সারাদিন তো ইস্কুলের পড়ার চাপেই কাটে, নিয়মিত কিছু কায করবো কোথা থেকে ? সময় একটু পেলেই তো তোমরা কায চাপাও, কসুর কর কি ?" বলিয়া প্রতিমা মায়ের কোল হইতে খোকাকে তুলিয়া লইল।

মা রাগ করিয়া বলিলেন, "ইস্কুলে পড়ে তো মাথা কিনছো ! তোমার বাবার আদরেই তোমার মাথা বিগড়োচ্ছে, বিয়ে হ'লে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যে কি করে তুমি বনিয়ে চলবে আমি তাই ভাবি, তোমার দুর্গতির শেষ থাকবে না।"

"বিয়ে আমি করলে তো ?" বলিয়া প্রতিমা বাহির হইয়া গেল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে খোকার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, "পাজি ছেলে দুপুর বেলা একটু ঘুমুতে পার না ?"

খোকা হাসিয়া দিদির গলা দুই হাতে জড়াইয়া বলিল, "জিজি !"

প্রতিমা হাসিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল, "পাজি, তুই বড় পাজি।"

সিঁড়ির ঘরে বালিকা কয়টি প্রতিমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার সকলে মিলিয়া পূর্ব্ববর্ণিত নূতন বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

এই পল্লীর কতকগুলি বাড়ী একেবারে পরস্পর সংলগ্ন। ছাদের আলিসা ডিঙাইয়া স্বচ্ছন্দে এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাওয়া চলে। যে বাড়ীর প্রাচীর উঁচু সেই বাড়ীর প্রাচীরের কয়েক খানা ইট খসাইয়া মেয়েরা যাত্রাপথের বাধা দূর করিয়াছেন।

"নূতন বাড়ী" একেবারে এই লাইনের শেষ বাড়ী, তাহার পাশেই বাজার। ছাদ দিয়া বালিকাগণ আসিয়া দেখিল, কয়েকটি পুষ্পিত ফুলগাছের টব নূতন ভাড়াটের আগমন সূচনা করিতেছে। তাহারা মহোৎসাহে ফুল সংগ্রহে মন দিল। প্রতিমা অন্যায় সহিতে পারিত না। ধমক দিয়া বলিল, "গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ছিস কেন ? ঝরা ফুলগুলো দিয়ে খোকাকে একটা মালা গেঁথে দিয়ে, আয় আমরা খেলা করি।"

একটি বালিকা ছাদে ছাদে ছুটিয়া গিয়া বাড়ী হইতে সূচ সুতা লইয়া আসিল। সকলে মিলিয়া একটি মালা গাঁথিয়া খোকাকে পরাইয়া, কতকগুলি ফুল তুলিয়া খোকার হাতে দিল। প্রতিমা খোকাকে শাসাইয়া বলিল, "এইখানে লক্ষী হয়ে বসে খেলা কর, খবরদার এদিক-ওদিক যেয়ো না বুঝলে ?"

খোকা হৃষ্টচিত্তে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

প্রথমটা প্রতিমার খেলায় মন লাগিতেছিল না, কারণ মেয়েগুলি সকলেই তাহার চেয়ে ছোট, তবে খানিকক্ষণ খেলার পর সে ভাবটা কাটিয়া গেল। খেলা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন নীচের তলায় একজন লোকের

পদশব্দ উঠিল, কিন্তু খেলায় উন্মত্ত বালিকা দলের কর্ণে সে শব্দ গেল না। আগন্তুক লোকটি অনুমানে সব ব্যাপার বুঝিয়া যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করিল। ক্রীড়াশীলা বালিকাদের ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে সিঁড়ির উপরের ধাপে উঠিয়াই সে একটা রাক্ষুসে চীৎকার করিল। ছোট বালিকা কয়টি এই আকস্মিক বিপদে আত্মহারা হইয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া সিঁড়ি দিয়া ছাদে পলাইল।

আগন্তুক সিঁড়ির উপর পর্য্যন্ত তাহাদের তাড়া করিয়া গেল। ভয়ে মুহ্যমানা বালিকারা পশ্চাদ্ধাবনকারীর প্রতি চাহিয়া দেখিবার অবকাশও পাইল না, ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজে নিজেদের বাড়ী গিয়া হাঁফ ছাড়িল।

আগন্তুক হাসিতে হাসিতে নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিল সিঁড়ির মুখেই একটি প্রিয়দর্শন শিশু, মুখে একটি আঙ্গুল পুরিয়া অবাক বিস্ময়ে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে।

আগন্তুকের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল—হয় একজন এই বাড়ীতে বন্দী হইয়াছে, নতুবা এখনই তাহাকে আসিতে হইবে—ইহাই মনে করিয়া সাগ্রহে সে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল।

খোকা কিছু মাত্র আপত্তি করিল না, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে একটা ঘর দেখাইয়া বলিল—"জিজি।"

আগন্তুক উৎসাহিত হইয়া খোকাকে বলিল, "কৈ কোথা? চলো তো খোকা তোমার দিদিকে ধরিগে। বাপরে কি সব দস্যি মেয়ে! ফুলগাছগুলো তছনছ করে দিয়েছে।"

যাহাকে শোনাইবার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলা হইল, বলা বাহুল্য সে কথাগুলি সে শুনিতে পাইল।

খেলার সময় প্রতিমাই মাত্র "বুড়ী" ছোঁয় নাই। সে যে ঘর খানায় লুকাইয়া ছিল তাহা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বাঁ দিকে পড়ে। এদিকে ঐ একখানি মাত্র ঘর, বাকীগুলি সব সিঁড়ির ডান দিকে এবং ছাদে যাইবার সিঁড়িও ডান দিকে। খোকাকে না লইয়া যাইবারও উপায় ছিলনা, কাযেই প্রতিমাই ফাঁদে পড়িয়া গেল। খুব ভীরু প্রকৃতির মেয়ে সে নয়, তথাপি নির্জ্জন, অন্য লোকের বাড়ীতে কি হইবে এই আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আগন্তুকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। একবার মনে হইয়াছিল নীচে নামিয়া রাস্তা দিয়া নিজেদের বাড়ী গিয়া চাকর পাঠাইয়া খোকাকে লইয়া যায়, কিন্তু একেই বাজারের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইবে, আজকাল সে রাস্তায় বাহির হয় না, মা টের পাইলে লাঞ্ছনার শেষ থাকিবে না, কাযেই পরমুহূর্ত্তে সে সংকল্প ত্যাগ করিতে হইল।

আগন্তুক বন্দিনীকে শাস্তি দিবার সাধু সংকল্পে ছাদের সুউচ্চ দরজায় শিকল চড়াইয়া খোকাকে লইয়া প্রতিমা যেখানে বারান্দায় দরজার পাশে, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে নিশ্চিত ধারণা করিয়াছিল, কোনও ক্রন্দনপরায়ণা বালিকাকে দেখিবে এবং খুব খানক ধমক চমকে তাহাকে কাঁদাইয়া অন্য লোকের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশের অনৌচিত্য বুঝাইয়া দিবে। কিন্তু আসিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। বারান্দার একপাশে যেখানে গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের টকটকে উজ্জ্বল রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে ঠিক সেই রকমই সোণার মত জ্বলজ্বলে রংয়ের একটি কিশোরী নতনেত্রে দাঁড়াইয়া, অব্যক্ত ভয়ে তার রাঙা ঠোঁট দুটি, সুদীর্ঘ কৃষ্ণ পক্ষ্মরাজি কাঁপিতেছে। দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল।

প্রতিমা এতক্ষণ ভৎসনা আশা করিয়া নীরব ছিল, এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও সাড়া না পাইয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ সুন্দরকান্তি এক যুবক মুগ্ধ নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। তাহার চক্ষু আপনিই নামিয়া গেল, তাহার অজ্ঞাতে রক্তোচ্ছ্বাসে তাহার সুগৌর কপোল আরক্ত হইয়া উঠিল।

প্রতিমার দৃষ্টিতে যুবক সচেতন হইল কিন্তু কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। বাঙালীর ঘরে এমন বয়ঃপ্রাপ্তা কিশোরীকে এমন ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিতে প্রায় দেখা যায়না, তাও আবার পরের বাড়ীতে। অথচ তাহার খেলাই তাহাকে বালিকা প্রমাণ করিতেছে। তাহাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করা কঠিন, তুমি বলাও শক্ত?

অবশেষে যুবক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আমার বাড়ীতে গাছ থেকে ফুল ছেঁড়া হয়েছে? চুরীর শাস্তি পেতে হবে না?"

প্রতিমার মনে এতক্ষণ কত রকম ভয়ের উদয় হইতেছিল, যুবকের সুশ্রী চেহারায় ও কথা শুনিয়া কতকটা ভয় তাহার কাটিয়া গেল। বলিল, "ফুল আমরা চুরী

করিনি, গাছের তলায় যা পড়ে ছিল তাই নিয়েছি। খোকাকে নামিয়ে দিন।" প্রতিমা অগ্রসর হইল।

যুবক দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বেশ তো! চুরী করিনি বল্লেই হ'ল? এত ফুল কখনো গাছের তলায় ঝরে? 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরী করা হয়' এ তো সবাই জানে।"

প্রতিমার দুই চোখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "ঝরা ফুল নিলে চুরী করা হয় আমাদের জানা ছিল না। খোকা নেমে এস।"

যুবকের কোলে খোকা চঞ্চল হইয়া উঠিল, যুবক তাহাকে ছাড়িল না। কৌতুকের হাসিতে তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—মেয়েটির আবার রাগও আছে! বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "তা জানা থাকবে কেন? আর বিনা অনুমতিতে এই বাড়ীতে ট্রেস্‌পাস করা, তার জন্যে শাস্তি না নিয়ে অমনি চলে গেলেই হ'ল? তা ট্রেস্‌পাসের মানে জানলে তবে তো?"

যে উদ্দেশ্যে যুবকের এই কথা বলা, মুহূর্ত্তে তা সফল হইল। প্রতিমা রাগিয়া বলিল, "আমি ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ি ট্রেস্‌পাস মানে কি করে জানবো?"

যুবকটির চোখে এই কিশোরীর বেশভূষার কিছু পার্থক্য ধরা পড়িয়াছিল, সেই কারণে সে এই কথার অবতারণা করিয়াছিল।

"তবে আমার কি করা উচিত? আমি তালা বন্ধ ক'রে পুলিস ডেকে আনি?"

প্রতিমা মেয়েটি আর পাঁচটা মেয়ের মত মোটেই নয়, তার লজ্জা সঙ্কোচ কিছু কম হইলেও এই নির্জ্জন বাড়ীতে অপরিচিত যুবকের সান্নিধ্য তাহার অন্তরের সুপ্ত নারী প্রকৃতিকে কতকটা অস্বাচ্ছন্দ্য দিতেছিল। যুবকের তালা-বন্ধের প্রস্তাবে তার সব সাহস চলিয়া গেল। বায়োস্কোপের ছবির মতন তার চোখের উপর দিয়া কত কি বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্য খেলিয়া গেল যার একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণা তার নিজের কাছেই অজ্ঞাত। আশঙ্কায় তার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তার এই ভাবান্তর দেখিয়া ছেলেটি রহস্য পরিত্যাগ করিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিল, "সত্যি কি আমি পুলিস ডাকব ভাব্‌ছ? তোমার কোন ভয় নেই, আমি তামাসা করছিলাম। তুমি লেখাপড়া জানো অথচ এমন ছেলেমানুষ, ঠাট্টা বোঝ না? যাক্, আমায় একেবারে একটা অভদ্র ভেবে নিওনা, আমি ভদ্রলোকই।"

কৃতজ্ঞতায় প্রতিমার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কথা কহিতে পারিল না, শুধু কৃতজ্ঞ নয়নে যুবকের মুখের প্রতি একবার চাহিল। সেই সুন্দর দুটি চোখের চাহনীর ভিতর দিয়া যুবক এই কিশোরীর অন্তরের যেন অনেক খানি দেখিতে পাইল—সেখানে অম্লান কোমল একখানি হৃদয়, সংসারের কোন দাগ তাহাতে পড়ে নাই, নিজের অন্তরের সরলতায় তাহা মণ্ডিত।

প্রতিমা খোকাকে কোলে তুলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, যুবক বলিল, "মালাটা আমারই পাওনা, আমায় দিয়ে যাও।"

প্রতিমা খোকার নিকট হইতে মালা লইয়া যুবকের হাতে ফেলিয়া দিল। চাহিয়া দেখিল না, যুবক মালাটা নিজের পকেটে পূরিল। সিঁড়ির উপরে আসিয়া যুবক বলিল, "তোমাদের বাড়ী কোন্‌টা?" আঙুল দিয়া বাড়ী দেখাইয়া একটু লজ্জিত ভাবে প্রতিমা বলিল "আপনি নীচে যান।"

যুবক হাসিয়া নীচে নামিয়া গেল।

প্রতিমা নিজেদের সিঁড়ির ঘরে গিয়া দেখিল বালিকা কয়টি তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সকলে এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, "উঃ কে সে লোকটা প্রতিমা দি'? আমারা তো ভয়েই সারা, ভাবছিলাম তোমার কি হ'ল না জানি।"

"ভাবলেই হ'ল? আমায় ফেলে নিজেরা তো দিব্যি পালিয়ে এলি? যা এখন সব বাড়ী যা, ও কেউ নয় একটা দুষ্টু ছেলে। মায়েদের এ কথা বলিস্‌ নি যেন, শেষে বকুনি খাবে।" বলিয়া নীচে নামিতেই দেখিল দালানে তার মা একজন প্রৌঢ়া বিধবার সহিত কথা কহিতেছেন। প্রতিমাকে দেখিয়া মা বলিলেন, "কোথায় ছিলে, রোদ্দুরে ঘুরে মুখ চোখ হয়েছে দেখনা!"

প্রৌঢ়াটি গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "আহা নামে প্রতিমা, রূপেও স্বর্ণপ্রতিমা, তবে একটু ডাগর হয়েছে এই যা।"

মা ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ডাগর আর কোথা? এই তো চৌদ্দ চল্‌ছে। মেয়ে আমার বড় বাড়ন্ত তাই বড় দেখায়।

আর আমাদের কুলীনের ঘরে এর চেয়েও ঢের ডাগর মেয়ে থাকে।"

কথাটা প্রতিমার কাণে গেল। প্রতিবাদ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না, তাই মায়ের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সে চলিয়া গেল। মাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, কারণ—প্রতিমা ষোল বছরে পড়িয়াছে, এবং তাঁহার মেয়েটি অসঙ্কোচে সত্য কথা বলার সাহস রাখে।

প্রতিমার বিবাহের কথা বহুদিন হইতেই চলিতেছিল। এত বড় অনূঢ়া মেয়ে ঘরে রাখিয়া কি করিয়া অন্নজল গলা দিয়া নামে, এই অনুযোগ দু'বেলা মাতা ও পত্নীর নিকট শুনিয়া শুনিয়া প্রতিমার পিতা ভুবন বাবু তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আয় মন্দ না হইলেও, অনেকগুলি প্রতিপাল্য থাকায় সঞ্চয় বিশেষ হইত না। তাহার উপর প্রায় চারি বৎসর হইল জেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, তাহাতে বিস্তর খরচ হইয়াছিল। এই সব নানা কারণে প্রতিমার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

তাহার উপর প্রতিমার ইচ্ছানুযায়ী তাহাকে এতদিন পর্য্যন্ত লেখাপড়া শেখানো লইয়াও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি কম ছিল না। ভুবন বাবুর মাতাও তাঁহার বধূমাতার পক্ষে। তাঁহাদের মতে এত খরচ পত্র করিয়া লেখাপড়া না শিখাইয়া সেই টাকা সঞ্চয় করিলে এতদিনে স্বচ্ছন্দে বিবাহ হইয়া যাইত। ভুবন বাবু বিনা বাক্যে এই সব আলোচনা শুনিতেন, বেশী অসহ্য হইলে বলিতেন, "প্রতিমাকে আমি যেচে কারো বাড়ী পাঠাবো না, প্রতিমার বর আপনিই আসবে।"

ফলে পত্নীর অভিমান হইত এবং ভুবন বাবু বাহিরের ঘরে আশ্রয় লইতেন। স্বামীর সহিত ঝগড়া করিলেও গৃহিণী নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না। ঘটকী লাগাইয়া অনেক লোভনীয় পাত্রের সন্ধান বাহির করিতেন, কিন্তু তাহাদের পণের বহর শুনিয়া আবার পিছাইতে হইত। আরও মুস্কিল এই যে, মোটামুটি রকমের পাত্রের কথায় কন্যার পিতার কোন আগ্রহ দেখা যাইত না।

যাই হোক এইবার বোধ হয় প্রতিমার বিবাহের ফুল ফুটিয়াছিল। একটি ভাল পাত্রের খবর গৃহিণীর নিকট পাইয়া ভুবন বাবু আলস্য ত্যাগ করিয়া পাত্র দেখিয়া একেবারে পছন্দ করিয়া আসিলেন।

মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা এবার বোধ হয় তোমার নাত-জামাই আসছে। ছেলেটি যেমন দেখ্‌তে শুন্‌তে তেমনি স্বভাব। এম্‌-এ পাস, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, অথচ বয়স বেশী নয়। কলকাতায় দু'খানা বাড়ী। বাপ নেই, মায়ের ঐ একমাত্র ছেলে—যেমন আমি চাই। আর তারা টাকা চায় না, লেখাপড়া জানা সুন্দরী মেয়ে চায়। দেখ, মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো কত ভাল।"

মাতা হরিনাম জপিতেছিলেন, মাথায় মালাটি ঠেকাইয়া স্বগত বলিলেন, "হরি মুখ তুলে চাও।" তার পর পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখনই অত খুসী হয়োনা বাবা। আগে তাঁরা মেয়ে পছন্দ করুন।" প্রতিমার মাতা টিপ্পনী কাটিয়া বলিলেন, "যা লক্ষ্মী মেয়ে, তাঁরা দেখতে এলে কি করবে জানিনা। ধ'রে তো বসেই আছে বিয়ে করব না, যদিও করি তো পরীক্ষার পর। তা তাঁরা কবে মেয়ে দেখতে আসবেন?"

ভুবন বাবু বলিলেন, "শীগ্‌গিরই একদিন ছেলের মা মেয়ে দেখতে আসবেন। মেয়ে পছন্দ হলে এই মাসেই বিয়ে দেবার তাঁর ইচ্ছা। বল্লেন আমার ছেলেটি বড় লাজুক, আমার মতেই মত দেবে, মেয়ে দেখা তার দরকার হবে না। আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে বল্লেন তা হ'লে মেয়ের একখানা ফটো দেবেন তা হলেই হবে।" আজকালকার ছেলে, তাতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কাজেই আমার মনটায় একটা খট্‌কা লাগছে, একটু খবর নিতে হবে। তবে অন্য সব বিষয়েই ছেলেটি চমৎকার।"

প্রতিমার মাতা শুনিয়া বলিলেন, "এখন ভগবানের ইচ্ছায় ছেলেটি ভাল হয়, আর তাদের চোখে প্রতিমা লাগে, তবেই হয়। অত ভাল আমাদের ভাগ্যে সইলে হয়।"

সন্ধ্যা বেলায় ভুবন বাবু ছাদে বসিয়া গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন, প্রতিমা আসিয়া নীরবে তাঁহার পাশে বসিল। আকাশে তখন শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত যাইতেছে, তাহার ক্ষীণ আলোকে থামের ছায়া পড়িয়া ছাতের

উপর আলো আঁধার মিশাইয়া অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

আজ প্রতিমার ভাবী শাশুড়ী আসিয়া তাহাকে দেখিয়া গিয়াছেন এবং আগামী পরশু আশীর্ব্বাদ ঠিক করিয়া গিয়াছেন। প্রতিমার মনে বিদ্রোহ জাগিতেছিল। বিবাহ করিবে না বলিয়া হয়তো তাঁহার সম্মুখে কিছু বলিয়াও বসিতে পারিত, কিন্তু প্রথম দর্শনেই বিধবা যেমন সস্নেহে তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন, তাঁহার সৌম্য সুন্দর মুখের প্রতি চাহিয়া প্রতিমার মাথা আপনিই নত হইয়া গেল।

কিন্তু মন তাহার ভার হইয়া রহিল।

তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভুবনবাবু শঙ্কিত হইলেন। এই মেয়েটি তাঁহার অতিশয় আদরের। তাহার মাতাকে সে কোন কথা বলেনা, পিতাই তাহার একমাত্র আশ্রয়। তিনিও সযত্নে সংসারের সকলকার নিকট হইতে আদরিণী কন্যাকে আড়াল করিয়া চলিতেন। তাহার অন্তরের অম্লান সরলতা সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে নষ্ট না হয় এবং এই সরলতার জন্যই সে সাধারণের প্রিয় নয়, এই কথা জানিয়া তিনি তাহার সকল আবদার পূরণ করিয়া আসিয়াছেন।

কন্যাকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভুবনবাবু সস্নেহে তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "অমন চুপ করে কেন মা?"

পিতার এই স্নেহস্পর্শে প্রতিমার মনের পুঞ্জীভূত বেদনা গলিয়া গেল। তাঁহার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি বিয়ে করবো না বাবা!"

"কেন মা? সকলেই তো বিয়ে করে।"

"কি জানি বাবা, আমার বড় ভয় করে। আর আমার পরীক্ষা দেওয়া হয়তো হবে না।"

ভুবনবাবু সোজা হইয়া বসিলেন। দু'হাতে মেয়ের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া অপলকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। এত বয়স হইয়াছে অথচ সাংসারিক জ্ঞান ইহার মোটেই হয় নাই। তাহার সমবয়সী কত মেয়েরা এখন শ্বশুরঘর করিতেছে, কাহারও বা সন্তান হইয়াছে। পিতামাতার উদ্বেগ তাহাকে বিচলিত করে না, উদ্বেগের কারণ কি তাহা বুঝিবার সাধ্য তাহার নাই, এমন মেয়ের বিবাহ দিতেই হইবে একথা মনে করিয়া পিতার বক্ষে বেদনা বাজিল, কিন্তু কর্ত্তব্য কি? কন্যার মাথায় হাত বুলাইয়া তিনি ধীর স্বরে বলিলেন, "পরীক্ষার জন্যে কিছু আটকাবে না, সে বিষয়ে তাঁরাই খুব উৎসাহী। আর, ভয় করবার কিছু নেই মা, তারা অতি ভাল। সে সব খবর না জেনেই কি আমি বিয়ে দিচ্ছি?"

"তোমায় ছেড়ে আমি কি করে থাকবো?"

পিতার মুখে ক্ষীণ বিদ্যুতের মতন হাসি খেলিয়া গেল। "আমি কি করে থাকবো মা? তোমার দিদিকেও তো এক দিন পাঠিয়েছি, তবে তার থেকেও তুমি আমার বেশি অনুগত। আমি যখন ছাড়তে চাইছি তুমি ঠিক জেনো তোমার মঙ্গলের জন্যেই আমি তোমায় ছাড়ছি। তুমি বিষণ্ণ হোয়ো না মা,কর্ত্তব্য কায তুমি করছ মনে করেই কোরো।"

পিতার কণ্ঠস্বরে প্রতিমা মনের মধ্যে কতকটা নির্ভরতা পাইল; চিরদিন পিতার নিকটেই সে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং তিনি পরম স্নেহভরে কন্যাকে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন, আজ সেই আশ্রয়েই প্রতিমা নিঃস্পন্দ ভাবে পড়িয়া অনুভব করিতে লাগিল, পিতার হস্তস্পর্শের মধ্য দিয়া তাঁহার অন্তরের মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ তাহার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। পিতার চক্ষু যে সজল হইয়াছে তাহা সে দেখিতে পাইল না।

প্রতিমার বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। গায়ে হলুদের তত্ত্ব দেখিয়া সকলেই একবাক্যে ভাবী কুটুম্বের প্রশংসা করিল, কেবল তাহার দিদি নীলিমা একটু বিষণ্ণ ভাবে বলিল, "সবই ভাল বাবু, কিন্তু ভগ্নীপতিটিকে চোখে দেখলাম না এই আশ্চর্য্য! আজকালকার ছেলে, তাতে ডেপুটি সাহেব, একেবারে অদেখা মেয়ে বিয়ে করে তাই আমার আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে।"

নীলিমাদের কাকীমা তাহাদের অপেক্ষা বয়সে খুব বেশী বড় নন, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "সে একেবারে শুভদৃষ্টিতে দেখ্‌বে বলে বসে আছে, এখন কেবল কল্পনাই করছে। যাই হোক্ তার কল্পলোকের মূর্ত্তি আসলের কাছে হার মান্‌বে।"

প্রতিমা সেখানেই ছিল, এসব কথার মর্ম্মনিহিত অর্থটুকু তাহার নিকট সুস্পষ্ট না হইলেও উহা যে ঠাট্টা, তাহা

তাহা বুঝিতে পারিলেও বেচারী মাত্র কনে বলিয়াই ঠোঁট কামড়াইয়া চুপ করিয়া রহিল।

সন্ধ্যার সঙ্গেই কনে সাজাইবার ধুম পড়িয়া গেল। বাহিরে নহবতের সুরে উজ্জ্বল গ্যাসের আলোয় বাড়ী তখন গম গম করিতেছে। সেই নহবতের রাগিণী প্রতিমার অন্তরে ঘা দিয়া তাহাকে বিচ্ছেদ শঙ্কায় ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল।

সজ্জা সমাপনান্তে যখন মাতাকে প্রণাম করাইবার জন্য নীলিমা তাহাকে মায়ের নিকট আনিল, চন্দন-চর্চ্চিতা বধূবেশিনী কন্যার প্রতি চাহিয়া মায়ের হৃদয় অব্যক্ত বেদনায় মোচড়াইয়া উঠিল, তাঁহার উমা আজ পর হইবে!

মায়ের থমথমে ভাব দেখিয়া, প্রতিমা নিজেকে সামলাইতে পারিল না। মাকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পিতামহী আসিয়া বলিলেন, "ছি ছি শুভদিনে এমন ক'রে কাঁদে? বৌমা তুমিও তো আচ্ছা লোক বাছা, কেঁদে ভাসালে। নে নীলিমা ওকে সরিয়ে নে। যত সব কাণ্ড! আর এও বলি বাছা বৌমা, এইতো তোমার প্রথম মেয়ের বিয়ে নয়, আর একটিকেও বিয়ে দিয়েছ, অমন ছেলেমানুষী কেন?"

প্রতিমার মাতা চোখ মুছিয়া সরিয়া আসিলেন। তাঁহার এই অবোধ কন্যা অন্তরে যে একেবারে বালিকা, তাহার মর্য্যাদা কি শ্বশুরবাড়ীতে বুঝিবে? তিনি নিজেই কতদিন তাহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন।

যথাসময়ে পত্রপুষ্প-সজ্জিত মোটরে বর আসিল। বর আধুনিক কালের ছেলে, বাজী বাজনা করিয়া আসিতে রাজি হয় নাই।

যুগল শঙ্খের শব্দে ও হুলুধ্বনির মধ্যে বর সভাস্থ হইলে তাহার প্রশান্ত সুন্দর কান্তি দেখিয়া নীলিমার মনের ক্ষোভ দূর হইল। সকলেই বলিল, "হাঁ, মেয়ের যোগ্য বর।"

নীলিমা এক সময়ে ছুটিয়া আসিয়া প্রতিমার কাণে কাণে বলিয়া গেল, "তোর বর খুব সুন্দর রে।"

প্রতিমা বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইল। ইহারা ভাবিয়াছে বর সুন্দর কি কুৎসিত ভাবিয়া প্রতিমার যেন ঘুম হইতেছে না! বিবাহের জন্য সে অত হাপিত্যেশ করিয়া ছিল না।

বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে স্ত্রী আচার আরম্ভ হইল।

বস্ত্রাবৃতা প্রতিমাকে সাত পাক ঘোরাইয়া মাথার হইল, উপর আচ্ছাদন দিয়া যখন তাহাকে চোখ চাহিতে বলা অভিমানে তখন তাহার চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িয়া-ছিল। মাথা নত করিয়া সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। "ওকি, চেয়ে দেখ, অমন করে না!" বলিয়া জোর করিয়া একজন তাহার মাথা তুলিয়া ধরিতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত হিম হইয়া আসিল। উজ্জ্বল আলোয় চশমার কাঁচ ভেদ করিয়া একটি সকৌতুক দীপ্ত দৃষ্টি অপলকে তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া আছে। মাথা ঘুরিয়া প্রতিমা টলিয়া পড়িবার মত হইল। পাশেই যাহার হাত ছিল সেখানা ধরিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। তাহার ভগ্নীপতি রহস্য করিয়া বলিলেন, "দেখেই যে মাথা ঘুরে গেল, পরে কি হবে?" সে দৃষ্টি সেদিনকার সেই নূতন বাড়ীর যুবকের।

তার পর সম্প্রদানান্তে বরকন্যা বাসরে আসিল। প্রতিমার মনে এতক্ষণ পর্য্যন্ত অপরিচিতের একটা যে ভয় জাগিতেছিল, কখন যে সেটা সরিয়া গিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এখন তাহার মনে জাগিতেছিল একটা লজ্জা, অভিমান। বরের নাম সুবিমল।

৬

ফুলশয্যার গভীর রাত্রে সুবিমল বধূকে ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া বাতির সুইচ টিপিয়া দিতেই দেখিল বিছানায় প্রতিমা নাই, জানালার কাছে একখানা কৌচে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া আছে। মৃদু হাসিয়া প্রতিমাকে উঠাইতে গিয়া দেখিল সে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। বিস্মিত হইয়া জোর করিয়া তাহাকে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছো কেন প্রতিমা?" প্রতিমা কথা কহিল না, দ্বিগুণ ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুবিমল বিব্রত হইল, সযত্নে তাহার চোখ মুছাইয়া বলিল, "বল কেন কাঁদছো। বাপের বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে?" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিমা বলিল, "কেন আপনি এমন করলেন?"

"কি করলাম, তোমার বিয়ে ?"

প্রতিমার চোখে আবার জল উথলাইয়া উঠিল। বলিল "এমন করে লুকিয়ে দেখে, ছিঃ আমার এমন লজ্জা করছে। সকলে শুনলে—"

সুবিমল হাসিয়া বলিল, "লুকিয়ে তো আমি তোমায় দেখতে যাইনি, ভগবান আমায় দেখিয়ে দিলেন। লজ্জার কি আছে ? ভাগ্যে সেদিন বন্ধুর বাড়ী দেখতে গিয়েছিলাম, তাই পাষাণ পুরীর রাজকন্যার দেখা পেলাম। তোমার চোখের জল আর বাঁধ মানবে না দেখছি। আমায় বুঝি তোমার পছন্দ হয়নি তাই এত কাঁদছ ?"

চকিত দৃষ্টিতে বরের প্রতি চাহিয়া প্রতিমা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "বিয়ে করতে আমার একটুও ভাল লাগেনা।"

"সেই জন্যে কান্না ? আমার দিকে চাও তো !" বলিয়া জোর করিয়া প্রতিমার মুখ খানা তুলিয়া ধরিল। বরের মুখের প্রতি চাহিতেই লজ্জার স্পর্শে প্রতিমার চোখ মুদিয়া আসিল। পাশের বাড়ীতে কে অত রাত্রে গাহিতেছিল—

কে জন যেন আমার মাঝে, জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোণার কাঠি ছুঁইয়ে দাও !

সুবিমল হাসিয়া বলিল "এই অরুণ আলোর পরশ পেয়ে তোমার ঘুম ভাঙ্‌বে।"

সলজ্জ কণ্ঠে প্রতিমা বলিল, "কি করে এমন হল ?"

সুবিমল হাসিয়া বলিল, "আমার বন্ধু নীরদ ঐ বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছে। সেদিন রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, ইচ্ছা হলো বাড়ীটা দেখে যাই। একটা সাধারণ তালা ছিল, আমার চাবীতেই খুলে গেল। তার পর যা হ'ল তা তো তুমি জানই ! তোমার সঙ্গে উপরে গিয়ে তোমাদের বাড়ীটা দেখে এলাম, নীচে এসে তোমাদের বাড়ীর সামনেই একটি ঘটকী আমায় দিয়ে একটা ঠিকানা পড়িয়ে নিলে। তার কাছেই তোমাদের পরিচয় পেলাম। আমার মা কত ভাল, তুমি ক্রমশঃ বুঝবে। আমি মায়ের একমাত্র ছেলে, আমার মতে মা কখনো অমত করেন না, কাযেই সব ঠিক হ'ল। একবার তোমায় দেখতে যাবার খুব ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তোমায় অবাক করে দেবো ব'লে আসিনি। যাক্ তুমি হয়তো কার ধ্যান করছিলে, ধ্যান ভেঙ্গে দেখলে সেদিনকার সেই অভব্যটা তোমায় গ্রাস করবার জন্য হাঁ করে আছে, তাই অমন চম্‌কে উঠেছিলে ?"

"যান্ আপনি ভারী দুষ্টু।"

প্রতিমার কাণের কাছে নত হইয়া সুবিমল বলিল "যদি আমায় ফের তুমি আপনি বলবে, তবে আমাদের প্রথম পরিচয়ের কথাটা সকলকার কাছে প্রকাশ ক'রে দেবো।"

শ্রীমণিমালা দেবী।

রূপ

ওগো রূপ ! উঠে এলে কুম্ভে সুধা ভরি
তৃষার্ত্ত বসুধা-বক্ষে অকস্মাৎ, মরি,
কে মোহিনী মনোরমা, চির-কামনার
সিন্ধুতল হতে ? রুদ্ধ দেউলের দ্বার
সহসা উন্মুক্ত হল রহস্য-মন্দিরে।
বিস্ময়ে দেবতা জাগে বিস্মৃতির তীরে।
স্পন্দে জগতের বুকে অজ্ঞাত চেতনা,
অনির্ব্বচনীয় সুখে অপূর্ব্ব বেদনা।

অরূপের অন্বেষণে পথশ্রান্ত মন
তোমার পূজার মন্ত্র করে গুঞ্জরণ,
শব্দচ্ছন্দ লীন হয় লীলায়িত ধূমে ;
মূর্চ্ছাতুর পুরোহিত ঢুলে ঘন ঘুমে
জ্বালিয়া অগুরু-গন্ধ জীবনের ধূপ,
ওগো রস, ওগো রূপ, ওগো অপরূপ !

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

সহধর্ম্মিণী (৩)

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী কায়স্থ বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের সহধর্ম্মিণী—
ক্ষীরোদামোহিনী

প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী—হেমাঙ্গিনী

'ইণ্ডিয়ান নেশনে'র সম্পাদক ও ইংরাজীতে সুলেখক নগেন্দ্রনাথ ঘোষের সহধর্ম্মিণী—লালমণি

ভগবান বসুর সহধর্ম্মিণী

এলাহাবাদের অতিথিবৎসল জমিদার ও কংগ্রেস কর্ম্মী চারুচন্দ্র মিত্রের সহধর্ম্মিণী—শিবসুন্দরী

ইংরাজী কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত নবকৃষ্ণ ঘোষের
(রামশর্ম্মার) সহধর্ম্মিণী—শিবসীমন্তিনী
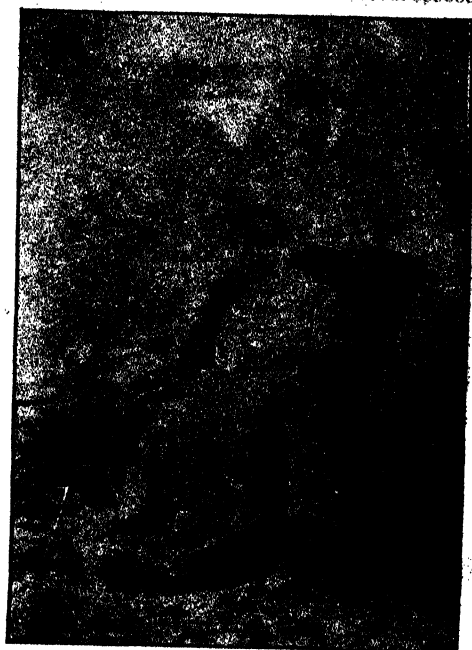
Cherry Blossoms প্রভৃতি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা
গিরিশচন্দ্র দত্তের সহধর্ম্মিণী—জয়চণ্ডী
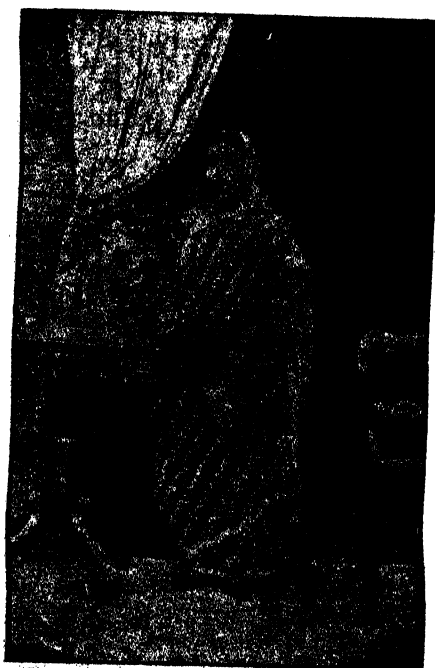
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী—সর্ব্বময়ী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী—সাহানা

ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসুর সহধর্ম্মিণী
কৈলাসবাসিনী

ডাক্তার রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুরের
সহধর্ম্মিণী—হেমলতা

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী
জগদম্বা

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহধর্ম্মিণী
রাজকুমারী

গত বৈশাখে ও আষাঢ়ে এই পর্য্যায়ে ৪৯ খানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে আরও ১৩খানি চিত্র পাঠকগণকে উপহার প্রদত্ত হইল।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

বৈদেশিকী

সঙ্কলন

১। সুমেরুপ্রদেশ ভ্রমণকল্পে অভিনব জলতলপোত—ইহাতে তুষারস্তূপ বিদারণার্থ বহুপ্রকার যন্ত্রাদি থাকিবে।

২। তাড়িৎমুদ্রাক্ষর বিন্যাসে (tele-type-setting) প্রেরকযন্ত্র।

(ক) এই ক্ষুদ্র যন্ত্র সাহায্যে মিশ্রমুদ্রণ (intertype) ও পংক্তিমুদ্রণ (linotype) কার্য্যে অক্ষরগুলি আপনা হইতেই

(খ) রেখাচিত্রে তাড়িৎমুদ্রাক্ষরবিন্যাস যন্ত্রের সাহায্যে
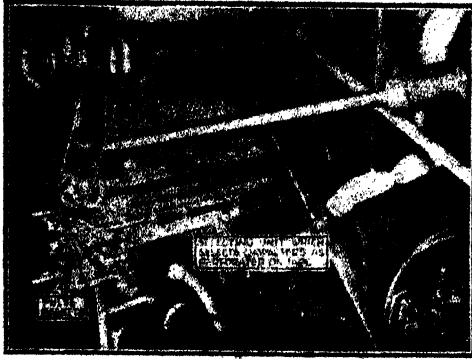
(গ) অক্ষরচয়নযন্ত্র :—ইহাতে সাঙ্কেতিক ছিদ্রশ্রেণী অক্ষরে রূপান্তরিত হয়। সূচীরন্ধ্র শ্রেণী সমন্বিত ফিতা প্রেরক যন্ত্র হইতে নির্গত হইয়া বণ্টনযন্ত্র মধ্যে (distributor) ধাবিত হইলে যে তাড়িতাভিঘাত সঞ্চারিত হয় তাহাতেই বহুদূরস্থিত গ্রাহকযন্ত্রসাহায্যে অক্ষর সজ্জিত হয়।
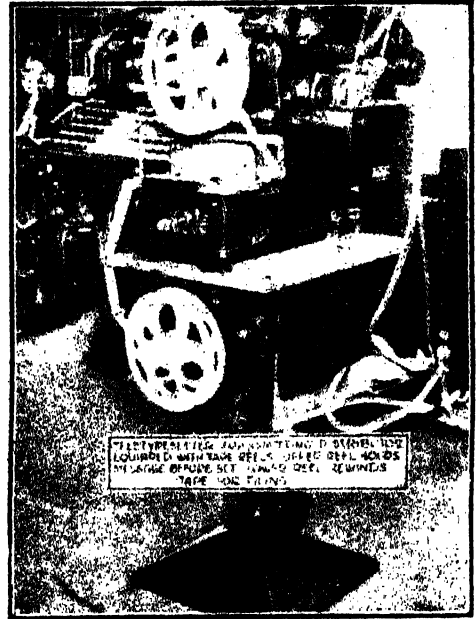
(ঙ) সঙ্কেত বণ্টন যন্ত্র :—ইহাতে দুইটী ফিতার কাঠিম আছে। উপরের কাঠিম হইতে সঙ্কেত প্রেরিত হয় এবং নিম্নের কাঠিমে সদ্য-ব্যবহৃত ফিতাগুলি জড়াইয়া রাখা হয়।
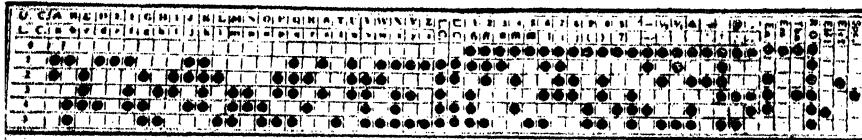
(ঘ) ছিদ্রিত অক্ষর সঙ্কেত ফিতা। প্রত্যেক অক্ষর সঙ্কেতার্থ ছয়টীর অধিক ছিদ্র থাকে না।

৩। মানদণ্ড সংযুক্ত পেন্‌সিল—ইহার ক্রমাঙ্কিত দুই ভাগ পরস্পরের সহিত যথাযথ ভাবে সংশ্লিষ্ট হইলে সঠিক অঙ্কফল পাওয়া যায়।

৪। ফরাসীদেশীয় দ্বিতল রেলগাড়ী। ইহা এক্ষণে যুক্তপ্রদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তথায় স্থানে ... হইতেছে।
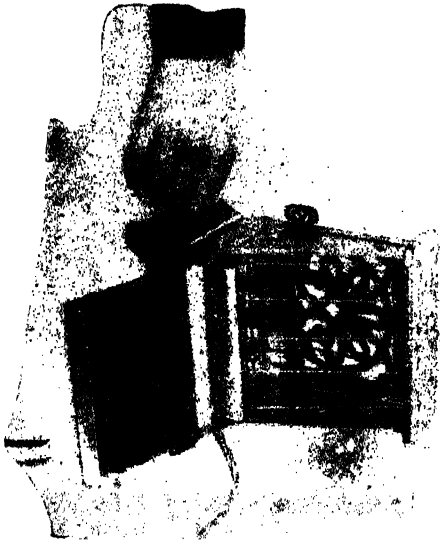
৫। পাঁউরুটি ভাঁজিবার নূতন কৌশল—ইহাতে পাঁউরুটি খণ্ডগুলি যথোপযুক্তরূপে ভর্জ্জিত হইলে যন্ত্রের কার্য্য আপনা হইতেই বন্ধ হয়।

(৭) অবগুণ্ঠনশূন্য উজবেক তরুণী:—আনুক্রমিক বিভিন্নজাতির প্রয়াণফলে রুশদেশীয় সীমান্ত প্রদেশগুলি মিশ্র জাতিতে পরিপূর্ণ। উহাদের মধ্যে অর্দ্ধসভ্য উজবেক-জাতি তুলার চাষ করে। উহারা মুসলমান এবং উহাদের সমাজে কঠোর অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে।
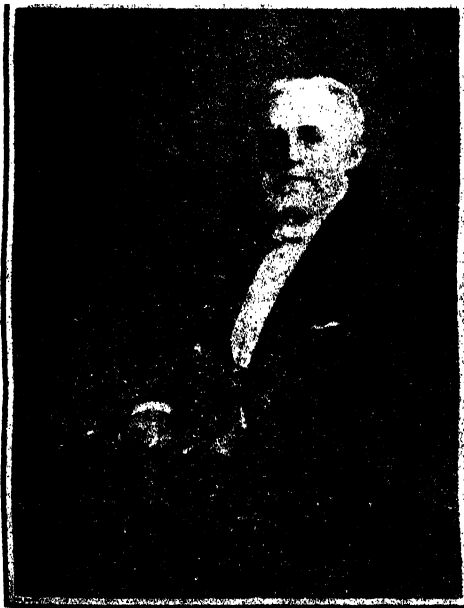
৬। শ্রেষ্ঠতম প্রচার কার্য্যালয় কুর্টিস্ পাবলিশিং কোম্পানির স্বত্বাধিকারী সাইরাস এইচ, কে, কুর্টিস। ইনি বালক বয়সে মাত্র তিন সেণ্ট মূলধন লইয়া সংবাদপত্র বিক্রয়ের কার্য্য আরম্ভ করেন। এক্ষণে তাঁহার কার্য্যালয় হইতে তিনটী দৈনিকপত্র এবং কয়েকটী মাসিকপত্রিকা

৮। টমাস্ আলভা এডিসন্ ও চার্লস্টাই নমেট্‌স

৯। অস্থিতত্ত্ব প্রকাশক ভূতপূর্ব্ব ডাঃ এ, টি ষ্টিল্‌। ডাঃ ষ্টিলের শতবার্ষিক জন্মোৎসবে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী তাঁহার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং একযোগে তাঁহার চিকিৎসাপদ্ধতি মানিয়া লইয়াছেন। ডাঃ ষ্টিলের মতে আস্থিক, মানসিক ও কায়িক শক্তি সমন্বয়ে মানবশরীরে অস্থি ও মাংসপেশী সমূহ যথাযথরূপে সন্নিবিষ্ট আছে এবং তাহাই প্রকৃতিসিদ্ধ। কৃত্রিম বিশৃঙ্খলাই অসুস্থতার কারণ এবং যথা নিয়মে তাহার পরীক্ষা ও প্রতিষেধ আবশ্যক। তাৎকালিক চিকিৎসকগণ উক্ত মত অনুমোদন করেন নাই, কারণ ডাঃ ষ্টিল্‌ ঔষধ সেবন ও অস্ত্রোপচার চিকিৎসার বিরোধী ছিলেন। সাম্য নিয়ামক স্বাস্থ্যই তাঁহার কামনা ছিল এবং যন্ত্রবিদের ন্যায় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইতেই তিনি উপদেশ দিতেন।

১০। ডামাস্কসের সমৃদ্ধ তরবারি নির্ম্মাণশালা। এক সময়ে এই স্থানে

মহারাষ্ট্রনেতা শিবাজীর জীবনের

রাজ্য ও রাজস্ব

শিবাজী দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর অবিরাম পরিশ্রম এবং নিদ্রাহীন চেষ্টার ফলে যে-রাজ্য গঠন করিয়া যান, তাহার বিবরণ এক কথায় দেওয়া অসম্ভব, কারণ নানা স্থানে তাঁহার স্বত্ব নানা প্রকারের এবং তাঁহার প্রভাব বিভিন্ন পরিমাণের ছিল।

প্রথম হইল তাঁহার নিজের দেশ; ইহাকে মারাঠীতে "শিব-স্বরাজ" এবং ফারসীতে "পুরাতন-রাজ্য" (মমালিক-ই-কদিমি) বলা হইত। এখানে তাঁহার অধিকার ও ক্ষমতা স্থায়ী এবং সকলেই তাহা মানিয়া চলিত। ইহার বিস্তৃতি সুরত শহরের ষাট মাইল দক্ষিণে কোলী দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া গোয়ার দক্ষিণে কারোয়ার নগর পর্য্যন্ত; মাঝে শুধু পশ্চিম উপকূলে পোর্তুগীজদের গোয়া ও দামন প্রদেশ দুইটি বাদ। এই দেশের পূর্ব্ব সীমা বগলানা ঘুরিয়া দক্ষিণ দিকে নাসিক ও পুণা জেলার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া, সাতারা ও কোলাপুর জেলা বেড়িয়া, উত্তর-কানাড়ার কূলে গঙ্গাবতী নদীতে গিয়া শেষ হয়। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি পশ্চিম-কর্ণাটকে বেলগাঁও-এর পূর্ব্বে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে কোপল প্রভৃতি জেলা অধিকার করেন; এগুলি তাঁহার স্থায়ী লাভ।

এই শিব-স্বরাজ তিন প্রদেশে বিভক্ত এবং তিনজন সুবাদারের শাসনাধীন ছিল :—

(১) দেশ, অর্থাৎ নিজ মহারাষ্ট্র; পেশোয়ার শাসনে,

(২) কোঁকন, অর্থাৎ সহ্যাদ্রির পশ্চিমাঞ্চল; অন্নাজী দত্তোর অধীনে,

(৩) দক্ষিণ-পূর্ব্ব বিভাগ, অর্থাৎ দক্ষিণ-মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম-কর্ণাটক; দত্তাজী পন্তের শাসনে।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্ব-কর্ণাটক অর্থাৎ মান্দ্রাজে (১৬৭৭-৭৮) দিগ্বিজয়ের ফলে জিঞ্জি বেলুর প্রভৃতি জেলা তাঁহার হাতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানে তাঁহার ক্ষমতা তখনও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই; তাঁহার সৈন্যেরা যতটুকু জমি দখলে রাখিতে বা যেখানে রাজস্ব আদায় করিতে পারিত, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত; অন্য সর্ব্বত্র অরাজকতা এবং পুরাতন ছোট ছোট সামন্তদের সংঘর্ষ। মহীশূরে বিজিত স্থান কয়টিরও সেই দশা। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্যন্ত কানাড়া অধিত্যকায়, অর্থাৎ বর্ত্তমান বেলগাঁও ও ধারোয়ার জেলায় এবং সোন্ধা ও বিদনুর রাজ্যে, যুদ্ধ চলিতেছিল, তাঁহার ক্ষমতা নিঃসন্দেহভাবে স্থাপিত হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, এই সব স্থানের বাহিরে নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলিতে তাঁহার সৈন্যেরা প্রতি বৎসর শরৎকালে গিয়া ছয় মাস বসিয়া থাকিয়া চৌথ আদায় করিত। এই কর রাজার প্রাপ্য রাজস্ব নহে, ইহা ডাকাতদের খুশী রাখিবার উপায় মাত্র। ইহার মারাঠী নাম "খণ্ডনী" (অর্থাৎ "এই টাকা লইয়া আমাকে রেহাই দাও, বাবা!") হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু চৌথ আদায় করা সত্ত্বেও মারাঠারা অপর শত্রুর আক্রমণ হইতে সেই দেশ রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিত না; তাহারা নিজেরা ঐ দেশ লুটিবে না, এইটুকু মাত্র অনুগ্রহ দেখাইত।

শিবাজীর সভাসদ্ কৃষ্ণাজী অনন্ত ১৬৯৪ সালে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রভুর রাজস্বের পরিমাণ বৎসরে এক কোটি হোণ এবং চৌথ ৮০ লক্ষ হোণ ধার্য্য ছিল। হোণ একটি খুব ছোট স্বর্ণমুদ্রা, ইহার দাম প্রথমে চারি টাকা ছিল, পরে পাঁচ টাকা হয়, সুতরাং এই দুই বাবদে শিবাজীর আয় ৭ হইতে ৯ কোটি টাকার মধ্যে ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদায় হইত অনেক কম, এবং তাহাও সব বৎসরে সমান হইত না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভাণ্ডারে যে ধনরত্ন পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ মারাঠা ভাষার সভাসদ-বখরে এবং ফারসী ইতিহাস 'তারিখ-ই-শিবাজী'তে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা ছিল ছয় লক্ষ মোহর এবং প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ হোণ, ও সাড়ে বারো খণ্ডী ওজনের ভাঙ্গা সোনা; রৌপ্য-মুদ্রা ছিল ৫৭ লক্ষ টাকা, এবং ৫০ খণ্ডী ওজনের ভাঙ্গা রূপা; হীরা মণিমুক্তা বহু লক্ষ টাকা দামের। [এক খণ্ডী কলিকাতার সাত মণের কিছু কম, ৬.৮ মণ]

সৈন্যসংখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ

ইংরাজ-যুগের পূর্ব্বে আমাদের দেশে দুই রকম অশ্বারোহী সৈন্য ভর্ত্তি করা হইত; যাহারা সম্পূর্ণভাবে রাজার চাকর এবং রাজসরকার হইতে অস্ত্র বর্ম্ম ও অশ্ব পাইত তাহাদের নাম "পাগা"; আর যে-সব ভাড়াটে অশ্বারোহী নিজেই অস্ত্র বর্ম্ম ও ঘোড়া কিনিয়া, ডাক পড়িলে নানা রাজ্যে বেতনের লোভে কাম করিত, তাহারা "সিলাদার"। পাগা সৈন্যদের ফারসী ভাষায় "বার্-গীর" (=ভারবাহী) বলা হইত, ইহা হইতে আমাদের "বরগী" শব্দের উৎপত্তি। যে বৎসর বা যে অভিযানে যত লোক আবশ্যক হইত, সেই অনুসারে রাজা কম বেশী সিলাদার ভাড়া করিতেন।

রাজ্যস্থাপনের গোড়ার দিকে শিবাজীর অধীনে এক হাজার (অথবা বারো শত) পাগা এবং দুই হাজার সিলাদার অশ্বারোহী ছিল। তাহার পর রাজ্যবিস্তার ও দূর দূর দেশ আক্রমণের ফলে তাঁহার সৈন্যদল ক্রমশঃ বাড়িয়া জীবনের শেষ বৎসরে দাঁড়াইয়াছিল—৪৫ হাজার পাগা ২৯ জন সেনানীর অধীনে ২৯ দলে বিভক্ত) এবং ৬০ হাজার সিলাদার (৩১ জন সেনানীর অধীনে), আর এক লক্ষ মাব্‌লে পদাতিক (৩৬ জন সেনানীর অধীনে)।

এই পদাতিকগুলি বর্ত্তমান সভ্যজগতের সৈন্যদের মত বারো মাস কুচ-কাওয়াজ করিত না বা রাজার কাযে সৈন্য-আবাসে আবদ্ধ থাকিত না; তাহারা চাষের সময় নিজ গ্রামে গিয়া জমি চাষ করিত, আর বিজয়া দশমীর দিন বিদেশ আক্রমণ করিবার জন্য, অথবা যুদ্ধের আশঙ্কা থাকিলে তাহার আগেই, আবার সৈন্য-নিবাসে আসিয়া জুটিত; তখন তাহাদের অস্ত্রবর্ম্মে সজ্জিত ও দলবদ্ধ করিয়া নেতার অধীনে রাখিয়া সৈন্যদল গঠন করা হইত। দুর্গরক্ষী পদাতিকেরা ইহাদের হইতে পৃথক; তাহারা দুর্গের নীচে চাষ করিবার জন্য জমি পাইত, এবং পরিবারদিগকে দুর্গে (কখন-বা ঐ নীচের গ্রামে) রাখিত। ইহারা বারোমেসে চাকর; ঘর ছাড়িয়া তাহাদের দূরে যাইতে হইত না।

শিবাজীর নিজের ১২৬০ (অন্য মতে তিন শত) হাতী, তিন হাজার উট, এবং ৩৭ হাজার ঘোড়া ছিল।

অষ্টপ্রধান

১৬৭৪ সালে রাজ্যাভিষেকের সময় শিবাজীর আটজন মন্ত্রী ছিলেন; সেই উপলক্ষে তাঁহাদের পদের উপাধি ফারসী হইতে সংস্কৃতে বদলান হয়:—

(১) মুখ্য-প্রধান (ফারসী নাম, পেশোয়া); ইনিই প্রধান মন্ত্রী, রাজার প্রতিনিধি ও দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ, এবং নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে মতভেদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি করিয়া রাজকার্য্যের সুবিধা করিয়া দিতেন। কিন্তু অপর সাত প্রধান তাঁহার অধীন বা আজ্ঞাবহ ছিল না, সকলেই নিজ নিজ বিভাগে একমাত্র রাজা ভিন্ন আর কাহাকেও প্রভু বলিয়া মানিত না।

(২) অমাত্য (ফারসী, মজমুয়া-দার) অর্থাৎ হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর বা একাউন্ট্যাণ্ট-জেনারেল); তাঁহার স্বাক্ষর ভিন্ন রাজ্যের আয়ব্যয়ের হিসাবের কাগজ গ্রাহ্য হইত না।

(৩) মন্ত্রী (ফারসী, ওয়াকিয়া-নবিস্‌); ইনি রাজার দৈনিক কার্য্যকলাপ এবং দরবারের ঘটনার বিবরণ লিখিতেন। যাহাতে রাজাকে গোপনে হত্যা বা বিষ খাওয়াইবার কোনরূপ চেষ্টা না হয়, সেজন্য রাজার সঙ্গী, আগন্তুক ও খাদ্যদ্রব্যের উপর মন্ত্রীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইত।

(৪) সচিব (ফারসী, শুরু-নবিস); ইনি সরকারী চিঠিপত্রের ভাষা ঠিক হইল কিনা দেখিয়া দিতেন। যাহাতে জাল রাজপত্রের সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য সচিবকে প্রত্যেক ফর্ম্মান ও দানপত্রের প্রথম পংক্তি নিজহস্তে লিখিয়া দিতে হইত।

(৫) সুমন্ত্র (ফারসী, দবীর) অর্থাৎ পর-রাজ্য-সচিব (ফরেন সেক্রেটারী): ইনি বিদেশী দূতদের অভ্যর্থনা ও বিদায় করিতেন এবং চরের সাহায্যে অন্যান্য রাজ্যের খবর আনাইতেন।

(৬) সেনাপতি (ফারসী, সর্-ই-নৌবৎ)

(৭) দানাধ্যক্ষ, অথবা মারাঠী ভাষায় ডাক-নাম "পণ্ডিত রাও"(ফারসী, সদর ও মুহতসিবের পদ মিলাইয়া); ইনি রাজার পক্ষ হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দক্ষিণা ধার্য্য করিয়া দিতেন, ধর্ম্ম ও জাত্-সম্পর্কীয় বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার করিতেন, পাপাচার ও ধর্ম্মভ্রষ্টতার শাস্তি এবং প্রায়শ্চিত্ত বিধির হুকুম দিতেন।

(৮) ন্যায়াধীশ (ফারসী, কাজী-উল্-কুজাৎ), অর্থাৎ

প্রধান বিচারপতি (চীফ্ জাষ্টিস); ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মামলা ছাড়া অপর সব বিবাদের বিচারভার ইঁহার হাতে ছিল।

ইঁহাদের মধ্যে সেনাপতি ছাড়া আর সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলেও (দানাধ্যক্ষ ও ন্যায়াধীশ ছাড়া) অপর পাঁচজন অনেক সময় সৈন্যদলের নেতা হইয়া যুদ্ধে যাইতেন, এবং ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কোন অংশে কম বীরত্ব বা রণ-চাতুর্য্য দেখাইতেন না। সব ফর্ম্মান, দানপত্র, সন্ধিপত্র প্রভৃতি বড় বড় সরকারী কাগজে প্রথমে রাজার মোহর, তাহার পর পেশোয়ার মোহর, এবং সর্ব্বনীচে অমাত্য মন্ত্রী সচিব ও সুমন্ত—এই চারি প্রধানের স্বাক্ষর থাকিত।

বর্ত্তমান যুগে বিলাতে মন্ত্রীসভা (ক্যাবিনেট)ই দেশের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা; তাঁহারা সব বিভাগে নিজ হুকুম চালান, যুদ্ধ সন্ধি রাজস্ব শিক্ষা সর্ব্ববিষয়ে রাজ্যের নীতি স্থির করেন। রাজা তাঁহাদের মানিতে বাধ্য, কারণ তাঁহাদের পশ্চাতে দেশের অধিকাংশ লোক আছে; রাজা তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে কায না করিলে তাঁহারা রাগিয়া পদত্যাগ করিবেন, জনসাধারণ ক্ষেপিয়া উঠিবে, এবং রাজাকে অপদস্থ (হয়ত পদচ্যুত) হইতে হইবে। কিন্তু শিবাজীর উপর মারাঠা অষ্ট প্রধানদের কোন ক্ষমতাই ছিল না; তাঁহারা রাজার কেরাণী (সেক্রেটারি) মাত্র, রাজার হুকুম পালন করিতেন, তাঁহারা যে উপদেশ দিতেন তাহা শুনা না শুনা রাজার ইচ্ছা। প্রধানেরা কোন বিষয়েই রাজনীতি বাঁধিয়া দিতে পারিতেন না, এমন কি তাঁহাদের নীচের কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত বিভাগীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাজার কাছে আপিল করিতে পারিত। আর এই অষ্ট প্রধানের প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান, হিংসাপরবশ,—ইংরাজ ক্যাবিনেটের সদস্যদের মত সুশৃঙ্খল, একজোটে বাঁধা দল ছিল না।

লেখকেরা, এবং অনেক স্থলে হিসাব-রক্ষকেরা সকলেই জাতিতেই কায়স্থ ছিলেন (চিটনবিস, ফর্দ্দ-নবিস ইত্যাদি)। সৈন্যদের বেতনের হিসাব লিখিত "সবনিস" উপাধিধারী এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী। ইহাদের পদ সামান্য হইলেও প্রভাব ছিল খুব বেশী। শিবাজীর কর্ম্মচারীরা (বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সুবাদার, খানাদার প্রভৃতি) অতি নির্লজ্জভাবে পীড়ন করিয়া ঘুষ লইত এবং রাজস্ব আত্মসাৎ করিয়া টাকা জমাইত।

দুর্গের বন্দোবস্ত

প্রত্যেক দুর্গ ও থানা তিন শ্রেণীর কর্ম্মচারীর হাতে রাখা ছিল; তাহাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিভাগে প্রধান, প্রত্যেকেই অপর দুইজনের উপর সহিংস সতর্ক দৃষ্টি রাখিত; অতএব তাহাদের একজোটে প্রভুর দুর্গ বা ধন নাশ করিবার ষড়যন্ত্র করা সম্ভব ছিল না। এই তিনজন— (১) হাবলাদার (২) সর-ই-নৌবৎ, ও (৩) সবনিস্। ইহাদের প্রথম দুইটি জাতে মারাঠা, তৃতীয়টি ব্রাহ্মণ; সুতরাং জাতিভেদের ঝগড়াতে ঐ তিনজনের দল বাঁধার ভয় দূর হইল। দুর্গের রসদ মাল প্রভৃতি একজন কায়স্থ লেখক (কারখানা-নবিস)-এর জিম্মায় ছিল। বড় বড় দুর্গগুলির দেওয়াল চার-পাঁচ এলাকায় ভাগ করা ছিল, প্রত্যেক এলাকা একজন রক্ষী (তট্-সর-ই নৌবৎ)-এর হাতে। দুর্গের বাহিরে পার্ওয়ারি ও রামুশী (বংশগত চোর) জাতের লোক চৌকি দিত।

দুর্গের হাবলাদার নীচের আমলাদের নিয়োগ বরখাস্ত করিতে পারিত, সরকারী চিঠিপত্র তাহার নামে আসিত, এবং সরকারের জন্য লিখিত চিঠিপত্রে নিজের মোহর দিয়া পাঠাইত। তাহার কর্ত্তব্য ছিল প্রত্যহ সন্ধ্যায় দুর্গদ্বার চাবি দিয়া বন্ধ করা এবং প্রাতঃকালে তাহা খোলা। এই ফটকের চাবিগুলি সে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিত, রাত্রে পর্য্যন্ত বালিসের নীচে গুঁজিয়া ঘুমাইত। সর্ব্বদাই চারিদিকে ঘুরিয়া দুর্গের ভিতরে ও বাহিরে সব ঠিক আছে কিনা দেখিত, আর অসময়ে খবর না দিয়া হঠাৎ গিয়া পাহারাদারেরা ঘুমাইতেছে কি সতর্ক আছে তাহার খোঁয লইত। সর-ই-নৌবৎ রাত্রের চৌকিদারদের কাজ দেখিত।

সৈন্য-বিভাগের শৃঙ্খলা

রাজার নিজ অশ্বারোহী (অর্থাৎ পাগা)-র দল এইরূপে গঠিত হইত। ২৫জন সাধারণ সৈন্য (বার্গীর)-এর উপর এক হাবলাদার (যেমন সার্জ্জেণ্ট), পাঁচ হাবলাদার (অর্থাৎ ১২৫ জন সাধারণ সওয়ার)-এর উপর এক জুমলাদার (যেমন কাপ্তেন) এবং দশ জুমলা (অর্থাৎ

১২৫০ জন সওয়ারের) উপর এক হাজারী (অর্থাৎ কর্ণেল)। তাহার উপর পাঁচ-হাজারী (ব্রিগেডিয়ার জেনারাল), এবং সর্ব্বোচ্চ সর্-ই-নৌবৎ (কমাণ্ডার ইন্-চীফ্)। প্রতি ২৫ জন অশ্বারোহীর জন্য একজন ভিস্তি ও একজন নালবন্দ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

পদাতিক বিভাগে, নয়জন সিপাহী ('পাইক')এর উপর এক নায়ক (কর্পোরাল), পাঁচ নায়কের (অর্থাৎ ৪৫ পাইকের) উপর এক হাবলাদার, দুই (বা তিন) হাবলাদারের উপর এক জুম্লাদার, দশ জুম্লা (অর্থাৎ ৯০০—১৩৫০ পাইক) এর উপর এক হাজারী।

রাজার শরীর-রক্ষী (গার্ড ব্রিগেড) ছিল দু হাজার বাছা বাছা মাব্‌লে পদাতিক, খুব জমকালো পোষাক ও ভাল ভাল অস্ত্রে সজ্জিত।

প্রত্যেক সৈন্য দল (রেজিমেণ্ট)এর সঙ্গে হিসাব-পরীক্ষক (মজমুয়াদার), সরকার (কারভারি), আয়-লেখক (জমা-নবিস) এক একজন করিয়া ছিল।

পাগা জুম্লাদারের বার্ষিক বেতন ৫০০ হোণ
„ মজমুয়াদারের „ „ ১০০ হইতে ১২৫ হোণ
„ হাজারীর „ „ হাজার হোণ
„ জমানবিস প্রভৃতি „ „ ৫০০ হোণ
তিন জনের একুন
পাঁচ হাজারীর „ „ দু হাজার হোণ
পদাতিক জুম্লাদারের বার্ষিক বেতন „ ১০০ হোণ
„ „ সবনবিসের „ „ ৪০ „
„ হাজারীর ৫০০ „
„ „ সবনবিসের „ „ ১০০ হইতে ১২৫ „

শিবাজীর রণ-নীতি

তাহার সৈন্যগণ বর্ষাকালে নিজ দেশে ছাউনিতে যাইত ; সেখানে শস্য, ঘোড়ার খাদ্য, ঔষধ, খড়ে ছাওয়া মানুষের কুটীর ও ঘোড়ার আস্তাবলের ব্যবস্থা থাকিত। বিজয়া দশমীর দিন সৈন্যগণ ছাউনি হইতে কুচ করিয়া বাহির হইত, আর সেই সময় সৈন্যদলের ছোট-বড় সব লোকের সম্পত্তির তালিকা লিখিয়া রাখা হইত, তাহার পর দেশ লুঠিতে যাইত। আট মাস ধরিয়া লস্কর পরের মুলুকে পেট ভরাইত, চৌথ আদায় করিত। স্ত্রী, দাসী, নাচের বাঈজী, সৈন্যদলের সঙ্গে যাইতে পারিত না ; যে সিপাহী এই নিয়ম ভঙ্গ করিত তাহার মাথা কাটার হুকুম ছিল। "শত্রুর দেশে স্ত্রীলোক বা শিশুকে ধরিবে না, শুধু পুরুষ মানুষ পাইলে বন্দী করিবে। গরু ধরিবে না, ভার বহিবার জন্য বলদ লইতে পার। ব্রাহ্মণদের উপর উপদ্রব করিবে না, চৌথ দিবার জামিন-স্বরূপ কোন ব্রাহ্মণকে লইবে না। কেহ কু-কর্ম্ম করিবে না। আট মাস বিদেশে সওয়ারী করিবার পর বৈশাখ মাসে ছাউনিতে ফিরিয়া আসিবে। তখন, নিজ দেশের সীমানায় পৌঁছিলে সমস্ত সৈন্যের জিনিষপত্র খুঁজিয়া দেখা হইবে, পূর্ব্বের তালিকার সঙ্গে মিলাইয়া যাহা অতিরিক্ত পাওয়া যায় তাহার দাম উহাদের প্রাপ্য বেতন হইতে বাদ দেওয়া যাইবে। বহুমূল্য জিনিষ থাকিলে তাহা রাজসরকারে জমা দিতে হইবে। যদি কোন সিপাহী ধনরত্ন লুকাইয়া রাখে এবং তাহার সর্দ্দার টের পায়, তবে তাহাকে শাসন করিতে হইবে।

"সৈন্যদল ছাউনিতে পৌঁছিলে, হিসাব করিয়া লুঠের সোনা রূপা রত্ন ও বস্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া সব সর্দ্দারেরা রাজার দর্শনার্থ যাইবে। সেখানে হিসাব বুঝাইয়া দিয়া, মালপত্র রাজভাণ্ডারে রাখিয়া, সৈন্যদের বেতনের হিসাব যাহা প্রাপ্য তাহা রাজকোষ হইতে লইবে। যদি নগদ টাকার বদলে কোন দ্রব্য লইতে ইচ্ছা হয় তাহা হুজুরের কাছে চাহিয়া লইবে। গত অভিযানে যে যেমন কায ও কষ্ট সহ্য করিয়াছে তদনুসারে তাহার পুরস্কার হইবে। কেহ নিয়ম-বিরুদ্ধ কায করিয়া থাকিলে, তাহার প্রকাশ্য অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার পর চারি মাস (অর্থাৎ আবার দশহরা পর্য্যন্ত) ছাউনিতে থাকিবে।"

ভূমির কর ও প্রজাশাসন প্রণালী

"দেশের সমস্ত জমি জরিপ করিয়া ক্ষেত্রভাগ করিবে। আটাশ আঙ্গুলে একহাত, পাঁচ হাত ও পাঁচ মুঠিতে এক কাঠী, বিশ কাঠি, লম্বা ও বিশ কাঠি প্রস্থে এক বিঘা, ১২০ বিঘায় এক চাবর। এইরূপে প্রত্যেক গ্রামে জমির কালি মাপ করা হইবে। প্রতি বিঘার ফসল নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার দুইভাগ রাজা লইবেন, আর তিন ভাগ প্রজা পাইবে।

"নূতন প্রজা বসতি করাইয়া তাহাদের খাইবার খরচ বাবদে এবং গাইবলদে ও বীজশস্য কেনার জন্য টাকা অগ্রিম দিবে, এবং তাহা দুই চার বৎসরে পরিশোধ করিয়া লইবে। রায়তদের নিকট হইতে ফসল-কাটার সময় ফসলের আকারে রাজকর লইবে।

"প্রজাগণ জমিদার দেশমুখ ও দেশাইদের আজ্ঞাধীন থাকিবে না; উহারা প্রজাদের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে না। অন্যান্য রাজ্যে এই-সব পুরুষানুক্রমিক ভূস্বামী (মিরাস-দার)-রা, ধন ক্ষমতা ও সৈন্যবলে বাড়িয়া প্রায় স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল; অসহায় প্রজারা সব তাহাদের হাতে; তাহারা দেশের রাজাকে অগ্রাহ্য করিত এবং প্রজার দেওয়া রাজকর নিজে খাইয়া রাজসরকারে অতি কম টাকা জমা দিত। শিবাজী এই শ্রেণীর জমিদারের দর্প চূর্ণ করিলেন। মিরাস্‌দারদের গড় ভাঙ্গিয়া দিয়া, কেন্দ্রস্থানগুলিতে নিজ সৈন্যের থানা বসাইয়া, জমিদারদের হাত হইতে সব ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া, তাহাদের প্রাপ্য আয় নির্দ্দিষ্ট হারে বাঁধিয়া দিয়া, প্রজাপীড়নের ও রাজস্ব-লুণ্ঠনের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। জমিদারদের গড় নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ হইল। প্রত্যেক গ্রাম্য-কর্ম্মচারী নিজ ন্যায্য পারিশ্রমিক (অর্থাৎ শস্যের অংশ) ভিন্ন আর কিছু পাইবে না।" (সভাসদ)

তেমনি জাগীরদারগণও নিজ নিজ জাগীরের মহালে শুধু খাজনা আদায় করিবেন, প্রজাদের উপর ভূস্বামী বা শাসনকর্ত্তার মত কোন প্রকার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। কোন সৈন্য আম্‌লা বা রায়তকে জমির উপর স্থায়ী সত্ব (মোকাসা) দেওয়া হইত না, কারণ তাহা হইলে তাহারা স্বাধীন হইয়া বিদ্রোহ সৃষ্টি করিত, এবং দেশে রাজার ক্ষমতা লোপ পাইত।

কমবেশী এক লাখ হোণ আদায়ের মহালের উপর একজন সুবাদার (বার্ষিক বেতন চারি শত হোণ) ও এক-জন মজ্‌মুয়াদার (বেতন ১০০ হইতে ১২৫ হোণ) রাখা হইত; পাল্‌কী খরচ বাবদে সুবাদারকে আরও চারি শত হোণ দেওয়া হইত। এই সমস্ত সুবাদার জাতে ব্রাহ্মণ, এবং পেশোয়ার তত্ত্বাবধানে থাকিত। [সভাসদ]

ধর্ম্ম বিভাগ

রাজ্যমধ্যে যেখানে দেব ও দেবস্থান ছিল, শিবাজী তাহাতে প্রদীপ নৈবেদ্য নিত্যস্নান প্রভৃতির যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিতেন। মুসলমান পীরের আস্তানা ও মস-জিদে প্রদীপ ও শিরণী সেই সেই স্থানের নিয়ম অনুসারে রাখিবার জন্য অর্থ সাহায্য দিতেন। বাবা ইয়াকুৎ নামক পীরকে ভক্তি করিয়া নিজ খরচে কেল্‌শী-নামক শহরে বসাইয়া জমি দান করিলেন। "বেদক্রিয়া-দক্ষ ব্রাহ্মণ-দের মধ্যে যোগক্ষেম ব্রাহ্মণ, বিদ্যাবন্ত, বেদশাস্ত্র-সম্পন্ন, জ্যোতির্ষী, অনুষ্ঠানী, তপস্বী, সৎপুরুষ গ্রামে গ্রামে বাছিয়া তাহাদের পরিবারের সংখ্যা অনুসারে যে পরিমাণ অন্নবস্ত্র লাগে সেই আয়ের মহাল ঐ গ্রামে গ্রামে দিলেন। প্রতি-বৎসর সরকারী আমলারা এই সাহায্য তাঁহাদের পৌঁছাইয়া দিত। [সভাসদ]

"লুপ্ত বেদচর্চ্চা শিবাজীর অনুগ্রহে আবার জাগিয়া উঠিল। যে ব্রাহ্মণ ছাত্র এক বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছে তাহাকে প্রতি বৎসর এক মণ চাউল, যে দুই বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছে তাহাকে দুই মণ, ইত্যাদি পরিমাণে দান করা হইত। প্রত্যেক বৎসর তাঁহার পণ্ডিত রাও শ্রাবণ মাসে ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়া তাহাদের বৃত্তি কমবেশী করিয়া দিতেন। বিদেশী পণ্ডিতদের সামগ্রী এবং মারাঠার পণ্ডিতদের খাদ্য দক্ষিণা দেওয়া হইত। মহাপণ্ডিতদের ডাকিয়া সভা করিয়া নগদ টাকা বিদায় দেওয়া হইত। (চিটনিস)

রামদাস স্বামী

শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী (জন্ম ১৬০৮, মৃত্যু ১৬৮১ খৃঃ) মহারাষ্ট্র দেশের অতি বিখ্যাত এবং সর্ব্বজনপূজ্য সাধু পুরুষ। তাঁহার ভক্তি-শিক্ষার বাণী অতি সরল সুন্দর ও পবিত্র। ১৬৭৩ সালে সাতারা-দুর্গ জয় করিবার পর শিবাজী গুরুকে উহার চারি মাইল দক্ষিণে পারলী অথবা (সজ্জনগড়)এ আশ্রম বানাইয়া দেন। এখনও লোকে বলে যে সাতারার ফটকের উপর চূড়ায় একখানা পাথরের ফলকে বসিয়া শিবাজী পারলী-স্থিত নিজ গুরুর সঙ্গে দৈব-বলে কথাবার্ত্তা কহিতেন। রামদাস আর আর সন্ন্যাসীর মত প্রত্যহ ভিক্ষা করিতে যাইতেন। শিবাজী ভাবিলেন, "গুরুকে এত ধন ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছি, তবুও তিনি ভিক্ষা করেন কেন? তাঁহার কিসে সাধ পুরিবে?" তাহার পর দিন একখানা কাগজে রামদাসের নামে সমস্ত মহ

রাজ্য ও রাজকোষের দানপত্র লিখিয়া তাহাতে নিজ মোহর ছাপিয়া, ভিক্ষার পথে গুরুকে ধরিয়া তাঁহার পায়ের উপর রাখিলেন। রামদাস পড়িয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত এসব গ্রহণ করিলাম। আজ হইতে তুমি আমার গোমস্তা মাত্র হইলে। এই রাজ্য তোমার নিজের ভোগ-সুখের বা স্বেচ্ছাচার করিবার দ্রব্য নহে; যেন মাথার উপরের এক বড় প্রভুর জমিদারী তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য হইয়া চালাইতেছ—এই দায়িত্ব জ্ঞানে ভবিষ্যতে রাজ্যশাসন করিবে।"

রাজ্যের প্রকৃত স্বত্বাধিকারী যখন এক সন্ন্যাসী, তখন সেই সন্ন্যাসীর গেরুয়া-বস্ত্র শিবাজীর রাজপতাকা হইল—ইহার নাম "ভাগবে ঝাণ্ডা।"

শ্রীযদুনাথ সরকার।

কোথা সে কতদূর

সজল বেদনায় ব্যথিয়া হিয়া মোর
কাজল কালো মেঘ গগন নীল ছায়,
আজি এ বাদলের অঝোর বরিষণে
ঝরিয়া তারি সনে কাহারে মন চায়।
নীরব নিরজনে নিঝুম দশ দিশি,
নিবিড় তমসায় নিখিল গেছে মিশি;
মত্ত মন মৃগ ভ্রমিছে খুঁজি কারে
তপনহীন ঘন স্বপন বনছায়!

আপন চরণের চপল বিচরণে
ধ্বনিয়া উঠে যদি সুপ্ত বনতল;
চমকি ফিরে চাই আর্দ্র তৃণ পরে,
বাজিছে বুঝি তার চরণ সুকোমল!
বিজন বন পথ, নীরব চারিধার,
কেবল ঝ'রে যায় অঝোরে বারিধার;
মোর সে হতাশায় পবন শ্বসি যায়
ব্যথিত বনানীর নয়ন ছল ছল॥

সহসা পথপারে পরশ হানে যদি
শিথিল শেফালীর সিক্ত ফুলদল,
তাহারি চম্পক করের অঙ্গুলি
পরশে মোরে ভাবি, পরাণ চঞ্চল।
চাহিতে সচকিতে চপলা যায় বাঁধি
আঁধারে আশাহত পরাণ উঠে কাঁদি
বরষা ধারা রূপে বরষে অবিরাম
ভরসা হারা এই বিরহী আঁখিজল॥

বিজন কাননের কূজন-হীন শাখে
কপোত মিথুনের মৌন আলাপন,
আকুল চঞ্চুর নিবিড় চুম্বনে
নয়ন নিমীলিত বিবশ তনু মন।
আমার ওষ্ঠের তৃষিত মরু'পরে,
স্নিগ্ধ জল ধারা সোহাগে পড়ে ঝরে;
প্রিয়ার অধরের পরশ রস সম
জাগায়ে সারা দেহে পুলক কম্পন॥

পাগল পারা ধাই কোথায় নাহি জানি
কোথায় প্রিয়া তুমি, কোথা সে কতদূর?
বাদল বায়ু ভরে ভাসিয়া আসে শুধু
তোমারি কণ্ঠের পাগল করা সুর।
তোমারি মোহভরা আকুল বাঁশী তানে,
মুগ্ধ মন-মৃগ বিরাম নাহি মানে;
গহন-ঘন তলে নয়ন নাহি চলে
চরণ থেমে আসে শ্রান্তি ভারাতুর॥

এবার এস সখি চুকাই চিরতরে
নিঠুর লীলা তব ওগো ও ছলময়ি!
তোমার মাধুরীর মহান বিস্ময়ে
নিয়ত নিঃশেষে বিলীন হয়ে রই।
তোমার অঙ্গের শীতল সৌরভে,
তোমার কণ্ঠের ললিত গীত রবে
সকল অনুভূতি ডুবায়ে একেবারে
তোমার মাঝে আমি আপনা হারা হই॥

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী।

ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব

প্রত্নজীব বিদ্যা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীস্থ জন্তু ও উদ্ভিদ-জগতে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে ও আমরা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের চারিদিকে যে রূপ প্রাণি জগৎ দেখিতেছি প্রাণিজগতের অবস্থা চিরকালই সেইরূপ ছিল না। মানুষ পৃথিবীতে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে ও পৃথিবীর উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতেছে কিন্তু পৃথিবীর জন্মের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত মানুষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না। এই পৃথিবীতে যে সমস্ত জন্তুর সহিত আমরা পরিচিত তাহাদের মধ্যে মানুষ বয়ঃকনিষ্ঠ : এই মানুষ ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে কতদিন হইল বাস করিতেছে সে সম্বন্ধে এক অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রাচীনযুগের মানবের অস্তিত্ব নানা প্রকার আয়ুধ প্রোথিত-মৃতদেহ-স্থান-সূচক নানাপ্রকার প্রস্তর ও তাহার কঙ্কালবশেষ প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। নৃতত্ত্ব আলোচনার প্রথম ভাগে য়ুরোপের নানা স্থান হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত নিদর্শনাদি সংগৃহীত হইয়াছিল কিন্তু এখন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ হইতেই এইরূপ নিদর্শন আবিষ্কারের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্ত নিদর্শনের সাহায্যে মানুষের অস্তিত্ব ব্যতীত প্রাচীনযুগে বিভিন্ন স্থানবাসী জাতিচয়ের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান এবং জাতি বিশেষের চলাফেরা সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। আমার এই কথা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দুইটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বে আয়ুধের কথা বলা হইয়াছে, প্রস্তর সেই আয়ুধের অন্যতম উপাদান। প্রধানতঃ দুই প্রকারের প্রস্তরায়ুধ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদিগেকে প্রত্ন ও নব প্রস্তরায়ুধ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। নব প্রস্তরায়ুধের যুগে মানুষ নিজের ব্যবহারের উপযোগী অস্ত্র প্রস্তুত করার জন্য প্রস্তর ঘষিতে শিক্ষা করিয়াছিল কিন্তু প্রত্নপ্রস্তরায়ুধের যুগে মানুষের সে শিক্ষা হয় নাই। বহুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের মিঃ থিওবল্ড ব্রহ্মদেশে এক প্রকার নব-প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন যাহাদিগকে দ্বি-স্কন্ধ প্রস্তরায়ুধ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এই ধরণের প্রস্তরায়ুধ ব্রহ্মদেশ ব্যতীত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোনও কোনও স্থানে —সিংভুমে ও ময়ূরভঞ্জে এবং ইণ্ডো-চীন প্রভৃতি স্থানে— প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং এই সমস্ত প্রাপ্তির স্থানসমূহ যে কোনও প্রাগৈতিহাসিক জাতির গতিবিধির পথ-প্রদর্শক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের ডাঃ কগিন ব্রাউন আসাম প্রদেশে প্রাপ্ত এরূপ কতিপয় প্রস্তরায়ুধের বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে গুলির মধ্যদেশে কোমরবন্ধের ন্যায় এক বেষ্টনী বিদ্যমান। এইরূপ প্রস্তরায়ুধ ভারতবর্ষের কোনও স্থানে চীন সাম্রাজ্যের মধ্যে ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে সামান্য, কিন্তু উত্তর আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ সমূহে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এইরূপ বিশিষ্ট গঠনের প্রস্তরায়ুধ বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল, না একদেশের মানুষ অপর দেশের মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া সেই দেশের মানুষের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছিল, তাহা গবেষণার বিষয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের অস্তিত্বের নানাপ্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সেগুলির বয়ঃক্রম কত তাহার আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর বয়ঃক্রম ব্যক্ত করিবার জন্য ভূতত্ত্ববিৎ কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং তদনুযায়ী নবজীবকযুগের শেষভাগে মানুষের অস্তিত্বের নিদর্শন নিঃসন্দেহ ভাবে পাওয়া যায়। নবজীবকযুগের যে অংশে মানুষের চিহ্ন আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ কোন প্রকার বাদ বিসংবাদের অবতারণা না করিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই অংশের নাম অত্যাধুনিক। এই অত্যাধুনিক যুগাংশ নৃতত্ত্ব হিসাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগাংশ বলিয়া অভিহিত

হইয়া থাকে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে আজকাল অনেকে প্রাগৈতিহাসিক শব্দ একটু অসংযত ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাহেঞ্জদারোতে প্রাপ্ত দ্রব্যসম্ভারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ এই সমস্ত নিদর্শন প্রাগৈতিহাসিক সময়ান্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে যথার্থভাবে বলিতে গেলে এই সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক সময়ের অন্তর্গত নহে, কিন্তু ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী উপ-ঐতিহাসিক সময়ের অন্তর্গত।

হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে দেরাদুনের নিকট শিবালিক পর্ব্বত বিদ্যমান। এই পর্ব্বতে অনেক বৃহদায়তন জীবজন্তুর দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, এবং অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে এইরূপ জীবাশ্ম-বাহীস্তর-পুঞ্জ ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিম্ন হিমালয়ের প্রায় সমগ্র পাদদেশ জুড়িয়া বিস্তৃত। এই স্তরাবলির মধ্যে একপ্রকার জীবের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে যাহাকে Sivapithecus আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে।—Sivapithecus—আবিষ্কারক ডাঃ পিলগ্রিম্ ইহাকে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও তাঁহার মতে এই জীব সরাসরি ভাবে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না কিন্তু মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাসের একপার্শ্বে ইহার স্থান আছে। আমেরিকার সুবিখ্যাত প্রত্নজীববিদ্যাবিদ্ ডাঃ গ্রিগোরী এই Sivapithecusকে Dryopithecus নামক লাঙ্গুলহীন বানরের তুল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম:—

It thus appears that *Sivapithecus indicus* combines in its mandible the human and the Simian aspect in a very remarkable way and we may preferably look upon it, at present, as belonging to the Homosimiidae the name being derived from Homosimius, the supposed semihuman ancestor of the eoliths according to de Mortilett. এই Sivapithecus সম্বন্ধে দুইবৎসর পূর্ব্বে ডাঃ পিলগ্রিম্ অপর একটী সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যে তিনি অনেকটা আমার এই পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থন করিতেছেন। কারণ তিনি বলিয়াছেন যে:—

If I am correct in deriving the chimpanzee [illegible] from some species of Sivapithecus, then its affinities to man…will accord with my suggestion that another species of Sivapithecus gave rise to the Hominidae. সুতরাং দেখা যাইতেছে যে Sivapithecusএর প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক না কেন, ইহা যে মনুষ্য পর্য্যায়-ভুক্ত নহে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভূবিদ্যাবিদ্‌গণের মতে ইহা মধ্যাধুনিক সময়ান্তর্গত। সুতরাং ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে মধ্যাধুনিক সময়ের মানুষের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে সেই সময়ে এমন এক জীব হিমালয়ের পাদদেশে বাস করিত যাহার সহিত মানুষের বংশপরম্পরাগত কোনও সম্পর্ক ছিল বলিয়া আমরা মানিয়া লইতে পারি।

মধ্যাধুনিকের পর বহ্বাধুনিক সময়ের আবির্ভাব। এই সময়ে মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু মতভেদ দেখা যায় এবং সংক্ষেপে সেই বিষয়ের অবতারণা করা হইতেছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের ডাঃ ন্যাট্‌লিঙ্গ ব্রহ্মদেশে কতকগুলি প্রত্ন-প্রস্তরায়ুধ ও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট একটী লুপ্ত জলহস্তীর এক জানু অস্থি আবিষ্কার করেন ও এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু যে স্তরে এই সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল সেইগুলি বহ্বাধুনিক সময়ের অন্তর্গত, সেই হেতু এই সমস্ত নিদর্শন দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে বহ্বাধুনিক যুগে ব্রহ্মদেশে মানুষ বিদ্যমান ছিল। বলা বাহুল্য যে এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে এবং এই বাদানুবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমার লিখিত ও পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরায়ুধের কৃত্রিমতা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই এবং আমি আমার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে এই সমস্ত প্রস্তরায়ুধের মধ্যে একটী প্রস্তরায়ুধ প্রত্ন-প্রস্তরায়ুধের পূর্ব্ব সময়ান্তর্গত না হইলেও ইহা যে প্রত্নপ্রস্তরায়ুধ সময়ের সর্ব্ব প্রথম

সময়-সূচক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যে স্তর হইতে এই সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল সে স্তরের বয়স সম্বন্ধেও কোন মতভেদ নাই। কিন্তু গোল হইতেছে একটী বিষয় লইয়া—সেটী এই যে, এই সমস্ত প্রস্ত্র-প্রস্তরায়ুধ প্রথম হইতেই এই স্তরবিশেষে বিদ্যমান ছিল, অথবা এগুলি যে স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহার উপর যে ছোট সমতল ভূমি বিদ্যমান আছে সেই স্থান হইতে এগুলি গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। ডাঃ ওল্‌ড্‌হ্যাম প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপন করেন। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলাম তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Thus, it is clear that we are here dealing not only with a human artifact, but with an implement which is possibly more primitive in pattern than the forms which are usually regarded as palæoliths and that there is not only nothing to doubt the artificial nature of the implements, but the nature of at least one of them shows unmistakably that it represents a cultural stage which, if not pre-palæolithic, is representative of the earliest palæolithic type and we have in Burma evidences which probably point to the existence of a man in the middle Siwalik or Pontian time."

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বহ্বাধুনিক সময়ে ব্রহ্মদেশে যে মানবের অস্তিত্ব ছিল তাহাতে আস্থা স্থাপন করার যথেষ্ট কারণ আছে যদিও এই বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন না।

এখন অত্যাধুনিক সময়ের পালা। এই সময়ান্তর্গত অনেকগুলি পলি আমাদের দেশে পাওয়া যায় এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নর্ম্মদা ও গোদাবরীর প্রাচীন পলিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই পলিতে অধুনালুপ্ত জীবের কঙ্কালাবশেষের সহিত প্রস্ত্রপ্রস্তরায়ুধ পাওয়া গিয়াছে—সুতরাং পৃথিবীর বয়স হিসাবে এই প্রস্তরায়ুধের বয়স নির্ণয় করা সহজসাধ্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই দুই পলির স্তর যে অত্যাধুনিক যুগের অন্তর্গত তাহাতে কোনও মতভেদ নাই। নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিন ভাগে অত্যাধুনিক সময় বিভক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে এই জীব-কঙ্কাল ও প্রস্তরায়ুধ-বাহী স্তর দুইটী অত্যাধুনিক সময়ের কোন্ ভাগে অবস্থিত। জীবাশ্মের আলোচনাতে দেখা যায় যে এই দুইটী পলি সমসাময়িক এবং নর্ম্মদার পলিতে প্রাপ্ত জীবাশ্মের সংখ্যা গোদাবরীতে প্রাপ্ত জীবাশ্মের সংখ্যা হইতে অনেক বেশী, সুতরাং নর্ম্মদার পলির বয়ঃক্রম স্থির করিলেই গোদাবরীর পলির বয়স স্থির হইবে।

ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের মিঃ মেড্‌লিকট্ মনে করিতেন যে এই দুই পলি উচ্চ-অত্যাধুনিক সময় অপেক্ষা প্রাচীন নহে ও পক্ষান্তরে ডাঃ পিলগ্রিম সর্ব্বপ্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে এই পলি নিম্ন-অত্যাধুনিকের পূর্ব্ব-সময়বর্ত্তী নহে। ইঁহারা যে উপায়ে এই পলির বয়স নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহার সাহায্য না লইয়া অপর উপায়ে এই পলির বয়স অধিকতর নিশ্চিত ভাবে স্থির করা যাইতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ে জলহস্তী আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু বহু প্রাচীন যুগে এই জলহস্তী এসিয়া ও য়ুরোপ বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষে চারি জাতির জলহস্তীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে দুইটী নর্ম্মদার পলিতে ও এই দুইটীর মধ্যে একটী গোদাবরীর পলিতে পাওয়া গিয়াছে। এই জল-হস্তীর দন্তবিন্যাসের আলোচনা দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে যব-দ্বীপে প্রাপ্ত Pithecanthropus-বাহী স্তর নর্ম্মদার প্রাচীন পলি অপেক্ষা প্রাচীনতর ও জীব-কঙ্কালাবশেষ-বাহী যমুনা ও গঙ্গার প্রাচীন পলি নর্ম্মদার প্রাচীন পলি অপেক্ষা নবীন। সমস্ত প্রকার প্রমাণ আলোচনা করিলে মনে হয় যে Pithecanthropus-বাহী স্তর ও গঙ্গা যমুনার প্রাচীন পলি যথাক্রমে নিম্ন ও উচ্চ অত্যাধুনিক সময়ের এবং নর্ম্মদা ও গোদাবরীর প্রাচীন পলি মধ্য-অত্যাধুনিক সময়ের অন্তর্গত বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি এবং তাহা হইলেই মধ্য-অত্যাধুনিক সময়ে যে ভারতে মানুষ ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভারতে মানুষের আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাবেই আমি বলিয়াছিলাম :—

"Thus the unmistakable evidence about

the existence of man in India can be traced down to the middle Pleistocene."

গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়াছিল সেই অধিবেশনে ভূতত্ত্ববিভাগের সভাপতিরূপে ডাঃ পিলগ্রিম ভারতে প্রাপ্ত স্তন্যপায়ী জীবাশ্মের চলাফেরা সম্বন্ধে এক অভিভাষণ পাঠ করেন এবং সেই অভিভাষণে তিনি ভারতীয় স্তন্যপায়ী-জীবাশ্মবাহী স্তর সমূহের বয়ঃক্রমের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে নর্ম্মদার প্রাচীন পলির বয়স সম্বন্ধে তিনি আমার মতের অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বহ্বাধুনিক যুগে ব্রহ্মদেশে মানুষ ছিল কিনা তাহাতে মতভেদ আছে, কিন্তু অন্ত্যাধুনিক যুগের মধ্যভাগে যে ভারতবর্ষে মানুষ বিদ্যমান ছিল তাহাতে সন্দেহ করার কোনও কারণ নাই।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

মারণেশ্বর

ভালোই হয়েছে— এবারে তোমার মুখোস পড়েছে খুলে',
হে ধর্ম্মরাজ, এর পরে আর মরিবে না লোক ভুলে' !
নকলের ফাঁকি কতদিন চলে চেনা চোখে বার বার,
কলঙ্ক-হার গলায় পরিয়া মানিতেই হয় হা'র।
এরও পরে যদি সোজা পথে তব ভুলে'ও কাহারে ডাকো,
পাপের শাস্তি-ভয়ের আঁধারে ধরার রাস্তা ঢাকো,
এরও পরে যদি যুগে যুগে আসা আজগবী-কাহিনীতে
দুষ্কৃতদের দলন-বার্ত্তা চাহ জীবে শুনাইতে,
বুঝিব তোমার শক্তির কথা নহে সে কেবলই মিছে,
বুঝিব তোমার লজ্জাও গেছে অহঙ্কারে পিছে !
এবারের হা'রে ধর্ম্ম তোমারে বুঝিবারে নাই বাকী—
তুমি ছাড়া আর কেহ দিতে নারে এত বড় ফাঁকা ফাঁকি !
ভালোই হয়েছে, সন্দেহ গেছে—বুঝেছি একথা ঠিক্—
জয়ের দর্প মাথা উঁচু করে' ধর্ম্মেরে দেয় ধিক্।
সত্য সত্য সব জন কহে - সত্য শুধু সে জয়,
অসত্য যত পরাভব আর অসত্য যত ভয় ;
বিবেকের বাণী মহা অসত্য— বিবেক তো মন-গড়া—
সুযোগবাদীর বুদ্ধির বুলি আওড়ায় ধার-করা !
তোমার রাজ্যে শত্রুরে ক্ষমা—নাহি তার কোনো ঠাঁই,
ছলে বলে নয় কৌশলে হোক্—জয় ছাড়া কিছু নাই।
মিথ্যা ধর্ম্ম মিথ্যা সত্য—বীর্য্য সত্য খালি,
পুরাণে কোরাণে বাইবেলে তারে যতই পাড়ুক গালি !
বীর্য্যের কাছে যত পাপ যত অধর্ম্ম সব মিছে,
বীর্য্যশুল্কে তারি পায়ে ধরা দুটি বেলা বিকাইছে !
শত্রু ব্যাঘ্র—দূরে থেকে তারে মারি যা করিয়া পারি,
শত্রু সর্প— ঔষধে তারে কৌশল ক'রে মারি ;
শত্রু শত্রু—যে উপায়ে হোক্ সাধি তার পরাজয়,
সত্যের বুলি জেনে, যে কেবলি ভীরুতারই অভিনয় !
মেঘের গর্ভে বজ্রে লুকায়ে গোপনে মানুষ মারো,
জরা ব্যাধি আর দারিদ্র্যে তারে দিনরাত সংহারো ;
ভূমিকম্পের কাপুরুষাস্ত্রে নিদ্রিত জীবে নাশি'
মুখে যদি বলো প্রেমই ধর্ম্ম—কিসে তোমা বিশ্বাসি ?
ঐ পোড়ামুখে ধর্ম্মের কথা সাজে না ধর্ম্মরাজ,
স্বরূপ চিনেছি, তোমার ধর্ম্মে পড়ুক তোমারি বাজ !
চোর তো বলিবে ডাকি' গৃহস্থে—আরামে ঘুমাও সবে,
জাগিয়া থাকিলে তবু তো তাহার কিছু অসুবিধা হবে !
ভালই করেছ, বুঝায়েছ ভুল, হে ধর্ম্ম অবতার,
ধর্ম্মে তোমার কর্ম্মে তোমার সংশয় নাহি আর।
ভালোই করেছ অরিরে মেরেছো—কে সে তব পথে কাঁটা,
বীরের কর্ম্ম মারণধর্ম্মে দু'হাতে পড়ায় ঘাঁটা ?
বড়র বংশ উজাড় করেছো যুগে যুগে দেশে দেশে,
পাকা হাত আরো পেকেছে যদিও পাক দেখিনাক কেশে ;
হোক্ না সে জনা বিপুল কর্ম্মী, ভূতলে অতুল ত্যাগী,
হোক্ না সে জনা দেশের দুঃখে চরম দুঃখভাগী,
যাক্ না তার সে বড়ো বুকে ভরা পতিতের উদ্ধার,
সেই তো তোমার যোগ্য খাদ্য, বীরের পুরস্কার !
যেখানে যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ও রাঙা চোখের বালি,
যা করিয়া হোক্, যে উপায়ে হোক্, লাগাও প্রহার খালি।
একজন গেছে দশজন আছে ও করে মিলাতে কর ,
সে তো ফাঁকি নয়, জয় তব জয়, জয় মারণেশ্বর।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

গ্রন্থ-সমালোচনা

যাত্রী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান :—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা, মূল্য ২৲

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি, তৎপরিশিষ্ট ও জাভা যাত্রীর পত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এই রচনাগুলির মধ্যে আমরা যে যাত্রীর পরিচয় পাই তিনি স্থূল বাস্তব রাজ্যের যাত্রী নন, সূক্ষ্ম মানস রাজ্যের যাত্রী। গভীর দার্শনিক চিন্তা, অনন্যসাধারণ কবিত্ব ও ভাষার নৈপুণ্য গ্রন্থখানিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। মানসিক জগতে কবি যাত্রী হইয়াছেন, তাঁহার চিন্তা বস্তুগত নয়, ভাবগত। যাঁহারা স্থানের বিবরণ জানিতে চান, তাঁহারা নিরাশ হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে কবির উক্তি জানিতে চান, যাঁহারা রসের অনুসন্ধান করেন, যাঁহারা শব্দগত ও অর্থগত মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহারা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। রচনাগুলি ভাবুক মাত্রেরই উপযোগী হইয়াছে। সাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে কবি তাঁহার অনন্যসুলভ ভাষা ও অলঙ্কারের সহিত যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেশী ও বিদেশী পাঠকের আলোচ্য। যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের দাসসুলভ চিত্তবৃত্তির নিন্দা করেন তাঁহারাই চিন্তাক্ষেত্রে দাসানুদাসের চিত্তবৃত্তির প্রমাণ দিয়া যে সব ধারকরা মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন তাহা এই রচনায় অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে চাই। কবির কথা শুধু বাঙ্গালীর কথা নয়, ভারতবাসীর কথা। দেশবিদেশের নানা বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান এ ভারতবাসীর আছে। সুতরাং তাঁহার কথাগুলি সংস্কারের বা জাতীয় অহমিকার গণ্ডীতে কোথাও সীমাবদ্ধ হয় নাই। বর্ত্তমান জগতে যে সব প্রশ্ন বিপ্লবের আগুন জ্বালাইয়া তুলিতেছে, এই ভারতীয় কবির উক্তি তাহাদেরই মীমাংসায় নিয়োজিত।

চিকিৎসা সঙ্কট

শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন কর্ত্তৃক নাটিকায় রূপান্তরিত। প্রকাশক :—এম সি সরকার এণ্ড সন্স, মূল্য ।/০

গল্পটি পরশুরামের। তিনি বলেন "এই গল্পের লেখাগুলির সঙ্গে যতীন্দ্রকুমারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কারণ এককালে তিনি ছবি আঁকিয়া ইহাদের রূপ দিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু কাগজের উপর তুলি চালাইয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, কথায় গানে হাস্যে দৃশ্যে জীবন্ত ছবি আঁকিতে চান। তাই গল্পটা নাটিকায় রূপান্তরিত করিয়াছেন।"

গ্রন্থখানি অনেকের চেষ্টায় রচিত হইয়াছে। পাঠকগণ ইহার রস উপলব্ধি করিবেন। হাস্যরসাত্মক সাহিত্যে ইহার উচ্চস্থান হইবে। গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। ইদানীং বাংলায় হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের অভাব দেখিয়া যাঁহারা নিরাশ হইতেছেন তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া আশান্বিত হইবেন।

চিত্রে চন্দ্রনাথ

রায় সাহেব শ্রীহরকিশোর অধিকারী সম্পাদিত। সীতাকুণ্ড। মূল্য ৫৲

চন্দ্রনাথ তীর্থের বর্ণনা ও কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থানের চিত্র এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। সম্পাদক গ্রন্থখানিকে লোভনীয় করিবার সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে সাহিত্যের বিশেষ কিছু নাই—এবং সাহিত্যরচনা গ্রন্থের উদ্দেশ্যও নহে। সম্পাদক গ্রন্থখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই সুন্দর করিয়াছেন, চিত্রগুলিও তীর্থ স্থানের, সকলেই দেখিতে চায়। ইহার উপর আবার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ফটোও দেওয়া হইয়াছে। আলবামের আকারে বাঁধিয়া গ্রন্থখানিকে এতই সুদৃশ্য করা হইয়াছে যে দেখিলেই হাতে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করে। প্রথম সংস্করণ তাড়াতাড়ি নিঃশেষিত হওয়ায় সম্পাদক গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া পাঠক সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

দিগ্বিজয়ী বীর

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক শ্রীতারাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর কলিকাতা। মূল্য ৷৷০

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জীবন কথা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। অল্পবয়সে স্বভাবতঃ বীরত্বের কথাই শুনিতে ইচ্ছা হয়; সেই জন্য গ্রন্থকার ছেলেমেয়েদের জন্য সহজ ভাষায় এই বীরের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। ছেলেমেয়েরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিবে। এরূপ পুস্তক সংখ্যায় যত বেশী হয়, ততই ভাল।

শিবাজী মহারাজ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তি স্থান :—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড কলিকাতা, মূল্য ৷৷০

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে শিবাজীর জীবনের চারিটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া ছোট ছেলেদের জন্য চারিটি গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। সরল মনোজ্ঞ ভাষায় গল্প কয়টি লিখিয়া তিনি অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের শিক্ষা ও আনন্দের যে আয়োজন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে।

গ্রন্থের ছাপা কাগজ সুন্দর।

Truths of Language or Comparative Philology of the Sanskrit, Bengali and incidentally other Prakrits Parts I & II by Srinath Sen, Retired Deputy Magistrate and author of 'Bha-ha Tattwa', 1928, Pric Rs 2-8. Published by the author, 4·, Ramdhan Mitra's Lane' P. O. Shyambazar, Calcutta. Pages iv, xi, 33·, x xvii, ii.

আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রথমে বঙ্গ-ভাষায় "ভাষাতত্ত্ব" নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া আমাদের কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জে, টি, ব্লমহার্ট মহাশয়ের প্রশংসা ও উৎসাহসূচক পত্র পাইয়াছিলেন। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক মহাশয় এই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বই খানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় নাই বলিয়া তাঁহার ছাত্রগণ ও তাঁহারা দেশের অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ইহা হইতে কোনও উপকার লাভ করিতে পারিতেছে না। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক মহাশয়ের উল্লিখিত অসুবিধা দূর করিবার জন্য কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও সংযোজন পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

আমরা আগাগোড়া গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম ইহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে অভিনবত্ব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ইহার কল্পনা বা ধারণা অভিনব, যুক্তিপ্রণালী অভিনব, গবেষণাপদ্ধতিও অভিনব। কোন বিষয়েই গ্রন্থকার পরের চলা পথে চলেন নাই। সুতরাং পাঠক গ্রন্থ খানিকে একখানি উপাদেয় কাব্যগ্রন্থ বা রোমান্স হিসাবে পাঠ করিলে পরম পরিতোষ লাভ করিবেন। লজিকের ফ্যালাসি অধ্যয়নার্থী ছাত্রগণও এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় বহুবিধ অভিনব আকারের ভ্রান্তির উদাহরণ দেখিতে পাইবেন।

গ্রন্থকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ধ্বনি-বিজ্ঞান-সূত্র। তাঁহার মতে যাবতীয় ধ্বনি মূল ধ্বনি 'ওঁ'। এই ওঙ্কার বা প্রণব ধ্বনির নানাবিধ বিকাশেই স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহ উদ্ভূত হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুগণ এই আবিষ্কারে পুলক ও বিস্ময়ে গদগদ হইয়া পড়িবেন কি না জানি না, কিন্তু যাঁহারা ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অধিকতর বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন। কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

ইথর যেমন বস্তুজগতে সর্ব্বত্র বিরাজমান মৌলিক পদার্থ বলিয়া পদার্থ-বিজ্ঞানে স্বীকৃত হইয়াছে, প্রণবধ্বনিও সেইরূপ অবিশ্লেষ্য মৌলিক ধ্বনি বলিয়া ভাষা-বিজ্ঞানেও স্বীকার্য্য। অথচ এই অবিশ্লেষ্য আদিবর্ণ বা মৌলিক ধ্বনিতে দুইটি বিশ্লেষিত ধ্বনির সত্তাও স্বীকার্য্য। সে দুইটী ধ্বনির একটী হইল মুখপথে উচ্চার্য্য 'ও', এবং আর একটী হইল নাসিকাপথে উচ্চার্য্য অনুনাসিক বর্ণ 'ং'। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের ন্যায় এই দুইটী বর্ণের মিলনকে অবিচ্ছেদ্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। নতুবা ভাষা-বিজ্ঞান ব্যর্থ এবং লজিক ব্যর্থ। পাঠক যদি কোনও উপায়ে এই দুইটী বর্ণের স্বতন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন ('ও' এবং 'ং'), তাহা হইলে আপনার উচ্চারণশক্তি বিকৃতি

আর একটা কথা—sound (ধ্বনি) ও letter (অক্ষর) লইয়া। আদিবর্ণ ওঁ যদি সর্ব্ববিধ ধ্বনি (all sounds) এবং সর্ব্ববিধ অক্ষরের (all letters) ভিত্তিভূমি বা basis হয়, তাহা হইলে কর্ণগ্রাহ্য ধ্বনি ও দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষরের ভিত্তিভূমির অভিন্নতা স্বীকৃত হইল। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞান বলে ইথরের কম্পনই সর্ব্ববিধ শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির অবলম্বন এবং কাগজ, ক্যান্‌ভাস, শ্লেট প্রভৃতি দৃশ্য বস্তুই দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষরের ভিত্তিভূমি হইতে পারে। তবে কবি-কল্পনায় আকাশও অট্টালিকার ভিত্তিভূমি হইতে পারে। সুতরাং এখানে কবিকল্পনাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না! কিন্তু সে হিসাবে ধরিতে গেলে আদিবর্ণেরও শূন্যে পরিণতি সম্ভব। অবশ্য সম্ভব, কারণ ইচ্ছানুসারে বৃদ্ধি, ব্যাপ্তি ও সংকীর্ণতার শক্তি না থাকিলে ইহার আদিবর্ণত্ব যে নিরর্থক হইয়া পড়ে।

আবার দেখুন, 'ওঁ' উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে যদি আপনি 'ওঁ' উচ্চারণ না করিয়া 'অ' উচ্চারণ করেন তবেই 'ওঁ' হইতে অ বর্ণের উৎপত্তি হইল। অন্য কথায় বলিতে গেলে সুবর্ণবলয় নির্ম্মাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে যদি আপনি সুবর্ণের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকা গ্রহণ করেন এবং সেই উপাদানের সাহায্যে বলয় নির্ম্মাণ না করিয়া ঘট নির্ম্মাণ বা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে সুবর্ণ বলয়কেই ঐ মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তুবিশেষের মূল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা বিজ্ঞান তর্কশাস্ত্রে উভয়ই ব্যর্থ হয়।

সাধারণ পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থে এই জটিল বিষয়টী একটু সুগম করিয়া বলিতে হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন কালের ধ্বনিতত্ত্ববিৎ প্রাতিশাখ্যকারগণ আমাদের বর্ণমালার উচ্চারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইলেও তাঁহারা আমাদিগের উচ্চারিত ধ্বনিসমূহের মধ্যে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন বর্ণ, শ্বাসবর্ণ, নাদবর্ণ, হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর, প্লুতস্বর প্রভৃতি নানা শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ শরীর-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া মানবের বাগ্‌-যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের প্রকৃতি ও কার্য্য-প্রণালীর বিশ্লেষণ দ্বারা মানব মুখোচ্চারিত ধ্বনিসমূহের বিশ্লেষণ ও শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। কৃত্রিম বাগ্‌যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ দ্বারাও ইঁহারা ধ্বনি-বিজ্ঞান-বিষয়ক নানা তথ্যের বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দ্ধারিত তথ্যসমূহ আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচারে এবং নানা ভাষার পরিবর্ত্তনের উদাহরণসমূহ দ্বারা তুলনামূলক পরীক্ষায় এ কাল পর্য্যন্ত ভ্রান্তিশূন্য বলিয়াই গণ্য হইয়া আছে। ধ্বনি-বিজ্ঞান-বিধির কোনও ব্যতিরেক দেখা যায় না। সেনজা মহাশয় অকস্মাৎ এক ওঙ্কারের হুঙ্কারে তাঁহাদের সেই ধ্বনিবিজ্ঞানের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিতে চান। ইনি কোনও প্রকার বিশ্লেষণপ্রণালী মানিতে চাহেন না। উদাহরণস্বরূপ একটা কথা বলা যাইতে পারে। প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে—"সংবৃতে কণ্ঠে নাদঃ।" আমাদের গলদেশের বহির্ভাগে

ইহার সাধারণ নাম "Adam's Apple" ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক নাম larynx বা laryngal chamber। ফুসফুস হইতে নির্গত শ্বাসবায়ুর নানা স্থানে নানাবিধ অবরোধাদি দ্বারা নানাবিধ ফলে নানাবিধ ধ্বনির উৎপত্তি। এই শ্বাসবায়ুর অবরোধের সর্ব্বপ্রথম স্থান কণ্ঠ বা larynx ; এই কণ্ঠ মধ্যে বায়ুনির্গমন পথের দুই পার্শ্বে দুই খানি পরদা বা membrane আছে। যদি এই স্থানে শ্বাসবায়ু অবরুদ্ধ হয় এবং তারপর ঐ পরদা দুই খানিকে ঈষৎ কাঁপাইয়া সেই কম্পনের মধ্য দিয়া শ্বাসবায়ুকে নির্গত করা যায় তবে নাদবর্ণ বা voiced sound উচ্চারিত হইবে। ইংরাজীতে সাধারণতঃ ইহাকে vibrated sound বলা যায়। অপর পক্ষে যদি কণ্ঠকম্পন না করিয়া সহজ শ্বাসক্রিয়ার সময়ে যে ভাবে শ্বাসবায়ু ত্যাগ করি সেই ভাবে বায়ু নিঃসৃত করা যায়, তাহা হইলে শ্বাসবর্ণ বা breath sound বা sounds without vibration (কম্পনবিহীন ধ্বনি) উচ্চারিত হয়। সেনগুপ্ত মহাশয় এবংবিধ শ্রেণী-বিভাগে রাজি নহেন। তাঁহার আদি বর্ণের দুইটী উপাদনই নাদবর্ণ। অথচ এই নাদবর্ণ হইতেই শ্বাস-বর্ণগুলিরও উদ্ভব স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলেই হুঁকার 'ডাবা' ও 'নল্‌চে' দুই বদলাইয়া লইলেও হুঁকার অভিন্নত্ব স্বীকার্য্য।

এ ত গেল ধ্বনি-বিজ্ঞানের মৌলিক বিচার। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থ খানিতে নানাবিধ বিচার ও বিশ্লেষণরীতি এরূপ অভিনব উপায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আর একখানি গ্রন্থ বা টীকাগ্রন্থ না লিখিলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব।

হিন্দুর মেয়ে

(উপন্যাস)

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এ আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। যে কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে—শিশিরের স্নেহকণা তাহাকে ক'দিন অম্লান রাখিতে পারে ? যে মনের ব্যাধি অসীমের মনের মধ্যে উদ্ভূত হইয়া দেহের অণু পরমাণুতে বিস্তার লাভ করিয়াছে, কৃত্রিম প্রফুল্লতায় কৃত্রিম উল্লাসে তাহার গতি কি প্রকারে রোধ হইবে ?

অসীম তাহার সামান্য জ্বরকে গ্রাহ্য না করিলেও জ্বর কিন্তু তাহার নিকটে সামান্য হইয়া রহিল না। এক দিন কলেজে লেক্‌চারের পর অসীম প্রবল জ্বরে অভিভূত হইল।

সেদিন মুকুলের জন্মোৎসব। মিঃ রায় মেয়ের জন্ম দিন উপলক্ষে তাঁহার পরিচিত বন্ধুবর্গকে ও কর্ম্মচারীদের নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা জলযোগ করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। তাঁহার আত্মীয় না থাকিলেও বন্ধু সংখ্যাতেই আত্মীয়ের স্থান পূর্ণ হইত। সেদিনও পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

পুষ্পমাল্যে ও দেবদারু পাতায় রায় ভবন পরিপাটী রূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। আতর গোলাপের স্নিগ্ধ গন্ধে সান্ধ্য বায়ু সৌরভযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দাস দাসীদের আনন্দের সীমা ছিল না। তাহারা সুরঞ্জিত নব বস্ত্র পরিধান করিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। যমুনা দেবী তাঁহার স্বাভাবিক বিষণ্ণতা পরিহার করিয়া একটুখানি প্রফুল্ল হইয়াছিলেন।

বহুমূল্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাজিয়া মুকুল মনে মনে অসীমের প্রতীক্ষাতে ব্যগ্র হইয়া পথের পানে চাহিয়া ছিল। এমন সময় মেস হইতে অসীমের জ্বরের সংবাদ আসিল। নিমেষে মুকুলের হৃদয় হইতে জন্মতিথির আনন্দ অন্তর্হিত হইল ; উৎসব প্রাণশূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অসীম যে জিনিসটি খাইতে ভালবাসে, মুকুল মাকে বলিয়া সেই খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করাইয়াছিল। অসীম কথার ছলে যেদিন তাহার যে বেশভূষাটির প্রশংসা করিয়াছে ; মুকুল নিজের অজ্ঞাতসারে সেই বেশভূষাতেই সজ্জিত হইয়াছিল। কত আশা কত সাধ লইয়া সে বসিয়াছিল—অসীম আসিতেছে, অসীম আসিলে মুকুল বাজাইবে ; নূতন শেখা গানটি গাহিয়া শোনাইবে, কিন্তু তাহার একটি আশাও আজ ফলবতী হইল না। অসীম বিহনে তাহার সমস্তই যেন ব্যর্থ মনে হইতে লাগিল

অভ্যাগতদের বিদায় দিয়া মিঃ রায় পত্নীকে বলিলেন, "অসীমের ভারী জ্বর হয়েছে; মেসের একটি ছেলে আমাকে খবর দিয়ে গেল, আমি এখুনি তাকে একবার দেখ্‌তে যাব।"

যমুনা জবাব দিবার পূর্ব্বেই মুকুল পিতার কোলের কাছে সরিয়া গিয়া নতনয়নে বলিয়া বসিল, "বাবা, আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল; আমিও তাঁকে একবার দেখে আসি।"

যমুনা দেবী আপত্তি করিলেন—"অসীম যে মেসে থাকে, তা কি তুই ভুলে গেছিস মুকুল? মেসের ভেতর তুই যাবি কেমন ক'রে?"

মুকুল নিরুত্তরে পিতার পাঞ্জাবীর বোতাম খুঁটিতে লাগিল। মায়ের কথার উত্তর দিল না।

মিঃ রায় বলিলেন, "হোক না মেস, মুকুল আমার সঙ্গে যাবে তাতে তোমার আপত্তি কি? আমার দেরী হবে না, একবার গিয়ে দেখে আস্‌বো। অসীম মুকুলের মাষ্টার মহাশয়, ওর কি উচিত নয় তাকে দেখ্‌তে যাওয়া। তুমি বল্লে ওকে নিয়ে আমি ঘুরে আসি।"

স্বামীর ইচ্ছার উপর আপনার অনিচ্ছা প্রকাশ করা যমুনার স্বভাব বিরুদ্ধ, কাযেই তিনি আর দ্বিধা না করিয়া বলিলেন, "সে হিসাবে ওর অবশ্যই যাওয়া দরকার, আমি মেস বলেই আপত্তি করেছিলাম। তোমার সঙ্গে যাবে—তার আবার মেস অমেস কি! তুমি মুকুলকে সঙ্গে ক'রে শীগ্‌গির ঘুরে এস।"

মায়ের সম্মতি পাইয়া মুকুল তখনই বেশভূষার পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল।

মেসের দুইটি যুবক অসীমের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া রোগীর সেবা করিতেছিল। একজন মাথায় বরফ দিতেছিল, অপর পাখার বাতাস করিতেছিল। কক্ষ নীরব নিস্তব্ধ, রোগীর চক্ষে আলো লাগিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় উজ্জ্বল আলোকের পরিবর্ত্তে দ্বারদেশে একটা কাগজ ঢাকা লণ্ঠনের মিটমিটে আলো রাখা হইয়াছিল।

দ্বারদেশে মিঃ রায়ের ভারী মোটর খানা থামিবার যুবকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মিঃ রায় মুকুলকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বরফের ব্যাগ টেবিলের উপর নামাইয়া অন্য যুবকটি মিঃ রায়কে অভিবাদন করিবার জন্য ব্যস্তভাবে উঠিতেই অসাবধানে চৌকীখানা নড়িয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অসীমের তন্দ্রার ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। তন্দ্রা ভাঙ্গিলেও অবসাদে অসীম চাহিতে পারিল না। মুদ্রিত নয়নেই অনুভব করিল—কাহারা যেন দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারই রোগ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছে। আর কে যেন মূর্ত্তিমতী করুণার মত তাহারই শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিয়াছে। যে আসিয়াছে তাহার পদশব্দ পরিচিত, সে শীতল করপুটে তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া অঙ্গের উত্তাপ পরীক্ষা করিতেছে, সে করপল্লব খানিও যেন পরিচিত। গন্ধ তৈলের সুবাস, অলঙ্কারের রিণি-ঝিনি, শাড়ীর খস্ খস্ শব্দ সবটা মিলাইয়া অসীমের মনের মধ্যে কাহাকে স্মরণ করিয়া দিতে চাহিতেছিল, কাহাকে বাহুর বন্ধনে বাঁধিবার নিমিত্ত তাহার দেহের জ্বালা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। ম্লান আলোকে আধ তন্দ্রা, আধ জাগরণে অসীমের বারম্বার ভুল হইতে লাগিল। একবার মনে হইল সুব্রতা আসিয়াছে, আর বাধা নাই, তাহার প্রিয়া, তাহার দয়িতা তাহারই নিকটে আসিয়াছে, এখনই তাহার অঙ্গের পরশে অসীমের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া যাইবে। অসীম নিমীলিত নেত্রে মুকুলের হাত ধরিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল "ব্রতা, এসেছ? আঃ এত দিন পর এসেছ? এস, এস আমার আরো কাছে এস, আমি মুকুলকে ভুল্‌তে না পেরে বড় কষ্ট পেয়েছি। উঃ বড় কষ্ট; তুমি আমায় ক্ষমা কর ব্রতু, মুকুলকে ভুলিয়ে দিয়ে—ক্ষমা কর।"

মুকুল শিহরিয়া অসীমের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাতখানা মুক্ত করিয়া লইল। তাহার সমস্ত শরীর বেতস পত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বক্ষ আন্দোলিত হইল। সে আজ এ কি শুনিল! এ যে অপ্রত্যাশিত অচিন্তিত ঘটনা! অসীমের এত যন্ত্রণার সেই কি একমাত্র মূলাধার!! অসীমের এ প্রলাপ কি দুরূহ রহস্যময়, এমন অভাবনীয় ব্যাপার মুকুল যে ভ্রমেও কল্পনা

কল্পনা করিতে না পারিলেও এ উচ্ছ্বাসে মুকুল তেমন দুঃখিত হইতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া অসীমের প্রলাপ রণিয়া রণিয়া উঠিতে লাগিল! মানব হৃদয় স্বভাবতঃ ভালবাসার কাঙ্গাল, কেহ তাহাকে ভালবাসে, কেহ তাহার প্রতীক্ষা করে ইহা স্মরণে শত দুঃখের পরিবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও সুখ হয়। বিশেষতঃ যখন জীবন-বসন্তের যৌবন সমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসার বাসন্তীশ্রীতে বিভূষিত করিয়া তোলে। অসীমের এ আক্ষেপ না শুনিলে মুকুলের হৃদয়-পদ্মের পাপড়িগুলি খুলিত কিনা কে জানে, কিন্তু অসীমের একটি কথায়, একটি ইঙ্গিতে মুকুলের হৃদয়-পদ্মের মুদ্রিত দলগুলি স্তরে স্তরে বিকসিত হইল। একটা অননুভূত পুলকহিল্লোলে রোমাঞ্চিত হইয়া মুকুল আপনার অন্তস্তলে চাহিল—কুমারীর শুভ্র সুন্দর অমলিন অন্তরে এ কিসের রেখা? কিসের ছায়াপাত?

মুকুল আর ভাবিতে পারিল না; ভাবিবার অবসর হইল না। অসীমের দিকে চাহিয়া সে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল, অসীম কখন নিঃশব্দে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে। তাহার আরক্ত চোখে আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম হইয়াছে।

মুকুল অস্ফুট চিৎকার করিয়া অসীমকে ধরিতেই অসীম জড়িতস্বরে কহিল, "তুমি ব্রতা নয়, মুকুল দেবী, দয়াময়ী, আমার রোগশয্যা পাশেও মুকুল।"

মেয়ের চীৎকারে মিঃ রায় ব্যস্তভাবে ছুটিয়া গিয়া অসীমকে বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। মুকুল কম্পিত হৃদয়ে অসীমের মাথায় বরফের ব্যাগ চাপিয়া ধরিল। একটী যুবক মুকুলের অদূরে দাঁড়াইয়া সসঙ্কোচে পাখা নাড়িতে লাগিল। আর একটি যুবক মিঃ রায়ের আদেশে তাঁহারই মোটর লইয়া চিকিৎসকের উদ্দেশে ছুটিল।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রজনী গভীর, জগৎ সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। আকাশে চন্দ্র, গঙ্গাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, গঙ্গার অমল ধবল জলরাশি স্থির শান্ত। ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে নক্ষত্রালোক পর্য্যন্ত নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। প্রকৃতি শুধু সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া রজনীর সৌম্য সুন্দর শান্ত শীতল ভুবন-মোহন রূপ প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে। মুগ্ধা প্রকৃতির সহিত আর একটি প্রাণী বাতায়ন তলে আশ্রয় লইয়া চন্দ্রালোকে পুলকিত ধরণীর পানে নির্নিমেষে চাহিয়া জাগিয়াছিল। তাহার সুখনিদ্রা কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছিল।

দ্বিতলে মিঃ রায়ের শয়ন কক্ষের গায়ে যমুনাদেবীর শয়ন কক্ষ; তাহার পাশের ছোট ঘরখানিতে মুকুল শয়ন করিত। সারি সারি তিনটি কক্ষের মাঝে মাঝে একটি করিয়া দ্বার, দ্বারে কারুকার্য্য বিশিষ্ট শুভ্রবর্ণের যবনিকা। যমুনা প্রতিদিন শয়নের পূর্ব্বে মুকুলের দ্বারের পর্দ্দাটি গুটাইয়া রাখিতেন। শয়নের পূর্ব্বে গৃহে গৃহে গাঢ় নীল বর্ণের বাতি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখা হইত। খাটে শুইয়া সেই নীলালোকে মুকুলের নীল পুষ্পস্তবকের ন্যায় সুন্দর সুমিষ্ট মুখখানি দেখিতে দেখিতে যমুনা প্রত্যহ ঘুমাইতেন; ঘুম ভাঙ্গিলে আবার সেই ক্ষুদ্র কক্ষের ক্ষুদ্র পালঙ্কের প্রতি তাঁহার স্নেহমাখা দৃষ্টিটা নিবদ্ধ হইয়া রহিত।

প্রতিদিনের অভ্যাস বশতঃ জাগিতে যমুনা দেবীর চক্ষে পড়িল মুকুলের শূন্য শয্যা। যাহাকে এক দণ্ডকাল চোখের অন্তরাল করা যায় না, সমস্ত অন্তরে যাহার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য, তাহার এতটুকু অদর্শনে হৃদয় আকুল না হইয়া যায় না।

যমুনা ব্যাকুল হইয়া ডাকিলেন, "মুকুল, মুকুল, তুই উঠেছিস কেন রে? তোকে দেখতে পাচ্ছি না; কোথায় গেছিস মুকুল?"

মাতৃ আহ্বানে মুকুল বাতায়ন পরিত্যাগ করিয়া ত্বরিত পদে মায়ের নিকটে উপনীত হইতেই যমুনা হাত বাড়াইয়া মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। মুকুলের বিশৃঙ্খল কেশগুচ্ছ ললাট হইতে সরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোর কি অসুখ করেচে মুকুল? বিছানা ছেড়ে উঠে ব'সে রয়েছিস কেন মা? তাই তো, তোর গা যেন গরম গরম দেখচি।"

মায়ের আশঙ্কায় মুকুল ম্লান হাসির সহিত বলিল, "তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা? আমার অসুখ করেনি। আজ

অনেক রাতে শুয়েচি ব'লে ঘুম আস্‌ছিল না, তাই জানালায় একটুখানি ব'সে ছিলাম।"

"সেই জন্যেই কি ঘুম আস্‌চে না? অসীমের মেস থেকে তোরা তো রাত বারটায় ফিরেছিস্, তাতেই কি ঘুম পাচ্ছে না? তুই আমার কাছে শো মুকুল, আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি এখুনি ঘুম হবে।"

মুকুল বিনা আপত্তিতে ছোট মেয়েটির মত মায়ের কোলের কাছে শয়ন করিল। মা স্নেহভরে মেয়ের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিয়া তাহার নিদ্রাকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই বিমল স্নেহ কিয়ৎকাল উপভোগ করিয়া মুকুল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ মা, টাইফয়েড হ'লে কি সবারই শরীরে একটা না একটা খুঁত হয়ে যায়, কেউ কি পূর্ব্বের মত থাকে না? ডাক্তার সাহেব অসীম বাবুকে তখন বল্লেন জ্বরের ধরণ টাইফয়েডের মত, শেষে হয় তো টাইফয়েডে দাঁড়াবে।—আচ্ছা মা; সত্যি যদি অসীম বাবুর টাইফয়েড হয় তা হলে কি হবে?"

যমুনা জানিতেন—তাঁহার মেয়ের প্রকৃতি বড় দয়ার্দ্র স্নেহপ্রবণ; সে কাহারো দুঃখ ব্যথা, রোগ শোক সহিতে পারে না। তিনি সংসারের ঝড় ঝঞ্ঝা রোগ ভোগ হইতে তাহাকে সযত্নে দূরে রাখিতেন। মায়ের উদ্বেলিত হৃদয়ে আশঙ্কা জাগিত—সংসারের রৌদ্র কিরণে কখন বা তাঁহার নবীন মুকুলটি ম্লান হইয়া যায়, ব্যথার তাপে ঝরিয়া পড়ে।

অসীমকে দেখিতে গিয়া রোগের ভীষণ যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিয়া মুকুল ব্যথিত হইয়াছে ভাবিয়া যমুনাদেবী আশ্বাসের স্বরে কহিলেন, "অসীমকে দেখে ডাক্তার তো ঠিক টাইফয়েড বলেন নি। টাইফয়েড নাও হতে পারে। আর হলে কি সবারই অঙ্গহানি হবে—তা নয় মুকুল, এই ধর না ছেলেবেলা তোরও টাইফয়েড হয়েছিল, তাতে তো তোর শরীরের কিছু হয় নি, যা হয়েছিল মনের।"

বাল্যের কথা শুনিতে অনেকেই ভালবাসে, মুকুলও ভালবাসিত। বাল্যের খেলা ধূলা হাসি গল্পের স্মৃতিটুকু সকলের নিকটেই মধু দিয়া মাখান। সে সব জানিবার আগ্রহ মুকুলের অত্যন্ত প্রবল হইলেও কি জানি কেন যমুনা সে অতীতের সরস সুন্দর কাহিনী প্রাণ খুলিয়া মেয়ের কাছে ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। কত দিন গল্পচ্ছলে মুকুলের বাল্যজীবনের ঘটনা বলিতে বলিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি নীরব হইতেন, অথবা স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতেন। মায়ের উদাসীনতায় মেয়ের জানিবার আগ্রহ শুনিবার উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি পাইত।

আজ নীরব নিশীথে নির্জ্জন গৃহে মা যেমন তাহার বাল্যস্মৃতির রুদ্ধ দ্বারটি একটু খুলিয়া দিলেন—অমনি মুকুল উৎসুক হইয়া উঠিল।—একখানি হস্তে মাকে বেষ্টন করিয়া মায়ের বুকের কাছে মুখ লইয়া মুকুল জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ক'বছর বয়সের সময় টাইফয়েড হয়েছিল মা? কত দিন জ্বর ভোগ করেছিলাম! মনের ক্ষতির কথা বলছ, মনের ক্ষতি কি মা?"

মা একটু ভাবিয়া সবিষাদে উত্তর দিলেন, "তোর যখন পাঁচ বছর বয়েস তখন টাইফয়েড হইয়েছিল, সে ভয়ানক জ্বর, ভয়ানক আক্রমণ; একান্ন দিনে জ্বর ছাড়ে। বাঁচবার কোন লক্ষণই ছিল না। ভগবান দয়া করে প্রাণটুকু ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তাই রক্ষা পেয়েছিলি। জ্বর থেকে উঠে তুই ছেলেবেলাকার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলি; পাঁচ বছরের আগেকার কোন কথা তোর মনে ছিল না। যে ঠাকুরদাদা তোর বড় ভালবাসার ছিলেন—তিনি তোর ভাবনা ভাবতে ভাবতে তোর অসুখের সময় হঠাৎ মারা গেলেন, তুই ভাল হ'য়ে তাঁকে এক দিনও খুঁজ্‌লি নে, এমনি স্মৃতিবিভ্রম হয়েছিল তোর।"

মুকুল আস্তে আস্তে বললি, "এখনো তো ঠাকুরদাদাকে আমার ভাল ক'রে মনে পড়ে না মা। তুমি তাঁর কথা আমায় ভাল ক'রে বল না বলেই বোধ হয় তেমন মনে পড়ে না। এবার থেকে রোজ রোজ ঠাকুরদাদার গল্প আমায় বোলো মা, তা হলেই তাঁকে আমার বেশী বেশী মনে হ'বে।" ছেলেবেলকার কথা আমি ভুলে গেলেও আমার ঢের মনে পড়ে—সেই আমাদের নদীর ধারের বাড়ী, মস্ত মস্ত বাগান, বাগ্‌দী-বৌ তার ছেলে জটাধারী সে সব কিছু আমি ভুলি নি মা। তাদের কথা এখনো আমার মনে হয়।"

"তা আর মনে হবে না! জটাধারীর মা বাগ্‌দী বৌ

তোকে সে বড্ড ভালবাসতো মুকুল, সেই তোকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছিল। তোর সেই বড় ব্যারামের সময় ডাক্তার কবিরাজ যখন জবাব দিয়েছিল, তখন বাগ্‌দীবৌ দুদিনের রাস্তা পায়ে হেঁটে প্রসাদপুর থেকে কালীমায়ের মাদুলী এনে তোকে দিয়েছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় সেই মাদুলীটা যেদিন তোর গলায় পরিয়ে দেওয়া হল, সেই দিনই জ্বর বন্ধ হয়েছিল।"

অকূলসাগরে নিমগ্নব্যক্তি সহসা কূলের আভাস পাইলে যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, মুকুল তেমনি উল্লসিত হইয়া কহিল, "সত্যি মা, ভারী আশ্চর্য্য তো! মাদুলী যেদিন হাতে পরেছিলাম সেই দিনই আমার জ্বর ছেড়েছিল? একান্ন দিনের জ্বর? এমন আর শুনি নি। আচ্ছা মা সে মাদুলী কত দিন আমার গলায় ছিল, সেটা আর কাউকে দিয়েছ না আছে?"

"দেবো আর কাকে? তোর ছেলেবেলার জিনিসপত্রের সঙ্গে কোথায় রয়েছে। মাদুলীটা অনেক দিন তোর গলার হারের সঙ্গে ছিল, তা কি তোর মনে পড়ে না? তুই বড়সড় হলে উনি খুলে দিয়েছিলেন।"

"সেই আমার মাদুলীটা তো? সে আমার বেশ মনে আছে মা। আচ্ছা বাবা যে আজ অসীম বাবুর বাড়ীতে টেলিগ্রাম ক'রে দিলেন. তাঁরা ক'বে পাবেন? সে দেশ থেকে এখানে আসতেই বা ক'দিন লাগবে?"

যমুনাদেবী মনে মনে আন্দাজ করিয়া বলিলেন "কা'ল বেলা দশটার ভেতরেই তাঁরা টেলিগ্রাম পাবেন। কা'ল যদি ষ্টীমার ধরতে পারেন তা হ'লে তস্‌সু এসে পৌছবেন। এ দু'দিনে ভগবানের কৃপায় অসীম একটুখানি ভাল হ'য়ে ওঠে—তাঁরা এসে ওকে ভাল দেখতে পান—তা হ'লে বেশ হয়। কি উৎকণ্ঠা নিয়েই না তাঁরা আসছেন! আহা, পরের বাছা শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে উঠুক। থাক্ ওসব কথা, ঢের রাত হ'য়ে গেছে তুই এখন ঘুমো মুকুল, এত রাত জাগ্‌লে তোর অসুখ হ'বে।"

"এইবার আমি ঘুমুবো মা, আর কিছু বলবো না; তুমিও ঘুমোও বেশী রাত জাগ্‌লে কা'ল আবার তোমার মাথা ধ'রে থাকবে।" বলিয়া মুকুল নীরব হইল, কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। যে মাদুলীর গুণে তাহার অমন জ্বর সারিয়া গিয়াছিল সে মাদুলীর প্রসঙ্গই তাহার মনের মধ্যে জাগাইতে লাগিল। মুকুল ভাবিল প্রভাতেই মাদুলীটা সে খুঁজিয়া সংগ্রহ করিবে, অসীমকে দেখিতে গিয়া কোন সুযোগে মাদুলীটা তাহার হাতে কিংবা গলার পৈতার সঙ্গে বাঁধিয়া দিবে। তাহা হইলেই অসীমের জ্বর বন্ধ হইবে, অসীম শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিবে। অসীমকে মাদুলী দিবার কথা মাকে বলা হইবে না। অসীমের প্রতি তাহার এতখানি আগ্রহে মা কি ভাবিবেন! মুকুল আর ভাবিতে পারিল না। সঙ্কোচ আসিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাভাতিক চা পানের পর মিঃ রায় অসীমকে দেখিতে গেলেন। মুকুল সে সম্বন্ধে কিছু বলিল না, বলিয়া তিনি নিজেও কিছু বলিলেন না।

পিতা মেসে গেলেন, মাতা রন্ধনের দ্রব্যাদি গুছাইয়া দিতে ভাঁড়ারে ঢুকিলেন। মুকুল এই সুযোগে একগুচ্ছ চাবী লইয়া ত্রিতলের সিঁড়ির পাশের ছোট ঘরখানিতে ঢুকিল। এ ঘরটি কোন দিনও ব্যবহার হইত না। গোটা দুই বাক্স আর একটি আলমারী বক্ষে লইয়া এ গৃহটি বাড়ীর অন্যান্য সুসজ্জিত গৃহ হইতে এক কোণে সরিয়া আপনার দীনতা আপনার মধ্যেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল। দাসদাসীরা ব্যস্ত সমস্ত ভাবে প্রতি প্রভাত সন্ধ্যায় এ ঘরের ধূলা ঝাড়িতে আসিত না। ইহার নির্ম্মল মর্ম্মর শুভ্র মেঝের জলের ধারা পড়িত না। এ যেন সমস্ত উজ্জ্বলতা সৌন্দর্য্য হইতে পরিত্যক্ত হইয়া এক পাশে পড়িয়াছিল।

বাড়ীর কেহই এ ঘরে বড় একটা আসিত না, আসিবার প্রয়োজনও হইত না। কেবল মাঝে মাঝে যমুনাদেবী আসিতেন, তাহাও অন্য সময়ে নহে, মধ্যাহ্নে জগৎ যখন সমস্ত কাযকর্ম্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া বিজনমূর্ত্তি ধারণ করিত, বিহগ-কণ্ঠ নীরব হইত, রুদ্র মহাকাশের তলে রৌদ্রতাপিতা পৃথিবী শুব্ধ হইয়া রহিত—সেই সময় যমুনাদেবী এই নিভৃত নির্জ্জন কক্ষে আসিতেন, দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাক্স আলমারী খুলিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি আবার নূতন করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতেন। এ গৃহের সহিত তাঁহার ইহার বেশী সম্বন্ধ ছিল না। সেই

গৃহে আজ অনেক কালের পর মুকুল পদার্পণ করিল। দরজা ভেজাইয়া দিয়া প্রথমেই মুকুল বাক্স খুলিল। বাক্সের মধ্যে তাহারই বাল্যকালের দ্রব্য স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। ছোট্ট ডুরে শাড়ী, ছিন্ন নীলাম্বরী, সিল্কের ফ্রক চিনেমাটীর খেলার সরঞ্জাম, কাঠের ঘোড়া, হাত ভাঙ্গা পুতুল, বেতের ঝাঁপি একটির পর একটিতে বাক্স পরিপূর্ণ। এ সব জিনিস নগণ্য অনাবশ্যক হইলেও সন্তান বৎসলা স্নেহময়ী জননী প্রাণে ধরিয়া ইহার কিছুই নষ্ট হইতে দেন নাই। চারিদিকেই বিলাসের বিপুল আয়োজন, ভোগের প্রচুর উপাদান, তথাপি যমুনা সেই বাল্যের স্মৃতি-বিজড়িত ছিন্ন শাড়ী, ভগ্ন পুতুলের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। সেই শাড়ী, খেল্‌না দেখিতে দেখিতে মুকুলের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইত, প্রাণের পাতে পাতে মাতৃস্নেহের ফল্গু ধারা বহিয়া যাইত।

বাক্স তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও মুকুল তাহার অভীষ্ট মাদুলী পাইল না। একবার ভাবিল মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, ইহাতে লজ্জা কি? পরক্ষণে ভাবিল আলমারীটা না খুঁজিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না।

চাবির পর চাবি লাগাইয়া একটি চাবীতে মুকুল আলমারীটা খুলিয়া ফেলিল।—প্রথমেই তাহার চক্ষে পড়িল একটি ছোট লাল চেলী। চেলীখানা ছোট হইলেও সেখানা যে বিবাহের চেলী তাহাতে মুকুলের সন্দেহ রহিল না। চেলীর স্থানে স্থানে চন্দন ও সিন্দুরের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। চেলীখানি হস্তে লইয়াই মুকুলের বোধ হইল এ চেলীটা যেন সে বহুবার দেখিয়াছে! এটা যেন তাহার খুব চেনা। কিন্তু কবে ইহা তাহার প্রথম দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল, কি করিয়া ইহার সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল—মুকুলের সে সব ভাবিবার সময় ছিল না। সে অখণ্ড মনোযোগ সহকারে মাদুলী খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইল।

চেলীর নীচেই চন্দনকাঠের একটা বাক্স ছিল, বাক্সটা কোলের কাছে টানিয়া লইতেই চন্দনের স্নিগ্ধগন্ধে তাহাকে বিভোরা করিয়া ফেলিল, মুকুলের অন্তরে কৌতূহলের বান ডাকিয়া গেল। এ বাক্সের ভিতর কি আছে? সৌরভযুক্ত সুদৃশ্য পবিত্র আধারে জননী কি রাখিয়াছেন।

উৎসুক মুকুল ক্ষিপ্রহস্তে বাক্সের ডালা তুলিল—এ কে? এ কাহার আলেখ্য শুষ্ক পুষ্পমাল্যের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে? আলোক চিত্রে একটী সুন্দর উজ্জ্বল চক্ষু বিশিষ্ট কিশোর মূর্ত্তি। তাহার মুখে মিষ্ট মধুর হাস্যচ্ছটা, ললাট প্রতিভায় প্রদীপ্ত। কি সুন্দর কি মধুর এই মূর্ত্তি! এই অবয়ব মুকুল যেন কোথায় দেখিয়াছে। এ মুকুলের পরিচিত, বড় পরিচিত গো। কিন্তু কোথায় সে ইহাকে দেখিয়া ছিল? ইহার সহিত তাহাদের সম্বন্ধই বা কি? এ কোথায় গেল? মুকুলের আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। সেই বাক্সের মধ্য হইতে সত্যের একটা কঙ্কাল মূর্ত্তি যেন তাহার গলা টিপিয়া মারিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিতে উদ্যত হইল। মুকুলের সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গেল। মুখ বিবর্ণ হইল। একটা প্রচণ্ড শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে চালনা করিতে লাগিল। যন্ত্র চালিতের ন্যায় মুকুল বাক্স হইতে একটা পুরাতন গোলাপী বর্ণের ছাপানো কাগজ টানিয়া তুলিয়া কাগজখানার দিকে অর্থশূন্য উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই ছাপা কাগজখানি বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র তাহাতে লেখা ছিল—

"সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন,

আগামী ১০ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার আমার পুত্র শ্রীমান মুরারীমোহন রায়ের কন্যা শ্রীমতী মুকুলিকা দেবীর সহিত চন্দ্রচূড় গ্রামের ৺শিবসুন্দর বাগ্‌ছী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ শিশির কুমার বাগ্‌ছীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবে।

মহাশয়, সবান্ধবে শুভ কার্য্যে যোগদান করিয়া বাধিত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

নিবেদক
শ্রীত্রিলোচন রায়।

ত্রিলোচন? ত্রিলোচন তো মুকুলের স্বর্গীয় ঠাকুরদাদার নাম। তাঁহার পুত্র মুকুলের পিতার নামই মুরারীমোহন। মুরারীমোহনের কন্যা মুকুলিকা। মুকুলের পায়ের তলের পৃথিবী সহসা কাঁপিয়া উঠিল, সে কম্পনে মুকুল স্থির থাকিতে পারিল না, দৃঢ়হস্তে ঝাটাটা চাপিয়া ধরিয়া ঝটিকা-বিচ্ছিন্ন মুকুলের ন্যায় মুকুল লুটাইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

শ্রীগিরিবালা দেবী।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

সাহিত্য

ভারতবর্ষ—ভাদ্র।

বাঙ্গালী বিদ্যাপতি—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত কয়েকটী পদ সম্বন্ধে অনুমান করেন যে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি সেগুলির রচয়িতা। যে সামান্য ভিত্তির উপর তিনি এই অনুমান স্থাপিত করিয়াছেন তাহা সুদৃঢ় নয়। আলোচনায় পাণ্ডিত্য বা গভীরতা নাই। সামান্য এক খানি খণ্ডিত পুঁথির কয়েকটী পদ হইতে এরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত কি? পরিশেষে লেখক আশা করিয়াছেন 'কোনো অনুসন্ধিৎসু সহৃদয় এ পথে অগ্রসর হইবেন এবং ফলস্বরূপ নিজের সুচিন্তিত মত প্রকাশে অনুগৃহীত করিবেন।' বেশ কথা!

বাঙ্গালীর রান্নাঘরের সমস্যা—শ্রীমতী মুকুলরাণী রায়। দুই চারিটী অবশ্যজ্ঞাতব্য কথা সরলভাবে লিখিত হইয়াছে।

ওমর খৈয়াম—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী। লেখকের নামটা বোধ হয় ছাপার ভুলে সুরেন্দ্রচন্দ্র হইয়াছে। অল্প পরিসরের ভিতর ওমর খৈয়ামের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লেখক সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। লেখক ওমর খৈয়ামের রসানুভূতি ও ভাব-ধারার পারম্পর্য্য হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন।

আহ্বান—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত। রঙ্গপুর জেলার ছাত্র-সম্মিলনের সভাপতিরূপে লেখক যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন সেইটী এস্থলে মুদ্রিত হইয়াছে। সাধারণতঃ অভিভাষণ শুনিলে প্রাণে যেন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয় যে কতই না গুরুগম্ভীর উপদেশ শুনিতে হইবে। এখানে কিন্তু লেখক ছাত্রদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা হইতে তাহারা শিক্ষালাভ করিতে পারিবে এ ধারণা আমাদের আছে। তিনি ছাত্রদিগকে কূপমণ্ডূক-বৃত্তি ছাড়িয়া সার্ব্বজনীন বিশ্ব-জীবনের একত্ব বোধ অনুভব করিবার উপদেশ দিয়াছেন। 'বাহির হইতে গ্রহণ করবার শক্তি পর্য্যন্ত আমরা হারিয়ে বসেছি' বলিয়া লেখক যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা খাঁটি সত্য। 'জ্ঞানে, ভাবে, কর্ম্মে আমরা যে এমনি করে আমাদের মনটাকে দেশের চৌহদ্দী দিয়ে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি, তাতে আমাদের দেশের চিত্ত যে কতটা দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে, সেটা বাইরের খবর যে কেউ রাখে, সেই অনুভব করতে পারে।' সেই জন্য সবার আগে তিনি চান যে, "আমাদের সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ-সাধন ক'রতে হবে। দুনিয়ার কোথায় কি হ'চ্ছে তার সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক সন্ধান রাখতে হবে; যেখানে যে রত্ন আবিষ্কৃত হ'য়েছে তাকে আহরণ ক'রতে হবে, যাচাই করতে হবে, বিচার ক'রে তাকে দেশমাতৃকার মুকুটে বসাতে হবে।' 'দেশের পূজা ক'রতে হ'লে উপচার আহরণ করতে হবে সমস্ত বিশ্ব থেকে—প্রসাদ বিতরণ করতে হবে সমস্ত বিশ্বে।' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই কথাই কয়েক বৎসর হইতে বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র ফলোদয় হইতেছে না দেখিয়া স্বদেশ-প্রেমিক লেখক প্রাণের আবেগে ভাষার মাধুর্য্যে ও যুক্তির সাহায্যে ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে প্রকৃত স্বদেশসেবীর অবশ্যকরণীয় কি তাহাই বলিয়া দিয়াছেন—তাহাদিগের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—

'মুক্তি যদি পেতে হয়, গৌরব যদি লাভ করতে হয়, দেশকে আদ্যোপান্ত মানুষ হ'তে হবে,—প্রাণপণ ক'রে সবাইকে মনুষ্যত্বের সাধনা করতে হবে,—স্বপ্নের নয়, ইন্দ্রজালের নয়! সেই মনুষ্যত্ব সাধনায় আত্মসমর্পণ কর।' এ উপদেশে নূতনত্ব না থাকিলেও পুরাতন কথা এমন সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে যে পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

মধ্যভারতে—রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন। সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী। পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। এবারে ইতিহাস-বিশ্রুত মাণ্ডুর ধ্বংসাবশেষের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বিশ্ব-সাহিত্য—শেলির শেষ দিন—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। করুণ রসাত্মক চিত্র।

মধুসূদনের স্মৃতি—শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কর। বিশেষ কিছুই নাই। মধুসূদন কাশীরাম দাস সম্বন্ধে এক দিন মাত্র কর মহাশয়কে বাঙ্গালায় কথা বলিয়াছিলেন, 'তেতলায়ও পড়ছে, গাছতলায়ও পড়ছে'। ইহা ছাড়া তিনি তাঁহার মুখে আর একটীও বাঙ্গালা কথা শোনেন নাই।

মেঘদূত—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। সুকবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের সচিত্র মেঘদূতের সুদীর্ঘ সমালোচনা। সমালোচনার সমালোচনা আমরা কোন দিনই করি না। আলোচ্য পুস্তকখানির সমালোচনাও ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু লেখক সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার স্থলে বিভিন্ন ছন্দের সমাবেশ দেখিয়া যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—"অনুবাদক কবির কবিতাগুলি এতই মধুর ও প্রকৃত কাব্যের অনুগত হইয়াছে যে, যাঁহারা মূল মেঘদূত পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই সত্য সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই বাংলা কবিতাগুলির একটা প্রধান গুণ এই যে, মূল মেঘদূত ভাষান্তরে অপ্রতি-পাদ্য ও অননুকরণীয় এবং এক গভীর অথচ সুমধুর বেদনার ভাষায় সমলঙ্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দে উপনিবদ্ধ হইলেও, এই বাংলা কবিতা কোন এক নির্দ্দিষ্ট ছন্দে গ্রথিত হয় নাই। ইহাতে, হৃদয়ে যে রাগরাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে, কবিতা পড়িতে পড়িতে পাঠকের মর্ম্মমধ্যে যে সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে সেই সেই কবিতার ছন্দও ঠিক তেমনই সুরের অনুকূল করিয়া গ্রথিত হইয়াছে।" এই ছত্র কয়টী কয়েকবার পড়িয়াও

ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না লেখকের বক্তব্য কি? তিনি কি বলিতে চান মন্দাক্রান্তা ছন্দে কালিদাস সমস্ত মেঘদূত রচনা করিয়া মাঝে মাঝে 'পাঠকের মর্ম্ম মধ্যে যে সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠে', তাহার অনুকূল ছন্দে গ্রথিত করিতে পারেন নাই, যেমন অনুবাদক করিয়াছেন? না লেখক প্রশংসোচ্ছলে কবি নরেন্দ্র দেব সম্বন্ধে নিন্দা করিতে চান তিনি অননুকরণীয় মন্দাক্রান্তা ছন্দে অনুবাদ করিতে পারেন নাই?

আনন্দমোহন বসু—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। মনীষীদের জীবন-কথা যতই আলোচিত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। দেশকে যাঁহারা গঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আনন্দমোহন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। তাঁহার পূতচরিত্র-কাহিনী, স্বদেশ-প্রীতির কথা সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

গ্রীস—শ্রীযুক্ত ভারতকুমার বসু। সচিত্র সঙ্কলিত প্রবন্ধ। গত বারে যে দোষের কথা বলিয়াছিলাম, লেখক তাহা সংশোধন করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। পাদপূরণে আজকাল যেমন কবিতা প্রকাশিত হইতেছে, পত্র পূরণেও সেইরূপ এই শ্রেণীর সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হইতেছে।

বিচিত্রা—শ্রাবণ।

সীমার দুঃখ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুন্দর রসোজ্জ্বল দার্শনিক প্রবন্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধে কবিবর বলিতে চান, 'আমাদের আত্মা পরমাত্মার মধ্যেই জাগ্‌তে পারে। ঐকান্তিক সংস্কারের মধ্যে মানব সুপ্ত, অন্ধ। সেখানে সে নিজেকে জানে না ব'লেই বিষয়কে বড় করে জানে। তাই পরমাত্মার মধ্যেই সে বাস করছে, এইখানে তার অমৃত, এই উপলব্ধিটিকে সে যদি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফিরে তা হ'লেই পদে পদে সে মিথ্যার হাত থেকে বাঁচে। কেন না, সকল মিথ্যার জন্ম সেইখানেই যেখানে আত্মা নিজেকে জানে না।' এই আত্মাকে জানিতে হইলে সীমার গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। আর ভালবাসায় শক্তিতে মানুষ 'নিজেকে অতিক্রম ক'রে অন্যের মধ্যে আপনাকে পায়। এমনি করে সীমাকে অতিক্রমের দ্বারাই নিজেকে পাওয়া হচ্ছে আত্মার প্রকৃতি, কেন না আত্মার মধ্যে অসীমের ধর্ম্ম আছে।... ...প্রেমের মধ্যেই সেই ধর্ম্মই সত্য বা সীমাকে অতিক্রম ক'রে নিজকে মুক্তিদান করা।' এখন জিজ্ঞাস্য এই মুক্তি কি হইতে মুক্তি? উত্তরেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়া দিয়াছেন—'না-পরিচয়ের বন্ধন থেকে, পাওয়ার বন্ধন থেকে, সীমার বন্ধন থেকে।' ইহার পথ তিনি এইভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—'অহমিকায় মানুষকে কেন অসত্যে নিয়ে যায়? কেন না অহমিকায় সে এই একটা প্রকাণ্ড মিথ্যাকে বরণ করে নেয় যে, আমাতেই আমার সার্থকতা। অথচ এর চেয়ে সত্য আর নেই, যে, মানুষ আপনার একান্ত স্বাতন্ত্র্যে সম্পূর্ণ নয়। মানুষের মধ্যে তাঁরাই মহাত্মা যাঁরা সকল মানুষের মধ্যেই আপন আত্মাকে জেনেছেন এবং সেই সত্যের দ্বারাই জীবনকে চালিত করেছেন। যার অহমিকা প্রবল সে আপনার চারিদিকে আপনার স্বাতন্ত্র্যকেই বড় ক'রে তুলতে চায়, বিশ্বের সঙ্গে আপন যোগকে অবরুদ্ধ করে।' বিশ্বকবি উপনিষদের গোড়ার কথা সরল ভাবে বুঝাইয়া বলিতে চান যে সীমার দুঃখ অশেষ—নামরূপ বাঁধা মতের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা অহমিকাকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র—ইহাতে স্বার্থপরতার বৃদ্ধিই হয়। ইহার জন্যই মানুষ মানুষকে কষ্টই দিয়া থাকে। প্রেমের সাহায্যে বিশ্বের সঙ্গে যোগ-সূত্রে স্থাপন করিতে পারিলে স্বার্থপরতা দূর হইবে—আর এরূপ করিতে পারিলে তখন মানব বিশ্বের দেবতাকে আপনার মধ্যে জানিতে পারিয়া অমৃতত্বের অধিকারী হইবে—অমৃত হইবে—

"এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ,
হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

গদ্যসাহিত্য বলেন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত নবেন্দু বসু। এই সুচিন্তিত সুলিখিত প্রবন্ধে লেখকের রস-বিশ্লেষণ শক্তি, রসানুভূতি, যুক্তির সারবত্তা ও সমালোচন বৃত্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক বলেন্দ্রনাথের রস-প্রবন্ধ সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। রস-প্রবন্ধের সহিত অন্যান্য প্রবন্ধের পার্থক্য লেখক মনোজ্ঞভাবে বুঝাইয়াছেন। লেখকের মতে—রস রচনা 'আনন্দের লেখা'; কোন উদ্দেশ্যের তাগিদ এতে তেমন নেই। প্রবন্ধ প্রকাশ, রস-প্রবন্ধ বিকাশ।' এ শ্রেণীর প্রবন্ধে পাওয়া যায় নিছক আনন্দ—তৃপ্তি। এ লেখায় ফুটিয়া ওঠে লেখকের ব্যক্তিত্ব—'আমি'র ছড়াছড়ি। কিন্তু এ 'আমি' অভিমানের বা অহঙ্কারের আমি নয়—এ আমি লেখকের 'অকপট ভাবে আত্ম-প্রকাশের' আমি। 'গদ্যে রস-লেখকের কায তাই, যা কাব্যে গীতি-কবি বা lyrist এর।' 'এই গীতোচ্ছ্বাসে বলেন্দ্রনাথ যে কত প্রবল, কত উচ্ছল, কত ছন্দিত, কত ঐক্য সম্পন্ন ছিলেন, তাহা লেখক সুন্দর ভাব দেখাইয়াছেন। বলেন্দ্রনাথের রচনার বিষয়-নির্ব্বাচনের কোন বাঁধা ধরা নিয়ম ছিল না। তাঁহার রচনায় কোথাও কষ্টকল্পনার কিছু নাই। বর্ণনভঙ্গী সর্ব্বত্র সহজ, সলীল, মৃদু, শিথিল মনোভাব চালিত, হাস্য রসোজ্জ্বল (humour)। তাঁহার রচনায় ভাব ও প্রাণ সজীব। তাঁহার ভাষা ছিল স্নিগ্ধ, কোমল, প্রশান্ত, উজ্জ্বল। তাঁহার কল্পনার অবাধ প্রসারতা ছিল—'অনেকটা নাট্যকারের সচেতন দৃষ্টি ছিল।' কোন কোন রচনায় হাস্যরসের ভিতর দুষ্ট হাস্যও (sly humour) বেশ পাওয়া যায়।—বহু দিন পরে আমরা একটী সুন্দর সমালোচনামূলক রস-প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি-লাভ করিয়াছি। লেখকের বিশ্লেষণশক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। স্রষ্টা বলেন্দ্রনাথের পরিচয় লেখক সুন্দর ভাবেই দিয়াছেন, তবে মাঝে মাঝে পুনরুক্তি দোষে রচনাটী দুষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধটী একটু সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত। প্রবন্ধের নাম করণও সমীচীন হয় নাই, কারণ লেখক একস্থলে স্বয়ং বলিয়াছেন শিল্প ও সাহিত্য সমালোচক বলেন্দ্রনাথের কথা এ

প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়। তাহা হইলে প্রবন্ধটী অযর্থ হইল কি করিয়া?

বাঙলা সাহিত্য ও প্রবাসী বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভাগলপুর শাখার বার্ষিক সভায় প্রদত্ত অভিভাষণ। বিশেষ কিছু নাই, তবে একটা বড় কথা লেখক উত্থাপন করিয়াছেন ও তাহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কথাটা লেখকের কথায় বলি:—'আর আমাদের সামনে যে একটা নূতন বিরাট্ জাতি গ'ড়ে তোলার সাধনা চলেছে, সে সাধনা যেমন বাঙালীর বৈশিষ্ট্যকে গ'ড়ে তোলার, তেমনি সমস্ত প্রদেশের Culture এবং ঐক্য গঠিত অখণ্ড ভারতীয়তাকে গড়ে তোলার। বাঙলা সাহিত্যের সেবা ক রেই আমরা এই দুই উদ্দেশ্যকেই সার্থক করতে পারি।' কথাটা ভাবিবার বিষয় বটে। পূর্ব্বে যেমন ভারতীয়তা-বোধ (Indian nationalism) জাগ্রত করিবার জন্য আমাদের নেতারা সচেষ্ট হইতেন, এখনকার নেতারা আর তেমন হন না।

মনীষী গিরিশচন্দ্র—শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত। সচিত্র জীবন-কথা। অল্পের ভিতর লেখক Bengalee পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্রের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন।

ভারতের বৈচিত্র্য কি?—শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য। লেখক দুই পৃষ্ঠার ভিতর তথাকথিত জাতীয়তা, বর্ণাশ্রম বা অহিংসা নীতি, যে ভারতের বৈশিষ্ট্য, তাহা বলিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি এইরূপে করিয়াছেন—'এক্ষণে জগৎকে একসূত্রে বাঁধিতে হইবে; ধর্ম্মগত ও ধনগত ভেদ দূর করিতে হইবে; উচ্চনীচ সমান করিতে হইবে। এই হইল বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য। এবিষয়ে ভারতের কোন বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না। ভারতেরও এই সমস্যা।' লেখক বিশেষ কোনরূপ যুক্তির সাহায্যে আপনার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেন নাই।

মধ্য-এশিয়ায় হিন্দুসাহিত্য—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী বি-এ। সচিত্র সুন্দর প্রবন্ধ। বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ, পূর্ব্বের মতই চলিতেছে।

উত্তর কুইন্স্ল্যাণ্ড—শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত। সচিত্র সঙ্কলিত প্রবন্ধ। রচনা-ভঙ্গীর গুণে এত মনোরম হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে মনে হয় না যেন একটা অনূদিত প্রবন্ধ পড়িতেছি।

মাসিক বসুমতী—শ্রাবণ।

অমৃতলালের স্মৃতি-অর্ঘ্য—বর্ত্তমান সংখ্যায় স্বর্গীয় অমৃতলালের সম্বন্ধে অনেক কথা সংকলিত হইয়াছে। রসরাজের হস্তাক্ষরের চিত্র, তাঁহারই রচিত গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাল্য-লীলা ও কয়েকটি প্রবন্ধ ও চিত্র পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। প্রবন্ধগুলির পরিচয় আমরা সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম—

১। অমৃতস্মৃতি—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু।

এই প্রবন্ধে রসরাজের নাটক-প্রহসনাদি প্রথম যে সালে অভিনীত হইয়াছিল ও তিনি নিজে যে যে ভূমিকায় যে যে সালে প্রথম অবতীর্ণ হন, লেখক যত্ন-সহকারে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কয়েকটি জীবন কথাও (anecdote) প্রকাশিত হইয়াছে।

অমৃতলোকে অমৃতলাল—শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রবন্ধে অমৃতলালের শিক্ষানুরাগ, শিক্ষা-নীতি, হাস্য-রসিকতা ও ধর্ম্ম-জীবন সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

অমৃতলাল ও জেলেপাড়ার সং—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস।

জেলেপাড়ার সং-এর আয়োজনে রসরাজের কতটা কর্ত্তৃত্ব ছিল তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

অমৃত স্মৃতি—রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন।

লেখক অমৃতলাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা মাঝে মাঝে মর্ম্মস্পর্শী, তবে প্রবন্ধটি আরো ছোট হইলে ক্ষতি ছিল না, কারণ অনাবশ্যক বাহুল্য অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়।

অমৃতময় অমৃতলাল—শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রচনাটি পাঠকের চিত্তে পুরাতন দিনের একটি চিত্র আঁকিয়া দেয়।

অমৃতলালের স্মৃতি-তর্পণ—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অমৃত-প্রয়াণ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত। বিশেষ কোন জ্ঞাতব্য বিষয় নাই।

দাদামশাই—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু। রসরাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাহার স্বদেশ প্রেমের প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দে। রসরাজ সম্বন্ধে কয়েকটি উপভোগ্য কাহিনী ইহাতে আছে।

অমৃত-স্মৃতি—শ্রীযুক্ত চুণিলাল বসু। অমৃতলাল নানা ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

অমৃতলাল—শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নাট্যক্ষেত্রে রসরাজের কৃতিত্ব বর্ণনা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। অল্প কথায় আড়ম্বরহীন ভাষায় এই শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদত্ত হইয়াছে।

অমৃতলালের কথা অমৃত সমান—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়। শুধু অমৃতলালের কথা নয়—তাঁহার সম্বন্ধে লেখক আপনার মত-বাদটাও প্রকাশ করিয়াছেন—দুঃখের বিষয় এ গুরুগম্ভীর আলোচনাটি আমরা সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিতে পারি নাই। রচনায় এমন একটা সাহিত্যসম্বন্ধীয় বিজ্ঞতা ও গবেষণায় আড়ম্বর আছে, যাহা রচনাটিকে জটিল ও দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে।

হাডুডু খেলায় অমৃতলাল—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ। দেশীয় সকল জিনিসই যে রসরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, নানা বিষয়ে তিনি যে জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তাহা এই সংক্ষিপ্ত রচনায় প্রমাণিত হইয়াছে।

উক্ত কয়েকটি প্রবন্ধে অমৃতলালের যে স্মৃতি-অর্ঘ্য রচিত হইয়াছে তাহার জন্য সম্পাদকের প্রতি পাঠক কৃতজ্ঞ থাকিবেন। প্রবন্ধগুলিতে মাঝে মাঝে অনেক বাজে কথাও আছে; অনেক স্থলে ভাবের অভাব

ভাষার দ্বারাও পূরণ করা হইয়াছে, সারল্যের পরিবর্ত্তে মাঝে মাঝে কৃত্রিমতার প্রকাশও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অমৃতলালের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা প্রগাঢ়; সেই জন্য প্রবন্ধগুলিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পাঠক প্রতি প্রবন্ধেই রসরাজ সম্বন্ধে কিছু জানিতে চান। এই জন্য প্রবন্ধকারেরা যদি সকলেই প্রত্যক্ষ বিষয়ের অবতারণা করিতেন এবং সাহিত্যিক গবেষণা, দার্শনিক ও সমালোচকের ভঙ্গিমা ছাড়িয়া সাদা-সিধা সত্য কথা বলিতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে এই স্মৃতি-অর্ঘ্য আরও হৃদয়গ্রাহী হইত। অনেকে তাহা করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা আমরা উপভোগও করিয়াছি। তবে কতকগুলি অচল। তাহাদের মধ্যে অমৃতলাল অপেক্ষা লেখকের নিজের কথাই অধিক।

বিলাতের স্মৃতি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৃত্যু সম্বন্ধে কবির উক্তি প্রাণস্পর্শী। এই সংখ্যায় বিলাতের স্মৃতি সমাপ্ত হইল, রচনাটি ভাবে ভাষায় ও দার্শনিক বিচারে রবীন্দ্রনাথেরই উপযোগী। রচনায় স্মৃতিকথা অপেক্ষা বিচার-বিশ্লেষণের মাত্রাই অধিক এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভারতীয় কবির এই চিন্তা-ধারা পাঠকমাত্রেরই আলোচ্য। তবে কবির অন্যান্য স্মৃতিকথার মত ইহা সরস ও সুন্দর হয় নাই। শুধু বাঙ্গালী বা ভারতবাসীর চক্ষে তিনি বিলাতকে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন কবি ও দার্শনিকের মত। সুতরাং জাতীয় সংকীর্ণতা কোথাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বিলাত ও ভারতের মধ্যে যে দুর্ব্বোধ্য অথচ যোগসূত্র আছে লেখক তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সুতরাং বিদেশসম্বন্ধে তাঁহার অন্যান্য রচনার মত ইহারও যে একটা আন্তর্জ্জাতিক মূল্য আছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

পুরাণ প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন।

ইহাতে পুরাণপাঠের প্রণালী, পুরাণের লক্ষণ প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। পুরাণ অনেকেই পড়েন, কিন্তু ইহার একটা যথোচিত আলোচনা আজ পর্য্যন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই বিপুল সাহিত্যভাণ্ডার শুধু এ দেশেরই সামগ্রী; কেহ ইহাদের শ্রদ্ধা করেন, কেহ অবজ্ঞা করেন, কেহ নিজের মতবাদ সমর্থনের জন্য ইহার শরণাপন্ন হন এবং এই বিপুল ভাণ্ডারে কিছুরই অভাব নাই। বিদেশী পণ্ডিতেরা যে ভাবে পুরাণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমরাও সেই পথই অবলম্বন করিয়া আসিতেছি। এ সম্বন্ধে দেশীয় মত কি তাহা বিশদ ভাবে দর্শনসম্মত যুক্তির সহিত কেহই বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। সমালোচ্য প্রবন্ধে কতকটা সেইরূপ চেষ্টার নিদর্শন লক্ষিত হয়। আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যার জন্য আগ্রহান্বিত রহিলাম।

বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে কাইসারলিঙের য়ুরোপ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

কাইসারলিঙ ইউরোপ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে কিরূপ দাঁড়াইতে পারে তাহাই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। রচনা সাময়িক, জ্ঞাতব্য তথ্যও আছে। কিন্তু লেখকের রচনা-ভঙ্গীর জন্য যাহা সরল, তাহাও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। লেখকগণ স্ব স্ব ভঙ্গীকে অনুচিত প্রাধান্য দিবার লোভ সংবরণ করিলে পাঠকেরা অনেকটা উপকৃত হন, কারণ পাঠকেরা লেখকের কথাই শুনিতে চান, যে ভঙ্গিমা বক্তব্যকে অস্পষ্ট করিয়া ফেলে তাহা অভিনয়মঞ্চে হয়ত সমাদর লাভ করিতে পারে—সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার স্থান নাই।

ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা—শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়।

সুচিন্তিত ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। লেখক বলেন ভারতের একটা নিজস্ব রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা আছে; তাহার আলোচনা ব্যতীত দেশের রাষ্ট্র-নীতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। এই প্রবন্ধে ভারতীয় প্রাচীন রাজ-নীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ A Defence of Indian culture নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহারই অনুবাদ এ স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে। চিন্তাশীল পাঠক ইহার সমাদর করিবেন।

বরণীয় বাঙ্গালী জীবন—৺অমৃতলাল বসু। দিনাজপুরের রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়ের কথিত বর্ণিত হইয়াছে। রচনায় অমৃতলালের নিবিড় দেশভক্তির পরিচয় আছে। পাঠককে তিনি যে উপহার দিয়াছেন তাহারও মূল্য সামান্য নয়।

'দপ্তরের' মধ্যে শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রুদ্র শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কমলকুমার সান্যাল "কাব্যে অশ্লীলতা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিতে চান ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সমাজ পরস্পরের সহযোগী। ইহাদের দ্বন্দ্ব মানব-জীবনের হিতকর হইতে পারে না। তিনি দেশের জীবনধারার অনুরূপ রসসৃষ্টি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। লেখকের উদ্দেশ্য সৎ, তবে কথাগুলি তিনি বেশ গুছাইয়া বলেন নাই।

'সমুদ্র যাত্রা'য় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন, তবে এ স্বাধীনতা শাস্ত্রবচনকে অগ্রাহ্য করিয়া নহে। প্রবন্ধটি সুলিখিত।

শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য কয়েকটি সুলিখিত নব আবিষ্কৃত প্রাচীন পদাবলী পাঠককে উপহার দিয়াছেন।

সুন্দর চরণে শীকার—শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসিচরণ রুদ্র। শীকারীদের প্রতি কয়েকটি উপদেশ আছে। এবারে হরিণ ও কুম্ভীর শীকারের কথা। শীকারীরা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন।

সতীত্ব—শ্রী—পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হইতেছে। আলোচনা বিশদ ও সুখপাঠ্য।

প্রবাসী—ভাদ্র।

ধ্যানী জাপান—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপানীরা সামান্য ছোট খাট কাযে কিরূপে মনকে একাগ্র করিবার চর্চ্চা করিয়া থাকে তাহার বর্ণনা করিয়া কবি উপসংহারে জানাইয়াছেন,

কোরিয়া দেশের একজন যুবকের সহিত একদিন তাঁহার যে সব কথা হইয়াছিল তাহা পরে লিপিবদ্ধ করিবেন। জাপানের কথা তিনি আমাদের জানাইয়া দেখাইতে চান, ধ্যানের শক্তিকে আমরা কতটা অস্বীকার করিয়া চলিয়াছি। পাঠক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথের চক্ষে জাপানকে দেখিবার অবকাশ পাইবেন।

গুজরাটে গোপীচাঁদের গান—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চৌধুরী।

বিদেশী পণ্ডিত স্যর জর্জ্জ এব্রাহাম গ্রীয়ারসন রঙ্গপুর হইতে গৌড়বঙ্গের রাজা গোপীচাঁদের এই গানের বাংলা সংস্করণ বাহির করিয়াছিল। লেখক গানের কথা বিশেষ কিছু বলেন নাই; তবে গল্পাংশ সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশনা—শ্রীযুক্ত ভানুভূষণ দাস গুপ্ত।

ধর্ম্মদেশনা বা নিমন্ত্রিত ভিক্ষুর মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও ব্যাখ্যা সিংহলী বৌদ্ধদিগের একটি অনুষ্ঠান। লেখক এই অনুষ্ঠানের যে চিত্র দিয়াছেন তাহা পাঠকের নিকট অগ্রাহ্য হইবে না, কারণ বিষয়টি সাহিত্যে পুরাতন নয় এবং বিবরণও প্রত্যক্ষদর্শীয়।

কান্যকুব্জে একদিন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কান্যকুব্জের পুরাতন ইতিহাস, দুইএক খানি চিত্র ও এখনকার সামান্য দুচারিটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া লেখক প্রবন্ধে শেষ করিয়াছেন। রচনায় কোথাও যত্ন বা শ্রমস্বীকারের নিদর্শন নাই।

মার্কিণ গ্রাম্য মহিলা—শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত।

মার্কিণ গ্রাম্য জীবনের বর্ণনাটি পাঠ করিয়া পাঠক আনন্দিত হইবেন। তবে বর্ণনা আরও বিশদ হওয়া আবশ্যক।

হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। রচনা সুপাঠ্য ও সুন্দর। চিত্রগুলি মনোরম।

কথা-সাহিত্য।

প্রবাসী—ভাদ্র।

শ্রীমতীর শিকার—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

একটি ইংরেজি গল্প অবলম্বন করিয়া রচিত। আমরা ইহার রস উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। লেখক বিষয়নির্ব্বাচনে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। অনুবাদ করিতে গেলে বিষয়টি অনুবাদযোগ্য কি না তাহা বিচার করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

সাবধানী—শ্রীমতী হেমমালা বসু।

খাঁটি দেশী গৃহস্থ ঘরের চিত্র সাহিত্যে এখনও একঘেয়ে পুরাতন যে হয় নাই, তাহা লেখিকা এই গল্পে প্রমাণ করিয়াছেন। তবে রচনা বড় দীর্ঘ। লেখিকা কতকটা ঔপন্যাসিকের রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। মাঝে মাঝে এক একটি চিত্র সুন্দর ভাবেই ফুটিয়াছে। সাবধানী ও ছোট গিন্নীর চিত্র জীবন্ত। তবে কোথাও আদর্শের টানে কোথাও বা বাস্তব চিত্রের মোহে রচনার সরল গতি প্রতিহত হইয়াছে। অনাবশ্যক যাহা তাহা পরিহার্য্য।

পরাজয়—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল রায়।

দরিদ্র পিতা বাটী বন্ধক রাখিয়া কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যত, কন্যা কিন্তু সে বিবাহে রাজী নয়—এই চিত্রটিতে মহত্ত্ব আছে, নূতনত্বও আছে তবে শেষের দিকে রচনাটি নীরস। কতকগুলা বিষয়ের অবতারণা করিয়া যাহা রচিত হইয়াছে তাহার কোনও সার্থকতাই আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

কুহকিনী—শ্রীমতী সুবর্ণলতা চৌধুরী।

পাদটীকায় উক্ত হইয়াছে ইহা একটী স্প্যানিশ গল্পের অনুবাদ। লেখিকার নির্ব্বাচনশক্তির প্রশংসা করা যায় না। গল্পটি এদেশের উপযোগী নয়। দুই একটি চিত্র যাহা এই গল্পের প্রাণ তাহা এদেশের খুব অল্প পাঠকই উপলব্ধি করিবেন। এই সামান্য জিনিষের জন্য এতটা পরিশ্রম দেখিলে দুঃখিত হইতে হয় এবং ইংরাজী ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে The game is not worth the candle.

ভারতবর্ষ—ভাদ্র।

এবারকার ভারতবর্ষ গল্প সম্পদে ধনী নহে। ছোট গল্প তিনটি আছে—সেগুলির আর গুণাগুণ যাই থাকুক, সেগুলি সত্য সত্যই ছোট।

শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "প্রণবকুমার" এবার সমাপ্ত হইয়াছে। এই উপন্যাস খানিতে একেবারে নিখুঁত দেবচরিত্র মানুষ আছে, নিখুঁত পাষণ্ড আছে, সম্ভব অসম্ভব ঘটনার ভিতর দিয়া দেবতার কাছে পাষণ্ডগণের পরাভব আছে, প্রেম আছে, হত্যা আছে, পুলিশ, আদালত প্রভৃতি সকলই আছে—সুনীতির পরাকাষ্ঠা আছে, নাই শুধু কথা-সাহিত্যের রস। কয়েকমাস ধরিয়া ইহা ভারতবর্ষের সরস বক্ষ উষর করিয়া রাখিয়াছে—আজ ইহার সমাপ্তি। আমরা বলি স্বস্তি!

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশের "মা" একটি গল্প। ছেলে খুন করিল, মা গিয়া তার বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিয়া আসিল। পাছে ইহাতেও পাঠকের মনে রসোদ্রেক না হয় সেই আশঙ্কায় লেখক সমাপ্তিতে মায়ের মুখে বলাইয়াছেন, "তোকে যা ভালবাসি বাবা তার চেয়ে ধর্ম্মকে বেশী ভালবাসি, ধর্ম্মের চেয়ে বড় কিছুই নাই।" রসিকের হাতে পড়িলে ইহা হইতেও একটা সত্য রসচিত্র গড়িয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু হইয়াছে একটা তৃতীয় শ্রেণীর নকল বিষ্ণুশর্ম্মার উপদেশ।

"মরু মায়া"—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্প ভিন্ন ধরণের। সস্তা sentimentalism ছাড়া ইহার ভিতর আর কিছুই নাই।

"প্রশ্ন" শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, ভারতবর্ষের শেষ গল্প। নিরুদ্দিষ্ট যে কি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। উৎপীড়িতা কুলবধূ পরপুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া কাশীতে স্বামী স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছিলেন। শেষে আসল কথাটা প্রকাশ হইল। মেয়েটি রাগ করে, ঝগড়া

করে, সে ছেলে চায়, তার ছেলে হয় না বলিয়া! এই উপাদান লইয়া একটি গল্প হইলে হইতে পারিত—কিন্তু হয় নাই। গল্পটি লেখক লিখিয়াছেন হাল্কা সুরে—রহস্যের প্রচণ্ড চেষ্টা আছে—কিন্তু না জমিয়াছে হাস্যরস না করুণ রস।

মাসিক বসুমতী—শ্রাবণ।

শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্যের 'নিষ্পত্তি' গল্পটী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাকা হাতের লেখা। যৌথ পরিবারের বড় ভাই কর্ত্তা, ছোট ভাইটীকে নিজে মানুষ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর খুড়ো ভাইপোর ঝগড়ার নিষ্পত্তি হইল বড় ভাইএর উইল প্রকাশে। ভাই সমস্ত সংসারের ভার ছোট ভাইটীর উপরই দিয়া গিয়াছেন, ছোট ভাইকে জীবিতাবস্থায় যাহা কিছু দিয়া গিয়াছেন তাহাতে কাহারও কোন দাবী দাওয়া রহিবে না। আখ্যানবিষয় মামুলী। তবে গল্পটী জমিয়াছে।

দুঃখের ভাগী—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন। আজকাল "ভিখারী বিদায়" যে ফ্যাসান হইয়া উঠিয়াছে তাহারই একটী যথার্থ ও মর্ম্মন্তুদ ছোট ছবি। ধনৈশ্বর্য্যের গরিমা ও মহিমা দেখাইবার জন্য যে দানের প্রহসন নিত্যই দেখা যায় তাহাতে দাতার দানে প্রাণ নাই ও গ্রহীতার গ্রহণে প্রয়োজন নাই। সত্যই যাহারা দয়ার পাত্র—কাণা খোড়া আতুর তাহারা বলবান ভিক্ষুকদের ধাক্কায় প্রবেশ পথের অনেক দূরে পড়িয়া থাকে। জমিদার পঞ্চানন বাবুর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিরাট থিয়েটার গৃহে ভিখারী বিদায় হইতেছিল। অন্ধ দয়াল একটী ভিখারী, কেহ তাকে সাথে করিয়া লইয়াও গেল না কেহ তাহাকে খুঁজিয়া কিছু খাইতেও দিল না। হোঁচট খাইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া সমস্ত রাত্রি কাটিল। সকালে আর একটী অন্ধ বালিকার ক্রন্দনে সে জাগিয়া দেখে উভয়েই একটি ঘরে আবদ্ধ। আসন্ন মৃত্যু ভয়ে শেষ বল সঞ্চয় করিয়া চীৎকার করিয়া দরজা খুলিতে বলিল। কেহ দরজা খুলিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্ষুধার তাড়নায় তৃষ্ণার পীড়নে অন্ধ বালিকার দুঃখে দয়ালের দেহ ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। বাহিরে পঞ্চানন বাবুর বাটীর উচ্ছিষ্ট খাদ্য সম্ভারে পথের ডাষ্টবিন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। করুণ গল্পটী ভাষায় ও ভাবে বেশ ফুটিয়াছে।

লক্ষ্য ভ্রষ্ট—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। সেকালের স্বদেশী যুগের গল্পের নূতন কলেবর দিয়া নকল। বড় বড় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বুঝাইবার চেষ্টা বিশেষত্বহীন।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের—'স্মৃতি' গল্পটী মোটের উপর ভালই লাগিল। বড় সাহেব ২৫ বৎসর আগে অর্থের অভাবে বিনা চিকিৎসায় প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারাইয়াছিলেন, সেই স্মৃতিতে গরীব কেরাণীর স্ত্রীর চিকিৎসায় প্রচুর সাহায্য দিলেন।

বিচিত্রা—শ্রাবণ।

দু'জনার (গল্প)—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস্।

এই রচনাটীকে গল্প নাম না দিয়া, সামাজিক চিত্র বলিলেই সঙ্গত হইত। বক্তা অথবা নায়ক বিলাত-প্রবাসী বাঙ্গালী যুবক। ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া বলিল, আপনার "বন্ধুনী" টেলিফোনে আপনাকে ডাকছেন। "আঃ, জ্বালাতন করলে"—এই প্রকার মনের ভাব লইয়া যুবক গিয়া টেলিফোন ধরিলেন। না, সে "বন্ধুনী" নয়—যুবকেরই ঈপ্সিতা। "তাকে দেখবার জন্যে এত ব্যগ্র ছিলুম, সে যে কি বল্লে শোনবার ধৈর্য্য ছিল না। প্রতি প্রশ্নের উত্তরে একটা করে হাঁ বলে গেলুম। বল্লুম, হাঁ আজ বিকেলে তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে যাবো।"

সঙ্কেত স্থানে কুমারী রোজালির সহিত সাক্ষাৎ হইলে যুবক শুনিল, পাড়াগাঁয়ে week-end যাপন করিতে যাওয়া তাহার ইচ্ছা। কিন্তু ইহার জন্য যুবক প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। সঙ্গে না আছে রাত কাপড়, না একখানা ক্ষুর, না একটা চিরুণী বুরুষ। কিন্তু মরদকা বাত—যাইতেই হইল। পাড়াগাঁয়ে একটা farm houseএ রাত্রি বাসের ব্যবস্থা রোজালি করিয়া রাখিয়াছিল। এই চব্বিশ ঘণ্টার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত টুকুই লেখকের বর্ণনীয় বিষয়।

লেখক রোজালির চিত্রটি আঁকিয়াছেন ভাল। তার বাহিরটা মেয়ে-মর্দ্দা গোছের, কিন্তু ভিতরটায় কোমলতার অভাব নাই। নায়িকার প্রতি নায়কের প্রেমটুকুও তিনি বেশ সুকৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালী ধরণের উচ্ছ্বাসের আতিশয্য আদৌ নাই। "সকাল বেলা তার চিঠিও পাইনি, ফোনও শুনিনি।" "যাকে দেখবার জন্যে এত ব্যগ্র ছিলুম।" "ট্রেণে খালি কামরা দেখে উঠলুম। কখন্ একটী যুবক উঠে পড়েছে। অতএব মামুলী কথাবার্ত্তা।" "আজ সারা সকাল দুপুর কি ভেবেছি, জান? ভেবেছি, আজ যদি তোমায় না দেখি তবে বাঁচবো না। দুটি দিন দেখিনি, মনে হচ্ছিল যেন দুটী বছর।" উচ্ছ্বাসের আতিশয্য ত নাই-ই, বরং একটু কাটখোট্টা ভাব আছে। এই ফার্ম্ম হাউসে দু'জনার জন্য দুখানা ঘর যদি না পাওয়া যাইত, তাহা হইলে নায়ক কি করিতেন তাহা বলিতেছেন—"অগত্যা তোমাকেই গোলাঘরে শুতে পাঠিয়ে তোমার ঘর আমি দখল করতুম।" ভিক্টোরিয়া যুগের নায়ক অবশ্য বলিত, "ভাল ঘরখানি তোমায় দিয়ে, আমি গোলাঘরে গিয়ে

ইদানী বিলাতের সামাজিক জীবনের রঙ বদলাইয়া গিয়াছে। প্রেমিক প্রেমিকা দূরস্থানে গিয়া এরূপ ভাবে week-end যাপন করিলে, পূর্ব্বকালে তাহা অত্যন্ত scandalous ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন, কোর্টশিপের অবস্থায় সমস্ত পুরাতন conventionকে বিসর্জ্জন দিয়াও প্রেমিক প্রেমিকারা আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। কেহ কেহ অবশ্যই পারে। কিন্তু সকলেই কি পারে? আগুন লইয়া খেলা করিতে গিয়া সবাইকার কাপড়ই কি বাঁচে? আমাদের বুড়া মুনিঋষিদের "ঘৃতকুম্ভসমা নারী" "বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামঃ" ইত্যাদি নীতি অবলম্বনেই বিলাতের বুড়া বুড়ীরাও যুবক যুবতীর মেলা-মেশা বিষয়ে নানারূপ conventionএর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা

যে ভুল করেন নাই, তাহা ত আজকাল সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই দেখিতেছেন।

হাতিরাম—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বিএল। গল্পটি সাবেকী ধরণের। ধর্ম্মমূলক কাহিনী, ঠাকুর-দেবতার কথা, ভক্তি-বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত। হায়, এমন জিনিষও আধুনিক সাহিত্যে 'অচল-অধম' হইয়া গিয়াছে! কিন্তু সাহিত্যের এ অবস্থা গৌরবের নহে। একঘেয়ে প্রেমের কাহিনী, নারীর অধিকার, বিবাহ-প্রথার বর্ব্বরতা, একনিষ্ঠ প্রেমের সঙ্কীর্ণতা পড়িয়া পড়িয়া পাঠকগণ যথেষ্ট হায়রাণ হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সরস করিয়া লিখিতে পারিলে পুরাতন ধর্ম্মমূলক কাহিনীগুলি বিশেষ প্রীতিপদ হইবে বলিয়াই মনে হয়। আলোচ্য কাহিনীটি আমাদের সেই জন্যই ভাল লাগিয়াছে।

ছুটির দিনে—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন। গল্পাংশ অতি সাধারণ। মক্কেলহীন প্রৌঢ় উকিল, পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম। যাকে বলে 'ডানে আন্‌তে বাঁয়ে নেই' সেই রকমই অবস্থা। অথচ ঘরসংসার আছে, লোক-লৌকিকতা আছে। ছুটির দিন এ রকম উকিলের পক্ষে একেবারে মারাত্মক। এই রকম এক ছুটির দিনে উকিল বাবু ঘরে বসিয়া 'আকাশ পাতাল' ভাবিতেছেন, এমন সময় আসিল একজন ভদ্রলোক। প্রথমে আগন্তুককে উকিল বাবু চিনিতে পারেন নাই, পরে একটু ইঙ্গিত পাইয়াই বুঝিলেন তিনি আর কেহ ন'ন, উকিল বাবুর শ্বশুরবাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীর দুলালচন্দ্র সোম। দুলাল বাবুর সঙ্গে উকিল বাবুর স্ত্রী মায়ার বিবাহের কথা হইয়াছিল—দুলাল "মায়াকে ভালবাসিত—পাগল হইয়াছিল তাকে বিবাহ করিবার জন্য" এ কথা মায়াই কবুল করিয়াছে। দুলালের আর্থিক অবস্থা ও বিদ্যার ওজন ভাল ছিল না বলিয়া তার সঙ্গে বিবাহ হয় নাই—তার পর হইতে দুলাল এ পর্য্যন্ত অবিবাহিত, রেঙ্গুণে কণ্ট্রাক্টারী করিয়া অনেক টাকা জমাইয়াছে। তাই দুলাল এ কথা সেকথা বলিয়া একেবারে একখানি ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক মায়ার স্বামীকে লিখিয়া দিল। উকিল বাবু খুসী হইয়াই চেকখানি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মায়া আসিয়া বিপদ ঘটাইল। সে দুলালকে 'দাদা বলিয়া সম্বোধন করিয়া প্রণাম করিল—এই দাদা হওয়াটা কিন্তু দুলালের পছন্দ হইল না। মায়া চেক লইল না। আর কিছু না হউক নারীর দৃপ্ত তেজের চিত্রটি ফুটিয়াছে ভাল। নারীর মনস্তত্ত্বটিও বেশ ফুটিয়াছে। মায়ার পক্ষে এই তেজস্বিতা স্বাভাবিক ও সুন্দর হইত, ইহাতে হয়ত কিছু ভাণ না থাকিতেও পারিত, কিন্তু লেখকের পক্ষে সেটি মনঃপূত হইল না—তাই উপসংহারে লিখিলেন—"চেকখানা দিতে আসিয়া দুলাল যতটা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল, চেকটা গ্রহণ না করিয়া মায়া যেন তার চেয়ে অনেক বেশী ধরা দিয়াছে।" এটুকুর জন্য কি পাঠকের উপর নির্ভর করিলে চলিত না?

কবিতা

ভারতবর্ষ—ভাদ্র।

সখা—শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অত্যন্ত সাধারণ মামুলী রচনা। সখ্য-রসের প্রবাহে ছন্দ, মিল সবই তলাইয়া গিয়াছে। ছোট রচনা, তবুও অসহ্য। রচনাটি সম্পাদক মহাশয়ের কবিতা নির্ব্বাচন-বৈরাগ্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অজানা—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল। সত্যকে জানিবার জন্য কবির আকুল প্রার্থনা। সত্য 'অজানা' বলিয়াই সত্য প্রকাশের প্রার্থনা-সম্বলিত রচনাকেও যে এই রকম দুর্ব্বোধ্য হইতে হইবে তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

> কি ভঙ্গিতে বিকাশের সূচনায় অজানার ছুটি,
> উল্লাসের কি আশ্বাসে ত্রাসে-ভরা উৎসবেতে জুটি!
>
> * *
>
> আকাঙ্ক্ষার রক্ত বর্ণে রঞ্জি ভাষা—প্রাণের নিশান;
> এই ধ্বজা বিশ্ব মাঝে তুমি নিজে উড়াও ঈশান।

অজানাকে জানাইবার এই কি সমীচীন উপায়?

'আমার দেশ' (রুশ দেশের জাতীয় সঙ্গীত)—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত। রুশ-দেশের জননীরা কি ছেলে ঘুম পাড়াইবার সময় এই 'জাতীয়-সঙ্গীত' গাহিয়া থাকেন? জাতীয় সঙ্গীত বলিতে দেশের স্বাধীনতা-বাঞ্জক উদ্দীপনাময় সঙ্গীতই সাধারণে বুঝিয়া থাকে; এটি নিশ্চয়ই সে ধরণের জাতীয় সঙ্গীত নয়। এ গান আমাদের পল্লীর 'মেঠো' সুরের পৌষ পার্ব্বণ গানেরই মত। রচনা বেশ সরল। গ্রাম্য-চিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে।

সুন্দর—শ্রীযুক্ত রমেন্দু দত্ত। প্রাণহীন আড়ষ্ট রচনা। না ভাবিয়া চিন্তিয়া গোটাকতক লাগসই কথার যোজনা করিয়া গেলে সুখ-পাঠ্য রচনা হইতে পারে, কিন্তু প্রাণ-স্পর্শী কবিতা হয় না।

দরদী—শ্রীযুক্ত সুকুমার সরকার। কবি বলিতেছেন—যেমন ফুলের দরদ জানে ভ্রমর, উষার দরদ জানে পাখী, তেমনই মানসী-প্রেয়সীর দরদ তার প্রিয়তমই জানে। রচনাটি ক্ষীণ-প্রাণ হইলেও একেবারে প্রাণ-হীন নয়। "মোর চোখে তবু কভু ফাঁকি দিতে পারো"—এই ছত্রটি কেমন বেখাপ্পা লাগিতেছে।

বিচিত্রা—শ্রাবণ।

আহ্বান—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটি খেলার আহ্বান।

'ঘুমপাড়ানী গান' ও 'অন্তিমে'—কুমারী মমতা মিত্র। প্রথমটির রচয়িত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, দ্বিতীয়টি ইংরেজ কবি রসেটির রচনা। দুইটিই অনুবাদ-যোগ্য কবিতা এবং দুইটির অনুবাদই ললিত-মধুর হইয়াছে।

তৃষাতুর—শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু, বি-এ। সুন্দর রচনা। ভাবে, ভাষায় ছন্দে কবিতাটি পরিপাটী। দয়িতার বিরহে কবির এই মিলন-তৃষায় কোন প্রকার আবিলতা নাই এবং সেই জন্যই তাঁহার তৃষাতুর হৃদয় লেখনীমুখে যে রস-সঞ্চার করিয়াছে তাহাতে কাব্য-রস-পিপাসুর তৃষা মিটিয়াছে।

আকুতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল। রসবস্তু

আছে, কিন্তু সেটি কঠিন ত্বকের আবরণে ঘেরা। প্রকৃত রস-পিপাসু পাঠক অবশ্য এই আবরণ ভেদ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, কিন্তু সাধারণ পাঠকের রস-পিপাসার উদ্রেক করিবার পক্ষে রচনাটির ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গী যথেষ্ট সরল হয় নাই।

"মুক্তি অন্বেষণ"—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী। (১) বিশ্বযোগ, (২) ত্যাগ-যোগে ও (৩) আত্ম-সৃষ্টি এই তিন উপায়ে মুক্তি অন্বেষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথম প্রণালীতে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে যোগ রাখিয়া কবি মুক্তি অন্বেষণ করিলেন, ফল হইল :—

"এ ত মোরে যুক্ত করা, এ ত মুক্তি নয়।"

দ্বিতীয় পন্থা ত্যাগের পন্থা—তাহাও পরীক্ষায় টিঁকিল না, ত্যাগের ফল এই—"এ ত মোরে শূন্য করা, এ ত মুক্তি নয়।" তৃতীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—আত্ম-সৃষ্টি। এই পথ ধরিয়া গেলেই কবির মতে 'মহামুক্তি' মিলিবে। মুক্তি-অন্বেষণ একটা জটিল দার্শনিক ব্যাপার। এই মুক্তি-সমস্যা যুগে যুগে দার্শনিকের মনকে আলোড়িত করিয়া নানা গোলো-যোগের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের কবি যে কি খেয়ালবশে এই জটিলতত্ত্বে মনোনিবেশ করিলেন বুঝা গেল না। কবিতায় দর্শনের স্থান নাই এমন কথা আমরা বলি না, তবে দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া নাড়া-চাড়া করিবার অধিকার কেবল ছন্দ মিলাইতে শিখিলেই হয় না। সাধনা চাই, অনুভূতি চাই, একাগ্রতা চাই—নচেৎ দুটো বাঁধি গৎ শুনিয়া সেগুলোকে কবিতার আকারে প্রকাশ করিলে কেবল জ্যাঠামোই প্রকাশ পায়। ছেলে ধরিতে না ধরিতে কেউটে ধরার সাধ একেই বলে। দার্শনিকের আব-হাওয়ায় থাকিলেই কি দার্শনিক কবিতা লেখার অধিকার জন্মে ?

যৌবন-শেষ—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। একটু সামান্য অনুভূতিকে ইনাইয়া বিনাইয়া ফেনাইয়া বড় করিয়া তোলা হইয়াছে। কবিতাটি পড়িয়া সাবান-জলের ক্ষণভঙ্গুর বুদ্বুদের কথাই মনে হয়। রচনাটি আর একটু ছোট হইলে, আর কিছু না হউক 'দক্ষনা'র সঙ্গে 'বাঁচ্‌বনা'র মিলের হাত হইতে কবি, পাঠক ও সমালোচক তিন জনেই বাঁচিতেন।

কাজরী মেয়ে—শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রচনাটি খাড়া করিতে কবিকে কিছু মাত্র ভাবিতে হয় নাই। অতি সাধারণ কতক গুলি ভাব ও শব্দ পর পর সাজাইয়া শ্রাবণ মাসের মাসিকে দিতে হইবে, এই কথাটি বেশ করিয়া মনে রাখিয়া লাইন কটি রচিত হইয়াছে। নাম-নির্ব্বাচনের সময় 'কাজরী মেয়ে'ই মনে আসিল, কাজেই রচনার শীর্ষদেশে ঐ নামটি জুড়িয়া বসিল।

প্রবাসী—ভাদ্র।

শিশুর হাসি—শ্রীযুক্ত জীবনময় রায়। শিশুর হাসি সুন্দর বটে কিন্তু সেই সঙ্গে সহজ ও সরল এবং অকপটতা ও সরলতা যে শিশুর হাসিকে সুন্দর করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কবিতাটির সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু সরলতার অভাবে সে সৌন্দর্য্য অনেকটা ঢাকা পড়িয়াছে।

না ফুরাতে—শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু। প্রাণহীন আড়ষ্ট কৃত্রিম রচনা। সামান্য কয়েক ছত্রের কবিতা, তার মধ্যে আবার মিলগুলি সব যায়গায় ঠিক হয় নাই।

অন্ধ—শ্রীমতী বিভাবতী সেন। একেবারে হেঁয়ালী—একটু নমুনা দিলাম—

আলোতে কালোতে মিশামিশি হ'য়ে
কালো হ'য়ে গেছে আলো
কালোর বুকেতে আলো ডুবে গেছে
আলোর বুকেতে কালো।
আলোর পিছনে কালোর মুরতি—ইত্যাদি

এই লাইন গুলির তুলনা এই লাইনগুলিই, অন্যত্র তুলনা পাওয়া একেবারে অসম্ভব না হইলেও দুর্ঘট।

মাসিক বসুমতী—শ্রাবণ।

তোমারে—শ্রীসুনীন্দ্রনাথ ঘোষ। বেশ রস-ঘন গম্ভীর রচনা, তবে স্থানে স্থানে অনাবশ্যক শব্দাড়ম্বরে রচনাটি দুর্ভেদ্য হইয়াছে।

বর্ষা-রাতে—শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বর্ষা-রাতে 'মাদল' না বাজিলে মানায় না, প্রকৃতির সঙ্গীত-সভায় তাই বর্ষায় মৃদঙ্গের গুরু-গম্ভীর নির্ঘোষই শুনা যায়। আলোচ্য কবিতাটিতে আমাদের কবি কিন্তু বর্ষা-রাতে 'বরুণ দেবের নাচ-মহলে' প্রবেশ করিয়া বাঁয়া-তবলার সঙ্গতে ঠুংরী-তালে নর্ত্তকীর শ্রীচরণের "ঘুঙুরের ঝুমুর ঝুমুর" রব শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। পাঠক কিন্তু বর্ষা-রাতে এমন চুটকী সুরে হতাশই হইবেন।

নারীর অধিকার—শ্রীমতী সরোজবাসিনী বসু। আজ-কালকার ভীষণ "নারী-জাগরণের" দিনে নারীর রচিত 'নারীর অধিকার' পড়িবার আগে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। কবিতাটি পড়িয়া কিন্তু বড়ই তৃপ্তি পাইলাম। ভাবের উৎকর্ষে, প্রকাশ-ভঙ্গীর সারল্যে, রচনার লালিত্যে ও আন্তরিকতায় রচনাটি উপাদেয় হইয়াছে। নারীর প্রকৃত মহত্ব ও জন্মগত অধিকার এই রকম অকুতোভয়ে প্রকাশ করিবার সৎ-সাহস নারীর পক্ষেই সুশোভন হইয়াছে। দু'একটি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি—

স্বাধীনতা নামে যদি স্বাতন্ত্র্য তাহার
হয় লুপ্ত, ক্ষুণ্ণ হ'বে তার অধিকার।

*   *

পুরুষের সাথে যদি সম অধিকার
চায় নারী, হারাইবে প্রকৃতি তাহার।

অভিশাপ—শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মণ্ডল বি, এ। কবিতা মাসে মাসে লিখিতেই হইবে এমন কথা কবিকে কি কেহ মাথার দিব্য দিয়া

তিন সত্য করাইয়া লইয়াছে? মিল, অর্থ, ভাব, রস, ভাষা, প্রকাশ-ভঙ্গী—কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা বলিব? সব গুলিই যে অভিশাপ-গ্রস্ত! দুই এক লাইন নমুনা স্বরূপ দিলাম :—

সাধনায় আমি পেয়েছিনু সখি সৌরভ-লাভে বর,—
রূপ—তাও যেন কিছু কিছু মোরে দেছিল প্রণয় দেবতা;

* * *

দেবতা আমারে দিয়েছিল বর, বিনিময়ে তারে ডাকি—
হোক্ সে দেবতা—যাবার সময় দিয়ে যাই অভিশাপ,

এ অভিশাপে দেবতার বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

পাপিয়া—শ্রীযুক্ত অন্নদামোহন বাগচী। কবি এখন কোকিল, পাপিয়া ছাড়িয়া কিছুদিন দাঁড়কাক, হাঁড়িচাচা প্রভৃতির চর্চ্চা করুন। ইহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে না, অথচ কবিরও হাত পাকিয়া আসিবে।

হিন্দুর কুল-লক্ষ্মী—শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য। ছন্দ-মিল অকূল সিন্ধুজলে ভাসাইয়া কাব্য-পক্ষীর ডানা ভাঙ্গিয়া "হিন্দুর কুল-লক্ষ্মীর" বর্ণনা না করিলে কি কবিবরের হিন্দুয়ানীর ঘাটতি পড়িত?

বর্ষার ব্যাথা—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। গোটাকতক মামুলী মিল মনে আনিয়া জোড়াতাড়া দিয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছে। বর্ষার ব্যাথায় কবির হাত-পা ফুলিয়া কন্ কন্ করিতে পারে কিন্তু বেদনায় হৃদয় টন টন করে নাই।

বর্ষা এল বিপুল বেগে—শ্রীযুক্ত বিমল মিত্র। এবার বাঙ্গলা দেশে বর্ষা ভাল হয় নাই তার কারণ আর কিছু নয় বসুমতীর পৃষ্ঠে "বর্ষা বিপুল বেগে" নামিয়াছে বলিয়া। যা হোক আলোচ্য কবিতাটী বসুমতীর অন্যান্য বর্ষা ঘটিত কবিতার চেয়ে ঢের ভাল। তবে এর বেগটা এতই বিপুল যে অনেক স্থানেই ছন্দ ও মিল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। "ডাকে-লাগে" "মেঘে-বেগে" "বুকে-শুকে"—এ রকম মিল অচল।

বাদল বঁধু—শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার রায় চৌধুরী। এ বর্ষায় "বাদল বধুর" ঘরের বাহির না হওয়াই উচিত ছিল। "বর্ষার ব্যথায়" কবি রাধাচরণ লিখিলেন "মেঘের কালিদহে" আর "বাদল বঁধু" কবিতায় কবি অমূল্য-কুমার লিখিলেন "দুধের কালিদহে"। এখন এই কালীয়দহ হইতে যদি কালীয় নাগ মাথা নাড়া দেয় তবে তাহাকে দমন করিবার জন্য বাঙলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ কোথায়?

তীর্থ—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়। এ যে কি ভীষণ তীর্থ, এ তীর্থের পথ যে কি রকম দুর্গম ও শ্বাপদ-সঙ্কুল তার নমুনা দেখুন—

কাশীর কৈবল্য-দাতা, কাশীশ করুণা,
বৃন্দাবনে রাধা-শ্যাম-লীলা-রাগ-রেখা,
নীলাচলে জগন্নাথ-জলজ্যোতিঃ-কণা,
পুত-ভাবময়ী করে নর-ভাগ্য-লেখা।

ত্রিকোটী কুলোদ্ধার, অক্ষয় স্বর্গবাস প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিষের লোভ পাইলেও কেহ এ তীর্থের পথ মাড়াইবে না।

বিজ্ঞান

মাসিক বসুমতী—শ্রাবণ।

প্রবন্ধের নাম খাদির-শিল্প। লেখক শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত। লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে জলপাইগুড়ি জেলা ও অপর কতিপয় স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, যে সমস্ত স্থানে অপব্যয় মূলক খদির-প্রস্তুত-প্রণালী রহিত করিবার জন্য কারখানা খোলা সরকারের অন্যতম কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সরকারী ও বে-সরকারী জঙ্গলে খদির প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতে প্রস্তুত খদিরের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে সরকারী ও বে-সরকারী খদিরের পরিমাণ বুঝিতে পারা যায় না। এই হিসাব জানা থাকিলে সাধারণের পক্ষে নিকুঞ্জ বাবুর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত।

বিচিত্রা শ্রাবণ।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারকার জন্ম'—একটী বিশেষত্ব বিহীন প্রবন্ধ। লেখক মহাশয় উপসংহারে বলিয়াছেন যে বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভ কোন সময় হইতে, ব্রহ্মার সৃজন দিবসের সে ঊষা কতকাল আগে মহা কালসমুদ্রে মিলাইয়া গিয়াছে, বিজ্ঞান সে বিষয়ে কোনো আলোকপাত করিতে পারে না।' লেখক মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মা যে কোন্ তারিখে সৃজন আরম্ভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে বিজ্ঞান চিরকালই মূক আছে ও থাকিবে।

দর্শন

ভারতবর্ষ—ভাদ্র।

ষড়্‌জ গীতা।—রায় শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর বি-এল লিখিত। মহাভারতে, শান্তিপর্ব্বের আপদ্ধর্ম্ম অধ্যায়ে এই গীতা সন্নিবেশিত আছে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, এই গীতায় তাহারই একটা আলোচনা করা হইয়াছে। বিদুর ও পাণ্ডবগণের চারি ভ্রাতা ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব মত ব্যক্ত করার পর যুধিষ্ঠির আপন সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। বিদুর ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু ভীমসেন কামকেই সকলের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কামেই ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়েই প্রতিষ্ঠিত। কেন না কামনা না থাকিলে কোনটাই সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনই সকলের কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, কিন্তু এই অর্থোপার্জ্জন ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে করাই কর্ত্তব্য; ধর্ম্মকে প্রধান করিয়া অর্থচিন্তা আবশ্যক। অর্জ্জুনের মতে ধর্ম্ম করাই অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে, যে অর্থ প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী তাহাই কর্ম্ম দ্বারা পাওয়া যায়, অপ্রাপ্য অর্থ পাওয়া যায় না। বিধাতা যে বিষয়ে যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য—এই ভাবে কর্ম্ম করিয়া

যাওয়াই উচিত। রাগদ্বেষাদিযুক্ত ব্যক্তির মোক্ষলাভ হয় না। মমত্বজ্ঞান রহিত পণ্ডিতগণই নির্ব্বাণের অধিকারী।

লেখক গীতার বশবর্ত্তী হইয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, কাম ক্রোধাদি জয় করিয়া, যথাশাস্ত্র কর্ত্তব্য পালন করিলেই মানুষ কৃতকর্ম্ম হইতে পারে। বর্ত্তমানে আমরা ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিতেছি, এই জন্যই আমরা অবনতিগ্রস্ত হইতেছি।

নিরীশ্বরবাদ ও ধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য, এম এ-লিখিত। লেখক সাংখ্য ও শঙ্কর প্রণীত বেদান্ত হইতে দেখাইয়াছেন যে পরমেশ্বরের প্রতি উপাসনা ও ভক্তি ব্যতীতও একটা জ্ঞান ও কর্ম্মের আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও জীবনের একটী মহান আদর্শ পূজিত হইয়া থাকে। সাধুজীবন প্রতিষ্ঠিত করা এবং পরহিত সাধনে আত্মনিয়োগ করাই মহান্ আদর্শ। অহিংসা, মৈত্রী প্রভৃতির সাধন দ্বারা মানবের কল্যাণ সাধনেই নির্ব্বাণ পাওয়া যায়। অবিদ্যা ও বাসনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভই তাহার প্রকৃষ্ট উপায়। জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের স্থান ইহাতে দেওয়া হয় নাই। প্লেটোর মতেও, মানবহৃদয়ের জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের যেটী আদর্শ তাহাই ধর্ম্ম। Kantও ঈশ্বরাস্তিত্ব বিষয়ক প্রমাণের খণ্ডন করিয়া ফল-নিরপেক্ষ কর্ম্মজীবনকেই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। —এই প্রকারে লেখক বলিতে চাহিয়াছেন যে, নিরীশ্বরবাদ ধর্ম্মজীবনের পরিপন্থী নহে। ঈশ্বর-ভক্তি, মানব মনের আর দশটা আদর্শের মধ্যে একটা আদর্শ মাত্র ;—ইহাই ধর্ম্মের সমস্ত আদর্শকে অধিকার করিতে পারে না। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক জগতের আদান প্রদান দ্বারা উদ্ভাসিত মানবজীবনের আদর্শগুলির সম্যক্ অনুশীলনই ধর্ম্ম শব্দের বাস্তবিকই অর্থ ; ইহা দ্বারা কেবল ভক্তি পূর্ব্বক এক অলৌকিক বস্তুর উপাসনা মাত্র বুঝিতে হইবে না। বরং এরূপ সঙ্কীর্ণ আদর্শে মানবের অকল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে।

প্রামাণ্যবাদ—শ্রীজ্ঞানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, এম-এ লিখিত।

এই বারে স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তি দিয়া, এই প্রবন্ধের শেষ করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রবন্ধটী ভাষার দোষে, বলিবার প্রণালীর দোষে জটিল করিয়া তোলা হইয়াছে। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিলে প্রবন্ধের মূল্য বাড়িতে পারিত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পূজার অবকাশ।—পূজা সম্মুখে। চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। রেল কোম্পানী বড় শ্রেণীতে এক ভাড়া ও ছোট শ্রেণীতে দেড়া, সওয়া ভাড়ায় দিল্লী লাহোর কাশী প্রয়াগ রাঁচি দারজিলিং যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখন হইতেই কে কোথায় যাইবেন, তাহার জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। হাইকোর্টের পূজার ছুটী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ; জজসাহেবরা অনেকেই 'হোমে' পাড়ি দিয়াছেন ; কেহ কেহ কাশ্মীর, নৈনিতালে যাওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। বাঙ্গালী জজদিগের মধ্যে কাহারও 'হোমে' যাওয়ার সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। এখন কাহারও সহিত দেখা হইলে, ঐ একই প্রশ্ন—"এবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?" উত্তরে কেহ বলেন,—পুরী, কেহ বলেন—রাঁচী, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু, কারও মুখেই শুনিনা—"এবার দেশে যাব।" অথচ গ্রাম-পল্লীর দুরবস্থার প্রতিকারের জন্ত 'অরগানিসেজন' ও বক্তৃতার আর কামাই নেই।

কন্‌গ্রেসের সভাপতি। আগামী ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময় লাহোরে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হইবে। উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু গোল লাগিয়াছে সভাপতি লইয়া। অধিকাংশ প্রাদেশিক কন্‌গ্রেস কমিটীর ভোটে মহাত্মা গান্ধী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু মহাত্মাজি এ পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কন্‌গ্রেসের অনেক মতামতের সহিত তাঁহার মিল নাই। এ অবস্থায় তাঁহাকে সভাপতিপদে বৃত করিলে তাঁহাকেও বিপন্ন হইতে হইবে, কন্‌গ্রেসের নেতৃবর্গেরও নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। সেই কারণে তিনি সভাপতি পদ গ্রহণ করিবেন না। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরুকে সভাপতি করা হউক। কিন্তু, কন্‌গ্রেসের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তি-বিশেষের প্রস্তাব অনুসারে তাহাকেও সভাপতি করা যায় না, বিভিন্ন প্রদেশের কমিটী যে সকল নাম প্রস্তাব করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি বেশী 'ভোট' পাইবেন তিনিই সভাপতি হইবেন ; সুতরাং মহাত্মাজির প্রস্তাব

গৃহীত হইবে না। এদিকে বড় বড় নেতারা মহাত্মাজির মত ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এখন পর্য্যন্তও মহাত্মাজি তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই, সভাপতি যে কে হইবেন তাহাও স্থির হয় নাই।

ঢাকায় হিন্দুসভা ও ব্রাহ্মণ।— এবার ঢাকায় হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিগত বৎসরে সুরাটের মহাসভায় বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি করা হইয়াছিল; তাই এবার সেই সৌজন্যের জন্য এ প্রদেশবাসী শ্রীযুক্ত কেলকার মহোদয়কে ঢাকার অধিবেশনে সভাপতি করিয়াছিলেন। সভায় বহুলোক সমাগম হইয়াছিল; অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কয়েক গণ্ডা প্রস্তাবও পাশ হইয়াছে। আবার কি চাই? সভায় যে সমস্ত প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে গুটী দুইয়ের কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। বিগত বৎসরে কলিকাতায় যে হিন্দুসভা হয়, তাহার সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়। সেই সভায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামক একজন ভদ্রলোক এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে চান যে, হিন্দুমাত্রকেই 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত করিতে হইবে। সভাপতি মহাশয় এ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে আপত্তি প্রকাশ করেন; এবং যখন তাঁহার আপত্তি গৃহীত হইল না, তখন তিনি সভাপতির আসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাহার পর অন্য একজনকে সভাপতি করিয়া ঐ প্রস্তাব পাশ করা হয়। এবার ঢাকায় সেরূপ কোন গোলযোগ হয় নাই। এবারও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশের ভোটে সমস্ত হিন্দু 'ব্রাহ্মণ' হইয়া গিয়াছেন। যখন 'ব্রাহ্মণ' হইয়াছেন, তখন নির্ব্বিচারে সকলেই উপবীত গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলেই উপবীতের গোল আর থাকিবে না। তাহার পর সভাপতি মহাশয় ঢাকা হইতে গৃহে ফিরিবার পথে কলিকাতায় একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়া গিয়াছেন যে, যাহারা হিন্দুস্থানে বাস করে, তাহারাই হিন্দু। সুতরাং আরও একটা গোল মিটিল। মনে আছে, কলিকাতায় যখন হিন্দু-মুসলমানে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়, সেই সময় কে একজন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এই হিন্দু-মুসলমানের গোলমালের প্রতীকারের পন্থা কি? রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা ভরে বলিয়াছিলেন, সব হিন্দু যদি মুসলমান হয়, অথবা সব মুসলমান যদি হিন্দু হয়, তাহা হইলেই এ গোল মিটিতে পারে। কবিবরের এই পরামর্শ দেখিতেছি কিয়ৎ পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না, কাহার নামে জয়ধ্বনি করিব।

হিন্দুসভা ও বিবাহ আইন।— ঢাকার হিন্দু-মহাসভায় গৃহীত আর একটী প্রস্তাবের বিবরণ দিতেছি। পাঠকগণ অবগত আছেন, আজ দুইতিন বৎসর ধরিয়া ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদে একখানি বিল ঘোরাফেরা করিতেছে। বিলখানির বাঙ্গালা নাম বোধ হয় এই দিলেই ঠিক হইবে যে—উহা হিন্দুর বিবাহ নিয়ামক আইন। এই আইনের পাণ্ডুলিপি রাষ্ট্র-পরিষদে উপস্থাপিত করিয়াছেন রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হরবিলাস সরদা মহাশয়। হিন্দু ছেলেমেয়ের বিবাহের বয়স বাঁধিয়া দেওয়াই এই আইনের উদ্দেশ্য; সুতরাং যাঁরা আইনের স্বপক্ষে তাঁহারা কেহ বলিতেছেন বিবাহে মেয়ের বয়স ১৪ ও ছেলের ছেলের বয়স ২০, কেহ বলিতেছেন মেয়ের বয়স ১৬ ও ছেলের বয়স ২৪ সর্ব্বনিম্ন করা হউক এই রকম নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, মেয়ের বিবাহের বয়স ১৮ হওয়া উচিত। এ মতভেদেরও না হয় একটা মাঝামাঝি রফা হইতে পারে। কিন্তু, আর একদল বলিতেছেন, এ সকল আইন হইলে হিন্দুত্ব একেবারে লোপ হইবে, আর জাতি থাকিবে না, ব্যভিচারে হিন্দু-সমাজ মহা দূষিত হইয়া যাইবে, শাস্ত্রের বিধানের ঘোর অমর্য্যাদা হইবে, অতএব এমন আইন হওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। ঢাকার হিন্দুসভাও এই আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন; অধিকাংশের ভোটের জোরে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ও-দিকে এই বিল কিন্তু সিলেক্ট কমিটির কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া পরিষদে

উঠিয়াছে এবং কয়দিন ধরিয়া বিভিন্নদলের বক্তৃতা আলোচনার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের প্রস্তাবে আলোচনা কয়েক দিনের জন্য বন্ধ আছে। কয়েক দিন পরেই আবার বক্তৃতা আরম্ভ হইবে। সরকার পক্ষ হইতে মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, সরকার এই আইনের স্বপক্ষেই মত দিবেন। এক রসিক বন্ধু বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট যদি আইন করিয়া ছেলেমেয়েদের বিবাহই একেবারে বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকেরা দুই হাত তুলিয়া গবর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ করিবে এবং এখন যে মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা একেবারেই থাকিবে না।

"কলেজ" ধর্ম্মঘট।—বিগত সংখ্যা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে আমরা 'কল'ওয়ালাদের ধর্ম্মঘটের আলোচনা করিয়াছিলাম। সে ধর্ম্মঘট মিটিয়াও মেটে নাই; একটা রফা নিষ্পত্তির পর আবার গোল মাল বাধিয়া 'কল'ওয়ালাদের ধর্ম্মঘট চলিতেছেই। তাহার পর আর এক ধর্ম্মঘটের ধুম পড়িয়াছে, এবার 'কল'ওয়ালা নহে, 'কলেজ'ওয়ালাদের ধর্ম্মঘট; আর সে ধর্ম্মঘটও যেমন তেমন কলেজে নহে,—কালকাতার প্রধান দুই কলেজে—প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাঙ্গালী ছেলেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। এই দুই ধর্ম্মঘটের কারণ সংক্ষেপে এই:—সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে রেক্টরকে অভিনন্দিত করিবার জন্য এক সভা হয়। সেই সভায় যে অভিনন্দন পঠিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহাতে স্বদেশপ্রীতি সম্বন্ধে কি একটা কথায় কলেজের পাদ্রীরা আপত্তি করেন, বাঙ্গালী ছেলেরা সে কথাটা তুলিয়া দিতে অস্বীকার করেন। এই উপলক্ষে বাঙ্গালী ছেলেদের সঙ্গে সাহেব ছেলেদের হাঙ্গামা হয় এবং তাহাতে শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকেরাও নাকি প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। এই লইয়া বিবাদ। ছেলেরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছেন, অনেকে অন্য কলেজে চলিয়া গিয়াছেন। মিটমাটের চেষ্টা সমস্তই বিফল হইয়াছে, ধর্ম্মঘট চলিতেছে।

দ্বিতীয় ধর্ম্মঘট প্রেসিডেন্সি কলেজে।—এটার আরম্ভ ইডেন হিন্দু হষ্টেল হইতে। এ হষ্টেলে একটা উপলক্ষে কতকগুলি ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করেন বলিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ব্যারো মহাশয় হষ্টেলের অনেকগুলি ছাত্রকে মোটা রকম জরিমানা করেন এবং যেদিন এই জরিমানার আদেশ দেন সেই দিনই ছেলেরা উহা দিতে অস্বীকার করেন। তখন প্রিন্সিপাল মহাশয় তাহাদিগকে অবিলম্বে হষ্টেল ত্যাগ করিতে বলেন। ছেলেরা চুপ করিয়া থাকে। তখন পুলিশ ডাকা হয়। ইতিমধ্যে স্যর নীলরতন, বিধান রায় ও শ্যামাপ্রসাদ বাবু উপস্থিত হইয়া মিটমাটের চেষ্টা করেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় ডাক্তার বিধান রায় ছাত্রদিগকে হষ্টেল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া স্থানান্তরে রাখেন। পরে প্রিন্সিপালের বিচারে অধিকাংশ ছাত্র ক্ষমা পায়; কিন্তু তেরটী ছাত্রের অপরাধ নাকি এতই গুরুতর যে, তাহাদিগকে প্রেসিডেন্সি কলেজ সুতরাং হিন্দু হষ্টেল হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই কলেজের কর্ত্তারা স্থির করেন। এই তের জন ছাত্রের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের অধিকাংশ ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়াছে। মধ্যে একদিনের জন্য কলিকাতার অন্যান্য কলেজের ছাত্রও এই উপলক্ষে সহানুভূতিসূচক ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। তাহাদের সভা ত প্রতিদিনই হইতেছে। এই সব কলেজওয়ালাদের ধর্ম্মঘটের জন্য কোন্ পক্ষ দায়ী, সে বিচার বা সে আলোচনা আমরা করিব না; আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, এ প্রকার অশান্তি ছাত্র ও শিক্ষক উভয় পক্ষেরই অকল্যাণকর। ইহাতে ছাত্র ও শিক্ষকের পবিত্র সম্বন্ধ একেবারে সমূলে উৎপাটিত হইবে; এবং তাহা যে দেশের পক্ষে কি শোচনীয় ব্যাপার, তাহা আর বলিতে হইবে না। উভয় পক্ষই যদি মাথা গরম না করিয়া সংযত ভাবে ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আর শিক্ষায়তনের এ দৃশ্য দেখিতে হয় না।

যোগিরাজ শ্রীশ্রী৺ শ্যামাচরণ লাহিড়ী

চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মহাষ্টমীর দিন যে মহাপুরুষ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাঠক পাঠিকার গোচরীভূত করিতেছি।

যাঁহাদের চরণস্পর্শে ধরণী পবিত্র হয় এইরূপ মহানুভব মহাপুরুষ অনেক গুলিই গত শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতাকাশে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ফুটিয়া উঠিয়া ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের পরিচয় ও তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যোগিরাজ ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ীর নামও কম প্রসিদ্ধ নহে। পার্থিবতা-সর্ব্বস্ব নাস্তিক-বহুল মানব মণ্ডলীর মধ্যে কিরূপে এই সত্যব্রত, নিত্যযোগমগ্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হইল তাহা বাস্তবিকই এক বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

প্রায় একশত ছয় বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে শ্যামাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে যোগাভ্যাসের অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। বাল্য সঙ্গীদের সঙ্গে বৃথা আলাপ ও খেলায় সময়ক্ষেপ না করিয়া, অবসর পাইলেই তিনি নিভৃতে পদ্মাসন করিয়া স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্যের লক্ষণ সমূহ বিশেষ রূপেই লোক চিত্তকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিত। সত্য ব্যবহার ও সত্য কথনে তিনি বাল্যকাল হইতেই অভ্যস্ত এবং ইহাই তাঁহার ভবিষ্য জীবনকে অনন্য সাধারণ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যাভ্যাসের পর আনুমানিক তেইশ বৎসর বয়সে তিনি গাজিপুরে পূর্ত্ত বিভাগে চাকরী আরম্ভ করেন। চাকরী করার ৮।১০ বৎসর পরে তিনি একটি বিশেষ কাযে রাণীখেতে যাইবার জন্য সরকারের আদেশ প্রাপ্ত হন। এই হিমালয়স্থ রাণীখেত উপত্যকার সমতল ক্ষেত্রের উপরে তাঁহার সদ্‌গুরুর দর্শন লাভ হয় ও এই স্থানেই তিনি দীক্ষিত হন্।

হিমালয়ের সুচারু দৃশ্যাবলি ও নিভৃত স্থান গুলি সাধনার বড় অনুকূল স্থান এবং এই সাধন-জীবনের
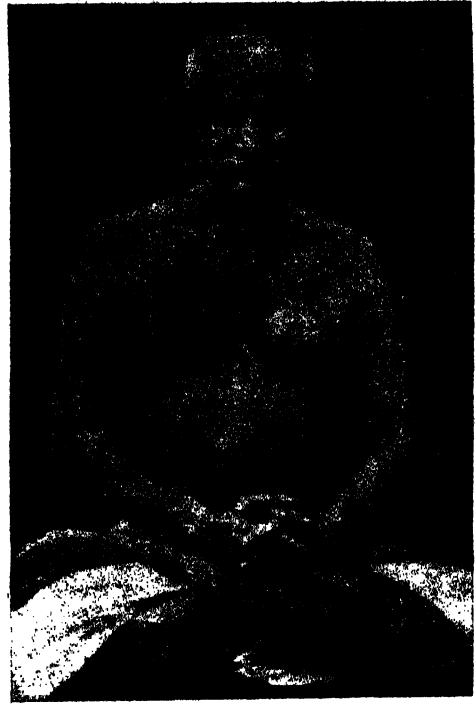
স্বর্গীয় শ্যামাচরণ লাহিড়ী

প্রয়োজনীয় তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। আমরা শুনিয়াছি শ্যামাচরণেরও সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে আর, ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গুরুর আদেশে তাঁহাকে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া আসিতে হয়।

শ্যামাচরণ বাল্যকাল হইতেই পিতা ও পরিজনবর্গের সহিত কাশীতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বিদ্যাধ্যয়নাদি সমস্তই কাশীতে সম্পন্ন হয়। এই কাশীক্ষেত্রেই তিনি এই পবিত্র যোগ ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি একদিকে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী হইতে সর্ব্ব প্রকার উচ্চ নীচ সাধন শ্রেণীর মধ্যেই এই শিক্ষার প্রচার করেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য অনেকে তীব্র প্রতিবাদও করিয়াছিল, কিন্তু যাহাতে মানবের চিত্ত ঈশ্বরমুখী হয়, মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করিয়া মানব তাহার

শাসন কিছুতেই তাঁহাকে এই কল্যাণকার্য্য হইতে বিমুখ করিয়া রাখিতে পারে নাই।

বোবার শত্রু বেশীদিন থাকে না। তিনি বড় স্বল্পভাষী ছিলেন, এবং কাযের কথা ছাড়া বাজে কথা বলিতে জানিতেন না। তা ছাড়া তাঁর সুতীক্ষ্ণ যুক্তিজাল ও সাধনার অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখিয়া বিদ্বান ও সজ্জনগন সহজেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। এত অল্প কথায় জটিল প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া কূট তার্কিকেরাও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইত।

দীক্ষাকালে তিনি জানাইয়া দিতেন যে বংশগুরু বা গুরুমন্ত্র বা কুলগুরু ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া দিবার তিনি আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং দেখা যায় যে কোনরূপ সম্প্রদায় গঠন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। শুদ্ধ লোককে প্রকৃত পথের একটু সন্ধান বলিয়া দেওয়াই তাঁহার শিক্ষা প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব যোগ প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমী জানিয়াও বহু দণ্ডী পরমহংস ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী তাঁহার নিকট যোগ দীক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার চাকরীর অবস্থাতেও বহুলোক তাঁহার সাধনলব্ধ প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া যোগ দীক্ষা লাভ করিয়া যোগাভ্যাসে রত হইতেন।

কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরই অতি দ্রুত প্রচার কার্য্যের সুরু হয়। তিনি যে এজন্য হাটে বাটে বক্তৃতা বা পুস্তকাদির প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নহে। জীবনের শেষ দিকটা যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সে মন লইয়া আর প্রচার কার্য্য চলে না। সে স্তব্ধ মৌন প্রশান্ততায় যাহারা তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহারা সে দৃশ্য কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারে না। তাই গন্ধলোভে মুগ্ধ ভ্রমরের মত শত সহস্র গৃহী ও ত্যাগীরা আসিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিয়া আপনাদের জীবনকে ধন্য মনে করিতেন এবং এইরূপে তাঁহার সাধন পদ্ধতি বঙ্গদেশে ও বঙ্গের বাহিরে বহুলভাবে প্রচারিত হয়। আধুনিক কালে গীতার মাহাত্ম্য প্রচারের তিনিই প্রধান পথ প্রদর্শক।

আজ ৩৪ বৎসর হইল তাঁহার দেবদেহের অবসান হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্মৃতিপূজা এখনও অনেক স্থানে নিত্য হইতেছে। পুরীতে চটক পাহাড়ে গুরুধামে, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর প্রভৃতি কতিপয় স্থানে, তাঁহার গৃহে কাশীধামে ও হরিদ্বার ও আরও অন্যান্য স্থানে তাঁহার সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তাঁহার ভক্তগণ সেই সেই স্থানে নিত্য পূজা করিয়া তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার উদ্দেশে ভক্ত সাধক গাহিয়াছেন :—

"রক্তপদ্ম জিনি নেত্র ধ্যান নিমীলিত
কি করুণা হেরি ওই বদনে মণ্ডিত
অরুণ কিরণ লাঞ্ছি কমল চরণ
মনঃ প্রাণ দেহ হতে করে আকর্ষণ ॥
মৃদুহাস মুখভাস সুন্দর শরীর
স্মরিলে সর্ব্বাঙ্গে হয় পুলক নিবিড়
মনঃ প্রাণ বিদ্ধ হয় চরণ চুম্বিয়া
চিত্ত কমল ফোটে পদ পরশিয়া।
নহ দেব, নহ নর, নহ এ লোকের
তুমি পূজ্য প্রিয় চির দেব মানবের ॥"

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

গরীব স্বামী

(উপন্যাস)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উষাকে লইয়া চারু গৃহে প্রবেশ মাত্র তাহার বেহারা জানাইল, হালদার-মেমসাহেব "হালকামরা"য় বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে উভয়েই চমকিয়া উঠিয়া পরস্পরের মুখের পানে চাহিল। চারু নিম্নস্বরে বলিল, "এস না ; তাতে কি হয়েছে!"—"চল," বলিয়া উষা তাহার পশ্চাদ্‌গামিনী হইল।

ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিয়া চারু ঝুঁকিয়া মিসেস হালদারের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "মামীমা, আপনি কবে এলেন ?"—চারুর দেখাদেখি উষাও নীরবে তাঁহার পদস্পর্শ করিল।

মিসেস্ হালদার উষাকে নমস্কার করিয়া সবিস্ময়ে তাহার মুখ পানে চাহিয়া চারুর প্রশ্নের উত্তর করিলেন, "আমি কাল এসে পৌঁছেছি।"

"মামা বাবুও এসেছেন নাকি ?"

"না, তিনি আসতে পারেন নি। তিনি গেছেন রঙ্গপুরে একটা মোকদ্দমা করতে। সেখানে বোধ হয় হপ্তা খানেক তাঁকে থাকতে হবে। সেখানকার কায হয়ে গেলে তার পর তিনি এখানে আসবেন। বোসো বোসো, তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?"

চারু উষাকে একখানি চেয়ার টানিয়া দিয়া, নিজে অপর একখানিতে বসিয়া বলিল, "আপনি কতক্ষণ ব'সে আছেন মামীমা ?"

"প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট হবে আমি এসেছি। আজ তোমার আদালতের ছুটি, ভাবলাম তুমি বোধ হয় বাড়ীতেই আছ। এসে শুনলাম, ব্রেকফাষ্টের পরই তুমি বেরিয়ে গেছ। ভাবলাম লাঞ্চ খেতে নিশ্চয়ই তুমি ত বাড়ী আসবে, তাই ব'সে আছি। এ মেয়েটি কে চারু, আমি ত চিনতে পারছি নে!"

চারু উষার দিকে একবার সহাস্যে চাহিয়া, বলিল, "আপনি এঁকে চিনতে পারছেন না মামীমা ? কিন্তু আপনিই ত একদিন এঁর কাছে আমার পরিচয় ক'রে দিয়েছিলেন।"

মিসেস্ হালদার সকৌতূহলে উষার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কোথায় ? কবে বল দেখি ?"

চারু বলিল, "মাস ছয়েক হতে চল্ল। আপনি গ্রীষ্মের সময় যখন এসেছিলেন, সেই কুকমপুরার রাণীর ঈভ্‌নিং পার্টিতে। এঁর নাম মিস্ চাটার্জ্জি—উষা চাটার্জ্জি।"

মিসেস্ হালদার বলিলেন, "ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে। তুমিই না সেখানে সেদিন একটি ফ্রেঞ্চ গান গেয়েছিলে ?"

উষা বলিল, "হ্যাঁ, গেয়েছিলাম বটে।"

"ঠিক ঠিক। সুন্দর গলাটি কিন্তু তোমার। আমার ত ভারি মিষ্টি লেগেছিল। তুমি কি এখনও সেই মেমেদের কাছে পড়ছ ?"

উষা বলিল, "হ্যাঁ, পড়ছি, কিন্তু এবার আমার পড়া শেষ হল। বাবা আমাকে নিতে এসেছেন, কাল আমি তাঁর সঙ্গে কলকাতা চ'লে যাব।"

"তোমার বাবা কোথায় আছেন ? তোমার স্কুলেই বোধ হয় ?"

উষার হইয়া চারু উত্তর করিল, "না, তিনি স্যানিটেরিয়মে রয়েছেন। তিনি ভারি হিন্দু মানুষ কিনা, স্কুলে মেমেদের টেবিলে খেলে যে তাঁর জাত যাবে।"

"তাই নাকি ? তবে মেয়েকে যে ও-ভাবে রেখেছেন ? মেয়ের জাত্ যাবে না ?"

চারু বলিল, "আজকালকার ব্যাপার তিনি দেখেছেন ত! মেয়ের জন্যে ধনে মানে বিদ্যায় ভাল পাত্র খুঁজতে হ'লে, টিকিওয়ালাদের মধ্যে তা যে পাওয়া যাবে না তা তিনি বেশ বুঝেছেন।"

মামীমা বলিলেন, "বিলেত ফেরৎ জামাই তাঁর ইচ্ছে বোধ হয় ? তাই মেয়েকেও সেই ভাবেই তৈরী করছেন।

তা ঠিকই করছেন। তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে ত ?"

"হ্যাঁ হয়েছে বৈকি !"

"তোমরা দু'জনে কি এখন স্যানিটেরিয়ম থেকেই আসছ ?"

চারু বলিল, "আমরা বার্চহিলে বেড়াতে গিয়েছিলাম, এখন লাঞ্চ খেতে এসেছি।"

"তুমি এখনও লাঞ্চ খাওনি বুঝি ?"

"না, আমিও না, উষাও না।"

"তবে এত দেরী ক'রে ফিরলে কেন ?"

চারু দুষ্টামি করিয়া বলিল, "সেখানে কথায় বার্ত্তায়, আমাদের সময়ের জ্ঞানই চলে গিয়েছিল মামীমা !"

মিসেস্ হালদার সন্দিগ্ধ নেত্রে একবার চারুর মুখ পানে, একবার উষার মুখ পানে চাহিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "তবে তোমাদের লাঞ্চ দিতে বল। আমি এখন উঠি।"

চারু বলিল, "আপনি উঠ্‌বেন কেন মামীমা, আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন না ?"

"আমি লাঞ্চ সেরেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। কাল একবার আমার ওখানে এস।"—বলিয়া মিসেস্ হালদার উঠিবার উপক্রম করিলেন।

চারু বলিল,"বসুন না মামীমা ! অন্য কিছু না খান এক পাত্র চাও ত খাবেন। আপনাকে একটা বিশেষ খবর দেবো—বোধ হয় শুনে আপনি খুসিই হবেন মামীমা !" বলিয়া, খানসামাকে ডাকিয়া চারু দুইজনের লাঞ্চ সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করিল ; স্যাণ্ড্‌-উইচ্ ও কাটলেট পূর্ণ লোফাফাটিও বাবুর্চ্চি খানায় লইয়া যাইতে বলিল।

ভাগিনেয় বাবাজীউ কি "বিশেষ খবর" দিবার জন্য যে উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন, ইহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহা অনুমান করিতে মিসেস্ হালদারের অধিক মস্তিষ্ক চালনা করিতে হইল না। প্রথম দিন তিনি ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন যে উষার পিতা একজন বড় "মার্চ্চেণ্ট"—একথাও তাঁহার স্মরণ হইল। বাবাজী বিবাহে যৌতুকস্বরূপ মোটা রকমেরই চেক পাইবেন বলিয়া বোধ হয়। উষার পানে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ভাই বোন ক'টি ?"

উষা বলিল, "আমরা দুই বোন এক ভাই। ভাইটি সবার ছোট।"

শ্বশুরের ধনের উত্তরাধিকারত্বের কোনও আশা নাই জানিয়া এই ভাই বোনেদের সম্বন্ধে কোনও কৌতুহলই মিসেস হালদারের মনে আর জাগিল না। উষার নিজের সম্বন্ধেই তিনি তাহাকে কথাচ্ছলে কয়েকটি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এই সময় খানসামা আসিয়া খবর দিল, আহার্য্য প্রস্তুত।

টেবিলে সাধারণ ভাবেই কথাবার্ত্তা চলিল। আহারান্তে সকলে ড্রয়িং রুমে ফিরিলে, মিসেস্ হালদার বলিলেন, "তুমি আমাকে কি বলবে বলেছিলে চারু, বল এইবার, আমার যাবার সময় হল।"

চারু কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল,— "মামীমা, শুনে বোধ হয় আপনি খুসী হবেন, উষা আমার গৃহলক্ষ্মী হতে স্বীকৃতা হয়েছেন।"

পূর্ব্বে যেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহই তাঁহার মনে উপস্থিত হয় নাই, এইরূপ ভাবটার অভিনয় করিয়া মামীমা বিস্ময়ের সহিত সহাস্যে বলিলেন, "তাই না কি ? বেশ বেশ। শুনে আমি সত্যিই খুসী হলাম চারু। দেখ, এত-দিন তোমায় বলিনি, আজ তবে বলি। সেদিন কুকমপুরার রাণীর পার্টিতে, উষাকে প্রথম দেখেই আমার কি মনে হয়েছিল জান ? মনে হয়েছিল আহা, দিব্য মেয়েটি, বেঁচে থাকুক। তার খানিকক্ষণ পরে তুমি এলে, তোমাকে আমি ইন্‌ট্রোডিউস ক'রে দিলাম। উষার গান হয়ে গেলে, ওকে ভারি শ্রান্ত দেখাচ্ছিল, তুমি ওর মেম শিক্ষয়িত্রীর অনুমতি নিয়ে, ওকে বাইরের বারান্দায় হাওয়া খেতে নিয়ে গেলে। তোমরা যখন দু'জনে হাতে হাতে হয়ে ফিরছিলে, তখন আমার মনে এই কথাই জেগে উঠেছিল, আহা দুটিকে এক সঙ্গে বেশ মানায় ; যদি বিয়ে হয় ত বেশ হয় ! ঈশ্বর যে আমার মনের সে গোপন কামনা এত শীঘ্র পূর্ণ ক'রে দেবেন তা তো আমি ভাবিনি চারু !"— বলিয়া তিনি দুই হাতে উষার স্কন্ধ ধরিয়া তাহার দুই গালে চুম্বন করি-লেন। উষা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

চারু বলিল, "ঈশ্বরের কৃপা ত অমনি অতর্কিত ভাবেই বর্ষিত হয়, মামীমা !"

মিসেস্ হালদার বলিলেন, "তা, উষা মা, কালই তুমি চ'লে যাচ্ছ, এক দিন তোমাকে যে খাওয়াব দাওয়াব, যত্ন করবো, তারই বা সময় কৈ ?"

উষা বলিল, "খাওয়াবেন মামীমা, আমি ত আপনারই রইলাম।"

ভাগিনেয়ের দিকে চাহিয়া মিসেস হালদার বলিলেন, "তোমাদের বিয়ে কবে হবে স্থির হয়েছে কি ?"

চারু বলিল, "না, এখনও হয়নি।"

উষার পানে ফিরিয়া মামীমা বলিলেন, "তোমার বাবা ত গোঁড়া হিন্দু! অগ্রহায়ণের আগে ত বিয়ে হবে না। আমিও ততদিন কলকাতায় ফিরে যাব। বেলা গেল, এখন তাহলে আমি উঠি। চারু, কাল তুমি আমার ওখানে ব্রেকফাষ্ট খাবে ? না, কাল তোমার কোর্ট আছে বুঝি ? তা হলে বিকেল বেলাই এস, চা খেয়ে, বেড়িয়ে, একেবারে ডিনার খেয়ে বাড়ী আসবে!"—বলিয়া তিনি উঠিলেন।

"তাই আসবো মামীমা।"—বলিয়া চারু তাঁহার পদধূলি লইল। উষাও তাঁহাকে আবার প্রণাম করিল। দুইজনে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফটক অবধি চলিল।

বাহিরে যাইতে মিসেস হালদার বলিলেন, "উষা, কলকাতায় তোমার ঠিকানা আমার দিও। আমি কলকাতায় ফিরে তোমার মার সঙ্গে দেখা করবো,—তোমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব।"—বলিয়া উষার চিবুক ধরিয়া তাহাকে আদর করিয়া, প্রস্থান করিলেন।

ড্রয়িংরুমে উভয়ে ফিরিলে উষা ম্লান মুখে বলিল, "আমি এখন বাবার কাছে যাই তা হলে ?"

চারু বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে কার্ট রোড অবধি আসবো ?"

"না, তুমি এই খানেই থাক। পথে যেতে যেতে নিজেকে আমি একটু সামলে নিই।"—বলিতে বলিতে উষার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

চারু উষাকে বক্ষে বাঁধিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "আবার কবে দেখা হবে উষা ?"

উষা চারুর কাঁধে মাথা রাখিয়া সেইরূপ স্বরে বলিল, "তুমি যবে বলবে। তোমার উষাকে তুমি ডাকলে সে ত কারু বাধা মানবে না।

"বাড়ী পৌঁছেই তুমি আমায় চিঠি লিখো। বাবার কাছে এই সব কথা শুনে মা-ই বা কি বলেন, দেবেন বাবুই বা কি বলেন, বাবা কি স্থির করেন, সমস্ত তুমি আমায় লিখো,—তার পর আমাদের কর্ত্তব্য আমরাও স্থির করে নেবো, কেমন ?"

উষা বলিল, "হ্যাঁ, সব কথাই আমি তোমার খুলে লিখ্‌বো। তার পর, তুমি আমায় যা করতে বল্‌বে, তাই আমি করবো। এখন আসি তা' হলে ?"

চারু উষাকে মুখ চুম্বন করিয়া সজল নয়নে বলিল, "এস।"

ভাল করিয়া চক্ষু মুছিয়া উভয়ে সে কক্ষ হইতে বাহির হইল। চারু উষার সহিত বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তা পর্য্যন্ত গেল। পথে উষাকে যতক্ষণ দেখা যায়, চারু ততক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তারপরে দ্বিতলে উঠিয়া নিজ শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মধুসূদন বাবুকে আনিতে দেবেন্দ্র বাবুর মোটর শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়াছিল। মধুসূদন কন্যাকে লইয়া বাড়ী আসিয়া, জিনিসপত্র নামাইয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "আমি এই গাড়ীতেই একেবারে গঙ্গাস্নানটা সেরে আসি। আমায় একখানা ধুতি গামছা দাও।"

গৃহিণী দেখিলেন, কর্ত্তার মুখখানা যেন ভার ভার। বলিলেন, "একটু বোসো, জিরোও, চা-টা খাও। তার পর না হয় একখানা ট্যাক্সি করেই গঙ্গাস্নানে যেও।"

মধুসূদন বলিল, "না, প্রবাসে অনাচার হয়েছে, একবারে স্নানটা সেরেই আসি।"

গৃহিণী ধুতি ও গামছা আনিয়া দিলেন। বাহুল্য বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া মধুসূদন গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন।

অন্যান্য বার উষা বাড়ী ফিরিবামাত্র ভাই বোনেদের লইয়া যেরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠে, হাসি গল্পের যে তুফান ছুটাইয়া দেয়, এবার সে সব কিছু না দেখিয়া, মেয়ের মুখখানি গম্ভীর ও বিষণ্ণ দেখিয়া, তাহার জননী বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। মেয়েকে কাছে

বসাইয়া সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "শরীর ভাল আছে ত মা ?"

উষা বলিল, "হ্যাঁ, ভাল আছি।"

"মুখ খানি অমন শুকিয়ে গেছে কেন ?"

"সারা রাত গাড়িতে এসেছি !"

"সারা রাত ত ফি বারেই গাড়ীতে আসিস বাছা ? কি হয়েছে ? উনি বকেছেন ?"

"না। একটু চা করিয়ে দাও মা, খাই।"

"কেন, তুই কি ইষ্টিশান থেকে চা খেয়ে আসিস নি ?"

উষা বলিল, "এবার যে বাবার সঙ্গে এলাম। বাবা কি আমায় নিয়ে চা খাওয়াতে সোরাবজীর হোটেলে ঢুকবেন ?"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ, তাও বটে। ওটা আমার খেয়ালই ছিল না,—নইলে আমি চায়ের জল তৈরিই রাখতাম। আচ্ছা যাই আমি, দেখি। তুই হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নে।"—বলিয়া তিনি প্রস্থান

মিনিট কুড়ি পরে উষা স্নান কক্ষ হইতে বাহির হইল। তাহার ছোট ভাই ভুবন আসিয়া বলিল, "ছোড়দি, আমার জন্যে দার্জ্জিলিং থেকে কি এনেছ ভাই ?"

উষা বলিল, "দার্জ্জিলিঙে কি-ই বা পাওয়া যায়, কি আর আনবো ভাই ? তোর কি চাই বল্, টাকা দেবো তুই এখানেই কিনে নিস্. কেমন ?"

বালক বলিল, "আচ্ছা, তাই দিও দিদি। বড়দি যখন শ্বশুরবাড়ী থেকে এল, আমার জন্যে কত কী নিয়ে এসেছিল।"

উষা ভাইয়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আমি ত আর শ্বশুরবাড়ী থেকে আসিনি ভাই।"

ভুবন মুচকি মুচকি হাসিয়া, মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে বলিল, "এইবার ত তোমাকেও শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে দিদিমণি !"

উষা বলিল, "দূর ! কে বল্লে তোকে ?"

ভুবন বলিল, "ওমা, সে কি গো ! তুমি কিছু শোননি নাকি ?"

উষা বলিল, "কি শুনবো আবার ?"

"এই অঘ্রাণ মাসে যে তোমার বিয়ে, দেবেন দা'র সঙ্গে। বাবা তোমায় বলেন নি ? কেন, আমরা ত সবে শুনেছি।"

উষা বলিল, "তোর দেবেন দা'কে বিয়ে করবার জন্যে আমার বয়ে গেছে !"

ভুবন বলিল, "ও কি কথা বলছ তুমি ? কেন, বিয়ে করবে না কেন, শুনি ?"

"আমার খুসী !"

"সত্যি করবে না ? না দিদি তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ।"

"না রে আমি ঠাট্টা করিনি। দেবেন দা'কে কেন আমি বিয়ে করতে যাব ? কখনই না—আমায় কেটে ফেল্লেও, না।"

বালক সভয়ে দিদির মুখ পানে চাহিয়া দেখিল, না, এ ত ঠাট্টা নয়, দিদির চোখ দুটা রাগে যেন জ্বলিতেছে, ভ্রু দুটি কুঁচ্‌কাইয়া উঠিয়াছে। সত্যই দিদি তবে বিবাহে অসম্মত ! এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, "মাটী করলে !"—বলিয়া ভুবন হতাশ ভাবে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

উষা বলিল, "কেন মাটীটা কি হল শুনি ?"

বালক গম্ভীরভাবে বলিল, "মাটী বৈ আর কি ? তুমি দেবেন দা'কে বিয়ে করলে, আমার কিছু লাভ হ'ত, —সেইটে ফস্কে গেল আর কি ! বামুনে-কপালে আর কত হবে !" বলিয়া বালক একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া, নিজের দুঃখ ভুলিয়া উষা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "কি লাভটা তোর হত রে, যা ফস্কে গেল ?"

"দেবেন দা বলেছিলেন, বিয়ের সময় আমায় একটা সোণার হাতঘড়ি কিনে দেবেন, আসল সোণার—রোল গোল নয়, আর একটা গ্রামোফোন।"—কথা শেষ করিয়া ভুবন নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে ভূমিতলে চাহিয়া আবার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। এই সময় তাহাদের জননী এক হাতে চায়ের পেয়ালা ও অপর হাতে মোহনভোগের রেকাবি লইয়া প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্য করিলেন, মেয়ের মুখখানি এখন হাসি হাসি, তাহার সে পূর্ব্ব বিষণ্ণতা দূর হইয়াছে।

উষা চা পানে প্রবৃত্ত হইল,—মা নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন "ভাই বোনে তোদের কি কথাবার্ত্তা হচ্ছিল রে ?"

ভুবন বলিল, "মা, শুনেছ দিদির আক্কেল খানা ?"

ছেলের গম্ভীর ভাব এতক্ষণে লক্ষ করিয়া মা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হয়েছে ?"

"দিদি, দেবেন দা'কে বিয়ে করবে না। বলছে তোর দেবেন দা'কে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে !"

গৃহিণী কন্যার মুখপানে চাহিলেন। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের সে হাসিখুসির ভাব তাহার মুখ হইতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে,—আবার মুখ গম্ভীর ও অপ্রসন্ন—বুঝি একটু রোষযুক্তও হইয়া উঠিয়াছে। চট্‌ করিয়া তাঁহার মাথায় প্রবেশ করিল, তবে কি হাওয়া ঐ দিক হইতেই বহিতেছে নাকি ?—তাই কি, কর্ত্তার মুখ খানিও ভার ভার ? পুত্রকে বলিলেন, "দিদি বাড়ী

কাণে কাণে খবরটি না দিলে তোর বুঝি আর ভাত হজম হচ্ছিল না?" কর্ত্তার উপরেও রাগ হইল। অত তাড়াতাড়ি মেয়েকে এ কথা জানানোর কি প্রয়োজন ছিল তাঁর? এ সব কথায় বাপের থাকিবারই বা দরকার কি? সময় বুঝিয়া তিনি নিজে মেয়েকে কথাটা জানাইয়া, মিষ্ট কথায় তাহাকে রাজি করিতে পারিতেন।

চা পান করিতে করিতে উষা জিজ্ঞাসা করিল, "পূজোর সময় দিদিকে শ্বশুরবাড়ী থেকে আনাবে না মা?"

মা বলিলেন, "তাদের বাড়ীতে পূজো, পূজোর সময় বাড়ীর বউকে কি পাঠাবে তারা? উনি দেখবেন অবিশ্যি চেষ্টা ক'রে?"

"আমাদেরও পূজোও ওঁরা বোধ হয় নিমন্ত্রণ করবেন। করলে আমাদের যেতে হবে ত?"

"তা, না নিয়ে গিয়ে কি আর তারা ছাড়বে?"

"তা হলে সেই সময় দিদির সঙ্গে দেখা হবে।"

এই সময় বাহিরে মোটর আসিয়া দাঁড়াইবার শব্দ শুনা গেল। উষার চা পান তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "ঐ বাবা এলেন বোধ হয়।"

ভুবন ছুটিয়া বাহির বারান্দায় গিয়াছিল, সে ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল, "বাবা নন মা, দেবেন দা এসেছেন।"—ইদানী এই বালকের দেবেন দা'র প্রতি ভক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

উষা শঙ্কিত স্বরে বলিল, "দেবেন দা' কি উপরে আসবেন নাকি মা?"

মা বলিলেন, "উনি বাড়ী নেই শুনে এখন নীচেই বসবেন বোধ হয়।" কিন্তু তাঁহার অনুমান ভ্রান্ত হইল। দেবেন্দ্র বাবু সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে ডাকিতে লাগিলেন—ভুবন—ভুবন।

গৃহিণী বাহির হইয়া, সিঁড়ির নিকট গিয়া বলিলেন, "এস, বাবা এস!"

দেবেন্দ্র বাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "মা, ষ্টেশন থেকে গাড়ী ফেরেনি?"

"হ্যাঁ, ফিরেছে বৈকি!"

দেবেন্দ্র বাবু দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন, "এই যে উষা এসে গেছ! বাবা কৈ?"

গৃহিণী বলিলেন, "তিনি এসেই, ধুতি গামছা নিয়ে, তোমার গাড়ীতেই গঙ্গাস্নানে গেছেন।"

দেবেন্দ্র বাবু হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন, "তাই বল! যা ভাবনা হয়েছিল আমার! পৌনে ৮টায় দার্জ্জিলিঙ মেল এসে পৌঁছবে, এঁদের এখানে পৌঁছে দিয়ে বড় জোর সওয়া আটটায় গাড়ী ফিরে যাবে। সওয়া আটটা বাজলো, সাড়ে আটটা বাজলো, নটা বাজলো—লেট আছে। ছুটলাম শেয়ালদহে। সেখানে গিয়ে শুনলাম, মেল যথাসময়েই এসে পৌঁছেছে। কি হল তবে?—ভাবতে ভাবতে আসছি।" বলিতে বলিতে ঘরের মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। উষার পানে চাহিয়া বলিলেন, "উষা এবার যেন একটু রোগা হয়ে এসেছে, নয় মা?"

উষা দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিল।

গৃহিণী করুণ স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, একটু কেন, বেশ রোগা হয়েছে বৈকি!"

দেবেন্দ্র বাবু এক খানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া, কারুণ্য পূর্ণ স্বরে নহে, বরং উৎসাহের সহিতই বলিলেন, "কেন রোগা হয়েছে জান মা?"

গৃহিণী বলিলেন, "খাওয়া দাওয়া বোধ হয়—"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "খাওয়ার জন্যে নয় বোধ হয় মা। আচ্ছা, উষা, তুমি রোজ ঘোড়ায় চড়তে?"

উষা বলিল, "হ্যাঁ চড়তাম বৈকি! রোজ ব্রেকফাষ্টের আগে ঘণ্টাখানেক ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে আসতাম।"

দেবেন বাবু বলিলেন, "তা হলে আমি ঠিকই ধরেছি। ঘোড়ায় চড়লে খুব পরিশ্রম হয়, তারই সুফলে স্বাস্থ্য ভাল হয়েছ—বেশ রোগা হয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "রোগা হলে স্বাস্থ্য ভাল হয়?"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "দেহ শুকিয়ে রোগা হওয়া কি? দেহের চর্ব্বি ঝরে গিয়ে রোগা হওয়া। মোটা থল থলে শরীর যাদের, তাদের কি স্বাস্থ্য ভাল ব'লে আপনি মনে করেন? তা নয় মা।" বলিয়া প্রসন্ন দৃষ্টিতে তিনি উষার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

উষা বলিল, "আপনি ত ঘোড়ায় চড়েন নি, তবে আপনি এমন রোগা হয়ে গেছেন কেন?"

তাঁহার দৈহিক অবনতি উষার চোখ এড়ায় নাই জানিয়া দেবেন্দ্র বাবু মনে মনে খুসী হইলেন। উত্তর না দিয়া উষার পানে চাহিয়া শুধু হাসিতে লাগিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "উনি জ্বরে যা ভুগলেন! মহাল থেকে ম্যালেরিয়া নিয়ে এসেছিলেন, দু'দুবার জ্বরে পড়লেন। নইলে অন্য অন্য বারের মত এবারও উনিই ত তোকে আনতে যেতেন।"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "মা, এক গ্লাস জল দিন না!"

"দিই বাবা!"—বলিয়া গৃহিণী ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেলেন।

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "উষা, ট্রেণে তোমার কি ভাল ঘুম হয় নি?"

উষা অন্য দিকে চাহিয়া বলিল, "হয়েছিল।"

"তা হলে তোমাকে এমন ক্লান্ত—ক্লান্ত ঠিক নয়,

একটু যেন দুঃখিত দুঃখিত দেখাচ্ছে। স্কুল শেষ হল বলে কি তোমার দুঃখ হয়েছে উষা ?”

উষা একটু নীরব থাকিয়া বলিল, “কি জানি !”

দেবেন্দ্র বাবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “তোমার মনে দুঃখ হয়েছে কিনা তুমি নিজেই তা জান না ? আমার কিন্তু বিশ্বাস, যে তাই। এই পাঁচ বছর ধ'রে এক রকম জীবন যাপন করে এসেছ, সেটা বদলে গিয়ে এখন অন্য রকম জীবন আরম্ভ হল, সেই জন্যেই মনটি তোমার খারাপ হয়েছে। তোমার স্কুলই বন্ধ হল, কিন্তু শিক্ষা বন্ধ হল মনে কোরো না উষা। তোমার এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে।”—বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু থামিলেন।

তিনি আশা করিয়াছিলেন, এবার কি শিখিতে হইবে তাহা জানিবার জন্য উষা সাগ্রহে তাঁহাকে প্রশ্ন করিবে। কিন্তু সে বিষয়ে উষা কিছুমাত্র ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিল না দেখিয়া তিনি একটু নিরাশই হইলেন।

উষার মা একটি কাচের ছোট রেকাবিতে দুইটি রসগোল্লা ও এক গ্লাস জল আনিয়া দেবেন্দ্রকে দিতে গেলেন। “এখন আর মিষ্টি খাব না মা,—শুধু জলই দিন” —বলিয়া দেবেন্দ্র হাত বাড়াইলেন। “তা কি হয়, শুধু জলটা খাবে!” ইত্যাদি উপরোধে দেবেন্দ্র বাবু অবশেষে একটি রসগোল্লা ভক্ষণ করিয়া জল পান করিলেন।

এ দিকে গঙ্গাস্নান করিয়া মধুসূদন বাবুও গৃহে ফিরিলেন। দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার সঙ্গে দুই চারিটি কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় চাহিলেন। গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মা, বিকেলের দিকে গাড়ী পাঠাব, একবার ভুবনকে আর উষাকে পাঠাবেন ? ওদের দু'জনকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাব মনে করছি।”

গৃহিণী বলিলেন, “তা বেশ ত, গাড়ী পাঠিও বাবা। কখন গাড়ী আসবে বল, আমি উষাকে তৈরী রাখ্‌বো।”

“এই ধরুন চারটের সময়। আমার ওখানেই একটু চা-টা খেয়ে, তার পর তিনজনে বেড়াতে বেরুনো যাবে।”

ভুবন সেখানে উপস্থিত ছিল, সে দেবেন্দ্র বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া নৃত্য নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিল, “কোথা আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবেন দেবেন দা' ? কোথায় নিয়ে যাবেন, বলুন !”

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, “সে তখন চা খেতে খেতে পরামর্শ করা যাবে।”—উষার পানে চাহিয়া বলিলেন, “তৈরী হয়ে থেকো উষা।”

উষা ক্ষীণ স্বরে বলিল, “আজ আমি বড় ক্লান্ত। অন্যদিন গেলে হবে না ?”

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, “তোমার ক্লান্তি দূর কর্‌বার জন্যেই ত তাজা হাওয়ায় তোমায় খানিক বেরিয়ে আনতে চাচ্ছি। খেয়ে টেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও, তার পর—চারটের সময়, কিংবা যদি বল ত আরও একটু দেরীতে, গাড়ী পাঠাইতে পারি।”

উষাকে নীরব দেখিয়া ভুবন বলিল, “দিদির যাবার ইচ্ছে নেই দেবেন দা'। ও না যায় নাই যাবে, আপনি গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, আমি যাব।”

“না, তোমার দিদিও যাবেন বৈকি !”—বলিয়া দেবেন্দ্র বাবু ভুবনকে আদর করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মৃত্যুর পরপারে

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেহ ও আত্মা লইয়া মনুষ্য গঠিত। মৃত্যুর তুষার হস্ত-স্পর্শে যখন দেহ ও আত্মা পৃথক হয়, তখন নশ্বর দেহ এই মর জগতে রহিয়া যায়, অবিনাশী আত্মা মুক্ত অবস্থায় প্রেত-লোকে প্রয়াণ করে। তখনও আত্মা যে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় তাহা নহে। তাহাতে 'পেরি স্পিরিট' নামক একটা অর্দ্ধ জড়াত্মক পদার্থের বেষ্টনী রহিয়া যায়। ইহাও প্রেতলোকে আত্মার সহিত গমন করে। যখন আত্মা সমস্ত বেষ্টনী হইতে মুক্ত হয়, তখন আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। তখন সমুদ্রে বারিবিন্দু পতনের মত, আত্মা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের পরম-আত্মায় বিলীন হয়।

আমাদের কর্ম্মফল আমাদের সহিত রহিয়া যায় ; এবং আত্মার বেষ্টনী আমাদের কর্ম্মফলানুযায়ী সৃষ্ট হয়। পুণ্য-শ্লোক যুধিষ্ঠিরকেও ইহার ফলে একবার নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। এই বেষ্টনীর মধ্যে আমাদের পাপ পুণ্য এমন কি আমাদের নিজস্ব ঝোঁকও আবদ্ধ থাকে। আত্মীয়ের প্রতি মায়ায়, ধনের মায়ায় কত আত্মা উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। আমাদের পরিচিত কোন এক ভদ্রলোকের পীড়া হয়, ক্রমে তাঁহার জীবন সংশয়াপন্ন হয়। তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসেন। এক রাত্রে ঐ ভগিনী স্বপ্নে দেখেন যে ঐ ভদ্রলোকের মৃতা প্রথমা পত্নী আসিয়াছেন। ভগিনীর

প্রশ্নে তিনি বলেন যে, তাঁহার স্বামীকে দেখিতে আসিয়াছেন। আবার কিছুদিন পরে তাঁহার প্রথমা পত্নীর প্রেত মূর্ত্তির আবার আবির্ভাব হয়। ভদ্রলোকের মাতা বড়ই ভাবিত হন। এরূপ প্রেত মূর্ত্তির পুনঃ পুনঃ আগমন তিনি তাঁহার পীড়িত পুত্রের পক্ষে বড় শুভজনক মনে করেন নাই। তাঁহার অনুরোধে, আমার কন্যা রমলাকে মিডিয়ম করিয়া ঐ ভদ্রলোকের প্রথমা স্ত্রীর প্রেতকে আহ্বান করি। অতি সহজে তাঁহাকে আনিতে সমর্থ হই। তিনি বলেন যে পূর্ব্ব রাত্রে তিনি আসিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁহার স্বামীকে দেখিতে আসেন। তিনি বলেন যে, যদিও তিনি বহুদিন গত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার স্বামীর প্রতি আকর্ষণ যাইতেছে না এবং তাহার জন্য তিনি দ্বিতীয় প্লেনের অপেক্ষা ঊর্দ্ধতন প্লেনে উঠিতে পারেন নাই।

ইহাই মায়া। ইহার সূত্র ছিন্ন না হইলে আমরা ঊর্দ্ধে উঠিতে পারি না। এই পৃথিবীতেও সেই দশা; যিনি যত মায়ায় আবদ্ধ, তাঁহার উন্নতি তত সীমাবদ্ধ। সেই মায়া মৃত্যুর পরেও আমাদের সহিত থাকে এবং আমাদের উর্দ্ধগতির অন্তরায় হয়। মায়া কাটাইয়া নির্লিপ্ত হওয়াই উন্নতির পন্থা। মায়া হইতে আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হয়। আকাঙ্ক্ষাই লোভ এবং লোভেই পতন। এই পৃথিবীতেই বা কি, আর পরলোকেই বা কি, সমস্তই এক নিয়মে চলে। অর্থলোভে কত আত্মার যে ঊর্দ্ধগতি হয় নাই, তাহার ইয়ত্তা নাই। মাথায় বোঝা লইয়া কেহ ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। যে পারে তাহার শক্তি থাকা চাই। সে শক্তি অন্য কার্য্যে ব্যয় করিলে, তাহার আরও উন্নতি হইতে পারিত।

ভগবানের সৃষ্ট জীব মাত্রেই ক্রমঃ উন্নতির দিকে ধাবমান। অবশ্য কর্ম্মফলে কখনও কখনও কাহারও পতন হয়, কিন্তু সে পতন চিরকালের জন্য নয়, আবার সে উন্নতির দিকে যাইতে থাকে। মানুষ মৃত্যুর পরই যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহার চরম অবস্থা নহে। তখনও সে ক্রম বিকাশের দিকে ধাবিত। মৃত্যুর সময় যে চিন্তা থাকে এবং মন যেরূপ ভাবাপন্ন থাকে, পরলোকে তাহার সেইরূপ গতি হয়। তাই, হিন্দুরা মৃত্যুর সময়ে হরিনাম স্মরণ করিতে এত উৎসুক হয় এবং আত্মীয়েরা ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া পরলোকগামী ব্যক্তির সদ্‌গতি করিয়া দেয়। কিন্তু চিন্তার স্রোতকে যখন ইচ্ছা তখন ভাল দিকে ফিরান বড়ই কঠিন। সমস্ত জীবন অনুশীলনের ফলে যে মন গঠিত হইয়াছে, তাহাকে মৃত্যুর প্রাক্‌কালে হঠাৎ অন্য দিকে ধাবিত করা, বড়ই কঠিন; এমন কি দুঃসাধ্য। পিতার মনের গঠনের উপর পুত্রের মনের গঠন নির্ভর করে। যাহা বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন, যদি অল্প মাত্রায়ও করিতে হয়, তাহা আয়াস সাধ্য। এক ভগবৎকৃপায় তাহা হইতে পারে। দস্যু রত্নাকরও মহামুনি বাল্মীকি হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু এরূপ ভগবৎকৃপা লাভও প্রাক্তনের ফল। সুতরাং আমাদের সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া অনুশীলন করিতে হইবে, যাহাতে আমরা সৎ পথে চলিয়া, মনে সৎ ইচ্ছা পোষণ করি। যে ইচ্ছা সকলের নিকট প্রকাশ করিতে পারি না, তাহা কখনও সৎ ইচ্ছা হইতে পারে না। সৎ ইচ্ছা সৎ কর্ম্মের পরিচালক, এবং একা সৎ কর্ম্মই ইহলোকে ও পরলোকে আমাদের উন্নতির মূল।

মৃত্যুর পর আমরা নূতন জগতে নীত হই। তথায় সকলেই অশরীরী। সে অবস্থায় অভ্যস্ত হইতে সময় লাগে। সে অবস্থা অভ্যাস করিতে পরকীয় সাহায্য পাইলে সুবিধা হয়। মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনদিগের প্রেতাত্মা তাহাকে লইতে আসে। মুমূর্ষু ব্যক্তি অনেক সময় মৃত আত্মীয়ের নাম করে এবং তাঁহাদিগের আগমন সংবাদ প্রচার করে। এই সকল প্রেতাত্মা মৃত ব্যক্তির আত্মাকে পরলোকে লইয়া যায় এবং অবস্থানোপযোগী ব্যবস্থা করিয়া দেয়। আবার পতিত আত্মার উদ্ধারের জন্য, পরলোকে কত উদ্ধৃত আত্মা রহিয়াছেন। প্রেততত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন যে দয়াবতী রাণী ভিক্টোরিয়া মরণান্তে পরলোকে কতক গুলি সদাত্মা লইয়া "আশা দল" সৃষ্ট করিয়া কত পতিত আত্মার উদ্ধারের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। আমেরিকাগামী বৃহৎ জাহাজ জলমগ্ন হইতেছে, বিলাতের রিভিউ অব রিভিউজ্ পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক ষ্টেড সাহেবের প্রেতাত্মা, অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের উপর মজ্জমান লোকদিগকে প্রেতাত্মাদের সাহায্যের বিষয় বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। ঐ প্রেতাত্মারা কত লোককে সাহায্য করিয়া জলমজ্জন হইতে রক্ষা করিয়াছে, এবং যাহাদের নিয়তি কাল পূর্ণ হইয়াছে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছে। প্রেততত্ত্ববিদ্‌দিগের সাহায্যে যে বিমানপোতগামী ইংরাজ, বায়ুবিতাড়িত হইয়া মধ্য অ্যাটলান্টিকে পড়িয়া মারা যান, তিনি আহূত হইয়া তাঁহার যাত্রার বিষয় এবং কিরূপে বিপদে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা সকলের জানা আছে। এইরূপে পরলোকে অবস্থানের বিষয় সকলে অবগত হইতে পারেন।

প্রেতাত্মারা যে কেবল মৃত ব্যক্তিকে সাহায্য করেন তাহা নহে। তাঁহারা জীবিত লোককেও ইহলোকে সাহায্য করেন। কত প্রেতাত্মা আমাদের চারিদিকে অহর্নিশি ঘুরিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহারা আমাদিগকে অনেক অনির্দিষ্ট উপায়ে রক্ষা করিতেছেন। কত সময় তাঁহারা ঔষধ দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর মাতাঠাকুরাণী এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসা এবং বায়ু পরিবর্ত্তনেও যখন কোনই উপকার

হইল না, বরং রোগ বৃদ্ধির মুখে যাইতে লাগিল, তখন তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখা হইল। এই অবস্থায় এক রাত্রে তিনি হঠাৎ "ঔষধ পাইয়াছি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। সকলে জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার হস্তে কয়েকটা শিকড় রহিয়াছে। তিনি বলিলেন যে এক প্রেতাত্মা আসিয়া উহা তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন এবং ব্যবহার বিধিও বলিয়া দিয়াছেন। সেই মত সেই শিকড় খাওয়ান হইল এবং তিনি ঐ ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন।

প্রেতাত্মা ডাকিয়া কোনও ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অনেক সময় বন্ধুবান্ধবেরা আমায় অনুরোধ করেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে যদিও প্রেতাত্মা মনুষ্য হইতে অনেক মুক্ত, তথাপি উহারা ভবিষ্যৎ বাণী করিতে অক্ষম। প্রেতাত্মা আহূত হইয়া জিজ্ঞাসিত হইলে ভবিষ্যৎ বিষয়ে বলে বটে, কিন্তু তাহা প্রায় সত্য হয় না। তবে আমি দেখিয়াছি যে যদি কোন জ্যোতির্বিদের প্রেতাত্মা আহূত হন, তিনি অনেক সময় অনেক ভবিষ্যৎ উক্তি করেন, যাহা সত্য বলিয়া পরে প্রতিপন্ন হয়। আমার কোন বিশিষ্ট বন্ধু কোন উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন কিনা ভাবিতেছিলেন। তাঁহার অনুরোধে আমি এক জ্যোতিষীর প্রেতাত্মার সাহায্যে যাহা জানিতে পারি তাহা পরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

অতীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার সম্যক জ্ঞান প্রেত সাহায্যে নির্ণীত হইতে পারে। বিহার প্রদেশ হইতে আমি এক পত্র পাই, তাহাতে লেখক জানিতে চাহিয়াছিলেন যে তাঁহার কন্যার কিরূপে মৃত্যু হইল। প্রেত সাহায্যে আমি জানিতে পারি যে তাঁহার ৯ বৎসরের কন্যা অগ্নিতে পুড়িয়া মরিয়াছে এবং তাঁহার এক ভৃত্যই তাহার মৃত্যুর কারণ। কে সেই ভৃত্য তাহা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসিত হইলে, আমি তাহার উত্তর দেওয়া উচিত মনে করি নাই। এক বেহারী ভদ্রলোকের পুত্র পাটনায় পড়িত। ছেলেটি বিবাহিত। সে বর্ষার সময় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া গঙ্গাগর্ভে অদৃশ্য হয়। কিন্তু তাহার পিতার ধারণা যে পুত্র জীবিত আছে। মাদ্রাজের অকাণ্ট হাউসে পত্র লিখিয়া আমার সংবাদ জানিতে পারিয়া, অত্যন্ত অনুনয় করিয়া তিনি আমাকে পত্র লিখেন। তখন আমি অনেক দিন অসুখে ভুগিয়া আরোগ্য হইয়াছি, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল আছি। তথাপি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি ঐ বালকের মাতার প্রেতকে আহ্বান করি। তাঁহার পুত্রের নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঐ বালকের ডাক নাম বলেন এবং সন্ধান লইয়া বলেন যে তাঁহার পুত্র জীবিত আছে, তবে তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পাঁচ মাস পরে ভাল হইয়া সে তাহার পিতার কাছে ফিরিয়া আসিবে। সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে কি ফল হয় তাহা দেখিবার জন্য আমি উৎসুক আছি।

পরলোকের বিষয় প্রেত সাহায্যে এত জানিতে পারা যায় যে তাহার একটা মোটামুটি ধারণা আমরা এই পৃথিবীতেই পাইতে পারি। পরলোকে অবস্থান এই পৃথিবীতে অবস্থান অপেক্ষা অনেক সুখকর। সেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, একটু উচ্চ প্লেনে অধিষ্ঠিত হইলে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এত অধিক উপভোগ হয় যে, আত্মা তাহাতে তন্ময় থাকে এবং ভগবৎ-চিন্তায় দিন যাপন করে। যথায় অভাব বলিয়া জিনিস নাই, সে দেশ নিশ্চয়ই সুখের দেশ। এক বিলাতী প্রেততত্ত্ববিৎ এই সুখের লোভে, তথায় শীঘ্র যাইবার জন্য, আত্মহত্যা করেন। কিন্তু তিনি, আমার মতে, ঠিক কার্য্য করেন নাই, কারণ আত্মহত্যাকারী কখনই উচ্চ প্লেনে স্থান পায় না। আমি যত প্রেত আহ্বান করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারা গৃহে বাস করেন; যাঁহারা চতুর্থ প্লেনে আছেন, তাঁহারা বলেন যে তাঁহাদের গৃহ আছে বটে, তবে তাঁহারা সাধরণতঃ গৃহে বাস না করিয়া উন্মুক্ত স্থানে বাস করেন; যাঁহারা ষষ্ঠ বা সপ্তম প্লেনে আছেন, তাঁহারা বলেন যে, তথায় গৃহ নাই, তাঁহারা উন্মুক্ত স্থানেই অবস্থান করেন, পূর্ণ বিকশিত পুষ্প নিচয় এবং বেগবতী নদী তথাকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে এবং সেই সকল প্লেনের অধিবাসী আত্মাদিগের ঐ সকল বস্তু উপভোগের জিনিস বলিয়া পরিগণিত হয়।

মৃত্যু আমাদের শেষ নহে। ইহা ইহলোক ও পরলোকের যোজক মাত্র। মৃত্যুতে আমাদের শেষ হয় না, এমন কি ইতর প্রাণীও মৃত্যুর পর পরলোকে অবস্থান করে, বিলাতি বৈজ্ঞানিক ও বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিৎ সার অলিভার লজ্ ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। সুতরাং এখন মৃত্যু আর কোন ভয়ের কারণ নহে; ইহাতে কেবল অবস্থান্তর আনয়ন করে, কিন্তু যে স্থানে মৃত্যুর পর আমরা নীত হই, তাহা এই পৃথিবী অপেক্ষা অধিক সুখকর স্থান।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

কলিকাতা ৭৭নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, মানসী প্রেস হইতে শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৩৬

২য় খণ্ড
৩য় সংখ্যা

স্মৃতি

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুল-ডোরে বাঁধা ঝুলনা।
এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে
যেন জাগে মনে, ভুলো না।
সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো,
আমারি মনেরি প্রলাপ জড়ানো
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো
তোমার হাসির তুলনা।

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে
চাঁদ উঠেছিলো গগনে
দেখা হয়েছিলো তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে।
এখন আমার বেলা নাহি আর
বহিব একাকী বিরহের ভার,
বাঁধিনু যে-রাখী পরাণে তোমার
সে রাখী খুলোনা খুলো না॥

International Railway
Siam
১৭ অক্টোবর ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"মায়ের-আহ্বান"

(শারদীয়)

"(ওঁ) বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমোনমঃ।
বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞ ঋতবে চ নমঃ সদা॥
হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ।
মাসং সংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥"

মধুর রবির কিরণ, নবপল্লবের শোভা, কোকিলের কুহু কুহু তান, শিশিরশ্রীর উদ্‌যাপন, প্রাণের আনন্দ, মনের উল্লাস প্রভৃতি সুখকর চিত্রের দ্বারা বসন্ত ঋতু মানবের নিকট সুপরিচিত। মানব সমাজ তাই ব্যস্ত হইয়া সেই বসন্ত ঋতুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বলিতেছে "বসন্তায় নমোনমঃ"—হে বসন্ত-ঋতুরূপিণী আনন্দময়ী তোমায় নমস্কার।

নিদাঘ মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তাপ, অতীব ভয়ঙ্কর বাতাতপ, নদী বিল পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের পরিশুষ্কতা, চাতকের 'ফটিক্‌জল, ফটিকজল' রূপ কাতর ধ্বনি, প্রাণের জ্বালা মনের চাঞ্চল্য, তৃষ্ণার কাতরতা প্রভৃতি ভীষণ ভাব সকলের প্রবর্ত্তক গ্রীষ্মঋতু সকলের স্মৃতিতেই জাগরূক। কিন্তু এই ভীম ভয়াবহ রূপের জন্যই হউক বা তাহার অন্তরালে কোন গভীর অর্থ নিহিতই থাকুক বলিয়াই হউক, হিন্দু সন্তান সেই প্রবল গ্রীষ্ম ঋতুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও বলিতেছে—"গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ"—হে গ্রীষ্মঋতু-রূপিণী জগন্মাতঃ তোমাকে নমস্কার।

আবার নিদাঘের পর্য্যবসানে রবি যখন প্রাবৃট্‌কালে পৃথিবী হইতে আকৃষ্ট রস প্রত্যর্পণ করিলেন, তখন সেই বায়ুর প্রবল বেগ, মেঘ সকলের নভোমণ্ডলে ভীষণ গর্জ্জন, বিদ্যুন্মণ্ডলীর নীলিম সমলঙ্কৃত নীরদমণ্ডলীর ক্রোড়দেশে প্রস্ফুরণ, ময়ূরের ঘন ঘন সুমধুর কেকারব, গগনমণ্ডল হইতে অবিশ্রান্ত বারিধারা, ভেকের কলরব, নদী বিলের জলপূর্ণ কলকল ধ্বনি, কুসুমদামের শোভা, এবং ফল ফুলের প্রকীর্ণতা প্রভৃতি মনোহর দৃশ্যে আবার জগৎকে মাতাইয়া তুলিল।

পরক্ষণেই শরতের মেঘে যেন সে ঘন বৃষ্টির প্রখরতা কমিয়া গেল। আজ শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা—মানব যাহা খুঁজিয়াছিল তাহা যেন পাইয়াছে, যাহার জন্য মানব গ্রীষ্মের প্রচণ্ড প্রতাপ সহ্য করিয়াছে, আজ তাহার সুফল ফলায় মানবের প্রাণে সেই শারদীয় উৎফুল্ল প্রাণভরা হাসি দেখা দিয়াছে, সেই শীতল স্নিগ্ধ মনোহারী শারীরিক সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে—আজ চারিদিকে আনন্দ। এই আনন্দ লইয়াই বর্ষা ও তাহার চিরসহচরী শরতের আগমন। তাই মানব এবার আর শুধু নমো নমঃ বলিয়া সারিয়া উঠিতে পারিল না। তাই বলিতেছে, হৃদয়ের আনন্দে বলিতেছে—"ঋতবে চ নমঃ সদা"—হে বর্ষা ও তোমার চিরসঙ্গিনী শরৎ তোমাদের উভয়কে ভূয়ো ভূয়ঃ নমস্কার।

শরৎ চলিল, হেমন্ত তাহার স্থান অধিকার করিল। যে রবির প্রখর উত্তাপে মানব গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে প্রাণে জ্বালা অনুভব করিয়া শরীর উন্মুক্ত রাখিতে ভালবাসিত, আজ তাহা যেন মানবের মনেই নাই। মানব এখন শরীরের আবরণী অন্বেষণে ব্যস্ত। মন, প্রাণ, শরীর, সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল। প্রাণ নিরন্তর আনন্দে বিভোর, বড়ই স্নিগ্ধ—আবার মহামায়ার লীলায় শিশিরের অনুগমনে যেন হেমন্তের হিম আরও প্রগাঢ় গভীরতর হইয়া "শীত"রূপ ধারণ করিল—মানবের আনন্দের সীমা নাই। তাই মানব করযোড়ে বলিতেছে—"হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ।" হে দেবী হেমন্তরূপিণী মহামায়ে, হে ব্রহ্মময়ী শীতঋতু রূপিণী জগন্মাতঃ—তোমাদের উভয়ের চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষা, বর্ষার অনুগামী শরৎ, শরতের পর হেমন্ত ও শিশির সকলকেই প্রণাম।

মানব আবার শুধু তাহাতেই তুষ্ট নহে। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, দিবসের পর দিবস সকলই চিরন্তন চিরনূতন চমৎকারিণী মূর্ত্তি। হে জগৎপ্রসূতি, হে জগন্মাতঃ তোমাকে এই সকল বিচিত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ অহরহ

পরিবর্ত্তনশীল ভাবগুলির মধ্যে উপলব্ধি করিয়া প্রণাম করিতেছি।

শুধুই কি মানব বিশ্বনিয়ন্তার এই মহাকাল-চক্রের, এই ঋতুপরিবর্ত্তন চক্রের মধ্যে, সেই মহাপ্রসূতির মহামায়া চক্রের নানা বৈচিত্র্যময়ী লীলায় যোগ দিবার জন্য প্রয়াসী? তাহা নহে। মানব প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা মহাশক্তি রূপিণী মহামায়াকে তাঁহার প্রত্যেক রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই রূপের রসকলার অভিব্যক্তির মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে চাহে। তাই আর্য্যসন্তান হিন্দুগণ বসন্তে বাসন্তী দেবীর আরাধনায়, গ্রীষ্মে মহামায়ার নাম গানের, বর্ষায় কল্লোলময়ী পূতসলিলা গঙ্গাদেবীর আবাহনের, শরতে শারদীয়া দুর্গোৎসবের ও মহালক্ষ্মীপূজার, হেমন্তে সৌর্য্য বীর্য্যের দেবতা কার্ত্তিকেয়ের ধ্যানের, শিশিরে সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতীর উপাসনার অবতারণা করিয়া থাকে। তাই হিন্দুর ঘরে সেই ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বারমাসে তের পার্ব্বণ। হিন্দু আজ তাই মহাশক্তি-স্বরূপিণী মঙ্গলময়ীর পূজায় ব্যস্ত। কেন হিন্দু এ পূজায় এত রত, প্রবীণ লেখক অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সুলেখনী প্রসূত কয়েকটা কথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

হিন্দু উপকার পাইলে "থ্যাঙ্ক্ ইউ" বলেনা, কিন্তু উপকারীর পূজা করে। সূর্য্য তাপ ও আলোক দেন, তাই হিন্দু সূর্য্যের পূজা করে, বৃষ্টির জলে তাহার ক্ষেত্র রসিয়া উঠে, তাই সে ইন্দ্রের পূজা করে, জ্যৈষ্ঠ মাসে পিপাসা নিবারণ করিয়া হিন্দু গঙ্গাপূজা করে, আর ছায়ায় বসিয়া পথশ্রান্ত পথিক শরীর জুড়ায় বলিয়া সে বটবৃক্ষের পূজা করে। সেইরূপ হিন্দু ঢেঁকী ও চরকারও পূজা করে। সভ্য শিক্ষিত শক্তিমান লোকেরা এই জন্য হিন্দুকে কুসংস্কারাপন্ন মূর্খ অসভ্য ও বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা ও বিদ্রূপ করেন; তথাপি হিন্দু পূজা করিতে বিরত নহে। অচেতন উপকারীরও পূজা করে। জন্মসংস্কার হইতে হিন্দুর সহজ জ্ঞান "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—সেই ব্রহ্মময়ী সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, তাই হিন্দুর এ পূজা আজ নূতন প্রচলিত নহে। আবহমান কাল হইতে হিন্দু এইরূপ ভাবে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূজা করিয়া আসিতেছে। তাই পৃথিবীর মানব সমাজের প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে—সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন বাক্যে ঋষি গাহিতেছেন—

"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম হোতারং" —যে অগ্নি আমাদের সর্ব্বযজ্ঞের হোতা, প্রবর্ত্তক, যে অগ্নি আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলদাতা, তাঁহাকে আমরা স্তুতি করি, অর্চ্চনা করি।—হিন্দুসন্তান তাই আশৈশব নমোনমঃ বলিতে অভ্যস্ত। তাই আজ আমরা প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করিতে এতই ব্যস্ত।

আজ আমরা এই শারদীয় মহোৎসবের প্রারম্ভে সেই আনন্দময়ীর পূজা করিতে সংকল্প করিতেছি, তাই বলিতেছি—

"ভাগ্যং ভাগ্যমহো বহুতিথে কালে গতে শ্রীমতী
মাতেয়ং তব দর্শনাতিথিরহো জাতারহো মানস।
এহি ভ্রাতরস্তদীয় চরণে পূজাবিধি রচ্যতাম্,
মাতঃস্নেহময়ি প্রসীদ দয়য়া পূজেয়মাদীয়তাম্॥

—হে মন! আজ তোমার বহুভাগ্য, আজ তোমার কি উৎসব! বহুকাল পরে আজ শ্রীজগদম্বা নির্জ্জন হৃদয়ে তোমার দর্শনপথে উপস্থিত হইয়াছেন! অতএব এস ভাই, তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। আর মা, তোমাকেও বলি স্নেহময়ী তুমি প্রসন্না হও, দয়া করিয়া তুমি এই পূজা গ্রহণ কর।

মহামায়া জগজ্জননীকে পূজা গ্রহণ করিতে বলিতেছি, পূজার কত আয়োজন আড়ম্বর করিয়াছি, মাকে সাদরে গ্রহণ করিতে বলিতেছি—কৈ মা কি আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন?

কিংবদন্তি আছে—নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দুর্গাপূজা করিতেন। তাহাতে অনেক আয়োজন ঘটা ও উপকরণ দ্বারা তাঁহার সমস্ত ক্ষমতার সহিত পূজা করিতেন। প্রতি বৎসর এইরূপ পূজা করিতেন। একদিন গৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া দেখিলেন সম্মুখে একটী পুষ্করিণীতে কয়েকটী পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক সুবর্ণ কলসে জল লইতে আসিয়াছেন। রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহারা কৈলাসে দুর্গাদেবীর সহচরী। রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যে প্রতি বৎসর দুর্গা পূজা করি, মা তাতে সন্তুষ্ট হন তো? দুই একদিন পরে তাহারা আবার আসিলে রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তাঁহারা

বলিলেন, মাকে আপনার কথা বলাতে তিনি বলিলেন, কৈ রাজা আমার পূজা করেন এমন তো মনে পড়ে না। কিন্তু এদেশে একটি দুঃখী ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি আমার পূজা করেন বটে, আমি সেখানে যাই।

রাজা একথা শুনিয়া বড় ক্ষুব্ধ হইলেন, প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। পূজাতে সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আমি যে পূজা করি মাতা তাহা জানেনও না! ঐ ব্রাহ্মণের নাম ধাম জানিয়া লইলেন। পূজার সময় ছদ্মবেশে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দেখেন যে কোন আয়োজন নাই, সামান্য ফুল, আর মোটা চাউল, থোড় কলার তরকারি। কিন্তু মা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছেন—"তুমিও খাও আমিও খাই।" রাজা স্তম্ভিত হইলেন।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধসা ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তস্যৈ সা আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥"

সেই বিশ্বনিয়ন্ত্রী জগন্মাতাকে বাক্যের দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা বা বিদ্যার দ্বারা পাওয়া যায় না, যাকে কৃপা করিয়া ধরা দেন কেবল সেই পায়—উপনিষদের এই মহাবাক্যের সার্থকতা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজা স্তম্ভিত হইলেন।

তাই বলিতেছিলাম, মা কি আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন? অনেক সময় বাহিরের বা ভিতরের নানা প্রকার আয়োজন করিয়া মনে করি তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। অনেক সময় এইরূপে আত্মপ্রতারিত হই। বাল্যকালে ফুলচন্দনাদির আয়োজন করিতাম, এখনও মনে করি ভক্তি প্রেম আয়োজন করিয়া বাহিরের বা ভিতরের উপকরণ দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলাম এবং তিনিও গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু এ কেবল মনের ভ্রান্তি মাত্র। বুঝিয়া দেখা উচিত যে মহামায়ার পূজা করিতেছি, না সংসারের সুখ, আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, যশ, মান, দলাদলি, দ্বেষাদ্বেষীর পূজা করিতেছি।

বর্ষে বর্ষে উৎসব করি, আনন্দ করি, কিন্তু সব বাহিরে বাহিরে, গভীর ভাবে তো হয়না! একটি ভাব আসিয়া আবার চলিয়া গেল এরূপ হয় কেন? কৈ বৃক্ষের একটি শাখা বাহির হইলে আর তো তাহা ভিতরে প্রবেশ করে না! তবে এরূপ কেন হয়?

সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না হইলে হয় না, বোধন না হইলে মায়ের পূজা হয় না। এই উদ্দেশ্যে পুরাকালে ঋষিরা বোধন করিতেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই পূজার পূর্ব্বে বোধনের অনুষ্ঠান হইত। তখনকার যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহারা যখন বিশেষ রূপে অথবা কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষেও পূজায় প্রবৃত্ত হইতেন, পূজার পূর্ব্বে সকলে এক মহাশক্তি মাহামায়ার নিকট উপস্থিত হইয়া বোধন করিতেন। সেই এক মহাশক্তি সমস্ত চরাচরের স্রষ্টা, সকলের কর্ত্তা, সকলের কারণ, সকলের প্রাণ, জীবনের আশ্রয়। তিনি সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকাশ কোথায়? যাঁহার শাসনে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, সেই এক অদ্বিতীয় মহাশক্তি, তাঁহার বোধন না হইলে তাঁহার প্রত্যক্ষ না হইলে তাঁহারা পূজা করিতেন না। শস্যে বৃক্ষে লতায় সকল পদার্থে অগ্নি আছে সত্য, কিন্তু তাহার কাশ না হইলে, ঐ অগ্নির বোধন না হইলে তাহার দ্বারা কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। সর্ব্বত্র বায়ুতে জল আছে, ঐ জলের বোধন না হইলে শুধু বায়ু-স্থিত জলে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। এইরূপে সকল স্থানেই সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে জীবনরূপে একমাত্র স্রষ্টা পাতা বিধাতা সেই ব্রহ্মময়ী মা জগদম্বা রহিয়াছেন। যিনি আদ্যাশক্তি, পরা শক্তি, তিনি কোথায় না বিরাজ করিতে-ছেন? কিন্তু তাঁহার বোধন কৈ? এখানে আছেন বলিলেই হয় না, বোধন চাই। এইজন্য প্রবীণ ঋষিগণ সকলে সমবেত হইয়া সমস্বরে বোধন করিতেন। যতক্ষণ প্রকাশিত না দেখিতেন, শ্রবণ না করিতেন, ইষ্ট দেবতা আসিয়াছেন প্রত্যক্ষ না করিতেন, ততক্ষণ পূজা করিতেন না। এই বোধন সে সময় একটি বিশেষ কার্য্য ছিল। প্রতি গৃহে প্রতিদিন কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষেও এই বোধন করা হইত। এক্ষণে কেবল দুর্গা পূজার পূর্ব্বেই এই বোধনের কথা শুনা যায়।

আমরা যাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি সেই পরমারাধ্যা মহাশক্তি বাস্তবিক চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান আছেন। সত্যই এখানে এই পুষ্করিণীতে, এখানে এই জলে স্থলে, অগ্নি বায়ু চরাচর সর্ব্বস্থানে, আমার রসনায় অস্থিতে মাংসে শোণিতে, আমার চারিদিকে, ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ রূপে রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বোধন কৈ? শোনা কথা, পাঠ করা কথা একটা সংস্কার মাত্র। বোধন অর্থাৎ সত্য বোধ করা। পরিষ্কার রূপে তাঁহার ভাব, জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম না হইলে পূজা হয় না।

যে পূজা দ্বারা পাপ তাপ দূর হয়, হৃদয় পবিত্র হয়, এই পৃথিবী স্বর্গ হয়, মানুষ দেবতা হয়, সে পূজা বোধন না হইলে হয় না। বাহিরের আয়োজন করি, নানা উপকরণ সংগ্রহ করি, কিন্তু প্রকৃত পূজা তাহাতে হয় না। সকলে যদি এক প্রাণে এক ভাবে সেই বিশ্বজননীকে চাই, তবেই হয়! প্রকাশ না হইলে পূজা হইবে না, পরোক্ষ ভাবে পূজা হইবে না। ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ না করিলে, তাঁহার আবির্ভাব না হইলে, পূজা হয় না। বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই প্রমাণ আছে যে উপাস্য দেবতা প্রত্যক্ষ হইয়া পূজা গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ যে পরমেশ্বরের পূজা করিবার জন্য সকল দেশে সকল জাতিতে, অনাদি কাল হইতে মন্দিরে গির্জ্জায় মসজিদে, বৃক্ষে শিলাতলে পুষ্করিণীতে নদীতে সর্ব্বত্র আয়োজন হইয়া থাকে, তাঁহার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা যে ব্যাকুলতা এ ভাব কখনও সামান্য বৃথা কল্পনা মাত্র হইতে পারে না।

সেই সত্য দেবতার সত্য প্রকাশ—বোধন—আবশ্যক। তাহা না হইলে তাঁহার পূজা হয় না। যদি বাস্তবিক আমাদের প্রয়োজন হয়, কোন প্রাণী নয়, বর্ষে বর্ষে উৎসবের উদ্বোধন করিয়া থাকি অতএব করি এরূপ যদি না হয়, তাহা হইলে বোধন—প্রত্যক্ষ উপাস্য ইষ্টদেবতাকে সম্মুখে দেখিতে পাইব। সত্য ক্ষুধা হউক সত্য পিপাসা হউক অমনি পাইব। তাঁকে কি চাই? বাস্তবিক যদি চাই, তবেই পাইব, যখনই চাহিব তখনই পাইব। কিন্তু আমি তাঁকে চাই না। গভীর ভাবে আত্ম পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে আমি তাঁহাকে চাই না। মুখে মাকে 'পূজা গ্রহণ কর' বলিতেছি, কিন্তু প্রাণে অন্য বাসনা কামনার পূজা করিতেছি। তবে কিরূপে সেই মহাশক্তি ভগবতীর বোধন হইবে? তাই বলিতেছিলাম—তাঁহার বোধন কোথায়?

যাঁহারা মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া ব্যবসা করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা ভীত থাকেন যে কোন্ সময়ে মহাজন আসিয়া টাকা চাহিবে—না দিতে পারিলে দেউলিয়া হইতে হইবে, লোকে আর বিশ্বাস করিবে না। মহাজন যখন জিজ্ঞাসা করিবে টাকা কি করিলে? তখন যদি সে দেখাইতে পারে যে, মাল সকল জমা রহিয়াছে, যাহা ক্রয় করিয়াছিল তাহা নষ্ট করে নাই, তবে এক প্রকার। যদি বলে বাকিতে বিক্রয় করিয়াছি—যাহারা বাকি লইয়াছে তাহারা মূল্য দেয় না। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে মহাজনের নিকট অপ্রস্তুত হইতে হয়। আর অর্থ চাহিলে পায় না। আমাদের মহাজন—মা বিশ্বজননী-জগদম্বা, আন্তরিক ধর্ম্মভাব—অর্থ। তিনি যে ধর্ম্মধনে ধনী হওয়ার জন্য আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ধনকে বাড়াইতে হইবে। তদ্দারা আমোদ আহ্লাদ করিতে হইবে। কিন্তু আমরা সেই সকল ভাবকে সংসারের নানাবিধ ভাবের নিকট বাকী বিক্রয় করিয়াছি। কতক স্ত্রীকে, কতক পুত্রকে, কতক পদমর্য্যাদায়, কতক বিভবকে, কতক কু-অভ্যাসকে, সুরাপানে, নেশাভাঙ্গে, কতক শ্রমবিমুখ অলসতায়, কতক দলাদলিতে, কতক অখাদ্য ভোজনে, কতক বেশভূষা সাজসজ্জায়, কতক দ্বেষাদ্বেষীতে, কতক ফন্দিবাজিতে, কতক আদালতে মোকদ্দমায়, কতক অযথা উৎপীড়নে ও নির্য্যাতনে, কতক ফাঁকিদারিতে, কতক অবৈধ প্রণয়ে, আরও নানাপ্রকার মিথ্যা চাতুরীতে;—এইরূপ নানা কার্য্যে সংসারের বহুবিধ বিচিত্র ভাবকে বাকি বিক্রয় করিয়াছি। এখন তাহারা আর চাহিলে দেয় না। তাই মহাজনের নিকট শূন্য হাতে আসিতে ভয় হয়, যখন আমরা তাঁহারা পূজার জন্য আসিয়া উপস্থিত হই, তখন যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কি আনিয়াছ? মনের মধ্যে যদি কোন উপকরণ না থাকে, মনের মধ্যে এক আধ কড়া থাকিলেও তাহা দিয়া কি সন্তুষ্ট থাকিতে পারি? তবে কি না আমাদের মহাজন বড় ক্ষমাশীল, উদার, তাই রক্ষা। তাঁর ধন ষোল আনা প্রায় শেষ করিয়াছি, এক আধ পয়সা থাকিতে পারে এরূপ মনে হয়। আমি তাঁর কি পূজা করিব? ষোল আনা অনুরাগ না থাকুক, বার আনা থাকিলেও ক্ষতি ছিল না, এ হৃদয় লইয়া কি তাঁর উপাসনা করা যায়? কত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র তাঁর পূজা করিতেছেন, আমরা কি দিয়া তাঁর পূজা করিব? অনেক সময় মা জগদম্বে, ব্রহ্মময়ি বলিতেছি, তিনি তো সর্ব্বব্যাপী, জাগ্রত, জীবন্ত দেবতা, কৈ তাঁকে দেখি না কেন? তাঁহার বোধন হয় না কেন? না, মন অন্যত্র বিক্রীত হইয়া রহিয়াছে।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তো মানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত না হইলে, প্রাণ অপবিত্র থাকিলে তাঁহাকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা পাওয়া যায় না। অনেক সময় মনে করি তাঁর পূজা করিতেছি, কিন্তু ভাবিলে দেখি অন্যের পূজা করিতেছি—নিজের বাসনা কামনার, কাম ক্রোধাদি রিপুর পূজাই করিতেছি এইরূপ মনকে অনেক সময় আত্ম প্রতারিত হইতে হয়। সত্যস্বরূপ দেবতা মা জগদম্বা—তাঁকে ষোলআনা প্রাণ দিতে পারিলে এখনই সব শূন্য স্থান পূর্ণ হইবে, অন্ধকার আলো হইয়া যাইবে। তিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ—কল্পনা নন, বাক্য বা ভাব নন, ষোলআনা অনুরাগে ডাকিলে এখনই তাঁর বোধন হইবে—তাঁর প্রকাশ হইবে। এমন যে করুণাময়ী বিশ্বজননী দীনজনপালিনী, জগত্তারিণী, কল্যাণময়ী মা ভগবতী, আমরা তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি—তিনি আমাদের সমস্ত প্রাণ মনকে ঢালিয়া লউন, আমরা তাহার পূজা করি।"

"এতদ্ ভূমিময়ং গৃহাণ বিমলং গন্ধং ত্বয়া লিপ্যতাম্
সর্ব্বব্যাপিনি তে নভোময়মিদং পুষ্পঞ্চ হারাবলি।
এবং তৈজসদীপ এব চ মরুদ্ধূপোঽয়মাদীয়তাম্
এতৎ তে সলিলস্বরূপময়ি ভো নৈবেদ্যমাবেদ্যতে॥"

মা, এই পৃথিব্যাত্মক বিমল গন্ধ গ্রহণ কর, করিয়া তোমার ঐ সুঅঙ্গে লেপন কর। সর্ব্বব্যাপিনি, এই তোমার আকাশ তত্ত্বাত্মক পুষ্প এবং হারাবলী (গ্রহণ কর)। এইরূপ তেজস্তত্ত্বাত্মক দীপ এবং ঐ বস্তুতত্ত্বাত্মক ধূপ গ্রহণ কর। অয়ি মাতঃ, এই তোমার জন্য রসতত্ত্বাত্মক নৈবেদ্য নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর।

"তথাত্রাদিকমেতদত্রভবতী স্পর্শন্ময়া কল্পিতম্
তৎসর্ব্বং ভবতী দয়াপরবশা গৃহ্ণাতু দাসার্জ্জিতম্।
এতন্নেত্রযুগং তবৈব চরণধ্যানে ময়া যোজিতম্।
কর্ণেন তৌ ভবতী গুণাবলী সুধাপানোৎসবৈ
কারিতৌ॥"

মা, তোমার স্পর্শমাত্র আমিরূপ রসাদি তথাত্র কল্পনা করিয়াছিলাম, তুমি দয়াপরবশা হইয়া দাসজনের অর্পিত তৎসমুদয় গ্রহণ কর। এই আমি আমার নয়ন যুগলকে তোমারই শ্রীচরণধ্যানে সংযোজিত করিলাম এবং শ্রবণদ্বয়কে তোমারই গুণাবলীরূপ সুধাপানের উৎসবে নিযুক্ত করিলাম।

"নাসা তে কমনীয় সৌরভযুতে পাদাম্বুজে মন্দতা,
জাতেয়ং রসনাঽপি তে গুণ রসেঽনাস্বাদিতে লোলুপা
তৎপ্রাপ্তোঽবসর ত্বগিন্দ্রিয়মপি স্পর্শায় লালায়তে,
যৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়মন্যদত্রভবতী পূজোৎসবং কার্য্যতে॥

আমার এই মাথা তোমার লোভনীয় সৌরভযুক্ত পাদাম্বুজে মিলিত হইয়াছে, এই রসনাও অনাস্বাদিত পূর্ব্ব তোমার গুণরসে লোলুপ হইয়াছে, সুতরাং অবসর মিলিয়াছে মনে করিয়া ত্বগিন্দ্রিয়ও তোমার স্পর্শের লোভে লালায়িত হইয়াছে এবং তদ্‌ভিন্ন হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে তোমার পূজোৎসবে নিযুক্ত করিয়াছি।

"প্রাণাস্তে প্রিয়নাম কীর্ত্তনবশাদাবদ্ধ ধৈর্য্যাঃ শনৈঃ
নাসাভ্যন্তরচারিণঃ স্থিরতয়া দৌবারিকাঃ স্থাপিতাঃ।
মাতস্তচ্চরণে মনোঽয়মধুনালীয়ে সুধাসাগরে,—
ইত্যুক্ত্বা চিরশান্তি বাসনিময়নোলীনং জলে বীচিবৎ॥

(অবশিষ্ট ছিল প্রাণ) প্রাণও (প্রাণায়াম যোগে) তোমার প্রিয়নাম (প্রণব) কীর্ত্তন করিতে করিতে ধীরতা লাভ করিয়াছে, এবং স্থিরতার দৌবারিকরূপে নাসাদ্বারে স্থাপিত হইয়াছে। মা, আমার মন এখন তোমার সুধাসাগরোপম চরণযুগলে লীন হইতেছে বলিয়া, বীচি যেমন জলে মিলাইয়া যায়, তদ্রূপ মন ব্রহ্মময়ীর চিরশান্তিময়পদে লীন হইল।

"ইত্যুক্ত্বা বিররাম বুদ্ধিরহহ ধ্যানৈকতানা তদা,
তাং জ্যোতিঃ-পরিবেশ রাজদমলজ্যোৎস্নাময়া সংপ্রতি।
চিত্রং তৎক্ষণ এব বাঙ্‌মনসয়োস্তৎ দ্বিক্রমা গোচরং।
প্রাদুর্ভূতমভূন্নিজেন সহসা সংপ্লাবয়ং সর্ব্বতঃ॥"

এই বলিয়া তখন বুদ্ধি সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যে বিরাজমানা অমল জ্যোৎস্নাময়ী জননীরূপে, ধ্যানৈকতানা হইল। ঠিক তন্মুহূর্ত্তে অবাঙ্‌মনসোগোচর এক জ্যোতিঃ আপন প্রভায় চারিদিক প্লাবিত করিয়া প্রাদুর্ভূতা হইল।

ঐ দেখ মায়ের প্রকাশ। ঐ দেখ, কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয়। তাই মা আনন্দরূপিণী ব্রহ্মময়ী প্রকাশমানা। ঐ শুন মা জগদম্বা কোটি কোটি চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে বিভূষিতা হইয়া সুবর্ণ কঙ্কণযুক্ত সুবিমল চারু হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক মৃদু গম্ভীর নিনাদে

বলিতেছেন—"মা ভৈঃ, মা ভৈঃ, আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন!" আর ভয় নাই, ভয় নাই, সেই ব্রহ্মানন্দকে একবার পাইলে ভয় থাকে না। আয় আমার কোলে আয়—তোদের সকল জ্বালা, যন্ত্রণা, পাপ আমি গ্রহণ করব। তোরা সকল ভুলে আমার কোলে আয়, তোরা সংসারের খেলায় একেবারে মত্ত হয়ে যাকে একেবারে ভুলে গেছিস, সব হারালি, আর খেলা খেলিস না, খেলা শেষ হয়েছে, আর বেল' নাই, সন্ধ্যা হয়েছে, তোরা মায়ের ছেলে মায়ের কাছে আয়। আয় আমার হারানিধি আয়, তোদের সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী আমি তোদের সকল দুঃখ নাশ করব। আয় আমার কোলে আয়—

"মা ভৈঃ—মা ভৈঃ—"
"আনন্দব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥"
সুরেন্দ্র-সেবিতা নিত্য অবিরাম,
বিনাশি আপদ শুভবিধায়িনী।
কর আমাদের মঙ্গল বধান।
উদ্ধত অসুরে তাপিত আমরা
সেই ঈশ্বরীকে নমিনু এখন।
ভক্তিনম্র দেহে স্মরিলে যাঁহাকে,
সকল আপদ নাশন তখন।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মূল্যদান

(গল্প)

সদর-বাজারে আমরা বিশ ঘর বাঙ্গালী। সবাই চাকুরে, তার মধ্যে তরুণ আর যুবা ১৪।১৫টি।

বিদেশে দুর্গোৎসব করতে হবে, উৎসাহের অবধি নেই। রোজই মিটিং,—নানা প্রস্তাব পাস হচ্চে।

এক জন বললেন—"এটা তো কেবল পূজাই নয়—উৎসব। তার ব্যবস্থা কি?"

কথাটা সাগ্রহে গৃহীত হয়ে গেল। স্থির হ'ল নবমীতে নাট্যাভিনয় হবে। সেটা করতে হবে নিজেদেরই।

নৃত্যবাবু ছিলেন আমাদের মধ্যে অভিনয় বিশারদ, ন্যাশনলে প্লে করেছেন। ষ্টেজ বাঁধা থেকে সাজানো, এস্তোক পেন্টিং,—অর্থাৎ ডিপার্টমেন্টের সব দিকেই ওস্তাদ্। পুস্তক নির্ব্বাচন তিনিই করলেন—"মেঘনাদ বধ," নিজে মেঘনাদ।

এই কয়টি লোকের মধ্যে পূজা সামলানো আর রিহার্সেল চালানো দুষ্কর হয়ে দাঁড়ালো। ব্যবস্থা মত কায এগোয় না। কারণ ঝোঁকটা শেষে বেশি দাঁড়িয়ে গেল অভিনয়ের ওপর। পূজার ব্যবস্থার লোকাভাব।

ম্যানেজার, তড়িৎবাবু এক একবার এসে বিদ্যুৎ হেনে যাচ্ছেন—সগর্জ্জনে। চ'টে একদম বারুদ। "এই রইলো আপনাদের পুজো! পাঁঠাগুলো স্বরাজ পেয়ে জঙ্গলে উধাও—যা ছুটতে পারেন ধ'রে ধ'রে খাবেন। ভেন্ ঘরে কেউ নেই, এরি মধ্যে তিন মণ ঘিয়ের তিরিশ সের পাচার, চুলোয় যাক্‌গে,"—ইত্যাদি।

তাঁর সময় কম বয়সও কম। তাই চিত্রাঙ্গদার পার্ট দেওয়া হয়েছে, পাঁচ মিনিট কেঁদেই খালাস।

"পাঁচ মিনিটের জন্যে আগে থেকে গোঁফ ফেলে কি মুখ্যুমিই করেছি! বাইরে কোথাও মুখ দেখাবার জো নেই, নাহলে আজই এলাহাবাদ"—অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ী!

একজন বললেন "প্রয়াগে বেমানান হবেনা হে।"

বিপিন বাবু বললেন—"বুঝচো না! তড়িৎবাবুর ওটা ধুঁয়ার ছলনে কান্নার রিহার্সেল্। সময়াভাবে এটেও করতে পারবেন না,—তাই সেরে রাখচেন। দেখে নিও ওঁর কান্নাতেই দুশো ক্ল্যাপ পড়ে যাবে।"

"আমি seriously বলছি, ভিয়েন ঘরে কেউ না থাকলে ঐ ভেনকর বেটাই সব সাবাড় করবে।"

সবাই নিজে নিজের সাজ-গোছ নিয়ে ব্যস্ত। নীলু প্রমীলা,—সিল্কের রুমাল আর সিল্কের মোজার জন্যে সহর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।

সত্যই চিন্তার কথা। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ফাই ফরমাস খাটচে,—তারাই এখন ভরসা, আর পুরোহিতদ্বয়। নৃত্যবাবু ষ্টেজ নিয়ে পড়েছেন।

রিহার্সেল-রুমে লোক ধরে না, পূজার প্রাঙ্গণ খালি। ম্যানেজার কেবল ছুটোছুটি করচেন আর চট্‌চেন,—"এই নাকে খৎ, একবার বিসর্জনটা দিতে পারলে বাঁচি!"

শরৎবাবু বললেন, "দোহাই তড়িৎবাবু, রাণী সাজবেন, অমন সুন্দর মুখখানা চটে চটে বিগড়ে ফেলবেন না।"

বিপিনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "না হে উনি বে-মতলবে কিছু করেন না। রাবণের সামনে ত' ওঁর রোষ-মিশ্রিত কান্না নিয়েই প্রবেশ। দুয়ের সংমিশ্রণ তোফা হবে,- সেই মুখই তো preferable! দেখে নিও, নবমীটা ছিজ–I mean শিজ্‌ডে (day) হয়ে দাঁড়াবে।"

সুশৃঙ্খলে দুদিক বজায় হওয়ার পথ পাচ্ছি না। অন্ততঃ দু'টি অভিজ্ঞ কাযের লোক দরকার। এই দুর্ভাবনা নিয়ে শয্যাত্যাগান্তে, সকলকে ডেকে পূজা প্রাঙ্গণে হাজির হয়ে দেখি,- নৃত্যবাবু ষ্টেজে wings fit করছেন।

তড়িৎবাবু বলচেন—"আজ সবে পঞ্চমী, ও কাষটা নবমী কাটলে করবেন। এখনই 'ডানা' (wings) বসাবেন না। যে ব্যবস্থা দেখছি, ও সুবিধে পেলে, মা এক দণ্ড দাঁড়াবেন না—এলেই উড়বেন; আমার ম্যানেজারী যাবে! কি ঝকমারিই করেছি! এদেশে এখন জয়ন্তীর ডাল পাই কোথা, আবার বেশ্যার দোরের মাটি। কি বিদকুটে ব্যবস্থা মশাই! সবই কি আমাকে করতে হবে? এ জানলে……"

দেবেনবাবু সকালে এসেই প্রতিমা সজ্জায় লেগে গেছেন;—ছেলে মেয়েরও গাঁজ লেগে গেছে। এদিকে বাবু, চাকর, মজুর দর্শক অনেকেই উপস্থিত।

তার মধ্যে একটী নগ্নপদ, দিব্যদর্শন গৈরিকধারী বলিষ্ঠ যুবা,—তড়িৎবাবুর কথা একাগ্রে শুনছিলেন আর মৃদু মৃদু হাসছিলেন। তড়িৎবাবু তাঁর দিকে চেয়েই থেমেছিলেন তাই আমাদের দৃষ্টিও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

নীরদ বাবু শ্বাসের ক্রিয়া করেন—আপিসেও বন্ধ থাকে না। Rule of three'ও চলে—শ্বাস regulate-ও চলে। এক মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে অতিক্রম করেন —বেশী হাওয়া না বেরিয়ে যায়। সুষুম্নাকে সযুৎ রাখাই তাঁর সর্ব্বক্ষণের কসরৎ। এগিয়ে যান, যে-হেতু ঝুটো সাঁচ্চার সমঝদার তিনি! তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে, এ পর্য্যন্ত যাঁরা এসেছেন তাঁর পরীক্ষায় শেষ পর্য্যন্ত কেউই ট্যাকেন নি। তাঁর অর্থপূর্ণ নিঃশব্দ হাসি, নির্ব্বিকার-দেরও বহির্দ্বার দেখিয়েছে।

এগিয়ে গেলেন!—"সাধুজির কোথা হতে আগমন?"

তিনি সহাস সুমধুর কণ্ঠে বললেন, "আমি সাধু নই। ঘুরে বেড়াই তাই ছোপানো কাপড়—ধোপা, ধোপার কড়ি দুয়েরই অভাব। গোদাবরী কুম্ভ ঘুরে গত রাত্রে এখানে এসে পোঁচেছি। মণ্ডপে আলো জলছিল, মায়ের কাছেই প'ড়ে ছিলুম।"

সুবিধা না পেয়ে নীরদবাবু বিশেষ ক্ষুণ্ণ হলেন। কিছু বলতেই হবে। "সাধু নন, কুম্ভের সখ?"

"কাযের মধ্যে যখন ঘোরা, গেলুমই বা।"

"কেন নিজের কায কিছু কি নেই? পরকালের কাযও ত' আছে! শুধু শুধু ঘোরাই বা কেন?"

"সে যে অনেক কথা। আর তা শুনেই বা আপনার লাভ কি হবে? যাদের ইহকালই নিজের নয়, তাদের পরকাল আছে কি?"

তড়িৎ বাবু বলিলেন "মাপ করুন নীরদবাবু, যখন পূজা ক্ষেত্রে এসে পড়েছেন উনি আমাদের অতিথি, নিশ্চয়ই কাল থেকে অভুক্ত।—কথাবার্ত্তা পরে হলে চলবে, আগে স্নানাহার করান। (সাধুর প্রতি) অন্ততঃ পূজার ক'দিন আপনাকে আমাদের অতিথি হয়ে থাকতে হবে।"

তিনি সহাস্যে বললেন—"কিন্তু কায দেবেন।"

তাঁকে বাসায় নিয়ে যাওয়া গেল। সকলেই সঙ্গ নিলেন, ধীর পদে, অর্থাৎ নীরদবাবুর চা'লে, যেহেতু তিনি কিছু বলবেনই এবং সেটা শোনবার মত কিছু হবেই।

অপাঙ্গে হাসি টেনে বললেনও, "সাধু কায চান!"

একজন বললেন, "কেন তাতে ক্ষতি কি?"

"আপনাদের আর ক্ষতি কি? ওঁর কথাই ভাবচি। শ্বাসের চাষ নেই, বেকার ঘোরা,"—ইত্যাদি।

আহারান্তে সাধুসমেত আড্ডায় জমায়েৎ। তিনি অতি মিষ্টভাষী ও মিশুক, অল্পক্ষণের মধ্যে আপনার হয়ে গেলেন।

নীরদবাবু এগিয়ে ব'সে বললেন, "যখন সাধু নন বলচেন, তখন নাম ধাম বিষয় কর্ম্ম বলতে আপনার আপত্তি থাকতে পারে না।"

"কিছু না। তবে আমার মত লোকের নামটা পরিচয়ের মধ্যেই নয়, যে নাম ইচ্ছা দিতে পারেন,—আমি নিজকে দেশভিক্ষুই বলি। উপাধি বন্দোপাধ্যায়, নিবাস বিষ্ণুপুর, কাযকর্ম্মের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো,—সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। লেখাপড়া 2nd year পর্য্যন্ত—পরীক্ষার অপেক্ষা সয়নি।"

"কেন ?"

"মনে হল লেখাপড়া তো চাকরির জন্যে! পরাধীন মানে দাস। আবার চেষ্টা ক'রে পাস্‌করা-দাস হওয়ার চেয়ে হরি-দাস হওয়াই ভাল। পাগলামী কত রকমের থাকে তো!"

"সেটা স্বীকার করেন ?"

"আমি না বললে—আপনি বলবেন তো ?"

নীরদবাবু সুবিধা না পেয়ে বললেন, "হরিদাস হয়ে করচেন কি ?"

"দেখাবার মত তো কিছু দেখতে পাইনে।"

তড়িৎবাবু ত্বরিত গতিতে ঘরে ঢুকেই সুরু করলেন, "মথুরা হালুয়াই বালুসাই যা বানিয়েছে, বাঘে চিবুতে পারবে না। প্রত্যেকের পাতে গেলাসের পাশেই এক একটি হামালদিস্তের ব্যবস্থা না করলে রক্তারক্তি। একেবারে Shell factoryর মাল, মেঘনাদ বধ দেখবার লোক থাকবে না। পুলিসে টের পাবার আগে সে গুলি পুঁতে ফেলাই যুক্তি, নচেৎ ম্যানেজারের 'বেলের' জোগাড় করুন—তাঁকে না জেলে পুজো দেখতে হয়।—এদিকে স্বভাবের একটা তাগিদ মেটাতে ঈশ্বরী প্রসাদের বাগানে গিয়ে নজরে পড়লো, নিম গাছে আমাদেরই একটা নতুন কলসী ঝুলচে—সর্ব্বাঙ্গে ঘিয়ের বসুধারা! উদিকে চিনির অমন দেড়মুণি থলে ভেনঘরে চুপসে থেবড়ে রয়েছে। যাত্রা পর্য্যন্ত দৌড় করাবে দেখছি। এখনও কোথায় কি, বোধনেই এই বিভ্রাট! দয়া ক'রে ইস্তফা নিন,—আপনারা মেঘনাদ বধ করুন বা পূজা রদ্ করুন—যথা অভিরুচি।"

ঝড়ের বেগে এতগুলি কথা কওয়ায় নীরদবাবু নিশ্চয়ই ভীত হচ্ছিলেন। আমরা না হাসতে পারি—না নিজেদের কাযের সমর্থন করতে পারি। রামচন্দ্রের only hope দক্ষিণ ও বাম হস্ত, তখনো অচল, তাঁদের পার্ট মুখস্ত হয় নি;—দেবেনবাবু মিত্র বিভীষণ, শরৎবাবু দুর্দ্দিনের ভাগ্যলব্ধ হনুমান,—স্মৃতি শক্তি উভয়েরই সমান। তাঁদের প্রাণ পড়ে রয়েছে পকেটে—পার্টের পুঁথিতে।

এখন উপায় ? সকলেই বললেন—"তাইতো!" একজন বললেন, "মথুরা বেটাকে মেরে তাড়াও।"

দেশভিক্ষু হাসিমুখে বললেন, "মার আর বধ না থাকলে বিজয়া হবে কি করে! যাক্ এঁরা বিজয়ার আয়োজন করুন, আপনি চলুন তো তড়িৎ বাবু, ভেনঘরের ভারটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসবেন। তার পর ও দিকটে আপনাদের না দেখলেও চলবে।"

নীরদবাবু চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না—গলা বাড়িয়েই—"কিন্তু—"

তড়িৎবাবু বাধা দিয়ে করযোড়ে বললেন, "নীরদবাবু ক্ষমা করুন। এ আপৎ কালে আর—'কিন্তু' কি 'কেন' ঝাড়বেন না। চারটে দিন দয়া করুন।"

"না, ওতে ওঁর—"

"কোনো ক্ষতি হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

তিনি দেশভিক্ষুকে নিয়ে চলে গেলেন। আমরা স্বস্তি বোধ করলুম।

নীরদ বাবু চটেন না, এইটি তাঁর সাধনালব্ধ মহৎ গুণ। চটলে দেহমধ্যস্থ জীবাণু সকল জখম হয়, তাতে শরীরের ক্ষতি তো হয়ই, আসল ক্ষতি যোগচ্যুতি ঘটে।

বললেন, "সাধুজির বুলি দুরন্ত বেশ। বলছিলেন না—'সকল জিনিসেরই মূল্য আছে, উচিত মূল্য দিয়ে পেতে হয়, তা না তো ঠক্‌তে হয়,—কিছু পেতে হলে তার ওজনের মূল্য দিতে শেখাই বোধ হয় বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ সাধনা।' কথা বেশ, কিন্তু কাযের বেলায় তো দেখছি লাড্ডু।

একজন বললেন, "সেটাও মূল্য দিয়ে পেতে হয়, সেই মূল্য দিতেই গেলেন।"

নীরদবাবু একটু অশব্দ হাসি হানলেন। তার পর রিহার্সেল চললো।

(৩)

আজ মহাষ্টমী, সকলেই উপবাসী। সন্ধি পূজা ছিল বৈকালে। তাও নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেছে,—অবশ্য পুরোহিতদ্বয় আর দেশভিক্ষুর দক্ষতায়।

সন্ধ্যারতির পর প্রসাদের পারণ সুরু হল।

নীরদবাবু বললেন, "সাধুজি উচিত মূল্য দিয়ে কি ওৎরালেন তা দেখা যাক্।"

কথাটা সকলেই অনুমোদন করলেন। দেশভিক্ষু নিজেই সকলকে দিতে লাগলেন। লুচি, আলুর দম, কচুরী, অমৃতি, বঁদে, পানতুয়া, বালুসাই, সন্দেশ, রসগোল্লা—সবই উৎকৃষ্ট এবং এদেশে দুর্ল্লভ।

সকলেই প্রবল পারণ করলেন। তড়িৎবাবু ভাঁড়ারের ভবিষ্যৎ ভেবে বিচলিত হতে লাগলেন।

সাধু নীরদবাবুকে বললেন, "মিষ্টান্ন সাত্ত্বিক আহার, দ্বিধা করবেন না।" তিনি পান্তুয়াটা প্রচুর ওড়ালেন। বললেন—"আপনি দেখচি যথেষ্ট একাগ্রতা এদিকে দিয়ে ফেলেছেন। এইটে যদি—"

"উচিত মূল্য না দিলে ইষ্টলাভ হয় কি? আপনারও ভাল লাগতো না।"

"ইষ্টই বটে!" ব'লে নীরদবাবু পান্তুয়া মুখে পুরলেন।

তড়িৎবাবু বললেন, "ওঁর অপরাধে পান্তুয়াকে আর নির্ব্বংশ করা কেন?"

বিপিনবাবু বিষয়ী লোক, তিনি প্রত্যেক জিনিষটি মুখে দেন আর ভাবেন—"ছাড়া হবে না,—এইখানেই দোকান করতে হবে। এ জিনিস পড়তে পাবে না। 'রেলের ফিরিঙ্গী এন্তোক কেলনার কোম্পানি নিয়ে যাবে। টাকা আমার—দশ আনা ছ'আনা।"

আহারান্তে আড্ডা জমলো। দেশভিক্ষুর ভাঁড়ার মিষ্টান্নে আর ঘৃতপক্কে পূর্ণ। তিনি ভাঁড়ারে চাবি দিলেন। তাঁকেও টেনে আনা হল। তাঁর প্রতি সকলের আজ শ্রদ্ধা সম্যক।

"আপনি খাবেন না?"

"আমি আজ খাই না।"

ওষ্ঠরুদ্ধ উপহাসের হাসির সঙ্গে নীরদবাবু আরম্ভ করলেন, "ও কষ্টটা মিছে আর পাওয়া কেন?—আপনাকে গেরুয়া আর পরতে দিচ্ছি না কিন্তু। স্বামী ভূতানন্দ থাকলে—"

"বড় সৌভাগ্য যে তিনি নেই, তা হলে ভাঁড়ারে কোন জিনিষের কণামাত্র থাকত না।"

"এই যে জানেন দেখছি। অত বড় যোগী আর—"

শরৎবাবু দেশভিক্ষুকে বললেন—"উনি যে তাঁর নাত্যানন্দ, শিষ্যের শিষ্য। স্বামীটে অবশ্য ওঁর পত্নীর।"

নীরদবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, "গুরুদেবকে তিনি সাত মাসেই 'নাল' তুলিয়েছিলেন,—ক্রিয়ার শেষ। হঠ যোগীর চরম প্রাপ্তি।"

"'নাল' তোলাটা কি?"

নীরদ আশ্চর্য্য হলেন, "নামও শোনেন নি। তবে আর ঘুরচেন কেন?—লাটিমও ত ঘোরে।"

দেশভিক্ষু হাসিমুখে বললেন, "লাটিমকে কেউ ঘোরায়, আমাকেও গ্রহে ঘোরায়। পরাধীনের বন্ধন মুক্তিই বোধ হয় চরম প্রাপ্তি, তার পর নির্ব্বাণ মুক্তির কথা মুখে আনা চলে! মুক্তির আস্বাদ যে জানিনা নীরদবাবু,—আস্বাদ পেলে না—চেষ্টা এগুবে?"

নীরদবাবু যেন ঘাবড়ে যাচ্ছিলেন। ভিক্ষু বললেন, "আমার বাজে কথায় কাণ দেবেন না। আপনার 'নাল তোলা' আসে?"

নীরদবাবু উত্তেজিত ভাবে বললেন—"আমার? গুরুদেবই হিম্‌সিম্ খেয়ে যান! দশ মিনিট দমবন্ধ করে কঠিন প্রক্রিয়ার দ্বারা সফল হন, চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, টস টস করে ঘাম পড়ে। আধঘণ্টা সামলাতে যায়—শুয়ে পড়েন। কাযটি তো সাধারণ নয়—দুর্ল্লভ, ভারতের বিশিষ্ট যোগী সম্প্রদায় মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু পারে ক'জন?"

"নিজে দেখে থাকেন তো বলতে আপত্তি আছে কি?"

"পরম গোপনীয় বটে। তবে সকলের সাধ্য যখন নয়, তখন আভাস দিতে পারি।"

গুরুদেবের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে বোধ হয় অনুমতি নিয়ে বললেন, "দু'হাঁটু গেড়ে দু' পায়ের গোড়ালির ওপর এই ভাবে (প্রদর্শন) ব'সে, শ্বাস রোধ করে আগ্রীব মেরুদণ্ড erect খাড়া রেখে, সুষুম্না পথে বায়ু সঞ্চালন

করতঃ চক্ষুস্থির ক'রে ধীরে ধীরে সমস্ত নাড়ীর ঊর্দ্ধ গতি করতে হবে। ক্রমে তারা একত্র হয়ে নাভি থেকে বক্ষ পর্য্যন্ত একটি নল আকারে এক ইঞ্চি স্ফীত হয়ে সুস্পষ্ট দেখা দেবে আর দু'ধারের কুক্ষিতে একদম খাল পড়ে গিয়ে পেট বেয়ালার আকার ধারণ করবে। এই যাঁরা পারেন, সমাধি তাঁদের মুঠোর মধ্যে। বহুজন্মে ও বহু ভাগ্যে এই চরম লাভটি ঘটে।"

ভিক্ষু অবাক হয়ে শুনছিলেন। সহসা উত্তরীয় খানা ফেলে, হাঁটু গেড়ে বসে, বললেন—"এই রকম কি?"

যেই বলা, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নীরদবাবুর বর্ণনার প্রতিচ্ছবি! দুই কক্ষ বিলীন, নাভি হতে বক্ষার্দ্ধ পর্য্যন্ত দেড় ইঞ্চি প্রশস্ত, আর দেড় ইঞ্চি উপরে (above surface) স্ফীতি!

হাসি মুখে নীরদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই কি?"

সে নীরদ বাবু আর নেই!—"কথা কবেন না কথা কবেন না," বলেই প্রণাম। নীরবে অবস্থান।

মিনিট দুই পরে তিনি সে ভাব সম্বরণ করলেন। যেমন মানুষ তেমনি,—না ছিল কসরৎ, না চোখ লাল, না ঘর্ম্ম। স্বাভাবিক ও সহজ।

নীরদ বাবুর এই পরাজয়ে সকলেই খুসি। নীরবে চোখ চাওয়া চাওয়ি। আশ্চর্য্যও সকলেই।

তিনি উত্তরীয় খানা নিয়ে উঠ্‌লেন। "রাত হয়েছে, সকালেই নবমী পুজা, সব ঠিক রাখা চাই। আপনাদের রিহার্সেল চলুক, খাটা চাই, মূল্য না দিলে মনের মত মাল মিলবেনা।" ব'লে হাসলেন। "আচ্ছা আপনারা জ্যান্ত কিছু খুঁজে পেলেন না বুঝি? মৃতকে মারবার অভিনয় কেন? একটা লোক কতবার মরবে?" ব'লে হাসতে হাসতে উঠে গেলেন।

কারুর মুখ থেকে কথা বেরুলো না। নীরদ বাবুর কথা ফুটলো—"অসাধারণ যোগী। আপনারা কেউ চিনতে পারেন নি।"

নীরদ বাবু চৌচাপটে চিৎ হয়ে পড়ায় তড়িৎ বাবুই সবার চেয়ে খুসি হয়েছিলেন। বললেন—"যাক্ একজন পারলেই হল, আমরা মারফতে মারবো। আমার চেনাটা অন্য রকম। আমাদের অবস্থা দেখে মা তাঁর পূজার ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছেন।"

হরকিষণ বাবু স্থানীয় অবস্থাপন্ন লোক, নর্ম্মদাকূলে পঞ্চাশ বিঘে বাগান আছে। বললেন, "ওঁকে রাখতে হবে, আমার বাগানে ওঁর ইচ্ছামত আশ্রম বানিয়ে দেবো, ছাড়া হবেনা।"

কথাটা বিপিন বাবুর ভাল লাগলো না। তাঁর মাথায় তখন 'পানতুয়া' ফুট কাটিছে,—initial expenditure-এর হিসাব চলছে।

(৪)

নৃত্য বাবু ড্রেসের (dressএর) জন্য সাত দেশ চষে বেড়িয়েছিলেন, পাঁচটা রয়েল ড্রেস্ চাই।

সবেগে আড্ডায় প্রবেশ ক'রে বললেন, "এই বুঝি আপনাদের রিহার্সেল হচ্ছে? জানেন কাল এমন সময়ে ব্যাপারটা কি!"

দোয়ারী বাবু প্রবীণ লোক; বললেন "সেই ভেবেই তো এঁদের হাত পা আসছে না।"

"না, তামাসার কথা নয়। নীরদ বাবু তো একটি 'হাপোর মালী' হাপুরে কসরতের জড়ভরত! বাজে কথার বৈশম্পায়ন, শত পৃষ্ঠাকে অষ্টাদশ পর্ব্ব করতে মজবুত। এদিকে চেড়িদের চুল মিলছে না।"

দেবেন বাবু মাথা চুলকে ধীরে ধীরে বললেন, "কেউতো চেনে না, কথাবার্ত্তাও নেই; বাড়ীর এঁদের ষ্টেজের পেছন দে এনে বসিয়ে দিলে, আর কোলে প্যাচা, টিকটিকি, পোঁটা, গুবরে থাকলে এই রিয়ালিজমের (realism এর) দিনে মানাবেও ভাল —দুর্ভাবনাও যাবে। তাঁরাও তাতে সর্ব্বানন্দ পাবেন।"

কে একজন hear hear বললেন। সকলে হেসে ফেললেন।

"ঠাট্টা নয় দেবেন বাবু, যাকে করতে হয় সেই জানে! রাজবাড়ীতে রয়েল ড্রেসের জন্যে এই পাঁচবার যাওয়া হল। নাপিত বাড়ী নেই, কোথায় গেছে, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না,—তোষাখানার চাবি নাকি বংশাবলী ক্রমে

নাপিতের chargeএ (জেম্বায়) থাকা নিয়ম। আবার ভোর না হতেই ছুটতে হবে!"

"কোন দিক সামলাবো,—এলাহাবাদে আজ টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার যাওয়া উচিত ছিল। সকালেই সেকেণ্ড ক্লাস বার্থের রিটার্ণ ফেয়ার পাঠাতে হবে, তা না তো হেমেন্দ্র বাবুকে পাওয়া যাবে না। গাইবে কে? সেরেফ রাবড়ী, রসগোল্লা আর আঙুর খান, তাই অমন মিঠে গলা রাখতে পেরেছেন; একাধারে প্রমীলার আওয়াজও পাবেন, স্মূর্পনখার আওয়াজও পাবেন,—চালাকি নয়।"

"হনুমানের গান নেই বুঝি, একটা ঢুকিয়ে দিন না, শোনা হয়ে যাক্। খরচটি তো কম নয়, ভাগ্যে আর জুটবে কিনা কে জানে।"

"এখন আসুনই আগে, তাঁদের পাওয়া সহজ নয়। তাঁর টাকাটা সময়ে পৌঁছলে হয়! উঃ তা না তো"—নৃত্য বাবু আর বলতে পারলেন না। চোখে সরষেঁ ফুল দেখলেন।

"এলাহাবাদে কি করেন?"

"কেলনারের কেরাণী।"

"বাপ, বার্থ রিজার্ভ! আমাদের বড়বাবুর যে ইণ্টার পর্য্যন্ত দৌড়!"

"গানটা একবার শুনবেন। আপনি যে একটিও কথা কচ্ছেন না নগেন বাবু?"

"আর কতক্ষণই বা আছেন, ভাই, আপনার কথাই শুনছি। কাল রাত পোয়ালে ত' আর শুনতে পাব না।"

হাসি পড়ে গেলো।

দেশভিক্ষুর চেষ্টা ও নিষ্ঠায় নবমী পূজা, কাঙালী ভোজন প্রভৃতি নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেল। হাসি মুখে কি পরিশ্রমই করতে পারেন!

রাতের বাবু-ভোজ স্বহস্তেই করালেন। বললেন,—"অভিনয় আছে, আজ একটু হাতে রেখে।"

কে একজন বললেন, "নৃত্যবাবুকে কিন্তু সাধ মিটিয়ে মনভোর খেয়ে নিতে দিন। উনি মেঘনাদ। আহা—"

লোকে লোকারণ্য। তড়িৎবাবু তিনটে আংটি প'রে বিজলী হেনে ফিরছেন—মেয়েদের না কোনো অসুবিধা হয়।

যারা মেয়ে সাজবে তারা ঘন ঘন পাণ খাচ্ছে, আর পাউডার মাখচে। সিগারেট জলছে নিবছে যেন আলেয়ার মত।

হেমেন্দ্র বাবু এসে গেছেন এবং সেরেফ এক ডজন রসোগোল্লা খেয়েছেন, ভোজন করেন নি,—গাইতে হবে।

কি কোলাহল! গ্রীণরুমে সাজো সাজো রব। নৃত্যবাবু বলচেন—"ওকি করা হচ্ছে? আগাগোড়া তো সাড়ী সেমিজ থাকবে; সর্ব্বাঙ্গে পাউডার লাগানো কেন?"

সকলের ঘরণীই এসেছেন। চিকের মধ্যে ঘন ঘন পাণের চালান চলেছে।

শরৎবাবু হনুমান। তিনি বেঁকে বসেছেন,—ভাল রয়েল ড্রেসটা তাঁর চাই, আর তাঁকে মহাবীর বলে সম্বোধন করতে হবে। এই কণ্ডিসনে (condition) তিনি হিউমিলিয়েসন হজম করতে পাবেন, নচেৎ এই নারী মণ্ডলীর সামনে—

তখন সকলে সব তাতেই রাজি। প্রভু রঘুনাথকে সাবধান করে দেওয়া হল—স্লিপ না হয়। আমি প্রম্‌ট করবো, আমাকেও।

হারমোনিয়মের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ উঠতেই সব নিস্তব্ধ।

ফুটলাইটের পরেই টেবল হারমোনিয়ম টিপছেন—হেমেন্দ্রবাবু। রোগা, এবং লম্বা। ভায়লেট রংয়ের সিল্কের লম্বা পাঞ্জাবী, সোণার বোতাম। লম্বগ্রীব, লম্বা লহরদার চুল, লম্বা ঈষৎ চড়ানো মুখের উপর লম্বা নাক, একদম প্রলম্বাসুর! পিচ কলারেব রুমাল উর্দ্ধে পুচ্ছে মাথায় জড়ানো। সিল্কের মোজার ওপর আনকোরা পামসু। পরনে কোঁচানো জরি পেড়ে ধুতি,—কন্দর্পও কিন্নরের সঙ্কর। অর্থাৎ যা হলে ঠিকটি হয় এবং পরবর্ত্তীদের প্রাণে পৌঁছে যায়।

হীরের (?) আংটী পরা লম্বা আঙুল হারমোনিয়মের পর্দ্দা স্পর্শ ক'রে যেন চুমকি বসিয়ে চলেছে। সহসা—

"কে রচিবে মধুচক্র" সুরু হলেই ক্লাপ্। টুঁটি অন্ধেও দেখতে পায় এমনি উবোলা। সে নড়ে চড়ে কণ্ঠের পর্দ্দা ঠিক করতে লাগলো।

গান শুনে সকলেই মুগ্ধ।—এনকোর।

অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল। আমি ডানা (wing) ঢাকা বেকার প্রম্‌টার। কেই বা কাণ দেয়! শাল্মলী তরুবরকে কলমী তরুবর; দাশরথীকে—দাশুরায়; রঘুজ অজ অঙ্গজকে রঘুজ ভুজ পঙ্কজ, চল্‌লো। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সিগারেট ধরালুম।

বাড়ীর মনোরথ পূর্ণ করবার জন্মে নীরদবাবুকেও চার লাইনের চিত্ররথ সাজতে হয়েছিল। কথাগুলো নিঃশব্দে তাঁর মুখের মধ্যে জব্দ আর স্তব্ধ হয়ে রইল।

শরৎবাবু হনুমান - বাড়ীতে বরাবর বলে এসেছিল—মহাবীর। প্রমীলাকে দেখে স্তব্ধ বিস্ময়ে বেজায় হাঁ ক'রে খট্টাসের মত চাইতেই, চিকের মধ্যে নারী-কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল "আঃ পোঃ...ওযে বেটাছেলে! কেউ বলে দিক্ না গা!"

কলহাস্য। একজন জিজ্ঞাসা করলেন—কর্ত্তা কি সেজেছেন না?

"মহাবীর।"

শুনে সকলেই হাসিঢাকা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করেন।

এমন সময় বেসামালে শরৎবাবু নিজমুখেই বামাল বার করে ফেললেন—"হনুমান নাম মম—রঘুদাস আমি"

আমি তাড়াতাড়ি মহাবীর মহাবীর বলে চেঁচালুম। Too late.

চিকের ভেতরকার অবস্থা অবর্ণনীয়। শরৎগৃহিণী ছেলেকে কাঁদিয়ে উঠে গেলেন।

আমরা ভীত। তারপর আর শরৎবাবুর একটিং (acting) জমে নি। জমেছিল নাকি বাড়ীতে।

তড়িৎবাবু চিত্রাঙ্গদা, কান্নায় ফার্ষ্ট প্রাইজ নিলেন। সকল মেয়েই চোখ মুছেছিলেন।

হেমেন্দ্রবাবু সাত গানে মাত করে আর অশ্রুপাত করিয়ে জয়মাল্য পেলেন। শেষ দেশভিক্ষুর অনুরোধে ড্রপের বাইরে এসে প্রভাতে যখন ধরলেন—

কবে আসিবি গো মা পুনঃ ভবনে,
এ প্রাণ জুড়াব কবে পুনঃ মুখ দরশনে।

তখন বাঙালীর প্রাণ অন্তরের এই সত্যিকার প্রার্থনায় সহজেই চোখের জলে যোগ দিয়েছিল।

নৃত্যবাবু গ্রীণরুমে তালা লাগালেন। হেমেন্দ্রবাবু ট্রেণ আটটায়,—তিনি বিজয়ীর মত Ivory handle চেরি ষ্টিক ঘোরাতে ঘোরাতে সকলের সকৃতজ্ঞ সমাদর আদায় ক'রে গাড়িতে উঠে পড়লেন।

দশমীর প্রভাবটা সকালেই সকলকে পেয়ে ব'সে অবসাদ আর অবসন্নতা এনে দিলে। অভিনয় সমালোচনার উত্তেজনা কারো এল না। সকলেই বাসায় চ'লে গেলেন। কেবল দেশভিক্ষু তড়িৎ বাবুকে টেনে রাখলেন।

বেলা তিনটের পর সকলে একত্র হয়ে এসে দেখি,—বাসন, ল্যাম্প,—মায় সামিয়ানা, যথাস্থানে সব ফেরৎ গেছে। পুরোহিতের পাওনা, ট্রেণ ভাড়া, চাকর মজুরের পাওনা বকসিস, ফর্দ্দ ক'রে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যা এক সপ্তাহে মিট্‌তো, দেশভিক্ষু তড়িৎ বাবুকে তার পনেরো আনা দায়মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। তাঁর দুর্ভাবনার এতটুকু কারণ রাখেন নি, তাঁকে একদম স্বচ্ছন্দ করে দিয়েছেন।

বরণ শেষ হলে বেলা চারটের পরই প্রতিমা নিয়ে ব্যাণ্ডসহ সমারোহে রওনা হওয়া গেল। নর্ম্মদা প্রায় পাঁচ মাইল। শরৎ বাবুকে কেবল পাওয়া গেল না।

ঘাটে নৌকা প্রস্তুতই ছিল। সন্ধ্যার পর নিরঞ্জন শেষ করে সহরের পথে ফেরা গেল। দেশভিক্ষুর সে হাসিমুখ সে উৎসাহ যেন নিবে গেল। তিনি উদাসভাবে পথের একপাশ ধরে চল্‌লেন।

দেবেন বাবু চোখে হাসির আভাস নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—"মাটির মায়ের তরে আপনার যে বড় এ ভাব?"

তিনি কাতর নয়নে বললেন, "মাটির মা-ই ত' সত্যিকারের মা দেবেন বাবু! রক্তমাংসের মা হলে—'অমৃতস্য পুত্রা' হতুম্ কি ক'রে? দেশ চিরদিনই মাটির, তিনিই সন্তানদের বুকে ক'রে লালন পালন করেন, সকল উপদ্রবই সহ্য করেন, ক্ষমা করেন! তাঁর বুকে থেকেও চিনতে পারি না। যাঁরা চিনেছিলেন—তাঁরা তাই মাটির মা গোড়ে পূজা করেছিলেন—তাই তো মায়ের সত্যিকারের প্রতীক। পরের মুখের নয়। এ ভুল যে দিন ভাঙবে সে দিন বিসর্জ্জন আর দেব না,—অর্জ্জনের দিন আসবে। আজও বিসর্জ্জনই দিচ্ছি।

একটি গভীর নিঃশ্বাস পড়লো, একটু ম্লান হাসি দেখা দেখা দিলে।

* * * *

সহরের মাঠেই এসে পড়া হয়েছিল। সহসা অনেকেই বলে উঠলো, "নিকটে কোথায় আগুন লেগেছে,—কি হল্‌কা উঠ্‌ছে!"

দেশভিক্ষু কথা না কয়ে ছুটলেন। আমরাও দ্রুত চললুম।

গিয়ে দেখি জৈন পাড়ায় ভীষণ আগুনের খেলা। দশমীর উৎসব এদেশেও আছে, ছেলেরা বাজি পুড়িয়ে এই বিভ্রাট ঘটিয়েছে।

জৈনীরা পরশনাথের সেবক,—বড় বড় ধনী। পরশনাথের রথ বারকরা তাঁদের পরম সৌভাগ্য ও সম্মানের কথা। লক্ষ টাকার কমে সে কায সম্পন্ন হয় না।

তাঁরা সেই রথ বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত। বাড়ীর ওপরকার বারাণ্ডায় একটি পাঁচ বছরের ছেলে মা মা বলে চীৎকার করছে,—তার খোঁজ খবর কেউ নেয় নি, সে বেড়া আগুনের মধ্যে! বাড়ীর নীচে চারিদিকের খোলার চালগুলি দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। তার মা ছুটে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

উপরে ওঠবার উপায় নেই। সকলেই বিমূঢ়। চেয়ে দেখি দেশভিক্ষু একখানা কম্বল হাতে তার পাশে উপস্থিত! কাপড় আর মাথার উত্তরীয় জ্বলছে। নিমেষে ছেলেটিকে কম্বলে জড়িয়ে—"লেও" বলেই ছুঁড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে লাফ।

বোধ হয় বলে গিয়েছিলেন,—কয়েকজন 'পাশী' জোয়ান প্রস্তুতই ছিল, তারা ধ'রে নিলে।

বোধ হয় সে অবস্থায় তাঁর পায়ের আর দৃঢ়তা ছিল না, নিজে নীচে না পড়ে জ্বলন্ত খোলার চালের কিনারায় এসে পড়লেন,—লেলিহান্ চিতার মধ্যে! তার পরই নীচে।

ছুটে গিয়ে তাঁকে সরিয়ে তফাতে আনতে পারি না—সব জ্বলছে। তাঁর মুখ থেকে বেরুলো "মাটি" (যা ছিল তাঁর মায়ের পরশ)।

আঁজলা আঁজলা মাটি দিয়ে নিবিয়ে উত্তাপের বাইরে আনা গেল।

"এ কি কর্‌লেন।"

"পাবার মূল্য যে দিতে হয়" ব'লেই চোখ বুজলেন। সুমিষ্ট হাসিতে সারা মুখখানি আলো হয়ে রইল। আর সব নিবে গেল।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভোরের কামিনী

(গল্প)

কোন্ স্মরণাতীত কালে যোগেশ নাকি তার মাকে বলিয়াছিল, সে পরীর মত সুন্দরী বধূ আনিবে।

শৈশবের সে কথা যোগেশ ভুলিয়া গেলেও মা ভোলেন নাই, তাই যোগেশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মা তাহার শৈশবের কথাটি স্মরণ করিয়া পরীর মত সুন্দরী বধূ খুঁজিতে লাগিলেন।

অবশেষে পাত্রী স্থির হইল,—বিবাহ করিয়া যোগেশ বধূ সহ ফিরিলে সকলে স্বীকার করিল, বধূ পরীই বটে! বধূর নাম পবিত্রা।

শুধু ননন্দারা বলিল, বৌয়ের মুখে হাসি নেই বাপু, অতবড় মেয়ে অমন কেন?

সুন্দরী পত্নী পাইয়া যোগেশের আনন্দের সীমা ছিল না। ফুলশয্যা হইয়া গেলে উৎফুল্ল হৃদয়ে সে পত্নীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া তাহার মুখখানি নিজের দিকে ফিরাইয়া দেখিল তাহার চোখে জল টলটল করিতেছে।

বালিকা হইলে ইহা অশোভন হইত না, কিন্তু পবিত্রার মত ষোড়শীর পক্ষে এটা যেন যোগেশের কাছে একটু বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হইল। তবু সে শান্ত

ভাবেই তাহার চোখ মুছাইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল, বাপের বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে ?

পবিত্রা মাথা হেট করিয়া রহিল। যোগেশ বলিল, সাত আট দিন পরে ত যাবেই, কাঁদছ কেন ?

পবিত্রা নিরুত্তর।

তাহার পর যোগেশ অনেক গল্প করিল, অনেক কথা বলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উৎসাহ পাইল না। যে কথার উত্তর না দিলেই চলেনা, পবিত্রা শুধু তাহারই উত্তর দিল। যোগেশ মনকে সান্ত্বনা দিল, প্রথম দিন বলিয়া সঙ্কোচ বশে কথা কয় নাই।

কিন্তু সাত আট দিন একত্র বাসের পরও সে পবিত্রার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখিল না। শুধু যোগেশই নয়, বাড়ী শুদ্ধ লোক বয়স্থা বধূর হাসিহীন মুখ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল।

বিদায়ের দিন যোগেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে আসবে ?

যেদিন আনবে।—সম্পূর্ণ নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর।

যোগেশ হতাশ হইল।

পিত্রালয়ে গিয়া পবিত্রা যোগেশকে পত্র দিল। সম্বোধন-শূন্য তিন ছত্রের পত্র, শুধু পৌঁছান সংবাদ মাত্র এবং কুশল প্রশ্ন। পত্র দেখিয়া যোগেশের সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিল। সে মনে মনেই বলিল, এই চিঠির আবার উত্তর কি দেবো ? দেখি উত্তর না পেয়ে কি করে !

দিন দশ পরে আবার পত্র আসিল, পূর্ব্বের মতই সম্বোধন-শূন্য এবং ক্ষুদ্র। যোগেশ রাগ করিয়া লিখিল, পবিত্রা যদি চিঠির মত চিঠি লেখে তবে যেন তাহাকে লেখে, নচেৎ তিনছত্রের পত্র সে চাহে না।

সেটা ১৯২৫ সাল, তখনও এলাহাবাদে নিখিল ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা হইত। যোগেশ বাংলা হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া গেল।

এলাহাবাদে পরিচিত কেহ না থাকায় সে চেষ্টা করিয়া একটা হষ্টেলে থাকার বন্দোবস্ত করিল, সে এবং আরও দুটী বাংলার নির্ব্বাচিত ছাত্র এক হষ্টেলেই রহিল।

একদিন পরীক্ষা দিয়াই কিন্তু যোগেশ জ্বরে পড়িল। পাশের ঘরের হিন্দুস্থানী ছাত্রটি তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল ; তাহার সাথীরা পরীক্ষার দরুণ তখন ব্যস্ত।

যোগেশ খাটে পড়িয়া মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। এ বৎসরটা তাহার মাটী। কতদূর হইতে সে কত আশা বুকে লইয়া পরীক্ষা দিতে আসিয়াছে, কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম হইল ! এতগুলা টাকা খরচ করিয়া বিদেশে শুধু রোগ ভোগ করিতে আসিল মাত্র !

যে হিন্দুস্থানী ছেলেটি তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছিল, সে দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, তাহার পিছনে আর একটী বাঙ্গালী যুবকও আসিল।

ইন্দ্রসিং যোগেশের কপালে হাত রাখিয়া বলিল, এ বেলা কেন আছেন ?

যোগেশ ধন্যবাদ দিয়া জানাইল সে সকালের মতই আছে।

ইন্দ্রসিং নিজে একটা চেয়ার টানিয়া বসিল, এবং বন্ধুকে একখানা টানিয়া দিয়া বলিল, ঘোষবাবু, ইনি আমার বন্ধু মিঃ সুনীল আইচ। বি-এস-সি পাশ ক'রে এখন এগরিকালচার লাইনে কায করছেন।

যোগেশ আলাপ করিয়া বলিল, থাকেন কোথায় ?

সুনীল বলিল, নাইনি সাইডে আমার ফার্ম্ম, সেখানেই বেশি থাকি, তবে মধ্যে মধ্যে এখানে এসেও থাকি।

সুনীলের গলা শুনিয়া আরও দুই তিনটি ছেলে প্রবেশ করিল। গল্প হইতে লাগিল।

ইন্দ্রসিং বলিল, মাঘ মাসে আমার বিয়ে সুনীল, তোমায় কিন্তু যেতে হবে।

সুনীল বলিল. বলা বাহুল্য আমি ত যাবই।

জীয়ারাম নামক একটি ছেলে বলিল, তোমার বিয়ে কবে হবে সুনীল ?

সুনীল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হবে না।

ইন্দ্রসিং বলিল, হবে না বৈকি। পিসিমাকে কালই বলছি আমরা—

সুনীল হাসিয়া বলিল, বোলো। পিসিমা আমার অমতে কিছুতেই আমার বিয়ে দেবেন না।

জীয়ারাম বলিল, তোমার অমত কিসের ? ভিতরে কিছু রোমাণ্টিক ব্যাপার আছে নাকি ?

সুনীল চুপ করিয়া রহিল।

বন্ধুর দল আর ছাড়ে? তাহাকে পীড়াপীড়ি খোঁচাখুচি করিতে লাগিল।

সুনীল বলিল, বলতে আমার আপত্তি নেই, তবে রোগীর ঘরে ব'সে অত কথা কওয়া যুক্তিসিদ্ধ কি?

যোগেশ গায়ের লেপখানা টানিয়া বলিল, না, না, আপনি বলুন। চুপ করে ত দিন রাতই পড়ে আছি, না হয় একটু গল্পই শোনা যাক।

ক্ষণকাল নিঃশব্দ নতমুখে থাকিবার পর সুনীল মুখ তুলিয়া বলিল—

ও বছর আমার অসুখ হতে আমি প্রায় তিন মাস খাটে পড়ে ছিলুম, তোমরা জানই। একটু সারলে ডাক্তার পাহাড়ে যেতে বল্লেন। পিসিমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নির্জ্জন পাহাড় স্থির করা হল বাগেশ্বর। আলমোড়া থেকে সাতাশ মাইল দূর। বাগেশ্বর ছোট সহর, সম্বলের মধ্যে একটি ডিস্‌পেনসারী, একটি স্কুল, একটি পোষ্ট অফিস।

ছোট জায়গা হলে কি হবে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তার অসীম। সহরের মাঝ দিয়ে তীব্রস্রোতা সরযূ নদী বয়ে যাচ্চে—তার দুই কূলে সহর; দক্ষিণকূলে 'মেন' বাজার সেই দিকেই ভাল বাড়ী ঘর। ওপর তলায় লোক বাস করে, নীচে দোকান। একটা সাস্পেনশন্ ব্রিজ মাঝে থাকায় কোন অসুবিধা নেই। একটু নীচে নেমে গোমতী নদী ও সরযূর সঙ্গম। উঃ কি তীব্র জলস্রোত সেখানে; গভীর নয়, স্বচ্ছ কাঁচের মত জল, কিন্তু পা রাখে কার সাধ্য! বড় বড় পাথর সেই অগভীর জলের বেগ সহ্য করতে না পেরে কেটে ভেসে চূর্ণ হয়ে যায়। পিসিমা সঙ্গে গিছলেন, তাঁর যত্নে আর সেখানের জল বাতাসের গুণে পনের দিনেই খুব সেরে গেলুম।

বাগেশ্বরের আর এক হিসেবে বৈশিষ্ট্য আছে, তার থেকে কয়েকটি বড় বড় রাস্তা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণে আলমোড়া ও বিনসর, পশ্চিমে সোমেশ্বর, উত্তর পশ্চিমে গাড়োয়াল, উত্তরে পিণ্ডারী গ্লেসিয়র, পূর্ব্বে থাল, আর আলিলাম ভেলী তিব্বতে যায়।

প্রায় দিন কুড়ি পরে একদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি বিনসরের দিক থেকে ফিরছি, হঠাৎ দেখি দুটী মেয়ে দেবদারু গাছের কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে। কাছে এসে বুঝলুম তারাও বাঙ্গালী। আশ্চর্য্য হয়ে বলে ফেল্লুম—তোমরা বাঙ্গালি? মেয়ে দুটীর মধ্যে একটি বছর বারো, আর একটি বড় জোর পনের হবে। তারা স্বীকার ক'রে বল্লে, আপনিও ত বাঙ্গালী?

হাঁ। কোথায় নেমেছ তোমরা? কবে এসেছ?—

কাল এসেছি। পাইন কটেজে নেমেছি।—

শুধু বেড়াতে এসেছ, না কিছুদিন থাকবে?—

থাকব। আমাদের ছোট ভাইটির যে অসুখ।—

সঙ্গে কে আছেন?—

ছোট কাকা।—

কথা কইতে কইতে একটু এগিয়ে এসেছি, এমন সময় ছোট মেয়েটি হঠাৎ বললে, ঐ যে ছোট কাকা!

সুনীল একটু থেমে বল্লে, ছোটকাকার নাম গিরীন্দ্র বাবু।—তাঁর সঙ্গে আলাপ হল, প্রায় আমারই বয়সী, কিছু হয়ত বড়। লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটীর গ্রাজুয়েট। উপস্থিত তাঁর দাদার সঙ্গে খেরীতে জঙ্গল জমায়েতের ব্যবসা করেন।

গল্প শুনিতে শুনিতে যোগেশ চঞ্চল চোখে সুনীলের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

সুনীল বলিতে লাগিল—সকালেই গিরীন্দ্রবাবু তাঁর ভাইঝি দুটী, পবিত্রা ও বিচিত্রাকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। পিসিমার আনন্দের সীমা রইল না।

দুপুরবেলা আমরা তাঁদের বাড়ী গেলুম। খুব জোর তাস খেলা হ'ল, তারপর বাড়ী ফিরলুম। এমনি করে আমাদের ভাব হয়ে গেল।

গিরীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। প্রত্যহ তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতুম। পবিত্রা, বিচিত্রাও সঙ্গে থাকত। পবিত্রার ওপর আমার একটা আকর্ষণ পড়ে গেল।

যোগেশ লেপের ভিতর দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল।

সুনীল বলিয়া চলিল—তারপর এমন হ'ল যে, যদি কোন দিন কোন কারণে গিরীন্দ্রবাবু না আসতে পারেন, তাহলে শুধু পবিত্রা বিচিত্রাই আমার সঙ্গে যেত। সেদিন গিরীন্দ্রবাবু আসতে পারেন নি, পূর্ব্বদিন পা মচকে ব্যথা হয়েছিল। পবিত্রা বিচিত্রা আমার সঙ্গে বেড়াতে গেল।

আমরা পথ ছেড়ে পাহাড় ভেঙে চলেছি। এক জায়-

গায়ে একটা উঁচু পাথর বিচিত্রা ডিঙুতে পারবে না ব'লে তাকে কোলে করে তুলে দিয়ে, পবিত্রার দিকে চাইতেই সে বল্‌লে, আমায় সাহায্য করতে হবে না।

পড়বে না ত?

না, বলে সে পাথর ধরে উঠতে লাগল, কিন্তু তার জুতোর হিল ফস্‌কে আর একটু হলেই সে গর্ত্তে পড়ে যেত,—আমি চট্‌ ক'রে তার হাত ধরলুম, সে তখন শূন্যে ঝুলছে। আমিও আর একটু হলেই তার সঙ্গে গর্ত্তে পড়তুম, কিন্তু কোন রকমে সামলে নিয়ে তাকে আস্তে আস্তে টেনে তুললুম। পবিত্রা যখন উপরে উঠল তখন তার কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে।

তার সেই ভয়কাতর মুখ দেখে আমার কেমন আত্ম-বিস্মৃতি এলো, আমি রুমাল বার করে তার মুখ মুছিয়ে দিলুম।

বিচিত্রা ভয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল, পবিত্রা তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে খুব কুণ্ঠিত ভাবে আমায় বললে, আমায় তুলতে খুব ভার লাগল?

আমি বললুম, তুমি আমার ভার নও।—তার দিকে ঝুঁকে চুপি চুপি বললুম, ঐ ভারটা বইতে পারলে বেঁচে যাই যে!

পবিত্রা ভ্রুভঙ্গী করে বললে, আহা, চিত্রা রয়েছে না?

আনন্দে আমি দিশাহারা হয়ে গেলুম। পবিত্রা অস্বীকার করেনি, বিরক্ত হয়নি, যেটুকু বলেছে, তা প্রথম প্রণয়ের ভয় আর লজ্জা!

দ্বিতীয় দিনে পবিত্রার সঙ্গে দেখা হতে সে বললে, কাল চিত্রার কাণে আপনার কথা গিয়েছিল।

কি বললে?

বড্ড নিরীহ কিনা, ধমক দিলুম চুপ করে রইল।

আমি তাকে পীড়াপীড়ি করে বললুম, কালকের কথার উত্তর দাও, আমি প্রত্যাশায় রয়েছি।

পবিত্রা মাথা হেঁট করে রইল। বারম্বার জিজ্ঞাসা করায় আস্তে আস্তে বললে, আমি ত কালও না বলিনি……

* * * * *

পিসিমাকে কথাটা জানালুম।

পিসিমাও পবিত্রাকে বউ করবার জন্যে ভারী উৎসুক হয়েছিলেন। তিনি তার পর দিনই পবিত্রার মায়ের কাছে কথা তুললেন। স্থির হল আমার বাবার আর পবিত্রার বাবার মত নেওয়া হবে।

ক'দিন পরে বাবার চিঠি এলো, বাবার অমত নেই। কিন্তু গিরীন্দ্রবাবু এসে ম্লান মুখে জানালেন, এ বিবাহ হবার নয়।

ইন্দ্র সিং প্রশ্ন করিল, কেন?

সুনীল বলিল, মেজকাকা একটি সিন্ধি মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন, আর তাঁর পরামর্শে বাবা আমার ছোট বোনের সঙ্গে এক পাঞ্জাবীর বিবাহ দিয়েছিলেন।

জীয়ারাম জিজ্ঞাসা করিল, তারপর?

তার পর আর কি, পাঁচ ছ'দিনের মধ্যেই তাঁরা বাগেশ্বর ছেড়ে দেশে ফিরলেন। আসবার আগের দিন বিকেলে পবিত্রার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে একটি কথাও উচ্চারণ করলে না, শুধু তার গাল বয়ে জল পড়তে লাগল।

আমরাই বলবার বা কি ছিল?—নিঃশব্দেই তার কাছে বিদায় নিয়ে এলুম।

সুনীল থামিল; সমস্ত ঘরখানা যেন করুণতায় ভরিয়া গেল।

পরদিন সুনীল ইন্দ্রসিংহের সহিত দেখা করিতে আসিয়া শুনিল, যোগেশের পীড়া কঠিন হইয়া উঠিতেছে। চিকিৎসক আজ ভয় পাইয়াছেন।

ইন্দ্রসিং ভীতভাবে বলিল, যদি বেশী দিন ভোগেন, তাহলে কি হবে তাই ভাবছি।

সুনীল একটু চিন্তা করিয়া বলিল, ডাক্তার আর ওয়ার্ডেনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, যদি তাঁরা স্বীকার করেন, আমি তাহলে যোগেশ বাবুকে নিজের বাড়ী নিয়ে যাই। সেখানে সেবা চিকিৎসা সবেরই সুবিধা হবে।

যোগেশের সহিত যাহারা আসিয়াছিল তাহারা সম্মত হইল; সুনীল তখন ডাক্তার ও ওয়ার্ডেনের অনুমতি লইয়া নিজ বাটীতে যোগেশকে লইয়া গেল। তাহার সঙ্গীদের যোগেশের বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিতে বলিল।

যোগেশ যখন সুনীলের বাড়ীতে আসিল তখন তাহার ঘোর বিকার ; সুনীল ও পিসিমা তাহার সেবা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ দিনে সুনীল যোগেশের পিতার টেলিগ্রাম পাইল, তিনি পত্নী ও বধূ সহ রওনা হইতেছেন, ষ্টেশনে লোক থাকিলে ভাল হয়।

প্রৌঢ় কর্ত্তা, অশ্রুমুখী মাতা, এবং অবগুণ্ঠনবতী বধূ অবতরণ করিলেন। বাড়ী আসিয়া অজ্ঞান পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন, বধূ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

পিসিমা যোগেশের মাকে বসিতে বলিয়া বধূর হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া তাহার গুণ্ঠন মোচন করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, একি! তুমি! পবিত্রা!

পবিত্রা আরক্ত স্ফীত দৃষ্টি তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিল।

সন্ধ্যার কিছু পরে খালি ঔষধের শিশিগুলা লইয়া সুনীল নীচে নামিতেছিল, বারান্দা পার হইতেই ঠিক সিঁড়ির মুখেই পবিত্রার সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। পবিত্রাও এইমাত্র নীচে হইতে আসিতেছে।

বিস্মিত বিমূঢ় সুনীলের মুখ দিয়া বাহির হইল—পবিত্রা, তুমি!

পবিত্রা সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর পবিত্রা মাথার কাপড় টানিয়া মৃদু পদে চলিয়া গেল।

শিশিটা চাকরের হাতে দিয়া সুনীল কোনমতে গিয়া ধপাস করিয়া শুইয়া পড়িল। পবিত্রাকে দেখিয়া তাহার চিন্তাশক্তি যেন বিকল হইয়া গেল। কি করিয়াছে সে,—কি করিয়াছে! যোগেশের সম্মুখে সে যে বাগেশ্বরের সকল কথাই অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়া ফেলিয়াছে। সেই রাত্রি হইতেই যোগেশের মস্তিষ্কের গোলযোগ, তাহার পীড়াও বাড়িয়াছে। যদি সে না বাঁচে, তবে তাহার জন্য সুনীলই ত দায়ী!

৫

পীড়া একই ভাবে চলিল—বিরাম নাই, শান্তি নাই, উপশম নাই। পবিত্রা অক্লান্ত হস্তে সেবা করিতে লাগিল। পবিত্রার পিতা আসিয়া জামাতাকে দেখিয়া গেলেন। কথার ভাবে মনে হইল এরূপ আকস্মিক ভাবে সুনীলের বাড়ী পবিত্রা আসায় তিনি একটু চিন্তিত হইয়াছেন। ছাব্বিশ দিন পরে যোগেশের চেতনা হইল। পবিত্রা মাথায় আইসব্যাগ ধরিয়া বসিয়াছিল, যোগেশ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে বলিল, তুমি কে ?

পবিত্রা তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, চিনতে পারছ না? আমি পবিত্রা।

যোগেশ অস্পষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, পবিত্রা, পবিত্রা? পবিত্রা, কার পবিত্রা?

ইহার পর সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে যোগেশ মাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কোথায় আছি? এ কার বাড়ী?

মা তাহাকে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সুনীল চিকিৎসক সহ প্রবেশ করিল দেখিয়া তিনি বলিলেন, এখন বেশ জ্ঞান হয়েছে বাবা।

সুনীল তাহার কাছে আসিয়া নত হইয়া বলিল, এখন কেমন আছেন? আমায় কোথাও দেখেছেন মনে হয়?

যোগেশের চোখের দৃষ্টি কেমন প্রখর হইয়া উঠিল। বলিল, হাঁ, এলাহাবাদে, হিন্দু বোর্ডিংয়ে। আপনি সুনীল বাবু। একটু থামিয়া বলিল, আমি কোথায় এসেছি?

সে যখন তাহাকে চিনিয়াছে, তখন অবশ্য পূর্ব্বকথাও মনে পড়িয়াছে ভাবিয়া সুনীল মাথার দিকে অপসৃত হইতে হইতে বলিল, এলাহাবাদেই, আমার বাড়ীতে।

মা বলিলেন, সুনীল আমার পেটের ছেলের বাড়া, যা করেছেন, সুরেশ রমেশও এত পারত কি না সন্দেহ!

যোগেশ চোখ বুজিয়া বলিল, উনি খুব ভদ্রলোক!

সুনীলের মনে হইল সেটা যেন শ্লেষ! সে চোরের মত সরিয়া পড়িল।

মা উঠিয়া গেলে পবিত্রা আসিয়া বলিল, একটু বেদানার রস দিই?

যোগেশ তাহার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি সরাইয়া বলিল, তুমি কেন? মাকে ডাক।

মা আহ্নিকে বসেছেন, সারা হলেই আসবেন। এখন একটু খাও।

মা আসিলে যোগেশ বলিল, তুমি ত রয়েছ মা, ওকে এখান থেকে যেতে বলনা।

মা মনে করিলেন, সেবা করিয়া বধূ ক্লান্ত হইয়াছে, তাই সে তাহাকে বিশ্রাম দিতে বলিতেছে। তিনি সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন, যাও মা, একটু ঘুরে ফিরে এস। রোগীর ঘরে বন্দী হয়ে ছেলেমানুষ সারা হয়ে গেলে। —পবিত্রা একটু ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া গেল।

ইহার পর মা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন যে, যোগেশ সর্ব্বদা পবিত্রতার সঙ্গ পরিহার করিতে ব্যগ্র, পবিত্রাকে দেখিলেই তাহার মুখে বিরক্তির ছায়া পড়ে, সে চোখ বুজিয়া থাকে।

মা মনে করিলেন, ছেলে রোগের জন্য খিট খিটে মেজাজ হইয়াছে।

মাঝে কয়েক দিনের জন্য সুনীল তাহার আবাদে গিয়াছিল। সে দিন যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি হইয়াছে।

সে দিন একাদশী। পিসিমা শয্যা লইয়াছেন। খাওয়া সারিয়া সুনীল যোগেশকে দেখিতে গেল। মা পাশের ঘরে শুইতে গিয়াছিলেন, পবিত্রা মাথার কাছে র‍্যাপার জড়াইয়া বসিয়া যোগেশের মাথায় হাত বুলাইতেছিল।

ঘরের আলো অত্যন্ত মৃদু এবং রোগীর প্রতিকূল দিকে থাকায় শুশ্রূষাকারিণী যে কে তাহা সুনীল বুঝিতে পারিল না; জুতা খুলিয়া নিঃশব্দ পদে কাছে আসিয়া দেখিল, পবিত্রা!

এক মুহূর্ত্ত সে ভাবিল, কি করিবে? পলায়ন? কিন্তু কেন? পবিত্রার রুগ্ন স্বামীর কুশল প্রশ্ন করাটার অধিকারও কি তাহার নাই?

সুনীল মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, জ্বর হয়েছে?

পবিত্রা ঘাড় নাড়িল।

এখন কত জ্বর?

পবিত্রা নিরুত্তরে টেবিলের উপর হইতে চার্টখানা তুলিয়া দিল।

সুনীল যে দিকটায় দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখে সমস্ত আলোটা পড়িতেছিল। আলোটা সে আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া চার্টের উপর চোখ বুলাইয়া বলিল, রাত্রি আটটায় শেষ দেখা হয়েছে, এখন ত এগারটা, একবার দেখলে হত না?

পবিত্রা কথা কহিল না, শুধু থার্ম্মোমিটরটা আগাইয়া দিল।

সুনীল সন্তর্পণে থার্ম্মোমিটর লাগাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জ্বর দেখিয়া চার্টে তুলিয়া বলিল, জ্বর ত বেশী নেই, তুমি শুতে যাও না, আমি বসে থাকছি।

পবিত্রা শুধু ঘাড় নাড়িল।

সুনীল বলিল, কেন, যাওনা। আমি বসে থাকব, মা এলে তবে যাব। তুমি ত প্রায় সমানেই দেড়মাস ধরে রাত জাগছ, যাও একটু আরাম কর।

পবিত্রা অবনত মুখে ঘাড় নাড়িল।

সুনীল আর একটু দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

যোগেশ এসময় জাগিয়াই ছিল, এবং মিটিমিটি চোখে তাহাদের লক্ষ্য করিতেছিল। সুনীলের পদশব্দ মিলাইয়া গেলে সে পবিত্রতার দিকে চাহিয়া বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলিল, ওঁর যদি তোমার জন্যে এতই ব্যথা, তবে শুতে গেলে না কেন?

পবিত্রা চমকিয়া ফস করিয়া বলিয়া ফেলিল, তুমি জেগে আছ?

থাকাটাই দেখছি অন্যায় হয়েছে!—বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

পবিত্রা বসিয়া কাঁপিতে লাগিল—শীতে কি দুশ্চিন্তায় কে জানে!

সকালে পবিত্রা স্নান করিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলে যোগেশ তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, আজ আর এখানে কেন? সুনীলবাবু বুঝি বাড়ী নেই?

পবিত্রা কথার ভাবটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল।

ইহার কয়েক দিন পরে যোগেশের জ্বর ছাড়িয়া গেল।

৭

সেদিন মাঘী অমাবস্যা। যোগেশের মা, বাপ, ও পিসিমা সঙ্গম স্নান করিতে গিয়াছিলেন। আসিতে বিলম্ব

হইবে জানাই ছিল। সুনীল তাহার আবাদে গিয়াছে, বাড়ীতে শুধু যোগেশ ও পবিত্রা ছিল।

ক'দিন হইতে খুব মেঘ করিয়াছিল, সকালের দিকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছিল। প্রচণ্ড দুর্দ্দান্ত শীত পড়িয়াছে, পশ্চিমা বাতাসে হাড়ের ভিতরটা পর্য্যন্ত যেন কাঁপাইয়া দিতেছে।

পবিত্রা চিমনীর আগুন একটু নাড়িয়া দিয়া যোগেশের পায়ের দিকে গিয়া বসিল। যোগেশ এখন অল্প একটু বসিতে পারে। সে গায়ে কম্বল ও লেপ জড়াইয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে ছিল। পবিত্রা লেপের ভিতর হাত ঢুকাইয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

যোগেশ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল, দৃষ্টি তাহার উদাস, মুখ তাহার মলিন, ক্লান্ত! তাহার সমস্ত আকৃতিতে যেন বিষণ্ণতা ছাইয়া গিয়াছে।

সকালবেলা কি একটা তুচ্ছ কারণে যোগেশ তাহাকে 'মাজা ঘষা' কথায় ধমক দিয়াছিল, এখন তাহার ম্লান মুখ দেখিয়া সে একটু মমতা বোধ করিল। বলিল, ওখানে নয়, আমার কাছে এসে বোস।

পবিত্রা উর্দ্ধদৃষ্টি নামাইয়া যোগেশের মুখে নিবদ্ধ করিল। তার পর ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বসিল।

যোগেশের ইচ্ছা হইল তাহাকে একটু আদর করে, সকালে যে কটু কথা গুলা উচ্চারণ করিয়াছিল তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া লয়; কিন্তু সে কোনটাই করিল না। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি গাইতে পার ?

পবিত্রা নিরুত্তরে ঘাড় হেলাইয়া স্বীকার করিল।

তবে একটা গান গাও।

কেউ যদি শুনতে পায় ?

বাড়ীতে কে আছে যে শুনতে পাবে ? গাও তুমি।

প্রভুত্ব ব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর শুনিয়া পবিত্রা মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া, তার পর গাহিল ;—

মেনেছি, হার মেনেছি।
ঠেলতে গেছি তোমায় যত
আমায় তত হেনেছি।
আমার চিত্ত গগন থেকে
তোমায় কেউ যে রাখবে ঢেকে
কোনো মতেই সইবে না সে
বারে বারেই জেনেছি!

পবিত্রা লক্ষ্য করিল না যে যোগেশের শীর্ণ মুখ কেমন বিকৃত হইয়াছে ও রোগপাণ্ডুর চোখ কি রকম জ্বলিতেছে। সে গাহিয়াই চলিল ;—

অতীত জীবন ছায়ার মত
চলছে পিছে পিছে,
কত মায়ার বাঁশীর সুরে
ডাকছে আমায় মিছে।

যোগেশ বলিয়া উঠিল, ব্রেভো! ইনকোর দিতে ইচ্ছে করছে! আমার সামনে এ গান গাইলে কি ব'লে ? লজ্জা করল না তোমার ?

পবিত্রা ভীত দৃষ্টি উন্নত করিয়া বলিল, এ ত গীতাঞ্জলি —

যোগেশ কুটিল হাসির সহিত বলিল, গীতাঞ্জলি না ভস্মাঞ্জলি! আমি সব জানি গো জানি! বাগেশ্বরের ব্যাপার যে জানে না তাকে গীতাঞ্জলির গান শুনিও, বুঝলে!

পবিত্রার মুখ সাদা হইয়া গেল, সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

যোগেশ ঠোঁটের উপর নিষ্ঠুর হাসি লইয়া বলিল, যেখানে রাণী হয়ে থাকতে সেখানে অতিথি হয়ে আছ, এ কি কম দুঃখের কথা ? অতীত মনে পড়বে বৈকি!— এই ত এত দিন আছ, কি কথাবার্ত্তা হল ? খুব চোখের জল আর হা হুতাশ, না ? দুজনে মিলে খুব আমার মৃত্যু কামনা করছিলে ?

পবিত্রা কালো চোখের সকাতর দৃষ্টি তাহার মুখে নিবদ্ধ করিয়া রহিল।

যোগেশ অধিকতর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, চিঠি পত্র চলত ? কি বল—কিন্তু এত দূর যখন গড়িয়েছিল তখন আর আমার কাঁধে ভর করলে কেন ? মা বাপকে বলতে পারো নি ? ঠুকরাণো চার ফেলে আমায় তাঁরা গাঁথলেন—সেটা কি ভাল হয়েছে ?"

সহসা যোগেশ দেখিল পবিত্রা তাহার বুকের কাছে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

যোগেশ ডান হাতে তাহার মাথাটা একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল, উপন্যাসের নায়িকার মত তুমি মূর্চ্ছা যেতে পার, কিন্তু আমার এখনও এতটা শক্তি হয়নি যে 'শীতল জল আনিয়া চৈতন্য সম্পাদনে' যত্নবান হব।

৮

সেদিন মাঘী পূর্ণিমা।

পবিত্রা শাশুড়ীকে বলিল, আমি একদিন সঙ্গমে নাইব মানত করেছিলুম মা, আজ আমায় নিয়ে যাবেন? পশু ত আপনারা দেশে ফিরবেন।

শাশুড়ী স্বীকার করিলেন। পবিত্রা শ্বশুর শাশুড়ীর সহিত স্নানে গেল।

সেদিন ঘাটে যে কি অপরিসীম ভীড় তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। ঘাটে না গিয়া কোমর- জলে নৌকা থামাইয়া তাঁহারা স্নানে নামিলেন।

পবিত্রা করযোড় করিয়া একবার উর্দ্ধদিকে চাহিল। তাহার পর জপপরায়ণা শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া, গভীর হইতে গভীরতর জলে ডুব দিল।

কেহ জানিল না, কেহ দেখিল না!

* * * *

বেলা নয়টার সময় এক দাগ ঔষধ খাইতে হইবে।

আজ পবিত্রা বা মা বাড়ী না থাকায় যোগেশ স্বয়ংই উঠিল। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, শিশির নীচে দু'খানা চিঠি—দুখানার খামই খোলা। এক খানা পত্র বাহির করিয়া দেখিল পবিত্রা লিখিতেছে,—

শ্রীচরণেষু,

জানিনা তুমি কোথা হইতে বাগেশ্বরের কথা জানিয়াছ, শুধু জানই নাই, অতিরঞ্জিত ভাবে শুনিয়াছ বোধ হয়। তাই তুমি প্রতি পলে আমায় সন্দেহের চোখে দেখিতেছ। হয়ত এ সন্দেহ তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু অন্তর্য্যামী জানেন আমি অপরাধী কিনা!

তুমি একদিন সত্যই বলিয়াছিলে,—বিবাহের পূর্ব্বে সুনীল বাবু আমার অন্তরের হাসি আনন্দ অপহরণ করিয়াছিলেন;—কিন্তু তুমি আমায় যে সন্দেহ করিয়াছ তাহা অলীক। আমার ভাগ্যবশে জীবনস্রোত ভিন্নপথে গিয়াছে সত্য। কিন্তু আমি সতী মায়ের কন্যা,—আমি আমার মাতৃশোণিতের অপমান করি নাই! বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে আমি তাঁহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখি নাই এবং এই দুই মাস ছয় দিন তাঁহার গৃহে অবস্থান কালেও কখনও তাহার সহিত একটি কথা বলি নাই, এবং বিনা কারণে সম্মুখে বাহির হই নাই। তিনিও যে আমার সহিত সেই মত ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য!

তবু তোমার মনে সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে,—তাহার জ্বালায় তুমি অধীর হইয়াছে। আমিও দগ্ধ, মৃতকল্প, ক্লান্ত—আমিও আর এ দুর্ব্বহ জীবন টানিয়া বেড়াইতে পারি না। তাই আজ ত্রিবেণীর শীতল জলে চিরশয়ন করিতে চলিলাম, দেখি যদি বুকের এ ক্ষত জুড়ায়।

যাহার অপ্রিয়দর্শন মুখ দেখার বিড়ম্বনা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অহর্নিশি চোখ বুজিয়া কাটাইয়াছ,—আজ সে অভাগিনী চিরবিদায় লইতেছে! প্রার্থনা করি তুমি সুখী হইও।

অপরাধিনী—পবিত্রা।

পুনঃ সুনীল বাবুর পত্রখানা যদি তাঁহাকে দিতে আপত্তি বোধ না কর, তবে দিও। খাম খোলাই রহিল।

যোগেশ কম্পিত করে দ্বিতীয় পত্রখানা বাহির করিল। সম্বোধনশূন্য পত্র। পবিত্রা লিখিয়াছে, "জীবনের মাঝে এই আমার প্রথম ও শেষ পত্র। এ পত্র না লিখিলেও চলিত কিন্তু কি জানি কেন, না লিখিয়া পারিলাম না! আমি মনে করিয়াছিলাম দ্বিতীয় বার জীবন যাত্রার চেষ্টা আরম্ভ করিব, কিন্তু পারিলাম না;—মাঝ পথেই আমি শক্তি হারাইয়াছি, কি সম্বলে যাইব?

জানিনা কি করিয়া আমার স্বামী বাগেশ্বরের কথা অতিরঞ্জিত ভাবে শুনিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ব্যর্থতার দাহ নিজে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি, তাঁকে আর ওটা দিতে ইচ্ছা করি না। আমি বিদায় লইতেছি।

জন্মান্তর আছে কি? পরলোক? যেখানেই হোক আর একবার দেখা হইবে না কি? আমি প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম! পবিত্রা।

যোগেশ পত্র দুখানা ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

শ্রীমায়া দেবী।

জুয়াড়ী

(গল্প)

গত রাত্রির উন্মাদনার পর সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। ভোরের বাতাস ভারি স্নিগ্ধ লাগিতেছিল, তাই পদব্রজেই ধীরে ধীরে বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম।

মনের ভিতর রাত্রের ঘটনাগুলা একত্র তালগোল পাকাইয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু তাহার ভিতর সব চেয়ে মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, তাসের বাজীর দৃশ্যটা। জুয়াখেলার এই তীব্র উন্মাদনা জীবনে পূর্ব্বে কখনো অনুভব করি নাই। আমার সম্মুখেই একটা লোক দুই ঘণ্টার ভিতর ২৫০৲ টাকা হারিয়া রিক্তহস্তে বাড়ী ফিরিল। জয় এবং পরাজয়—দুইয়েরই একটা কেমন বিপুল নেশা ! সারাটা রাত তাই জুয়াড়ীদের পাশে বসিয়া যে কোন্‌খান্ দিয়া কাটিয়া গেল একবার যেন বুঝিতেও পারিলাম না।

তন্ময় হইয়া পথ চলিতেছিলাম, হঠাৎ বন্ধু চিরঞ্জীবের ডাকে চমকিয়া উঠিলাম।

বন্ধু বলিল,—ব্যাপার কি ? সারাটা রাত ছিলে কোথায় ?

আমি বলিলাম,—আর ভাই ! কাল বড় আনন্দে কেটেচে। সারারাত তাসের বাজী খেলা দেখেই কাটিয়েচি !

বন্ধু বলিল—তাসের বাজী ! কি সর্ব্বনাশ ! জুয়া খেল্‌ছিলে ?

—না, আমি খেলিনা তুমি তো জানো, শুধু হাতে খেলা চলে না !

বন্ধু বলিল,—ভগবান্ তোমায় রক্ষা করেচেন ! খবর্দ্দার ! অমন হতচ্ছাড়া জায়গায় আর পা বাড়িয়ো না।

আমি হাসিলাম। বলিলাম,—তুমি বড় ভীতু ! জুয়াখেলা যে ভাল তা আমি বলিনে, কিন্তু ভাই, এর ভেতর মানুষের মনের এমন একটা চমৎকার দ্বন্দ্ব, আশা ও নিরাশার এমন একটা মত্ততা প্রত্যক্ষ করা যায়—

বন্ধু বলিল,—সব জানি, ভাই, সব জানি। সে অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে আমার অনেক বেশী ! কিন্তু সে অভিজ্ঞতার ফলে আমায় কি দিতে হ'য়েচে যদি শোনো—

—বুঝেচি, অনেকগুলো টাকা তুমি মার খেয়েছ। এ তো খুবই স্বাভাবিক !

—তা নয় ভাই, তা নয় ! মনের ভিতর যে দাগা আমি পেয়েচি, তার তুলনায় টাকা অতি সামান্য ! সে ক্ষতের দাগ আমার শুকোবে না কোনো দিন, যতদিন বাঁচবো !

জিজ্ঞাসুনেত্রে বন্ধুর মুখের পানে চেয়ে বললুম —চল না, বাড়ী ফির্‌তে ফির্‌তে তোমার গল্পটাই না হয় শোনা যাক্ !

সে বল্‌লে,—গল্প নয় বন্ধু। আজ প্রায় দশ বৎসর অতীত হ'য়ে গেল ; 'গল্প' ভেবে তাকে কতদিন উড়িয়ে দিতে চেয়েচি, পারিনি। হতভাগ্য নরেনের স্মৃতি আমার মনের কোণে তুষের আগুনের মত দিনরাত্রি ধোঁয়াচ্চে !

—নরেন ? কে নরেন ?

—তাকে তুমি চেনো না ! আমার ছেলেবেলার বন্ধু। শুধু ছেলেবেলার বন্ধু নয়, তাতে আমাতে একসঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে নামি, একই আফিসে দু'জনে চাকরী আরম্ভ করি।

দারিদ্র্য-অভাবের কণ্টকময় পথ অতিক্রম ক'রে তখন একদিন নিভৃতে পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, জীবনে কখনো আমরা পরস্পরকে বিস্মৃত হব না। ঈশ্বর না করুন, যদি আমাদের মধ্যে একজন কখনো বিপদে পড়ে, সে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে অপরে তার যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌বে !

বছরের পর বছর কেটে গেল। রেঙ্গুনে আমাদের আফিসের একটা ব্রাঞ্চ খোলাতে নরেন রেঙ্গুনে বদলী হল।

সেখান থেকে প্রায়ই তার চিঠিপত্র পেতুম; কিন্তু বদ্‌লী হওয়ার বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে তার চিঠিপত্র কমে আস্‌তে লাগ্‌ল। শেষ চিঠিতে তার আভাস পেলুম যে, কোন্ এক রূপসী তরুণীর প্রেমে তার হৃদয় মশ্‌গুল হ'য়ে উঠেচে। সুতরাং পুরাণো বন্ধুকে চিঠিপত্র লেখা যে সে বন্ধ কর্‌বে, সেটা আমার কাছে খুব স্বাভাবিক ব'লেই মনে হ'ল।

তারপর অনেক দিন—বোধ হয় আরো বছর দু'য়েক কেটে গেল। চিঠিপত্র আর তার একেবারেই পেতুম না; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সব আবেষ্টনের মধ্যে প'ড়ে আমিও নরেনের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম।

হঠাৎ একদিন রেঙ্গুন-প্রত্যাগত এক ভদ্রলোকের কাছে নরেনের যে সংবাদ পেলুম, তাতে আপনার মনেই শিউরে উঠলুম। নরেন এখন একটা প্রকাণ্ড মাতাল, এই অল্পদিনের মধ্যেই সে অধঃপাতের অনেকখানি নিম্নস্তরে নেমে গিয়েচে। কিছুদিন হ'ল সে নাকি বিবাহ করেচে। সংসারের খরচ এবং নিজের আমোদের রসদ জুগিয়ে উঠ্‌তে সে কত মহাজনের কাছে কত টাকা যে কর্জ্জ করেচে তার আর ইয়ত্তা নেই। এমনও নাকি শোনা যাচ্চে, সে সেখানে অনেক বন্ধুর কাছে নানারকম মিথ্যা ফন্দিবাজী ক'রে টাকা আদায় করেচে, এবং তার এক পয়সাও শোধ দেয় নি।

ক'দিন ধ'রে মনটা এমনি খারাপ হ'য়েছিল, তা বল্‌বার নয়! মনে করেছিলুম, তাকে একখানা চিঠি লিখ্‌বো; কিন্তু সে তো শুধু অরণ্যে রোদন হবে,—তাই সে সংকল্প ত্যাগ কর্‌লুম।

তারপর যে কথা তোমায় বল্‌তে যাচ্ছিলুম—হ্যাঁ, ঐ তাসের বাজীর কথা! সে একটা কিসের ছুটির দিন, খুব সম্ভব দেওয়ালীর ছুটী। তার আগের দিনই আফিসের মাহিনা পেয়েছি—৯০৲ টাকা। সকালে বাসাখরচের দেনা ও দোকানদারের খুচরো পাওনাগুলো মিটিয়ে হাতে তখনো ৫০৲।৬০৲ টাকা মজুত আছে। এর ভিতর থেকে হাতখরচের জন্যে কিছু রেখে বাকীটা কালই ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আস্‌তে হবে ব'লে ঠিক ক'রে রেখেচি।

হঠাৎ একখানা চিঠি পেলুম—নরেনের চিঠি। সে লিখেছিল, রেঙ্গুনের চাক্‌রীতে তার বরখাস্ত হওয়ায় সে বাধ্য হ'য়ে তার জন্মভূমি সোণামুখীর বাড়ীতে এসে উঠেচে—সঙ্গে তার স্ত্রী। এখানে এসে অবধি তার স্ত্রী অসুখে শয্যাশায়ী! হাতে তার এমন পয়সা নেই যাতে ক'রে তার স্ত্রীর ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে। তাই, এই দুঃসময়ে আর কোনো উপায় না দেখে সে আমার কাছ থেকে পঞ্চাশটি টাকা প্রার্থনা করেচে।

কাহিনীর মাঝখানে বাধা দিয়া আমি বলিলাম,—অর্থাৎ এও এক নূতন রকমের ফন্দিবাজিতে সে তোমার কাছে কিছু আদায় কর্‌তে চায়!

চিরঞ্জীব বলিল,—কিন্তু আমার তা একবারও মনে হয় নি। বরং, চিঠিখানা পড়ে' আমার বুকের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বেদনায় টন্ টন্ ক'রে উঠেছিল।

—আমি তখনি পাঁচখানি নোটকে একখানা মোটা খামে বন্ধ করে' তার ওপর নরেনের ঠিকানা লিখে সমস্ত প্রস্তুত ক'রে ফেল্‌লুম। চাকরাকে ডেকে বল্‌লুম, এখনি গিয়ে সেটাকে রেজেষ্ট্রী করে' আসবার জন্যে। কিন্তু সে আমায় স্মরণ করিয়ে দিলে যে, সেদিন দেওয়ালীর ছুটী, পোষ্টাফিসে রেজেষ্ট্রী হবে না।

মনটা একটু দমে গেল। তার এতখানি অভাবের সংবাদ পেয়ে আমি যদি আজিই তাকে টাকাটা পাঠাতে পা্‌রতুম, কালই সকালে এ টাকা তার হস্তগত হ'তো!

যাক্, যা হবার নয়, তা ভেবে আর কি হবে! খামখানাকে সেই অবস্থাতেই আমার ক্যাশবাক্সে রেখে চাবি বন্ধ করলুম।

সন্ধ্যার পর দেওয়ালীর মেলা দেখ্‌তে বেরিয়েছিলুম, সেখানে দু'তিনজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা। তারা বল্‌লে, কি কর্‌বেন একা-একা

ঘুরে বেড়িয়ে—আসুন আমাদের সঙ্গে আমাদের ক্লাবে! সেখানে আজ কী ধুম!...

আপত্তি কর্‌লুম না। ক্লাবে গিয়ে দেখি, আনন্দের চিহ্ন বিশেষ কিছু নেই। শুধু একটা বড় হলঘরে তিন চার যায়গায় কতকগুলো লোক কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে' কিসের জটলা কর্‌চে। আমি আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম,—ব্যাপার কি এদের?

সঙ্গী হেসে বল্‌লে,—বুঝ্‌তে পার্‌চেন না? তাসের বাজী চল্‌চে। আজ দেওয়ালী বছরের শুভদিন—আজ্‌কের দিনে এরা সব নিজের নিজের ভাগ্যপরীক্ষা কর্‌বে।

বৎসরারম্ভে ভাগ্যপরীক্ষা! কথাটা আমার মন্দ লাগ্‌ল না। একটা দলের খুব কাছ ঘেঁসে ব'সে পড়লুম। সঙ্গীও আমার পাশেই বস্‌ল'।

সঙ্গী বল্‌লে,—বড় মজার ব্যাপার, নয় কি? দেখুন্ না আপনিও আপনার ভাগ্যটা পরীক্ষা ক'রে!

আমি আমার জামার সব পকেটগুলো হাত্‌ড়ে নিয়ে হতাশস্বরে বল্‌লুম,—ভাগ্যপরীক্ষা করবার মাল-মসলা যে আমার কাছে একদম্ নেই!

সঙ্গী বল্‌লে,—কি, টাকা? আরে, আপনি বলেন তো সেটার বিষয় আমি এখুনি যোগাড় ক'রে দিতে পারি। এখানকার মালিককে আমি অনুরোধ কর্‌লে তিনি আপনাকে পাঁচশো টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারেন; অবশ্য, কালই আপনাকে ঐ টাকা শোধ দিতে হবে।

পাঁচশো টাকা! আমার এই ক'বছরের উপার্জ্জনের সঞ্চয় মাত্র ঐ পাঁচশো টাকাই আমার ব্যাঙ্কে জমা হয়েচে! সুতরাং, ঈশ্বর না করুন, দরকার হ'লে কালই আমি পাঁচশো টাকা পরিশোধ কর্‌তে পারবো!

সঙ্গীকে বল্‌লুম,—বেশ তো। তবে, আমার অত টাকার প্রয়োজন নেই! দু'শো টাকা যদি আমায় দিতে পারেন—

মিনিটপাঁচের মধ্যেই টাকা আমার হাতে এসে পড়্‌ল। মহানন্দে খেলা সুরু করলুম। পাঁচ, দশ, পনের, কুড়ি,—এমনি ক'রে আস্তে আস্তে বাজী বেড়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। প্রথমেই হারের পালা সুরু হ'য়ে-ছিল; দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় একশো টাকা নিঃশেষ হ'য়ে গেল। তারপর জিত! অনেকগুলো টাকা হাতে এসে গেল।

সঙ্গী আমায় পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্লে,—কেমন লাগ্‌চে?

তন্ময় ভাবে জবাব দিলুম,—চমৎকার!

তারপর আবার হার! আবার একশো টাকা কর্জ্জ নিলুম। ঘণ্টাতিনেক পরে দেখা গেল, তিনশো টাকার মধ্যে আন্দাজ তখন আমার হাতে শ'দুয়েক টাকা মজুত!

সঙ্গী বল্‌লে—আবার দেখ্‌বেন?

উত্তর দিলুম,—নিশ্চয়! একশো টাকা এখনো হেরে আছি, অন্ততঃ সেটাকে উদ্ধার কর্‌তে হবে বৈকি!

সঙ্গী মুখ টিপে হাস্‌লেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগ্‌লো। বড় ক্লক্‌খানার ঢং ঢং ক'রে যখন রাত্রি চারটে বাজিয়ে দিলে, তখন আমার কি অবস্থা জানো ভাই? মোটের ওপর তখন আমার পাঁচশো টাকাই কর্জ্জ নেওয়া হচ্চে; এবং বেশ মনে পড়ে, তখন আমার হাতে মজুত মাত্র পাঁচ টাকা সাত আনা!

সেই পাঁচ টাকা সাত আনা পকেটে নিয়ে যখন আমি সেই সর্ব্বনাশা ক্লাবঘর থেকে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম, তখন আমার মাথার ভিতরটা অনবরত দোল খাচ্চে। চলবার সামর্থ্য ছিল না, একখানা ট্যাক্সি নিয়ে বাসায় ফিরলুম।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন প্রথম কথাটাই জগদ্দল পাথরের ভার নিয়ে বুকে চেপে বস্‌ল—এতদিন —মাসের পর মাস যে টাকা আমি জমিয়ে তুলেছিলুম ভবিষ্যতে কোনও অজ্ঞাত দুর্দ্দিনের আশঙ্কায়, কাল এক রাত্রিতে সে সমস্তই নিঃশেষ ক'রে দিয়েচি! চমৎকার ভাগ্যপরীক্ষা!

বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারলুম না। শুয়ে শুয়েই ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, গতরাত্রের সেই জয়ের পরাজয় অদ্ভুত লীলা! মানুষ শুধু যে জিতের পাল্লা ফেলেই উঠে আস্‌তে পারে না তাতো নয়, হার্‌তে ব'সে

সর্ব্বস্বান্ত হবে জেনেও সে আত্মসম্বরণ কর্‌তে পারে কৈ? এইটাই আমার সব চেয়ে বিস্ময়কর ব'লে মনে হ'ল।

নইলে, কাল—মাত্র কাল রাত্রে যে-আমি একদম নিঃসম্বল হয়ে বাড়ী ফিরেচি, সেই আমারই আজ আবার মনে হয় কেন, যদি আর কিছু—অন্ততঃ কিছু টাকা আমার থাক্‌তো, তাহলে আজ একবার শেষ চেষ্টা ক'রে অন্ততঃ পক্ষে এই নিদারুণ পরাজয়ের গুরুভার কতকটা হাল্কা কর্‌তে পারতুম! এ কি সর্ব্বনাশ খেয়াল আমার!

হঠাৎ মনে পড়ল, ক্যাশবাক্সে সেই খামের ভেতর পঞ্চাশটা টাকা! ধড়্‌মড়্‌ করে' উঠে বাক্স খুললুম।

বন্ধুর চিঠিখানা খুলে আবার একবার আদ্যন্ত পড়ে ফেল্‌লুম। চিঠির ভাষা অন্তর খানাকে মুচড়ে ভেঙ্গে দিতে চাইলে। কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন তীব্রস্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠল—মিথ্যা—মিথ্যা—আগাগোড়া মিথ্যায় ভরা ঐ চিঠি! ফন্দিবাজি করে' যেমন অনেক লোকের কাছেই সে টাকা আদায় করেচে, এও তারই পুনরভিনয় মাত্র! বন্ধুত্বের আশ্রয় নিয়ে আমাকে ঠকাবার চেষ্টা ছাড়া এ আর কিছুই নয়! ভণ্ড—মাতাল কোথাকার!

তারপর, কি করলুম জানো? তাড়াতাড়ি তাকে লিখে দিলুম—বেশ তীব্র ঝাঁঝালো ভর্ৎসনার ভাষায় তার চিঠির উত্তর দিলুম, এবং স্পষ্ট জানিয়ে দিলুম যে, তার এই উচ্ছন্ন যাবার পথ পরিষ্কার করতে—তার মাতলামির সাহায্য করতে এক পয়সাও আমি তাকে দিতে পারবো না।

চিঠিখানাকে দ্বিতীয়বার প'ড়ে দেখ্‌বার সাহস আমার হ'ল না। চাকরকে ডেকে সেটা তৎক্ষণাৎ ডাকে পাঠিয়ে দিলুম।

চাকর চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মনটা যেন অনেকখানি দ'মে গেল। আর, সত্যই যদি সে আমার সঙ্গে প্রতারণা না করে' থাকে! ভেতরের শয়তানী বুদ্ধি আমাকে আশ্বাস দিলে, তাই যদি হয়, তাতেই বা' এমন কি ক্ষতি হবে? আজ এই ৫০৲ টাকার বাজীতে জিত্‌তে পারলে তুমি তো তাকে আরো বেশী করে সাহায্য কর্‌তে পারবে! সে সম্ভাবনা টুকু তো রইল!

যুক্তিটা মন্দ লাগ্‌ল না। খামখানাকে ছিঁড়ে ফেলে নোটগুলো বাক্সে রাখ্‌লুম।

হৃদয় ছটফট করতে লাগ্‌ল সন্ধ্যার প্রতীক্ষায়!...

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তারপর? নিশ্চয় সে টাকাও হার্‌লে?

সে বলিল,—না ভাই, জিত্‌লুম। কিন্তু সে জিত্‌ হারের চেয়েও সহস্রগুণে মর্ম্মভেদী হয়ে দাঁড়াল।

পরের দিনই আপিল থেকে বেরিয়ে বরাবর সোণা-মুখীর দিকে রওনা হ'লুম। সঙ্গে আমার প্রায় একশো টাকা।

কিন্তু কি দেখ্‌লুম জানো সেখানে গিয়ে? নরেনের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ! দু'চারজন লোক সেখানে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। শুনলুম, দুপুরের পর থেকে এই রাত্রি ৮৷৯ টা পর্য্যন্ত তারা এ ঘরের দরজা খোলে নি।

সন্দেহ হল। দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলুম।

কি দেখ্‌লুম জানো ভাই? হতভাগ্য আর হত-ভাগিনীর নিষ্প্রাণ হিমদেহ পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ! বিছানায় পাশে আমার সেই চিঠি—ছুরীর চেয়েও তীক্ষ্ণ!—

ভাই, আমার সঙ্গে প্রতারণা তো সে করেনি! তাই, আমার সে রুক্ষ প্রত্যাখ্যান তার হৃদয়কে একেবারে চুরমার করে' দিয়েছিল!

নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাদের পানে চেয়ে রইলুম। মনের ভেতর থেকে কে চীৎকার করে' উঠল, এ হত্যা—হত্যা! এবং হত্যাকারী আমি নিজে!

বলিতে বলিতে চিরঞ্জীবের দুই চোখ ছল্‌ ছল্‌ করিয়া উঠিল। আমি তার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলাম—বড়ই করুণ কাহিনী বটে! কিন্তু তোমার কাছ থেকে সাহায্য পেলেও যে সে উচ্ছৃঙ্খল মাতালের ঐ রকমই একদিন ভয়াবহ পরিণাম হ'ত না, সে কথা কে বল্‌তে পারে ভাই?

রুদ্ধস্বরে চিরঞ্জীব বলিল,—বল্‌বার কথা হয়ত' অনেক কিছুই থাকতে পারে, কিন্তু ভাই, এ জীবনে

এই সব শোচনীয় দুর্ঘটনার উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ানোর মত দুর্ভাগ্য যে আর কিছু নেই! তাই তো আমি ওকথা এতদিনেও ভুল্‌তে পারিনি, পারবোও না কোনো দিন! তাইতো, জুয়ার কথা শুনেই আমার হৃৎকম্প হয়, মনে হয়, তার ঐ হার জিতের আবেশরাশির সঙ্গে সঙ্গে ঐ নরেন আর তার স্ত্রীর কত না হতভাগ্যের তপ্ত শোণিত-প্রবাহ মিশে রয়েছে।*

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

* পল বুর্জে লিখিত ফরাসী গল্প অবলম্বনে।

বর্ষামিলন

আজি ফিস্‌ফিস্ ঝরে মেঘ ভুবন ভরি'—
বুঝি ধরারে জানায় প্রেম আদর করি';
তার ধরণ সোজা—
তবু যায়না বোঝা,
শুধু কাণ পেতে প্রণয়ের ধ্বনিটি ধরি!

জাগে ধরণীর গায়ে কাঁটা রসরভসে,
পাশে সরসী আরসি সম হাসে হরষে;
জল কাঁপিয়া উঠে,
টল ছাপিয়া ছুটে—
সুখে চক্‌চক্ করে চোখ পুলকরসে!

লাগে লতায় পাতায় দোল প্রণয়দোলে,
সুখে সবুজ ঘনিয়ে উঠে ঘাসের কোলে;
শিখী পেখম খোলে,
শাখে কদম ঝোলে,
হাসি' প্রকৃতি সাজায় দেহ নীল নিচোলে!

কাঁপে বেণুর বেণীতে বাঁধা পীত পতাকা,
শোভে শিরোপরি সাতনরী শ্বেত বলাকা;
নীচে উটজ পাশে
ভিজে' কুটজ হাসে,
ডাকে ডাহুক-ডাহুকী সুখে মিলায়ে পাখা।

দূরে গুরুগুরু ডাকে মেঘ মৃদুমধুরে—
সুরে দুরুদুরু কাঁপে বুক জগৎ জুড়ে';
সুখে তাহারি সাথে
খ্যাপা পবন মাতে,
তালে তালীবন তাল ছায় ঝিঁঝিঁ-ঝুমুরে!

ওরে কাম নাই—কোন'-কিছু নাহি আর কাম,
ছাখ্ মিলনের মধু-ঝোরা ঝরে শুধু আজ;
ঐ মেঘেরই মতন
ভরি' নিখিল ভুবন
শুধু চলুক মিলন-মেলা ভুলি' ভয়-লাজ!

যত দূরের যে-কেউ আজ আয়রে বুকে—
আজি সবারে টানিব কোলে গভীর সুখে!
বাহু বাহুতে বাঁধি'
মাটী ভিজাব কাঁদি'—
ঐ মেঘেরই মতন—চুমি' সবারি মুখে।

ওরে পথের পথিক, ওরে আয়রে কাছে,—
সারা ভুবন ভুখারী আজি মিলন যাচে;
ছাখ্ উপরে নীচে,
ছাখ্ সমুখে পিছে—
ছাখ্ নাগর-দোলায় আজি নিখিল নাচে!

তোর ঘরে ও বাহিরে আজি দুলেরে দুলা!
ঝরা- মেঘের ঝালরে ঝুলা ঝুলন-ঝুলা;
সব বাঁধন খুলা,
যত কাঁদন ভুলা,—
বাঁধি' বঁধুর বুকেতে মধু-পরশ বুলা।

আজি ফিস্‌ফিস্ ঝির্‌ঝির্ ঝর্‌ঝর্ জল—
সুখে বিবশা ধরণী রসে করে টলমল;
আজি মেঘে-ঢাকা পথ,
শুধু চলে মনোরথ—
তাও রসের সায়রে বুঝি হয়-বা বিকল!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

নূতন গহনা

(গল্প)

অপরাহ্নে দাওয়ায় বসিয়া হরিধন পরামাণিক অপ্রসন্ন মুখে তামাক টানিতেছিল। তাহার দৃষ্টি ছিল ঘন ছায়াছন্ন বনপথের পানে। মনটাও বোধ হয় নিভৃত নদীর ঘাটে উধাও হইয়া গিয়াছিল।

সংসারে হরিধনের শান্তি ছিল না। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে পত্নী বিয়োগের পর দশম বর্ষীয়া ঠাকুরদাসীকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া হরিধন অশান্তিকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। পুত্রের আশায় বিবাহ, সুদীর্ঘ দশ বছরের মধ্যেও তাহার শুভাগমনের কিন্তু কোনও সম্ভাবনাই প্রকাশ পাইল না।

পুত্র না আসিলেও ভাবী পুত্রের জননীর অযাচিত রূপ যৌবনের উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধকে নিরতিশয় বিব্রত হইয়া থাকিতে হইত। আরও বিব্রত হইতে হইল নিজের দৃষ্টিক্ষীণতার জন্য।

ঝাপ্‌সা দৃষ্টি লইয়া হরিধন আপনার জাত ব্যবসা করিতে পারিত না। যাহাকে লোক-লোচনের অন্তরালে হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া লুকাইয়া রাখিতে সাধ হয়, প্রাণের দায়ে পেটের জ্বালায় তাহারই হস্তে আলতার চুব্‌ড়ি দিয়া পাড়ায় পাড়ায় পাঠাইতে হইত। শুধু পাড়ায় নহে; গ্রামের শেষ প্রান্তে নির্জ্জন তটিনী তটে ঠাকুরদাসীকে বহুবার যাতায়াত করিতে হইত। গৃহে কূপ নাই। জমিদারের সুবৃহৎ পুষ্করিণীর ফটিকস্বচ্ছ জলরাশি সাধারণের স্পর্শ-নিষেধ। গরীবের প্রাণ স্বরূপিণী একমাত্র ক্ষুদ্র নদীটি।

সেই কাশগুচ্ছে আবৃত সুনিবিড় বৃক্ষাবলীতে ছায়ান্বিত পল্লীরমণীর সুখ দুঃখের লীলানিকেতন ঘাটটি আজকাল গৃহস্থ বধূর পক্ষে তেমন নিরাপদ ছিল না। তাই স্ত্রীকে জল আনিতে পাঠাইয়া হরিধন আকুল আগ্রহে পথের পানে চাহিয়া ছিল।

কিয়ৎকাল পত্নীর আশা-পথ পানে চাহিয়া বৃদ্ধ নিজেকে আর সংযত করিতে না পারিয়া বেড়ার গায়ে হুঁকা রাখিয়া চালের বাতা হইতে তৈল পক্ক বাঁশের লাঠিগাছা লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু বেশীদূর তাহার অগ্রসর হওয়া ঘটিল না।

অকস্মাৎ কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া প্রবল বেগে ঝড় উঠিয়া আসিল। গাছপালা হেলিয়া দুলিয়া ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। শুষ্ক খড়কুটা, ধুলা-বালি দিগ্বিদিকে উড়িয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

চোখে মুখে ধুলার ঝাপটা সহিয়া, হোঁচট খাইয়া হরিধন বাধ্য হইয়াই বাড়ীর দিকে ফিরিল। সহসা তাহার পশ্চাৎ হইতে ঠাকুরদাসী ছুটিয়া আসিয়া চিৎকার করিয়া কহিল—"একি কাণ্ড! এই ঝড়ের ভেতর মানুষ বার হয় না কি? চোকে ভাল দেখতে পাও না, বনে জঙ্গলে ঢুকে যদি পড়ে যেতে?"

হরিধনের হারা প্রাণ যেন দেহে ফিরিয়া আসিল। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিমেষে তিরোহিত হইল। স্ত্রীর সদা প্রফুল্ল মুখ খানি দেখিবার আশায় বৃদ্ধ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সহাস্যে কহিল—এ ঝড়ে আর কেউ ঘরের বার হয় না রে দাসী—যার পরাণ গাঙের ঘাটে পড়ে থাকে সেই কেবল বার হয়। আর, বার হয় বদমাইসরা। নদীর দিকেই ওদের আড্ডা, তাই ভয় হয়।"

"ভয় কি? ওরাও মানুষ আমরাও মানুষ। ঢিল ছুড়লেই পাটকেল খেতে হবে। ঘাটে পথে এক আধ দিন একটু আধটু দেরী হয়েই থাকে, সেজন্যে কি এত ভাবনা করতে হয়? আমার হাত ধ'রে এখন তাড়াতাড়ি ঘরে চল, ঝড় ক্রমেই বেড়ে আস্‌চে।"

বলিতে বলিতে কলসী কক্ষে সিক্তবসনা ঠাকুরদাসী স্বামীর নিকটস্থ হইয়া তাহার ডান হাত খানি চাপিয়া ধরিল।

২

গৃহে ফিরিয়া হরিধনের পদ প্রক্ষালন করিয়া তাহাকে মাদুরে বসাইয়া দাসী কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেল।

হরিধন অনিমেষ নয়নে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল। বেচারী ঝড়ের মুখে পড়িয়া নিতান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়াছিল, খানিকটা ধূলাবালি খাইয়া তাহার গলাটা খুস খুস করিতেছিল। সর্ব্বশ্রান্তিহরণ এক ছিলিম তামাকের আশায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া উচ্চস্বরে হাঁকিল, "দাসি কোথায় গেলি, কাপড় ছাড়তে কি মানুষের এত দেরী হয়? এই এখানে, ওই ওখানে হাতে পায়ে যে নেত্য করে বেড়াস্।"

কিয়ৎকাল পর দাসী কল্কের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে দিতে আসিয়া হরিধনের হাতে হুঁকাটা আগাইয়া দিয়া প্রদীপ সাজাইতে বসিল।

বাহিরে তখন বৃষ্টিতে সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। ঝটিকার হুঙ্কারে, মেঘগর্জ্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারের সহিত মেঘের অন্ধকার মিশিয়া ধরাটাকে যেন অন্ধকারের রাজ্য করিয়া তুলিয়াছে।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া, স্বামীর পায়ে একটু গরম তৈল মালিস করিবার নিমিত্ত দাসী মৃন্ময় প্রদীপটি মাদুরের পার্শ্বে আনিতেই উজ্জ্বল আলোকে হরিধন স্ত্রীর মণিবন্ধের দিকে চাহিয়া চমকিত হইল।

দাসীর কাঁচের চুড়ির কোলে ন্যাকড়ার পটি কেন? সাদা পটীর খানিকটা তাজা রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে।

বিস্মিত হরিধন হুঁকাটা বেড়ার গায়ে রাখিয়া সন্তর্পণে স্ত্রীর হাতখানা টানিয়া লইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "একি রে তোর হাত কাটলো কখন? উঃ এখনো যে রক্ত পড়চে; শাঁখা খানাও দেখচি নে, শাঁখা ভেঙ্গেই হাত কেটে গেছে বুঝি?"

দাসী মৌন হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিতে লাগিল। পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শাঁখা ভেঙ্গেই আমার হাত কেটে গেচে, অমন কাটা কত কাটে, কালই সেরে যাবে তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

"ব্যস্ত হইনি, কিন্তু কাটলো কি করে তা' বলচিস নে কেন? অত মোটা শাঁখা এমনি তো ভাঙ্গে নি, শক্ত চোট লেগেই ভেঙ্গেচে।"

ভূমিতলে চোখ নামাইয়া দাসী নীরবে বসিয়া রহিল, স্বামীর প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়াও দরকার বোধ করিল না।

স্ত্রীর নীরবতা হরিধনের ভাল লাগিল না। যাহার কণ্ঠে রাত্রি দিন বাক্যের ঝরণা বহিয়া যায় এক কথায় পাঁচ কথা শুনিতে হয়; তাহাকে যে কি ভূতে পাইল হরিধন অনেক ভাবিয়াও বুঝিতে পারিল না। না পারিলেও ঠাকুরদাসীর শরীরে রক্তপাত নিরীক্ষণ করিয়া বৃদ্ধ স্থির থাকিতে পারিল না। অস্থির হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দাসি, চুপ করে রয়েছিস কেন? কেমন করে কেটে ফেল্লি বল না?"

দাসী তেমনি নতনেত্রে জবাব করিল, "তা শুনে লাভ নেই, শুধু কষ্ট পাবে; শাঁখা ভেঙ্গে কেটে গেছে এই টুকুই জেনে রাখো।"

"আমি বুড়ো হয়ে গেছি বলে তোর কাছে কি মানুষ নামের যুগ্যি নয়? তোর কোন কথা জান্বার দরকার আমার নেই? তোর যা খুসী তাই কর, আমি কিছু জানতে চাইব না।" বলিয়া হরিধন দাসীর হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া ক্ষুণ্ণমনে সরিয়া বসিল।

স্বামীর অভিমান হৃদয়ঙ্গম করিতে দাসীর বিলম্ব হইল না। তাহার তেজোদীপ্ত মুখখানি ম্লান হইয়া চোখ জলে ভরিয়া গেল। অঞ্চলে অশ্রুজল মুছিয়া দাসী আস্তে আস্তে কহিল, "ভ্যাখো কদিন হল তোমায় বলবো বলবো করে বলতে পারচি নে। নদীর ধারের সেই চৌকীদারটা আমার পিছনে লেগেছে। আজ খালি ঘাট পেয়ে সে আমার গায়ে কতকগুলো ফুল ছুঁড়ে দিয়েছিল। এত দিন আমি তার হাসি ঠাট্টা চুপ করেই সয়েছি, তোমার ক্ষমতার বাইরে জেনেই কথা বলি নি, কিন্তু আজ সইতে না পেরে একটা ভাঙ্গা ইঁটের টুকরো দিয়ে ওর মাথায় আমি ঢিল ছুঁড়েছিলাম। ও রেগে সেই ঢিলটা আমার হাতের ওপর ফেলে দিয়েছিল, তাই শাঁখা ভেঙ্গে হাত কেটে গেছে।"

হরিধন আহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। "কি বল্লি? চৌকিদারের এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি বুড়ো বলশূন্য হয়েচি বলেই ওর এত সাহস। ও কত বড় বদ্‌মাস আজ আমি দেখে নেবো, আমার লাঠিটা দে তো দাসি, আমি ওর মাথা ফাটিয়ে আসচি।"

ক্রোধে হরিধনের কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল। নেত্রদ্বয় জ্বলিতে লাগিল। বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দাসী দুইখানি বাহুর বেষ্টনে স্বামীকে মাদুরে বসাইয়া

সান্ত্বনার স্বরে কহিল "তুমি থামো, শান্ত হও। এমন পাগলের মত কোরো না। কাল আমি জমিদার বাড়ী গিয়ে গিন্নিমার কাছে নালিশ করে আসবো। জন্তুটা আমার কি করবে? আমি নাপিতের মেয়ে, জন্তুর ভয়ে ডরাই না। আজ ফুল দিয়ে ইট খেয়েছে, বেশী সাহস করলে পশুটাকে আর আস্ত রাখবো না। তোমার বল কমে গেচে, তা বলে আমার বল তো কমে নি।"

স্ত্রীর সান্ত্বনাবাক্যে হরিধন কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কহিল, "বলের কথা কি বলছিস দাসি, পশুর কাছে কি মানুষের বল? সে পশুও বনপশু, ওকে সাজা দিতে গেলে নিজেকেও যে পশু হতে হবে। এ জন্মের মত তা আমার ফুরিয়ে গেচে। হরিধন পরামাণিকের হাতে লাঠি থাকলে যমও ভয় পেতো; এখন সে সব স্বপ্ন। আমার প্রাণ দিলেও যদি সেই বল এক দিনের তরে ফিরে পেতাম তাহলে চৌকিদারকে শিক্ষা দিতে পারতাম।"

হারা যৌবনের শোকে দুঃখে ক্ষোভে হরিধন গর্জ্জন করিতে লাগিল।

স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া পরদিন প্রভাতে ঠাকুর দাসী জমিদার ভবনে নালিশ করিতে গেল।

জমিদার গৃহিণী সবে গরদ পরিয়া পূজার ঘরে যাইতেছিলেন, এমন সময় দাসী তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়া কাতরস্বরে নিজের লজ্জাজনক মর্ম্মান্তিক দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিল।

সহায়হীনা নারীর অপমানে গৃহিণীর সুকোমল হৃদয়টি বেদনায় বিগলিত হইল। তাঁহার পূজায় বসা হইল না। তখনই ঠাকুরদাসীকে সঙ্গে করিয়া গৃহিণী কর্ত্তার বসিবার কক্ষে উপনীত হইলেন।

গ্রামের প্রবল প্রতাপ জমিদার চায়ের পেয়ালার সম্মুখে বসিয়া হাই তুলিতেছিলেন। গৃহিণীর পশ্চাতে এক অবগুণ্ঠনবতী রমণীর আবির্ভাবে তিনি প্রসন্ন হইলেন না। নিদ্রাভঙ্গে চায়ের পেয়ালাটা লইয়া বসিতে না বসিতেই অমনি নালিশ শালিসের ধূম পড়িয়া গেল! নাঃ ইহাদের লইয়া পারিবার উপায় নাই, কেবল কাঁদনি, আর নালিশ।

কর্ত্তা বিরক্ত হইলেও কর্ত্রী বিরক্তির ধারও ধারিলেন না। তিনি স্বামীর নিকটে ঠাকুরদাসীর সমস্ত ঘটনাবলী বিবৃত করিয়া বলিলেন, "পেয়াদা পাঠিয়ে এখুনি সে পাজীটাকে ধরে এনে পঁচিশ জুতো লাগাও। গাঁয়ে চৌকি দেওয়ার ছুতায় ওরা একটা আড্ডা গড়ে তুলেছে। মেয়েদের মান সম্ভ্রম পথের ধুলোয় লুটোচ্ছে। গোড়াতে কঠিন শাসন না করলে ক্রমেই লম্পটদের সাহস বেড়ে যাবে।"

কর্ত্তা কাসিয়া মাথা চুলকাইয়া উত্তর দিলেন, "কে প্রকৃত দোষী তা না জেনে শাসন করবো কাকে? এরও হাত কেটে গেচে, তারও হয়তো মাথা ফেটে গেচে, কে আগে ঢিল ছুঁড়েছিল তার প্রমাণ কি? আর নদীর ঘাট, সেতো সরকারী; যার লজ্জাসঙ্কোচ বেশী, তার নদীর মায়া ত্যাগ করে বাড়ীতে কুয়ো দিয়ে নিতে হয়। এ সতীর কথা সত্যি কিনা তা ভাল করে না জেনে তাকে আমি পঁচিশ কেন একটি জুতোও মারতে পারবো না। এ আমার যেমন প্রজা, সেও তেমনি।"

গৃহিণী লজ্জায় ঘৃণায় বাহিরে আসিয়া ঠাকুর দাসীকে বলিলেন, "জমিদারের ব্যবহারে তুই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিস না বৌ। সে পশুটাকে শাসিয়ে এখনি আমি তার কাছে লোক পাঠাচ্ছি। তুই সতর্ক হয়ে থাকিস। আবার যদি গোলমাল করে, আমায় এসে জানাবি। আর একটা কথা, তুই বাড়ী গিয়ে হরিধনকে বল্‌বি সে যেন শীগ্‌গির বাড়ীতে একটা কুয়ো দেবার যোগাড় করে, কুয়ো কাটতে যত টাকা লাগে সব আমি দেবো। তোর ভয় নেই বাছা, তুই ঘরে যা।"

"আমাদের চরণে রেখো মা, আমরা বড্ড দুঃখী।" বলিয়া গৃহিণীর পদধূলা মাথায় লইয়া দাসী বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

হরিধন স্ত্রীর নিকটে জমিদার গৃহিণীর কূপের আশ্বাসে যেমন আশান্বিত হইল, জমিদারের বিচারে চিন্তিত হইল তদধিক। যেখানে রাজার শাসন-প্রণালী এই প্রকার, সেখানে দীন প্রজার মান-মর্য্যাদা রক্ষার উপায় কি? কিন্তু যাহার উপায় নাই, তাহা নীরবে সহিতে হইবে। সামর্থ্য-হীন অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ এত বড় অপমানটা নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া ফেলিল। জমিদারের পক্ষপাতিত্বায় অভিমান করিয়া জমিদার গৃহিণীর কাছে কূপ খননের টাকার নিমিত্ত ঠাকুরদাসীকে পাঠাইল না।

হরিধন না পাঠাইলেও গৃহিণী ভুলিলেন না। বিলাসের স্রোতে ভাসমান থাকিয়াও জমিদার গৃহিণী তাঁহার এক দীন প্রজার কুলবধুর করুণ মুখচ্ছবি স্মরণ করিয়া বিশ্বস্ত লোক দ্বারা কূপ খননের সমুদায় অর্থ হরিধনকে পাঠাইয়া দিলেন। অভিমানের বশে অর্থ ফেরত পাঠাইয়া মাকে অপমানিত করিতে হরিধন সাহসী হইল না।

অল্পদিনের মধ্যেই কূপ প্রস্তুত হইল। কূপের স্ফটিক-স্বচ্ছ জল নিরীক্ষণ করিয়া বৃদ্ধের আনন্দের সীমা রহিল না। এইবার ঠাকুরদাসীকে নদীতীরে যাইতে হইবে না, দুষ্টের কুটিল কটাক্ষের তাপে তাপদগ্ধ ফুলের ন্যায় ম্লান হইতে হইবে না। তাহার সুনির্জ্জন শান্তির নীড়ে সাধের বিহগী লুকায়িত রহিবে, ব্যাধ তাহার সন্ধান পাইবে না।

হরিধন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, আলতা পড়াইতে দাসীকে আর পাড়ায় পাড়ায় পাঠাইবে না। পাট কিনিয়া হাতের আন্দাজে গুণ কাটিয়া হাটে বিক্রয় করিলে দাসীর অপেক্ষা সে বেশি রোজগার করিতে পারিবে। গৃহে যাঁতা আছে, কলাই, গম ভাঙ্গাইয়া দিতে পারিলে মন্দ লাভ হইবে না।

স্বামীর ব্যবস্থায় দাসী প্রসন্ন হৃদয়ে সায় দিল। তাহার হৃদয়ের ঘন মেঘ অন্তর্হিত হইয়া আশার চন্দ্রমা উদিত হইল। ভাগ্যাকাশের মেঘরাশি কিন্তু এত সহজে অপসারিত হইল না।

সে দিন হাস্যোজ্জ্বল প্রভাতে জমিদার বাড়ী গমভাঙ্গা আটা দিয়া দাসী ত্বরিতপদে গৃহে ফিরিতেছিল। তাহার চক্ষু ছিল পথের উপর, মন পড়িয়াছিল ঘরের অসমাপ্ত কাযের প্রতি। হঠাৎ ঝোপের পার্শ্ব হইতে কে যেন ব্যঙ্গ-পূর্ণ নীরস স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি নবাবজাদি, এখন যে বোরখা ঢাকা হয়েছিস! ভেবেছিস এত অল্পেই আমার কাছ থেকে ছাড়া পাবি? আমার নামে জমিদারের কাছে নালিশ করবার সুখ আমি তোরে বুঝিয়ে দেব কি?"

পরিচিত কণ্ঠস্বরে দাসী চমকিয়া উঠিল। শরীরের সমস্ত রক্তস্রোত যেন হিম হইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ বেতস-পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু সে ক্ষণকালের নিমিত্ত।

দাসী তখনই নিজেকে সংযত করিয়া ঝোপের দিকে ঘৃণাভরা তীব্র দৃষ্টি হানিয়া কঠোরস্বরে কহিল, "বুঝিয়ে দিবি দিয়েই দেখিস। একদিন মাথা ফেটে গিয়েছিল, এবার কাণ যাবে। নাপিতের মেয়ে অস্ত্র ধরতে জানে, তোর মতন পথের কুত্তাকে সে ভয় পায় না।"

দীপ্ত ভঙ্গীতে কথা কয়েকটি বলিয়া ঠাকুরদাসী হন হন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

হরিধন দাওয়ায় বসিয়া নিবিষ্টমনে গুণ কাটিতে কাটিতে গাহিতেছিল—

> "বারে বারে যত দুখ দিয়েছ, দিতেছ তারা,
> দুখ নয় সে, দয়া তব, জেনেছি মা দুখহরা।
> সন্তান মঙ্গল তরে জননী কামনা করে,
> তাই মা সহি বুকে দুখেরি পসরা।"

ঠাকুরদাসী পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "ওগো, গান রেখে আগে আমার কায করে দেবে?"

হরিধন ঘাড় ফিরাইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কায রে দাসী? আমার সব কাযই তো তুই করে দিস, আজ আবার তোর কায আমি করবো? হাসালি!"

"হাসির কথা নয়, সত্যি একটা কায করতে হবে। গুণ কাটা রেখে আগে এই কাঁচিখানি আমায় শাণ দিয়ে দাও দেখি?"

"কাঁচি? কাঁচি শাণ দিয়ে তোর হবে কি? মেয়েদের কামাতে কাঁচির দরকার হয় না, আর কামানো তো তুই ছেড়েই দিয়েছিস, তবু কাঁচি শাণের কি দরকার রে?"

"তোমাদের লাঠির কি দরকার হয়?"

"লাঠি যে ব্যাটাছেলের হাতিয়ার। লাঠিই বাহুবল। লাঠি ধরতে তো জানিস না, জান্‌লে বুঝতিস লাঠির ভেতর কি শক্তি আছে।"

"লাঠি ধরতে না জান্‌লেও ছুরি কাঁচি ধরতে জানি। ছুরি কাঁচিই মেয়েদের বাহুবল। মেয়ে মানুষ হয়েছি ব'লে কি আমাদের বাহুবল থাকতে নেই? তুমি উঠে কাঁচিটাকে বেশ করে শাণ দিয়ে দাও, আমি যাই, আমার যে কোন কায হয় নি।" বলিয়া স্বামীর হাতের মধ্যে কাঁচিখানা গুঁজিয়া দিয়া দাসী জল তুলিতে চলিয়া গেল।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর দাসী এক গোছা রাঙ্গা সুতার সহিত শাণ দেওয়া চকচকে কাঁচিখানি গলায় দুলাইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে হরিধনকে গিয়া বলিল, "চেয়ে দেখ আমি কেমন নতুন গয়না পরেচি, আমায় কেমন মানিয়েচে?"

গহনার প্রসঙ্গে হরিধন একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশেষ মনোযোগ সহকারে পত্নীর গহনা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। রাঙ্গা সুতার গ্রন্থিতে অভিনব গহনা নিরীক্ষণ করিয়া বৃদ্ধের আর কৌতুকের সীমা রহিল না। মানুষের এমন খেয়ালও হয়? কাগজ কাটা, চুল কাটা কাঁচি কেহ না কি সাধ করিয়া গলায় পরিয়া থাকে?

কিন্তু সাধ করিয়া সে কেহ অস্ত্র কণ্ঠে ধারণ করে না এই সত্যটুকু হরিধনকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইবার নিমিত্তই ভগবান অলক্ষ্যে থাকিয়া একটি অপূর্ব্ব ঘটনার সমাবেশ করিলেন।

সেদিন বর্ষার মেঘমেদুর নিশীথে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িতেছিল। আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ খেলিতেছিল। মেঘের গুরু গুরু ডাকের সহিত বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দ মিশিয়া বিশ্বের বুকে যেন কি এক অকথিত বিপুল বিষাদ বহিয়া আনিতেছিল। ক্ষুদ্র গ্রামটি কুটীরদ্বার বন্ধ করিয়া নীরবে ঘুমাইতেছিল।

সকলে শান্তিতে ঘুমাইলেও হরিধন ও ঠাকুরদাসী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিল না।

বেড়া কাটার একটুখানি খর খর শব্দ হইতে না হইতেই যমদূতের ন্যায় দুইটা মূর্ত্তি অকস্মাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে ঠাকুরদাসীর মুখ হাত বাঁধিয়া ফেলিল। স্ত্রীর মুক্তিলাভের বৃথা আস্ফালনে হরিধনের অগভীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য হরিধন প্রস্তুত ছিল না। ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠিয়া লাঠিগাছা খুঁজিতে খুঁজিতে হরিধন চিৎকার করিতে লাগিল "চোর, কে কোথায় আছ, আমার সর্ব্বনাশ হয়, চোর চোর।"

"চেঁচানোর মজা দেখাচ্ছি বুড়ো সয়তান" সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই হরিধনের মাথার উপর একটা দারুণ লাঠির প্রহার পড়িল। একবার "মাগো" বলিয়া বৃদ্ধ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশয্যায় আশ্রয় লইল।

সেই মুহূর্ত্তে দুই মত্ত দানব বিবশা বন্দিনীকে বহন করিয়া নিশীথিনীর গভীর অন্ধকারে মিশিয়া গেল। কড়্ কড়্ নাদে মেঘ গর্জ্জিতে লাগিল। সন্ সন্ করিয়া বাতাস গুমরিয়া উঠিল। মানবের দানবীয় আচরণে বারিবর্ষণ-ছলে দেবতারা অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

* * * *

যখন হরিধনের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখনও ভোরের বাতাস ধরণীর দেহে শিহরণ তোলে নাই। তখনও রাত্রি শেষের পাখীরা ডাকিতে আরম্ভ করে নাই। বর্ষণক্লান্ত গগনে একটী ম্লান নক্ষত্র মিটি মিটি জ্বলিতেছে।

হরিধন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিল না। তখনও মাথা ঘুরিতেছে। বক্ষের স্পন্দন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হরিধন শূন্য শয্যা-তলে হাত বুলাইয়া মুক্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"দাসি, দাসি!"

প্রান্তর হইতে ভিজা উদ্ভিদের গন্ধ বহিয়া উতলা বায়ু হাহাকার করিয়া প্রতিধ্বনি তুলিল, "দাসি।"

বাতাসের শব্দ মিলাইতে না মিলাইতেই শিথিল-বসনা বিমুক্তকুন্তলা দাসী উন্মাদিনী বেশে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া হরিধনের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

এক অদৃশ্য তড়িৎস্পর্শে যেন হরিধনের সমস্ত জড়তা অবসাদ নিমেষে অন্তর্হিত হইল। হরিধন কম্পিত হস্তে ভূলুণ্ঠিতা পত্নীর মস্তক বুকে টানিয়া লইয়া কহিল, "দাসি এসেছিস? নারীর মান, বংশের মান রক্ষা করে আসতে পেরেছিস?"

"পেরেছি, না পারলে আসতে পারতাম না। শুধু বংশের মান রক্ষা করেই আসি নি, আমি নাপিতের মেয়ে আমার কাঁচির মানও আছে। তার একটা কাণ, তার সাথীর একখানি ঠোঁট জমিদারকে দেখাব বলে কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে এসেছি। আমার নতুন গয়নাই আমায় রক্ষা করেচে। কুকুর ছুঁয়ে আমার ঘেন্না করছে গো, তোমার পায়ের ধূলায় আমায় শুদ্ধ করে নাও।" বলিয়া ঠাকুর-দাসী পাগলের মত হরিধনের পায়ের ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিল।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

জীবন-নাট্য

(গল্প)

বর্ষাকাল, থাকিয়া থাকিয়া কেবলি বৃষ্টি পড়িতেছে, সূর্য্যের আলো আজ তিন দিন দেখা দেয় নাই।

সেদিনও বৈকালে নরেনদের বাড়ী গিয়াছি; আমরা তিন বন্ধু প্রতিদিন একই সময়ে সেখানে জুটিতাম। নরেন ছিল ধনী; সুতরাং তাহার খরচে চা বিস্কুট প্রতিদিনই পাওয়া যাইত, মাঝে মাঝে নানা রকমের খাদ্যাদিও আসিত না এমন নয়। মাসের শেষে যখন দেখিতাম জল-খাবারের পয়সাটা বাঁচিয়াছে, তখন বন্ধুর প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ হইতাম তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তবে লাভের আনন্দ যে প্রায়ই অনুভব করিতাম একথা সত্য।

সেদিন টেবিলের উপর "জীবন-নাট্য" নামে একখানি নব-প্রকাশিত পুস্তক পড়িয়া ছিল। সেখানি হাতে করিয়া নরেন বলিল "আচ্ছা, জীবনটাকে যদি নাট্য বল তাহলে সেটা মিলনান্ত না বিয়োগান্ত?"

উপেন্দ্র বলিল, "তুমি কেবল রাশি রাশি কেতাব পড়ছ আর যত রকমের উদ্ভট চিন্তা মাথায় বাসা বাঁধছে, পাগল হবে দেখ্‌ছি।"

আমি বলিলাম, "জীবন-নাট্যটা মিলনান্ত। মৃত্যু একটা মহামিলনের দ্বার, এ মিলন জানার সঙ্গে নয়—অজানার সঙ্গে।"

নরেন বলিল "ও সব ধোঁয়াটে প্রমাণহীন কথা ছেড়ে দাও। আমার মনে হয় এটা বিয়োগান্ত, কেন না আমরা সব ছাড়তে ছাড়তেই চলেছি, সব ছেড়ে দেওয়ার নামই মৃত্যু। তারপর ভেবে দেখ, সবারই জীবনে এক একটা ট্রেজেডি আছে।"

আমি বলিলাম, "যাহাকে তুমি জীবনের ট্রেজেডি বলিতেছ তাহাই আমাদের বিচার-বিতর্কের সহযোগে একটা ভাবময় জগত নির্ম্মাণ করে; জীবনের রস, আনন্দ আমরা ঐ ট্রেজেডি হইতেই সঞ্চয় করি।"

নরেন বলিল, "মানুষের বিচার বিতর্ক, তাহলে সেই ভাবেরই সহযোগিতা করে। তার কি একটা স্বাধীন অস্তিত্ব নেই?"

"আছে, কিন্তু সে ভাবের স্বাধীনতাই আগে স্বীকার করিতে চায়।"

"আচ্ছা আমি ভদ্র সন্তান, কিছু লেখাপড়াও শিখেছি, জন্মাবধি বিশেষ কোন পাপ করেছি বলে মনে হয় না। বিচার বুদ্ধিও আমার আছে। কোন গর্হিত কায কি আমার করা অসম্ভব?"

আমি বলিলাম, "ভাবের ঝোঁকে সব গর্হিত কাযই তুমি করিতে পার।"

নরেন থামিল। বলিল, "দেখ যতীন, আমি ভেবে দেখেছি চুরি, আত্মহত্যা, খুন এ সব কায তোমার আমার মত লোকে করতে পারে না।"

এমন সময় টেবিলের উপর চা ও খাদ্যদ্রব্য আসিয়া পড়িল। আমি বলিলাম "এবার তর্ক-বিতর্ক ছাড়িয়া আহারে মন দাও।"

অন্য দিন চা আনিত উড়িয়া চাকর, আজ আনিল একটী রমণী—অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল কতকটা ঢাকা। বয়স প্রায় ত্রিশ হইবে, দেখিতে সুশ্রী। বলিলাম, "ইনি তোমার কে হন?"

নরেন অন্য মনস্ক ভাবে চুপ করিয়া রহিল। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার উত্থাপন করিতে পারিলাম না।

নরেন হঠাৎ বড়ই গম্ভীর হইয়া পড়িল। আহারাদির পর সকলে উঠিয়া গেল; শেষ পর্য্যন্ত আমি একাই তাহার কাছে বসিয়াছিলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে আমিও উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ সে আমার হাত ধরিল। বলিল "বস, আমার অনেক কথা বল্‌বার আছে।"

নরেনের ভাবভঙ্গী কেমন-কেমন মনে হইল। বলিলাম, "কি বলিবার বল, বাড়ীতে কায আছে, তাড়াতাড়ি উঠিতে হইবে।"

নরেন বলিল "চল ছাদের উপর যাই।"

তখন বৃষ্টি থামিয়াছে। আকাশের খানিকটা ঘননীল, তাহারই মধ্যে পঞ্চমীর চাঁদ ও কয়েকটা নক্ষত্র। আমি নরেনের পিছনে পিছনে ছাদের উপর উঠিয়া বলিলাম, "ভিজা ছাদে বেশীক্ষণ থাকা ভাল হবে না!"

নরেন বলিল, "বেশীক্ষণ থাক্‌বো না; যে কথা তোমাকে বল্‌তে চাই, সেটা ঘরের ভিতরকার জিনিস নয়। এখানে আমার কথা তুমি আর এই শূন্য ছাড়া আর কেউ গ্রহণ করবে না। ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে ?"

আমি বলিলাম, "খুব পড়ে।"

"মনে পড়ে যেদিন আমরা উলঙ্গ শিশু ঐ অশথ তলায় খেলা করতুম? তার পর একদিন শিবতলায় ঠাকুরের ফুল হাতে ক'রে আমাদের বন্ধুত্ব পাতান হ'ল। কিন্তু কিছুদিন পরে শিখলুম আমি ধনীর পুত্র, তোমার সঙ্গে বেশী মেলামেশা আমার অন্যায়। তারপর বিচ্ছেদ। আমি কল্‌কাতার মেসে রইলুম। দু'জনে খুব কমই দেখা হত। ক্রমশঃ তুমি বড়ই পর হয়ে গেলে। দুজনের জীবন দুই দিকে দুটি নদীর মত ছুটে চল্‌ল।

"তারপর যৌবন কাট্‌ল একটা নেশার ঘোরে। নূতন প্রাণ, নূতন উদ্যম, নূতন আশা ও আনন্দ। প্রাণ নূতনের রঙ্গে রঙীন হয়ে উঠল।

"আজ মনে হচ্ছে কত লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, নানা অবস্থায় নানা বন্ধু জুটেছে, এখন আর তাঁদের আবশ্যকতা বুঝে উঠতে পারি না; সেই জন্য রাজার চাকরের কায করতে করতে দেশ-বিদেশে বদলী হবার পর যখন ঘরে ফিরলুম তখন আগে মনে পড়ল তোমায়। আমিই তোমার সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে যাই; বল ত সেদিন হঠাৎ আমাকে দেখে কি মনে হয়েছিল ?"

আমি বলিলাম, "আমার মনে হল একটা বন্ধু লাভ করেছি ?"

"একটা নূতন বন্ধু ?"

কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলাম, "হাঁ, নূতন বন্ধুই বটে"।

"আমার কিন্তু মনে হল—আমি একটা হারানো জিনিস খুঁজে পেয়েছি। তোমার সঙ্গে ছেলেবেলায় অনেক প্রাণের কথা কয়েছি; আজ প্রৌঢ়ে তুমি সেই বন্ধুই হয়ে থাক, তোমার কাছে যেন কিছু আমার গোপন না থাকে। আমার যৌবনের কথা তুমি জাননা, সেই কথা বল্‌বার জন্যেই তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি।

"ছেলেবেলায় বিবাহ জিনিষটা কেমন একটা রহস্যময় ব্যাপার ব'লে মনে হত। উৎসবের আনন্দ-উল্লাসে ভরা বিবাহদিন, অনেক আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দু'টি পরস্পর অপরিচিত জীবের মিলন—আমার হৃদয়ে একটা লজ্জা, সঙ্কোচের সৃষ্টি করেছিল; শ্বশুরবাড়ী নামটাই আমাকে ত্রস্ত করে তুলত।

"সেই জন্য আগে বিবাহের পক্ষপাতী ছিলাম না, কিন্তু বিবাহ করে বুঝতে পারলুম, অবিবাহিত থাকা হতভাগ্যের

"বিবাহের পর জগৎ একটা নূতন রূপ ধারণ কর্‌লে। অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চরণস্পর্শে আমার সংসার রূপান্তরিত হয়ে গেল।

"প্রায় দশ বৎসর এই ভাবে কেটে গেল। এক দিন দেখলুম দেবতা অন্তর্ধান করেছেন, আমার সংসারক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। শিশুপুত্রটিকে কোলে ক'রে কাঁদতে বস্‌লুম।

"ক'দিন পরে কান্না থেমে গেল। দেখলুম ছেলেটা আর তার মায়ের নামও করে না, কিন্তু সদাই মনে হত, সে যেন কি একটা নিদারুণ অভাবের তাড়নায় বিব্রত। আমি একা তাঁর বাপ মা দুয়েরই কায কর্‌তে লাগলুম। মায়ের হৃদয় আমার নেই, সেই জন্যে মায়ের কায অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, পরপর জোর করে মায়ের স্থান অধিকার কর্‌তে গিয়ে পিতার আসন থেকেও ভ্রষ্ট হলুম। পত্নীর জীবদ্দশায় আমি কখনো তাকে আদর করিনি; আমার স্নেহে বিহ্বলতার লেশও থাকৃত না। সেই জন্যে এখন শিশুটিকে আদর করতে বসলে সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে আমার দিকে চাইত, মনে হত আমার ভাবান্তর দেখে সেও বিষণ্ণ হয়েছে।

"দু একজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন, বিবাহ কর। আমার কিন্তু তাতে প্রবৃত্তি হল না। স্ত্রীকে যে আসনে বসিয়ে-

ছিলুম, সেখানে অন্যকে বসানো আমার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠ্ল!"

এই সময় দুই চারি ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল। বলিলাম, "এইবার নীচে চল।"

নরেন প্রথমে কথাটা গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু বৃষ্টি যখন সজোরে আরম্ভ হইল তখন আর অন্য গতি রহিল না।

আবার পূর্ব্বেকার ঘরে বসিতেই নরেন আরম্ভ করিল—

"তোমার মনে পড়্বে, ছেলেবেলা থেকেই আমার ধর্ম্মে মতি ছিল। এক যোগী গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে কিছুদিন যোগাভ্যাসও করেছিলুম। এখন মনে হল ভগবান যেন আমার সব বাঁধন ছিঁড়ে দিয়ে আমার ধর্ম্ম-কর্ম্মের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন।

"শ্রীশ্রীরামচন্দ্রকথামৃত পড়্লুম—বুঝ্লুম কামিনী ছাড়া আবশ্যক। যে কামিনীকুলের শিরোমণিকে আমি পত্নীরূপে লাভ করেছিলুম তার তুলনায় অপর কামিনী নগণ্য। সুতরাং কামিনীর প্রতি আমার কোন আসক্তিই থাক্তে পারে না। তারপর কাঞ্চন। কাঞ্চনেও আমার লোভ ছিল না।

"দর্শন, গীতা, উপনিষদ, যোগবাশিষ্ঠ সবই পড়্লুম। মনকে ভাল করেই বোঝালুম—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা।

"হয়ত যতীন তুমি মনে করবে আমি ভণ্ডামি কর্‌ছি, কিন্তু ভাই ঠিক জেনে রেখো—ভণ্ডামিকে আমি বড়ই ঘৃণা করি। আমি সব কথা সরলভাবেই বল্ছি। আমি ধর্ম্মকেই আঁকড়ে ধরলুম, তখন ওটা ছাড়া আমার অন্য গতি ছিল না।

"এই অবস্থায় আমি কল্‌কাতায় বদলী হলুম; তাই আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হল।

"দেশে এসেছি আজ পাঁচ বছর; এখান থেকে রোজ সহরে যাই, সন্ধ্যায় ফিরে আসি। শিশুটি সদাই সঙ্গের সাথী হয়ে থাকে।

"সেই মা-হারা শিশুটির হাসি, উল্লাস ও আবদার দেখে অনেকদিন কেঁদে ফেলেছি। মনে হত যেন সে আদর পায় না। ছেলের যত্ন আমি কম করিনি, কিন্তু বেটাছেলে যত্নের কি জানে?

"যখন বিদেশে ছিলুম, তখন বিপত্নীক অবস্থার দুঃখটা একটা উপভোগের সামগ্রী বলে মনে হত। সময়ে সময়ে ভাবতুম দেশে আমার ঘরসংসার আলো ক'রে আমার গৃহলক্ষ্মী অক্ষয় হয়েই অবস্থান করছেন; সেই জন্যে তাঁর শোকটা তীব্র হয়ে উঠ্‌ত না। যখন বাড়ী এলুম—যখন দেখলুম আমার ঘরখানি শূন্য—বিজয়ান্তে ম্লান চণ্ডীমণ্ডপের মত, সেদিন হৃদয় শুষ্ক হয়ে উঠল।

"নারী কি তা এতদিন ভেবে দেখিনি। এবার বুঝতে পারলুম, যে-জগতে এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছি, সেটাকে আমার অন্তরের নারীই মনোরম করে তুলেছিল। এখন তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে জগতের সব সৌন্দর্য্য, সব রস অন্তর্ধান করেছে।

"আমি লম্পট নই, আমার চরিত্র এখনও নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু যতীন, কোন স্ত্রীলোক যখন পথ দিয়ে চলে যেত আমি তার দিকে চেয়ে থাকতুম নির্লজ্জের মত। ধর্ম্মতঃ বলছি মনে কোন পাপচিন্তা থাকৃত না; তবে ভাবতুম, এরা এই পৃথিবীর অলঙ্কার, আনন্দ ও উৎসব। স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাটা খুবই বেড়ে উঠল।

"পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আগে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসতেন। দু একদিন অনেকেই এলেন, কিন্তু তারপর ক্রমশঃ তাঁরা এখানে আসা একেবারে বন্ধ করে দিলেন।

"একদিন হঠাৎ মনে হল এই ঘরে একটী নারীর প্রয়োজন; সেই কেবল সংসারের কতকটা মালিন্য দূর করতে পারে—মা-হারা ছেলেটারও একটা স্ত্রীলোকের আদর আবশ্যক।

"আমার এক আত্মীয়া ছিলেন—তিনি আমার স্বর্গস্থ পত্নীর দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী। তিনি দরিদ্র বিধবা, তাঁর এক মাত্র পুত্র সেদিন মারা গেছে। আমি তাঁকেই বাড়ীতে নিয়ে এলুম। মনে হল ছেলেটা যেন তার মরা মাকে ফিরে পেলে।

"যিনি টেবিলে চা দিয়ে গেলেন, তিনি কে তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে। তিনিই আমার সেই আত্মীয়া, তাঁকে দেখি ভগ্নীর মত; ছেলেটি তাঁকে পেয়ে হয়ত মাকেও ভুলে গেছে।"

আমি বলিলাম "ভাই, ওঁর কি কোন অপর আত্মীয় নেই ?"

নরেন বলিল, "আত্মীয়েরা ওঁর যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করেছে, এখন ওঁর সকলের চেয়ে নিকট আত্মীয় আমি।"

আমি বলিলাম, "তা হতে পারে; আমি ভাবছি একটি স্ত্রীলোকের এখানে এভাবে থাকা উচিত কিনা।"

"তাহলে তুমি আমায় বিশ্বাস করছ না দেখ্‌ছি।"

ঘড়িতে টং টং করিয়া নয়টা বাজিল। আমি উঠিলাম। নরেন কোন কথা কহিল না, বুঝিলাম সে আমার উপর কিছু বিরক্ত হইয়াছে।

অনেক দিন নরেনের কাছে যাই নাই। সেও আমার খোঁজ করা আবশ্যক মনে করে নাই।

শীতকাল। সেদিন সন্ধ্যায় পায়চারি করিতে করিতে তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ সে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "এতদিন কোথায় ছিলে ?"

আমি বলিলাম, "এই খানেই ছিলাম।"

সে বলিল, "চল ভিতরে গিয়ে বসি।"

নরেন আমাকে একেবারে ছাদের উপর নিয়ে গেল। দেখলাম আজও তার হাতে সেই বইখানা।

নরেন বলিল, "শরীর জিনিষটা অনিত্য, যতই একে যত্ন কর, এককালে এর বিনাশ আছে। আমি আত্মাকে জান্‌তে চাই। বাইরের এই স্থূল জগৎ কেবলি আমাদের প্রতারণা কর্‌ছে। যতীন, আত্মার সন্ধান কর, আনন্দ পাবে।"

আমি বলিলাম, "জগতে অনেক জিনিসেরই সন্ধান পেয়েছি, পাই নি কেবল ঐ আত্মার।"

নরেন বলিল, "চেষ্টা করনি, দিনরাত চেষ্টা করতে হবে। এ পথে অনেক বিঘ্ন, সব বিঘ্নকে অগ্রাহ্য ক'রে চল্‌তে হবে। একদিন আমি তোমায় গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাব, দেখবে তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ।"

আমি বলিলাম, "তোমাদের বিষয়সম্পত্তি নিয়ে যে মোকদ্দমাটা হয়ে গেল তার ফল কি হবে ?"

নরেন বলিল, "ফলটা ভাল হবে না, হয়ত আমার বৈমাত্রেয় ভাইই জিতবে।"

আমি বলিলাম, "সেটা ত বড়ই বিপদের কথা !"

নরেন বলিল, "বিপদ আর কি ? যদি পথেই দাঁড়াতে হয়, জেনে রেখো সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।"

আমি বলিলাম, "দেখ ভাই, আমার মনে হয় তোমার বিবাহ করা উচিত। সেদিন এই কথাই বলছিলাম। তুমি লক্ষ্মীবান, রূপবান, পৃথিবীতে এখনও তোমার কায আছে। মায়ার বাঁধন যত জোর ক'রে ছিঁড়তে যাবে তত জোরেই আবার বদ্ধ হবে।"

নরেন বলিল, "যতীন, কোনো মায়া আর আমায় বাঁধতে পারে না। স্ত্রীলোক দেখ্‌লে এখন আমার ঘৃণা হয়, নারীদেহের স্বরূপ আমি উপলব্ধি করেছি। তারপর অর্থ—সেটাও আমি অনর্থ বলে বিবেচনা করি।"

নির্ম্মল আকাশ, অবারিত জ্যোৎস্না। চুপ করিয়া নরেনের কথা শুনিতেছি, এমন সময়ে সেই রমণী রেকাবিতে কিছু খাবার ও দুই বাটি চা আনিয়া সম্মুখের টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। নরেন বলিল, "মায়া, এদিকে এস।" আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। রমণী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নরেন বলিল, "তুমি আমাকে ভাইয়ের মত দেখছ, জেনে রেখো এই যতীনও তোমার আর এক ভাই। তুমি একে দেখে মাথায় কাপড় দিতে পারবে না। এখনই মাথার কাপড় খুলে ফেল।"

জ্যোৎস্নাধারায় তাহার মুখমণ্ডল প্লাবিত হইল। চাহিয়া দেখিলাম অবসন্ন যৌবনের লাবণ্য তাহার মুখশ্রীকে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। ইহার সহিত ভ্রাতৃসম্বন্ধ কাহারও অনীপ্সিত হইতে পারে না।

নূতন ভগিনীটি চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত দু' একটা কথা কহিবারও অবকাশ ঘটিল না।

বাড়ীতে দুই একজন কুটুম্ব আসিবার কথা ছিল। নরেনের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

দিন পনের কাটিয়া গেল। তার পর কয়দিনের জন্য

মেদিনীপুর যাইতে হইয়াছিল। বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, নরেন আমাকে তিন দিন খোঁজ করিয়াছে।

অপরাহ্ণে তাহার সহিত দেখা করিলাম—বাহিরের ঘরে সে বসিয়া আছে, পাশে রমেন। রমেন পূর্ব্বে নরেনের বন্ধু ছিল। তাহার স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না। আজ বহুদিন পরে নরেনের সহিত তাহার মিলন একটা সন্দেহজনক ব্যাপার বলিয়া মনে হইল।

আমি ঘরে প্রবেশ করিতেই নরেন বলিল, "কবে এলে ?

আমি বলিলাম "আজ।" রমেন বলিল, "এস, অনেক দিন পরে দেখা হ'ল।" এই বলিয়া সে নিজে একটা সিগারেট ধরাইল, আমাকেও একটা দিবার উপক্রম করিল। আমি বলিলাম, "আমি ও রসে বঞ্চিত।"

সিগারেটটি বাক্সে রাখিয়া রমেন বলিল, "তুমিও দেখছি নরেনের মত, এতটা বয়স হ'ল, নেশা টেশা কিছুই করলে না, জীবনটা যে শুকিয়ে মারতে বস্‌লে। নরেন যোগতপস্যা ক'রে শরীর ক্ষয় করছে; আর আমরা দেখ, কি রকম ফুর্ত্তিতে দিন কাটাচ্ছি।"

নরেন বলিল, "তোমার বুদ্ধি শুনলে উচ্ছন্ন যেতে হবে।"

রমেন বলিল, "উচ্ছন্ন যেতে হলেও হাস্‌তে হাস্‌তে যেতে পারবে। আর এখন উচ্ছন্ন না গিয়েই যে কাঁদতে বসেছ মুখটা পেঁচার মত হয়ে গেছে যে!"

আজ টেবিলের উপর চা রাখিয়া গেল একটা চাকর। জিজ্ঞাসা করিলাম, "দিদি ভাল আছেন ?"

নরেন বলিল, "তিনি বড়ই শোকার্ত্ত।"

বলিলাম, "কেন ?"

নরেন বলিল, "শোননি ? আমার ছেলেটি আজ এক মাস হল কলেরায় মারা গেছে।"

"বল কি ?"

"এই ব্যাপার, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।"

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। সেই হাস্যময় চঞ্চল বালক আমার কল্পনায় জীবন্ত হইয়া উঠিল।

রমেন বলিল, "চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক্‌।"

নরেন উঠিল। যাইবার সময় বলিল, "যতীন, তুমি দিদির সঙ্গে দেখা শোনা কর, আমি আস্‌ছি, না এলে তুমি যেও না।"

আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। দুজনে বাহিরে চলিয়া গেল।

দিদির সঙ্গে এক দিন মাত্র দেখা—কোন কথাবার্ত্তাও হয় নাই। কেমন করিয়া একা তাঁহার সঙ্গে কথা কহিব এই চিন্তাটাই প্রবল হইয়া উঠিল।

এমন সময় দেখিলাম দ্বার খুলিয়া নিঃসঙ্কোচে দিদি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "ভাল আছ ত ভাই ?"

আমি বলিলাম, "ভাল আছি।"

দিদি একখানা চেয়ারে ব'সলেন। বলিলেন, "ভালই হয়েছে। তোমায় একা পেয়েছি, কয়েকটা কথা আমার বল্‌বার আছে। আমার একটা উপায় ভাই তোমাকে করতে হবে।"

আমি বলিলাম, "বলুন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

দিদি বলিলেন, "আমি ত্রিশ বৎসরে বিধবা হই, তোমার বন্ধুর পত্নী কমলা আমার ছেলেবেলার সাথী, তার ছেলেটির সঙ্গে আমার ছেলের খুবই সদ্ভাব ছিল। দুজনের রূপগুণ অনেকটা এক রকমের ব'লে আমি পুত্রহীন হবার পর কমলার ছেলেটিকে কেবলই দেখ্‌তে ইচ্ছা করতুম। আমার শ্বশুরকুল বা পিতৃকুলে কেউ ছিলেন না। নরেন দাদার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে সকলেরই ভাল ধারণা ছিল। সেই জন্যে আমার এই অবস্থায় তাঁর ঘরে আশ্রয় নিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করিনি। হয়ত এ কায আমি কর্‌তুম না, কিন্তু ছেলেটির জন্যে আমার খুবই টান ছিল, আর ভগবানও আমায় আশ্রয়চ্যুত করেছিলেন। ছেলেবেলায় লেখাপড়া শিখেছিলুম ব'লে আমি সাধারণ কুলবধূদের মত কখনই

"তারপর এখন ছেলেটি আর নেই, একথা তুমি জান। দাদা সকালে বিকালে ঠাকুরঘরে খিল এঁটে বসে থাকেন, শুনতে পাই তিনি যোগী। আজ কুড়ি পঁচিশ দিন হল তাঁর এক নূতন বন্ধু জুটেছে, তার চালচলন আমার ভাল লাগে না। দাদা আমাকে তাঁর সামনে বেরুতে বলেন, আমি আজ পর্য্যন্ত তাঁর কথা রাখতে পারিনি।

"তারপর মোকদ্দমার কথা বোধ হয় শুনেছ।

"মোকদ্দমায় বিমাতার পুত্রেরই জিত। দাদার চারিদিকে দেনা। ছেলেটার চিকিৎসার খরচ আমিই দিয়েছি।"

আমি বলিলাম, "বটে? দাদা কি ছেলেটার চিন্তাও ছেড়ে দিয়েছিলেন?"

"তিনি দিনরাত আত্ম-চিন্তা করচেন, ছেলের চিন্তা কিছু ছিল কিনা জানি না। একটা হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে ফেলে রেখেছিলেন, বল্‌তেন—ভগবান্ যা করেন তাই হবে।

"যাক্ সে কথা। এই ত সংসারের অবস্থা, তার ওপর ঐ রমেন বন্ধুটি জুট্‌ল। দূর থেকে তার কথা শুনে তার ওপর অভক্তি ধরে গেছে। দু একদিন হুইস্কির বোতলও ধরে দেখেছি। দাদা বলেন শুধু রমেনই হুইস্কি খায়। আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না।"

"দু একদিন দাদারও ভাবান্তর দেখেছি; আগে তাঁর মুখ দেখলে মনে হত তিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, কিন্তু এখন আর তাঁকে পূর্ব্বের মত মনে হয় না। তিনি যতই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করুন, তাঁর মুখে চোখে পাপের কালি দেখা দিয়েছে।

"আমি ভদ্রলোকের মেয়ে, আমাকে তুমি রক্ষা কর; তোমাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখি, আজ ছোট ভাইয়ের কায কর। ক'দিন ধরে তিনি টাকা চাইছেন; আমার আর কিছু নেই, গায়ের ক'খানা গয়না আছে, সেগুলো আমার স্বামীর দান—আমি তা ছাড়্‌তে চাই না। আমার একটা উপায় কর ভাই, আমি এখান হতে চলে যেতে চাই।"

আমি বলিলাম, "দিদি, কথাগুলো ভেবে দেখি; আমি কি করতে পারি তা' দু একদিনের মধ্যেই জানাব।"

ঘড়িতে আটটা বাজিল। আমি উঠিলাম।

সদর দরজার কাছে আসিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম, নরেন আসিতেছে। বলিলাম, আমাকে এখনই বাড়ী যাইতে হইবে। নরেন বলিল, "কাল এস।" কথা কহিতেই মুখ দিয়া সুরার গন্ধ নির্গত হইল।

গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

সকালে বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিয়াছি। খবরের কাগজ পড়িবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় নরেন উপস্থিত হইল—তাহার মুখ বিষণ্ণ।

পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া সে আমায় পড়িতে দিল, দেখিলাম উকিলের চিঠি। উকিল নরেনের বৈমাত্রের ভাই অনিলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছে যে নরেনের বাসগৃহ আইনতঃ অনিলের; এক মাসের মধ্যে সে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে বাধ্য।

নরেন বলিল, "দেখ যতীন, আমার আর অন্নের সংস্থান নেই, আজ আমি তোমার অতিথি।"

কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বলিলাম, "তুমি এত ম্রিয়মাণ কেন?"

নরেন হাসিয়া। বলিল, "আমি শোকগ্রস্ত নই, বিপদ আপদ আমায় টলাতে পারে না। যা সত্যি কথা তাই বলছি।"

আমি বলিলাম, "চল বাড়ীতে। তুমি পাগল হবে নাকি?"

নরেন বলিল, "আমি পাগল কিসে যতীন? চাক্ষুষ দেখবে? চল।"

নরেনের বাড়ীখানি প্রাসাদের মত। তাহার পিতার আমলে কতবার এখানে যাত্রা, থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছি। তখন এখানে নিত্য উৎসব লাগিয়া থাকিত; ফটকের কাছে দু'চারিজন দোবে চোবেরও অভাব ছিল না।

আজ আর বাড়ীর সে শ্রী নাই। তাহার একদিক গত বর্ষায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; চারিদিকে আগাছা, দেয়ালগুলি অনেক স্থলে শৈবালে আচ্ছন্ন। আমরা ধীরে ধীরে ফটক পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। উপরে আসিয়া দেখি, দালানের এক কোণে দিদি বসিয়া আছেন, তাঁহার চোখে অশ্রু।

আমি বলিলাম, "দিদি, ব্যাপার কি?"

নরেন সরিয়া গেল। দিদি বলিলেন, "আজ ভাই হাতে পয়সা নেই, দাদা আমার গয়না বন্ধক দিতে বল্‌লেন, আমি তাঁর কথা শুনিনি।"

আমি বলিলাম, "আপনি কিছু মনে করবেন না; আমি

একশো টাকা আপনাকে ধার দিতে চাই—আপনি তাই নিয়ে সংসার চালান্।"

নরেন অন্য কক্ষে বসিয়াছিল। তাহাকে বলিলাম, "দিদি খাবার জোগাড়ে ব্যস্ত, আমিও আজ এখানে খাব, আমি এক ঘণ্টা পরে আসছি।"

এই কথা বলিয়া আমি তীরবেগে বাহির হইলাম। হঠাৎ অন্তরে বড়ই একটা স্ফূর্ত্তির উদয় হইল।

আমার পিতা ছিলেন মোক্তার। নরেনদের বাড়ীর বৈষয়িক সব কাযই তাঁহার দ্বারা হইত। নরেনের পিতার উইলও তাঁহার হাতে লেখা। অনিল যে পিতার সবই অধিকার করিবে এরূপ ধারণা আমার ছিল না। হঠাৎ মনে হইল, অনিল উইল জাল করিয়া নরেনের নামে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়াছে এবং তাহার উইল যে মিথ্যা তাহার প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিতে পারিব। বাড়ীতে আসিয়া বাক্স সিন্দুক অনুসন্ধান করিতে বসিলাম। নরেনের পিতার উইলের খসড়া বাহির হইয়া পড়িল। দ্রুতপদে নরেনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, "তোমার মোকদ্দমার আপিল করতে হবে। নিশ্চয়ই তুমি পিতার উইল দেখ নি। আমার মনে হয় উইল চুরি গেছে।"

নরেন চুপ করিয়া রহিল। বলিল, "যতীন, তুমি নিয়তিকে বাধা দেবে?"

আমি বলিলাম, "যা করবার আমি করব। পিতার আমলের দলিল কাগজপত্র সম্ভবতঃ বিমাতার হাতেই ছিল?"

নরেন বলিল, "হাঁ।"

আহারাদি শেষ হইবার পর নরেন বলিল, "যতীন, বাড়ীটা এখন অনিলের, আদালতে এই ঠিক হয়েছে। আমাকে হাজার খানেক টাকা ধার দিতে পার? আমি আম-বাগানে কেশব চাটুয্যের পোড়ো বাড়ীটা কিনে বাস করি। এখানে আর একদণ্ড থাকতে পারছি না।"

আমি বলিলাম, "বাড়ী তোমার, স্থির হয়ে থাক। আমার কথামত কায কর, অধীর হোয়ো না।"

নরেন হাসিল। বলিল, "আমি অধীর? কখনই নয়। আমি অচল, অটল।"

সেইদিন হইতে কেবলি অনিলের উইল জাল প্রমাণ করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। পিতার দপ্তরের মধ্য হইতে এমন কতকগুলি চিঠিপত্রও পাইলাম যাহা আমার কাযে লাগিতে পারে। আমার উকীল ছিলেন বিচক্ষণ। তিনি আমায় একদিন স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন এ মোকদ্দমার নরেনবাবুর জিত অনিবার্য্য।

এই সময় আমার মায়ের অসুখের জন্য কলিকাতায় বাসা বাঁধিতে হইল। যাইবার দিন নরেনের সঙ্গে দেখা করিলাম। তাহার আকৃতি দেখিয়া মনে হইল সে যেন নরেন নয়। বলিলাম, "তোমার চেহারা এমন হল কেন?"

"কাল সারা রাত্রি ঘুম নেই।"

"দিদি কোথায়?"

"সকাল থেকে তাকে দেখতে পাচ্ছি না।"

আমি বলিলাম, "আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। এখনই তিনি আসবেন।" বলিয়া আমি বিদায় লইলাম।

হাইকোর্টে আপিল চলিল। তিন চারি মাস কাটিয়া গেল। মা কতকটা সুস্থ হইলেন। মোকদ্দমাও সুন্দর ভাবে চলিতে লাগিল।

প্রমাণ হইল অনিলের মামা উইলখানি চুরি করেন। কয়েকজন সাক্ষীও জুটিয়া গেল। মূল উইলের উদ্ধার করিলাম। তাহার মতে নরেন বসতবাড়ীর মালিক। জমিদারীর অর্দ্ধেক আয় অনিলের।

একদিন শুনিলাম নরেনের মাথার রোগ দেখা দিয়াছে। অনেকদিন তাহার সহিত দেখা হয় নাই। মাঝে দু'একখানা পত্র দিয়াছিলাম, কিন্তু কোন জবাব পাই নাই।

মাকে লইয়া গ্রামে ফিরিলাম। মনে বড়ই আনন্দ হইল। আহারাদির পর তাড়াতাড়ি নরেনের বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম একখানা খাটের উপর নরেন শুইয়া আছে। পাশেই একটা টেবিলের উপর সেই 'জীবন-নাট্য' বইখানা পড়িয়া আছে। আমি যাইতেই নরেন আমার দিকে চাহিয়া বলিল "বস"। বলিলাম, "স্থির হও, খবর সব শুনেছ? মোকদ্দমায় তোমার জিত।"

নরেনের মুখে একটুও আনন্দের চিহ্ন দেখা দিল না।

সে বলিল "যতীন, বই খানার গোড়ায় কি লেখা আছে পড় ত।"

আমি পড়িলাম—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে আত্মহনোজনা॥"

"এর অর্থ কি জান?"

বলিলাম, "জানি।"

"বইখানা তুমি পড়েছ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

"স্বামিশরণের অবস্থা যখন খারাপ হয়, তখনই সে দুশ্চরিত্র হয়ে পড়ে, তার আগে সে ছিল জিতেন্দ্রিয়; বইখানায় এ বিষয়টা লক্ষ্য করেছ।"

আমি বলিলাম তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। দিদির জন্য মনটা ছটফট করিতেছিল। বলিলাম, "দিদি কোথায়?"

নরেন গম্ভীরভাবে বলিল, "ব্যস্ত হোয়ো না, সব বল্‌ছি। একটা কায কর্‌তে পার?"

বলিলাম, "কি কায?"

"আজ রাত্রি বারোটায় আমার কাছে আস্‌বে? আজ এখানে তোমায় থাক্‌তে হবে।"

আমি বলিলাম, "দিদি কি এখানে নেই?"

নরেন বলিল, "আছে, কিন্তু আমি না দেখালে তুমি তাকে দেখ্‌তে পাবে না।"

নরেনের শূন্যদৃষ্টি ও অর্থগম্ভীর কথাগুলি আমাকে চিন্তান্বিত করিল।

রাত্রি আটটার সময় আবার তাহার নিকটে আসিয়া বসিলাম। রাত্রে জ্যোৎস্নার অন্ত ছিল না। জানালার ধারে আমরা দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম। ঘড়িটায় আজ সকালে আমিই দম দিয়াছিলাম। সেটা কেবলি টিক্ টিক্ করিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

জানালার দিকে চাহিয়া নরেন বলিল, "দেখ্‌ছ, দূরে আমবন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, দেখছি।"

"ভেতরে একটা বাড়ী দেখ্‌ছ? তার কতকটা ইটের, কতকটা খোড়ো।"

"হাঁ।"

"ঐ বাড়ীটা কিন্‌তে চেয়েছিলুম, জান?"

"হাঁ।"

"তার জন্যে আমার হাজার খানেক টাকা দরকার হয় তাও জান।"

নরেন আর কথা কহিল না।

আমার আহার শেষ হইল। নরেন বলিল, "আমার ক্ষুধা নাই।"

তার পর সে একটা বোতল বাহির করিয়া খানিকটা তরল পদার্থ একটা গ্লাসে ঢালিল।

ঘড়িতে বারোটা বাজিল। গ্লাসটা নিঃশেষ করিয়া সে বলিল, "চল।"

দুজনে বাহির হইলাম। বাহিরে জলে স্থলে বৃক্ষশীর্ষে জ্যোৎস্নার প্রবাহ দেখিতে পাইলাম।

আমবনে প্রবেশ করিলাম। কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। মন্ত্রমুগ্ধের মত দুইটি নির্ব্বাক প্রাণী চলিতে লাগিলাম।

আমবনের ভিতর সেই জনশূন্য বাড়ীটির কাছে আসিলাম। নরেন কতকগুলা শুক্‌না খড় টানিয়া বাহির করিল, তার পর দেয়াশালাই বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। কথা কহিতে পারিলাম না, কে যেন আমার গলা চাপিয়া ধরিল।

তার পরে দুজনে দ্রুতপদে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

আলো নিবাইয়া জানালা দিয়া দেখিতে লাগিলাম কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি আকাশের জ্যোৎস্নালোক মলিন করিয়াছে। চারিদিকে লোকের কোলাহল শোনা গেল। প্রভাতে গৃহখানি ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

নরেনকে একা রাখিতে ভয় করে। একটা চাকরকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া আমি স্বগৃহে আসিলাম। বাড়ীতে পঁহুছিতেই একটা লোক ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "তাড়াতাড়ি আসুন, বাবু ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ছিলেন, আমি ধরে ফেলেছি।"

মাকে দু চারি কথা বলিয়া আবার নরেনের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম একখানা চেয়ারে

সে বসিয়া আছে, তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ; মুখ দিয়া আসবের গন্ধ নির্গত হইতেছে, হাতে সেই বইখানা।

আমি বলিলাম, "নরেন, এ সব কি করিতেছ ?"

নরেন বলিল "ভাই, সব বুঝ্‌বে, বোঝাব। মনে হয় আমি দুশ্চরিত্র? হয়ত বল্‌বে 'না'। আমি বল্‌ছি আমি দুশ্চরিত্র। মনে পড়ে একদিন বলেছিলুম খুন করা বা চুরি করা আমার অসাধ্য? আজ বলছি কিছুই আমার অসাধ্য নয়। একটা কায কর, আমি একটু বাইরে যেতে চাই। চাকর এতক্ষণ কোথাও যেতে দেয় নি। তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।"

আমি বলিলাম, "কেন না বললে আমি যাব না।"

"তবে নিজেই যাই" বলিয়া নরেন দ্রুতপদে নীচে নামিল। আমি ও একজন চাকর সঙ্গে চলিলাম।

ফটক হইতে সামান্য দূরেই একটা অশ্বত্থ গাছ; তাহার নীচে একটি পোষ্টবাক্স। নরেন লাল খামে মোড়া দুখানা চিটি তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিল।

আমি বলিলাম, "চিঠি কার ?"

নরেন জবাব দিল না।

সারাদিন তাহারই বাড়ীতে রহিলাম। সন্ধ্যার পর নরেন বলিল, "যতীন, দিদিকে দেখ্‌বে ?"

আমি বলিলাম "তি ন কোথায় ?"

নরেন বলিল, "আর একটু রাত্রি হোক্‌।"

কথাটা আমার প্রাণে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিল।

রাত্রি সাতটা বাজিল। তার পর আটটা। নয়টার সময় আহারাদির যোগাড় হইল, কিন্তু কেহই আহার করিলাম না। দশটার সময় আমার একটু তন্দ্রা আসিল। এগারটার সময় দেখিলাম—নরেন ঘরে পায়চারি করিতেছে। টং টং করিয়া যখন বারোটা বাজিল, সে আমাকে সজোরে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিল, "চল ওঠ, দিদিকে দেখ্‌বে চল।"

উঠিলাম। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নিঃশব্দে নীচে চলিলাম। খিড়কীর দরজা খুলিয়া নরেন বাহির হইল। সম্মুখে একটি টালি দিয়া ছাওয়ান ঘর। নরেন ঘরের ভিতর হইতে শাবল বাহির করিয়া এই ঘরখানির নীচের দিকে দেওয়ালের গায়ে আঘাত করিল। দুচারিটি ইট সরিয়া গেল।

আমার কাছে একটি ইলেক্‌ট্রিক টর্চলাইট ছিল। দেখিলাম ঘরের নীচে খিলান, খিলানের নীচে এক অন্ধকূপ। নরেন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা সিন্দুক টানিয়া আনিল, তার পর বাহিরে আসিয়া বলিল, "দেখ তোমার দিদিকে।"

সিন্দুকের ডালা তুলিয়া দেখিলাম একটা কঙ্কাল।

নরেন বলিল "সব গহনাগুলি দেখ, এখনো গায়ে আছে।"

সে আর কথা কহিল না। সিন্দুকটা ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া ইঁটগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া বলিল, "চল ওপরে যাই।"

আমার মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছিল। টলিতে টলিতে উপরে গেলাম।

নরেন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "এখন আত্মরক্ষার উপায় কি করেছ ?"

নরেন হাসিয়া বলিল, "রক্ষা? আত্মার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছি।"

সকালে একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি এমন সময় লাল খামে মোড়া একটা চিঠি পোষ্ট পিওন আমার হাতে দিয়া গেল। চিঠিটা খুলিয়া পড়িলাম

যতীন,—রূপের মোহে, টাকার লোভে আমি নারীহন্তা হয়েছি, পুলিশকে সব প্রমাণ দিও।

তোমার নরেন।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের লোক বাড়ীতে প্রবেশ করিল। পাড়ার লোক দলে দলে ঘরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু নরেন কোথায়?

ইনস্পেক্টর সাহেব লাল খামে মোড়া একখানা চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন, "যতীন বাবুকে ডাক, তিনি সব জানেন।" আমি খিড়কীর বাহিরে সেই ঘরখানির দিকে আসিয়া দেখিলাম, যে খিলানের নীচে সিন্দুকটা আছে তাহারই উপর নরেনের লম্বমান মৃতদেহ খিলান হইতে ঝুলিতেছে ও বাতাসে দুলিতেছে।

[ধ]চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। •

পিতা

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোনও দেশে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, মহত্তর ও পবিত্রতর পিতৃস্তব রচিত হয় নাই। পিতা পুত্রের সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই অতি মধুর ও পবিত্র, কিন্তু আমাদের দেশে এই সম্বন্ধ যেন আরও মধুর, আরও পবিত্র। এ সম্বন্ধ কেবল ইহকালের নহে, পরকালেরও। পিতা পুত্রের নিকট স্বর্গ হইতে উচ্চতর, আবার পুত্র পিতার নরকত্রাতা, তাঁহার ধর্ম্মপালনের সহায়। সর্ব্বাগ্রে পিতৃগণকে স্মরণ ও তাঁহাদের তর্পণ না করিলে হিন্দুর কোনও ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না। সুপুত্র লাভ, মানবের পুণ্যলক্ষণ নির্দ্দেশ করে বলিয়া আমরা মানি। কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তির পূজা সর্ব্বদেশে প্রচলিত আছে। তাঁহাদের পুরুষকার, বীর্য্য ও বিবিধ সদ্‌গুণ-নিচয় সকলেই আগ্রহসহকারে কীর্ত্তন করেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথাও তাঁহাদের সাফল্য পিতার পুণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, একথা আমরা জ্ঞাত নহি। রঘুর ন্যায় দিগ্বিজয়ী মহাবীরের বীরত্ব-কাহিনী বহুদেশের মহাকবি অমর গাথায় কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবর্ষের—কেবল ভারতবর্ষের—মহাকবিই পিতা দিলীপের সৎপুত্রলাভার্থ কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতপালন, সংযম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার গৌরবময়ী কাহিনী মহাকাব্যে বর্ণিত করিবার উপযুক্ত মনে করিয়াছেন, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়া গেলেও, ভারতবাসী সেই পুণ্য-কাহিনী পাঠ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে। আজ এই মহালয়ার পুণ্যতিথিতে,—যখন লক্ষ লক্ষ হিন্দু পিতৃ-তর্পণ করিতেছেন, তখন এতৎসম্বন্ধে দীর্ঘ ভূমিকা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা আমাদের প্রিয় পাঠকপাঠিকা-গণের সম্মুখে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে কয়েকখানি পিতৃ-চিত্র তুলিয়া দিতেছি।

মহালয়া
১৩৩৬

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) পিতা ক্রোড়পতি—রামদুলাল দেব (সরকার)

ভূকৈলাসের উদার হৃদয় রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুরের পিতা—রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর

রাজা কালীকৃষ্ণ, মহারাজ কমলকৃষ্ণ, মহারাজ স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতির পিতা—রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
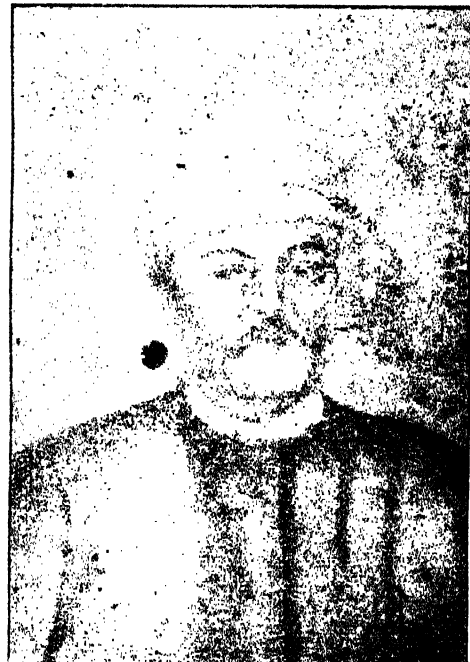
রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পিতা-মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা
প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গ-বিখ্যাত পুত্রের পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পিতা-
প্যারীমোহন সেন

বাঙ্গলায় রিসার্চ ফেলোসিপ প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক শরৎকুমার লাহিড়ীর পিতা—রামতনু লাহিড়ী

স্বনামধন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পিতা-
গোপীমোহন ঠাকুর
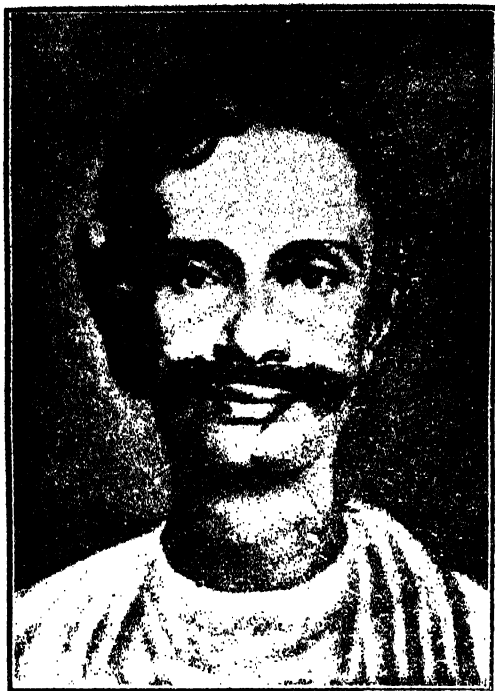
মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ও রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন
ঠাকুর বাহাদুরদিগের পিতা—হর ঠাকুর

দানবীর হীরালাল শীল প্রভৃতির পিতা—
মতিলাল শীল

দত্ত ফ্যামিলী এলবমের অন্যতম রচয়িতা সুকবি গোবিন্দ
চন্দ্র দত্ত প্রভৃতির পিতা—রসময় দত্ত

সুকবি উমেশচন্দ্র দত্তের পিতা-
কৈলাসচন্দ্র দত্ত

বহু ইংরেজী গ্রন্থ লেখক রায় শশীচন্দ্র দত্ত বাহাদুরের
পিতা—পীতাম্বর দত্ত
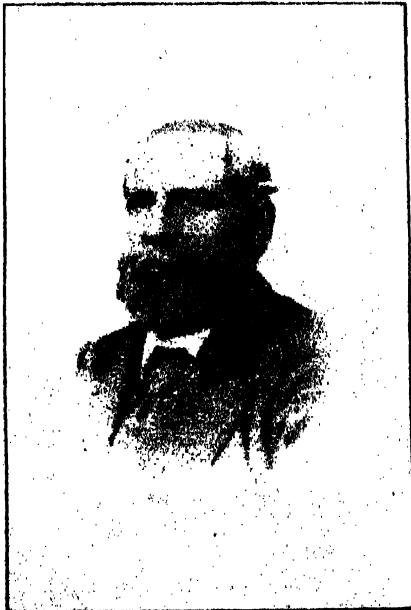
সুকবি তরু দত্তের পিতা—
গোবিন্দচন্দ্র দত্ত

সুপণ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী যোগেন চন্দ্র দত্তের পিতা—
উমেশচন্দ্র দত্ত

প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতা—
প্রসন্নকুমার ঠাকুর
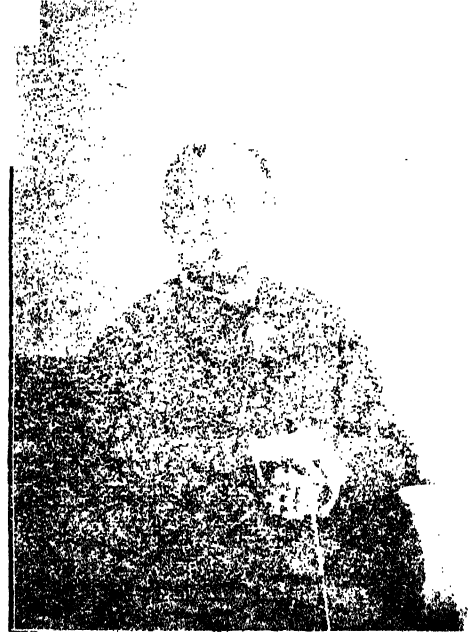
হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার-জজ স্যর আশুতোষ
চৌধুরীর পিতা—দুর্গাদাস চৌধুরী
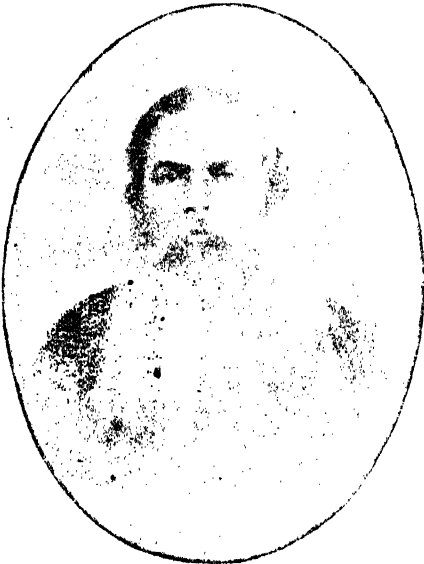
বড়লাটের মন্ত্রণাসভার সদস্য মিষ্টার এস্ আর দাশের পিতা-
দুর্গামোহন দাশ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা-
ভুবনমোহন দাশ

স্যর রাসবিহারী ঘোষের পিতা—
জগদ্বন্ধু ঘোষ

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা-
ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের পিতা-
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রাণনাথ পণ্ডিতের পিতা-
শম্ভুনাথ পণ্ডিত

মহাভারত অনুবাদক মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের পিতা— নন্দলাল সিংহ

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা গঙ্গাচরণ সরকার

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা— দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়

"বঙ্গাধিপ পরাজয়" প্রণেতা প্রতাপচন্দ্র ঘোষের পিতা হরচন্দ্র ঘোষ

দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-সম্রাট রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের পিতা
—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
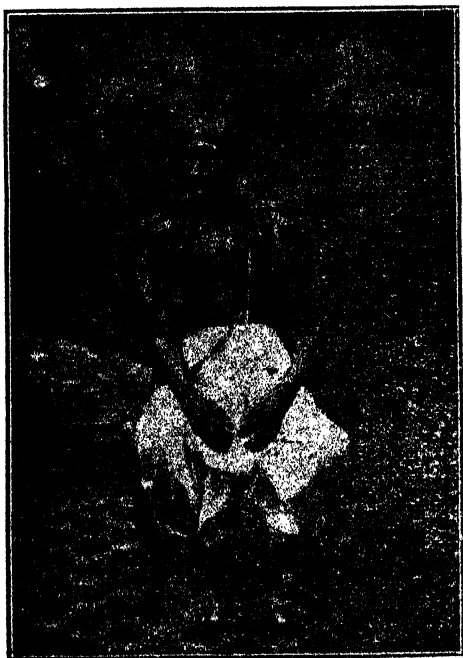
আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা-
হরানন্দ বিদ্যাসাগর

বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদক জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের পিতা—
পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পিতা—গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক
ব্যোমকেশ মুস্তফির পিতা—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি

সুকবি বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র রায় বাহাদুরের পিতা—
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

সুলেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা-
বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যোড়াসাঁকো থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা 'বিক্রমোর্ব্বশী' অনুবাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা—গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রসিদ্ধ নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাসের পিতা—শ্রীনাথ দাস

রসরাজ অমৃতলাল বসুর পিতা—
কৈলাসচন্দ্র বসু

সুপ্রসিদ্ধ কলাবিৎ ও গায়ক লালচাঁদ বড়ালের পিতা-
নবীনচাঁদ বড়াল।

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও দেশসেবক স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-
পাধ্যায়ের পিতা—ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক রায় নরেন্দ্র নাথ সেন
বাহাদুরে পিতা—হরিমোহন সেন

—। স্বনামধন্য দেশসেবক অশ্বিনীকুমার দত্তের পিতা-
ব্রজমোহন দত্ত
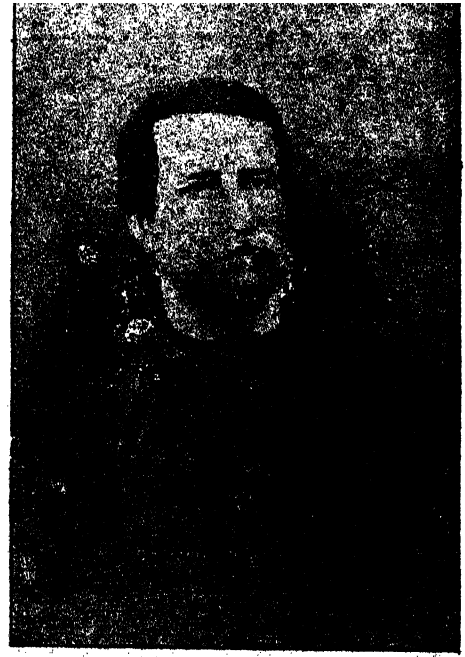
'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদক এবং বহু সদ্‌গ্রন্থের লেখক
রায় মুকুন্দলাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের পিতা—
ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

সুপণ্ডিত প্রসন্নকুমার ও সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক
রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুরের পিতা—
যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী

সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক ও বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের
প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর পিতা—
রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর

জয়পুর রাজ্যের পররাষ্ট্র সচিব অবিনাশচন্দ্র সেনের পিতা
বাহাদুর

মধ্যপ্রদেশের জুডিসিয়্যাল কমিশনার সুপ্রসিদ্ধ
ব্যারিষ্টার জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্রের পিতা—
...নীলাল মিত্র

বাণীর বরপুত্রী প্রতিভা দেবী (লেডি চৌধুরীর) পিতা—
হেমেন্দ্রনাথঠাকুর

'অন্তঃপুর' সম্পাদিকা বনলতা দেবী ও 'ভারত মহিলা'
সম্পাদিকা সরযুবালা দত্তের পিতা—শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

'ভারতী' সম্পাদিকা হিরণ্ময়ী দেবীর পিতা—
জানকীনাথ ঘোষাল
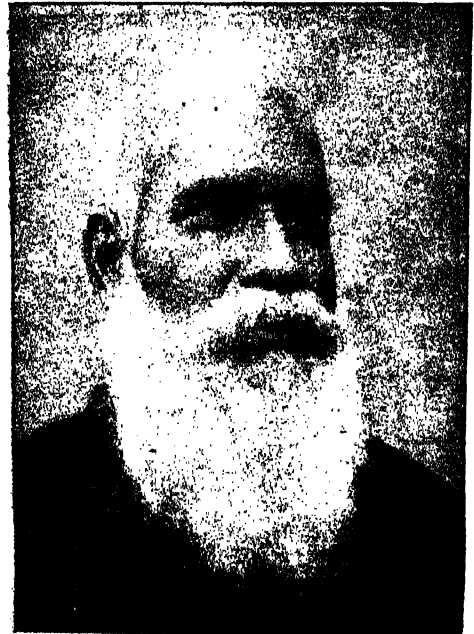
সুলেখিকা ইন্দিরা দেবীর পিতা—
রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

নারীধর্ষণ

(গল্প)

নারীধর্ষণের কথা হইতেছিল—তুমুল তর্ক।

গৃহকর্ত্তা অমৃত বাবু—টিং টিংয়ে—ফর্সা—ডিস্পেপ্ সিয়াগ্রস্ত—বয়স বছর চল্লিশ—ফিনফিনে পাঞ্জাবী, কোঁচান কাপড়, ওলটান চুল, ইত্যাদি।

প্রধান বক্তা যোগেন বাবু—মিশমিশে কালো—সোণার চশমা চোখে—জ্বল্ জ্বলে চোখ—ক্ষীণ দেহ এবং উচ্চ কণ্ঠ।

তাঁর বিরোধী নৃপেন বাবু—মোটা সোটা গোলগাল—স্কন্ধহীন—আয়েস ও আরামের জীবন্ত মূর্ত্তি।

যোগেন বাবু বলিতেছিলেন, মুসলমানদের অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গে স্ত্রীকন্যা লইয়া বাস করা অসম্ভব হইয়াছে। পুলিশ অকর্ম্মণ্য—গভর্ণমেণ্ট ততোধিক। একটা গুণ্ডা-অ্যাক্ট করিয়া বিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ বছর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানকে জেলে পূরিয়া রাখা উচিত—ইত্যাদি।

নৃপেন বাবু বলিতেছিলেন, এই সব নারীধর্ষণ আগাগোড়া সাজান ব্যাপার। মেয়েগুলি স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া গিয়া পরে ধরা পড়িলে বলে, তাদের জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত তাঁর নিজের জানা আছে।

অমৃত বাবু মৃদুস্বরে কদাচিৎ দু'একটা কথা বলিতেছিলেন, তার সার মর্ম্ম যতদূর বোঝা গেল তাহা এই—হিন্দুসভা করিয়া এই নিদারুণ বিপদের প্রতিকার করা উচিত। তা ছাড়া যোগেন বাবুর কথাটা ঠিক, মুসলমানের অত্যাচার অসহ্য হইয়াছে। আবার নৃপেন বাবুর কথাই ঠিক বলিয়া মনে হয়—মেয়েরাই বাস্তবিক বাহির হইয়া যায়—তার প্রমাণ—নারীধর্ষণের যত মামলা প্রায় সবই বিধবা লইয়া।

ভূমিকম্পের মত ইহার মাঝখানে আসিয়া পড়িলেন সূর্য্য বাবু—লম্বা চওড়া জোয়ান—সাদা মাঠা পোষাক—আদ্যোপান্ত একটা দৃপ্ত বলিষ্ঠতা তাঁর সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট।

ইহাদের তর্ক শুনিয়া তিনি মৃদু হাস্যসহকারে বলিলেন, "নারীধর্ষণ! এ আর একটা বেশী কথা কি? আমাদের দেশে নরধর্ষণ হ'লেই বা ঠেকায় কে? ছেলে ধরার হুজুগ বার দুই উঠেছিল মিছেমিছি। কিন্তু যদি ছেলেধরা আসতো সত্যি সত্যি, তবে তোমরা বুড়ো খোকারা কেউ বাদ যেতে না।"

শারীরিক শক্তির স্পর্দ্ধায় সূর্য্য বাবু যে ক্লিষ্টবৃত্ত এই দলটিকে অপদার্থ বলিয়া উপহাস করিতেন, এটা কোনও বন্ধুই ভাল রকম সহিতে পারিত না। তাই তিন জনেই একযোগে সূর্য্য বাবুকে আক্রমণ করিলেন।

"দেখা গেছে, তোমার বিক্রম দেখা গেছে! মুখে মুখেই বাহাদুরী। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার সময় কোথায় ছিলে চাঁদ?"

সূর্য্য বাবু বলিলেন, "চাঁদ চিরকাল আকাশেই থাকে। তোমাদের আয়ত্তের বাইরে।"

বাস্তবিক সূর্য্য বাবু তখন নিষ্কর্ম্মা ছিলেন না, কিন্তু তাঁর কাযের কথা তিনি কোনও দিন প্রকাশ করিয়া বলেন নাই।

অমৃত বাবুর মেয়ে আসিয়া বলিল, "বাবা, খাবার হ'য়েছে।"

যোগেন বাবু বলিলেন, "বাঃ বিনি যে দিব্যি বড় সড় হ'য়ে উঠেছে দেখি—ওর বিয়ে দিচ্ছ কবে?"

অমৃত বাবু বলিলেন, "চেষ্টা তো দেখছি—কিন্তু ভাল পাত্তর পাচ্ছি নে।"

বিনি ছুটিয়া পলাইল।

যোগেন বাবু বলিলেন, "পাত্তরের অভাব কি? টাকার তো খাঁক্তি নেই তোমার, টাকার গন্ধ পেলে মৌমাছির মত ভন্ ভন্ ক'রে এসে জুটবে।"

"তা জুটছে, কিন্তু একটাও মনের মতন নয়।"

সূর্য্য বাবু বলিলেন, "আমাদের সুরেনের ছেলে তো পাশ হ'য়ে বেরিয়েছে, দাও না তার সঙ্গে বে।"

"কি বল তার ঠিক নেই ওর না আছে চাল, না

আছে চুলো। তা ছাড়া ছেলে একটা গুণ্ডা!—আমার এই মেয়ের সঙ্গে তাকে মানায়?"

সূর্য্য বাবু একটু ভ্রূকুটি করিলেন।

নৃপেনবাবু বলিলেন, "তোমার যে বেয়াড়া ফরমায়েস তাতে বিশ্বকর্ম্মার বাড়ী বরাত না দিলে পাত্তর জুটবে না।"

"কেন বাপু, বেয়াড়াটা কিসে? ছেলেটি দেখতে শুনতে ভদ্রলোকের মত, এম-এ পাশ, আর ঘরে অন্ততঃ বছরে ছ-সাত হাজার টাকা আয়ের বিষয় এমন একটি ছেলে কি জুটতে নেই? আমি তো টাকা দিতে নারাজ নই—আর ঐ পরীর মত মেয়ে আমার!"

মেয়েটি সত্যই পরীর মত। বছর চৌদ্দ বয়স, কিন্তু ছোট্ট হাল্‌কা,—যেন একটি পুতুল। মুখ খানি ছাঁচে কাটা, দুধে আলতা রং, টানা ভুরু, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাসা দুটি চোখ, লতার মত হাত পা। রূপের পরাকাষ্ঠা। দেখিলে মনে হয় যেন ফুলটি—মনে হয় পকেটে পুরিয়া লইয়া যাই—সাজাইয়া রাখিবার মত জিনিষটি।

* * *

সূর্য্যবাবু বলিলেন, "বস্ এই হ'লেই হ'ল আর কিছু দরকার নেই! মেয়েটা খেয়ে দেয়ে আয়েসে থাকবে, আর বরটি জাত হিসাবে পুরুষ—এবং এম এ পাশ—এই। সে মানুষ কি না সেটা দেখবার দরকার নেই। হোক সে রোগা টিনটিনে, হোক সে রাগী বদখেয়ালী—এম-এ হ'লেই হল! আরে ভাই, মেয়ের বিয়ে দিতে সবই দেখতে হয় ঠিক, কিন্তু সবার আগের কথা এই যে, বরটি মানুষ কি না, সত্যি সত্যি পুরুষের বাচ্ছা কি না, সুস্থ শক্তিমান কি না।"

"তা হ'লে ভাল ভাল ছেলে ছেড়ে তোমার পাড়ার আখড়া থেকে বাছা বাছা গুণ্ডা ধ'রে ধ'রে মেয়েদের বে দেওয়া উচিত।"

"তা দিলে অন্ততঃ একটা জিনিষ হ'বে—নারীধর্ষণের কথা নিয়ে আরাম কেদারায় ব'সে নিষ্ফল আলোচনার কোনও দরকার থাকবে না।"

* * * *

বিনির বর জুটিল। বাপ যেমন চাহিয়াছিলেন তেমনি। দিব্য কার্ত্তিকের মত চেহারাখানা, সোণার বর্ণ, দেহখানা যেন রং করা মাখন দিয়া তৈয়ারী। ছেলের বাপ অবস্থাপন্ন, তা ছাড়া নিজের মাতামহ-বিত্ত যা আছে, তাহাতেই সে বেশ স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইতে পারে। তার উপর সে এম-এ, বি-এল, হাইকোর্টে শীঘ্রই ভর্ত্তি হইবে। ফুর ফুরে বাবুটি, মনে হয় যেন গায় এক কোঁটা রৌদ্র লাগিলে সে গলিয়া যাইবে।

জামাই দেখিয়া মেয়ের বাপ মা, সবাই ভয়ানক খুসী হইলেন। বিনির চক্ষু তো তার দিকে চাহিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মহা আনন্দে একটা অবসানহীন কাব্যের মত স্বামী-স্ত্রীর সম্পন্ন জীবন কাটিতে লাগিল। অবসরের তাদের অভাব নাই, স্বামী স্ত্রী কারও কাযের কোনও তাড়া নাই। অলস দিনগুলি অনলস প্রেম চর্চ্চায় ভরিয়া

সুরেনের ছেলে বলিয়া সূর্য্য বাবু যার পরিচয় দিয়াছিলেন তার নাম দেবলাল। সত্যই তার চেহারা কার্ত্তিকের মত মোটেই নয়। রং কালো না হইলেও ময়লা। লম্বা ছ ফুট দু ইঞ্চি—প্রকাণ্ড চওড়া বুক, হাত পাগুলো যেন একটা গাছের গুঁড়ি—পাহাড়ের মত শক্ত বলিষ্ঠ তার দেহ।

তার বাপ সেক্রেটারিয়াটে কায করিতেন। তাঁর মনে মনে আশা ছিল, ছেলেটা বি-এ পাশ করিলেই সাহেবদের ধরিয়া তাকে একটা ডেপুটী, কি সবডেপুটী করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন।

কিন্তু বি-এ পাশ করিবার পূর্ব্বেই ছেলেটির নিজের ইচ্ছা বলিয়া একটা বেয়াড়া জিনিষ দেখা দিল,—সেটা যেমন স্পষ্ট তেমনি শক্তিমান। ছেলে বলিল, "ও সব কায ক'রবো না আমি। টেবিলে ব'সে শুধু দিনরাত কলম পেশা, সে আমার পোষাবে না।"

ছেলের সঙ্গে এই লইয়া পিতার একটা প্রকাণ্ড ঝগড়া হইয়া গেল।

দেবলালের আর সব দোষের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দোষ এই যে, সে খেলা লইয়া বড় বেশী বাড়াবাড়ি করে। এই খেলার বাতিকে মাতিয়া সে পরীক্ষায় ভাল

ফল করিতে পারিল না বলিয়া তার পিতার আক্ষেপের সীমা ছিল না।

তা ছাড়া, তার বাপ মা তাকে বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অনেকগুলি ভাল ভাল মেয়ে দেখিয়াছিলেন। বিনির সঙ্গেও কথাটা উঠিয়াছিল। দেবলাল ঝাড়িয়া অস্বীকার করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, প্রথমতঃ তার বিবাহের সময় হয় নাই—দ্বিতীয়তঃ ঐ সব সাজান পুতুল সে বিবাহ করিবে না। ফুলের ঘায় যারা মূর্চ্ছা যায় সে সব পরীর বাচ্ছা ঘরে আনিয়া তার পোষাইবে না।

তার বোন মণি বলিল, "হাঁ, দাদা, তোমার বউ কি এসে তোমার সঙ্গে কুস্তী লড়বে না কি?"

দেবলাল বলিল, "তা' হ'লে মন্দ হয় না। কিন্তু কুস্তী না লড়লেও চলতে পারে, যদি সে মলয়বায়ের ধাক্কায় আছাড় না খেয়ে, শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।"

"মলয় বায়ুকে তোমার এত ভয়?"

"তা ভয় আছে বই কি? ঐ জিনিষটা যে দেশে এপিডেমিক হ'য়ে উঠেছে।"

মণি স্বয়ং মলয় বায়ের ঘায়ে পড়িয়া যাইবার মত মোটেই নয়। সে দেবলালের সহোদরা এবং শিষ্যা—শক্ত সমর্থ কর্ম্মিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা।

সে বলে, "তোমার জন্যে তবে একটা অ্যামেজন খুঁজে বের ক'রতে হবে।"

"যা ব'লেছিস্—ঠিক তোর মত।"

অনেকগুলি বড় বড় ঘরের মেয়ে এই কারণে হাত ছাড়া হইয়া যাওয়ায় দেবলালের মা ছেলের উপর চটিয়া গেলেন। যদিও ছেলের বিবাহে পণ লইতে তাঁরা পারিবেন না বলিতেন, তবু বড় ঘরে কটুম্বিতা করিবার গৌরবের লোভ তাঁদের ছিল। তা ছাড়া, বড় লোকের মেয়ের বিবাহে পণ না লইলেও সেটা যৌতুকে পোষাইয়া যায় এ জ্ঞান তাঁদের ছিল।

তার বাপ ও মা দুজনেই যখন হাল ছাড়িয়া দিয়া ছেলের সম্বন্ধে একেবারে নির্ভরলা হইয়া বসিয়াছেন, সেই সময় দেবলাল একটা ভাল চাকরী পাইয়া গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা বিবাহও করিয়া ফেলিল।

খেলার মাঠে রেলের এক বড় সাহেবের সঙ্গে দেবলালের ভাব হইয়াছিল। তাঁর যত্নে সে রেলওয়ের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় তার চাকরীতে ভর্ত্তি হইতে গেল।

ভরা বর্ষায় তখন পদ্মার দুই কূল ছাপাইয়া গিয়াছে। একটু জোর হাওয়া বহিতেছে—তাতেই পদ্মার বিপুল বক্ষ আলোড়িত হইয়া বড় বড় ঢেউ ছুঁড়িয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, আর মনের আনন্দে নদী তার কূল ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে।

ষ্টীমারের ফার্ষ্ট ক্লাশের ডেকে বসিয়া দেবলাল মুগ্ধ নয়নে পদ্মার এ ধ্বংসলীলা দেখিতে দেখিতে চলিল।

একখানা গ্রাম, পদ্মার ধারে। অনেক দিনের এ গ্রাম। নিশ্চিন্তমনে গ্রামবাসীরা এখানে পাকা ঘর বাড়ী গড়িয়া বাস করিতেছিল—পদ্মা তখন ছিল অনেক দূরে। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে নদী আসিয়া পড়িয়াছে তাদের ঘরের পাশে। গ্রামখানা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অনেক বাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে, তীরে এখন যেগুলি আছে সে বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তার যা কিছু সঙ্গে লওয়া যায় তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য গৃহস্বামীরা ব্যস্ত হইয়াছে। পুরুষ নারী, বৃদ্ধ হইতে শিশু সবাই সন্ত্রস্ত চিত্তে কাষ করিতেছে, ভাঙ্গন আসিবার আগে ঘর ভাঙ্গিয়া নামাইবার চেষ্টায়।

এ দৃশ্য দেবলাল কখনও দেখে নাই। দেখিয়া বিস্ময়স্তব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

অন্য বাড়ীগুলি হইতে একটু তফাতে একখানা বাড়ী—সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী বলিয়া মনে হইল।

দুটি পুরুষ আর পাঁচ ছয়টি স্ত্রীলোক কোমরে কাপড় বাঁধিয়া এখানে ঘর ভাঙ্গিতে লাগিয়া গিয়াছে। নদীতে দুখানা ডিঙ্গি বাঁধা রহিয়াছে তার উপর জিনিষ উঠান হইতেছে। একটি মেয়ে—বছর ষোল সতের তার বয়স—সে একটা ভারী বোঝা আনিয়া ডিঙ্গির উপর রাখিল। সে চাহিয়া দেখিল ষ্টীমার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। এখনি ষ্টীমারের ঢেউ লাগিয়া নৌকা দু'খানি হয় ভাসিয়া যাইবে না হয় ডাঙ্গায় ঘা খাইয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে।

মেয়েটি চীৎকার করিয়া বাড়ীর লোককে ডাকিল। ডাক শুনিয়া একজন পুরুষ ছুটিয়া আসিল, আর একজন টিনের ঘরের চালার উপর হইতে তাড়াতাড়ি নামিতে লাগিল।

তার আগেই ঢেউ আসিয়া প'ড়িল।

পুরুষ যে আসিয়াছিল, সে একখানা নৌকার গলুই ধরিয়া অনেকটা ডাঙ্গায় তুলিয়া প্রাণপণ জোরে তাকে টানিয়া ধরিল। মেয়েটি আর একটা নৌকা ধরিল। ষ্টীমারের ঢেউ আসিয়া প্রচণ্ড বেগে নৌকার গায়ে আঘাত করিল। পুরুষটি সে ধাক্কা সামালাইল, মেয়েটি পারিল না, নৌকার ঘা খাইয়া পড়িয়া গেল।

দেবলাল দেখিতেছিল। মেয়েটি পড়িতেই সে লাফাইয়া উঠিল—উপরে সারেঙ্গের কাছে ছুটিয়া তাকে বলিতে গেল "ষ্টীমার থামাও।"

সারেঙ্গকে দেখাইতে গিয়া সে দেখিতে পাইল যে, নৌকাখানা ভাসিয়া খানিকটা দূরে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মেয়েটি?—সে জলের ভিতর খানিকটা গড়াগড়ি খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেবলাল বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া চাহিয়া দেখিল যে, এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া মেয়েটি বাড়ী ফিরিয়া গেল না; চক্ষের পলক না ফেলিতে সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, সাঁতার কাটিয়া সে নৌকা ধরিয়া তার উপর বসিয়া বৈঠা লইয়া সে তাহা চালনা করিবার চেষ্টা করিল।

তখন অপর পুরুষটি নামিয়া আসিয়াছে। সেও সাঁতার কাটিয়া নৌকায় উঠিল। দেবলাল নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সারেং ষ্টীমারের এঞ্জিন বন্ধ করিয়াছিল, সে আবার চালাইবার আদেশ দিল। দেবলাল নীচে নামিয়া আসিল।

অল্প দূরে ষ্টীমার তারপাশা ষ্টেশনে ধরিল। দেবলাল সেখানেই নামিয়া পড়িল।

জিনিষপত্র ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মায় রাখিয়া নদীর ধার দিয়া দেবলাল সেই বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল, বাড়ীর কর্ত্তা আধ বয়সী এক গ্রাম্য ভদ্রলোক। দেবলাল সেদিন তার সেই ভাঙ্গা ঘরে আতিথ্য স্বীকার করিয়া বাড়ীর লোকের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কায করিয়া দিল।

পরের দিন তাঁরা তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। দেবলাল তারপাশায় ফিরিয়া আসিয়া ষ্টীমার ধরিল।

ভদ্রলোকটীর সবিশেষ পরিচয় সে পাইয়াছিল। তারাকান্ত বাবু সম্পন্ন গৃহস্থ—বিস্তর জোত জমী ছিল। পদ্মায় তাঁর জমীজমা প্রায় সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, এখন ঘর বাড়ীও গেল। নগদ টাকা ও তেজারতি কিছু আছে, তাহাই সম্বল করিয়া তিনি নূতন বাসা বাঁধিবার চেষ্টায় স্থানান্তরে গেলেন।

বাড়ীর অপর পুরুষটি তারাকান্ত বাবুর ছেলে—ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। এইবার তার পাঠ সাঙ্গ করিয়া চাকরী করিতে হইবে—পাঠ চালাইবার সঙ্গতি তাদের নাই।

মেয়েটি তারাকান্তবাবুর মেয়ে সুধা। বয়স সতেরো বছর হইয়াছে, বিবাহের কোনও জোগাড় করিতে পারেন নাই। এখন তাঁর যে অবস্থা তাতে আর যে পারিবেন সে ভরসাও নাই।

মেয়েটিকে দেবলাল কাছাকাছি দেখিয়াছে। গৌরবর্ণ সুস্থ সবল, পরিপূর্ণ, শক্তিমান দেহ। যুবতী-সুলভ মনোহারী হাবভাব তার নাই, কিন্তু দেবলালের চক্ষে তাকে অশেষ সৌষ্ঠবে মণ্ডিত বলিয়া মনে হইল।

দেবলাল জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ভিন্ন জাতে মেয়ে বিয়ে দিতে আপনার আপত্তি আছে?"

তারাকান্ত বাবু একটু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "তা' —কত লোকেই তো করছে—ছেলেটি যদি ভাল হয়—তবে দোষ কি? কি বল?" বলিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিলেন। গৃহিণী ভ্রূকুটি করিয়া চলিয়া গেলেন।

যাইবার সময় দেবলাল তারাকান্তর ছেলে ভূপতিকে তার সঙ্গে খানিক দূর টানিয়া লইয়া গেল। বিদায়ের সময় নিজের সমস্ত পরিচয় দিয়া বলিল, "তোমার বাবা মার যদি মত হয়, তবে আমি তোমার বোনকে বিয়ে ক'রতে চাই। বোলো তাঁদের।"

মত হইল। একমাস পর সুরেন বাবু ও তাঁর স্ত্রী ছেলের চিঠি পাইয়া অবাক হইয়া গেলেন। ছেলে

লিখিয়াছে, সে সুধাকে বিবাহ করিবে স্থির করিয়াছে। সুধা অসবর্ণা।

মা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বাপ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নারায়ণ!"

পাঁচ বছর পরে।

বিনির স্বামী বিজলীবাবু মুন্সেফ হইয়া ময়মনসিংহে আসিয়াছেন।

চাকরী নিতে বাড়ীর সকলের মত ছিল না, কিন্তু বিজলীর বাড়ীতে বাস করিতে মন উঠিতেছিল না। তার বাপ ও খুড়িমা নিতান্ত সেকেলে, আর তাদের বাড়ী লোকজনে ভর্ত্তি!

সুন্দরী স্ত্রীকে লইয়া স্বচ্ছন্দ ভাবে সংসার করিবে, নিজের ইচ্ছা মত তাকে লইয়া ঘুরিবে ফিরিবে, এ সথ বিজলীর ছিল। কিন্তু এসথ মিটাইবার অবসর তার কলিকাতার বাড়ীতে হয় না। এখানে বউ থাকে অন্দরে বন্দী—বাহিরে যাইতে হইলে গাড়ীর চারিদিকে পরদা দিয়া খাঁচার পাখীর মত তাকে বাহির হইতে হয়, বহির্ব্বাটীর সঙ্গে তার আদান প্রদান হয় ঝির মারফতে।

বিজলীর প্রাণভরা পিপাসা এ আবেষ্টনে মিটিল না। স্বাধীন ভাবে স্ত্রীকে লইয়া ঘর বাঁধিবার জন্য ব্যাকুলতায় সে অবশেষে মুনসেফী স্বীকার করিল।

বিজলী মুন্সেফ, কিন্তু সে মোটর রাখে, বেশ সাজান বাড়ীতে থাকে। স্ত্রীকে লইয়া মোটরে এদিক সেদিক বেড়াইতে যায়; বাড়ীতে ড্রইং রুমে বসিয়া স্ত্রীর গীতবাদ্য শোনে;—বেশ সৌখীন ভাবে জীবন কাটায়।

একদিন বিজলী বিনিকে লইয়া দশ বার মাইল দূরে চলিয়া গেল। সঙ্গে গেল তার শোফার ও একটী চাপরাশী। ব্রহ্মপুত্রের ধারে একটা নির্জ্জন জায়গায় মোটর রাখিয়া তারা নদীর ধারে বেড়াইতে লাগিল।

সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। জ্যোৎস্না রাত্রি—হেডলাইট আছে, ভাবনা হইল না।

মোটর ছাড়িয়া অনেক দূর তারা চলিয়াছিল, হঠাৎ অবস্থাটা খেয়াল হইয়া বিনি ভয় পাইয়া বলিল, "চল গাড়ীতে ফিরে যাই—আমার ভয় করছে।"

তাকে বুকের ভিতর সাপটিয়া ধরিয়া বিজলী বলিল, "দূর পাগলী, ভয় কিসের?"

"না, চল।"

তারা ফিরিল।

তিনটি লোক সেই পথ দিয়া আসিতেছিল, দেখিয়া বিনি আতঙ্কে একেবারে বিজলীর বুকের ভিতর মিশাইয়া গেল।

বিজলী বলিল, "ও কি? অমন কোরো না। চল।"

তারা চলিল। লোক তিনটি সাম্‌নে আসিল। তাদের একজন বিনিকে লক্ষ্য করিয়া কুৎসিৎ একটা ইয়ারকী করিল।

বিজলী ক্রুদ্ধ হইয়া তাকে তিরস্কার করিল।

লোক তিনটা তার সামনে আসিয়া তাড়া করিল। বিনি একেবারে মুশড়িয়া পড়িল, বিজলীরও বুক শুকাইয়া গেল। কিন্তু সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "চাপরাশী! চাপরাশী!"

তখন একটা লোক তার গালে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল

আর একজন বিনির চিবুক ধরিয়া তুলিয়া দেখিল—বলিল, "বা রে!"

দেখিতে দেখিতে কি যে কাণ্ড হইয়া গেল!

হেঁচকা মারিয়া একজন বিনিকে বিজলীর কাছ হইতে ছিনাইয়া লইল। আর এককন তার হাতের ছড়ি দিয়া বিজলীকে মারিল এক ঘা।

খানিকক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বিজলী তীরবেগে "চাপরাশী! চাপরাশী!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল মোটরের দিকে। ড্রাইভার ও চাপরাশী ছুটিয়া আসিল, কিন্তু ততক্ষণ বিনির অচেতন দেহ কাঁধে ফেলিয়া দুষ্কৃতকারীরা পলায়ন করিয়াছে।

৫

ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে একটা সাইডিংএ একখানা সেলুন।

দেবলাল ও সুধা দুখানা চেয়ারে দুজনে বসিয়া তখনও বই পড়িতেছে—রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর।

পোকার উপদ্রবে শেষে বই বন্ধ করিয়া সুধা বলিল,

"চল শোবে চল। পাট ক্ষেতের মধ্যে গাড়ী বেঁধেছে—পোকার জ্বালায় আলো রাখবার জো নেই।"

পাশেই পাট ক্ষেত।

সুধার চেহারা আশ্চর্য্য রকম খুলিয়া গিয়াছে।

বিবাহের পর হইতে দেবলাল তাকে নিয়মিত ব্যায়াম করাইয়া শরীরের শক্তি অসম্ভব বাড়াইয়া তুলিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ অপরূপ গৌরব ও শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

দেবলাল হাসিয়া বলিল, "আমি উঠবো না। ওঠাও দেখি আমায়।"

সুধা কোমরে কাপড় আঁটিয়া দেবলালের চেয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেবলাল চাপিয়া চেয়ারে শুইয়া রহিল, খুব খানিক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া শেষে সুধা তাকে দু'হাতে তোল্লা করিয়া ধরিয়া বিছানায় লইয়া গেল।

এই পরিশ্রমের ক্লান্তিতে সুধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে তার কোমরের বাধন খুলিতে লাগিল। তার সেই শ্রম-ক্লান্ত শ্রীর অপরূপ মাধুরীতে দেবলাল মুগ্ধ হইয়া গেল। সে উঠিয়া তার বলিষ্ঠ বাহুর ভিতর তাকে চাপিয়া নিষ্পেষিত করিল—আর চুম্বন ধারায় তাকে ভাসাইয়া দিল। সুধা তার হাতের উপর এলাইয়া পড়িল।

তার পর বাতি নিবাইয়া তারা শুইয়া পড়িল।

দেবলাল তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সুধারও ঘুমের আভাস আসিয়াছে।

হঠাৎ নারী-কণ্ঠের একটা চীৎকারের শব্দ হইল। তার পর সব স্তব্ধ। সুধা লাফাইয়া উঠিল।

কোথাও কোনও শব্দ নাই।

কিছুক্ষণ পর একটা খুব চাপা গোঙানি শোনা গেল।

গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া টর্চ্চ ঘুরাইয়া সুধা শব্দের দিকে চাহিল। তার মনে হইল পাটক্ষেতের মাঝখানে পাটের ডগাগুলি ঘন ঘন নড়িতেছে।

ধাক্কা দিয়া সে দেবলালকে উঠাইল।

দুজনে দুইটা বন্দুক হাতে করিয়া তারা গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। ছুটিয়া পাটক্ষেতের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ভয়ানক ব্যাপার।

দুষ্কৃতকারীরা পলায়ন করিতেছে—ভূমিতে পড়িয়া একটি অপরূপ সুন্দরী অর্দ্ধচেতন অবস্থায় গোঙাইতেছে।

দেবলাল বলিল, "তুমি একে নিয়ে যাও, আমি ওদের দেখি।"

সুধা মেয়েটির অচেতন দেহ কাঁধে ফেলিয়া গাড়ীতে লইয়া গিয়া তার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। চাপরাশীকে পাশের কামরা হইতে ডাকিয়া সাহেবের সাহায্যার্থে যাইতে বলিল, বন্দুকটা তার হাতে দিয়া দিল।

দুষ্কৃতকারীরা ভিন্ন ভিন্ন পথে পলাইয়াছিল—দেবলাল একজনকে অনেকদূর অনুসরণ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। তার গলায় কাপড় বাঁধিয়া তাকে লইয়া রেল পুলিসের আফিসের দিকে গেল।

পাষণ্ডদের একজন ছুটিয়া আসিয়া দেবলালের গাড়ীর চাকার আড়ালে লুকাইয়া ছিল।

চাপরাসী চলিয়া গেলে সে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া পথ নিষ্কণ্টক দেখিয়া একবার সুধার কামরার ভিতর উকি মারিল।

সুধা তখন আলো জ্বালিয়া শায়িত নারীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত।

লোকটার তখন মনে হইল মেয়েটাকে না সরাইলে তারা হয় তো ধরা পড়িবে। কেন না কয়েকদিন হইল তারা তাকে তাদের সবার বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরাইয়া রাখিয়াছে, তাদের ঘরের সন্ধান সে হয়তো বলিতে পারিবে।

গাড়ীর ভিতর একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ নাই দেখিয়া তার সাহস হইল।

সুধা দুয়ার বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, পাষণ্ড নিঃশব্দে কামরার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

মেয়েটির জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছিল। সুধা তার First aid outfit হইতে উত্তেজক ঔষধ বাহির করিয়া তাকে খাওয়াইতেছিল।

এমন সময় ঐ লোকটার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মেয়েটি বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। সুধা মুখ ফিরাইয়া দেখিল কামরার ভিতর লোক।

সে একটু চমকাইয়া উঠিল। সেই সুযোগে লোকটা তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রচণ্ড শক্তির সহিত একটা ঝটকা মারিয়া সুধা লোকটাকে গাড়ীর অপরপ্রান্তে ছুড়িয়া ফেলিল।

তার পর তার স্বামীর লাঠি হস্তগত করিয়া সে তাকে এমন কয়েক ঘা লাগাইল যে লোকটা হাউ মাউ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

সুধা তখন তার হাত পা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া তাকে রাখিয়া আবার আর্ত্তশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

দেবলাল যখন তার বন্দীকে পুলিসের জিম্মা করিয়া দিয়া ফিরিল তখন তার সঙ্গে দারোগা ও একজন কনেষ্টবল আসিয়াছিল মেয়েটির জন্য।

দেবলাল যখন দেখিল যে সুধা একটি দস্যুকে আহত করিয়া বন্দী করিয়াছে, তখন তার অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হইল – ছাতি ফুলিয়া উঠিল।

বিনিকে পুলিস দেবলালের কাছেই রাখিল, ডাক্তার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

বিনি লজ্জার ভয়ে তার নাম প্রথমে প্রকাশ করে নাই, কিন্তু ক্রমে সব জানাজানি হইয়া গেল।

সুস্থ হইবার পর একদিন বিনি সুধাকে বলিতেছিল, "তুমি যে এমনি থাক ভেবে অবাক লাগে। আমি হ'লে তো ভয়েই ম'রে যেতাম।"

সুধা সগর্ব্বে বলিল, "যার কাছে আমি থাকি, তার চারপাশে কোথাও ভয় আসতে পারে না।"

"তা সত্যি ভাই।"

অনেকক্ষণ পর কথায় কথায় বিনি বলিল, "ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল!"

"তাই নাকি? এ কথা এতদিন বল নি? তাই বলি, এটা তা' হলে যোগ-সাজসী ব্যাপার।" বলিয়া সুধা হাসিয়া উঠিল।

"যাও কি যে বল! ভাই, ও সব কথা আর মুখে এনো না। সে দিনের কথা মনে উঠলেও আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। ঠাট্টা ক'রেও সে কথা ব'লো না।"

হাসিয়া সুধা বলিল, "আচ্ছা তা নাই ব'ল্লাম। তা' তোমার বিয়ে হ'ল না কেন?"

"তা' জানি না। হয়তো তোমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হবে ব'লে।"

"তা যাকগে। এখন বিয়ে হ'য়ে যাক তা' হ'লে!" সুধা আবার হাসিল।

"কি যে বল!"

সুধা হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিল। বলিল, "হাঁ ভাই, মনে কিছু ক'রো না—তোমার স্বামী যদি তোমাকে নাই নেন, তবে কি ক'রবে?"

"কেন? তিনি কি তাই ব'লেছেন নাকি?—তা' ব'লবেন না কেন? আমিই বা আর কোন মুখে তাঁর কাছে যাব?"

বিনির চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল।

সুধা বলিল, "না সে কথা তিনি বলেন নি – কিন্তু কি ক'রবেন তিনি সেটা এখনও বুঝতে পারছি নে। উনি বলেছিলেন যে ভদ্রলোকের ইচ্ছে আছে, কিন্তু লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না ব'লে ভয় পাচ্ছেন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিনি বলিল, "তা তো বটেই!—মুখ দেখাবার পথ আমারও নেই তাঁরও নেই।" তার পর কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, "আমার বন্ধুর কায ক'রবে ভাই? অনেক তো ক'রেছ, তবু এই টুকু!—একটু বিষ দিতে পারবে?"

"পাগল! মরবে কোন দুঃখে? স্বামী নাই নেন, তাতেই কি তোমার জীবন ব'য়ে গেল? আমি ব'লছি তুমি এখান থেকে স্বামীর ঘরে যাও ভাল, নইলে এখানেই তুমি থাকবে। আমি তোমাকে মানুষ ক'রে তুলবো, যাতে মুখ উঁচু ক'রে লোককে মুখ দেখাতে পারবে তাই ক'রবো।"

কিন্তু ভাবনা চিন্তা শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। সেই দিনই বিজলী আসিয়া বিনিকে লইয়া গেল। ময়মনসিংহে তার মুখ দেখাইবার পথ নাই, আর কলিকাতার নিরাপদ আশ্রয় ছাড়িয়া মফঃস্বলে এ অমূল্য রত্ন লইয়া বাস ভয়াবহ, তাই সে চাকরী ইস্তাফা দিয়া কলিকাতায় আসিয়া বসিল।

নারীধর্ষণের প্রতিকারের জন্য অমৃত বাবু উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সভা সমিতিতে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। অমৃতবাবুর তিলার্দ্ধ অবসর নাই।

একটা সভা হইতে ফিরিয়া অমৃতবাবু সরবৎ পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিতেছেন।

সূর্য্যবাবু আসিয়া বলিলেন, "ভায়া, নারী-ধর্ষণের প্রতিকার মীটিং করে ক'রে হয় না। ছেলে মেয়েগুলোকে মানুষ কর। সুরেনের ছেলেকে গুণ্ডা ব'লে তার সঙ্গে

মেয়ের বিয়ে দিলে না—এখন দেখলে তো তোমার সোণার চাঁদ ছেলেদের মূল্য কি?"

সুধা দেবলালকে বলিল, "কি সুন্দর চেহারা বিনির, যেন পটের পরীটি—ঠিক যেন একটা সাজানো পুতুল—দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে।"

দেবলাল বলিল, "তা' সত্যি।"

"শুনলাম তোমার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হ'য়েছিল। অমন মেয়ে ছেড়ে তুমি এই ধুমসো মাগীকে বিয়ে ক'রলে?"

দেবলাল তাকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া বলিল, "পটের পুতুল নিয়ে আমি কি ক'রবো সুধা? পুতুল খেলবার বয়েস যে নেই। আমার চাই জ্যান্ত মানুষ—তাই।"

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

আশীর্ব্বাদ

(গল্প)

ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন তো বাসা বাঁধিয়াছে। আজ বাংলা, কাল বিহার, পরশু উড়িষ্যা, তারপর দিন মাদ্রাজ এই রকম করিয়া তাহাদের বদলি হইতেছে। ইহা ছাড়া এক এক প্রদেশে এক একটি ব্যাধি বারমাস বসবাস আরম্ভ করিয়াছে; যথা বাংলায় ম্যালেরিয়া, বেহারে কলেরা, ইউপিতে প্লেগ ইত্যাদি।

কথায় বলে নিত্য নেই দেয় কে, নিত্য রোগী দেখে কে? ফলে এই হয়, দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনে সাহায্যের জন্য যত লোকের প্রয়োজন হয় তাহার অর্দ্ধেকও জুটে না। যাহারা জুটে তাহাদের সকলেও সেবার ব্যবস্থা অবগত নহে। কাজেই যেমনটি হওয়া উচিত তাহার অর্দ্ধেকও হয় না।

কলেরায় ও প্লেগে দুটি রোগী মরিবামাত্র দু'শো লোক পলাইতে আরম্ভ করিতে থাকে—শেষটা মৃতদেহ ফেলিবার লোক পাওয়া দুষ্কর হয়। ম্যালেরিয়ায় কেহ কাহাকেও ফেলিয়া পলায় না—তাহার প্রধান কারণ, পলাইবার সামর্থ্য থাকে না। সকলেই ভোগে ও চাহিয়া দেখে; কিন্তু প্রতিকারের উপায় কেউ ভাবে না—খুঁজিয়াও পায় না।

এ সকল বিপত্তি ও ব্যাধিতেই সেবার প্রয়োজন। সাধারণ লোক সেবা-বিমুখ; কেহ বা আলস্যবশতঃ কেহ বা অজ্ঞানতা নিবন্ধন।

সমস্ত ভারত সেবা সঙ্ঘ হইতে সেজন্য সেবাব্রত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাদের সেবার পদ্ধতি শিখাইবে, জলপ্লাবনে কি করিয়া লোককে বাঁচাইতে হইবে, কি করিয়া তাহাদের সাহায্য দিতে হইবে, দুর্ভিক্ষে কি করিয়া খাদ্য ও ঔষধ যোগাইতে হইবে, মহামারীতে কি করিয়া সাহসের সঙ্গে তাহাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া তাহাদের নিরাময় করিতে হইবে, এই সব এক এক করিয়া শিখানো হইবে।

সেবা সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্কুল, কলেজ, মিউনিসিপালিটি ইউনিয়ন প্রভৃতির কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিলেন যে অন্ততঃ একজন করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধি তাঁহারা শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠান; ইহারাই শিখিয়া গিয়া আবার অন্যান্যকে শিখাইতে পারিবে।

এই শিক্ষার সময় তিনমাস নিরূপিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে এক একবার এই শিক্ষালয় বসিবে। প্রথম বারে বসিবে বাংলায়, প্রত্যেক প্রদেশ হইতে এক আধজন করিয়া আসিতে লাগিল।

পূর্ণেন্দু আসিল পাটনা হইতে। সেখানকার বি এন্ কলেজের অধ্যাপক সে। কলেজ হইতেই তিন মাসের পূরা বেতনে ছুটি পাইয়াছে। আপনি শিখিয়া আসিয়া ছাত্রদের শিখাইবে; যে শিক্ষা তাহারা কলেজে শিখাইতেছে

তাহার চেয়ে হয়ত এই শিক্ষা তাহাদের ও ছেলের বেশী কাযে লাগিবে।

বর্ষা পড়িয়াছে। ভরা শ্রাবণ। বাহিরে অবিশ্রান্ত বর্ষণের শব্দ। মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। পরক্ষণে মেঘ গর্জ্জিয়া আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে।

রাত্রি ২টা বাজিয়াছে, সরোজিনীর চক্ষে তবু ঘুম নাই। মেয়েটি তাহার শ্বাশুড়ীর কাছে ঘুমাইতেছে। কোলের ছেলেটি তাহার কাছে—সেও অঘোরে ঘুমাইতেছে।

সরোজিনী ভাবিতে লাগিল, মানুষ যাহা পায় তাহা লইয়া সুখী হয় না কেন? এই বর্ষা—অবিশ্রান্ত বর্ষণ, গভীর রাত্রি, এ সময়ে মানুষ আপনার জন লইয়া সুখী হইতে পারে না কেন?

সরোজিনী পূর্ণেন্দুর স্ত্রী। স্বামী বিদেশে যাইবে শুনিলেই সে অস্থির হইয়া পড়িত। প্রথমে রাগ করিত, শেষে কাঁদিয়া ভাসাইত।

স্বামীকে ফেলিয়া সে পিতৃগৃহে গিয়াও সুখ পাইত না। কলিকাতায় তাহার পিত্রালয়। তাহার অন্য দুই ভগিনী বৎসরে অন্ততঃ একবার নিয়মিত ভাবে পিতামাতার কাছে আসিত ও অন্ততঃ এক মাস থাকিত। তাহাকে আনিতে যাইলে সে কোন না কোন একটা ওজর দেখাইয়া রহিয়া যাইত, ভাইদের মাঝে মাঝে পাটনায় আনাইত, তাহার পিতাও বৎসরে একবার তাহাকে দেখিয়া যাইতেন। মাকে দেখিবার ইচ্ছা হইলে স্বামীকে সঙ্গে লইয়া দুই চারিদিনের জন্য একবার চট্ করিয়া ঘুরিয়া আসিত। তাহার বড়দিদি পরিহাস করিয়া বলিত, সরোটা পাষণ্ড, স্বামী পাইয়া সব ভুলিয়াছে। আমরা তেমন নই।

সরোজিনী সে কথা শুনিয়া হাসিত। বুঝি আপন মনে একটা প্রীতিও অনুভব করিত।

পূর্ণেন্দুর যাইবার কথা শুনিয়া সে প্রথমে রাগ করিল, লুটাইয়া কাঁদিল, মেয়ের চুল বাঁধিয়া দিল না, ছেলেকে দুধ খাওয়াইল না।

মেয়ে ঠাকুরমার কাছে ঠোঁট ফুলাইয়া নালিশ করিল, "মা বকেচেন, চুল বেঁধে দিলেন না।"

ঠাকুরমা ব্যাপারটা জানিতেন। নাতিনীর চোখের জল মুছাইয়া, তাহার মুখে চুমা দিয়া শান্ত করিলেন।

বাহিরে যাইতে হইলেই পূর্ণেন্দুর সরোজিনীকে প্রয়োজন হইত। স্বামীর যাহা কিছু প্রয়োজন একটি ব্যাগে সে গুছাইয়া দিত। বিদেশে গিয়া পূর্ণেন্দুকে কোন অসুবিধায় পড়িতে হইত না।

একদিন পূর্ণেন্দু যখন বলিল, "আমার ব্যাগটা একটু ভাল ক'রে দেখে দাও, মাস তিনেক হবে।" তখন সরোজিনীর বড়ই রাগ হইল। বলিল, "বড় আনন্দ হচ্ছে, না? যাও, আমি কিছু পারবো না।" বলিয়া সে রাগ করিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল যেমন জমা হইবা মাত্র এক এক খণ্ড মেঘ বৃষ্টি ধারায় ঝরিয়া পড়ে।

তারপর স্বামী বাহিরে যাইবা মাত্র চক্ষু মুছিয়া স্বামীর যাহা কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য একটি ব্যাগে ও বাক্সে গুছাইয়া দিল। তিন মাসের জিনিষ কখনো একটা ব্যাগে ধরিয়া থাকে? বলিয়া আপন মনে খানিকটা রাগ করিল। তারপর যে যে বিছানা লইয়া যাওয়া হইবে তাহাও বাক্সের উপর গুছাইয়া রাখিল।

কায মিটিয়া গেলে সরোজিনী জোর করিয়া অশ্রু রোধ করিয়া ছেলেটিকে বুকে লইয়া অন্যঘরে লুকাইয়া রহিল।

যাত্রার সময় মাকে প্রণাম করিয়া পূর্ণেন্দু সরোজিনীর খোঁজে আসিয়া তাহাকে উঠাইল। বলিল, মাত্র "তিন মাসের জন্যে যাচ্ছি। রাগ কোরো না চিঠি দিও। ফিরে এসে কত গল্প বলব দেখো।"

সরোজিনী কিছু বলিল না, শুধু নত হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিল। স্বামী হাত ধরিতে গেলে দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া সে ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইল।

স্বামীর বিদায় লইবার সময় দুঃখে রাগে অনেক কথাই স্বামীকে তাহার বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু কিছুই বলা হয় নাই, তাহাতে অভিমান বাড়িয়াছিল বৈ কমে নাই।

পূর্ণেন্দু ঠিকানা বলিয়া গিয়াছিল। সে রাত্রেই সরোজিনী স্বামীকে একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিল। তাহাতে শুধু এই কথা কয়টী লেখা ছিল—তুমি যেমন বিনা কারণে আমাকে একা ফেলিয়া গেলে, ফিরিয়া আসিয়া আমাকে

আর যেন দেখিতে না পাও। আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, সে জন্য আমাকে ছাড়িয়া যাইতে তোমার এই আনন্দ—তাহা আমি বুঝিয়াছি।

সে চিঠির উত্তরও আসিয়াছে। পূর্ণেন্দু কত অনুনয় করিয়া কত আদর করিয়া পত্র লিখিয়াছে, কতবার করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে।

আজ রাত্রি জাগিয়া সরোজিনী সেই সব কথাই ভাবিতেছিল। আর মনে করিতেছিল, যাবার সময় কেন মরিতে রাগ করিলাম! তাঁহাকেও ব্যথা দিলাম—নিজের ব্যথা তাহাতে বাড়িল বই কমিল না।

কলেজ হইতে উৎফুল্ল হইয়া ফিরিয়া অর্দ্ধেন্দু সরোজিনীর খোঁজে দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইল। সরোজিনী নিবিষ্টচিত্তে কি ভাবিতেছিল। তাহার চক্ষু দুটি ম্লান, মুখ বিষণ্ণ। পূর্ণেন্দুর প্রবাস যাত্রার দুঃখ এখনও সে মন হইতে দূর করিতে পারে নাই।

কিন্তু বিশেষ একটা কথা বলিবায় জন্য অর্দ্ধেন্দু কলেজ হইতে সকালে সকালে ফিরিয়াছিল, তাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে ডাকিল, "বৌদি!"

সরোজিনী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, অর্দ্ধেন্দু। তাহার মুখের উৎফুল্ল ভাবটা তখন মিলাইয়া গিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে একটু বেদনার আভাস। সরোজিনী মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া বলিল, "এস ঠাকুরপো, আজ সকাল করে যে?"

অর্দ্ধেন্দু বলিল, "তোমাকে তাড়াতাড়ি একটা কথা বলতে এসেছিলাম; কিন্তু তুমি যেরকম মুখ করে ছিলে দেখে আর বলতে ভরসা হচ্ছে না। তুমি কিন্তু বড় ছেলে-মানুষ বৌদি!"

সরোজিনী ম্লান হাসিয়া বলিল, "আগে বলতে আমি মেয়েমানুষ তাতেও কথা কইনি, আজ বলছ ছেলেমানুষ তাও চুপ করে শুনে যাচ্ছি। তোমাদের কিছু বলা ত শোভা পায় না।"

অর্দ্ধেন্দু একটু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল—"এ তোমার রাগের কথা বৌদি! তোমার সঙ্গে আমরা কি সে রকম ব্যবহার করি? তুমি যে বিষয়ে যা ব্যবস্থা কর তাইত আমরা মেনে চলি। মা তো তোমারি হাতে সংসার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন!"

সরোজিনী অর্দ্ধেন্দুকে সহোদরের মত ভালবাসিত। অর্দ্ধেন্দুর কথা তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। বলিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, ঘরে এসে বস ত, একটা কথা বলি।"

অর্দ্ধেন্দু ঘরের ভিতর আসিয়া বসিল। সরোজিনী বলিল, "দেখ ত ঠাকুরপো, তুমিই বল, এই দারুণ বর্ষায় ঘরের ভিতর মানুষ অস্থির হয়ে পড়েছে, এ সময় কি কেউ সাধে সুখ বাইরে যায়? কোন্ প্রোফেসার এ সব শিখতে গিয়েছেন বল ত?"

অর্দ্ধেন্দু বলিল, "হয়ত খুব বেশী প্রোফেসার এ কষ্টকর কাযে যাননি। কিন্তু তাই ব'লে এটা যে তাঁদের অযোগ্য কায তা তো নয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—তাঁকে তো জান, তিনি তো আজীবন এই কায করে আসচেন্। ভাব দেখি বৌদি, সমস্ত কলেজের মধ্যে—হয়ত সমস্ত পাটনার মধ্যে—একা তিনি এই সেবার কায শিখে আস্চেন, আর এসে সবাইকে এই সেবাব্রত শেখাবেন। আর এই সেবাব্রত যে কত বড় কায তা আর তোমাকে বোঝাতে হবে না। নিশ্চিন্ত আরাম, আর তোমাদের সেবা কার না ভাল লাগে বৌদি? সেই সব ছেড়ে যিনি পরের জন্যে দুটো দিনও ব্যয় করতে পারেন, তিনিই কতকটা মানুষের কায করেন। তার জন্যে তোমার দুঃখ করা উচিত হয় না।"

সরোজিনী একটু ভাবিয়া বলিল, "ঠাকুরপো তোমার কথাই ঠিক। আমরা স্বার্থপর মানুষ, নিজের ক্ষতিটা সইতে পারিনে, তাই এমন ভাবি। আর নিজেদের বাড়ীর বাইরেটা তো দেখতে পাইনে, তাই এই বাড়ীটার সুখ দুঃখই পৃথিবীর সব মনে করি।"

অর্দ্ধেন্দু এবার আসল কথা পাড়িল, যাহার জন্য তাহার মনটা হাঁফাইয়া উঠিতেছিল। বলিল, "আর একটা কথা শুনেছ বৌদি? দাদা সেখানে এই ১৫ দিনের মধ্যে একেবারে বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা যেখানে তাঁবু ফেলেছেন সেখান থেকে খানিকটা দূরে এক উকিলের বাড়ী হঠাৎ আগুন লেগে যায়। এরা সবাই সেখানে গিয়ে পৌঁছন। সিঁড়িতে তখন আগুন, উপরে ওঠবার উপায় নেই—আর উপরের ঘরে উকিলবাবুর স্ত্রী ও একটী ছোট ছেলে। দাদা সেখানে অদ্ভুত সাহস দেখিয়ে

বাঁশ আর দড়ি বেয়ে উপরে উঠে যান্ ও দুজনকে নিরাপদে নিয়ে আসেন। সমস্ত বিবরণ এই অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছে, পড়ে দেখ।"

স্বামিগৌরবে সরোজিনীর হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; উদ্বিগ্নহৃদয়ে পত্রিকা লইয়া সেই স্থানটি সে পড়িতে লাগিল।

সেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, মায়ের আর্ত্ত চিৎকার, পিতার উন্মত্ত আক্ষেপ, প্রতিবেশীর ব্যর্থ আস্ফালনের ভিতর তাহার নির্ভীক স্বামী কেমন করিয়া জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন, কি অদ্ভুত উপায়ে মাতা ও শিশুর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, কি প্রশংসা ও বিস্ময়ের সহিত সকলে তাঁহার পানে চাহিয়াছিল, সে সব পড়িতে পড়িতে সরোজিনীর চক্ষু বারবার সজল হইতে লাগিল।

৪

আজ সন্ধ্যায় পূর্ণেন্দুর ফিরিবার কথা। অপরাহ্ন হইতে পূর্ণেন্দুর মা কতবার ঘর ও বাহির করিয়াছেন। সরোজিনী দুরুদুরু হৃদয়ে উপরের একটি ঘরের জানালার কাছে বসিয়া ছিল। পাছে মা বা কেহ দেখিতে পান্, সে মাঝে মাঝে সরিয়া শয্যার দিকে আসিতেছিল, কেহ কাছাকাছি উপস্থিত নাই দেখিয়া আবার তাড়াতাড়ি জানালার কাছে যাইতেছিল।

অর্দ্ধেন্দু দাদাকে আগাইয়া আনিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছে। পূর্ণেন্দু তিন মাস পরেই আসিবে বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঐ সময় উত্তীর্ণ হইতে না হইতে কাছাকাছি একটী সহরে কলেরা হওয়ায় জন কয়েক সেবক ঐ স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে পূরা এক মাস অবিশ্রান্ত চেষ্টার ও সুব্যবস্থার পর সে স্থান হইতে কলেরা দূরীভূত হয়, কিন্তু সে নিজে ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহার সঙ্গের লোকেরা তাহাকে স্থানীয় হাঁসপাতালে লইয়া যায়। সেখানকার চিকিৎসক তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রাণপণে সেবা ও চিকিৎসার দ্বারা তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজ চারি মাস পরে পূর্ণেন্দু বাড়ী আসিতেছে।

পূর্ণেন্দু অসুখের কোন সংবাদই বাড়ীতে দেয় নাই।

"মা!"—নীচে হইতে পূর্ণেন্দুর গলা শোনা গেল।

মা দ্রুতপদে সিঁড়ির কাছে আসিতেই পুত্র উপরে উঠিয়া আসিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই মা বলিলেন, "এত রোগা হয়ে গেছিস কেন বাবা?"

"দিনকতক অসুখ হয়েছিল মা।"

"কি ব'লে খবর দিসনি বাবা?"

"ভেবে কষ্ট পাবে তাই খবর দিইনি মা! আর এমন হঠাৎ অসুখ হয়েছিল যে, সে সময় খবর দেবার উপায়ও ছিল না।"

বলিতে বলিতে পূর্ণেন্দু মায়ের সঙ্গে মায়ের কক্ষে প্রবেশ করিল। পশ্চাতে অর্দ্ধেন্দু আসিল। পূর্ণেন্দু বসিতে না বসিতে তাহার কন্যা ছুটিয়া আসিয়া বাপের একখানি হাত টানিয়া লইয়া বলিল, "তুমি এত দেরী করে এলে কেন বাবা?"

ঘরের অপর প্রান্তে অন্য ঘর দিয়া অর্দ্ধগুণ্ঠিতা সরোজিনী খোকাকে কোলে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

জুতা ও কোট খুলিয়া পূর্ণেন্দু মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়াছিল। গায়ে হাতকাটা খদ্দরের একটা কামিজ ছিল। হাতের অনাবৃত বাহুমূলে কয়েকটি দাগ দেখিয়া মা সে স্থানটিতে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কিসের দাগ বাবা?"

পূর্ণেন্দু একটু বিপদে পড়িয়া বলিল, "ও ইন্‌জেক্‌শনের দাগ মা।"

অর্দ্ধেন্দু তাহা দেখিয়া বলিল, "দাদা এ বুঝি intervenous injectionএর দাগ! তোমার তাহলে কলেরা হয়েছিল দাদা! আর আমাদের একটা খবরও দাওনি?"

সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। মা বলিলেন; "অ্যাঁ বেলিস্ কি অর্দ্ধেন? পূর্ণেন সত্যি করে বল বাবা কি অসুখ হইছিল তোর?"

পূর্ণেন্দু অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বলিল, "হ্যাঁ মা কলেরাই হইয়াছিল।"

মার চক্ষু দিয়া টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। তীক্ষ্ণ সূচ ফুটিয়া যে স্থান খানিকটা কালো হইয়া গিয়াছিল, পুত্রের বাহুর সেই স্থানে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, মা "বাছারে আমার, মরে যাই! সেখানে তোর এমন অসুখ হয়েছিল? আর তোকে কোথাও এমন করে যেতে দেব না।"

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া সরোজিনী অশ্রু মুছিয়া শেষ

করিতে পারিতেছিল না। পূর্ণেন্দু তখন মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া বাংলার নগর ও গ্রাম সমূহে কি ধ্বংসের লীলা দেখিয়া আসিয়াছিল তাহাই বলিতে লাগিল। ঘরে ঘরে পুরুষ নারী শিশু কি করিয়া মরিয়া পড়িয়াছিল— ঔষধ দিবার লোক নাই, পানীয় জল নাই, পথ্য নাই. কত বাড়ীতে রোগী ফেলিয়া লোক ভয়ে পলাইয়াছে— রোগী শূন্যবাড়ীতে একা পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছে। পূর্ণেন্দু মায়ের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "সেই সময়ে সেই সব লোককে দেখা, তাদের সুস্থ ক'রে তোলা কি ভাল নয় মা? ভগবানের দয়ায় কত মরণাপন্ন ছেলেকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করেছি, মাকে বাঁচিয়ে ছেলের মুখে হাসি দেখেছি। এমন কাযে মা তুমি আমাকে যেতে দেবে না?"

মা সজল নেত্রে পুত্রের মাথায় হাত দিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মুখে কথা সরিল না।

আহারাদির পর পূর্ণেন্দু আপনার শয়নগৃহে আসিবা-মাত্র সরোজিনী তাহার চরণে প্রণাম করিয়া তাহার পানে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া বলিল, "আমি তোমার উপর আর রাগ করব না; কিন্তু আমাকেও তোমার পাশে দাঁড়াতে দাও, তোমার সঙ্গে আমাকেও কায করতে শেখাও।"

পূর্ণেন্দু সাদরে সরোজিনীকে উঠাইয়া বলিল, "এবার হতে আমরা দুজনেই আর্ত্তের সেবায় ব্রতী হব।"

দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া ধীরে ধীরে ছাদের উপর গিয়া মুক্ত নীলাকাশের নীচে দাঁড়াইল। পরিপূর্ণ শুভ্র শান্ত জ্যোৎস্নায় তখন আকাশ বাতাস অট্টালিকা-শ্রেণী দূর প্রান্তর সব ভরিয়া গিয়া যেন স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার হইয়া গিয়াছে।

দুজনেরই একসঙ্গে। মনে হইল এতদিনে তাহাদের সত্যকার মিলন হইল। নক্ষত্র-খচিত জ্যোৎস্না-হসিত আকাশের পানে চাহিয়া তাহাদের মনে হইল, ভগবানের আশীর্ব্বাদ যেন শতধারে তাহাদের শিরে ঝরিয়া পড়িতেছে।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

অনুকল্প

যাহারে বাসিব ভালো
ধ্যানময় রূপ তার,
চিত্তে নিবেশ করি
মুছি আঁকি বারবার,
গড়ি তার কল্পিত
চিন্ময়ী প্রতিমায়
প্রেম সঞ্চার করি
নিজ রস পিয়াসায়।
তারি স্থূল রূপ খুঁজি
ঘুরী নারী মণ্ডলে,
অর্দ্ধ জীবন তাতে
কেটে যায় কুতুহলে।
কোথাও মিলে না তারে
দুনিয়াটা খুঁজে খুঁজে,
ক্লান্ত অবশ শেষে
মরীচিকা ভুল বুঝে,
এক জনে বুকে টানি,
নাহি করি বাছাবাছি,
তারে ভাবি কল্পিত
প্রতিমার কাছাকাছি।
কায়া নাহি পেয়ে ছায়া
সেবিবার চেষ্টায়,
অর্দ্ধ জীবন বাকী
মায়া মোহে কেটে যায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

চির-যৌবন

আর কেহ নাই প্রিয়া, আজি শুধু তুমি আর আমি,—
অখণ্ড এ অবসর, বাধাহীন নিভৃত মিলন ;
এসো কাছে—আরো কাছে, চাহ তুলি' প্রশান্ত নয়ন,
তোমার চোখের আলো ভ'রে দিক্ দীর্ঘ দিনযামী।

অন্তহীন বিভাবরী, দিনমান সীমারেখাহীন,—
নিস্তরঙ্গ স্রোত চলে অবিরাম আলোকে ছায়ায়,
আমরা জাগিয়া তীরে—শুধু আজি তোমায় আমায়,
দু'টি হাতে হাত রাখি', দু'টি আঁখি আঁখিতে নিলীন।

– কোনো কথা কহিব না, কোনো কথা সুধায়ো না আর।
অনেক হয়েছে কথা, কহিবার আর কিছু নাই,
বুঝিতে কি আছে বাকী ? কোন্ কথা কথায় জানাই ?
জানিতে কি আছে বল পড়া-শেষ পুঁথির পাতার ?

এ চোখের বাতায়নে কি হেরিছ জানো তুমি প্রিয়া,
আমিও চোখের আড়ে কি আছে তা' জানি—সব জানি !
যে মৃদু হাসির রেখা স্ফুরিছে ও ওষ্ঠাধরখানি
আমার নয়নে বুঝি তারি আভা ওঠে আভাসিয়া !

এ ভাষা বুঝিবে কেবা ? পথে যারা ভিড় ক'রে যায়,
কথায় গাঁথিয়া কথা বোঝাতে বা বুঝিতে না পারে,
আমরা দাঁড়ায়ে শুনি নীরবে এ পথের কিনারে –
সব কথা রূপ ধরে পলকের আঁখির আভায় !

ফিরিয়া চাহেনা কেহ, পুরাতন—মোরা পুরাতন,
বাসি ফুল—ঝরা পাতা, কোনো কাযে লাগিব না আর,
ফেলে যায়, দ'লে যায় পথপ্রান্তে ধূলার মাঝার,
সবার পেছনে শুধু মুখোমুখী আমরা দু'জন।

—তুমি আর আমি শুধু, আজি আর কেহ নাই প্রিয়',
ভুল-বোঝা, ভুল-খোঁজা, হাসি অশ্রু – সব গেছে থেমে।
শ্রান্ত সারা দেহমন, আঁখিপাতে তন্দ্রা আসে নেমে,
বক্ষপুটে বেঁধে লও সুকোমল বাহু দু'টি দিয়া।

চেয়ে থাকি নির্নিমেষ নিশান্তের শুকতারা প্রায়,—
তোমারে ঘিরিয়া জাগে প্রভাতের সোণার স্বপন,
মূর্চ্ছিত বসন্ত, আর তন্দ্রাহত প্রথম যৌবন
আনন্দে উছলি' ওঠে অঙ্গে অঙ্গে রেখায় রেখায় !

প্রথম চুম্বন-লেখা আকুঞ্চিত বিশীর্ণ অধরে,
পীবর-লাবণ্য-স্মৃতি সুধা-নত ক্ষীণ বক্ষ জুড়ি',
আঁখির প্রশান্ত নীলে ভুলে-আসা সরম-মাধুরী,
কিশোরীর লজ্জা-রাগ আভাহীন ম্লান গণ্ডোপরে !

মোদের যৌবন, প্রিয়া, জরারে যে করিল বিজয়,
এ কথা কহিব মোরা চুপি চুপি দু'জনার কাণে,
ফাল্গুনের ফুলবন দু'দিনের যে বসন্ত আনে
মোদের বসন্ত সে তো —জানি মোরা—সে নয়, সে নয় !

এসেছি বন্ধুর পথে শোণিতাক্ত বিক্ষত চরণ,
যে কাঁটা বিঁধেছে পায়, জানি বুকে বেজেছে তোমার,—
লাঞ্ছনার পঙ্ক ভেদি' আবরিয়া অশ্রুর বিথার
ব্যথার মৃণাল-বৃন্তে শতদলে ফুটেছে যৌবন।

জাগিব একান্তে আজি অন্তহীন বসন্ত-লীলায়
দীর্ঘ দিবা-বিভাবরী দু'টি চির-তরুণী-তরুণ,
পুলক-বেপথুমতী অনুরাগ-সরম-অরুণ
চিরন্তনী নববধূ রবে প্রিয় বক্ষের কুলায়।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

স্মৃতি-বিভ্রম

(গল্প)

"মা!"

"কেন বাবা?"

বেলা বারোটা। খেতে খেতে জমীদার কালীকান্ত বসুর একমাত্র বংশধর সুনীতিকুমার মাকে ব'ল্‌লে, "মা একটা কথা রাখবে?"

মা প্রশ্ন ক'রলেন, "কি কথা বাবা?"

"বাবাকে বোলো, এখন আমি বিয়ে করবো না, আমি বিলেত থেকে ঘুরে এলে তার ব্যবস্থা।"

"উনি যে তোমার বিলেত যাওয়াতেই আপত্তি করছেন বাবা! ব'লছেন, 'সুনুকে বোলো, ওকে বিলেত পাঠাতে আমার ইচ্ছে নেই, কেননা বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে এলে ওর কি হবে, ওর তো পয়সার অভাব নেই। তা'ছাড়া ও এখন থেকে জমীদারী দেখে শুনে বুঝে নিক্, আমার আর ক'দিন? জমীদারী রক্ষে করা বড় কঠিন কায।"

"হলেই বা মা, আমি তো চিরদিন সেখানে থাক্‌বো না. দু'বছরের মধ্যেই চলে আস্‌বো। বাবাকে বোলো, এটা আমার অনেক দিনের সাধ।"

"জান তো বাবা উনি কিরকম একরোখা মানুষ! যা 'না' বলবেন তা আর 'হাঁ' হবেনা।"

"তবু মা, তুমি একবার ব'লে দেখো, আমিও বলবো এখন, আর শোভাকে দিয়েও বলাবো।"

"আচ্ছা আজ উনি খেতে বস্‌লে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাবে।"

"তাই দেখো মা।" ব'লে সুনীতি খেয়ে উঠে পড়লো।

সুনীতি সব পরীক্ষাতেই বৃত্তি পেয়ে খুব সম্মানের সঙ্গেই, ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, এম-এ পাশ করেছিল। তার বাপ মার দুটিমাত্র সন্তান—সে আর তার ছোট বোন শোভা। শোভার আজ দু'বছর হলো বিয়ে হয়েছে, কল্যাণপুরের জমীদার বাড়ীতে। জামাইটী এম-এ পাশ ক'রে নিজেদের জমীদারী দেখা শোনা করছে।

স্বামী আহারে বস্‌লে ছেলের অনুরোধে গৃহিনী করুণাময়ী সব কথা তাঁকে খুলে জানালেন। শুনে কালীকান্ত বসু বললেন, "আমি এক কথার মানুষ, আমি যখন বলেছি যে বিলেত পাঠাবনা, তখন সে কথার নড়চড় হবে না। বিয়ে তার করতে ইচ্ছে না হয় সে যদি নিজের মতেই কায করতে চায় করুক?"

করুণাময়ী নীরব হয়ে রইলেন, অধিক কিছু বল্‌বার তাঁর সাহস হলো না।

সেই দিনই বিকেলে কালীকান্ত বাবু ছেলেকে কাছে ডেকে ব'ললেন, "তোমায় যখন আমি বলেইছি যে তোমায় বিলেত পাঠানয় আমার মত নেই, তখন বার বার ওকথা না তোলাই ভাল, আর যদি নিতান্তই তুমি তোমার জেদ বজায় রাখতে চাও, তবে তোমার সঙ্গে আমার সকল সম্পর্কের শেষ হওয়াই ভাল। বুঝে সুজে কায কোরো এই আমার আদেশ।"

সুনীতি নতশিরে ব'ললে, "কোনো দিন তো আপনার অমতে কোনো কায করিনি বাবা, তাই আপনার অনুমতি চাইছিলাম।"

"শুধু অনুমতিই তো এর শেষ নয়, কিছু অর্থেরও যে এতে যথেষ্ট অপব্যয় আছে।"

কালীকান্ত বাবু ভয়ানক কৃপণ ছিলেন।

সুনীতি ব'ল্‌লে, "এ কি অপব্যয় হ'লো বাবা? ফিরে এসে আমি অনেক উপার্জ্জন ক'রতে পারবো।"

"আমি কি আর তা দেখে যেতে পারবো? তার চেয়ে ওদিকে টাকা খরচ না ক'রে, যাতে জমীদারীর আয় বাড়াতে পার তারি চেষ্টা দেখ, না দেখ্‌তে চাও, নিজে নিজের পথ দেখ।"

অভিমানী সুনীতি ক্ষুব্ধস্বরে ব'ললে, "বার বার

ওকথা কেন বলছেন বাবা? যদি আমার চেয়ে আপনার টাকাই বড় হয়, তবে তাই হোক, আমি নিজের পথ নিজেই দেখবো।"

"এখন তুমি লায়েক হ'য়েছ, বুড়ো বাপ্‌কে আর মানবে কেন বাপু? বেস তোমার পথ তুমিই দেখো। আমি তোমার মত সন্তানের মুখ দেখ্‌তে চাইনে।"

"অভাগা সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।"—ব'লে সুনীতি পিতৃচরণে প্রণত হয়ে চলে গেল।

মার কাছে গিয়ে সব জানিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় ছুঁইয়ে তাঁর কাছেও বিদায় নিয়ে এল। সে তার পাসের সার্টিফিকেটগুলি ও কিছু টাকা নিয়ে কল্‌কাতায় পৌঁছে একটা মেসে বাসা নিলে। পরে বিকেলের বায়ুসেবনের জন্যে ইডেন গার্ডেনে গেল। সেখানে গঙ্গার ধারে খানিক ব'সে সন্ধ্যার পর সে গড়ের মাঠের সামনের রাস্তায় বেড়াতে লাগ্‌লো। মনের অশান্তিতে সে একটু অনমনস্ক ছিল। হঠাৎ একখানা বাড়ীর মোটর গাড়ী এসে তাকে চাপা দেবার যোগাড় করেছিল আর কি! সে সাম্‌লাতে গিয়ে গাড়ীর একটা ধাক্কা খেয়ে দূরে ঠিক্‌রে প'ড়লো। চাপা না পড়লেও তার মাথায় বিষম চোট্ লেগে রক্তপাত হতে লাগ্‌লো, তার ফলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

গাড়ীর আরোহী ছিলেন বালিগঞ্জ নিবাসী অবসর-প্রাপ্ত সেসন জজ রায় বাহাদুর ঘোষ সাহেব। তিনি মোটর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে সুনীতির কাছে এলেন। তার সবল সুস্থ সুন্দর চেহারা দেখে প্রশংসায় ও তার অবস্থা দেখে করুণায় তাঁর মন আর্দ্র হয়ে উঠলো। তিনি তখনি তাকে সযত্নে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে তাঁর প্রাসাদ তুল্য বাড়ীতে এলেন, ও একজন ভাল ডাক্তারকে ফোন্ করে আনালেন।

ডাক্তার এসে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবার কিছু পরেই সুনীতির জ্ঞান হল। ঘোষ সাহেব তার পরিচয় জানলেন এবং শুনলেন যে বাবার ওপর অভিমান ক'রে বেরিয়ে এসে তার এই বিপদ ঘটেছে।

কোন্ জায়গায় তার বাড়ী তা শোনা হলনা, কারণ সে ক্লান্তিবশতঃ ঘুমিয়ে পড়লো। তার পরদিন থেকে সুনীতির খুব জ্বর হল, সে প্রলাপ বক্‌তে লাগলো! ডাক্তারদের পরামর্শে তার মাথায় অস্ত্রোপচার করা হল, ঘোষ সাহেব সুনীতির বাবার ঠিকানা না জানায় কোন খবরই তাঁকে দিতে পারলেন না।

অস্ত্রোপচার করার দু'দিন পরে সুনীতির জ্ঞান হল এবং তারপর থেকে সে ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগ্‌লো বটে, কিন্তু তার স্মৃতিবিভ্রম হলো। নিজের কোন পরিচয়ই তার মনে রইলনা। ঘোষ সাহেব, তাঁর স্ত্রী ও তাঁদের একমাত্র কন্যা উমারাণীর অক্লান্ত যত্নে দিনে দিনে সুনীতি শরীরে বেশ বল পেতে লাগ্‌লো।

যখন সুনীতির পকেটে রাখা পাশের সার্টিফিকেট গুলি প'ড়ে ঘোষ সাহেব খুব খুসী হলেন, ও তার রূপে গুণে আকৃষ্ট হয়ে উমারাণীর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার কল্পনাও করলেন। তখন ঘোষ গিন্নি শুনে প্রথমে এই একটু আপত্তি তুলেছিলেন যে, তাঁর একটি মেয়ের বিয়েতে বরের কুটুম্বদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ হবে না। ঘোষ সাহেব তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌লেন, "কিন্তু মেয়েকে যে পরের বাড়ী পাঠাতে হবেনা। তা ছাড়া ও যখন বিলেত যাবার সংকল্পে বাধা পেয়েই বাড়ী ছেড়ে এসেছিল, তখন ওকে বিলেত পাঠিয়ে দেবো, ব্যারিষ্টার হয়ে আসবে। আর আমার যা কিছু সবই তো ওদেরই।"

সব শুনে আর সুনীতির সুন্দর চেহারায় ও বিনয়-নম্র ব্যবহারে ঘোষ গিন্নিও শেষে সানন্দে বিয়েতে মত দিলেন। শুভদিনে উমার ও সুনীতির বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের এক বছর পরেই সুনীতি বিলেত চলে গেল। সেখান থেকে সম্মানের সঙ্গে ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসে সে হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস করতে লাগ্‌লো। অল্পদিনেই তার পশারও বেশ জমে গেল। এমনি করে ৫।৬ বছর কেটে গেল।

ডাক্তারেরা সুনীতিকে রোজ খোলা হাওয়ায় বেড়াতে বলায়, সে প্রতি সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেত।

একদিন সে উমা আর তাদের ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে বেড়াতে এল। উমা আর ছেলেটিকে একটা বেঞ্চে বসিয়ে, একজন চাকরকে সেখানে দাঁড় করিয়ে

রেখে, সুনীতি চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ একব্যক্তি তার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো —"একি? খোকা বাবু যে!"

সুনীতি বিস্মিত হল। ঠিক সেই সময়ে একজন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ব'ললেন "কৈ শ্যামাচরণ, আমার সুনু—সুনীতি কৈ?"

প্রথম ব্যক্তি বৃদ্ধ কালীকান্ত বসুর ম্যানেজার শ্যামাচরণ বাবু। বল্‌লে, "এই যে কর্ত্তা বাবু এই সামনে।"

বৃদ্ধ কালীকান্ত বাবু এগিয়ে গিয়ে ফিরে সুনীতিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন, "সত্যিই তো এই আমার সুনীতি—আমার হারানিধি। এতদিন বাপের ওপর অভিমান ক'রে কোথায় ছিলে বাবা?"

সুনীতি চঞ্চল ভাবে নিজের মাথায় হাত বুলুতে লাগলো। কালীকান্ত বাবু পরিচয় দিতেও সে কিছু ঠিক্ মনে করতে পারলে না।

নিজের অপঘাতের কথা না জানিয়ে সে বললে, "আপনাদের পরিচিত মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় দেখেছি আন্দাজ করতে পারছি না।" তখন কালীকান্ত বাবু সজল চোখে ব'ললেন, "বাবা, আমার জন্যেই তোমার এই দশা ঘটেছে। যাই হোক বাড়ী চল, তোমার মা তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হতে বসেছেন, আমিও কোন রকমে প্রাণে বেঁচে আছি, চিকিৎসকের উপদেশে কল্‌কাতায় বাস করছি, আর রোজ এখানে বেড়াতে আসি। আজ এসে তোমায় আবার এতদিনের পর ফিরে পেলুম।"

তার পর কালীকান্ত বাবু উমারাণীর পরিচয় পেয়ে পুত্রবধূ ও পৌত্রকে নিয়ে, নিজের মোটরে করে নূতন কেনা বাড়ীতে নিয়ে এলেন। গৃহিণী করুণাময়ী এসে পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শোভা এসে উমারাণী ও খোকাকে ঘরে নিয়ে গেল, আর শুভ শঙ্খধ্বনি ক'রলে।

সারা বাড়ী আনন্দে মুখর হয়ে উঠলো। সুনীতির চাকরটিকে বালিগঞ্জে ঘোষ সাহেবকে খবর দিতে পাঠানো হল। তিনি খবর পেয়েই সস্ত্রীক এসে হাজির হলেন।

সকলেই এ মিলনে খুসি হলেন, শুধু সুনীতি পুরোমাত্রায় খুসী হতে পারছিল না। কিছুই যে তার মনে পড়ে না! সে কেবলি ভাব্‌ছিল। সেদিন তার শুতে অনেক রাত হয়েছিল, মাথার যন্ত্রণায় সে অস্থির হতে লাগলো, রাতে খুব জ্বরও তার হলো। পরদিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এসে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যই পীড়ার কারণ ঠিক ক'রে অস্ত্রোপচার আবশ্যক ব'লে গেলেন। দিন দুইয়ের মধ্যেই সুনীতির মাথার উপর আবার অস্ত্রোপচার হল। কিছু কাল সে আচ্ছন্ন ভাবে রইল। বেশ জ্ঞান হতেই সুনীতি চারিদিকে চাইলে, আর তার মাকে পাশে বসে থাক্‌তে দেখে বল্‌লে, "একি! মা, তুমি এখানে বসে আছ? উঃ কত যেন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলুম। মনে হচ্ছে কতদিন পরে তোমায় আবার দেখলুম। কত যেন তোমরা বদলে গেছ। আমার বুঝি খুব অসুখ করেছিল, না? তোমাকে বাবাকে আর শোভাকে দেখে প্রাণ যেন বাঁচলো।"

কালীকান্ত বাবু বুঝলেন, অস্ত্রোপচারের ফলে সুনীতির স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছে। তিনি আনন্দিত হয়ে, তাকে বেশী কথা বল্‌তে বারণ ক'রে, ডাক্তারকে খবর দিতে গেলেন।

কিছুদিন পরে সুনীতি যখন শরীরে একটু জোর পেয়েছে, আর শোভা বেদানা ছাড়িয়ে তাকে খাইয়ে দিচ্ছে, এমন সময় উমারাণী তার খোকাটিকে কোলে ক'রে ঘরে ঢুক্‌লো। সুনীতি তাদের দেখে বললে, "শোভা, ইনি তো দেখছি নার্স, ক'দিন আমার খুব সেবা করছেন। কিন্তু এ ছেলেটি কে রে?"

শোভা সবিস্ময়ে বললে, "কি যে বল দাদা! এ নার্স কেন হতে যাবে? এ তো তোমার বৌ।—আমার বৌদিদি উমারাণী। আর এটি তোমার ছেলে, খোকন বাবু।"

সুনীতি হেসে বল্‌লে, "ছি শোভা, তোর দুষ্টুবুদ্ধি এখনো গেল না? ইনি কি মনে ক'রবেন বল দেখি! আমার বিয়েই হলো না এখনও, আর তুই ব'লছিস, আমার বৌ! পাগলী কোথাকার! বাবা আমায় বিলেত পাঠাতে চাননা, তাই নানা রকম করে আমায় ভুলিয়ে রাখ্‌তে চান, আমি যেন এখনও সেই খোকাটি আছি!"

শোভা অবাক হয়ে উমার দিকে চাইলে। সে অশ্রু-ভরা চোখে ব'সে প'ড়ে শোভার হাত ধরে বললে, "একি হল ঠাকুঝি? ওঁর আবার স্মৃতিবিভ্রম হল? আগের সব মনে করতে পারছেন, শেষের দিকের সব ভুলে গেলেন দেখছি। কি হবে ভাই?"

শোভা বললে, "ভয় কি বৌদিদি, ও টুকুও সেরে যাবে।" উমা দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো।

শোভা তার চোখের জল আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে বললে, "চুপ করো বৌদিদি, দাদা রোগা মানুষ, হিতে বিপরীত হবে।"

সুনীতি প্রশ্ন করলে, "হ্যাঁরে শোভা, উনি কাঁদছেন কেন?"

শোভা বললে, "দাদা, তুমি বৌদিদিকে চিনতে পারছো না ব'লে।"

"সত্যি শোভা, আমার স্ত্রী উমারাণী? চিনি চিনি মনে হয়। অনেক দিন থেকে জানি ব'লে মনে হয়, কিন্তু স্ত্রী বলে মনে ক'রতে পারছি না। তাই তো কি হল বল্ তো!"—ব'লে সুনীতি কেবলি নিজের মাথায় হাত বুলুতে লাগলো।

তখনি কালীকান্ত বাবুকে সব কথা জানানো হলো। তিনি ও ঘোষ সাহেব ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারের বাড়ীর খবর দিতে ছুটলেন। উমা, ঠাকুর ঘরে পড়ে কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডাকতে লাগলো। ডাক্তার এসে সব শুনে বললেন, "ইনি বিবাহিত জীবনের ৬।৭ বছরের কথা সব ভুলে গেছেন। যাই হ'ক আবার এঁর মাথায় অপারেশন ক'রতে হবে।"

তৃতীয় বার সুনীতির মাথায় অস্ত্রোপচার হল। দিন চার অসুস্থতার ঘোরেই তার কাটলো। পাঁচ দিন পরে ঘুম ভেঙ্গে উঠে চারিদিকে চেয়ে সুনীতি বললে, "সকলকে দেখছি, খোকা কৈ আমার? খোকন!"

শোভা এগিয়ে এসে বললে, "ওঘরে আছে, আনছি।" ব'লেই সে দ্রুতপদে গিয়ে উমাকে বললে, "বৌদিদি, খোকাকে কোলে করে দাদার ঘরে যাও।"

উমা খোকাকে নিয়ে সুনীতির ঘরে ঢুকলো। খোকা বাবা, বাবা, বলে হেসে উঠ্‌লো।

সুনীতি হেসে বললে, "এই যে খোকা!" উমার দিকে চেয়ে বললে, "কেমন আছ উমা? মনে হচ্চে যেন কতকাল তোমাদের দেখিনি।"

উমা সজল চোখে বললে. "এতদিনে আমাকে মনে পড়েছে তোমার?"

"কবে বা ভুলে ছিলুম উমা?"

"সেদিন যে চিনতেই পারনি, বিয়ে অস্বীকার করে-ছিলে!"

সুনীতি কৌতুকের স্বরে বললে, "বিষম ভুল বটে - ছেলে বৌ সব অস্বীকার! কিন্তু সেটা সুখের ভুল নয়, অসুখের ভুল, সুতরাং ক্ষমার্হ।" তারপর খোকাকে ডেকে কাছে নিয়ে বললে, "আয় তো খোকা, বাবাকে একটা চুমু দে।" খোকা ঝুঁকে পড়ে বাবাকে চুমু দিয়ে হেসে উঠ্‌লো।

উমা বললে, "তুমি ক'দিন ওকে ডাকনি, আদর করনি, ওর সে দুঃখ যদি দেখ্‌তে!"

"যাক্, ওর মার তো দুঃখু হয়নি মোটেই?"

উমা সে কথার কি জবাব দিয়েছিল, আর কেমন করে দিয়েছিল, তা অপ্রকাশিত রইলো।

শ্রীতমাললতা বসু।

মুক্তি গান

পথে চলার পথিক আমি,
পথের মায়ায় ভোর!
সকল বাঁধন কাটিয়ে এলাম,
—সকল বাঁধন মোর!
আজকে আমি মুক্ত-পাখী
নীল আকাশে মেলে আঁখি
মুক্ত পাখায় চল্‌ছি যেথায়
মুক্তি-উষা ভোর।

আজ তবু ঐ ডাক্‌ছে পিছু
নীল আকাশের তারা!
চাঁদের চোখে পড়ছে গ'লে
জ্যো'স্না-জলের ধারা!
বাতাস এসে বলছে "দাঁড়াও!"
ফুলেরা কয়, "এই দিকে চাও!"
হায়রে, তারা বৃথাই রচে
মায়ার বাঁধন ডোর!

নিমকহালাল

(গল্প)

তাদের দোষ নেই। যে পথ দিয়ে সব ছেলেরা পাঠশালায় যায় সেটা সোজা হলেও নীরস। তার মধ্যে কোন নূতনত্ব নেই, কবিত্ব নেই, আবিষ্কারের কৌতূহল নেই। তাই তারা চিরাভ্যস্ত নন্দীদের গোলার পাশ দিয়ে না গিয়ে আচার্য্যিদের বাঁশ-ঝাড় ঘেরা পানাপুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়াই পছন্দ করলে।

কিছুদূর গিয়েই শৈলবালার অনুসন্ধিৎসু চোখ একটি পেয়ারা গাছের উপর স্থির হলো, সে থমকে দাঁড়িয়ে ডাকলে—"বেণী দা!" বেণী পুকুরের পাড়ে বই শ্লেট নামিয়ে একটা কাঁকড়ার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করছিল—সহসা শৈলর ডাকে চমকে উঠে উত্তর করলে—"কি রে?" শৈল তার ক্ষুদ্র তর্জ্জনীটিকে ঊর্দ্ধে প্রসারিত করে বল্লে—"দেখ না!" বেণীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সে কেবলমাত্র বল্লে—"তাইত রে!" নব বর্ষার বারিসিঞ্চনপুষ্ট অনেকগুলি পেয়ারা যেন শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করেচে। তাদের প্রলোভনীয় ড াঁসাত্ব যেন নীরব নিমন্ত্রণের অম্লমধুর স্বরে বল্‌চে—"আয় তোরা আয়।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে বেণীর কোঁচা, কাছার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে কাছার গন্তব্য স্থানেই উপস্থিত হলো—এবং সে তত্ত্বান্বেষী বৈজ্ঞানিকদের অগোচরেই প্রমাণ করে ফেল্‌লে যে. ডারউইনের কোন একটী মতবাদ একেবারেই অযৌক্তিক নয়। পেয়ারা গাছের মসৃণ কাণ্ড বেয়ে সে যখন ক্ষিপ্রগতিতে ডাল হতে ডালান্তরে সঞ্চরণ করতে লাগ্‌লো তখন শৈলবালার বিস্ময়োৎফুল্ল চক্ষে সে বীর কার্ত্তিকেয়ের মতই প্রতিভাত হতে লাগ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে শৈলর কোঁচড়, এবং দুজনেরই গাল পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। কাযেই পাঠশালায় উপস্থিত হতে তাদের যে ঘণ্টাখানেক বিলম্ব হয়ে গেল সেটা খুবই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য।

গুরুমশায় তখন তন্দ্রাজড়িত স্বরে বিরনব্বই কড়ায় ক গণ্ডা" "বানান্ কর্ অশ্লীল" "ওরে চণ্ডে তামাক সাজ্" প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রশ্ন ও আদেশ উচ্চারণ করছিলেন—সহসা বেণী ও শৈলবালাকে চোরের মত পিছনের সারে গিয়ে বসে পড়তে দেখে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন—"দাঁড়িয়ে থাক্ এক পায়ে।" পর্য্যাপ্ত আহারের উপর পেয়ারাভারগ্রস্ত বেচারাদের এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা যে কত বড় কঠোর শাস্তি, তা তাঁর ধারণাতেও এল না।

মিনিট দশেক পরে গুরুমশায়ের মুখের শব্দের চেয়ে নাকের শব্দই যখন প্রখর হয়ে উঠ্‌লো—তখন শৈল চুপে চুপে বেণীকে বল্লে "নুণ নিয়ে আসি বেণীদা"—এবং চুপে চুপে বেরিয়ে একেবারে গুরুমশায়ের অন্তঃপুরে গিয়ে হাজির। গুরুপত্নীর কাছে সে এই বলে নুণ ভিক্ষা করলে যে 'গুরুমশায় চাইচেন।'

বাঁ হাতে একমুঠো নুণ নিয়ে সে যখন বেণীর কাছে ফিরে এলো তখন দুজনে তাদের নিঃশব্দ টিফিনের জোগাড় করচে দেখে—আশপাশের দুচারজন সহপাঠীর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। তারা লালায়িত অধরপুট বিস্তার ক'রে করুণ মিনতির স্বরে বল্‌লে—"দে না ভাই একটা!"

শৈল একটা পেয়ারা কোঁচড় থেকে বের করে বল্‌লে—"এইটে সবাই কামড়ে ভাগ ক'রে খা।" যারা পেয়ারার জোগাড় কার্য্যে কিছুমাত্র সাহায্য করেনি; তাদের প্রতি এ দানটা বড় অল্প নয়। কিন্তু তারা তা বুঝলে না। তারা ক্ষুব্ধ স্বরে বল্লে, "ওকি ভাই! এক একটা করে দে। তোর ত অনেক আছে।"

এরকম দাবী করা যে তাদের পক্ষে কতদূর অন্যায় তা অল্প কথায় বুঝিয়ে দেবার জন্যে বেণী চোখ ঘুরিয়ে বল্লে, "মাইরি আর কি! আবদার!"

এই কথার মধ্যে কি তীব্র শ্লেষ ছিল জানিনা, কিন্তু টগ্‌রার আর সহ্য হল না। সে দস্তুর মত শাসিয়ে বল্লে, "না দিস্ তো গুরুমশায়কে ব'লে মজা দেখাবো।"

মজা! এতবড় কুৎসিত ইঙ্গিত! কৃতঘ্ন বিদ্রোহীদের যে

আর একটা পেয়ারাও দেওয়া উচিত নয়, এইটে শৈলকে কাণে কাণে বুঝিয়ে দিয়ে বেণী সগর্ব্বে উত্তর করলে, "মজা না আরো কিছু। যাঃ, কিচ্ছু দেবো না।"

"গুরুমশাই—বেণী—পেয়ারা" ক্রমিক উচ্চস্বরে টগ্‌রা এই কথা তিনটি উচ্চারণ করতেই শৈল ভ্রুভঙ্গী সহকারে টগরার দিকে কট্‌মট্ করে চাইলে। তাতে টগরা কিছু মাত্র বিচলিত না হয়ে ঐ সঙ্গে সংযোগ করলে, "আর—শৈলি!" অবশ্য টগ্‌রার এ উদ্দেশ্য ছিলনা যে সত্যই বেণী ও শৈলকে পেয়ারা চর্ব্বণের অপরাধে গুরুমশায়ের কাছে অভিযুক্ত করে। তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল ভয় প্রদর্শন ক'রে ঘুস স্বরূপ ছু' একটা পেয়ারা আদায় করা। তাই তার স্বরগ্রাম ক্রমিক উচ্চতা সত্ত্বেও গুরুমশায়কে প্রবুদ্ধ করবার মত উচ্চস্তরে ওঠেনি। কিন্তু বেণী ও শৈল যখন নির্ব্বাক দৃঢ়তার সঙ্গে বুঝিয়ে দিলে যে তাদের নৈতিক মেরুদণ্ড বরং দণ্ডের ভার বহন করবে, তবু ঘুসের নয়, তখন টগ্‌রা হঠাৎ চীৎকার করে উঠ্‌লো—"খাচ্চে।"

সুপ্তোত্থিত গুরুমশায়, "এ্যা? কি? কে?" ব'লে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন। তাঁর রক্তিম চোখ ছুটি অকালনিদ্রাভগ্ন কুম্ভকর্ণের চোখের মত ক্লাশের চারদিকে ঘুরতে লাগ্‌লো। টগ্‌রা একটা বড় রকম ঢোক গিলে নিয়ে বলে উঠ্‌লো—"এই—এই—বেণী আর শৈলি।'

গুরুমশায় গর্জ্জন করে উঠ্‌লেন—"কি খাচ্চে?"

"এই-এই—আপনার গাছের পেয়ারা।"

গুরুমশায়ের রান্নাঘরের কানাচে সত্যিই একটা পেয়ারা গাছ ছিল। তার পেয়ারা গুলিকে তিনি কুষী অবস্থাতেই নেকড়া দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন—এ পর্য্যন্ত একবারও খোলেন নি—পাছে বাড় কমে যায়। সেই পেয়ারা চুরি! গুরুমশায়ের মুখশ্রী কালান্তক যমের মত ভীষণ হয়ে উঠ্‌লো। তিনি বেতের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু বেত বা তজ্জাতীয় কোনও পদার্থ নিকটে না থাকায় অগত্যা ছিটেবেড়ার একগাছা কঞ্চি টেনে বের করতে উদ্যত হলেন। সেই ফাঁকে শৈল ও বেণীতে কি একটু কাণাকাণি হলো এবং তারপরই ছু'জনে একসঙ্গে দাওয়ার উপর থেকে মাটিতে লাফিয়ে প'ড়ে দে দৌড়। 'ধর্ ধর্' শব্দে গুরুমশায় চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—এবং সেই শব্দের বৈদ্যুতিক প্রেরণায় সমস্ত পাঠশালাই যেন সচল হয়ে পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করলে।

দৌড়—দৌড় দৌড়। মাঠের ভিতর দিয়ে পোয়াটেক পথ দৌড়ে তারা খালের ধারে গিয়ে উপস্থিত হলো। পিছন ফিরে দেখ্‌লে, তখনো একটা ছেলে, বোধ হয় টগরা—মাটের ধূলো উড়িয়ে ছুট্‌চে। তখন আবার দৌড়ে—খালের ধার দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে তারা যে অত পথ অতিক্রম করলে তা সেই দুপুর রৌদ্রে আর কেউই জান্‌লে না দু একটা গাংশালিখ ছাড়া।

সহসা খালের মুখ বিস্তীর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। ভয়চকিত নেত্রে তারা দেখ্‌লে সাম্‌নেই এক বিশালবক্ষা খরস্রোতা নদী। তখন তারা আর একবার পিছন ফিরে চাইলে। নঃ, কাকেও আর দেখা যাচ্চেনা। স্বেদসিক্ত আরক্ত মুখে তারা কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগ্‌লো। নাতিশীতোষ্ণ তীব্র বাতাস তাদের চুল ও বসন-প্রান্তকে পিছনদিকে ওড়াতে লাগ্‌লো।

কম্পিতকণ্ঠে শৈলবালা ডাক্‌লে, "বেণীদা!"

বেণী উত্তর করলে, "কিরে শৈল?"

"তোমার ভয় করচে বুঝি?"

"দূর! ভয় করবে কেন?"

"তুমি কখনো এতদূর এসেছ?"

"না।"

"এইটে বুঝি সেই বড় নদী?"

"তাই বোধ হয়।"

"চল বাড়ী ফিরে যাই।"

"না না এখন নয়। গুরুমশায় পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছে। সেই রোদ পড়লে তখন ফিরবো।"

"তাহলে চল একটা গাছের ছায়ায় বসে পেয়ারা খাইগে।"

এই উত্তম প্রস্তাব বেণীর সম্পূর্ণ অনুমোদিত হল। সে শৈলবালার হাত ধ'রে নদীর ধার দিয়ে এগোতে লাগ্‌লো। কিন্তু কৈ? গাছ ত চোখে পড়েনা। গরম বালিতে পা পুড়িয়ে যখন তাদের চোখে জল বেরোবার উপক্রম হয়েছে, তখন একটি ছোট্ট হিজল গাছ তাদের আশ্রয়দাতারূপে

দেখা দিলে। গাছটী ছোট হলেও তার ঘন পল্লব একটি সবুজ ছাতির মত শূন্যে বিস্তৃত ছিল এবং তার একটি ডাল ঝুঁকে পড়েছিল প্রায় নদীর উপর। ঐ ডালটীর পিঠে চড়ে ঘোড়ায় চড়ার দুঃসাহসিক সখ মেটাবার একটা অদম্য প্রলোভন বেণীকে পেয়ে বসলো। শৈলরও যে সে প্রলোভন একেবারে হয়নি তা বলতে পারি না, তবে ওর সাহসের মাত্রা কিছু কম থাকায় সে আর একটী ডালে চড়ে বসলো যা বেণীর ডাল ডেকে হাত দুই দূরবর্ত্তী।

"দে পেয়ারা দে।" ব'লে বেণী হাত বাড়ালে। শৈল তার কোঁচড় থেকে সব চেয়ে বড় পেয়ারাটা তুলে বেণীর দিকে এগিয়ে দিলে। কিন্তু দুজনের হাতের ডগার মধ্যে আঙ্গুল চারেক ব্যবধান থেকে গেল। বেণী অতি কষ্টে সেই ব্যবধানটুকু দূর ক'রে পেয়ারার বোঁটার দিকটা ধরেচে মাত্র, এমন সময় একটা আচমকা হাওয়া ডাল দুটোকে এমন দুলিয়ে দিলে যে পেয়ারাটা তাদের দুজনেরই হস্তচ্যুত হয়ে একেবারে গড়াতে গড়াতে নদীর মধ্যে গিয়ে পড়লো এবং এক নিমেষেই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

দোষটা হাওয়ারও বটে, গাছেরও বটে, কিন্তু হাওয়া অদৃশ্য এবং গাছ প্রত্যক্ষ। সুতরাং শৈল ও বেণীর সমস্ত রাগটা পড়লো গাছেরই উপর। বেণী তার জামার পকেট থেকে একটা ভোঁতা ছুরি বের ক'রে গাছের গুঁড়িটা ক্ষত বিক্ষত করে তুললে এবং শেষে বড় বড় অক্ষরে শাস্তিদাতার নামটাও সেখানে খোদাই করে দিলে। শৈল কিন্তু তাতে না সন্তুষ্ট হয়ে গাছের গোড়া খুঁড়ে তার হাতের নুনটুকু সেখানে পুঁতে দিলে। নুনের পরিমাণ বোধ হয় দশবারো গ্রেণের বেশী ছিল না কিন্তু তা হলে কি হয়? নুণ তো! তাদের শোনা ছিল যে গাছের গোড়ায় নুণ পুঁতলেই গাছ মরে। শৈশব-স্বাভাবিক নৃশংসতায় তারা বেশ একটা হিংস্র আনন্দ অনুভব করলে।

পনের বছর কেটে গেছে।

কলকাতার একটী দোতালা বাড়ীতে বসে ভাত খেতে খেতে বেণী ডাকলে—"ওগো শুনচো!"

"কি?" ব'লে শৈল ধীরপদে এসে কাছে দাঁড়ালো। দুধের বাটী দেখিয়ে বেণী বললে, "একটা পিঁপড়ে পড়েচে—তুলে দাও।"

সযত্নে পিঁপড়েটিকে আঙ্গুল দিয়ে তুলে শৈল বললে, "আহা বোধ হয় বাঁচবে না গো! একটু আগেও যদি দেখতে!"

বেণী একগাল হেসে বল্লে—"এত দয়া সেদিন কোথায় ছিল শৈল যখন বিষ দিয়েছিলে?"

শৈল অবাক হয়ে বেণীর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে,"ওমা সে কি কথা?"

বেণী হাসতে হাসতেই বল্লে, "মনে ক'রে দ্যাখ। সে জীবটি আবার উপকারী, আশ্রয়দাতা।"

শৈল ঈষৎ কুপিত হয়ে বললে, "খুলেই বলোনা।"

বেণী গাম্ভীর্য্যের ভাণ করে বললে, "গাছ একটা জীব, আর নুণ তার পক্ষে বিষ।"

এবার শৈলর মুখে হাসি দেখা দিলে। সে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বল্লে—"এহেহে যত দোষ আমার। তুমি আমায় সাহায্য করনি? আইনে বলে না হত্যা করতে যে সাহায্য করে তার অপরাধ হত্যা-কারীর মতই?" বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বেণী অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলে—"আচ্ছা শৈল, তখন তুমি আমায় কি ব'লে ডাকতে?"

লজ্জার স্থানে আঘাত পেয়ে শৈল ভ্রূ কুঁচকে বললে, "যাঃও, মনে নেই।"

দুই চোখে একটা দুষ্ট কৌতুকের হাসি হেসে বেণী বল্লে, "আচ্ছা, একটু ভেবে দ্যাখনা, পড়বে এখন মনে। মনে কর দু'জনে আবার সেই রকম দুই পাশাপাশি ডালে বসে আছি—তুমি আমার দিকে পেয়ারা এগিয়ে দিচ্ছ।"

শৈল উত্তর করলে, "তাও মনে করতে পারচি নে।"

বেণী উৎকণ্ঠার ভাণ করে বল্লে, "কেন কেন? এমন স্মৃতিশক্তির লোপ হচ্ছে কেন?"—শৈল হেসে উত্তর করলে, "যেহেতু তখন বসেছিলুম অন্য ডালে, আর এখন বসেছি তোমারি ডালে।" কথাটা বলেই শৈল রান্নাঘরের দিকে যাবার জন্য পা বাড়ালে।"

"কোথায় যাচ্ছ!" বলে বেণী বাঁহাত দিয়ে তার অঞ্চল প্রান্ত ধরলে।

"তোমার সন্দেশ নিয়ে আসি।"

"তার আগে আমি তোমাকে একটি সন্দেশ দিতে চাই, কেন না রসিকতায় হারিয়ে দিয়ে তুমি বক্‌সিসের অধিকারিণী হয়েছ।"

"তোমার সন্দেশ মানে ত খবর ?"

"ধরেছ ঠিক। কিন্তু এ সন্দেশ বোধ হয় ভীমনাগের সন্দেশের চেয়ে তোমার কম মুখরোচক হবে না।"

"কিগো কি ?" বলে শৈল, স্বামীর পাতের ধারে হাঁটু পেতে বস্‌লো।

"আজ আমাদের পূজোর ছুটী হবে—পূরো একটি মাস।"

"এই কথা ? এ আবার মুখরোচক কি ? এখন থেকে সারাটা দুপুর বেলা আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবে বৈত নয় !"

"না—না, আগে শুনে নাও। আমাদের সেই গুরু মশা'কে মনে আছে ত ? তিনি 'মান্যবরেষু' সম্বোধন ক'রে আমাকে এক চিঠি লিখেচেন।"

"ওমা কি লজ্জার কথা !" ব'লে শৈল চিবুকে আঙ্গুল ঠেকালে।

"লজ্জার কথাই বটে। উনি ভুলে গেছেন যে আমি পাশ ক'রে উকীল হয়েছি বটে, কিন্তু ওঁর অপরিশোধ্য বিদ্যার ঋণ এখনো আমার পেটের বনেদে গজ্‌ গজ্‌ করচে।"

"যাক্—তারপর ?"

"তারপর লিখেচেন যে তাঁর সেই (অর্থাৎ আমাদের সেই) বিদ্যালয়টি জীর্ণ সংস্কারের অভাবে ভূমিসাৎ হয়েচে। তাকে পুনরায় খাড়া ক'রে তোলবার জন্যে কিছু অর্থসাহায্য দরকার।"

"দেবে কিছু ?"

"দেবো না ? মনে নেই কি ক'রে আমরা তাঁর ন্যায্য কঞ্চির মারকে ফাঁকি দিয়েছিলুম ?"

"কত দেবে ?"

"সে কথা পরে বিবেচ্য। কেন না মনে করচি এবার দেশে গিয়ে একটা চাঁদা তোলবার চেষ্টা করবো। আমি চেষ্টা করলে যৎকিঞ্চিৎ উঠ্‌তেও পারে। তারপর এষ্টিমেট থেকে যা কম পড়বে আমিই দেবো।"

"বাঃ বাঃ আমি বুঝি আর কিছু দেবো না ? এষ্টিমেটের উপর যা বেশী পড়বে তার অর্দ্ধেক আমার।"

"এ নৈলে আর পেয়ারা পেড়ে তোমারই কোঁচড়ে দিই ?"

"ফের বাজে কথা ! কবে যাচ্ছ ?"

"কবে বল যেতে ?"

"কালই।"

"বেশ, জিনিষপত্তর গোছাও গে।'

জ্যোৎস্না রাত্রি। পা'লের ভরে নৌকো তরতর করে ছুটেচে। বেণী পাটাতনের উপর মাস্তল ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর তার পায়ের কাছে বসে আছে শৈল। তারা বুঝতে পেরেছে গ্রামে পৌঁছবার আর বেশী দেরী নেই। বেণী মাল্লাদের প্রশ্ন করলে, "হ্যাঁরে বাঁদিকের সে খালটা আর কত দূর ?'

মাল্লারা সবই বিদেশী, এদিকে কখনো ক্ষেপ দেয়নি। কাযেই তারা মাথা চুলকে বল্‌লে, "আজ্ঞে বলতে পারছিনে কর্ত্তা। আপনি একটু নজর রাখবেন।"

নজর রাখতে বলা বেণীকে বাহুল্য। সে উত্তর করলে, "সেই খালের মধ্যেই আমাদের ঢুকতে হবে, বুঝেছিস তো ?" এবং তারপরই গুন্ গুন্ স্বরে গান ধরলে—"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।"

শরতের একখানা সাদা মেঘ চাঁদের মুখ ঢাকা দিলে এবং বাতাসও ধীরে ধীরে মরে গেল। মাল্লারা পাল নামিয়ে দাঁড় ধরলে। উজোন ঠেলে নৌকো আর এগোয় না। বেণী বিরক্ত হয়ে বল্লে—"মাঝি, তোমার হালে একটু ঝিঁকি দাও না।"

কিন্তু ঝিঁকি আর দিতে হল না। সহসা নৌকোর বেগ বাড়তে লাগলো—মাল্লারা বিস্মিত হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। নৌকোর বেগ আরো বাড়তে লাগলো—এবং দূরে একটা অস্ফুট জল কল্লোল শোনা যেতে লাগলো। স্তিমিত জ্যোৎস্নার আলোকে সকলেই দেখতে পেলে একটা ভীষণ আবর্ত্ত। বাঁদিকের সেই খালের মুখেই একটা দোয়া পড়েচে। মাঝি "উরে আল্লা" এবং মাল্লারা "বদর বদর" বলে উঠলো।

"ভেড়া ভেড়া, তীরে ভেড়া" ব'লে বেণী চীৎকার করে উঠলো।

মাল্লারা প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করতে লাগলো বটে, কিন্তু তাতে বিপদ আরো বেড়ে উঠ্‌লো। তীরের দিকের স্রোত আরো তীব্র। নৌকো তীর ঘেঁসেই চল্‌লো বটে, কিন্তু তীরবেগে। আর পঞ্চাশ হাত মাত্র, তারপরই কি হবে কে জানে? উন্মত্ত ফেনিল জলরাশি একটা বৃহৎ অজগরের মত করাল বদন বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে, আর নৌকোখানা তারই ক্ষুধার্ত্ত গ্রাসে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে মন্ত্রমুগ্ধ শশকের মত ছুটেচে। এক মুহূর্ত্তে বেণী ও শৈলর মাথার ভিতর দিয়ে তাদের সমগ্র বাল্যজীবনের ছবি চলচ্চিত্রের মত ছুটে গেল। আসন্ন মৃত্যুভয়ে শৈল "'বেণী দা!" বলে বেণীকে জড়িয়ে ধরলে।

ও কি ও সামনে? একটা গাছের ডাল না? যেন গাছ একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলচে—"ধরো!" ছৈ-এর পাশ দিয়ে ডালটা বেরিয়ে যাবার আগেই বেণী ক্ষিপ্রহস্তে সেটাকে ধরে ফেল্‌লে। কিন্তু টানের চোটে সে নৌকা হতে জলে প'ড়ে যেতো, যদি না শৈল প্রাণপণে এক হাত দিয়ে তার কোমর ও অপর হাত দিয়ে মাস্তলটাকে আঁকড়ে ধরতো।

বাধাপ্রাপ্ত নৌকা বন্ বন্ করে ঘুরপাক খেতে লাগলো এবং ঘুরপাক খেতে খেতে তীরের এতই নিকটবর্ত্তী হলো যে গলুই-এর মাল্লা এক লাফে ডাঙ্গায় লাফিয়ে প'ড়ে নৌকোটাকে কাছি দিয়ে বেঁধে ফেল্লে। বেণী ও শৈল কম্পিতপদে ডাঙায় নেমেই—সরাসর গাছের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

তখন আকাশে আবার জ্যোৎস্না ফুটে উঠেচে। পরলোকের দ্বারদেশ হতে ইহলোকে ফিরে আসা দম্পতি নতজানু হয়ে ভক্তিভরে গাছের গোড়ায় প্রণাম করলে। কিন্তু প্রণাম করবার সঙ্গে সঙ্গেই বেণী চমকে উঠ্‌লো—গাছের ছালে অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েচে 'বেণী।'

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বেণী বল্লে—"শৈল, শৈল, এ সেই গাছ।"

"কোন গাছ গো, কোন গাছ?"

"যে গাছের গোড়ায় আমরা নুণ পুঁতেছিলুম।"

মুখের হাসি ও চোখের জল একত্র করে শৈল বল্লে—"নুণ খেয়ে কখনো নিমকহারামি করতে পারে? ওরা নিমকহালাল।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

বর্ষা-শেষ

বহুদিন কেটে গেল বর্ষা-অন্ধকারে
নিবিড় মেঘের ছায়ে। ঝর ঝর ধারে
ঝরিল বৃষ্টির ধারা বিরাম বিহীন
প্লাবিয়া ধরণী-বক্ষ ধরি' রাত্রি দিন।
আজি মেঘমুক্ত দিন শক্তিমান রবি
প্রচণ্ড প্রদীপ্ত করে জলজল ছবি
প্রকাশিছে আপনার। শুভ্র করজাল,
ক্ষুধিত কাঙাল যেন ছিল কত কাল,
ধরিয়াছে ধরণীরে প্রবল আগ্রহে
আদরে যতনে সুখে; যেন তৃপ্ত নহে
আঁকড়িয়া বৃক্ষে বৃক্ষে তৃণে ও ধরায়।
ধরণী বলিছে যেন—আয়, আয়, আয়,
রে শুভ্র প্রদীপ্ত প্রাণ, জীবন আমার,
তৃণে বৃক্ষে কর্ দৃপ্ত প্রাণের সঞ্চার।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

দ্বারকায় তিনদিন

গত বৎসর ডিসেম্বরের প্রথম দিকে দেশ ভ্রমণের নেশা চেপে বসেছিল, তাই তল্পিতল্পা নিয়ে মাস তিনেকের জন্যে বেরিয়ে পড়েছিলুম। নানা জায়গা ঘুরে, রাজপুতনার মরুময় বুকের শুষ্কতায় অধীর হয়ে যে দিন প্রথম কাথিয়া-বাড়ের সীমায় প্রবেশ করলুম সেদিন সবুজ শোভার স্নিগ্ধতা দেখে বাস্তবিক মনটি একটী মধুর রসে ভ'রে গিয়েছিল। প্রথমেই মনে পড়েছিল—

কখনো মা তুমি ভীষণ দৃপ্ত
তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখনো শ্যামল শস্যে
ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

ভারতের অঙ্গ জুড়ে আছে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, কোথাও হরিৎ ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় কোলাকুলি, আবার কোথাও দারুণ শুষ্কতার বেদনাহত দীর্ঘনিঃশ্বাসের ছড়াছড়ি।

ট্রেণ ছুটে চলেছিল উদ্দাম গতিতে। ক্রমে যেন মনে হ'ল পৃথিবীর হাসি থেমে গেছে, আর তার বদলে উঁকি মেরে উঠছে বার বার তার বিষাদ ভরা মুখটী। মাঝে মাঝে নীল দু'টী কোমল চোখের মত বালুচরের ওপারে সমুদ্রের একটী প্রান্ত দেখা যাচ্ছিল, আবার আমাদের দ্রুতগতির শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গে তা যেন শঙ্কায় লজ্জায় বন্ধ হ'য়ে আসছিল। বড় ছোট অনেক জায়গা আমরা পেরিয়ে গেলুম ঐতিহাসিক মূল্যে যা মহার্ঘ।

সারাদিন এমনি ভাবে চলতে হ'ল। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এ চলার শেষ নেই, এ পথ যেন সীমাহীন। মাঝে মাঝে সাগরের খেলার সাথী চঞ্চল বাতাস দুদিক থেকে ছুটে এসে আমাদের চুল কাপড় উড়িয়ে দিয়ে ছোট্ট চলতি ঘরটীর জিনিসগুলি এলোমেলো করে দিয়ে যাচ্ছিল। তখন আকাশের গায়ে দিনমণি প্রেয়সী সন্ধ্যারাণীকে প্রকাশ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে ফেলেছেন, তারই ব্রীড়ানত মুখের লজ্জারুণ রাগে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে; ক্রমে সে লালিমা ম্লান হয়ে এল নিশা-সহচরী তারাপুঞ্জের আগমনে। সরম-শঙ্কিতা সন্ধ্যারাণী সারা পৃথিবীতে কালো পর্দ্দা টেনে দিয়ে প্রিয়তমের সঙ্গে নিভৃতে লুকালো—ঠিক সেই সময়ে সে আধ-ছায়া আধ আলোর দূরে দেখা গেল প্রকাণ্ড একটী গাঢ় নীল আস্তরণের উপর মহিমময় রাজার মত দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের একটী উচ্চ চূড়া। বুঝতে পারলুম ঐ দ্বারকা-ধীশের মন্দির।

আমাদের কয়েকখানা গাড়ী কেটে লাইনের এক পাশে রেখে ট্রেণটী ধীরে ধীরে আবার চলে গেল ওখা পোর্টের অভিমুখে। দ্বারকা থেকে তার দূরত্ব ৪।৫ মাইল ও সেইখানেই তার চলার শেষ। দ্বারকা ষ্টেশনটী ছোট। একটী ছোট ঘর ষ্টেশন নামের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে কোন মতে আত্মপ্রকাশ করে রয়েছে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চলে এসেছি। সে
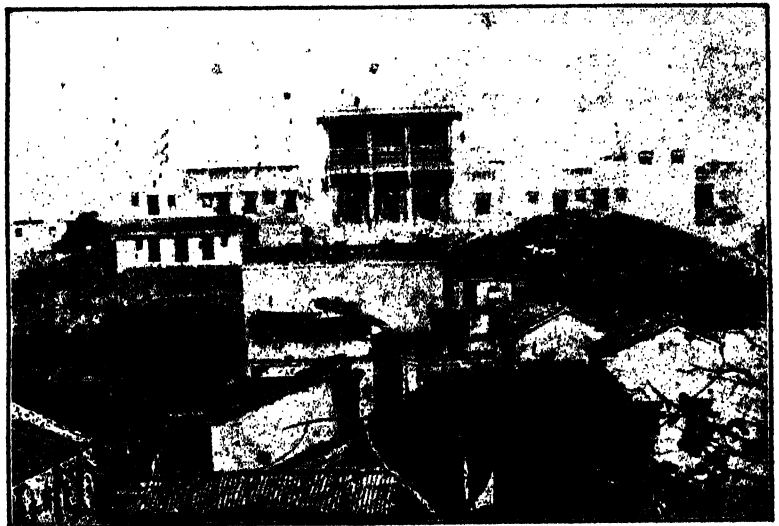
ভেট দ্বারকা

নির্জ্জন সন্ধ্যায় সাগরের উদাস সঙ্গীতের সুরে ঘর ছাড়া প্রবাসী আমরা, দলে চাকর বাকর নিয়ে ১৫।১৬ জন হ'লেও, বড় একলা বড় নিঃসঙ্গী লাগছিল। তবে মাস দেড়েক গাড়ীতেই ঘর সংসার পেতে বসেছিলুম তাই অতটা মানসিক অভাব সত্ত্বেও সোয়াস্তি ও শান্তি ছিল।

মনটা বেশীক্ষণ দ'মে রইল না। মধুর গন্ধে যেমন পিপড়ের দল সারি বেঁধে আসে তেমনি আস্তে আস্তে পাণ্ডার দল এসে আমাদের গাড়ীগুলিকে ছেঁকে ধরলে। বেশী বাগ্‌বিতণ্ডা ক্লান্তিকর বুঝে সবাইকে বিদায় দেওয়া হল। একজন পাঁণ্ডা বেচারা বিশ্বস্ত অনুচরের মত আজমীর থেকে আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল, তাকেই অবশেষে বাহাল করা গেল। পাণ্ডাজী বিজয়ী বীরের মতন অন্য অনাহূতদের নিজের শক্তি সামর্থ্য বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে আমরা মন্দিরে দর্শনে যেতে রাজি আছি কিনা। অরাজির বিশেষ কিছুই ছিল না। কাযকর্ম্ম কিছু ছিল না, লাইনের পাশে তাম্বু খাটিয়ে তখন লোক জনেরা রান্নার বন্দোবস্ত করছিল মাত্র। তাতেও দেরী হবে। কাযেই বাকি সময়টুকু একটু ঘুরেই আসা যাক্ ভাবলুম। টঙ্গা ছাড়া আর কোন যান পাওয়া যায় না সেই জন্যে টঙ্গাকে পথের সম্বল ক'রে রওনা হওয়া গেল।

দ্বারকাকে একটী ছোট সহর বলা চলে। ধর্ম্মশালা ২।১টী আছে, বাজার আছে। রাস্তাগুলি বেশ চওড়া। ঘন অন্ধকারময়ী রাত্রি, বহু দূরে দূরে এক একটী কেরোসিনের মিটমিটে আলো অন্ধকারকে নিবিড়তর ক'রে তুলছিল মাত্র। আমরা সেই পথ দিয়ে ৪।৫ খানি টঙ্গায় চলেছিলুম। পথটুকু হাসি গল্পে বেশ কেটে গেল। তার পরে ছোট্ট একটী দরজা পেরিয়ে একটী প্রকাণ্ড ফটকের সামনে গাড়ীগুলি থেমে পড়লো। শুনলুম এই দ্বারকাধীশের রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার। সেইখানে গাড়ী থেকে নেমে ফটক পার হয়ে খুব বিস্তীর্ণ একটী বাঁধানো চত্বরে উপস্থিত হলুম। বাঁয়ে প্রদ্যুম্নজীর মন্দির অতিক্রম ক'রে সামনে উন্নত মহিমময় দ্বারকাধীশের মন্দির, বহু কারু-কার্য্যখচিত। পাথরে প্রাণ সঁপে কোন্ অজানা কারিগর এই অপূর্ব্ব শিল্পখণ্ড প্রস্তুত ক'রে রেখে গেছে! তার উদ্দেশে শ্রদ্ধায় প্রশংসায় আপনা আপনি মাথা নত হয়ে আসে। কিম্বদন্তী আছে এই মন্দির নাকি দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা মাত্র একদিন এক রাত্রের পরিশ্রমে গ'ড়ে তুলেছিলেন। সে যাই হোক্ এতটা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করার কৃতিত্ব মানুষ নিজে না নিয়ে দেবতাকে নিবেদন করেছে, এতে তাদের ঈশ্বর-ভক্তিরই প্রমাণ পাওয়া যায় বেশী। সেদিন ভাল ক'রে তবুও রাতের অন্ধকারে সবটা দেখা হয়নি। পরদিন দিনের আলোয় তা অভিনবতর মূর্ত্তিতে আমাদের সমক্ষে ঘোমটা খুলে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করলুম। প্রকাণ্ড নাটমন্দির প্রায় ৬০টী থামের উপর ভর দিয়ে আছে। মেঝেটা মর্ম্মর পাথরের বাঁধানো। তখন দ্বারকাধীশের আরতির সময়। পরে ভোগ, ও তারপরে শয়ন।

মন্দিরে তখন বেশী লোকজন ছিল না। আমরা দ্বারকাধীশের মূল মন্দিরের বিরাট কারুকার্য্য-শোভিত রূপার দরজার খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলুম। অদূরে রূপার বেদীর উপর নিকষ কালো পাথরের মূর্ত্তি অসংখ্য হীরা মণি মাণিকে গা ঢেকে বহুমূল্য কিংখাব বেনারসীতে সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ঠিক রাজাধিরাজের মতন দাঁড়িয়ে আছেন। এক পাশে আমাদের সঙ্গে দু'চারজন সুগঠনা সুন্দরী স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিল, আর একদিকে কয়েকটী সাধু, সন্ন্যাসী পরিব্রাজক গোছের লোক বসে ছিল, তাদেরই একজন ভক্তিরসে মনটা ধুয়ে দিয়ে সুন্দর সুরে একমনে একটী ভজন গান গেয়ে যাচ্ছিল। তাতে তাল ছিল না গান ছিল না, কিন্তু স্থান-কালোপযোগী এমন একটী ভাব বিজড়িত ছিল যাতে উপস্থিত সকলকেই সে গান অভিভূত করেছিল। আমরা চুপ করে একটী থামের গায়ে হেলান দিয়ে শুনে যাচ্ছিলুম—

"দ্বারকাধীশ নাম শুনকে
তোরি শরণ পর আ রহি,
গোমতী তট পর স্নান করকে
সব পাপ ক্ষয় হো রহি,
তুঁহি তো বাচানেওয়ালে
তোরি চরণ পর গির রহি।

ভেট দ্বারকা

রণ ছোড়কে যব আয়া
তব হুয়া রণছোড়জি!
তুঁহি ব্রহ্মা, তুঁহি বিষ্ণু,
তুঁহি মহেশ গুন রহি।"

গানটী খুব বড়, সব পদগুলি মনেও নেই, কতক্ষণ গান চলেছিল তা বুঝতে পারিনি। হঠাৎ চমক ভাঙ্গলো পাণ্ডার কথায়: সে বললে অন্য সব মন্দির দর্শন করতে হলে এখনি যাওয়া উচিত—১১টা প্রায় বাজে, দেবতাদের শয়নের সময় উপস্থিত। দ্বারকাধীশের মন্দিরের পাশেই বলরামজীর মন্দির। ততটা জাঁকজমকে দ্বারকাধীশের মন্দিরের সমকক্ষ না হলেও তিনিও নেহাৎ দীন নন্। কিছু দূরে এক পাশে শঙ্করাচার্য্যের আসন আছে। দুর্ব্বাসা মুনির আশ্রম নামে একটী ছোট্ট ঘর একদিকে আছে। শোনা গেল এখানে রুক্মিণীর স্থান নেই। তিনি নাকি দুর্ব্বাসার অভিশাপে এখান থেকে তিন মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে একটী নির্জ্জন মন্দিরে নির্ব্বাসিতা হয়েছেন।

তার পরেই আমরা শ্রীকৃষ্ণের অন্দর মহলে প্রবেশ করলুম। বাতির জোর তেমন নেই, মিটমিটে আলোয় যতটা সম্ভব দেখে নিতে হল। একে ঠিক মন্দির বলা চলে না, তবে মানুষের বাসোপযোগী অন্দর মহল বলা যেতে পারে। মাঝখানে একটী উঠান, চার পাশে উঁচু বারান্দা সংলগ্ন ছোট ছোট কতকগুলি কুঠুরী। প্রত্যেকটীতে শ্রীকৃষ্ণের এক একটি মহিষীর প্রতিমূর্ত্তি। কোনওটিতে সত্যভামা, কোনটীতে জাম্ববতী ইত্যাদি। মনে হল গত বহুযুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভেদ ক'রে বুঝি বা সত্যিই দ্বারকার রাজা, রাণীদের নিয়ে আজও সেখানে রাজত্ব করছেন।

আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে এলুম। বোধ হ'ল মন্দিরের খুব কাছেই সমুদ্র, তার অস্ফুট গর্জ্জন ও দুর্দ্দান্ত বাতাসের আকুলতা বেশ কাণে বাজছিল। তখন অনেক রাত হয়ে গেছে, নৈশ নীরবতা ধীরে ধীরে গা এলিয়ে দিয়েছে। তখনো দু' একটী দোকান খোলা ছিল, আমরা কিছু সখের জিনিষপত্র কিনে ষ্টেশনে ফিরে এলুম। সুন্দর সুন্দর ছোট বড় কাঠের কৌটা, কাঠের এলাচি লবঙ্গ ইত্যাদি মসলা সেখানে পাওয়া যায়।

গাড়ীতে ফিরে খানিকক্ষণ গল্পগুজবে গানে বাজনায় নীরব ষ্টেশনটী সরব ক'রে তুলে আমরা সেদিনের মত বিশ্রাম নিলুম। ষ্টেশন মাষ্টার বেশ ভদ্র, আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিলেন।

পরদিন সকালে উঠেই পাণ্ডাজীর দর্শন মিললো। বেগুনী রংএর গরদে আর হলদে গরদের চাদরে সেজে গুজে চন্দনলিপ্ত হয়ে সে আমাদের অভিবাদন করলে। পাণ্ডাজীর সঙ্গে তার পিছনে ১০।১২ জন দোকানদার তাদের পোটলা পুটলী সহ দাঁড়িয়ে আছে দেখলুম। সকলেই আমাদের গাড়ীর সামনে যে যার ভাণ্ডার খুলে বসলো, আর কার জিনিষের কি কি গুণ এবং সে সব কত দুর্লভ অথচ তারই কাছে কত সুলভ—এই সব প্রমাণ করবার জন্যে চিৎকার ও গোলমালের প্রতিযোগিতা

আরম্ভ করে দিলে। সে এক ভীষণ ব্যাপার। যাহোক কোন মতে তাদের "অত্যাশ্চর্য্য" জিনিষ কিছু কিছু নিয়ে তাদের প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করা গেল। এই ব্যাপারে প্রায় বারোটা হল। ওদিকে পাণ্ডাজী বার বার করুণ সুরে নিবেদন করছিল গোমতী স্নান, দর্শন, প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্মের সময় চলে যাচ্ছে। এত বড় লোভ ত্যাগ করা কঠিন। কাযেই আমরা সকলেই দল বেঁধে গোমতী ও মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হলুম।

গোমতী এখানে কি করে এলো তা বলা কঠিন। গোমতী বোধ হয় গঙ্গার শাখানদী, লক্ষ্ণৌয়ের পাশ দিয়ে মধ্য প্রদেশের মাঝখান দিয়ে তা প্রবাহিতা হচ্ছে। সেই গোমতী গুজরাট অঞ্চলে কেমন করে আবির্ভাব হ'ল তা বুঝতে পারলুম না। তবে বোধ হয় গোমতী নামের পুণ্য স্মৃতি স্মরণ ক'রে এখানকার লোকেরা তার মাহাত্ম্য বাড়িয়ে দেবার জন্যে এই ছোট নদীটাকে গোমতী আখ্যা দিয়েছে।

আমরা এবারে প্রথমে মন্দিরে না গিয়ে আর একটা রাস্তা ঘুরে একটা ছোট ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেখানে অসংখ্য পাণ্ডা ভাল শীকার সংগ্রের আশায় উৎফুল্ল হয়ে ব'সে ছিল। সেই খানে আর এক প্রস্থ গোলমাল ঝগড়া সুরু হ'ল। "ছ্যা"-অন্ত ভাষার কচমচিতে কাণ ঝালাপালা হবার উপক্রম হয়ে উঠলো। যাহোক কোন রকমে সেখানে কিছু কিছু ধর্ম্মকার্য্য সেরে নেওয়া হ'ল—অর্থাৎ স্নানের আগে কি কি নাকি দান করা উচিত। সে দান শেষে স্নানের পালা। সেখান থেকে বেরিয়ে খানিক দূর গিয়েই সামনে একটা প্রকাণ্ড অশান্ত নীলিমার সমাবেশ দেখে চোখ ঝলসে গেল। এত কাছে মহান বিরাট সুন্দর কিছু আছে সে ধারণা এতক্ষণ করতে পারিনি। আর পাশেই বাঁ দিকে গোমতী।

তখন বেলা দুপুর, সূর্য্যকিরণ খুব প্রখর, সারা আকাশ মেঘশূন্য গভীর নীল। আকাশে জলে অনন্ত নীলের মাখামাখি, সঙ্গে সঙ্গে সোণালি আলোর মেলা। সে অসীম প্রদীপ্ত রূপরাশি দেখে মন মেতে উঠলো। রৌদ্রের তাপ উপেক্ষা ক'রে খানিকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে রইলুম। কি চমৎকার! তার সবই গরিমাময়! কোথাও এতটুকু চঞ্চলতা নেই, প্রগল্‌ভতা নেই, শুধু আপন গৌরবে আপনহারা। মৃদু ঢেউগুলি ধীরে ধীরে জলগর্ভ থেকে উঠে তীরের উপর এসে আছাড় খেয়ে পড়ছিল—যেন উপেক্ষিতা দারুণ অভিমানে বার বার শুষ্ক বালুর উপর লুটিয়ে প'ড়ে ফিরে যাচ্ছে। আর ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে, তার ব্যর্থ সজ্জার হীরার আভরণগুলি।

গোমতী বোধ হ'ল ঠিক নদী নয়, সমুদ্রের একটী নালা। ডানদিকের পাড় পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বাঁধানো, বাঁদিকের পাড় বালুকাময়। বাঁধানো পাড়ের দিকে স্নানার্থীদের সুবিধার জন্যে পাথরের একটী লম্বা বারান্দা গোছ আছে, সেইখানে সকলে কাপড় ছাড়ে, আবার অনেকে শ্রাদ্ধাদি ক'রে থাকে। নদী অথবা নালার জল তীব্র লবণাক্ত। জল খুব অল্প—এমন কি হেঁটে এপার ওপার করা চলে। স্বচ্ছ জলের ভিতর ছোট বড় অনেক রকমের মাছ খেলে বেড়াচ্ছে দেখা গেল। কোনও রকমে স্নান সেরে পুণ্য অর্জ্জন করলুম। এখানে ব'লে রাখা দরকার যে এই গোমতীতে স্নান করতে প্রত্যেককে ১৵০ আনা ট্যাক্স স্বরূপ দিতে হয়।

স্নানের পর আমার স্বামী যতক্ষণ শ্রাদ্ধ করলেন, ততক্ষণ আমরা বসেছিলুম। বহু নরনারী একত্র মিলে তখন স্নানের আসর জমিয়ে তুলেছে। দ্বারকায় যে ক'দিন ছিলুম একটীও কুৎসিৎ স্ত্রীলোক আমার চোখে পড়েনি। সেখানকার স্ত্রীমূর্ত্তির স্রষ্টা কি আশ্চর্য্য শিল্পকুশলী যে এতটুকু খুঁত কোথাও কারো গায়ে বা মুখে রেখে দেননি। রঙিন সাড়ীতে তারা চারিদিক রাঙিয়ে দিয়েছিল —যেন কোনো অমনোযোগী চিত্রকর তুলির টানে ইতস্ততঃ অসাবধানে রেখাপাত করেছে। তখন সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশের গায়ে ঢ'লে প'ড়ে পৃথিবীকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দিয়েছে, সাগর সেই বিদায় ব্যথায় ব্যাকুল চিত্তে উদ্বেলিত হয়ে জলের জোয়ার তার কানায় কানায় ভরিয়ে এনেছে। এমন কি ছোট্ট গোমতী পর্য্যন্ত বাঁধনের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছে। উদাস ধরণী শ্রান্ত ক্লান্ত দীন নয়নে আকুতি জানিয়ে দিচ্ছে যেন দিনমণির দেখা চির প্রথামত পরদিন পায়। সেই সময় আমরাও ষ্টেশনে ফিরে এলুম।

রাত্রে আবার দ্বারকাধীশের মন্দিরে যাওয়া হ'ল। পাণ্ডা বললে চরণ পূজা কেউ করতে চায় তো করতে

পারে। অর্থাৎ দ্বারকায় স্পর্শদোষ নেই। তবে, ৸৹ আনা না কত একটা ট্যাক্স যে দেবে সে নিজে দ্বারকাধীশের মূর্ত্তি স্পর্শ ক'রে পূজা করতে পারবে। আমাদের ভিতর অত বড় সৌভাগ্যকে অনেকে উপেক্ষা করতে পারেনি—তারা চরণ পূজার অধিকার কিনে নিয়েছিল। মন্দিরে সেদিনও সেই লোকটী ব'সে গত দিনের ভজনটী গেয়ে ঠিক সেই রকম ভাবপূর্ণ গম্ভীর একটা রসের ধারা চারিদিকে বইয়ে দিচ্ছিল। সেদিন বাইরে অশান্ত প্রকৃতির ব্যাকুলতা আকাশে পাতালে ছাপ মেরে দিয়েছে। সমুদ্র আকুল হয়ে তার যত কিছু জ্বালা সরব গর্জ্জনে জানিয়ে দিচ্ছে—কা'কে কে জানে! আমরা অন্ধকারে বালুচরের উপর সাগরের খুব কাছ ঘেঁসে খানিক দূর হেঁটে চললুম। নিবিড় অন্ধকার। বোধ হয়, আকাশে মেঘ ছিল। চলতে চলতে মনে হচ্ছিল জমাট বাঁধা কালো পাথরের স্তূপের ভিতর দিয়ে চলেছি। পাশে শঙ্কিতা বিরহিণী সাগরিকা বুকফাটা ব্যথা চেপে রেখে গুমরে মরছে—বেশ লাগছিল। ভীষণের সৌন্দর্য্যও মাঝে মাঝে মনকে মুগ্ধ করে।

পরদিন খুব সকালে উঠে তিন মাইল দূরে রুক্মিণী রাণীকে অভিবাদন করতে গেলুম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর দর্শন অদৃষ্টে ঘটে নি। পুরোহিত ঠাকুর নাকি ১০ টার আগে কখনো সে মুখো হন না, কাযেই প্রভাতের শান্ত পবিত্র সৌন্দর্য্যটুকু নীল সাগরের কোলে অর্দ্ধভগ্ন নির্জ্জন মন্দিরের সিঁড়ির উপর বসে উপভোগ করেই ষ্টেশনে ফিরে এলুম, কারণ ১১টার সময় আমাদের দ্বারকা ত্যাগ করবার কথা ছিল। ভোরের ঠাণ্ডা মনমাতানো হাওয়ায় আর পথের শোভায়—সুন্দরী তরুণীরা কোথাও কোথাও দুধের কলসী মাথায় নিয়ে, কোথাও বা কলসে জল ভ'রে অঙ্গসৌষ্ঠবের লাবণ্য ছড়িয়ে চলেছে—সে সুন্দর দৃশ্য দেখে রুক্মিণী দেবীকে না দেখার ক্ষোভটা মিটে গেল। ফিরে আসতেই ষ্টেশন মাষ্টার ওখাপোর্ট গামী গাড়ীর সঙ্গে আমাদের গাড়ী জুড়ে দিলেন।

ওখাপোর্ট অত্যন্ত নির্জ্জন জায়গা। এখানে পানীয় জলাভাব আছে শুনলুম। এখান থেকে কতকদূরে নীল সাগরের বুকে একটী ছোট দ্বীপ আছে, তারই নাম ভেট অথবা ইংরাজী উচ্চারণে বেট দ্বারকা। বেটদ্বারকা যেতে পাণ্ডারা বললে ছোট একটু নালা পেরিয়ে যেতে হয়, বড় বড় নৌকা পাওয়া যায় তাতেই সকলে পার হয়। পোর্ট কমিশনরকে আমরা

গোমতী ঘাট। পশ্চাতে দ্বারকাধীশের মন্দির

ষ্টীম লঞ্চের জন্য লিখেছিলুম, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন যে ষ্টীমলঞ্চ নাকি তখন out of port কাযেই নৌকা ছাড়া গতি নেই। জলভয়টা আমার অত্যন্ত বেশী, তবুও বেলা ৪টের সময় গাড়ী থেকে নেমে আমরা ঘাটে গিয়ে নৌকায় উঠলুম।

পাণ্ডারা যাকে ছোট নালা ব'লে অভিহিত করেছিল সে আমার চোখে দিব্যি বড় বলেই প্রতীয়মান হ'ল। এ বিরাট সাগরের রূপ দেখে আমার প্রাণ কেঁপে উঠলো— শুধু লজ্জার খাতিরে চুপ করে বসে রইলম। পাল খাটিয়ে নৌকা ছেড়ে দেওয়া হ'ল। যত তীর ছেড়ে চললো ততই সাগর যেন হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নেবার জন্যে এগিয়ে এলো। দুই দিকে বিশাল উচ্ছ্বসিত জলরাশি—মনে হ'ল কত কি বলবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে আসতে চায়। ওপারে পৌঁছাতে ঘণ্টা খানেক লাগলো।

বেট দ্বারকাকে গ্রাম বললেই মানায় ভাল। সেখানকার মন্দির ঠিক মন্দিরের চূড়াবিশিষ্ট নয়, বরং বাসোপযোগী বাড়ীর মত। সেখানকার মূর্ত্তি দ্বারকারই মূর্ত্তির অনুরূপ। চরণ পূজার প্রথা সেখানেও আছে। দ্বারকানাথের মত একটী অন্দর মহলও সেখানে আছে। ফেরবার পথে একটী দোতলা বাড়ীতে একটী অপরূপা সুন্দরী দেখে থমকে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম। সৌন্দর্য্যের কি আকর্ষণী শক্তি আছে তা জানি না, কিন্তু মনে হয় যা সুন্দর তাই ঐশ্বরিক, তাই আনন্দদায়ক। বার বার মনে হচ্ছিল—

A thing of beauty is a joy for ever.

বাতাসের জোর বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার এসে সাগরের জল নাচিয়ে তুলছে। পাথরে বাঁধানো ঘাটে বাঁধা নৌকাও নেচে নেচে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে। মনে ভয় হ'ল, কি ক'রে সাগরের চঞ্চল নৃত্যরতা দেহের উপর দিয়ে ভেসে যাব। মাঝি বললে একটু ঘুরে যেতে হবে, জোয়ার এসেছে। নিরুপায়—ঘুরেই যেতে হ'ল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

যখন ফিরে এলুম, শোভাসুন্দরীর অতুল সৌন্দর্য্য প্রাচুর্য্যে তখন মন আমাদের ভ'রে উঠেছিল।

রাত তিনটার সময় আমরা ওখা পোর্ট ছেড়ে এসেছিলুম, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসেনি। পরদিন আবার দ্বারকা ষ্টেশন অতিক্রম ক'রে জুনাগড়, ভেরাবল, পোরবন্দর উদ্দেশে রওনা হওয়া গেল।

দ্বারকা খুব প্রাচীন স্থান। দ্বারকার নামোল্লেখ মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, হরিবংশ ও দেবী ভাগবতে পাওয়া যায়। অনেক প্রাচীন কালে দ্বারকার মাহাত্ম্য, দ্বারকার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সপ্তধামের ভিতর দ্বারকা একটী ধাম ও হিন্দুর পুণ্যতীর্থ। শ্লোক প্রচলিত আছে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকাঃ।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা ॥ ইত্যাদি

তবে বর্ত্তমানে যে দ্বারকা আমরা দেখে এসেছি তা সেই পুরাণে বর্ণিত বিবরণের সঙ্গে কিছুতেই মেলে না। সেই জন্যে মনে হয় বর্ত্তমান দ্বারকা সেই প্রাচীন দ্বারকা নয়। প্রাচীন দ্বারকা নাকি সমুদ্রে ডুবে গেছে, এই কিম্বদন্তী শোনা যায়। প্রাচীন গ্রন্থ গুলিতেও দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের কাছ থেকে শত যোজন জমি চেয়ে নিয়েছিলেন, তাঁর প্রতিজ্ঞা মত মৃত্যুর সময় আবার সেই জমি সমুদ্রকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন।

বর্ত্তমান দ্বারকা যে সেই প্রাচীন দ্বারকা নয় তার আরো প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান দ্বারকার পরিমাণ শত যোজন হতে পারে না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দ্বারকার বর্ণনায় দেখা যায় যে, তখন দ্বারকা খুব বড় সহর ছিল। হাতী ঘোড়া রথ সর্ব্বদা যাতায়াত করতো। রাস্তা গুলি সুপ্রশস্ত ছিল ও বড় বড় অট্টালিকা সহরের শোভা বর্দ্ধন করতো। কিন্তু এই দ্বারকায় দ্বারকাধীশের মন্দির ভিন্ন তার পূর্ব্বসম্পদের কণামাত্র আছে বলে মনে হয় না। মহাভারতে সভাপর্ব্বে ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে দ্বারকায় যে বিবরণী প্রকাশ করেছেন তাতেও দেখা যায় দ্বারকানগরী তখন বিপুল ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিল। কাযেই এই দ্বারকা প্রাচীন দ্বারকা নয়।

তবে প্রাচীন দ্বারকার অবস্থিতি কোথায় ছিল তা ঠিক করাও কঠিন। ধৌম্য ঐ প্রসঙ্গেই বলেছেন যে দ্বারকার প্রতিষ্ঠাতা অনর্ত্তের পুত্র রেবত, রৈবতক পর্ব্বতের নিকট পর্য্যন্ত দ্বারকারাজ্য বিস্তৃত ক'রে ঐ গিরিশ্রেণীকে নিজের নামে অভিহিত করেছেন। হরিবংশ এই যুক্তির সমর্থন করেছে দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকার প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করলেও এ কথাও বলে যে দ্বারকার পরিধি শত যোজন ছিল, আর রৈবতক গিরি

শ্রেণী তার প্রাকৃতিক তোরণ স্বরূপ বিরাজিত। এই সব প্রমাণে বোঝা যায় দ্বারকা নিশ্চয় রৈবতক গিরি-শ্রেণীর নিকটেই ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান রৈবতক বর্ত্তমান দ্বারকা হ'তে বহু দূরে, বর্ত্তমান জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত ও তার বর্ত্তমান নাম গির্ণার পর্ব্বত। মহাভারতে দেখা যায় উজ্জয়ন্ত ও রৈবতক একই পর্ব্বতকে বলা হ'ত ও সেই যুগ থেকে আজও সেই পাহাড় স্থাপত্য শিল্পকলা বা তীর্থমাহাত্ম্য হিসাবে দর্শনীয় স্থান। যথা—

প্রভাসঞ্চোদধৌ তীর্থং ত্রিদশানাং যুধিষ্ঠির।
তত্র পিণ্ডারকং নাম তাপসা চরিতং শিবম্॥
উজ্জয়ন্তশ্চ শিখরী ক্ষিপ্রং সিদ্ধিকরো মহান। ২১।

পুণ্যে গিরৌ সুরাষ্ট্রেষু মৃগপক্ষি-নিষেবিতে উজ্জয়ন্তে স্ম তপ্তাঙ্গো নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে। বনপর্ব্ব।

স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডেও পাওয়া যায় যে রৈবতক ও উজ্জয়ন্ত একই স্থানের নাম— যথা—

সোমনাথস্য সান্নিধ্যে উজ্জয়ন্তো গিরির্মহান।
তস্য পশ্চিমভাগে তু রৈবতক ইতি স্মৃতঃ॥ ১৮।১।১৯

দ্বারকাধীশ রণছোড়জী

বিশ্বকোষে পাওয়া যায় যে উজ্জয়ন্ত বর্ত্তমান গির্ণারকে বলা হ'ত। যথা

উজ্জয়ন্ত—কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটী পবিত্র পাহাড় ইহার বর্ত্তমান নাম গির্ণার। (বিশ্বকোষ)

এই সব প্রামাণিক বচন থেকে জানা যায় যে রৈবতক, উজ্জয়ন্ত, গির্ণার একই স্থানের নাম। এই রৈবতক যখন পৌরাণিক গ্রন্থকারেরা বলেন যে দ্বারকার কাছে ছিল, তখন প্রাচীন দ্বারকা নিশ্চয় গির্ণার পাহাড় অর্থাৎ জুনাগড়ের কাছেই ছিল। মীমাংসা আরো জটিলতর হ'য়ে ওঠে যখন জানা যায় যে এই উজ্জয়ন্ত আবার সোমনাথের নিকটে ব'লে উল্লিখিত আছে, যথা—

সোমনাথস্য সান্নিধ্যে উজ্জয়ন্তো গিরির্মহান

এবং
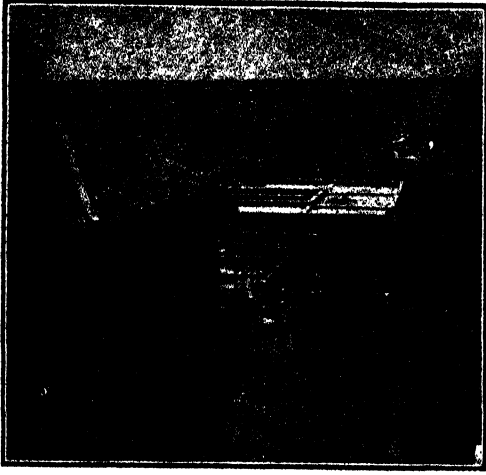
ওখা পোর্ট

প্রভাসক্ষোদধৌ তীর্থং ত্রিদশানাং যুধিষ্ঠির
উজ্জয়ন্তশ্চ শিখরী ক্ষিপ্রং সিদ্ধিকরো মহান।

বর্ত্তমান সোমনাথ অথবা প্রভাস ক্ষেত্র জুনাগড় থেকে দূরে। একদিনের পথে ভেরাবল ষ্টেশন, তারই একখণ্ডকে পাটন সোমনাথ অথবা প্রভাস পাটন বলে। তা ভেরাবল থেকে তিন মাইল দূরে। তাহলে মনে হয় পূর্ব্বে বোধ হয় বর্ত্তমান প্রভাস থেকে জুনাগড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সমস্তকেই প্রভাস বলা হ'ত এবং এই প্রভাস বোধ হয় দ্বারকা রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল। গুজরাটের মানচিত্র দেখলে দ্বারকা, ভেট দ্বারকা, গির্ণার, জুনাগড় ও ভেরাবলের দূরত্ব বেশ বোঝা যায়,কাযেই মনে হয় পূর্ব্বে দ্বারকা রাজ্য, সমস্ত গুজরাটের পশ্চিম খণ্ডে এই সব রাজ্য নিয়ে বিস্তৃত ছিল। হয়তো পশ্চিম খণ্ড আরো প্রসারিত ছিল, কালের চক্রে তা সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় নিয়েছে। এই ক্ষেত্রে প্রাচীন দ্বারকা ঠিক প্রাচীন বিবরণানুযায়ী শোভা সম্পৎশালিনী ছিল বলে মনে হয়, আর শত যোজন ভূমির মাপও মিলে যেতে পারে।

দ্বারকাধীশের মূর্ত্তি নাকি ৫০০ বৎসর পুরানো। আর এইটী নাকি ঠিক প্রকৃত মূর্ত্তি নয়, কে নাকি সে মূর্ত্তি চুরী করে নিয়ে "ডাকো" নামক একটী রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ না করে পালিয়ে দ্বারকায় গিয়েছিলেন ব'লে দ্বারকার মূর্ত্তির আর এক নাম "রণছোড়জি"

বর্ত্তমান দ্বারকা শুধু নামটুকু নিয়ে কোন মতে বেঁচে আছে, তবু এই নামের জন্যে শত শত হিন্দু সেখানকার বালুতে একবার মাথা লোটাতে ছুটে যায়।

দ্বারকা এখন মহারাজ গায়কোয়াড়ের অধীনে।

(রাণী) শ্রীসুরুচিবালা চৌধুরাণী

দুরাকাঙ্ক্ষী

সুকুমারী রাজার কুমারী
প্রেম অর্ঘ্য লবে কি দীনের ?
প্রাসাদের চারুবরনারী
রবে সাথে আলয়-হীনের ?
রেশমের কোমল আসনে
রহে নিত্য পদযুগ যার,
দারিদ্র্যের কঠিন শাসনে
লাবণ্য কি রহিবে তাহার ?
পথিকের অপরাধী আঁখি
রাজপুরী করি অতিক্রম
তারকায় নিল তার আঁকি
কুমারীর ছবি অনুপম।

প্রহরীর বাধা মানিল না
বিচঞ্চল আকুল হৃদয়,
জগতের কেহ জানিল না,
হিয়া-হারা রিক্তের বিস্ময় !
সিংহাসনে কোনো দিন কভু
অনুরাগ পায় না কি ঠাঁই ?
হোক্ ধনী রাজকন্যা, তবু
বুকে তার সুধা-উৎস নাই ?
চোখে চোখে যবে একদিন
নিমেষের হবে বিনিময়
ওগো, সে কি আলিঙ্গন-লীন,
কহিবে না 'লভিয়াছ জয়।'

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

চোখের বালি

(গল্প)

বর্ষণক্ষান্ত শরতের মেঘ-মুক্ত আকাশে যেন মাতামাতি সুরু হইয়া গিয়াছে। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে খঞ্জনী বাজাইয়া বৈরাগীর দল বাঙালীর সেই চির-প্রিয় চির নূতন সঙ্গীত গাহিয়া ফিরিতেছে—'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা আমার কত কাঁদিছে!'

প্রিয়জন-মিলনের অভিলাসে সারা বাঙলার বুকে আনন্দের উৎস ছুটিয়াছে!

আশ্বিনের এমনই এক পুলকোজ্জ্বল সন্ধ্যায় অমিয়-কুমার আফিস হইতে গৃহে ফিরিয়া পত্নী শোভনার উদ্দেশে বলিল, "ভাল বিপদ যাহোক! ভেবেছিলুম—দেশে যাব, তা আর হলো না! বড়বাবুর বাড়ী পূজো, তাই থেকে যেতে হল।"

শোভনা মৃদু হাসিয়া বলিল, "শেষে কি বড়বাবুর পূজোটাই বড় হল নাকি?"

"নিশ্চয়, নইলে চাক্‌রী থাক্‌বে মনে করেছ? আসবার সময় যে বারবার ডেকে বলে দিয়েছেন—'তোমাদের ভরসাতেই ভাই আমার এ বৃহৎ ব্যাপারে হাত দেওয়া; দেখো যেন লোক না হাসে!' এর মধ্যে অনেকের ওপর অনেক জিনিষ কিনে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে, কি ভাগ্যিস্ আমার ওপর সে দয়া হয় নি!"

"কেন, পয়সা দেবে, তা কিনে দিতে...?"

বাধা দিয়া অমিয় বলিল, "ক্ষেপেছ! বড়বাবু দেবে পয়সা! আর হাত পেতে নেবেই বা কোন্ নির্লজ্জ? সেবার আমার উপর ভার পড়্‌ল—একটা সোণার সেপটি-টিপন্ কেনার। যাবার সময় বলে দিলেন,—'বাড়ীতে বল্‌ছিল, পাশের বাড়ীর কারা নাকি দুটাকা ন-সিকের মধ্যে আনিয়েছে। দেখো, তার বেশী যেন—' 'যে আজ্ঞে' ব'লে তো বেরিয়ে পড়্‌লুম। ভাগ্যিস্ সে দিন মাইনে পেয়েছিলুম; সারা বাজার খুঁজে দুটাকা তো দূরের কথা পাঁচ টাকায়ও সেপ্‌টিপিন মিল্‌ল না, ট্যাঁক্ থেকে চারটী টাকা দণ্ড দিয়ে তো জিনিষ এনে দিলুম! অধরে একটু হাসির রেখা টেনে এনে বড়বাবু বল্‌লেন—'জানি অমিয় আমার কাযের লোক। দ্যাখো, দুটো টাকার মধ্যে কি সুন্দর জিনিষ কিনে এনেছে!' আমিও জল হয়ে গেলুম।"

শোভনা মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"বাহাদুর বটে!"

অমিয় বলিল, "এবার আবার বায়না হয়েছে তোমায় নিয়ে যেতে হবে, তুমি না গেলে—"

বাধা দিয়া শোভনা কহিল—"আমি? আমি সেখানে গিয়ে কি কর্‌ব?"

"অন্য পাঁচজন যা করে।"

"খোসামুদী?"

"দরকার হোলে তাও!"

"না, না আমি ওসব পার্‌ব না, আমি যাব না!"

"কিন্তু চাকরী?"

"সে তুমি জানো!" বলিয়া শোভনা সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

পূজার দিন কিন্তু শোভনাকে বড়বাবুর বাড়ীতে যাইতেই হইল। অমিয়র একান্ত অনুনয়-বিনয়-সাধ্য-সাধনায় সে আর 'না' বলিতে পারিল না।

যখন ইহারা পূজা বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন চারি-দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কলা-বৌ স্নান করাইবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। অমিয়কে দেখিয়াই বড়বাবু বলিয়া উঠিলেন—"আরে কেও, অমিয় নাকি? যা হোক্ ঘুম যে ভেঙেচে এই ঢের;—আমি তো ভাব্‌লুম—"

তাঁহার কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অমিয় বলিল, "এই এদের আন্‌তে একটু দেরী হয়ে গেল! তা কি কায আছে বলুন না এখনই..."

"যাক্, ওঁকে ভেতরে দিয়ে এস!" একজন আসিয়া শোভনাকে ভিতর বাড়ীতে লইয়া গেল। সঙ্কোচে শোভনার চরণ জড়াইয়া পড়িতেছিল, সে কোন মতে অগ্রসর হইল। অন্দরমহলে তখন বড়বাবুর স্ত্রীকে ঘিরিয়া একপাল রমণী খোসামোদ করিতেছিল;—শোভনাকে আনিয়া দাসী তাহাদের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া গেল।

কে একজন প্রশ্ন করিল, "ইনি কে গা?"

"আপিসের কোন কেউ হবেন;- এসো, বোস।" বলিয়া বড়বাবুর গৃহিণী আভাবতী অন্য একজনের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

শোভনা শিহরিয়া উঠিল;—ঘোম্‌টাটা আরো একটু টানিয়া দিয়া সে এক কোণে গিয়া বসিয়া পড়িল।

কে একজন বলিয়া উঠিল—"ওমা, এখানে কে আছে বাছা যে একগলা ঘোম্‌টা দিয়ে বসে রইলে?"

শোভনা কোন কথা কহিল না, নড়িলও না। বরং ঘোম্‌টাটা আরো একটু টানিয়া দিল। অল্প বয়সী একজন জোর করিয়া তাহার মাথার কাপড়্‌টা টানিয়া খুলিয়া ফেলিতেই বড়বাবুর গৃহিণী সহসা চম্‌কিয়া উঠিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"একি, সই?"

শোভনা মৃদু হাসিল; কথা কহিল না। ঘাড় নীচু করিয়া রহিল।

"বেশ যা হোক্, তোর রকম দেখে আর বাঁচি নে!—নে, নে, উঠে আয়। কতদিন পরে দেখা,—আমায় একেবারে ভুলে গেছিস্ বোধ হয়?"

ইহা অপেক্ষা যে ভোলাই ছিল ভাল! শোভনা কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে পারিল না; মাথা নীচু করিয়াই বসিয়া রহিল। বাল্যের সব স্মৃতি একত্র হইয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। সে ছিল ধনীর কন্যা, শিক্ষিতা, রূপসী! এত গুলোর অধিকারিণী হইলে যাহা হয়, তাহা হইতে সেও বাদ পড়ে নাই। সকল সঙ্গিনীর নিকট প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই সে প্রতিপন্ন করিতে চাহিত সে যেখানে যে ঘরে পড়িবে অনেকের পক্ষে তাহা কল্পনা করাও সম্ভব নয়! কিন্তু বিধাতার কি অপূর্ব্ব পরিহাস! কেমন করিয়া কি হইয়া গেল তাহা আজ ভাবিবারও প্রবৃত্তি তাহার হইল না!—হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, এই আভাকেই সে একদিন বড় গলায় বলিয়াছিল, 'সই ব'লে আদর ক'রে যদি না ঘরে ডাকি, আমার দরজা মাড়াবার সাহসও তোদের হবে না।' আর আজ?—তবে কি জানিয়া শুনিয়াই অপমান করিবার জন্য আভা তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে? হইবেও বা! সে অর্থহীন দৃষ্টিতে একবার আভার মুখের দিকে চাহিল!

আভা বলিল, "কার সঙ্গে এলি বল তো শোভা?"

শোভা জড়িত-কণ্ঠে বলিল—'ওঁর সঙ্গে। উনি আপনাদের ওখানে—'

"ফের আপনি?" বলিয়া বড়বাবুর গৃহিণী ধমক দিয়া উঠিলেন।

পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। শোভনা বাড়ী ফিরিয়া যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। যে কয়দিন সেখানে ছিল, প্রাণপণ যত্নেই সে আভার সঙ্গ এড়াইয়া চলিয়াছে! আভাও বড় একটা তাহাকে সে জন্য জেদ করে নাই, বরং একটু নিজের স্বাতন্ত্র্য বেশী করিয়াই বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। শোভনায় লক্ষ্যেও ইহা এড়াইয়া যায় নাই। এ দম্ভের প্রতিদানে সে দম্ভ দেখাইতে না পারিলেও বুকের ভিতর সে অনেক খানি বিষই সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিল। নির্জ্জনে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পাইলে হয় তো বুকের বোঝা কমিয়া যাইত,—কিন্তু সে দীনতাটুকুও যেন তাহার অসহ্য বোধ হইল। তাই অসহ বেদনায় সে নিজে নিজেই লাঞ্ছিত হইতে লাগিল।

সেদিন আফিস হইতে ফিরিয়া অমিয় গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "তুমি বড়বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কি সব করেছ?"

"কি করেছি?"

"তা তুমিই জান। বড়বাবু আজ বড় মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন দেখ্‌লুম। বল্‌লেন—'যার যা নিজের ওজন তাই বুঝেই চলা উচিত, নইলে—"

শোভনা শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "তা বটে।"

ঈষৎ বিরক্তি ভরে অমিয় বলিল, "তোমার জন্যে দেখছি মুস্কিলে পড়্‌তে হবে।"

শোভনা কোন কথা বলিল না।

পরদিন একেবারে অবসন্নভাবে আফিস হইতে আসিয়া

অমিয় মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। শোভনা উৎকণ্ঠিত ভাবে কহিল, "কি হল গো?"

"সর্ব্বনাশ হয়েছে। বড় সাহেব লোক কমাবার জন্যে বড়বাবুর কাছে লিষ্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন কার কার নাম কাটিয়ে দিতে হবে। শুনলুম—আমার নাম··

"ওঃ" বলিয়া শোভনা চুপ করিয়া রহিল।

অমিয় কাতরভাবে বলিল, "মিছিমিছি কি সব অনর্থ বাঁধালে বল তো! নইলে বড়বাবু আমার ওপর বরাবরই সন্তুষ্ট ছিলেন।"

শোভনা চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ অমিয় বলিয়া উঠিল, "এখনও রিপোর্ট ফাইল হয়নি। তুমি একটু চেষ্টা করলে কাযটা হয়ত থাকলেও থাকতে পারে।"

"আমি?"

"হ্যাঁ, তুমি যদি একবার বড়বাবুর স্ত্রীকে···"

"সে আমি পারবো না।" বলিয়া অশ্রু-গম্ভীর মুখে শোভনা সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। খানিক পরেই কিন্তু আরক্ত নেত্রে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "চল, তাই যেতে হবে আমায়।"

অমিয় বিশেষ কিছু বলিল না, পত্নীকে লইয়া বড়বাবুর গৃহাভিমুখী হইল।

৪

শোভনা বড়বাবুর পত্নী আভার হাত ধরিয়া বলিল, "শুনছেন?"

আভা গম্ভীর ভাবে বলিল, "কি?"

"আমার অপরাধ হয়েছে, আমাদের বাঁচান আপনি।"

"আমি বাঁচাব? কেমন করে কি করেছি আমি তোমাদের—"

"সেদিন হয়তো না জেনে আপনাদের অপমান করেছি, তাই আমার স্বামীর চাকরী যেতে বসেছে। আর যাই করুন, আমার জন্যে তাঁকে এ সাজা দেবেন না, তা হলে আমরা খেতে পাব না।"—তাহার কণ্ঠ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

আভা বলিল, "পাগল না কি? আফিসের কথা আমি কি জানি? আর সাহেব কি ওনার হাতধরা? মিছি মিছি কষ্ট করে এলে, এ বিষয় আমি কি করব?"

শোভনা অনেক বলিল, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। ভগ্নহৃদয়ে তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইল।

৫

পরদিন কর্ম্মচ্যুতির সংবাদ জানিবার জন্য অমিয় প্রস্তুত হইয়াই অফিসে গিয়াছিল। সমস্ত দিনেও কিন্তু কোন সংবাদ জানিতে না পারিয়া সে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল।

সন্ধ্যার মুখে বাড়ী ফিরিবার পথে বড়বাবু বলিলেন, "কাল আবার নাকি তোমার স্ত্রী আমাদের ওখানে গিয়েছিল। মহা বিপদ দেখ্‌ছি। গিন্নী কি একটা চিঠি দিয়েছে এটা তাকে দিও।"

"বড়বাবু!"

"বিরক্ত করো না, যাও!" বলিয়া বড়বাবু অন্য কার্য্যে মন দিলেন।

অমিয় ধীর পদে বাহির হইয়া যাইতেছিল, সহসা বড়বাবু ডাকিয়া বলিলেন, "আহা চাকরটি গেল তোমার! বড়ই দুঃখের বিষয়। চেষ্টা করতে থাক, অন্য কোথাও জুটে যাবেই একটা! আর হ্যাঁ,—দ্যাখো, গিন্নী মানা করেছেন এ চিঠি যেন তুমি পোড়ো না,—তোমার বউকে—"

"যে আজ্ঞে!"

কোনরূপে টলিতে টলিতে অফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া অমিয় পত্নীর হাতের উপর চিঠিখানি ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "জবাব হয়ে গেছে।"

কম্পিত বক্ষে শোভনা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অমিয় বিরক্তিভরে বলিল, "দেখ উনি আবার কি অপমান করে চিঠি দিয়েছেন—কিন্তু না, আর ভয় করি না; যখন চাকরীই রইল না তখন"—সে আবল-তাবল অনেক কথাই বকিয়া যাইতে লাগিল

শোভনা ধীরে ধীরে পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল;—কোন রকমে দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া জড়িতকণ্ঠে স্বামীকে বলিল, "পড়।"

অমিয় একবার পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিয়া পড়িতে লাগিল—

"সই!

সেদিন কি তুই ভুলে গেছিস্, যেদিন এতটুকু খাবার খেতে গেলেও দুজনে ভাগ না ক'রে নিয়ে খাইনি। একবার আমার অসুখের সময় তুই তিন দিন পড়ে কেঁদেছিলি;—কেউ তোর মুখে একটু জল পর্য্যন্ত দেওয়াতে পারে নি। আর আমি—যাক্ সে কথা! এখন আমি বড়বাবুর গিন্নী, আর তুই অধীনস্থ কেরাণীর স্ত্রী! এ কি আমার অপরাধ ভাই? কিছুতেই তো তুই আমাকে একবার সই বলে ডাক্‌লি নে—কেন? কি করেছি বল্ তো? মনে হয়েছিল—দিই খুব ক্যাঁট্ ক্যাঁট্ করে শুনিয়ে, কিন্তু দিইনি অন্য কারণে। ভাবলুম যেমন মন তোর,—ভাববি হয়তো বড়বাবুর স্ত্রী—ছি, ছি ভাব্‌লেও লজ্জা হয়, মলেও যে এ দুঃখ যাবেনা সই! এর চেয়ে যে—এম্‌নি রাগ হচ্ছে ওই বিধাতা পুরুষের উপর যদি একবার তাকে পেতাম—

যাক্—কাল যখন তুই এলি, তখন ভাবলুম একবার সই বলে ডাক্‌বি; কিন্তু তুই তোর অত বড় দাবীটা অক্লেশে ছেড়ে দিয়ে বল্‌লি কি না—তোকে তো রাগের মাথায় তাড়ালুম, তার পর কেঁদে মরি।—কাল সকালেই তোর ওখানে গিয়ে তোর ঘাড় মট্‌কে খেয়ে তবে অন্য কায। ওঁকে ধরেছি—যেমন করেই হোক্ উনি তোর বরের সম্বন্ধে হুকুম রদ করিয়ে তবে ছাড়বেন;—নইলে আমার সইকে যে হারাতে হয়! আজ এই পর্য্যন্ত—ইতি।"

অমিয় বিস্ময়ভরে আরও দেখিল—ঐ চিঠির সঙ্গে বড় সাহেবের সই করা একখানা চিঠি, তাহাতে অমিয়কে বড়বাবুর সহকারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে—মাহিনা দ্বিগুণ হইয়াছে।

অমিয় সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "শোভা, শোভা—বড়বাবু দেবতা না মানুষ!"

নীচ হইতে কে ডাকিল, "সই, সই, কালকের জন্যে আর তর সইল না, আজই এসে পড়েছি ভাই। তুই বল্লেই তো আর চোখের বালি হতে পারি না! কৈ লো, সাড়াই দিস্ না যে!"

সাড়া দিবে কি, শোভনা তখন চোখের জলে মুখের ভাষা হারাইয়া ফেলিয়াছে!

শ্রীহরিপদ গুহ।

গান

(কীর্ত্তনের সুর)

ঘন মেঘে ঢাকা সুহাসিনী রাকা,
তুমি কিগো সেই মানিনী?
বাদল নিঝরে শুধু মনে পড়ে
সে দুটি কাজল ঝরিণী।
এ ঘোর আঁধারে, খুঁজিছ কি তারে
বিজন-জীবন-যমুনার পারে?
বিরহীর লাগি আছ কি গো জাগি?
কাটে কি কাঁদিয়া যামিনী?

রুদ্ধ আকশ বন্ধ দুয়ার,
তুমি কিগো তারই সেই মুখ-ভার?
সহসা বিজলি উঠিছে উজলি,
তুমি কি গো সেই দামিনী?
কাটি যাবে যবে বরষার রাত
আসিবে হাসিয়া সোণার প্রভাত
তেমতি হাসিয়া বিষাদ নাশিয়া
আসিও মধুর-হাসিনী।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

সমস্যা

(গল্প)

সৃষ্টিকর্ত্তা স্বর্গে ব'সে যখন নিগ্রো, কাফ্রী তৈরী করছিলেন, সেই সময় আমার মায়ের কাতর আবেদন তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল—মা একটী পুত্র-সন্তানের জন্যে কান্না জুড়ে দিয়েছিলেন। দয়াময় সৃষ্টিকর্ত্তার মনে তখন দয়ার উদ্রেক হল; হাতের কাছে নিগ্রো কাফ্রী গড়বার যে ছাঁচ ছিল, তাইতে ফেলে একটী ছেলে গ'ড়ে আমার মায়ের কোলে তুলে দিলেন—সেই ছেলে হচ্চি আমি। নইলে যার বাবা শরীরের গঠনে, গায়ের রংয়ে বল্‌তে গেলে কার্ত্তিকের মত, যার মা'কে পরমা-সুন্দরী বললেও সব বলা হয় না, তাদের ছেলে এমন পাথুরে কালো, আর এমন কুৎসিত কি ক'রে হ'তে পারে? আমার একটী বড় বোনও আছেন; তিনি মায়ের মতই সুন্দরী; আর আমি কি না একেবারে হাঁড়ির কালী গায়ে মেখে সুপুরুষ বাপের ঔরসে, সুন্দরী মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলাম!

বাবা হাইকোর্টের বড় উকীল ছিলেন, যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করতেন; সংসারে কিছুরই অভাব ছিল না। একটী মেয়েও ছিল। তবুও বাবা মা একটী ছেলের জন্যে অধীর হয়ে পড়েছিলেন। তার ফলে এমন একটা ছেলে পেলেন, যার চেহারা ভদ্রলোকের ছেলের মত ত নয়ই, চাষার মতও নয়—একেবারে অদ্ভুত!

বাবার সম্মুখে কিন্তু কেউ আমার চেহারার নিন্দা করতে পারত না; কেউ যদি ঘুরিয়ে ফিরিয়েও কথাটার উল্লেখ করত, বাবা অমনি ব'লে উঠ্‌তেন, "কালো জগতের আলো। আমার হারাধনকে আমি এমন ক'রে গ'ড়ে তুলব যে, সে আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে; তার কালো রূপে দেশ আলো করবে।" হায় সন্তান-বৎসল পিতৃদেব, আজ তুমি বেঁচে থাকলে দেখ্‌তে পেতে তোমার হারাধন তোমার নিষ্কলঙ্ক কুলে কি কালিমা লেপন করেছে!

এইবার আমার অভিশপ্ত জীবন-কাহিনী বলি।

বাবা এই কালো কুৎসিত ছেলেকে জগতের আলো না হোক, দেশের আলো করবার জন্যে কোন রকম চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নি—আমার এই মসীবিনিন্দিত, অসৌষ্ঠবভূষিত দেহের পরিবর্ত্তন সাধন মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল—এ যে দেবতার খেলা—অভিশাপ বল্‌লেই বোধ হয় ঠিক হয়। তবুও আমার সৌভাগ্য যে, আমার কোন অঙ্গ বিকৃত ছিল না—তা হলেই একেবারে সোণায় সোহাগা হত।

বাবা স্থির করেছিলেন, আমাকে এমনভাবে লেখা-পড়া শেখাবেন যে, আমার বিদ্যার আলোকে চেহারার ত্রুটী ঢেকে যাবে। তারই জন্যে আমার বয়স পাঁচ বৎসর পার হতে না হতেই তিনি আমার স্কন্ধের উপর গণ্ডাখানেক শিক্ষকের ভার চাপিয়ে দিলেন। তাঁরা আমাকে সর্ব্বক্ষণ ঘিরে ব'সে থাক্‌লেন। কেউ আমাকে বাঙ্গালা ভাষা শেখাবেন, কেউ বিদেশী ভাষা শেখাবেন, কেউ আমার ভ্রমণ সঙ্গী হবেন এবং ব্যায়াম শেখাবেন; একজন পণ্ডিত মহাশয় সেই সময় থেকেই আমার মাথার মধ্যে উপক্রমণিকা ব্যাকরণ কৌমুদী প্রবেশ করাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা আরম্ভ করলেন;—আমি ঠিক সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর দশা প্রাপ্ত হলাম।

দেখ্‌তে কদাকার হলেও আমার একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল; লেখাপড়া শেখ্‌বার দিকেও আগ্রহ ছিল; বোধ হয়, আমার কুরূপকে একটু ঢেকে দেবার জন্যেই ভগবান এ দয়াটুকু আমার উপর করেছিলেন, অন্ততঃ শৈশবে এই লেখাপড়ার দিকে টান থাকাটাকে আমি ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ব'লেই মনে ক'রে নিয়ে-ছিলাম। এখন কিন্তু মনে হয়, আমি বোকা হলেই ঠিক হত। তা হলে আর এমন যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না,—সে কথা পরে বল্‌ছি।

বাবার যথেষ্ট উপার্জ্জন, তাঁর ব্যাঙ্কের হিসাবও খুব

বড়, আমি একমাত্র পুত্র, সুতরাং আমার কোনো অভাবই ছিল না; যখন যা আবদার করেছি, বাবা মা তাই পূরণ করেছেন। তারপর লেখাপড়ায় আমার বিশেষ মনোযোগ আছে, এ কথা শুনে বাবা আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আমার মাষ্টার মহাশয়দের কাছে যখন তখনই বল্‌তেন, "হারাধনকে এ দেশের সব পরীক্ষায় পাশ করিয়ে আমি ওকে বিলেত পাঠাব। ব্যারিষ্টার ত হবেই, অক্সফোর্ড থেকেও পাশ করিয়ে আনব। এর জন্যে যত টাকা খরচ হয় তা আমি করব।"

বাবার এই উচ্চ আশার কথা শুনে আমারও মনে খুব উৎসাহ হত; আমি প্রাণপণে তাঁর বাসনা পূর্ণ করবার চেষ্টা করতাম। সে চেষ্টা বিফল হয় নি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যখন গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলাম, তখন বাবার আর আনন্দ ধরে না; তিনি একেবারে একটা প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন ক'রে বন্ধুবান্ধবদের খাইয়ে দিলেন। যাঁরা নিমন্ত্রণ খেলেন, তাঁরা দুই বৎসর পরে আবার এমনই করে ভোজ খাবার প্রলোভনে আমাকে বহু আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলেন। তাঁদের আশীর্ব্বাদ বৃথা হয় নি; আমি আই-এ পরীক্ষাতেও খুব উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলাম, বি-এ পরীক্ষায় একেবারে সকলের মাথায় উঠেছিলাম। তারপর এম-এ পরীক্ষায় ফল যখন বের হল, তখন বাবা আর সে সংবাদ ইহলোকে বর্ত্তমান থেকে শুন্‌তে পেলেন না; স্বর্গে সে সুখসংবাদ্ পৌঁছেছিল কি না, তা আমি কি ক'রে বলব?

বাবার ইচ্ছে ছিল, এম-এ পাশ করবার পর আমার শুভবিবাহ কার্য্য শেষ ক'রে আমাকে বিলাতে পাঠাবেন। এ কথা বলাই বাহুল্য আমার মত কদাকার চেহারা যুবক যে অবিবাহিত অবস্থায় বিলেতে গিয়ে একটা মেম বিয়ে করে আনবে এ সম্ভাবনাও কখনও তিনি মনে স্থান দেন নি এবং সেজন্যেও বিলাত যাত্রার আগে আমার বিবাহ দেবার সঙ্কল্প করেন নি। আমার আই-এ পাশের পর থেকেই কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকে রাবাবার কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেছিলেন, ঘটকীরাও বাড়ীর ভিতর গিয়ে অনেক তিলোত্তমার সংবাদ মাকে দিয়েছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দশ বারো হাজার টাকারও প্রলোভন দেখিয়েছিল। কিন্তু বাবার সেই একই কথা—এমএ পাশ করার পূর্ব্বে তিনি কিছুতেই ছেলের বিবাহ দেবেন না। সেই জন্যেই আমার বিবাহ বন্ধ ছিল।

বাবা তাঁর শেষ বাসনা পূর্ণ না ক'রেই চ'লে গেলেন। তাঁর ইচ্ছার কথা মা যে জান্‌তেন না, তা নয়। কিন্তু, তিনি তাঁর একমাত্র ছেলেকে বিলেত পাঠাতে কিছুতেই সম্মত হলেন না; এখন যে তিনিই আমার অভিভাবিকা।

বাবার অপর বাসনা পূর্ণ করবার জন্যে মা তৎপর হ'লেন। পিতৃবিয়োগের পর এক বৎসরের মধ্যে পুত্রের বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রানুমোদিত নয়, একথা তিনি জান্‌তেন; কিন্তু এ আইনের যে একটা কাটান্ আছে, সে কথাও পুরোহিত মহাশয়দের আগ্রহে তাঁহার অবিদিত ছিল না—একবৎসরের সপিণ্ডীকরণ এক দিনে শেষ ক'রে ফেল্‌লে বিবাহে কোন বাধা থাকে না। সুতরাং বাবার পরলোক গমনের পর ছ'মাস যেতে না যেতেই মা আমার বিবাহের জন্যে একেবারে উঠে পড়ে লাগলেন।

আমার চেহারা কদাকার হলে কি হবে, আমার বাবার ব্যাঙ্কের খাতা, কোম্পানীর কাগজের তাড়া, পাঁচ সাত খানা বাড়ীর ভাড়া আমার রূপকে একেবারে ঢেকে ফেলে দিলে। পরমাসুন্দরী কন্যার পিতা পিতৃব্য ভ্রাতার দল প্রতিদিন আমাদের বাড়ীটাকে একেবারে বিবাহের হাটে পরিণত করলেন; পাঁচ হাজার থেকে কুড়িহাজার পর্য্যন্ত দর উঠ্‌তে লাগ্‌ল। মা কিন্তু ওসব দরদস্তুরের দিকে তেমন আস্থা প্রকাশ করলেন না—তিনি চান ভদ্রঘরের পরমা সুন্দরী লেখাপড়া গান বাজনা জানা বয়স্থা মেয়ে। তিনি যা চান, তা পাওয়া যাচ্ছে—অমন পাঁচ সাতটা মেয়ের বাপ উমেদারী করছেন, কিন্তু, আমার মায়েরও মনে হয় না, আর যাঁরা মেয়ের অভিভাবক তাঁদেরও মনে হয় না যে, মেয়ে বিক্রয়ের সামগ্রী নয়। মা যেমন সুন্দরী মেয়ে চান, সেই রকম সুন্দরী, বয়স্থা, লেখাপড়া জানা মেয়ে ত একটা জড়পিণ্ড নয়, বা আট বছরের মেয়ে নয়

—তারও ত ভালমন্দ জ্ঞান আছে, সেও ত স্বরূপ কুরূপ বোঝে! তারও ত হৃদয় ব'লে একটা পদার্থ আছে। এ কথাটা যেন কেউই স্বীকার করতে চান না।

আমি একদিন লজ্জাসরম ত্যাগ করে মাকে এই কথাটা বোঝাতে গিয়েছিলাম; তিনি আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের নজীর দেখালেন, রাধাকৃষ্ণের কথা বল্‌লেন;—অর্থাৎ তাঁর ছেলে যেন নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র, বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ। মায়ের চোখে তাঁর এই ছেলেটী হয় ত তাই-ই; কিন্তু আমিও জানি, দশজনেও দেখছে যে, আমার এই মসীনিন্দিত চেহারা কিছুতেই মদনমোহন হ'তেই পারে না।

মায়ের কাছে কত কথা বল্‌লাম, কত দৃষ্টান্ত দিলাম. কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারলাম না। শেষে বল্‌লাম, "তুমি যাই বল মা, আমি স্থির করেছি, এ জীবনে বিবাহ করব না।"

মা তখন তাঁর অমোঘ অস্ত্র কান্না আরম্ভ করলেন এবং তার চেয়েও গুরুতর কথা বল্‌লেন, আমি যদি বিবাহে সম্মতি না দিই, তা হ'লে তিনি অন্নজল ত্যাগ করবেন।

এটা যে বৃথা ভয় দেখানো, আমি প্রথমে তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু যখন দেখলাম, সত্যিসত্যিই উপবাস আরম্ভ করলেন, তখন আমার প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে গেল। আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, মাকে এমন অবস্থায় দেখা আমার পক্ষে অকর্ত্তব্য। আমি তখন মায়ের পা জড়িয়ে ধ'রে বললাম—"তুমি যখন আমার মনের কথা বুঝলে না, তখন তোমার যা ইচ্ছা তাই করতে পার। তুমি যাকে বিয়ে করতে বল্‌বে আমি তাকেই বিয়ে করব। দেখাশুনো, পছন্দ, ওসব হাঙ্গামায় আমাকে ফেল্‌তে পারবে না।"

মা আনন্দিত হ'লেন। তার পর তিনি নিজেই মেয়ে দেখে বেড়াতে লাগলেন। এই কলকাতা, সহরেরই এক বড় মানুষের সুন্দরী অষ্টাদশবর্ষীয়া শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির করে ফেল্‌লেন। দেনাপাওনা সম্বন্ধে মা কোন কথাই বল্‌লেন না, কন্যাপক্ষ সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত করলে তিনি বলে-ছিলেন—"আমি ছেলে বেচতে বসি নি, আমি মেয়েই চাই, আর কিছুই চাই নে।'

যাক্, ও কথা আর বাড়িয়ে কায নেই। তাঁর ঘরে যথাসময়ে তাঁর লক্ষ্মীর আবির্ভাব হল। যিনি এলেন, তাঁর নাম সুলোচনা। নামটা তাঁর বাপ-মা ঠিকই দিয়েছিলেন—তিনি সুলোচনাই বটে। কিন্তু সে আয়ত লোচনের দৃষ্টি আমার দিকে কি ভাবে পড়েছিল, সে কথা—

আজ চা'র বৎসর হল আমার বিবাহ হয়েছে। এ চার বৎসর যে কি ভাবে কেটেছে এবং আরও কত-দিন যে কি ভাবে কাট্‌বে,ভগবানই তা বল্‌তে পারেন।

এই দীর্ঘ চার বৎসরের মধ্যে কত যে কাণ্ড হ'য়ে গেল, আরও কত যে হবে, কে জানে? কতজনের কাছে যে কত কথা শুনি, নিজের চক্ষেও যে কত দেখি তার বিবরণ দিতে পারব না। আমি যা ভয় করে-ছিলাম, তাই হয়েছে, আমার জীবন একেবারে শ্মশান হ'য়ে গিয়েছে।

কাকে দোষী করব? সুলোচনাকে? কিছুতেই নয়। দোষ আমার—দোষ আমার দৃঢ়তার অভাবের। মায়ের চোখের জলকে আমি উপেক্ষা করতে পারি নি এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু, তার পর? সম্মুখে যে আরও অনেক দিন আছে, তার কি? আমি এখন বাবার কাছে যেতে চাই। কিন্তু সে ত আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। আত্মহত্যা? ছিঃ!

শ্রীজলধর সেন।

ফুল ঝুম্‌কা

আমার পূজ্য প্রমাতামহের
বৃদ্ধ প্রপিতামহ
কটকে ছিলেন 'নিমক দেওয়ান'
—চাকুরী কষ্টসহ।
অর্থ প্রচুর, সম্মান বহু,
কাযেই প্রিয়ার তরে
মুকুতা দোলানো ঝুমকা গড়ান্‌
স্বর্ণকারের ঘরে।
প্রতি মুক্তাটী সুন্দর, খাঁটী,
নিটোল চমৎকার,
দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন
নিশ্চয় প্রিয়া তাঁর।
প্রথম যেদিন প্রিয়ারে তাঁহার
দিলেন ঝুমকা জোড়া,
রোজনাম্‌চায় উল্লেখ নাই
—খুঁজিয়া দেখেছি মোরা।

তার পর গেছে সুদীর্ঘ কাল,
প্রীতির বারতা বহি
সে ফুল ঝুম্‌কা পেলেন ক্রমেতে
শেষে মোর মাতামহী
বহু ঝঞ্ঝাট অভাব গিয়াছে
তাহার উপর দিয়া,
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর,
ছয়টা মেয়ের বিয়া,
ঝুম্‌কা তবুও অটুট রয়েছে
বন্ধক হতে ফিরি,
স্বর্গবাসিনী আত্মীয়াদের
প্রেম আছে তারে ঘিরি।
যুগের যুগের নবীনা বধূর
রাঙা ঘোমটার ঘামে,
প্রেমের জোছনা প্রীতির সরিৎ
বক্ষে তাহার নামে।
প্রণয় ব্যবসা করিতে করিতে
সে পেয়েছে বুঝি প্রাণ
অতীত প্রেমের নির্ম্মাল্য সে,
কুলদেবতার দান।

ঝুমকা জোড়াটী যৌতুক পেলে
পরিশেষে মোর প্রিয়া,
শত বাসন্তী ফুলের পরশ
আদর সোহাগ নিয়া।
এখন হয়েছে আবার রঙীন
কৌটায় তার ঠাঁই,
স্বর্গবাসীর স্বর্ণমরাল—
তুলনা তাহার নাই।
ফুল ঝুমকায় প্রণয় যাঁদের
যাইতেছি 'যক্‌' দিয়া,
অংশ লভিয়া হাসিবে মোদের
নাতির নাতির প্রিয়া।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মন্দর দর্শন

ভাগলপুর জেলায় পুরাণ প্রসিদ্ধ মন্দরগিরি অবস্থিত। পৌরাণিক উপাখ্যান মতে দেবগণ বাসুকী নাগকে মন্থন রজ্জু এবং মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড করিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়া সুধা, চন্দ্র, লক্ষ্মী, ধন্বন্তরী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ইত্যাদি উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভাগলপুর ষ্টেশন হইতে একটী শাখা-লাইন বৌশী গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রেল লাইনের পার্শ্বেই মন্দর পর্ব্বত অবস্থিত। এই লাইনের শেষ ষ্টেশনটী

বৌশী গ্রামে অবস্থিত হইলেও ষ্টেশনের নাম "মন্দর হিল" (সংস্কৃত "মন্দার গিরি")। ইহার নিকটেই মধুসূদনের মন্দির। পূর্ব্বে এই মধুসূদন মন্দর পর্ব্বতের উপরে ছিলেন, পরে মুসলমানদের অত্যাচারে এই মন্দির ধ্বংস হইলে মধুসূদনকে বৌশীতে আনয়ন করিয়া এক নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং সেই হইতে এই মন্দিরেই তিনি অবস্থিতি করিতেছেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে কোন কার্য্য উপলক্ষে আমাকে ভাগলপুরে যাইতে হইয়াছিল, সেই সময় মন্দর পর্ব্বত ও মধুসূদন দর্শন ইচ্ছা হওয়ায় আমি আমার দৌহিত্র শ্রীমান খগেন্দ্রনাথ মিত্রকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করি। বেলা ৭টা ৫০ মিনিটের সময় মন্দারের গাড়ী ভাগলপুর ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া মন্দর অভিমুখে ধাবিত হইল। ভাগলপুর হইতে ইহার দূরত্ব ৩২ মাইল। সমস্ত পথই মগধ দেশের আম্রকানন খচিত কৃষিক্ষেত্রের অনুপম শোভা ও স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী দেখিয়া মন পরিতৃপ্ত হইল। বেলা ৯॥ টার সময় আমরা "মন্দর হিল" ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তীর্থস্থানের প্রথা অনুসারে গাড়ী হইতে অবতরণ মাত্র এক দল পাণ্ডা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল, এবং কি, নাম কোথায় বাড়ী ইত্যাদি প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। উহাদের মধ্যে হইতে এক জনকে আমাদের পাণ্ডা মনোনীত করিয়া মধুসূদন দর্শন করিতে গমন করিলাম। ষ্টেশনের অনতিদূরে মধুসূদনের মন্দির। আমরা পদব্রজে তথায় উপস্থিত হইলাম।

মন্দির প্রাঙ্গণ প্রাচীর বেষ্টিত। পূর্ব্ব দিকে সুন্দর ও বৃহৎ তোরণ দ্বার এবং তদুপরি নহবতখানা। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে ইষ্টক নির্ম্মিত গরুড়স্তম্ভ ও তদুপরি শ্বেত প্রস্তরের গরুড় মূর্ত্তি। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে মন্দির। মন্দিরটী দ্বিতল। উপরের তলে মধুসূদন বিরাজ করিতেছেন। নিম্নতলে ও দক্ষিণ পার্শ্বের বারান্দায় যাত্রীদিগের অবস্থিতির জন্য গৃহ নির্ম্মিত আছে। মধুসূদন শ্বেত প্রস্তরের বেদীর উপর শ্বেত মর্ম্মর সিংহাসনে উপবিষ্ট সুন্দর কৃষ্ণ প্রস্তরের মূর্ত্তি। উপরে চন্দ্রাতপ বিস্তৃত। মন্দিরের উচ্চতা অধিক নহে। এখানে পূজার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। যিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই দিতে পারেন। পাণ্ডাদের কোন অত্যাচার নাই। আমরা যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী ও পূজা প্রদান করিয়া বেদী প্রদক্ষিণ করিলাম, পরে নীচে নামিয়া বিশ্রাম অন্তে প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। মন্দির প্রাঙ্গণ বৃহৎ নহে। মন্দিরের উত্তরে একটী ইষ্টকালয় অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

মধুসূদনের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এই বিশ্বজগৎ জলমগ্ন ছিল এবং ভগবান নারায়ণ যোগনিদ্রায় অভিভূত, তখন তাঁহার কর্ণ বিবর হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুইটী অসুর জন্ম গ্রহণ করে।

"দৈনন্দিন তু প্রলয়ে প্রসুপ্তে গরুড়ধ্বজে।
তস্য শ্রবণবিড়্ জাতাবসুরৌ মধুকৈটভৌ॥"

এই অসুরদ্বয় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ভগবান বিষ্ণু উহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং দশ সহস্র বৎসর যুদ্ধের পর উহাদিগকে বিনষ্ট করেন। অসুরদ্বয় বিনষ্ট হইলেও উহাদের মস্তকহীন দেহ পুনঃ পুনঃ কম্পিত ও ভূপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হওয়ায় ভগবান ঐ দেহের উপর মন্দর গিরি স্থাপন করেন এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আপনার চরণদ্বয় ঐ পর্ব্বতোপরি স্থাপন করিয়া দেহ নিশ্চল করেন। মধু দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন এই জন্য ভগবানের এক নাম মধুসূদন। তিনি মধুসূদনরূপে সর্ব্ব সময়ে এই পর্ব্বতে বিরাজিত এইজন্য এই পর্ব্বতের মাহাত্ম্য অধিক। মথুরায় যেমন শ্রীকৃষ্ণ, নীলাচলে যেমন জগন্নাথ, এবং নাসিকে যেমন রামচন্দ্র— সেইরূপ মন্দরে মধুসূদনের প্রতিষ্ঠা কোন অংশে কম নহে।

"দোলায়মানগোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং।
রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

অতঃপর আমরা মন্দির দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া মন্দর গিরি দর্শন জন্য একখানি গোযান ভাড়া করিয়া যাত্রা করিলাম। মন্দির হইতে পর্ব্বত প্রায় দুই মাইল ব্যবধান। ডিষ্ট্রীক্‌ট বোর্ডের একটী পাকা রাস্তা পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ভাগলপুর জেলার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান দ্রষ্টব্যই এই মন্দর গিরি। এটী একটী সপ্ত শৃঙ্গ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র পর্ব্বত। ইহার পূর্ব্ব দিকের শৃঙ্গটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং ইহাই পুরাণ বর্ণিত "মন্দার গিরি"। ইহার উচ্চতা প্রায় ৭০০ ফিট্। এই পর্ব্বতটী বেহারের অন্যান্য

পর্ব্বতমালার ন্যায় কৃষ্ণ শিলাময় অর্থাৎ গ্র্যানিট্ প্রস্তরে গঠিত। এই গিরিশ্রেণীর সমস্ত অংশই পাদপশূন্য, কেবল পূর্ব্ব দিকে ও পর্ব্বত-শিখরে সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল দেখিতে পাওয়া গেল। অনেকগুলি ক্ষুদ্র জলাশয় এই পর্ব্বতের উপর স্থানে স্থানে আছে দেখিলাম। পর্ব্বতে উঠিবার জন্য পর্ব্বত গাত্রে ছোট ছোট সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সোপান শ্রেণী পর্ব্বতের প্রায় অর্দ্ধেকের উপর পর্য্যন্ত গিয়াছে। পর্ব্বতের পাদদেশে একটী হ্রদ বা পুষ্করিণী আছে। ইহার জল অতি পরিষ্কার। পাহাড় ভেদ করিয়া এই জল বহির্গত হইতেছে। এই খানে একদিন উপবাস করিয়া পরদিন এই হ্রদে স্নান করিলে মানব আত্মীয়বর্গ ও বন্ধু বান্ধব সহ সমস্ত পাপ ও ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। এই হ্রদে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় ইহাই সাধারণের বিশ্বাস।

আমরা সোপান বাহিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিলাম। কতক দুর উঠিলে এই পর্ব্বতের অঙ্গ বেষ্টন করিয়া একটি সর্পের রেখা অতি কদর্য্য ভাবে কাটা আছে দেখিতে পাইলাম। পাণ্ডারা ইহাকে বাসুকীর অঙ্গচিহ্ন বলিয়া যাত্রিগণকে দেখাইয়া থাকে।

এই সোপানশ্রেণী যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে একটী কুণ্ড দেখিলাম। এই কুণ্ডটী ·· ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। ইহাকে স্থানীয় লোকে "সীতা কুণ্ড" বলে। উহাদের বিশ্বাস যখন রামচন্দ্র সীতা দেবীর সহিত বনে গমন করেন, তখন তাঁহারা কিছু দিন এখানে বাস এবং এই কুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম "সীতা কুণ্ড" হইয়াছে। এই সীতাকুণ্ডের উত্তর তীরে মধুসূদনের প্রাচীন মন্দির অবস্থিত ছিল। ইহা এক্ষণে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। এরূপ কিম্বদন্তী যে মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় যখন মন্দির ধ্বংস করিতে অগ্রসর হন, তখন মধুসূদন লম্ফ প্রদান করিয়া এই সীতাকুণ্ডে আত্মগোপন করেন। বহু বৎসর পরে এক পাণ্ডার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইলে সেই পাণ্ডা ঐ বিগ্রহকে কুণ্ড হইতে উঠাইয়া বৌশী গ্রামে আনয়ন করেন এবং তথায় জমিদারের সাহায্যে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই হইতে মধুসূদন এই মন্দিরে অবস্থিতি করিয়াছেন।

সীতা কুণ্ডের উত্তর দিকে আর একটী কুণ্ড আছে, উহা শঙ্খকুণ্ড নামে অভিহিত। এই খানে শঙ্খাসুর নামে এক দুর্জ্জয় অসুর বাস করিত। এই অসুরকে বধ করিয়া ভগবান উহার অস্থি হইতে দিব্য পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রস্তুত করিয়া স্বীয় হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার আরও কিঞ্চিৎ উত্তরে একটী ক্ষুদ্র ঝরণা আছে, উহা আকাশ-গঙ্গা নামে কথিত। উহার জল অতীব স্বচ্ছ। তিন ফিট্ গভীর একটী গহ্বর সর্ব্বদাই এই জলে পূর্ণ থাকে। আকাশ গঙ্গার বাম দিকে পর্ব্বত গাত্রে মধু দৈত্যের বিরাট মূর্ত্তিও অঙ্কিত আছে। উহার ১৫ ফিট্ নিম্নে একটী গম্বুজাকার গুহা আছে। গুহায় প্রবেশ জন্য একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। গুহায় নৃসিংহ দেবের মূর্ত্তি এবং নিকটে প্রহ্লাদ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রামচন্দ্র প্রভৃতি মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ইহার নাম "নৃসিংহ গুহা"। এই পর্ব্বতের শীর্ষদেশে একটী বুদ্ধ মন্দির আছে, জৈনগণ ভক্তিভরে তথায় পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

এই সমস্ত দেখিয়া আমরা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলাম। এই মন্দার গিরি যে তীর্থ মাহাত্ম্যেই প্রসিদ্ধ তাহা নহে। এখানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের দেখিবার ও অনুসন্ধান করিবার অনেক জিনিস আছে। এই পর্ব্বতের তলদেশে ও চতুর্দ্দিকে ২ মাইল মধ্যে অসংখ্য পুষ্করিণী, বহু পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকা, কতিপয় প্রস্তর মূর্ত্তি, এবং কয়েকটী সুগভীর কূপ বিদ্যমান থাকিয়া এক সময়ে এই স্থানে যে একটী প্রাচীন নগর ছিল তাহারই পরিচয় দিতেছে। এই প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরটীর নিকটেই বর্ত্তমান বৌশী গ্রাম সংস্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে প্রাচীন সহরে ৫২ বাজার, ৫৩ রাস্তা, এবং ৮৮টী পুষ্করিণী ছিল। পর্ব্বতের পাদদেশে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা ছিল, তাহাতে চতুষ্কোণাকৃতি প্রায় এক সহস্র গহ্বর ছিল। দীপান্বিতা পর্ব্বের সময় নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসিগণ প্রত্যেকে এক একটী প্রজ্জ্বলিত দীপ ঐ সমস্ত গহ্বরে রক্ষা করিত। গৃহ এক্ষণে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই অট্টালিকার প্রায় ১০০ গজ দূরে আর একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সুবৃহৎ ও সুন্দর অট্টালিকা ছিল। এরূপ কিম্বদন্তী যে এই অট্টালিকা চোল রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই রাজা দ্বাবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। কিরূপে ও কি

অবস্থায় এই নগর ও মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা জানা যায় না, তবে সকলেই অনুমান করেন যে কালাপাহাড় কর্ত্তৃকই এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

এই প্রাচীন জনপদ ও মেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে প্রবাদ এখানে প্রচলিত আছে এবং কর্ণেল ফ্র্যাঙ্কলিন ও হাণ্টার সাহেব প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিকগণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাই এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

কাঞ্চীপুর নামক স্থানে চোল নামক একজন প্রবল-প্রতাপ রাজা ছিলেন। তিনি দৈব নিগ্রহে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে তীর্থ ভ্রমণের উপদেশ দেন। তদনুসারে তিনি ভারতের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন, কিন্তু কোন তীর্থেই উপকার প্রাপ্ত হন না। অবশেষে তিনি মন্দরে উপস্থিত হন এবং এই শৈলতলস্থ জলাশয়ে অবগাহন করিয়া দেখিতে পান যে তাঁহার কুষ্ঠ জনিত ক্ষত সকল অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি এই জলাশয়টিকে বিস্তৃত ও সুগভীর করিয়া খনন করেন এবং উহার পূর্ব্বনাম "মনোহর কুণ্ড" পরিবর্ত্তন করিয়া "পাপ হারিণী" নাম দেন। চোল রাজা এইরূপে ব্যাধিমুক্ত হইলে তিনি এই স্থানের নিকট তাঁহার রাজধানী মনোনীত করিয়া এক সুবৃহৎ নগর নির্ম্মাণ করেন এবং বহু অর্থব্যয় করিয়া উহার শোভা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করেন। তিনি পর্ব্বতের উপর বহুবিধ মর্ম্মর মূর্ত্তি, প্রস্তরের মন্দির, বৃহৎ পুষ্করিণী এবং সুগভীর কুণ্ড খনন করিয়া দিয়াছিলেন। পর্ব্বত গাত্রে সে সর্পরেখা দেখা যায় তাহাও তিনিই অঙ্কিত করেন। পর্ব্বত গাত্রে যে সোপানশ্রেণী নির্ম্মিত আছে তাহাও তাঁহারই কর্ত্তৃক প্রস্তুত, এইরূপ লোকের বিশ্বাস। সোপান পার্শ্বে একটী শিলালিপি খোদিত আছে, উহা পাঠ করিয়া পণ্ডিত গণ বলিয়াছেন যে ঐ সোপানশ্রেণী ভৈরব নামা একজন বৌদ্ধ রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন যে এই লিপি সিঁড়ি নির্ম্মাণসূচক নহে, উহা কোন এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপক। এক্ষণে কোনও মূর্ত্তি এখানে নাই, কিন্তু ইতস্ততঃ অনেক ভগ্ন মূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ অবস্থায় পতিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি বোধ হয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক স্থানচ্যুত ও বিচূর্ণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

চোল রাজা যেদিন ব্যাধিমুক্ত হন ঐ দিন পৌষ সংক্রান্তি ছিল। সেই জন্য রাজা ঐ দিনে এক মেলার সৃষ্টি করেন। এখন পর্য্যন্ত এই প্রথা আছে যে বৎসরে একবার পৌষ সংক্রান্তির দিন মধুসূদন বিগ্রহকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া শোভাযাত্রা পূর্ব্বক বৌশী হইতে মন্দর গিরির তলদেশে আনয়ন করিয়া ছত্রপতি নির্ম্মিত তোরণস্থ দোলমঞ্চে রক্ষা করা হয়। এই সময় যাত্রিগণ "মঞ্চস্থং মধুসূদনং" দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও সৌভাগ্যশালী মনে করেন। অপরাহ্নে মধুসূদনকে পুনরায় শোভাযাত্রা করিয়া বৌশীতে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ দিন হইতে পক্ষকাল ব্যাপী এক মেলা এইখানে বসিয়া থাকে এবং এই মেলায় ৩০।৪০ সহস্র লোকের সমাগম হয়।

স্থানীয় প্রবাদ যে, পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই পর্ব্বতোপরি বহু বৎসর নারায়ণের তপস্যা ও আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপ শেষ হইলে তিনি পূর্ণাহুতি প্রদান জন্য হোমাগ্নিতে পান ও সুপারি অর্পণ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত সুপারি অগ্নিতে দগ্ধ না হইয়া পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া নিম্নস্থ হ্রদে পতিত হয়। সেই হইতে ইহার জল পবিত্র ও ব্যাধি মুক্তিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। সেই সময় হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিগণ মৃতদেহ সকল এই হ্রদের তীরে আনয়ন করিয়া দাহন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার ঐ সকল মৃত দেহ জলে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়। মেলার পূর্ব্বে এই হ্রদ একবার পরিষ্কার করা হয়।

পূর্ব্বে যে চোল রাজার প্রাসাদের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অনতিদূরে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত তোরণ দ্বার বর্ত্তমান। এইখানে সংস্কৃত ভাষায় যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তাহা পাঠ করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই তোরণ রাজা ছত্রপতি সিংহের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণার জন্য নির্ম্মিত এবং মধুসূদনকে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এই নগর ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিল তাহাও তাঁহারা বলেন। সকলেই অনুমান করেন যে মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক যখন এই মন্দির ও নগর ধ্বংস হইয়াছিল, সেই সময় হইতে হিন্দু ও মুসলমানদের পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষে এই স্থানটী ক্রমেই পরিত্যক্ত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মধুসূদনের মন্দির ধ্বংসের পর বিগ্রহ বৌশীতে আনয়ন করিয়া নূতন

মন্দিরে স্থাপন করা হয়। সুবলপুরের বর্ত্তমান জমিদারগণ বলেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত রাজা ছত্রপতি সিংহের বংশধর। যখন ঐ স্থানটী অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত হয় তখন বিগ্রহ বৌশীতে আনীত ও প্রতিষ্ঠিত হন।

এই তীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বরাহ পুরাণে শ্রীভগবান স্কন্ধকে বলিতেছেনঃ—"শুন স্কন্ধ, পৃথিবীতে যতগুলি পবিত্র ও মাহাত্ম্যপূর্ণ তীর্থ আছে তন্মধ্যে মন্দার গিরিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই স্থানে আমি মধু কৈটভকে সংহার করায় সকল দেবগণ মিলিত হইয়া আমার জয়গান করিয়াছিলেন, এইখানে পবিত্রাত্মা মুনিগণ বাস করিয়া সতত আমার ধ্যান ও তপ করিয়া থাকেন, এইখানে আমার প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবী সতত বাস করেন। এই হেতু মন্দারের স্থায় কোন তীর্থই উন্নত বা পবিত্র নহে।"

মন্দরগিরি দর্শন করিয়া অতঃপর আমরা বৌশী গ্রামে প্রত্যাগমন করিলাম। এই বৌশী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে পূর্ব্বে ভাগলপুর জেলার একটী সাবডিবিজন বা মহকুমা ছিল। ১৮৬৩ খৃঃ অঃ এই মহকুমা স্থানান্তরিত হইয়া বাঁকা নামক স্থানে উঠিয়া গিয়াছে। এখন এখানে একটী ডাক বাংলা, লছমাপুর এষ্টেটের সাহায্য প্রাপ্ত একটী বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয়, একটী ডাকঘর ও একটী ক্ষুদ্র বাজার আছে। স্থানটীর স্বাস্থ্য ভাল এবং জল হাওয়াও উত্তম। এই জন্য ভাগলপুরের কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল এখানে সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। খাদ্যাদি তাদৃশ দুষ্প্রাপ্য নহে। মিষ্টান্ন কেবল বাতাসা ও পেঁড়া ভরসা। এখানে একজন ভদ্রলোক স্থায়িভাবে বাস করিতেছেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তিনি পূর্ব্বে ভাগলপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে কার্য্য করিতেন, সম্প্রতি পেন্‌সন্ লইয়া এখানে বসবাস করিতেছেন। তিনি অতিশয় অমায়িক, নিরহঙ্কার ও সদালাপী। তিনি সকলকেই সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া অতিথি সেবা করিয়া থাকেন। আমরা ইঁহার বাটীতে চা পান করিয়া বাজার পরিদর্শন করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম এবং সাড়ে পাঁচটার গাড়ীতে উঠিয়া সন্ধ্যার পর ভাগলপুরে প্রত্যাগমন করিলামন।

আমরা যে দিন বৌশী গিয়াছিলাম, সেদিন রেল কোম্পানির পক্ষ হইতে অনেকগুলি লোক জরিপ কার্য্য জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে মন্দর হিল রেলওয়ে বিস্তৃত হইয়া বৈদ্যনাথধাম ষ্টেশনে কর্ড লাইনের সহিত সংযুক্ত হইবে। এরূপ আশা করা যায় যে সম্বৎসরেই এই কার্য্য শেষ হইবে।

দেওঘর বা বৈদ্যনাথধাম হইতে প্রত্যহ মোটর লরি মন্দরে যাতায়াত করিতেছে। ভাড়া ২৲।

শ্রীহরিচরণ বসু।

এত তুমি দিলে

এত তুমি দিলে,
দেবতা করিয়া মোরে যেন নিবেদিলে,
তোমার নিখিল বিশ্ব, আকাশ, আলোক,
শ্যামল সুষমা ভরা এই বসুলোক!
'কুসুমের কোমল বয়ান,
স্নিগ্ধ নীল উৎপল নয়ান
ভাবে ভরা ভাষার অতীত বাণী তার,
লিখে দিল চিত্ত-লোকে প্রেম বারতার
বিচিত্র অমরাবতী—
চির ভালবাসা ভরা আঁখির মিনতি!

কিবা দিব আমি,
হে বল্লভতম মোর, হে দয়িত স্বামী,—
তোমা সাথে কি আমি করিব বিনিময়?
ধেয়ান, চেতনা-দীপ্ত-চিত্ত নিরাময়!
আমার সকল ভালবাসা,
হার মানে যেথা সব আশা,
স্তব যেথা মৌনতার আদিম মূরতি!
নেত্রে বহে আলোকের অন্তিম আরতি!
সন্ধ্যার অম্বর সম,
নিতান্ত নির্ব্বাক্ যার বাণী শ্রেষ্ঠতম।

পাটনা—
১৩।৩।২৯

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

আলো আঁধার

(গল্প)

"হ্যাঁ মা, কৈ আমাদের কলকাতায় যাওয়া হ'ল না ?" বলিয়া প্রকৃতি তার জননী সৌদামিনীর মুখের উপর জিজ্ঞাসু নয়ন স্থাপিত করিল।

"তোর দাদার একটা কিছু কায-কর্ম্ম জুটলেই চলে যাব। কি ভেবে দেশে এলাম, আর কি পেলাম !"

"তুমি ত তিরিশ বছর পরে নিজের দেশে এসেছ বল —তবুও দেশের লোক গুলো আমাদের তাড়াতে পারলে যেন বাঁচে ! তাদের ত আমরা কোন অপকার করি নি মা ?"

"কে বল্লে করিনি ? এত দিন ত তারাই আমাদের বাগান-বেড়-পুকুরের মালিক হ'য়ে ছিল। এখন তা'দের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে, তারা রাগবে না ? নিজের জিনিস একবার পরের হাতে গেলে তা বড় সহজে উদ্ধার হয় না রে।"

তিরিশ বৎসর পর স্বামী-শোকে বিহ্বলা বিধবা সৌদামিনী পশ্চিমের বসবাস একেবারে উঠাইয়া দিয়া আজ ছয় মাস হইতে চলিল দেশে নিজ জীর্ণ বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। অস্থিপঞ্জরসার পতনোন্মুখ বাড়ীখানির বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সম্পূর্ণ সংস্কার করিয়াছেন।

তিরিশ বৎসর পশ্চিমাঞ্চলে থাকিয়া ইঁহাদের চাল চলন আচার ব্যবহার অনেকটা সেই দেশের মত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং এখানকার মত চলিতে পদে পদে বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল। তাঁহাদের সমস্তই যেন নূতন বলিয়া মনে হইতেছিল। আর অভ্যাস বশে চলিয়া তাঁহারা গ্রামে উপহাসাস্পদ হইতেছিলেন। দেশের লোকের নিকট তাঁহাদের আচরণ কোনও দিক দিয়া থাপ্ খাইতেছিল না। এমন কি প্রথম প্রথম তাঁহাদের হিন্দীতে অনেক সময় কথা বলা শুনিয়া, গ্রামের লোকেরা হাসি বিদ্রূপ করিত। ইঁহাদের কণ্ঠস্বরকে ব্যঙ্গ করিতে তাহারা সদা আনন্দ অনুভব করিত। এইরূপ অকরুণ ও অনাত্মীয়ের মত ব্যবহার সৌদামিনী ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণের মনে অত্যন্ত ব্যথা দিত। এমন কি গ্রামের মাতব্বরেরা সৌদামিনীর একটী ব্রতের ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণে পর্য্যন্ত আসিলেন না—অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে কেশহীন মস্তক চুলকাইয়া যে অভিমত প্রকাশ করিলেন, তাহা মোটামুটি এই যে, বিদেশে দীর্ঘকাল বসবাস করার হেতু ইঁহারা একরূপ ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং ইঁহাদের অনাচারের জন্য তাঁহারা ত আর সনাতন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পারেন না।

এই সকল কারণে সৌদামিনী স্বামীর বাস্তুভিটায় কষ্ট করিয়া টিকিয়া থাকিবার মত কোন প্রলোভনই দেখিতে পাইলেন না। সব চেয়ে তাঁর অধিক চিন্তার কারণ হইল তাঁহার বয়স্থা কন্যা দুইটির বিবাহ দেওয়ার ব্যাপার লইয়া। বড় মেয়ে প্রকৃতির বয়স ষোল অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ছোট মেয়ে ছায়া তার দিদির অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। বড় ছেলে বনবিহারীর বয়স ২৩।২৪ হইবে। ছোট ছেলে কাননবিহারী তার দাদার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট।

সৌদামিনীর স্বামী বেশ মোটা মাহিনার চাকরী করিতেন। তিনি যখন পশ্চিমে যান, তখনকার দিনে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল। ৩২ সের দুধ টাকায়। উৎকৃষ্ট ঘিয়ের সের বার আনা। সুতরাং মাহিনার অনেক টাকা বাঁচাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন, অত্যন্ত বে-হিসাবী ও খরুচে মানুষ। সেজন্য বেশী কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। নিজেদের বাসের জন্য পশ্চিমে একখানি বাড়ী ও বাগান করিয়াছিলেন। সৌদামিনী দেশে আসিবার সময় উহা ভাড়া দিয়া আসিয়াছেন।

বিধবা দেশে আসিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। দেশের সঙ্কীর্ণমনা পল্লীবাসিগণ তাঁহাদের প্রতি কোন রূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিল না। সুতরাং দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় বাসা করাই সৌদামিনী শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

এমনি করিয়া এই শান্তিপ্রিয় নবাগত বিধবা চতুর্দ্দিকে হইতে বিনা কারণে প্রতিবেশীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের দেশে অবস্থিতিকে অনাবশ্যক ও তাঁহাদিগকে সর্ব্বদিক দিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সৌদামিনী দেখিলেন, তাঁহার স্বামীর ভিটায় তিনি অপরিচিতের মতই। সুতরাং সে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে তিনি মর্ম্মাহত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া উঠিতেছিলেন।

সৌদামিনীর মনে পড়িল কত দিন বাঙালার পবিত্র ও পূর্ণ শ্রীর কথা গর্ব্ব করিয়া পশ্চিমবাসীদের নিকটে বলিয়া নিজদেশের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান অকুণ্ঠিত ভাবে আদায় করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আজ তাঁহারই নিজ অভিমত তাঁহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার কিছু দিন পরে বনবিহারীর কলিকাতায় একটী চাকরী হইল। সৌদামিনী আর একদণ্ড বিলম্ব না করিয়া দেশ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা ভবানীপুর অঞ্চলে বাসা করিলেন। এখান হইতে তাঁহার নিত্য গঙ্গাস্নানেরও সুবিধা হইল।

ছায়া ডাকিল, "দিদি!"

প্রকৃতি উত্তর দিল, "কেন?"

"তুমি আজ-কাল যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ। একলা চুপ ক'রে ব'সে থাকতে কষ্ট হয় না?"

"তোর এক কথা, শুনলে হাসি পায়। বসে থাকলে বুঝি আবার কষ্ট হয়?"

"মুখ বুজে বুঝি কেউ বসে থাকতে পারে?"

"কেউয়ের সঙ্গে তো আমার কোন সম্বন্ধ নেই—তারা না পারলেও আমি পারি।"

"তোমার এ কথার মানে হয় না।"

"আজ কাল সব কথার যে মানে উলটে গেছে—তা বুঝি তুই জানিস না?"

"কথার মানে বুঝি কোনো দিন আবার বদলে যায়?"

একটী গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রকৃতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর কি ভাবিয়া সেখান হইতে হঠাৎ সে উঠিয়া গেল।

এমনই করিয়া অর্দ্ধপথে—অসমাপ্ত ভাবেই আজ কাল প্রকৃতির কথা, হাসি, উৎসাহ, আনন্দ, উচ্ছ্বাস কেমন স্তব্ধ হইয়া পড়ে। সে যেন বাড়ীর সকলের সঙ্গে সমান ভাবে পা ফেলিয়া পূর্ব্বের মত চলিতে পারে না। এই না পারার কারণ কি তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই কিংবা করিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করে নাই।

গঙ্গার ঘাটে সৌদামিনীর অনেক বন্ধু জুটিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের সহিত বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। তাঁহারা মোটর পাঠাইয়া প্রায় দুপুরে, সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। সেই সঙ্গে প্রকৃতি ও ছায়া যায়। খুব মেলা-মেশা চলিয়াছে। দেশের লোকদের নিষ্ঠুর আচরণের দরুণ মনস্তাপ কলিকাতায় আসিয়া দূর হইয়াছে। সৌদামিনীও মাঝে-মাঝে তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। পশ্চিমের অনেকখানি হাওয়া কলিকাতার ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাহিত দেখিয়া সৌদামিনী অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন ও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে হরিহরবাবু ব্যারিষ্টার এ অঞ্চলের মধ্যে প্রসিদ্ধ বড় লোক। তাঁহার স্ত্রী প্রভাবতীর সহিত সৌদামিনীর অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছে। যেন দুটি সহোদরা বলিয়া মনে হয়। প্রভাবতীর দুই ছেলে। একটী কলেজে পড়ে, অপরটি যাহার নাম শৈলেন্দ্র - সে ব্যবসা করে।

ছায়া মেয়েটিকে প্রভাবতীর খুব ভাল লাগিয়াছে। যেমন অসামান্য সুন্দরী, তেমন অপরিসীম গুণ। লেখা-পড়াও জানে। মেয়েটিকে নিজ পুত্রের সহিত বিবাহ দিবার কথা এক দিন স্বামীর নিকট প্রভাবতী পাড়িলেন।

হরিহরবাবু যেন হাত বাড়াইয়া আকাশ পাইলেন। তিনি বলিলেন, "জান প্রভা— তোমাকে এতদিন লুকিয়েছিলেম—আমার বন্ধু রমেশ, যার মেয়ের সঙ্গে আমাদের খোকার বিয়ের কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়েছিল।"

হরিহর তাঁ'র বড়ছেলেকে খোকা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।

প্রভাবতী বলিল, "সে কথা ত আমাকে বলেছিলে। কিন্তু তাদের কথার ভাব দেখে আমার মনে হয়েছিল

যেন জোর করে আমরা তাদের গায়ে গিয়ে পড়ছি। সেজন্য বড় কিছু জিজ্ঞাসা করতাম না। তার পর আমাদের ত আর মেয়ে নয় যে বিয়ে এখন না হলে চলবে না।"

"সে কথা কে না জানে? কাল রমেশ আমাকে খুব অনুনয় করে বল্‌লে কি শুন্‌বে? সে কথা শুনে পর্য্যন্ত আমার গায়ের মধ্যে রিঃ রিঃ করছে।"

স্বামীর কথায় বাধা দিয়া প্রভাবতী উত্তর করিল, "বল্লে তার স্বর্গের পরী-কন্যার সঙ্গে আমার শৈলেন্দ্রের বিবাহ হ'তে পারে না—এর বেশী আর কি শুনব?"

"ঐ কথাই বটে, তবে একটু ঘুরিয়ে—একটু মোলায়েম করে। আসল ব্যাপার কি জান? কোথাকার এক বড় জমিদারের ছেলের সঙ্গে ভেতরে ভেতরে সব ঠিক করেছে। কেবল বড় মানুষী চাল।"

"সে কথা যেদিন তার স্ত্রীকে দেখেছি, সেই দিনই বুঝেছি।"

"দেখ প্রভা, যে কোন উপায়ে তার মেয়ের বিয়ের আগে আমাদের খোকার বিবাহ দিতেই হবে, এ মান তোমাকে রক্ষা করতেই হবে।"

প্রভাবতী এক গাল হাসিয়া উত্তর করিল, "বটে, এতটা?"

"ঠাট্টা করছ প্রভা?"

"ছিঃ তা কি পারি? এতদিন মহাশয়ের মান আমি ত রক্ষা করে আসছি। সে জন্য কোন চিন্তার কারণ নেই। এখন কি করতে হবে হুকুম হোক্‌।"

"কিন্তু আজই সব ঠিক করা চাই। আমরা টাকা চাই না। শুধু ছায়া মেয়েটিকে চাই, বুঝলে?"

"তা যেন সব হ'ল। কিন্তু আমার ঘট্‌কালী ফাঁকি দেবে না ত?"

"কোন আশঙ্কা নাই। হাতী চিরদিনই দুয়ারে বাঁধা থাকবে একথা স্পর্দ্ধা করে বলছি।"

"যাও। ভারি এক কথা শিখেছ!"

"সত্যি কথা বল্‌লাম—তবে শোন আর না শোন সে হচ্ছে তোমার হাত।"

প্রভাবতী হাসিয়া উত্তর করিল "এখন সত্যি কথার বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে—শৈলেন্দ্রের সঙ্গে ছায়ার বিবাহ যত শীঘ্র সম্ভব হওয়া চাই।"

"কথা ঐ বটে তবে একটুখানি গোল করেছ। রমেশের মেয়ের বিয়ের পূর্ব্বে খোকার বিবাহ হওয়া চাই।"

"মনে কর যদি তারা অত তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হ'তে না পারে।"

"এর পারা-পারির কি আর প্রকাণ্ড ব্যাপার আছে? আমরা তাদের কাছে ত এক পয়সাও নিচ্ছি না।"

"টাকা না নিলেও অন্য অনেক ব্যাপার ত আছে।"

"ঘটকালী কাযটা ত আর জলের মত সোজা নয়; তা হ'লে আর তোমার মত পাকা ঘটকীর আশ্রয় নেবো কেন?" বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

এবার প্রভা মুখখানি যথা সম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিল, —"দেখি আপনাদের পাঁচজনের কৃপায় যদি ব্যবসাটা ভবিষ্যতে ভাল করে চালাতে পারি।"

"বর্ত্তমানে বিশ্বাস রেখে চলাই হচ্ছে ভাল। ভবিষ্যৎকে কোন দিন বিশ্বাস করতে নেই—সে যতই সুন্দর হোক না।"

"ব্যারিষ্টার সাহেবের নিকট যখন পরামর্শ নিতে যাব তখন দেখা যাবে।"

হরিহরবাবু প্রভার হাত দুটি নিজ হাতের মধ্যে অত্যন্ত আগ্রহভরে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "রমেশের অপমানের প্রতিশোধ যতক্ষণ না দিতে পারছি ততক্ষণ পৃথিবী আমার চক্ষে অন্ধকার হয়ে থাকবে জেনো প্রভা।"

"আমাদের অপমান তোমরা নিজেদের অপমান মনে করতে কোন দিনই পার না তা জানি। কিন্তু, তোমাদের এতটুকু অপমান করলে আমরা অনায়াসে প্রতিশোধের জন্য প্রাণ দিতে পারি।" বলিতে বলিতে প্রভার দুই চক্ষু অশ্রুভারে টল টল করিতে লাগিল।

হরিহর প্রভাকে বক্ষের নিকট টানিয়া লইয়া বলিলেন, "রাগ কর্‌লে প্রভা?"

"ইচ্ছা কর্‌লেও রাগ করতে পারি কৈ?"

সৌদামিনী বলিলেন, "কেমন করে সম্ভব হয় বলুন? আমাদের অবস্থার কথা ত আপনার অজানা নেই।"

"সব সময় অবস্থার কথা খাটে না। অবস্থা হচ্ছে জোয়ারের জলের মত, তার স্থায়িত্ব কোন দিনই নেই।

সুতরাং তা' নিয়ে বিচার করা চলে না। আমরা শুধু ছায়াকে নিয়ে যেতে চাই।"

"কিন্তু—"

"দিদি, 'কিন্তু' এখানে কোন মতেই চলতে পারবে না। আপনিও ছেলের মা, আমিও ছেলের মা। সুতরাং আমাদের কোন কথা বোঝবার পক্ষে মোটেই আটকাবে না।"

"ভাববেন না, আমি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি। ছায়ার অদৃষ্ট তার প্রতি যে এতটা প্রসন্ন হবে কোন দিন স্বপ্নেও তা ভাবিনি; তবে যা সত্যি সেই কথাটাই শুনতে বলছি।"

"যদি বলি সে কথা আমার শোনা আছে এবং তার যা কিছু প্রতিকার করা প্রয়োজন, তার ভার আমার। তা হ'লে এখন আমার কথাই আপনার শোনবার দরকার কি না বলুন?"

"আপনি যদি অমাবস্যার অন্ধকারে পূর্ণিমার আলোক ফোটাতে চান—তা হ'লে আমার কিছুই বলবার নেই।"

"একটা কথা বলি শুনুন, আমার ছেলের বিবাহ সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল আমার স্বামীর এক বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে। ছেলে গিয়ে মেয়ে দেখে পর্য্যন্ত আসে। সে মেয়ে তার ভারী পছন্দ হয়েছে, সে কথাও সে তার বন্ধুবান্ধবের মুখ দিয়ে জানিয়েছে।"

তাহার কথায় বাধা দিয়া সৌদামিনী বলিলেন, "এর চেয়ে আর সুখের কি হ'তে পারে! সেই খানেই ব্যবস্থা করুন, নইলে ছেলে সুখী হ'তে পারবে না।"

প্রভাবতী হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা একশোবার ঠিক। এখন কথা হচ্ছে তাঁরা কোনও পয়সাওয়ালা জমিদারের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ পাকা করে ফেলেছেন। একথা ছেলে শুনে পর্য্যন্ত পাগলের মত হ'য়ে উঠেছে। কর্ত্তার কয় দিন একেবারে খাওয়া নেই বল্লেই হয়। এত বড় অপমান কেউ কোনও দিন তাঁকে করতে পারে নি।" বলিয়া প্রভা একটি সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

"বলেন কি? তারা ভদ্রলোক? কথা দিয়ে কথা ফিরিয়ে নেন! কিন্তু আপনার ছেলের কি ছায়াকে পছন্দ হবে দিদি?"

"তার খুব পছন্দ হ'য়েছে। সে দিন ছায়া যখন আমাকে গান শোনাচ্ছিল, তখন শৈলেন বাড়ী ছিল, আমি তা জানতাম না। পাশের ঘরে বসে বসে সে গান শুনেছিল। তারপর বলেছিল, মা মেয়েটি চমৎকার গান গায় ত! রীতিমত না চর্চ্চা করলে, না শিখলে এমন সুন্দর করে গাওয়া যায় না। তারপর ছায়াকে ডেকে শৈলেনের ঘরে নিয়ে গিয়ে বল্লাম—ছায়া, তোমার গানের খুব প্রশংসা করছিল শৈল। সে মাথা নীচু করে মৃদুস্বরে বল্লে—"অনেকদিন অভ্যাস নেই। ভাল হয় নি জানি।"

শৈল বলিল, "কে বল্লে ভাল হয় নি? চমৎকার! চমৎকার!"

ছায়া লজ্জাবিজড়িত কোমলকণ্ঠে উত্তর করেছিল,—"ঠাট্টা করবেন না শৈল-দা। এক সময় বাবার বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে, বড় বড় গাইয়েদের নিকট গান গেয়েছি ও শিখেছি। বাবার গানে বড় সখ ছিল।"

প্রভা বলিলেন "না মা ছায়া, শৈল তোমার সত্যই প্রশংসা করছে।"

এ কথা শুনিয়া সহসা সৌদামিনীর চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল এবং একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উদাস ভাবে বলিলেন "এতদূর হয়ে গেছে! তা ত জানি না। সত্যি, একদিন ছায়ার গান শুনে কত লোক তারিফ করেছে।"

"তারপর আরো প্রমাণ পেয়েছি শৈল ছায়াকে খুব পছন্দ করেছে। এখন তুমি যদি আমাদের এ অবস্থায় রক্ষা কর।"

"দিদি আমরা গরীব লোক। আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার মত সামর্থ্য আমাদের নাই। এ কথা জেনেও যদি ছায়াকে নিয়ে যেতে চান আমার আপত্তি করবার কিছুই নেই। গরীবের মেয়েকে কি কেউ···"

বাধা দিয়া প্রভা উত্তর করিলেন, "ঢের হয়েছে দিদি, ঢের হয়েছে!"

সৌদামিনী নীরবে শুধু প্রভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে একথা কর্ত্তাকে জানাইগে? তিনি জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছেন।" বলিয়া চলিয়া গেলেন। অর্দ্ধপথে পথে প্রভা পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটী কথা না বলিয়া পারিলেন না। বলিলেন, "দিদি অনেক বড় ঘরের শিক্ষিত মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এমন করুণ সমবেদনাকাতর

অন্তঃকরণ কোথাও দেখি নি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার মত উচ্চ মন পাই।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রভা যাইতে যাইতে অঞ্চলে নয়নাশ্রু মুছিতে'ছিলেন তাহা সৌদামিনীর দৃষ্টি এড়াইল না। নির্ব্বাক বিস্ময়ে তিনি শুধু সেদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

সৌদামিনী গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলে বনবিহারী বলিল, "মা সাহেবকে অনেক করে ধরে পাঁচশ টাকা ধার করেছি। কিছুতেই কি রাজি হয়? বলে, তোমার নূতন চাকরী···আরো কত কি।" বলিয়া মায়ের পায়ের কাছে একতাড়া নোট রাখিয়া দিল।

মা বলিলেন, "এসব না হয় কোন রকমে যোগাড় করা যেতে পারে। কিন্তু ওরা যে ভাবে তাড়া দিচ্ছে, তা ত বুঝছিস···কাল মেয়ে ও ছেলে আশীর্ব্বাদ হবে। কাল না কি খুব ভাল দিন আছে।"

মায়ের কথায় ছেলে উত্তর করিল, "শুভ কায যত শীগ্‌গির শীগ্‌গির হয় ততই মঙ্গল। কার মনে কি আছে কে জানে মা?"

উত্তরে মা বলিলেন, "তাঁর মত সাদা মানুষ যে আর একটী দেখি নি রে। তাঁর ছেলে মেয়ের বিয়েতে কোন গোল হ'তে পারে কি?" মায়ের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর ধরিয়া আসিল।

ছেলের মনের ভিতর স্নেহময় স্বর্গীয় পিতার ছবি ফুটিয়া উঠিল। সে মাথা নীচু করিয়া শুধু বলিল, "কি জোগাড় করতে হবে বল মা?"

"তোর বড় মামা এসেছিলেন। বলেন, প্রকৃতির বিয়ে না হ'লে কি ছায়ার বিয়ে কোন মতে হ'তে পারে? লোকে বলবে কি? এখন উপায় কি? ওঁদের কি বলি বল্?"

ছেলে বলিল, "পাকা দেখা ত হয়ে যাক্—তারপর কথাটা পেড়ে দেখা যাবেখ'ন। যদি অপেক্ষা করতে রাজি হন।"

এই সময় বাহিরের দ্বারে মোটরের শব্দ শ্রুত হইল। মা ও ছেলে উভয়ে ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অগ্রসর হইয়া দেখিবার পুর্ব্বেই প্রভাবতী তাঁর ছোট ছেলেকে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

এক ঘণ্টা আগে ত গঙ্গার ঘাটে দেখা হইয়াছে। সৌদামিনী মনে মনে ভাবিলেন আবার নূতন কিছু হ'লো না কি?

প্রভাবতী বলিলেন, "একটা অত্যন্ত জরুরী কথা বলতে উনি পাঠালেন।"

মা ও ছেলে পরস্পরের মুখের প্রতি তাকাইল। উভয়ের বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। প্রভাবতী বলিলেন, "এই মাত্র রমেশবাবু এসে তাঁর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। বেশ মনে হ'লো—আমাদেরই প্রথম জানিয়ে দিয়ে আনন্দ পেলেন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বেদনা-নিপীড়িত করুণস্বরে সৌদামিনী উত্তর করিলেন, "বলবার কিছু নেই বোন। বুঝ্‌তে পারিনা কেন মানুষ মানুষকে ঘা দিয়ে মানুষ আনন্দ ও সুখ পেতে চায়। অমৃতের বদলে গরল দেওয়াই যেন বর্ত্তমানের সময়ের ধর্ম্ম হয়ে উঠেছে, মানুষের সহজসংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর একটা কথা—টাকা মানুষকে বড় করে না। বরং নীচের দিকে পথ দেখিয়ে দেয়।"

প্রভা উত্তরে বলিলেন, "সহস্রবার; অস্বীকার করার উপায় নেই।"

সৌদামিনী বলিলেন, "বিবাহ কবে?"

"আজ থেকে পনের দিন পরে! এর আগেই আমাদের কাযটা শেষ করতে হবে।"

"বেশ!"

প্রভা বলিলেন, "কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন দিদি? সব জোগাড় আমরাই করে নেবো। জেনো দিদি মেয়েমানুষ সব সহ্য কর্‌তে পারে, পারে না শুধু স্বামীর অপমান!"

"কুণ্ঠিত হবো কেন বোন? গরীব মানুষের মনের জোর বড় মানুষদের চেয়ে অনেক বেশী! তারা বে-পরোয়া—ইজ্জতের জন্যে সকল ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করে ফিরিয়ে দিতে চিরদিন তারাই পেরেছে।"

প্রভা উৎসাহে ও আনন্দে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কালই পাকা দেখা। উনি এখনি নিমন্ত্রণ করতে যাবেন। আমাকেও একবার বেরুতে হবে। বৈকালে এসে সব ব্যবস্থা করব।"

সৌদামিনী কি একটা কথা বলবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থামিয়া গেলেন।

প্রভা নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেলেন।

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। উদ্যোগ ও আয়োজন চলিতেছে। বাড়ীতে মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। নানাবিধ কাপড়, জামা, সেমিজ, সাবান, গন্ধ, অলঙ্কার প্রভাদের বাড়ী হইতে প্রতিদিন উপহার আসিতেছে। হরিহরবাবুর বন্ধুরা আসিয়া মেয়ে দেখিয়া গান শুনিয়া খুসী হইয়া যাইতেছেন। সকলের মুখেই ছায়ার অসামান্য সৌন্দর্য্য ও শিক্ষার প্রশংসা। সৌদামিনীর হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে। মাঝে প্রকৃতির বিবাহ না দিয়া ছায়ার বিবাহ দেওয়া ন্যায়-সঙ্গত ও শোভন নয় একথা উঠিয়াছিল। আর কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া প্রকৃতির বিবাহের পর করিলে সকল দিক হইতে ভাল হয়। কিন্তু যে জিদের উপর এই বিবাহ হইতেছে, সেখানে কোন যুক্তি বা আইন চলে না।

ছায়ার বিবাহের পূর্ব্বেই ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে তার যাতায়াত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বক্ষণই বাড়ীর দুয়ারে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য মোটর দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু এই উৎসবে গৃহের মধ্যে একজনকে বড় একটা কেহ খুঁজিতেছে না। যাঁহারা এই পশ্চিম প্রত্যাগত পরিবারটির বিষয় অবগত নন তাঁহারা প্রকৃতির অস্তিত্বের কথাই জানেন না। প্রকৃতি অন্তরে-অন্তরে বুঝিয়াছে, তাহার ছায়ার মত রূপ নাই। সেটাই কি তার বড় অপরাধ বলিয়া সে অজ্ঞাত পরিত্যক্ত? তার উপর শুভকাযে সে একটা মস্ত অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে লইয়া মা, দাদা, আর সবাই যে কি করিবে ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ছায়া ছোট বোন, প্রকৃতির ছেলেবেলার সাথী। তার সকল আব্দার অভিযোগ আজ বার বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে সেই শুনিয়া আসিয়াছে। শয়নে-স্বপনে সেই ছিল তার অবলম্বন। প্রকৃতি এই কথা ভাবিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বোনের বিবাহে তাহার কি আনন্দ হইতেছে না? কিন্তু, এই সহজ কথাটা অন্যে নাই বুঝুক, ছায়াও আজ বুঝি বুঝিতে পারিতেছে না? বিবাহের যখন প্রথম প্রস্তাব হয় তখন ছায়াই ছুটিয়া তার কাছে আসিয়া, অভিমান ভরে জানাইয়াছিল, "হ্যাঁ দিদি, তোমার আগে আমার বিয়ে কি করে হতে পারে?" প্রকৃতি সেদিন, অন্য কথা পাড়িয়া, পশ্চিমের কত গল্পই না ছায়ার কাছে করিয়াছিল।

প্রকৃতি নিজেকে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সকলের দৃষ্টির বাহিরে রাখিয়াছে। কোন কাযেই আজ তাহার ডাক পড়িতেছে না। তত্ত্ব আসিয়াছে, পাড়ার দশজন মেয়ে ছেলে জুটিয়াছে। ছায়া ও তাহার জননী সকলকে সেই সব জিনিষ একটি একটি করিয়া দেখাইতেছে। তাহা লইয়া আনন্দ হাসি, আলোচনা চলিতেছে। কেহ কেহ ছায়ার অসামান্য সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া যাইতেছে। প্রকৃতির ইচ্ছা করে ছুটিয়া সেখানে যায়। সকলের সঙ্গে সেও আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু কেন যে সে ছায়ার পূর্ব্বে জন্মিয়াছে, সেটাই তার পথের কণ্টক হইয়া কোন দিন যে দাঁড়াইতে পারে, এটা এতদিন কারও জানা না থাকিলেও আজ সকলেই জানিতে পড়িয়াছে। প্রকৃতি কত কি ভাবে। কিছুই বুঝিতে পারে না। সে না থাকিলে আজ কাহারও পক্ষে কোন গোল থাকিত না—এই নিদারুণ সত্য কথাটাই যে, সকলের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বেচারী সাহস করিয়া তার জননী ও দাদাদের কাছেও অগ্রসর হইতে পারে না। কে যেন তাকে সবলে পশ্চাৎ হইতে টানিয়া রাখে। সে নির্জ্জনে,একা বসিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে। প্রাণপণ শক্তিতে সে চোখের জল রোধ করিতে চেষ্টা করে—পাছে ছায়ায় কোনরূপ অকল্যাণ হয়; পাছে কেহ তাহার চোখের জলের অন্য রূপ অর্থ করে বসে! সে দিন, সারাদিন প্রকৃতির কেহ সন্ধান করিল না। সে সিঁড়ির ছাদের ঘরে বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কেহ তাহাকে খাইতে ডাকিল না। কাযের বাড়ীতে অনেক লোক আসিয়াছিল—তাহারা খাইয়া আমোদ করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের যত্ন খাতির করিতে গিয়া কেহ আর প্রকৃতির কথা, বোধ হয় মনে করিতে পারে নাই।

সন্ধ্যার পর সৌদামিনী কন্যার উপর অত্যন্ত রাগিয়া ডাকিলেন, "প্রকৃতি!"

মায়ের ডাকে সে দিন তার বুক কাঁপিয়া উঠিল। যেন তার অপরাধের সীমা নাই, এমনই কুণ্ঠিত ভাবে সে উত্তর দিল, "আমাকে ডাকছ মা?"

"তোকে নয় ত কি আর যমকে ডাকছি? এ দিকে আয় ত। ভারী তেজ হয়েছে যে দেখ্‌ছি।"

মায়ের মুখে আজ প্রথম যমকে ডাকার কথা প্রকৃতির কাছে কেমন বিশ্রী শুনাইল। সে ধীরে ধীরে মায়ের নিকট গিয়া অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

মেয়েকে দেখিয়া সেদিন সৌদামিনীর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল—মনে হইল, তাহার জন্যই আজ এত কথা শুনিতে হইয়াছে, তাহার জন্যই ত অনেকে ঠাট্টা করিতে ছাড়িতেছে না। প্রকৃতির জন্যই ত আজ কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে—কেন রে বাপু? আমার এত ঝঞ্চাট! নিজ নিজ ভাগ্য সঙ্গে করে এনেছিস সে দোষ কার? ছায়ার আগে বিয়ে হচ্ছে, ত মেয়ে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে—আহার নিদ্রা ত্যাগ! প্রকাশ্যে বলিলেন, "হয়েছে কি তোর শুনি? খাওয়া হয় নি কেন?"

প্রকৃতি কোন উত্তর দিতে পারিল না। সে কেবল মেঝের দিকে নীরবে তাকাইয়া রহিল।

"ধেড়ে মেয়েকে ডেকে ডেকে খোসামোদ ক'রে খাওয়াতে হবে? কে তোর মাহিনা করা চাকরাণী আছে শুনি?"

এতখানি বয়স হইল, মায়ের মুখে এমন কথা প্রকৃতি কোন দিন শোনে নাই। সে জন্য আজ তাহার বুক ফাটিয়া কান্না পাইতেছিল। ভাবিল সে ত ইচ্ছা করিয়া খাওয়া বাদ দেয় নাই, ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

মেয়েকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সৌদামিনীর রাগ আরো বাড়িয়া উঠিল। বলিলেন, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে ভাবছিস্ কি! খেয়ে আমার মাথা কিন গে। কি হিংসুটে মেয়ে বাবা!"

এবার সে কোন মতে কান্না চাপিয়া রাখিতে পারিল না। ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "মা তুমি যত পার বক, কিন্তু ছায়াকে আমি হিংসা করি একথা তুমি ভাবতে পারলে?"

প্রকৃতি আর দাঁড়াইয়া থাকতে পারিল না। মেঝের উপর সহসা বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষুর সম্মুখে যেন সারাবিশ্ব মুহূর্ত্তের ভিতর অন্ধকার হইয়া গেল।

ছায়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া প্রকৃতির হাত ধরিয়া ডাকিল, "দিদি! দিদি!"

প্রকৃতি কোন উত্তর দিল না, অশ্রুসিক্ত কালো চোখ দুটি কি করুণভাবেই না সে তাহার ছোট বোনের মুখের উপর রাখিল। সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, "ছায়া! বোন, ছেলেবেলার সাথী! আমি কি তোকে হিংসে করতে পারি রে? তুইও কি তাই মনে করিস্?"

প্রভাবতী বলিয়া গেলেন, "উনি প্রকৃতির জন্য অনেক ঘটক লাগিয়েছেন।"

সে কথায় বড় একটা কেহ কাণ দিল না। কারণ এত তাড়াতাড়ি কিছু হওয়া সম্ভবপর নয়। ছায়ার বিবাহের মাত্র চার দিন বাকী আছে।

সৌদামিনী প্রকৃতির সহিত আর বড় একটা কথা বলেন না। প্রকৃতিও নিজেকে যতদুর সম্ভব দূরে দূরে রাখিয়া চলিতেছিল। কিন্তু সে দিন কি একটা কায করিতে যাইলে, প্রকৃতির জননীকে কে যেন জিজ্ঞাসা করিল, "এই মেয়েটির কথাই বুঝি বলছিলেন?"

সৌদামিনী কহিলেন, "হ্যাঁ। আমার গর্ভে যে এমন মেয়ে জন্মাবে, কে তা জানত দিদি? নইলে আঁতুড়েই নুন খাইয়া সব গোল মিটিয়ে দিতাম।"

মায়ের মুখের কথা শুনিয়া প্রকৃতির মাথা ঘুরিয়া গেল। মনে হইল তাহার পায়ের নীচের মাটি ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে, চোখের সামনের আলো অকস্মাৎ কে যেন নিবাইয়া দিয়াছে। তার ইচ্ছা হইল একবার ভাল করিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে,—তার সদা স্নেহশীল জননী কেমন করিয়া এমন কঠিন হইয়া গেছেন! প্রকৃতি আস্তে আস্তে সেখান হইতে আপনাকে কোনোমতে সরাইয়া লইয়া গেল। এবার সে প্রাণপণ শক্তিতে অন্তরভেদী কান্নার গতি রোধ করিল।

সারা বাড়ীটি আত্মীয় কুটুম্বতে ভরিয়া গিয়াছে। সকলের মুখেই হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। কোথাও সুন্দরী তরুণীরা একত্র বসিয়া জটলা পাকাইতেছে। কোথাও বা প্রৌঢ়ারা অতীত যৌবনের সুখ দুঃখের কথা উত্থাপন করিয়া বর্ত্তমানকে একেবারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় অকাট্য

যুক্তি ও তর্কের আবির্ভাব করিতেছেন। দাস-দাসীদের বিয়ে বাড়ীর পাওনা লইয়া প্রকাণ্ড একটা আলোচনা-সভা বসিয়াছে। ছেলের দল পরিষ্কার কাপড় জামা পরিধান করিয়া তুলনায় রুচির সমালোচনা করিতেছে।

প্রকৃতি একরূপ সকলের দৃষ্টির অগোচরে বাড়ীর ভিতর একমাত্র নির্জ্জন স্থান ছাদের উপর সিঁড়ির ঘরের দুয়ারে গিয়া বসিল।

নানাবিধ চিন্তা তাহাকে কেমন সর্ব্ব দিক হইতে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। যা কখনও সে স্বপ্নেও কোনদিন ভাবে নাই—আজ তাহার বেদনাক্লিষ্ট মনের দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় করিতে এমন সব দুষ্ট চিন্তা তাহার নিকট পরম আত্মীয়ে মতই দেখা দিতে লাগিল।

প্রকৃতি মনে মনে ভাবিল, তার এত দিন বাঁচিয়া থাকাটাই অন্যায় হইয়াছে। মা নুণ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিতেন সেই ছিল ভাল। সে আর না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না।

হঠাৎ তার মনে হইল—আমি যদি না থাকি তা হ'লে সংসারের বালাই সব আপদ চুকে যায়। আমার জন্যে কেউই সুখী হ'তে পারচে না। আমি যাব! বাবা, আমি তোমার কাছে যাব। আমি যাব। আর একদণ্ড মার চক্ষুশূল হ'য়ে তাঁকে কষ্ট দেবো না।—এই চিন্তা সারা দিন ধরিয়া তার মাথার মধ্যে তাল পাকাইতে লাগিল। তারপর ভাবিল সে মরিলে এ বিবাহে আর কাহারও কোনও আপত্তি থাকিবে না। মামা মাকে বকিবেন না। গঙ্গার ঘাটে কেউ মার কৈফিয়ত চাহিবে না। প্রভা মাসীমাদের আর আমার বিয়ের জন্য ঘটক ডাকিতে হইবে না। পথ-হারা প্রকৃতি যেন একটা পথ দেখিতে পাইল। পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কি আরাম! মস্ত একটা বোঝা কে যেন তার ভারক্লান্ত মনের উপর হইতে নামাইয়া লইল। তার বিমর্ষ মুখের উপর একটা তীব্র সঙ্কল্প ও হাসি ফুটিয়া উঠিল। তার নয়ন কোণ হইতে অশ্রু একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল।

রাত্রি প্রায় দুইটা বাজে। ঠিক সেই সময় প্রকৃতি গৃহ হইতে উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন সারা দিনের পরিশ্রমের পর সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। গঙ্গায় ডুবিয়া মরাই প্রকৃতির সোজা বলিয়া মনে হইল। তাহাতে বাড়িতে তাহার মৃত্যু লইয়া কোনও গোলমাল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

পথে পা দিবামাত্র ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। একবার মনে হইল ফিরিয়া যায়। কিন্তু পশ্চাতে ফিরিতেও তাহার আর সাহস হইল না। জনবিরল পথ যেন তাহার সম্পূর্ণ নূতন মনে হইল। গঙ্গার পথ সে ঠিক করিতে না পারিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছিল। সেই সময় তাহার পার্শ্বে একখানি মোটর আসিয়া সহসা থামিয়া গেল। প্রকৃতি ভয়বিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত সেইখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল ও বাতাহত পত্রের মত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

গাড়ীর মধ্য হইতে একটী যুবক অবতরণ করিয়া দেখিলেন, মেয়েটি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে। ব্যাপার যে কিছু একটা ভয়ানক তাহা বুঝিতে তাঁরবাকী রহিল না।

তিনি বলিলেন, "গাড়িতে উঠুন।"

"কেন?"

"দরকার আছে।"

"কাকে? আমাকে কারো ত দরকার নেই।"

"কারো নেই আমার আছে। শীগ্‌গির উঠুন। নইলে বিপদে পড়বেন।" প্রকৃতি একথার কোন অর্থই বুঝিতে পারিল না। সকল কথা তার কাণের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল বলিয়াও মনে হয় না। ভয়ে ভয়ে মন্ত্রচালিতের মত গাড়িতে গিয়া বসিল। তারপর সংজ্ঞা হারার মত গাড়ির মধ্যে লুটাইয়া পড়িল।

যুবক বোধ হয় তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি সোফেয়ারের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। যখন গাড়ী তাঁর বাড়ীর গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল—তখন রাস্তার শীতল বায়ু স্পর্শে প্রকৃতির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে, সে উঠিয়া বসিয়াছে। চারিদিক ব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখেতেছে এ কোথায় আসিলাম? মা কৈ? ছায়া কৈ? দাদা কৈ?

যুবকের জননী পুত্রের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া জাগিয়া বসিয়া ছিলেন। তাড়াতাড়ি

তিনি দরজা খুলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর এত দেরী কেন রে বিমল ?"

"মা, এদিকে এসে এই মেয়েটিকে নামিয়ে নাও ত !"

মা আসিয়া প্রকৃতিকে হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামাইয়া লইলেন।

ঘরের আলোকে প্রকৃতির মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিয়া বলিলেন, "দিব্যি মেয়ে! এখনও বিয়ে হয়নি দেখছি। কার মেয়ে রে ?"

বিমল বলিল, "আমি জানি না। ওকেই জিজ্ঞাসা কর।"

প্রকৃতি পাষাণের মত নিশ্চল নির্ব্বাক।

বিমল বলিল, "মা অনেক রাত্রি হয়েছে, কাল সকালে সব কথা বলব।" বলিয়া সে শয়ন করিতে চলিয়া গেল।

বিমলের জননী সুবর্ণলতা প্রকৃতিকে দেখিয়া বিমোহিতা হইয়া গেলেন। মেয়েটির নিষ্কলঙ্ক সুন্দর মুখখানির উপর কে যেন নিবিড় বিষাদ ঢালিয়া দিয়াছে। প্রকৃতিকে দেখিয়া সুবর্ণলতার মাতৃত্ব বন্যার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মেয়েটিকে তিনি নিজ স্নেহ-বক্ষের মধ্যে প্রবল আকর্ষণে টানিয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার বড় বড় টানা কালো চোখের গভীর তলদেশে অপূর্ব্ব সরলতা মাখা।

সারা রাত্রি সুবর্ণলতার নিদ্রা হইল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি প্রকৃতিকে আপন করিয়া লইলেন। তাহার নিকট হইতে সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিলেন।

সেই গভীর রাত্রিতে প্রকৃতি কিছুই খাইবে না বলিয়া আপত্তি করিলেও শেষে তাঁহার স্নেহের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না।

সুবর্ণলতা যখন বুঝিলেন প্রকৃতিরা তাঁহাদেরই পাল্‌টা ঘর, তখন আনন্দে তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল।

৯

সকালে উঠিয়া সৌদামিনী যখন প্রকৃতিকে কোন খানে খুঁজিয়া পাইলেন না তখন বনবিহারীর নিকট গিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ছেলে বলিল, "মা চুপ কর। হৈ চৈ করলে আরও বিপদ, বুঝতে পারছ না ?"

মা বলিলেন, "আর দুটো দিন পরে গেলে কি এত ভাবতাম ?"

ছেলে বলিল, "মা সে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে। প্রকৃতি অন্যায় কোনদিন করতে পারে না।"

"এখন কেউ না জানতে জানতে এসে পড়লে যে বাঁচি। মুখ রক্ষা হয়।"

এই সময় দ্বারে মোটর আসিয়া হর্ণ দিল।

সৌদামিনী ও বনবিহারীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। মা বলিলেন, "বোধ হয় সব ব্যাপার জানতে পেরে ওরা বিয়ে বন্ধ করতে এসেছে।"

এমন সময় সুবর্ণলতা প্রকৃতিকে সঙ্গে করিয়া সেখানে আসিয়া ডাকিলেন, "কৈ দিদি একবার এদিকে আসুন—বাড়ীতে কুটুম্ব এসেছে।"

বনবিহারী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে একেবারে বিস্ময়াভিভূত ও স্তব্ধ হইয়া গেল।

সৌদামিনী সেদিন প্রথম দেখিলেন, প্রকৃতিকে কি সুন্দর মানাইয়াছে। পরিধানে সুন্দর মূল্যবান একখানি নীলাম্বরী সাড়ী। সর্ব্বাঙ্গে বহুমূল্য হীরকখচিত অলঙ্কার। যেন স্বর্গ হইতে কোনও দেবী মর্ত্তে ভুলিয়া আসিয়াছে! ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন।

সুবর্ণলতা বলিলেন, "এই নিন আপনার মেয়ে।" তারপর আগাগোড়া সব কথা জানাইয়া বলিলেন, "এই বার আমার একটী ভিক্ষা আছে। সব কথা আমি শুনেছি। যদি দয়া করে মেয়েটি আমাদের দান করেন। আমার একটী মাত্র ছেলে বিমল—সে গাড়ীতে বসে আছে।"

"দিদি, এত ভাগ্য আমার !"

"কালই ভাল দিন আছে।"

পরদিন বিমলের সহিত প্রকৃতির বিবাহ হইয়া গেল।

এ শুভ বিবাহে প্রভাবতী সর্ব্বাগ্রে নবদম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। জড়োয়ার মুকুট প্রকৃতির মাথায় পরাইয়া দিয়া বিমলকে বলিলেন, "বাবা যে হার তুমি আজ কুড়িয়ে স্বেচ্ছায় গলায় পরেছ, তা যেন চির-অম্লান থাকে।"

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লাভ

প্রেয়সী আমার কাছে চেয়ে গেল প্রেম,
দেবতা চাহিল শুধু ভক্তি ;
"দোঁহারে সন্তুষ্ট করি"—আমি বলিলাম,
"এতখানি নাই মোর শক্তি।"
দেবতার মুখে শুধু ফুটে উঠে হাসি,
প্রিয়ার নয়নে আসে জল ;
তখন প্রণমি বলি, "ও ঠাকুর, আসি,
এ দীনের সামান্য সম্বল।"

ঠাকুর চাহিল দিতে বিনিময়ে বর,
প্রিয়া বলে, "প্রেম আছে শুধু,
লোকে বলে, "সব মিথ্যা, ত্যজিয়া নশ্বর
অমরে বরণ কর বঁধু!"

আমি ভাবি, "তাই ঠিক, চাই যে অমৃত।"
দেবতার মুখপানে চাহি'
প্রিয়ারে সবলে বক্ষে করিলাম ধৃত,
বলিলাম, "আর চিন্তা নাহি।"

হাসিয়া দেবতা দোঁহে করিলা আশিস,
প্রেম আজ পড়ে গেল মন্ত্র,
"দিবার যা তাহা শুধু একজনে দিস,
ভাল নয় ভাগাভাগি-তন্ত্র ;
এরে দিয়ে ওর জন্য—বড় হীন সাধ—
রেখে দেওয়া কিছু অতিরেক!"
কিছু-না'র পরিবর্ত্তে পেনু আশীর্ব্বাদ,
কিছু দিয়া লভিনু অনেক।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

শেষ-মিলন

(গল্প)

"সুধা ?"

"কি দিদি।"

"এখন রাত্রি কত ভাই ?"

দেওয়াল ঘড়ির পানে তাকাইয়া বিধবা ছোট বোন সুধা বলিল—"সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।"

চমকিয়া উঠিয়া সুধার একখানি হাত নিজের গাঢ়-তপ্ত হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রমা বলিল—"বলিস কি সুধা—এখনো রাত্রি শেষ হয়নি ? আমি ত মনে করছি ভোর হয়ে এলো বুঝি !"

মাথার জলের পটিটা আর একবার ভিজাইয়া দিয়া সুধা বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি দিদি, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর,—নইলে মাথায় আবার রক্ত উঠবে।"

কোটর-প্রবিষ্ট জলজ্বলে কালো চোখ দু'টি সুধার পানে স্থির করিয়া রমা বলিল—"সুধা দিদি, আমার বড় ভয় করচে। কেবল মনে হচ্ছে ঘুমোলে বুঝি আর জাগবো না—জেগে আছি—বেশ আছি, তোদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছি—ঘুমিয়ে পড়লে আর কি তোদের দেখতে পাব ? না না, ঘুমোতে বলিসনে—জেগে আছি—বেশ আছি।"

সুধার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল মুখ ফিরাইয়া সে জল মুছিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল—"আমি তোমার শিয়রে জেগে বসে আছি—কোন ভয় নেই তোমার! লক্ষ্মী দিদি আমার, একটু ঘুমোও ভাই!"

রমা তখন জানালার বাহিরে তারাময় আকাশের

পানে সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়া ছিল। অনন্তকালের সাক্ষীর মতো ঐ যে তারাগুলি পৃথিবীর পানে করুণ নয়নে চাহিয়া আছে—কত দূরে উহারা? উহারা কি পৃথিবীর দুঃখে কাতর হয় না? মানুষ মরিয়া কি ঐখানে যায়? আমি যদি মরি—তাহা হইলে ঐখানে অমনি তারার মতো ফুটিয়া আমিও কি পৃথিবীর পানে চাহিয়া রহিব?

যে তারাগুলি রমার পানে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল সেগুলির পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার দু'চোখে জল ভরিয়া আসিল। ঐ তারাগুলিকে আজ তাহার নিকটতম বন্ধু বলিয়া মনে হইল।

কিছুক্ষণ এমনি তদগত ভাবে রহিয়া সুধার পানে ফিরিয়া রমা বলিল—"আজ আর ঘুম আসবেনা বোন্! অমি ঐ তারার পানে চেয়ে থাকি—আর তুই একটা কবিতা পড়্—"

সুধা বলিল—"কোন কবিতাটা শুনতে চাও—বল?"

রমা বলিল—"সেই—'এখনো যদি হয়নি সময়' সেইটে—"

পুস্তকাধার হইতে একখানি "সন্ধ্যাতারা" টানিয়া লইয়া কয়েকপাতা উল্টাইয়া সুধা পড়িতে লাগিল:—

"তাই যুগযুগান্ত জুড়ি দুই পাণি
অশ্রুসাগর তটে—
করি আরাধন দৈবে যদি গো
দেব দরশন ঘটে।
আশা নিরাশায় কেটেছে দিবস,
আসে বিভাবরী আজ,
জীবনে আমার নেমেছে সন্ধ্যা,
পরনে গেরুয়া সাজ।
এখনও যদি হয়নি সময়,
আর কি সময় হবে?
ঘনায়ে আসিল মৃত্যুলগন—
মিলন লগ্ন কবে?"

পড়িতে পড়িতে সুধার নয়নপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। গাঢ়স্বরে সে বলিল—"আর পড়তে পারছিনা দিদি, এ কবিতা থাক।"

রমা তখন অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, তাহার জীবনেও তো সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে, বিভাবরীও নিকটাগত, সমস্ত দিন তো আশা নিরাশায় কাটিল, কিন্তু দেব দরশন আর হইল না। আট বছর পূর্ব্বেকার এক মধুযামিনীর কথা তার মনে পড়িল। আর সেই সঙ্গে মনে পড়িল—এক তরুণ কিশোরের চন্দন চর্চ্চিত ললাট, সলজ্জ হাসি, কমনীয় কান্তি,—স্নিগ্ধ দু'নয়ন। জীবনবসন্তের পুষ্পিত প্রভাতের সেই দিনগুলি আজ কোথায়?

তারপর তার জীবনে সে কি লজ্জা ও মর্ম্মবেদনার দিন আসিল! দুর্দ্দিন গত হইল বটে—কিন্তু সুদিন আর আসিল না। রমার চোখের কোণ গড়াইয়া জল পড়িল। বলিল, "ঐ শেষের লাইন ক'টা আর একবার পড় সুধা, ভারি মিষ্টি লাগছে—"

সুধা আর একবার পড়িল—

"এখনো যদি হয়নি সময়
আর কি সময় হবে,
ঘনায়ে আসিল মৃত্যুলগন
মিলন লগ্ন কবে?"

রমা আপন মনে খানিকক্ষণ কি ভাবিল, তারপর সুধার পানে চাহিয়া কি যেন বলিতে ইচ্ছা করিল।

সুধা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—"দিদি, আমি বুঝতে পারছি, তুমি জামাইবাবুর কথা জানতে চাও। তাঁকে তো চিঠি দেওয়া হয়েচে, তিনি বোধ হয় কালই এসে পৌঁছবেন।"

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া রমা বলিল "কে তোকে বল্লে আমি তাঁর কথা জানতে চাই? আমি জানি তিনি আসবেন না।"

সুধা বলিল—"তোমার এমন অসুখ শুনলে তিনি কি না এসে থাকতে পারেন? নিশ্চয় কাল আসবেন।"

রমা কিছুক্ষণ কি ভাবিল। শেষে বলিল—"আচ্ছা সুধা, তোর কি মনে হয়—আমি বাঁচবো তো?"

রমার মুখে হাত চাপা দিয়া সুধা বলিল—"ছি ছি ওকথা বলতে নেই। কি হয়েছে তোমার—দু'দিনেই সেরে উঠবে।"

রমার দুই চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল—"তোকে সত্যি বলচি দিদি—মরতে আমার বড় ভয় করে না না সে আমি পারবো না।"

সুধা বলিল—"ডাক্তারেরা তো সবাই বলেচেন আশঙ্কাটা কেটে গেছে, এখন বুকের ব্যথাটা একটু নরম পড়লে আর তোমার ভয় কি?"

ধীরে ধীরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া রমা বলিল—"ব্যথা অনেক কমে গেছে। যাই হোক তোরা যেন আমায় ছেড়ে দিস্ নে।"

সুধা বলিল—"পাগল হয়েছ! আমরা তোমায় কোথায় ছেড়ে দেবো? আমি বাতাস করছি, এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

রমা বলিল, "না না—এখন ঘুম হবে না। আর একটা কবিতা শোনা—'সেই জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি'—সেইটে।"

আর একখানা বই টানিয়া লইয়া সুধা পড়িতে লাগিল:—

"আমি জ্বালবনা মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি।
আমি শুনব বসে আঁধার ভরা গভীর বাণী॥
আমার এ দেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথ রাতে
আমার লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাক্ না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি॥
(আমার) সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে
যেখানে ঐ আঁধার বীণায় আলো বাজে।
(আমার) সকল দিনের পথ খোঁজা এই হ'ল সারা
এখন দিগ্‌বিদিকের শেষে এসে দিশা হারা
কিসের আশায় বসে আছি অভয় মানি॥"

সুধার পড়া সাঙ্গ হইলে রমা বলিল—"কি সুন্দর। সুধা—এসব কবিতা শুনলে মৃত্যুভয় কেটে যায়—মরণকে যেন মধুর বলে মনে হয়!"

সুধা বলিল—"আমি দেখছি কথায় তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়ছো। সে হলে তো চলবে না দিদি! আজ ঘুমোও—সকাল হলে আরও কত কবিতা তোমায় পড়ে শোনাবো।"

রমা বলিল—"আচ্ছা তাই হবে। আলোটা একটু কমিয়ে দে, চোখে বড় লাগছে।"—বলিয়া আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া শুইল।

আলোর তেজ কমাইয়া দিয়া সুধা ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

অপরাহ্ণ বেলায় বাড়ীর পিছন দিকের নারিকেলের বাগানে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে প্রকাশ ভাবিতেছিল—এ জীবনে আর দেখা হল না। সুধার এ চিঠি তো শেষ চিঠি—এতক্ষণে বোধ হয় সব শেষ হয়ে গেছে। চির অপরাধী হয়ে রইলাম—মার্জ্জনা চাওয়ারও অবসর পেলাম না। কি করেই বা যাই? সেখানে যাওয়ার তো আমার মুখ নেই! সুধার কাছে যে অপরাধ আমি করেছি—তাতে এ মুখ কি তাকে আর দেখাতে পারি? তার মা যদি আমায় অপমান করে তাড়িয়ে না দিতেন—তা'হলে হয় তো একটা মিটমাট হতে পারতো। তার জন্যে যথেষ্ট অপমানিত লাঞ্ছিত হয়েচি—কিন্তু রমা আমায় একটি কথাও বলেনি। আমার কীর্ত্তিতে লজ্জিত হয়ে কেবল মুখ লুকিয়ে কেঁদেছিল। তার মায়ের কথা শুনে আমিই তো তাকে অকারণে অপমান করে চলে আসি। আর দেখা হয়নি। রমা কালো বলে রমাকে আমি দেখতে পারতাম না—সুধার নয়ন ভোলানো রূপ আমায় পাগল করে তুলেছিল। এসব অনেক দিনের কথা—তারপর আট বছর কেটে গেচে আর ওমুখো হইনি। সুধা বোধ হয় আমাকে ক্ষমা করেচে—নইলে আমাকে সে কখনো চিঠি লিখতো না। ঐ অতটুকু মেয়ে—কি গাম্ভীর্য্য! কি তেজ! অথচ একদিন কি ভুলই না বুঝেছিলাম—মেয়েমানুষকে কিছুই বোঝবার যো নেই। ছি ছি, কি অন্যায় করেছি। এখনো তাকে এ মুখ দেখাতে লজ্জা করে। কিন্তু রমা—রমার কি দোষ?"

তাহার হৃদয় মথিত করিয়া আট বছর পূর্ব্বের একখানি ছবি মানস নয়নে ভাসিয়া উঠিল। কত কথা তাহার মনে পড়িল—সেই সব দিনের সেই সব কথা।

কিছুক্ষণ পায়চারী করিয়া বাড়ী ফিরিয়া মাকে

বলিল —"মা, তোমাকে বলিনি—রমার বড় অসুখ—"

মা বলিলেন, "সে কিরে! কি করে তুই জানলি ?"

প্রকাশ বলিল—"আজ চারদিন হলো—চিঠি পেয়েছি।"

মা বলিলেন—"বাছা, কেন যে এতদিন বউমাকে আনবার নাম করিস নি আমি তা বুঝতে পারতাম না। আমার মনে হতো কালো মেয়ে বলে ছেলের আমার মনে ধরে না। সেই জন্যে তাকে আনবার জন্যে আমি তোকে জিদ করিনি। আজ তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে—আমার ভুল ধারণা! আচ্ছা প্রকাশ, সত্যি করে বল দেখি—বউমাকে কি তুই ভালবাসিস না ?"

প্রকাশ বলিল—"মা কেন যে তাকে এতদিন আনতে চাইনি, সে কথা তুমি জানতে চেও না। তুমি মা হয়ে ছেলের সব কথা কেমন করে শুনবে মা ? সে যে তোমার লজ্জা—আমার লজ্জা—"

মা বলিলেন—"থাক্ বাছা, থাক্। যে কথা বলতে তুই লজ্জা পাস সে কথা বলবার দরকার নেই। কিন্তু একটা কথা—বউমার তো আমার প্রাণের কোনো আশঙ্কা নেই ?"

বিমর্ষচিত্তে প্রকাশ বলিল—"তা এখন কি করে বলব বলো ? তবে অসুখ খুব শক্ত বটে!"

মা বলিলেন—"চারদিন পত্র গোপন করে রাখা তোর খুব অন্যায় হয়েচে। আর দেরী করিসনে—এই সন্ধ্যার ট্রেণেই তুই চলে যা।"

মনকে খুব শক্ত করিয়া সমস্ত দ্বিধা জোর পূর্ব্বক সরাইয়া ফেলিয়া প্রকাশ শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

"সুধা, প্রকাশকে তো পত্র দিয়েছিস—তা সে তো কোনো খোঁজ নিলেনা—"

কি লজ্জার কথা সুধার মনে পড়ায় তাহার মুখ কাণ লাল হইয়া উঠিল। কষ্টেসৃষ্টে সে ভাব দমন করিয়া সে বলিল—"দেখই না—আজ বোধ হয় আসবেন।"

মা বলিলেন—"বাছা, সে যদি তোর অপমান না করতো তা'হলে কি তাকে অমন ক'রে তাড়িয়ে দিই। যাক্! এখন বুঝছি অতটা না করলেও চলতো। সে যদি মানুষ হতো তা'হলে ওকথা বলতে তোকে সাহস করতো না। এখন রমা তার জন্যে যেমন ছট্‌ফট্ করছে, বাছার সে দুঃখ আমি চোখে দেখতে পারছিনে। হাঁ রে সুধা, রমা আমার বাঁচবে তো ?"

মার বুকে যে জ্বালা, সুধার বুকেও তাই। মাকে সে কোন সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিল না। সুধা মুখ ফিরাইয়া উদ্গত অশ্রু গোপন করিল।

মা বলিলেন—"এ বয়সে অনেক শোক পেয়েছি—পাথর হয়ে গেছি। বুঝেছি সর্ব্বনাশের আর বিলম্ব নেই। এখন প্রকাশের সঙ্গে ওর একবার দেখা হলে আমি শান্তি পাই। বাছার প্রাণটা কেবল যেন তারই জন্যে আটকে আছে।"

সুধা বলিল—"আমি তো জামাই বাবুকে খুব ভাল ক'রে পত্র দিয়েছি, দিদির প্রাণের আশঙ্কার কথাও জানিয়েছি, তিনি কি এমন নিষ্ঠুর হবেন ?"

মা বলিলেন—"অদৃষ্টের ফেরে যা হয়ে গেছে তাতো ফিরবে না! সবই অদৃষ্টের ফের—নইলে তার অমন দুর্ম্মতি হবে কেন ? যাক্, আজকের দিনটে দ্যাখ—কাল না হয় রমেনকে পাঠিয়ে দেবো। ভগবান এখন ভালয় ভালয় দু'দিন পার করলে হয়।"

সুধা বলিল—"সেই ভাল, আজ যদি না আসেন কাল তাহলে রমেনকে পাঠিয়ে দাও। দিদির জন্যে সবই করতে হবে—"

মা বলিলেন—"যা বাছা, আর দাঁড়িয়ে থাকিসনে—এতক্ষণে বোধ হয় ঘুম ভেঙেছে। আমি সাবুটা তৈরী করে নিয়ে যাচ্ছি। ওষুধটা ঠিক ঠিক দিচ্ছিস তো ? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।"

সুধা বলিল—"সে জন্যে ভেব না—সে সব ঠিকমত হচ্ছে। এখন ভগবানের হাতে পড়েছে—তিনি যদি দয়া করে ফিরিয়ে দেন। যাই আমি আর দেরী করবো না।"

"সুধা দিদি, এসেছিস ? এতক্ষণ আমি তোকেই খুঁজছিলাম।"

দিদির শিয়রে বসিয়া তপ্ত ললাট স্পর্শ করিয়া সুধা বুঝিল—জ্বর সমভাবেই আছে। এই জ্বর অবসানের সময়টা যদি কোনক্রমে কাটিয়া যায়, তাহা হইলে রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে—ইহাই অভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মত।

বাতায়নের বাহিরে ধব্‌ধবে জ্যোৎস্নার প্লাবন বহিয়া যাইতেছে। পুষ্করিণীর পাড়ের বাগান হইতে মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধ দখিণ হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে। নক্ষত্রবিরল পশ্চিম গগনে একটি বড় তারা জ্বল জ্বল করিয়া দীপ্তিদান করিতেছে।

সেই দূরস্থিত তারকার পানে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রমা বলিল—"সুধা, আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেচে। তার সঙ্গে আর দেখা হল না—বড় দুঃখ রয়ে গেল। সুধা, তুই আমার ছোট বোন নোস—তুই আমার দিদি। তুই যা আমার করলি—কোন ছোটবোন তার বড়দিদির জন্যে এমন করতে পারে?"

সুধার দুইচোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। বাষ্প রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি দিদি, ওসব কথা বলে আমায় লজ্জা দিয়ো না। তুমি আমার দিদি আমি তোমার ছোট বোন—আর কিছু জানিনা—"

রমা বলিল—"সুধা, তার হয়ে তোর কাছে আমি মাপ চাচ্ছি—তুই যেন তাকে ক্ষমা করিস। তোর মন তো ছোট নয় সুধা—আমি জানি তুই তাকে মাপ করতে পারবি।"

সুধা বলিল—"ছি ছি, ওসব কথা মনে কোরোনা। সে কথা যদি আমার মনে থাকতো তাহলে কি তাঁকে আর আমি চিঠি লিখতে পারতাম? কেন যে তিনি এলেন না বুঝতে পারছিনে।"

রমা বলিল "সে লজ্জার কথা সে ভুলতে পারেনি। আমি মারা যাওয়ার পর সে যদি আসে তাহলে তুই যেন তার যত্ন করিস। আমার মাথা খাস আর যেন তাকে লজ্জা দিসনে।"

দিদির পায়ের ধূলা মাথায় বুলাইয়া সুধা বলিল—"দিদি, তুমি দেবী, আমি তোমার পায়ের ধূলো নিচ্ছি—আশীর্ব্বাদ কর—আমার মন যেন এমনি উঁচু হয়।"

রমা বলিল—"আর একটা কথা। না, যাক্! সমস্ত মন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বহুদূরে কে যেন কোথায় কাঁদচে—আমি যেন ঐ তারার দেশে চলে গেছি। যখনি একটু তন্দ্রা আসছে, কত কি সব দেখছি। মনটা যেন খুব হালকা হয়ে গেছে…সুধা সেই 'তরী আমার কবে কিনার পাবে'—সেই কবিতাটি একবার শুনিয়ে দে—"

চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া সুধা পড়িতে লাগিল

"তরী আমার কবে কিনার পাবে
পাবে সে দিন, যেদিন আমার দিন ফুরায়ে যাবে।
নিবে নিবুক দিনের আলো"—
ছেয়ে আসুক আঁধার কালো
তরুণ আঁখির উজ্বল আলো শেষের পথ দেখাবে
শেষের পথ দেখাবে যেদিন দিন ফুরায়ে যাবে।'

চোখ বুজিয়া শুনিতে শুনিতে রমার হৃদয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল—আমার দিনও তো ফুরিয়ে এল—আমার তরী কি কিনার পাবে না? দিনের আলো নিবে গেছে, কালো আঁধার ঘনিয়ে এসেছে—সেই স্নিগ্ধসুন্দর তরুণ আঁখি দু'টির উজ্বল আলোর এই সময় যে বড় অভাব বোধ করছি—সেই আলোই তো আমায় শেষের পথ দেখাবে—পথের অন্ধকার দূরে করবে।

নিজের অন্ধকার অন্তরের মধ্যে রমা সেই চোখ দুইটির সন্ধান করিতে লাগিল।

চোখ চাহিতেই সেই বড় তারাটি তার চোখে পড়িয়া গেল। ঐ সুদূরের তারকা যেন তার প্রাণের মধ্যে সাহস ও সান্ত্বনার বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল।

অনাদি উষার চক্ষুর মতো করুণ নয়নে চাহিয়া সে যেন বলিতেছিল—"ভয় কি, আমার কাছে এস, আমি তোমাকে বুকে করে রেখে দেবো। এখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, এখানে তারায় তারায় সুধার উৎস উথলে উঠেছে। ঐ পৃথিবীর পানে তাকিয়ে তখন তুমিও আমার মতো হাসবে।"

রমার বুকের মধ্যে যেন একটা পুলকের হিল্লোল বহিয়া গেল বলিল—"আর একটা শুনিয়ে দে ভাই—শেষের সম্বল আর একটা—সেই 'ঐ মরণের সাগর

পারে চুপে চুপে' সেইটি—রাতও এদিকে শেষ হয়ে আসছে—"

আর একখানি বই লইয়া অশ্রু মোচন করিয়া দিদির শেষ ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য সুধা পড়িতে লাগিল —

"ঐ মরণের সাগর পারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপন রূপে।
কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
ঘুরেছিল চারি দিকের বাধায় ঠেকে।
বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে।
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে॥
আর কি দেখি কালো চুলের আঁধার ঢালা
স্তরে স্তরে সন্ধ্যা তারার মাণিক জ্বালা।
আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভরে আছে
ঝিল্লি রবে কাঁপে তোমার পায়ের কাছে;
বন্দনা তোর পুষ্পবনের গন্ধ ধূপে।
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপন রূপে॥"

সুধার পড়া শেষ হইলে রমা কিছুক্ষণ বাহিরের জ্যোৎস্না প্লাবিত বিশ্ব প্রকৃতির পানে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। তারপর সেই বড় তারার পানে দুই চোখ স্থির করিয়া অকস্মাৎ সে হাসিয়া উঠিল হা—হা—হা—হাসি আর থামে না।

সুধা বুঝিল মৃত্যুক্ষণ দ্রুত পদে আগাইয়া আসিতেছে। নিবিবার আগে প্রদীপ যেমন হাসিয়া উঠে এ হাসিও তাই। রমা বলিয়া উঠিল—"ঐ দেখ আমাকে নিতে এসেচে—তাই আমি হাসচি। মাকে ডেকে নিয়ে আয়, রমেনকে ডেকে নিয়ে আয়, আর আমায় বেশ ভালো করে সাজিয়ে দে। তুমি এসেছ—বড় দেরী করে এলে। নিয়ে যাবে আমায়?—চলো—না না, মুখ ফিরিয়ো না—মা তোমায় ক্ষমা করেচেন, সুধার সে কথা মনে নেই। অন্যায় করেছিলে—তার জন্যে যথেষ্ট শাস্তি নিয়েছ। কিন্তু আমাকে তুমি ভুল বুঝেছিলে—আমি তোমার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে কত কেঁদেচি তা যদি জানতে! কিছুই বলা হলো না। আরও আগে আসতে হয়—এস—এস—আরও কাছে—আরও কাছে—

'আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপন রূপে'—আর কি আনন্দ আজ গো!"

সুধা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"মা মা, শীগগির এসো—দিদির বুঝি হয়ে গেল।"

ঠিক সেই সময় দুয়ার ঠেলিয়া প্রকাশ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুভলগ্ন

ঘরের খাঁচায় বনের পাখী ক' দিন ধ'রে রাখ্‌বে?
একটি সেদিন পালিয়ে গেল, এটি কি আর থাক্‌বে?
গাছের ফলেই মিটিয়ে ক্ষুধা, কৃষ্ণানদীর জলে
স্বাধীন পাখী ছুট্‌ত সুখে মুক্ত আকাশ-তলে,
"ভোর না হ'তেই ভোরের খপর" দেওয়া যাহার কায
সেই পাখীরে খাঁচায় পুরে রাখ্‌বে তুমি আজ!
শিকলকে আর মিথ্যা কেন স্বর্ণ দিয়ে ঢাক্‌বে?
নিম্ব ফলের যায়না তিতো যতই চিনি মাখ্‌বে।

ভাঙ্‌বে না কেউ খাঁচার বেড়া, আপ্‌নি দুয়ার খুল্‌বে,
রক্ষীও হায় শক্তি-মদে নেশার ঘোরে ঢুল্‌বে।
প্রভাত-রবির বার্ত্তাটি পায়—সেই ত সবার আগে,
সবার আগেই তাইত পাখী নিদ্রা হ'তে জাগে।

কারার আঁধার চোখে তাহার লাগায় না ত ধাঁধা,
মিথ্যে তারে খাঁচায় পোরা, মিথ্যে তারে বাঁধা।
মুক্তি পেতে ভৈরবীতে যে সুর পাখী তুল্‌বে,
হাজার পাখী সে সঙ্গীতে কারার ব্যথা ভুল্‌বে।

নিঝুম হ'য়ে আছেন প'ড়ে যোগী কি যোগমগ্ন;
খোঁজ রাখনা কোথায় এখন চিত্তটি তাঁর লগ্ন,
অন্তরে তাঁর গর্জ্জে বুঝি প্রলয় দিনের গান,
মহাকালের নাচের তালে সৃষ্টি কম্পমান,
হেরেন কি হায় হেলায়-ফেলায় গান করি' কালকূট,
নৃত্যকালে নীলকণ্ঠের উড়ছে জটাজূট,
জীবের শিবের মিলন যোগের এই ত শুভ লগ্ন
তর্‌সবেনা, হবেই হবে এবার খাঁচা ভগ্ন।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুষ্কর

দেশ ভ্রমণ সাধনের একটী অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যখন শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল তখন পর্য্যটককে নিতান্ত নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় অত্যন্ত অপরিচিত স্থানে ভ্রমণ করিতে হইত এবং আতিথ্য গ্রহণ বা ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিতে হইত। এইরূপে অন্ন সংগ্রহ উপলক্ষে অনেকের নিকট হইতে অনেক সময় দুর্ব্ব্যবহার যে পাইতে হইত না এরূপ অনুমান করা যায় না। এইরূপে অহংকার অভিমান প্রভৃতি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির অন্তরায় গুলি তিরোহিত হইত; বিপদ হইতে রক্ষা পাইলে ভগবৎ কৃপার উপলব্ধি হইত। অন্য দিকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত আলাপ পরিচয়ে এবং তাহাদের আচার ব্যবহার দর্শনে অনেক ভ্রম কুসংস্কার দূর হইত—উদারতা বৃদ্ধি হইত। নানা বিচিত্র দৃশ্য দর্শন মানব প্রকৃতির একটী স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং সে ইচ্ছারও তৃপ্তি হইত।

বর্ত্তমান সময়ের ভ্রমণে বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত আলাপ পরিচয় এবং নানা বিচিত্র দৃশ্য দর্শন ভিন্ন অন্যান্য অভিজ্ঞতাগুলি লাভ হয় এরূপ মনে হয় না। এখন ভারতের সর্ব্বত্র রেলপথ বিস্তৃত, দেশভ্রমণ এখন রেলযোগেই প্রায়ই সম্পন্ন হয়। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মশালা, হোটেল দোকান ইত্যাদি আছে, কাযেই নিতান্ত নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় এখন আর কেহ বড় ভ্রমণে বাহির হয় না এবং আতিথ্য অথবা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অনেকেই অন্ন সংস্থান করে না। অহঙ্কার অভিমানাদি চূর্ণ হইবার যে গুলি উপায় ছিল সে উপায় গুলি এখন আর ততটা বর্ত্তমান নাই। তবে পথকষ্ট সমানই বর্ত্তমান আছে—বিশেষতঃ রেলগাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর পক্ষে। কষ্ট বর্ত্তমান থাকা সত্বেও মাঝে মাঝে আত্মীয় বিহীন দূরদেশে যাইয়া কিছু দিন না কাটাইলে যেন একটা অসোয়াস্তি অনুভব করি। ইংরেজী ১৩২৬ সনের এপ্রিল হইতে জুলাই পর্য্যন্ত উচ্চ হিমালয়—যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, ত্রিযুগীনারায়ণ কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, বদ্রীনাথ প্রভৃতি ভ্রমণ অন্তে কিছু দিন কাশীতেই ছিলাম। কিন্তু এই এক বৎসরের উর্দ্ধকাল এক স্থানে অবস্থান যেন একটা "বন্ধন" বলিয়াই মনে হইতে ছিল।

আমারই কেবলই মনে পড়িত—

"আমি সুদূরের পিয়াসী।"

"ওহে সুদূর, অনন্ত সুদূর,
তুমি যে বাজাও মধুর বাঁশরী।
মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই
সে কথা যে যাই পাশরি॥"

সুদূরের মধুর বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া আবার কিছুদিনের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম।

৭ই অক্টোবর ১৯২৭—বিজয়া দশমীর পর দিন। গতকল্য বৈকালে বৃষ্টি হওয়ায় প্রতিমা বিসর্জ্জনে বিসর্জ্জনকারী এবং দর্শক সকলেরই অসুবিধা হইয়াছিল। অদ্য আকাশ বেশ পরিষ্কার। বেলা ১০ ঘটিকার সময় কাশী ত্যাগ করিলাম। অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকায় কাণপুর পৌঁছিলাম। পথে বর্ণনীয় বিশেষ কিছু নাই—রেলপথের উভয় পার্শ্বেই কেবল শস্যহীন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, স্থানে স্থানে কোথাও বা দুই একখানা গ্রাম। এ প্রদেশের গ্রামগুলি বঙ্গদেশের গ্রাম হইতে বিভিন্ন আকৃতির—গ্রামখানা ভিন্ন ভিন্ন গৃহস্থের কতকগুলি গৃহের একত্র সমাবেশ মাত্র। প্রত্যেক গৃহস্থের স্বতন্ত্র বাড়ী—আঙ্গিনায় গোময়লিপ্ত তুলসীমঞ্চ, ঘরের চালে পুষ্পিত ঝিঙ্গে লতা,—বঙ্গদেশের গ্রামের এ সমস্ত স্নিগ্ধ শোভা এ প্রদেশের গ্রামগুলিতে নাই।

৮ই অক্টোবর হইতে ১৪ই পর্য্যন্ত এক সপ্তাহকাল কাণপুর, তথা হইতে মথুরা, বৃন্দাবন, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন, গোকুল, মহাবন প্রভৃতি স্থান দর্শন করিলাম। এ সমস্ত স্থানগুলি আমার পূর্ব্বদৃষ্ট—ইংরেজী ১৯২৩ সনের জুন মাসে এ সমস্ত স্থানগুলি একবার দর্শন করিয়া গিয়াছিলাম এবং আমার পর্য্যটনের অভিজ্ঞতা বাঙ্গালা ১৩৩১ সালের বৈশাখ সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে পাঠক বর্গকে উপহার দিয়াছিলাম।

এবার নূতনের মধ্যে দেখিলাম এ সকল স্থানে "মোটর গাড়ী"। বৃন্দাবন হইতে মথুরা, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড গিরি-

গোবর্দ্ধন আবার মথুরা হইতে গোকুল, মহাবন সর্ব্বত্রই এখন মোটরগাড়ীতে অতি অল্প সময়ে যাতায়াত করা যায়। ইহাতে সময় হিসাবে ভ্রমণের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু ভ্রমণের এবং দর্শনের আনন্দ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

এবার মাদ্রাজীদের স্থাপিত গোকুল দর্শন করিলাম। স্থানটী যমুনার কূলে, কিন্তু নন্দালয় প্রভৃতি স্থানগুলি বড়ই গলি ঘুচির মধ্যে। দিবাভাগেও সে স্থানগুলি অন্ধকার। গোকুল অপেক্ষা ইহার বিশেষত্ব এই—অন্ততঃ মাদ্রাজীরা এই বিশেষত্ব দাবী করে যে—ইহা মুসলমান স্পর্শদোষ শূন্য। এখানে মুসলমান বসতি নাই এবং কোন মসজীদও নাই। আর একটী বিশেষত্ব, এখানে কেবল "দেহি দেহি" শব্দ নাই।

১৫ই অক্টোবর ১৯২৭। ১-৩০ মিনিটের সময় মথুরা ক্যান্টনমেন্ট হইতে বি, বি, সি, আই লাইনের রেলগাড়ীতে আজমীর যাত্রা করিলাম। দিবাভাগেও এখান হইতে দুইখানা গাড়ী আজমীর যাত্রা করে, কিন্তু সেই গাড়ীতে আরোহী হইলে পথে গাড়ী বদল করিতে হয় এবং অসময়ে আজমীর পৌঁছিতে হয়। রাত্রের গাড়ী বেলা ১২ টায় জয়পুরে এবং অপরাহ্ণ ৫টায় আজমীরে পৌঁছে এবং পথে নামা উঠা করিতে হয় না। সুবিধা মত সময়ে আজমীর পৌঁছিবার জন্য অসুবিধার সময়ে—গভীর রাত্রে—মথুরা ত্যাগ করিলাম।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী নিশি—অনেকক্ষণ চন্দ্রোদয় হইয়াছে। আকাশও নির্ম্মল। জ্যোৎস্না প্লাবিত ধূধূ বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল গাড়ীর জানালা দিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নাস্নাত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম। পরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। গাড়ীতে যাত্রীর ভিড় ছিল ছিল না—একখানা সম্পূর্ণ বেঞ্চই আমি দখল করিতে পারিয়াছিলাম, কাযেই নিদ্রারও কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

মথুরা জেলার সীমা ত্যাগ করিয়া কখন এবং কোন ষ্টেশনে গাড়ী আলোয়ার রাজ্যে প্রবেশ এবং রাজ্য ত্যাগ করিল তাহা জানিতে পারি নাই। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম গাড়ী বাণ্ডিকুই ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছে, সূর্য্যোদয় হইয়াছে।

বাণ্ডিকুই একটী বড় জংসন ষ্টেশন, জয়পুর রাজ্যে অবস্থিত। রেল লাইন এবং লাইনের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী কতকদূর পর্য্যন্ত স্থান ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট খাস দখলে আনিয়া রেল কোম্পানীর হাতে দিয়াছেন। জয়পুর রাজ্যর সহিত রাজ্যস্থিত এই সকল স্থানের ভৌগোলিক সম্পর্ক ভিন্ন শাসন সংক্রান্ত কোন সম্পর্ক নাই। এখানে ইংরেজের পুলিশ, ইংরেজের আইন, ইংরেজের শাসন এবং ইংরেজে রেল কোম্পানীর অর্থ উপার্জ্জন। করদ মিত্র রাজ্যের যেখানে রেলপথ খোলা হইয়াছে সেই খানেই এই অবস্থা। মথুরার সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই আমি—

"অবশেষে উপনীত রাজপুতনায়।
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি মেখলায়॥"

রাজপুতনার কীর্ত্তি-মেখলায় বসুধা বেষ্টিত থাকিলেও স্বয়ং রাজপুতনা এখন "লৌহবিনির্ম্মিত" মেখলায় বেষ্টিত। এই লৌহমেখলায় গাড়ী দ্রুত ছুটিল। বাণ্ডিকুই হইতে জয়পুর পর্য্যন্ত রেলপথের উভয় পার্শ্বে কেবল উর্ব্বর ভূমি এবং মাঝে মাঝে দুই একটী পাহাড়ও দৃষ্ট হয়। লোকালয় এবং কর্ষণোপযোগী ভূমি অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইল।

বেলা ১২ টায় গাড়ী জয়পুর ষ্টেশনে পৌঁছিল। অনেক যাত্রী এখানে নামিল এবং নূতন যাত্রী উঠিল। পুষ্করের পাণ্ডার সহিত এখানেই প্রথম সাক্ষাৎ। প্রত্যেকেরই অনুরোধ আজমীরে যেন তাহার লোককেই পাণ্ডা বরণ করি এবং পুষ্করে যেন তাহার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করি। অনেকে মুদ্রিত কাগজ দিল, অপরের নাম ইত্যাদি নোটবুকে লিখিয়া লইলাম।

জয়পুর ষ্টেশনে গাড়ী অনেকক্ষণ থাকে। এখানে দুগ্ধ ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতির বিক্রেতা অনেক এবং বিক্রয়ের জিনিষও প্রচুর। সন্ধ্যা পাঁচটার পূর্ব্বে আজমীরে পৌঁছিতে পারিব না কাযেই দুগ্ধ ফল মিষ্টান্ন এখানেই মধ্যাহ্ন ক্রিয়া শেষ করিলাম।

জয়পুর রাজ্যের পর কিষণগড় রাজ্য। তার পর ব্রিটিশ দখল আজমীর। ম্যাপে হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত করদ-মিত্র রাজ্য রাজপুতনার মাঝখানে লাল রঙ্গে চিত্রিত খাস ইংরেজ রাজ্য, আজমীর মরুভূমিতে ওয়েসিসের মত বা সাগর মাঝে দ্বীপের ন্যায় দেখায়।

"অজামিলপুরী আজমীর" এখন ইংরেজরাজের একটী জেলা। আজমীরের পৌরাণিক কিম্বদন্তী এই। ইহার

প্রতিষ্ঠাতা অজামিল দস্যুবৃত্তির দ্বারা রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সকল রাজ্যই প্রথমে এইভাবে সংস্থাপিত হয়—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদপূজনং" দ্বারা পৃথিবীতে কেহ কোন দিন রাজ্য সংস্থাপন করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও পারিবে না। তবে অজামিলের দুর্ভাগ্য যে দস্যু বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অন্য দিকে তিনি আবার পরম সৌভাগ্যবান্—নারায়ণ নামধারী স্বীয় পুত্রকে মৃত্যুকালে আহ্বান করিতেই তিনি অতি সহজে মুক্তিলাভ করেন।

অপরাহ্ন ৫টায় আজমীর ষ্টেশনে নামিলাম। এখন প্রয়োজন বাসস্থান। জয়পুর প্রবাসী একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাঙ্গালী যাত্রীদের অবস্থান জন্য আজমীরে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহাতে বাঙ্গালী যাত্রীদের একটী বিশেষ অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। ষ্টেশন হইতে ধর্ম্মশালা বেশী দূরে নয়। ধর্ম্মশালায় জিনিষ পত্র রাখিয়া আহার্য্য সংগ্রহ জন্য বাজারে গেলাম।

বাজার বেশ বড়, রাস্তাগুলি খুব প্রশস্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আজমীরে প্রধান দ্রষ্টব্য মেয়ো কলেজ। রাজপুতনার রাজকুমারদিগকে এই কলেজে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়। যতটা পারিলাম বাজার বেড়াইয়া দেখিলাম। সূর্য্যাস্তের অধিক বিলম্ব নাই, আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

১৬ই অক্টোবর ১৯২৭। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলাম। ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষের সঙ্গে গতকল্য সাক্ষাৎ হয় নাই, অদ্য প্রাতে তিনি ধর্ম্মশালায় আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইল।

পুষ্কর এখান হইতে ৮ মাইল দূর। একখানা "টাঙ্গা" (দেখিতে অনেকটা টম্‌টম্ গাড়ীর মত) ভাড়া করিয়া বেলা ৮টায় পুষ্কর যাত্রা করিলাম।

পুষ্করের রাস্তা অতি সুন্দর। ডান দিকে আয়না সাগর নামে একটী বিস্তীর্ণ জলাশয়, বামদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ, সম্মুখে পাহাড়। কিছু দূর পর্য্যন্ত টাঙ্গা সমতলে চলিয়া পাহাড়ের পাদমূলে পৌঁছিল। এখানে পূর্ত্ত বিভাগের একটী ঘাটী আছে—যাতায়াতকারী টাঙ্গা ওয়ালাদিগের নিকট হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট ট্যাক্স এখানে উসুল করা হয়। যাহারা পদব্রজে গমনাগমন করে তাহাদিগকে কোন টেক্স দিতে হয় কিনা জানিতে পারি নাই।

এখান হইতে "স্বর্গারোহণ পর্ব্ব" আরম্ভ। টাঙ্গা ক্রমোর্দ্ধ পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতে আরম্ভ করিল। শিলং দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থান যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা এই জাতীয় রাস্তার সঙ্গে পরিচিত এবং এই জাতীয় রাস্তার সৌন্দর্য্যও তাঁহাদের পূর্ব্বানুভূত। পাহাড়ের গায়ে আঁকা বাঁকা রাস্তায় টাঙ্গা চলিতে চলিতে ক্রমে সর্ব্বোচ্চ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইল। এখানে পাহাড়কে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া রাস্তা পাহাড়ের অন্যদিকে বাহির করা হইয়াছে। পাহাড় অত্যন্ত উচ্চ হইলে এরূপ প্রায়ই তলবর্ত্ম (tunnel) প্রস্তুত করা হয়। আর যে পাহাড়ে তৈয়ারী রাস্তা না থাকে সেখানে যাত্রীকে পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া পুনরায় অপর দিকে নামিতে হয়। এই শেষোক্ত জাতীয় পথে অবশ্য গাড়ী টাঙ্গা ইত্যাদি চলিতে পারে না ইহা, "পাহাড়ীয়া" রাস্তা।

পাহাড়ের দ্বিধা কর্ত্তিত অংশ অতিক্রম করার পর আজমীর পশ্চাতে অদৃশ্য হইল। টাঙ্গা এখন এক উপত্যকায় প্রবেশ করিল। পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে পর্ব্বতের বেষ্টন, সম্মুখেও অনেক দূরে পর্ব্বত দৃষ্ট হইতে লাগিল।

সম্মুখে একটী হ্রদ দৃষ্ট হইল, নাম বুড়া পুষ্কর। বামদিকে পাহাড়ে অপর একটী স্বাদু জলের হ্রদ আছে, তাহা এপথ হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই হ্রদ হইতে আজমীরের ব্যবহার্য্য জল নলযোগে সরবরাহ করা হয়। আজমীর সহরের নিকটবর্ত্তী আয়না সাগরের জল অব্যবহার্য্য।

পাহাড়ের উচ্চ স্থান হইতে টাঙ্গা আবার নিম্নে সমতল ভূমিতে নামিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে পাহাড়, মধ্যে সমতলভূমি, সম্মুখে বিস্তীর্ণ জলপূর্ণ হ্রদ—দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

ক্রমে সাবিত্রীর পাহাড় এবং শীর্ষস্থ দেবালয়, পাপমোচন পাহাড় ও মন্দির দৃষ্ট হইল। পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ মিঃ সময় টাঙ্গা পুষ্কর পৌঁছিল।

সমতল, পাহাড়, হ্রদ প্রভৃতির পরে এখন "বালুর দেশে" পৌঁছিলাম। পুষ্করে বাজারের মধ্যস্থিত রাস্তা বালুকাময়। এ পাহাড়ের রাজ্যে বালু কোথা হইতে আসিল বুঝিতে পারিলাম না।

পুষ্কর হ্রদের উত্তর তীরে "সিন্ধি" ধর্ম্মশালায়

আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। "বেরী" ধর্ম্মশালা, "নাগপুর বিড়িওয়ালা" ধর্ম্মশালা—এই দুইটী ধর্ম্মশালা শুনিলাম সত্ত্বাধিকারীর পক্ষ হইতে বেতনভোগী ভৃত্য রাখিয়া পরিচালনা করা হয় এবং সেখানে সকলেরই আশ্রয় গ্রহণের অধিকার আছে জানিতে পারিলাম। "গুজরাটী" ধর্ম্মশালায় এবং "আজমীর সিরি" ধর্ম্মশালায় অন্য প্রদেশীয় লোক দিগকে আশ্রয় দেওয়া হয় না। অন্যান্য ধর্ম্মশালা এবং ঠাকুর বাড়ীতে পাণ্ডারাই অধ্যক্ষ। তাহার কোনও ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষকেই পাণ্ডা বরণ করিতে হয়।

ধর্ম্মশালায় জিনিষ পত্রাদি রাখিয়া হ্রদে স্নান করিতে গেলাম। হ্রদের পশ্চিম এবং দক্ষিণ তীরে পরিত্যক্ত পুরাতন মন্দিরই অধিক।

হ্রদের পূর্ব্ব তীরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে দক্ষিণ তীরের পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত একটী ইষ্টক নির্ম্মিত বাঁধ। এই বাঁধ দ্বারা হ্রদকে বিভক্ত করিয়া এক অংশকে প্রায় চতুষ্কোণ করা হইয়াছে। এই চতুষ্কোণ অংশের তীরেই পুষ্করের লোকালয় ও মন্দিরাদি এবং এই অংশেই তীর্থ স্নানাদি করিতে হয়। অপর অংশের পশ্চিম তীরে শ্মশান ক্ষেত্র।

হ্রদে স্নান জন্য অনেক গুলি ঘাট আছে। পশ্চিম তীরস্থ এক ঘাটে স্নান সম্পন্ন করিলাম। হ্রদে অনেকগুলি কুমীর—সেগুলিও খুব প্রকাণ্ড। স্নানের সময় পাণ্ডার এক ভাই এক দীর্ঘ বংশ দণ্ড হস্তে হইয়া জলমধ্যে দণ্ডায়মান রহিল এবং কুম্ভীরের উদ্দেশে বারংবার সেই দণ্ড জলমধ্যে সঞ্চালন করিতে লাগিল। স্নানান্তে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান এবং ব্রহ্মার মন্দির দর্শন পুষ্করের তীর্থকৃত্য। অন্যান্য অনেক দেবতার মন্দিরও এখানে আছে, কিন্তু সেগুলি আধুনিক এবং ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি।

স্নান এবং মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া প্রায় ৩টার সময় দ্রষ্টব্য স্থান গুলি দর্শন জন্য বাহির হইলাম। প্রথমে তীর্থ হ্রদের উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ অংশ বেড়াইয়া দেখিলাম। দক্ষিণ তীরের নিকট হ্রদ মধ্যে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপাকার স্থান। অনেক গুলি কুমীর সেখানে রৌদ্র সেবন করিতেছে। দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব তীর সংযোজক বাঁধের উপর দিয়া কতদূর অগ্রসর হইলাম, কিন্তু পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলাম না—হ্রদের জল নিঃসরণের জন্য পূর্ব্বতীর হইতে কতকটুকু জায়গা শূন্য রাখা হইয়াছে।

অপরাহ্নে ব্রহ্মার মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। পুরী-সম্প্রদায়ভুক্ত একজন সন্ন্যাসী মঠের বর্ত্তমান মোহান্ত। মঠের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ভূসম্পত্তি আছে এবং যাত্রীদিগের স্বেচ্ছাকৃত দানের আয়ও আছে। মোহান্তজীর সঙ্গে আলাপে জানিলাম, পূর্ব্বে সাবিত্রী পাহাড়ও এই মঠের অধীন ছিল এবং সেখানকার আয়ও এই মঠেই আসিত। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন এক মোহান্তের সময় হইতে সাবিত্রী পাহাড় ব্রহ্মার মঠের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া পুরোহিতের সম্পত্তি হইয়াছে। বৎসরে মাত্র একদিন সাবিত্রী পাহাড়ের আয় ব্রহ্মার মন্দিরে আইসে।

পুষ্করে আগত সমস্ত যাত্রীরাই, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা, সাবিত্রী পাহাড় দর্শন করেন, ইহাতে পুরোহিতের যথেষ্ট আয় হয়। ভারতবর্ষে অন্য কোথাও আর ব্রহ্মার মন্দির নাই, এই পুষ্করেই একমাত্র মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপিত। কিন্তু অনেকেই ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ, এমন কি অনেকে পুষ্করে আসিয়াও ব্রহ্মার মন্দির দেখেন না। ব্রহ্মার মন্দিরে ব্রহ্মা, গায়ত্রী ও সরস্বতী এই ত্রিমূর্ত্তি বিদ্যমান। অঙ্গনস্থিত অন্যান্য মন্দিরে অন্যান্য বিগ্রহও আছেন। মৃত্তিকার নিম্নে নির্ম্মিত একটী মন্দিরেও একটী বিগ্রহ দর্শন করিলাম।

"কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণিচ—তীর্থান্যেতানি"র মধ্যে পুষ্করই সত্যযুগের তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং ইহাই প্রাচীনতম তীর্থ। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, পৃথিবীতে একটী তীর্থ সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্মা এখানে একটী যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে সস্ত্রীক পূর্ণাহুতি দান করিতে হইবে এই জন্য দিবাশেষে ব্রহ্মা তাঁহার পত্নী সাবিত্রী দেবীকে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। সাবিত্রী দেবীর আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল, এদিকে সূর্য্যদেবও অস্তাচল গমনোন্মুখ। পূর্ণাহুতি এখনই দিতে হইবে তাই ব্রহ্মা গায়ত্রীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দান করিলেন।

সাবিত্রীদেবী আসিয়া দেখেন যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দান হইয়া গিয়াছে—উপরন্তু তাঁহার একটী সপত্নীও জুটিয়াছে। ক্রোধে, অভিমানে, দুঃখে সাবিত্রীদেবী বাষ্পাকারে পাহাড়ে মিলাইয়া গেলেন। এই পাহাড় সাবিত্রী দেবীর নামে পরিচিত হইল।

সাবিত্রী পাহাড়ে যাইবার সময় না থাকাতে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

১৭ই অক্টোবর ১৯২৭, বেলা ৬-৩০ মিঃ সময় সাবিত্রী পাহাড়ে রওয়ানা হইলাম। সাবিত্রীর মন্দিরে বিগ্রহের কপালে সিন্দূর লেপন এবং হস্তে লৌহবলয় স্পর্শ করানই এখানকার তীর্থকৃত্য এবং ইহা মহিলাদেরই কার্য্য।

ধর্ম্মশালা হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম একজন মুসলমান অনেকগুলি সিন্দূরের প্যাকেট ও লোহার বালা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হিন্দু যাত্রীদের নিকট লোহার বালা ও সিন্দূর বিক্রয় করাই তাহার পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় এবং ইহা দ্বারাই সে তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ

করিতেছে। মহিলা যাত্রীগণ ইহার নিকট হইতে সিন্দুর ও লোহার বালা ক্রয় করিয়া পাহাড় উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন।

হ্রদের পশ্চিম তীর হইতে পাহাড়ের পাদদেশ অনুমান এক মাইল হইবে। পাহাড়টী ক্ষুদ্র এবং অনুচ্চ। বঙ্গদেশের চন্দ্রনাথ অথবা আসামের নীল পর্ব্বত (কামাখ্যা পাহাড়) হইতে অধিক উচ্চ নহে। পাথরের সিঁড়ি বাঁধান পথ উঠিতে বিশেষ কোন কষ্ট নাই।

পাহাড়ের শীর্ষদেশে পূর্ব্বাংশে মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে ছোট আঙ্গিনা, পশ্চাতে একটী বৃহৎ কূপ—জল অব্যবহার্য্য। পাহাড়টী তরুলতাদি বর্জ্জিত। পশ্চিম অংশে বড় বড় পাথরের খণ্ড সকল। কোন লোকালয় নাই। পুরোহিত প্রাতঃকালে আসিয়া দরজা খোলেন এবং যাত্রীদের দর্শন অন্তে পুষ্করে নিজ গৃহে চলিয়া যান।

মন্দিরে সাবিত্রী দেবীর এক বিগ্রহ স্থাপিত। কেহ কেহ নিজহস্তে বিগ্রহের কপালে সিন্দূর লেপন করিলেন এবং হাতে লৌহবলয় স্পর্শ করাইলেন। যাঁহারা নিজ হাতে বিগ্রহ স্পর্শ করিবেন তাঁহাদিগকে ১॥✓ আনা দক্ষিণা দিতে হয়। অনেকে এতদতিরিক্ত পুরোহিতের কুমারী কন্যাকে বস্ত্রাদি দানও করিয়া থাকেন। কেহ কেহ নিজে বিগ্রহ স্পর্শ না করিয়া পুরোহিতের হাতে সিন্দূর ও লৌহবলয় দিয়া থাকেন এবং পুরোহিত লেপন ও স্পর্শন কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইঁহাদিগকে ।০ আনা ৵০ আনা দক্ষিণা দিতে হয়। অনেকে শুধু কিছু প্রণামী দিয়া বিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম করিয়া আসেন।

সিন্দুর লেপন এবং বালা স্পর্শ করান কার্য্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা যতটা করিয়া থাকেন অন্য প্রদেশীয় স্ত্রীলোকেরা ততটা করেন না—পুরোহিত নিজেই এই কথা বলিলেন।

বিগ্রহ, বিগ্রহের কপালে সিন্দুরে লেপন এবং হস্তে বলয় স্পর্শন দর্শন করিয়া ক্ষুদ্র পাহাড়টী ঘুরিয়া দেখিলাম। চতুর্দ্দিকে নিম্নভূমির মধ্যে একটী খণ্ড পাহাড়, ঐ নিম্নভূমির শেষ সীমায় আবার পাহাড়ের বেষ্টন।

দর্শন অন্তে বেলা ১০টায় ধর্ম্মশালায় প্রত্যাগমন করিলাম। স্নান আহার সমাপনান্তে বেলা ১২টায় পুষ্কর ত্যাগ করিয়া আজমীর ষ্টেশনে পৌছিলাম। জয়পুরগামী গাড়ী ষ্টেশনেই ছিল, ঐ গাড়ীতে রাত্র ৭টায় জয়পুর পৌছিলাম। প্রথমতঃ মাইজীকী ধর্ম্মশালা নামে এক ধর্ম্মশালায় গেলাম, কিন্তু এখানে সুবিধা বোধ না হওয়াতে এডওয়ার্ড মেমোরিয়েল ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এটি নামে ধর্ম্মশালা কিন্তু কাযে হোটেল। অন্যান্য ধর্ম্মশালার ন্যায় বিনা পয়সায় আশ্রয় পাওয়া যায় না। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য কোঠা ভাড়া করিলাম এবং হোটেল হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিয়া বিশ্রামলাভ করিলাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

এস মা

এস মা মহেশরাণি, এস আজি সংবৎসর পরে ;
দুঃখ শোক নিপীড়িত বাঙ্গালার প্রতি ঘরে ঘরে
ডাকিছে কাতর কণ্ঠে ধনী দীন দুঃখী আর্ত্ত সব,
ব্যথিতেছে চতুর্দ্দিক মর্ম্মস্পর্শী শুধু মা-মা রব !
করাল দুর্ভিক্ষ সদা করি ভীম বদন ব্যাদান
মা তব সন্তানে গ্রাসি বঙ্গ প্রায় করেছে শ্মশান !
অনশন-অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট, তবু সে জ্বালা ভুলিয়া
তোমার পূজার তরে যোড়করে আছে দাঁড়াইয়া।
তব শুভাগমে মাতঃ বাঙ্গালার প্রান্তরে প্রান্তরে,
আকাশে বাতাসে বনে, পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে,
তটিনীর কলতানে, বিহগের কাকলী কলায়
জীবন্ত উৎসবানন্দ নাচিয়া নাচিয়া আসে যায়।
রোগী ত্যজিয়াছে শয্যা, নাহি ক্লান্তি নাই সে যন্ত্রণা,
দরিদ্র অশন-ক্লিষ্ট ভুলে গেছে ক্ষুধার তাড়না।
যেরূপ ব্যথিত যেই, নাই আর সে বেদনা তার,
তিনটী দিবস মাগো চিত্তহারা করেছ সবার।
এস মা করুণাময়ি, অয়ি জটাজুট বিলম্বিতে,
জ্ঞানময়ি, ত্রিলোচনে, অর্দ্ধচন্দ্রে ললাট শোভিতে !
শারদ পূর্ণিমা ইন্দু পরাজিত বদন প্রভায়,
অতসী জিনিয়া বর্ণ, অনুপম রূপের ছটায়
নবীন যৌবনবতী বিভূষিত সর্ব্ব আভরণে,
কোটি চন্দ্র পরাজিত মনোহর দশন কিরণে।
দশহস্তে প্রহরণ মহিষ-অসুর-বিনাশিনি,
প্রধানা প্রথমা শক্তি, ব্রহ্মময়ি, শিবসীমন্তিনি
এস মা, চরণ তব নেত্রজলে করিয়া ক্ষালন
ভকতি কুসুমদাম বিল্বদলে করিব পূজন।
অযুত অযুত নতি দয়াময়ি চরণে তোমার
কৃপাবারিবিন্দু দানে সিক্ত কর অন্তর সবার।

শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

২১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

২য় খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

বনবাসার্থ রাম চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে স্বজন-পরিজনাদি সঙ্গে ভরত সেখানে আসিয়া রামকে রাজ্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অতি দীনভাবে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাম কিন্তু অচল, অটল। যিনি ধর্ম্ম-বুদ্ধি দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করেন, তাঁহার পক্ষে ঐরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি অতি ধীরভাবে ভরতকে এ বিষয়ে বুঝাইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার মুখে যে একটী নূতন কথা শুনা গেল, তাহাই এখানে আমার আলোচ্য। রাম বলিলেন ;—

"পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্ ॥
দেবাসুরে চ সংগ্রামে জনন্যৈ তব পার্থিবঃ।
সংপ্রহৃষ্টো দদৌ রাজা বরমারাধিতঃ প্রভুঃ ॥"

—তোমার জননীকে বিবাহ করিবার সময়ে আমাদের পিতা মাতামহের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঐ কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে তিনি রাজ্য দিবেন। তার পরে, দেবাসুর-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত রাজা তোমার জননীর সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আর এক বর দানের প্রতিশ্রুতি দেন।

কৈকেয়ীকে রাজ্যশুল্কা করিয়া বিবাহ—দশরথের এরূপ প্রতিশ্রুতির কথা বনবাসী রামের মুখে নূতন কথা! অযোধ্যা-কাণ্ডের প্রারম্ভে যে দুইটী বরদানের ব্যাপার লইয়া রাজ্যে একটা খণ্ড প্রলয় সংঘটিত হইয়া গেল, সেই দুইটী বরই কিন্তু দেবাসুর-সংগ্রাম-কালে প্রদত্ত। রামের গুণাবলী-মুগ্ধা কৈকেয়ী ঐ দুইটী বরের কথা বিস্মৃতা হইয়াছেন দেখিয়া দাসী মন্থরা সে কথা কৈকেয়ীকে স্মরণ

করাইয়া তাঁহার সুপ্ত বিমাতৃত্বকে জাগাইয়া দিয়াছিল। মন্থরা-কথিত দুইটী বরের কথা কৈকেয়ী অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং পরে তিনি দশরথের নিকট সেই দুইটী বরের কথা উল্লেখ করিলে, দশরথও তাহা অস্বীকার করেন নাই। তার পরে, দশরথের সমক্ষে কৈকেয়ী রামকেও ঐ দুই বরদানের কথা শুনাইয়াছিলেন। তাহাতে যাহা ঘটিবার, তাহাও ঘটিল। এখন তবে কৈকেয়ীকে রাজ্যশুল্কা করিয়া দশরথ বিবাহ করিয়াছিলেন, এ নূতন কথা রাম কেন বলেন ?

টীকাকার রামানুজ পূর্ব্বাপর এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাহা বিচার-সহ হয় নাই। বিবাহ-কালীন প্রতিশ্রুতিটী সম্বন্ধে তিনি স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নর্ম্ম-বিবাহে এরূপ প্রতিশ্রুতি অপালনে দোষ হয় না।—

"নমু স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
গোরক্ষণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্॥

ইতি স্মৃতিঃ। কৌশল্যায়াং বিদ্যমানায়াং কৈকেয়ী বিবাহস্য নর্ম্মবিবাহত্বাৎ তৎ প্রতিজ্ঞাহানির্ন দোষায়।"

এইরূপে টীকাকার এস্থলে রামোক্ত একটী প্রতিশ্রুতির খণ্ডন করিলেন। বাকী থাকিল "বরম্"। এই "বরম্" দিয়াই দুইটী কার্য্য সাধিত করিতে হইবে। তাই টীকায় দেখি, "বরং বরদ্বয়ম্"। এরূপে পূর্ব্বাপর অসঙ্গতির সামঞ্জস্য-সাধন কিন্তু তৃপ্তিকর নয়। কেন নয়, তাহা বলিতেছি।

কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার কালে প্রতিশ্রুতি-দান—এ কথা এই প্রথম শুনা গেল। ধরা যাউক, দশরথ এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং পরে, রাজ্য রামের হইবে, কি ভরতের হইবে, এ সমস্যার সমাধানও কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ (ঐ স্মৃতির বচনানুসারে মনে করা যাউক, ঐ স্মৃতি তখন প্রচলিত ছিল) গোপনে দশরথকে বলিয়া (রামায়ণে উল্লেখ নাই) দশরথের ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতেই ত কথা মিটিয়া গিয়াছে। তবে এই বনবাসে বসিয়া রাম সে প্রতিশ্রুতির কথা তুলেন কেন ? এবং যদিই বা তুলিলেন, বশিষ্ঠও ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ত টীকাকার-ধৃত স্মৃতির বচন বলিয়া বিবাহ-কালীন প্রতিশ্রুতি কাটাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বশিষ্ঠ ত তাহা করিলেন না।

দ্বিতীয়তঃ—দশরথের এই প্রতিশ্রুতির কথা রাম জানিলেন কিরূপে ? আর যদি তিনি কোন সূত্রে ইহা জানিয়াই ছিলেন, তবে অভিষেকের উদ্যোগারম্ভেই সত্যব্রত রামের উচিত ছিল পিতাকে এ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা। তাহাও তিনি করেন নাই। বরং তিনি অভিষেক গ্রহণের জন্য প্রস্তুতই হইয়াছিলেন। আবার যদি ধরা যায়—রামও স্মৃতির বচনানুসারে নর্ম্মবিবাহে পিতৃদত্ত প্রতি-শ্রুতি না রক্ষা করিায় দোষ নাই ভাবিয়া নিজের অভিষেকে আপত্তি করেন নাই, তবে এখন আবার ভরতকে সে প্রতিশ্রুতির কথা শুনাইবার অভিপ্রায় কি, ফলই বা কি ? বনবাসে আসিবার পথে কোনও ঋষিমুখে পিতার ঐরূপ প্রতিশ্রুতির কথাও ত রাম শুনেন নাই, তবে এখন রাম এ নূতন কথা বলেন কেন ? দুইটী বরেই কৈকেয়ীর বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। তবে এখন আবার সেই দুইটী বরের রূপান্তর করিবার উদ্দেশ্যই বা কি এবং ফলই বা কি ? বরং বিচার করিয়া দেখিলে ইহাতে পরোক্ষভাবে রাম-চরিত্রে বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণ হয়।

সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, ভরতের প্রতি রামের ঐ উক্তিটী প্রক্ষিপ্ত। কোনও অপরিণামদর্শী লিপিকর কবি, দশরথের ঐরূপ প্রতিশ্রুতি ভরতের উপরে সমধিক কার্য্যকরী হইবে ভাবিয়া রামের মুখে ঐ প্রতি-শ্রুতির উক্তিটী বসাইয়া দিয়াছেন কিন্তু তাহাতে মোটের উপরে তিনটী প্রতিশ্রুতি হইয়া দাঁড়ায় দেখিয়া দেবাসুর-সংগ্রামকালীন দুইটী বর স্থানে "বরম্" করিয়া প্রক্ষেপ-কারক নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। টীকায় স্মৃতির বচন দিয়া প্রতিশ্রুতিটী উড়াইয়া দেওয়াও 'টেনে বোনা' এবং তারপর একটী বরে কুলায় না বলিয়া "বরম্" অর্থে "বরদ্বয়ম্", ইহাও টেনে বোনা। ঐ দুইটী শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিয়া লইলে কিন্তু টানাটানি কিছুই করিতে হয় না। নতুবা এত টেনে বোনা সত্ত্বেও রাম চরিত্রে যে বিষম দোষ পড়িতেছে, তাহার নিরসন হয় না। পিতার প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়া শুনিয়াও রাম যে অভিষেক গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, বাল্মীকি-চিত্রিত রাম চরিত্রকে এত খানি হীন কল্পনা করাও দুষ্কর।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

"কালিদাসঃ কবীন্দ্রঃ"

সমালোচনার ইংরাজী definition (সংজ্ঞা) হইল passion for excellence—জাতৌ জাতৌ যৎ উৎকৃষ্টং তৎ রত্নং ইতি কথ্যতে—সমস্ত জাতির (species) মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহাই রত্ন নামে পরিচিত। সমালোচনা হইল এই রত্ন-পরিচয়। উৎকর্ষের প্রতি আন্তরিক ও গভীর অনুরাগই সমালোচনার প্রাণবস্তু। উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারি "নাল্পে সুখমস্তি"—যা বলা হইল অথচ চিরকালের জন্য বলা হয় নাই, যাহা ক্ষণস্থায়ী, যাহা কাল-সমুদ্রের ফেন বুদ্‌বুদের মত নিতান্ত নশ্বর তাহার প্রতি সমালোচনার অনুকম্পা থাকিতে পারে শ্রদ্ধা থাকিবে না; সমালোচনা বলে "ভূমৈব সুখম্"—যাহা চিরজীবী, শাশ্বত, অবলীলা ক্রমে যাহা মৃত্যুকে জয় করে—তাহাই সমালোচনার—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আলোচনার—বিষয়। তাহারই নির্দ্দেশে, তাহারই বর্ণনায়, তাহারই গুণ-কীর্ত্তনে সমালোচনা আপনাকে আপনি সার্থক করিয়া তোলে।

সংস্কৃত-সাহিত্যে যাঁহাদের দান কালজয়ী, চিরন্তন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি রত্নভূত, আমরা তাঁহারই—সেই সরস্বতীর বরপুত্রেরই—কীর্ত্তিকথার আলোচনা করিতে অদ্য প্রয়াসী। কিন্তু কথা উঠিতে পারে আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া তাঁহার সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমার অবধারণ আমরা কি করিয়া করিব? কিন্তু কালিদাসই বলিয়াছেন

ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ

অল্পবিষয়া মতি অর্থাৎ ক্ষুদ্র বুদ্ধি এবং সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ অর্থাৎ বৃহৎ একটা কিছু এই দু'য়ের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য সঙ্গতি আছে। কালিদাসের সমালোচনা ব্যাপারে আমরা কালিদাসের কথাতেই আশ্বস্ত হইতেছি।

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে আমরা বেশ জোড়া জোড়া নাম পাই; যথা সীতা রাম, রাম লক্ষ্মণ,—ভীমার্জ্জুন; সমালোচনা সাহিত্যেও পাইয়া থাকি যথা কালিদাস ও ভবভূতি, মাঘ ও ভারবি। কালিদাসের নাম করিলেই ভবভূতির নাম উঠিয়া পড়ে, তাঁহারা যেন এক গঙ্গোত্রীর দুইটি ধারা। ভবভূতি কোনও মহাকাব্য কিংবা খণ্ডকাব্য রচনা করেন নাই, সুতরাং প্রথম শ্রেণীর নাটককার হিসাবেই কীর্ত্তি-রূপ অমৃত ভোজন ব্যাপারে তিনি কালিদাসের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়াছেন। কিন্তু কথাটা খুব হেঁয়ালির মত শুনাইলেও বলিতে হয়, যাহাকে বলে ঠিক নাটকীয় প্রতিভা, সেই প্রতিভা লইয়া ভবভূতি জন্মিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। উত্তর-চরিতে দেখিতে পাই (বাহুল্য ভয়ে আর দুইখানা কম নামজাদা নাটকের উল্লেখ করিব না) আলেখ্য দর্শন নামক প্রথম অঙ্কের পর আর অবশিষ্ট ছয় অঙ্কে নাটকীয় ঘটনা-স্রোত নিদাঘ-তপ্ত তটিনীর ন্যায় বড়ই মন্থর গতি হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে যে গল্পটি আপনাকে আপনি সৃজন করিয়া তোলে—ইংরাজীতে যাহাকে বলে dramatic action—সেই গল্প-স্রোতাকে আরম্ভ হইতে পরিণতিতে লইয়া যাইতে ভবভূতি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িতেছেন। গল্প-স্রোত মধ্যে মধ্যে থামিয়া যায়, মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইবার ভয় দেখায়। পঞ্চবটী প্রবেশ নামক দ্বিতীয় অঙ্কে দিব্য পুরুষের আবির্ভাব নাটকীয় হিসাবে অযৌক্তিক (dramatically superfluous)—অথচ এই দিব্য পুরুষের মুখে এবং শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে ভবভূতি যে গুরুগম্ভীর বর্ণনা-পটুত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমরা মুগ্ধ। অন্য কবিরা যখন ফুলের পরাগে ধূসর ভ্রমর ও উটজাঙ্গনের মৃগশিশু লইয়া ব্যস্ত, তখন ভবভূতি ফুৎকার-ক্ষেপক ভল্লুক ও মহাকায় অলস অজগর দ্বারা পরিপূর্ণ জন-স্থানের ভীষণ অথচ মহিমময় চিত্রোদ্‌ঘাটনে কৃতনিশ্চয়, আসন্ন-সমুদ্র-সঙ্গমা বিশালকায়া তটিনী যেখানে আসিয়া অনন্ত নীল বারিধির সহিত আপনার শ্বেতধারা মিশাইয়াছে—সেই নদী সমুদ্রের উচ্ছ্বাসময়ী বর্ণনা, কল্লোল-কোলাহলে তাঁহার ভাষাকে আবিল ও আমাদের চিত্তকে আবিষ্ট করে।

সুতরাং বলিতে সাহস করি ভবভূতির প্রতিভা ছিল মহাকাব্যোচিত (essentially epical)। এই হিসাবে উত্তর-চরিতের সঙ্গে Goethe's Faust-এর সাদৃশ্য আছে। দু' খানাই epic drama। জনস্থানের অপরূপ চিত্রাঙ্কনে যে স্বভাব-কবিত্ব প্রকটিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে তুলিত হ'তে পারে কেবল কালিদাস-কৃত কুমারসম্ভবে হিমবানের বর্ণনা। আমরা মূল হইতে পাঠোদ্ধার করিতেছি—

কুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটা ঘুৎকারবৎকীচক-
স্তম্বাড়ম্বর মূক মৌকুলি কুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ঃ গিরিঃ।

অথবা

এতে তে কুহরেষু গদ্‌গদ নদদ্ গোদাবরী বারয়ো
মেঘালঙ্কৃত মৌলি নীল শিখরা ক্ষৌণীভৃতো দক্ষিণাঃ।

গদ্‌গদ-নাদী গোদাবরীর গতিভঙ্গেরই ন্যায় ছিল ভবভূতির ভাষা, আর তাঁহার বর্ণনাশক্তি বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয়, তাঁহার বর্ণনা অন্তহীন সাগরেরই মত—যাদঃ সংযোগে যাহা ভীতিপ্রদ হইয়াও মণিসংযোগ ছিল যাহা মনোহারী।

ভবভূতি সম্বন্ধে এই সব বলিয়া কালিদাস সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে এক কথা বলিলেই চলে—ভবভূতি যাহা কোনও কালেই ছিলেন না, কালিদাস তাহাই। প্রতিভাশালী নাট্যকারের গুণ তাঁহার ষোল আনাই ছিল।

ইংরাজী শিক্ষিত মহলে কালিদাসের নামের সঙ্গে আর একটা নামের যোড়া লাগিয়াছে—সেই নামটা বিশ্ববিখ্যাত মহা নাট্যকার শেক্সপীয়রের। ভবভূতি সম্বন্ধে যে কথা খাটে, শেক্সপীয়র সম্বন্ধেও তাহাই অর্থাৎ শেক্সপীয়র কোনও মহাকাব্য কিংবা খণ্ড কাব্য ইত্যাদি বিশেষ করিয়া রাখিয়া যান নাই—তিনি বিশেষ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—তাঁহার নাটক। Venus and Adonis বলিয়া যে কাব্য তিনি লিখিয়াছেন, তাহার সহিত "রঘুবংশম্" ইত্যাদির তুলনা করিলে বলিতে হয়, বায়স যেন গরুড়ের সঙ্গে আকাশপথে ব্যর্থ প্রতিযোগিতা করিতেছে। শেক্সপীয়রের "Sonnets" আর কালিদাসের "মেঘদূতম্"—আমরা বলি "সোণার মেডাল"—উৎকর্ষের যে স্বর্ণপদক—তাহা মেঘদূতেরই হস্তে অর্পণ করা হউক! সব্যসাচী বলিলে বুঝি যিনি দুইহাত সমভাবে অবলীলাক্রমে চালাইতে পারেন। কালিদাস ছিলেন চতুর্ভুজ এবং সব্যসাচী—তিনি সফোক্লিস্ অথবা শেক্সপীয়রের মত নাটক লিখিয়াছেন, হোমর, বাল্মীকির মত মহাকাব্য লিখিয়াছেন, Wagner, রবীন্দ্রনাথের মত গীতি নাটিকা (Opera) লিখিয়াছেন এবং স্বয়ং কালিদাসের মত "মেঘদূতম্" লিখিয়াছেন—সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার মত নাটককার নাই—বিশ্বসাহিত্যে তাঁহার মত "গানের রাজা" (lyric poet) নাই।

এখন দেখা যাউক নাটককার কালিদাস এবং নাটককার শেক্সপীয়র—এই দুইয়ের একটা তুলনামূলক সমালোচনা করা যায় কি না। আমরা অল্প কথায় নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা করিব। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুইলর-কাউচ্ সাহেব বলেন—

"I can barely imagine, yet can just imagine, a world in which the murder of Desdemona, the fate of Cordelia will be considered curiously, as brute happenings proper to a time outlived; and again, while I reverence the artist who in Othello or in Lear purges our passion, forcing us to weep for present human woe. The Tempest, as I see it, forces diviner tears, tears for sheer beauty; with a royal sense of this world and how it passes away, with a catch at the heart of what is to come. And still the sense is royal—it is the majesty of art—we feel that we are greater than we know."

অজ্ঞাতসারে অধ্যাপক মহাশয় কালিদাসেরই নাটকের সমালোচনা করিয়াছেন। œdipus Legend, Macbeth, King Lear—এ সমস্তের অবলম্বনে ঐরূপ বিয়োগান্ত নাটক রচিত হইতে পারে যাহা যুগপৎ আমাদের মনে গভীর করুণা এবং অমানুষী সন্ত্রাস উৎপন্ন করিবে। কিন্তু আসলে এগুলা হইল "those brute happenings proper to a time outlived." শেক্সপীয়রের Tempest এবং কালিদাসের শকুন্তলায়—"we breathe a serener atmosphere"—তপোবনের হোমগন্ধী বায়ু নিঃশ্বাস-

পথে গ্রহণ করি—"we feel that we are greater than we know."...

অথচ শকুন্তলার মত এত বড় একখানা বিয়োগান্ত নাটক পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ...তবে একটু অন্য ধরণের।

Raleigh সাহেব লিখিয়াছেন—"The tragedy of which they (the Sonnets of Shakespeare) speak is the topic and inspiration of all poetry; it may be read in all nature and in all art; there are hints of it in the movement of the dial hand, in the withering of flowers, in the wrinkles on a beautiful face; it comes home with the harvest of autumn and darkens hope in the eclipses of the Sun and Moon, the yellowing papers of the poet and the crumbling pyramids of the builder tell of it." যুদ্ধ বিগ্রহ একদিন হয়ত পৃথিবীতে থাকিবে না—হিংসা, দ্বেষ—"those brute instincts in man" একদিন হয়ত মানুষ পরিহার করিব —কিন্তু সেদিনও কি সবুজ পত্র আগন্তুক শীতের প্রকোপে শুষ্ক হইবে না? সেদিনও কি ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িবে না? মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ছোট্ট মেয়ে পথের ধারে বসিয়া সে দিনও কাঁদিবে—sunt lacrimæ rerum—sunt lacrimæ rerum—Tears awaken tears—all these tearful incidents of human life.

ঝরা পাতা, শুষ্ক ফুল ও ক্রন্দনরতা বালিকা—শকুন্তলা তাহারই tragedy। ডনকানের হত্যা, ডেসডেমোনাকে গলা টিপিয়া মারা, এই ক্রন্দনরতা বালিকার দুঃখের কাছে মনে হয় বীভৎস—"those brute happenings."

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্।

এত চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন না—শকুন্তলার আশ্রম জীবন শেষ হইতেছে—জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। এই যে ফুলের মতন মেয়েটি আশ্রম জীবন হইতে খসিয়া পড়িল, অথচ দুষ্যন্ত মালার মতন তাহাকে গলায় তুলিয়া লইলেন না, ইহার জীবনের যে tragedy—"that forces diviner tears, tears for sheer beauty"—দুই পথ যেখানে আসিয়া মিলিয়াছে সেই cross-roadএর ধারে পা ছড়াইয়া বসা মেয়ের কান্না Sunt lacrimæ rerum —Sunt lacaimæ rerum—কালিদাস এ ব্যথা বুঝিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি এখানেই থামেন নাই। তিনি ছিলেন নীললোহিত দেবের উপাসক, সমুদ্রমন্থনের বিষ শিব আকণ্ঠ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। এই যে সংসারের সব ব্যথা-বিষ, কালিদাস নীললোহিতের মতনই পান করিয়াছেন। হাস্য জিনিষটা অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু যে হাস্য ক্রন্দনের অন্তরের অন্তরালে থাকে সে হাস্য শাশ্বত। গ্রীক সাহিত্যে একেই বলে equilibrium, equipoise.

কালিদাস লিখিলেন—'পশ্চিমাৎ যামিনী যামাৎ প্রসাদমিব চেতনা।' পশ্চিমাৎ যামিনী যামাৎ চেতনাই কেবল প্রসাদগুণ লাভ করে না—কালিদাসও তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন। তাই ত তিনি ক্রন্দনভরা হাসি সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন! তাইত বলি এই "majesty of art"—"royal sense of this universe"

আরম্ভ হইল—দক্ষিণ বাটিকায়াং আলাপ ইব শ্রূয়তে

F. Myers ভাষা একটু ঘুরাইয়া বলিতে পারি—

"In this line it seems as if all that makes life precious were in the act of being created at once and together—poetry itself and the first emotion, and the inconceivable charms of song...."

আর শেষ হইল সপ্তম অঙ্কের সেই মহাবাক্যে—"ভাগ্যং পুচ্ছই।"

এত বড় সৃষ্টি কবে কোন মানুষ করিয়াছে জানিনা। উদীয়মান সূর্য্যের মত শেক্সপীয়র আমাদের দৃষ্টিকে অভিভূত করিয়াছেন—কালিদাসকে কিন্তু আমরা তুলিত করিব সপ্তর্ষিমণ্ডলের সঙ্গে।

পরিশেষে আমরা বলি অ্যাংলো স্যাক্সন শেক্সপীয়র আর হিন্দু কালিদাস দুইজনেই তাঁহাদের উন্নত মস্তকে যশের শুভ্র কিরীট ধারণ করিয়াছেন—তাঁহারা দুজনেই—"চারু চন্দ্রাবংতসৌ"।

উত্তরচরিতের আখ্যান ভাগের সহিত অভিজ্ঞান

শকুন্তলার আখ্যান ভাগের একটা সাদৃশ্য আছে। রাম সীতাকে নির্ব্বাসন করিতেছেন, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে অস্বীকার করিতেছেন। রাম ও দুষ্যন্তের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা দুই চারি কথা বলিতে চাই। প্রথমেই বলা যাইতে পারে রাম-চরিত্র static—অ-পরিণামী; দুষ্মন্ত চরিত্র dynamic—অর্থাৎ পরিণামী। "আলেখ্য-দর্শনে" আমরা রামভদ্রকে যেরূপ দেখি, সম্মেলন নামক সপ্তম অঙ্কে তিনি প্রায় তদবস্থাতেই থাকেন—প্রণয়শীল স্বামী ও ধার্ম্মিক নরপতি। কিন্তু দুষ্মন্ত চরিত্রের একটা আমূল পরিবর্ত্তন অভিজ্ঞান শকুন্তলায় আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয়।

প্রাণভয়ে ভীত, পলায়নপর হরিণের অনুসরণকারী দুষ্মন্ত রঙ্গমঞ্চে আমাদের নয়ন-গোচর হন—ঊর্দ্ধবাহু তাপসীর বাধায় হরিণ-শিশু কোনক্রমে পলাইয়া আত্ম-রক্ষা করে—কিন্তু হরিণদিগের যিনি ছিলেন দরদী মালিক, কণ্বমুনির আশ্রমের ভূষণস্বরূপা শকুন্তলা কিন্তু আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। দুষ্যন্ত হরিণ শিশুকে লক্ষ্যবিদ্ধ না করিলেও "প্রতিসংহর সায়কম্" এই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই এবং "ন প্রহর্ত্তুমনাগসি" কথাটা মানিয়া চলেন নাই। দক্ষিণ বাটিকায় আলাপ শ্রবণ করিয়া তিনি আকৃষ্ট হন্ এবং অতিক্রান্তযৌবনা সখীদের রসালাপ গোপনে শ্রবণ করেন। এখন যদি আমরা তৃতীয় অঙ্কের ঘটনাবলীর কথা মনে করি—কণ্ব মুনির আসিবার অপেক্ষা না করিয়াই শকুন্তলাকে হস্তগত করিবার কথা মনে করি, তাহা হইলে দুষ্মন্তের উপর বীতশ্রদ্ধ না হইয়া পারি না। পুরুবংশে যাঁহাদের জন্ম তাঁহাদের কি এই রকম আচ-রণ? তাঁহারা কি সকলেই এইরূপ lady-killer? এইরূপ ভ্রমে যাহাতে না পতিত হই তাহার জন্য কালিদাস আমাদিগকে দ্বিতীয় অঙ্ক দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য কবিবরের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। মন্দাক্রান্তাছন্দে দুষ্যন্তের মহিমার কথা তিনি সসম্ভ্রমে এবং ঔৎসুক্যের সহিত উদ্‌ঘোষণ করিয়াছেন—সেই বিরাট কীর্ত্তনেই দুষ্মন্ত চরিত্র আমাদের চিরপরিচিত হইয়া গিয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি তিনি মুনি—কিন্তু কেবলং রাজপূর্ব্বঃ রক্ষাযোগাৎ—রক্ষা করাই তাঁহার যোগ অর্থাৎ তপস্যা। তিনি বিনাশ করিবেন কিরূপে? তিনি lady-killer নন্, ফুল ছেঁড়া তাঁর স্বভাব নয়! আর হরিণ শিকার—সে ব্যবসাও তাঁর নয়—অস্যাধিজ্যে ধনুষি বিজয়ং পৌরুহুতে চ বজ্রে।" শেক্সপীয়রও Macbethকে Bellona's bridegroom lapped in proof বলিয়াছেন; Othello র মুখ দিয়া বলাইয়া-ছেন—Keep up your bright swords; for the dew will rust them। এইরূপে নায়কগণ বীরত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। উত্তরচরিতে শম্বুক বধব্যাপারে কিংবা চন্দ্রকেতুর স্তুতিতে রামভদ্রের বীরত্ব কিন্তু ততটা প্রকটিত হয় নাই। তারপর যা হইবার তাহা হইল—শকুন্তলা মর্ম্মান্তিক আঘাতে আহত হইয়া করুণার স্বর্গে আশ্রয় লইলেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক আমরা ত্বরান্বিত হইয়া অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ অঙ্কে উপস্থিত হইব। আমাদের দেশে একটা কিম্বদন্তী আছে যে চতুর্থ অঙ্ক সর্ব্বোত্তম। আমার মনে হয় ষষ্ঠ অঙ্কের কবিত্ব ও চরিত্র-বিশ্লেষণ অতুলনীয়। পঞ্চম অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছিল—

"অভিনব মধুলোলুপস্ত্বং তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীং"—এই সুরে। কিন্তু ষষ্ঠ অঙ্ক প্রতিধ্বনিত হইয়াছে আর এক রকম সুরে—

চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ।

এখানে একটা কথা। পঞ্চম অঙ্কে নায়কের মৃত্যু হইবে Bradley সাহেবের এই যে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা, ইহাকে খুব একটা অর্থহীন সংজ্ঞা বলিয়া মনে করি। মৃত্যু হয় কেন? যখনই দেখি একটা মহৎ গুণের জন্য কোনো একটি মহাশয় লোককে শাস্তি বহন করিতে হইতেছে—তখনই সেটা tragic হয়। Othello র ভালবাসিবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, Macbethএর রাজা হইবার একটা অপরিসীম যোগ্যতা ছিল—অথচ এই সদ্‌গুণাবলীর জন্যই তাঁহাদিগকে মৃত্যু দণ্ড পাইতে হইল—ইহাই tragedy—পঞ্চম অঙ্কে নায়কের মৃত্যু tragedy নয়। দোষের জন্য শাস্তি পায় অসাধু; গুণের জন্য শাস্তি পায় বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক। দুষ্যন্ত যদি নাগরিকই হই-তেন—"অবরোধে মহত্যাপি" এই নিয়মে নাগরিক হইবার তাঁহার মস্ত বড় একটা সুযোগ ছিল—তাহা হইলে ষষ্ঠ অঙ্ক ব্যাপিয়া দীর্ঘশ্বাসের সহিত অশ্রুজল তিনি অভাগিনী শকুন্তলার জন্য মিশাইতেন না। এক শকুন্তলার পরিবর্ত্তে

সহস্র শকুন্তলা তাঁহার করায়ত্ত ছিল। "উদধি শ্যাম-সীমাং ধরিত্রীং"কে যিনি "শশাসৈক পুরীমিব", তাঁহার পক্ষে অনাঘ্রাত পুষ্পের মত মনোরমা তরুণী প্রাপ্তি দুষ্কর হইত না। দুষ্যন্ত গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন— সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু। সত্য সত্যই তিনি ছিলেন সৎ। যখনই দেখি একটি মহৎ লোক একটা খারাপ অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছেন তখনই সেটা হয় tragedy। হত্যা করা পাপ, কিন্তু Macbeth হত্যাকারী নন্—ঈর্ষা লঘুচেতার ধর্ম্ম, কিন্তু Othello লঘুচেতা নন্। নাগরিকত্ব দোষাবহ, কিন্তু দুষ্যন্ত নাগরিক ছিলেন না। তাই এত মনস্তাপ এত দুঃখ। ষষ্ঠ অঙ্কের গভীর বিক্ষোভের পর সপ্তম অঙ্কের সুগভীর শান্তি, স্নেহশালিনী মাতার ন্যায় উপস্থিত হয়। সর্ব্বদমনের অস্থিরতায় এবং শকুন্তলার অনাড়ম্বর মহৎ সৌভাগ্যে নেপথ্য হইতে আমরা বলি ও মধুঃ, ওঁ মধুঃ, ওঁ মধুঃ—মধুবাতা ঋতায়তে। তপস্বী কণ্ব ছিলেন ব্রহ্মবিদ্, তাই ত তিনি যথার্থবাদীর ন্যায় বলিয়াছিলেন, উষার সময় সূর্য্য ঘোষণা সকলেই করিতে পারে, কিন্তু দুঃখরজনীর প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছিলেন মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া-স্বরূপা শকুন্তলা এবং অর্হতাং প্রাগসরঃ যে দুষ্যন্ত এই উভয়ের মিলন ঘটাইয়া—

সমানয়ন্ তুল্যগুণং বধূবরং
চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ।

সংস্কৃত সাহিত্যের মস্ত একটা নিয়ম যে বিয়োগান্ত নাটক সংস্কৃতে লেখা হতে পারে না। ভাগ্যের কথা, নহিলে সংস্কৃতেও শেক্সপীরীয় কিংবা গ্রীক নাটকই আমরা পাইতাম—কালিদাসের নাটক পাইতাম না। রামায়ণে দেখিতে পাই রাম ও সীতার শেষ জীবনে মিলন ঘটিল না। অথচ যে কবি রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, ক্রৌঞ্চবধূর দুঃখে যিনি একদিন অশ্রুপাত করিয়াছিলেন—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ ইত্যাদি যাঁর শোক "শ্লোকত্বং আপদ্যত" তিনিও হায় রঘু বধূর দুঃখের কথা মনেও আনিলেন না। কি দুর্দ্দৈব! ভবভূতি যখন তাঁহার মহতী লেখনী ধারণ করিলেন, তখন চিরদুঃখিনী সীতাকে রঘুকুলপ্রদীপের বামদেশে স্বর্ণ সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন নাই। বিয়োগান্ত নাটক লেখা হইতে পারে না ইহাই নিয়ম—অথচ কি গভীর কবিত্বের সহিত ভবভূতি এই নিয়ম মানিয়া লইয়াছেন। আত্রেয়ীর মুখে উচ্চারিত এই শ্লোক—পুরাণ কবির এই যে বাণী—উত্তরচরিতের ইহাই হইল মূল সুর। মহাকবি কালিদাস এবং ভবভূতি তাঁহাদের নায়ক নায়িকাগণকে "দুঃখের বরষায় চক্ষের জল" হইতে শাশ্বত মিলনের শরৎ পূর্ণিমা রাত্রিতে উত্তীর্ণ করাইয়াছেন।

শকুন্তলার সমাপ্তি-সূচক ভরতবাক্য লিখিবার ছলে কালিদাস একটা শ্লোক রচনা করেন—প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ ইত্যাদি। এই কবিতাটির সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত করিতে পারি এমন ভাষা আমার নাই। মৃত্যু-সঙ্গীতে যিনি এত মধু ঢালিতে পারেন—তিনি জীবনে কোন্ মহাসত্যের আস্বাদ পাইয়াছিলেন? সত্য সত্যই কি তিনি সরস্বতী বরপুত্র ছিলেন? ক্ষোভ নাই, গ্লানি নাই, হা হুতাশ নাই—পক্ব ফল যেমন আশ্রয়তরু ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর শ্যামশস্পে খসিয়া পড়ে—সেইরূপ কবি সুস্থচিত্তে মৃত্যুপুরীর নীরবতাকে তাঁহার ধ্যানগম্ভীর সঙ্গীত সরসতায় চঞ্চল করিয়া মৃত্যুর গলদেশে বাসর রাত্রির মালা দোলাইয়াছেন—ইহাতেই মৃত্যু নতজানু হইয়া তাঁহাকে অমরত্ব উপঢৌকন দিয়াছে।

F. Myers বলেন—"In literature as in life, affection and reverence may reach a point which disposes to silence rather than to praise. The same ardour of worship which prompts to missions or to martyrdoms when a saving knowledge of the beloved object can be communicated to, will shrink from all public expression when the beauty which it reveres is such as can be made manifest to each man only from within. A sense of desecration mingles with the sense of incapacity in describing what is so mysterious, so glorious and so dear."

জানিনা প্রাণের সহিত যাহাকে ভালবাসি মুখে তাহার প্রশংসা করিতে যাইয়া অপরাধ করিলাম কিনা—গুণ বুঝিবার যোগ্যতা নাই কিন্তু ভালবাসিবার স্পর্দ্ধা আছে, তাই অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশ হইতে বলি—কালিদাসঃ কবীন্দ্রঃ।

শ্রীফণীন্দ্রভূষণ রায়।

অতীতের প্রিয়া

জন্মে জন্মে যাহাদের বারবার বাসিয়াছি ভাল,
আজি এই ঘনায়িত আষাঢ় সন্ধ্যার অন্ধকারে
একে একে আসি তারা দাঁড়াইল ঘেরিয়া আমারে,
অতীতের হাসি মুখে, চোখে নিয়ে অতীতের আলো।

তাদের মঞ্জীরধ্বনি রিমিঝিমি বাজিল বাদলে,
রজনীগন্ধার গন্ধে গহন কুন্তল ধূপবাস,
শীকর সিঞ্চিত বায়ে বরতনু-পরশ আভাস,
বিজলী আঁকিয়া দিল স্বর্ণাঞ্চল সুনীল নিচোলে।

মুখে মুখে চেয়ে চেয়ে তোমাদের চিনিয়াছি প্রিয়া!
কোথায় লুকায়ে ছিলে এতকাল গূঢ় মর্ম্মপুরে,
অন্তরের অবরোধে, দেখি নাই নয়ন খুলিয়া;
আজিকে বিদ্যুৎবিভা উজলিল মানস মুকুরে,
স্মৃতির সুযুপ্ত বীজ বারিপাতে উঠে মুকুলিয়া,
মর্ম্ম মোর মুঞ্জরিল নবোদ্‌গত অঙ্কুরে অঙ্কুরে।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূত্রকার গোতম

যদিও আজ-কাল ভারতের অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনীষীদের সম্পর্কেই ঠিক কিছু বলা বড় সহজ নয়, ন্যায়দর্শন প্রবর্ত্তক গোতমের মত প্রাচীন মহর্ষিরা কবে কোন্ প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া এই ভারতভূমি পবিত্র করিয়া গিয়াছেন তাহার আলোচনা করিতে যাওয়া যে বাস্তবিক দুঃসাহসের কর্ম্ম ইহা বলাই বাহুল্য; তথাপি যথাসম্ভব তথ্যানুসন্ধানে উদাসীন থাকা সঙ্গত নহে।

ন্যায়দর্শনের রচয়িতা মহর্ষির নাম লইয়াই মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের প্রণেতা, আবার অনেকের মতে গোতমই ন্যায়দর্শনের রচয়িতা। কাহারো বা ধারণা—গোতম ও গৌতম দুইটিই প্রকৃতপক্ষে এক, দুইটিই বাস্তবিক ন্যায়দর্শনের প্রবর্ত্তক প্রাচীন মহর্ষিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। মুদ্রিত ন্যায়দর্শনের গ্রন্থসমূহেও অনেক স্থলে 'গোতম', কোথাও বা 'গৌতম' নামের উল্লেখ আছে; কাষেই 'গোতম' ও 'গৌতম'এর মধ্যে কোন্‌টা প্রামাণিক, দুইটিই এক ব্যক্তির নাম কি না, এ প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা আবশ্যক।

ন্যায়সূত্রেই তর্ক-বিদ্যার প্রথম প্রকাশ। তর্কের মতবাদ প্রথমে এই সূত্রগ্রন্থেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল। আমি কি, জগৎ কি, জগৎ ও আমার অন্তরালে কে আছে—এই তিনটী প্রশ্ন পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্য মহর্ষিদের মনে দার্শনিক চিন্তার ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। এই তিনটী প্রশ্নের বিশ্লেষণেই দার্শনিকতার উদ্ভব। এই প্রশ্ন তিনটী মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে ন্যায়সূত্রে অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ আলোড়িত হইয়াছে। আত্মাদি-দর্শনের সাধন, বেদোপদিষ্ট মনন বা যথার্থ অনুমানরূপ উপাসনা নির্ব্বাহ করিবার জন্য তর্ক-শাস্ত্রের সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এ জন্য ইহার নাম ন্যায়দর্শন বা 'দার্শনিক তর্ক-বিদ্যা'।

ন্যায়দর্শন ষড়দর্শনের অন্যতম, স্মরণাতীত কালে ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার অপূর্ব্ব নিদর্শন। পরম কারুণিক মহর্ষি গোতম ইহার প্রবর্ত্তক এরূপ প্রসিদ্ধি বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ন্যায়দর্শনে এ সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। সুতরাং কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন।

মহামহোপাধ্যায় বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় ন্যায় বার্ত্তিকের ভূমিকায় (১৪-১৮ পৃষ্ঠা) ন্যায়দর্শন প্রণেতার জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি উঁহার নাম, ধাম ও স্থিতি-কাল সম্পর্কে আলোচনা করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার মতে ন্যায়দর্শন-কারের নাম 'গোতম'—'গৌতম' নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় বাৎস্যায়ন ভাষ্যের ভূমিকায় (প্রথম খণ্ড ২৪-২৫ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন—"দ্বিবেদী মহাশয়ের যুক্তির বিচার না করিয়া এখন এই সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, যদি ঋগ্বেদাদি বর্ণিত রাহূগণ গোতমকেই অহল্যাপতি ও ন্যায়সূত্রকার বলিয়া গ্রহণ করা যায়, বিদেহ রাজবংশে তাঁহার পৌরোহিত্যনিবন্ধন জনকরাজার পুরোহিত শতানন্দকে তাঁহারই পুত্র বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও তিনি গোতমবংশীয় বলিয়া তাঁহাকে গৌতম বলিতে হয়, কারণ, বৌধায়ন গোত্রপ্রবর্ত্তক সপ্তর্ষির মধ্যে যে গোতমের নাম (পাঠান্তরে গৌতম) বলিয়াছেন, তাহারই দশটি শাখার মধ্যে রাহূগণ সপ্তম শাখা। বৌধায়ন গৌতম কাণ্ডে (২য় অঃ) রাহূগণ ঋষিকেও গৌতমগণের মধ্যে বলিয়াছেন। সুতরাং রাহূগণ ঋষি গোত্র প্রবর্ত্তক মূল পুরুষ গোতমের অপত্য হওয়ায় তিনি গৌতম। ফল কথা, রাহূগণ যে গোত্রকারী মূল পুরুষ গোতম নহেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। ("নির্ণয় সিন্ধু" গ্রন্থের গোত্রপ্রবর-নির্ণয় প্রকরণ দ্রষ্টব্য।) সুতরাং তিনি সূক্তদ্রষ্টা ও পুরোহিত বলিয়া গোতমবংশে তাঁহার প্রাধান্য নিবন্ধন বেদে মূলপুরুষ গোতম নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হয়। পূর্ব্বকালে মূলপুরুষের নামেও প্রধান ব্যক্তির নাম ব্যবহার ছিল। জনক রাজার পূর্ব্বপুরুষ নিমিরাজার পৌত্র জনক প্রথম জনক রাজা ছিলেন, তাঁহার নামানুসারেই রাজর্ষি জনক জনক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, ইহা বাল্মীকি রামায়ণের কথায় বুঝা যায়। (আদিকাণ্ড ৭১ সর্গ দ্রষ্টব্য।) গোত্রকারী সপ্তর্ষি বসিষ্ঠাদিও পূর্ব্ববর্ত্তী বসিষ্ঠাদির অপত্য বলিয়া গোত্র হইয়াছেন অর্থাৎ বসিষ্ঠাদির অপত্যও বসিষ্ঠাদি নামে গোত্র হইয়াছেন, ইহাও নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে কথিত হইয়াছে।"

ডসন্ সাহেবের (Mr Dowson) মতে ন্যায়-সূত্রকার গোতম। ইঁহার অপর নাম শতানন্দ। অনেক সময় ইঁহাকে গৌতমও বলা হইয়া থাকে। ইনি ধর্ম্ম শাস্ত্রেরও গ্রন্থকার। (১)

ভট্ট মোক্ষমুলার (Max-Muller) বলেন, হস্ত-লিখিত গ্রন্থসমূহে ন্যায়দর্শনকারের নামে স্বরবর্ণ 'ও'-কার ও 'ঔ'কার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও 'গোতম' কোথাও বা 'গৌতম' পাঠ আছে। গোতম ও গৌতম বস্তুতঃ এক। গোতম বা গৌতমের বংশধর বলিয়া ন্যায়দর্শনের প্রণেতাকে 'গোতম' ও 'গৌতম' দুইই বলা যাইতে পারে। বুদ্ধও ঐ গোতম বা গৌতম-বংশীয় হওয়ায় তাঁহার সহিত ন্যায়দর্শনকারের পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য সাধারণতঃ বুদ্ধকে 'গৌতম' ও ন্যায়-দর্শন প্রণেতাকে 'গোতম' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। (২)

নৈয়ায়িক-প্রবর ন্যায়পঞ্চানন বিশ্বনাথ ন্যায়সূত্রের 'বৃত্তি' গ্রন্থে ন্যায়দর্শনকারের নাম 'গোতম'—'গৌতম' নহে—এরূপ মতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। (৩)

বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে অক্ষপাদ দর্শনে 'গোতম' নামের কীর্ত্তন করিয়া ন্যায় দর্শনকারের মত স্বকীয় গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। (৪)

১। "Gotama—Founder of the Nyaya School of Philosophy. He is called also Satananda, also frequently Gautama. He was author of Dharma Sastra or law-book." (Dowson)
Cyclopoedia of India Vol. 1.

২। Gautama is the same as Gotama, only that by a tacit agreement Gotama has generally been used as the name of the philosopher, Gautama as that of Buddha, both belonging, it would seem, to the family of the Gautamas or Gotamas, the Mss. varying with regard to the vowel.
The Six Systems of Indian Philosophy, 369. p, New edition.

৩। "এষা মুনিপ্রবর গোতমসূত্রবৃত্তিঃ।
শ্রীবিশ্বনাথকৃতিনা সুগমাল্পবর্ণা।" ইত্যাদি

৪। 'ভগবতা গোতমেন প্রমাণাদি পদার্থ নবকলক্ষণ নিরূপণং বিধায়' ইত্যাদি।

ষড়দর্শন টীকাকৃৎ আচার্য্য বাচস্পতিমিশ্র 'ন্যায়-সূচীনিবন্ধে' ন্যায় দর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষিকে 'গোতম' নামে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"যেরূপ দুস্তর পঙ্কমগ্ন অতিবৃদ্ধ গোশ্রেষ্ঠ উত্তম ধেনুদিগকে উত্তোলন করিলে পুণ্যলাভ করা যায়, সেইরূপ দুস্তর কুনিবন্ধরূপ পঙ্কে মগ্ন অতি প্রাচীন শ্রীগোতম নামধেয় মুনির শোভন বাক্যজাতের সম্যক্ নিবন্ধন হেতু যাহা কিছু সুকৃত লাভ করিয়াছি তাহার সমগ্র ফল সংসার-সমুদ্র-সেতুস্বরূপ সকল দুঃখ শান্তির একমাত্র কারণ, গোতমধ্বজ মহেশ্বরে অর্পিত হইল। ইহাতে ভগবান্ প্রীতিলাভ করুন।" (৫)

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মহাকবি শ্রীহর্ষ নৈষধচরিতের সপ্তদশ সর্গে ৭৫ম শ্লোকে লিখিয়াছেন,—"শিলাত্ব বা পাষাণাবস্থারূপ মুক্তি প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত যিনি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি বাস্তবিক 'গোতমই'—আর কেহ নহেন। (৬)

এখন দেখা যাইতেছে তর্কবাগীশ মহাশয় রাহূগণ অহল্যাপতি মুনিকেই ন্যায়দর্শনের বক্তা বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার মতে ইঁহার নাম 'গৌতম', কাযেই দ্বিবেদী মহাশয়ের ন্যায় তিনি ন্যায়দর্শন প্রণেতাকে 'গোতম' বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। ঋগ্বেদাদি গ্রন্থোক্ত রাহূগণ গোতম আর অহল্যাপতি যদি একই ব্যক্তি হন, আর ঐ রাহূগণকেই যদি ন্যায়দর্শনের বক্তা বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ন্যায় দর্শনকারকে 'গোতম' বলা যাইতে পারে না, গৌতমই বলিতে হয়, কারণ অহল্যাপতির নাম কোথাও 'গোতম' দেখা যায় না, সর্ব্বত্রই 'গৌতম' নামে ইঁহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে বালকাণ্ডে ৪৮—৫১ সর্গে অহল্যাপতির বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সেখানে তাঁহাকে 'গৌতম' (৭) নামেই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শতানন্দ তাঁহারই পুত্র বলিয়া উত্তররাম-চরিতে শতানন্দের 'গৌতম' (৮) বিশেষণ দেখিয়াই শতানন্দের পিতাকে মূল পুরুষ 'গোতম' রূপে সিদ্ধান্ত করা যায় না। শতানন্দের পিতার নাম 'গৌতম' হইলেও গৌতমের অপত্য শতানন্দের 'গৌতম' বিশেষণটি উপপন্ন হইতে পারে। 'গোতম' শব্দের উত্তর 'অপত্য' অর্থে 'অন্' প্রত্যয় করিলে যেমন 'গৌতম' পদটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ 'গৌতম' শব্দের উত্তরও 'অপত্য' অর্থে 'অন্' প্রত্যয় করিলে 'গৌতম' পদটি নিষ্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং অহল্যাপতির পুত্রকে গৌতম দেখিয়া অহল্যা পতিকে গোতম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কল্পনা বৈ আর কিছুই হইতে পারে না। ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিতে যাইয়া এরূপ স্বকপোল কল্পনার আশ্রয় নেওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। রাহূগণ ঋষিও মূলপুরুষ গোতমের বংশধর (৯) বলিয়া গৌতমই হইয়া পড়েন,

---

৫। "যদলম্ভি কিমপি পুণ্যং দুস্তর কুনিবন্ধ-পঙ্কমগ্নানাম্।
শ্রীগোতম সুগবীনামতিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ॥
সংসারজলধিসেতৌ বৃষকেতৌ সকলদুঃখসমহেতৌ।
এতস্য ফলমখিলমর্পিতমেতেন প্রীয়তামীশঃ॥

দুস্তর কুনিবন্ধপঙ্কমগ্নানাং দুস্তরে কুনিবন্ধরূপে পঙ্কে মগ্নানাং অতি-জরতীনামতিবৃদ্ধানাং পুরাতনীনাঞ্চ শ্রীগোতম-সুগবীনাং শ্রীগোতমস্য গোশ্রেষ্ঠস্য তন্নামধেয়মুনেশ্চ সুগবীনাং উত্তমানাং ধেনূনাং শোভনানাং বাচাঞ্চ সমুদ্ধরণাৎ উত্তোলনাৎ সম্যঙ্-নিবন্ধনাচ্চ যৎ কিমপি পুণ্যং সুকৃতম্ অলম্ভি প্রাপ্তং, এতস্য অখিলং সমগ্রং ফলং সংসার-জলধিসেতৌ সকল দুঃখসমহেতৌ বৃষকেতৌ গোতমধ্বজে মহেশ্বরে অর্পিতং প্রদত্তং, এতেন ঈশঃ মহেশ্বরঃ প্রীয়তাং প্রীতো ভবতু—
—ইতি রূপকোত্থাপিতঃ শ্লিষ্টোঽর্থঃ। (প্রবন্ধকারস্য)

৬। "মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিথ তথৈব সঃ॥"

যঃ সচেতসাং চৈতন্যবতাং সুখদুঃখানুভবাভাবাৎ শিলাত্বায় পাষাণাবস্থারূপায়ৈ মুক্তয়ে মুক্তিং প্রতিপাদয়িতুং শাস্ত্রমূচে ন্যায়দর্শনং নির্ম্মমে···যূয়ং তং স্বয়মেব অবেত্য বিচার্য্যৈব গোতমমেতন্নামানং যথা বিথ জানীথ স এব তথা নান্য ইত্যর্থঃ। স গোতমো যথা যুষ্মাকং সম্মতস্তথা মমাপীত্যর্থঃ। নায়ং পরং নাম্না গোতমঃ, কিন্তু প্রকৃষ্টো গৌর্গোতমো মহাবৃষভঃ পশুরেব।" (টীকাকারস্য)

৭। "গৌতমস্য নরশ্রেষ্ঠঃ পূর্ব্বমাসীন্মহাত্মনঃ।
আশ্রমো দিব্যসংকাশঃ সুরৈরপি সুপূজিতঃ॥
স চাত্র তপ আতিষ্ঠদহল্যাসহিতঃ পুরা।
বর্ষপূগান্যনেকানি রাজপুত্রঃ মহাযশঃ॥"
(বাল্মীকি রামায়ণ ৪৮ সর্গ।)

৮। "গৌতমশ্চ শতানন্দো জনকানাং পুরোহিতঃ।
(উত্তর রামচরিত, প্রথম অঙ্ক।)

৯। "১। আয়াস্যাঃ, ২। সরদ্বন্তঃ, ৩। কৌমন্তাঃ,

সুতরাং ন্যায়দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি 'গোতম' হইলে তিনি রামায়ণোক্ত অহল্যাপতি নহেন, বেদাঙ্গ-গ্রন্থোক্ত রাহূগণ ঋষিও নহেন। অহল্যাপতি বা রাহূগণের 'গোতম' নাম কিছুতেই উপপন্ন হয় না। বাস্তবিক, রাহূগণ ঋষিকেই অহল্যাপতি বলিয়া স্বীকার করিলে আর অহল্যাপতিকেই ন্যায়দর্শনকার বলিয়া ধরিয়া লইলে ন্যায়দর্শন প্রণেতার নাম যে 'গৌতম'ই হইয়া পড়ে, 'গোতম' হইতে পারে না, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। কাযেই, দ্বিবেদী মহাশয়ের মত গ্রহণ করা যায় না। এই জন্যই তর্কবাগীশ মহাশয় ন্যায়দর্শনকারকে 'গোতম' না বলিয়া 'গৌতম' বলিয়াই প্রচার করিতে চান।

পরন্তু, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্য, ন্যায়সূচী-নিবন্ধকার বাচস্পতি মিশ্র ও নৈষধকার শ্রীহর্ষ ন্যায়সূত্রকারকে 'গোতম' নামেই জানিতেন, তাঁহারা উঁহাকে 'গৌতম' বলিয়া ভ্রমেও কীর্ত্তন করেন নাই। প্রাচীন ন্যায় সম্পর্কে তাঁহাদের মতের মূল্য অনেক বেশী, কারণ তাঁহারা গুরুপরম্পরা সুপ্রসিদ্ধ নামেরই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক ঐতিহাসিকদের ন্যায় কল্পনার আশ্রয় লন নাই। তাঁহাদের গ্রন্থে লেখকের দোষে 'গৌতম' স্থলে 'গোতম' লিখিত এরূপ কল্পনা করার অবকাশও সর্ব্বত্র নাই। বিশ্বনাথ ও মাধবাচার্য্যকে যদি বা এই বলিয়া বাদ দেওয়া চলিতে পারে, তথাপি শ্রীহর্ষ ও বাচস্পতি মিশ্র এই অজুহাতে বাদ পড়িবেন না, ইঁহাদের লিখিত শ্লোকের অর্থসঙ্গতি করিতে হইলে ন্যায়সূত্রকারকে 'গোতম' না বলিয়া পারা যায় না। ন্যায়দর্শনপ্রণেতার প্রকৃত নাম 'গোতম' না হইয়া যদি 'গৌতম'ই হইত তাহা হইলে গোতমের 'গোতম'ত্ব অব্যাহত রাখিয়া সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মহাকবি শ্রীহর্ষের পক্ষে ন্যায়দর্শনের রচয়িতাকে ব্যঙ্গ করা সম্ভব হইত কি? শ্রীহর্ষ ন্যায়শাস্ত্রকারকে 'গোতম' (মহাপশু) বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কবি-কল্পনা নহে, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মে ৩৮।৩৯ অধ্যায়ে বর্ণিত চার্ব্বাক উক্তিরই রূপান্তর মাত্র। ন্যায়দর্শনের নিন্দাপ্রসঙ্গে চার্ব্বাকপন্থী অনেকে ঐ নৈষধোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, ন্যায়দর্শন বা তাহার প্রণেতাকে নিন্দা করা শ্রীহর্ষের উদ্দেশ্য ছিল না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে তিনি ঐ নৈষধচরিতেরই দশম সর্গে ৮২ম শ্লোকে (১০) মহর্ষি গৌতমোক্ত আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যাকে মোক্ষের উপযোগী বলিয়া বর্ণনা করিতেন না। এখানে ঐ সপ্তদশ সর্গের শ্লোকটিতে ইন্দ্রের নিকট চার্ব্বাকের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া চার্ব্বাক যে ন্যায়দর্শনপ্রণেতা মুনিকে 'গোতম' (গোশ্রেষ্ঠ বা মহবৃষভ) বলিয়া উপহাস করিয়াছেন কবি তাহাই চার্ব্বাকের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। নারায়ণ প্রভৃতি টীকাকারেরা ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইনি যে শুধু নামেই গোতম ছিলেন এমন নহে, পরন্তু, কার্য্যেও 'গোতম'ই ছিলেন, 'গোতম' নামটি ইঁহার অন্বর্থ এরূপ ভাবই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

যদিও নৈষধোক্ত শ্লোকটিতে "শাস্ত্র" মাত্রের উল্লেখ আছে ন্যায়শাস্ত্রের নহে, তথাপি গোতমকৃত ন্যায়দর্শনে দুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষই অপবর্গ (১১) এরূপ সূত্রের উল্লেখ থাকায় নারায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণ 'শাস্ত্র' পদে 'ন্যায়দর্শন' বলিয়াই বুঝিয়াছেন। ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষির মতে দুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষই অপবর্গ। নৈষধোক্ত শ্লোকে শিলাত্বরূপ মুক্তির উল্লেখ আছে। ন্যায়দর্শনোক্ত অপবর্গ ভিন্ন এই শিলাত্বরূপ মুক্তি অপর কোন বস্তুকেই লক্ষ্য করিতে পারে না। মহর্ষি কপিলোক্ত দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পুরুষার্থও (১২) এই শিলাত্বরূপ মুক্তির লক্ষ্য হয় না, কারণ শ্লোকটিতে স্পষ্ট গোতমের নাম উল্লিখিত রহিয়াছে। গোতমের উল্লেখ না থাকিলে একবার ন্যায় ও সাংখ্যে গোতম ও

৪। দীর্ঘতমসঃ, ৫। উশনসঃ, ৬। কারেণুপালাঃ,
৭। রাহূগণাঃ, ৮। সোমরাজকাঃ ৯। বামদেবাঃ,
১০। বৃহদুক্থাঃ ।, (গোতমগণে বৌধায়ন)

১০। উদ্দেশ পর্ব্বণ্যপি লক্ষণেঽপি দ্বিধোদিতৈঃ ষোড়শভিঃ পদার্থৈঃ
আন্বীক্ষিকীং যদ্দশনদ্বিমালীং তাং মুক্তিকামাকলিতাং প্রতীমঃ।

১১। তদত্যন্ত বিমোক্ষোঽপবর্গঃ। ন্যায়সূত্র ১।১।২২

১২। অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ। সাংখ্যসূত্র ১।১

কপিলে টানাটানি করা চলিত। সুতরাং এই শ্লোকোক্ত শাস্ত্রপদে যে ন্যায়দর্শনকেই বুঝাইতেছে তাহাতে কোন রূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না। ফলতঃ, ন্যায়দর্শন-প্রণেতা মহর্ষির নাম বস্তুতঃ 'গোতম', 'গৌতম' নহে ইহাতেও মতভেদ থাকার কোনও কারণ দেখা যায় না

বিশেষতঃ, আস্তিক গোতম যাগযজ্ঞ ও বেদাদির সমর্থন করিয়া নাস্তিক চার্ব্বাকের মতে নির্ব্বোধ কাপুরুষ-দের জীবিকার একটা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন (১৩) বলিয়াই তাঁহার "গোতমত্ব" প্রতিপন্ন হইতে পারে, নামটি "গৌতম" হইলে এরূপ উক্তি সর্ব্বথা অসঙ্গতই হইত। সুতরাং ন্যায়দর্শন প্রণেতার নাম "গোতম," গৌতম নহে ইহা নিশ্চিত। গোতম ও গৌতম যে একই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতে পারে না তাহাও ইহাতেই সম্যক্ উপপন্ন হইতে পারে।

অধিকন্তু, ষড়্দর্শনটীকাকৃৎ আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়দর্শনপ্রবর্ত্তক মহর্ষির নাম এরূপ ভাবেই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন যে, তাহাতে উঁহাকে "গোতম" না বলিয়া "গৌতম" রূপে কল্পনা করিবারই অবকাশ নাই, কারণ, "গৌতম" বলিলে ন্যায়সূচীনিবন্ধোক্ত শ্লোকের অর্থসঙ্গতিই হইতে পারে না। কাযেই, ন্যায়সূত্র-কারকে "গোতম" না বলিয়া "গৌতম" নামে প্রচার করার চেষ্টা বাড়াবাড়ি মাত্র। ন্যায়সূচীনিবন্ধোক্ত শ্লোকে রূপকোত্থাপিত শ্লিষ্ট অর্থের সঙ্গতি বজায় রাখিতে হইলে আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র যে ন্যায়সূত্রকারকে "গোতম" বলিয়াই জানিতেন তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। "গৌতম" না বলিয়া "গোতম" বলাতে শ্রীহর্ষের কাছেও যে তিনি "গোতম" নামেই পরিচিত ছিলেন তাহাতেও কোনরূপ সন্দেহ করার কারণ নাই। "শ্রীহর্ষ "গৌতম" বলিয়াও ঐ উপহাস বর্ণন করিতে পারিতেন, কারণ, গৌতম অর্থাৎ গোশ্রেষ্ঠের বংশধর এই অর্থেও গৌতম বলিয়া চার্ব্বাক এই ভাবে উপহাস করিতে পারেন, (বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ১ম খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা) এইরূপ কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়া তর্কবাগীশ মহাশয় ন্যায়-দর্শনপ্রণেতাকে "গৌতম" নামেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু, বলা বাহুল্য ঐতিহাসিক হিসাবে কল্পনার কিছুই মূল্য নাই। এরূপ কষ্টকল্পনা করিতে যাওয়া এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। "গোতম" (গোশ্রেষ্ঠ) বলাই "গৌতম" (গোশ্রেষ্ঠের বংশধর) বলা অপেক্ষা সমধিক স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। বিশেষতঃ, শ্রীহর্ষ কি বলিয়াছেন তাহাই এখানে দেখা প্রয়োজন, কি বলিতে পারিতেন তাহা কল্পনা করা বৃথা। শ্রীহর্ষ যে ন্যায়সূত্র-কারকে "গোতম" বলিয়াই জানিতেন তাহা তর্কবাগীশ মহাশয়ও স্বীকার করিতে বাধ্য।

অতএব, দ্বিবেদী মহাশয়ের রাহূগণ ঋষি অহল্যা-পতি "গৌতম" বলিয়া ন্যায়দর্শনপ্রণেতা "গোতম" নহেন, কারণ, অহল্যাপতি মুনির "গোতম" নাম কিছুতেই উপপন্ন হয় না। তর্কবাগীশ মহাশয়ের "গৌতম"ও "গোতম" নহেন বলিয়া ন্যায়দর্শনের প্রণেতা হইতে পারেন না। বিশেষতঃ একই ব্যক্তি বস্তুতঃ "গোতম" ও "গৌতম" নহেন। "গোতম" ও "গৌতম" দুইটিই যদি একই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতে পারিত তাহা হইলে ঐ গোত্র দুইটিতে অন্ততঃ সমান সমান প্রবর দেখিতে পাওয়া যাইত। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রও সমান সমান প্রবর হইতে পারে, যেমন সাবর্ণি ও বাৎস্য-গোত্রের প্রবর এক সমান। গোতম গোত্র ও গৌতম গোত্রে সমান প্রবর দেখিলে না হয় দুইটিকে ভিন্ন না ভাবিয়া এক বলিয়াই গ্রহণ করা যাইত। কিন্তু বলা বাহুল্য, গোতম গোত্রের প্রবর ও গৌতম গোত্রের প্রবর সমান নহে। (১৪) কাযেই, ভিন্ন ভিন্ন প্রবর বলিয়া দুইটিই যে একই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতে পারে না তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

উত্তররামচরিতে শতানন্দের "গৌতম" বিশেষণ দেখিয়াই বোধ হয়, ডসন্ সাহেব শতানন্দ ও গৌতম যে একই ব্যক্তি তাহা স্থির করিয়াছেন। আর, ন্যায়সূত্র-কারের নাম গোতম কি "গৌতম" তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া ঐ শতানন্দকেই ন্যায়সূত্রকার বলিয়া সিদ্ধান্ত

১৩। অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ।
(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাকদর্শন)

১৪। গোতম গোত্রস্য প্রবরাঃ—গোতম বসিষ্ঠ-বার্হস্পত্যাঃ।
গৌতম গোত্রস্য প্রবরাঃ—গৌতমাঙ্গিরাঙ্গিরস বার্হস্পত্য নৈধ্রুবাঃ।
কেষাঞ্চিৎ—গৌতমাঙ্গিরসাবাসাঃ।

করিয়া বসিয়াছেন। তিনি যদি ন্যায়শাস্ত্রের একখানা গ্রন্থও দেখিতেন তাহা হইলে বোধহয় এরূপ দুঃসাহসের পরিচয় দিতে পারিতেন না। অহল্যাপতি গৌতমের পুত্র বলিয়া শতানন্দকে "গৌতম" বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইনি যে কিছুতেই ন্যায়দর্শনের বক্তা "গোতম" হইতে পারেন না তাহা বোধ হয় আর এখানে না বলিলেও চলিতে পারে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের বক্তা যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহা প্রচার করিতেও ইনি লজ্জাবোধ করেন নাই। কাযেই, ইঁহার মনগড়া কথার যে কোনও মূল্য নাই তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

ভট্ট মোক্ষমুলার সাহেবও এক্ষেত্রে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। হস্তলিখিত গ্রন্থসমূহে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখিয়াই বুদ্ধকে "গৌতম" বলিবার জন্য ন্যায়দর্শনকারকে "গোতম" বলা হয় এরূপ সিদ্ধান্ত তিনি কিরূপে উপনীত হইলেন তাহা বুঝা কঠিন ব্যাপার বটে। ফলতঃ গোতমবংশীয় হইলেও ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি "গোতম" যে "গৌতম" হইতে পারেন না তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে; বুদ্ধ হইতে পৃথক্ করিবার জন্যই তাঁহার নাম গোতম হয় নাই, গোতম তাঁহার ব্যুৎপন্ন নাম। ব্যুৎপন্ন নাম বলিয়াই তিনি গোতম বংশধর হইয়াও "গৌতম" না হইয়া "গোতম" হইয়াছেন, নতুবা গোতম অথবা গৌতম অথবা উভয় নামেই পরিচিত হইতে পারিতেন। বুদ্ধদেব সর্ব্বত্রই "গৌতম" নামে পরিচিত নহেন। ব্রহ্ম-দেশে "গোতম" বলিয়াই তিনি সচরাচর অভিহিত হইয়া থাকেন। (১৫) সুতরাং ভট্ট মোক্ষমুলার সাহেবের অনুমান যে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত বৈ আর কিছুই নহে তাহাতে সন্দেহ করার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

১৫। "Gotama: a name of Sakyasinha applied to him after his death, when he had become a Buddha. It is by this name that he is usually known in Burma." Cyclopœdia of India.

গান

আজ বরষায়, মন কি যে চায়
বুঝিতে পারিনে হায়,
সুনীল গগন বিষাদে মগন
ওগো কোন্ বেদনায়?
বাতাসেতে কার এত হাহাকার,
উত্তরোল ঝরে কার আঁখি ধার?
ভেঙে পড়ে যেন হৃদয়ের ভার
ব্যথা ভরা নিরাশায়!

ঘনালো আঁধার—প্রদীপ আমার
নিবিয়া গিয়াছে, জ্বালিনিক আর!
এই আঁধারেতে খুলে দিছি দ্বার,
আছি তব ভরসায়।
তোমা লাগি আজি হবে অভিসার,
বিফল হবে না রাতি আজিকার—
পাব, পাব, আমি দরশ তোমার
এই ঘোর বরষায়।

শ্রীউমা দেবী।

হিন্দুর মেয়ে

(উপন্যাস)

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মানব চরিত্র বিচিত্র রহস্যময়। যাহা কল্পনায় হৃদয়ে স্থান দিতে সাহস হয় না, সময়ে তাহাই বাস্তব রূপে দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, অসহনীয় যন্ত্রণাও ক্রমে সহনীয় হইয়া যায়।

যে ভীষণ ব্যথা এক দিন অতর্কিতভাবে সুব্রতাকে

আক্রমণ করিয়া বালিকার সুকুমার অন্তঃকরণ শতধা বিদীর্ণ করিয়াছিল, কালের স্নিগ্ধ প্রলেপে সে ব্যথার তীব্রতা তাহার সহনীয় হইয়া উঠিল। সুব্রতা বাংলা-দেশের মেয়ে যাদের 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না'। তার বুক ফাটিল বটে, কিন্তু মুখ ফুটিল না।

স্বামী যে কাহার প্রতি অনুরক্ত, কাহার গুণে মুগ্ধ—ইহা কেহ সুব্রতাকে না বলিয়া দিলেও তাহার মনই তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল।

স্বামী যাহাকে ভালবাসিয়াছেন তাহার প্রতি সুব্রতার দ্বেষ হইল না। কিন্তু স্বামীর উপর কেমন যেন একটু অভিমান হইল, সেটুকু অভিমান বলিলেও চলে, আবার নিজের প্রতি ধিক্কার বলিলেও চলে।

তাহার প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস—ইহার কি কোনই মূল্য নাই? তাহাতে স্বামার আশা মিটিল না, তৃপ্তি হইল না, তাহার প্রেম, তাহার ভক্তি সে কি নিশির শিশির বিন্দু, একজনার রূপরৌদ্রালোক ছুঁইতে না ছুঁইতেই মিলাইয়া গেল! সে অসীমের এম্‌নি অযোগ্যা স্ত্রী! যে স্ত্রীর ভালবাসা স্বামীকে শত প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে পারে না, দুঃখ দুর্দ্দিনে স্বামীর অন্তরাকাশে সমুজ্জ্বল তারাটির ন্যায় উদয় হইয়া থাকে না,—সে কি আবার ভালবাসা?

ভালবাসা যাহাই হোক না কেন, কিন্তু কিরূপে যে তাহারা আবার মিলিত হইবে; সুব্রতা তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। সে হিন্দুর মেয়ে, জীবনে সত্য, ধর্ম্ম, দেবতা এই তিনটিকেই পার্থিব সুখ সম্পদের অনেক ঊর্দ্ধে স্থান দিয়া রাখিয়াছিল।

এক মহাতীর্থে দেবতার নামে স্বামী যাহা বলিয়া-ছিলেন, তাহার অন্যথায় স্বামীর অকল্যাণ হইবার আশঙ্কা সরলা সুব্রতার সকল দুঃখ ছাপাইয়া অনেক উপরে উঠিল। শুধু উপরে উঠা নয়, তাহার মনের ভিতর স্বামীর সহিত একটা বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল।

অসীমের চিঠির প্রথম ধাক্কায় সুব্রতা অভিভূত হইলেও বিবশা হইল না। হৃদয়ের যন্ত্রণা হৃদয়ে চাপিয়া সে হৃদয় বাঁধিল।

অনেক ভাবিয়া, অশ্রুজলে চিঠির অনেক কাগজ নষ্ট করিয়া তাহার পর সুব্রতা স্বামীকে চিঠি লিখিল। চিঠিতে হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল না; স্বামীকে ডাকিল না। সেই দিন হইতে তাহাদের একযাত্রা পথের ভেদ আরম্ভ হইল।

স্ত্রী ডাকিল না বলিয়া অভিমানে অসীম সে সম্বন্ধে আর আলোচনা করিল না। কিন্তু স্ত্রীর নিকটে চিঠি লেখা বন্ধ করতে পারিল না।

অসীমের চিঠি আসিত, সুব্রতারও চিঠি যাইত, সে চিঠিতে কি থাকিত না না থাকিত তাপসী তাহার খবর লইতেন না। দিন দিন সুব্রতাকে তপস্বিনী গৌরীর ন্যায় চিন্তামলিন ও কৃশ দেখিয়া তাপসী একদিন হাসিয়া বলি-লেন, "হ্যাঁরে, ব্রতা, তুই দিন দিন এমন হয়ে যাচ্ছিস কেন? তোর স্বামী তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পতির পুণ্যে সতী যেন পুণ্যের প্রদীপ শিখাটি হয়ে যাচ্ছেন। অসীম যে দুষ্ট হয়েছে, বড়দিনের বন্ধের আগে ও হয়তো আসবেই না। তুই বরং এর ভেতর একবার কটক থেকে ঘুরে আয়; বাবার কাছে মা'র কাছে গেলে তোর শরীরও ভাল হবে, মনও ভাল হবে।"

সুব্রতা নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া ব্রতা বলিল, "আমায় ঐ কথা কেন বলছ দিদি? তোমার কাছ থেকে কোথায় গেলে আমার মন ভাল থাক্‌বে? বাবা মার কাছ থেকে আমি কি তোমার কাছে অসুখে থাকি যে শরীর মন ভাল করতে আমায় কটকে যেতে হবে? না, দিদি, তুমি আমায় কোথাও পাঠিয়ো না, তোমার কাছে থাক্‌তে দিও।"

বলিতে বলিতে সুব্রতার চোখের প্রান্ত বহিয়া দু'টি জলের ধারা নামিয়া আসিল।

তাপসী বিস্মিত হইলেন। তিনি এমন কি বলিয়াছেন যাহাতে সুব্রতা এত কষ্টানুভব করিতেছে? আজ কাল সুব্রতার এ কি পরিবর্ত্তন? যেখানে হাসির ঝরণা কুলু কুলু তানে বহিয়া যাইত, সেখানে এ অশ্রুর প্লাবন কোথা হইতে আসে? কিসে সুব্রতাকে শিশিরাশ্রুপ্লুত শেফালিকার মত এমন এমন অশ্রুভারে বিমণ্ডিতা করিয়াছে?

তাপসী ব্যথিতা হইয়া সুব্রতার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে মমতাভরা কণ্ঠে বলিলেন, "পাগলী মেয়ে, কটকে যেতে বলেছি বলে কেঁদে ফেল্লি! তুই দিনকের দিন কি

হচ্ছিস ব্রতা? যত বড় হচ্ছিস, ততই ছিচ্‌কাঁদুনে হ'য়ে যাচ্ছিস। আগে তো এমন ছিলি না! তোকে কাছে রাখা তোর দিদির কি অসাধ? তোরা ছাড়া তোর দিদির আর কে আছে ব্রতু? কটকে যেতে বলছি না, এম্‌নি একটা কথার কথা বলেছি বৈ তো নয়। কোথাও তোকে যেতে হবে না বোন, তুই জন্মে জন্মে তোর দিদির ছোট বোনটি হয়ে তার কোলের কাছেই থাকিস।"

"তুমি আমায় সেই আশীর্ব্বাদ কর দিদি, আমি যেন জন্ম জন্ম তোমারি ছোট বোন হবার সৌভাগ্য লাভ করি।" বলিয়া সুব্রতা তাপসীর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

তাপসী স্নেহভরে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া ধরা গলায় বলিলেন, "অত বেশী বেশী বোলসনে ব্রতা, এ দিদির বোন হওয়া সৌভাগ্য নয়রে, দুর্ভাগ্য।"

দিদির আদরে গলিয়া গিয়া সুব্রতা ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় তাপসীর কোলে মুখ লুকাইয়া মনে মনে বলিল, "দিদি, তুমি জান না, তোমার স্নেহ আমার বুকে কি অমৃত দিয়েচে। তুমি না থাক্‌লে তোমার ভালবাসা না থাক্‌লে আমি বাঁচতাম না দিদি, একদিনও বাঁচতাম না। শত জন্মের শত পুণ্যে আমি তোমাকে পেয়েছি। যে দুঃখ আমার বুকে পাষাণ হ'য়ে আছে, তোমাকে গোপনে করেই পাষাণ হ'য়েছে, নইলে ফুল হ'য়ে যেতো। আমার গোপনতার প্রয়াস, আমার ছলনা তুমি যখন জান্‌বে তখন আমায় মাপ কোরো দিদি, একজনার আদেশ বলে মাপ ক'রো।"

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি শেষের দিকে অকাল বর্ষা নামিয়াছিল টিপি টিপি বৃষ্টি ও শীতল বাতাসে অগ্রহায়ণকে পৌষ বলিয়া ভ্রম হইতেছিল।

সারা সকালটি মৃদু মৃদু বর্ষণের পর এত বেলায় একটু ধরণ হইয়াছে। ঈশান কোণে ঘন মেঘ এখনও জমা হইয়া রহিয়াছে। বাতাসের বেগ অত্যন্ত প্রখর, রহিয়া রহিয়া গুরু গুরু মেঘ ডাকিতেছে। বায়ুস্পর্শে গাছের জল টুপুর টুপুর করিয়া পাতার পাতায় ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে চক্ষু জুড়ান গাঁদা ফুলের ঝাড় বৃষ্টিজলে ধৌত হইয়া বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া হাসিয়া উঠিতেছে।

তাপসী স্নানান্তে নিত্য পূজা সারিয়া তুলসীমূলে জল দিতেছিলেন। সুব্রতা উনুনে ডা'ল চড়াইয়া, বঁটী পাতিয়া কুটনা কুটিতে কুটিতে রঘুর সহিত গল্প করিতেছিল।

রঘুর একান্ত আগ্রহে পূজার সময় জামাই মেয়ের পূজার কাপড় দিয়া অন্নদা রঘুকে মুক্তাহারে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, রঘুর এখনও কটকে ফিরিয়া যাওয়া হয় নাই। এক দিদির স্নেহের টানে ছুটিয়া আসিয়া রঘু দুই দিদির মায়াজালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। দুই দিদির মায়াজাল বিষম শক্ত, সহজে ছিন্ন করা যায় না। ছিন্ন করিবার ইচ্ছাও তেমন নাই।

তাপসী তুলসীতলা প্রণামান্তে রন্ধন শালায় ঢুকিয়া সুব্রতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি কুটছিস ব্রতু? এ যে মটর শাক দেখছি, কে তুলে আন্‌লে রে?"

সুব্রতা জবাব দিল, "রঘুদা তুলে এনেছে দিদি, তুমি কাল যে ওকে শাকের ঘণ্ট রেঁধে খাইয়েছ—তার লোভে আজ আবার তুলে এনেছে। আমি আর সব রাঁধচি, কিন্তু ঘণ্টটি তোমায় রেঁধে দিতে হবে দিদি, তোমার মত হাতের তার আমার হয় না।"

"হয় না আবার, হওয়ালেই হয়। ভারী তো শাকের ঘণ্ট তার আবার এত ব্যাখ্যা!" বলিয়া তাপসী রঘুর পানে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "এত জল কাদাতেও তোমার শান্তি নেই রঘুদা? রাতদিন খেটেই মরছ! সুদামকে বল্লেই পারতে, সেই শাক তুলে দিত, তোমার কাদা ঘাঁটা কেন? যাও চান ক'রে জল মুখে দাও। এখনও বৃষ্টিটা ধরেছে, বেলাও কম হয় নি, তুমি আর দেরী কোরো না রঘুদা।"

রঘু উঠিয়া বলিল, "যাই দিদি। দু'টো শাক তুলেচি ভারীতো কায তাই আবার এত ক'রে বলছ! এখানে এসে তোমাদের কল্যাণে আমার বাত হ'বার যো হয়েছে। আমাকে চান্ ক'রে জল খাবার তাগাদা দিচ্ছ, তোমাদের তো পূজো টুজো সারা হ'ল তোমরা কিছু জল খেয়ে নিয়ে রান্না বান্না কর। আমি বাবা ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে চান করতে যাই।"

রঘুর বাবা ঠাকুরকে লইয়া আর স্নানে যাওয়া হইল

না। একখানি টেলিগ্রাম হস্তে বিমনা ভাবে তাঁহাকে অন্দরে আসিতে দেখিয়া রঘুর প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল।

তাপসী ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিয়া উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসিল, "কোথায় থেকে টেলিগ্রাম এল বাবা? অসীম ভাল আছে?"

বধূর হস্তে টেলিগ্রাম খানি অর্পণ করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় শান্তস্বরে বলিলেন, "না মা অসীম ভাল নেই, তার জ্বর হ'য়েছে। তাই মুরারিবাবু আমাদের যেতে লিখেছেন।"

"টেলিগ্রাম" "অসীমের জ্বর" এই দুইটি শব্দই মুহূর্ত্তে সুব্রতাকে যেন অটল পাষাণ প্রতিমায় পরিণত করিয়া ফেলিল। তাহার হাতের শাকের আঁটী তেমনি রহিল, হৃদয়ের মধ্যে প্রলয়ের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘ আসিয়া জমিতে লাগিল।

এক বধূ কুটনা লইয়া রহিল, আকস্মিক বিপদে আর এক বধূর কথা ফুটিল না বলিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় নীরব রহিলেন না। ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি ও বাড়ীর বিকাশকে ব'লে এলাম মা, সেই তোমাদের কানপুরে নিয়ে যাবে। তোমরা যা হোক্ দুটো রান্না ক'রে তৈরী হ'য়ে নাও, তাড়াতাড়ি না করলে আজকের ষ্টীমারটা ধরতে পারবে না। রঘুও তোমাদের সঙ্গে থাক্, ও তোমাদের সঙ্গে থাক্‌লে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারবো।"

তাপসী বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল. "আমরা সব যাব, আপনি কি যাবেন না বাবা?"

"না, আমি আমি যাব না। আমি গেলে আমার শ্যামসুন্দর কার কাছে থাক্‌বে মা? এত কাল পরে এত বয়সে শ্যামসুন্দরকে ছেড়ে আমার কোথাও যাওয়া হবে না জননী!"

"যাবেন না বাবা? অসীমের এমন অসুখ শুনেও যাবেন না? কেমন ক'রে থাক্‌বেন বাবা, থাক্‌তে পারবেন?"

"থাক্‌তে পারবো না? আমার না থাকার মত অবস্থা তুমি কি কখনো দেখেচ মা? তোমাদের এ বুড়ো ছেলে সব পারে। শ্যামসুন্দর তাকে অনেক পরীক্ষা করেছেন, বাকী যা আছে তাও করবেন। তাঁর দেওয়া সব আমি মাথা পেতে নেবো, আমার জন্যে চিন্তা কিসের মা?"

তাপসী আর কিছু বলিল না। শ্বশুরের অশ্রুমাখা কথগুলিতে তাহার স্মৃতির দ্বার খুলিয়া গেল। সেই উন্মুক্ত দ্বার পথে দুঃখের পর কতই দুঃখ ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তখন সে সব দুঃখ প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করিবার অবসর ছিল না। তাপসী একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে উঠিয়া গেলেন।

"দিদি!"

তাপসী ছোট একটা বাক্স কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার ভিতর সমস্ত গুছাইয়া লইতেছিলেন. সুব্রতার দিদি ডাকে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন "তোর ভোগ রান্না কতদূর হল ব্রতা? আমি তোর চার খানা কাপড় নিলাম, ওতেই হয়ে যাবে, না হলে—"

ব্রতা বাধা দিয়া স্থির কণ্ঠে কহিল, "আমার কাপড় নিয়ো না দিদি, আমি যাব না।"

"যাবি না! এটা কি তোর ঠাট্টার সময় হল ব্রতা?"

"আমি ঠাট্টা করিনি দিদি, সত্যিই আমি যাব না। আমরা দু'জনে গেলে বাবাকে কে দেখবে? শ্যামসুন্দরের পুজো, ভোগের কে যোগাড় করবে? তুমি গেলে আমার যাবার কিছু দরকার হবে না দিদি।"

সুব্রতা বলে কি? কেমন কথা? তাপসী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সুব্রতার পানে চাহিয়া রহিল। সুব্রতার মুখে সংকল্পের ছায়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। চক্ষু প্রদীপ্ত, কণ্ঠস্বর অবিচলিত। এই কি ভীতা বিহ্বলা সুব্রতা? কে বলিবে এ সেই স্বামী-বিরহে কাতরা, বৃক্ষচ্যুত ক্ষীণা লতিকার ন্যায় ভাবে বিবশা বালিকা!

কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া চাহিয়া তাপসী বলিল, "বাবার কষ্ট হবে বলে তুই যাবি না ব্রতা? কিন্তু আমার সঙ্গে তোকে না দেখলে তার যে কত কষ্ট হবে তা কি একবার ভেবে দেখেছিস? তোকে না নিয়ে আমি কোন্ মুখে তার রোগশয্যা পাশে গিয়ে দাঁড়াব? কাত্যায়নী ঠাকুরঝিকে বল্লেই সেই এসে বাবাকে দেখ্‌বে শুনবে, ভোগ রাঁধবে। সে কাযের জন্যে তোকে থাকতে হবে না। অসীমের অসুখের খবর পেয়ে তুই যে এমন অম্লান মুখে যাব না বল্লি কি করে তাতে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি।"

"তুমি জান না দিদি, কেন আমি সেখানে যেতে চাচ্ছি

।। আমার যাবার উপায় নেই। আমার সব চেয়ে বড় কষ্ট তা তোমায় বলতে পারছি না। তুমি তাঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো দিদি, যেতে ব'লে আমায় আর দুঃখ দিও না। কথা না শোনার দুঃখ আমি যে আর সইতে পারি না।" চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া সুব্রতা বিদ্যুদ্ বেগে তাপসীর নিকট হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুব্রতার করুণকণ্ঠে তাপসী কিসের যেন একটা আভাস পাইলেন। আংটি, সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্ বাণী হঠাৎ তাঁহার স্মরণপথে আসিল। ব্রতার ঘনকৃষ্ণ নয়নের নিবিড় বেদনার মর্ম্ম আজ আর তাঁহার কাছে লুকান রহিল না। নিজের উদাসীনতার অনুতাপে ও লজ্জায় তাপসী যেন যেন মরমে মরিয়া গেলেন।

সুব্রতা এতদিন যাহা বক্ষপঞ্জরে ঢাকিয়া রাখিয়া প্রতি-দিনের জীবন যাত্রায় হাসিমুখে যোগ দিয়া আসিয়াছে, তাহার সে লুকান ব্যথা বাহিরে টানিবার প্রবৃত্তি তাপসীর হইল না। কানপুরে যাওয়া সম্বন্ধে আর কিছু তাপসী সুব্রতাকে বলিলেন না। বধূর অনিচ্ছায় শ্বশুরও আপত্তি করিলেন না।

যাত্রাকালে তাপসী সুব্রতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া স্নেহ-স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "তুই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকিস ব্রতা, আমি যত শীগ্‌গির পারি অসীমকে তোর কাছে ফিরিয়ে আনবো। তোর কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই, আমি জানি শ্যামসুন্দর তোর প্রাণে এতটুকু আঘাত দেবেন না। যদি কিছু দিয়েই থাকেন সে আমারি দোষে, তোর দোষে নয় ব্রতু

পাড়ার ছেলে বিকাশ ও পুরাতন ভৃত্য রঘুকে লইয়া তাপসী রওনা হইয়া গেলে সুব্রতা ঠাকুরঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

দেবতার সন্নিধানে তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সুব্রতা করযোড়ে ডাকিতে লাগিল—"শ্যামসুন্দর, তাঁকে রক্ষা কর, তাঁর মঙ্গল কর। তুমি আমার অন্তর্য্যামী, তোমায় কি জানাব, তুমি আমার সকলি জান। সকল ব্যথাই অনুভব করতে পার। আমি তাঁর কাছে গেলে, তাঁকে স্পর্শ করলে পাছে তাঁর অকল্যাণ হয় সেই ভয়ে আমি নিজেকে এমন করে বঞ্চিত করলাম, এত কষ্ট পেলাম। আর কেউ যদি আমার এ দুঃখ না বোঝে, তুমি বুঝো শ্যামসুন্দর! তুমি আমার হৃদয়ে বল দাও, আমায় বলহারা কোরো না।"

সমস্ত দ্বিপ্রহরটা প্রার্থনার অশ্রুজলে সুব্রতার অতি-বাহিত হইল।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

"মুকুল, মা আমার, এখন কেমন আছ? চোখ মেলে চেয়ে দেখ।"

মুকুল তন্দ্রা বিজড়িত নেত্রযুগল ঈষৎ খুলিয়া শীর্ণ বাহুটি বাড়াইয়া বিছানার প্রান্তে কি যেন খুঁজিতে লাগিল।

যমুনা দেবী মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খুঁজচ মুকুল? কি চাই লক্ষ্মী, বল, একবার বল আমায়!"

মায়ের কাতর আহ্বানে মুকুল এবার জোর করিয়াই চাহিল। গৃহের চতুর্দ্দিকে, মায়ের মুখের দিকে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "আমি শুয়ে রয়েছি কেন মা, আমার কি হয়েছে?"

মা মেয়ের ললাটে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আজ পাঁচ ছ'দিন হল তোমার অসুখ হয়েছে মুকুল, তাই তুমি শুয়ে রয়েছ।"

"অসুখ? কি অসুখ হয়েছে? আমার কি জ্বর হয়েছে?'

"না মা, জ্বর নয়, তোমার মাথার অসুখ হয়েছিল, তুমি মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে। এখন অসুখের কথা থাক্, একটু দুধ খাও মুকুল, আজ ক'দিন তোমার কিছুই খাওয়া হয়নি। দুধ খেয়ে তুমি ঘুমিয়ে থাক, আমি তোমার মাথায় হাওয়া করচি।"

মুকুল মায়ের কথার জবাব না দিয়া কড়ি কাঠের দিকে তাকাইয়া কি যেন স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল। ধীরে ধীরে বিস্মৃতি হইতে তাহার অন্ধকার অন্তরে স্মৃতির আলো জ্বলিয়া উঠিল। মনে পড়িল নির্জ্জন গৃহে মাদুলি অন্বেষণ, তাহার পর ভাগ্যবিধাতার বিধানে তাহার সমগ্র জীবন-নাটকের যবনিকা উত্তোলন। সেই অসীমময় জীবন নাটকের প্রধান অভিনেতার আলোকচিত্রে উজ্জ্বল মুখচ্ছবি, সুধাময় শিশির নামটি।

মুকুল অস্ফুট কণ্ঠে বার কয়েক শিশির নাম উচ্চারণ করিয়া অবসাদে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার হৃদয়ের

নিভৃতে সেই ছবির সুন্দর মুখখানি বারবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

যমুনা মেয়ের গায়ে ঈষৎ নাড়া দিয়া ডাকিলেন, "মুকুল আবার চোখ বুজলি কেন মা? চোখ চেয়ে, হাঁ করে এই গরম দুধটুকু খেয়ে ফেল্। দুধ খেয়ে তারপর ঘুমুবি, আমি আমি গায়ে হাত বুলিয়ে দেবো।—না করচিস কেন, মা লক্ষ্মী আমি মুখে ঢেলে দিচ্ছি। একটু দুধ খেলেই শরীর ভাল বোধ হবে, আর কষ্ট হবে না।"

মুকুল সেই অবস্থাতে মায়ের হস্ত হইতে দুগ্ধ পান করিল। মা ভেজা রুমাল দিয়া সযত্নে মেয়ের মুখখানি মুছাইয়া দিলেন।

মুকুল বলিল, "বাবাকে দেখছিনে কেন মা? বাবা কোথায় গেছেন?"

মুকুলের বিশৃঙ্খল চুল গুছাইয়া দিতে দিতে যমুনা কহিলেন, "ক'দিনের ভেতর তিনি একদণ্ড তোর বিছানার পাশ ছাড়া হন নি, আজ ডাক্তাররা বলে গেছেন তুই ভাল হয়েছিস, আর কিছু ভাবনা নেই, তাই উনি একবার অসীমদের ওখানে গেছেন। অসীম এখন ভাল হয়ে গেছে। তার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছিল, অসীমের বৌদিদি এসেছেন।"

মুকুল একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদিদি এসেছেন, আর কেউ আসেন নি মা? তিনি কোথায় আছেন?"

"মেসেই আছেন, মেসের ছেলেরা দোতলাটা তাদের ছেড়ে দিয়েছে। অসীম আর একটু সারলেই তারা সব দেশে যাবে। রঘু ও বিকাশ ব'লে দুইটী লোককে সঙ্গে নিয়ে অসীমের বৌদিদি এসেছে, আর কেউ আসেন নি।"

"তাঁকে—বৌদিদিকে তুমি দেখেছ মা?"

"হ্যাঁ দেখেছি। সে তো তোকে রোজ একবার করে দেখতে আসে মুকুল। মেয়েটির সঙ্গে আমাদের আলাপ সালাপ হয়েছে, তার নাম তাপসী, একেবারে দেবী প্রতিমার মত, কি মিষ্টি স্বভাব, অমন দেখা যায় না।"

মুকুল আবার চিন্তামগ্ন হইল। যমুনা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু রহিয়া রহিয়া মুকুলের রুক্ষ চুল লইয়া খেলিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পর মুকুল বলিল, "মা, আমায় একটা কথা বলবে?"

কি কথা যে বলিতে হইবে যমুনা পূর্ব্বেই তাহা অনুমান করিয়াছিলেন। মেয়ের আরোগ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে মা'র হৃদয়ে আশা আকাঙ্ক্ষার তুমুল দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। হায়, তাঁহার বলিবার কি আছে? তিনি মা হইয়া কোন প্রাণে সন্তানের নিকটে সে মর্ম্মান্তিক সাংঘাতিক কাহিনী বিবৃত করিবেন? সে কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি মূক হইলেন না কেন? তাঁহার মৃত্যু হইল না কেন?

মার নীরবতায় মুকুল তাহার কথার পুনরাবৃত্তি করিল। যমুনার আর চুপ করিয়া থাকা হইল না। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন "মুকুল, আজ কোনও কথা নয়। তুই সুস্থ হ', সবল হ', তারপর তোর অভাগী মা তোর সব কথারই উত্তর দেবে। কিছু বাদ দেবে না, গোপন করবে না। কিন্তু আজ নয়।"

মুকুল একটু ভাবিয়া করুণকণ্ঠে বলিল, "আমি এখন সুস্থ হয়েছি, আর আমার অসুখ নেই মা, আমায় আর কষ্টের ভেতর রেখো না। আমি আর পারছিনা। বল মা, কি হয়েছিল? কত দিনের কথা, বিয়ের কতদিন পরে? মা, তুমি কাঁদছ—এতদিন ধ'রে এত কেঁদেছ তাতেও তোমার চোখের জল শুকোয় নি। এত কালের পর আমি তোমার কষ্ট বুঝতে পেরেছি কেন তুমি হাসতে পারনি, অমন হয়ে থেকেছ। এখন তো আমাকে লুকোবার দরকার নেই মা, তবে বলছ না কেন?"

"কেন বলচিনা, সে যে আমার বলার কথা নয়। তা বলতে গেলে আমার যে কণ্ঠরোধ হয় মুকুল, কেমন করে বলবো, কি বলবো, তুই আমায় বলে দে।"

"আমি বলে দেবো? আচ্ছা বলছি—সত্যি যা তা কি মা গোপন থাকে? একদিন না একদিন তা প্রকাশ হয়েই পড়ে। তোমরা কতই কষ্ট করেছ আমার জন্যে! সমাজ ছেড়ে স্বজন ছেড়ে স্বদেশ ছেড়ে এই বিদেশে তোমরা আমারই জন্যে বিদেশী হয়ে রয়েছ, কিন্তু আমার ভাগ্য তো বদলাতে পার নি মা। আমি আমার ভাগ্যের বিষয় জানতে চাই। কবে আমি কুমারী ছিলাম, কবেই বা আমি বিধবা হলাম?"

যমুনা আর্ত্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "মুকুল চুপ

কর, ও নিষ্ঠুর শব্দ উচ্চারণ করিস নে। তুই বিধবা নয়, সধবা নয়, তুই তোর মায়ের কোলের কুমারী মেয়ে। পাঁচ বছর বয়সে যে মেয়ের বিয়ে হয় দু'মাস যেতে না যেতে সব ফুরিয়ে যায়, সে কুমারী ছাড়া কি হতে পারে?”

যমুনা অধীর আবেগে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁর চোখে ধারার পর ধারা ছুটিল। এই অশ্রুজলের ভিতর যে কত বর্ষের কত শোক, কত পুঞ্জীভূত ব্যথা লুক্কায়িত ছিল তাহা এক মাত্র অন্তর্যামী জানিতেন।

মায়ের বুকভাঙ্গা রোদনে মুকুল স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। হায়, এই সংসার, দুইদিন পূর্ব্বে ইহারই চতুর্দ্দিকে সে মায়াকুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া সৌন্দর্য্যে সুষমায় মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাস ছিল সংসার যাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মত, নিশিদিন একই স্রোতে বহিয়া যাইবে, একই গানে চারিদিক মুখর করিয়া রাখিবে। মায়াকাননের আশা-পিক গুলি নির্ঝরিণীর তানে তানে গাহিয়া উঠিবে। ফুলে ফুলে বিচরণ করিয়া ভ্রমর ঝঙ্কার তুলিবে। মুকুল প্রফুল্ল হৃদয়ে শারদ রৌদ্ররঞ্জিত লঘু মেঘখণ্ডের মত সেই মায়া উপবনে অনন্দে ভাসিয়া বেড়াইবে। হায়, কুহকিনী দুরাশা! হায়, মানবের ভাগ্যসূত্র! কাল যাহার হৃদয় হাস্য-কৌমুদী রাশিতে উদ্ভাসিত ছিল, আজ তাহারই আঁখি-প্রান্তে বিষাদের অশ্রুজল। এখন যে সৌভাগ্যের সুউচ্চ শিখরে সমাসীন, চোখের পলকে তাহারই স্থান ধরণীর ধূলায়! এই সংসার, এই মানব জীবন!

ক্রমশঃ

শ্রীগিরবালা দেবী।

শ্রীপাঠ ঝামটপুর

কাটোয়া সাব্‌ডিবিজানের মধ্যে ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী মৌগ্রামে আমার কন্যা শ্রীমতী চিন্ময়ীর শ্বশুরবাড়ী। সম্প্রতি তথায় গিয়া কথা-প্রসঙ্গে শুনিলাম, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি বহুগ্রন্থ রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান ঝামট্‌পুর গ্রাম সেখান হইতে আড়াই মাইল মাত্র পশ্চিমে অবস্থিত। তখন তথায় আর এক দিন মাত্র আমার অবস্থিতির নির্দ্দিষ্ট কাল। সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, পর দিন প্রাতে ঝামট্‌পুর গিয়া, এগারটার পূর্ব্বেই ফেরত আসিব—এইরূপ ব্যবস্থা হইল। ঝামট্‌পুর গ্রাম, বাণ্ডেল-বারহারওয়া লাইনের, গঙ্গাটিকুরী বা শলার ষ্টেশনের দুই বা আড়াই মাইল পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

আমরা পরদিন প্রাতে ঝামট্‌পুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মনে কত আশা!—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চরণরেণু-পূত আবাস-বাটী ও তাঁহাদের পারিবারিক দেব-বিগ্রহ দর্শন করিয়া ধন্য হইব! উৎসাহের সীমা নাই!—মাঠের পথ ধরিয়া চলিলাম—এই দুই দিন বৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং কর্দ্দমের লেশমাত্র ছিল না!

প্রায় এক ঘণ্টা কাল হাঁটিয়া আমরা ঝামট্‌পুর গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইলাম। এই পূর্ব্ব-প্রান্তে সর্ব্বপ্রথম গৃহ—কবিরাজ গোস্বামীর পরম পবিত্র শ্রীপাঠ-বাড়ী! আমরা একেবারে মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, মন্দিরের দ্বার তখনও রুদ্ধ রহিয়াছে। এই নাতিবৃহৎ দেবায়তনের সম্মুখে, খড়ের ছাউনি-করা একটি নাট্যশালা। এই নাট্যশালায় তখন একজন গ্রাম্য-শিক্ষক, ছাত্রগণের হাজিরা লইতেছিলেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, এই মন্দিরের দ্বার কখন উন্মোচিত হইবে, মন্দিরের সেবাইৎ, পূজারী বা মোহান্ত থাকেন কোথায়—ইত্যাদি প্রশ্ন করিলাম।

শিক্ষক মহাশয় আমাদের প্রশ্নাবলীর কোনরূপ উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া মন্দির-সংলগ্ন একটি বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন যে কয়েকটি ভদ্রলোক শ্রীপাঠ্‌ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। তার পর তিনি আপন মনেই বলিলেন—“দেখুন, একক আমার উপর, বালকদের পাঠশালা ও বালিকা-বিদ্যালয়—এই উভয়েরই কার্য্যভার আছে। তজ্জন্য আমি মহামান্য গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক আট টাকা

ও চারি টাকা হিসাবে দুইটি সাহায্য পাই। ছাত্রগণের বেতনেও মাসিক পাঁচ সাত টাকা হয়, তবে সব আদায় হয় না। চাষা-গয়লার গাঁ—দিচ্ছি দিব করিয়া অনেকে বেতন দেয় না। আমাদের স্বতন্ত্র পাঠশালা-গৃহ আছে, তাহা এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তাই অস্থায়ী ভাবে এখানে কার্য্য চালাইতেছি। আমার সমবয়স্কগণ রেলে চাকরী করিয়া, এখন এক শত টাকা করিয়া মাহিনা পাইতেছে। সুতরাং, আমি ঐরূপ চাকরিতে গেলে, আমারও এক দেড় শত টাকা বেতন হইত! কিন্তু কি করি—এখন এই কর্ম্মই করিতেছি।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাহার পর তাঁহাকে কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাঠ-সংক্রান্ত দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করায়, তিনি নিতান্ত প্রমাদ গণিলেন এবং তাড়াতাড়ি ছাত্রের পর ছাত্র প্রেরণ করিয়া, মোহান্তকে ডাকিয়া আনিবার জন্য অতিমাত্রায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অজ্ঞতা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু এই গ্রামবাসী হইয়া, কবিরাজ গোস্বামী বা তাঁহার পাঠ-বাড়ী সংক্রান্ত কোন কথা না জানার জন্য, অত্যদ্ভুত বাহাদুরীর অশেষ প্রশংসা (বা ভর্ৎসনা) করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলাম—"মহাশয়, আপনি যেরূপ গুণী ব্যক্তি, তাহাতে আপনার যে এত দিন মধ্যে বহু টাকা বেতন হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই! তবে, আশঙ্কা হইতেছে, কোন মাতৃভাষানুরাগী রাজকর্ম্মচারী পাঠশালা পরিদর্শন জন্য এখানে শুভাগমন করিলে, মহাশয়ের এই গ্রাম্য শিক্ষকের আসন রক্ষা করা নিতান্তই কঠিন হইবে।"

শিক্ষক মহাশয় দেখিলেন—মন্দির-দ্বার খুলিতে তখনও বিলম্ব আছে—অথচ, আমরা নীরবে না রহিয়া, নানারূপ প্রশ্নে তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছি! এই নিমিত্ত তিনি, দুইটি শিশুছাত্র সঙ্গে দিয়া বলিলেন—"এই বাবুদিগকে ও-পাড়ায় রঘুনাথের মন্দির দেখাইয়া আন।" এই ভাবে তিনি আমাদিগকে বিদায় দিয়া আশ্বস্ত হইলেন! আমরাও রঘুনাথ বিগ্রহ দর্শনার্থ, অদূরবর্ত্তী অন্য পাড়ায় চলিলাম।

সেখানে গিয়া দেখিলাম, সে মন্দিরের দ্বারও তখন উন্মোচিত হয় নাই। প্রাঙ্গণের একটি পুষ্পবৃক্ষে উঠিয়া একজন পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। তিনি আমাদিগকে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, সম্মুখের পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেলেন। এই ব্যক্তিই পূজারী—ইনি, অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং আধা হিন্দিভাঙ্গা বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিলেন। মন্দিরটি ছোট—ইষ্টক-নির্ম্মিত; সম্মুখে, একটি তদনুরূপ নাট্য-শালা।

পূজারী স্নাত হইয়া মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিলেন—বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। সিংহাসনের পশ্চাৎ অংশে গৌর-নিতাইএর দারুময় বিগ্রহ—মধ্যে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের দারুময় মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণের বলিয়া কল্পিত হইলেও, রঙ কৃষ্ণ বা শ্যাম নহে—একেবারে হরিৎ! শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের এরূপ হরিৎ রঙ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "কারিকরকে মূর্ত্তি গড়্‌তে বলেছিলাম, সে এই রঙ করে দিয়েছে—আমি কি করবো?" আমরা নিরুত্তর হইলাম!

দারুময় মূর্ত্তিত্রয়ের সম্মুখে শ্যামচাঁদের পাষাণ বিগ্রহ ও শ্রীমতীর ধাতু-বিগ্রহ। এতদ্ব্যতীত নাড়ুগোপাল, রঘুনাথ, শালগ্রাম ইত্যাদি রহিয়াছেন। মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিলে দেখিলাম, সিংহাসনের সম্মুখভাগে একখানি কাপড় টাঙ্গান আছে—সেখানি সরাইয়া লইলে বিগ্রহগণ দৃষ্টিগোচর হইলেন। পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুরদের শয়ন দেওয়া হয় না?" পূজারী বলিলেন, "মন্ত্র-শয়ন দেওয়া হয়।" আমরা—"কেন? সকল বিগ্রহের না হোক্, প্রধান বিগ্রহ শ্যামচাঁদের পর্য্যন্ত শয়ন দেওয়া হয় না কেন?" তখন পূজারী বলিলেন—"আমি কি করবো? শয়ন দিবার খট্টা বা শয্যা নাই।" আমরা—"পল্লীগ্রামে অল্প তিন চারি টাকা খরচ করলেই ত হইতে পারে। বিগ্রহ সেবার নির্দ্দিষ্ট আয় হইতেও ত করিতে পারেন! কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাঠ বলিয়া ত এখানে শারদীয়া ত্রয়োদশীর দিন বহু লোকের সমাগম হয় এবং তদুপলক্ষে এখানেও ত যথেষ্ট প্রণামী পড়ে! ইচ্ছা রহিলে আপনি সচেষ্ট হইয়া ত করিয়া লইতে পারেন!" পূজারী—"অত করিবার কি সময় আছে, বাবা?" এই উত্তরে আমরা নিরস্ত হইয়া কবিরাজ গোস্বামীর পাঠ বাড়ী অভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

২

পাঠ-বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম, মন্দিরের দ্বার

উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পূজারী প্রাচীন বৈষ্ণবটি, তুলসীপত্র ধুইয়া, বাছিয়া মুছিয়া, একটি পাত্রে সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেছেন। ইনিই মোহান্তের নিযুক্ত পূজারী। এই মন্দিরের অধিকারী একজন গৃহী-বৈষ্ণব। তিনি, মন্দির-সংলগ্ন কতিপয় মৃন্ময় গৃহে সপরিবারে বাস করিতেছেন। ইনিই এখানকার মোহান্ত। ইহাঁর বয়স অধিক নহে—অনুমান ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর। পূজারীর বাটী অন্যত্র, অদূরবর্ত্তী গ্রামে।

আমরা উপস্থিত হইয়া মোহান্তের অভিপ্রায় মত, মন্দিরের উপর বারাণ্ডায় উঠিয়া, দ্বার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলাম এবং বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া চিরধন্য হইলাম। সিংহাসনোপরি, নিতাই-গৌরাঙ্গের সুন্দর সুঠাম দারুময় মূর্ত্তি। সম্মুখে, কবিরাজ গোস্বামীর পারিবারিক পাষাণময় ক্ষুদ্রাকৃতি অতি সুদর্শন বিগ্রহ বাল-গোপাল এবং তাঁহার পার্শ্বে বামভাগে গিরিধারীর লিঙ্গমূর্ত্তি। কিছুক্ষণ অপলক-নেত্রে বিগ্রহ দর্শন করিয়া মোহান্ত মহাশয়কে শ্রীপাঠে কি কি দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য আছে, তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া বা বলিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিলাম।

এই স্থানে পূর্ব্বাভাষরূপে আমার 'সাহিত্য-সেবক' নামক চরিতাভিধান গ্রন্থে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জীবনী-প্রবন্ধের শেষাংশে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি—এখন, কবিরাজ গোস্বামীর সমগ্র জীবনী বিবৃত করিবার আবশ্যকতা নাই।

"কবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান ঝামটপুর গ্রামে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি সেবা, কবিরাজ গোস্বামীর কাষ্ঠ-পাদুকা এবং ভজন-স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সকলের নিত্য-পূজাদির বন্দোবস্ত আছে। ঝামাটপুর বৈষ্ণব ও সাহিত্য-সেবিগণের দর্শনীয় স্থান। এখানে কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য মুকুন্দ কবিরাজের হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রক্ষিত আছে। কবিরাজ গোস্বামীর স্বহস্ত লিখিত মূল গ্রন্থখানি বৃন্দাবনে রাধাদামোদরের মন্দিরে এখনও বর্ত্তমান আছে।" (সাহিত্য-সেবক—পৃঃ ১১৯)

মোহান্ত বলিলেন, "কবিরাজ গোস্বামী-রচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের তাঁহার শিষ্য মুকুন্দ, মূলগ্রন্থ রচনার সঙ্গে সঙ্গেই যে অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই মূল অনুলিপি গ্রন্থখানিই ঐ ঠাকুরের সিংহাসনে রক্ষিত হইয়া নিত্য তুলসী চন্দন দ্বারা পূজিত হইতেছেন। বহু লোক কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া, ঐ গ্রন্থখানি হাজার বারশত টাকা পর্য্যন্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন!"

আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "হাজার বারশত মানে কি, লক্ষ টাকা দিলেও দিবেন না—কিছুতেই দিবেন না।" তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ঠিক্ বলেছেন, দিব কেন? গ্রন্থখানি চারিশত বৎসরের পুরাতন—অতি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে!" এই বলিয়া তিনি বিগ্রহগণের সিংহাসনোপরি রক্ষিত পুঁথিখানির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। আমি বলিলাম, মহাশয়, দূর হইতে কাপড়ে বাঁধা পুঁথি দেখিয়া আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না। আমরা, ঐ পুঁথি খানির হস্তাক্ষর দেখিয়া ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষায় এখানে আসিয়াছি। দয়া করিয়া পুঁথিখানি একবার খুলিয়া দেখাইলে, আমরা চিরকৃতার্থ হইব।"

পূজারি বলিলেন, "আপনি স্নান করিয়াছেন কি?"

আমি—"অ-স্নানে গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে কি গঙ্গাজল অপবিত্র হয়? না, অস্নাত-ব্যক্তিই গঙ্গাজল স্পর্শে পবিত্র হয়? আপনি পুঁথি দেখান—আমি না হয়, ছুঁইব না—আপনি খুলিয়া আমায় দেখাইবেন।" মোহান্ত মহাশয় তখন আজ্ঞা দিবামাত্র পূজারী, পুঁথি খানি সিংহাসন হইতে নামাইলেন এবং চন্দনলিপ্ত বস্ত্রাচ্ছাদনখানি খুলিয়া পুঁথিখানি আমায় দেখাইলেন। দুই একস্থান উল্টাইলে পর বলিলেন, "মহাশয়, কোনও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, এই পুঁথি খানি নাড়াচাড়া করিয়াছে, সমস্ত পত্রগুলিই বিপর্য্যস্ত হইয়া রহিয়াছে!" এই কথা শুনিয়া মোহান্ত এ পুঁথি খানি আমার হাতে দিবার অনুমতি দিলেন।

পুঁথিখানি পাইবামাত্র, আমি অত্যল্পকাল মধ্যেই সমস্ত পত্রগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম। আমি আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল, নিত্য প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি নাড়াচাড়া করিতেছি। সুতরাং, পুঁথি দেখিয়া পুঁথির বয়স অনুমান করিলে, তাহা বেশী তফাৎ না হইবারই কথা। এই পুঁথি খানির কাগজ, কালি ও হস্তাক্ষর দেখিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইল ইহা ১২৫ হইতে ১৫০ বছরের লেখা—ইহার পূর্ব্বেকার তারিখ হইতেই পারে না।

পুঁথিখানি সমস্ত সজ্জিত করিয়া দেখা গেল, যে-পত্রে লেখকের নাম, বাসস্থান ও হস্তলিপি সমাধার তারিখ প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লিখিত থাকে, কেবলমাত্র সেই শেষ পত্রটিই নাই! পুঁথিখানি জীর্ণ ত নহেই—বিশেষ পুরাতনও নহে! কোন পত্রই নষ্ট হয় নাই—সমস্ত পত্র গুলিই সর্ব্বতোভাবেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পুঁথিখানির পাটা দুইটিও ঠিক্ আছে, বিশেষ—পুঁথিখানির সমস্ত পত্রই গোলমাল হইয়াছিল শেষপত্রগুলি শেষাংশেই ছিল না! এই সব লক্ষ্য করিয়া মনে দৃঢ় ধারণা হইল, বর্ত্তমান বা ইহাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মোহান্ত, একখানি সাধারণ "চৈতন্য চরিতামৃত" পুঁথি সংগ্রহ করিয়া, তাহাই কবিরাজ গোস্বামীর পাঠের বিগ্রহগণের সিংহাসনে রক্ষিত করিয়া, কবিরাজ-শিষ্য মুকুন্দের হস্তলিখিত পুঁথি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন! কিন্তু, এই পুঁথির শেষ পত্র রহিলে, লেখকের নাম, বাসস্থান, লিপিকাল ইত্যাদি সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িবে—এই জন্য ইচ্ছা করিয়াই তাহা অপসৃত করা হইয়াছে!

মনোমধ্যে এইরূপ দৃঢ় ধারণা হওয়ায় আমি মোহান্তকে—যিনি মন্দিরের বারাণ্ডায় আমাদের সঙ্গেই আমাদেরই মত অস্নাত অবস্থায় বসিয়াছিলেন—বলিলাম, "মোহান্ত ঠাকুর, এই পুঁথি খানির আর একটি পত্রের অভাব হইতেছে—সেই পত্রটি কোথায় রাখিয়াছেন, লইয়া আসুন।" তিনি বলিলেন—"আবার পত্র কোথায় পাইব?" তখন আমি তাঁহাকে শেষপত্রটির কথা বলিলাম এবং বুঝাইয়া দিলাম যে,—তিনি নিজে না হোন্, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও মোহান্ত, ইচ্ছা করিয়াই এই লিপিকাল ও লেখকের নাম সংযুক্ত শেষপত্র খানি সরাইয়া রাখিয়াছেন! নচেৎ, মুকুন্দের লেখা প্রাচীন অনুলিপি বলিয়া অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষে ধূলি দিবার সুবিধা হইবে কেন? কিন্তু, এরূপ অপচেষ্টা দ্বারা আপনারা এতদিন লোক-সমাজে মুকুন্দের অনুলিপি বলিয়া প্রচারিত করিয়া থাকিলেও, প্রার্থনা করি অতঃপর আর তাহা করিবেন না! পরম ভাগবত পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পাঠ, তাঁহার বাল্য ও যৌবনের লীলানিকেতন—ইহাই ত ভক্তগণের পক্ষে যথেষ্ট। যাহা নয়, তাহা প্রচার করিয়া, আপনারা আর অধিক কি কৃতিত্ব দেখাইবেন? সকলে পুঁথি খুলিয়া দেখেন না—আপনাদের কথার উপর নির্ভর করিয়াই সমাগত ভক্তগণ কৃতার্থ হন। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া এরূপ অ-যথা সংবাদ প্রচার করা, আপনাদের পক্ষে সঙ্গত কর্ম্ম নহে। হয়ত, আপনিই কখনও পুঁথি খুলিয়া দেখেন নাই—প্রচলিত প্রবাদের কথা মানিয়াই, মুকুন্দের হস্তলিপি বলিয়া প্রচার করিতেছেন! এরূপ অ-যথা সংবাদ প্রচারের ফলে, সকলেই প্রতারিত হইতেছেন—আমিও আমার পুস্তকে পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে, মুকুন্দ লিখিত অনুলিপি ঝামটপুরে থাকার কথা লিখিয়া, অ-যথা সংবাদ প্রচারের সহায়তা করিয়া মহা অপরাধ করিয়াছি! আজ, স্বচক্ষে সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া, আমার দুঃখ ও আক্ষেপের অবধি রহিল না!"

আমার এইরূপ মন্তব্য শ্রবণ করিয়া মোহান্ত পূজারীকে বলিলেন, "অন্য ঐ পুঁথিখানি দেখাও ত।" পূজারী সিংহাসন হইতে আর একটি যে পুঁথি নামাইয়া আনিল, এটি খুলিয়া দেখা গেল—এই গ্রন্থখানিও 'চরিতামৃত' গ্রন্থের একটি অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি মাত্র। তবে, পূর্ব্ব পুঁথি অপেক্ষা আরও আধুনিক! পত্রগুলিও একেবারে বিপর্য্যস্ত—যেন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি, রৌদ্রে দিয়া তুলিবার সময় যথেচ্ছ ভাবে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছে! এই কথা শুনিয়া মোহান্ত, তাঁহার বাড়ী হইতে কবিরাজ গোস্বামীর ছাপা জীবনী-গ্রন্থ আনিবার আদেশ করিলেন। আমরা, কবিরাজ গোস্বামীর স্বতন্ত্র ছাপা জীবনী গ্রন্থের কথা জানিনা—তাই অতিশয় আগ্রহভরে তাহা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দুই তিনবার আদেশ করা সত্ত্বেও, কেহই আর তাহা বাটী হইতে আনিয়া দিল না! যাহা নাই, তাহা আনিবে কোথা হইতে?

পুঁথির ব্যাপারে মোহান্তগণের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া, আমার মন বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল! আমি অপরের কথায় বিশ্বাস করিয়া, অ-যথা সংবাদ প্রচাররূপ যে অপরাধ করিয়াছি তাহার জন্য, কবিরাজ গোস্বামীর পারিবারিক সুদর্শন বিগ্রহ বালগোপাল দেবের শ্রীচরণে, কতই না কাতর প্রার্থনা করিলাম।

ইহার পর পুজারী মহাশয়, একটি টিনের খড়মাকৃতি কৌটার মধ্যে রক্ষিত, কবিরাজ গোস্বামীর ব্যবহৃত খড়ম বলিয়া দুইটি অতি পুরাতন খড়মের ভগ্নাংশ দেখাইলেন। ইহাতে সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই—আমরা তাহা

মস্তকে স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম। পূজারী বলিলেন, "এই টিনের বাক্স সম্প্রতি হইয়াছে. পূর্ব্বে কান্দীর রাণী প্রদত্ত স্বর্ণকোটায় এই খড়ম রক্ষিত হইত! দাতা দিলে কি হয়?" সেই স্বর্ণ কোটা দুইটি যে কি হইল তাহা তিনি বলিতে পারেন না--তবে প্রবাদ যাহা প্রচলিত আছে, তাহাই তিনি বলিলেন মাত্র! কবিরাজ গোস্বামীর খড়মের মূল্য কি স্বর্ণ কৌটায় রক্ষিত হইলে সমধিক বর্দ্ধিত হয়? থাক্ সে কথা—কিন্তু এই সকল কথা বলায় আমাদের মনোমধ্যে যে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, হায় পুরোহিত, তুমি যদি অণুমাত্রও তাহা অনুভব করিতে!

অতঃপর মোহান্তকে, অপর কি দর্শনীয় আছে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি নাট্য-মন্দিরের অদূরে বাঁশঝাড়ের তলে, মোহান্তের পারিবারিক গৃহ হইতে পুষ্করিণী যাইবার পথের উপর অবস্থিত ইষ্টক নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র গৃহ দেখাইলেন। এই গৃহের দ্বার এতই সঙ্কীর্ণ যে, বসিয়া ভিন্ন, প্রবেশের উপায় নাই! মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগও অতি সঙ্কীর্ণ—ইহার মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র 'গবাক্ষ'-দরজার সম্মুখে একটি চারি অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চ গোলাকার লাল-সিমেণ্ট মাটি মণ্ডিত বেদী। এই সিমেণ্ট লেপের উপর দুইটি পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছিল। অল্পকাল মধ্যেই সিমেণ্ট মাটি চটিয়া যাওয়ায়, পদচিহ্নও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র মন্দিরটিও অধিক দিনের নহে।

মোহান্ত বলিলেন, "এইটি কবিরাজ-গোস্বামীর ভজন স্থান।" আমি তথায় ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ও সেই স্থানের ধূলি মস্তকে লইয়া বলিলাম, "মোহান্ত মহাশয়, গ্রামে গ্রামে মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহসেবা বর্ত্তমান রহিয়াছেন—সুতরাং শুদ্ধ এই বিগ্রহ দেখিবার জন্যই, দেশ-বিদেশ হইতে অগণিত ভক্তমণ্ডলী শ্রীপাঠ ঝামট্‌পুরে আইসেন না! পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর বাল্যলীলা ও যৌবন-বিলাসের স্থল ঝামট্‌পুর, তাঁহার ভজন-স্থান ঝামট্‌পুর, তাঁহারই পূজিত শ্রীবিগ্রহ-শোভিত ঝামট্‌পুর বলিয়াই দূর দূরান্তর বিভিন্ন দেশ হইতে ভক্তজনের সমাগম হয়। আপনারা দয়া করিয়া সেই জগৎপূজ্য কবিরাজ গোস্বামীর ভজন-স্থল বলিয়া, শুদ্ধ একটি উন্মুক্ত মাটির ঢিপি দেখাইয়া দিলেও বিন্দুমাত্র ক্ষতি ছিল না! কিন্তু তাঁহার জগদ্ব্যাপী খ্যাতির অনুরূপ না হইলেও, কিয়দংশেও ত তাহার স্মৃতি-চিহ্ন দর্শনীয় হওয়া চাই! কবিরাজ গোস্বমীর জন্যই ত আপনাদের অস্তিত্ব! আর তাঁহারই স্মৃতি-নিদর্শনের এই পরম শোচনীয় পরিহাস! আপনারা তাঁহার জগদ্ব্যাপী নামের বলেই সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন—তাঁহার প্রতি আপনাদের নিজের কি কিছুই কর্ত্তব্য নাই? বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিয়া পরমসুখে সপরিবারে বাস করিতেছেন দয়া করিয়া, কবিরাজ গোস্বামীর ভজনস্থলের উপর নির্ম্মিত ক্ষুদ্রায়তন গৃহটির উপর একটু কৃপাকটাক্ষপাত করুন না কেন?"

মোহান্ত মহাশয়, কি জানি কেন, আর বেশী কথা কহিলেন না। আর, দেখাইবার, বা জানাইবার অপর কিছু ছিল না। তবে তিনি বিদায়কালে বলিলেন—"শারদোৎসবের পর শুভ ত্রয়োদশীর দিন, মহোৎসবের সময়, এখানে বঙ্গের যাবতীয় ভাল ভাল কীর্ত্তনীয়া দলের গান হয়। আপনি সেই সময় আসিলে, যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিবেন।"

"আসিতে পারিলে নিজকে বিশেষ সৌভাগ্যশালী মনে মনে করিব"—এই কথা বলিয়া, শ্রীপাঠ ঝামট্‌পুরের সুপবিত্র ধূলিকণা মস্তকে লইয়া পবিত্র অন্তঃকরণে বেলা দশটার সময় বিদায় গ্রহণ করিয়া বারটার সময় মৌগ্রামে উপস্থিত হইলাম। পরদিন সালার ষ্টেশনে বেলা ১০টার গাড়ী ধরিয়া বৈকালে শিউড়ী ফিরিলাম।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

বাংলা সাহিত্যের ধারা

বাংলা সাহিত্য কত দিনের প্রাচীন এবং সর্ব্বপ্রথমে কোন্ মহাকবির মোহন সঙ্গীতে বাংলার সাহিত্যিকগন মুখরিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা এতকাল পরে বড় সহজ কার্য্য নহে।

বাংলার হিন্দু রাজত্ব যখন অবসন্নপ্রায় এবং মুসলমান সাম্রাজ্য যখন উত্তর ভারতের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাংলার দিকে নিজের বাহু বিস্তার করিতেছিল, সেই সময়ে বাংলার বড় কবি হিসাবে আমরা জয়দেবকে পাই। তিনি বাংলার

শেষ স্বাধীন নৃপতি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন, সুতরাং তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে অবশ্য সাহিত্যের দ্বার রুদ্ধ ছিল না, কিন্তু কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ মহারথী সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সঠিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ হইয়াছে কি না বলা কঠিন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে জয়দেবকে লইয়াই আমাদের আরম্ভ করিতে হয়। বাংলায় হিন্দু সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইবার পর জয়দেবই বাংলার আদি মহাকবি।

জয়দেব বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালী রাজার সভাপতি ছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁহার কাব্যে বাংলার চেয়ে সংস্কৃতের প্রভাবই আমরা বেশী করিয়া দেখিতে পাই। হউক সংস্কৃত কিন্তু তবুও সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী কবি বর্ষার মেঘমেদুর আকাশে দিগন্তের তমাল বিপিনে যে শ্যামচ্ছায়া দেখিয়াছিলেন, আজও তাহা বাঙ্গালীর হৃদয়কে নব নব ভাবে অভিভূত করিয়া দেয়। বাঙ্গালী কবির যশোগাথা বহু পুরাতন হইয়াও চিরনূতন।

জয়দেবের পরেও অবশ্য কাব্য বা সাহিত্য নীরব থাকে নাই, কিন্তু প্রায় তিন শত বৎসরের অজ্ঞাত ইতিহাসের যবনিকা উত্তোলন করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, বাংলার কাব্য সাহিত্য যখন মিথিলার বিদ্যাপতির প্রভাবে ম্লান, সেই সন্ধিক্ষণে নান্নুরের এক ভাবুক কবি এক রজকিনীর দেহে বুঝি বা ব্রজের রাধাকে দেখিয়া আত্মহারা হইলেন। কাব্যলোকের অমৃত-সাগরে স্নান করিতে গিয়া চণ্ডীদাস নিজে হয়তো মনের দুঃখে গরল পাইয়াছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যের মধুররসে বঙ্গবাসী যে অমৃতের আস্বাদন পাইল, তাহার মধুরতা এবং মাদকতা দীর্ঘকালের ব্যবধানে আজও তো ভুলিতে পারা যায় না!

চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ১৪০২ খৃষ্টাব্দে, চৈতন্যদেবের জন্মের ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে। চৈতন্যদেব প্রেম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সারা ভারতের ধর্ম্মজগতে একটী নূতন সাড়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু ৮৩ বৎসর পূর্ব্বেই চণ্ডীদাসের সঙ্গীতে বাংলার সাহিত্যগগন প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হইয়াছিল। শোনা যায় যে চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবী বাশুলী নাকি স্বয়ং তাঁহাকে এবং রজকিনী রামীকে চতুরক্ষর রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং দীক্ষার পরেই নাকি চণ্ডীদাস পদরচনায় প্রবৃত্ত হন।

শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হন ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে। ধর্ম্মজগতে তিনি কি ভাবে একটা যুগান্তর আনিয়াছিলেন সে চিরন্তন কাহিনীর পুনরুল্লেখের কোন প্রয়োজন এখানে নাই। কিন্তু ভক্তহৃদয়ে তিনি যে ভাবের বন্যা বহাইয়াছিলেন, তাহার ফলে কেবল ধর্ম্মজগতে নয়, সাহিত্যজগতেরও রূপ বদলাইয়া গেল। চৈতন্যদেবের জীবিতকালে এবং তাঁহার তিরোধানের পরেও বহু বৈষ্ণব কবির নাম আমরা পাই এবং বঙ্গভারতীর চরণতলে তাঁহাদের কাহারও দান সামান্য নহে।

গৌরলীলার প্রথম পদ রচয়িতা নরহরি দাস, প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বংশীবদন দাস, রামানন্দ বসু, চৈতন্যদেবের সহপাঠী এবং "চৈতন্য রচিত" প্রণেতা মুরারি গুপ্ত, "ভক্তি-রত্নাকর" প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী, "পদসমুদ্র" রচয়িতা মনোহর দাস আউলিয়া, "ভক্তমাল" গ্রন্থকার যোগদাস বাবাজী, "চৈতন্যচরিতামৃত" রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি শত শত কবি এই বৈষ্ণবযুগে বাংলার সাহিত্যকে নানারত্নে মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে মাধবী দেবী নাম্নী একজন স্ত্রীকবিও ছিলেন। তিনি নীলাচলে বাস করিতেন এবং চৈতন্যদেব স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করেন না বলিয়া তিনি গোপনে থাকিয়াই নিজের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গৌরাঙ্গের পদে দিতেন। তাঁহার নিজের কাব্যেই বলিয়াছেন—

"যে দেখয়ে গোরা মুখ সেই প্রেমে ভাসে
মাধবী বঞ্চিত হইল নিজ কর্ম্মদোষে।"

চৈতন্যদেবের সময়ে বাংলার ধর্ম্মজগতে এবং সাহিত্য-জগতে এক নূতন সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার সমসাময়িক সমস্ত কবিদের আদমসুমারি করা বড় সাধারণ ব্যাপার নহে, তবে যাঁহাদের নাম করিলাম তাঁহারা ব্যতীত, কবি কর্ণপূর, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, লোচন দাস প্রভৃতি অনেককেই প্রসিদ্ধ কবি হিসাবে আমরা পাই।

কবি কর্ণপূরের আসল নাম পরমানন্দ সেন। ইনি যখন ৭ বৎসরের বালক সেই সময়ে ইঁহার পিতা ইঁহাকে

সঙ্গে লইয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট যান। সেখানে নাকি এক দিন মহাপ্রভুর পদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া কবিতা নির্গত হইতে থাকে। তাঁহার গ্রন্থাবলী "চৈতন্যশতক" "স্তবাবলী" প্রভৃতির মধ্যে একখানি নাটকও আছে, তাহার নাম চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক। মহাপ্রভু ইঁহার কাব্যে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে "কবি কর্ণপুর" উপাধি দেন।

গোবিন্দদাসের মধুর পদাবলী "অরুণিত চরণে রণিত মণি মঞ্জীর আধপদ চলনি রমান" প্রভৃতি আজিও বাঙ্গালীর কাছে পুরাতন হয় নাই। তাঁহার কাব্যে আর একটা চমৎকার জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায় সেটী তাঁহার

"কুটিল কুন্তল, কুসুম কাছনি, কান্তি কুবলয় ভাস রে।
কুঞ্চিতাধর, কুমুদ কৌমুদী, কুন্দ কোরক হাস রে।
ইত্যাদি

কবি হিসাবে বসন্ত রায়ের খ্যাতিও বড় কম নয়। কেহ বলেন ইনিই প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য,কেহ বলেন ইনি অন্য ব্যক্তি। ইঁহার ব্যক্তিত্ব লইয়া ঐতিহাসিকগণ গবেষণা করিতে থাকুন, কিন্তু ইঁহার কাব্যের সহিত পরিচয় হইলেই বোঝা যায় ইনি উচ্চ দরের কবি। বসন্তরায় সম্বন্ধে একটী সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"বসন্ত রায়ের কবিতায় প্রায় কোনখানেই টানাবোনা তুলনা নাই, তাহার মধ্যে কেবল সহজ কথার যাদুগিরি আছে। যাদুগিরি নহে তো কি? নয়তো গান শুনিয়া প্রাণের মধ্যে কেন এমন মোহ উপস্থিত হয়? কথাগুলিও তো খুব পরিষ্কার, ভাবগুলিও তো খুব মধুর, তবে উহার মধ্যে এমন কি আছে যাহাতে এতটা আনন্দ, এতটা সৌন্দর্য্য আনিয়া দেয়?"

এই সব বৈষ্ণব কবিদের যুগে বাংলার সাহিত্যগগনে আরও দুটী উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, একটী—রামায়ণকার কৃত্তিবাস আর একটী মহাভারতকার কাশীরাম দাস। কৃত্তিবাস ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে এবং কাশীরাম ৫৫৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। কাশীরামের আবির্ভাবের কাল লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে, এবং কাহারও মতে তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। এই মতটী যে ভ্রান্ত তাহা দুইটী কারণে প্রমাণ করা যায়। এক—কাশীদাস ও কৃত্তিবাস উভয়েরই লিখনভঙ্গী প্রায় এক রকমেরই। একজন যদি সপ্তম শতাব্দীর এবং আর একজন ষোড়শ শতাব্দীর লোক হন, তাহা হইলে এই নয়শত বৎসরের মধ্যে কি ভাষার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই? তাহাও তো বলা যায় না, কারণ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চণ্ডীদাস প্রভৃতির ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের।

আর একটী প্রমাণ—কাশীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস শেষ বয়সে পুরীধামে যাইয়া—"জগৎমঙ্গল" নাম কাব্য লেখেন। তাহাতে এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন—

"রাজ চক্রবর্ত্তী সাজাহাঁ দিল্লীপতি
ধর্ম্ম ন্যায়ে তোষণ করিয়া বসুমতী।
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ
মহান প্রতাপী হয় বৈরী জয় যশ।"

সুতরাং তিনি সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে অথবা তাহার পরে—পূর্ব্বে নয়—বর্ত্তমান ছিলেন। জগৎমঙ্গল সমাপ্ত হয় বাংলা ১০৫০ সালে। তাহাতেই লিখিত আছে—

চতুঃষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চশত
সহস্র পঞ্চাশ সন, দেখ' লেখা মত।

বাংলা ১০৫০ সাল ইংরাজী ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দ, তখন সত্য সত্যই সাজাহান দিল্লীপতি ছিলেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও প্রায় এই সময়েরই লোক। বর্দ্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে অতি দরিদ্রের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মামুদ সরিফ নামা এক ডিহিদারের অত্যাচারে তাঁহাকে জন্মভূমি ত্যাগ করিতে হয়। পথের কষ্ট কতখানি পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

তৈল বিনা কৈনু স্নান, করিনু উদক পান,
শিশু কাঁদে ওদনের তরে—ইত্যাদি

এই সব কষ্ট ভোগ করিয়া তিনি মেদিনীপুরের নিকট বাঁকুড়া রায় নামা এক ভূস্বামীর আশ্রয় পান। মুকুন্দরামের করুণ কাহিনী শুনিয়া তিনি তাঁহাকে নিজের পুত্রের গৃহশিক্ষকরূপে নিয়োজিত করেন।

দামুন্যা হইতে আসিবার সময়ে পথেই নাকি—

"দেবী চণ্ডী মহামায়া, দিলেন চরণ ছায়া,
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীতে।"

দেবীর এই আদেশ অনুসারেই নাকি মুকুন্দরাম চণ্ডী

কাব্য রচনা করেন। বাঁকুড়ার বংশধরেরা মেদিনীপুরের অন্তর্গত "সেনাপতি" নামক গ্রামে এখন বাস করেন। তাঁহাদের বাড়ীতে মুকুন্দরামের স্বহস্ত লিখিত চণ্ডী কাব্যের পুঁথি এখনও নাকি প্রত্যহ ফুলচন্দনে পূজিত হয়।

বাংলা কবিতায় বিবিধ প্রকারের ছন্দ সর্ব্বপ্রথমে ভারতচন্দ্রই প্রবর্ত্তিত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রায় গুণাকর অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতিতে পদলালিত্য, শব্দযোজনা এবং সরস ভাষার অবতারণায় একটা নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের পরেও অনেক কবির সন্ধান আমরা পাই। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত বঙ্গবাসীর মনে প্রাণে যে একটা সাড়া আনিয়া দেয় সে কথার উল্লেখ প্রয়োজন নাই। রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতির নামও কবি হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

গদ্যসাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের নামও করা যাইতে পারে। লর্ড ওয়েলেসলি সিভিলিয়ানদের বাংলাশিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে মৃত্যুঞ্জয় তাহাতে প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁহার "প্রবোধ চন্দ্রিকা" হইতে তৎকালীন ভাষায় একটু নমুনা দেওয়া যাক—

"শার্দ্দুলের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনাকর্ণন বিসঙ্কট বদন ব্যাদান, বিকট দংষ্ট্রা কড়মড়ি, ঘনঘন লাঙ্গুলাঘাত, চট চট শব্দ, ভীম লোচনদ্বয়ের ঘূর্ণনেতে অত্যন্ত সংত্রস্ত—"

আর বেশী উদ্ধৃত করিলে বোধ হয় অনেকেই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবেন।

পরবর্ত্তী যুগে বাংলার চারিদিকে যখন কবির লড়াই, হাফ আকড়াই প্রভৃতির খুব চলন, আসরে মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর দেওয়া হইত, সেই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব হইল! ঈশ্বরচন্দ্র যখন "সংবাদ প্রভাকর" সম্পাদন আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর। পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যু হওয়ায় "প্রভাকর" দুইবৎসরের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র তখন সাংসারিক অনটনে পড়িয়াও "সংবাদ রত্নাবলী" কাগজে লিখিতেন। তিন বৎসর পরে অন্য একজন ধনী মহাত্মার সাহায্যে "প্রভাকর" আবার পুনর্জ্জীবিত হয় এবং ক্রমে উহা দৈনিকে পরিণত হয়। বাংলা দৈনিকের মধ্যে "প্রভাকরই" সর্ব্বপ্রথম।

ইহার কিছুদিন পরেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রস্বরূপ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার জন্য একজন ভাল লেখকের অনুসন্ধান করা হয় এবং বোধ হয় পরীক্ষা লইয়া একজনকে মনোনীত করা হয়। তিনিই সর্ব্বজনবিদিত অক্ষয়কুমার দত্ত।

বিদ্যাসাগর ও তারাশঙ্কর তাঁহারই সমসাময়িক। এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষা নামে বাংলা হইলেও, ইহা সর্ব্বতো-ভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত। এই শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল সর্ব্বপ্রথম টেকচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল।" বঙ্কিমচন্দ্র এই উভয় ভাষার মধ্যে কতকটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই নিজের লেখনী চালনা করিয়াছেন। "লুপ্তরত্নোদ্ধার" নামক একখানি পুস্তকের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন—"আলালের ঘরের দুলাল" হইতেই প্রথম এ তথ্য দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাংলা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায় এবং সে গ্রন্থ সুন্দরও হয়। বাংলা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরী আর এক সীমায় টেকচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কোনটিই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়, কিন্তু আলালের পর হইতেই বঙ্গবাসী বুঝিতে পারিল যে এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাংলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমারের ঠিক পরবর্ত্তী যুগ সেটাও আসিল্ সেটা বাংলা সাহিত্যের Augustan Period. বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র,—কাব্যজগতে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি, নাট্যজগতে প্রথমে রামনারায়ণ পণ্ডিত, তারপ দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতির আবির্ভাবে এই যুগ গৌরবময় হইয়া উঠিল।

মধ্যে মধ্যে সাহিত্যের এক একটা যুগ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু সেই পরি-

বর্ত্তনের সময় বিদ্রোহের রক্তধ্বজা অতীতযুগে কখনও সাহিত্যরাজ্যে উঠিয়াছিল কিনা সে খবর আমাদের জানা নাই। প্রথম জানিলাম যখন চিরগতানুগতিক পথ ছাড়িয়া মাইকেল তাঁহার "মেঘনাদবধ"কে লোকের সম্মুখে ধরিলেন। শ্রেষ্ঠ কবির লাঞ্ছনা বড় কম হয় নাই। মেঘনাদের সঙ্গে কোন্ কোন্ জীবের বধ হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত তালিকা আমার অজ্ঞাত, "ছুছুন্দরী বধেই" সে হত্যা-কাণ্ড শেষ হইয়াছিল কিনা, সে বিষয়েও আমি সন্দেহশূন্য নহি। কিন্তু নিন্দুকের নিন্দার আবরণ ভেদ করিয়া আজ "মেঘনাদবধ" মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত ভাস্বর ও প্রদীপ্ত।

তারপর সাহিত্যের আধুনিক যুগ। ভাষা যখন বঙ্কিমের রাজবেশে ঝলমল করিতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সে নিজের অর্ঘ লইয়া বাণীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নিত্য নব উপচারে বঙ্গবাণী আজ বিশ্ববন্দিতা।

সাহিত্যে, বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যে, দেখা যায় যে প্রাচীন যুগে কবিরা প্রায় গতানুগতিক পন্থা সহজে ছাড়িতে চাহিতেন না, কিন্তু আধুনিক যুগে দেখা যাইতেছে যে একটা নূতন জিনিষের অবতারণা করিবার জন্য সকলেই যেন ব্যাকুল। বঙ্কিমের ভাষার পর যখন রবীন্দ্রনাথের ভাষার যুগ আসিল, তখন একেবারে চলতি কথার পসরা লইয়া সাহিত্যের আসরে "বীরবল" দেখা দিলেন। অন্যান্য লোকদের মত তাঁহার ভাগ্যেও বোঝা চাপিয়াছিল, কিন্তু বীরবলী ভাষা কেবল যে নিজের জয়-পতাকা উড়াইয়া গেল তাহা নয়, সাহিত্যক্ষেত্রে সে নিজের ভিত্তি এমন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে যে বাংলার আধুনিকতম সাহিত্য সেই ভাষাতেই সমুজ্জ্বল।

দুই বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীতে প্রবাসী সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে বীরবল নিজেই বলিয়াছেন যে নবসাহিত্যের ভাষার একটু নবীনতা আছে এবং সাহিত্যের ভাষার এই মোড় ফেরানর ব্যাপারে তাঁহার কতকটা হাত আছে এবং প্রধানতঃ সেই হিসাবেই সাহিত্য সমাজে তিনি নিন্দিত ও প্রশংসিত—অর্থাৎ বিখ্যাত।

তারপর খুব বেশী দিনের কথা নয়, নূতন আগুনের আর একটা স্ফুলিঙ্গ "বড়দিদি" রূপে "ভারতী"তে বাহির হইল। অজ্ঞাতনামা লেখক তারপর সেই যে অজ্ঞাতবাস সুরু করিলেন, কয়েকবৎসর আর তাঁহার কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। তারপর একদিন দেখা গেল যে শরৎচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের মতই "যমুনা"র বুক আলো করিয়া উদিত হইয়াছেন। আবার একটা নবযুগের সাড়া পড়িল, বিদ্রোহের আগুনও ধূমায়িত হইতে হইতে শেষে একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল যখন "চরিত্রহীন" প্রকাশিত হইল। আজকালকার এই যে তরুণ সাহিত্য ইহাতে চরিত্রহীনের প্রভাব কতখানি আছে তাহা বলা কঠিন। তবে একটা লেখক সম্প্রদায় এই চরিত্রহীনের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছেন, বোধ হয় নরেশচন্দ্রই তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

বাংলা সাহিত্যে আজ সবুজের জয়কেতন উড়িয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে তরুণদলের এই যে সবুজের অভিযান, ইহার উদ্বোধন প্রথমে রবীন্দ্রনাথ অথবা বীরবল অথবা শরৎচন্দ্র কর্ত্তৃক হইয়াছিল, অথবা ইহা বিদেশী লেখকদের নিকট হইতে আমদানী করা হইয়াছে তাহা লইয়া অনেক আলোচনা ও আন্দোলন হইয়াছে এবং সে আন্দোলনের শেষ যে কোথায় তাহাও এখন অজ্ঞাত। কিন্তু তরুণ সাহিত্যের নূতন ধারা ভাল কি মন্দ, ইহার ভাব ভঙ্গী, ভাষা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর কল্পনা কতদূর রুচি ও নীতিসঙ্গত, তাহার অবতারণা করিতে যাওয়া এ ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা। তবে সচরাচর যেমন ঘটিয়া থাকে, সাহিত্য ক্ষেত্রেও একাধিক দল আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ বা এই নূতন ধারার প্রসংসায় পঞ্চমুখ, কেহ বা নিন্দায় খড়্গহস্ত। অখ্যাত এবং বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নিকট ইহাদের তাড়না ও গঞ্জনা বড় কম সহ্য করিতে হইতেছে না, কিন্তু তবু দেখা যাইতেছে ইহার গতি স্বচ্ছন্দ এবং অবাধ। নূতন জিনিষ গড়িতে গেলে বিদ্রোহের রক্তধ্বজা উড়িবেই। নূতনের যদি শক্তি থাকে, সহস্র বাধার কুটিল ভ্রুকুটিকে ভেদ করিয়া সে তাহার নিজের জয়পতাকা উড়াইবেই। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী আলোচনা না করিয়া বীরবলের কথারই পুনরুক্তি করি—

"ভবিষ্যৎ বিষয়ের কোনও বর্ত্তমান প্রমাণ নাই। সে বিষয়ে আশাই একমাত্র প্রমাণ।"

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

পার্ব্বত্য গৃহশিল্প

দার্জ্জিলিং অঞ্চলে যে সকল পার্ব্বত্য জাতির বাস, তাহাদের অধিকাংশই প্রায় অশিক্ষিত ও অসভ্য। সভ্যতার আলোক এখনও সম্যক্‌রূপে ইহাদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রভাবে যে সকল পাহাড়ী বালক বালিকারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহারা ক্রমশই পাশ্চাত্য অনুকরণে বিলাসিতার দাস হইয়া পড়িতেছে এবং স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের প্রতি বিমুখ হইয়া চাকুরীপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালীর মত এখনও ইহারা স্বদেশ হিতৈষণার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয় নাই। বাঙ্গলার অসহযোগ আন্দোলন বা স্বাদেশিকতার ঢেউ দার্জ্জিলিঙ্গের তুঙ্গ গিরিশিখরে আজিও আঘাত করিতে পারে নাই।

পার্ব্বত্যদের মধ্যে যাহারা নিরক্ষর ও অশিক্ষিত, তাহারাই স্বদেশী শিল্প ব্যবসায়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে; অর্দ্ধ শিক্ষিত ও শিক্ষিতগণ পাশ্চাত্য আদর্শ অনুকরণ করিয়া 'বাবু' সাজিতেছে। বাঙ্গালী যেমন ক্রমশঃ পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণের কুফল বুঝিতে পারিয়া আজ নবীন যুগে আসিয়া স্বদেশপ্রেমিক হইয়া উঠিয়াছে এবং স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগী হইয়া লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধনে ব্রতী হইয়াছে; ইহারাও অদূর ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য মোহ কাটিয়া গেলেই স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে সন্দেহ নাই।

দার্জ্জিলিং অঞ্চলে সাধারণতঃ নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা এই তিন শ্রেণীর পার্ব্বত্য জাতির বাস। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের কথা ছাড়িয়া দিলে বাকী সকলেই দিন মজুরী, বা ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই অশিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যেই শিল্পচর্চ্চার প্রসার অধিক। ইহাদের শিল্পকলা দর্শন করিলে শিক্ষাভিমানী সভ্যতা-গর্ব্বিত বাঙ্গালী বাবুদিগকে অধোবদন হইতে হয়। অশিক্ষিত হইলেও ইহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও কর্ম্মঠ জীবন বাস্তবিকই অনুকরণীয় ও প্রসংশার্হ।

পার্ব্বত্যজাতিরা স্ত্রী পুরুষে উপার্জ্জন করিয়া থাকে, বাঙ্গালী সমাজের মত একজনের অর্জ্জিত অর্থে সমগ্র পরিবার প্রতিপালিত হয় না। ইহারা আবালবৃদ্ধ বনিতা স্বাবলম্বী। ইহাদের সমাজে নারীর পর্দ্দা নাই। স্ত্রীলোকগণও পুরুষের সঙ্গে কর্ম্ম করিতে লজ্জিত হয় না। ইহারা অলসের ন্যায় বসিয়া জীবন যাপন করে না। অবসর পাইলেই বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া কোন না কোন শিল্প কার্য্য করিয়া থাকে। যে পরিবারে পুরুষ মজুরী করিতেছে; হয়ত তাহার স্ত্রী বাজারে শাক শব্জি বিক্রয় করিতেছে। দার্জ্জিলিঙ্গে স্ত্রীলোক দোকানীর সংখ্যা কত বেশী পর্য্যটকগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ছেলে মেয়েরাও বসিয়া নাই, তাহারাও দোকানের কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। দোকানী স্ত্রীলোকটী ইহার উপর শিল্প কার্য্যও চালাইতেছে। ইহাদের হাতে সূতা ও বুনিবার কাঠি সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছে। খরিদ্দারকে জিনিস বিক্রয় করিয়া যে সময় বসিয়া থাকে, সেই অবসরে হাতে বয়ন কার্য্য চালাইয়া থাকে। এই প্রকারে সারা দিন দোকানের কায করিয়াও ইহারা পশমের মোজা, গেঞ্জি, সোয়েটার, গলাবন্দ ইত্যাদি তৈয়ার করিতেছে।

এক মাসের শিশু সন্তানকে ইহারা বেতের ঝুড়ির ভিতর শোয়াইয়া ঝুড়িটী পিঠে বাঁধিয়া অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে। কখন কখন শিশুকে ঝুড়ির ভিতর রাখিয়া জননীরা পাথর ভাঙ্গা ও অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকে। এই শীতপ্রধান দেশে ইহাদের শিশুদের অযত্ন দেখিলে বাঙ্গালীরা অবাক হইয়া যান। অথচ ইহাদের স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ও দেহ বলিষ্ঠ!

সম্পূর্ণ অসভ্য একটী ভুটিয়া রিক্‌সা-চালক রিক্‌সা লইয়া পথপাশে দাঁড়াইয়া আরোহীর অপেক্ষায় আছে, অথচ হাতে বয়ন কার্য্য চলিতেছে। পথে চলিবার সময়ও ইহাদের হাতের বয়ন কার্য্যের বিরাম নাই। ভিক্ষুকও পথে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা সংগ্রহের সঙ্গে বয়নকার্য্য করিয়া থাকে। এই প্রকার শিল্পকার্য্য দ্বারা ইহারা সকলেই অর্থোপার্জ্জন করে।

তিব্বতীয় ভেড়ার পশম দ্বারা ইহারা কম্বল, র্‍যাগ,

গেঞ্জি, মোজা, সোয়েটার, গলাবন্ধ প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া থাকে। এই সকল জিনিস অতি মজবুত ও সুন্দর হয়। শীতের পক্ষে এদেশে এগুলি বিলাতী গরম কাপড় অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। কোনও কল কব্‌জার দরকার করে না। দুইটী বাঁশের কাঠি ও ভেড়ার লোমের সুতা হইলেই যথেষ্ট। এই দুই দ্রব্যের সাহায্যে অতি অল্পবয়স্ক বালক বালিকারাও বয়ন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কুটীরশিল্পের প্রকৃত চর্চ্চা হয়।

উপযুক্ত শিক্ষা ও উৎসাহ পাইলে ইহাদের শিল্পকলা আরও উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে; কিন্তু উৎসাহদাতারই অভাব। কারণ শিক্ষিত সম্প্রাদায়ের এদিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা চাকুরীর সন্ধানে বিব্রত। খৃষ্টান মিশনরিরা তাঁহাদের মিশনে ইহাদিগকে শিল্প শিক্ষাদান করিয়া থাকেন।

কালিম্পংএ মিসনারীদের একটী সুবৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে। ইহা কালিম্পং আর্ট্‌স্ এণ্ড ক্রাফট্‌স্ নামে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল বলিয়া একটী বিভাগ আছে। এখানে বহু পার্ব্বত্য বালক বালিকা মিশনারীদের তত্ত্বাবধানে নানাবিধ শিল্প কার্য্য শিখিয়া থাকে। ইহাদের হস্ত নির্ম্মিত সূচীশিল্প বয়নশিল্প দর্শন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিবিধ কারুকার্য্য খচিত কার্পেট, র‍্যাগ ও রেশম বস্ত্রের নানাবিধ দ্রব্য তৈয়ারী হয়। চামড়ার কায, চিত্রবিদ্যা ও ছুতারের কাযও শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাদের তৈয়ারী এই সকল দ্রব্য বহুমূল্যে বিলাতে ও অন্যান্য দেশে বিক্রয় হইয়া থাকে। অবশ্য এই শিল্প ব্যবসায়ের লাভের অংশটী বিদেশী বণিকের খাতাতেই জমা হইয়া যায়; পার্ব্বত্য কারিকরগণ বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র, অধিকন্তু শিল্পবিদ্যা শিক্ষাই ইহাদের একমাত্র লাভ।

এই প্রকারে যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় উল্লিখিত অশিক্ষিত ও নিরক্ষর সমাজে শিল্প কার্য্যের উন্নতি কল্পে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতেন তাহা হইলে ইহাদের জাতীয় শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইত। দরিদ্রদের শিক্ষার জন্য শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। দেশীয়দের এদিকে দৃষ্টি নাই। আমরা জানি, শিক্ষিত সম্প্রদায় কালিম্পংএ একটী কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহাদের স্বদেশী লুপ্তপ্রায় শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতির জন্য কোনই চেষ্টা দেখা যাইতেছে না কতিপয় বৎসর পরে মনোযোগিতার অভাবে এই সমুদয় শিল্পকলা লুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

এই প্রকার শ্রমশীল কর্ম্মঠ হইলেও ইহাদের দরিদ্রতা ঘুচে নাই। অনুসন্ধানে জানা যায় ইহারা অত্যধিক পানাসক্ত। একমাত্র ভুট্টা, চা ও রুটী ইহাদের খাদ্য। ইহারা স্বাবলম্বী হইয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহাদের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ সমস্তই প্রায় সুরাপানে ও জুয়াখেলায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। নতুবা ইহারা যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক উন্নতি করিতে পারিত। ইহাদিগকে মদ্যপান হইতে বিরত করিবার জন্য দেশবাসীর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

দর্জ্জির কাযটীও ইহাদের ভিতর প্রসারলাভ করিয়াছে। ইহাদের অনেকের গৃহেই সিঙ্গারের সেলাইর কল দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকেরাও ঘরে বসিয়া কলে জামা-কাপড় সেলাই করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে।

কৃষি শিল্পের চর্চ্চাও ইহারা করিয়া থাকে। অবস্থাপন্ন লোকদের কমলা লেবুর বাগান আছে। শীতের সময় কমলা লেবু, বর্ষায় ন্যাসপাতী, আনারস প্রভৃতি ফলের ব্যবসায় করিয়া ইহারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে। পাড়াগাঁয়ে গৃহস্থেরা ভুট্টা, ইক্ষু, কলা, গোল আলু, শিম্, বেগুন ও নানাবিধ শাকশব্জির চাষ আবাদ করিয়া থাকে। ইহাদের উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যাদিই অতি সস্তাদরে বাজারে বিক্রয় হয়। ইহাদের মধ্যে কৃষি শিল্পের প্রসার অধিক বলিয়াই দার্জ্জিলিং অঞ্চলে শাক সব্জি এত সস্তাদরে পাওয়া যায়।

ইহারা তামা পিত্তল এবং লৌহের দ্রব্যাদিও প্রস্তুত করে। নেপালীদের এক মাত্র অস্ত্র খুকরী এই অঞ্চলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। দার্জ্জিলিঙের নিকটবর্ত্তী ঘুম নামক স্থানে প্রস্তুতের বৃহৎ কারখানা আছে।

ইহারা যে প্রকার শক্তিশালী ও কর্ম্মঠ, তাহাতে উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে সকল প্রকার শিল্প ব্যবসায়েই

উন্নতি করিতে পারে। এখনও ইহারা দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায় না। ইহাদের উর্ব্বরা জন্মভূমি এখনও ইহাদের অন্ন দিতেছে। অন্নসমস্যার সমাধানের জন্য বিলাসিতা পরিত্যাগ না করিলে ভবিষ্যতে ইহাদের অবস্থা কি হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গৃহের মায়া

খালি ঘরে বসতি আমার
প্রবাসে তাহারি তরে
বিনিদ্র নয়ন ঝরে,
মনে পড়ে সে শূন্য আগার,
প্রকৃতি আপন করে,
সাজায়েছে থরে থরে,
ফল ফুল পল্লব লতায়,
তাই হেথা সারা দিন,
নিরজন জন হীন
তবু দেখি সব পূর্ণতায়,
সজনতা চারিধারে
ঘেরিয়া রয়েছে তারে
কোনও অভাব তাহে নাই,
বাতায়নে ভানু কর
প্রাতে আসে নিরন্তর,
দরশনে নিত্য প্রাণ পাই,
ধীরে আসে সমীরণ
সাথী সম অনুখণ
কত কথা কাণে কহি যায়,
পরিতৃপ্ত তারি বাণী
শুনিয়া আনন্দ মানি,
হৃদয়ের পূর্ণতা তাহার,
শ্রুতি ভরে শুধু ধ্বনি
যে কথা বিস্মৃতি গণি,
ঘনীভূত আকারে দাঁড়ায়,
তারা মোর অন্তরঙ্গ,
প্রীতি-ময় চির সঙ্গ,
তুলে আনে অজ্ঞাত কাহিনী,
নিরজন নহে তাই,
স্মৃতিতে দেখিতে পাই
হিল্লোলিত অনন্ত বাহিনী।
একা ঘর, একা নয়,
আলেখ্যে ভরিয়া রয়,
সে সকল প্রাণের দোসর,
পাষাণে দেবতা গড়ে,
ভক্ত পূজে ঘরে ঘরে,
এও সেইরূপ পূর্ব্বাপর,
ভক্তি প্রীতি ভালবাসা
পূরাইয়া হৃদি আশা,
পূজা করে ভক্তজন নিতি,
তেমতি ছবির সহ,
কাটে দিন অহরহ,
জাগাইয়া রাখে পূর্ব্ব স্মৃতি,
সে গৃহ ছাড়িয়া দূরে,
কভু কি হৃদয় পূরে ?
তার মায়া সকলের বাড়া ;
পরবাসে ভাবি তায়,
কেমনে যে দিন যায় ?
নীরবে নয়নে বহে ধারা।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের উপদেশ

আমরা ১৩৩৫ সালে ৺শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে জেসিডিতে যাই। জেসিডি হইতে ৪॥৫ মাইল পূর্ব্বে দেওঘর। তথায় করণীবাদ রাস্তার উপর গুরুদেব শ্রীশ্রীবালানন্দ স্বামীজির 'রাম-নিবাস ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' অবস্থিত। ৺শারদীয়া পূজার কয়েকদিবস আশ্রমে খুব আনন্দোৎসব হইয়া থাকে। এই সময় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ স্বয়ং আশ্রমে উপস্থিত থাকেন এবং প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আশ্রমবাটী চণ্ডীপাঠ শব্দে মুখরিত হয়। যখন ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ চণ্ডীর প্রত্যেকটি শ্লোক পাঠ পূর্ব্বক সম্মুখস্থ বৃহৎ হোম্ কুণ্ডে "অগ্নয়ে স্বাহা" "অগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া আহুতি প্রদান করেন এবং দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যায় নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড সহকারে দুইবার আরত্রিক হয়, তখন সে মহাসমারোহ ব্যাপার। নবমী পূজার দিবস শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ স্বয়ং যজ্ঞকুণ্ড সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে যখন পূর্ণাহুতি প্রদান করেন, তখন উহা দর্শন করিবার জন্য চতুষ্পার্শ্বে বহুব্যক্তি সমাগত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর সুললিত স্বরে মন্ত্রপাঠ সহ পূর্ণাহুতি সমাপ্ত হইয়া গেলে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ তাঁহার আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারী শিষ্যবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সেই বিরাট জন-সঙ্ঘের প্রত্যেক ব্যক্তির ললাটে স্বহস্তে যজ্ঞের ফোঁটা প্রদান করিয়া থাকেন।

এই দৃশ্য দেখিবার জন্য সপ্তমী পূজার দিবস ৫ই কার্ত্তিক আমরা ৯টার মধ্যে স্নানাদি সমাপন করিয়া জেসিডি হইতে মোটরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের আশ্রমে রওনা হইলাম। ৯টার সময় আমরা তথায় পৌছিলাম। আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক অল্পদুর অগ্রসর হইলেই দেখা গেল বালেশ্বরী মাতার মন্দির অবস্থিত। শ্রীশ্রীবালেশ্বরী মাতার মন্দিরের সংলগ্ন সম্মুখেই যে সুবৃহৎ হোম কক্ষ আছে তাহাতে বোধনের ঘট-স্থাপন হইয়াছে। অন্য সময় ঐ কক্ষের দেওয়ালে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সুরঞ্জিত বৃহৎ তৈল-চিত্র ও অন্যান্য ছবি দ্বারা গৃহখানি সজ্জিত থাকে, কিন্তু এখন দেখিলাম গৃহটী বিবিধ পূজোপচারে পূর্ণ হইয়াছে। ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ সুললিত কণ্ঠে সমস্বরে চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। তথায় পরমানন্দ, তারানন্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের শিষ্যগণ নানা কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন। আমরা ঐ স্থানে প্রণাম করত শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের দর্শনের নিমিত্ত চলিলাম। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সবে মাত্র তিনি তাঁহার "ধ্যান কুটীর" হইতে বহির্গত হইয়াছেন এবং দর্শনপ্রার্থী বহু ভক্ত তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন। আমরাও তথায় প্রণাম পূর্ব্বক সেই পবিত্র পদরজ শিরে ধারণ করিলাম।

এবার রাজসাহীর স্বনামধন্য প্রবীণ উকিল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী মহাশয় এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চৌধুরী মহাশয় দেওঘর ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই খুব ইচ্ছা যে গুরু মহারাজকে দর্শন এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করেন। তাঁহাদের এই বাসনা পূর্ব্বেই একদিন আমার স্বামীর নিকট ব্যক্ত করায় সেদিন তিনি গুরুদেবের নিকট উহা জানাইয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া উঁহাদিগকে আনিতে গেলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই মোটরে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুদেবের নিকট আমার স্বামী উঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিলে উঁহারা গুরু মহারাজকে প্রণাম পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন—"কিসে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা আমাদিগকে বলুন।" শ্রীগুরু মহারাজ বলিলেন, "কি উপদেশ তোমরা চাও?" তখন তাঁহারা অতি বিনীত ভাবে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "কিসে ধর্ম্মপথে সহজে অগ্রসর হওয়া যায় তাহাই কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে উপদেশ দিন।" তাঁহাদের ঐ বাক্য শ্রবণে শ্রীগুরুদেব উচ্চ হইয়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল নানাভাবে বুঝাইয়া বহু উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি প্রথমে বলিলেন, "কর্ম্মযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ এবং ভক্তিযোগ ইত্যাদি বহুপথ রহিয়াছে, যাহার যে পথ ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারে। তবে ভক্তি পথই সহজ সাধ্য। কর্ম্ম যোগাদিতে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, ভক্তিমার্গে বিঘ্ন কম। এই নিমিত্ত প্রথমে ভক্তিপূর্ব্বক 'নাম' সাধনা করিতে হইবে।

চিত্তের অজ্ঞান অন্ধকার অপসারিত করিয়া জ্ঞানালোক আনয়ন করা প্রয়োজন। যতদিন চিত্ত শুদ্ধ না হইবে ততদিন কিছুই হইবে না।" গুরুদেব বলিতেছিলেন, "এই মলিন অপরিষ্কার চিম্‌নি পরিষ্কার করিবার অর্থাৎ বিষয়াদি নানা দোষে মলিন এই চিত্তভূমি শুদ্ধ পবিত্র করিতে এক মাত্র ভগবানই হইল মহৌষধ। এই নিমিত্ত নিত্য নিরন্তর নাম জপ করা প্রয়োজন। মনকে ঘুরাইয়া উল্টাইয়া দিতে হইবে। বহির্ম্মুখ মনকে ঘুরাইয়া অন্তর্ম্মুখ অর্থাৎ ভগবন্মুখ করিতে হইবে। যে কোন কার্য্য করা হউক না কেন 'তাঁহারই প্রীত্যর্থে তাঁহারই কার্য্য করিতেছি' এইরূপ মনে স্থির করিয়া করিতে হইবে। আমি যখন সাধনাদি করি তখনও যেমন মনে করি তাঁহার কার্য্য করিতেছি, আবার এই যে তোমাদের নিকট এত কথা বলিতেছি, তাহাও তাঁহারই কার্য্য মনে করিয়া বলিতেছি, কারণ এই বাক্য হইতে যদি কিঞ্চিৎ মাত্র তোমাদের মনের পরিবর্ত্তন হইয়া মন তাঁহার দিকে ধাবিত হয় ইহাই আমার ইচ্ছা। তাহা হইলে এই যে আমার পরিশ্রম তাহাও সার্থক বোধ করিব।"

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের একটী প্রধান উপদেশ এই যে, "পুত্র কন্যা, আত্মীয় বন্ধু হইতে আরম্ভ করিয়া ধনরত্ন বাড়ী ঘর ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুকেই শ্রীভগবানের বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই সংসার ও বিবিধ অনিত্য বস্তু নিচয়ের আসক্তিতে বদ্ধ না হইয়া, এ সকলে মমত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করত, 'এ সকলই সেই একমাত্র পরমাত্মার,—আমরা কিছুদিনের নিমিত্ত মাত্র এ সকলের জেম্মাদার,'—এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া সেবাইৎ বুদ্ধিতে সংসারের যাবতীয় বস্তুকে দেখিতে হইবে। সকল কার্য্য তাঁহারই কার্য্য মনে করিয়া যত্নের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে।" স্ত্রীলোকদের প্রতি তাঁহার সাধারণ উপদেশ এই যে, "গৃহস্থালীতে তাঁহারা ভগবানের ঝি" এই ভাবে থাকিবে এবং কর্ত্তব্য কার্য্যাদি ভগবৎকার্য্য মনে করিয়া সন্তোষ ও যত্নের সহিত নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুক্ত কিশোরী বাবু বলিলেন, "মনকে কিরূপ উপায়ে ঘুরাইব? আপনি সাধন পথের ক্রম আমাদের বলিয়া দিন।" ইহা শ্রবণে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বলিলেন, "প্রথমেই নিয়ম ঠিক্ করা আবশ্যক। যেমন স্নানাহার বিশ্রামাদি নিয়মিত ভাবে করা হয় এবং করিলে শরীরও ভাল থাকে, সেইরূপ প্রত্যহ একটী নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া প্রথম এক ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টা সময় নিয়মিত ভাবে আসনে বসিয়া নাম সাধন অভ্যাস করিতে হইবে। প্রথমে হয়ত নামে মন ব'সতে চাহিবে না, কারণ চিত্ত শুদ্ধ না হইলে নামের মিষ্টত্ব অনুভব করা যায় না। প্রথম প্রথম নামে মন না বসিলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই। অতক্ষণ সময়ের মধ্যে যদি অল্প সময়ও মন যথাস্থানে নিবদ্ধ থাকে তবে তাহাই তখন যথেষ্ট। এইরূপ অভ্যাসে ক্রমে ক্রমে মন নিশ্চয়ই বেশী সময় উহাতে বসিবে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তই নাম করিবার প্রকৃষ্ট সময়।"

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের বাক্য শ্রবণে উঁহারা বলিলেন, "নাম তো করি, কিন্তু মন তেমন ভাবে বসিতে চাহে না।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "তবুও প্রথমে এইরূপ অভ্যাস চাই। নিয়মিত সাধন অভ্যাস একান্তই আবশ্যক। নিয়ত ভক্তি পূর্ব্বক নাম জপ করিতে থাক,—প্রাণপণে তাঁহাকে ডাক, সতত তাঁহাকে স্মরণ কর;—তাহা হইলেই মন তাঁহার দিকে ঘুরিবে এবং অবশেষে ঐ নামের দ্বারাই নামীকে পাইবে। নামের দ্বারাই শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয় এবং নাম করিতে করিতেই বিষয়ে অনাসক্তি জন্মে। 'তদ্‌জপং তদর্থভাবনম্' অর্থাৎ নাম জপ করিতে করিতে নামের প্রতিপাদ্য দেবতাকে চিন্তা করিতে হইবে। সতত তাঁহার স্মরণ মননের দ্বারা চিত্তভূমি পরিষ্কার হইতে থাকিবে। প্রথমতঃ মন তো এ-দিক ও-দিক যাইবেই, কিন্তু নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা মনকে ক্রমে বশে আনিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা ক্রমশঃ মনকে আপন বশে আনিতে হইবে। এইরূপ নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারাই ক্রমে মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার ও বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ আরও বলিলেন, "লোকে বলে বটে যে 'আমার মন' কিন্তু মন যদি আমার হইত তবে সে আমার বশেই থাকিত। আমি তাহাকে নিজের ইচ্ছা-মন চালাইতে পারিতাম। সাধারণ জীব তো তাহা পারে না, মনই তাহাদিগকে চালাইয়া থাকে। মনের উপর যাহার ঠিকমত অধিকার হইয়াছে, সে জগজ্জয়ী হইতে পারিয়াছে।" গুরুদেবের এই বাক্য শ্রবণে এক

ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, এই মনের উপর কিরূপে আধিপত্য স্থাপন করা যায়?" গুরু মহারাজ বলিলেন, "মনের উপর আধিপত্য কি সহজ কথা? মনের উপর আধিপত্য হইলে তো কার্য্যই সিদ্ধ হইল। মনকে জয় করিয়া উহা বশে আনিবার নিমিত্তই তো এত সাধনার আবশ্যক।"

শ্রীযুক্ত কিশোরীবাবু বলিলেন, "আমাদের মত সংসারী ব্যক্তির মনই ওদিকে যাইতে চায় না।" তদুত্তরে গুরু মহারাজ বলিলেন, "চাই তীব্র পিপাসা। পিপাসার সময় যদি কাহাকেও সরবৎ পান করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ সরবৎ অতিশয় মধুর বোধ হয়। তাদৃশ পিপাসা না থাকিলে উহা তেমন ভাল লাগে না, বা পান করিবারও প্রবৃত্তি হয় না। তোমাদিগের অর্থাৎ সাংসারিক ব্যক্তি-দের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইয়াছে। ধর্ম্মের ক্ষুধাই তাদৃশ জাগ্রত হইতেছে না। জানিও ইহারও ঔষধ আছে, ঐ ঔষধ একমাত্র সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গের দ্বারা ক্রমে ঐ ক্ষুধা বর্দ্ধিত হইবে। এই যে অক্ষুধা ব্যাধি, উহার প্রকৃত পাঁচনই হইল সৎসঙ্গ। ঐ পাঁচন সেবনে ক্ষুধার উদ্রেক ও ক্রমেই উহার বৃদ্ধি হইবে। স্বাধ্যায় বা সৎ শাস্ত্রের বিচার ও সাধুসঙ্গ ইহা প্রথমে নিতান্ত আবশ্যক।"

গুরুদেব আরও একটী কথা বলিতেছিলেন যে, "পরকে মারিতে হইলেই বিবিধ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের প্রয়োজন হয়, কিন্তু নিজকে মারিতে সামান্য একটী সূঁচ দ্বারাও কার্য্য সিদ্ধি হয়।" ইহার মর্ম্ম এই যে অপরকে শিক্ষা দিতে হইলে বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ এবং পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয়, কিন্তু নিজে বুঝিবার নিমিত্ত অত কিছুর আবশ্যক হয় না। তাই গুরুদেব বলিতেছিলেন, "এ পথে আসিতে হইলে গাঢ় ভক্তি এবং গভীর বিশ্বাস চাই। যদি মনে মনে ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকে তবে কিছুই হইবে না।" তিনি আরও বলিলেন, "যদি স্বয়ং ব্রহ্মা আসেন, তবুও কার্য্য হইবে না।"

তৎপরে শ্রীশ্রীগুরুদেব কিশোরী বাবুর পুত্র যতীন্দ্র বাবুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কৈ তুমি কিছু প্রশ্ন করিলে না?" তিনি বলিলেন, "আমার সকল প্রশ্নেরই উত্তর পাইয়াছি।" কিছুক্ষণ পর পুনরায় তিনি গুরুদেবকে বলিলেন, "আমাদের দেশে উপযুক্ত গুরু দুষ্প্রাপ্য। ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে হইলে সদ্‌গুরুর কৃপা বিশেষ প্রয়োজন।" গুরু মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, "গুরু তো অনেকই মিলে, কিন্তু প্রকৃত ভক্তিমান্ শিষ্য মিলাই দুর্ঘট ব্যাপার। যেমন একটী কথা আছে, "গুরু মিলে লাখ্ লাখ্, চেলা না মিলে এক।" গুরুদেবের বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, উপদেষ্টা অনেকই পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক পালন করে এবং গুরু বাক্যানুযায়ী সাধন করে এরূপ প্রকৃত শিষ্য পাওয়াই দুষ্কর। গুরুদেব যতীন্দ্রবাবুকে আরও বলিলেন, "কৃপা তিন প্রকার, ভগবৎকৃপা, আত্মকৃপা ও গুরুকৃপা। প্রথমেই কিন্তু আত্মকৃপা চাই। আত্মকৃপা অর্থাৎ আত্মচেষ্টা হইলে তবে গুরুকৃপা এবং তৎপরে ভগবৎকৃপা লাভ হইয়া থাকে। প্রথমে আত্মকৃপায় চেষ্টা আসে, আত্ম-চেষ্টা ব্যতিরেকে গুরু কৃপা বা ভগবৎ কৃপা উপলব্ধি হয় না। ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হইলে চাই প্রাণের তীব্র ব্যাকুলতায় সাধন করা। সাধন ব্যতীত কোন কিছু লাভ হওয়া অসম্ভব।"

প্রথমে আত্মকৃপা চাই, এবং উহা ব্যতীত যে কিছুই লাভ হয় না ও আত্ম-চেষ্টার দ্বারা যে কতদূর পর্য্যন্ত কার্য্য হইতে পারে তাহার উদাহরণ স্বরূপ গুরু মহারাজ সেদিন অষ্টাবক্র মুনির কাহিনী বলিয়া সকলকে শুনাইয়া-ছিলেন। সে গল্পটি এইরূপ—

অষ্টাবক্রের জন্মকালাবধি দেহের অষ্ট স্থান বক্র ছিল। সে কারণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। একদা তিনি এক গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, এই সৃষ্টি যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি দেখিতে চাই। গুরু তাঁহাকে ব্রহ্মার মন্ত্র প্রদান করিলেন। অষ্টাবক্র অতিশয় শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি ঐ মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক একাগ্রমনে গুরু প্রদত্ত মন্ত্রের সাধন ও কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন। উহার ফলে তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তৎসমীপে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া অষ্টাবক্র বলিলেন, "আপনি কে এবং আপনার কি কর্ম্ম?" ব্রহ্মা নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। এই মহা বিশ্ব ও সর্ব্বলোক আমিই সৃজন করিয়াছি।" তাহা শুনিয়া অষ্টাবক্র স্বীয় দেহ দেখাইয়া বলিলেন, "আপনি কিরূপ

সৃষ্টিকর্ত্তা ? আমার মত এইরূপ আট স্থান বক্র জীব কি আপনি সৃষ্টি করিয়া থাকেন ?" অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তোমার প্রারব্ধের নিমিত্ত এইরূপ বক্র দেহ লাভ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি কি করিব ?" অষ্টাবক্র বলিলেন, "আমার প্রারব্ধই যদি আমার গঠনকর্ত্তা, তবে আপনারই বা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া এ অভিমান কেন ? আর আপনাকেই বা আমার কি প্রয়োজন ?" অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

অষ্টাবক্র গুরুর নিকট গমন করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "কে এই জগতের পালনকর্ত্তা ?" গুরুদেব কহিলেন, "পালনকর্ত্তা বিষ্ণু।" অষ্টাবক্র ভাবিলেন ভাল, তবে তাঁহাকেই একবার দেখা যাউক। তিনি গুরুকে বলিলেন, "আমাকে আপনি বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করুন।" অষ্টাবক্র গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সেই মন্ত্র একাগ্র মনে সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উগ্র তপস্যায় বিষ্ণু দর্শন দিলেন। অষ্টাবক্র তাঁহার পরিচয় এবং তাঁহার কোন্ কর্ম্ম জানিতে চাহিলেন। তিনি এই বলিয়া নিজ পরিচয় দান করিলেন যে, "আমিই এই বিরাট বিশ্বের পালনকর্ত্তা বিষ্ণু। আমিই জগতের সর্ব্ব প্রাণীকে আহার প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের জীবন রক্ষা করিয়া থাকি।" বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণে অষ্টাবক্র বলিলেন, "আপনি কেমন পালনকর্ত্তা ? আর যদি সর্ব্ব প্রাণীকে আহার প্রদানই আপনার কার্য্য হয়, তবে আমি পেট ভরিয়া আহার পাই না কেন ? কখনও কখনও ২।১ দিন উপবাসেও আমার দিন অতিবাহিত করিতে হয় কি নিমিত্ত ?" বিষ্ণু বলিলেন, "আমি তাহার কি করিব ? তোমার যেমন প্রারব্ধ, তেমনই তো তুমি পাইবে ?" অষ্টাবক্র বলিলেন, "তাহা হইলে দেখিতেছি আমিই আমার প্রারব্ধ ও অদৃষ্ট সৃজনের কর্ত্তা। আপনার দ্বারা যদি আমার কোন উপকারই না হইবে তবে আপনারই বা পালনকর্ত্তারূপে এ অভিমান কেন ?" অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণে বিষ্ণু নিরুত্তর হইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অষ্টাবক্র পুনর্ব্বার গুরুর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গুরুকে প্রশ্ন করিলেন, "কে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সংহার কর্ত্তা ?" গুরু বলিলেন, "মহেশ্বর।" অষ্টাবক্র বলিলেন, "তবে মহেশ্বরের মন্ত্রই আমাকে প্রদান করুন।" গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণান্তর সেই মন্ত্র একান্ত ভাবে সাধন করায় কালক্রমে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া অষ্টাবক্র সমীপে আবির্ভূত হইলেন। অষ্টাবক্র তাঁহার পরিচয় ও কোন্ কর্ম্ম জানিতে চাহিলে তিনি নিজ পরিচয় দিলেন ও বলিলেন, "আমিই ইহসংসারের সর্ব্বপ্রাণীর সংহারকর্ত্তা —মহাকাল।" মহাদেবের বাক্য শ্রবণে অষ্টাবক্র বলিলেন, "তবে আপনি এখনই আমাকে সংহার করুন। কারণ আমার মত বিকলাঙ্গ জীব দ্বারা এই পৃথিবীর কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে ?" মহাদেব বলিলেন, "এখনও প্রারব্ধঅনু-সারে এ পৃথিবীতে তোমার বহু কর্ম্ম রহিয়াছে। এখন আমি তোমাকে কেমন করিয়া নিধন করিব ?" তাহা শুনিয়া অষ্টাবক্র বলিলেন, "তবে আর আপনি কেমন সংহারকর্ত্তা ? প্রারব্ধই যদি আমার সর্ব্ববিষয়ের কর্ত্তা, তবে আপনি সংহারকর্ত্তা বলিয়া এ ভ্রান্ত অভিমান মনে পোষণ করেন কেন ?" মহেশ্বর অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণে অন্তর্হিত হইলেন।

অষ্টাবক্রের এত দিবসের এত কঠোর তপস্যা বৃথা গেল না। এই বহু বৎসরাবধি কঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার চিত্তভূমি অতি নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়াছিল। মহেশ্বর যখন অন্তর্হিত হইলেন তখন তিনি আপন মনে বিচার করিয়া ইহাই বুঝিলেন যে মানবগণ স্বয়ংই স্ব স্ব অদৃষ্টের কর্ত্তা। যে যেমন কর্ম্ম করে সেইরূপ কর্ম্মফলানু-সারে তাহার প্রারব্ধ এবং ভবিষ্যতের অদৃষ্টাদি রচিত হইয়া থাকে। প্রারব্ধ ফিরাইবার ক্ষমতা স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরেরও নাই দেখিতেছি। আমিই যখন আমার সম্পূর্ণ কর্ত্তা তখন কি করিলে আমি আমাকে ভালরূপ জ্ঞাত হইতে পারিব, কিসে আমার প্রকৃত আত্ম-বোধের উপায় হইবে, এখন তাহারই চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই রূপ চিন্তা করিয়া তিনি গুরু সন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন, "কিরূপে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, আপনি আমাকে কৃপা পূর্ব্বক সেই উপদেশ এবং সেইরূপ উপযুক্ত মন্ত্র প্রদান করুন।"

অষ্টাবক্রের প্রার্থনানুসারে গুরু তাঁহাকে আত্মজ্ঞান লাভের মন্ত্র প্রদান করিলেন। অষ্টাবক্র তখন বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যম সহকারে আত্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ নিমিত্ত নিয়ত ধ্যানে রত রহিলেন। তিনি আত্মধ্যা ন

দ্বারা ক্রমে আত্মা বিদিত হওয়ায় সম্পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইলেন। মহা তপস্যার ফলে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইয়া গেল এবং তিনি পূর্ণ জ্ঞানী পুরুষ হইলেন। যথাকালে তিনি অষ্টাবক্র মুনি নামে জগতে বিদিত হইলেন!

এই গল্প বলিয়া শ্রীগুরুদেব বুঝাইলেন যে আত্মকৃপা বা আত্মচেষ্টাই মানবের উন্নতির মূল কারণ। অষ্টাবক্রের আত্মচেষ্টায় গুরুমন্ত্র লাভ এবং আত্মচেষ্টার সহিত মহা তপস্যার দ্বারা অবশেষে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

একদা মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক বিরাট সভা করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সন্নিকটে একখানি বহু মূল্যবান্ আসন রাখিয়া তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি একটি বাক্য দ্বারা আমাকে মহৎ একটি উপদেশ দিতে পারগ হইবেন তিনি এই আসনে উপবেশন করিবেন। আমি তাঁহাকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইব।"

রাজর্ষি জনকের বিরাট সভামণ্ডপে অনেক উপযুক্ত ব্যক্তি এবং বহু মুনি ঋষি উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জনক রাজার গুরু হইবার ইচ্ছা অনেকেরই মনে জাগ্রত হইয়াছিল; কিন্তু একটি বাক্যে উপদেশের সারাংশ কেমন করিয়া কে কি বলিবেন তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই কারণেই সাহস পূর্ব্বক ঐ গুরুর আসনে কেহ বসিতেও পারিতেছিলেন না। এমন সময় অষ্টাবক্র মুনি উঠিয়া সেই আসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। উহা দর্শনে সভাস্থ বহু সম্মানিত মুনি ঋষি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ইহাই মনে করিলেন যে, আমরা যে আসনে বসিতে সঙ্কুচিত হইতেছি, তাহাতে কি না একজন বিকলাঙ্গ ব্যক্তি বসিতে সাহসী হইল? উঁহাদিগকে ঐরূপ উচ্চ হাস্য করিতে দেখিয়া অষ্টাবক্র তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা চামার ও কসাই।" সভাস্থ সম্মানিত ব্যক্তিগণ সমক্ষে এইরূপ অপ্রিয় কর্কশ বাক্য শ্রবণে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া অষ্টাবক্রকে বলিলেন, "এরূপ রূঢ় বাক্য কেন আমাদের প্রতি প্রয়োগ করা হইল?" তদুত্তরে অষ্টাবক্র মুনি বলিলেন, "তোমাদের আমি চামার ও কসাই বলিতেছি—ইহার কারণ তোমরা আমার কেবল মাত্র হাড়, মাংস ও চামড়াই দেখিতেছ। ইহার অতিরিক্ত যে কোন বস্তু থাকিতে পারে ইহা বোধ হয় তোমরা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ।" অষ্টাবক্র মুনির এই প্রকার তীব্র ভৎর্সনা বাক্যে তখন সকলেই মহা লজ্জিত হইলেন।

এদিকে, আসনে উপবেশনান্তর অষ্টাবক্র মুনি জনক রাজার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "তোমার নিজের যাহা বস্তু তাই আমাকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ প্রদান কর।" জনক রাজা দেখিলেন, এই মুনি সংক্ষেপে এক কথায় অতি সত্য বাক্যই বলিয়াছেন। কারণ, এই সুবিশাল রাজত্ব, এই বিরাট রাজসভার বহুমূল্যবান্ পদার্থ নিচয়, প্রকাণ্ড সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ, নানাবিধ মণি-মুক্তার বিবিধ অলঙ্কার এবং এই অগণিত আত্মীয় বন্ধুবর্গ—এ সকলই তো অনাত্ম বস্তু। দৃশ্যমান্ পদার্থ নিচয় বাস্তবিক পক্ষে তো আমার নিজ বস্তু নয়। এ সকলের সহিত আমার সম্বন্ধই বা কয় দিনের? সত্যই বাহিরের কোন বস্তুই আমার হইতে পারে না। তখন তিনি অষ্টাবক্র মুনির প্রতি সুপ্রসন্ন দৃষ্টি প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিলেন, "হে গুরো! আপনাকে আমি দক্ষিণা দিতে অসমর্থ। কারণ, আপনি যথার্থ বাক্যই বলিয়াছেন, এস্থানে 'আমার' বলিতে তো কিছুই নাই। এই অনাত্ম বস্তুসমূহের কোনটীই আমার নিজ বস্তু নয়।" সেদিন সেই সভা-মণ্ডপে অষ্টাবক্র মুনির ঐ একটী বাক্যে ঐরূপ মহৎ উপদেশ লাভ করিয়া রাজর্ষি জনক পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তিনি সেই সুবৃহৎ সভাস্থলে অষ্টাবক্র মুনিকেই তাঁহার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রী গুরুদেব এই কাহিনী সমাপ্ত করিয়া আরও কিছু কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "গঙ্গা নিত্য নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, যাহার যত বড় পাত্র সে ততখানি গঙ্গোদক ভরিয়া লইতে সমর্থ হয়। আধার ক্ষুদ্র হইলে তাহাতে গঙ্গোদক কি প্রকারে বেশী ধরিবে? ক্ষুদ্র পাত্রের নিমিত্ত যদি পাত্রে অল্প গঙ্গোদক ধরে তবে সে দোষ তো গঙ্গার নয়?"

যতীন্দ্র বাবু গুরু মহারাজকে বলিলেন, "আপনি উপযুক্ত রূপ পাত্র প্রস্তুত করিয়া লউন।" গুরুদেব বলিলেন, "পাত্র নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রথমে খুব চোট দিতে হয়। যেরূপ স্বর্ণের ভূষণ প্রস্তুত করিতে হইলে পূর্ব্বে স্বর্ণকে অগ্নিতে পোড়াইয়া উত্তাপ দ্বারা গলাইয়া অস্ত্র দ্বারা

ছেদন করিরা, নানা প্রকারে দিয়া, তবে খাঁটি স্বর্ণের ভূষণ প্রস্তুত করিতে হয়। তখন তাহা অঙ্গে ধারণ করা যায়। যদি প্রকৃত খাঁটি স্বর্ণ হয়, তবেই ঐ সমস্ত চোট সহ্য করিতে পারে, আর উহাতে যদি কোন খাদ মিশ্রিত থাকে তবে উহা ফাটিয়া যায়, উহা দ্বারা আর ভূষণ প্রস্তুত সম্ভবপর হয় না। একবার ঐ সকল সহ্য করিয়া ভূষণ প্রস্তুত হইয়া গেলে তখন আর তাহাকে তাপ, চোট্ কিছুই দিতে হয় না। তখন ঐ ভূষণ কণ্ঠে, কর্ণে, বাহুতে পরিধান করা যায়। সেইরূপ পাত্র প্রস্তুত করিতে হইলেও অশেষ-বিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। আমি যদি এখন চোট্ দিই, তাহা হইলে কি তুমি তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হইবে?"

গুরুদেব আরও বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ক্রমে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। পিতা মাতা এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী, ইঁহাদিগকে আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সেবা করিতে হইবে। প্রত্যহ প্রাতে নিয়মিত ইঁহা-দিগকে সভক্তি প্রণাম করা প্রয়োজন।" ইহা বলিয়া তিনি তখনই যতীন বাবুকে তাঁহার পিতাকে প্রণাম করিতে বলিলেন। যতীন বাবু আদেশ প্রতিপালন করিলে গুরুদেব বলিতে লাগিলেন, "যদি তুমি প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া এইরূপ ভক্তি পূর্ব্বক পিতামাতাকে নিয়মিত প্রণাম কর, তবে তাঁহাদিগের আন্তরিক আশীর্ব্বাদে তোমার অন্তরে শক্তি বৃদ্ধি হইবে। দেখ, পিতামাতা তোমার নিমিত্ত কত করিয়াছেন, তুমি এখন উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছ, তোমার কর্ত্তব্য এখন তাঁহাদের সেবা করা, তাঁহাদের কার্য্য করা। পরে ক্রমে ভগবদ্ উদ্দেশ্যে হিতকর কর্ম্ম করিবে। তুমি এতদিন ধরিয়া যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছ তাহাতে সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ এবং সংসারের সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম পথের কোনই সহায়তা হইবে না। তোমাকে আজ যে সকল উপদেশ দেওয়া হইল, উহা অন্তরে স্মরণ রাখিও এবং সেইরূপ চলিতে প্রয়াস করিও। তাহা হইলে তোমারও বিশেষ উপকার হইবে, আমারও এই শ্রম সার্থক মনে করিব।"

শ্রীযুক্ত কিশোরী বাবু ও তৎপুত্র এই সকল উপদেশ-বাক্য শ্রবণে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, "আমরা আর এক দিন আপনার নিকট আসিতে ইচ্ছা করি।" শ্রীগুরুদেব বলিলেন, "আমার দরজায় তো প্রহরী নিযুক্ত নাই যে তোমাদের আসিতে বাধা প্রদান করিবে! এখানে তোমাদের যখন ইচ্ছা তখনই আসিতে পার। আর অদ্য তোমরা যাহা পাইলে, তাহা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিও। তোমাদিগকে যে ঔষধ আজ প্রদান করা হইল, একদিন হয় তো তাহার পরীক্ষা লওয়া হইতে পারে।" সে দিবস এই প্রকার বহু উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক শ্রীশ্রী গুরুমহারাজ নীরব হইলেন। উঁহারাও উভয়ে গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজসাহীর জনৈক ভদ্রমহিলা।

দিনের আলোকে

দিনের আলোকে যাহা ছিল চোখে,
সাঁঝের আঁধারে নাই
মুকুল মাধুরী মালতীর ঝুরি,
গোলাপের চিকণাই;
তবু তারা আছে—গন্ধে ভরিয়াছে,
কাননের সব ঠাঁই॥

অমল মর্ম্মরে কাঁদনিয়া ঝরে,
তারকা দিতেছে উঁকি,
বাঁকা চাঁদ খানি কি যে বলে বাণী
কি যেন দেখে সে ঝুঁকি,
চোখে চোখে রেখে কথা বলে ডেকে,
অর্থ তার বুঝিনু কি?

চোখের আড়ালে পা দুটি বাড়ালে,
যায় সে কি একেবারে?
আমি কাল ভোরে যাবনা ত মরে'
যাব সুদূরের পারে,
দূরের বারতা শুনিতে পার তা
প্রাণের গোপন তারে।

পাটনা

আপন ও পর

(গল্প)

রাত্রি এগারটার সময় কোনও মফঃস্বল সহরের এক সুদৃশ্য অট্টালিকায় ত্রিতলের একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে যুবক দম্পতীর মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতেছিল।

যুবক। সুষমা, সেদিন যে তোমাকে দশটাকার পাঁচখানি নোট দিয়েছিলাম, সে নোট ক'খানি দাও তো, আমার বিশেষ কায আছে। সাতদিন পরে আমি দশ টাকা সুদ শুদ্ধ তোমার টাকা শোধ করব।

যুবতী। চুপ কর বলছি। রাত্রি এগারটার সময় কোথায় আমার সঙ্গে প্রেমের কথা বলিবে, তা না, কেবল টাকা, টাকা, টাকা। সমস্ত দিন তো শামলা মাথায় দিয়ে টাকার ফিকিরে ঘোর, আবার রাত্রে শোবার ঘরে এসে সেই টাকা টাকা টাকা ?

যুবক। না, ঠাট্টা রাখ; আমার পঞ্চাশটে টাকার বিশেষ দরকার হয়েছে। আমার এক বন্ধু বিশেষ বিপদে পড়েছে, তাকে কালই এই টাকা ক'টা পাঠাতে হবে।

যুবতী। তবে শোন, আমিও সত্যি বলছি, টাকা আমার কাছে নেই। আমার এক বন্ধু বিশেষ বিপদে পড়েছিল, তাকে দিয়ে দিয়েছি।

যুবক। অবাক্ করলে। সেই বন্ধুটী কে বল দেখি ? যদি ব্যাটাছেলে হয়, তবে তার সঙ্গে একটা খুনোখুনি রক্তারক্তির ব্যাপার ক'রে ছাড়বো।

যুবতী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমার বন্ধু পুরুষ মানুষই বটে, শুধু পুরুষ নয় আবার যুবা পুরুষ, বয়স তোমার চাইতে কিছু কম্। দেখতে দিব্যি সুশ্রী।

যুবক। (হাসিয়া) অ্যাঁ তবে ত যুদ্ধ নিশ্চয়।

যুবতী। তা যুদ্ধ, রক্তারক্তি যা খুসী তা কর। কিন্তু শেষটায় ভ্রাতৃহত্যার পাতক হবে।

যুবক। হেঁয়ালি রাখ। স্পষ্ট ক'রে বল বন্ধুটী কে ?

যুবতী। ওগো পুরুষমানুষ, অন্তরের জ্বালায় জ্বলে মরোনা। আমার বন্ধুটী আর কেউ নয়, তোমার ছোট ভাই নরেন। সে আমার কাছে পঞ্চাশটি টাকার জন্যে কাকুতি মিনতি ক'রে চিঠি লিখেছিল, তোমাকে জানাতে বারণ করেছিল। সেই জন্যে আমি গোপনে তোমার দেওয়া সে পঞ্চাশ টাকা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে লিখেছিল যে এই টাকা দিয়ে সে একটী রিষ্ট ওয়াচ কিনবে। রিষ্টওয়াচ না হলে নাকি কলেজে যাওয়া আসার বিশেষ অসুবিধা হয়। বি-এ পরীক্ষার সময় নাকি রিষ্টওয়াচের বড় দরকার !

যুবক। ছি সুষমা, এ তোমার ভারি অন্যায় ! এই গেল বছর আমি তাকে একটী ভাল জেব ঘড়ী কিনে দিয়েছি। সেই ঘড়ী দেখে অনায়াসে কলেজে যেতে ও পরীক্ষা দিতে পারে। রিষ্টওয়াচ শুধু বাবুগিরির জন্যে। পাঠ্যাবস্থায় ওর বাবুগিরির প্রশ্রয় দেওয়া তোমার উচিত নয়।

যুবতী। চুপ কর,' উকিল মশাই। আমি জজ্ সাহেব নই; আমার কাছে তোমার আর সওয়াল জবাব.করতে হবে না। একটী মাত্র ছোট ভাই, অল্প বয়সে বি-এ পরীক্ষা দেবে। কোথায় খুসী হয়ে তাকে দশ পাঁচটা টাকা দেবে, তা না ক'রে আমি টাকা দিয়েছি বলে আমার উপর তম্বি করচ ! বলি এত রোজগার করছ কিসের জন্যে ? তোমার শামলা কেড়ে নিয়ে ওকালতির খাতা থেকে নাম কেটে দেবো। এবার বড়দিনের বন্ধের পর কলকাতায় যাওয়ার সময় তাকে আর যা দিয়েছি তা শুনলে তুমি ত একেবারে রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠবে !

যুবক। (ব্যস্তভাবে) আর কি দিয়েছ বল শুনি। তুমি ওর মাথাটি খেলে দেখ্ছি !

যুবতী। আমাদের গেল বিবাহের সম্বৎসরের দিন

তুমি যে আমাকে একটী নীলা বসান আংটী আর তিন খানি সুন্দর রেশমী রুমাল দিয়েছিলে, তা আমার লক্ষ্মণ দেবরকে স্বত্বত্যাগ করে দিয়ে দিয়েছি। সে বল্লে, কলেজের সব ছেলেরি আংটী আছে; শুধু তারই নেই, আর সব ছেলেই নাকি সিল্কের রুমাল ব্যবহার করে। বড় কলেজে বড় লোকের ছেলেরা সব পড়ে, তাদের সঙ্গে সমান ভাবে তাকে চল্‌তে হবে ত! আর মাথা খাওয়ার কথাটা যে বলছ, মাছের মুড়ো হতে ভায়ের মাথা পর্য্যন্ত পুরুষমানুষেরাই খেয়ে থাকে। স্ত্রীলোকের ভাগ্যে সে জিনিষটা খুব কমই জোটে।

যুবক (নিরাশ ভাবে) তোমার সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই। তা যা দিয়েছ, দিয়েছ, আর কিছু দিওনা। কোন রকমে বি-এ টা পাশ করতে দাও।

যুবতী। আর তার পরেই ভাইকে বিয়ে করিয়ে তার শ্বশুরের ঘাড়ে তাকে চাপিয়ে দেবে, মনে করেছ?

যুবক। আমি এই বল্লুম নাকি? তোমার সব-তাতেই বাড়াবাড়ি। রাত বেশী হয়ে গেছে; এখন বাতি নিবিয়ে শোয়া যাক, কি বল?

যুবতী। আমি ত আগে থাক্‌তেই এই কথা ব'লে আসছি।

বলিয়া যুবতী বাতি নিবাইয়া দিল। এবং শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পঁচিশ বৎসর পরের কথা। সুষমার স্বামী হেমেন্দ্রলাল এখন আর মফঃস্বলের উকীল নহেন হাইকোর্টের একজন নামজাদা ভকীল, খুব পসার। বহু টাকা জমাইয়া ফেলিয়াছেন। আরও জমিতেছে। সুষমা এখন পাকা গৃহিণী—দুইটী মেয়ে এবং চারটী ছেলের মা। বড় মেয়ের খুব ধুমধামের সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহাতে হাজার ত্রিশেক টাকা ব্যয় হইয়াছে। বড় ছেলেটী ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে ঢুকিয়াছে। দ্বিতীয় মেয়েটী বেথুনে পড়ে, ছেলে তিনটী হিন্দুস্কুলে পড়ে। ছোট ভাই নরেন্দ্রলাল সে বার বি-এ পাস করিতে পারে নাই। আরও দুইবার পরীক্ষা দিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হয় নাই। প্রেমে পড়িয়া বীণা নাম্নী এক গরিব গৃহস্থের সুশিক্ষিতা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। হেমেন্দ্র ভ্রাতৃ-বধূকে সাদরে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু সুষমার সহিত বীণার বনিবনাও হইল না। সংসারে রাত্রিদিন কলহ ও কিচিকিচি লাগিয়াই থাকিত। কোন পক্ষকেই নিরস্ত করিতে না পারিয়া নরেন্দ্র দাদাকে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিল এবং সামান্য ত্রিশ টাকা বেতনে ডাক বিভাগে চাকরী লইল। চাকরীতে পাকা হইবার পরে একদিন হেমেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে বাসায় আসিয়া বীণাকে লইয়া কর্ম্মস্থলে গেল। সুষমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

এ কয় বৎসরে নরেন্দ্রলালের ছয়টি সন্তান হইয়াছে। তন্মধ্যে চারিটি মেয়ে, দুটী মেয়ে বিবাহ যোগ্যা হইয়াছে কিন্তু অর্থের অভাবে তাহাদের বিবাহ দিতে পারে নাই। ছেলে মেয়ে গুলি দেখিতে বেশ সুন্দর, সকলেই মায়ের সুগৌর বর্ণ ও সৌন্দর্য্য পাইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে পিতা তাহাদিগকে আবশ্যক মত গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইতে পারে না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় নরেন্দ্র মজঃফরপুরের বড় পোষ্টঅফিসের মানিঅর্ডার বিভাগের বড় কেরাণী। বেতন আশী টাকা। নরেন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই মজঃফরপুরে বদলী হইয়া গিয়াছিল, কারণ তখনকার দিনে মজঃফরপুরে বাসা ভাড়া ও জিনিষপত্র খুব সস্তা ছিল। তাছাড়া অন্য একটী কারণও ছিল। ছেলে মেয়েদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, বেশীদিন তাহার চাকরী করা চলিবে না, একটা কোন ব্যবসা করিতেই হইবে। সে শুনিয়াছিল যে মজঃফরপুরে আম ও লিচু যেমন সুস্বাদু তেমনি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এবং মূল্যও তেমনি সস্তা। আমেরিকা প্রত্যাগত কোনও বন্ধুর নিকটে সে ফলকে টিনের কৌটায় ভরিয়া কি প্রকারে বহুকালের জন্য সংরক্ষণ করা যায় সেই প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল মজঃফরপুরে দুই এক বছর থাকিয়া লোকজনের সহিত পরিচিত হইলে চাকরী

পরিত্যাগ করিয়া আম ও লিচুর ব্যবসা করিবে, এবং কৌটায় ভরিয়া আম ও লিচু ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এমন কি ইয়োরোপে ও আমেরিকায় ও চালান দিবে।

নরেন্দ্রের মজঃফরপুর গমনের পর দুই বৎসর পূর্ণ হইলে, এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। সেদিন মনি-অর্ডারের সংখ্যা কিছু বেশী হইয়াছিল—পাঁচ হাজার টাকার উপর। বেলা ৩টার সময় মনিঅর্ডার বন্ধ হইলে নরেন্দ্র পাঁচ হাজার টাকার নোট গণিয়া একটা বাণ্ডিল করিয়া সুতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিল। এবং অবশিষ্ট টাকা ও নোট একটা ট্রের উপর রাখিল। টাকা ও নোট পোষ্ট অফিসের খাজাঞ্চিকে দিতে যাইবে, এমন সময় পোষ্ট মাষ্টার তাহাকে একটা জরুরি কাযে ডাকিয়াপাঠাইলেন। নরেন্দ্র তাহার নিম্ন কেরাণী অবি-নাশকে নোট ও টাকা গুলি দেখিতে বলিয়া পোষ্ট-মাষ্টারের সহিত দেখা করিতে উপর তালায় চলিয়া গেল। পাঁচ মিনিট পরে নরেন্দ্র আসিয়া দেখে অবিনাশও নাই পাঁচহাজার টাকার নোটের বাণ্ডিলও নাই। শুধু ট্রের উপর টাকা ও নোট রহিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী পার্শেল ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল যে অবিনাশের পেটের পীড়া হওয়াতে সে আধঘণ্টার জন্য বাহিরে গিয়াছে, আধঘণ্টা পরেই ফিরিয়া আসিবে বলিয়াছে।

নরেন্দ্র বুদ্ধি করিয়া পাঁচহাজার টাকার নোট অদৃশ্য হইয়াছে এই কথা পার্শেল বাবুকে বলিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিল, সে চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। ক্ষণকাল সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল। মস্তিষ্ক দ্রুত কার্য্য করিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল অবিনাশ নোট নিয়া আর ফিরিবে না। পনের মিনিটের মধ্যে সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির ফেলিল। খাজাঞ্চিকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল। এবং হাতে পায়ে ধরিয়া, পরদিন বেলা ১২টা পর্য্যন্ত কোন রিপোর্ট না করিতে অনুনয় করিল। যদি ১২টার মধ্যে এই পাঁচ হাজার টাকা পূরণ না করিয়া দিতে পারে, তবে যেন খাজাঞ্চি মহাশয় উপরওয়ালার নিকট তাহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন, তখন আর সে কোন ওজর আপত্তি করিবে না। তখন তাহার অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবে।

অফিস শুদ্ধ সকলেই নরেন্দ্রের সৎস্বভাব, বিনয় ও অমায়িকতার জন্য তাহাকে ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধা করিত। বৃদ্ধ খাজাঞ্জিবাবু নরেন্দ্রকে নিজের পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। টাকা না দিতে পারিলে নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি পড়িবে জানিয়াও খাজাঞ্জি বাবু পরদিন বেলা ১২টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন। খাজাঞ্জিবাবুর দয়ায় নরেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল। খাজাঞ্জিবাবু তাহাকে ক্রন্দন করিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া টাকার যোগাড় করিতে উপদেশ দিয়া, ট্রের উপর যে টাকা ও নোট ছিল তাহা সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

নরেন্দ্র খাজাঞ্জির ঘর হইতে বাহির হইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু এক বই দ্বিতীয় উপায় ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। তাহা, দাদা হেমেন্দ্রের নিকট পাঁচ হাজার টাকার জন্য তার করা। সে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা লইয়া বেতনের অল্পতা হেতু দারিদ্র্যে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তথাপি দাদার নিকট একটি পয়সাও কখনও চাহে নি। আজ পাঁচ হাজার টাকার জন্য দাদার নিকট হাত পাতিতে তাহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু উপায় নাই। পরদিন বেলা ১২টার মধ্যে টাকা না দিতে পারিলে নিশ্চয়ই জেল হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকরীও যাইবে। তখন স্ত্রী-পুত্র কন্যার উপায় কি হইবে? মজঃফরপুরে এত টাকা চাহিলে কেহই দিবে না—লাভের মধ্যে জানা-জানি হইবে। আর ভাবিবারও সময় নাই। নরেন্দ্র কম্পিত হস্তে নিম্নলিখিত সংবাদটি লিখিয়া জরুরী তারযোগে দাদার নিকট পাঠাইল—"বিশেষ বিপদ। লোক মারফতে পাঁচ হাজার টাকার নোট অদ্য রাত্রির গাড়ীতে অবশ্য পাঠাইবেন। পত্রে সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইতেছি।"

তার পাঠাইয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া দাদার নিকট এক পত্র লিখিয়া, সেই পত্র ডাকে দিয়া নরেন বাসায় ফিরিয়া গেল। বীণাকে কিছুই বলিল না।

বলিলে কিছুই লাভ হইত না। শুধু মনকষ্টে ও দুশ্চিন্তায় সে পাগলিনীর মত হইত। সেদিন রাত্রে নরেন্দ্র ভাল করিয়া আহার করিতে পারিল না। শত চেষ্টাতেও নিদ্রা আসিল না। সমস্ত রাত্রি বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। সে একা এক ঘরে শুইত, বীণা ছেলে-মেয়ে নিয়া অন্য ঘরে শুইত। কাযেই বীণা কিছু মাত্র টের পাইল না।

সেদিন হেমেন্দ্রবাবু ৫টার সময় হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া জলযোগান্তে নীচে নামিয়া মাত্র সুসজ্জিত বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় পিয়ন নরেন্দ্রের প্রেরিত তারখানি তাহার হস্তে দিল। হেমেন্দ্র তারখানি পড়িয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। যদিও তিনি হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তথাপি পত্নী সুষমাকে না জানাইয়া একটি পয়সাও খরচ করিতেন না। তারখানি হাতে লইয়া সুষমার নিকট গেলেন এবং স্বামী স্ত্রীতে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইল।

হেমেন্দ্র। বলি শুন্‌ছ? নরেন তার করেছে—তার নাকি বড় বিপদ। লোক মারফতে আজই পাঁচ হাজার টাকা পাঠাইতে লিখেছে। কি বল? টাকা পাঠিয়ে দিই? নরেন ত কোন দিন আমার কাছে কোন সাহায্য চায় নি। আমিও ভাই হয়ে নরেনের প্রতি ভাইয়ের আচরণ কিছুই করিনি। মজঃফরপুরের কত লোকের কাছে নরেনের দরিদ্রতা ও খাওয়া পরার কষ্টের কথা শুনেছি। ছেলেমেয়ে গুলির রূপগুণের কথাও শুনেছি। তবুও সেও আমার নিকট কোনও সাহায্য চায় নি, আমিও সাহায্য করি নি। আজ পঁচিস বছর পরে যখন সে প্রথম আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে তখন নিশ্চয়ই তার খুব বিপদ! আমার মনও সেই কথা বলছে।

সুষমা। ও আমার দরদী রে! ভাইয়ের দুঃখে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। ও সব ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা। সেই বীণা ছুঁড়ী ওকে শিখিয়ে দিয়ে থাকবে। খবরদার! কখনও এই টাকা পাঠাতে পাবে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমারও কটা কাচ্চাবাচ্চা হয়েছে। তুমি যাকে তাকে এতগুলি ক'রে দান করলে শেষে কি আমি ছেলেপুলেগুলিকে নিয়ে পথে দাঁড়াব? তুমি কিছুতেই টাকা দিতে পারবে না।

হেমেন্দ্র। ছি সুষমা, তোমার এ কথা বলা বড় অন্যায়। তুমিও জান, আমিও জানি, নরেনকে পাঁচ হাজার টাকা দিলে আমার সংসারের কোনও অনটন হবে না। কিন্তু টাকার অভাবে নরেনের বিশেষ বিপদ হতে পারে। হয়ত তাকে জেলে যেতে হতে পারে। হাজার হোক সে আমার ভাই ত!

সুষমা। ও আমার ভাই লো! ভাইয়ের জন্যে ভাইয়ের কত দরদ? এতদিন মজঃফপুরে আছে, শুনেছি সেখানে সস্তায় কত ভাল ভাল আম লিচু টিচ্‌ পাওয়া যায়। ভাইকে কি ভাইয়ের ছেলে মেয়েগুলিকে দুটো আম কি লিচু ভুলে কখনও পাঠিয়েছে? আর তোমার ভাই-ই বুঝি ভাই, আমার ভাই বুঝি ভাই নয়। আমার দাদা যে কত অনুনয় বিনয় করে তোমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিল, তাকে কি দিয়েছিলে? বল্লে—'ওকে টাকা দেওয়া বৃথা। ব'লেছে বটে জমি কেনবার জন্যে টাকা চায় কিন্তু টাকা দিলে মদ গাঁজা খেয়ে আর থিয়েটার করে উড়িয়ে দেবে।' আবার বলছি, কখনও এ টাকা দিতে পারবে না। সে যদি পাপ ক'রে থাকে ত শাস্তি পাবে। তার অদৃষ্টে থাকে, জেলে যাবে।

হেমেন্দ্র। কি বল্লে? তার অদৃষ্টে থাকে সে জেলে যাবে? তোমার এই কথা? ছেলে মেয়ের মা হয়ে তোমার হৃদয় এমন কঠিন? আমি এ টাকা পাঠাইবই।

সুষমা। আমিও বল্‌ছি, তুমি যদি এ টাকা পাঠাও তবে তোমার বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্তও আমি থাকব না। তোমার ছেলে মেয়ে বুঝে নেও। আমি আজই বাপের বাড়ী চলে যাব।

হেমেন্দ্র। তোমার যা খুসী তা তুমি করতে পার। আমি টাকা পাঠাবই।

বলিয়া হেমেন্দ্র আর বাক্যব্যয় না করিয়া

ইতালীর সাগরবেলায় কবি শেলীর শবদাহ

যে ঘরে লোহার সিন্ধুক থাকিত সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া লোহার সিন্ধুক হইতে পাঁচ হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া একটি ক্যাস বাক্সের মধ্যে ভরিল। ক্যাসবাক্সে চাবি দিয়া তালার মুখটি গালা দিয়া শীল করিল এবং ক্যাসবাক্সটি একটি ক্ষুদ্র তোরঙ্গে ভরিয়া একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া তাহাকে পাঞ্জাব মেলে রওয়ানা হইতে আদেশ দিল। এবং বলিয়া দিল সে যেন তোরঙ্গটি নরেন্দ্রের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া তাহার হাতে দুটি চাবি দিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে ফেরৎ গাড়ীতে কলিকাতা চলিয়া আইসে। বলিয়া কর্ম্মচারীর হাতে একটি রিং সমেত তোরঙ্গের ও ক্যাসবাক্সের চাবি দুটি তাহার হাতে দিল। কর্ম্মচারী তোরঙ্গ লইয়া চলিয়া গেল।

সুষমা মুখে যাহা বলিয়াছিল কার্য্যেও তাহাই করিল। সে রাত্রেই একটি দাসী ও একজন সরকার সঙ্গে নিয়া খুলনা মেলে সে বাপের বাড়ীর দিকে রওনা হইল। হেমেন্দ্র তাহাকে বাধা দিল না। হৃদয়ে দারুণ আঘাত অনুভব করিল।

সে রাত্রে নরেন্দ্র বিছানায় শুইয়া ছটফট্ করিতেছিল, কিছুতেই নিদ্রা আসিতেছিল না।

রাত্রি ২টার সময় একখানি গাড়ী আসিয়া তাহার বাসার সদর দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। এবং বাহিরের ঘরের দ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনা গেল।

নরেন্দ্র ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। তবে কি পুলিশ তাহাকে ধরিতে আসিল? আসে আসুক, সে পলাইবে না, ধরা দিবে, নিজের অসাবধনতার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বীণাকে কিছু বলা হইবে না। অভাগিনী সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর শান্তিতে ঘুমাইতেছে, ঘুমাক— তাহার শান্তির ব্যাঘাত করা হইবে না। পরে তো সকলই জানিবে। এই ভাবিয়া নরেন্দ্র অতি সন্তর্পণে শয্যা-গৃহের দ্বার উন্মোচন করিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া একটী লণ্ঠন জ্বালিল। তারপর দৃঢ়হস্তে বাহিরের দিকের দরজা খুলিয়া দিল।

খুলিয়া যে দৃশ্য দেখিল সে তাহাতে চমকিত হইয়া উঠিল। দেখিল তাহার দরজার সম্মুখে বিংশতি বর্ষীয়া এক সুন্দরী ভদ্রঘরের রমণী হাতে একটি কাপড়ের পুটলী লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যেন সাক্ষাৎ ভগবতী, আর্ত্তকে বরদান করিতে আসিয়াছেন। রমণী নিঃশব্দে ধীর পদবিক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তার পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া নরেন্দ্রকে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। নরেন্দ্র বলিল, "কে মা তুমি?" যুবতী মৃদু স্বরে কহিল, "আমি পাপিষ্ঠা, পাপীর স্ত্রী। আজ দারুণ লোভের বশবর্ত্তী হয়ে, পিতার তুল্য মহাপুরুষকে বিপদে ফেলে, যে আপনার জিম্মা হতে পাঁচ হাজার টাকার নোট সরিয়েছিল, আমি তাঁরই স্ত্রী। আমার স্বামী আমার কাছে এনে যখন সেই নোটের তাড়া হাতে দিলেন, আমি তখনই দুঃখে লজ্জায় মৃতপ্রায় হলাম। তাঁকে তাঁর ভুল বুঝিয়ে দিলাম, আর আজ রাত্রেই আপনাকে নোট ফিরিয়ে দিতে হবে এই কথা তাঁকে বিশেষ ক'রে বোঝালাম। তিনি বুঝলেন। আমার স্বামী এখনও গাড়ীর ভিতর ব'সে আছেন, লজ্জায় আপনার সম্মুখে আসতে সাহস পাচ্ছেন না। এই নিন্ আপনার নোট। আশা করি আফিসের আর কেউ এই ব্যাপার জান্‌তে পারে নি। আমি চললাম, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার স্বামীর আর কখনও কুমতি না হয় যেন এই ঘটনায় তাঁর জীবনব্যাপী শিক্ষা হয়।"

এই বলিয়া রমণী নোটের পুটুলী নরেন্দ্রের পদপ্রান্তে রাখিল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া আবার নরেন্দ্রকে প্রণাম করিয়া, দরজা খুলিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

ব্যাপারটা নরেন্দ্রের নিকট একটা স্বপ্নের মত মনে হইল। সে প্রথমে ভাবিল, বিপদে পড়িয়া তাহার তো মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে নাই! কিন্তু যখন নোটের পুটলীটী খুলিয়া দেখিল যে সে যেমন ভাবে নোটগুলিকে গাঁথিয়া রাখিয়া পোষ্টমাষ্টারের নিকট গিয়াছিল, নোটগুলি ঠিক সেই ভাবেই সূতায় বাঁধা রহিয়াছে, তখন আর তাহার চক্ষুকে অবিশ্বাস করিবার কারণ রহিল না। সে দরজা বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে নিজ

শয্যাগৃহে পুনরায় প্রবেশ করিল। এবং ভগবানের অসীম দয়ার কথা চিন্তা করিতে করিতে বিনিদ্রভাবে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিল। অতি প্রত্যুষে খাজাঞ্চি বাবুর বাসায় গিয়া তাঁহাকে নোটগুলি দিয়া আসিল। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বীণাকে বলিল, আজ সকালেই তাহার ক্ষুধা বোধ হইতেছে, বীণা যেন চায়ের সঙ্গে তাহার জন্য কিছু লুচি ও হালুয়া প্রস্তুত করে। সরলা বীণা সহাস্যে লুচি ও হালুয়া প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইল।

সেই দিন বেলা ১০টার সময় নরেন্দ্র অফিসে রওনা হইবে, এমন সময় তাহার দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল; এবং এক ব্যক্তি গাড়ী হইতে নামিয়া নরেন্দ্রকে একটী তোরঙ্গ এবং দুইটী চাবি দিয়া বলিল, "আপনার দাদা পাঠিয়েছেন।" এই বলিয়া, সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়া উঠিল, এবং গাড়োয়ানকে তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইয়া যাইতে হুকুম দিল। গাড়ী দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। নরেন্দ্রের বিস্ময় কাটিয়া যাইবার পূর্ব্বেই গাড়ী অদৃশ্য হইল। নরেন্দ্র লোকটীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ পাইল না। সে প্রথমতঃ তোরঙ্গ খুলিল, এবং তার পরে শীল ভাঙ্গিয়া ক্যাসবাক্স খুলিল। দেখিল, তাহার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার দশ টাকার নোট সাজান রহিয়াছে। ক্যাস বাক্স ও তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া উহা নিজ শয়ন ঘরে রাখিয়া সে অফিসে চলিয়া গেল।

অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া নরেন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিল, টাকা রাখিবে কি দাদাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিবে। দরিদ্রতার জ্বালায়, বিশেষতঃ দুইটী কন্যার বিবাহ দিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহার হৃদয় তিক্ত হইয়া গিয়াছিল, সে জানিত, চাকরী করিলে এই দরিদ্রতার জ্বালা কখনও অবসান হইবে না। আম ও লিচুর ব্যবসা করিলে হয়ত দিন ফিরিলেও ফিরিতে পারে। ব্যবসার জন্য মূলধনের দরকার, ভগবান অমঙ্গলের মধ্য দিয়া মঙ্গলের বিধান করিয়াছেন। বিপদের মধ্য দিয়া এই পাঁচ হাজার টাকা মূলধন পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহার দারুণ লোভ হইল। সে কিছুতেই এই সুযোগ ত্যাগ করিবে না। দাদা তো তাহাকে এই টাকা দান করিয়াছেন। সে ইহার দ্বারা ব্যবসা আরম্ভ করিবে। এই ব্যবসায়ে লাভ হইলে দাদাকে সুদ শুদ্ধ হিসাব করিয়া টাকা ফিরাইয়া দিবে।

একমাসের মধ্যে নরেন্দ্র ও তাহার সহকারী অবিনাশ পোষ্ট আফিসের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিল।

ইতিমধ্যে একদিন অবিনাশ নিজের বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া নরেন্দ্রের পদপ্রান্ত রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিল, এবং শপথ করিয়াছিল, চিরজীবন নরেন্দ্রের দাসানুদাস হইয়া থাকিবে এবং নরেন্দ্রের কার্য্যে প্রাণপাত করিবে, কখনও বিন্দুমাত্র সত্য ও ন্যায়মার্গ হইতে বিচলিত হইবে না। নরেন্দ্র সরল হইলেও লোকচরিত্র বুঝিত, সেও অবিনাশকে বিশ্বাস করিল। এবং স্বীয় ব্যবসায়ে তাহাকে প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিল।

তিন বৎসর নরেন্দ্রের কারবার বেশ জোরে চলিল। তখন জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময়। ভারতীয় সৈন্যগণের জন্য প্রচুর পরিমাণে কৌটা ভরা আম ও লিচু সরকার ক্রয় করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গত তিন বৎসরে নরেন্দ্রের ত্রিশ হাজার টাকার উপর লাভ হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে ফল সংরক্ষণের যন্ত্রাদি আনিতে হইয়াছিল। রাত্রি দিন দুই শত লোকের উপর কায করিয়াও কুলাইতে পারিত না।

৮পূজার সময় কলিকাতা সহর সরগরম। থিয়েটার, বায়স্কোপ, নাচগান, ভোজ সর্ব্বত্র চলিতেছে। হেমেন্দ্রবাবু বড় ছেলে মেয়েদিগকে নিয়া ৫টার সময় মোটরে বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। সুষমা ও ছোট ছেলে মেয়ে দুটী বাসায় রহিয়াছে।

প্রচুর ভোজের আয়োজন। সুষমা তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছে, এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সুষম কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, "ও মা, ঠাকুরপো যে! এতদিনে বুঝি অস্মরণ রাজার স্মরণ হ'ল, দাদা বউদির কথা মনে পড়ল? পোষ্ট আফিসেও পূজোর ছুটি হয় নাকি?"

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না বউদি, আমি আর এখন

পোষ্ট আফিসে চাকরি করিনে, ব্যবসা করি। এখন আমি স্বাধীন। তাই পূজোর সময় বেড়াতে এসেছি।"—বলিয়া হ্যামিল্‌টনের বাড়ী হইতে কেনা, হাজার টাকা মূল্যের একটি হীরার আংটি বউদিদির চরণপ্রান্তে রাখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিল।

আংটি তুলিয়া লইয়া, হীরকের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া বউদিদি খুব খুসী হইলেন। বলিলেন, "এ সব আবার কেন? ব্যবসা ক'রে তুমি বুঝি বড়লোক হয়েছ ঠাকুরপো?"—বউকে আনে নাই বলিয়া তিনি ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হেমেন্দ্র বাবু ছেলেমেয়েদের লইয়া বাসায় ফিরিলেন। ছেলে মেয়েরা কাকাকে দেখিয়া এবং তাঁহার আনীত নানাবিধ উপহার দ্রব্য পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। সুষমা ঠাকুরকে বলিল, "ঠাকুর, আজ আস্ত মটনের কাবাব এবং আলু বোখারার টক্ তৈরী কর। ছেলেবেলা ঠাকুরপো খেয়ে বড় ভালবাসতেন।"

কোন রকমে ছেলে মেয়েদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া নরেন্দ্র দাদার সহিত বৈঠকখানা ঘরে সাক্ষাৎ করিল। তখন সেখানে অন্য কেহ ছিল না। নরেন্দ্র দাদাকে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহার সহিত বিজয়ার কোলাকুলি করিয়া নতমস্তকে পকেট হইতে দশ হাজার টাকার একখানি চেক বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "দাদা, তোমাকে না ব'লে তোমার টাকা দিয়ে ব্যবসা সুরু করে দিয়েছিলাম, গত তিন বছরে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার উপর লাভ হয়েছে। তাই তোমাকে তোমার টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছি। টাকাটা সুদে খাটালে এতদিনে প্রায় দ্বিগুণ হত, তাই কিছু বেশী টাকা দিচ্ছি। তোমার স্নেহের ঋণ এ জন্মে শোধ হবার নয়। না বলে তোমার টাকা খাটিয়েছি, আমার অপরাধ হয়েছে। মাপ করো।"

হেমেন্দ্র গম্ভীর ভাবে চেক্‌খানি নাড়িয়া চাড়িয়া এপিঠ ওপিঠ দেখিলেন। পরে চেকখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "বাঁদর, বাঁদরামি করবার আর জায়গা পেলি না, আমার সঙ্গে বাঁদরামি করতে এসেছিস? ছোট বেলা যে কাণ ধরে গালে ঠাস ঠাস করে চড়াতুম, মনে আছে? ফের যদি টাকার কথা বল্‌বি, তবে কাণ ধরে আবার ঠাস ঠাস করে গালে চড় মারব।"

এমন সময় ঝি আসিয়া খবর দিল খাইবার জায়গা হইয়াছে। হেমেন্দ্র সহাস্যে নরেন্দ্রের স্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া সস্নেহকণ্ঠে বলিলেন, "এখন খেতে চল্। দেখি ছোট বেলার মত খেতে পারিস কিনা।"

দুই ভাইয়ে পাশাপাশি হইয়া খাইতে বসিয়া গেল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস।

মাতৃমূর্ত্তি

আজিকে তোমারে আমি পারিনা চিনিতে,
এ কি অপরূপ রূপে আসিলে জিনিতে
হৃদয় আমার, দেবী! আজি তোমা দেখি
হৃদয় লুটায়ে পড়ে সসম্ভ্রমে, এ কি!
চাহিতে পারি না মুখে ওগো রূপবতী
তোমার নয়নে আজ এ কি দিব্য জ্যোতি!
কোথা গেল নয়নের বিলোল চাহনি
হৃদয় পাগল করা? কোথা গেল ধনি
হাসি তব, যে হাসিতে মাতাইতে মোরে,
ফুটিত গোলাপ রাশি অরুণ অধরে?
এতদিন ছদ্মবেশে ছিলে মোর কাছে,
প্রকৃত তোমার রূপ আজিকে বিরাজে!
তোমার অঙ্কের পরে শিশুপুত্র শোভে
স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা মরি লাজে ক্ষোভে॥

শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত।

রাজা রামমোহন রায়ের রাষ্ট্র চিন্তা*

নব্য ভারতের রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাস যখন লিখিত হইবে, তখন তাহা রাজা রামমোহনের পুণ্যনাম স্মরণ করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অ্যারিষ্টটলের মৃত্যুর পর তেইশ শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কত শত চিন্তানায়ক তাঁহাদের ভাবরাজি দ্বারা মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তব ইতিহাসের উপর রাষ্ট্র চিন্তা অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—তথাপি আজ পশ্চিমের মনীষিগণ অ্যারিষ্টটলের ভাবধারার নিকট আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তাকে লইয়া যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব। যখন রাজা রামমোহনের রাষ্ট্র চিন্তা সম্যক্‌ রূপে আলোচিত হইবে, তখনও বোধ হয় তাঁহার আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইবার জন্য আমাদের দেশে আন্দোলন আরম্ভ হইতে পারে। এই ভরসায় আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুসারে রাজার রাষ্ট্র চিন্তার পরিচয় দিতে অগ্রসর হইতেছি।

রাজা রামমোহন বৈদান্তিক রূপে ও তুলনামূলক ধর্ম্মালোচনার প্রতিষ্ঠাতা রূপে সমগ্র জগতে সুপ্রসিদ্ধ। এক দিকে তিনি যেমন খ্রীষ্টান মিশনারি দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অন্য দিকে তেমনি তিনি ভারতের একেশ্বরবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, সমাজ সংস্কার ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচার করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রচেষ্টা আমাদের প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কার এরূপ ভাবে উত্তেজিত করিয়াছিল যে, অদ্যাবধি আমরা তাঁহার কীর্ত্তি স্মরণ করিবার সময় কেবলমাত্র তাঁহাকে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক রূপে দেখিয়া থাকি। তিনি যে রাষ্ট্র নীতি বিষয়ে গভীর গবেষণা করিয়াছিলেন ও ভারতের রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন সে কথা আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হইয়া থাকি। রাজা তাঁহার শিক্ষা ও চরিত্রে প্রকৃত দার্শনিক ছিলেন। ইউরোপের অতীত যুগে যেমন প্লেটো ও অ্যারিষ্টলের ভাবরাশি দ্বারা পাশ্চাত্য রাষ্ট্র চিন্তা গঠিত হইয়াছিল, তেমনি মধ্য যুগেও Aquinas ও Marsight'র দ্বারা এবং নব্য যুগে Hobbes, Locke, Kant, Hegel, Fichte, Bentham, Green প্রভৃতি দার্শনিকের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। মধ্য যুগে ভারতবর্ষে দার্শনিকের অভাব হয় নাই কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর শঙ্করাচার্য্য হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত কেহই রাষ্ট্র চিন্তার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করেন নাই। ইহা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিকই, কেননা সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা (civil liberty) নাই, সেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার লইয়া চিন্তা করিয়া লাভ কি? যেখানে জনসাধারণের মতের (public opinion) অস্তিত্ব ছিল না এবং রাজাই দেশের সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলেন, সেখানে রাষ্ট্র চিন্তা করিয়া কিছু লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না। মধ্য যুগে ইউরোপে যে রূপ অবস্থা ছিল, মুসলমানগণের রাজত্ব কালে ভারতেরও অনেকটা সেইরূপ অবস্থা ছিল। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে ভারতবাসীদিগকে কিছু কিছু করিয়া ব্যক্তিগত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা (civil liberty) দেওয়া হইল। খ্রীষ্টান পাদরীগণ কেবল মাত্র যে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা এ দেশের অধিবাসীদিগকে কিছু কিছু করিয়া রাষ্ট্র চিন্তা করিবার জন্যও শিক্ষা দিতে লাগিলেন।(১) ভারতে বৃটিশ শাসন আরম্ভ হইবার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে রাজা রামমোহনের রাষ্ট্রীয় চিন্তা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় ভাবধারাকে আয়ত্ত করিয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তি-আন্দোলন আরম্ভ করা সম্ভবপর ছিল না। যখনই ঐরূপ সম্ভাবনার আবির্ভাব হইল তখনই রামমোহন সেই সম্ভাবনাকে কর্ম্ম-জগতে রূপ দিতে প্রয়াসী হইলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে যে সব অনাচার,

---

* রাজার রাষ্ট্রচিন্তামূলক রচনার বাঙ্গলা অনুবাদ ১৩১২ সালে কুন্তলীন প্রেস হইতে প্রকাশিত "রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী"তে দেখিতে পাইলাম না। তজ্জন্য এলাহাবাদ পাণিনি আফিস হইতে ১৯০৬ সালে প্রকাশিত "English works of Raja Rammohan Roy,' নামক গ্রন্থের পত্রাঙ্ক উদ্ধৃত স্থানের প্রমাণ রূপে বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইল। অনুবাদ আমার নিজের।

(১) ১৮২২ সালের "Friend of Indi' Vol VII দ্রষ্টব্য।

অমানুষিক কার্য্যাবলী ও কুসংস্কার ছিল রাজা তাহার বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার এক খানি চিঠি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই সকল সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কারের পশ্চাতে রাজার একটী মহৎ উদ্দেশ্য ছিল—তাহা হইতেছে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মুক্তি কামনা। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা লিখিতেছেন, "বলিতে দুঃখ হয় যে আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হিন্দুদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিভেদ, নানা বিভাগ ও উপবিভাগ বর্ত্তমান থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সদ্ভাবের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মের নানা বিভাগ, লোকাচার ও উৎসব ভারতবাসী দিগকে একের সহিত অন্যকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। এই সকল কারণে আমার মনে হয় অন্ততঃ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুবিধার জন্যও হিন্দু ধর্ম্মের কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক।" ২

তাঁহার চিন্তা-প্রণালী

সাধারণতঃ রাষ্ট্র চিন্তা করিবার দুইটী প্রণালী অনুসৃত হইয়া থাকে। একটী প্রণালী হইতেছে এই যে, রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানের মূলে যে সমস্ত ধারণা বর্ত্তমান তাহাকে দার্শনিক ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা। প্লেটো এই প্রণালীতে বিচার করিয়া গিয়াছেন। মধ্য যুগে ইউরোপের চিন্তা-নায়কগণ কয়েকটী ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার করিয়া অন্যান্য ভাবকে অবরোহ প্রণালীতে Deductive method) প্রমাণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বেও রুসোর রচনায় এই প্রণালীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অন্য প্রণালী আরোহ (Inductive) বা ঐতিহাসিক প্রণালী নামে অভিহিত হইয়া থাকে

Aristotle, Machiavelli, Bodin ও Montesquieuএর ন্যায় রাজা রামমোহনও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্বরূপের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের পরিচালন প্রণালীর দিকেই বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের রাষ্ট্র চিন্তা তাঁহার কোন একখানি বিশেষ পুস্তকের মধ্যে নিবদ্ধ নাই। বার্কের গ্রন্থাবলী হইতে যেমন তাঁহার রাষ্ট্র দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ রাজা রামমোহন রায়েরও সমগ্র গ্রন্থের পর্য্যালোচনার দ্বারা আমরা তাঁহার রাষ্ট্র চিন্তার স্বরূপ বুঝিতে পারি। বার্ক দর্শনে আপাতঃ প্রতীয়মান বিভিন্ন বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করিবার জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয়। রাজার রাষ্ট্র দর্শন সুসংবদ্ধ ও সামঞ্জস্য-পরিপূর্ণ। রাজার নিম্নলিখিত রচনাগুলি হইতে তাঁহার রাষ্ট্র চিন্তার ধারা বুঝিতে পারা যায়।

(১) Petitions against the Press Regulation and to the Supreme Court and (২) To the King in Council, (৩) Remarks on settlement in India by Europeans, (৪) Essay on the rights of Hindus over ancestral property according to the law of Bengal, (৫) Questions and answers on the Judicial system of India (৬) Final appeal to the Christian public, (৭) His speeches and letters এবং (৮) His petition on behalf of the Badshah to King George IV.

রাজার এই সকল রচনাবলী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি কোন দিন আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখেন নাই। তিনি তাঁহার দেশবাসীর ক্ষমতা যে কতদূর তাহা জানিতেন। বৃটিশ অধিকারে ভারত যে কতখানি উন্নত হইয়াছে তাহা বুঝিতেন। কিন্তু ভারত যাহাতে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করে তাহার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিলে ভারতবাসীরা যে তাহার ব্যবহারে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে এ কথা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। "দেশের মধ্যে গ্রামবাসী ও কৃষকগণ অতীতের অথবা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ ও উদাসীন। তাহারা সুশাসন বা অত্যাচার যাহাই লাভ করুক না কেন, তাহা তাহাদের অব্যবহিত রাজ কর্ম্মচারীর উপর আরোপ করিয়া থাকে। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ ও যে সব ব্যক্তি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধর অথচ অধুনা দুর্দ্দশাপন্ন, তাঁহারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে যে সব ক্ষুদ্র পত্র পদ দেশীয়গণ পাইবার অধিকারী তাহা গ্রহণ করা অপমানজনক বিবেচনা করেন ও বৃটিশ সরকারের প্রতি রীতিমত বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন। যাহা হউক যাঁহারা বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং যাঁহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা তাঁহাদের জমি-

(২) English Works, pages 929—30, published by the Panini Office, Allahabad, 19·6,

দাবীর স্থায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দ্বারা ভবিষ্যতে যে দেশের আরও উন্নতি হইবে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু উহাকে দেশের পক্ষে বিধাতার দান বলিয়া মনে করেন। দেশের বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী জননায়কদিগের পক্ষ হইতে বলিতে হইলে আমাকে বলিতে হইবে—যে গভর্ণমেণ্ট ভারতের প্রতি সম্মান বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিবে এবং যে গভর্ণমেণ্ট ভারত বাসিগণের যোগ্যতা অনুসারে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করাইয়া দিবে ও শ্রদ্ধা ও সম্মানজনক পদ প্রদান করিবে, তাহারই প্রতি তাঁহারা আস্থা স্থাপন করিবেন।"

রাজার এই সুদীর্ঘ উক্তি উদ্ধার করিয়া আমি যে শুধু তাঁহার রাষ্ট্র চিন্তার ধারার দিকটাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি তাহা নহে, পরন্তু উল্লিখিত উক্তি যে সাধারণ ভাবে আধুনিক অবস্থার প্রতি প্রযোজ্য তাহারও ইঙ্গিত করিতেছি।

আমরা এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিতেছি, কিন্তু এখনও আমাদের জনসাধারণ একশত বৎসর পূর্ব্বের ন্যায় অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত। তাহারা শিক্ষা দীক্ষা হীন, সর্ব্বাধিকার বঞ্চিত ও সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত এবং আজও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুরাগী। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসীকে জজ অথবা কলেক্টার করিলেই তাঁহারা মনে করিতেন যে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এখন আর আমাদের মনোবৃত্তি ঐরূপ নাই। আমরা এখন উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী করিতেছি। কিন্তু আমার মনে হয় রাজার Gradual promotion according to their respective ability and merits এই উক্তি ১৯১৯ সালের Government Act-এর সুপ্রসিদ্ধ preambleকে স্মরণ করাইয়া দেয় ও ভারতের ভবিষ্যৎ দাবীর সূচনা করে।

"স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার" অথবা "স্বাভাবিক অধিকার" রাজা এরূপ কোন মতের পোষণ করিতেন না। রাজা এইরূপ কোন মতের পোষণ করিয়া আবেদন নিবেদন করেন নাই ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, কেন না তিনি দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের সাফল্য কামনা করিতেন ও তিনি নিশ্চয়ই ফ্রান্সের ও অ মেরিকার Declaration of Rights এর সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন। কিন্তু রাজার সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল যে, রাষ্ট্র হইতেই অধিকার উদ্ভূত ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এই জন্যই ফরাসী বিপ্লব ও নব্য গণতন্ত্রবাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়াও তিনি কর্ত্তব্য ও অধিকার নির্ণয়ে ভ্রান্তপথে চালিত হয়েন নাই।

রামমোহনের রাষ্ট্রীয়দর্শনের মূল বিষয়গুলি আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার।

মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সমাজে নারীর স্থান

ইতিহাসের আরম্ভ বা শেষ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। যখন হইতে মানবজাতি এ পৃথিবীতে আসিয়াছে, তখন হইতেই তাহার ইতিহাস আরম্ভ; অতি প্রাচীন যুগে যখন মানুষ বর্ব্বর বলিয়া খ্যাত, তখন হইতেই তাহার যথার্থ ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে, যদিও সে ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং ইতিহাসের স্রোত কোন্ যুগ হইতে প্রবাহিত হইতেছে তাহা বলা শক্ত; ইতিহাসের শেষও কেহ বলিতে পারে না, কারণ মানবজাতি কবে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে তাহা কেহই জানে না। সেই জন্য প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাক্টন 'ইতিহাস-আলোচনা" নামক প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—'Modern history is a subject to which neither beginning nor end can be assigned" (Lecture on Moden History by Acton—Inaugural Lecture on the Study

of History p. I). লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকের এই প্রসিদ্ধ উক্তি সমস্ত ইতিহাস-শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ইতিহাসের ধারা নদীর স্রোতের ন্যায়; নদীর স্রোতের ন্যায় ইতিহাসের ধারা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

ইতিহাসের একটী বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে Unity of History বা ইতিহাসের সমন্বয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইতিহাসকে আমরা তিনটী কাল্পনিক যুগে বিভক্ত করিতে পারি যথা প্রাচীন, মধ্য ও বর্ত্তমান। প্রাচীন যুগে ঈজিপ্ট, বাবিলন, অসুর, পারস্য, গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ ও চীন সভ্যতার কিরণ-জাল জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিল; ঐতিহাসিকগণের মতে প্রাচীন যুগ যথার্থ উজ্জ্বল। মধ্যযুগে ফরাসী ও তুরস্কের সভ্যতা জগৎকে এক বিশিষ্ট অলঙ্কার দান করিয়াছে; বর্ত্তমান যুগ সভ্যতার আলোকে পরিপূর্ণ। মধ্যযুগকে অনেক ঐতিহাসিক অন্ধকারময় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু, বিশেষরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, য়ুরোপে যে মধ্যযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা কখনই অবহেলার জিনিষ নহে। যখন গ্রীসের জ্ঞানের প্রদীপ নিবিয়া গেছে, যখন রোমের পরাক্রম অতীতের একটী সুখময় ইতিহাস বলিয়া পরিণত হইয়াছে, সেই সময় সমগ্র য়ুরোপখণ্ড তথাকথিত অসভ্য জাতি অর্থাৎ পরাক্রমশালী জাতিদের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। প্রাচীন যুগের জ্ঞান ও মধ্যযুগের পরাক্রম—এই দুইটীর সংমিশ্রণে যে অপূর্ব্ব সভ্যতার বিকাশ মধ্যযুগে হইয়াছিল তাহা যথার্থ অভূতপূর্ব্ব। মধ্যযুগে আমরা দেখিতে পাই নূতনের সহিত পুরাতনের সংমিশ্রণ; পুরাতনের শিক্ষাদীক্ষার সহিত নূতনের উদ্যম, চেষ্টা ও উদ্দামতার অপূর্ব্ব মিলন। মধ্যযুগের এই বিশেষত্ব হইতেই বর্ত্তমান যুগের প্রকাশ।

ইতিহাসের দুইটা দিক আছে যাহার দ্বারা একটী জাতির প্রকৃত রূপ বুঝিতে পারা যায়—যথা রাজনীতি (politics) ও সমাজনীতি (sociology)। রাজনীতির সাহায্যে জাতি আপনাকে অন্য জাতির সম্মুখে বাহিরে বা বিশ্ব দরবারে প্রকাশ করে এবং সমাজনীতির দ্বারা আপনার ঘরের শৃঙ্খলা রাখে। সমাজের মধ্যে নারী পুরুষের ন্যায় তুল্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। কোনও দেশের বা কোনও যুগের সভ্যতার পরিচয় জানিতে হইলে সমাজে নারীর স্থান কি প্রকার তাহা যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকাবলী পাওয়া যায় ও তাহা হইতে আমরা এই বিষয়টী সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি। ধর্ম্ম ও আভিজাত্য মধ্যযুগের সমাজে সব চেয়ে বড় স্থান অধিকার করিয়া ছিল। নারীকে এই দুইটী বিশেষভাবে সচেষ্ট রাখিয়াছিল। বিশ্বে নারীর স্থান সম্বন্ধে জাক্ দঁ ভিত্রি বলিয়াছেন—"Between Adam and God in Paradise, there was but one woman; yet she had no rest ustil she had succeeded in banishing her husband from the Garden of delights, and in condemning Christ to the torment of the Cross." কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত মধ্যযুগের একটী পুঁথিতে লিখিত আছে—"Woman is to be preferred to man,to wit,in material, because Adam was made from clay and Eve from the side of Adam"...সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে নারী সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন মতবাদ মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল। এই যুগে খৃষ্টান ধর্ম্ম বা চার্চ্চের ইতিহাসে নারীকে নিম্ন স্থান দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু যে সময় হইতে ধর্ম্মের প্রকৃত রূপ সম্যক্‌রূপে লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল, তখন হইতে নারীর সম্মান সম্বন্ধে অনেকে উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন। নারীর প্রকৃত রূপ যে সকলে বুঝিতে পারে নাই তাহার একটী প্রধান কারণ হইতেছে, সাধারণ লোকের ভিতর শিক্ষার অভাব। ধর্ম্মযাজক ও অভিজাত বংশজাত পুরুষ ব্যতীত প্রায় সকলেই অশিক্ষিত ছিল। এই নিমিত্ত নারীকে তাহারা সমাজের নিম্নস্তরে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

পুরুষ নারীকে নিজের আধিপত্যে রাখিবে এটা মধ্যযুগের য়ুরোপীয় সমাজের বিশেষত্ব। বিবাহের আদর্শ ছিল যে নারী পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিবে ও পুরুষ তাহার উপর নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করিবে। বর্ত্তমান জগতে নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে নূতন মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—এই মতবাদটী হইতেছে যে শারীরিক সতীত্ব বা physical

moralityর সহিত নারীর যথার্থ সতীত্ব বা chastityর কোনও আপেক্ষিক (relative) সম্বন্ধ নাই। রুশিয়া এই বাণীর অগ্রদূত; কিন্তু মধ্যযুগের য়ুরোপে ছিল শারীরিক সতীত্ব বা physical moralityর সঙ্গে সতীত্ব বা chastityর কার্য্য-কারণ সূত্রে বাঁধা একটী অচ্ছেদ্য বন্ধন। মধ্যযুগের জনৈক লেখক বলিয়াছেন, "Women can easily preserve their honour if they wish to be held virtuous, by one thing only, ie. if she be a w5rthy woman of her body." সুতরাং দেখিতেছি যে physical morality মধ্যযুগের নারীর প্রধান বিশেষত্ব। ধর্ম্ম ও আভিজাত্য পুরুষের নিকট নারীর অধীনতা অনুমোদন করিয়াছিল, কিন্তু আবার তাহারাই Virgin cult ও chivalryর প্রধান অনুমোদনকারী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেরূপ একটী তথা-কথিত অন্ধকারময় যুগ হইতে Romanticismএর প্রারম্ভ, সেইরূপ তথাকথিত অন্ধকারময় যুগ হইতে virgin cult ও chivalryর উৎপত্তি। মধ্যযুগে ধর্ম্মের প্রধান স্থান হইতেছে এই virgin cult। Virgin বা খৃষ্ট-জননী একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ড দ্বারা পূজিত হইতেন। তাঁহার মহিমাতে য়ুরোপ মুগ্ধ হইয়াছিল। Chivalryর উৎপত্তিও ধর্ম্ম হইতে। ইহার ভিতরে আমরা ভগবানের আরাধনা ও নারীর সম্মানের উপলব্ধি দেখিতে পাই। বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক গিবন্ লিখিয়াছেন—"The knight was the champion of God the ladies—I blush to unite such discordant terms." ইহা একেবারে স্বতঃসিদ্ধ যে, যে মতবাদ নারীর সম্মানকে ভগবৎ-আরাধনার পরেই স্থান দিয়াছে এবং নারীকে পুরুষজাতির উদ্যম, চেষ্টা ও একাগ্রতার উৎস বলিয়া প্রচার করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই নারী-অধীনতারূপ মতবাদটীকে বিশেষরূপে খর্ব্ব করিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও নারীসম্বন্ধে এই উচ্চ আদর্শ কতিপয় ব্যক্তির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। যেমন ধর্ম্ম-আরাধনাতে কেবল ধর্ম্মযাজকদের অধিকার ছিল, সেইরূপ এই আদর্শটি আভিজাত্যের ভিতর গণ্ডীবদ্ধ ছিল। এবং অভিজাত মানব মণ্ডলীর বহিঃস্থিত যে বৃহৎ মানবসমাজ ছিল, তাহাতে ইহা কোন ছাপ মারিতে পারে নাই। এটা খুব সম্ভব যে এই আদর্শটী মধ্যযুগের প্রারম্ভের চেয়ে পরবর্ত্তিকালে বেশী আদৃত হইয়াছিল। ইহা বর্ত্তমান জগৎকে মধ্যযুগের একটী বিশেষ দান। মধ্যযুগে যতগুলি মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ইহা প্রধান ও মৌলিক এবং বর্ত্তমান সামাজিক জীবন গঠন করিবার জন্য ইহা অনেক সাহায্য করিয়াছে।

ধর্ম্ম ও আভিজাত্যের মধ্যে যে নারী বর্দ্ধিত, তাহার জীবন কি প্রকার ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারী আপনার সত্তা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল ও সমর্থও হইয়াছিল; কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর নারী আপনার মূল্য মোটেই বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং মোটামুটী উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে, সমাজে নারীর স্থান নিতান্ত হেয় ছিল না। সমাজে নারীর স্থান কি প্রকার তাহা বুঝিতে হইলে নারীর প্রাত্যহিক জীবন-লিপি দ্রষ্টব্য। অন্তঃপুরে নারী কোনও উচ্চ বা নিম্ন স্থান অধিকার করে নাই—একটী সাদাসিধে জীবন তাহার লক্ষ্য ছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে মধ্যযুগে তিন শ্রেণীর নারী ছিল যথা অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণী। মধ্যযুগে নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ পত্নীত্ব হইলেও ইহা একেবারেই ঠিক নহে যে সকল নারীই এই আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। মধ্যযুগে সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ ও পারিবারিক কলহ হেতু অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার দরুণ ও ধর্ম্মযাজকগণ অবিবাহিত জীবন ধারণ করায়, নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশী ছিল। এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা 'স্বাধীন নারী' বলিয়া একশ্রেণী নারীর উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে বিধবা ছিল, কিন্তু অধিকাংশ ছিল কুমারী—ইহারা নিজেদের জমি পরিচালনা করিত ও অনেক সময় পিতার জমিও রক্ষণাবেক্ষণ করিত। নগরে তাহারা ব্যবসা বাণিজ্যও করিত। স্ত্রীলোকের কার্য্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য ছিল চরকাতে সূতা কাটা। প্রত্যেক নারী কি ধনী, কি নির্ধন—সূতা কাটাকে আপনার নারীত্বের চরম নিদর্শন বলিয়া জানিত।

যে সব নারী অবিবাহিত জীবন যাপন করিত তাহারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত ছিল। অভিজাত বংশজাতা নারীর পক্ষে অবিবাহিত জীবন যাপন করা কষ্টকর ছিল, কারণ ফিউডাল্ সমাজে অবিবাহিতা নারীর জন্য

কোনও স্থান নির্দ্দেশ করা ছিল না। চার্চ্চ এই সব কুমারীকে রক্ষা করিবার জন্য খৃষ্টপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জীবন বিবাহিত জীবনের চেয়ে বেশী সম্মানজনক ছিল। ভারতবর্ষের দেবদাসী প্রথার সহিত এই প্রথার অনেকাংশে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক অবিবাহিতা নারী সন্ন্যাসব্রত ধারণ করিত। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর নারী এই ব্রতের অধিকারিণী ছিল না। যাহারা সন্ন্যাস ব্রত ধারণ না করিত, তাহারা কি প্রকারে যাপন করিত? তাহারা বিবাহ করিত, কিন্তু পাত্র ঠিক করিয়া দিতেন পিতা। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কিংবা তৎপূর্ব্বেই সাধারণতঃ বিবাহ হইত। কন্যার পিতাকে যথেষ্ট পরিমাণে যৌতুক দিতে হইত, কারণ যৌতুক না দিলে শ্বশুরালয়ে কন্যাকে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত। বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপের বিবাহ-প্রথা বর্ত্তমানের নিজস্ব দান। বর্ত্তমানে য়ুরোপে কন্যা তাহার পাত্র মনোনীত করিয়া লইয়া থাকে কিন্তু মধ্যযুগের প্রথা ছিল একেবারে উল্টা। এই প্রথার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হইত না তাহা নহে, কিন্তু তাহা সফল হইত না; কিন্তু ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে বিবাহিত জীবন সফল হইত না, কারণ এটা খুব স্বাভাবিক যে পিতা তাহার কন্যাকে সাধ্যানুসারে সৎপাত্রে দান করিতেন। বিবাহিত জীবন সাধারণতঃ সুখময় হইত, কারণ বিবাহিত জীবন অল্পবয়সে আরম্ভ হইত। অল্পবয়সে বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন—"Human nature is extremely adaptable, and they came up to each other with no strong marked ideas or prejudices and grew up together." এই উক্তি যথার্থ সত্য। মধ্যযুগে এই বিষয় লইয়া একটী উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

বিবাহিত জীবনে যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। সমস্ত মধ্যযুগ ধরিয়া সামাজিক ও স্থানীয় চালচলন, যুদ্ধবিগ্রহ এবং সর্ব্বোপরি সংবাদপ্রেরণে অসুবিধা হেতু অনুপস্থিত পতির প্রতিনিধিস্বরূপে পত্নীকে অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে নারীর কর্ম্মস্থল হইতেছে অন্তঃপুরে, কিন্তু মধ্যযুগে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম পরিলক্ষিত হইত না, পরন্তু নারীর কর্ম্মক্ষেত্র বিশেষভাবে বিস্তৃত ছিল। যখন কোনও পুরুষ যুদ্ধে তীর্থে, রাজদ্বারে কিংবা অন্য কোনও স্থানে যাইতেন, তখন পত্নীর উপর সমস্ত জিনিষের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িত। বিবাহিত জীবনে ইহা অপেক্ষা সম্মানজনক কার্য্য আর ছিল না। যখন য়ুরোপের অভিজাত বংশধরগণ খৃষ্টধর্ম্ম মুসলমানের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে এসিয়া ভূখণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, তখন য়ুরোপে নারী পুরুষের কার্য্যাবলী সম্পাদন করিয়াছিলেন। নারী কি প্রকারে অর্থব্যয় করিবে তৎসম্বন্ধে ক্রিষ্টিন নাম্নী একটী মহিলা মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে নারী পঞ্চ প্রকারে অর্থব্যয় করিবে যথা (১) দান, (২) গৃহস্থালী, (৩) দাসদাসীদের বেতন, (৪) অন্যান্য মঙ্গলকর কার্য্য ও (৫) নিজেদের সাজসজ্জা, অলঙ্কার ইত্যাদি। এই নিয়মাবলী যে শুধু কাগজে কলমে লেখা হইয়াছিল তাহা নহে, ইহা কার্য্যেও পরিণত করা হইত। মাতা তাঁহার সন্তানকে নিজে লালনপালন করিতেন। গ্রাম্যনারীর ন্যায় অভিজাত বংশজাতা নারীকেও গৃহের শৃঙ্খলা রাখিতে হইত। গৃহের কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে নারী সেবা শুশ্রূষা করিতেন। মধ্যযুগের জীবন বর্ত্তমান জীবনের ন্যায় এতটা চাকুরে হইয়া উঠে নাই, সেই জন্য প্রত্যেক নারীকে চিকিৎসাবিদ্যার নিয়মাবলী মোটামুটী জানিয়া রাখিতে হইত, কারণ সে সময়ে চিকিৎসক বেশী পাওয়া যাইত না। ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই যে পত্নী স্বামীর চিকিৎসা করিতেছেন। সাধারণতঃ নারীগণের কোনও চিকিৎসাবিদ্যার উপাধি না থাকিলেও তাঁহারা সমাজে যথেষ্ট সম্মান অর্জ্জন করিতেন এবং অনেক নারী চিকিৎসক রূপে যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে নারীকে কেবল অন্তঃপুরে কার্য্য করিতে হইত তাহা নহে; অনেক সময়ে স্বামীর অনুপস্থিতিতে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতে হইত। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য লইয়া লিখিত মধ্যযুগের একটী পুস্তক তিনটী অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে নৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয় এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্তঃপুরে নারীর কর্ত্তব্য ও তৃতীয় অধ্যায়ে নারীর আমোদপ্রমোদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গৃহের কার্য্যের জন্য কোনও স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিতে হইলে প্রথমতঃ অনুসন্ধান করা হইত যে সে পূর্ব্বে কোথায় ছিল

এবং সচ্চরিত্রা কিনা। কোনও স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করিতে হইলে গৃহিণী তাহার পিতার ও মাতার নাম ও বাসস্থান লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। যদি কোনও ভৃত্য পীড়িত হইত তাহা হইলে গৃহিণী তাহাকে মাতার ন্যায় সেবা শুশ্রূষা করিতেন। মধ্যযুগে সমাজের যত নিম্নস্তরে গমন করি, ততই দেখিতে পাই যে নারীর কার্য্য বাড়িয়া যাইতেছে। কৃষক রমণীর জীবন সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যময় ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া নারী যে আমোদ প্রমোদ করিত না তাহা নহে। মধ্যযুগের সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তৎকালের রমণীগণ নৃত্যে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। সর্ব্বপ্রকার ক্রীড়াতে নারী একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মধ্যযুগে য়ুরোপীয় সমাজে নারী একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া ছিল। সমাজে নারীর স্থান দ্বারা যদি মধ্যযুগীয় সভ্যতাকে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে মধ্যযুগ কখনও অবনতির দিকে অগ্রসর হয় নাই। নারীর কর্ম্মক্ষেত্র রীতিমত বিস্তৃত ছিল। যে যুগ জান্ দার্কের ন্যায় মহীয়সী নারীর জন্মদান করিতে পারে, সে যুগ কখনই অবহেলার জিনিষ নহে। মধ্যযুগ বর্ত্তমানকে যে সমস্ত সম্পদ দান করিয়াছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে নারীর প্রতি পুরুষের সম্মানের আদর্শ, ইহা সমস্ত মধ্যযুগকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত।

শ্রীগৌর গুরু

বন্ধু, তুমি গো বন্ধুর পথে
বন্ধুর রূপে আছ,
চির-বন্ধুর রূপটী ধরিয়া
আমারেই চাহিয়াছ।

তুমি গুরু মোর, তুমি সব বন্ধু,
তোমারে কহিব কিবা—
তুমি যে আমার সব সম্বল
সকল রজনী দিবা!

দুঃখ দহন যা কিছু সয়েছি
অবিদিত তব নাই,
যত কিছু মোর বন্ধন ডোর,
পুড়িয়া হইল ছাই!

হোক ছাই, বঁধু, কোন দুখ নাই
ছাই সে তো সুধু ছাই—
ছাইয়ের বদলে কাঞ্চন তনু
বাঞ্ছিতে যদি পাই!

অন্তরে মোর যে তব মন্ত্র
সুপ্ত ছিল গো লাজে,
জাগ্রত কর, আহ্বান কর
আমার সর্ব্ব কাযে।

জীবনের পথে, ওগো গুরু মোর,
জীবন-স্বরূপ তুমি –
জীবন অন্তে নব বসন্তে
মলয়ের সম চুমি।

তোমার নিশান অসীমের রূপে
লয়ে যায় যেন মোরে,
সকলের গুরু বাঁধা আছে যেথা
আপনার প্রেমডোরে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

খোয়াজা কুতুবউদ্দীন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার কাকী উশী

ইরাণের অন্দজানের নিকট উশ-নগর-বাসী ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্-প্রবর খোয়াজা কমাল উদ্দীন যখন হিজরা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের শেষে দেহরক্ষা করিলেন, তখন তাঁহার সাধ্বী তপস্বিনী বিধবা দেড় বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র কুতুবউদ্দীনকে লইয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেজন্য শিশুর শিক্ষা দীক্ষার অভাব হয় নাই। সেকালে এশিয়ার কোনও দেশে বালককে শিক্ষা দিতে স্কুলের ফী দিতে হইত না, বিদ্বান্ শিক্ষকেরা রাজ সরকার ও নাগরিকদের কাছে নিজের ও ছাত্রদের ব্যয়ের জন্য যথেষ্ট বৃত্তি পাইতেন; তাঁহারা ছাত্রদের অন্ন বস্ত্র দিয়া পালন করিতেন ও নানাপ্রকার শিক্ষা দিতেন। এক এক বিষয়ে এক এক গুরুর কাছে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ছাত্রেরা অন্য গুরুর কাছে অন্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিত। কোন কোনও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ অধ্যাপক সকল বিষয়েই শিক্ষা দিতেন। যখন বালকের বিদ্যার্জ্জনের বয়স হইল, তখন বিধবা আপনার এক প্রতিবেশীকে অনুরোধ করিলেন যে নগরে গিয়া বালককে কোনও বিদ্বান্ ধার্ম্মিক তপস্বী অধ্যাপকের কাছে দিয়া আইস। সে ব্যক্তি বালককে লইয়া যখন রাজ-ধানী ইস্পহান অভিমুখে যাইতেছিল, তখন পথে এক বৃদ্ধের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ তাহাকে বালক সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ও সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমাকে এই বালকটি দাও, আমি এক ধর্ম্মজ্ঞ সাধু ও বিদ্বান্ শিক্ষকের কাছে ইহার পাঠের উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিব।" সে ব্যক্তি বৃদ্ধের হাতে বালককে দিলে ঐ বৃদ্ধ সে সময়কার ইস্পহানবাসী প্রসিদ্ধ সাধু বিদ্বান্ তপস্বী শেখ অবাহিফজের কাছে লইয়া গেলেন ও বালককে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শেখ স্বীকার করিলে বৃদ্ধ হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। শেখ তখন বালককে বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ সম্বন্ধে বালক কিছুই জানিত না, যাহা জানিত তাহা বলিল। শেখ বুঝিতে পারিলেন যে এই বৃদ্ধ আর কেহ নহে, স্বয়ং নবীশ্রেষ্ঠ খিজির, (১) বিশেষ কারণ না থাকিলে তিনি বালককে সঙ্গে আনেন নাই সম্ভবতঃ এই বালক ভবিষ্যতে একজন উচ্চশ্রেণীর বিদ্বান, সাধক বা অওলিয়া (২) হইবে। যাহা হউক, এইরূপ ধারণা লইয়া শেখ বালককে অতি যত্নে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রতিভাবান্ বালক কোরাণ ও নানা শাস্ত্রের গুপ্ত অর্থ ও রহস্য শিক্ষা করিল এবং সকল বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইল।

যখন এই বালকের বয়স প্রায় ২০ বৎসর, তখন একদিন হটাৎ খোয়াজা মুঈন উদ্দীন চিশ্‌তি পরিব্রাজক রূপে সেখানে আসিলেন। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে সেই সময়ে গাঢ় প্রীতি স্থাপিত হইল। কুতুবউদ্দীন এই সময়ে মুঈন-উদ্দীনের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া চিশ্‌তিয়া সম্প্রদায়ের তপস্বী শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে কুতুবউদ্দীন প্রত্যহ ২৫০ রুকৎ নমাজ উপাসনা করিতেন ও প্রতি রাত্রে তিন সহস্র বার হজরৎ রসুলঅল্লার নামে "দরূদ" (৩) পাঠ বা জপ করিতেন। পুত্রের ভাব দেখিয়া মাতার মনে সন্দেহ হইল যে পুত্র যে কোনও সময়ে সংসারকে অপবিত্র বিষ্ঠার মত পরি-ত্যাগ করিয়া মক্কা যাত্রা করিতে পারে, অতএব তাহাকে সংসারে আকৃষ্ট করিবার জন্য এক সুন্দরী যুবতীর সহিত বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর তিন রাত্রি আর রসুলের জপ হয় নাই! তৃতীয় রাত্রে তাঁহার এক ধনবান জমীদার প্রতিবেশী অহমদ রঈস স্বপ্নে দেখিলেন যে তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে এক অতি উৎকৃষ্ট অট্টালিকার দ্বারের কাছে পহুঁছিয়াছেন। দ্বারের কাছে অনেক লোক একত্র

১। খোয়াজা খিজির, বাইবেলের ইলিয়াস, Prophet Ellias। মুসলমানেরা বলেন, তিনি অমর, স্বর্গে বাস করেন, কোনও ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হইলে অথবা তাহার কোন প্রকার সাহায্য প্রয়োজন হইলে দয়া করিয়া কোনও রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিয়া সাহায্য করেন, আবার অদৃশ্য হইয়া যান।

২। অওলিয়া—সাধকগণের মধ্যে এমন উচ্চ শ্রেণীর, যাঁহার কার্য্যে প্রায়ই অতিপ্রাকৃতিক (supernatural) ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। দরূদ শব্দের অর্থ উপহার। ইসলাম অনুসারে কেবল মাত্র ঈশ্বরের উপাসনা সম্ভব। রসুলের নামে যে জপ করা হয় তাহা উপহার মাত্র।

হইয়াছে। একজন অতি খর্ব্বকায় দ্বারবানকে তাহারা কিছু বলিতেছে, সে অট্টালিকাতে প্রবেশ করিয়া প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর আনিয়া দিতেছে। রঈস একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ প্রাসাদ কাহার ও ঐ খর্ব্বকায় ব্যক্তিটি কে?" সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "তুমি জান না? এ প্রাসাদে জগতের শেষ রসুল মকবুল হজরৎ মহম্মদ বাস করেন। ঐ দ্বারবানটি অবদুল্লা মসউদ। তুমি যদি হজরৎ রসুল অল্লাকে দর্শন করিতে চাও তবে অবদুল্লাকে বল, অনুমতি পাইলে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিও।" রঈস অবদুল্লাকে আপনার ইচ্ছা জানাইলে অবদুল্লা প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন ও ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "হে অহমদ রঈস, হজরৎ রসুল অল্লা বলিতেছেন 'তুমি এখনও আমাকে দর্শন করিবার শক্তি লাভ কর নাই, অতএব তোমাকে দর্শন দান অসম্ভব! তুমি আপনার প্রতিবেশী কুতুবউদ্দীন বখ্তিয়ার কাকীকে আমার সম্ভাষণ জানাইয়া বলিও, তিনি আমাকে প্রতি রাত্রে কিছু উপহার পাঠাইতেন, আজ তিন রাত্রি সে উপহার আমি পাই নাই।" ইহার পরই রঈসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। রঈস চিন্তিত হইয়া পর দিবস প্রাতে কুতুবউদ্দীনকে সবিস্তার সংবাদ দিলেন। কুতুবউদ্দীন উপহার না পাঠাইবার কারণ বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি সেই দিবসই আপনার নবপরিণীতা পত্নীকে তলাক দিয়া স্বাধীনতা দান করিলেন ও স্বয়ং মাতার অনুমতি লইয়া পরিব্রাজক রূপে গৃহত্যাগ করিলেন।

তিনি প্রথমে বাগদাদে গিয়া সেখানকার বিদ্বান সাধু ও তপস্বীদের কাছে নানারূপ গুপ্তবিদ্যার গূঢ় রহস্য শিক্ষা করিলেন। এই সময়ে শেখ শিহাব উদ্দীন ওমর সহর ওয়র্দী, শেখ ওহদ উদ্দীন কিমানী ইত্যাদি প্রসিদ্ধ সাধকদের সৎসঙ্গে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। এই সময়ে শেখ জলাল উদ্দীন তবরেজী খোরাসান হইতে দ্বিতীয়বার বাগদাদে আসিয়াছিলেন। কুতুব উদ্দীন তাঁহার কাছে জানিতে পারিলেন যে খোয়াজা মুঈন উদ্দীন চিশতী ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, ও সম্ভবতঃ দিল্লীতে কিছুকাল বাস করিবেন। এই কথা শুনিয়া কুতুব উদ্দীন জলাল উদ্দীনের সহিত ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উভয়ে মুলতানে আসিয়া সেখানকার প্রসিদ্ধ সাধক শেখ বহাওউদ্দীন জকরিয়ার অতিথি হইয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ... যোদ্ধা মুলতানের দুর্গরক্ষক ছিলেন, তিনি কুতুব উদ্দীনকে দেখিয়াই তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। এক দিন তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়া কুতুব উদ্দীনের কাছে আসিয়া বলিলেন, উত্তর দেশ হইতে এক দল বিধর্ম্মী আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার দুর্গ বেষ্টন করিয়াছে। আমার সেনা অল্প, তাহাদের বেশী, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবার কোনও আশা নাই। আমাকে রক্ষা করুন।" কুতুবউদ্দীন এক সৈনিকের কাছে একটি তীর চাহিয়া লইয়া কবাচাবেগকে দিলেন ও বলিলেন, "কল্য প্রাতে এই তীরটি তোমার শত্রুদের দিকে ফেলিবে, তোমার কোনও ভয় থাকিবে না।" পর দিবস কবাচাবেগ স্বয়ং সেই তীর শত্রুদের সেনা লক্ষ্য করিয়া ত্যাগ করিলেন, পরে দেখিতে পাইলেন আক্রমণ ও অবরোধকারী সৈনিকেরা কোনও অজানিত কারণে অত্যন্ত ভয় পাইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল ও অল্প কয়েক দণ্ডে মুলতানের সীমা ত্যাগ করিয়া গেল।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে কুতুব উদ্দীন দিল্লী অভিমুখে ও শেখ জলাল উদ্দীন তবরেজী গজনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কবাচাবেগ তাঁহাকে আর কিছুকাল মুলতানে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি স্বীকার করিলেন না। বলিলেন, "এ দেশ শেখ বহাওউদ্দীন জকরিয়ার শাসনাধীন, অতএব আমি হস্তক্ষেপ করিতে অথবা এখানে বাস করিতে অক্ষম।"

কুতব উদ্দীন দিল্লীতে আসিতেই সে সময়কার সম্রাট সুলতান শমস্ উদ্দীন ইয়লতমশ [১২১০ হইতে ১২৩৬ ঈ] প্রথম দর্শনেই তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে শেখ জমাল উদ্দীন মহম্মদ নিজামী ও শেখ মহম্মদ অতা [যিনি শেখ হমীদ উদ্দীন নগোরী নামে প্রসিদ্ধ] ইত্যাদি সাধু ও বিদ্বান্‌দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই সময়ে শেখ বদর উদ্দীন গজনবী কুতুব উদ্দীনের কাছে খির্কা লাভ করিতে আসিলেন। তিনি আপনার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত গুরুসেবা করিয়া কাটাইয়াছিলেন।

কিছুকাল দিল্লী বাসের পর কুতুবউদ্দীন আপনার গুরুদেব মুঈন উদ্দীনের সহিত মিলিত হইতে ব্যস্ত হইলেন এবং এক দূত হস্তে অজমীরে গুরুকে পত্র লিখিয়া তথায় যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মুঈনউদ্দীন উত্তরে লিখিলেন "আমাদের শীঘ্রই মিলন হইবার আশা আছে"

পক্ষে দূরদেশে বাস মিলনের বাধা হইতে পারে না। যাহা হউক, আমি স্বয়ং তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শীঘ্রই দিল্লী যাইব।" যখন খোয়াজা মুঈনউদ্দীন দিল্লীতে আসিলেন, তখন কুতুবউদ্দীন বলিলেন, "এখানকার সুলতান ইয়লতমশ আপনাকে দর্শন করিতে চাহেন, আপনি অনুমতি দিলে তিনি আসেন।" কিন্তু মুঈনউদ্দীন স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, "আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, বড় জোর ২।৪ দিন থাকিব, আমি গোলমাল ভালবাসি না।" তথাপি, নগরের বহু নাগরিক এই প্রসিদ্ধ সাধককে দর্শন করিতে আসিতে লাগিল। এই সময়ে শেখ নজমউদ্দীন এ অঞ্চলে ধর্ম্ম বিভাগের প্রধান অর্থাৎ 'শেখ-উল-ইসলাম' ছিলেন। তিনি খোয়াজা মুঈনউদ্দীনকে ইরাণের খোরাসান প্রদেশে বাস কালে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু কুতুবউদ্দীনকে অত্যন্ত হিংসার চক্ষে দেখিতেন। কেন না, নাগরিকেরা নজমউদ্দীন অপেক্ষা কুতুবউদ্দীনকে বেশী শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। মুঈন উদ্দীন এ সময়ে কুতুবউদ্দীনের অতিথি ছিলেন, সেই জন্য নজমউদ্দীন তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন না। মুঈনউদ্দীন সকল সংবাদ পাইয়া স্বয়ং নজমউদ্দীনের গৃহে যাইলেন, ও কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "হে নজমউদ্দীন, তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি শেখ-উল-ইসলাম পদ পাইয়া অহঙ্কারে জ্ঞান হারাইয়াছ?" নজমউদ্দীন লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে যেমন আপনার ভক্ত ছিলাম, এখনও সেইরূপ আছি, কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে, আপনি এখানে যে শিষ্যটি রাখিয়াছেন, তাহাতে আমাকে আর কেহ শেখ-উল-ইসলাম বলিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করা দূরের কথা, গ্রাহ্যই করে না।" মুঈন বলিলেন, "চিন্তা করিও না, আমি কুতুব উদ্দীনকে আপনার সহিত অজমীরে লইয়া যাইতেছি, তাঁহাকে ঐ অঞ্চলের শেখ-উল-ইসলাম পদ দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করেন নাই।" ইহার পর, মুঈনউদ্দীন কুতুবউদ্দীনকে সঙ্গে করিয়া অজমীর অভিমুখে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু নগরবাসীরা কোলাহল আরম্ভ করিল। তাহারা কুতুবউদ্দীনকে অত্যন্ত ভক্তি করিত, সকলেই তাঁহাকে দিল্লীতে বাস করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। সুলতান ইয়লতমশ সংবাদ পাইয়া সাধারণ নাগরিক বেশে আসিয়া উভয়কে কাতর ভাবে বলিলেন, "হে মহাত্মা, আমরা রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া নানা প্রকার অন্যায় ও পাপ করিয়া থাকি। আপনাদের মত সাধুদের দর্শন, সৎসঙ্গ ও উপদেশ আমাদের বিপথগামী হইতে দেয় না, নরকের উন্মুক্ত পথ হইতে রক্ষা করে। আমাদের একমাত্র মুক্তির উপায় হইতে আমাদের বঞ্চিত করিবেন না।" মুঈনউদ্দীন এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া বলিলেন, "বাবা কুতুবউদ্দীন কাকী, তপস্বীর পক্ষে সকল স্থানই সমান, নগর ও বনে প্রভেদ নাই। যেখানে বাস করিলে সন্তপ্ত পাপী তাপী জীবের বেশী উপকার হয়, সাধুরা নিজেদের অসুবিধা হইলেও সেইখানে বাস করিয়া জগতের হিত করিয়া থাকেন। তুমি এই নগরবাসীদের আন্তরিক ইচ্ছামত দিল্লীতেই বাস কর, তাহাতে তোমার নিজের সুখ বা অসুখ যাহাই হউক, নগরবাসীদের যথেষ্ট উপকার হইবে।" গুরুর কাছে এইরূপ উপদেশ পাইয়া কুতুবউদ্দীন দিল্লীতেই থাকিয়া গেলেন। মুঈনউদ্দীন অজমীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

কুতুবউদ্দীন দিল্লীতে বাস কালে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন, ও তাঁহার শেখ অহমদ ও শেখ মহম্মদ নামক দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার যেরূপ স্বভাব ছিল, তিনি ভক্তদের উপহার ক্বচিৎ স্বীকার করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহার স্ত্রী পুত্রের আহারাভাব হইলেও তিনি অন্ন চিন্তা করিতেন না, কাহারও নজর বা নিয়াজ (ভেট) গ্রহণ করিতেন না, আপনার ধ্যান, সমাধি লইয়াই থাকিতেন। তাঁহার পত্নী পুত্রদের প্রায়ই অনাহারে থাকিতে হইত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ অহমদ যখন সাত বৎসর বয়সে মরিয়া গেল, তখন তাহার মাতার ক্রন্দনে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি আপনার শিষ্য বদরউদ্দীন গজনবীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কারণ শুনিয়া তিনি কেবল মাত্র বলিলেন, "মূর্খ স্ত্রীলোককে চেঁচাইতে নিষেধ কর।" এই বলিয়া আবার সমাধিস্থ হইলেন।"

তাঁহার পত্নীর আহারাভাব হইলে কখন কখন প্রতিবেশী ধনবান শরফউদ্দীন নামক এক বণিকের পত্নীর কাছে সিকি বা আধুলি ঋণ করিতেন, আবার কোনও ভক্তের কাছে উপহার পাইলে ঋণ পরিশোধ করিতেন। শরফ-

উদ্দীনের স্ত্রী ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া একবার সাধু-পত্নীকে বলিল, "তোমার আহার অভাব হইলে আমিই তোমাকে রক্ষা করিয়া থাকি, আমি নিকটে না থাকিলে তোমাকে সন্তান সহিত খাদ্যাভাবে শুকাইয়া মরিতে হইত। তুমি সে জন্য কৃতজ্ঞ কি না?" কুতুবউদ্দীনের পত্নীর হৃদয়ে এ গর্ব্বপূর্ণ কথা গুলি শেল সম বিঁধিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর আহারাভাব হইলেও তাহার কাছে ঋণের জন্য হাত পাতিবেন না। একদিন তিনি স্বামীকে আপনার মনের যাতনার কথা বলিলেন। কুতুব উদ্দীন হাসিয়া বলিলেন, "তোমার যে অর্থাভাব হইয়াছিল, কৈ আমাকে ত সে কথা জানাও নাই। যাহা হউক ভবিষ্যতে আর কাহারও কাছে ঋণ করিও না। তোমার যখন সত্যসত্যই অভাব হইবে, তখন আমার বসিবার ঘরের সম্মুখের ঐ তাকে করুণাময় পরমেশ্বরের নাম করিয়া হাত দিও, এবং বলিও আমার এত টাকা বা পয়সা চাই, তোমার যাহা প্রয়োজন তাহা পাইবে। তবে স্মরণ রাখিও, অর্থ সঞ্চয় করিও না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাহিও না, কেবল ব্যয় করিবার মত পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিও।" সেই পর্য্যন্ত তাঁহার পত্নী প্রয়োজন হইলেই তাকে টাকা পাইতেন, নিজের সংসারে ব্যয় করিয়া দরিদ্রদের অন্ন বস্ত্র দান করিতেন। শরফ উদ্দীনের ধনগর্ব্বে গর্ব্বিতা পত্নী এখন দেখিতে পাইল, যাহাকে দুই চার আনা পয়সা ধার দিয়া সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া অহঙ্কার করিত, সেই ফকীর-পত্নী এমন প্রত্যহ কত দরিদ্র আতুরদের অকাতরে অন্ন বস্ত্র দান করিতেছে।

সুলতান ইয়লতমশ একবার রাত্রে শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, নগরের নিকট কোনও স্থানে একটি জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া প্রজার কষ্ট দূর করিবেন। রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, নগরের একস্থানে একটি বলবান বড় ঘোড়ার পৃষ্ঠে হজরৎ রসুল অল্লা দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। নিকটে যাইলে বলিলেন, "যদি জলাশয় নির্ম্মাণ করিতে চাও তবে আমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছি ঠিক এই স্থানে কর।" পরে, তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাতে কুতুবউদ্দীনের কাছে সেবক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি, অনুমতি দিলে আপনার কাছে গিয়া নিবেদন করি।" কুতুবউদ্দীন সেবককে বলিলেন, "তোমার প্রভুকে বলিও এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। যেখানে জলাশয় নির্ম্মাণ করিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন সেইখানে আমি যাইতেছি, তিনিও যেন শীঘ্র আইসেন।" সুলতান সেখানে গিয়া দেখিলেন কুতুবউদ্দীন তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। যেখানে হজরৎ রসুল অল্লা দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখানে তাঁহার ঘোড়ার পায়ের দাগ রহিয়াছে। তিনি ঠিক সেই খানেই জলাশয় নির্ম্মাণ করিলেন।

১৪ রবি-উল-অউয়ল ৬৩৪ হিঃ (১৫ নবেম্বর ১২৩৬) কুতুবউদ্দীন ভক্তি বিষয়ের কওয়ালী গান শুনিতে শুনিতে বারবার অজ্ঞান হইতে লাগিলেন। তিনি আপনার শিষ্য হমীদ উদ্দীনকে বলিলেন, "খোয়াজা মুঈনউদ্দীনের যে খির্কা আমি পাইয়াছি, সেই খির্কা, আমার অসা (দণ্ড), ও খড়ম শেখ ফরীদ উদ্দীন মসউদ শকরগঞ্জকে দিবে, ও বলিবে তিনি যেন আমার আসনে আসিয়া বসেন।" হমীদ উদ্দীন আরও কিছু শুনিবার আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিলেন গুরুর প্রাণপাখী উড়িয়া গিয়াছে।

পুরাতন দিল্লীতে এখনও তাঁহার সমাধিস্থান সম্মানিত হয়। প্রতি মৃত্যুর তারিখ (১৪ রবিউল অয়উল) ভারত, অফগানিস্থান ও ইরাণের বহু ভক্ত একত্র হইয়া মহা সমারোহে তথায় উর্স করিয়া থাকেন। উর্সের সময় ভক্তি বিষয়ে কওয়ালী গান হয়।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

[library stamp] ...INSTITUTE ... CALCUTTA
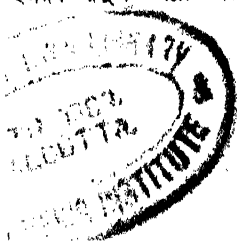
কটকে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি

ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে গঙ্গাবংশীয় রাজগণ ১১১৮—১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যাতে স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। উক্ত বংশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রতাপরুদ্রদেব একজন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তিনি ১৫০৪—১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কটক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজপ্রাসাদের চিহ্ন এখন না থাকিলেও উক্ত স্থানটি নির্দ্দেশ করা দুরূহ ব্যাপার নয়।

প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক। চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে বাস করার সময় প্রতাপরুদ্রদেব উড়িষ্যার একচ্ছত্রাধিপতি নরপতি ছিলেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অন্যান্য নরপতিগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিতেন। প্রতাপরুদ্রদেব একজন প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন।

নবদ্বীপ-চন্দ্র নবদ্বীপ অন্ধকার করিয়া শ্রীক্ষেত্রে উদয় হইলেন। তিনি কাশী মিশ্রের বাটীতে একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে সাধন ভজন করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। উক্ত প্রকোষ্ঠটি 'গম্ভীরা' নামে প্রসিদ্ধ ও শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী শ্রীরাধাকান্ত মঠের অন্তর্ভুক্ত। ঐ প্রকোষ্ঠে চৈতন্য দেবের কমণ্ডলু, ছিন্ন কন্থা ও পাদুকাদ্বয় এখনও সযত্নে রক্ষিত হইয়া বিধিমতে পূজা প্রাপ্ত হইতেছে। এইখানে বিখ্যাত পণ্ডিত সার্ব্বভৌম জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেবের ভক্তি মার্গ অনুসরণ করিবার মানসে মহাপ্রভুর আশ্রয় লইয়াছিলেন। ভক্ত হরিদাস, চৈতন্য দেবকে প্রাপ্ত হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হন ও দ্বিগুণ উৎসাহে প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম জপ আরম্ভ করেন। প্রভু গদাধরও মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ও শ্রীরাধিকার প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি মাত্র তিনিই বা প্রভুকে ছাড়িবেন কি করিয়া? এইরূপে চৈতন্যদেবের গণ সকলেই ক্রমে ক্রমে যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। 'গম্ভীরা' ও পুরী নগর হরিধ্বনিতে পূর্ণ হইতে লাগিল।

শ্রীক্ষেত্রে নূতন যুগের আবির্ভাব হইল। প্রত্যহ দলে দলে লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। চৈতন্যদেব চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় সকলকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কি অসাধারণ ক্ষমতা! মহাপুরুষদিগের সকলই আশ্চর্য্যজনক, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বোঝা সম্ভবপর নয়। দক্ষিণ দেশ হইতে রায় রামানন্দ, মান সম্ভ্রম রাজসম্মান ও অর্থ তুচ্ছ করিয়া সংসারত্যাগী হইয়া শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আশ্রয় লইলেন। এই যে প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইল, রাজা প্রতাপরুদ্রদেব পর্য্যন্ত তাহাতে ভাসিয়া গেলেন। সকলেই আশ্চর্য্য, সকলেই অবাক! একজন কৌপীনধারী বৈষ্ণবমাত্র একচ্ছত্রাধিপতি নরপতির মন টলাইলেন। বৈষ্ণবের পাদপদ্মে রাজা আত্মসমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাইয়া ও তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া বুঝিতে পারিয়া শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিলেন। চৈতন্যদেব নিজের প্রাধান্য বিস্তৃত হইবার আশঙ্কায়, সামান্য বৈষ্ণব হইয়া একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজরাজেশ্বরকে মন্ত্রদান করিতে প্রথমে অস্বীকৃত হন। কিন্তু পরে নরপতির একাগ্রতা, ভক্তিভাবের উদয় ও সরলতার পরিচয় পাইয়া ও তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়া কৃতার্থ করেন। এই বিবরণগুলি কাল্পনিক নয়, চৈতন্যচরিতামৃত পাঠকগণের নিকট ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিবেচিত।

প্রতাপ রুদ্রদেব শিষ্যত্ব লাভ লাভে তাঁহার বহুকালের আশা পূর্ণ হয় ও তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের সঙ্গসুখে বিভোর হইয়া ধনরত্ন ও রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গগণের সহিত পুরীতেই সামান্য লোকের মতন বাস করিতে থাকেন। নরপতির এরূপ বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া শ্রীচৈতন্যপ্রভু

তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন। গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রতাপ রুদ্রদেব কটকে ফিরিলেন ও নিজ রাজপ্রাসাদে চৈতন্যদেবের একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবাদি করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব নবদ্বীপে যে প্রেমের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, উড়িষ্যা যে সে প্রেমপ্রবাহের কণিকা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার অকাট্য নিদর্শন রাজা প্রতাপরুদ্রদেব কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্য-মূর্ত্তি স্থাপন। চৈতন্যদেবের সেই মূর্ত্তিটী এখনও বর্ত্তমান। তাহা কটক নগরের মহম্মদিয়া বাজারস্থ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে অলক্ষিত ভাবে পড়িয়া ছিল, এমন কি উক্ত স্থানটী নির্দ্দেশ করাও ইতিপূর্ব্বে কঠিন ছিল। এক্ষণে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু এম-এ নামক একজন বৈষ্ণব ভক্তের চেষ্টায় মূর্ত্তির সেবাপূজা সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। কটকের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ও ভক্ত শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আনুকূল্যে ও সর্ব্বসাধারণের অর্থসাহায্যে একটী নাটমন্দিরও নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইলে বাকী অভাবগুলি অতিশীঘ্র পূরণ হইয়া পবিত্র স্থানটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে ও অতীতের কীর্ত্তি রক্ষা হইবে। আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন ইহা ৪০০ বৎসরের অপেক্ষা ঊর্দ্ধকালের কীর্ত্তি এবং একজন প্রধান ভক্তের কীর্ত্তি, সুতরাং ইহা সামান্য স্থান নয়। ভক্তাধীন মহাপ্রভু এস্থান কথনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

এই মূর্ত্তিটী যে আধুনিক নয় ইহার অকাট্য প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। পূজ্যপাদ নাগপুর অধিপতি রঘুজী ভোঁসলা মহোদয় ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা অধিকার করেন ও হিন্দুদেবতাদিগের সেবাপূজার ব্যয় রাজকোষ হইতে নির্ব্বাহিত হইবার ব্যবস্থা করেন। উড়িষ্যা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ শাসনাধীন হইলে সরকার বাহাদুর দেবালয়গুলির জন্য তদনুযায়ী মাসিক বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন ও তদনুযায়ী বৃত্তি বা 'গণ্ডি টাকা' সেবকগণ অদ্যাবধি পাইয়া আসিতেছেন। চৈতন্যদেব-মূর্ত্তি মাসিক ১০।৶ দশটাকা ছয় আনা পাইয়া থাকেন। সুতরাং ইনি মারহাট্টা অধিকারের পূর্ব্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত আছেন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই চৈতন্য মূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া রাজা প্রতাতরুদ্রদেবের রাজপ্রাসাদের স্থানও নির্দ্দেশ করিতেছে। কেবল ইহাই নহে। বিজয়া দশমীর পর ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিন দিন চৈতন্যদেব রাজাপ্রতাপরুদ্র দেবের অনুরোধে তাঁহার রাজপ্রাসাদে বাস করেন ও পূর্ণিমার দিন মহানদী পার হইয়া চৌদুয়ার পথে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। শ্রীচৈতন্যদেবের উক্ত শুভ আগমন উপলক্ষে এখনও পর্য্যন্ত মন্দিরে তিন দিন ব্যাপী উৎসব হইয়া থাকে। সুতরাং চৈতন্যদেবের পদরজঃস্পর্শে স্থানটী পবিত্র হইয়াছে।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ।

বিসর্জ্জন

হে প্রতিমা,
তব বিসর্জ্জন মন্ত্র পুরোহিত কবে
পড়িয়াছে, বাকী আছে সলিল-সমাধি।
নামিবে সন্ধ্যার আঁধি
নিতান্ত নীরবে;
বাজিবে বাজনা
পূর্ণ তবে হবে বিসর্জ্জনা।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পাটনা—
১১।৩।২৯

ভারতের "লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা" হিসাবে বাংলার স্থান

গত অগ্রহায়ণের "বিচিত্রা"য় শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা দেবীর লেখা একটী প্রবন্ধ দেখিলাম—"বঙ্গ ভাষার প্রচলন।" ইনি ভারতের ভাষা সমূহের মধ্যে সার্ব্বজনীন হইবার মত কোন্‌টীর দাবী অধিক সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কতকটা এই সম্বন্ধেই আমিও চিন্তা করিতেছিলাম এবং সেই জন্যই এ প্রবন্ধে শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীর অলিখিত দুই চারিটী কথা বলিতেছি। তবে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য সার্ব্বজনীন ভাষা নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে নেহরু কমিটী ও বহুবিধ propagandaর পৃষ্ঠপোষিত হিন্দুস্থানীর সহিত বাংলা ভাষার তুলনা করা।

Census Report হইতে দেখা যায় যে বাস্তবতঃ হিন্দুস্থানী-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বেশী। কিন্তু এই যুক্তিতে ইহাকে ভারতের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা নির্ব্বাচন করা যে কতটা ভ্রমাত্মক হইবে তাহা শুধু দুই চারিটা কথাতেই বুঝাইয়া বলা যায়। বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষে এমন কোন ভাষা নাই যাহা শুধু সংখ্যার জোরেই majorityর ভাষা বলিয়া দাবী করিতে পারে। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া বলি। সরকারী বিবরণে ভারতে ২২২টী ভাষা ও ৩৮টী উপভাষা (dialect) আছে; এবং ইহাদের মধ্যে বাস্তবতঃ প্রধান পশ্চিমী হিন্দুস্থানী (Western Hindusthani) ৯৬, ৭১৫,০০০ লোকের মাতৃভাষা বলিয়া উল্লিখিত। এখন দেখা যাক্ majority হিসাবে ইহার দাবী কতটা। আমি আরও মাত্র ৩০টী ভাষার লোক সংখ্যার যোগফল কষিলাম। সে অঙ্কটী হয় মোটামুটি ২১২, ৭২২,০০০। ইহা ছাড়াও ত' ১৯১টি ভাষা ৩৮টি উপভাষা বাদই দেওয়া হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে শুধু সংখ্যার জোরে হিন্দুস্থানীও majority ভারতীয়দের মাতৃ-ভাষা বলিয়া দাবী করিতে পারে না। সুতরাং এই অবস্থায় বিবেচ্য (১) প্রথমতঃ ইহার বর্ত্তমান লোক সংখ্যা, এই ভাষার উপভাষা সমূহের লোক সংখ্যা এবং ইহার প্রচারে সমস্ত ভারতের সুবিধা ও অসুবিধা (২) ভারতের সম্মান রক্ষার্থ সার্ব্বজনীন ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে কি না।

এই ত' গেল পরিমাপের আদর্শ। এখন এই আদর্শ লইয়া বিচার করিতে বসিলে হিন্দুস্থানীর সম্বন্ধে প্রথমেই চোখে পড়ে যে, সরকারী বিবরণে যে প্রায় দশ কোটি লোকের উল্লেখ আছে, তাহা বাস্তবতঃ এক হিন্দুস্থানীরই নহে, ইহা হিন্দুস্থানী, উর্দ্দু, বঙ্গরু, ব্রজভাষা, কনৌজী, বুন্দেলী, হিন্দী, আউধি, ছত্রিশগড়ী, মগধি, মৈথিলি এবং ভোজপুরী এই দ্বাদশ ভাষার সংখ্যার সমষ্টি। কাজেই এই বিশাল ভাষাব্যূহের সঙ্গে একা বাংলার সংখ্যা ক্ষুদ্রতর হওয়া মোটেই আশ্চর্য্যজনক নয়। এই সকল সমুন্নত ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষাগুলি দ্বারা ব্যূহ রচনা করিয়া সংখ্যার গৌরব করিতে পারিলে আর যাহাই কেন হউক না 'propaganda'র পথে অনেক সুবিধা হইবে বটে। কিন্তু propagandaর খাতির না রাখিয়া সত্য সরল কথায় কাহার প্রচার বেশী, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট হইতে তাহারই উল্লেখ করিতেছি—"Among the languages and dialects of India, Bengali is the speech of the largest number of people 48, 367, 915. (১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে এই অঙ্ক ৪৯,২৯৪,০০০,) আরও দেখুন—"Taking into consideration the number of people speaking it as their mother tongue, Bengali is the seventh language of the World, coming after Northern Chinese, English, Russian, German, Spanish and Japanese." (Origin and Development of Bengali Language by Shuniti Kumar Chatterjea. Vol. I, page 1) অথচ কিছুদিন আগে 'Forward'এ এক দিন পড়িতেছিলাম যে জনৈক 'নেতা' নাকি মান্দ্রাজে এক বক্তৃতার মঞ্চে উঠিয়া হিন্দুস্থানীর প্রশংসা করিতে করিতে বলিয়া ফেলিয়াছেন "সংখ্যা হিসাবে হিন্দুস্থানী পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় ভাষা!" বক্তৃতার মঞ্চে দাঁড়াইলে একা বাঙ্গালীরই মাথা খারাপ হয় না!

সে যাই হউক এই সম্পর্কে কিন্তু আর দুই একটি কথা বলিবার আছে। অসমীয়া ভাষাকে বাংলা হইতে পৃথক করিয়া সরকারী বিবরণে ধরা হয়, অথচ ইহারই সম্বন্ধে বহু ভাষাবিৎ যাহা বলিয়া থাকেন তাহাই

সুনীতিবাবুর উপরিউক্ত গ্রন্থের কথায় "Bengali and Assamese are practically one language." (Vol I. page 91)! এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার সংখ্যা যোগ দিতে গেলে হিন্দুস্থানীর বেলায় 'দোষং নাস্তি' আর বাংলার বেলায় সেটা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট vexata quœstio! তাহার উপর কলিকাতা ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরী গেজেটে খাস বাংলাকেই দুই ভাগ করিয়া বাংলা ও মুসলমানী বাংলা বলিয়া ধরা হয়! এ যেন নিষ্ফল বঙ্গ-ভঙ্গের নিদারুণ আক্রোশে বঙ্গভাষা ভঙ্গের প্রাণপণ প্রচেষ্টা!

হিন্দুস্থানী সার্ব্বজনীন ভাষা হইলে পঞ্জাব, গুজরাট ও রাজস্থানের জনবর্গের কতকাংশের সুবিধা হইবে; বাংলার বেলাতেও সমগ্র আসাম, চট্টগ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মগ প্রদেশ, বেহার,* ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার † সুবিধা হইবে এবং ইহাদের সংখ্যা তুলনা করিলে বাংলার সংখ্যা হিন্দুস্থানীর অপেক্ষা কোন অংশে ক্ষুদ্রতর হয় না।

এখন দ্বিতীয় আদর্শ—সাহিত্যের মাপ। বরাবর প্রথম হিন্দুস্থানীকে ধরা হইয়াছে তাই এই বারও প্রথমতঃ হিন্দুস্থানী সাহিত্যের কথাই চলুক। বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী সাহিত্য সাধারণ শিক্ষিত লোকের (ভারতের লোক শতকরা কত জন নিতান্ত সাধারণ রূপেও শিক্ষিত তাহা পাঠকের অবিদিত নাই) মনের কতটা সংস্পর্শে আসে তাহারই জবানবন্দী—

"A language is developed mainly in two ways —(1) by popular contact with new ideas and (2) by the experiments of literatures. To take (2) first, the popular speech is still wholly unaffected in this way. So far there is any Hindustani literature (in which I include what would be called Hindi and Urdu literature) at all, it is written in an artificial language, only intelligible to those who have deliberately learnt it. The excellence of a writer's style is measured by the reconditeness of his vocabulary. Neither such vernacular books as are published, nor the vernacular newspapers are understood by the people. They therefore do not influence the language that the people use... What Hindusthani needs is standardisation.......As regards the curriculum (of schools) it is suggested in all humility that a retrograde step was taken some years ago when passages in "High Hindi" and "High Urdu" were introduced into the school readers, avowedly to enable students to read modern newspapers···That the language used in official transaction is tending towards simplification will be realised by any district official if he compares the jargon of the Land records or that still spoken by police station officials, which is a survival of the old official style, with the vernacular publications of the Gazette of the present day. It is perhaps over-sanguine to see any appreciable advance since 1911." (Census Report of India, 1921. Vol I. page 199)

যে সরকারী বিবরণের নজির তুলিয়া নেতারা লাফাইয়া থাকেন, হিন্দুস্থানী সাহিত্যের সম্বন্ধে তাহারই এত বড় 'প্রশংসা পত্র' বোধ করি তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তেই মানিয়া লইবেন?—তাহার পর শুনিতেছি বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী উপন্যাসাদি কতকগুলি নাকি এমনি অশ্লীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীকেই বৃদ্ধ বয়সে কোমর বাঁধিয়া স্বদেশ-সেবার ক্ষেত্র হইতে সাহিত্য-সেবার ক্ষেত্রে নামিয়া পড়িতে হইয়াছে। এই সকল 'সাহিত্য ও উপন্যাস' সম্ভারশালী হিন্দুস্থানী ভাষা যখন ভারতের সার্ব্বজনীন ভাষা হিসাবে এবং রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্য সম্পর্কে সমগ্র পৃথিবীর নিকট পরিচিত হইতে থাকিবে, তখন এই চিরপরাধীন ভারতের 'গৌরব' শিখরে যে আরও এক পোঁচ পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালী পাঠককে বাংলার সাহিত্য-সম্ভারের কথা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজে এমন কেহই নাই যিনি বাংলা সাহিত্যের যশোগান

* প্রবাসী—পৌষ ১৩৩৪ শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধির প্রণালী' দ্রষ্টব্য।

† 'Oriya is most closely related to Bengali-Assamese." Origin Development of Bengali Language. Vol I, page 91.

(propaganda দ্বারা নহে) শুনেন নাই। বাস্তবিকই এই সকল propagndaর আবহাওয়া এড়াইয়া যে সকল ভারতীয়রা আছেন ও যাঁহাদের হিন্দুস্থানী ও বাংলার মধ্যে কোনটাই মাতৃ-ভাষা নহে, তাঁহারা বাংলাকেই সম্মান দিয়া থাকেন এবং অনুসন্ধিৎসু যাঁহারা, তাঁহারা বাংলা-ভাষা শিক্ষায় যত্নবান হন। এই সূত্রে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সরকারী বিবরণের প্রথম খণ্ড ১৯৯ পৃষ্ঠায় বরদা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "The recent vogue of Tagore has given an impetus to the study of the Bengali Language."

এইখানে শেষ করিবার পালা, তবে একটি বিশেষ কথা উল্লেখ করিবার আছে। হিন্দুস্থানী ও উর্দ্দু ইহারা যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়া আসিয়াছে, সুতরাং ইহাদের মধ্যে যে কোনও একটি সার্ব্বজনীন ভাষা হইলে অপর সম্প্রদায় ক্ষুণ্ণ হইবে এবং এমন কি তাহারা নিজেদের পৃষ্ঠপোষিত ভাষাটি জোর করিয়া চালাইবার চেষ্টাও করিতে পারে। বর্ত্তমানেও একটির ভাষীদের নিজেদের প্রদেশে চলিতে হইলেও অপরটি শিখিয়া লইতে হয় এবং এই সকল যোগাযোগের জন্য যে কোনও একটিকে সার্ব্বজনীন করিতে গেলেই বস্তুতঃ ভারতীয়দিগকে দুইটি ভাষা শিখিতে বাধ্য করা হয়। ইহারও উপর এই দ্বাদশ ভাষা নির্ম্মিত ব্যূহের মধ্যে হিন্দুস্থানী বা হিন্দী কোন্‌টি নির্ব্বাচিত হইবে তাহা লইয়া হিন্দুদের মধ্যেই বিবাদ বাধিতে পারে, তাহার উপর উর্দ্দু লইয়া মুসলমানদের সহিত এক পালা ত আছেই।

এদিকে ভারতের প্রতি-পাঁচজন মুসলমানের মধ্যে দুই জনের মাতৃ-ভাষা বাংলা। বাংলা দেশে মুসলমানদের মধ্যে উর্দ্দুর ঝোঁক কাটিয়া গিয়াছে, মুসলমানেরা বাংলাকেই মাতৃভাষা বলিয়া অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছেন। কাযেই বাংলাকে লইয়া হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভাষা-সমর বাধিবে না, ইহাও একটা দেখিবার দিক। এ সম্বন্ধে 'বিচিত্রা'য় শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবী যথেষ্ট লিখিয়াছেন বলিয়া তাহার আর পুনরুক্তি করিলাম না; অনুসন্ধিৎসু সেই প্রবন্ধটি পড়িয়া লইবেন।

শ্রীসঞ্জয়।

* ১৯৬ পৃষ্ঠা প্রথম খণ্ড ১৯২১ বেঙ্গল্‌ রিপোর্ট লিখিতেছেন, "Pelitical and religions congiderations alse effect the return, the Muhmudan community usnally preferring to record widn as their language"

কবে

কবে আমায় টেনে নেবে
তোমার মধুর কোলে,
তোমার নামে পরাণ আমার
পড়বে কবে গ'লে ?

কবে তুমি ডাক্‌বে মোরে
তোমার স্নেহের স্বরে,
তোমার বাঁশি কবে আমায়
ফেল্‌বে অবশ করে ?

কবে তুমি গড়বে আসন
আমার হৃদয় মাঝে,
তুমি আমার সকল হয়ে
ফুটবে সকল কাযে ?

তোমার পরশ কবে মোরে
তুলবে পাগল ক'রে
তোমার গানে পরাণ কবে
নাচবে পুলক ভরে ?

আমায় তুমি ডেকে নেবে
কবে তোমার পাশে,
ব'সে আছি হেথায় আমি
সেই ডাকেরই আশে।

শ্রীপরেশ সেনগুপ্ত।

দেব দেউল

(উপন্যাস)

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মণিকার শ্রেষ্ঠীর গৃহ সেদিন উৎসবের বেশে সজ্জিত হইয়াছিল। অংশুমানের সহিত এষার বিবাহ তাহার পরদিন সুস্থির হইয়াছিল বলিয়া সেদিন বাড়ীতে একটা ভোজের আয়োজন হইয়াছিল।

বাড়ীর দ্বারের কাছে যাইয়া ভৈরব একবার দেব-দেউলের দিকে চাহিল। দেখিল, পান্না সেই একভাবেই প্রস্তর বেষ্টনীর কাছে বসিয়া আছে। ক্রমে বেলা পড়িতে লাগিল, ক্রমেই তাম্রলিপ্তের ধনী বণিকেরা একে একে আসিতে লাগিলেন। অংশুমানের অপেক্ষায় ভৈরব দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত দিনটা গেল। ক্রমে ধূসরবর্ণ সন্ধ্যা নামিল। ভৈরব তখনও পথের উপর দাঁড়াইয়াই রহিল—পান্না তখনও দেবদেউলের প্রস্তর বেষ্টনীর কাছে বসিয়াই রহিল। অংশুমান বাহির হইল না।

রাত্রি আসিল। চন্দ্রমাহীন অন্ধকার রাত্রি। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া ভৈরব একবার পান্নাকে দেখিতে চেষ্টা করিল। কিছুই দেখা গেল না। শ্রেষ্ঠিগৃহের কক্ষে কক্ষে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল। বীণার ঝঙ্কার উঠিল। ভৈরব তখনও দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রাত্রি গভীর হইল। পথের ধারের অন্যান্য বাড়ীর দীপশিখা একে একে নিবিয়া গেল—শ্রেষ্ঠিগৃহের নিম্নতল অন্ধকার হইল। নিমন্ত্রিতেরা একে একে বিদায় হইলেন। অংশুমান তখনও বাহির হইল না। ভৈরব অধীর হইয়া রাজপথের উপর ঘুরিতে লাগিল। তখনও শ্রেষ্ঠিগৃহের তেতলার একটা ঘরে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। ভৈরব সেই আলোকের দিকে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে হঠাৎ দেখিল, সেই কক্ষের দ্বারের নিকট অংশু-মান ও এষা। ভৈরব এষাকে চিনিত না বটে, কিন্তু তাহাকে সে অনেকদিনই শ্রেষ্ঠিগৃহে দেখিয়াছে। অংশুমান ও এষা সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া চাতালে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে যে কি কথা হইতেছিল ভৈরব তাহা শুনিতে পাইল না বটে, কিন্তু তাহার অন্তরটা সহসা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার অপরিপুষ্ট দেহের মত অপরিপুষ্ট হৃদয় যে কিছুতেই সাড়া দিত না তাহা ত নয়! তাহার শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল, বিধাতার বিচার নিরপেক্ষ নয়! প্রেম ও রূপ বুঝি শুধু পরেরই জন্য—ভৈরবের জন্য তাহার কণিকাও নাই। তাহার নিজের জীবন রহিয়া গেল একটা শুষ্ক দগ্ধ মরুভূমি!

রাত্রি যখন আরও গভীর হইল তখন ভৈরব দেখিল, একটী ভৃত্য অংশুমানের সুসজ্জিত অশ্ব আনিল এবং পরক্ষণেই অংশুমান ঘোড়ায় উঠিয়া পথের মোড় ফিরিল। ভৈরব সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল। ডাকিল—"গণপতি! কথা আছে।"

অংশুমান থামিল। নিতান্ত অবজ্ঞার কণ্ঠে ভৈরবকে সম্বোধন করিল। ভৈরব সে কথা শুনিল, কি শুনিতে পাইল না, তাহা শুধু সেই বলিতে পারে। সে কহিল. "আমার সঙ্গে দেউলে আসুন। একজন সেখানে আপনাকে কি বল্‌তে চায়।" ঘোড়াটা দুই এক পা চলিতেছে দেখিয়া ভৈরব বল্গাটা ধরিল।

নিতান্ত অশিষ্ট ভাবে ভৈরবকে গালি দিয়া অংশুমান বলিল, "কে রে তুই আমার ঘোড়া ধরেছিস্? কোথায় যেন তোকে দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে।"

বধির ভৈরব কহিল, "কে কথা কইতে চায়, তা-ই জিজ্ঞাসা করছেন?" রোষদীপ্ত কণ্ঠে অংশুমান বলিল—"তোর কথা জিজ্ঞাসা করছি! ছেড়ে দে ঘোড়া! নিশ্চয় ব্যাটার মনে কি একটা আছে!"

ভৈরব এতক্ষণ বল্গাটাই ধরিয়াছিল, এইবার টানিয়া ঘোড়ার মুখটা ফিরাইল। ব্যগ্র হইয়া কহিল, "আসুন গণপতি, আসুন। একজন স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

ভৈরব একটু থামিল এবং পরক্ষণেই গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "সে আপনাকে ভালবাসে।"

অংশুমান তিক্ত কণ্ঠে কহিল, "তবে রে ব্যাটা! পথে ঘাটে যে মেয়েমানুষ আমায় ভালবাসবে, আমি কি তারই পেছনে ছুটবো? যা' যা'—বলগে তাকে, আমার আর ভালবাসায় কায নেই। আমি এখন বিয়ের বর।"

ভৈরব এ কথা না শুনিয়া কলের পুতুলের মত পূর্ব্ববৎ বলিল, "আসুন আসুন গণপতি। সে স্ত্রীলোক আর কেউ নয়, এ সহরের বেদেনী—যে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতো। সে বলেছে, আপনিও তাকে ভালবাসেন।"

বেদেনীর নাম শুনিবামাত্র অংশুমান অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। সে জানিত এষা তখনও তেতলার চাতালের উপর দাঁড়াইয়া আছে। সে শুনিল না ত? কোথা হইতে এই আপদটা আসিয়া জুটিল!

অংশুমান অত্যন্ত রূঢ়কণ্ঠে কহিল—"কি বল্লি রে ব্যাটা? একটা বেদেনীকে ভালবাসে গণপতি অংশুমান? সে-ত কবে ম'রে ভূত হয়েছে। তুইও কি যমালয় থেকে আসছিস নাকি?"

ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া দিয়া ভৈরব আবার বলিল—"এই পথ—এই পথ—আসুন, আসুন। সে যে সকাল থেকে ব'সে আছে আপনারই জন্যে।"

"আবার—আবার সেই পেত্নীটার কথা!" অংশুমান সজোরে ভৈরবের মুখের উপর পদাঘাত করিল।

ভৈরবের চোখ দুইটী অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল। সে একবার দাঁতে দাঁত ঘষিল। তার পর তাহার মুষ্টি বদ্ধ হইল। ইচ্ছা হইল, এক আঘাতে অংশুমানকে ধরাশায়ী করে!

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া ভৈরব কহিল, "গণপতি, আপনিই সুখী। সে যে আপনাকেই ভালবাসে।"

ভৈরবের বুক ভাঙ্গিয়া একটা প্রবল ঝড় যেন বাহিরে আসিল। ঘোড়ার মুখ ছাড়িয়া দিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল। অংশুমান বেগে অশ্ব চালাইয়া অন্ধকারে মিলিয়া গেল।

ভৈরব যখন ধীরপদে দেবদেউলে ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল পান্না পূর্ব্ববৎ একই স্থানে বসিয়া আছে। ভৈরবের পদশব্দ শুনিয়াই পান্না তাহার দিকে ছুটিয়া গেল এবং পরক্ষণেই বজ্রাহতের মত দাঁড়াইল। পান্না দেখিল, ভৈরব একা ফিরিয়াছে!

আবেগহীন কণ্ঠে ভৈরব বলিল, "তাকে পেলাম না!"

রুষ্ট ও উত্তেজিত কণ্ঠে পান্না বলিল, "সারা রাত কেন তার জন্যে ব'সে থাকলে না?"

ভৈরব বুঝিতে পারিল যে পান্না অত্যন্ত রাগ করিয়াছে, হৃদয়ে বড় কঠিন আঘাত পাইয়াছে ও তাহাকেই তিরস্কার করিতেছে। সে অবনত মস্তকে পূর্ব্ববৎ কহিল, "এইবার যে দিন ডাকতে যাব, সে দিন সারারাতই বসে থাকবো।"

অত্যন্ত তীব্র কণ্ঠে পান্না বলিল, "যাও—দূর হও এখান থেকে।" ছিন্ন হৃদয়ে ফিরিয়া যাইতে যাইতে ভৈরব ভাবিল, বেদেনী তাহাকে তিরস্কার করে করুক—তাহাকে যদি আর সম্মুখে আসিতেই না দেয়, সে-ও ভাল। তবুও একথা তাহাকে জানিতে দিবে না যে গণপতি পান্নাকে ঘৃণা করে—ভালবাসে না।

ভৈরব স্থির করিল, নিজেই সকল দুঃখ সহিবে তবুও সত্য কথা বলিয়া পান্নার দুঃখের কারণ হইবে না।

সেই রাত্রি হইতে বেদেনী আর ভৈরবকে বড় একটা দেখিতে পাইত না। কখন-কখনও পান্না লক্ষ্য করিত যে কোনও একটা চৈত্য-চূড়া হইতে, কিংবা কোনও একটা কুলুঙ্গীর অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরমূর্ত্তি মাজিতে মাজিতে ভৈরব একদৃষ্টে তাহার দিকেই চাহিয়া আছে। ভৈরবের সে দৃষ্টি বিষাদ মাখা। যখনই ভৈরব বুঝিতে পারিত, সে যে লুকাইয়া পান্নাকে দেখিতেছে ইহা পান্না বুঝিতে পারিল, তখনই ভৈরব চকিতে অদৃশ্য হইত। ভৈরবকে দেখিতে পাইত না বলিয়া যে পান্নার এতটুকুও দুঃখ কোনও দিন হইয়াছে, তাহা নহে। ভৈরব তাহার বিকট মুখ ও কদাকার দেহ লইয়া যে তাহার সম্মুখে আসিত না, পান্না সে জন্য মনে মনে স্বস্তিই অনুভব করিত।

পান্না ভৈরবকে দেখিতে পাইত না বটে, কিন্তু ইহা সে দেখিত যে, কে যেন তখনও তাহার জন্য খাদ্য ও পানীয় আনিতেছে—তাহার শয্যায় পার্শ্বে রাশি রাশি পুষ্প

রাখিতেছে। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার জন্য তাহার যাহা-কিছু প্রয়োজন, প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই পান্না দেখিত যে তাহার কোথাও কোনও অভাব নাই। পান্না যে প্রকোষ্ঠে থাকিত তাহারই নিকটে একটী বিকটাকার যক্ষের মূর্ত্তি ছিল। শয্যায় শয়ন করিয়া চক্ষু চাহিলেই পান্না সেই মুখ দেখিত এবং এক একদিন ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। একদিন কথা প্রসঙ্গে ভৈরবকে সেকথা সে বলিয়াছিল। পরদিন পান্না দেখিল যে যক্ষের দেহ হইতে মাথাটী কে যেন ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, পান্নার চিন্তা তখন শুধু অংশুমানকে বেড়িয়াই ঘুরিত, এ সকল দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর এবং ইচ্ছা কিছুই তাহার ছিল না।

ভৈরবকে কিছুদিন দেখিতে না পাইয়া পান্না মনে করিল, সে হয়ত দেব দেউল ছাড়িয়াই গিয়াছে। কিন্তু সেই দিনই গভীর রাত্রে সহসা নিদ্রাভঙ্গের পর পান্না শুনিতে পাইল, প্রকোষ্ঠের বাহিরে ঝড়ের মত কে যেন শ্বাস ত্যাগ করিতেছে। ভীত হইয়া সে উঠিয়া বসিল এবং উঁকি দিয়া মৃদু চন্দ্রালোকে দেখিল, কক্ষের মুক্ত-দ্বারের অনতিদূরে অনাবৃত প্রস্তরের উপর পড়িয়া ভৈরব নিদ্রা যাইতেছে।

দেব দেউলে ভৈরব যে দিন পান্নাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল তাহার পর হইতে মোহান্ত শতমন্যুকে কেহ আর বড় বেশী দেখিতে পাইত না। নিজের অন্ধকারপ্রায় গুপ্ত সাধনকক্ষে বসিয়া সে যে কি করিত তাহা কেহই জানিত না। সে-ত ধরিয়াই লইয়া-ছিল যে বেদেনীর ফাঁসি হইয়াছে—বেদেনীর প্রেতাত্মাকেও ত সে ফাঁসির রাত্রিতে দেউলের চত্বরে দেখিয়াছিল। কাযেই বেদেনীর জন্য যতদূর মর্ম্মব্যথা ভোগ করা সম্ভব কিছুদিন ধরিয়া তাহা সে করিল। মানুষের মন এমনি যে হত আশার ব্যথার একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা পর্য্যন্তই সে মনে ধারণ করিতে পারে। সেই মাত্রা অতিক্রম করিয়া যে ব্যথা আসে, মনুষ্য হৃদয় তাহাতে আর মথিত হয় না। উহা যেন একখানা স্পঞ্জ। উহা সম্পূর্ণ রূপে ভিজিয়া উঠিলে, চোখের জলের সমুদ্রও যদি উহার উপর দিয়া বহিয়া যায়, স্পঞ্জ তাহার এক বিন্দুও আর লয় না।

পান্না যখন মরিল তখনই শতমন্যুর সেই স্পঞ্জ খানা সম্পূর্ণই সিক্ত হইয়া গেল। সে মনে করিল, পান্নাই যদি মরিল তবে তাহারই বা বাঁচিয়া থাকিবার আর প্রয়োজন কি? সে যদি তখন জানিত যে পান্না মরে নাই এবং অংশুমানও বাঁচিয়া আছে তাহা হইলেই তাহার মনঃ-পীড়ার আর অন্ত থাকিত না। তখনই আবার নূতন করিয়া মোহান্তের সেই জীবন আরম্ভ হইত যাহা অসহ বেদনায় কাতর। তেমন নূতন জীবনের কামনা শতমন্যু কখনও করে নাই—কেহই কি করে? কিন্তু উহাই তাহার ফিরিয়া আসিল। একদিন সে বুঝিতে পারিল যে ভৈরবই পান্নাকে রক্ষা করিয়া দেবদেউলে রাখিয়াছে! ভৈরব? যে ভৈরবকে সে শিশুকাল হইতে তিলে তিলে মানুষ করিয়াছে, যাহার মুখে সে ভাষা আনিয়া দিয়াছে, সেই ভৈরব শেষে মৃত্যুর গ্রাস হইতে পান্নাকে বাঁচাইল এবং শতমন্যু যে দেউলের মোহান্ত সেই দেউলেই তাহাকে আশ্রয় দিল—আর অংশুমান এখনো বাঁচিয়াই আছে! ভৈরবের উপর শতমন্যুর অত্যন্ত ক্রোধ হইল। কি যে করিবে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া শতমন্যু সেই দিনই তাহার সাধনকক্ষে নিজেকে বন্দী করিল এবং অনেকদিন পর্য্যন্ত কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না—দেবব্রত নয়, নগরপাল নাগার্জ্জুন নয়—কেহই নয়। সকলে মনে করিল শতমন্যুর বোধ হয় পীড়া হইয়া থাকিবে। সত্যই সে পীড়িতই হইয়াছিল।

দিনের পর দিন শতমন্যু তাহার কক্ষের উচ্চ জানালা-টায় মুখ দিয়া রহিল এবং দেউলের চাতালের উপর পান্নাকে দেখিতে লাগিল। কোন্ মুহূর্ত্তে পান্না সেখানে আসিয়া আবার তখনই চলিয়া যাইবে তাহাও শতমন্যু অনুমান করিতে পারিত না—কাযেই দিনের একটা মুহূর্ত্তও সে নষ্ট হইতে দিত না। ক্রমে শতমন্যু দেখিল, ভৈরব পান্নার সম্মুখে দাঁড়ায় যেন তাহার ক্রীতদাস, সে এমন ভাব দেখায় যেন তাহার অন্তর পান্নার জন্য কোম-লতায় পরিপূর্ণ। একদিন শতমন্যুর মনে হইল, ভৈরব যেন অত্যন্ত অনুরাগের দৃষ্টিতে পান্নার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। শতমন্যুর হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য নয়—সর্ব্বক্ষণের জন্য। ঈর্ষা যাহার হৃদয়ে, স্মৃতিই যে তাহার প্রধান পীড়ক!

শতমন্যু বার বার ভাবিতে লাগিল, কেন ভৈরব

এমন সময় মেঘমুক্ত চন্দ্রের তীব্র আলোকে সেই বারান্দাটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই উজ্জ্বল আলোকে ভৈরব দেখিল, এ যে তাহারই প্রভু শতমন্যু!

ভৈরব শতমন্যুকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

পান্না দেখিল, সবই সহসা ওলট পালট হইয়া গেল। কোথায় শতমন্যু ভৈরবের পায়ের উপর পড়িবে, না ভৈরবই শতমন্যুর পদলগ্ন হইল। মুখের শিকার কাড়িয়া লইলে বাঘ যেমন করে, শতমন্যুর অবস্থাও তখন ঠিক তেমনি হইয়াছিল। রোষে ভৈরবকে পদাঘাত করিয়া শতমন্যু কহিল—"যাও—পথ ছাড়!"

বধির ভৈরব অবনত বদনে মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া রহিল এবং পরক্ষণেই পান্নার প্রকোষ্ঠের দ্বারে জানু পাতিয়া বসিয়া গম্ভীর ও দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—

"আপনার যা' খুসি তা করবেন—আগে আমায় এই খানে বধ করুন।"

ভৈরব নিজ হস্তের ধারালো ছোরা খানা শতমন্যুর পদনিম্নে ফেলিয়া দিল। শতমন্যুর তখন আর হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। কাম তখন মোহান্তকে রাক্ষস করিয়াছিল। ছোরা খানা তুলিয়া লইবার জন্য মোহান্ত হাত বাড়াইতেছে দেখিয়া পান্না বাজের মত ছোঁ দিয়া উহা তুলিয়া লইল এবং প্রেতিনীর মত হি হি করিয়া হাসিয়া কহিল- "এ-সো!"

এ কি ভীষণা মূর্ত্তি! এই কি সেই নৃত্যশীলা পান্না! শতমন্যু সেই রণচণ্ডীর মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইল, বিহ্বল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বেদেনী বলিল—"জানি ভীরু, এখন এগুতে তোমার সাহস নেই।" অতি তীক্ষ্ণ অতি নিষ্ঠুর অতিশয় তীব্র বিষমাখা কণ্ঠে সে চীৎকার করিয়া কহিল—"শোন মোহান্ত! প্রিয়তম অংশুমান এর দণ্ড তোমায় দেবেই দেবে। ভেবো না যে সে মরেছে। সে বেঁচেই আছে এই তাম্রলিপ্তে।"

এই সময়ে অংশুমানের নাম! মোহান্তের হৃদয়ে যেন একটা অগ্নিশল্য বিঁধিল। ভৈরবকে ক্রোধে আর একটা পদাঘাত করিয়া মোহান্ত রোষকম্পিত দেহে নীচে নামিয়া গেল।

মেঝের উপর হইতে বাঁশীটা তুলিয়া লইয়া ভৈরব আবার পান্নার হাতে দিয়া বলিল, "আমি ঘণ্টাঘরে ছিলাম, তাই আগে শুনতে পাইনি। আর আমি অতদূরে থাকবো না। বাঁশীটা বাজলেই ছুটে আসবো তোমার কাছে। ভয় কি?"

বলিয়া ভৈরব ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

সাধনকক্ষে প্রবেশ করিতে করিতে মোহান্ত শতমন্যু বলিতে লাগিল - "কখনো না—কখনো না। বেদেনীকে আমি কারো হাতেই দিতে পারবো না। ভৈরবকে নয়—অংশুমানকেও নয়!"

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

বাঁশীর সুর

চাঁদের আলোয় মাঠের পথে কে যেন আজ বাজায় বাঁশী,
বদ্ধ ঘরের বাঁধন টুটে বেরিয়ে আসে মন উদাসী।
সেই বাঁশীরই পরশ নিয়ে বাতাস আসে দুয়ার দিয়ে,
আলোর মাঝে আপন-হারা সুরের লহর বেড়ায় ভাসি।

নিথর রাতে ঝাউএর শাখা আপন মনে উঠছে দুলে,
মেঘের ভেলা পথ হারিয়ে জমছে এসে গগন কূলে।
দিগ্‌বধূদের ঘোমটাগুলি, সুরের মোহে যাচ্ছে খুলি,
ফুলের কলি চমক লেগে চোখ মেলে চায় মনের ভুলে।

রাত বেড়ে যায়—আধখানা চাঁদ পড়ছে ঢ'লে যাত্রা শেষে,
বেলার বুকে ঢেউগুলি সব আছ্‌ড়ে পড়ে তন্দ্রাবেশে।
দুয়ার বেঁধে আঁধার ঘরে ঘুমায় সবাই অকাতরে,
বাঁশীর ধ্বনি নিদ্রাবিহীন আমার কাণেই লাগছে এসে।

অচেনা তার নাম জানিনে, তবু তারি বাঁশীর স্বরে
এই নিরালায় একলা বসে প্রাণ যে আমার কেমন করে!
সে বুঝি মোর মরমবাণী, সুরের ঘোরে বাইরে টানি'
বিশ্বমাঝে ছড়িয়ে দিলে আজকে রাতের দ্বিপ্রহরে।

শ্রীসতীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থ-সমালোচনা

রামায়ণের কথা ও অন্য-পূর্ব্বা বিবাহ

মহারাজকুমার শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রণীত, মূল্য ১৲

এই পুস্তকখানি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে রামায়ণের কথা ও দ্বিতীয় অংশে অন্য-পূর্ব্বা বিবাহ আলোচিত হইয়াছে। অন্যপূর্ব্বা বিবাহ ও বিধবা বিবাহ তুল্যার্থবোধক। এই পুস্তক পাঠে দেখা যায় যে গ্রন্থকার মহাশয় আলোচ্য বিষয় দুইটী সম্বন্ধে অনেক অনুশীলন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বক্তব্য বিষয় এরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে অনেক স্থলে তাঁহার অভিপ্রায় পরিস্ফুট হয়; এবং এই মন্তব্য পুস্তকের প্রথমাংশের প্রতিই সমধিক প্রযোজ্য। 'রামায়ণের কথা' অংশে 'বাল্মীকি ও ব্যাস' নামক এক অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে লেখক মহাশয় যে প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন, সেই প্রশ্নের কোনও মীমাংসা এ অধ্যায়ে দেখিতে পাইলাম না। 'অন্যপূর্ব্বা বিবাহ' অংশে বিধবা-বিবাহ সমর্থিত হইয়াছে। এই সমর্থনে অনেক শাস্ত্রীয় মতের অবতারণা করা হইয়াছে। বোধ হয় যে লেখক মহাশয় চেষ্টা করিলে তাঁহার বক্তব্য বিষয় অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যক্ত করিতে পারিতেন। লেখক মহাশয় আশ্বলায়ন গৃহ্য-সূত্রের ব্যাখ্যাতে বলিয়াছেন যে সূত্রকারের মতে শিল্প ও বৃদ্ধদাস পতিস্থানীয়। দেবর এখনও অনেক সমাজে পতিস্থানীয়, কিন্তু শিল্প বা বৃদ্ধদাস পতিস্থানীয় ইহার সমর্থনে লেখক মহাশয় কোনও দৃষ্টান্ত দেখান নাই। এই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে atavism অবতার-ইজম্। অর্থ বুঝিতে পারা গেল না। এই গ্রন্থে প্রকাশিত চিত্রের আলোচনাতে লেখক মহাশয়ের রুচির বিশেষ প্রশংসা করিতে পারা যায় না।

কলির কীর্ত্তি

"আদি আশ্রম" হইতে শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য।৹

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে বর্ত্তমান সমাজের কয়েকটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

মুখে লোকে দেশ-উদ্ধারের কথা বলে বটে, কিন্তু তাহার স্বদেশের নীতি ও আচার ছাড়িয়া, পরদেশের চাক্‌চিক্যে ভুলিয়া তাহারই অনুকরণ করিতেছে। বিদেশী-পদ্ধতি সংস্কারগত থাকায়, লোকে স্বদেশের সংস্কার করিতে চায়। দেশমাতাকে বিদেশী ভাবে দীক্ষিত করাই তাহাদের আসল উদ্দেশ্য।

আত্মার শাসনে না থাকিয়া, জীব ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পড়িয়াছে। শস্যশ্যামলা ভূমিকে সে মাতা বলিতেছে, কিন্তু প্রকৃত মাতার কোন সন্ধান রাখে না। চরকা কাটিয়া বিদেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া দেশকে স্বাধীন করিতে চাহিতেছে। ধর্ম্মঘট করাইয়া শ্রমিকদিগের বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে। ফল এই হইতেছে যে, কৃষকগণ কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া, চরকা কাটা ছাড়িয়া, অর্থলোভে কলকারখানার কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। অর্থ দেশীয় ধন নহে, উহা বিদেশীয় কৃত্রিম উপায় মাত্র। উহাতে দেশে খাদ্যাভাব থাকিয়াই যাইবে। এ দেশের প্রকৃত অর্থ হইতেছে শস্যাদি-রূপ ধন। তদ্রূপ অর্থ সংগ্রহেই দেশ পুষ্ট হইবে। শস্যাদির উৎপত্তি বিষয়ে যত্ন লইলেই দেশের মঙ্গল হইবে, চরকায় বা ধর্ম্মঘটে নহে।

বর্ত্তমান যুগে লোকে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটা সঙ্কীর্ণ মনের সৃষ্টি; এ প্রথার উচ্ছেদ করিয়া না দিলে, সকলের একতা সাধন হইতে পারে না। সঙ্কীর্ণ মনে কুলবধূগণকে গৃহমধ্যে লুকাইয়া রাখিবারই বা প্রয়োজন কি? উহা উদার ভাবের লক্ষণ নহে। বিবাহ প্রথাটাও নিন্দনীয় ব্যবস্থা। যদি বা উহা রাখিতে হয়, অসবর্ণ বিবাহ পক্ষে বাধা ঘুচাইয়া দেও। আবার, মঠ স্থাপন করতঃ নরনারী সকলকে একত্র রাখিয়া, পরস্পর অভিজ্ঞতা লাভ দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও।—এই প্রকারে গ্রন্থকার বর্ত্তমান যুগের অনেক আন্দোলনের উপরে কটাক্ষ করিয়া সেগুলির নিন্দা ও অসারতা দেখাইয়া দিয়া, শাস্ত্রানুসারে নিষ্কাম ধর্ম্মশিক্ষা করতঃ, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের ব্যবস্থা দিয়া, মুক্তাবস্থায় সর্ব্বকর্ম্ম করণের উপদেশ দিয়াছেন। কন্যার বিবাহের বয়স ১০ হইতে ১২ বৎসর বয়সের মধ্যে দেওয়াই শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়াছেন। পরাশর স্মৃতি অবলম্বনে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও স্থলবিশেষে পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থাও দিয়াছেন।

এই প্রকারে সমাজের নানাদিকের উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, ঐ সকল উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা যে বঙ্গীয় সমাজ অধঃ-পতনের দিকেই চলিয়াছে, গ্রন্থকারের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। কি করিলে এই উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারিত হইতে পারে, তাহারও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কামাদি রিপুর সংসর্গে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি থাকে; কিন্তু আর এক প্রকার দৃষ্টি আছে, যাহা রিপু-সংস্পর্শে থাকিয়া নয়, পরন্তু "প্রাণ" সম্পর্কে থাকিয়া। ইহাকেই স্বাধীনভাবে কার্য্য করা বলে; পর-বশে নহে। প্রাণ হইতেই দেহাদি জগতের সৃষ্টি হইয়াছে; প্রাণ হইতে মনেরও উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং প্রাণই মনের স্বীয় বা আত্মীয়। কিন্তু মন রিপুবশে গিয়া, আত্মীয়কে ছাড়িয়া, দেহে বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়বশে কার্য্য করিতেছে,—ইহাই পরাধীনতা। কামনার প্রকোপ নিবা-

রণের জন্ত কামিনী, কাঞ্চন, ধন-মান প্রভৃতি বহু সংগ্রহের আবশ্যক হয়; অভাব বোধ আছে বলিয়াই বহু ভাবের জন্ত চেষ্টা হয়। কিন্তু কামনা বর্জ্জন করিয়া, ভাবময় পুরুষ সংযোগে যে ভাবের উৎপত্তি হয়, তদ্দ্বারা সর্ব্বত্র আত্মদর্শন হয়; তখন কামমূর্ত্তির অদর্শন হয় বলিয়া, কামিনী কাঞ্চনাদি লোষ্ট্রবৎ পরিত্যজ্য হয়। তখনই প্রকৃত "কিসের দৈন্ত, কিসের ক্লেশ"—যাহা জাতীয় সঙ্গীতে কথিত হয়, সেই ভাব তখনই প্রকৃত প্রত্যক্ষ হয়। আত্মৈশ্বর্য্য ছাড়া, তখন আর অন্ত ঐশ্বর্য্যের প্রয়াস থাকে না। তখন অপর কাহারও সহিত "অসহযোগিতা"র প্রয়োজন হয় না।

ত্রিবেণী

উপন্তাস। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত। প্রকাশক:—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ৩৲

উপন্তাসখানি দীর্ঘ, পাঁচ শত একত্রিশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মহীপাল ও কামপালের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া লেখিকা এই উপন্তাস রচনা করিয়াছেন। ভূমিকায় নানা ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা করা হইয়াছে। আমরা উপন্তাসকে ইতিহাস বলিতে চাই না, সেই জন্ত ভূমিকায় এই দীর্ঘ ঐতিহাসিক গবেষণা আমরা অনাবশ্যক মনে করি।

গৌড়ের পুরাতন কথা লইয়া লেখিকা একটি রোমান্স রচনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে রোমান্সের আড়ম্বর আছে, দীর্ঘ বক্তৃতা আছে, জমকাল পাত্রপাত্রীর বর্ণনাও আছে। উপন্তাস রচনার আধুনিক পদ্ধতি লেখিকা অবলম্বন করেন নাই। মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তায় যে আধুনিকতার আভাস আছে তাহা বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত সুসঙ্গত হয় নাই। বাস্তব নিখুঁত চিত্র এখানে নাই—চরিত্র চিত্রে বৈশিষ্ট্যের অভাবও লক্ষিত হয়। নিষ্প্রাণ ইতিহাসে যথাসাধ্য প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া লেখিকা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা পাঠকের চক্ষে সত্যের সজীবতা লাভ করিতে পারে নাই। তবে কল্পনার সাহায্যে পুরাতন গৌড়ের যে চিত্রটি তিনি ফুটাইয়াছেন তাহা পাঠককে কতকটা তৃপ্ত করিবে।

রচনায় আড়ম্বর খুবই বেশী, এত বেশী যে এ যুগে তাহা অচল। শব্দে, বাক্যে, বর্ণনায় এই আড়ম্বর পাঠকের মনে বিতৃষ্ণা আনিয়া দেয়। ঘটনার সমাবেশেও আমরা নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই না।

ভাষা অনেক স্থলে দুষ্ট—সর্ব্বত্র অর্থ বুঝিয়া ওঠাও দুষ্কর। লেখিকা অনেক বাজে কথা বলিয়াছেন, যাহা বাদ দিলে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বাড়িয়া উঠিত। যাঁহারা কাল্পনিক চিত্র ও সেকালের রাজারাজড়াদের বর্ণনা ও গালভরা বক্তৃতা ভালবাসেন তাঁহারা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়াপাত অনেক স্থলে ঘটিয়াছে দেখিয়া সুখী হইতে পারেন। আমরা কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তৃপ্ত হই নাই।

গ্রন্থের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই মন্দ নয়।

বিবেকানন্দ তত্ত্ব

প্রণেতা, শ্রীসাহাজী। প্রকাশক—শ্রীকালিপদ বসাক, বঙ্গীয় তিলিসমাজ পত্রিকালয়, নয়াবাজার, দিনাজপুর, মূল্য ৵৹

প্রবন্ধটি পূর্ব্বে অর্চ্চনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক বিবেকানন্দের মতাদি তাঁহারই ভাষায় প্রকাশ করিলে ভাল হইত। যাই হোক্ বিবেকানন্দ তত্ত্ব—যাহা বুঝিবার শক্তি লেখকের মতে ভারতবাসীর এখনও হয় নাই—তাহা এত অল্প কথায় বর্ণিত হইতে পারে এ ধারণা আমাদের কখনও ছিল না এবং এখনও নাই।

এই প্রবন্ধটির পর আরও একটি রচনা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার নাম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। কতকগুলি আধুনিক সমস্যার উল্লেখ করিয়া লেখক পাঠককে কিছু ভাবাইতে চান। উদ্দেশ্য সাধনের উপায় কিন্তু অকিঞ্চিৎকর। এ প্রবন্ধটিও সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। তারপর লেখকের যুক্তিও সর্ব্বত্র আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না। History repeats itself কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। তবে বিংশ শতাব্দীর ভাব ও মতবাদ দিয়া ত্রেতাযুগের সব ঘটনা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে এরূপ ধারণা পোষণ করিতে আমরা অক্ষম।

আবর্জ্জনা

শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবনোয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসনা থিয়েটার হল, বাজে শিবপুর, হাওড়া। মূল্য ।৹

প্রায় পঞ্চাশটি ছোট কবিতা এই গ্রন্থে সংগ্রহীত হইয়াছে। নূতন কবির রচনা। গোড়াতেই তিনি যে নমুনা দিয়াছেন, আশা হয় পরে তাহা আরও সুন্দর পরিণতি লাভ করিবে। কাব্য-জগতে কবির অবস্থা ও তাঁহার ভাব ও ভাষার নমুনা পাঠকগণ নিম্নোদ্ধৃত রচনা হইতে কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন—

শারদ প্রাতের আলো নয়নে লাগিল ভালো
　　মধুর লাগিল প্রাণে মেঘেরো গর্জ্জন
মরু মরীচিকা খেলা, কাননে তরুর মেলা
　　সকলি রচেছে যেন ধরায় নন্দন।
কে তুমি মাধুরী রাণী, পরিচয় নাহি জানি
　　তব কৃপা পরশনে নবীন জীবন,
ব্যাকুলিত, দিশাহারা, পরাণ পাগল পারা
　　খুঁজিছে তোমায় সারা ভুবন গগন
　　পরি তব অমিয় অঞ্জন।

বাংলার নট

শ্রীপ্রসন্নকুমার মিত্র প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবনোয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২ নং পার্কস্ গার্ডেন লেন, হাওড়া। মূল্য

বঙ্গীয় নট সম্প্রদায়ের দোষ-গুণ নির্দ্দেশ করিয়া কবি ছড়ার ধরণে এই কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভাষা ও বর্ণন ভঙ্গী

কতকটা 'সেকেলে' হইলেও রচনা সরস। নট সম্প্রদায় কোন্ কোন্ দোষ পরিত্যাগ করিলে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন তাহাও লেখক সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আলোচনাটি নূতন। গ্রাম্যতা দোষ মাঝে মাঝে আছে। তবে পড়িতে বসিয়া পাঠক যে কিছুক্ষণের জন্য নির্দোষ আনন্দ উপভোগ করিবেন তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

যাযাবর

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅভয়হরি শ্রীমানী, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ১৷৹

গ্রন্থখানি উপন্যাসের আকারে রচিত। গ্রন্থের নায়ক উত্তম পুরুষ হইয়া গল্প বলিতেছেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া তিনি নর বিশেষতঃ নারীর জীবনে যে ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই বক্তাকেই উদ্দেশ করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন "যাযাবর"। যাযাবরের কথা অনেক স্থলে সরস, কবিত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক। বর্ণনায় স্থানে স্থানে নিপুণতা আছে, স্থানে স্থানে একটা দার্শনিকতার আভাসেরও অভাব নাই।

গ্রন্থকার ভাবুক। যে ভাবুকতা গঠন কার্য্যে সহায়তা করে, যাহা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও কর্ম্মশক্তিতে অনুপ্রাণিত, তাহার অস্তিত্ব আমরা এখানে দেখিতে পাই না। তবে যাহা দুইচারিটা সামাজিক ও নৈতিক গলদকে দেখাইয়া দেয় ও তাহাদের প্রতি সামান্য ইঙ্গিত করিয়াই স্বকার্য্য শেষ করে, তাহারাই উদাহরণ এ স্থলে অধিক। গ্রন্থের মাধুর্য্য অংশগত, সমগ্রের রচনা ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিন্তারাজ্যে আজকাল একটা বিপ্লব দেখা দিয়াছে। দেশ-বিদেশের সামান্য ইতিহাস আলোচনা করিলেই দুই চারিটি নূতন ভাব সহজেই সংগ্রহ করা যায়। যাঁহারা মৌলিক গবেষণার ধার ধারেন না, তাঁহারা তাঁহাদের রচনায় নূতনত্ব দেখাইবার জন্য এই সব ভাব অনুসরণ করেন। গ্রন্থের মধ্যে সমাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা মনোজ্ঞ হয় নাই।

তারপর, ইঙ্গিতগুলি প্রায়ই অস্পষ্ট, লেখক এত সংক্ষেপে কথা কহিতে চান্ যে তাহা সর্ব্বত্র বোধগম্য হয় না। বইখানি পড়িতে পড়িতে বড়ই একঘেয়ে ও অর্থহীন মনে হয়। পাঠকদের জন্য কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করিলাম—

১। মাটির কানায় কানায় সৃষ্টির বেদনা সেখানে নিস্পন্দ হইয়া গেছে।

২। উচ্চ ভূমির অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দেখি, অনন্ত ধরণীর শিয়রে মিশিয়াছে অনাদি আকাশ। রূপ আর অরূপের এই চুম্বনে তারাগুলি পর্য্যন্ত রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। অন্ধকার আভা আলোকের ভূকায় থর্ থর্ করে।

কবিত্ব ও দার্শনিকতার এইরূপ উৎকট অভিনয় না করিয়া লেখক সরল শ্রদ্ধার সহিত সাহিত্য রচনা করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সকলেই বঙ্কিমবাবু বা রবিবাবু হইতে পারেন না। সাহিত্যে নূতন কিছু একটা সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য যাঁহার নাই, তিনি তাহা লাভের জন্য সাধনা করুন। বিনা চেষ্টায় বিনা পরিশ্রমে শুধু একটা আত্মগরিমার বশবর্ত্তী হইয়া কবিত্ব ও দার্শনিকতার অভিনয় করিতে গেলে আত্মতৃপ্তি হইতে পারে, চাটুকার বন্ধুবর্গের হাততালিও হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু পাঠকের শ্রদ্ধা মোটেই লাভ করা যায় না।

এই গ্রন্থ রচনায়, বাক্যে ভঙ্গীতে ও বর্ণনায় যে প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হেয়, এবং তাহার লীলাস্থল সাহিত্য ক্ষেত্র না হইলেই ভাল হয়।

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন কর্ত্তৃক সুদীর্ঘ ভূমিকা, পূজারী গোস্বামীর টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদিত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩৷১৷১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। আকার ষোলপেজি ২৯২ পৃষ্ঠা ; এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা ও কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲

গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে সুদক্ষ শিল্পী মনীষী দে অঙ্কিত একটি রেখা-চিত্র। চিত্রের বিষয় জয়দেব গোস্বামীর ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণ - 'দেহি পদ পল্লব মুদারম্' এই বাক্যাংশ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। চিত্রখানি কি ভাব, কি বিষয় নির্ব্বাচন, কি অঙ্কন কৌশল সর্ব্ববিষয়েই চিত্রকরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। তাহার পরই উৎসর্গ পত্র। বহিখানি মধ্য ভারতের ছত্রপুরাধিপতির নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। তাঁহারই আনুকূল্যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত, ইহা এক দিকে যেমন তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে, অপর দিকে তেমনি বীরভূমবাসী ধনী ব্যক্তিগণের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। এ কলঙ্ক দুরপনেয়। বীরভূমের একজন দরিদ্র সন্তান, বীরভূমের জগদ্বিখ্যাত দে'বাপম মনস্বী সন্তানের উদ্দেশে যে বিপুল আয়োজন সহকারে স্মৃতিতর্পণের ব্যবস্থা করিয়া-ছেন, তাঁহার এই গৌরবাত্মক সুপবিত্র অনুষ্ঠানে বীরভূমবাসী কোন ধনী সন্তান তাঁহার সহায়তা কল্পে অগ্রসর হইলেন না, ইহা স্মরণ করিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।

বীরভূমের অমর কবি, জগতের বরেণ্য কবি জয়দেব গোস্বামী রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের আজ পর্য্যন্ত বহুবিধ সংস্করণ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু কোন সংস্করণে জয়দেব গোস্বামী রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ বুঝিবার পক্ষে, এরূপ বিশদ ও সুদীর্ঘ পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণা মণ্ডিত ভূমিকা দেখি নাই। শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ আস্বাদন করিতে হইলে, যে ভূমিতে আসিয়া উপনীত হইতে হইবে, সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় তাহা প্রকৃষ্টরূপেই সুদৃঢ় ও সুসজ্জিত করিয়া

দিয়াছেন। এখন এই ভূমিকা অবলম্বনে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে গীত-গোবিন্দ পাঠে অগ্রসর হইলে, এই জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের প্রকৃত আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া পাঠকগণ চরিতার্থ হইবেন। ভূমিকা অংশ রচনা করিতে সম্পাদক মহাশয় যেরূপ পরিশ্রম ও একাগ্রতা সহকারে যাবতীয় গোস্বামী শাস্ত্র ও সমসাময়িক বঙ্গের ইতিহাস প্রভৃতি হইতে তথ্য নিচয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তাঁহার অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রাচুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠা পরিমাণ ভূমিকায় তিনি বীরভূমের ঐতিহাসিক তথ্য, কবি-সাময়িকী, জীবন কথা, কাব্য কথা, সর্গবন্ধ, প্রথম শ্লোক, বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস ও রাধানাম, কবি জয়দেবের বৈশিষ্ট্য, রাধা তত্ত্ব, শৃঙ্গার রস, যোগমায়া, প্রকৃতি ভাবের উপাসনা, রসোপাসনা ও পরিশিষ্ট—এই কয়টি অত্যাবশ্যক বিষয়ের সুবিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া, পাঠকগণের মূল গ্রন্থ বুঝিবার ও গ্রন্থের বর্ণিতব্য বিষয় প্রকৃষ্টরূপে ধারণা ও আস্বাদন করিবার সহায়তা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তিনি বহু অযথা নিন্দাবাদ ও প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা সম্যক্‌রূপ নিরসন করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের পরমোপকার সাধন করিয়াছেন। বঙ্গের সুধীবর্গ এই গ্রন্থের ভূমিকা পড়িয়া উপকৃত হইবেন এবং মূল গ্রন্থ আস্বাদনে প্রলুব্ধ হইবেন। সম্পাদন সাফল্যের ইহাই অভ্রান্ত নিদর্শন। অমর কবি জয়দেব রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে সুধীজন উপভোগ্য এই সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া হরেকৃষ্ট বাবু, সমগ্র বীরভূমবাসী তথা সমগ্র বঙ্গবাসীর অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল এবং টীকানুযায়ী হইয়াছে, ইহাতে অনুবাদের আড়ষ্ট ভাব নাই, পরন্তু স্বচ্ছন্দ ও সলীল গতিভঙ্গে ইহা পরম রমণীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থের বাহ্য ও আভ্যন্তর সৌন্দর্য্যে পাঠকের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে।

পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থের মূল অংশ অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে মুদ্রিত করিলে গ্রন্থসৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইবে। প্রতি সর্গের নাম গ্রন্থ-শেষে দেওয়া আছে—অনুবাদ গ্রন্থে, সর্গ শীর্ষেও এই নাম উল্লেখ প্রচলন করিলে হয় না?

আসাম প্রাদেশিক হিন্দু-সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে

সভাপতির অভিভাষণ

আমার আসাম দেশীয় প্রিয় ভ্রাতৃগণ ও মাতৃবৃন্দ! আসাম প্রদেশের দ্বিতীয় বার্ষিক হিন্দু সম্মেলনে আপনারা আমাকে সভাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া আমাকে যে অসামান্য সম্মান দান করিয়াছেন তাহাতে আমি বিশেষ গৌরব বোধ করিতেছি—এবং সেই জন্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনারা ইহা গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন।

ভারতের ইতিহাসে আসাম প্রদেশের শৌর্য্য, বীর্য্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা, ভগবদ্‌ভক্তি-প্রবণতা ও সরলতা প্রমুখ গুণরাশি সমুদ্‌ভূত কীর্ত্তি-জ্যোৎস্নায় চিরসমুজ্জ্বল কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ দেব এই আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট প্রদেশে প্রথমে জননী জঠরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি, পরম ভাগবত শ্রীশঙ্করদেব গোস্বামি-পাদ এই আসাম প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দেশে যে ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে এখনও আসামবাসিগণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশিষ্ট গৌরবাবহ স্থান অধিকার করিয়া এ প্রদেশে এখনও প্রাচীন ভাগবত ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আসামের মহাতীর্থ মহাপীঠে শ্রীশ্রীকামাখ্যা পুণীতে অনাদিকাল হইতে ভারতের সকল প্রদেশের শক্তি-সেবক অগণিত ভক্ত নরনারী নিবহ প্রতিবর্ষে দলে দলে আগমন করিয়া চিদানন্দময়ী জগজ্জননীর রাতুল পদ-পঙ্কজে রক্তচন্দন-চর্চ্চিত জপা বিল্বপত্রাঞ্জলি দান পূর্ব্বক মানবজন্মের সাফল্য বিধান করিয়া থাকে। সেই বহুতীর্থ-মণ্ডিত এই আসাম প্রদেশের দ্বিতীয় বার্ষিক হিন্দুসম্মেলনে সম্মিলিত হইয়া আমরা যে কার্য্য সাধন করিবার জন্য বদ্ধ-করিকর হইতে পারিব, তাহার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রথমেই আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি।

এ সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যাহা না করিলে চলে না, আমরা অর্থাৎ বিশাল ভারতের সমগ্র হিন্দুজাতি তাহাই করি না। শুধু তাহা নহে—আমাদের মধ্যে যদি কেহ বা কাহারা তাহা করিবার জন্য উদ্যত হয়, আমরা

তাহাতে বাধা প্রদান করিবার জন্য উদ্যত হই। আমরা বাধা প্রদান করাকেই পরম পুরুষার্থ বলিতে লজ্জাবোধ করি না। এই প্রকার বিচিত্র বিস্ময়াবহ মনোবৃত্তি পৃথিবীতে অন্য কোন সভ্য জাতির দেখিতে পাওয়া যায় না। জাতির মরণের পথকেই আজ শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দ্বারা অমৃতের সন্ধান বলিয়া অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি না। এই বিষম ভ্রান্তি যদি কেহ সাহস করিয়া দেখাইতে চাহে তাহাকে ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, কালাপাহাড় প্রভৃতি মুখরোচক গালি দেওয়াকেই আমরা হিন্দুত্বের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ঘোষণা করিতে গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

"অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।'

এই ভগবদ্ বাক্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, আজ বিশাল হিন্দু জাতিই হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহারই নাম দাসোচিত মনোবৃত্তি বা Slave mentality। এই হিন্দুর সর্ব্বনাশকারী দাসোচিত মনোবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য হিন্দু মহাসভা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই কথাই বলিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। মোটকথা এই হইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে এ সংসারে হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দুই—বাহিরের শত্রু হিন্দুর কেহ আছে বা থাকিলেও যে হিন্দুর কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে এ বিশ্বাস আমার নাই। হিন্দুর অন্তঃশত্রুই হিন্দুর ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কেন যে এ বিশ্বাস আমার বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি, আপনারা একটু ধীরতার সহিত তাহা শুনিলে আমি অনুগৃহীত হইব।

সকলেই আমরা বলিয়া থাকি যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-আচার শাস্ত্রমূলক, শাস্ত্র যাহা নিষেধ করে, বা শাস্ত্র সম্মত আচারের যাহা বিরুদ্ধ আচার, তাহা হিন্দুর পক্ষে কর্ত্তব্য নহে—তাহার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে আমাদের বৈশিষ্ট্য ঘুচিয়া যাইবে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অধঃপাতে যাইবে, ইহকালে ও পরকালে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে জাতির অস্তিত্ব ও সকল উন্নতির কারণ সঙ্ঘশক্তিকে ফিরাইয়া আনিতে এবং সমুদ্দীপিত করিতে হইলে যে সকল নূতন পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক, তাহা যাঁহারা কায়মনোবাক্যে চাহেন, তাঁহারা শাস্ত্রবিরোধী বা শাস্ত্রের উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর নহেন। প্রাচীনপন্থিগণ কিন্তু বলিয়া থাকেন যে, নূতন আচারের অঙ্গীকার সর্ব্বথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, সুতরাং তাহা সর্ব্ব প্রকারে পরিহার্য্য। এই যে পরিবর্ত্তন-বিরোধী নব্য পন্থী ও প্রাচীন পন্থীর পরস্পর মতভেদ, ইহাই হইল বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের সকল প্রকার অভ্যুদয়ের প্রতিকূল। এই মত-বৈষম্য নিরাকরণ করিতে না পারিলে আমরা সঙ্ঘশক্তি ও সংগঠনকে জাগাইতে পারিব না—ইহা প্রাচীন পন্থীও বুঝেন নব্য পন্থীও বুঝেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, যে পথে চলিলে এই সর্ব্বনাশকর মত-বৈষম্য দূর হইতে পারে, সে পথে আমরা চলিতে চাহি না, আপনার মত বজায় রাখিবার চেষ্টাকেই আমরা পৌরুষ বলিয়া বিবেচনা করি, সত্য কি তাহা বুঝিয়া, নিজমত পরিবর্ত্তন করাকে আমরা কাপুরুষতা বলিয়া বুঝিতে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতে পারি না।

ইহা সত্য সুতরাং অপরিহার্য্য, ইহা বুঝিবার ও বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার শক্তি যে জাতির লুপ্ত হয়, তাহার ধ্বংস যে অনিবার্য্য ইহা কে অস্বীকার করিবে?

হিন্দু শাস্ত্র অগাধ অতলস্পর্শ ও অপার বারিধি-কল্প। সংস্কৃত ব্যাকরণে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা ন্যায়শাস্ত্রের কিংবা স্মৃতিশাস্ত্রের খানকয়েক হাজার বৎসরের মধ্যে সমুদ্ভূত পুঁথিতে ব্যুৎপত্তি থাকিলেই যে হিন্দুর সেই শাস্ত্রবারিধির পার লাভে কেহ সমর্থ হয়, এ বিশ্বাস যাঁহার এখনও মনে আছে, তিনি হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে নিতান্ত একদেশদর্শী। তাঁহার মতানুযায়ী ব্যক্তিগণের দ্বারা এই আত্মহারা বিপর্য্যস্ত আত্মবিনাশোদ্যত হিন্দু জাতির কোন অহিত প্রতিবিধান ও উন্নতিসাধন হইতে পারে না; ইহা এখনও যে হিন্দু না বুঝিয়াছে, তাহার ন্যায় হতভাগ্য যে সর্ব্বথা শোচনীয়, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই।

হিন্দুশাস্ত্র যেমন অতিবিস্তৃত তেমনই ইহার তাৎপর্য্যও দুরধিগম। এক হাজার বা বারো শত বৎসর হইতে ঐ শাস্ত্রসমূহের যেরূপ ব্যাখ্যা কোনও সম্প্রদায় বিশেষের হইয়া আসিতেছে, সেই ব্যখ্যাই যে সর্ব্ববাদিসম্মত তাহা বলিতে পারা যায় না। দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ নূতন নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং কোনও ব্যাখ্যা গ্রন্থই কেবল প্রাচীনতা

বশতঃ যে সর্ব্বাংশে সকলের সম্মত হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত কোনও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না।

শাস্ত্র কাহাকে বলে? যাহার দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক হিতকর বস্তু উপদিষ্ট হয়, তাহাই তো শাস্ত্র। শাস্ত্রের সাহায্যে আমরা জানিয়া থাকি, কোন্ বস্তু ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখপ্রাপ্তির হেতু। তাহা জানিয়া আমরা সুখ-সাধনের অনুষ্ঠান করি বা দুঃখসাধনের অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হই। হিন্দুর পক্ষে এই শাস্ত্র বলিলে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র এবং রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাস: গ্রন্থকেই বুঝায়। এই বিরাট শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের মধ্যে যাহার নাম শ্রুতি বা বেদ, তাহাই অপৌরুষেয়, অর্থাৎ হিন্দুগণের মতে কোন লৌকিক পুরুষ বা জীব কর্ত্তৃক রচিত নহে। সেই বেদই মূল প্রমাণ। এই বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝাইবার জন্য মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে, ইহাই হইল আস্তিকগণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু ঐসকল ব্যাখ্যা গ্রন্থরূপ শাস্ত্র সমূহের মধ্যে বহু পরস্পর-বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই মতভেদ নিরাকরণ করিয়া বেদের প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে যুক্তিরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥"

কেবল শাস্ত্র'ক আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের মধ্যে মহর্ষি মনু যে সর্ব্ব প্রধান ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সেই মনুই স্পষ্টভাবে বলিতেছেন, যুক্তির সাহায্যে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া তবে ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। প্রাচীন পণ্ডিগণ বলেন যে, এই যুক্তি লৌকিক যুক্তি নহে, কিন্তু ইহা মীমাংসাশাস্ত্র প্রদর্শিত যুক্তি, সেই যুক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থ নির্ণয় করিতে সমর্থ। সুতরাং লোকপ্রসিদ্ধ যুক্তির দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থ বুঝা মনুর অভিমত নহে। সংস্কার বিরোধী প্রাচীন পণ্ডিগণের এইরূপ সিদ্ধান্ত কিন্তু মনুর অভিপ্রেত হইতে পারে না—কারণ মনু স্বয়ং এই যুক্তিশব্দের কি অর্থ তাহা নিজমুখে আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রা-বিরোধিনা
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।"

বেদশাস্ত্রের অবিরোধি যুক্তির সাহায্যে যে ব্যক্তি ঋষিবচন ও বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে প্রয়াস করে, সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে পারে, অপরে নহে। এই মনু বচনে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, যে তর্ক বেদশাস্ত্রের অবিরোধি, তাহার দ্বারাই ধর্ম্মোপদেশ সমূহের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ইহাতে এমন বুঝায় না যে, বেদশাস্ত্রের অবিরোধি লৌকিক তর্ক গ্রহণ করিবে না।

সুতরাং মীমাংসাশাস্ত্রসম্মত তর্ক ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার বেদ প্রামাণ্যের অবিরোধি তর্ক আশ্রয় করিলে যে ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝা যায় না, এই প্রকার প্রাচীন পণ্ডিগণের ধারণা সর্ব্বথা অমূলক। ফল কথা হইতেছে ইহাই যে, হিন্দুধর্ম্ম ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত নহে, হিন্দুধর্ম্মের যাহা মূল তত্ত্ব তাহা অপৌরুষের বেদবাণীর দ্বারা অন্যান্য সকল ধর্ম্ম প্রচারের বহুপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে। সে ধর্ম্ম—ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন বিভাগে বিভক্ত। যে ব্যক্তি জন্মান্তর মানে, ঐহিক সৎ বা অসৎ কর্ম্মের ফল পরলোকে ফলিয়া থাকে দেহ ইন্দ্রিয় ও মন হইতে আত্মা অত্যন্ত ভিন্ন, সেই আত্মার অবিদ্যাকৃত অবিশুদ্ধ ভাব দূর করিবার জন্যই আত্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। জীবের সেই পরমাত্মার সম্বন্ধ বুঝিয়া ভগবানের অভিপ্রেত কর্ম্মদ্বারা চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া সংসারের সকল প্রকার ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তাঁহাকেই উপাসনা মানবের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এইরূপ বিশ্বাসই হিন্দুত্বের মূল ভিত্তি। এইরূপ হিন্দুত্ব বা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম শ্রুতির দ্বারা অনাদিকাল হইতে উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে। বেদোপদিষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের প্রতি যাহার আস্থা আছে, ইহাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া যে বিশ্বাস করে, সে যে কোনও জাতিতে বা যে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সেও হিন্দু। তাহাকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে, হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে, প্রাচীন ভারতবর্ষে শিষ্ট সমাজের মধ্যে কোন প্রকার আপত্তি যে ছিল, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না—সমগ্র বেদশাস্ত্রের মধ্যে এমন একটি বাক্যও দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা জন্মতঃ অহিন্দু, তাহাদের হৃদয়ে হিন্দুভাব জাগিয়া উঠিলে হিন্দুসমাজের

মধ্যে প্রবেশ হইতে পারে না এইরূপ উপদেশ প্রাচীন কোন শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের বহুপূর্ব্বে যখন হিন্দু বাঁচিয়া ছিল, তখন হিন্দু—পরকে, অহিন্দুকে—হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করাইতে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিত না। যেদিন হইতে ভারতে ক্ষাত্র ও বৈশ্যশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, জন্মগত অথচ গুণবিরহিত ব্রাহ্মণের প্রভাবে হিন্দুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা শোচনীয় ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইদিন হইতেই হিন্দুর অধঃপতনের সূত্রপাত—অর্থাৎ জাতি-ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত গুণসমূহ পরিত্যাগ করিয়া অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত অন্ধবিশ্বাসী জননিচয়কে পরলোকের ভয় দেখাইয়া নিজেদের দল পুষ্ট করিবার জন্য যেদিন হইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং তাহাদিগের এই অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিবিধান করিবার সামর্থ্য হিন্দুসমাজে লুপ্ত হইয়াছে, সেইদিন হইতেই হিন্দু পরাধীন হইয়াছে, হিন্দু আত্মহারা হইয়াছে, নিজের ভালমন্দ বুঝিবার ভার অপরের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। হিন্দু সমাজের এইরূপ অবস্থা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর শত্রু।

আমি বলিতে চাহি যে, হিন্দুর এই দাসোচিত মনোবৃত্তিকে সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে। হিন্দুকে সহস্র বৎসরের সঞ্চিত কুসংস্কারের আবর্জ্জনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইবে। তাহা না করিলে বিংশ শতাব্দীর এই ভীষণতর জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া হিন্দুর আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। সমগ্র ভারতবর্ষে বিশাল হিন্দুজাতির মধ্যে এই আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের জন্য যে দুর্দ্দমনীয় বিরাট আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাকে সুশৃঙ্খল ভাবে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হিন্দুসভার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইতেছে আত্মবিদ্বেষে আত্মকলহে জর্জ্জরপ্রায় হিন্দুজাতিকে পুনঃসংগঠিত করা। এই সংগঠনের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হইতেছে, হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতিগত উচ্চনীচকরার শোচনীয় পরিণতি অস্পৃশ্যতা বা অনাচরণীয়তা। ব্রাহ্মণকুলে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আপনা অপেক্ষা হীন বিবেচনা করে। এই জ্ঞান যে সর্ব্বথা হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ, প্রাচীন ভারতে যতদিন হিন্দু বাঁচিয়া ছিল ততদিন এইপ্রকার জাতিগত উচ্চনীচভাব ছিল না এবং হিন্দু সমাজ মধ্যে তন্মূলক ঘোরতর অশান্তিও বিদ্যমান ছিল না—ইহা আমরা হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্যেই বুঝিয়া থাকি। চণ্ডালের ছায়া স্পর্শ করিলে চণ্ডাল যেকূপজল গ্রহণ করে সেইকূপে জল গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ ও অন্য দ্বিজাতি অপবিত্র হইয়া যায় এরূপ বাক্য বেদের মন্ত্র ব্রাহ্মণ বা আরণ্যক ভাগের মধ্যে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

"ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ"

অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ সবিস্তারে নির্ণয় করিতে হইবে। এইরূপ বচন আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। ভারতের প্রাচীনতম ইতিহাস মহাভারত, সেই মহাভারতে প্রাচীন ভারতের কি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা দেখুন—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং স্মৃতম্।
ব্রহ্মণা সৃষ্টপূর্ব্বং হি কর্ম্মভি বর্ণতাং গতম্॥

বেদব্যাস বলিতেছেন—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এইরূপ জন্মগত বর্ণবিভাগ পূর্ব্বে ছিল না। যে ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিত সেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইত। যে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিত সেই ক্ষত্রিয় হইত। যে বাণিজ্যাদি করিত, সে বৈশ্য হইত। জন্মের দ্বারা জাতি বিভাগ হয় না—কিন্তু কর্ম্ম দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে। সকল মানুষই ভগবানের সৃষ্ট। মানুষের যাহা লক্ষণ—হস্ত পদ চক্ষু নাসা কর্ণ জিহ্বা ত্বক্ মনঃ ও বুদ্ধি প্রভৃতি,—তাহা সকল মানুষেই একপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের এই জাতিগত বিভাগ যে জন্মকৃত, এ বিষয়ে প্রমাণ বেদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের যে বচনটীর উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন পণ্ডিগণ জন্মগত ব্রাহ্মণাদির ব্যবস্থাপন করেন, তাহা একটী রূপক ছাড়া কিছুই নহে। সে বচনটী এই—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যং কৃতঃ।
উরূ তদস্য বৈশ্যোঽথ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"

এই বচনে সেই বিশ্বরূপধর বিরাট পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ ছিল এই কথা বলা হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিগণ বলিয়া থাকেন মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কিন্তু

বচনে বলে না। বচনে বলে—মুখ ব্রাহ্মণ ছিল। ইহা রূপক ব্যতিরিক্ত আর কি হইতে পারে? মুখ হইতে উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণ হইবে ইহাই যদি বেদের অর্থ হয়, তাহা হইলে প্রাচীন পন্থিগণকে জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে বালক উৎপন্ন হয় সে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ হইবে? কারণ সে ত' বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন হইল না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে তাঁহার যথাক্রমে বাহু ও উরু করা হইয়াছিল, কিন্তু শূদ্র তাঁহার পাদদ্বয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল—এই মন্ত্রটী এইরূপই নির্দ্দেশ করিতেছে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে তাঁহার বাহু ও উরু করা হইল, কিন্তু কে করিল, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। যদি সেই পরমেশ্বরই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হয় এই বাহু ও উরু স্থানীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে যিনি করিয়াছেন তিনি বিরাট পুরুষ নহেন, কিন্তু বিরাট পুরুষ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যিনি বিদ্যমান থাকিয়া এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্ররূপ মস্তক, বাহু, উরু ও পদরূপ অবয়ব যুক্ত বিরাট পুরুষের শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই নির্ম্মাতা পুরুষই বেদান্ত দর্শনানুসারে মায়োপহিত ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর—সেই পরমেশ্বর মায়িক সংকল্পানুসারে এ সংসারের সকল প্রকার দৃশ্যবস্তুর নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন—ইহাই হইল বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এই মন্ত্রেও সেই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে কেহ উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট এইরূপ কোন নির্দ্দেশ এই মন্ত্রে নাই। শরীরের মধ্যে মুখ উৎকৃষ্ট, বাহু অপকৃষ্ট উরু তদপেক্ষা অপকৃষ্ট এবং পাদ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অঙ্গ—এই প্রকার কল্পনা কবিগণেরই শোভা পায়। কারণ মুখের ন্যায়, বাহু উরু ও পাদ প্রত্যেক অঙ্গই শরীরের পক্ষে একান্ত উপযোগী—যে কোনটীর অভাব হইলে শরীর বিফল ও অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। শরীর ধারণ ও শারীরিক কার্য্য করিতে হইলে ঐ সকল-অঙ্গেরই পূর্ণতা থাকা চাই, একটীরও অভাবে পুরুষ অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। স্ব স্ব কার্য্য বিষয়ে উহাদের প্রত্যেকেরই অসাধারণ উপযোগিতা আছে—সে হিসাবে কোন অঙ্গই কোন অঙ্গ হইতে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত মন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সমূহের মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ আপেক্ষিক ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা, কল্পনা-মাত্র। বস্তুতঃ এই মন্ত্রটী বিধায়ক নহে, কিন্তু উহা স্তুতি। সমগ্র ধরাতল ব্যাপিয়া প্রতিষ্ঠিত বিরাট মনুষ্যসমাজ-রূপ বিরাট পুরুষের অসীম শক্তিমত্তার ইহা স্তুতিবাক্য ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার মুখ্য অর্থে কোন তাৎপর্য্য নাই। মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত ইহাই—কারণ এই প্রকার লোক-বিরুদ্ধ অর্থবোধক বৈদিক বাক্যের স্বার্থে যে তাৎপর্য্য নাই, তাহা অর্থবাদাধিকরণে মীমাংসা সূত্রকার মহর্ষি জৈমিনি স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ভাষ্যকার শবরস্বামীও অতি বিশদভাবে তাহারই উপপাদন করিয়াছেন।

"স প্রজাপতিরাত্মণো বপামুদখিদৎ।"

সেই প্রজাপতি নিজের বক্ষঃস্থিত বপানামক মাংসল যন্ত্র-বিশেষ উৎপাটিত করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন—এইরূপ বেদ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—কেহই নিজের বপা উপড়াইয়া তাহা দ্বারা হোম করিতে পারে না—সুতরাং এইরূপ বাক্যের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই। ইহা দ্বারা বপাহোমের স্তুতিই করা হইতেছে। সেইরূপ "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্র যজ্ঞের দেবতা বিরাট পুরুষের স্তুতি করিতেছে মাত্র। ব্রাহ্মণে মুখত্বের আরোপ, ক্ষত্রিয়ে বাহুত্বের আরোপ, বৈশ্যে উরুত্বের আরোপ এবং শূদ্রে পাদত্বের আরোপ সেই স্তুতির আনুকূল্য করিতেছে—বাস্তব কোন সত্যের উল্লেখ করিতেছে না। শ্রুতিরই অন্যত্র আছে—

"স মূর্দ্ধ্নো রাজানমসৃজত, সমূর্দ্ধন্যভিষিক্তো রাজা ভবেৎ।"

অর্থাৎ তিনিই শিরোদেশ হইতে রাজা সৃজন করিয়াছিলেন, শিরোভাগে অভিসিক্ত হইয়া রাজা হয়। এই শ্রুতিবাক্যও পুরুষসূক্তের রূপক সম্বন্ধে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে—কারণ এক্ষেত্রেও যথাশ্রুত অর্থে শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য্য হইলে বিরোধ ঘটিয়া থাকে—সুতরাং গুণ ও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বিভাগ হইবে না—এইরূপ ধারণা নিতান্ত ভিত্তিহীন। এই ভারতবর্ষে স্মৃতি-নিবন্ধ গুলি রচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, যে গুণ-কর্ম্মগত বর্ণবিভাগ প্রচলিত ছিল, পূর্ব্বোদ্ধৃত মহাভারত বচন তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করে।

সংস্কার-বিরোধী প্রাচীন-পন্থিগণ মুখেই মনুস্মৃতির দোহাই দেন, কার্য্যে কিন্তু মনুর মতানুসরণ বড় কেহই করেন না। মনুর যে সকল বচন প্রতিপালন না করিলে, তাঁহাদের জাতিগত ব্রাহ্মণ্যও রসাতলে যায় সেই সকল

বচনকে তাঁহারা গত সহস্র বৎসর হইতে একপ্রকার উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। মনু বলিয়াছেন—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদ মন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স:জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

—অর্থাৎ যে দ্বিজাতি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য কোন বিষয়ে শ্রম করিয়া থাকে—সে এই জন্মেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে এই বিশাল ভারতবর্ষে একটিমাত্র ও দ্বিজাতি যথাবিধি উপনীত হইয়া গুরুগৃহে বাস পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ও বিহিত ব্রতাদির সহিত বেদাধ্যয়ন করে না—ইহা অখণ্ডনীয় ও জাজ্বল্যমান সত্য, সুতরাং মনুর মতানুসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে এইরূপ একজন ব্যক্তিও এখন নাই। অথচ ব্রাহ্মণের লাভ মান খ্যাতি ও পূজা প্রভৃতির সুবিধা লাভ করিবার জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন ব্যক্তিই লালায়িত। তাহার এই অন্যায্য ভাবে আকাঙ্ক্ষিত লাভ মান খ্যাতি ও পূজার বিরুদ্ধে যে দণ্ডায়মান হইবে, দল বাঁধিয়া শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে ধর্ম্মদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, স্বজাতি-দ্রোহী বলিয়া অকথ্য ভাষায় গালি দিতে ও অপদস্থ করিতে আজ সমগ্র ভারতের সকল হিন্দুসমাজের তথাকথিত ব্রাহ্মণ নেতৃবর্গ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ সমাজের শোচনীয় অধঃপতন আর কি হইতে পারে তাহা কল্পনাতেও প্রতিভাত হয় না!

সংস্কার বিরোধী প্রাচীন-পন্থিগণ নিজের বংশ-পরম্পরা-প্রাপ্ত লাভ সম্মানাদিজনক অধিকার বজায় রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আজ হিন্দু ভারতের যে সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা ভাবিলেও প্রত্যেক স্বজাতি-প্রেমিক হিন্দুর হৃদয় আতঙ্কে ও লজ্জায় শিহরিয়া উঠে।

যে জাতির মধ্যে শতকরা ৮০ জন ব্যক্তি অপর ২০ জনের অস্পৃশ্য ও হেয়, যে জাতির মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইবার ব্যবস্থা নাই, শীত বর্ষায় উপযুক্ত গাত্রাবরণের সংস্থান নাই, হিন্দু নামে পরিচিত হইয়াও হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাস্য দেব-প্রতিমার পূজায় অধিকার নাই, তথাকথিত উচ্চবর্ণের বলপূর্ব্বক সংস্থাপিত ব্যবস্থার প্রভাবে সাধারণ বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহের অনুকূল শিক্ষালাভের সুযোগ নাই, সেই জাতির এই বর্ত্তমান যুগের অতি কঠিন জীবন সংগ্রামে আত্মরক্ষার কল্পনা যে আকাশকুসুমকল্প তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? এ সংসারে মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হইতে যে জাতি বঞ্চিত, পরকালে তাহার পক্ষে অমরাবতীর তোরণ দ্বার অনন্ত কালের জন্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া আছে এই বিশ্বাস লইয়া কতকগুলি প্রাচীন আচার প্রতিপালন করিতে করিতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিবার নাম যদি হিন্দুত্ব হয়, তাহা হইলে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, ভারতের নব জাগরিত হিন্দু সে হিন্দুত্বকে বিসর্জ্জন দিতে অনুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিবে না। ঐহিক সর্ব্ব প্রকার অভ্যুদয়ে বঞ্চিত হইয়া আজীবন দাস-মনোবৃত্তি লইয়া পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকাই যদি হিন্দুত্বের পরিণাম হয়, তাহা হইলে সেই হিন্দুত্বকে যত শীঘ্র পারা যায়, বঙ্গোপসাগরের অতল জলে বিসর্জ্জন করাই বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অধঃপতিত, পরপদ-লাঞ্ছিত, পৃথিবীর সকল মানব সমাজে দাস বলিয়া চির-উপেক্ষিত দুর্ব্বহ ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন লইয়া এ সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার বিড়ম্বনা ভোগ নব্যহিন্দু করিতে চাহে না।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে আমারা কাহার বংশধর! যে হিন্দু একদিন পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির জ্ঞানদাতা গুরু ছিল,—যে হিন্দুর মহিমা বর্ণন করিতে যাইয়া মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ"।

"এই দেশে সমুদ্ভূত ব্রাহ্মণের নিকটে পৃথিবীর সকল মানব নিজ নিজ চরিত্র শিক্ষা করিবে।" আমরা সেই হিন্দুর বংশধর—যে হিন্দুর জ্ঞান, বীর্য্য, মহিমা ও শান্তি লাঞ্ছিত বিজয় বৈজয়ন্তী একদিন ভারতসাগর পার হইয়া সিংহলে, জাভায়, সুমাত্রায়, মরীচিদ্বীপে বড় বড় বিরাট ভাস্কর্য্য মণ্ডিত দেবমন্দিরে গগনস্পর্শী সুবর্ণময় ধ্বজদণ্ডের উপর মৃদু মারুত হিল্লোলে খেলা করিতে করিতে বিশ্বমানব বিজয়িনী হিন্দু সভ্যতার কীর্ত্তিগান শত শত ধ্বনিতে শত শত বৎসর ব্যাপিয়া গাহিত, যে হিন্দুর গৈরিক বস্ত্র মাত্র

প্রতিনিধি সধবল চিরহিমানী মণ্ডিত সমুচ্চ হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সুদূর তিব্বতে, মঙ্গোলিয়ায়, চীনে, কোরিয়ায় ও জাপান প্রভৃতি দেশে কোটি কোটি নরনারীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞানান্ধকারাবৃত হৃদয়ে সদ্ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক বিতরণ পূর্ব্বক সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার পথ দেখাইয়া দিয়াছিল, মনে থাকে যেন আমরা সেই হিন্দুর বংশধর। যে হিন্দু জগতের সমগ্র সভ্য জাতির গুরুস্থান অধিকার করিয়া "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং অমৃতং পুরস্তাৎ" এই মহাবাক্যের ঘোষণা দ্বারা সর্ব্বভূতে একই আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, মানবাত্মার মধ্যে বস্তুতঃ কোন পার্থক্যই নাই, এই অভ্রান্ত সত্য প্রচার করিয়াছিল, সেই হিন্দুর সন্তান হইয়া সেই হিন্দুর আবিষ্কৃত জ্ঞান বীর্য্য প্রসাদ ও শান্তি মণ্ডিত সভ্যতার অধিকারী হইয়া আজ আমরা কি ঘৃণিত অবস্থায় কিরূপ উপেক্ষিত ভাবে পৃথিবীর সকল মনুষ্য জাতির মধ্যে মার্কামারা দাস হইয়া দুর্ব্বহ জীবন ভারে মৃতকল্প হইয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আছি, আপনার ভাইকে শত্রু করিয়াছি, নিজের দেবমন্দিরে নিজের ভাইকে প্রবেশ করিতে দেখিলে দেবতা অপবিত্র হইবেন ভাবিয়া বৃথা ভয়ে অ কুল হইতেছি। যাহাদের শিক্ষা দিলে, যাহাদের দীক্ষা দিলে, যাহাদের হীনাবস্থা ঘুচাইয়া আমার সমান করিলে আমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকা্র মঙ্গললাভ অনিবার্য্য হইবে তাহাদিগকে ঘৃণা করা নীচভাবা অস্পৃশ্য মনে করা আমাদের ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সকল দাসোচিত মনোবৃত্তি যাহা্না জাতির প্রতি শোণিত বিন্দুতে মিশাইরা দিয়াছে, তাহাদিগের কথায় তাহাদিগের কল্পিত পরলোক বিভীষিকার আমরা এখনও ভীত হই, ইহা অপেক্ষা মনুষ্যজাতির পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে ? হিন্দুসভা এই দাসোচিত মনোবৃত্তিকে এই গোঁড়ামির দুর্ব্বিবহ লৌহ শৃঙ্খলকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুকে বুঝিতে হইবে এই দাসোচিত মনোবৃত্তির বিধ্বংসের জন্য হিন্দু সভা যে প্রযত্ন ও যে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছে তাহার সহিত হিন্দুশাস্ত্রের কোন প্রকার বিরোধই নাই, হিন্দুসভা হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধী নহে, কিন্তু ইহা হিন্দুশাস্ত্রের স্তম্ভধ্বংসের নামী অসমাপ্ত কল্পিত সর্ব্বনাশকর আচ- সংস্কার সমূহের বিধ্বংস করিবার জন্যই মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। হিন্দুসভা বাহিরের শত্রুকে শত্রু বলিয়াই জ্ঞান করে না, সে হিন্দু সমাজের অন্তঃশত্রুর সহিত বিরোধ করিবার জন্য, তাহার উচ্ছেদ করিবার জন্য বলসঞ্চয় করিতেছে। হিন্দুসভা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরোধী নহে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত যে বর্ণাশ্রমাভাস, তাহাকে দূর করিয়া গুণকর্ম্মগত বাস্তব বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এই ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বেদশাস্ত্র ইহার বিরোধী নহে, পরন্তু বেদশাস্ত্র ইহার সর্ব্বথা অনুকূল। সেই শাস্ত্রেরই সাহায্যে হিন্দুসভা এই দুঃসাধ্য সাধন করিবে ইহা স্থির।

গুণকর্ম্মহীন জন্মনিয়ন্ত্রিত ব্রাহ্মণত্ব হিন্দু সমাজের বিশেষ অনিষ্টকর, সুতরাং ইহার প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক, এই কথা নব্য পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণের তথাকথিত নেতাগণ উপহাস করিয়া থাকেন যে নব্য পণ্ডিতগণের এই ব্রাহ্মণ্য-বিদ্বেষ পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষময় ফল ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। উচ্চনীচ জাতি নির্ব্বিশেষে পাশ্চাত্য শিক্ষার বহুল প্রচারের ফলে, নীচ জাতিগণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের সম্মান গৌরব ও প্রতিষ্ঠা দর্শনে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া তাহার ধ্বংস সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তাহাদের সহিত পাশ্চাত্যশিক্ষিত বিকৃত মস্তিষ্ক কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সন্তান মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যের বিলোপ দ্বারা হিন্দুসমাজে এক সর্ব্বনাশকর বিপ্লবের যুগ আনয়ন করিতেছে, পিতৃ পুরুষগণের অবলম্বিত সনাতন আচার মার্গ প্রতিপালন করিতে লোভ ও আলস্য বশতঃ অসমর্থ হইয়া তাহারা হিন্দু সমাজের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং ইহারাই হিন্দু সমাজের ভয়াবহ অন্তঃশত্রু, ইহাদের উচ্ছেদ করিবার জন্যই আজ কলিকাতা ঢাকা বারাণসী প্রভৃতি গোঁড়ামী প্লাবিত স্থানে দলবদ্ধ হইয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম গেল, সমাজ গেল, হিন্দুয়ানী গেল বলিয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে ভারতের গগন পবন মুখরিত করিয়া নিজের দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে—ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু গুণবর্জ্জিত মিথ্যাচার কদর্থিত জন্মমাত্রনিয়ত ব্রাহ্মণ্য বেদসম্মত নহে, অতি প্রাচীন কালের বৈদিক সাহিত্যেই এইরূপ কথা ব্রাহ্মণ্যের প্রতি উপহাস ও অবজ্ঞার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া

যায়, তাহা হয়ত' আমাদের মধ্যে এখনও অনেকের জানা নাই, যাঁহারা ইহা জানে না তাঁহাদের অবগতির জন্য বৈদিক সাহিত্য অর্থাৎ উপনিষদ হইতে কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

সামবেদীয় বজ্রসূচিকোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রা ইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরুক্তম্। তত্র চোদ্যমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম, কিং জীবঃ, কিং জাতিঃ, কিং জ্ঞানং, কিং কর্ম্ম, কিং ধার্ম্মিক ইতি। তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেন্ন। অতীতানাগানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ একস্যাপি কর্ম্মবশাৎ অনেকদেহ-সম্ভবাৎ সর্ব্বশরীরাণাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ চ। তস্মান্ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন আচাণ্ডালাদি পর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাৎ জরামরণধর্ম্মাধর্ম্মাদি সাম্যদর্শনাদ্ ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ পিত্রাদিশরীরদহনে ব্রহ্ম হত্যাদিদোষ সম্ভবাচ্চ। তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেক জাতিসম্ভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যঃ কৌশিকঃ কুশাৎ জাম্বুকো জম্বুকাৎ বাল্মীকিঃ বল্মীকাৎ ব্যাসঃ কৈবর্ত্ত-কন্যায়াং শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ বশিষ্ঠ উর্ব্বশ্যাং অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপি অগ্রে জ্ঞান প্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতি ব্রাহ্মণ ইতি তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন ক্ষত্রিয়াদয়োঽপি পরমার্থদর্শিনোঽভিজ্ঞাবহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসঞ্চিতাগামিককর্ম্ম-সাধর্ম্ম্যদর্শনাৎ কর্ম্মাভিপ্রেরিতা সন্তো জনাঃ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্তি ইতি তস্মান্ন কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি ধার্ম্মিকো ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিৎ ষড়ূর্ম্মি ষড়ভাবেত্যাদি সর্ব্বদোষরহিতং সত্য-জ্ঞানানন্দানন্ত স্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পমশেষকল্পাধারমশেষ-ভূতান্তর্যামিত্বেন বর্ত্তমানমন্তর্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতং অখণ্ডানন্দস্বভাবপ্রমেয়মনুভবৈকবেদ্যমপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্য-তৃষ্ণাশামোহাদিরহিতঃ দম্ভাহঙ্কারাদিভিরস্পৃষ্টচেতা বর্ত্তত এব মুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধি-র্নাস্ত্যেব।

ইহার অর্থ এই—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিটী বর্ণ; ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান। ইহাই বেদের অভিমত, স্মৃতি সমূহও ইহাই বলিয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশ্ন হইতেছে ইহাই যে, এই ব্রাহ্মণ কে? জীবাত্মা কি ব্রাহ্মণ? অথবা শরীর ব্রাহ্মণ? কিংবা জাতি ব্রাহ্মণ? অথবা জ্ঞানই ব্রাহ্মণ? কিংবা কর্ম্ম ব্রাহ্মণ? অথবা ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ? এই কয়টী প্রশ্নের মধ্যে প্রথমকল্প অর্থাৎ জীবাত্মাই ব্রাহ্মণ এইরূপ কল্প হইতে পারে না। কারণ অতীত ও অনাগত অনেক দেহের সম্বন্ধী জীব সর্ব্বদা একরূপই হয়। একই জীবের কর্ম্মবশতঃ অনেক দেহের সংহতই সম্বন্ধ হইয়া থাকে এবং সর্ব্ব শরীরেই জীব একরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং জীবাত্মা ব্রাহ্মণ এইরূপ পক্ষ হইতে পারে না। তবে দেহই ব্রাহ্মণ হউক এইরূপ পক্ষও যুক্তিসহ নহে। চাণ্ডালাদি সকল মনুষ্য দেহই পাঞ্চ-ভৌতিক, সুতরাং মনুষ্য মাত্রের দেহ এক প্রকার। সকল দেহের জরামরণ রূপ পরিবর্ত্তন আছে। ধর্ম্মাধর্ম্মও সকল দেহের সামান্য ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ নিয়মও না থাকায় এবং পিতা প্রভৃতির শরীর মরণের পর দাহ করিলে পুত্রাদির ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রসক্তি বশতঃ দেহও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। তবে জাতি বিশেষকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে এই প্রকার মতও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ ভিন্ন জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও অনেক ব্যক্তিই মহর্ষি হইয়া-ছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীর উদরে জন্মিয়াছিলেন, কৌশিক কুশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, জাম্বুক নামে ঋষি শৃগাল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বাল্মীকি বল্মীক হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বেদব্যাস কৈবর্ত্ত কন্যার উদরে জন্মিয়া-ছিলেন, শশের পৃষ্ঠভাগ হইতে গৌতম হইয়াছিলেন, অগস্ত্য কলসে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ইহা শ্রুত হইয়া থাকে। লোকপ্রসিদ্ধ জাতি বিশেষে জন্ম পরিগ্রহ

না করিয়া উঁহাদেরও জ্ঞান প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব হইয়াছিল এবং এইরূপ আরও অনেক মহর্ষি হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং জাতিবিশেষই যে ব্রাহ্মণ তাহা বলা যায় না। তবে জ্ঞানই ব্রাহ্মণ হউক,—তাহাও নহে। কারণ ক্ষত্রিয়াদিও পরমার্থদর্শী ও অভিজ্ঞ হইয়া থাকেন, সুতরাং জ্ঞানও ব্রাহ্মণ নহে। কর্ম্মই তবে ব্রাহ্মণ হউক তাহাও নহে। কারণ প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামিক—এই ত্রিবিধ কর্ম্ম মনুষ্য মাত্রেরই থাকে। সকল দেহীই কর্ম্ম প্রেরিত হইয়া এ সংসারে কার্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং ধার্ম্মিকই ব্রাহ্মণ ইহাও বলা যায় না। তবে ব্রাহ্মণ কে? ইহার উত্তর এই যে, ষট্ প্রকার উর্ম্মি ও ষট্প্রকার ভাববিকার যাহার নাই, যাহা সর্ব্বদোষ বর্জ্জিত, যাহা সত্য জ্ঞান আনন্দ ও অবিনাশী, যাহা স্বয়ং সিদ্ধ, নির্বিকল্প অথচ অশেষ কল্পের আধারভূত, যাহা অশেষ প্রাণীর অন্তর্য্যামী রূপে বিদ্যমান, সকল পদার্থের বাহিরে ও ভিতরে যাহা আকাশের ন্যায় অনুস্যূত, অখণ্ড আনন্দই যাহার স্বভাবভূত, যাহা অপ্রমেয় সেই ব্রহ্মতত্ত্বকে করতলস্থিত আমলক ফলের ন্যায় যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিয়াছে এবং তাহারই ফলে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়াছে বলিয়া যাহায় কাম ও রাগাদি দোষ বিনষ্ট হইয়াছে, যে শমদমাদি ভাবসম্পন্ন, মাৎসর্য্য তৃষ্ণা আশা ও মোহ যাহার নষ্ট হইয়াছে, দম্ভ ও অহঙ্কার দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ—শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণেতিহাসের ইহাই তাৎপর্য্য!

এই ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষে আবার যাহাতে হয়, তাহারই জন্য হিন্দুসভা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এই ব্রাহ্মণ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ভারতে করিতে হইলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কূপমণ্ডূক কল্প গতানুগতিক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণপণ্ডিত কুলকে সমাজের ও জাতির মঙ্গলের জন্য যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যপূত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন, নির্লোভ ও অসূয়াশূন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমাদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। এইরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় যাহাতে সমাজের সমস্যা সমূহের সমাধানে পথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তাহার জন্য যাহা বৈধ উপায় তাহার অনুষ্ঠান করিতে হিন্দু মহাসভা আয়োজন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা হিন্দুর জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যাহাতে সংস্থাপিত করিতে পারেন, তাহার জন্য বঙ্গদেশের বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রস্থল কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দুসভার অনুমোদন অনুসারে একটী ব্রাহ্মণ পরিষৎও স্থাপিত হইয়াছে। মহামনা ভারতভূষণ শিক্ষিত-হিন্দু-সমাজের অগ্রণী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহোদয় এই ব্রাহ্মণ পরিষদের এই বৎসরের পরিচালনার জন্য দুই হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। সংস্কারকামী বিশুদ্ধচরিত কতিপয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও মহামহোপাধ্যায়-কল্প বহু পণ্ডিতই এই ব্রাহ্মণ পরিষদের ব্যবস্থাপক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পক্ষপাত-রহিত, মীমাংসা সম্মত যুক্তির সাহায্যে হিন্দুশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের সার রহস্যরূপ রত্নরাজির উদ্ধার পূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় তাহার প্রচারের জন্য ব্রাহ্মণ পরিষৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুগে হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দু সমাজের বাস্তব উন্নতির জন্য যে বদান্যাগ্রগণ্য বৈশ্যকুলভূষণ শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর বিরলা মহোদয় অকাতরে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন তিনি এই ব্রাহ্মণ পরিষদের পৃষ্ঠপোষক বা Patron হইয়াছেন। বঙ্গীয় হিন্দুসভা এই ব্রাহ্মণ পরিষদের সমুন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর। আমি আশা করি অচির কালেই এই ব্রাহ্মণ পরিষদ্ আমাদের দেশে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দু সমাজের আবশ্যক সংস্কার কার্য্যগুলি বিহিত ভাবে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন।

আমার বক্তব্য অদ্যকার জন্য শেষ হইয়া আসিল। উপসংহারে আমার আসাম দেশীয় প্রিয়ভ্রাতা ও মাতৃগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা হিন্দুর সংগঠন কার্য্যে দৃঢ়চিত্ত হউন, অস্পৃশ্যতা রূপ মহাব্যাধি হিন্দুসমাজ হইতে চিরদিনের জন্য যাহাতে বিদূরিত হয় তাঁহারা ঐকমত্য সহকারে বদ্ধপরিকর হউন, সমগ্র ভারতে হিন্দু জাগরণের যে নূতন বিজয়বৈজয়ন্তী উত্তোলিত হইয়াছে, জাতিগত উচ্চনীচভাব পরিহার পূর্ব্বক ব্যক্তিগত আভিজাত্য পাণ্ডিত্য বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিষ্ঠা কামনায় বিসর্জ্জন দিয়া আমরা সকলে এক ভারত মাতার উচ্চনীচ ভাব বর্জ্জিত সন্তান, এই জ্ঞানে দেশমাতৃকার গৌরব রক্ষা করিবার জন্য তাহারই মূলে সকলে মিলিত হউন, প্রত্যেক হিন্দুললনা

যাহাতে শিক্ষিত হয়, প্রত্যেক হিন্দু সন্তান যাহাতে শিক্ষিত, বীর্য্যসম্পন্ন ও স্বাবলম্বী হয়, তাহার জন্য প্রাণপণে সকলেই চেষ্টা করুন, দেশের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হউক, আত্ম-বিবেকের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হউক। অজ্ঞান কল্পিত কলিযুগ দেশ হইতে বিদূরিত হউক, সত্যযুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হউক, হিন্দুর যথার্থ হিন্দুত্ব জাগিয়া উঠুক, তাহার ফলে ভারতে—না না শুধু ভারতে নহে, সমগ্র পৃথিবীতে—সর্ব্ব জাতির মধ্যে অধ্যাত্মজ্ঞান অনাবিল শান্তি, ও বিশ্বজনীন প্রেম দ্বারা সমলঙ্কৃত পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হউক, ইহাই আমার পতিত পাবন দীনতারণ শ্রীভগবানের চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা।

সঙ্গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভগং যথা পূর্ব্বে সঞ্জনানাং উপাসতে।১।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং সহচিত্তমেষাং
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা
জুহোমি।।২।।
সমানী বঃ আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ সুসহামতি।।৩।।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

রেখা চিত্র

—যদি ধমকি তেড়ে আস নথ নাড়ি,
আমি চমকি চুলকাব পাকা দাড়ি।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

শিল্পী—শ্রীশিবপদ ভৌমিক।

পাথর-পুরীর পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার ফিরিবার পালা। সম্মুখে রাত্রি—বিশ্রাম। অতীতের সেই মহিমময়ী কীর্ত্তির দিকে আর একবার অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সকলে নামিতে আরম্ভ করিলাম।

হে পবিত্র পুরী, তোমায় নমস্কার করি।

হে আরাধ্য করুণাময় রাজ-সন্ন্যাসী, আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

মনের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করিতে শক্তিহীন আমি-কি লিখিব? বিশ্ববরেণ্য কবি "বোরো-বুদুরে" যে সুধা ধারা তাঁর অমৃত নিষ্যন্দিনী লেখনীতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারই ভাষায় বলি—

তাই আসিয়াছে দিন
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে,
শুনিবারে
পাষাণের মৌন তটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর।
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমর প্রেমের মন্ত্র "বুদ্ধের শরণ লইলাম"।

হে অতীতের নমস্য ত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দ, তোমাদের নমস্কার করি। এই নির্জ্জন নিরালায় শত শত বৎসর উপাসনা করিয়া তোমাদের ভক্তহৃদয় ধন্য হইয়াছে। এখানকার আকাশে বাতাসে এখনও তোমাদের স্তবগাথা বুঝি শোনা যায়। এই ধূলিকণার মধ্যে সাধকদের পবিত্র পদধূলি এখনও মিশিয়া আছে। হে পবিত্র পুরী, তুমি শুধু শিল্প সৌন্দর্য্যের গৌরবময় ইতিহাস নহ, তুমি শত সহস্র ভক্ত উপাসকের দেবমন্দির। তোমাকে আমার শত প্রণাম।

এই অজন্তা পুরী এমনই নিভৃত পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত যে একটী মাত্র বাঁক ঘুরিতেই সকল দৃশ্য নয়নপথের অতীত হয়।

এই খানে একটী ঘটনায় উল্লেখ না করিলে কিছু কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে। অজন্তা হইতে ফিরিবার সময়ে আমরা মেয়েরা ধীরে হাঁটি বলিয়া, আমরা অগ্রগামী হইয়া বড় ছেলের সহিত নামিয়া চলিলাম। মেঝ ছেলে অজন্তায় পাদবাহী নদীতটে নামিয়া সেখানে দেখিতে চলিল। অজন্তার সুউচ্চ গুহার প্রাসাদ পুরী হইতে নদী বক্ষে নামিবার সোপান এখনও আছে। সেই স্থানে সে দেখিতে পায় কয়েকটী মৎস্যজীবী মৎস্য ধরিয়াছে। বাঙ্গালীর ছেলে—তৎক্ষণাৎ মৎস্য ক্রয় করিয়া রুমালে বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিয়া আসিয়া আমাদের সহিত মিলিল। আমরা তখন মোটরে উঠিয়াছি। তাহার প্রতীক্ষায় পথ পানে চাহিয়া ছিলাম, কহিলাম, "এত দেরী কেন?" "মা, মাছ পেয়েছি, তাই নিয়ে উচু নীচু পথ দিয়ে আসতে দেরী হয়ে গেল।" আমি আর কিছু বলিলাম না, কিন্তু উনি একটু গম্ভীর হইয়া রহিলেন। মোটর ঔরঙ্গাবাদের পথে ফিরিয়া চলিল। আজ রাত্রে সেখানে অবস্থান ও বিশ্রাম করিয়া কল্য ইলোরা দর্শনে যাইব।

এই দীর্ঘ পথ বায়স্কোপের ছবির মত দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখাইয়া চলিল।

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় ঔরঙ্গাবাদ সহরের প্রান্ত দেশে উপস্থিত হইতেই আকাশ ভাঙ্গিয়া মুষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পথ ঘাট জলে জলময়—জলস্রোতে মোটরের চাকা পিছলাইয়া যাইতেছে। কোন্ পথে যাইতে হইবে কিছুই অনুমান করা যাইতেছে না।

আমরা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। বৃষ্টির জন্য পথে ঘাটে লোকও নাই। অনুমান করিয়া ড্রাইভার গাড়ী চালাইতেছে।

আকাশ চিরিয়া বিদ্যুৎ শিখা এক বার চক্ষু ধাঁধিয়া প্রকাশ হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন শব্দে ঈশ্বর স্মরণ করিতেছি। কচি শিশুদের বুকের মাঝে জড়াইয়া রাখিয়া চিন্তা করিতেছি, না জানি কি ঘটে!

এইরূপে ধীরে ধীরে গাড়ী দুখানি কোনও রূপে ঔরঙ্গবাদের থানার সম্মুখে আসিয়া পহুঁছিল।

আমাদের নামিবার জন্য বাড়ী স্থির আছে জানাইয়া সব ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় লোক দিলেন।

কোনও রূপে সেই মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে চলিয়া গাড়ী দুখানি এক বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। আমরা ছাতা ও ওয়াটার প্রুফ আবৃত হইয়া কোনও রূপে সেই গৃহের বারান্দায় আসিয়া পহুঁছিলাম।

স্থানটি কিরূপ তাহা প্রথমে আমরা অনুমান করিতে পারি নাই। সেই দারুণ দুর্য্যোগের ভিতর একটী আশ্রয়ে পৌছান নিতান্তই প্রয়োজন ছিল, জিনিষ পত্র ও শিশুদের সহ সেই উন্মুক্ত বারান্দায় পহুঁছিয়া বুঝিলাম, ইহা গৃহ নয়, এই বারান্দা টুকুই আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যাহা হউক আমরা অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম। কম্বল সতরঞ্চি পাতিয়া শিশুদের বসাইয়া নিজেরাও বসিলাম। উনি ও বড় ছেলে গৃহের সন্ধানে মোটরে করিয়া আবার বাহির হইলেন।

আমাদের সেই বারান্দার দুই হাত দূরে চতুষ্কোণ উঠানের মত বাঁধান হাউজ বা চুনবালি নির্ম্মিত পাকা জলাধার। যে লোকটী আমাদের বাড়ী দেখাইতে সঙ্গে আসিয়াছিল, সে আমাদের এই বাড়ি পছন্দ নয় জানিয়া একটু বিস্মিত হইয়াছিল। (এমন চমৎকার হাউজ সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও আমাদের সেই বারান্দা পছন্দ নয় জানিয়া বিস্মিত হইয়াছিল) ঔরঙ্গবাদে মুসলমান রাজত্বের সময় সহরে জলের কলে জল সরবরাহ হইত। এবং এখনও সেই সময়কার ব্যবস্থা অনুযায়ী জল সমস্ত সহরে সরবরাহ হয়।

চুন বালির প্রস্তুত প্রকাণ্ড নল সহরের প্রান্তদেশ বহিয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এই জল কোথা হইতে আসিতেছে এখনও নাকি কেহ জানে না।

সহরের মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড উনানের মত বাঁধানো চৌবাচ্চা বা হাউজ। তাহা সর্ব্বদা ঐ জলে পূর্ণ থাকে। সহরবাসী কলসী ডুবাইয়া জল তুলিয়া লইয়া যায়।

এখানকার বহুলোকই মুসলমান সেজন্য এই হাউজের জলেই বোধ করি কায চলে। এদেশের হিন্দু অধিবাসীরা এই জল ব্যবহার করে কিনা চাক্ষুষ দেখি নাই। তবে পথে লোহার পাইপ বসানো জলের কল হইতে বহুলোকে জল লইতেছে দেখিয়াছি।

পুরাতন জলের পাইপের সংযোগ স্থলে লোহার পাইপ বসাইয়া আধুনিক বাসিন্দারা নিজ নিজ নবনির্ম্মিত গৃহে জল লইতেছে দেখিলাম।

সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে একটী কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল, এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমরা যে বারান্দাটীতে বসিয়া ছিলাম, পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার সম্মুখে উঠানের মত নীচু করিয়া গাঁথা বৃহদাকার হাউজ। আমরা একটী গলি পথে বারান্দায় আসিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের ভৃত্য আঙ্গহু লণ্ঠন ও একটী বিছানা সহ উঠান ভ্রমে সেই জল পূর্ণ হাউজের ভিতর ঝাপাইয়া পড়িল। আমরা তাহার এই দুরবস্থায় একটুও দুঃখ না করিয়া খুব এক চোট হাসিয়া লইলাম। সেও খানিকক্ষণ সন্তরণ করিয়া স্নান টুকু ভাল করিয়া সারিয়া লইল।

ঘণ্টা দুই পরে ধর্ম্মশালায় ঘর ঠিক করিয়া উনি ফিরিয়া আসিলেন, এবং আমাদের কহিলেন, যে স্থানে দুই হাজার বৎসর ধরিয়া অহিংসা পরমোধর্ম্ম মতের উপাসনা হইয়াছে, সেই স্থানে গিয়া তোমরা মাছের লোভ ত্যাগ করিতে না পারিয়া মাছ সংগ্রহ করিলে সেই জন্যই আজ এই কষ্টটা সকলকে ভোগ করিতে হইল। মাছ ফেলিয়া দিয়া এইবার ধর্ম্মশালায় চল। তোমরা যখনই মাছ সঙ্গে আন, তখনি আমায় মনে ইহা বড়ই বিসদৃশ লাগিয়াছিল।

অতঃপর মাছ দুইটী ফেলিয়া দিয়া আমরা মোটর আরোহণে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় ধর্ম্মশালায় পহু-ছিলাম। এবং রাত্রি অধিক হওয়াতে বাজার হইতে লুচি তরকারী ও মিষ্টান্ন আনাইয়া সকলে আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আমরা ধর্ম্মশালার দ্বিতলে ছিলাম। ধর্ম্মশালাটী ঔরঙ্গাবাদ ষ্টেশনের সন্নিকটে। তখনও তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয় নাই। রাজমিস্ত্রি ছুতার প্রভৃতিরা তখনও একাংশে কায করিতেছে। যাগ যজ্ঞ করিয়া শুভদিনে তখনও তাহার ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই।

অনেক অনুরোধে উপরোধে কিংবা জানিনা কিসের
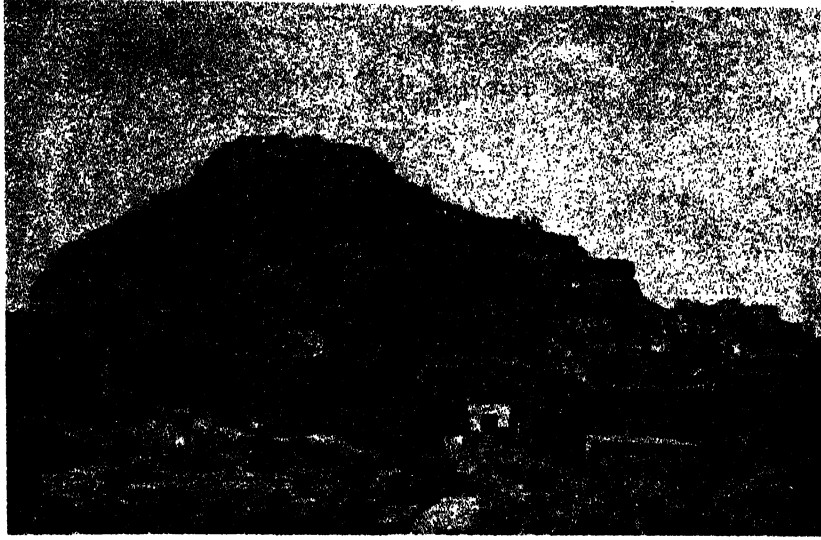
দৌলতাবাদের গিরি দুর্গ

এই ধর্ম্মশালার রক্ষক আমাদের আশ্রয়ের জন্য দুটি ঘরে উপর তলায় খুলিয়া দিয়াছিল। বিদেশীদের পক্ষে এইরূপ একটী আশ্রয়ের কত খানি প্রয়োজন, তাহা সেই রাত্রে আমরা খুবই অনুভব করিয়াছিলাম। এই ধর্ম্মশালা অনুষ্ঠানের সহিত খোলা না হইলেও ইতি মধ্যেই ইহাতে যাত্রী সমাগম আরম্ভ হইয়াছে।

অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে দ্বিতলের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। বৃষ্টিস্নাত পাহাড় বেষ্টিত সহর খানি একখানি ছবির মত দেখাইতেছে। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য্যদেবের কিরণ ধরণীপৃষ্ঠের সিক্ত সবুজ বসন খানি তখনও শুকাইয়া দেয় নাই।

ধর্ম্মশালাটী অনেক খানি জমি লইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। আশে পাশে অনেক গুলি গৃহ, দোকান-পসার।

দোকানী ধীরে ধীরে ঝাঁপ খুলিল। গৃহে গৃহে নর-নারী ও শিশুগণ জাগিয়া উঠিল। চিরন্তন রীতিতে রমণীরা গৃহ দ্বার পরিষ্কার করিতেছে, কেহ বা চুল্লীতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছে। এ অঞ্চলের লোকেরা অত্যন্ত চা ভক্ত। ধনী হইতে দীন দরিদ্র সকলেই চা সেবী। সেই জন্য সকল গৃহেই চা প্রস্তুত হইতেছে দেখা গেল। ধর্ম্মশালার নিম্নতলে এক দল মাড়োয়ারী বরযাত্রী আসিয়া পহুঁছিয়াছে। দলে প্রায় ২৫ জন স্ত্রীলোক, পুরুষ ১৫ জন, বালক বালিকা টী। বরটি কিশোর বয়স্ক বয়স ১৫।১৬ হইবে। বধ

চিনি মহল—গোলকুণ্ডার শেষ রাজা অব্দলহাসান [illegible] এখানে বন্দী ছিলেন

৮।৯ বৎসরের। সকলে মিলিয়া বধূকে আদর করিয়া এক একবার কোলে বসাইতেছে। মাড়োয়ারী মেয়েদের মুখে অবগুণ্ঠন থাকিলেও সমস্বরে গীত ও কথাবার্ত্তা হইতে কোনও কুণ্ঠা নাই।

উঠানে ঘুঁটে সাজাইয়া তাহার উপর এই বৃহৎ দলের জন্ম ডাল ভাত চড়ানো হইল। এবং সের পাঁচেক আটা মাখিয়া গুলি করিয়া তাহার ভিতর ঘৃত পুরিয়া তাহা অগ্নি-দগ্ধ করিতে দেওয়া হইল। আমাদের মত ব্যঞ্জনের বালাই দেখিলাম না। ইহাদের আহারাদি আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত আমরা উপস্থিত ছিলাম না।

ইলোরা যাত্রার জন্ম আমরা শীঘ্র স্নান আহার সমাধা করিয়া ইলোরার পথে ধাবিত হইলাম। জিনিষপত্র ধর্ম্ম-শালার গৃহে তালাবদ্ধ রহিল।

আমীন সাহেব পথপ্রদর্শক সঙ্গে ছিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর পথিমধ্যে আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, এবং বৃষ্টি ধারা সবেগে নামিয়া আসিল। সেই বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ী চলিল। চারিদিককার পরদা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অভ্রের আবরণের মধ্য দিয়া যতটুকু সম্ভব দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। পাহাড় প্রদেশের প্রকৃতি নির্ম্মিত নালা পরিখার মধ্য দিয়া তুমুল বেগে গৈরিক বর্ণের জলরাশি সশব্দে পড়িতেছে। সেই জন্য কোথাও জল দাঁড়াইয়া কাদা হয় নাই।

চাঁদ মিনার পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত

ঔরঙ্গাবাদ সহর প্রাচীর ও গেট দ্বারা রক্ষিত। আমরা সহরের গেট অতিক্রম করিয়া চলিলাম। প্রকাণ্ড গেট, লোহার সূচ্যগ্র ফলক বসানো বৃহৎ দ্বার-সংলগ্ন। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দৌলতাবাদের দুর্গ স্পষ্ট দেখা গেল।

বাম পার্শ্বে জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসাবশেষ দৌলতাবাদকে রাখিয়া আমরা ইলোরার পথে চলিলাম। পাহাড় কাটিয়া পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিয়াছে। আমাদের মোটরও
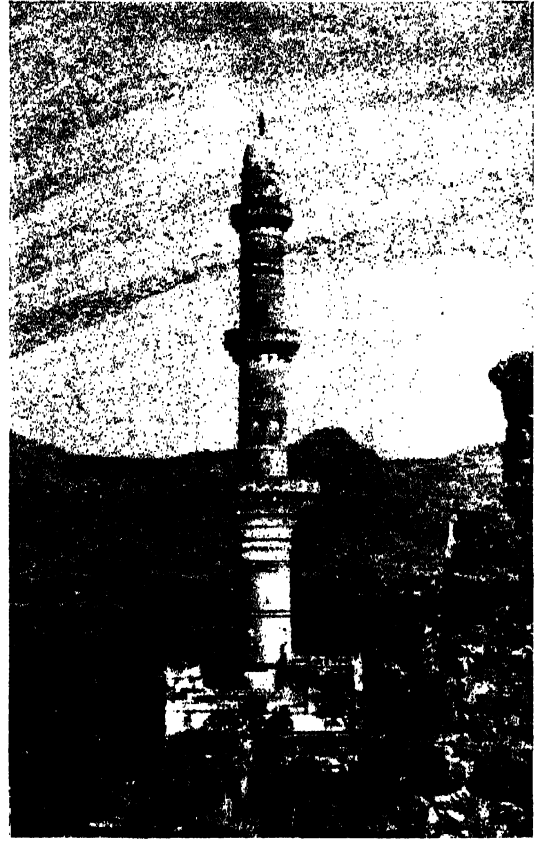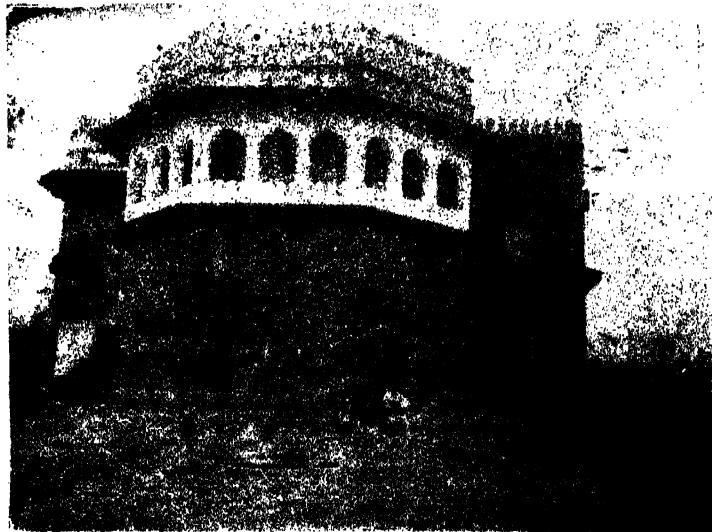
সেই পথে চলিল। এদিকে আর বৃষ্টি নাই। দূরে পাহাড়ের উপর রৌদ্র ঝক ঝক করিতেছে। এদিকেও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ। অনেকগুলি বাঁক। চারি পার্শ্বে সুন্দর দৃশ্য। উচ্চ পাহাড় পথ হইতে দৌলতাবাদের সুউচ্চ চাঁদ-মিনার ও ভগ্ন গৃহ-গুলি দেখা যাইতেছে।

শুনিলাম মহম্মদ তোগলক দেবগিরি ধ্বংস করিয়া এই দৌলতাবাদ সহরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এবং দিল্লি বাসিগণকে বাস উঠাইয়া আনিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইরূপ খেয়ালী রাজার রাজ্যে তখনকার প্রজাবর্গ কিরূপে ধন মান ও প্রাণ লইয়া বাস করিত, তাহাই মনে হইতে লাগিল।

দৌলতাবাদ দুর্গের চূড়ায় শ্রীদুর্গা কামান

আমাদের গাড়ী দুই খানি কখনও উচ্চে কখনও ঢালু পথে নামিয়া অবশেষে চড়াইয়ের উপর কিছুক্ষণ চলিয়া ইলোরার দ্বারদেশে উপনীত হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীঊষা দেবী।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

ঋষির মত শিশুর মত তোমার চরিত্র,
স্নিগ্ধ হৃদয় অমল ধবল কোমল পবিত্র,
দরদ মাখা মিঠা মেঠো সরল অমায়িক,
শরৎকালের কমল ভরা দীঘির মত ঠিক।
ছিলনাক মুখে বুকে কোথাও অভিমান,
সলিল ভরা নয়ন তব, আঁজুল ভরা দান!
ঠকিয়াছ বারম্বারই—ঠকিয়া আহ্লাদ,
বাঙালীকে মানুষ করা জীবন ভরা সাধ।
পদে পদে কৃতঘ্নতায় পায়নি তাহা লয়,
[illegible]।

ভাণ্ডারেরি রিক্ততাতে কমায়নি উদ্যম
দীনকে নারায়ণ ভাবিতে তুমি নরোত্তম।
ধরার মত সহিষ্ণুতা, তৃণের মত দীন,
কর্ম্মে ছিল বিপুল নেশা ফলস্পৃহা-হীন।
ভগবানের উপর ছিল অনন্ত বিশ্বাস,
হরিনামের সঙ্গে নিতে প্রতিটী নিশ্বাস।
দানে তোমার অতুল প্রীতি অসংখ্য পোষ্য,
মহাপুরুষ তুমি—তুমি ধরার নমস্য।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

শিল্প-চয়ন

(শ্রীতরুণকুমার ঘোষ সংগৃহীত)
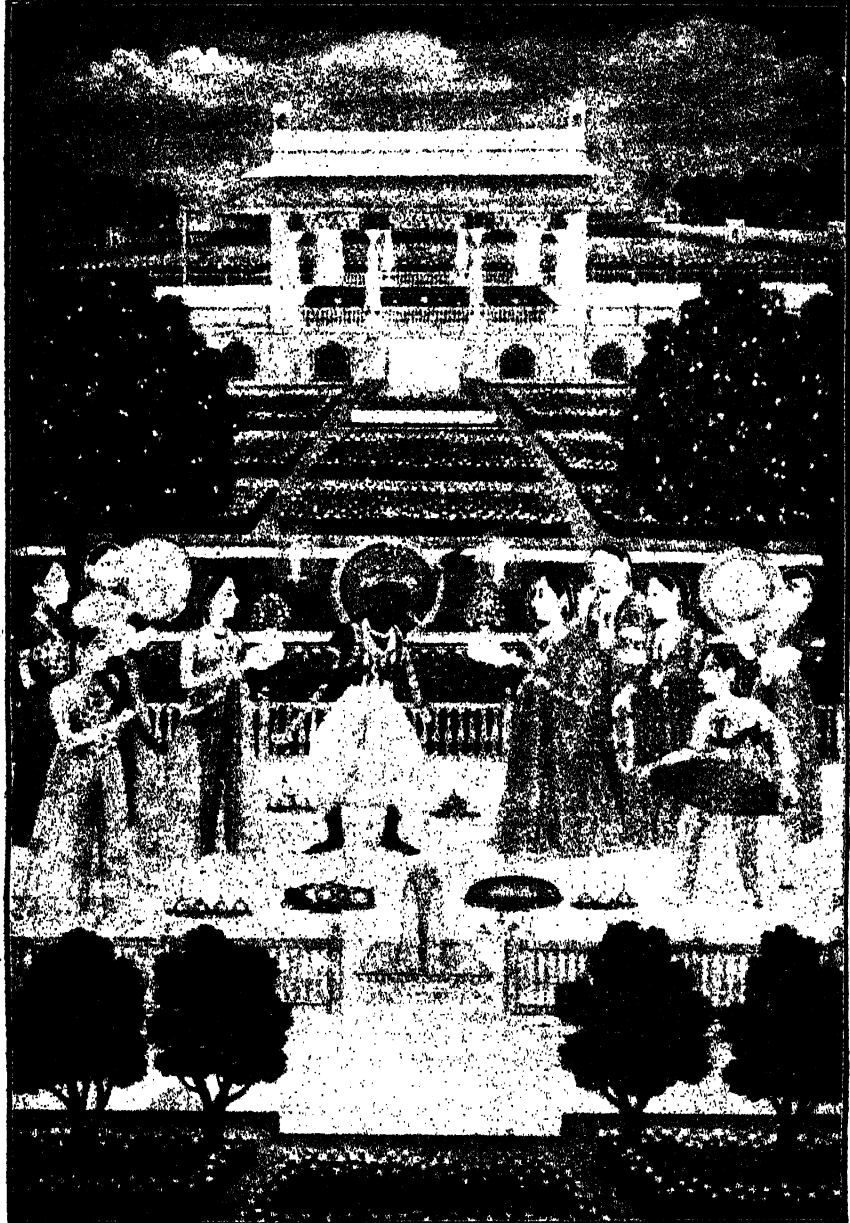
কুঞ্জবিহারী

অলিন্দে

(রাজপুত চিত্রকলা—অষ্টাদশ শতাব্দী)

বিশ্রাম নিরতা মহিলা
(রাজপুত চিত্রকলা—অষ্টাদশ শতাব্দী)

বাজীকর

(রাজপুত চিত্রকলা অষ্টাদশ শতাব্দী)

অশ্বিনীকুমার

(বিগত ৭ই নভেম্বর কলিকাতা আলবার্ট হলে অশ্বিনীকুমার-স্মৃতি-সভায় পঠিত)

৺অশ্বিনীকুমার দত্তের শ্রাদ্ধ-বাসরে আপনারা আমায় সভানেত্রী পদ গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া আমাকে যে একান্ত গৌরব দান করিয়াছিলেন, শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তাহা আমি গ্রহণ করিতে না পারিয়া দুঃখবোধ করিতেছি। আমি এখন প্রবাসে, স্বাস্থ্য-লাভের আশায় আসিয়াছি, পৌর্যের পূর্ব্বে ফিরিতে অক্ষম, তাই আপনাদিগের অনুরোধ মত আমার স্মরণে তাঁহার যে আনন্দ-উজ্জ্বল মূর্ত্তি বিরাজিত আছে, যাহা কখনো ম্লান হইবার আশঙ্কা নাই, সেই স্মৃতি-কথা কয়টী লিখিয়া আজিকার শ্রাদ্ধ সভায় আমার একান্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিব। দূরে থাকিয়াও মনে আজ আমি আপনাদের মধ্যেই সঙ্গীরূপে আছি জানিবেন।

জীবন চরিত পাঠে এবং তাঁহার সহিত বহু বৎসরের পরিচয়ে আপনারা তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানেন। আমি এখানে সে প্রসঙ্গে কিছুই বলিব না, তাঁহার সহিত আমার ব্যক্তিগত যে প্রীতির বন্ধন ছিল তাহাই কেবল জানাইব। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ আমার জীবনে একটী পরম ঐশ্বর্য্য-লাভ। অপ্রত্যাশিত ও অযাচিত দৈব সম্পদের মত, তাই অমূল্য।

বালিকা বয়সে আমরা যখন কৃষ্ণনগরে বাস করিতাম, তখন আমার পূজনীয় মাতুল স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ চৌধুরী ও আমার মাতাঠাকুরাণী প্রসন্নময়ী দেবীর সহিত দত্ত মহাশয়ের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই সময়ে অশ্বিনীকুমারের নাম ও তাঁহার বহু প্রশংসাবাদ শুনিয়াছিলাম, তবে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয় না। পরে আমার বয়স যখন ১৪ কি ১৫ বৎসর, আমরা দেওঘরে যাই। ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আমাদের প্রতিবেশী ও দৈনিক অতিথি ছিলেন। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই অশ্বিনী বাবুর কথা শুনিতাম ও তাঁহাকে

অশ্বিনীকুমার দত্ত (যৌবনে)

দেখিবার জন্য মনে আগ্রহ জন্মিত। বহু বৎসর পরে—আবার ৮৯৬সালে দেওঘর যাই ও দীর্ঘকাল থাকি। সেই সময়ে সর্ব্বদাই অশ্বিনী বাবুর কথা শুনিতাম ও তাঁহার প্রণীত "ভক্তিযোগ" পড়িয়াছিলাম। ইহার পর আবার কত বৎসর অতীত হইয়া যায়। ১৯ ৮ সালে তিনি যখন পীড়িতাবস্থায় ডাক্তার নীলরতন সরকার

মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন, তখনই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরিচিত হইল।

প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতেই আম তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের অধিকারী হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। প্রথম প্রথম তিনি আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমি আপত্তি করায় বলিলেন, "কি জানি বিদুষী ভদ্র-মহিলা যদি চটিয়া যাও তাই ভয়ে ভয়ে বলিয়াছি।" এই বলিয়া তাঁহার প্রাণ খোলা হাসি হাসিলেন। অমন হাসি হাসিতে পারিতেন কেবল ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। সে হাসর উচ্ছ্বাসে চারিদিকের বাতাস যেন নির্ম্মল হইয়া উঠিত। সেই দিন হইতে 'প্রিয়' ও 'তুমি' হইলাম। বড় মা ও গণেশ সঙ্গে ছিলেন, আর সঙ্গে ছিল একটী পীড়িত বালক। তার রোগ ক্ষয়কাস। নিজ বিছানার পাশেই তাহাকে শোয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার অসুস্থ শরীরে অপকার হইতে পারে বলিয়া আপত্তি করায় হাসিয়া বলিলেন—"কর্ত্তার মর্জ্জি।" ছেলেটীকে সঙ্গে লইয়াই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গি াছিলেন।

ইহার পর হইতে তাঁহার সহিত পত্রব্যবহার ছিল। এই সময়ে তিনি আমাকে ও আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল ৺আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়কে হেমচন্দ্রের কথকতা ও মুকুন্দ দাসের যাত্রার পোষকতা করিয়া স্বদেশী ও সামাজিক সংস্কার কার্য্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে অনুরোধ আমরা রক্ষা করিতে অবহেলা করি নাই।

ইহার পর তাঁহার সহিত আমার আর দুইবার সাক্ষাৎ হয়—একবার কলিকাতয় আর একবার বরিশালে। যে বৎসর অতি বন্যায় ও ঝড়ে পূর্ব্ববঙ্গ বিধ্বস্ত হয়, তিনি সেই সময়ে সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা আসিয়াছেন জানিতাম; কয়দিন অতি বর্ষণের উপদ্রবে ঘরের বাহির হওয়া দুষ্কর; দেখি তিনি সেই বৃষ্টি মাথায় করিয়া আসিয়া উপস্থিত। আমি অনুযোগ করিলে বলিলেন, "এখানে আসিয়া তোমায় না দেখিয়া যাইতে পারি না।" একবার বরিশাল যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন। আমরা তাহার কিছুদিন পরে ষ্টীমার যোগে সুন্দরবনের পথে বরিশাল যাই। তখনও বন্যা প্রশমিত হয় নাই। খুলনার ঘাটে যখন আমাদের ষ্টীমার আসিল, ত'হার পূর্ব্ব হইতেই কত গো মহিষাদি ভাসিয়া যাইতে দেখিলাম তাহার সংখ্যা হয় না। তখনও নদী ভরা তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে বিক্ষুব্ধ। আমাদের ষ্টীমার খুলনা ঘাট ছাড়িবার পূর্ব্বে প্রভাতের উজ্জ্বল অরুণালোকে দেখিলাম একজন সধবা রমণীর মৃতদেহ ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহার দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশরাশি জলের আন্দোলনে উঠিতেছে পড়িতেছে—হাতের দু'গাছি বালা আর সিঁথির সিন্দুর সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মৃতা রমণীর দেহ জীবিতার মতই সৌষ্ঠব সম্পন্ন। এখনও এ অঞ্চলে বন্যার বিপদ কত যে আধুনিক তাহা এই দৃশ্যে বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আমরা যাঁহাদের সহযাত্রী হইয়াছিলাম তাঁহারা বন্যা প্লাবিত স্থান সকলের কেন্দ্রস্থান গুলিতে সাহায্য বিতরণের জন্যই যাইতেছিলেন। স্থির ছিল, বরিশালে অশ্বিনীকুমারের কাছে তাঁহাদের কার্য্য-বিবরণী দিয়া আবশ্যক অর্থসাহায্য লইয়া খুলনা আসিয়া আমাদের ট্রেণে তুলিয়া দিয়া গোয়ালন্দ মুখে আবার যাত্রা করিবেন। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী যে যাইতেছেন, তার-যোগে অশ্বিনী বাবুকে সে সংবাদ জানান হইয়াছিল, তবে আমি আর মাতাঠাকুরাণীও যে তাঁহাদের সঙ্গী, তাহা জানাইতে দিই নাই। প্রথম কারণ তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম এবার বরিশালে গেলে তাঁহাদের বাড়ীতে কিছুদিন থাকিব, ঘটনাচক্রে তাহা সম্ভব ছিল না। পূজার ছুটীতে গিয়াছিলাম, সম্মুখে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, মাতাঠাকুরাণী বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত, সময় সংক্ষেপ, কাযেই একরাত্রির অধিক সময় থাকিবার আশা ছিল না, তাই এক্ষেত্রে হঠাৎ গিয়া পড়িলে অশ্বিনী বাবু ও বড় মা কত খুসী হইবেন মনে করিয়া আমাদের যাইবার কথাটা গোপন রাখা গিয়াছিল।

আমরা রাত্রে বরিশালে পৌছিলাম। মনে নাই কি কারণে বিলম্ব হইয়াছিল, ডাক বাংলাতে বাসা লওয়া গেল। সঙ্গী বন্ধু ভদ্রলোকটি প্রাতে অশ্বিনী

বাবুর বাড়ী গেলেন। বন্ধুপত্নী, তাঁহার এক পুত্র মাতা-ঠাকুরাণী ও আমি ডাক বাংলায় রহিলাম।

দশটার কিছু পর অশ্বিনী বাবুকে লইয়া বন্ধু ফিরিয়া আসিলেন। বন্ধু-পত্নী অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন, আমরা তখনও নেপথ্যে রহিলাম। শিষ্টাচার সমাধা করিয়া যখন তাঁহারা সুখাসীন, বন্যার প্রসঙ্গে একেবারে নিমগ্ন, প্রায় সেই অবসরে আমরা সেখানে গেলাম। অশ্বিনী বাবু এতই খুসী হইলেন, এত হাসিলেন, মাকে এতবার প্রণাম করিলেন ও আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য এতই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তিনি চলিয়া যাইবার পর, বন্ধু-পত্নী সন্দেহ প্রকাশ করিলেন যে, বৃদ্ধ ভদ্র লোকটী বোধ হয় পাগল। আমি তাঁহাকে বলিলাম "তুমি আমি অমন পাগল হইতে পারিল পৃথিবী স্বর্গ হইত।" আর মনে পড়িল ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গান "পাগলকে যে পাগল ভাবে" ইত্যাদি।

সেই তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ। তাঁহার সে আনন্দোজ্জ্বল দীপ্ত মুখচ্ছবি, স্নিগ্ধ স্মৃতিতে চিরদিন জীবন্ত হইয়া থাকিবে। কবি বলিয়াছিলেন—

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটী জীবন
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।

বিরোধ-বাধা-বিক্ষুব্ধ বরিশালের সম্মুখে অশ্বিনীকুমার এই পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার মন্ত্রৌষধি গুণে বিরোধ স্থলে সাম্য মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তিনি কর্ম্মী হইয়াও যোগী ছিলেন, বিষয়ী হইয়া হইয়াও ভক্ত ছিলেন, লোকগুরু, জননায়ক, পতিতের সহায়, পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা, দেশসেবক, স্বদেশ প্রেমিক অনেক কিছুই ছিলেন। আশ্চর্য্য ছিল তাঁহার কার্য্য-তৎপরতা ও সংগঠনী শক্তি। একাধারে এতগুণ কচিৎ দেখা যায়। বরিশালের জন্য তিনি যেন পরিত্রাণায় সাধুনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্ আসিয়াছিলেন। তবে তাঁহার চরিত্রে বজ্র-কঠোরতার সঙ্গে মনে যে কুসুম সৌকুমার্য্য ও সরল মাধুর্য্য ছিল, তাহাই আমার মনের উপর একান্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই মাধুর্য্যই পৃথিবীকে স্বর্গ এবং ভক্তকে ভগবানের সান্নিধ্য দান করে। আজ সেই মধু মন্ত্রের সাধকের তর্পণ দিন, আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের তিথি, আজ যেন, "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ। মধু নক্তমুতষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমান অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বী র্গাবো ভব স্তুনঃ।"

রাঁচি ২৫।১০।২৯।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রবাসী

বিদায়ের ব্যথা বুকে চেপে আমি
নামিনু পথের মাঝে;
ছল ছল তার মলিন নয়নে
তখনো অশ্রু রাজে।
কত ব্যথা নিয়ে বিদায়ের পলে
আসিয়া দাঁড়াল বাতায়ন-তলে
আঁখি দুটি পুন ভ'রে গেল জলে,
কি বেদনা হৃদে বাজে!

সুদূর প্রবাসে আজি বার বার
মনে পড়ে মুখ খানি;
হৃদয়ে বেদনা গুমরিয়া ওঠে,
কোথায় হৃদয়-রাণী!
উতলা আকুল পাপিয়ার তান
মরমে জাগায় পুরানো সে গান,
ব্যাকুল আমার বিকল পরাণ,
কেন ওগো নাহি জানি।

শ্রীকালিদাস নন্দী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শোক-সংবাদ

অজাতশত্রু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিগত ৭ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে আমাদের পরম সুহৃদ্ প্রবীণ সাহিত্যিক সুধীন্দ্রনাথ ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। সুধীন্দ্রনাথ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছোট গল্প ও কবিতা যিনি পড়িয়াছেন তিনি কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহার চিত্র-রেখা, চিত্রালী, বৈতালিক, মঞ্জুষা, দোলা গ্রন্থগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প পড়িলে যেমন 'কাবুলীওয়ালা' হৃদয়ে জাঁকিয়া বসে, সুধীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের মধ্যে 'কাশীমের মুরগী'কে তেমনি ভোলা যায় না। তাঁহার ছোট ছোট কবিতা অনবদ্য— সুন্দর। তাঁহারই উদ্যোগে "সাধনা" মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনবৎসর কাল তিনি ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

মানুষ হিসাবে এমন অমায়িক, স্থির, ধীর, বিনয়ী ও শান্তপ্রকৃতির লোক দেখা যাইত না। একবার যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে পরম হিতৈষী বলিয়া গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ নবীন সাহিত্যিকগণকে তিনি যে কিরূপ স্নেহ করিতেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাস করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন হাইকোর্টে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু তারপর আর যাইতেন নাই। তিনি বলিতেন, "ও ব্যবসা আমার ধাতে সহিবে না।" তিনি স্বল্প ও মৃদুভাষী ছিলেন, তবে প্রাণটা তাঁহার বরাবর কবিজনোচিত ছিল। আমরা তাঁহার ন্যায় বন্ধুকে হারাইয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি।

অক্লান্তকর্ম্মী সুরেন্দ্রনাথ রায়

বিগত ১১ই নভেম্বর সোমবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বেহালার বাসভবনে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার জন্ম—১৮৬২ খৃষ্টাব্দ এপ্রিল (১২৬৮ বঙ্গাব্দ ১লা বৈশাখ)। বিখ্যাত জমীদার স্বর্গীয় রায় অম্বিকাচরণ রায় বাহাদুরের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে থাকেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট পসার ও প্রতিপত্তি হয়। এই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। শাসন-সংস্কারের পর তিনি ব্যবস্থাপক সভা হইতে বাঙ্গালার ভারতীয় বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। প্রথমে ডেপুটী প্রেসিডেন্ট হ'ন এবং কয়েক মাস সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা বিল পেশ করেন এবং বহু চেষ্টায় উহা পাশ করাইতে সমর্থ হ'ন। মেষ্টন এওয়ার্ড সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট অভিমত পাঠাইবার জন্য ব্যবস্থাপক সভা তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করেন।

কর্পোরেশনের কমিশনর (১৮৯৫ খৃঃ), সাউথ সাবার্বান মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান (১৯০০-১৯২৯), সেক্রেটারি বোর্ড,২৪ পরগণা জিলা বোর্ড লোক্যাল বোর্ড,এই তিনটীর প্রথম সদস্য, মিউনিসিপালিটী গার্ডনরীচ মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যান, বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯১৩) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহঃ সভাপতি, জমিদার সভার অবৈতনিক সম্পাদক, বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-সমিতি, বঙ্গীয়-শিল্প-সমিতি—এই দুই সমিতির কোষাধ্যক্ষ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য, রাজবন্দী মুক্তি কমিটির চেয়ারম্যান।

তাঁহার রচিত গ্রন্থ—

১। Native States of India (Gwalior)

২। Some nots on financial condition in Bengal.

৩। Some suggestions for the election of present economic problems.

৪। Select speeches of Surendranath Ray.

গৌড়-রাজর্ষি মণীন্দ্রনাথ

বিগত ১১ই নভেম্বর সোমবার রাত্রি দেড় ঘটিকায় আমরা একজন পুণ্যশ্লোক রাজর্ষিকে হারাইয়াছি। কাশীমবাজারাধিপতি ঐ সময়ে ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতার ৩০২ নং সার্কুলার রোডস্থ ভবনে পরলোক-গমন করেন। মণীন্দ্রচন্দ্র ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ হয়। পরে তিনি তাঁহার মাতুলানী মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাজ উপাধিভূষিত হন। ইহার পর তিনি দানবীর দানশৌণ্ড বলিয়া বঙ্গে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ৩২ বৎসরের মধ্যে তিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য এক কোটী টাকার উপর বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে দান করিয়াছিলেন। তিনি বহরমপুরে তাঁহার মাতুল কৃষ্ণনাথের নামে কলেজ স্থাপন করেন।

বহরমপুর কলেজে যখন যে টাকার প্রয়োজন হইয়াছে তাহা তিনি অকাতরে প্রদান করিয়াছেন। দৌলতপুর কলেজও তাঁহার নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছে। কাশী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় ও বসু ইন্‌ষ্টিটিউটে তিনি ২ লক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজে তাঁহার দান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার দানের তালিকা দিতে হইলে একটী বড় বই লিখিতে হয়। প্রতি বৎসর তিনি অন্যূন ১৫০ ছাত্রকে অর্থ-সাহায্য করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত ভূমির উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠিত।

তিনি ১৫ বৎসর ধরিয়া বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটী ও মুর্শিদাবাদ জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি ও বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। ভাইসরিগাল কাউনসিলেরও তিনি সদস্য-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের চুঁচুড়ার পঞ্চম অধিবেশনে তিনি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি বাঙ্গালার শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বহু সাহিত্য-সেবীকে তিনি অর্থ-সাহায্য করিতেন। তিনি নিজেও বঙ্গ-সাহিত্যের সেবক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে আমরা একজন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবকেও হারাইয়াছি। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য চারি লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। এত বড় মহারাজ তিনি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গৃহে অবারিত দ্বার। সকলকেই তিনি মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করিতেন। ইঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নয়।

এবারের সাময়িক-প্রসঙ্গের প্রধান কথা মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের ঘোষণা-বাণী। বিগত ৩১শে অক্টোবর, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর বড়লাট বাহাদুর দিল্লীতে এক ঘোষণা-বাণী প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সেই সুদীর্ঘ ঘোষণার আগা-গোড়া তুলিয়া দিবার স্থান আমাদের নাই এবং তাহার বিশেষ যে কোন প্রয়োজন আছে, তাহাও আমরা মনে করি না, কারণ বিজ্ঞ রাজ-নীতিক পণ্ডিতের মত তিনি বেশ বুঝিয়া-সুঝিয়া তাঁহার বাণী-প্রচার করিয়াছেন এবং তাহাতে মামুলী আশা-ভরসার কথাও সুন্দর ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। সে সকল বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া তাঁহার ঘোষণা-বাণীতে যে কয়টী মূল কথা পাওয়া যায়, তাহা এই—(১) ভারতবর্ষে উপ-নিবেশিক শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠা করাই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য, (২) সাইমন কমিশন ও ভারতীয় কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার আলোচনা করিবেন, (৩) তাহার পর ভারতের বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণ ও সমস্ত রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালীর খসড়া প্রস্তুত করা হইবে, (৪) এবং ঐ খসড়া পার্লিয়া-

মেণ্টের লর্ড ও কমন্স সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি আলোচনা করিয়া এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবেন, (৫) ঐ পাণ্ডুলিপি পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইলে তদনুসারে ভারতবর্ষ শাসিত হইবে।—ইহাই হইল বড়লাট বাহাদুরের ঘোষণা বাণীর সার মর্ম্ম।

এই ঘোষণা প্রচারিত হইবার দুই দিন পরে দিল্লীতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের একটী আলোচনা-সভা বসে। সেই সভায় মহাত্মা গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন। বড়লাট বাহাদুরের ঘোষণা-বাণী লইয়া খুব আলোচনা হয় এবং অবশেষে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারিগণ বিশেষ যত্নসহকারে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুরের ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়াছি। ঘোষণায় সারল্য এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় জনসাধারণের অভিমতের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টার বিষয় আমরা উপলব্ধি করিতেছি। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের আবশ্যক অনুযায়ী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে যে চেষ্টা করিতেছেন, আমরা তাহাতে সহযোগিতা করিতে পারিব বলিয়া আশা করি। তবে দেশের প্রধান প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বাস ও সহযোগিতা অর্জ্জন করিবার জন্য কয়েকটি কার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি।

সকলে যাহাতে মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে পারেন এজন্য একটী সাধারণ মিলন-নীতির প্রবর্ত্তন আবশ্যক; রাজনৈতিক বন্দিগণকে মুক্তি প্রদান প্রয়োজন, প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে জনসাধারণের প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে ভারতের কংগ্রেস সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত বলিয়া তাহা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বড়লাট বাহাদুর যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ইহা এইরূপ বুঝিতেছি যে, কবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে বিষয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক হইবে না। কিন্তু ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালীর কার্য্যপদ্ধতি রচিত করিবার জন্যই সম্মেলনের বৈঠক হইবে। আমরা আশা করি যে, বড়লাট বাহাদুরের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় যে আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমরা ভুল করিতেছি না।

যে পর্য্যন্ত নূতন শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত না হয় সে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অধিকতর উদার নীতির অনুসরণ করা আবশ্যক। প্রস্তাবিত সম্মেলনের উদ্দেশ্যে শাসন ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে অধিকতর সামঞ্জস্য স্থাপন এবং বিধিসঙ্গত উপায় ও কার্য্য প্রণালীর উপর অধিকতর সম্মান প্রদর্শন প্রয়োজন।

জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়া দরকার যে আজ হইতে দেশে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছে—নূতন শাসন বিধান কেবল মাত্র তাহার নিদর্শনরূপে কার্য্য করিবে। সম্মেলনের সকল দিক বিবেচনা করিয়া ইহার সাফল্যের জন্য, আমরা মনে করি যে, যত শীঘ্র সম্ভব উহা আহ্বান করা প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত নেতৃবর্গ ইহাতে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন—

মিঃ গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল, স্যার তেজ বাহাদুর, ডাঃ এনি বেসান্ত, ডাঃ আন্সারী, মিসেস্ সরোজিনী নাইডু, ডাঃ মুঞ্জে, মিঃ এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, মিঃ শেরওয়ানী, মিঃ জে, এম, সেন গুপ্ত, মিঃ এনি, ডাঃ বি, সি, রায়, মিঃ ভি, জে, প্যাটেল, মিঃ সৈয়দ মহম্মদ, মিঃ জগৎনারায়ণ মল, মিঃ খলিলুল জমান, মিঃ সর্দ্দার সিং, সার আবদার রহিম, মামুদাবাদের রাজা, সার আলি ইমাম, মৌলানা আবুল কাশেম আজাদ, মিঃ বিজয়রাঘব আচারিয়া প্রভৃতি; এবং আরও ২৭ জন ভারত-নেতা ইহাতে স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন।

এবার, আগামী সরস্বতী পূজার সময় কলিকাতা ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে এবং প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ও মাননীয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথাক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভবানীপুর অঞ্চলের খ্যাতনামা সাহিত্য-সেবকগণের দ্বারা একটী কার্য্য

নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে, এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। এক্ষণে সম্মেলনের সভাপতিগণের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। মূল সভাপতি হইয়াছেন বিশ্ব-কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। সাহিত্য-শখার সভা-নেত্রী হইবেন শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী মহশয়া, দর্শন-শাখা সভাপতি হইবেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়; ইতিহাস-শাখার অধিনায়কত্ব করিবেন শ্রীযুক্ত কুমার শরৎ কুমার রায় মহাশয়; এবং বিজ্ঞান শাখার ভার গ্রহণ করিবেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়। এই নির্ব্বাচন যে অতি সুন্দর হইয়াছে, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। ভরসা করি, পূর্ব্ব বৎসরের মাজু অধিবেশনের মত শেষ মুহূর্ত্তে সভাপতি বিভ্রাট হইবে না, তাহা হইলেই ভবানীপুরের সম্মেলন সর্ব্বাংশে সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

আর একটি সম্মেলনের কথা এই উপলক্ষে মনে আসিতেছে। সেটী প্রবাসী-সাহিত্য সম্মেলন। ইন্দোরের সাহিত্য-সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের জলধর দাদা বলিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন যে, প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনের আগামী অধিবেশন বড় দিনের ছুটীতে নাগপুরে হইবে। বড়দিনের ত আর বিলম্ব নাই; এক মাস পরেই বলিতে গেলে বড়দিন আরম্ভ হইবে। কিন্তু নাগপুরের কোন সাড়াশব্দই ত আমরা পাইতেছি না। তবে নাগপুরের যাঁহারা ইন্দোরে উপস্থিত হইয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিলেন? তাহা হইলেও, সে সংবাদটা খবরের কাগজের মারফৎ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য ছিল।

এসম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে নাগপুর সাহিত্য সম্মেলন নাগপুর হইতে ইংরাজী ভাষায় লিখিত, টাইপ করা একখানি বিজ্ঞপ্তি-পত্র আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। তাহাতে প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের কোন প্রসঙ্গই নাই। তাহা হইতে এই সংবাদ অবগত হওয়া গেল যে, নাগপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং এই শাখার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ ঐ বিজ্ঞপ্তি পত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, নাগপুরের বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরা এই শাখার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করা, তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি-পত্র ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইল কেন? যিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালী, তাঁহার ন ম মাননীয় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু। বিজ্ঞপ্তিপত্রে পাঠে বেশ বোঝা গেল, তিনি ইংরাজী ভাষাতেই তাঁহার অভিভাষণ দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা ইংরাজীতে কি বাঙ্গালায় তাহা ঠিক ধরিতে পারা গেল না। শ্রীযুক্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই বিজ্ঞপ্তি পত্র আমাদের নিকট প্রেরণ করা উপলক্ষে যে দুইতিন লাইন স্বহস্তে লিখিয়াছেন, তাহাও বাঙ্গলায় নহে, ইংরাজীতে। বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের শাখা স্থাপিত হইল, বাঙ্গালী ভদ্র লোকেরাই ইহার অনুষ্ঠাতা, অথচ সবই ইংরাজীতে—ইহা বড়ই বিসদৃশ বোধ হইল।

বরিশালের স্বদেশ-নেতা শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বিরুদ্ধে ১১০ ধারার যে মামলা উপস্থাপিত হইয়াছিল এবং বরিশালে কিছুদিন সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণের পর যে মামলা কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, সে মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রবাবুকে তিন বৎসর কাল সৎ ভাবে থাকিবার জন্য পাঁচ হাজার টাকার জামিন ও পাঁচ হাজার টাকার মুচলেকা দিতে হইবে; অন্যথায় তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার সঙ্গে আর যে কয়েকজন অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিও ঐ প্রকারের দণ্ড বিহিত হইয়াছে; তবে পরিমাণে কম। সতীন্দ্রবাবু এই দণ্ডাদেশ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, জানা যায় নাই; এখন ত তিনি সুদীর্ঘ অনশন জনিত অবসাদগ্রস্ত। এদিকে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভবানীপুরে এক সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে সিডিশনের ধারায় পড়িয়া এক বৎসরের জন্য তাঁহার কারাদণ্ড হইল। শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রলোক দক্ষিণ কলি-

কাতায় বে-আইনী শোভাযাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিশি মহাশয় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গীদিগের বিচার এখনও শেষ হয় নাই। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে গুরুতর রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের মামলা চলিতেছে। আর 'বেণু' ও 'স্বাধীনতা' নামক দুইখানি পত্রের বিরুদ্ধেও রাজদ্রোহের অভিযোগ চলিতেছে। ইহা ছাড়া মফস্বলে—খুলনায়, যশোহরে, কৃষ্ণনগরে ও বাঁকুড়ায় রাজদ্রোহের অপরাধে কয়েকজন অভিযুক্ত হইয়াছেন। মীরাট ও লাহোরের রাজসূয় যজ্ঞের অবসান যে কবে হইবে, তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

ছুটি

বন্ধু, বন্ধু, দাও অবসর আজ!
ফুরিয়ে গেছে খেলা আমার,
ফুরিয়ে গেছে কায।
কর্ম্মশালার কোলাহল ঐ আসে থেমে থেমে,
সন্ধ্যা এল নেমে,
এল অন্ধকার,
আর কি হাঁটতে পারি বন্ধু, খাটতে পারি আর?
ক্লান্ত দেহ—দাও আমারে ছুটি,
ধূলার মানুষ ধূলা হয়ে ধূলার 'পরে লুটি।
চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে,
ঘুম পেয়েছে ভাই,
থির হয়ে এই নিথর রাতে ঘুমাতে আজ চাই।

সাঙ্গ ক'রে কায,
সঙ্গীরা সব এগিয়ে গেল অনেক,
ডাকলাম আমি এত,
শুনতে পেলেনাকো তারা, দাঁড়াল না ক্ষণেক।
ছুটতে ছুটতে তবু ত আজ এলাম এত দূর;
নদীর তীরের কাছে,
মনে হল হয়ত তারা আমার প্রতীক্ষায়
দাঁড়িয়ে সেথা আছে।
এসে দেখি বইছে শীতল হাওয়া,
কোথাও ত কেউ নাই;
সর্ব্বশরীর শ্রান্ত—এ সৈকতে
বিশ্রাম তাই চাই।

পরপারের অন্ধকারে
খেয়ার নৌকা ঐ না দেখা যায়?
আমায় ফেলে যাস্‌নি নেয়ে,
আয় রে ফিরে আয়,
হেথায় ফিরে আয়!
দূরের পথে যাত্রী হব আমি,
যেথায় চাবে, ওদের সাথে সেথায় যাব নামি।
এই পারেতেই রেখে দিয়ে কান্নাকাটি এ-পারের আমার,
তোমায় শুধু হাসিটুকু দেবো উপহার,
পরপারের মাঝি!
অশ্রু দিয়ে ধুয়ে দেবো হৃদয়-ফুলের সাজি;
সকল মলিনতা আমার করব পরিহার।
ঐ খেয়াতেই নিয়ে চল আমায় পরপার।
বন্ধু, বন্ধু, শুনলে না সে কথা,
বৃথাই আমার অনুনয় গো, বৃথাই আকুলতা?

চেষ্টা আমি করেছি ত ভাই,
করতে আমার কায;
হয়ত খানিক ভুল হয়েছে, হয়ত খানিক পারিনিক,
তাই ব'লে কি আজ
চাইতে আমি পারব না আর আমার অবসর?
খেলুনীরা চলে গেছে—কিসের খেলাঘর?
নদীর ধারে শীতল এ সৈকতে
শয়ন হল পাতা;

কুলু কুলু বইছে স্রোতোধারা, মর্ম্মরিয়া উঠছে গাছের পাতা,
নিঃশবদে পড়ছে ঝ'রে দু'চারিটি ফুল,
থেমে আসে দুরু দুরু ক্লান্ত বুকের ধ্বনি,
হারিয়ে ফেলি সীমা আমার, হারিয়ে ফেলি কূল,
হারিয়ে ফেলি দিবস-রজনী।
ঘুম পেয়েছে—ঘুমোতে আজ চাই,
যারা আছে করুক তারা কায,
সেথায় কেন আমায় খোঁজ ভাই?
অবসাদে জীবন পড়ে নুয়ে,
আর কেন গো, এইখানেতেই পড়িনাক শুয়ে?
বিশ্রাম চাই বন্ধু,
দাও আমারে ছুটি,
ধূলার মানুষ ধূলা হয়ে ধূলার উপর লুটি।

শ্রী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

সাহিত্য

মাসিক বসুমতী—আশ্বিন।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বিষয়টি সুরচিত ও চিত্তাকর্ষক। বুদ্ধদেবের শিষ্যগুলির পরিচয়ও সুখপাঠ্য। প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য এই যে, লেখক পুরাতন বৌদ্ধযুগটিকে ছবির মত পাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শিষ্যেরা কোন্ কোন্ বিষয়ে বুদ্ধদেবের সহিত একমত হন্ নাই তাহার আলোচনাটুকুও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সেকালে স্বাধীন চিন্তার কিরূপ প্রসার ছিল তাহা প্রবন্ধটি পাঠ করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন। প্রবন্ধটী ছোট, আশা করি লেখক এই আলোচনা সংক্ষেপে শেষ করিবেন না। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। উপযুক্ত লেখক সে কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। আমরা আরও বিশদ আলোচনার প্রত্যাশায় রহিলাম।

অভিভাষণ—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নিজ চতুঃপঞ্চাশত্তম জন্মদিনে প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতির সভ্যগণের অভিনন্দন শুনিয়া লেখক যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাই এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রবন্ধটির বহুল প্রচার আবশ্যক। অনেকে মনে করেন, আজকাল যাহা 'তরুণ সাহিত্য' নামে প্রচলিত, শরৎচন্দ্রই তাহার প্রধান উৎসাহদাতা। প্রবন্ধটি পাঠ করিলে পাঠক স্পষ্টই বুঝিবেন 'তরুণ সাহিত্য' সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কিরূপ। তিনি বলেন "নবীন সাহিত্য যা আজকাল খবরের কাগজে, মাসিক পত্রে ও নানা ভাবে অনবরত বেরুচ্ছে—গত এক বৎসর আমি সে সকল যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েছি * * * আজ আমাকে দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে—জিনিষটা সত্যই বিশ্রী হয়ে উঠেছে। * * আমি যাকে রস ব'লে বুঝি তাদের ভিতর তার বড্ড অভাব। * * * একটা মানুষের হৃদয়বৃত্তির যত ভাগ আছে তার একটা ভাগ যেন তাঁরা অনবরত পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, সে যেন আর থামে না।"

কতকগুলি তরুণী এক সময়ে লেখককে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও লেখকের ভাষায় উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। তাঁহারা বলিয়াছিলেন "আমরা লিখতে জানি না, সেই জন্য আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি না। আজকাল যা হচ্ছে তাতে আমরা লজ্জায় মরে যাই। * * * প্রতিবাদ ক'রে কিছু লিখ্‌লে তারা গালিগালাজ আরম্ভ করবে। * * সেই জন্য সব সহ্য করে যাচ্ছি।"

আশা হয় এই সব উক্তির পর 'তরুণ সাহিত্যে'র রচয়িতারা সংযম শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন।

উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন, "এক বৎসর যদি বেঁচে থাকি আবার আসব। না থাকি ত ভালই হয়।"—চুয়ান্ন বৎসর বয়সে আর তাঁহার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই একথায় আমরা ব্যথিত। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পিনালকোডে বিবাহ-বিধি—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সর্দ্দার বিলের প্রতিবাদ। রচনা যুক্তিপূর্ণ, সারবান্ ও প্রাঞ্জল। আইন দ্বারা বলপূর্ব্বক বিবাহের সময় বৃদ্ধি করা লেখকের মতে অনুচিত।

প্রবাসী—কার্ত্তিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রাবলী—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

লেখক বলেন "Bengal Past and Present এ (1914 Vol vll) ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে ইংরাজীতে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি পত্র আছে। এই পত্রগুলিরই অনুবাদ এস্থলে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি বঙ্গীয় পাঠকের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিবে। এই পত্রগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক কথাই আছে। তবে পত্রে শব্দের চেয়ে লিখিবার ভঙ্গীটি (style) লেখকের অধিকতর পরিচয় দান করে। সেই জন্য ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ পাঠকগণকে ইংরাজী পত্রগুলির অনুসন্ধান করিতেই হইবে। লেখক মাঝে মাঝে তাহাদের অংশ উদ্ধৃত করিয়া কতকটা সাহায্য করিতে পারিতেন। তাহা হইলে অনু-

বাদে দুইএক স্থানে যে অস্পষ্টতা দোষ লক্ষিত হয়, তাহা স্পষ্ট হইতে পারিত।

হিমালয়পারে কৈলাস ও মানস সরোবর—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। সুন্দর ও সুপাঠ্য রচনা। ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

যুগগুরু রামমোহন—শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন।

মধ্যযুগের সাধকদের বর্ণনা ও তাঁহাদের উক্তিগুলি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। লেখক বলেন, সেই সব সাধকদের ত রামমোহনও এই বৈজ্ঞানিক-সমস্তাবহুল যুগে মিলনের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন। রামমোহনের মহত্ত্ব আমরা অস্বীকার করি না, তবে ধর্ম্মজগতে তিনি এদেশের যুগগুরু কি না এখনও তাহারা মীমাংসা হয় নাই। লেখক এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ভাল হয়।

নব্যচীন ও বাঙ্গলা—ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ—শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মজুমদার।

প্রবন্ধটি সাময়িক। চীনজাতি কিরূপে উন্নতিলাভ করিল এবং চীনের যুবকগণ কিরূপে এই নব অভ্যুদয়ে সহায়তা করিল তাহার বর্ণনার পর বঙ্গীয় যুবকগণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আজকাল বিদেশের অনুকরণে এদেশেও যুবকসম্মেলনের ব্যবস্থা হইতেছে। অনেক বক্তা যুবকদের নিকট একটু সহজে গুরুগিরি করিবার অবকাশ পান্ এবং তাহাদের তোষামোদ করিয়া একটা দলও গঠন করেন। তারপর এই দলটি প্রায়ই তাঁহার স্বার্থ দেবতার বলিরূপে নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে এদেশের যুবকগণ বিগত কয় বৎসর ধরিয়া আজ পর্য্যন্ত কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা মুখে না বলিলেও অনেকে অন্তরে অন্তরে জানেন। ধ্বংসনীতির কথাই ইহাদের বলা হয় এবং দলটিও গুরুদেবের একান্ত বাধ্য হইয়া পড়ে। প্রফুল্লচন্দ্র কিন্তু যুবকসমাজকে বলিয়াছেন—"গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ কর, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চীন যুবকের মত অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।" প্রত্যেক যুবকেরই প্রবন্ধটি পাঠ করা উচিত। ইহা অন্যান্য যুবসম্মেলনের বক্তৃতার মত অসার নয়।

পরিচ্ছদের ইতিহাস আলোচনা—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই আলোচনার আবশ্যকতা কি এবং কিরূপে তাহা হইতে পারে তাহা লেখক সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। একশত বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালী কেরাণী ও স্ত্রীলোকের চিত্র পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিবে। যাঁহারা পরিচ্ছদের ইতিহাস আলোচনা করিতে চান তাঁহারা প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন।

সুইটজারল্যাণ্ডে গিরি অভিযান—শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়।

বর্ণনা সুন্দর ও সুপাঠ্য। প্রত্যক্ষ বিষয়ের বর্ণনা কিন্তু যেরূপ প্রাণময় হওয়া উচিত তাহা হয় নাই।

সাহিত্য বিচার—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপসংহারে কবি বলিতেছেন—"সাহিত্যের বিচার হচ্ছে, সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এ ব্যাখ্যা মুখ্যতঃ সাহিত্য বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিম্বা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সে রকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।"

কবিবরের বিশ্লেষণ নৈপুণ্য অসাধারণ। সাহিত্য বিচার মুখ্যতঃ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নিপুণ, সুন্দরভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।

বিচিত্রা—আশ্বিন।

শারদোৎসব—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সুচিন্তিত প্রবন্ধে কবিবর বুঝাইতে চাহিয়াছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত মানবের প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে হইলে মানব-চিত্তে "প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করিতে হইবে"—আর এইরূপ করিতে পারিলেই উভয়ের "মিলন সার্থক হইবে ও সেই মিলনের ফলে মানব পূর্ণতা লাভ করিবে।" সুতরাং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে—এই সকল উৎসবে প্রাণ-মন দিয়া যোগদান করিতে পারিলে আমরা সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিব না। এই সকল ঋতু উৎসবে "প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পেয়েছে সেইটেকে বাইরে নানারূপে নানা রসে শোধ করে দিচ্ছে।" এই শক্তি প্রকৃতির নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। "বিশ্ব-প্রকৃতিতে ও মানবপ্রকৃতিতে এই অমৃতের প্রকাশকে বলে সৌন্দর্য্য; আনন্দরূপমমৃতম্।" এই সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিয়া অমৃতের অধিকারী হইতে হইবে। এত অল্প পরিসরের ভিতর এই দুরূহ বিষয় সাধারণকে বুঝাইতে গিয়া কবিবর যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না।

পথে-প্রবাসে—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতেছে। চিন্তাশীল লেখকের নানা বিষয়ের চিন্তার ধারার সহিত আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা পরিচিত হইতেছি। অবশ্য সর্ব্বত্র তাঁহার মতের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না, কিন্তু তথাপি বলিব, তাঁহার দর্শন করিবার শক্তি আছে, প্রকাশ করিবার ভঙ্গীও বেশ সহজ ও সরল। ইংরাজ চরিত্রের আরও কয়েকটী বৈশিষ্ট্য তিনি এবার বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা আইন মানিয়া চলে। ইংরেজ মজুর শ্রেণীর লোকেরা এখন খুব শিষ্ট শান্ত। ইংলণ্ডে ক্রাইম্ কমিয়া আসিতেছে, দ্বি-বিবাহ ও ভিক্ষুকতা বেশ বাড়িতেছে। পূর্ব্বে এই দুইটী কার্য্যই 'ক্রাইম্' বলিয়া পরিগণিত হইত, এখন এই দুইটার সম্বন্ধে লোকমত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাহার পর লেখক বলিয়াছেন, "ইংরেজদের সমাজে আইন যা আমাদের সমাজে আচার তাই।" তিনি দুঃখ করিয়া আরও বলিয়াছেন—"হিন্দু-সভা যদি রাজনৈতিক না হ'য়ে সামাজিক হ'য়ে থাকতো তবে হয়তো রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা তারই মধ্যে মূর্ত্তি পেতো।" তৎপরে তিনি বলিয়াছেন,"ভারতীয় চরিত্রের মূলকথা যেমন সমন্বয়,—ইংরেজ চরিত্রের মূল কথা বিনিময়।" এইজন্য ইংরেজের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার গড়িয়া ওঠে নাই—পরিবারও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইংরেজের আর একটী গুণ

লেখকের মতে এই—"ইংরেজ যত দেশকে শোষণ ও শাসন করেছে তত দেশকে একসূত্রে বেঁধেছে, ঐক্য দিয়েছে।" ইংরেজ-প্রীতিবশে একথা বলা বেশ সহজ, কিন্তু প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা কথাটা সমর্থন করিতে পারিলে ভাল হইত। ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষে এতদিনের মধ্যেও একতার বন্ধন কেন সুদৃঢ় হয় নাই তাহা কি লেখককে জিজ্ঞাসা করিতে পারি? আর যেটুকু একতা হইয়াছে তাহা কি ইংরেজের চেষ্টায় হইয়াছে—না তাহাদের অভাবে সাহায্যে হইয়াছে। ভারতবাসী ইংরাজের ভেদ-নীতিই সর্ব্বত্র দেখিতে পায়। অন্যান্য দেশের কথা বলিতে পারি না, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশই চিরকালই সমগ্র ভারতবর্ষকে আপনার বলিয়া জানে—ভারতবাসীর দেব-মন্দির ও মসজিদ ভারতের যেখানে থাকুক ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের লোকই সেই সকল স্থানে পূর্ব্বে কত দুঃখে কষ্টে গিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? অবশ্য ইংরাজের রেল-পথ ও জাহাজাদি হওয়ায় ভারতের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাওয়া-আসার সুবিধা হইয়াছে স্বীকার করি। কাযের লোক ইংরাজ বুঝে "হৃদয়কে চরিতার্থতা দিলে কায নষ্ট হয়, তাই বিউটির চেয়ে ডিউটিকে ইংরেজ বড় বলে মানে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় প্রেমের কবিতা ইংরেজী ভাষায় যত ও যত রকম ও যত গভীর অন্য কোনো ভাষায় তত নয়। এক চণ্ডীদাস ছাড়া কোনো বাঙালী কবি কোনো দিন সর্ব্বস্ব পণ করে ভালোও বাসেন নি, ভালোবাসার কবিতাও লেখেন নি। গদ্য কবিদের মধ্যে শরৎ চট্টোপাধ্যায়।" আমরা 'অন্য কোন ভাষায় সঠিক সংবাদ রাখি না স্বীকার করি, কিন্তু প্রেমের কবিতা একা চণ্ডীদাস ভিন্ন যে আর কোনও বাঙ্গালা কবি লেখেন নাই, "কোন বাঙালী কবি সর্ব্বস্ব পণ করে ভালোও বাসেন নি" এমন জোর করিয়া কোন কথা বলিবার ধৃষ্টতা রাখি না। আমরাও বলি ইংরেজি কবিতার ভিতর প্রেমের কবিতা আছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই কামের কবিতা। লেখক কোথাও প্রেমের সংজ্ঞা দেন নাই—তাঁহার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া ভালবাসাই যদি প্রেমের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যেক কবিতাই কি প্রেমের কবিতা নয়? আর বাঙ্গালায় গদ্য কবিদের ভিতর শরৎচন্দ্র ছাড়া আর কেহ যে প্রেমের কথা লেখেন নাই, এ তথ্য নূতন বটে!

ড্রামা—শ্রীঅষ্টাবক্র। লেখক প্রথমেই বলিয়াছেন আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর ড্রামার অভাব। কথাটা খাঁটি সত্য। ইহার প্রথম কারণ তিনি দেখাইয়াছেন আমরা সাধারণতঃ কয়েকটা ভুল করি, সেগুলি সংশোধন করিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন, "ড্রামার বাংলা নাটক কিংবা অভিনয় নয়। ড্রামার আর্ট সমষ্টিমূলক। দ্বিতীয় ভুল করি আমরা অনুভূতিই সব—আইডিয়াই সব ভাবিয়া। কিন্তু প্রকৃত কথা হইতেছে রূপান্বেষণ (a search for form) এর সফলতার উপরই নির্ভর করে আর্টের মর্য্যাদা এবং আর্টিষ্টের প্রতিষ্ঠা। আর্টের জন্ম এবং বিকাশ অনুভূতিতে নয় অনুভূতির প্রকাশে। তৃতীয় ভুল করি আমরা এই প্রকাশকে (form) তুচ্ছ উপাদান বলিয়া মনে করি।"

তৎপরে লেখক বলিয়াছেন—আমাদের দেশে ট্র্যাজিডির অভাব। এ অভাব আছে সত্য, কিন্তু তাহার কারণটা কি, তাহা চিন্তাশীল লেখক একটু ভাবিয়া দেখেন নাই। ভারতের লোকের ইহা 'ধাতস্থ' নয়—সহজ-জ্ঞানে ভারত সকল রসের মধ্যে করুণ রসেরই প্রাধান্য দিয়াছে। ভারত-বাসীর চরিত্রের ইহা বৈশিষ্ট্য। ভারতবাসী শান্ত ভাবে সাধনা করিতে চায়, ভয়-ভাবনার ভিতর দিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে চায় না, এ কথা ভুলিলে চলিবে কেন? লেখক এক স্থলে প্রশ্ন করিয়াছেন, আজ-কাল যে-দেশে গান্ধির মত ট্র্যাজিক ক্যারাক্টারের জন্ম হয়, সেই দেশে রমা রলাঁর মতন ট্র্যাজেডির স্রষ্টার জন্ম হয় না কেন?—প্রধান কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ট্র্যাজেডির মূলে দুঃখ। ট্র্যাজেডিতে চাই যুদ্ধ, মারামারি ইত্যাদি। এই দুঃখকে ভারতবাসী চিরদিন বরণ করিয়া লইয়াছে—দুঃখকে ভগবানের দান বলিয়া হাসিমুখে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ভারতের ধর্ম্ম তাহাকে শিখাইয়াছে এই দুঃখ হইতে নিবৃত্তি বা মোক্ষলাভ করিতে হইবে। ভারতবাসী আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অবহিত—সে মারামারি কাটাকাটি চাহে না—সে চাহে শুদ্ধা ভক্তি, সর্ব্বজীবে দয়া। এই চিন্তার ধারা ট্র্যাজিডি-রচনার পক্ষে অনুকূল নয়। এ কারণ এখন যে সকল ট্র্যাজেডি বাঙ্গালায় বাহির হইতেছে সেগুলি ধার করা জিনিস বলিয়া সুন্দর হইতেছে না। অবশ্য এ কথা সত্য যে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আমাদের চরিত্র অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং যখন পাশ্চাত্য দেশের ভাবসমূহ আমরা আপনার করিয়া লইতে পারিব তখন বোধ হয় দেশে ভাল ট্র্যাজেডিও জন্মিবে।

পদানন্দ—শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র বি-এ। আলোচ্য ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখক বীরভূমের 'রতন লাইব্রেরী'তে পদানন্দ নামে যে একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ (পুঁথি) আছে তাহার যৎসামান্য পরিচয় দিয়াছেন। এই পুঁথির উদ্দেশ্য কেবলমাত্র প্রাচীন পদাবলীর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা বর্ণনা। সঙ্কলয়িতা কোথাও নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে ৫১ জন খ্যাতনামা প্রাচীন পদকর্ত্তার ও কয়েকজন অজ্ঞাতনামা পদকর্ত্তার ২৬৬টী পদ আছে।

শিল্পী ললিতমোহন সেন—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার। এই সচিত্র প্রবন্ধে শিল্পীর গুণপনার পরিচয় যৎসামান্য আছে। যে চারি জন বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত এ, আর, সি, এ (লণ্ডন) উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন ইনি তাহাদের মধ্যে একজন। সম্প্রতি ইনি লাহোর আর্ট স্কুলে সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ও বিলাতে 'ইণ্ডিয়া হাউস' সুসজ্জিত করিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ফ্রান্সের নব মনোভাব—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম-এ, বার-য়্যাট্-ল। এই সুচিন্তিত প্রবন্ধ আমরা সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। লেখক লিখিয়াছেন, ইউরোপ যে জীবন্ত তার প্রমাণ আধুনিক ফরাসী সাহিত্য হইতে পাই। এই সাহিত্যের ভিতর একটা সন্দেহের ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত অকাট্য সত্যের প্রতি অসন্তোষ ও অবজ্ঞার সুর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ফরাসী সাহিত্যের একটা প্রধান গুণ

তাহার স্পষ্ট ভাষা। মনোরাজ্যে তারা সম্পূর্ণ নির্ভীক। ইউরোপে যখন যে ভাব জন্মগ্রহণ করে তাহা স্পষ্ট রূপ লাভ করে ফরাসী সাহিত্যে। এখন ফরাসী সাহিত্যে ঐহিকতার (Laicisme) বিরুদ্ধে সকলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছেন। এই ফরাসী শব্দ লৌকিক ধর্ম্মের অর্থ বলিয়া সুপণ্ডিত লেখক প্রকাশ করিয়াছেন।

ফরাসী দেশের নব-চিন্তার ধারা দুই দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এক দিকে ইহা উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি অনাস্থা দেখাইতেছে, অপর দিকে ধর্ম্মের সত্যের প্রতি আস্থা দেখাইতেছে। এখন লোকের ধারণা হইয়াছে "বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করবার একমাত্র চাবি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়।" এখন বৈজ্ঞানিকেরা প্রায় সকলেই একমত হইয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, "Science এবং Religion উভয়ই সমান সত্য, কারণ সত্যে পৌঁছিবার মনোজগতে দুইটি পথ আছে—একটি বিজ্ঞানের পথ, অপরটি ধর্ম্মের পথ।

তাহার পর লেখক বুঝাইয়াছেন, "নূতন মনোভাব পুরোনো মনোভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অথবা বিভিন্ন নয়।" তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন—"পুরাকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন তাঁদের হাতে বৈদিক ধর্ম্ম যেমন বৈদান্তিক ধর্ম্ম হয়ে উঠেছিল, আমার বিশ্বাস ইউরোপের এই নব ধার্ম্মিকদের হাতে খৃষ্টান ধর্ম্মও নব-রূপ ধারণ করবে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে ফরাসী মন, তথা সমগ্র ইউরোপের মন আজ ধর্ম্মের দিকে উন্মুখ হইয়াছে—ভারত যে পথে এতদিন চলিয়াছে ইউরোপ আজ সেই পথই ধরিয়া চলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। আর আমরা কি এখনও আমাদের চিরাচরিত ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া চলিব?

উপসংহারে আধুনিক চিন্তাশীল লেখক Paul Masson-Oursel এর মতে "ইউরোপের সভ্যতা এসিয়ার স্কন্ধে ভর করে কোনও সুফল-প্রসূ হয় নি। কারণ আমরা যে সে দেশে শুধু রেলের গাড়ী ও টেলিফোন রপ্তানী করেছি তাই নয়, কতকগুলি মারাত্মক ismও রপ্তানী করেছি, যাহা Capitalism, industrialism, alcoholism nationalism এবং সেই সঙ্গে আমাদের spiritual দৈন্য এবং moral বিশৃঙ্খলতা"—এর ফলে না কি এসিয়াবাসীর মনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধিই প্রবল হয়েছে। Oursel আরও বলেন যে "আমরা Orientalistরা এসিয়ার অতীতকে উদ্ধার করেছি এবং সে অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমান এসিয়াবাসীদের পরিচয় করে দিয়েছি; কিন্তু সে অতীতের প্রতি আমাদের যে কোনরূপ ভক্তি নেই সে সত্য এসিয়াবাসীরা ধরে ফেলেছে। ফলে এ বিষয়ে তারা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়।"

ভারতবর্ষ—কার্ত্তিক।

এমাসে দুইটী সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী ও একটী আলোচনা মূলক প্রবন্ধ আছে।

'মধ্যভারত'—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের ক্রমশ প্রকাশ্য প্রবন্ধ। আলোচ্য ভ্রমণকাহিনীতে অজন্তা গুহার চিত্রাবলী ও তাহাদের বিবরণ আছে। ভাষা মন্দ নয়, তবে নূতন কথা কিছুই নাই। এই কয়েক মাস ধরিয়া বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা চলিতেছে। তবে এরূপ আলোচনায় আমরা পক্ষপাতী, কারণ পাঠকদের মনে যদি এ শ্রেণীর কোন রচনা কৌতূহল বৃদ্ধি উদ্রেক করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস কেহ না কেহ বাঙ্গালা দেশ হইতে সুদূর মধ্যভারতে ভারতবাসীর অক্ষয় কীর্ত্তি দেখিবার জন্য সাগ্রহে ছুটিবে।

রোম—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু। এই ভ্রমণ কাহিনীতে লেখক রোমের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নমুনা গুলির সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষাও কবিত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্র প্রতিভার উৎস—(জীবনদেবতা)—শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম এ। প্রবন্ধটীতে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি সহজ সরল ভাষায় তাঁহার বক্তব্য সাধারণের বোধগম্য করিয়া লিখিতে পারেন নাই। পুনরুক্তি দোষও আছে। প্রবন্ধটী পাঠককে টানিয়া লইতে পারে না। লেখক কবিবরের সৃষ্টি প্রেরণার বহু উৎস খুঁজিয়া বাহির করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ১১ পৃষ্ঠার ভিতর তাঁহার বক্তব্য যাহা লেখক বলিতে চান,তাহা পরবর্ত্তী এক পৃষ্ঠার ভিতর এই ভাবে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন:—"প্রভাত সঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া "চৈতালী" পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের মধ্যে বিশ্বজীবনের যে অনুভূতি, তাহার প্রকাশ ও পরিচয়টুকু আমরা লইতে চেষ্টা করিলাম। বহু কবিতার মধ্যে এই অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু যে কবিতাগুলিতে সেই আভাস অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট, সেই কবিতাগুলি হইতে কবিজীবনের এই অপূর্ব্ব রহস্যটি বুঝিতে চেষ্টা করা সহজ। কবিজীবনের প্রথম হইতেই বাহিরের বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে কবিহৃদয়ের একটু নিবিড় নাড়ী-চলাচলের যোগ—তাহার সঙ্গে কবির কি যেন একটা আত্মীয়তা আছে। যাহা কিছু কবি কানে শুনিতেছেন, স্পর্শে অনুভব করিতেছেন, এই পৃথিবীর গান, বাতাসের শব্দ, আকাশের সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, মানুষের চলা-বলা, গাছ-পালা, নদ-নদী যত কিছু, সব মিলিয়া যেন একটা অখণ্ড রূপ লইয়া তাঁহার অন্তরের মধ্যে ধরা দিয়াছে—এই রূপ তাঁহার অর্দ্ধপরিচিত এবং এই অর্দ্ধপরিচিত প্রাণীটি যেন নিরন্তর তাঁহাকে সঙ্গদান করিতেছে। কিন্তু অন্তরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সে নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পায় না, ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িতে চায় এবং বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত প্রকাশের মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে চায়। 'প্রভাত সঙ্গী'তে এই কামনাটী প্রকাশ পাইয়াছে। অন্তরের মধ্যে এই যে প্রাণীটী ইহার পরিচয় প্রথমে স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু ক্রমে তাহার অস্তিত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে বাহিরের বিশ্বজীবনের বিচ্ছিন্ন বিচিত্র খণ্ড খণ্ড প্রকাশ যে অখণ্ড অনুভূতির রূপ লইয়া কবির অন্তরের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে কবি একটা নিবিড় বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছেন—সে তাঁহার খেলার সঙ্গী। কিন্তু এই বন্ধন নিবিড় হইতে যতই

নিবিড়তম হইতে লাগিল এবং কবির বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, ততই যেন তাঁহার সখী কবির প্রাণের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া কবির প্রেমের কারাগারে বন্দী হইতে লাগিল এবং ক্রমে বাল্যের সখী কৈশোরের সঙ্গিনী, যৌবনে অন্তরলক্ষ্মী হইয়া মর্ম্মের গৃহিণী হইয়া অন্তর মন্দিরে প্রবেশ করিল। * * এ লীলার মধ্যেও আবার মাঝে মাঝে অবসাদ দেখা দেয়, প্রতিদিনের স্পর্শে মাধুর্য্য তাহার নূতনত্ব হারায়, তখন আবার নূতন করিয়া পাইবার ইচ্ছা জাগে। ... কিন্তু এই প্রিয়তমার রূপ ছাড়া এই মানসসুন্দরীরই আর একটা রহস্যরূপ আমরা দেখিতে পাই। সে রূপ শুধু প্রিয়তমারই রূপ নয়—সেখানে যেন এই প্রিয়তমাই আবার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে দেখা দিয়াছে। * কবি নিজে যাহা বলেন তাহা এই রহস্যময়ীর কথা, যে পথে চলেন সে পথের নির্দ্দেশও করে এই কৌতুকময়ী, সেই তাঁহাকে অজানা নিরুদ্দেশ পথে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে, এই রহস্যময়ী কৌতুকময়ী মানসসুন্দরীই জীবনদেবতা—বাল্যে যে সখী, যৌবনে যে প্রিয়তমা। সকলেই এই বিশ্বজীবনের বিচিত্র প্রকাশের এক অখণ্ড-রূপ। ইহার অনুভূতিই অন্তর-পুরুষের অনুভূতি। ইনিই কবিজীবনের অধীশ্বর—ইনিই কবির অসংখ্য কথায় ও কবিতায়, গানে ও সুরে নিজেকে সার্থক অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন।"

ইহার পরে 'নৈবেদ্য' 'খেয়া' হইতে কবিজীবনের নূতন অধ্যায় সুরু হইল। এ জীবনে তিনি ভূমাকে প্রত্যক্ষ করিবার সহজ আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। এ স্তরে জীবন-দেবতার অনুভূতি ক্রমে বিশ্বদেবতার বৃহত্তর গভীরতর অনুভূতির সঙ্গে এক হইয়াছিল। ক্রমে 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালিতে' উহাই ভগবানের অনুভূতি বলিয়া অনুমিত হয়। এই সময়ে কবির অবস্থা লেখকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় "গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের রসবোধ সকল বিচিত্র রসবোধ বিলীন করিয়া দিয়া অনন্যশরণ বিশ্বদেবতার চরণে আত্মসমর্পণই বুঝি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের শেষ আশ্রয় হইল।' কিন্তু কবির লেখনী হইতে 'বলাকা' বাহির হইল প্রেম, যৌবন ও সৌন্দর্য্যের জয়গান লইয়া। তার পর আসিল 'পলাতকা'—এখানে মানবজীবনের তুচ্ছ সুখদুঃখ, তুচ্ছ ঘরকন্নার ইতিহাস উজ্জ্বলভাবে লিখিত হইল। তার পর 'পূরবী'তে আবার বিশ্বদেবতার গভীরতর অনুভূতির প্রকাশ দেখা গেল। আবার প্রথম যৌবনের অনুভূতি ফিরিয়া আসিল ঋতু উৎসবের গানে ও 'শেষের কবিতা'র মত সাহিত্য সৃষ্টিতে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার উৎস খুঁজিয়া গিয়া লেখক যে সকল স্তরের কথা বলিয়াছেন, এরূপ স্তর-বিভাগের পক্ষপাতী আমরা নহি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এরূপ পৃথক পৃথক বিভাগ করা যায় না। কারণ প্রত্যেক কাব্যেই জীবন দেবতার অনুভূতিও যেমন পাওয়া যায়, দয়িতা প্রেমের গভীরতা দ্যোতক কবিতাও তেমনই পাশা-পাশি পাওয়া যায়। কবির কাব্য রস-সৃষ্টির দিক হইতে যাচাই করাই যুক্তিসঙ্গত। তত্ত্ব জ্ঞান বা দর্শনের মাপকাটিতে বিচার করিলে কবিতার প্রতি অবিচার করাই হয়।

কবিতা

প্রবাসী—কার্ত্তিক।

আসার আগে—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ। কবি যে কি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। গোটা কতক যুৎসই শব্দের সমাবেশ আছে বটে, কিন্তু সেগুলি ভাব-প্রকাশের সহায়তা করে নাই। ভাষাই ভাব প্রকাশ করে, অসংবদ্ধ শব্দ-সন্নিবেশে বরং ভাব আরও ঢাকা পড়ে। রসের কথা ত অনেক পরে।

ও পার আলো এ পার ছায়া
মধ্যে সাঁঝের সোণার মায়া
মিলিয়ে দিল কায়ায় কায়া
দিন রজনীর খেয়ার পারে।

কিন্তু ভাবের খেয়া পার হইতে গিয়া পাঠকের যে নৌকা-ডুবি হইল তার খেয়াল কি কবি রাখেন?

অনাহূত—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী। রূপকের অন্তরালে কবি গৃহস্থালীর যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা যেমনই সত্য তেমনই সুন্দর। কবিতার প্রথম লাইনে আছে, কবি লতাটিকে ঘরের কোণে 'অযতনে' পুঁতিয়াছিলেন। এই অযতনে পোঁতার সার্থকতা কি পরে এইরূপে প্রকাশ পাইয়াছে?

আজকে দেখি অনাদরের কৌতূহলে, রৌদ্রে জলে,
সেই লতাটিই ঘরটি ছেয়ে লতিয়ে চলে ফুলে-ফলে।

যত্ন করিয়া পুঁতিলে কি নিষ্ফলা হইত, না ছাগলে মুড়াইত? মোট কথা এই অযতনটা একটা accident মাত্র। সকল ভবিষ্যতের আশায় যদি কেহ গৃহলতাকে অযত্ন করেন, তবে আমরা কবিকে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ ও নির্দ্দোষ মনে করিতে পারিব না।

আনন্দম্—রূপমমৃতম্—(কবীর)—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। মূলটি না জানায় অনুবাদ কেমন হইয়াছে বলিতে পারিলাম না। তবে ভাবটি যে মহৎ ও উচ্চ তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষ—কার্ত্তিক।

মায়া—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ। সতীর সহমরণে, পিতার বেদনা-ব্যথিত বদন হেরিয়া স্নেহময়ী কন্যার জীবন-দানে জ্ঞানী মায়া-মোহেরই প্রভাব দেখিতে পান, দরদী কবি কিন্তু ইহাতে 'মহামায়ার মাধুরী', দেখিয়া পুলকিত হইয়াছেন। ভাব-প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গীর দোষে কিন্তু পাঠকের মনে সম্পূর্ণরূপে রসানুভূতি হইতেছে না। এদিকে কবির লক্ষ্য থাকা উচিত।

স্মৃতি —শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বিএ। মানুষ তাহার প্রিয়জনের স্মৃতি, প্রতিমা গড়িয়া বা সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া জাগরূক রাখিতে চায়, কিন্তু সেখানে আলো বাতাস প্রবেশ করে না, নিখিল-জগতের আনন্দ সংবাদ পৌঁছোয় না, তাই 'মৃত বিস্মৃতির তলে চিরমৃত'ই থাকে। কিন্তু প্রকৃতির স্মৃতি রক্ষার প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'তৃণ-শয়ন, ঝরা-পাতা, মরা-ফুল' প্রাণ দিয়া মৃতকে সঞ্জীবিত রাখে। কবি যে ভাবটি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন তাহা যেমন অভিনব ও সুন্দর, প্রকাশ-ভঙ্গীর নৈপুণ্যে, ভাবের অভিব্যক্তিও হইয়াছে তেমনই হৃদয়-গ্রাহী।

আত্মদান—শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র। আরম্ভটা এই রকমে হইয়াছে :—

আমার জানিত হ'য়ে, অজানিত হ'য়ে,
　　যে যেখানে আছো ধরা ভ'রে—
আজি আমি সবাকারে বাসিলাম ভালো
　　সবাকারে দিয়ে দিনু মোরে।
　আমি কারো করিনাক আশ—

এই আত্মদান উদারতরা ও নিঃস্বার্থতার দিক্‌টায় অভুতপূর্ব্ব ও অতুলনীয়। দধীচি 'জানিত' ইন্দ্রের জন্য আত্মদান করিয়াছিলেন, দেশবন্ধু 'জানিত' ভারতবাসীর জন্য আত্মদান করিয়াছিলেন, কিন্তু এ আত্মদান শুধু 'জানিতের' জন্য নয়, 'অজানিতের' জন্যও। তবে কবি বোধ হয় অসাবধানতা বশতই এই অপূর্ব্ব দান-সাগরে একটু গণ্ডী টানিয়া দিয়াছেন—'ধরা ভ'রে' বলিয়া। যে হতভাগ্যেরা ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে কবি তাহাদের কথা একবার ভাবিয়া দেখিলেন না কেন? আশা করি ২য় সংস্করণে এই ত্রুটিটুকু সারিয়া লওয়া হইবে। যেখানে ভাবের বন্যা এই রকম প্রবল, সেখানে ভাষা বা ভঙ্গীর বালির বাঁধ কতক্ষণ টিকিবে?

ব্যর্থ পূর্ণিমা—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ। পূর্ণিমা রাতে 'বাদল নামিয়াছে' দেখিয়া কবি হতাশ হইয়া নানা প্রকার আক্ষেপ করিয়াছেন। একটু রূপকেরও আভাস আছে। কবির নিজস্ব সুর ও প্রকাশ-ভঙ্গী এই রচনায় পাইলাম না। মিলের খাতিরে স্থানে স্থানে রচনা আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অভিব্যক্তিও বড় বাঁকা-চোরা পথে ঘুরিয়া গিয়াছে। 'ভরেনাক দিল, মিলেনাক মিল, শূন্য মনের খাতা।' অবশ্য প্রবীণ কবি তাঁহার বহু যত্নায়ত্ত অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের সহিত কবিতার বাহ্যিক মিলগুলি ভাল করিয়াই 'মিলাইয়াছেন' কিন্তু তবুও ভাবে ও রসে পাঠকের দিল ভরাইতে পারেন নাই! পাঠান্তে পাঠকের মনের খাতায় যে হিজিবিজি অক্ষরে ভরিয়া গেল! তার চেয়ে সে খাতা 'শূন্য' থাকাই ভাল ছিল।

কালি শুক্লা-চতুর্দ্দশী রাতে—শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত। শুক্লা-চতুর্দ্দশী রাতে অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সহসা যুবতীর মনে যৌবন জাগরণের সাড়া আসিল, আর জীবনের এই পরম মুহূর্ত্তের অমৃত আস্বাদ পাইয়া নারী চিরজীবনের মত ধন্য হইয়া গেল। ভাবটা নূতন না হইলেও বর্ণনা-ভঙ্গীর গুণে মনের মধ্যে অপূর্ব্ব পুলক সঞ্চার করে। এই রসোদ্রেকের শক্তিতেই রচনাটি সার্থক হইয়াছে। 'সকরুণ বংশীসুরে: ডাক দেছে অচেনা রাখাল'—এই একটি টানে পাঠকের হৃদয়ে যে সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত শাশ্বত রাখালের চিত্র-খানির সঙ্গে সঙ্গে কবির কৃতিত্বের চিত্রও পরিস্ফুট হয়। ভাষা কিন্তু সব যায়গায় সুষ্ঠু হয় নাই—'আলিঙ্গন দিলো মোর সাথে' 'বিভাসিলো স্বপন-মধুর' 'সুখের সঙ্গীতে ভোর'' প্রভৃতির পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়।

ভোলার উপহার—শ্রীমতী উমা দেবী। মোটের উপর, চিত্তাকর্ষক সরল মধুর রচনা। ছন্দের গতি সব যায়গায় অপ্রতিহত ও সাবলীল নয়, প্রথম stanzaতেই দেখা যায় ছন্দ একটু খোঁড়াইয়া চলিয়াছে! স্থানে স্থানে গদ্যাত্মক লাইনও আছে। তবুও যে চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা মনোরম।

হৃদয়-মন্দির—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ। কবিতাকারে উপদেশ ও তত্ত্বালোচনা। ৮ লাইন পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে কারণ ঐ পাতায় আর জায়গা ছিল না।

অভিসার—রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ। গদ্য ছাড়িয়া পদ্যে এ অভিসারের কি প্রয়োজন ছিল? অভিসার-পথ বিপদ-সঙ্কুল, কিন্তু প্রাণের আবেগে যুক্তি-বিবেচনা ভাসিয়া যায়, গুরুজনের বাধা মানে না—এই অভিসার সমালোচনার বাহিরে।

মাসিক বসুমতী—আশ্বিন।

শারদীয়া—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ। ভাবের ছন্দের বা ভঙ্গীর কোন রূপ বিশেষত্ব পাইলাম না। যে আধ্যাত্মিকতা টুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিতান্তই সাধারণ। ইহাতে না আছে নূতন কিছু, না আছে বাঙালীর হৃদয়দ্রবকারী সুপরিচিত চির-পুরাতন সেই আগমনীর সুর। অথচ এই রচনাটী শারদীয়া সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাটাই অধিকার করিয়াছে। বসুমতীর হিন্দুয়ানীও কি reformed হইল না কি?

প্রভাতী—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ। কবি কি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা ত বুঝাই গেল না, বরং মনে হইল যে তাঁহার বক্তব্য যদি কিছু থাকে তাহা তিনি নিজেই বোঝেন নাই। ছোট কবিতা না হয় গানই হইল—তা' বলিয়া কি মিল গুলিও নির্দ্দোষ হইবে না? প্রথম stanza তুলিয়া দিতেছি :—

চোখের জলে, বুকের তলে—'
　　কঠিন শিলা যখন গলে,
তখন তবে অশেষ জ্বালা
　　সবাই পালা, দারুণ জ্বলে'।

কার সাধ্য এটা বুঝিবে! কি কুক্ষণেই বঙ্কিমবাবু রমেশচন্দ্র দত্তকে বলিয়াছিলেন বাঙালীর ছেলে যা লিখিবে তাই বাংলা!

জাগরণ—শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। রচনায় মধ্যে জাগরণের উদ্দীপনা নাই, তবে ঢাক ঢোল সহযোগে রাসভ কণ্ঠে কেহ যদি নিদ্রিতের কাণের কাছে এই কবিতাটী আওড়ায় তবে বিরক্তিতে যে

তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের পরই কুরুক্ষেত্র।

শ্রীদুর্গা মূর্ত্তি—মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ। বড় আড়ষ্ট রচনা। অষ্টভুজা দুর্গা-মাতার "সহসা প্রকাশ" হইল এইটুকু প্রকাশের জন্যই কি এত আড়ম্বর করিয়া সিংহ ও অসুরের বর্ণনা? সবটাই কেমন খাপছাড়া লাগিল।

দুঃখীর নিবেদন—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। এই নিবেদনে লেখক যে রসের উদ্রেক করিয়াছেন তাহা প্রকৃত বৈষ্ণবের আত্মনিবেদনেই পাওয়া যায়। এই হিসাবে এটা খাঁটী কবিতা। তবে মিলের খাতিরে স্থানে স্থানে ভাষার উপর অত্যাচার করা হইয়াছে।

বিচিত্রা—আশ্বিন।

বরণ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ। গৃহলক্ষ্মীর এই বরণে ভাবের বা প্রকাশ-ভঙ্গীর কোনও অভিনবত্ব পাইলাম না। ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। রচনাটির মধ্যে এক আলোকই যে কত রকমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই—আলোক কখনও 'পাখী' হইয়া উড়িতেছে, উড়িতে উড়িতে 'জ্যোতির রশ্মি' (?) আঁকিতেছে, সেই আলোই আবার কখনও বা 'আলোমুক্তা, ছড়াইতেছে, 'সিথায় কনক কিরণ' হইয়া ঝরিতেছে, 'কুটীরের গায়, আঙিনা পরে' জলস্রোতের মত উছলিছে, তারায় তারায় বাঁশী বাজাইতেছে। বেচারা আলোর ঘাড়ে এক সঙ্গে এত কাযের বোঝা না চাপাইয়া কবি যদি তাহাকে রচনাটির মধ্যে একটু ছড়াইয়া দিতেন তবে পাঠককে অন্ধকারে এত হাতড়াইতে হইত না।

আগমনী—শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর। বিশেষত্ব-বর্জ্জিত আধুনিক কালের আগমনী। প্রাকৃতিক বর্ণনা সম্পূর্ণ রূপেই মামুলি হইত, কিন্তু বাঁচিয়া গিয়াছে এই লাইনটির জন্য—

বাতাস বহে ছন্দ-অধীর

এই 'ছন্দ-অধীর' হইয়া বাতাস বহার মধ্যে মানে যত থাক না থাক নূতনত্ব আছে। আর মানেই বা নাই কেন? ছন্দ অধীর এলোমেলো অথবা ছন্দের দোলে চঞ্চল। আর একটী ভাবও বেশ উজ্জ্বল ও চমকপ্রদ—

কে-ই বা জানে কোন অজানার-
কার টানে ধায় প্রাণ,

জগজ্জননীর আগমনীর সময় মনের এই রকম উড়ু উড়ু ভাব কি সাবেক কালে হইত? তখন মনের টান কোন দিকে, কার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় সারা বঙ্গভূমি আনন্দে চঞ্চল, সে বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহের ছায়াপাতও হইত না। এইগুলিকে বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করিলে কবিতাটিতে বৈশিষ্ট্য আছে বৈ কি! অতএব পূর্ব্বে যে বলিয়াছি বিশেষত্ব বর্জ্জিত তাহা ঠিক নয়।

আবিষ্কার—শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শব্দের চয়নে মনোহারিত্ব আছে, রচনা নৈপুণ্যও আছে, কিন্তু ভাবের সামঞ্জস্য ও পার্থক্য রক্ষিত না হওয়ায় রসসৃষ্টি হয় নাই। প্রেয়সী চিরন্তন, এ পারের মিলন আকস্মিক ব্যাপার নহে, পূর্ব্বজন্মের মিলনেরই জের এবং ও-পারের মহা-মিলনের বাণী এপার হইতেই শোনা যায়—এই চির-পুরাতন সত্যকেই কি কবি নব আবিষ্কার মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়াছেন?

বিভ্রান্ত—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া আমরাও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। একটু নমুনা দিয়া পাঠককে বিভ্রান্ত করিবার কু-ইচ্ছা দমন করিতে পারিলাম না—

আমার গানের পাশে ফুল ফুটেছে সকাল হতে
না জানি কোন আশে।
... ...
আমি কারেও চাব না, বুকের হাসি ফুরিয়ে দিয়ে
মন হারাব না।
আমার মনের পাশে কত প্রাণের জুটেছে সাধ
না জানি কোন আশে
আমি কারেও চাব না, চোখের আলো নিবিয়ে দিয়ে
পথ হারাব না।

'বিভ্রান্ত' আর কাহাকে বলে!

বিদেশীয়া—শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু। নানা দেশের নানা ভাবের কবিতার নমুনা। অনুবাদগুলি সুন্দর। আফগনিস্থান হইতেও যে কাব্য-মেওয়া আমদানী করা যায় পূর্ব্বে এ সংবাদ জানিতাম না।

পতিব্রতা—(গাথা) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। দরিদ্রা বিধবা যুবতীর উপর অযথা কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া তাহার দণ্ডবিধান, সমাজপতির স্বাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীর এ অন্যায় ব্যাপারে স্বামীকে নিরস্ত করণের বৃথা চেষ্টা, সমাজপতির নিত্য নিয়মিত পরকীয়ানুরাগ, স্বকীয়ার স্বামী পরিত্যাগ প্রভৃতি চমকপ্রদ ঘটনাবলীর বিবরণ সম্বলিত রচনা। ভাষা স্থানে স্থানে আড়ষ্ট হোক, ছন্দের গতি মাঝে মাঝে খঞ্জের গতির সঙ্গে পাল্লা দিক্‌, পদ্যের মাঝে গদ্যের আমদানী হোক—সবই সহ্য হয় শেষ দু'লাইনের উপদেশামৃতের গুণে—অর্থাৎ যখন ব্যভিচারী স্বামীকে পতিব্রতা বলিতেছেন :—

পরের পুরুষ এখন তুমি, পতিব্রতার পরপুরুষের ছোঁয়া
লাগতে যে নেই—অটুট শুধু থাকুক হাতের নোয়া।

এ যে একেবারে 'উল্‌টা বুঝিলি রাম' হইল!

অর্ঘ্য—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী। কবির পরিকল্পনা ভাল, কিন্তু রেখার ইঙ্গিতগুলি যথেষ্ট হয় নাই। বর্ণ-সম্পদ আছে কিন্তু বর্ণ-বৈচিত্র্য নাই। কবি যে চিত্রখানি অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, নিজের চিত্ত-কলকে কি তাহার সুস্পষ্ট ধারণা হইয়াছে? আগে চাই সম্যক ধ্যান, অবিচলিত ধারণা, পরে প্রকাশ। সাধারণ Convention-এর অযথা প্রাধান্য দিলে শ্রেষ্ঠ রচনা হয় না।

নির্ঝর ও সাগর (ভিক্টর হুগো) ও প্রতীক্ষায় (হাইনে)—কুমারী মমতা মিত্র। দুইটীই অনুবাদযোগ্য কবিতা এবং উভয় অনুবাদ স্বচ্ছতায় ও লালিত্যে অনুপম হইয়াছে। অপরিপক্ক হস্তে মৌলিক রচনার বৃথা চেষ্টার অপেক্ষা এই রকম অনুবাদ বাঞ্ছনীয়।

ইঙ্গিত—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। লঘু হস্তে হাল্‌কা সুরে রচিত এই কবিতাটি পড়িয়া আমরা তৃপ্তই হইতাম, যদি ইহাতে মাঝে মাঝে ছন্দ-পতন না ঘটিত, মিলগুলি স্থানে স্থানে এত দুর্ব্বল না হইত, মাঝে মাঝে গদ্যাত্মক লাইন অনধিকার প্রবেশ না করিত ও যদি ইহা রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ না হইত—অর্থাৎ এটা যদি ভাল হইত ত ভাল লাগিত। এখন কবিতাটীর বহিরঙ্গের ব্যাপার ত এই। অন্তরাত্মার ব্যাপারটী যে কত সঙ্গীন তাহার ইঙ্গিত কবি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আভাসে এইটুকু বোঝা যায় যে প্রেমিকার অপর পাত্রের প্রতি ন্যস্ত ব্যর্থ প্রেমের ও সেই পাত্রের অপর প্রণয়িনীর প্রতি প্রেমের ইঙ্গিত করিয়া অবেদনকারী কিস্তীমাৎ করিবার চেষ্টায় আছেন—অর্থাৎ দুই পক্ষই military !

কথা-সাহিত্য

বিচিত্রা—আশ্বিন।

মেঘ ও রৌদ্র—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। একটি একাঙ্ক নাটক। অনঙ্গলেখা নর্ত্তকী, সে ভালবাসিল পূজারী ব্রহ্মচারী সত্যব্রতকে। সত্যব্রত নর্ত্তকীকে প্রত্যাখান করিল। এই পর্য্যন্ত রচনাটি হৃদ্য হইয়াছে। তবে উক্তিগুলি সর্ব্বত্র স্বাভাবিক ও সুসংযত নয়। তারপর আখ্যানাংশ যে ভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহাও কবিজনোচিত বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যাখ্যানের পর অনঙ্গলেখা অপমানে ও ক্রোধে সত্যব্রতকে প্রলুব্ধ করিল। সত্যব্রত অনঙ্গ লেখার নিকট প্রেম নিবেদন করিল কিন্তু প্রতিদান পাইল না। অবশেষে নর্ত্তকীর ধর্ম্মপথ অবলম্বন ও একটি বিধবা রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত সত্যব্রতর পলায়ন। নাটকটি একাঙ্কে সংক্ষিপ্ত হওয়ায় দেশ কাল ও পাত্র বিষয়বস্তুর পরিণতিব্যাপারে যথোচিত সহায়তা করে নাই। তিনি যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, উপসংহারে তাহারও অনৌচিত্য ধরা পড়িয়াছে। নাটকের প্রতিপাদ্য কি তাহা তাঁহাকে বিস্তারিত ভাবে নীতিসূত্রের আকারে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। নাটকের বিভিন্ন পাত্র পাত্রীরও উক্তিতে কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। সকলেই এক ধরণে কথা কয়। নাটকটি অভিনয়ের উপযোগী আদৌ হয় নাই। বিষয়বস্তুতেও অভিনবত্ব নাই। রচনা কৌশল বা শিল্প নৈপুণ্য কোথাও দেখিলাম না। নাটকের নামটি ধার করা, তাহারও কোন সার্থকতা নাই।

ছুটির দিন—শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবির।

ঠিক গল্প নয়, তবে একটা চিত্র বা নক্সা বলিতে আপত্তি নাই। ছুটির দিনে কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান বন্ধুর কথোপকথন। ইহাতে Ben J nson এর কথা আছে, তারপর জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা প্রভৃতি সাময়িক কথাও আছে। তবে ইহাতে ছোট গল্পের রস নাই, প্রবন্ধের গাম্ভীর্য্যও নাই।

হরিমতির স্বপ্ন—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। অন্ধ বিশ্বাস ও তাহার পরিণাম এই গল্পে চিত্রিত হইয়াছে। সন্তানের আশায় মা ষষ্ঠীর পচা পুকুরে সাতটি ডুব দিয়া হরিমতি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তারপর স্বামী দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন। এই বার তাঁহার সন্তান জন্মিল। এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া লেখক সংক্ষেপে যে আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় আছে। হরিমতির চিত্রটি প্রাণস্পর্শী, গ্রাম্য পরিবেষ্টনের মধ্যে তাহার সাধাসিধা চিত্রখানি সুন্দরভাবেই ফুটিয়াছে। উপসংহার করুণ।

কাম্য—শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার সান্যাল।

আধুনিক সাহিত্যে কয়েকজন গল্প লেখক রুশিয়ান ভূতের দ্বারা আবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন ভারতবর্ষ রুশিয়ার নামান্তর, এদেশের আভিজাত্য ও রাশিয়ান এরিষ্টক্রেশী একই জিনিস। সেই জন্য গল্পের মধ্য দিয়া তাঁহারা মার্কস, লেনিন্ প্রভৃতির বক্তব্য প্রকাশ করেন, আর মনে করেন তাঁহারা ডষ্টয়েভস্কি, টুরগিনিভ, গোর্কি ও অন্যান্য খ্যাতনামা রুস লেখকদের মত প্রতিভাশালী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের একটা বলিবার রীতি আছে ; ভাষা ও ভঙ্গীতে নূতনত্ব আছে ; এই শ্রেণীর লেখকেরা কিন্তু সেই ভাষা ও ভঙ্গীর বারবার অনুকরণ করিয়া তাহার অভিনবত্বের বিনাশ সাধন করিয়াছেন, কোন নূতন নীতি বা ভঙ্গী আর তাঁহারা সন্ধান করিতে পারেন নাই। সমালোচ্য রচনাটির মধ্যে মাধবী ও দরিদ্র দীনুর কথোপকথন ভাল লাগে। ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে নববধূরূপ কাম্য বস্তুটী গল্পের শেষ রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু নায়ক বেচারীর শেষ রক্ষা হইবে কিনা তাহার আভাস আমরা পাই নাই।

লালটু—শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়।

রচনাভঙ্গী—তরুণ সাহিত্যের ড্যাস আছে ডট আছে, ধ্বনিত অর্থও সম্ভবতঃ আছে—তবে পাঠক বুঝুন আর নাই বুঝুন। শুধু বর্ত্তমান ছাড়া অপর কোন কাল এই সাহিত্যের ব্যাকরণে নাই। সুতরাং এই সব রচনাগত অভিনব কৃত্রিম বন্ধন মানিতে গিয়া লেখক রচনাকে আড়ষ্ট, ও স্ফূর্ত্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছেন। কনকের চিত্রটি পাঠক কতকটা উপভোগ করিবেন। বাকী কেবল অসার বাক্যবিন্যাস।

প্রলোভন—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। জোহানা উড নরউইজিয়ান লেখিকা। তাঁহারই একটি গল্পের অনুবাদ এস্থলে প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয়বস্তু বঙ্গসাহিত্যে নূতন নয় ; সুতরাং ইহা বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে অক্ষম।

বৈকুণ্ঠে বিচার—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

গল্পটি একটি ফরাসী গল্প অবলম্বনে রচিত। লেখক রচয়িতার নাম উল্লেখ করেন নাই। গল্পে বিষ্ণু, নারদ ও দুর্ব্বাসার অবতারণা করিয়া লেখক বক্তব্যটি একটু দেশীয় পরিচ্ছদে সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে নারদ প্রভৃতির চিত্র যেভাবে তিনি আঁকিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হয় পরিচ্ছদটী দেশীয় নয় এবং বিষয়বস্তুও তদ্রূপ। সুতরাং এক্ষেত্রে পুরাদস্তুরে অনুবাদ প্রকাশ করিলেই ভাল হইত।

মেজদি—শ্রীযুক্ত সুবোধ দাশগুপ্ত।

একটি করুণ-রসাত্মক চিত্র। রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের চিত্র অনেক আঁকিয়াছেন। তাহার পর, ইহার মূল্য আধুনিক সাহিত্যে অতি সামান্য। তবে লেখক যত্ন করিয়াছেন, রচনাও চলনসই, সম্ভবতঃ পাঠকেরও অভাব হইবে না। তবে এখানে একটা কথা না বলিয়া থাকা যায় না। লেখক গল্পটির নাম দিয়াছেন 'মেজদি', এই মেজদি গল্পের নায়িকা। বাড়ীর সকলে তাহাকে মেজদি বলিয়া ডাকিত. সেই জন্য গল্পের নায়ক সেই নামই পছন্দ করিয়াছিলেন। এই মেজদির সহিত নায়কের প্রণয় সম্বন্ধের কথা গল্পে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই জন্য আমাদের মনে হয় 'মেজদি' নায়িকার নাম না হইলেও ক্ষতি ছিল না, কারণ নামটির সার্থকতা নাই এবং এই নাম নির্ব্বাচন করিয়া লেখক সামাজিক শিষ্টতা ও সুরুচির পরিচয় দেন নাই। সাহিত্য, সমাজের অধীন না হোক, সাহিত্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ যে অচ্ছেদ্য একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'মেজদি' নামটার এরূপ দুর্ব্যবহার অনেকের অন্তরে আঘাত করিয়া রসানুভূতির আনন্দেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে।

ক্রীড়নক—শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। সীতানাথ মাতাল, কেবল দেনা করে, হলধর বাবু ধার দেন। ক্রমে সীতনাথের বিষয়সম্পত্তি সবই হলধর বাবুর হস্তগত হইল। সীতানাথ গৃহত্যাগ করিল; পত্নী কমলা ও পুত্র প্রফুল্লও ক্রমশঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। নানা অবস্থার বিপর্য্যস্ত হইয়া প্রফুল্ল হলধর বাবুর বাড়ীতেই চাকরী করিতে আরম্ভ করিল। হলধর বাবু তাহার প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিলেন। প্রফুল্ল কিন্তু কতকটা প্রতিহিংসা কতকটা আভিজাত্য বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ম্যাক্সিম গর্কীর উপন্যাসের নায়কের মত হলধর বাবুকে গলা টিপিয়া হত্যা করিল। তারপর একদিন দেখা গেল অনুতপ্ত প্রফুল্লর মৃতদেহ নদীতে ভাসিতেছে।—গল্পটি এরূপ গুছাইয়া বলা হইয়াছে। তবে এটি শুধু গল্প—পাঠককে ভাবাইবার কোন আয়োজন নাই। প্রফুল্লই বোধ হয় ভাগ্যদেবতার ক্রীড়নক। হলধর বাবুকে হত্যা করিবার কারণটা সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট ভাবে দেখানো হয় নাই। বলিবার ভঙ্গী অনেক স্থলে অপ্রীতিকর। অবান্তর কথাও বিস্তর। লেখক গল্প লিখিতে গিয়াও 'অহং'কে ভুলিতে পারেন নাই। এই 'অহং' স্থানে স্থানে অসাধারণ মুরুব্বিয়ানাকে প্রশ্রয় দিয়াছে। গল্পটি পড়িতে মন্দ লাগে না, তবে রচনা হিসাবে ইহার স্থান নিম্নে। চিত্রগুলি পুরাতন—বিদেশী লেখকদের নিকট লেখক খুবই ঋণী। আমাদের দেশে এসব রচনার বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার ঘটনাবলী একটা আন্তরিক গ্লানি বা অবসাদের সৃষ্টি করে।

ভারতবর্ষ—কার্ত্তিক।

শ্রীযুক্ত সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেবী" গল্পটী একটি করুণ চিত্র। বিপথগামী স্বামীর প্রতি অপরিসীম স্নেহ লইয়া একটি বালিকা তার অপরাধ ঢাকিয়া কেমন করিয়া তার আত্মীয় পরিজনের কাছে পদে পদে আপনাকে অপদস্থ করিয়াছে। লজ্জা অপমান মাথায় পাতিয়া লইয়াছে তারই একটি মর্ম্মন্তুদ চিত্র। এ হিসাবে গল্পটি মন্দ নয়—কিন্তু গল্পের উদ্যোগ-পর্ব্বে লেখক যে একটা অনর্থক অসার এবং সঙ্গতি-বিহীন বক্তৃতা প্রয়োগ করিয়াছেন সেটুকু বর্জ্জন করিলে গল্পটি মনোজ্ঞ হইত।

"কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ড"—"শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র সুর বিরচিত—চক্রপাণি চিত্রিত" পরশুরামের পদ্ধতির অক্ষম অনুকরণ। বৃন্দাবনে বানরের অত্যাচার এবং সেই বানর তাড়াইবার চেষ্টার প্রতিবাদের অসারতা পরিস্ফুট করিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে হাসি পায় কিন্তু চেষ্টাটা সাহিত্য-পদবাচ্য নয়।

প্রবাসী—কার্ত্তিক।

অর্ঘ্য—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প। ভাষায় অলঙ্কারের কিছু বাহুল্য থাকিলেও, ভাষা সুন্দর। চরিত্রের কল্পনায় মাধুর্য্য আছে, কিন্তু গল্পের প্লট রচনায় কারিগরীর অভাবে সমগ্র ভাবে গল্পটি সুন্দর হইতে পারে নাই। ধর্ম্মের জয় দেখাইয়া তৃপ্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা লেখককে এত বেশী করিয়া না পাইয়া বসিলে আরম্ভের সহজ পরিণতিতে গল্পটি করুণ রসে রসাল হইয়া উঠিতে পারিত।

শ্রীযুক্ত মোহিত দাসগুপ্তের "ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ" গল্পে দোষ অনেক আছে। ভাষার ভিতর চেষ্টাকৃত কৌতুকের চাপে রস মারা গিয়াছে। রসোদ্বোধনের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে গল্পের অনেকটাই অনায়াসে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্লটের খাঁচাটি সুন্দর। বাহুল্য ও রস-সাঙ্কর্য্য বর্জ্জন করিয়া পরিণতিতে লক্ষিত রসটি সুপরিস্ফুট করিবার মত করিয়া গল্পের উপাদান গুলি সাজাইলে সুমধুর হইতে পারিত। বাজে কথার চাপে এবং ইয়ারকী করিবার উৎকট প্রয়াসে গল্পের রসটি ফিকে হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুবোধ বসুর 'চিঠি' গল্পটি অকিঞ্চিৎকর—রবি বাবুর দু'তিনটি গল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত। অলোক-পন্থায় কল্পনার জ্যোতিবিহীন একটি ব্যর্থ প্রয়াস।

সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রকর'। রচনা যে রবীন্দ্রনাথেরই—ভাষার ঝঙ্কারে বর্ণনার মাধুর্য্যে তাহা পরিস্ফুট। গল্প ইহাতে কিছুই নাই, আছে শুধু অর্থসর্ব্বস্ব জগতের বিপুল অধ্যবসায়ের বিরুদ্ধে রসিক ও আর্টিষ্টের একটা আর্ত্ত প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদকে যে রসরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ রচনায় দিয়াছেন, রসের সে সমৃদ্ধিতে এ গল্পটী গৌরবান্বিত হয় নাই। কুবেরের ভাণ্ডারের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা পাইয়া আশ মিটে কি?

মাসিক বসুমতী—আশ্বিন।

সহযাত্রী—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী।

সিতিকণ্ঠ সিংহ ঠাকুরের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী তাঁহারই এক আমলার প্রতি আসক্ত হয়। দুই জনে ট্রেণে ট্রেণে ঘুরিয়া বেড়ায়। সিতিকণ্ঠ একটি চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীও ঘরে আনিতেন কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁহার ক্রোধ এতই বাড়িয়া উঠিল যে, তিনি সন্ন্যাসীর বেশে বন্দুক হাতে করিয়া তাহাদের খুন করিবার জন্য এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়ান।

গল্পে এই সিতিকণ্ঠই 'সহযাত্রী'। বলিবার ধরণটি ভাল হইলেও গল্পটি এতই সামান্য ও বৈশিষ্ট্যহীন যে লেখক ইহা প্রকাশ না করিলেই ভাল করিতেন।

নির্ব্বন্ধ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। গল্পটি আরও ছোট করিয়া লেখা চলিত। প্রণয় কাহিনীটি সেকালের রোম্যান্সের মত। বঙ্কিম চন্দ্রের প্রভাব রচনায় একাধিক স্থলে লক্ষিত হয়। গল্পটির উদ্দেশ্য দাউদ ও হানিফার মিলন। এই মিলনের পথে বাধার সৃষ্টি না করিয়া লেখক ইহার আকর্ষণী শক্তিকে অনেকটা স্তম্ভিত করিয়া ফেলিয়াছেন।

রক্ত রেখা—শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র গুপ্ত। যক্ষ্মা রোগী মিহির দেশভক্ত। দেশের কয়েকটি দারিদ্র্যের চিত্র একে একে নিরীক্ষণ করিয়া সে স্থির করিল বাঙ্গালী ধ্বংসোন্মুখ। দেশের জন্য চিন্তা ও উদ্বেগ অবশেষে তাহার মৃত্যুর পথ সরল করিয়া তুলিল। কয়েকটি দৃশ্য একটি সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা গ্রথিত হইয়াছে। দুই একটি দৃশ্য ভাল তবে সমগ্র গল্পটির আখ্যান ভাগের সুসঙ্গত পরিণতি (plotting) বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের সুন্দর প্রকাশ (presentation) না দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। অনেক দুঃখের কথা বলিয়াও লেখক করুণ রস ফুটাইতে পারেন নাই।

এক পশলা—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। এই রচনায় একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। তবে আধুনিক সাহিত্যে ছোট গল্পের বিষয় বর্ণন বা তাহার ক্রমবিকাশ যে ভাবে দেখান হয় তাহা এস্থলে লক্ষিত হইল না। লেখক যেমন তেমন করিয়া একটা বৃত্তান্ত খাড়া করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে পাঠক রচনায় রস বা শিল্পনৈপুণ্যের অনুসন্ধান করেন তাঁহাকে বড়ই নিরাশ হইতে হইবে। লেখক অবহেলার সহিত লিখিয়াছেন, রচনাটি অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ। ইহার নামটিরও কোন সার্থকতা আমরা দেখিতে পাইলাম না। এই গল্পের প্রতিপাদ্য কি তাহাও অস্পষ্ট।

আমার পূর্ব্বস্মৃতি—শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু। এক অষ্টম গর্ভের সন্তান অদৃষ্টের জোরে কিরূপে বিচারকের দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল তাহাই এ স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। রচনায় লিপিকুশলতা না থাকিলেও ইহা পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিবে। বলিবার ভঙ্গীটা ঠিক স্মৃতিকথার মত নয়, কতকটা উপন্যাসের মত, কিন্তু উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ইহাতে নাই। বিষয়টী সর্ব্বত্র স্মৃতিকথার মত বর্ণিত হইলেই ভাল হইত।

ডেভিল ম্যারেজ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু। কয়েকটি চিত্র একটি কথাসূত্রের দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে। আখ্যানভাগে রচনার নৈপুণ্য দৃষ্ট হয় না। তবে হাস্যরসটুকু বিশেষ উপভোগ্য।

প্রেরণা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু। গল্পটীর শিরোনামা সার্থক বলিয়া মনে হয় না। রচনা শব্দবহুল ও প্রাণহীন। লেখক যে সব উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা সুবিন্যস্ত হইয়া একটা সমগ্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে নাই। একদিকে দুই ভ্রাতার বিচ্ছেদকথা অপর দিকে মৃণাল ও উমার প্রণয়কাহিনী রচনার বিষয়টীকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পাঠকের রসানুভূতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মা—শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ। গল্পের প্লট সামান্য, ঘটনার সংযোগে কোন প্রকার চাতুর্য্য লক্ষিত হয় না। যে পুত্র মাতৃভক্ত বলিয়া পরিচিত, মাতার প্রতি তাহার উদাসীনতাই লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাণহীন ও দুষ্ট যথা,—হায়! স্নেহমুগ্ধা মমতাময়ী আমার আদর্শস্বরূপা মাতৃহৃদয়।

মহামায়ার খেলা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। একটা দুর্গোৎসবের কথা। ছোট গল্পের কারুকার্য্য বা বৈশিষ্ট্য নাই। রচনাটী অল্প গুডতা বর্জ্জনের সমর্থক।

ত্রিস্রোত—"কপুর" সূচীপত্রে বলা হইয়াছে ইহা একটা গল্প। ইহার দীর্ঘ ভূমিকা ও উপসংহার দেখিয়া গল্পটী সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। লেখক মনের আনন্দে যে বাক্যজাল নির্ম্মাণ করিয়াছেন পাঠক তাহাতে জড়িত হইবেন, তবে আনন্দের কোন ভরসা নিশ্চয়ই নাই। গল্পটী অসম্পূর্ণ এ কথা শুনিলে হয়ত কতকটা আশার সঞ্চার হইতে পারিত।

প্রমত্ত মর্ত্ত্যলোক—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা। একটা হাস্যরসাত্মক রচনা। আমরা পড়িয়া মাঝে মাঝে হাসিয়াছি। তবে অনেক স্থলেই রসবিকাশের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

দিব্যদৃষ্টি—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মাসিক-সাহিত্যে গল্পের অভাব

কোনও নূতন মাসিকপত্র হস্তগত হইলেই সাধারণ পাঠক মোড়ক খুলিয়া প্রথমেই সূচিপত্রে চোখ বুলাইয়া দেখেন কয়টি গল্প আছে। তারপর লেখকদিগের নাম দেখিয়া, যিনি নামজাদা লেখক বা কিছু নামও করিয়াছেন, তাঁর লিখিত গল্পটিই সর্ব্বাগ্রে পড়িতে বসেন। সেই গল্পটি শেষ হইলে যদি সময় থাকে—অন্যান্য অখ্যাতনামা লেখকদিগের রচিত গল্পগুলি পড়িতে বসেন। গল্প ল সাঙ্গ হইলে মনে করেন—যাহা হোক এ সংখ্যার

কাগজখানা তো একরকম সারা হইল। তখনো কিন্তু ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসগুলি এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও কবিতা-গুলি একেবারেই দেখা হয় নাই।

রমাই পণ্ডিতের মহাভারত, পাতালপুরীর শিলালিপি, গুটিপোকার চাষ, বেদের সময় নিরূপণ এবং প্রাচীন গৌড়ের ইতিবৃত্তের সহিত সাধারণ পাঠকের কোনো হৃদ্যতা নাই। তাঁহারা ঐ ফুটনোট কণ্টকিত প্রবন্ধ গুলিকে যথা সম্ভব এড়াইয়া চলেন। ঐ সমস্ত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ মুষ্টিমেয় পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক পঠিত হয় এবং ইহার সম্বন্ধে যত কিছু আলোচনা তাঁহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু কেবল মাত্র ঐ মুষ্টিমেয় পণ্ডিত মণ্ডলী লইয়াই তো কাগজ চলে না। কাগজ চালাইতে হইলে সাধারণ পাঠকের সহিত সহযোগিতা রাখা চাই এবং তাহা রাখিতে হইলেই গল্প চাই—এই জন্যই মাসিক সাহিত্যে গল্পের চাহিয়া এত বেশি। তাই বলিয়া ইহা সত্য নহে যে—যে কাগজে যত বেশি গল্প প্রকাশিত হয়, সেই কাগজই তত উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট গল্প যদি একটি মাত্র প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে সেই একটি মাত্র গল্পই রসগ্রাহী পাঠকের চিত্ত যেমন ভরিয়া রাখিবে, এমন দশটি নিকৃষ্ট গল্পে পারিবে না। কিন্তু সকল লেখকের প্রতিভা তো সমান নহে—এবং সকলের প্রতিভাও সব দিক দিয়া সমান ভাবে খেলে না—বিশেষতঃ যাঁহারা হালে কলম ধরিয়াছেন তাঁহাদের রচনার মধ্যে রসস্ফূর্ত্তির অভাব অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়। তাই বলিয়া তাঁহারা যদি কেবাল নিষিদ্ধ প্রেম কাহিনীর আবোল তাবোল বকিতে থাকেন, তাহা হইলে বিজ্ঞ বহুদর্শী সম্পাদক মহাশয়গণের কর্ত্তব্য ঐ 'রাবিস' গুলি পত্রস্থ না করা। ইহাতে একশ্রেণীর চপলমতি লেখক-দিগকে অকারণ রাগাইয়া তোলা হয়।

গল্প যখন আমাদের সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে, তখন ইহাকে কখনই ছোট করিয়া দেখা কর্ত্তব্য নহে।

সাধারণ পাঠকের রসগ্রহণ করিবার শক্তির অধিকার যতই থাক, তাঁহারা দুধ ঘোলের তফাৎটা বুঝিতে পারেন। তাঁহারা যথার্থই গল্প ভালবাসেন, কিন্তু তৎ পরিবর্ত্তে আবোল তাবোল একেবারেই সহিতে পারেন না। আজকাল আবার অতি আধুনিক একদল গল্প লিখিয়ে উঠিয়াছেন, ইঁহারা সমস্ত গল্পটা সম্পূর্ণভাবে বলেন না—কাটা কাটা ভাবে বলিতে বলিতে হঠাৎ একজায়গায় শেষ করিয়া দেন। ইহা একটা নূতন ফ্যাসান হইতে পারে—কিন্তু সাধারণ পাঠকবর্গ এই সব অতি আধুনিকগণের ফ্যাসানের দৌরাত্ম্যে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন।

উদীয়মান লেখকদিগের মধ্যে ভাল গল্প লেখক যে একেবারেই নাই একথা বলি না। তবে তাহার সংখ্যা এতই কম যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্লটের কারচুপি নাই, কল্পনার মনোহারিত্ব নাই, বিষয় নির্ব্বাচন শক্তি নাই, ভাষার সরলতা নাই—সম্বল কেবল সবুজ শাড়ীর আঁচল দোলানো তরুণী নায়িকা, আর লম্বা চুলো চশমা পরা প্রেমের কবিতা লেখক নায়ক। এই অল্প পুঁজিতে কি গল্প জমে? এই শ্রেণীর কবিতা-লেখক, বংশীবাদক ও চিত্রকর নায়কদিগের কীর্ত্তিকলাপের বহুদিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে—ইহাদিগের অত্যাচারে তরুণী নায়িকাকুল এইবার 'তরুণ সংশ্রব নিবারণী' সভা না করিয়া বসেন তো রক্ষা। দেওঘর, মধুপুর, যশিডি, পুরীর সমুদ্রসৈকত, দার্জ্জিলিঙ, ওয়ালটেয়ার, কার্সিয়াং—প্রভৃতি স্থানের উদ্ভট প্রেমের কাহিনী কি কোনও দিন ফুরাইবে না? তরুণী রূপসীর কাজল চোখ, নীল শাড়ী, হাঁটু ছোঁওয়া চুল, সিঁদুরে মেঘের মতো মুখের লালিমা—এসব জিনিষের আলোচনা অনেক হইয়াছে, আর কেন? এইবার কিছুদিন ঐ তরুণী রূপসীর দলকে বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কি?

মাসের পর মাস ঐ একঘেয়ে নীরস প্রেমের কাহিনী শুনিতে শুনিতে নিরীহ পাঠককুল হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা কি ঐ সব পড়িবার জন্য কাগজ ক্রয় করেন? ঐ সব পড়িয়া তাঁহারা বিরক্ত হইয়া লেখকের উদ্ভট কল্পনার পাগলামী দেখিয়া একটু হাসিয়া কাগজ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেন। তাঁহাদের অন্তরের প্রতিবাদ ঠিক আসল স্থানে পৌছে না বলিয়া ইহা তাঁহারা ভালবাসেন—এরূপ মনে করিলে, ভু মনে করা হইবে। এক একটি গল্পের স্থান-বিশেষে নায়ক নায়িকার কথোপকথন এমন জঘন্যভাবে বর্ণিত হয় যে, মনে হয় লেখক ইহাদের নাড়িভুঁড়ি চটকাইয়া পবিত্র সাহিত্য মন্দিরে ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধ ছড়াইতেছেন। পূর্ব্ব-

২১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৩৬

২য় খণ্ড
৫ম সংখ্যা

হিন্দুধর্ম্মে সাম্য

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং তজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন, তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে এক অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব বলিয়া প্রকাশ করেন তিনিই বেদান্ত-বিদ্‌গণের ব্রহ্ম, যোগিগণের পরমাত্মা এবং ভক্তগণের ভগবান্। আবার ভক্তগণ শিব বিষ্ণু রাম কালী দুর্গা সূর্য্য গণপতি প্রভৃতি নামরূপ ভেদে যে দেবতার উপাসনা করেন, তিনিও সেই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম। ইহাই বেদ পুরাণ তন্ত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই সার সত্যটি প্রথমতঃ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া একদল হিন্দুসন্তান হিন্দুর উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বোধে পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টানদিগের অনুকরণে এক পৃথক ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, তাহার নাম ব্রাহ্মসমাজ। পরে আবার তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ ভুল বুঝিতে পারিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া স্থানলাভ করিয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু এখন আবার আর এক দল লোক হিন্দুধর্ম্মের সেই ঐক্যসূত্র ভুলিয়া গিয়া শৈব শাক্ত-বৈষ্ণবাদি নানা আপাত-বৈষম্যময় বিশাল হিন্দু জাতিকে ধর্ম্মমতের জন্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মনে করিয়া নানা কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে একতাসূত্রে বন্ধনের চেষ্টা করিতেছেন। কেহ

বলিতেছেন, সর্ব্ব জাতিকে গায়ত্রী দীক্ষা দ্বারা ব্রাহ্মণ বানাইলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কেহ বলিতেছেন, সমস্ত হিন্দু সন্তানদিগকে জাতি-নির্ব্বিশেষে এক 'রাম' নামে অথবা প্রণবযুক্ত শিব বা নারায়ণ মন্ত্রে দীক্ষা দিলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি বলি, এই সকল কৃত্রিম উপায়ে কখনও জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। প্রথমতঃ, এই প্রকার সমগ্র হিন্দুজাতিকে এক নাম বা এক মন্ত্রে দীক্ষাদান সম্ভবপর নহে; দ্বিতীয়তঃ সম্ভবপর হইলেও তাহা দ্বারা অভীষ্ট ফল লাভ হইবে না।

প্রত্যেক মনুষ্য তাহার উপাস্যদেবতার সহিত নিজের ভাবে নিজের প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অধিকারী। এ বিষয়ে তাহার জন্মগত স্বতন্ত্র অধিকার ও স্বাধীনতা আছে। হিন্দুশাস্ত্র তাহার এই জন্মগত অধিকার স্বীকার করিয়া পরম উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এবং সেই অনুসারে হিন্দুদিগের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ব্যাপার হঠাৎ কোন রাজ্যশাসক বা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের হুকুমের দ্বারা হয় নাই, ইহা মানুষের জন্মগত সংস্কার হৃদয়বৃত্তি ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিহাসে পাওয়া যায় বটে, কোনও সময়ে রাজাকে আশ্রয় করিয়া কোন স্থানে শৈব মত, সৌর মত, বৈষ্ণব মত, প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সেই সেই মত গ্রহণের জন্য জনস ধারণের উপর জোর জবরদস্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক উপাসকের নিকট তাহার নিজের মত ও বিশ্বাস একটি জলন্ত সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা তোমার আমার মুখের কথায় ধুইয়া মুছিয়া যাইবার নহে। আজ কোনও প্রবল ধর্ম্ম-প্রচারকের অনুরোধে যদি এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসকমণ্ডলী তাঁহাদের নিজ নিজ উপাস্যদেবতা বা মন্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য একটি মন্ত্র বা নাম জপ ধ্যান করিতে আরম্ভ করেন, তবে তাহা কখনও তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না, তাহা দ্বারা বরং তাঁহাদের ধর্ম্মপিপাসা নষ্ট করিয়া বিশেষ অনিষ্ঠ সাধন করা হইবে। তবে যে সকল জাতি বা সম্প্রদায়ের আদৌ কোন উপাস্যদেবতা বা মন্ত্র ঠিক নাই, তাহাদিগকে কোন সহজসাধ্য নাম বা মন্ত্রে দীক্ষিত করিলে সুফল ফলিতে পারে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই ভাবে বঙ্গদেশে হরিনাম প্রচার দ্বারা আপামর সাধারণের হিতসাধন করিয়াছিলেন।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারকগণ যদি আপাত-বৈধর্ম্ম্যের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে যথার্থই ইচ্ছা করেন, তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মূলতঃ ঐক্য আছে, তাহা শাস্ত্র-প্রমাণাদির সাহায্যে সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে, এক অদ্বিতীয় পরম পুরুষই লীলা বিগ্রহ ধারণ করিয়া শিব বিষ্ণু গণপতি দুর্গা কালী প্রভৃতি আকারে আমাদের উপাস্য হইয়াছেন। সাধকগণ নিজ নিজ প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে এই সকল নাম ও রূপের অবলম্বনে সেই এক সাকার সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন। সেই জন্য স্তোত্রাদিতে ইহার প্রত্যেক দেবতাকেই সকলের আদি কারণ বলা হইয়াছে। * সেই জন্য ইহার প্রত্যেক দেবতাই সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য, মূলতঃ কোন ভেদ নাই। সেই জন্য যিনি বৈষ্ণব তাঁহাকে প্রথমতঃ গণেশ সূর্য্য শিবাদি দেবতার উপাসনা করিতে হয়; আবার যিনি শৈব কি শাক্ত, তাঁহাকেও গণেশ সূর্য্য বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পূজা করিতে হয়। যিনি হরি ও হরে, কিংবা শিব ও শক্তিতে ভেদজ্ঞান করেন, তাঁহার পূজা নিষ্ফল ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী রাধা প্রভৃতি স্ত্রী দেবতা এক মহাশক্তিরই অংশ বা রূপভেদ; আবার শিব ও শক্তিতে এবং রাধা ও কৃষ্ণে মূলতঃ কোন ভেদ নাই। একই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সৃষ্টি লীলা প্রকটের জন্য নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ব্যক্ত হইয়াছেন।

এখন আমার এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপ আমি আমাদের নিত্য উপাস্য দেব দেবীর কতকগুলি স্তোত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। আমি আমাদের সকল সম্প্রদায়ের নিত্য পাঠ্য কতকগুলি স্তোত্র সংগ্রহ করিয়া "স্তুতিস্তবক" + নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক

---

* মৎপ্রণীত "সাকার ও নিরাকার" পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

+ "স্তুতিস্তবক' ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলি-

বাহির করিয়াছি, এই শ্লোক গুলি তাহা হইতে উদ্ধৃত হইল।

গণেশের স্তোত্র

"যতোহনন্ত শক্তেরণন্তাশ্চ জীবাঃ
যতো নির্গুণাদপ্রমেয়া গুণাস্তে।
যতো ভাতি সর্ব্বং ত্রিধা ভেদভিন্নং
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥" ইত্যাদি

অর্থাৎ যে অনন্ত শক্তিময় পরব্রহ্ম হইতে অনন্ত জীবের সৃষ্টি হইয়াছে, যে নির্গুণ সত্তা হইতে অপ্রমেয় গুণরাশি নির্গত হইয়াছে, যাঁহা হইতে সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব উদ্ভিন্ন হইয়াছে, সেই গণেশকে আমি নমস্কার ও ভজনা করি।

এখানে গণেশকে পরব্রহ্ম বলিয়া স্তব করা হইয়াছে।

শিবের স্তোত্র

জগদুদ্ভবপালননাশকরং
করুণয়ৈব পুন স্ত্রিরূপধরম্।
প্রিয়মানব সাধুজনৈকগতিং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

* * *

তেজোময়ং সগুণনির্গুণমদ্বিতীয়ং
আনন্দ কন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ম্।
নাগাত্মকং সকল নিষ্কলমাত্মরূপং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥

* * *

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্॥
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য॥

একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সমস্তং
সত্যং সত্যং নেতরচ্চাস্তি কিঞ্চিৎ।
একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়োহবতস্থে
তস্মাদেকং ত্বাং প্রপদ্যে মহেশম্॥

এই সকল শ্লোকের ভাষা অতি প্রাঞ্জল, সেজন্য ইহার অনুবাদ দেওয়া হইল না।

এই সকল স্তোত্রে **শিবকে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিয়া স্তব করা হইয়াছে।**

বিষ্ণুর স্তোত্র

ত্রিদশং বিভুং নির্ম্মলং নির্ব্বিকল্পং
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারগম্যম্।
গুণাতীতমব্যক্তমেকং তুরীয়ং
পরং ব্রহ্ম যং বেদ তস্মৈ নমস্তে॥
বিশুদ্ধং শিবং শান্তমাদ্যন্তশূন্যং
জগজ্জীবনং জ্যোতিরানন্দরূপম্।
অদিগ্‌ দেশকাল ব্যবচ্ছেদনীয়ং
ত্রয়ী ব্যক্তি যং বেদ তস্মৈ নমস্তে॥

* * *

প্রাতর্ভজামি মনসাং বচসামগম্যং
বাচো বিভান্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ।
যন্নেতি নেতি বচনৈর্নিগমা অবোচং
স্তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্॥
প্রাতর্নমামি তমসঃ পরমর্কবর্ণং
পূর্ণং সনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম্।
যস্মিন্নিদং জগদশেষমশেষমূর্ত্তৌ
রজ্জাং ভুজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ॥

এই সকল স্তোত্রে **বিষ্ণুকে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিয়া স্তব করা হইয়াছে।**

দেবীর স্তোত্র

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্ বন্দ্য পাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

কাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং কাশী দশাশ্বমেধ ঘাট বাণী বিদ্যালয়ে প্রাপ্তব্য, মূল্য ।/০ আনা মাত্র।

অচিন্ত্যাপি সাকার শক্তিস্বরূপা
প্রতিব্যক্ত্যধিষ্ঠান সত্ত্বৈকমূর্ত্তিঃ।
গুণাতীত নির্দ্দ্বন্দ্ব বোধৈকগম্যা
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥

* * *

যদা নৈব ধাতা ন বিষ্ণু র্নরুদ্রো
ন কালো ন বা পঞ্চভূতানিলাশাঃ।
তদাকারণীভূত সত্ত্বৈকমূর্ত্তি-
স্তমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥

* * *

ন বলো ন চ ত্বং বয়ঃস্থা ন বৃদ্ধা
ন চ স্ত্রী ন বণ্ডঃ পুমান্নৈব চ ত্বম্।
ন চ ত্বং সুরো নাসুরো নো নরো বা
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥

এই সকল স্তোত্রে শক্তিকে (দুর্গা, কালীকে) এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিয়া স্তব করা হইয়াছে।

এইরূপে আমরা বুঝিতে পারিলাম, শৈব শাক্ত বৈষ্ণব গাণপত্য প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করেন। তাঁহাদের উপাস্য দেবতার মূলতঃ কোন ভেদ নাই, কেবল নাম ও রূপের ভেদ মাত্র। তাই মহিম্নঃ স্তোত্রে বলা হইয়াছে,—

—"ঋজু কুটিল নানা পথজুসাং
নৃণামেকো গম্য স্তমসি পয়সামর্ণব ইব।"

—হে ভগবান্, নদী সকল যেমন কোনটি সরল কোনটি কুটিল পথে ধাবমান হইয়া একমাত্র সমুদ্রে পতিত হয়, সেইরূপ সকল মানবই বিভিন্ন উপাসনার পথ অবলম্বন করিয়া একমাত্র তোমাতেই মিলিত হইয়া থাকে।

হিন্দুধর্ম্মের এই মূলতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোন অবসর থাকে না, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন সহজসাধ্য হয়। তাহার জন্য অন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের আবশ্যক হয় না। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা (Unity in diversity) তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এরূপ দুই চারিজন গোঁড়া আছেন যাঁহারা মনে করেন, আমরা যে যে পথে চলিতেছি তাহাই একমাত্র সত্য পথ, অন্যের অবলম্বিত পথ কুপথ। আমার কৃষ্ণ, বা আমার কালীই একমাত্র সত্যদেবতা, অন্যের উপাসিত দেবতা মিথ্যা। ইঁহারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম, যুক্তিতর্ক দ্বারাও নিজ নিজ ভ্রম বুঝিতে পারেন না। এই সকল সংকীর্ণচিত্ত লোকদিগের মধ্যে কিছুতেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

সংপ্রতি একদল লোক বলিতেছেন, দেবতার পূজায় মনুষ্য মাত্রেরই সমানাধিকার, সুতরাং সকল জাতীয় লোকই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদে দেবমন্দিরে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে। তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা একবার বিচার করা আবশ্যক।

ভগবান্ বা ভগবতীর জাতিভেদ নাই সত্য, কিন্তু উপাসকদিগের মধ্যে জাতিভেদ আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আবার সাধনের উচ্চনীচ ক্রম অনুসারে সাধকদিগের মধ্যেও অধিকার ভেদ আছে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার বশতঃ অথবা ইহজন্মে আত্মচেষ্টা দ্বারা একজন সাধক এতদূর উন্নত হইয়াছেন যে অন্যে তাঁহার পদধূলিরও যোগ্য নহে। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে এবং কঠোর তপস্যা দ্বারা ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এত উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন যে, আমরা তাঁহার পদতলে বসিবারও যোগ্য নহি। তিনি মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে চিন্ময়ী দেবতাকে দর্শন করিতেন এবং মায়ের সঙ্গে কত প্রাণের কথা কহিতেন। ধরুন আর একজন ব্রাহ্মণ সাধক মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া যদি মাকে সেইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে থাকেন, এমন সময় কয়েকজন নিম্নজাতীয় লোক আসিয়া যদি বলে—"ঠাকুর, আমরা সকলে চাঁদা করিয়া তোমার দ্বারা কালীপূজা করাইতেছি, তুমি দরজা বন্ধ করিয়া আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া একলাই দেবতাকে দর্শন করিতেছ, তুমি ত আচ্ছা স্বার্থপর! খোল মন্দিরের দরজা, আমরাও মন্দিরে ঢুকিয়া দেবতার পূজা করিব।" তাহারা যদি কোন দেশহিতৈষীর প্ররোচনায় প্রকৃতই দরজা ভাঙ্গিয়া মন্দিরে প্রবেশ করে, তবে তাহারা কি দেখিবে? তাহারা নিশ্চয়ই সেই চিন্ময়ী দেবতার দর্শন পাইবে না, তাহারা দেখিবে সুধু মাটী আর খড়। সাতের মধ্যে যে পুরোহিতের

অসাধারণ ভক্তি বলে দেবতা প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যিনি সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলকামনায় দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া বরলাভে কৃতার্থ হইতেছিলেন, তাঁহার সেই পূজা পণ্ড হইবে। দেবতার পূজা কেবল গায়ের জোরে অথবা বক্তৃতার বাহাদুরিতে হয় না, তাহা বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনা সাপেক্ষ। আজ যে জনসাধারণকে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজা (?) করিবার জন্য উত্তেজিত করা হইতেছে, তাহাদের কয়জন প্রকৃত পূজা জানে? যদি তাহাদিগকে বলা হয়, তোমরা সকলে সারাদিন নিরম্বু উপবাস করিয়া থাক, রাত্রি দুই প্রহরে দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিবে, তবে তাহার মধ্যে কয়জনে সেই কৃচ্ছ্রসাধনে সম্মত হইবে?

শাস্ত্রে আছে, সাধকের ভক্তিদ্বারা প্রতিমাতে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। তাহাও সকল ক্ষেত্রে সমান হয় না, তাহা দেবতার কৃপাসাপেক্ষ। যে যে স্থানে কোন মহাপুরুষের ঐকান্তিক ভক্তি তপস্যার বলে দেবতা কৃপা করিয়া প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেইগুলি মহাপীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই সকল মহাপীঠে কোন জাতিবিচার নাই, এই জন্য ৺কালীঘাটাদি সিদ্ধপীঠে অথবা ৺কাশীধামের বিশ্বনাথ মন্দিরে অথবা ৺পুরীধামের জগন্নাথ মন্দিরে সর্ব্বজাতীয় হিন্দু উপাসকের অবাধে প্রবেশের অধিকার আছে। কিন্তু যে গাছটি এখনও বড় হয় নাই, তাহাকে যেমন চারিদিকে বেড়া দিয়া রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপে যে যে স্থানে এখনও দেবতার প্রত্যক্ষদর্শন ঘটে নাই সেখানে সাধককে নানা প্রকার শাস্ত্রীয় নিয়মপদ্ধতি মানিয়া চলিতে হয়। একজন মালী বহু আয়াস স্বীকার করিয়া তাহার বাগানে কয়েকটি গোলাপ গাছ জন্মাইয়াছে, এবং অনেক দিনের পরে সেই গাছে ফুল ফুটিয়া বাগান উজ্জ্বল হইয়াছে। মালী বাগানের চারিদিকে শক্ত বেড়া দিয়া গাছগুলিকে রক্ষা করিতেছে। এখন যদি একজন সর্ব্বভূতে সমদর্শী দয়াশীল মহাত্মা আসিয়া বলেন,—"ওহে মালী! তুমি চারিদিকে ঐ বেড়া দিয়া ঘোর নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার করিয়াছ। ঐ বেড়া আজই ভাঙ্গিয়া দিয়া গরুদিগকে এই বাগানে অবাধে চরিতে দাও। তাহারাও ত ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, তাহাদিগের এখানে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।" সেই মহাত্মার হুকুমে মালী যদি বাগানের বেড়া ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে সেই কণ্টকাকীর্ণ গোলাপ গাছ খাইয়া গরুর পেট নিশ্চয়ই ভরিবে না, কিন্তু সে বাগানে আর গোলাপও যে ফুটিবে না ইহা নিশ্চয়।

আজ যাঁহারা বাঙ্গলার হিন্দু সাধারণকে দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য ক্ষেপাইয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতেছেন কিনা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আজ দেশের নানাস্থানে "সার্ব্বজনীন পূজা" নামে যে সকল অনুষ্ঠান হইতেছে, সেগুলিকে "পলিটিক্যাল পূজা" বলা যাইতে পারে, তাহার দ্বারা পূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইতেছে কি না সন্দেহের বিষয়। উপাস্য দেবতা যে শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে প্রসন্ন হন, সে পূজায় তাহার একান্ত অভাব দেখা যায়, কেবল "আমি বড়" ভাবটাই বিশেষ রূপে ফুটিয়া উঠিতেছে। এই প্রকার আসুরিক পূজার ফল গীতায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধন মান মদান্বিতাঃ।
যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥"

ভগবান্ বলিতেছেন,—যাহারা আত্মসর্ব্বস্ব, অনম্র, ধন ও মান জনিত অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া নামযজ্ঞ দ্বারা অবিধিপূর্ব্বক আমার পূজা করে, যাহারা অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধপরবশ হইয়া আত্মদেহ ও পরদেহে আত্মারূপে অবস্থিত আমাকে হিংসা করিয়া সাধুদিগের নিন্দা করে, আমি সেই সকল হিংসাকারী, ক্রূর, অশুভ নরাধমদিগকে অনবরত অসুর যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি।

আত্ম প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া বলপূর্ব্বক দেবমন্দিরে ঢুকিয়া অবিধি পূর্ব্বক পূজা করিলে তাহার পরিণাম কি একবার চিন্তা করা আবশ্যক। দেবপূজার প্রধান

উপকরণ হৃদয়ের ভক্তি, অহঙ্কার হিংসা দ্বেষ নহে। যে উপাসকের চিত্ত ভক্তিতে পরিপূর্ণ, তিনি নিজেকে দেবতার সমক্ষে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে করেন। ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে যাইয়া কখনও শ্রীবিগ্রহের নিকট যাইতেন না, তিনি দূরে গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বে দাড়াইয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেন। তখন তাঁহার অশ্রুধারার প্রবাহে সর্ব্ব-শরীর ভাসিয়া যাইত। মহাপ্রভুর কথা স্বতন্ত্র, কোন সাধক সাধনার যত উচ্চস্তরে আরোহণ করিবেন, তিনি ততই নিজের মলিনতা স্মরণ করিয়া দেববিগ্রহের সন্নিকটে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন। কিন্তু ইংরেজীতে যে একটা কথা আছে—"Fools rush in where angels fear to tread."— ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

হিন্দুর মেয়ে

(উপন্যাস)

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অশ্রুর প্রথম পসলা সবেগে বর্ষণের পর যমুনা দেবী কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। অসীম ধৈর্য্যসহকারে হৃদয় বাঁধিয়া মুকুলের অশ্রুসিক্ত ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সে চোখের সে দৃষ্টি মুকুল সহিতে পারিল না। মায়ের কোলের উপর হাত খানা প্রসারিত করিয়া মুকুল বড় স্নিগ্ধ বড় করুণ কণ্ঠে কহিল, "মা, আমি কি তোমায় বড় ব্যথা দিলাম? আমি যদি সব শুনতে না চাইতাম, তাহলে তুমি এত কষ্ট পেতে না। তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ তবুও যে আমার সব জানতে ইচ্ছা হচ্ছে মা। তোমার কাছে না জান্‌লে আমার কথা আমি কার কাছ থেকে জানবো?"

যমুনা চক্ষু মুছিয়া মুকুলকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। তারপর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ধীরে বলিলেন, "মুকুল, কষ্টের কথা কি বলছিস মা, এক যুগ বারো বছর এ যন্ত্রণা আমি বুকে লুকিয়ে পাষাণ হয়ে গেছি, কিন্তু ভুলতে পারি নি, যে একদিন আমার পুত্রহীন সংসারে পুত্রের শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে এসেছিল, যার মা ডাকে আমার প্রাণের কোথাও ফাঁক ছিল না, তার কথা আমি না বল্লে কে তোকে বলবে মা? জানি বল্‌তে বুক আমার ভেঙ্গে যাবে। তবু আমিই তোকে সব বল্‌বো। তার আপনার বলতে সংসারে কেউ ছিল না। ছেলে-বেলায় সে বাপ মা হারা। আত্মীয়শূন্য সুন্দর প্রতিভাবান ছেলেটিকে দেখে আমার শ্বশুর লোভ সাম্‌লাতে পারলেন না। তোকে দিয়ে তাকে আপনার করতে চাইলেন। তুই পাঁচ বছরের এতটুকু মেয়ে ব'লে উনি বাপের কথায় রাজী হতে চাইলেন না। কিন্তু বাপ সেকেলে মানুষ, তাঁর যুক্তি তর্ক ওঁর মতের সঙ্গে না মিল্‌লেও উনি বাপের মনে আঘাত দিতে পারলেন না। পাঁচদিন শুনে শুনে শেষে বাপের মতে ওঁকে মত দিতে হল। মত দেওয়া ছাড়া তখন আর উপায়ও ছিল না। তাকে আমিও দেখেছি-লাম, শুধু দেখা নয়, তোর পাশে আমার কোলে রাতদিন তাকে কামনা করেছিলাম। বাইরে বাপ, ঘরে আমি—ওঁর অনিচ্ছা ইচ্ছায় পরিণত হ'ল।—সেটা ছিল ফাল্গুন মাস, দশই তারিখ। সে এসে পুত্রহীনার পুত্রের স্থানটি অধিকার ক'রে ফেল্লে। তাকে পেয়ে আমার সুখ অসীমায় গিয়ে পৌঁছল। বড় আনন্দে বড় সুখে তোদের নিয়ে আমরা তিনটি মাস কাটিয়ে দিলাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে তাকে সঙ্গে ক'রে উনি বাড়ী এলেন। দেশে এসেই তার জ্বর হ'ল। সে জ্বর ক্রমে টাইফয়েডে দাঁড়াল। সেই সময় তোরও টাইফয়েড হ'ল। এর পরের টুকু আমি কি করে বলি মুকুল? এর পরেও কি আমার বলবার আছে?"

যমুনা দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন।

মুকুল পাষাণ পুত্তলিকার মত স্তব্ধ হইয়া জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। সমস্ত জানিয়া শোকের দারুণ সন্তাপে তাহার চোখের জল অকস্মাৎ শুকাইয়া গেল। বুকের ভিতর হইতে একটা অব্যক্ত ব্যথা হায় হায় করিয়া উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল।

জানালা দিয়া যতটুকু আকাশ দেখা যায় মুকুল সেই দিকে চাহিয়া রহিল বটে, কিন্তু যে উদয়াস্ত ছায়ালোকের বিচিত্র রঙ্গভূমি—প্রভাতের অরুণালোকে কোথাও উজ্জ্বল হইয়া, মেঘের আচ্ছাদনে কোথাও ম্লান ভাবে নিবিয়া তাহার প্রাণে সৌন্দর্য্যের তুলিকা বুলাইল না। প্রতিদিনের মত তেমনি দ্রুতগতিতে তপনদেব দূর নীলাম্বর গাত্রে সহস্ররশ্মি বিচ্ছুরিত করিয়া উজ্জ্বলতর বেশে উদিত হইলেন। আকাশের গা ঘেঁষিয়া রৌদ্রালোকে পাখা মেলিয়া পাখীর ঝাঁক উড়িয়া গেল। গঙ্গার স্বচ্ছ জলে আকাশের ছায়া, সূর্য্যের ছায়া, সারিবদ্ধ পাখীর ছায়া একবার ভাঙ্গিল, আবার গড়িল। নিশার শিশির দূর্ব্বাদলে, পত্র পুষ্পে এবং মুদিত মুকুলের বুকে যে বেদনার অশ্রুটুকু রাখিয়া গিয়াছিল, রৌদ্রস্পর্শে ধীরে ধীরে সেটুকু শুকাইয়া আসিল, কিন্তু কিছুই মুকুলের চোখে পড়িল না। তিমিরাবৃত অতীত ভেদ করিয়া তাহার মানসনয়নে ঝাপসা ঝাপসা কি যেন কতক গুলা ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই অতীতের স্মৃতিগুলি সযত্নে হৃদয়পটে অঙ্কিত করিতে মুকুল কত চেষ্টা করিল, তবু তাহা স্বপ্নের ন্যায় মনের ভিতর ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিল না। সেই চেষ্টায় মুকুলের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল।

যমুনা ব্যস্ত হইয়া অঞ্চলে মুকুলের ঘর্ম্মসিক্ত ললাট মুছাইয়া দিলেন। পাখাখানা তুলিয়া লইয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন "আবার গা ঘামছে, অমন করে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছিস কেন মুকুল? বড্ড কি কষ্ট হচ্চে মা? আবার অসুখ বোধ করছিস?"

"অসুখ, না মা, অসুখ নয়। কষ্ট না মা; আমার কষ্ট হচ্চে না।" বলিয়া মুকুল উদাস দৃষ্টি মায়ের মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিল। সে নয়নের হতাশা যমুনার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল। তিনি আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন "মুকুল মা আমার, কেন অমন করে চাচ্ছিস? তোর কোন চিন্তা নেই, এখনো তোর মায়ের কোল আছে বাপের অগাধ স্নেহ আছে। তোর ভাবনা কি? উনি তোকে সুখী করতে সংসার স্বজন সবই পরিত্যাগ করে এসেছেন। তোর সুখের জন্যে বাকী যা আছে তাও ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে আছেন। যেমন করেই হোক্ যাকে দিয়েই হোক তোর অপূর্ণ জীবন তিনি পূর্ণ করবেন মুকুল।"

মায়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে মুকুল শিহরিয়া উঠিল। তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া গেল। কর্ণকুহরে মধ্যে নিস্তব্ধ মৃত্যু-রজনীর ঝিল্লি ধ্বনির মত "শিশির শিশির" একটা শব্দ হইতে লাগিল।

মুকুল দুই হাতে পাশ-বালিসটা আঁকড়িয়া ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"মা, কি বলছ? এই জন্যেই কি তোমরা আমাকে আমি কি জানতে দাও নি? আমার জন্যে, একটা মেয়ের জন্যে, এত কষ্ট পেয়েছ, এত ব্যথা সয়েছ, কিন্তু বিধির বিধি ওল্টাতে পার নি, পারবেও না। আমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর মেয়েই থাকবো। আর কিছু হব না মা। আমার জন্যে তোমাদের আর কিছু করতে হবে না। সকল সমাজে সকল ধর্ম্মেই ত্যাগের মূল্য আছে, সতীত্বের মূল্য আছে. তোমাদের মেয়ের জন্যে ভয় নেই মা, তোমাদের শিক্ষা তোমাদের ত্যাগ তাকে পথের খবর দিতে পারবে। যা তোমাদের মনে আছে তা ব'লে আর কখনো আমায় অপবিত্র করো না। তোমাদের মত বাপ-মা যার, তার কিসের দুঃখ। এই একটু আগেই না তুমি বল্লে—আমি তোমার কোলের কুমারী মেয়ে। আমি কুমারী মেয়েই মা, আমার আর কিছু ভেব না।"

"না মা, আর কিছু ভাববো না, তুমি আমার কুমারী মেয়ে, আশীর্ব্বাদ করি আজীবন কুমারীই থেকো। তোমার তপস্যার সিদ্ধি ইহলোকে না মিলেও পরলোকে মিলবে।"

মা ডান হাত খানি মেয়ের মাথার উপর রাখিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মধ্যাহ্নে মুকুল সিঁড়ির পার্শ্বের নিভৃত কক্ষে বসিয়া

স্মৃতির সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। তাহার সম্মুখে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েক খানি পুরাতন খাতা, জীর্ণ পত্র, আর কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক। এ সমস্তই শিশিরের, অভাগিনী মুকুলের স্মৃতির সমুদ্রের শ্রেষ্ঠ মণি, হারাণো রত্ন। কলিকাতায় প্রবাস যাপনের সময় এই ক্ষুদ্র চিঠি কয়েক খানি শিশির যমুনাকে লিখিয়াছিল। যমুনা তাহার সামান্য এতটুকু জিনিসও নষ্ট হইতে দেন নাই। মহামূল্য রত্নের ন্যায় প্রতি জিনিস সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। তাহার পুরাতন অস্পষ্ট ফটো হইতে এক খানি সুন্দর উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছেন।

মুকুল প্রথমে বহুবার পঠিত পত্রগুলি পুনরায় পাঠ করিয়া, পত্রের প্রতি অক্ষর প্রতি রেখাটির প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া চাহিয়া পুস্তক কয়েক খানি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। খাতা দেখা শেষ হইলে শিশিরের ছবিখানা লইয়া বসিল। সেই সুন্দর প্রিয়দর্শন আলেখ্য খানি নিরীক্ষণ করিতে করিতে মুকুলের নেত্রপ্রান্ত বহিয়া দুইটি স্বচ্ছ মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু নামিয়া আসিল। এই তাহার স্বামীর চিত্র। কি উজ্জ্বল সরল আঁখি দুইটি, প্রশস্ত সুগঠিত ললাট, বাঁশীর মত সুন্দর নাসিকাটি, তাহার নীচে ফুল্ল কুসুম তুল্য মধুর অধর। ইহাকেই কাল স্পর্শ করিয়াছে, ইহার নির্ম্মল প্রাণকণিকাটুকু হরণ করিয়া লইতে তাহার মমতা হয় নাই, করুণা হয় নাই? কোন্ পাষাণ এমন করিয়া ইহাকে ছিনাইয়া লইতে পারে? কোন্ পাষাণ ইহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে?

মুকুল চকিত দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া ছবি খানাকে মাথায় ঠেকাইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। চিত্রটি বক্ষে চাপিয়া মুকুল অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "তুমি এজগতে নাই, তোমার মধুমাখা শিশির নাম পৃথিবী থেকে মুছে গেছে, কিন্তু তবুও তুমি আছ; তুমি একেবারে নাই, আমি যে তা ভাবতে পারি নে। এ লোকে না থাক্‌লেও তুমি সে লোকে আছ, তুমি ফুরিয়ে যাও নি, ফুরিয়ে যেতে পার না। তুমি যেখানেই থাক্, যে লোকেই থাক— আমার প্রাণে বল দাও; তোমাকে মনে রাখতে শিখিয়ে দাও। আমি জগতের কায ক'রে, তোমার প্রতীক্ষা করে এজীবন যেন কাটাতে পারি।"

"মুকুল, মুকুল!"

মুকুল ব্যস্তভাবে ছবিখানি লুকাইয়া দ্বারদেশে অগ্রসর হইতেই দুইটি সুকোমল বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ হইল। সেই স্নেহের স্পর্শটুকু মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া মুকুল আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি তুমি কতক্ষণ হল এসেছ? কাউকে দিয়ে আমায় ডাকালেই পারতে, এত সিঁড়ি ভেঙ্গে কষ্ট করে আবার এখানেই এসেছ। চল দিদি, ঘরে গিয়ে বসবে চল।"

"ভারী ত ক'টা সিঁড়ি তাতেই আবার কষ্ট! তোর দিদির এত ননীর শরীর নয় মুকুল। আমি বেশীক্ষণ আসিনি, একটু মার কাছে ব'সে তোর কাছেই এসেছি। ঘরে কেন এখানেই বসছি, এখানে অল্প অল্প রোদ আসছে বোসে আরাম পাওয়া যাবে। তোর চুল গুলোও শুকানো যাবে।" বলিয়া তাপসী দ্বারদেশেই বসিলেন।

যমুনা দেবীর নিকটে মুকুলের ব্যর্থ জীবনের সকরুণ কাহিনী শুনিয়া তাপসী মুকুলকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন। অকালে বৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় এই তরুণীটির মধ্যে বিধাতা এমন একটা উপাদান দিয়াছিলেন, যাহাতে কেহ তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। জগতের ভালবাসা কুড়াইবার জন্যই যেন তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রথম দৃষ্টিপাতে তাপসীর হৃদয় যাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, কয়েক দিনের আলাপ আলোচনায় সে তাপসীর বড় কাছে আসিয়া পড়িল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দুঃখিনী মুকুলের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইল।

তাপসী অসীমের মেসে থাকিয়া প্রতি দিন দ্বিপ্রহরে মুকুলের কাছে আসিতেন, মুকুলকে দুটি স্নেহের কথা বলিয়া, একটু আদর করিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইত। তাপসী অপেক্ষাও আনন্দ হইত মুকুলের বেশী। মুকুল জীবনে বড় ভগিনীর স্নেহ পায় নাই, ছোট বোনের ভালবাসার স্বাদও জানে না। জীবনের দুর্দ্দিনে ঝটিকা-বিক্ষিপ্ত জীবন-নদীর উপকূলে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত অকস্মাৎ অভাবনীয়রূপে ভগিনীর স্নেহ লইয়া একজন তাহার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল। যে আসিল সে তাহারই ন্যায় ভাগ্যবিধাতা কর্ত্তৃক বিড়ম্বিতা, একই শোকের ছায়ায় অবস্থিত।

বিনা দ্বিধায়, বিনা সংশয়ে এক নিমেষেই মুকুল তাহাকে ভগিনীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিদি বলিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল।

তাপসী বসিলে তাপসীর কোলের কাছে বসিয়া মুকুল বলিল, "আজই কি তোমাদের যাওয়া ঠিক দিদি, আর দিন থাকতে পারলে না? তোমাকে পেয়ে যে আমি কি পেয়েছিলাম তা বল্‌তে পারবো না। জন্মাবধি আমি বোন দেখি নি, আমার খেলার সাথী পর্য্যন্ত ছিল না। বাবার, মার ভালবাসায় কোন দিন তার অভাবও জানি নি। কিন্তু এখন মনে হয় তোমার মত দিদি যদি আমার কাছে থাক্‌তো তা হলে খুব শান্তি পেতাম।"

তাপসী সজল চোখে গাঢ়স্বরে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ বোন, আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে আমাদের যাওয়া ঠিক হয়ে আছে। তোর কাছে আর ক'দিন থাকা আমার ত অসাধ ছিল না মুকুল, কিন্তু তাকে—তোর মত এম্‌নি আর একটী বোনকে আমি যে ফেলে রেখে এসেছি। শুধু ফেলে আসি নি, তার ঘাড়ে বুড়ো শ্বশুরঠাকুর, ঘর বাড়ী সব দিয়ে এসেছি। সে অনাহারে অনিদ্রায় আমার পথের পানে চেয়ে রয়েছে। আমি অসীমকে তার কাছে না নিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। জানি তোকে এমন ভাবে ফেলে যেতে প্রাণ আমার কেমন করবে। ভগবান আমাকেও তোর দিদি করেছেন, কিন্তু দূরের দিদি, কাছের নয়। কানপুর আর পাবনা অনেক দূরে, কি ক'রে এ দূরত্ব কাটিয়ে নেব মুকুল?"

"আমি বাবাকে বলে কাটাবার ব্যবস্থা করেচি দিদি। যে দেশে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা জ'ন্মে দেশে মাটীর সঙ্গে লয় হয়ে গেছেন, যেটা বাবার জন্মভূমি, শুধু জন্মভূমি নয়, সেখানকার ধূলোর সঙ্গে তার অস্থি এখনো মিশে রয়েছে সেই বাংলা সেই পল্লী আমার তীর্থভূমি। তা ছেড়ে কি আমি আর দূরে থাকতে পারবো? পারবো না দিদি, সেইখানেই আমায় যেতে হবে—আমি যাব। আমি যদি সেখানে একটা অনাথ আশ্রম করতে চাই, ছেলে মেয়েদের শিক্ষালয় করতে চাই, এম্‌নি জনহিতকর আরও যদি কোন কায করতে চাই, তা হ'লে তোমায় ডাক্‌লে তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে যাবে না দিদি?"

"যাব না, কি বলছিস মুকুল? তুই না ডাক্‌লেও যে তোর অমন মহৎ কাযে তোর এ অযোগ্যা দিদি তার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে ছুটে যাবে। কিন্তু বোন একটা কথা সঙ্কোচের সঙ্গেই আমায় বল্‌তে হচ্ছে—বাবা তোকে এমন ক'রে সর্ব্বত্যাগিনী হ'তে দেখলে ভারী আঘাত পাবেন। তাঁর সংকল্প তুই তো জানিস মুকুল? কেন তিনি সংসার ছেড়ে স্বদেশ ছেড়ে তোকে এমন ভবে প্রতিপালন করেছিলেন? তাঁর দিক থেকেও তুই একটু ভেবে দেখিস।"

মুকুল নত নেত্রে ভাবিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার আঁখিপল্লব ভেদ করিয়া অশ্রু ঝরিল। সে নয়ন-জল তাপসীর নিকটে অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত। বিস্মিতা তাপসী মুকুলের অশ্রুধৌত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "মুকুল কাঁদ্‌ছিস কেন? কি হ'ল বোন?

মুকুল কিছু না বলিয়া তাপসীর হস্ত হইতে মুখখানি মুক্ত করিয়া লইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিল। কিন্তু তাহার চোখের জলের বিরাম হইল না।

অনেক অশ্রু বর্ষণের পর, তাপসীর অনেক মিনতিতে মুকুলের মুখ ফুটিল। ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিল, "দিদি, জানি তুমি বাবার অনুরোধেই আমায় ভেবে দেখার কথা বলেছ, নইলে বলতে পারতে না! যে মেয়ে স্বামী চেনে না, স্বামীর ধর্ম্ম বোঝে না, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করতে পারে না, অনেক সমাজেই তাদের বিধবা বিবাহ হয়, কিন্তু তাই ব'লে সকলের হ'তে পারে না। তুমি তো বাল-বিধবা দিদি, তুমি কেন আর একটি বিয়ে করে সুখী হও নি? তুমি বলছ তুমি স্বামীর মর্ম্ম বুঝেছিলে, তাঁকে চিনে-ছিলে। আমি স্বামী চিনি নি, বুঝি নি, এ তোমার ভুল ধারণা। আগে জানি নি বলেই চিনি নি, বুঝি নি, অনির্দ্দেশের উদ্দেশে মন আমার ছুটে যেতে চেয়েছে। এখন তার কথা ভাবতে ভাবতেই বিস্মৃতি হ'তে আমার স্মৃতি এসেছে দিদি। পাঁচ বছর বয়সের বিয়ের কথা, খেলার কথা হাসি গল্পের কথা, এমন কি তার চেহারাটি পর্য্যন্ত এখন আমার মনে জাগ্‌ছে। এখন নতুন ক'রে আমার স্বামী খুঁজে নিতে হবে না দিদি, তিনি আমার মনের ভিতরেই রয়েছেন। তোমরা আমায় যতটা দুঃখিনী ভাব আমি তা নয় দিদি। তুমি যে দেশের মেয়ে, যে হিন্দুর মেয়ে, আমিও সেই দেশের, সেই হিন্দুর মেয়েই। যার জন্যে তুমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করে তপস্বিনী সেজেছ, তিনি

আমারো ছিলেন. এখনো আছেন। যুগ যুগান্তে কোটি কোটি জন্মেহিন্দুর বিবাহ, হিন্দুর সম্বন্ধ মুছে যায় না দিদি, তোমারো যায় নি, আমারো যায় নি।"

"মুকুল, দিদি আমার, আমি তোকে শিক্ষা দিতে এসেছিলাম, তুই আমায় শিক্ষা দে বোন। বল্, আবার বল্, হিন্দুর বিবাহ কোটি কোটি জন্মেও মুছে যায় না, আমাদেরো যায় নি।"

তাপসী প্রসারিত বাহুর মধ্যে মুকুলকে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়ের অশ্রুজলে উভয়ের বক্ষ সিক্ত হইয়া গেল

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নে রঘু তাপসীকে লইতে আসিল। সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য অসীম তাহার সহিত আজ আসিয়াছিল। অসুখ হইতে উঠিয়া অসীম এ গৃহে আর পদার্পণ করে নাই। মুকুলের ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের সংবাদ অসীমের অবিদিত ছিল না। মুকুল যে গৃহের আনন্দ প্রতিমা, আশালতা, যাহার জন্য গৃহের শোভা, আকর্ষণ, তাহাকে নিরাভরণা বিষাদে মলিনা দেখিবার আশঙ্কায় সুস্থ হইয়াও অসীম রায় ভবনে আসিতে সাহসী হয় নাই। আজ যাত্রার পূর্ব্বে ভদ্রতার খাতিরে তাহাকে বাধ্য হইয়াই আবার আসিতে হইয়াছে।

সেই গৃহ তেমনি সুসজ্জিত শোভন রহিয়াছে; সেই পরিচিত দাসদাসীগণ অসীমকে দেখা মাত্র পূর্ব্বের নিয়মানুসারে সসম্মানে মুকুলের পাঠাগারের দ্বার খুলিয়া দিল।

যন্ত্রচালিতের ন্যায় অসীম তাহার প্রিয়কক্ষে প্রিয় টেবলটির সম্মুখে চেয়ারটা টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। সেই আসবাব পত্র, সেই পুস্তকাবলী তেমনি রহিয়াছে, টেবিলের উপর মুকুলের পাঠ্যপুস্তকগুলি ঝক ঝক করিতেছে। কোণের দিকে বাদ্যযন্ত্র গুলা কাহার কোমল করস্পর্শের প্রতীক্ষায় পড়িয়া আছে। যেখানে যে জিনিষটি রাখা হইত, এখনও সেই জিনিষটি সেইখানে সেইভাবেই রহিয়াছে, কেবল তাহাদের মধ্যে মুকুল নাই। প্রত্যেক জিনিসের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া অসীম একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। মিঃ রায়ের সহিত তাহার দেখা করিতে ইচ্ছা হইল না। যমুনাকেও মনে পড়িল না। সন্ধ্যার গাড়ীটা যে তাহাকে ধরিতে হইবে অসীম তাহাও ভুলিয়া গেল। মুকুলের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কাহিনীটি তাহার মনের মধ্যে বারবার আন্দোলিত হইতে লাগিল।

অসীম কিছু না বলিলেও অসীমের আগমন সংবাদ মুকুলের নিকট পঁহুছিতে বিলম্ব হইল না। অসীম আসিয়াছে, পাঠাগারে অপেক্ষা করিতেছে, শুনিয়া মুকুল নিমেষের জন্য সচকিত হইল। নিমেষের তরে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে নিমেষের জন্যই। পরক্ষণে মুকুল শান্ত সংযত হইয়া অসীমের সহিত দেখা করিতে চলিল।

কিয়ৎকাল পর পদশব্দে মুখ তুলিয়া তাপসীর সহিত মুকুলকে দেখিয়া অসীম ব্যথিত হইল, তাহার দৃষ্টি অশ্রুজলে ঝাপসা হইয়া গেল। শুভ্র যুথিকা ফুলের মত বিধবা-বেশধারিণী শান্ত সুগম্ভীর সৌম্য ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি ও কে? ওই কি প্রফুল্ল-বদনা রত্ন-ভূষণা, কৌতুকময়ী মুকুল? না, না ও মুকুল নহে, উহার মধ্যে মুকুলের কোন চিহ্নই নাই। এ যে দেবীমূর্ত্তি। কামনা বাসনার অনেক উর্দ্ধে।

মুকুল আস্তে আস্তে অসীমের পাশে আসিয়া নত নেত্রে নত মুখে সহজ কণ্ঠে কহিল, "আপনি বড্ড রোগা হয়ে গেছেন অসীম দাদা, দেশে গিয়ে তাড়াতাড়ি শরীরটা সারিয়ে নেবেন। আপনার অসুখ থাকলে আমার কায করবে কে? এবার থেকে রীতিমত ভাবে আপনাকে দিয়ে খাটিয়ে নেব।"

মুকুল 'দাদা' সম্বোধন করিয়া সহজ ভাবে অসীমের সহিত বাক্যালাপ করিলেও অসীমের চঞ্চল হৃদয়কে শান্ত করিতে সময় লাগিল। চট করিয়া তাহার মুখে উত্তর যোগাইল না। সে বাহিরে দিনান্তের আরক্ত ছবিটির পানে দৃষ্টি প্রসারিত করিল।

দেবরের বিমূঢ় ভাব তাপসীর কাছে গোপন রহিল না তাপসী এখানে আসিয়া কথার ছলে অসীমের হৃদয়ের খবর জানিতে পারিয়াছিলেন। মুকুলের অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে শ্রীহীন বেশভূষায় অসীম বিহ্বল হইয়াছে ভাবিয়া তাপসী অসীমকে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কহিলেন, "বোনটি তো তোমাকে দিয়ে কায করিয়ে নেবার মহলা দিচ্ছে, তুমিও আকাশ পানে চেয়ে কাযের খসড়া মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছ, কিন্তু আজ যে

যেতে হবে তা কি মনে নেই অসীম? বেলা যে একেবারেই গেল, রঘুদা ভারী ছট ফট করছে। বাবা, মার সঙ্গে দেখা করে চল শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়া যাক্। তোমার অসুখ শরীর একটু সময় থাক্‌তেই যাওয়া উচিত।"

অসীম জবাব দিবার পূর্ব্বেই মুকুল বলিল, "তোমাদের যাবার সময় হয়ে এল বৈকি দিদি, রোগা মানুষ নিয়ে যাবে, তাড়াহুড়ো না ক'রে একটু ধীরে সুস্থেই যাওয়া ভাল। আমি বাবাকে, মাকে এখানেই ডেকে আন্‌ছি। আর একটি কথা দিদি, আমি যদি আমার কোন জিনিষ ব্রতাকে দিই তাতে কি কোন দোষ হবে? ব্রতা কি আমার দেওয়া জিনিষ নেবে?"

তাপসী স্নেহভরে মুকুলের হাত ধরিয়া বলিলেন, "ব্রতার জীবনে কোন অমঙ্গল যদি স্পর্শ করতে উদ্যত হয়, তোর দেওয়া জিনিষ পরলে সে অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে মুকুল। ব্রতা তোর দেওয়া জিনিষ নেবে কিনা জিজ্ঞাসা করছিস, তোর দ্রব্য সে মাথায় তুলে নেবে বোন। তুই তাকে যখন দেখ্‌বি, তখন বুঝ্‌বি সে কি। আমার দুটি বোন, দুটিই দেবপূজার ফুল। এ জগতে তাদের তুলনা হয় না। তুই তাকে কি দিবি মুকুল নিয়ে আয়।"

মুকুল ক্ষিপ্রপদে কক্ষান্তর হইতে কাগজের একটা বাণ্ডিল আনিয়া তাপসীর হস্তে অর্পণ করিয়া পিতা মাতাকে ডাকিতে গেল।

তাপসী অসীমের সম্মুখেই বাণ্ডিলটি খুলিলেন, তাহার মধ্য হইতে বাহির হইল একখানি চন্দন রঙ্গের বেনারসী শাড়ী, ব্লাউজ, একজোড়া চুণীর কঙ্কণ, হীরার দুল, মুক্তার কণ্ঠি। এ সমস্তই অসীমের বিশেষ পরিচিত দ্রব্য, শুধু পরিচিত নহে, প্রিয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বসন ভূষণে মুকুলকে সুসজ্জিত দেখিয়া একদিন মুগ্ধ অসীম প্রশংসা করিয়াছিল। সেই সব মুকুল আজ তাহার ভগিনীকে উপহার দিয়াছে। অসীমের চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু ঝড়িয়া পড়িল।

মিঃ রায়ের ও যমুনাদেবীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া অসীম যখন প্রস্থানোদ্যত হইতেছিল, সেই সময় মুকুল আসিয়া অসীমের পায়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

অসীম রুদ্ধকণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া সজল চোখ মুকুলের মুখের উপর ফেলিয়া শান্তস্বরে বলিল, "আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান তোমাকে শান্তি দিন। ধর্ম্মে তোমার অচলা মতি হোক।"

ক্রমশঃ

শ্রীগিরিবালা দেবী।

নিঠুরা রূপসী

(Keats-এর অনুসরণে)

"আহা, কেন হেন ম্লান মুখ তব
ওগো যুবা-বীর অশ্বারোহী?
কেন একা হেথা ঘুরিয়া বেড়াও
কেমন বেদনা বক্ষে বহি'।

"দেখ, শুকায়েছে কুমুদের দল,
পাখীদেরো গান যায় না শোনা,
হাহা করে মাঠ,—কাঠবিড়ালিও
কোটরে ভরেছে ক্ষেতের সোনা।

"আহা, তুমি কেন এ হেন সময়ে
ঘুরিয়া বেড়াও অশ্বারোহী?
দেহ হ'ল ক্ষীণ, বদন মলিন,
কোন সে বেদনা বক্ষে বহি'?

"কেয়াফুল জিনি' পাণ্ডু ললাট
জ্বরের শিশিরে ভিজিয়া ওঠে।
দুই গালে দেখি শুকায় গোলাপ,
রক্তের আভা মিলায় ঠোঁটে

২

"আমি দেখেছিনু প্রান্তর-পথে
সুন্দরী এক, পরীর পারা—
পিঠ-ভরা চুল, চরণ রাতুল,
উদাস আকুল অক্ষি-তারা !

"তখনি তাহারে তুলিয়া লইনু
এই ছুটন্ত ঘোড়ার 'পরে,—
পাশ থেকে ঝুঁকে, সমুখে হেলিয়া,
কালো কেশপাশ বাতাসে মেলিয়া,
সারা দিনমান গাহিল সে গান
কপোত-করুণ কণ্ঠস্বরে—
জানি না কেমনে কেটে গেল দিন
শুধু চেয়ে তারি বিম্বাধরে !

"ফুল বিনাইয়া কপালে পরা'নু,
দু'হাতে পরা'নু ফুলের বালা,
ক্ষীণ কটিতটে নীবির বাঁধনে
দুলাইয়া দিনু ঝুমুকা-মালা ;
মৃদু মধু-সুরে গুমরি' গুমরি'
ভালোবাসা-চোখে চাহিল বালা।

"মাটি থেকে তুলে' কত মিঠা মূল,
বন হ'তে আনি' জংলা মধু,
পায়স-পীযুষ পিয়া'ল আমারে
মোর সে মোহিনী রূপসী বধূ ;
কি এক ভাষায় কুহরিল কানে—
'বড় ভালোবাসি তোমারে, বঁধু !'

"নিয়ে গেল শেষে গিরিগুহা তলে—
ছোট্ট সে ঘর, পরীর বাসা !
সেথায় আমারে বাহুপাশে বাঁধি'
কাঁদিয়া জানা'ল কি ভালোবাসা !—
চোখের পাতায় চুমা দিয়ে শেষে
ঢাকিনু সে-চোখ সর্ব্বনাশা !

"গান গেয়ে গেয়ে পাড়াইল ঘুম,
দেখিনু স্বপন ঘুমের ঘোরে—
হায়, বিধি হায় !—সেই হ'তে আর
দেখিনি স্বপন, শীতের ভোরে !

"দেখিনু স্বপন, যেন কত রাজা,
কত রাজ-রথী, পুরুষ-বীর –
সবে শবসম পাংশুবদন
চাহিয়া রয়েছে, পলক থির !
সহসা সকলে একসাথে যেন
কাতরে ডাকিয়া কহিল মোরে—
'নিঠুরা রূপসী নারী-কুহকিনী
বাঁধিয়াছে তোরে কুহক-ডোরে।'

"সেই আবছায়া-আঁধারে তাদের
পিপাসা-মলিন ওষ্ঠাধরে—
ব্যাদান-বদনে,সে কি বিভীষিকা !
চমকি' জাগিনু তাহার পরে।
সেই হ'তে দেখি, ঘুরিতেছি হেথা
এই পথহীন তেপান্তরে।

"তাই একা-একা ঘুরিয়া বেড়াই
ম্লান ছায়াসম, শূন্যমনা,—
যদিও শালুক শুকায়েছে কবে,
পাখীদেরো গান যায় না শোনা।"

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

নারীর সম্মান

নারী জাতি মাতৃজাতি উল্লেখে আজকাল তাঁহাদের সম্মানের দাবী লইয়া বেশ একটু সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে।

হিংসা-কলুষিত মন লইয়া, সন্তান পালন অর্থে ছেলে ঠেঙ্গাইয়া, ও গৃহকর্ম্ম অর্থে পথে ঘাটে অকারণ বা সামান্য কারণ উপলক্ষে ঝগড়া বাধাইয়া নিজেদের কৃতিত্ব গলা-বাজিতে জাহির করা যাহাদের নিত্য কর্ম্ম, সেই গৃহ-কোটরে আবদ্ধা হিংসা-দ্বেষ-পরিপূর্ণা, সংকীর্ণচেতা নারী জাতির মন শিক্ষা দীক্ষায় উন্নীত করিয়া, তাহাদের মনে বিবেকের বিমল জ্যোতি জ্বালাইয়া, তাহাদের যথার্থ গৃহ-লক্ষ্মী ও দয়া ক্ষমায় মাতৃনামের যোগ্যা করা তাহাদের বড় কম সৌভাগ্য বা শ্লাঘার বিষয় নহে। কিন্তু কথা হইতেছে, তাহা শুধু কল্পনা-প্রবণ মস্তিষ্কের ক্ষণিকের উত্তেজনা প্রসূত কাল্পনিক একটা যা তা—মন গড়া ভাবের অভিব্যক্তি, না সবল মস্তিষ্কের দৃঢ়তা সম্বলিত কঠোর সত্য।

মানুষ-নামধারী পশু-প্রকৃতি বিশিষ্ট গুণ্ডার দল দিনের পর দিন এই যে দুর্ব্বল নারী জাতিকে নিগৃহীত করিতেছে, তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেক মহানুভব ব্যক্তির মন কাতর ও বিচলিত হইয়াছে।

তাই এক দিকে যেমন সংবাদপত্রে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে, অপর দিকে তেমনি নারী জাতিকে শিক্ষা দীক্ষা রূপ মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম চর্চ্চায় তাহাদের দুর্ব্বল দেহকে সবল করিবার চেষ্টাও নাকি স্থানে স্থানে হইতেছে।

কবে সে দিন আসিবে, যেদিন এই সফলতার হিল্লোল প্রতি বঙ্গগৃহে প্রবাহিত হইয়া অজ্ঞ বঙ্গ ললনাগণকে সকল সঙ্কীর্ণতার অন্ধকার হইতে মুক্ত করিয়া যথার্থ মাতৃ-নামের যোগ্যা করিয়া তুলিবে? এবং অপর দিকে দৈহিক স্বাস্থ্যে মনের সবলতায় কবে তাহারা বিপদে পড়িয়া সহায়-হীনার মত সেই বিপদকে গ্রহণ না করিয়া তাহার আবর্ত্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার মত শক্তি ও সাহস অর্জ্জন করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইবে?

মনে পড়ে কিছুদিন পূর্ব্বে একবার শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনে একটী উনিশ কুড়ি বৎসরের মেয়ের অসহায় অবস্থার কথা।

মেয়েটীকে তাহার দুটী শিশুপুত্র সহ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তার সঙ্গী অভিভাবক মাল আনিতে যান, এ দিকে ট্রেণ ছাড়িয়া দেয়। ভদ্রলোক হাঁফাইতে হাঁফাইতে ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর দৌড়াইয়াও ট্রেণে উঠিতে পারিলেন না। আপনার অসহায় অবস্থা বুঝিয়া মেয়েটী কাঁদিয়াই আকুল। গাড়ীর অন্য মহিলারা যেন কি একটা নূতন মজা পাইলেন এমনি ভাবে নানা প্রশ্নে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ দমদমায় থামিল। ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া জানাইলেন মেয়েটির ভাই টেলিগ্রাম করিয়াছেন, তদনুসারে তাহাকে নামিতে হইবে। ঘুমন্ত শিশু দুটীকে বুকে চাপিয়া দুরু দুরু বক্ষে মেয়েটী নামিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের নির্দ্দেশ মত ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিল।

রাত্রি গভীর, চারিদিক স্তব্ধ। ট্রেণ চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনের আলোক নির্ব্বাপিত হইল। ঘরে তখন অন্য কোনও স্ত্রীলোক ছিল না। নিরুপায় মেয়েটী ঘুমন্ত শিশু দুটীকে গায়ের চাদর পাতিয়া শোওয়াইয়া শঙ্কিত মনে বসিয়া রহিল। অর্গলহীন দরজা, বাতাসের সঙ্গে সশব্দে খুলিতে ও বন্ধ হইতে লাগিল।

এদিকে মিনিট কয়েক বাদে দরজা পথে একে একে অনেক মূর্ত্তিই দেখা দিতে লাগিল; এবং ইতর ভাষায় নানা রকম অশ্লীলতা সূচক হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। মেয়েটী অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া এক পাষণ্ড বলিয়া উঠিল "ভয় কি যাদু, আমরা ত আর বাঘ ভালুক নই!" মেয়েটীর ভীত চঞ্চল মনে সহসা সাহস ও উত্তেজনা জাগিল। সে মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দৃপ্তভাবে কি বলিতে গেল, ঠিক সেই সময় হুস্ হুস্ শব্দে একখানি ট্রেণ প্ল্যাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইল

এবং অবিলম্বে তাহার সঙ্গী ভদ্রলোকটীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের কি উচিত ছিল না মেয়েটীর একটু খোঁজ লওয়া? তবে এরূপ উদাহরণ বিরল নহে, নিত্য ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানান্তর হইতে কোন একটি ভদ্র মহিলা "চিত্তরঞ্জন সেবা সদন" দেখিবার মানসে ভবানী-পুরে আসেন। পথিমধ্যে মোটরের কল বিগড়াইয়া যাওয়ায় সন্ধ্যা হইয়া যায়। বাহিরের লোকের হাঁস-পাতালে প্রবেশের কি নিয়ম তাহা জনিবার জন্য তিনি তাঁহার সঙ্গীয় লোককে পাঠাইয়া দেন। হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ তখন সকলেই অনুপস্থিত। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া ভদ্রলোকটী ফিরিয়া আসিয়া বলেন, ভিতরে না গিয়া শুধু শুধু হাঁসপাতাল কম্পাউণ্ডে একটু ঘুরিয়া দেখিতে আর দোষ কি? বাহিরে একটু ঘুরিয়া আসিবেন তাতে আর দোষের কি আছে মনে করিয়া মহিলাটী কম্পাউণ্ডের এক ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, ঠিক সেই সময় একটা কঠোর স্বর তাঁহার কর্ণে বাজিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁর সঙ্গীয় ভদ্রলোকটীকে কেহ চড়া সুরে ভৎসনা করিতেছে। মহিলাটী নিকটেই ছিলেন, সহসা "নিকাল যাও, নিকাল যাও" স্বর কাণে আসিতেই অপমানের ভয়ে ভীতা মহিলাটী পিছনের দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। কর্কশ কণ্ঠে একটী ভদ্রলোক কতকগুলি নীচ জাতীয় লোককে আদেশ করিলেন মহিলাটীকে সম্মুখের ফটক দিয়া বাহির করিয়া দিতে। বিনা হুকুমে আসিবার দরুণ অপমানকর ভাষাও মহিলাটীকে শুনিতে হইল এবং সেই নীচ জাতীয় লোকগুলি সমস্বরে "ইধার ইধার যাও" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

মানি, জানিয়া বা না জানিয়া যেমনই হউক হাঁস পাতালের নিয়ম ভঙ্গ করা খুবই অকর্ত্তব্য! কিন্তু এটুকু বোধ হয় বলিতে পারা যায় যে, সেই ভদ্রলোকটীর যাহা কিছু বলিবার তাহা ভদ্রভাবেও বলিতে পারিতেন— বিশেষ যেখানে একজন ভদ্রমহিলা রহিয়াছেন।

যে দেশে নারীজাতি ঘরে বাহিরে এমন ব্যবহার পাইয়া থাকেন, সেই দেশের নারী জাতির "সম্মানের দাবী", পুরুষের সহিত সমান অধিকার—এই যে সব বড় বড় কথার ঝড় বহিতেছে, ইহার মূলে বাস্তব কিছু আছে? না উহা শুধু কল্পনার ছায়া বাজি মাত্র?

শ্রীকিরণবালা দেবী।

জীবনের পথে

আমাদের ভিতরে জড়বুদ্ধির প্রভাব অতিমাত্রায় গিয়া উঠিয়াছে। বিষয়ের সহিত লেনা-দেনায় যাঁহারা পাকা হইয়া উঠিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদেরই আমরা শ্রদ্ধা করি। বৈষয়িক বুদ্ধি যাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ, তাঁহাদিগকেই আমরা মানুষ বলিয়া বিবেচনা করি। সংসারে যাহারা নিজেদের কায গুছাইয়া চলিতে পারে, যাহাদের কেহ ঠকাইতে পারে না, তাহাদেরই আমরা বলি 'successful in life'। বৈষয়িক বুদ্ধির এই সম্মান পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সব ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রতিষ্ঠিৎ হইয়া আছে।

পারিবারিক ক্ষেত্রে দেখুন, একটি পরিবারের মধ্যে যে বেশী অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে, যে শুধু ঠক্‌দের কাছ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়াই সন্তুষ্ট নয়, উপরন্তু অপরকে ঠকাইয়াও পকেট ভর্ত্তি করিতে পারে, তাহাকেই আমরা পরিবারের রত্ন বলিয়া আদর করি। তাহার বুদ্ধির প্রতি আমরা সমধিক শ্রদ্ধা পোষণ করি। আর যে একটু অপটুভাবে, বাহির হইতে দেখিতে গেলে একটু বোকার মত, অথবা একটু ঢিলে পত্তনে চলে, তাহার গুণগুলি আমাদের চক্ষে পড়ে না। কিংবা যে ব্যক্তি বিষয়ের চেয়ে মহত্তর বা সুন্দরতর কিছুর

অনুসন্ধানে ছোটে, ও সংসারে অর্দ্ধ-উদাসীনের মত থাকে, তাহাকে আমরা ঘৃণাই করি। আমরা তাহার জীবন-যাত্রার কোনও সার্থকতাই খুঁজিয়া পাই না। অথবা বাহিরের ঝুটো মালের আপাতদৃশ্যমান ও অসার চাকচিক্য সেখানে না দেখিয়া আমরা ভাবি, সে জগতে শুধু পরের কৃপা প্রার্থনা করিতেই, শুধু ভিক্ষার ঝুলি বহিয়া যাইতেই জন্মিয়াছে। বুঝিতে পারি না, তাহার অন্তরের ভাণ্ডারে এমন রত্ন-কণা থাকিতে পারে, যাহার মূল্য সংসারের হাটে মিলে না।

সমাজেও আমরা এমনি দেখিতে পাই। অন্তরের সমৃদ্ধিতে, মহত্ত্বে, পবিত্রতায় যে বড়, সে কোণঠাসা হইয়া আছে। আর বৈষয়িকতায় ঝুনো মাথার কাছেই সহস্র মাথা হেঁট হইতেছে। মনুষ্যত্বের কেন্দ্র যাহা, সেই হৃদয়ের ধনে দীন, ও নিম্নক্ষেত্রে বর্ব্বর ও পশুর মত যে মানুষ, সেও কুটিল বুদ্ধির জোরে সমাজে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে। আমাদের রাষ্ট্রনীতির কথা আর বেশী কি বলিব? এক কথায় বলিতে গেলে, দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নির্ভর করিতেছে প্রকৃত স্বদেশপ্রাণতায় নয়, পোলিটিক্যাল্ চালবাজীর সুকৌশল প্রয়োগের উপরে।

ধর্ম্মের ক্ষেত্রে আমরা কি সনাতনী, আর কি liberal, উভয় সম্প্রদায়ই ধর্ম্মের উৎস যাহা, সেই আত্মাকে বর্জ্জন করিয়া, হয় বংশপরম্পাগত লৌকিক আচার-ধর্ম্মে ও নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিতে, অথবা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ও ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধীয় মামুলি বুকনিতে মানুষের সনাতন ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমরা উভয় দলই দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। কেহ বা ধর্ম্মের সর্ব্বভেদ লোপ করিয়া দিয়া বিজ্ঞানমূলক এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। বিশ্বসৌভ্রাত্র্য, বিশ্বধর্ম্ম শব্দগুলি সবই সত্য সন্দেহ নাই; কিন্তু শব্দগুলি নিতান্তই ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। ইহার ভিতর বস্তু নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই। আবার সনাতনী চিত্তশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি ও সংস্কারক্ষয়-মূলক নিত্য কর্ম্মের উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, আচার ধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু সত্যকার শুদ্ধি, শৌচ, অন্তরের জ্যোতির বিকাশ কতখানি হইল, তাহার দিকে ইঁহারা ততটা লক্ষ্য করেন না, যতটা বাহিরের ঠাট্‌টা,—নির্দ্দোষ খোলসটা রাখিতে।

বস্তুতঃ ধর্ম্মকেও আমরা সর্ব্ব সম্প্রদায়েই নিতান্ত বুদ্ধিগত, তর্কবুদ্ধি বা জড়বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিয়া ফেলিয়াছি। ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও আমরা পুরাদস্তুর বৈষয়িক। ভিতরকার অন্তরাত্মার যে ধর্ম্ম, যে প্রেরণা, যে আশা ও যে স্বপ্ন, তাহা আমরা তর্কবুদ্ধির কুজ্ঝটিকায় আবৃত করিয়া ফেলিয়াছি। তাই আমাদের দার্শনিক চিন্তাশীলতায় পাশ্চাত্য ঘোর জড়বাদী দেরই পদ্ধতি অনুশীলিত হইতে দেখিতে পাই। সত্যকার আত্মানুভূতির ক্ষেত্রে এই সব বিশ্লেষণী বুদ্ধি একেবারেই পঙ্গু, সেখানে ইহার কাছে হেঁয়ালি।

বস্তুতঃ বাহিরের মাপ দিয়া সব কিছুর মূল্য নিরূপণ করিতে যাই, আর ইহাই জড়বুদ্ধির পরিচায়ক। অন্তর দিয়া প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে চাই না; চাই শুদ্ধ ইন্দ্রিয় দিয়া দেখিতে ও সন্দিগ্ধ মন দিয়া বিচার করিতে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, মানুষের সহিত মিলনের ক্ষেত্রে আমাদের মন হইয়া পড়িয়াছে অতিরিক্ত সন্দিগ্ধ। তাই সাধারণ বিষয়ী স্বার্থপর মানুষের চাল্ চল্‌তি আমাদের সহজে চক্ষে পড়ে, কিন্তু যে মানুষ ভাবের মানুষ বা যার ভিতরে সত্যকার মানুষ জাগিয়াছে, যাকে বাহিরের মাপ কাঠিতে যাচাই করা যায় না, তাকে আমরা বুঝিতে পারি না। তাহার অন্তরাত্মার যে নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা, যে গভীর প্রেরণা তাহা অন্তর দিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু বাহিরের সন্দিগ্ধ মন সে দিকে অন্ধ। সে দেখে মানুষটি কি করে, কি খায়, কি বলে—আর আপন মন-গড়া সব অভিপ্রায় সে মানুষে আরোপ করিয়া করিয়া শেষটা একটা কদর্য্য কিছু কল্পনা করিয়া বসে।

স্বার্থ ছাড়া যে মানুষ মানুষের সহিত মিলিতে পারে, এই ধারণা আমাদের এই স্থূল বুদ্ধি কখনও স্বীকার করিতে চায় না, তাই মানুষে মানুষে মিলনের ক্ষেত্রে যেখানে কোনও বাহ্য প্রয়োজনের তাড়না দেখিতে পায় না, সেখানে মানুষ একটা না একটা প্রচ্ছন্ন বৃহৎ স্বার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লয়। আমরা এরূপ ক্ষেত্রে ভাবি, নিশ্চয়ই ভিতরে গুপ্ত কোনও উদ্দেশ্য আছে, আর সেই উদ্দেশ্য কাম কঞ্চন বা যশ প্রতিপত্তি ছাড়া যে আর কিছু

হইতে পারে এ বিশ্বাস আমরা করিতে পারি না। তাই ভাবুকেরা বা মরমী দরদী সাধকেরা একটি নিভৃত কোণে নির্ঝঞ্ঝাটে পরস্পরের ভাবের, পরস্পরের অন্তর্লীন আনন্দের আদান প্রদান করিতে গেলেও সমাজের চক্ষুশূল হইয়া ওঠে। সন্দিগ্ধ মন তাহার ক্ষুদ্র বিকৃত ভাল-মন্দ বোধের ছাঁচে মানুষের সম্বন্ধে এক একটা ধারণা ঢালাই করিয়া তাহাই বাজারে চালাইয়া দেয়, আর এমন অসংখ্য ধারণা পাকা বিষয়ী বুদ্ধির মেশিনারীতে নিত্য প্রস্তুত হইয়া সংসারের হাটে বিজ্ঞবাক্য-লেবেল্-যোগে বহুমূল্যে বিক্রীত হয়—বহুমূল্যে, কেন না ইহার চাহিদা বাজারে বড়ই অধিক।

এই যে পাকা, বিষয়ী বুদ্ধি, ইহা এক আসুরী শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শক্তি লোকহিতের অজুহাতে, ধর্ম্মের অজুহাতে, সদাচারের অজুহাতে, চারিত্রনীতি বা শিক্ষানীতির অজুহাতে সমাজের বুকের উপর দিয়া কত বড় অত্যাচার ও কত বড় নির্য্যাতন অবাধে চালাইয়া আসিয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। কত নিরপরাধ এই যন্ত্রশক্তির পেষণে পিষ্ট হইয়া জীবনের সব আশা, সুখ ও শান্তি হারাইয়াছে।—এই পক্ক বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত নিপীড়ন-নীতির চাপে কত সুকুমার-হৃদয় কিশোর ও যুবক নীরস শুষ্ক মনুষ্যত্বহারা হইয়া অবশেষে এই নিষ্ঠুরতার, এই অত্যাচারেরই যন্ত্ররূপে সমাজে স্থান পাইয়া অসার, বাক্‌সর্ব্বস্ব, কুটিল বিষয়ীরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার অবধি নাই।

মানুষের সব চেয়ে বড় ক্ষতি হইতেছে তার মনুষ্যত্ব হারাণো। সমাজনীতি ও ভদ্রতার আবরণে আমরা আমাদের অমানুষতাকে বেশ গোপন করিয়া রাখি। নীতিমান্ মানুষকে আমরা মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করি, কিন্তু দেখি না সুনীতির অন্তরাল হইতে অনেক সময় কত বড় নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা মানুষকে তাহার কর্ম্মপথে পরিচালিত করিতেছে। কেবলমাত্র চরিত্রবল সম্বল করিয়া, চলিয়া মানুষ আপনাকে হৃদয়হীন পশু, অসুর বা পিশাচবৎ করিয়া ফেলে, অথচ সমাজে সম্মানিত হয়। এই আসুরিক কৃচ্ছ্রসাধনার জোরে মানুষ নিজের পাশবিক প্রবৃত্তির একটা গতি কোনও মতে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেও; পশুকে সে নষ্ট করিতে পারে না। দুর্জ্জয় অভিমান, ক্রোধ, প্রভাব-স্পৃহা তাহাকে পাইয়া বসে বা অত্যাচারের আবেগে সে স্বভাবের পাশবিক হিংস্রতা অবাধে প্রকটিত করিতে থাকে।

মনুষ্যত্বের সাধনায় হৃদয়কে বাদ্ দিয়া আমরা যে তপস্যাই করি না কেন, তাহা আমাদের অমানুষ করিয়া তুলিবে। আমরা হৃৎকেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়াছি, তাই জীবনে আমরা ঘোর স্বার্থপর। তাই আমরা উৎকট পশুধর্ম্ম, পরশ্রীকাতরতা পরহিংসাব্রতে দীক্ষিত। আমরা ষড়দর্শনের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু দৃষ্টি আমাদের ভাগাড়ের দিকে। জীবনে যত দিন উদারতা, ঋজুতা, প্রেম ও আত্মবিশ্বাস না আসিবে, ততদিন আমাদের সব বক্তৃতাই নিষ্ফল।

জীবনের ক্ষেত্রে তাই বুদ্ধিবিলাস নয়, বাহিরের তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও সমালোচনা নয়, আর নিপীড়ন ত একেবারেই নয়—চাই হৃদয়ের জাগরণ, পরিবারে, সমাজে ও সর্ব্বত্র একটা হৃদ্য সম্বন্ধ।

হৃদয়কে আমরা অনেক সময় অন্ধ বলি, হৃদয়াবেগকে মোহ বলি, কেন না আমরা জানি না হৃদয় কাহাকে বলে। যে ফেনিলতা ও আবিলতা লইয়া সাধারণতঃ আমাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা হৃদয়ের সত্য ধর্ম্ম নয়, তাহার বিকারমাত্র। হৃদয় শান্ত হইলে, তাহাতে যে আলো, যে অনুভূতি জাগিয়া ওঠে, তাহা চৌদিক উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। হৃদয়কে ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। হৃদয়ের প্রদীপ যাহার জ্বলিয়াছে, সে কখনও কুপথে পা নিম্ন পথে পা ফেলে না। নিম্নগামী মলিন প্রকৃতির মানুষ তাহাকে কখনও বশীভূত করিতে পারে না; কেননা হৃদয়ের সে দৃষ্টি, সে সন্ধান-আলো (search-light) বড় অন্তর্ভেদী। হৃদয় যাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করে, বাহিরে তার গুণাগুণ বিচারের নিক্তি ওজনে গুরু লঘুরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু অন্তরের জ্যোতিতে সেও দেদীপ্যমান আলো আলোকেই ডাকিয়া আনে—অন্ধকার তাহার সামনে আসিতে পারে না।

হৃদয়ের বোধশক্তি এত সুদূরপ্রসারী যে, অশুভ যাহা কিছু, তাহা বহু পূর্ব্বেই হৃদয়ে এক অস্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে, হৃদয় তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে ও সচেতন হয়। শ্রেয়ের পথে সারথিরূপে জীবনের রথ পরিচালিত করিতেছে এই হৃদয়। এই হৃদয়কে আমাদের উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

হৃদয়ে আমরা পাইব এক অনির্ব্বচনীয় রস-উৎস, এক অভ্রান্ত আলোক ও অব্যর্থ বিশ্ববিজয়ী শক্তি।

এই প্রেম, জ্ঞান ও শক্তির সম্মিলনে পরিপূর্ণ যে জীবন, সেই জীবনেই মানুষ সার্থক, তার ধর্ম্ম সার্থক, তার সমাজ, তার রাষ্ট্র, তার পরিবার সার্থক। মানুষ এখন হইয়া পড়িয়াছে নিতান্তই বহির্মুখ। এই বহির্মুখীন অবস্থায় যে শক্তি তাহাকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা হইতেছে এক প্রকাণ্ড স্বার্থপরতার শক্তি। আর এই শক্তির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়াই বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতেছে। ফলে মানুষ হইয়া পড়িয়াছে এক নিষ্ঠুর মিথ্যাচারের যন্ত্রমাত্র। মানুষের এই মিথ্যা খোলস ছিন্ন করিয়া তাহাকে অগ্রে দেখিতে হইবে সত্যকার কোন্ বস্তু সে চায়। সব চেয়ে বড় চাওয়াকে যেদিন হৃদয়ে চিনিতে পারিব, প্রাপ্তির আর সে দিন বিলম্ব থাকিবে না, নিখিল পুরুষার্থ হাতে লইয়া স্বয়ং মহালক্ষ্মী আমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবেন।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

রামায়ণের যুগে সমাজ

আমরা এখন যে বাল্মীকি রামায়ণ পাই তাহা আগাগোড়া বাল্মীকি রচিত না হইলেও খুব প্রাচীন গ্রন্থ। অনেকের হস্তক্ষেপ যে ইহার আকার বড় করিয়া দিয়াছে, উত্তরকাণ্ড বাদ দিলেও ইহা অবিসংবাদিত সত্য। তাহা সত্ত্বেও অন্ততঃ দেড় হাজার হইতে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার সমাজের যে প্রতিবিম্ব ইহাতে পাওয়া যায়, অধুনিক কোন গ্রন্থে তাহা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

উত্তরকাণ্ডের বয়স মোটামুটি দেড়হাজার বৎসর ধরিয়াই এই কথা লিখিলাম। রামায়ণের খুব প্রাচীন অংশের বয়স ৩০০০ বৎসরের কম হইবে না। 'সমাজ' কথাটা ইহার অধুনিক অর্থেই ব্যবহার করা গেল, সাবেক কালে ইহার একটা বিশেষ অর্থ ছিল।

আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের চেহারা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, লোকের রুচি ও মতিগতি অন্য রকম হইয়াছে, শিক্ষাদীক্ষার পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষ নূতন নূতন আদর্শ সম্মুখে ধরিতেছে, কিন্তু আবার কোন কোনও ব্যবহারে আশ্চর্য্য মিল দেখিলে মনে হইবে, মানুষ বাহিরে যতই ভিন্ন ভাবাক্রান্ত হউক—সেই মানুষই রহিয়া গিয়াছে।

রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, বা টেলিফোঁ অবশ্য তখন ছিল না। যাঁহারা পুষ্পকরথে অবিশ্বাসী তাঁহারা এয়ারোপ্লেনের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না। এ সকল বিজ্ঞানের কলকব্জি বাড়িয়াই চলিয়াছে। তখন ছিল অশ্বে টানা রথ, এখন হইয়াছে মোটর কার। পৃথিবী অনেকটা মানুষের মুঠার মধ্য আসিয়াছে, কিন্তু মানুষ আমূল বদ্‌লায় নাই।

রামায়ণ ত্রেতা যুগের কথা বলিয়াছে। তখন আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণের আধিপত্য যথেষ্ট, রাজা ব্রাহ্মণের অনুগত। তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, গ্রন্থখানিতে যে যে স্থানে আর্য্যাবর্ত্তের লোকের কথা আছে, সে সকল স্থান ঋষিগণের উপযোগী আচরণের বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ। মুনিরা সাধারণতঃ নিরামিষাশী ও ফলমূলভোজী হইলেও সাধারণের মধ্যে আহার পানে অনেক স্বেচ্ছাচার তখনও ছিল, এখনও আছে। স্মৃতিশাস্ত্র যতই চোখ রাঙান্, মদ্যপান কোনও কালেই এদেশে কি ছোট কি বড় কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে একেবার অপ্রচলিত ছিল না। রামায়ণের যুগে পানের মাত্রা বরং কিছু বেশী বেশী ছিল বলিয়াই মনে হয়—কি আর্য্য কি অনার্য্যের মধ্যে। প্রথমেই সাধারণ পানাগারের উল্লেখ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভরত বন হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ফিরাইয়া আনিতে না পারিয়া অগত্যা স্বয়ং ফিরিয়া আসিলেন, তখনকার অযোধ্যার দুর্দ্দশা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন

ক্ষীণ পাত্রোত্তমৈর্ভগ্নৈঃ শরাবৈরভিসংবৃতাম্
হতশৌণ্ডামিব ধ্বস্তাং পানভূমিমসংস্কৃতাম্॥

—মদ খাওয়া হইয়া গিয়াছে, পাত্রগুলি ভগ্ন, মদ্যপায়ীরা চলিয়া গিয়াছে. জায়গাটা তখনও পরিষ্কার করা হয় নাই

এইরূপ পানভূমির সহিত কবি তাৎকালিক অযোধ্যার তুলনা করিয়াছেন। চক্ষুর সম্মুখে এরকম ব্যাপার না ঘটিলে কবি তাহাকে উপমান করিবেন কেন? ভরত রাস্তায় চলিতে চলিতে যে সকল জিনিষের অভাব অনুভব করিলেন, তাহার একটা বারুণীমদ্যের গন্ধ। ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে অন্য সময়ে সে জিনিষটার সুগন্ধে অযোধ্যার রাস্তা মসগুল থাকিত।

ভরত যখন রামকে ফিরাইয়া আনিতে বনে যান, তখন প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনি তাঁহাকে নানা প্রকারে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন বলিয়া রামায়ণকার লিখিয়াছেন। ভরতের সহিত সৈন্য সামন্ত ছিল অনেক। তাহাদের আতিথ্যসৎকারের জন্য মুনি বিস্তর জিনিষপত্র যোগবলে সংগ্রহ করিয়াছিলেন—মদ্যমাংসও বাদ দেন নাই। আবার মাংস কেমন? কেবল ছাগল, ভেড়া, শূকর বা হরিণের নহে—ময়ূর ও কুক্কুটেরও ছিল। কুক্কুটগুলি গ্রাম্য কি বন্য, কবি তাহা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, তবে তাহার মাংস বেশ পরিষ্কার করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

রাক্ষসেরা অবশ্য খুবই মদ খাইত, কিন্তু সেই যে ফলমূলভোজী বানর, তারাই কি কসুর করিত? সুগ্রীবের সীতা-অন্বেষণে অবহেলায় যখন লক্ষ্মণ রাগে গস্‌গস্‌ করিতে করিতে কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন, তখন পথেই গন্ধ পাইলেন "মৈরেয় মধু"র। ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী সাধুপুরুষের অগত্যা অর্দ্ধভোজন (পান) হইয়া গেল। মদ্যপানটা যে কেবল পুরুষ বানরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহাও নহে। প্রাতঃস্মরণীয়া "পঞ্চকন্যা"র অন্যতমা বালীপত্নী তারা যখন ভয়বিহ্বল দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া লক্ষ্মণের নিকট ওকালতী করিতে আসিলেন, তখন যে পরপুরুষের নিকট তাঁহার লজ্জায় কণ্ঠরোধ হইয়া গেল না, কবি মদ্যপানই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"সা পানযোগাচ্চ নিরস্তলজ্জা"। ডি, এল, রায়ও লিখিয়াছেন, মদ খাইলে, "থাকিবে না কোন চক্ষুলজ্জা রবে না কারো তোয়াক্কা।"

আর সেই আদর্শ নরপতি ও আদর্শ সাধ্বী—রাম ও সীতা?

সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।
উত্তরকাণ্ড ৫২।১৮-১৯

সীতাকে (আদর করিয়া) হাতে ধরিয়া রাম নিজেই তাঁহাকে পবিত্র মৈরেয় মধু পান করাইয়া দিলেন।

আর বেশী উদাহরণের প্রয়োজন কি? বাদ যাইতেন বোধ হয় শুধু বনচারী গোবেচারী মুনিঋষির দল। সেও একেবারে নয়, কারণ তখনও সোমলতা পেষণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল—অন্ততঃ রামায়ণ রচনার প্রথম দিকটায়।

শুধু মদ খাওয়া নয়, বাজি রাখিয়া পাশাখেলারও প্রচলন ছিল। স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ আছে। খেলায় হারিয়া কাপড় চোপড় গহনা ফেলিয়া পলাইতে হইত।

আমাদের বাঙ্গালীদের মাছ খাওয়ার একটা বদনাম আছে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে তত নদ নদী, খাল বিল বা সুস্বাদু মৎস্য নাই বলিয়াই হয়ত সেখানকার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বাঙ্গালীর উপর এতকাল এই বদনাম চাপাইবার সুযোগ পাইয়াছেন (অবশ্য আজকাল মাছ কেন, অনেকেই তাহার উপরে উঠিয়া গিয়াছেন)। কিন্তু চিরকাল এমনটী ছিল বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ রামায়ণে, লক্ষ্মণ পম্পানদীতে ভাল ভাল মাছ মারিবেন আর রামচন্দ্র তাহা বেশ করিয়া খাইবেন এই প্রলোভনটী অযোধ্যার রাজকুমারের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে দেখিতে পাই (আরণ্য কাণ্ড)। মাছ মারার যে সকল প্রক্রিয়া ছিল, বঁড়শীর ব্যবহার ছিল তাহার অন্যতম।

যে সকল ব্রাহ্মণ উচ্চস্বরে বেদ পাঠ করিতেন, তাঁহাদের পরিধানে থাকিত কৃষ্ণাজিন, আর গলায় ঝুলিত যজ্ঞোপবীত (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড—১৮।১০)—খুব সুলভ স্বদেশী পোষাক। বনে তখন হরিণের অভাব ছিল না, চামড়াগুলিও টিকিত বহুকাল—খদ্দর কোথায় লাগে! সন্ন্যাসীরা গেরুয়া বসন পরিতেন ও ছাতা ব্যবহার করিতেন। কাঁধে থাকিত লাঠি আর হাতে কমণ্ডলু।

স্পর্শদোষটা এখন যতদূর ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে, তখন অবশ্যই ততদূর ছিল না। ক্ষত্রিয়-

বৈশ্যের হাতে ব্রাহ্মণের খাওয়া পর্য্যন্ত চলিতেছিল। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণদিগের পরিবেষণ করিতেছে বানরেরা—অর্থাৎ অনার্য্যেরা। যত বাড়াবাড়ি কি কলিযুগের জন্য?

চিকিৎসাবিদ্যা তখন নিতান্ত শৈশবাস্থায় ছিল না। লঙ্কাকাণ্ডে, যুদ্ধের সময় বারবার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা তাহার একটী প্রমাণ। সুন্দরকাণ্ডে প্রসূতিকে রক্ষা করার জন্য গর্ভে অস্ত্রপ্রয়োগের কথাও পাওয়া যায়। "গর্ভস্থ জন্তোরিব শল্যকৃন্তঃ" এ ব্যাপারটা অস্ত্রচিকিৎসা একটু বেশীদূর অগ্রসর না হইলে অসম্ভব হইত।

তখনকার সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা দেখা যাউক। অবরোধ প্রথা ছিল, অবগুণ্ঠনও ছিল (এ গুলি ঠিক মুসলমান আমলের আমদানি নয়) কিন্তু কোনটাই কড়াকড়ি ভাবে ছিল না। বহুবিবাহ ছিল তখনকার সমাজের একটী প্রধান দোষ—রামচন্দ্র বা লক্ষ্মণের আদর্শ সকলে অনুসরণ করিত না। যেখানে বহুবিবাহ সেখানে অবরোধ প্রথা অল্প বা বেশী পরিমাণে থাকিবেই। বেত্রহস্ত কঞ্চুকীর ও অন্তঃপুরে নপুংসক কিঙ্করের প্রয়োজনও সেইখানে। রামায়ণে এ সকলেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু অবরোধ প্রথা সত্ত্বেও নারী মুক্তবায়ুর অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। নারী ছিল সহধর্ম্মিণী, আর ধর্ম্মকার্য্যের প্রভাব তখন খুব প্রবল থাকায় নারীরও প্রভাব ছিল। শুভকার্য্যের পূর্ব্বে দেবার্চ্চনা করিবার সময় সহধর্ম্মিণীও তাহা সঙ্গে সঙ্গে করিতেন, আবার অশ্বমেধের ঘোড়া কাটিতেন রাজার প্রধানা মহিষী (আদিকাণ্ড)। তখনকার হিন্দু মহিষীদিগের হস্ত একালকার মোটরকার-বিহারিণীদিগের অপেক্ষা খড়গধারণের অধিক উপযুক্ত ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য কেবল পুরুষের নয়, নারীরও দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে ছিল। (সুন্দরকাণ্ড ১৪।১৯) আর তপস্যাও পুরুষদিগের একচেটিয়া ছিল না। উত্তরকাণ্ডে দেখিতে পাই, বাল্মীকির আশ্রমের নিকট অনেক তাপসী তপশ্চর্য্যা করিতেন। আরণ্যকাণ্ডে আমরা শবরী নাম্নী শ্রমণার পরিচয় পাই।

কন্যা চিরকালই একটা দায়ের মধ্যে গণ্য। রামায়ণের যুগে এখনকার মত বরপণ ছিল না সত্য, বরং ভাল কন্যালাভের জন্য পুরুষেরাই ব্যস্ত হইয়া পড়িত। কিন্তু কন্যা যাহাতে সৎপাত্রে পড়ে, যাহাতে তাহার জন্য কোন মানহানি না হয়, সে জন্য পিতা সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন। (উত্তরকাণ্ড ১২।১৪) কন্যার পিতা খুব বড় দরের লোক হইলেও তাঁহাকে (এখনকার মত নিজের তুল্য বা নিজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বরপক্ষীয় লোকের নিকট অপমানিত হইতে হইত। (অযোধ্যাকাণ্ড ১১৮।৩৫)

দুষ্কুলজাতা নারীদিগকে 'সংস্কৃতা' করিয়া গ্রহণ করার রীতি ছিল (উত্তরকাণ্ড ২১।১০)। নারীরক্ষা-সমিতি শুধু রামায়ণ কেন, অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও নজীর সংগ্রহ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন। নারীবধ অবশ্য অতি ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত।

সীতা যে পাতিব্রত্যধর্ম্মের উজ্জ্বল আদর্শ, রামায়ণের স্থানে স্থানে সেই ধর্ম্মের বেশ উজ্জ্বল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাই, কৌশল্যা বলিতেছেন, নারীর গতি স্বামী, তদভাবে পুত্র, তদভাবে জ্ঞাতিগণ, অন্য গতি নাই। এ আমাদের চিরপরিচিত মনুর বচনেরই প্রকারান্তর। সীতার প্রতি ঋষিপত্নী অনসূয়ার উপদেশবাক্যে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা সূচিত হইয়াছে। পতি নগরেই থাকুন কিংবা বনেই থাকুন, অনুকূলই হউন অথবা প্রতিকূলই হউন, তাঁহাকে ভক্তি করিলেই স্ত্রীলোকের মঙ্গল। স্বামী দুশ্চরিত্র, স্বেচ্ছাচারী, দরিদ্র হইলেও তিনিই স্ত্রীর দেবতা। স্বামীকে কেবল ভরণপোষণের কর্ত্তা মনে করিতে হইবে না, তিনিই স্ত্রীর সর্ব্বস্ব। এই যে স্ত্রীর সর্ব্বতোমুখ আনুগত্য ভাবের প্রাধান্য, ইহা রামায়ণের সর্ব্বত্রই কবি ফুটাইয়া তোলার চেষ্টা করিয়াছেন।

রমণীগণের নৃত্য এদেশে একটী বহুপ্রাচীন অনুষ্ঠান, রামায়ণে অনেক স্থানেই ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্রের সম্মুখে পানবশীভূতা সুন্দরীগণের নৃত্যের কথা আছে। অবশ্য এই সুন্দরীগণ ভদ্র গৃহস্থঘরের কুলাঙ্গনা নহেন।

অনার্য্যদিগের সহিত রামচন্দ্রের এত মিত্রতা, তবু শূদ্রদের সামাজিক হীনাবস্থা রামায়ণে নানাভাবে নানা

স্থানে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। 'অদ্বিজ'কে মন্ত্র দেওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে ভারী দোষের ছিল। শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ উত্তরকাণ্ডের যুগে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়। এই শূদ্র-নিগ্রহ বাদ দিলে দেখা যায়, জাতিভেদের এতটা কড়াকড়ি তখন ছিল না। ক্ষত্রিয়ের সংস্কার অনেকটা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মতই ছিল। রামচন্দ্রের দশম বর্ষে উপনয়নের কথা রামায়ণে পাই। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়-কন্যা বিবাহ ত ছিলই, ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহও একটা অভাবনীয় ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইত না। উত্তরকাণ্ডে দণ্ড রাজার উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়, শুক্রকন্যা অবজা ক্ষত্রিয় রাজাকে বলিতেছেন—"আপনি বলিলেই পিতা আমাকে আপনার হাতে দিবেন।"

বারাণসী উত্তরকাণ্ড রচনার সময়ও খুব পবিত্র স্থান ছিল। রামচন্দ্রের অদ্ভুত বিচারের পর ফরিয়াদী মনস্বী সারমেয়কে সেখানে গিয়া অনশনব্রত অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে যে সমস্ত কার্য্য অত্যন্ত পাপজনক বলিয়া গণ্য হইত, তাহার একটা লম্বা ফর্দ্দ রামনির্ব্বাসনের পর ভরতের কাতরোক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। তাহার কতকগুলি এখানে লিখিত হইল—১। শায়িত গাভীকে পদদ্বারা তাড়না করা, ২। পাপীর ভৃত্য হওয়া, ৩। সূর্য্যের দিকে মলমূত্র ত্যাগ করা, ৪। কোন বড় কায করাইয়া লইয়া ভৃত্যকে পারিশ্রমিক না দেওয়া, ৫। পুত্রের ন্যায় প্রজাকে পালনকারী রাজার প্রতি বিদ্রোহ, ৬। উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ কররূপে গ্রহণ করিয়া রাজার প্রজা রক্ষা না করা, ৭। তপস্বীকে যজ্ঞের প্রতিশ্রুত দক্ষিণা না দেওয়া, ৮। হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ শস্ত্র সমাকুল যুদ্ধে সৎ লোকের ধর্ম্ম আচরণ না করা, ৯। বৃথা ছাগমাংস, কৃসর ও পায়স ভক্ষণ, ১০। গুরুর অবজ্ঞা, ১১। পা দিয়া গরুকে স্পর্শ করা, ১২। গুরুনিন্দা, ১৩। মিত্রদ্রোহ, ১৪। বিশ্বাস করিয়া একজন কাহারও নিন্দাজনক কথা বলিয়া গিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া, ১৫। অকৃতজ্ঞতা, ১৬। পরিবারের মধ্যে থাকিয়া গৃহীর একাকী ভাল জিনিষ খাওয়া, ১৭। লাক্ষা, মধু, মাংস, লৌহ ও বিষ বিক্রয় করা, ১৮। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় শয়ন, ১৯। মদ্য, স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আশক্তি, ২০। কাম ক্রোধে অভিভূত হওয়া, ২১। অপাত্রে দান, ২২। স্বধর্ম্মে আশক্ত না হওয়া, ২৩। ঘর পোড়ান, ২৪। দেবতা, পিতৃগণ ও মাতাপিতার সেবা না করা, ২৫। সতী সকামা স্ত্রীর ঋতুরক্ষা না করা, ২৬। ব্রাহ্মণের পুত্র না হওয়া, ২৭। বালবৎসা গাভীর দোহন, ২৮। পানীয় থাকা সত্ত্বেও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে বঞ্চনা করা, ২৯। ব্রাহ্মণের জন্য সঙ্কল্পিত পূজায় বিঘ্ন উৎপাদন, ৩০। নিজের ইষ্টদেব বড় বলিয়া বিবাদ করা, ৩১। বিবাদভঞ্জনে সমর্থ ব্যক্তির বিবাদ দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা।

আর একটী কৌতুহলোদ্দীপক প্রথার উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিব। করমর্দ্দন (shake-hand) করার প্রথা কি আমরা আমাদের পাশ্চাত্য প্রভুদের নিকট শিখিয়াছি? রামায়ণ কিন্তু তাহা বলে না। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে পাই, রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিবার সময় সংপ্রহৃষ্টমনা হস্তং পীড়য়ামাস পাণিনা। (৫।১২)—রামচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে হস্তদ্বারা সুগ্রীবের হস্তপীড়ন করিলেন। এ প্রথাটা কত প্রাচীন?

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

প্রেম
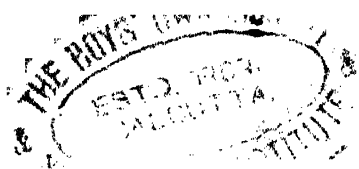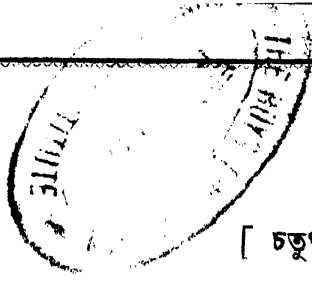
[চতুর্থ উচ্ছ্বাস]

সৃষ্টি রহস্য

'স্রষ্টা ও সৃষ্টি বা সৃষ্টি প্রবাহ'—"যেমন সূর্য্য ও তাহার কিরণ একও নয়, পৃথকও নয়, সমুদ্রতরঙ্গ ও বুদ্‌বুদ, একও নয়, পৃথকও নয়" * * অর্থাৎ ভেদও বটে, অভেদ ও বটে,—'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' তত্ত্ব। যে বুঝিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। যে মহান্ ব্যক্তি বিশ্বনিয়ন্তা রচিত এই সৃষ্টিকে স্রষ্টার সহিত পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ইহার মহিমা অবগত আছেন এবং তিনিই উহা সম্যক্‌ভাবে কীর্ত্তন করিতে পারেন—সেই মহাপুরুষই ধন্য। এবিষয়ে আর কি বলিবার আছে ?

সেই অনন্তমূর্ত্তি, পরমানন্দ-স্বরূপ বিশ্বস্রষ্টা হইতেই এই সৃষ্টি উদ্ভূত। যেমন উর্ণনাভ (১) নিজের মুখনিঃসৃত তন্তু হইতে তাহার জাল প্রস্তুত করে, সেইরূপ বিশ্বনিয়ন্তা নিজেই উপাদান হইয়া নিজেই নিমিত্তরূপে তাঁহার এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। তিনিই (ব্রহ্ম) এই সৃষ্টির উপাদান কারণ (constitutive cause) এবং তিনিই আবার ইহার নিমিত্ত কারণ (efficient cause)। সেই ব্রহ্ম হইতেই এই সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে এবং তাঁহাতেই এই সৃষ্টি স্থিতি করিতেছে এবং তাঁহাতেই লয় পাইতেছে। (২) যেমন হিমগিরি হইতে কল্লোলিনী প্রবাহিণী নির্গত হইয়া সাগর বক্ষে পড়িয়াছে, 'সৃষ্টি প্রবাহ'ও বিশ্বস্রষ্টা হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই স্রষ্টাতেই প্রবেশ করিয়াছে। (৩)

তাই 'আমি' আছি, 'সৃষ্টি বা বাহ্যজগৎ' আছে, আর 'স্রষ্টা' আছেন, ইহা আমার সহজ ও আপাতঃ ভাবসিদ্ধ ভেদজ্ঞান সম্ভূত হইলেও, পরিণামে সেই একই মূলে একই হইয়া যাইবে। সৃষ্টিও সেই স্রষ্টাতে গিয়া মিশিবে এবং 'আমি'ও সেই সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত জীব, সেই বিশ্ব-স্রষ্টাতেই মিশিব। নদী যেমন সাগরে গিয়া মিলিত হয়, 'আমিও সৃষ্টিপ্রবাহ' সেই 'অনন্ত সাগরে' গিয়া মিশিব—তখন চারিদিকেই মধুর প্রেমানন্দ, কেবলই প্রেমানন্দ। তাই বলিতেছিলাম, যাহা এখন সুস্পষ্টভাবে কেবলই ভেদ বুঝাইতেছে, পরিণামে সেটি থাকিবে না। ঐরূপ ভাব থাকে না। নদী সাগরে মিলিল, ভেদও রহিল, অভেদও হইল—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব। ইহাই সৃষ্টির বিচিত্রতা।

ব্যাকরণ মতে 'আমি' (অহং) উত্তম পুরুষ, (first-person), 'সৃষ্টি বা বাহ্য জগৎ" (তুমি বা ত্বং) মধ্যম

* * "ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" ব্রহ্মসূত্র (বেদান্ত দর্শন) ২অঃ।১।১৩—"ব্রহ্মই জগতের উপাদান হইলে জীবরূপে ব্রহ্মেরই সুখ দুঃখাদি ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়; সুতরাং বেদপ্রসিদ্ধ ভোক্তা ও নিয়ন্তা বলিয়া কোন ভেদ থাকে না; এইরূপ আপত্তি হইলে, তদুত্তরে আমরা বলি যে, উক্ত ভোক্তৃত্ব নিয়ন্তৃত্বে ভেদ থাকে ; তাহার দৃষ্টান্তও লোকমধ্যে দৃষ্ট হয় ; যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, যেমন সূর্য্য ও তৎ-প্রভা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, তদ্রূপ ভোক্তা জীব ও নিয়ন্তা ঈশ্বর অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন"—এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান শঙ্কর বলিতেছেন—"* * ইতাতঃ পরম কারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বেঽপ্যুপপন্নো ভোক্তা ভোগ্যলক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্র তরঙ্গাদি ন্যায়েনেত্যুক্তম'—অর্থাৎ "* * অতএব পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও সমুদ্রের তরঙ্গাদি বিভাগের ন্যায় ভোক্তা-ও ভোগ্য বলিয়া যে প্রভেদ প্রসিদ্ধ আছে তাহা উৎপন্ন হয়।"—আবার বলিতেছেন—...... অত একত্বং নানাত্বঞ্চোভয়মপি সত্যমেব ...... যথা চ সমুদ্রাত্মনৈকত্বং ফেনতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বম, অর্থাৎ—অতএব ব্রহ্মের একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য। ... যেমন সমুদ্ররূপে একত্ব, এবং ফেন তরঙ্গাদি রূপে নানাত্ব।

১। "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, তথাক্ষরবৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্"—মুণ্ডকোপনিষৎ। যে রূপে মাকড়সা (অন্য উপাদানের সাহায্য না লইয়া স্বয়ং) সূত্র উৎপাদন করে এবং উহা গ্রহণ করে অর্থাৎ গ্রাস করে সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ব্রহ্মেই মিশিবে।"

২। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভি সম্বিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি। তৈত্তিরীয়োপ-নিষৎ।

৩। "যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি"—গীতা ১১।২৮

পুরুষ, সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বনিয়ন্তা' (তিনি বা স) প্রথম পুরুষ (third person)। ব্যকরণ সর্ব্বশাস্ত্রের কীলক বা চাবি-কাঠি, তাই উহা সকল গ্রন্থের আদ্যন্ত। সুতরাং সুরুতে সকলেরই এই ভাব—এই ব্যাকরণীয় ভাব। পরে ব্যাকরণের কঠোর গণ্ডিটুকু একবার এড়াইতে পারিলে—অর্থাৎ অতিক্রম করিলে—এভাবটি তেমন থাকে না, ক্রমে উহা কোমল হইয়া আসে। তখন সেই প্রথম পুরুষটি অর্থাৎ বিশ্বনিয়ন্তা অর্থাৎ 'তিনি কি' তাহার বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। 'তিনি (ব্রহ্ম) সম্মুখে নাই, প্রত্যক্ষে নাই, গোচরে নাই, অন্তরালে বা আড়ালে আছেন—তাই তাঁহাকে বলি, একটু ইঙ্গিতেই বলি 'তিনি' (সে)। পবিত্রদেহা হিন্দুরমণী তাঁহার প্রাণপ্রতিম ভর্ত্তাকে বা 'স্বামী'কে সর্ব্বসমক্ষে বাহ্যজগতের নিকট 'সে' বলিয়া অর্থাৎ প্রথম পুরুষে (third person) ইঙ্গিতের দ্বারা সম্বোধন করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন কেহ সমক্ষে থাকে না, যখন বাহ্য জগতের প্রকোপ নাই দেখেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক লজ্জা ত্যাগ করিয়া সেই স্বামীকেই, যাঁহাকে ইতঃপূর্ব্বে প্রথম পুরুষ ভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আদরের সহিত, প্রেমের সহিত, তুমি বলেন। এখন আর সে প্রথম পুরুষের ভাব তাঁহার স্বামীতে নাই, তাঁহাকেই 'মধ্যম পুরুষটি'ই দেখেন। তখন ভাবেন যে তিনি আছেন আর তাঁহার প্রেমময় স্বামীই আছেন। আর কিছুই দেখেন না, দেখিতে পানও না। বাহ্য জগতের পৃথক ভাবে স্ফূর্ত্তি আর তাঁহার নিকট হয় না, তাই আর কিছুই ভাবেন না, ভাবিতে পারেন না, ভাবিবার আর যো নাই দেখেন। তাই লজ্জাও করেন না। ক্রমে স্বামি-সহবাসে, স্বামি-সোহাগে প্রেম প্রগাঢ় হইলে তখন নিজের দেহ হইতে স্বামীকে অভেদ জ্ঞান করেন, তখন তিনি পতিপ্রেমে তন্ময় অর্থাৎ 'স্বামী ও তিনি' একই উপলব্ধি করেন। তখন আর স্বামিতে মধ্যমপুরুষের ভাবও থাকে না। পূর্ব্বে বাহ্যজগতের প্রকোপে ভয়ে লজ্জায়, যাঁহাকে 'সে' বলিয়াছেন, এখন আর সে ভয়ের কারণ না থাকায় এবং তাঁহাকে প্রাণের মধ্যে সম্যক উপলব্ধি করায়, তাঁহাকেই 'অহং' বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়াছেন। এখন তাঁহাকে নিকটে, অতি সন্নিকটে, অন্তরের অন্তরে পাইয়া উত্তম পুরুষই উপলব্ধি করিতেছেন। অপূর্ব্ব প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছেন -পরিপূর্ণং আনন্দং—পূর্ণানন্দের সম্যক উপলব্ধি, তিনি ও তাঁহার স্বামী, একও নয়, পৃথকও নয়, ভেদও বটে অভেদও বটে, (৪) অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব। ধন্য প্রেমের লীলা খেলা।

প্রেমের এই খেলাটি বুঝিলে আর কোন গোলই বাধে না। সবই মিটিয়া যায়। সৃষ্টিও সৎ এবং নিত্য (stern reality) হইয়া পড়ে। (৫) এবং স্রষ্টার সহিত সৃষ্টিকে উপলব্ধি করিলেই বিশুদ্ধ সত্যজ্ঞান প্রবুদ্ধ হইয়া মানব 'প্রেমানন্দ' লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই পরমপদ ও পরমাস্পদ।

তবে এত দুঃখ শোক কেন? "সংসার দাবানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে"—এত দুঃখ কেন? তাহার উত্তর 'মিথ্যাজ্ঞান'। সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, পাপ পুণ্য ইত্যাদি 'সংস্কার' মাত্র। 'সংস্কার' মাত্রেই 'মিথ্যাজ্ঞান' সম্ভূত এবং 'মিথ্যাজ্ঞানের' কারণ 'রাগদ্বেষ'। এখন এই 'রাগদ্বেষের' উৎপত্তি নিরূপণ করিতে পারিলেই 'সৃষ্টি'কে কেন 'অসৎ ও মিথ্যা' বলা হয় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

'স্রষ্টার সহিত সৃষ্টি'—'একের পৃষ্ঠে শূন্য'—ইহাই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলেই 'সৃষ্টি' সৎ ও নিত্য এবং সত্য হয়। আর স্রষ্টাকে বাদ দিলেই, একেকে মুছিয়া ফেলিলেই সৃষ্টি অসৎ ও অনিত্য এবং মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই মিথ্যাজ্ঞানই জীবের সুখ দুঃখাদির কারণ। অতএব এই মিথ্যাজ্ঞানের অভিব্যক্তি কিরূপে হয়, তাহাই দেখা আবশ্যক।

৪। শ্রুতিতে দুই রূপই আছে যথা—"অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি" এই আত্মাব্রহ্ম, আবার "আত্মান মন্তরো যময়তি" অর্থাৎ ব্রহ্ম সুখ দুঃখাদির ভোক্তা জীব হইতে ভিন্ন—শ্রুতি এই সকল বাক্যে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র ২য়, ১ম পাদ, ২০।২১ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৫। "ভাবে চোপলব্ধেঃ"—ব্রহ্মসূত্র ২য় অঃ। ১ পাদ-১৫। "কার্য্যস্ত কারণাদনন্যত্বং কুতোঽবগমাতে? তত্রাহ কারণ সদ্ভাবে সতি, কার্য্যস্ত উপলব্ধেঃ, 'সমূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎ প্রতিষ্ঠাঃ—"কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব কিরূপে অবগত হওয়া যায়? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে কারণের সদ্ভাব থাকিলেই কার্য্যের জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না, ইহা দ্বারাও কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব জানা যায়। হে সৌম্য এই সকল সৎমূলক।

প্রথমে দেখিতে হইবে যে যদিও 'আমি আছি', 'সৃষ্টি আছে' ও স্রষ্টা আছেন ইহা আমরা সাব্যস্ত (establish) করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, তত্রাচ স্রষ্টা যে আছেন, তিনি কিরূপে আছেন, তাহার কোন সিদ্ধান্তই হয় নাই। তিনি 'সাকার' না 'নিরাকার' ইহা লইয়া দ্বন্দ্ব বাধিবার সম্ভাবনা, কারণ এরূপ দ্বন্দ্ব আবহমান কাল হইতে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে! কেহ বলেন যে তিনি সাকার, আবার কোন কোন মহাজনের ধারণা যে তিনি নির্ব্বিশেষ নিরাকার। এই কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, 'সাকারবাদী এবং নিরাকারবাদী' ইত্যাদি। তাই মহাত্মা কবীর দুই মতের সমন্বয় পূর্ব্বক বলিতেন "নিরাকার মেরা বাপ, সাকার মেরা মায়ী; কাকো নিন্দো কাকো বন্দো দোনো পাল্লা ভারি"। আমাদেরও মনে হয় কোন নিরর্থক গণ্ডগোলের মধ্যে এখন না যাইয়া মহাত্মা কবীরের ন্যায় মহাজনের পন্থানুধাবন করাই শ্রেয়ঃ। 'ব্রহ্ম' নিরাকার কিংবা সাকার এরূপ ভাব না গ্রহণ করিয়া, তিনি যখন স্রষ্টা, বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্ববিধাতা, তখন তিনি নিরাকারও হইতে পারেন আবার সাকারও হইতে পারেন, সব ভাবই তাঁহার সম্ভব হইতে পারে! সুতরাং ইহা লইয়া মিছামিছি এখন আর কোন বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। তিনিই যখন আত্মা, মন, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি হইয়াছেন, আবার তিনিই যখন ক্ষিতি, অপ্, তেজ ইত্যাদি হইয়াছেন, কখনও মূর্ত্ত কখনও অমূর্ত্ত, তখন তিনি সবই হইতে পারেন। মহাজনগণও তাই বলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন "তিনি সাকার আবার নিরাকার। ** সাকার রূপও দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়। তা বুঝাব কেমন করে? যে ভক্ত যে রূপ দেখে সে সেই রূপ মনে করে। বাস্তবিক কোন গণ্ডগোল নাই"। (৬) অতএব এইরূপ মীমাংসাতে কোনও গোল বাঁধিবারই সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্ম 'সৎ চিৎ আনন্দ' অতএব তিনি চিদাকার, তিনি সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন, তিনি সাকারও নন, নিরাকারও নন, তিনি চিদাকার চিন্ময়। এখন বুঝিতে হইবে যে, স্রষ্টার এই সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা। কোন কিছু দেখিলে বা একটা কিছু করিতে হইলে আমাদের কাছে তাহা উদ্দেশ্যজ্ঞাপক বলিয়াই বোধ হয়। উদ্দেশ্য বিনা কার্য্যের সম্ভাবনা মানববুদ্ধির অগোচর। তাই আমরা ভাবি যে স্রষ্টার এই সৃষ্টি রচনার উদ্দেশ্য কি? এরূপ ভাবটা আমাদের স্বাভাবিক, আমাদের অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়াই এইরূপ ভাবাইয়া থাকে। ইহার উপায় নাই। ইহা লইয়া সেই প্রাচীন যুগ হইতে তর্ক বিতর্ক হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর সকল দর্শনেই ইহার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সে অনেক কথা, তাহার বিবরণ এখানে আর আবশ্যক হইবে না। তবে সকলেরই এই মত যে 'ব্রহ্ম' যখন পরিপূর্ণ, সিদ্ধকাম, তাঁহার কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য আছে (৭) ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। কোন কোন দার্শনিক ব্রহ্মের সৃষ্টিরচনা যে একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন তাহা স্বীকার করেন না। সুতরাং সৃষ্টির যে একটা উদ্দেশ্যরূপ কারণ (purposive cause) আছে তাহা তাঁহারা সাব্যস্ত করেন। (৮)

যাহা হউক, এই সব গোলযোগ ও জটিলতা আপাততঃ ত্যাগ করাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বথা বিধেয়। যখন স্রষ্টা পূর্ণকাম, তখন সৃষ্টি রচনায় তাঁহার কোন 'উদ্দেশ্য' থাকিতে পারে না, থাকা সম্ভবপর হয় না, এরূপ ভাব গ্রহণ করিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবার কথা নয়। তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে 'সৃষ্টি' হয় কিরূপে? তাহার উত্তর শ্রুতি (মণ্ডুক উপনিষৎ) দিতেছেন—"দেবস্যৈব স্বভাব

(অর্থাৎ এই সকল সৃষ্ট বস্তু মূলে আশ্রয়ে ও প্রতিষ্ঠানে সৎ) ইত্যাদি প্রতিবাক্য তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।"—ইহা হইতে সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়েই সৎ এবং নিত্য তাহা প্রমাণিত হইল।

৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম কথিত, ১ম ভাগ। শ্রুতিও তাই বলিতেছেন—"দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ" ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

৭। "ন, প্রয়োজনবত্বাৎ লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম। ব্রহ্মসূত্র ২য় অঃ ১ম পাদ ৩১।৩২ সূত্র। ব্রহ্মের প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত সৃষ্টি রচিত নহে, সৃষ্টি তাঁহার ক্রীড়ামাত্র। "দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা"—ব্রহ্মের উহাই (সৃষ্টিকরণ) স্বভাব, আপ্তকামের আবার স্পৃহা কি?" মণ্ডুকোপনিষৎ।

৮। Teleology বা "লক্ষ্যবাদ"। Teleology which begins with Descarte and extends to Comte—J. Martineau. Every art is thus a joint result of laws of nature disclosed by Science, and of the general principles of what has been called Teleology or the doctrine of ends."

হয়মাপ্ত কামস্ত কা স্পৃহা"—অর্থাৎ ব্রহ্মের উহাই (সৃষ্টিকরণ) 'স্বভাব', আপ্তকামের আবার স্পৃহা কি? ভগবান শঙ্কর বোধ হয় এই শ্রুতিবাক্যেই—"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" সূত্রের ভাষ্যে বলিতেছেন—"স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তি র্ভবিষ্যতি" অর্থাৎ "ব্রহ্মের স্বভাব হইতেই লীলারূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।" (৯) তাহা হইলে বুঝা গেল ব্রহ্মের স্বভাবই 'সৃষ্টিকরণ'। যেমন নিঃশ্বাস (১০) প্রশ্বাস ফেলা জীবের স্বভাব, সেইরূপ 'সৃষ্টিকরণ' ব্রহ্মের স্বভাব। একবার সৃষ্টি করিতেছেন (১১) আবার লয় করিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহা হইতেই সৃষ্টি হইতেছে, আবার তাঁহাতেই (কারণেই) লয় হইতেছে। (১২) তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ব্রহ্ম অখণ্ড চৈতন্য সচ্চিদানন্দ হইলেও সেই একই ভাবে যে আছেন তাহা নয়, সেই একই ভাবে থাকিতে পারেন না, থাকিবার যো নাই, তাই থাকেনও না। তাঁহাকেও বহু হইতে হয়। ইহাই তাঁহার স্বভাব। কেন? তাহা বলিবার ইচ্ছা হইলেও চাপিয়া থাকিতে হইবে, বলিতে পারিব না। কারণ ভগবান শঙ্কর প্রশ্ন করিয়া মুখের উপরই বলিতেছেন—"ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুয়োক্তুং শক্যতে"—অর্থাৎ "ঈশ্বরের (ব্রহ্মের) স্বভাবের কারণ অনুসন্ধান সম্যক্ প্রকারে যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং আমরাও এখানে চুপ করিলাম, যদি কিছু বলিবার থাকে তাহা যথাসময়ে পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

৯। শারীরক ভাষ্য।

১০। "যথা চোচ্ছাস-প্রশ্বাসাদয়োঽনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিত্ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব ভবন্তি, একমীশ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি। নহীশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমানং ন্যায়তঃ শ্রুতিতো বা সম্ভবতি। ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুয়োক্তুং শক্যতে"—"যেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস কোন বাহ্যকারণের অপেক্ষা না করিয়াই দেহযন্ত্রের স্বভাব বশতঃই বহিয়া থাকে, তদ্রূপ সৃষ্টিকরণ ব্রহ্মের লীলারূপ প্রবৃত্তি দ্বারাই ঘটিয়া থাকে, কোন প্রয়োজনান্তরের অপেক্ষা করে না। ঈশ্বরের (ব্রহ্মের) কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য আছে এইরূপ অবধারণ তর্কের দ্বারা বা আগমের দ্বারা কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর (ঐ) স্বভাবের কারণ অনুসন্ধানও যুক্তিযুক্ত নহে।" শারীরক ভাষ্য।

১১। ১, ২ ও ৩নং পাদটীকায় উর্ণনাভীর দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য।

১২। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। ব্রহ্মসূত্র ১।১।২ 'নাশঃ কারণ লয়ঃ'—সাংখ্য দঃ ১।১২১

মোট কথা 'ব্রহ্ম' একমেবাদ্বিতীয়ং অর্থাৎ তিনি এক অদ্বিতীয় অখণ্ড, কিন্তু তাঁহার "একোঽহং বহুস্যাম" অর্থাৎ 'বহু' হইবার ব্যাপারটিও তাঁহারই 'স্বভাব'। (১৩) পরন্তু 'এক'কে 'বহু' হইতে হইলে কোন বিশেষ 'শক্তির' প্রয়োজন, তাই তিনি এক বিচিত্র অনির্ব্বচনীয় অঘটনঘটনপটিয়সী শক্তিবিশিষ্ট। এই শক্তিই তাঁহার (ব্রহ্মের) 'বহুভবনশক্তি', এবং ইহাকেই দার্শনিকগণ তাঁহার 'মায়া' বলিয়া থাকেন। 'মায়া' ব্যতিরেকে 'সৃষ্টি' অসম্ভব, সেই হেতু 'মায়ার' আবির্ভাব। এই 'মায়া' তাঁহারই শক্তি, তাঁহাতেই নিহিত, সুতরাং এই 'মায়াই' সৃষ্টির উপাদান কারণ। এই 'মায়াই' যখন ব্রহ্মের সৃষ্টিকরণ 'স্বভাব' প্রতিষ্ঠানে মুখ্য এবং অদ্বিতীয়, তখন তাঁহার 'স্বভাব' ও 'মায়া' পৃথক ভাবে উপলব্ধি করা অসম্ভব। অতএব এই 'মায়াই' ব্রহ্মের 'স্বভাব' বা এক কথায় 'প্রকৃতি'। (১৪) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই অজা 'প্রকৃতিই' স্রষ্টার সৃষ্টির আদিরূপা সনাতনী বলিয়া ইহাকে 'আদ্যা' বলা হয় এবং ব্রহ্মবিভবশক্তিযুক্তা বিশ্ববিভাবিনী বলিয়া ইনিই ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী, তাই তিনি জগন্মাতা, ব্রহ্মভাবভূতা, সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বশক্তিময়ী, সর্ব্বনিয়ন্ত্রী ও অন্তর্যামী স্বরূপা ব্রহ্মময়ী।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। তাঁহার কার্য্যকরী বহুভবন শক্তিই ব্রহ্মময়ী 'মায়া', 'প্রকৃতি' বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। যেখানে কার্য্য বা ক্রিয়াভাব সেখানেই 'গতি' (motion) আছে, যেহেতু কার্য্য মাত্রেই গতিবোধক। গতির সহিত সম্বন্ধ বিনা কার্য্য হইতে পারে না। গতিই কার্য্যের নির্ণায়ক, বোধক ও পরিমাপক; যেখানে 'গতি' সেইখানেই 'মাত্রা' থাকিবেই। এই 'মাত্রা' গতির পরিমাণজ্ঞাপক। পরিমাণ (measure) ব্যতিরেকে 'গতি' হইবার যো নাই। 'গতি' ও 'পরিমাণ', বাক্য ও অর্থের ন্যায় পরস্পর সংপৃক্ত।

১৩। "সোঽকাময়ত বহুস্যাং"। "স্বয়মাত্মানমকুরুত।" "তদৈক্ষত বহু স্যাম্।" "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি"—কঠোপনিষৎ।

১৪। কা প্রকৃতিঃ—ব্রহ্মণঃ সকাশাং নানাবিধ জগদ্বিচিত্র নির্ম্মাণ সমর্থ বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ"। ব্রহ্মেই নিহিত—জগতের বিবিধ বিচিত্র নির্ম্মাণ নিপুণ বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিই 'প্রকৃতি'। নিরালম্বোপনিষৎ।

"ইত্যাশ্চ প্রকৃতিব্রহ্ম"—প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি। শারীরিক ভাষ্য। 'প্রকৃষ্ট বাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ'। সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা স্মৃতঃ"।

গতি বুঝিলেই তাহার মাত্রা বা পরিমাণটিও বুঝিতে হইবে, তাহা না হইলে চলিবে না। সাধারণ মোটামুটি ভাবে গতির মাত্রা তিন বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ পায়। ইহা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে হইলে আমাদের পাদসঞ্চালন গতি বা 'চলন' বুঝিলেই হইবে। আমরা যখন সচরাচর সামান্য পাদচারণ করিয়া বেড়াই, অর্থাৎ এখানে যাই ওখানে যাই, তাহাতে আমরা সামান্য মাত্র শারীরিক কোনরূপই ক্লেশ অনুভব করি না, অথচ আমাদের কার্য্যাদি সুসম্পন্নও হয় এবং শরীর সঞ্চালন হেতু যথেষ্ট ব্যায়ামও হয় যাহা সুফলদায়ী। এইরূপ কল্যাণকর সাদাসিদে 'গতি' বা 'চলন' 'বৈধ' বা বিহিত (normal) বলিয়া উক্ত হয়। তাহার পর যদি আমরা দৌড়াই অর্থাৎ সাধারণ গতির মাত্রা বাড়াইয়া দিই, তাহা হইলে সেই গতিকে আর বৈধ (normal) বলি না। তাহাকে বিশেষ ভাবের গতি এবং শারীরিক ক্লেশসূচক বলিয়া অবৈধ বা অবিহিত (abnormal) গতি বলিয়া থাকি। দৌড়িলে হাঁফাইয়া পড়ি, তখন গতির মাত্রা বা পরিমাণ একেবারে হ্রাস হইয়া যায়, শরীরে অবসাদ আসে। গতির এই অবস্থাটি শারীরিক জড়তা উৎপাদক ও মনকেও (শরীরের সহিত যোগ হেতু) আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। যাহা আচ্ছন্ন করে তাহা 'তম' বা অন্ধকার (darkness) বোধক। তাই গতির এই 'বৈধেরও প্রতিকূল' (sub normal) ভাবটিকে 'তমোভাব' বলে।

তাহা হইলে দেখা গেল যে সাধারণ 'গতি' বা চলন হইতে আমরা গতির মাত্রার বা পরিমাণের তারতম্যে ত্রিবিধ বিভিন্ন ভাবগুলি উপলব্ধি করিতে পারি। তন্মধ্যে প্রথমটি 'বৈধ ও বিহিত' (normal), দ্বিতীয়টি 'অবৈধ ও অবিহিত' (abnormal), এবং তৃতীয়টি 'তম' (dark) জ্ঞাপক ও 'বৈধেরও প্রতিকুল' (subnormal)।

যাহা বিধিযুক্ত তাহা নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত সন্দেহ নাই, তাই উহা বৈধ ও যথাবিহিত (normal)। এরূপ ভাবই বিশুদ্ধ (pure) ও সৎ (good and noble)। 'সৎ' ভাব বা বিশুদ্ধ ভাব অর্থাৎ সতের ভাবই 'সত্ত্ব' বলিয়া অভিহিত হয়। গতির এই ভাবই 'সাত্ত্বিক' (pure) ভাব। সুতরাং গতির বিপরীত ভাবটি অর্থাৎ অবৈধ ও অবিহিত (abnormal) ভাবটি অবিশুদ্ধ বলিতে হইবে। গতির এই ভাবটি অবৈধ ও অবিহিত ক্রিয়াশীল ভাব এবং ইহাতে ইন্দ্রিয় নিচয়ের অতিরিক্ত ক্রিয়ার আধিক্য প্রযুক্ত শরীরে ও মুখে রক্তোদ্গমের বিকাশ হেতু ইহা 'রাগ' (passion) ব্যঞ্জক তাহাতে সন্দেহ নাই। 'রঞ্জ' হইতে রাগের উৎপত্তি হইয়াছে (১৬) এই রাগ ভাব দুঃখের কারণ, যেহেতু ইহা শরীরে ক্লেশদায়ক এবং পরক্ষণেই অবসাদ ও তমভাব আনয়ন করে। যাহা দুঃখ-জনক তাহাই 'রঞ্জের ভাব' বা রঞ্জভাবাত্মক। সহজ ভাষায় ইহাকে 'রাজসিক' (passionate) বলা হয়।

গতির তৃতীয় ভাবটি যাহা 'বৈধেরও প্রতিকূল' (sub-normal) তাহা জড়তা অবসাদ ও আচ্ছন্ন ভাবযুক্ত বলিয়া—'তামসিক' (dark) ভাব বলিয়া অভিহিত হয়।

তাহা হইলে সাধারণ পদক্ষেপ বা চলন গতি হইতে আমরা গতির মাত্রার বা পরিমাণের ক্রমানুযায়ী, বৈধ বা 'সাত্ত্বিক' (normal, pure), অবৈধ বা 'রাজসিক' (passionate, abnormal) এবং বৈধ প্রতিকূল (sub normal) 'তামসিক' (dark) এই তিনটি বিভিন্ন অর্থাৎ ত্রিবিধ গুণাত্মক ক্রিয়ার উপলব্ধি করিলাম। এইরূপ বিশ্লেষণ ফলে আমরা বুঝিলাম যে, যেখানে 'গতি' সেইখানে এই ত্রিবিধ গুণাত্মক ক্রিয়ার প্রকাশ হইবেই। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লব্ধ তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজ, তম বাদ দিয়া কোন কর্ম্মেরই অভিব্যক্তি ঘটে না, ঘটিতে পারে না।

সুতরাং ব্রহ্মের কার্য্যকরী 'বহুভবন শক্তি' মায়া বা প্রকৃতি ত্রিগুণ সম্পন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ কার্য্যকরী শক্তি মাত্রেই গতিবিশিষ্ট এবং গতি হইলেই তাহার মাত্রার পরিমাণ থাকিবেই এবং তাহা তিন বিভিন্ন রূপেই ঘটিয়া থাকে। অতএব ব্রহ্ম প্রকৃতি যে এই

১৫। "য অপহত পাপ্মা নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ"—ইতি শ্রুতিঃ।

১৬। রাগঃ—(রঞ্জ + ঘঙ—ঘ)

১৭। "গুণে প্রকৃষ্টে সত্ত্বে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ। মধ্যমে রাজসি-কশ্চেতি শব্দস্তামসঃ স্মৃতঃ। ত্রিগুণাত্ম স্বরূপা যা সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা। প্রধানে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ সৃষ্টৌ ভূা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা।—ইতি স্মৃতি

ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তম শক্তি বিশিষ্ট তাহা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যাইতেছে (১৮)

সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিবিধ, সুতরাং প্রত্যেক ভাবই বিভিন্ন শক্তিজ্ঞাপক। এই ত্রয়ীগুণভূত 'প্রকৃতিই' ব্রহ্মের কার্য্যকরী বহুভবনশক্তি বা 'মায়া' বলিয়া আখ্যাত হয়। এই মহামায়া 'প্রকৃতিই' স্রষ্টার সৃষ্টি করণের যন্ত্র বা উপাদান স্বরূপ (১৯) ইহা ত্রিগুণ-বিশিষ্ট তাই ইনি 'ত্রয়ী'। 'ত্রয়ী' বলিলেই এই মূল 'আদ্যা' আদিরূপা ব্রহ্মশক্তিঃস্বরূপিণী মহামায়া 'প্রকৃতি'কে বুঝায়। তাই ইহার অপর নাম, ত্রিগুণ প্রসবিনী, গুণত্রয়ী বিভাবিনী, (২০) ত্রয়ীগুণ বিধায়িনী।

এই সত্ত্ব (pure) রজ, (passionate), তম (dark) ত্রিগুণময়ী 'প্রকৃতিই' বিশ্ব-রচয়িতা বিশ্ব-প্রসবিনী অর্থাৎ বিশ্ব নিয়ন্তার বিশ্ব-জগৎটি এই ত্রিশক্তির কৌশল বিন্যাসে রচিত (২১)

আবার এই তিন শক্তির অধিষ্ঠান দুই প্রকারে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে একটি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণোদ্ভূত এবং অপরটি রজ ও তমের পরস্পর সংযোগ সম্ভূত। কারণ, সত্ত্বে অন্য গুণের প্রকোপ নাই, কিন্তু যেখানে 'রজ' সেইখানেই পরক্ষণেই 'তম' ভাবের প্রকোপ ঘটিয়া থাকে, তাই 'রজ' ভাব 'তমের' প্রকোপ ছাড়া থাকে না, থাকিতে পারে না। কথাটা পূর্ব্বোক্ত সাধারণ "পাদবিক্ষেপ" বা চলনরূপ গতি আলোচনা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। সর্ব্ব প্রথমে সাধারণ "পাদবিক্ষেপ" মাত্র। ইহা নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত, তাই বৈধ ও বিহিত, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যেখানে নিয়ম সেখানে সংযম, (restraint), যেখানে সংযম সেখানে কষ্ট আছেই। বিনা আয়াসে সংযম হয় না, তাই উহা কষ্ট বা দুঃখাত্মক। কিন্তু ইহার ফল সুখদায়ক কারণ সংযম দ্বারা নিয়মিত চলনে শরীরের পুষ্টি ও মনের প্রফুল্লতা উৎপাদন করে। সুতরাং দেখা গেল যে সুরুতে কষ্ট বা দুঃখ বোধ হইলেও যখন এইরূপ ক্রিয়াতে পরিণামে সুখলাভ হয় তাহা হইলে উহাকে 'সৎ' বলিতে হইবে। ফলে ক্রিয়ার এইরূপ ভাব কেবল মাত্র 'বিক্ষেপ' জনিত বলিয়া ইহাকে 'বিক্ষেপ' বলে। ইহা বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক গুণের অত্যাধিক্য পরিমাণ সম্ভূত বলিয়া একান্ত 'সৎ' ভাব তাহাতে সন্দেহ নাই (২২)

কিন্তু দৌড়াইয়া হাঁফাইয়া পড়িলে 'রজ' ভাব হইতে তমভাব আসিল। সুরুতে ইন্দ্রিয় নিচয়ের বিশেষ পরিচালনা হেতু সাময়িক আনন্দ হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণে অবসাদ বা আচ্ছন্নতা ঘটিল। আগে 'রজ' ভাবে সাময়িক সুখ, পরক্ষণেই 'তম' বা আচ্ছন্নতা ভাব অবসাদ আসিয়া জুটিল। অতএব এইরূপ ক্রিয়াতে অর্থাৎ যাহাতে সুরুতে সুখ কিন্তু পরিণামে দুঃখ, অবসাদ, আচ্ছন্নতা, তাহা ঘোর আচ্ছাদনাত্মক সন্দেহ নাই। ক্রিয়ায় এইরূপ ভাব 'রজ এবং তমের' মিশ্রণে উদ্ভূত এবং ইহার ফল 'আচ্ছাদন বা আবরণ তাই ইহাকে 'আবরণ' বলে (২৩)

১৮। "মহানাত্মা ত্রিবিধো ভবতি সত্ত্বং রজস্তম ইতি, সত্ত্বং তু মধ্যে বিশুদ্ধং তিষ্ঠত্যভিতো রজস্তমসী। রজঃ ইতি কামদ্বেষস্তমঃ—নিরুক্ত পরিশিষ্ট। "সেই মহান আত্মা (পরম ব্রহ্ম) ত্রিগুণময় সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। বিশুদ্ধ সত্ত্ব রজঃ ও তমের মধ্যে অধিষ্ঠিত, (অর্থাৎ এক পাশে রজঃ অপর পাশে তম, মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব। রজ—কাম, তম—দ্বেষ।"

১৯। "অভিধ্যোপদেশাৎ'—ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন) ১ ৪।২৪ (অভিধ্যা সৃষ্টিসঙ্কল্পঃ) "তদৈক্ষত বহু স্যাম্" ইত্যাদিনা তদুপদেশাৎ ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্ব প্রকৃতি বর্ত্তেতে—নিম্বার্কভাষ্য। অর্থাৎ "ব্রহ্ম নিজেই বহু হইবেন, এইরূপভাবে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টরূপে শ্রুতি উপদেশ করাতে জগতের নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতি (উপাদান কারণ) যে ব্রহ্ম তাহাই সিদ্ধান্ত হয়।"

"ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম। যৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং "তদাত্মনং স্বয়মকুরুত ইত্যাত্মানং কর্ম্মত্বংকর্ত্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি"—শাঙ্করভাষ্য বেদান্তসূত্র ১।৪।২৬ ইহা হইতে ব্রহ্ম প্রকৃতি বুঝা যায়, তিনি আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই বাক্যের দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে ব্রহ্মই কর্ত্তা, আবার তিনিই কর্ম্মরূপ জগৎ।"

২০। "'সুধাত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকাস্থিতা' (হে অক্ষরে নিত্যে! তুমি সুধা ও তিন মাত্রা) "সর্ব্বাশ্রয়া খিলমিদং জগদংশভূত মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতি স্ত্বমাদ্যা" (অখিল সৃষ্টির সর্ব্বপ্রিয়া, তুমি এই জগতের অংশভূতা অবিকার স্বরূপ পরম আদ্যা প্রকৃতি)" "প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী" (প্রকৃতিস্থ সকলের গুণত্রয় প্রদায়িনী)। —মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

২১। 'সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য আত্মভূতে ইবাবিদ্যা কল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্য ত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসার প্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্যমায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতিচ শ্রুতি স্মৃত্যোরভিলপ্যেতে"—অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের আত্মভূত নাম ও রূপ কল্পিত অনির্ব্বচনীয় সংসার প্রপঞ্চের বীজ স্বরূপ ইহাই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি 'প্রকৃতি'—ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়—শারীরকভাষ্য ২অঃ, ১ম পাদ, ১৪সূত্র।

২২।২৩। "সৃষ্টিকালে ভগবান্ আদৌ মায়াং প্রকাশয়ামাস। সা

তাহা হইলে দেখা গেল যে 'সত্ত্ব, রজঃ তম' দুই বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল। তন্মধ্যে প্রথমটি কেবল বিশুদ্ধ ক্রিয়া বা 'বিক্ষেপ' মাত্র (action pure and simple) আর দ্বিতীয়টি 'আবরণ' বা আচ্ছন্নতা প্রতিপাদক (action leading to darkness and ignorance)।

এক্ষণে ব্রহ্ম প্রকৃতি যখন ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্ব, রজ, তম ভাবাপন্ন, তখন 'প্রকৃতি' ও দুই বিভিন্নরূপে কার্য্যকরী

দ্রষ্টৃ দৃশ্যানুসন্ধানপরা কার্য্যকারণরূপা চ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী। অস্যাঃ শক্তি দ্বয়ং আবরণং বিক্ষেপশ্চ" ইতি শ্রীভাগবতমতম্।

"পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মক ও সৎ ও অসৎ রূপে অনির্দেশ্য পদার্থ বিশেষকে অজ্ঞান কহে, এই অজ্ঞান জগতের কারণ বলিয়া ইহাকে প্রকৃতিও কহে। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ ভেদে দুইটি শক্তি আছে। যেরূপ মেঘ পরিমাণে অল্প হইয়াও দর্শক জনগণের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহুযোজন বিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকে যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছন্ন হইয়াও যে শক্তি দ্বারা দর্শক ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিচ্ছন্ন আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে ঐ শক্তিকে আবরণ শক্তি কহে। আর যে শক্তি সহকারে অজ্ঞান উপাদান কারণরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন ঐ শক্তিকে বিক্ষেপ শক্তি কহে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থাভেদে দ্বিবিধ, মায়া আর অবিদ্যা। বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজো বা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণ প্রধান অজ্ঞানকে মায়া, আর মলিন অর্থাৎ রজো বা তমোগুণ দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগুণ প্রধান অজ্ঞানকে অবিদ্যা কহে। উল্লিখিত মায়াতে ব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব হয় ঐ প্রতিবিম্বই মায়াকে স্বায়ত্তে করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, এই কারণে ঐ প্রতিবিম্বই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বনিয়ন্তা ও অন্তর্য্যামীস্বরূপ ঈশ্বর পদবাচ্য, আর অবিদ্যাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয় ঐ প্রতিবিম্বই ঐ অবিদ্যা বশীভূত হইয়া মনুষ্যাদি যাবৎ জীব পদবাচ্য হয়—সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, শঙ্কর দর্শন, ১০৮-৪০ পৃঃ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কৃত।

শাঙ্কর দার্শনিকগণের মতে—"যেরূপ মায়াবী ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা দ্বারা ঐন্দ্রজালিক বস্তু সকল প্রকাশ করিয়া জনগণের দর্শনৌৎসুক নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ সকল বস্তুর সংহার করে, সেইরূপ পরমেশ্বর অচিন্ত্য শক্তিশালী মায়া সহকারে জগৎ সৃষ্টি করিয়া জনগণের সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল প্রদানান্তে পরিশেষে জগতের প্রলয় করেন।"

পরন্তু লেখক স্বয়ং শঙ্কর দর্শনের এই সকল মতের পক্ষপাতী নহেন, মূল প্রবন্ধ পাঠে পাঠক মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। 'বিক্ষেপ' ও 'আবরণ' কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার জন্যই এই সকল মত উদ্ধৃত করা হইল। এবং এই সকল মতের বিচার পরে যথা সময়ে করিবার প্রবৃত্তিও রহিল।

হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই প্রকৃতির দ্বিবিধ অধিষ্ঠান (installation) অর্থাৎ 'বিক্ষেপ' ও 'আবরণ' সাধারণেও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ফল কথা 'প্রকৃতি' দ্বিবিধ 'বিক্ষেপ ও আবরণ'। 'বিক্ষেপ' বোধশক্তির উদ্দীপক ও 'আবরণে' বিশিষ্টরূপ অজ্ঞানের অবতারণা ঘটিয়া থাকে। প্রথমটিতে প্রকৃতি সৃষ্টি রচনা করেন মাত্র, দ্বিতীয়টিতে সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। তাই বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজ বা তম গুণ অনভিভূত 'সত্ত্বগুণ প্রধান' প্রকৃতি 'জ্ঞানাত্মক' এবং অবিশুদ্ধ অর্থাৎ রজ তম গুণ দ্বারা অভিভূত 'সত্ত্বগুণ প্রধান' প্রকৃতি 'অজ্ঞানাত্মক' বলিয়া অভিহিত হয়।

সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি ব্রহ্মের কার্য্যকরী শক্তি। কার্য্য বা ক্রিয়া জড়, অচেতন, কারণ উহা পরক্ষণেই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব ব্রহ্মের কার্য্যকরী শক্তি প্রকৃতি জড় বা অচেতন প্রতিপন্ন হইল। অচেতন প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের বহুভবনশক্তি 'মায়া' বা 'প্রকৃতি' কেবলমাত্র অচেতন হইতে পারে না। ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রহ্ম 'প্রকৃতি' দ্বিভাবাত্মক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহা চেতন ও অচেতন দুই। একটি পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ অপরটি অচেতন। একটি বিশুদ্ধ 'জ্ঞানময়' অপরটি 'অজ্ঞানময়'। যেটি ত্রিগুণাত্মক কার্য্যকরী সেটি অজ্ঞান তাই এইটি 'অবিদ্যা মায়া বা প্রকৃতি' বলিয়া অভিহিত হয়। আর অপরটি নির্গুণ চৈতন্য বা পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ তাই উহা 'বিদ্যা মায়া বা প্রকৃতি' বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। গীতাতে ভগবান তাহাই বলিয়াছেন "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহংকার ইতীয়ংমে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিত স্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (২৪) অর্থাৎ ভূমি, জল, অনল, বায়ু আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার অষ্ট প্রকারে আমার অবিদ্যা প্রকৃতি বিভক্ত, এই অষ্টধা প্রকৃতি 'অপরা' অর্থাৎ নিকৃষ্ট (কারণ ইহা জড় এবং পরার্থ সম্পাদনকারী)। হে মহাবাহো এতদ্ভিন্ন আমার আর একটি জীবস্বরূপ 'পরা' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রকৃতি আছে জানিবে, এবং তাহাই এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।" ব্রহ্মের এই দুই প্রকৃতি অর্থাৎ পরা ও অপরা বা বিদ্যা ও অবিদ্যা একত্রে সংযোগে সৃষ্টি রচিত

২৪। গীতা ৭ অঃ ৪।৫।৬।৭ শ্লোক।

হইয়াছে। ভগবান স্বয়ং গীতাতে বলিয়াছেন—এতদ্‌-যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। মত্ত পরতরং নান্যত কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। (২৫) গীতা ১৩ অঃ। অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ। এই প্রকৃতি হইতেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতের উৎপত্তি বলিয়া জানিবে; অতএব আমিই এই সপ্রকৃতিক জগতের পরম কারণ এবং সংহারকর্ত্তা। হে ধনঞ্জয়! এই জগতের সৃষ্টি ও সংহারের আমা অপেক্ষা পরতর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কারণ অন্য কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণিরাজি গ্রথিত থাকে তদ্রূপ আমাতেও এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে।"

সুতরাং সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভেদ এবং যখন স্রষ্টা এক হইয়াও বহু হইয়াছেন তখন এক ও বহুতে ভেদ আছে, অতএব সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভেদও বটে ভেদও বটে—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব সন্দেহ নাই (২৬) সৃষ্টি স্রষ্টারই প্রকৃতি বা স্বভাব (২৭) তাই উহা অনাদি ও অনন্ত সনাতন শাশ্বত সত্য নিত্য ও সৎ এবং পূর্ণ। ব্রহ্ম 'প্রকৃতি' পরিণামী(২৮) হইলেও অহরহঃ বিকৃত হইলেও প্রকৃতি মূলে অক্ষুণ্ণই থাকে, যেমন আকাশ বা অম্বর (Ether) পরিণামী বা বিকার প্রাপ্ত হইয়া নানা বিচিত্র রূপে তাড়িৎ (Electricity), চুম্বক (Magnatism), তাপ (Heat), আলো (Light), এবং সমগ্র জড় জগৎরূপে পরিণত হইলেও মূলে এক আকাশই অনন্তরূপে অবস্থিতি করিতেছে, সেইরূপ ব্রহ্ম প্রকৃতি অঘটনঘটনপটীয়সী 'মায়া' বিচিত্রে বিবিধরূপে পরিণতি লাভ করিলেও মূলে সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া একই রূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাশিষ্যতে॥"

২৫। গীতা ৭ অঃ ৪।৫।৬।৭ শ্লোক।

২৬। "উভয়ব্যাপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ"—ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন) ৩ অঃ-২।২৭—"মূর্ত্তামূর্ত্তস্য প্রতিষেধাত্তঃ দৃঢ়য়তি, মূর্ত্তাদিকং বিশ্বং ব্রহ্মণি স্বকারণে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধেন স্থাতুমর্হতি, ভেদাভেদ ব্যাপদেশাহি-কুণ্ডলবৎ"—নিম্বার্কভাষ্য। "ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব আরও দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সূত্রকার (শ্রীশ্রীভগবান বেদব্যাস) বলিতেছেন:—স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্ব স্বকারণ ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত, কারণ ব্রহ্মের সহিত ভেদ সম্বন্ধ ও অভেদ সম্বন্ধ উভয়ই শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। সর্প যেমন কুণ্ডলাকারে থাকিলে তাহার অঙ্গসকল অপ্রকাশিত থাকে, প্রসারিত হইলে ফণা লাঙ্গুলাদি অবয়ব প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রকাশিত হয় এবং প্রলয়কালে তাঁহাতে গুপ্ত হইয়া থাকে। উভয়বিধ শ্রুতি যথা:—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্"—ইত্যাদি ভেদব্যাপদেশঃ, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি অভেদ-ব্যাপদেশঃ।

"(ভগবান) শঙ্করাচার্য্য এ সূত্রের ভাষ্যে সূত্রের শব্দার্থ এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং জীবের সহিত যে ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধ তাহাই এই সূত্রে (শ্রীশ্রীভগবান) বেদব্যাস প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শাঙ্করভাষ্যের অভিপ্রেত।"

২৭। "ব্রহ্মবনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্যতো, দ্যাবাপৃথিবী…এতদ্ যদধ্য তিষ্ঠন্তুবনানি ধারয়ন"—অর্থাৎ ব্রহ্মই বন, ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ, যাহা হইতে পৃথিবী ও আকাশ খণ্ডের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনীষিগণ ধ্যানযোগে অবগত হয়েন, যিনি এই সমস্ত ভুবন ধারণ করিয়া অধিষ্ঠিত আছেন"—ইতি শ্রুতিঃ। "ইতশ্চ প্রকৃতিব্রর্হ্ম"—ইহা হইতে ব্রহ্মপ্রকৃতি বুঝায়—শাঙ্করভাষ্য।

২৮। "আত্মকৃতেঃ—পরিণামাৎ"—ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন) ১।৪।২৬—

"ইতশ্চ প্রকৃতিব্রর্হ্ম। যৎকারণং ব্রহ্ম প্রক্রিয়াং "তদাত্মানং স্বয়ম কুরুত" ইত্যাত্মনঃ—কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি। আত্মানমিতি কর্ম্মত্বং স্বয়ম কুরুতেতি কর্ত্তৃত্বং। কথং পুনঃ পূর্ব্ব সিদ্ধস্য সতঃ কর্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুং? পরিণামাদিতিব্রমঃ। পূর্ব্বসিদ্ধোহপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণাময়ামাসাত্মানমিতি বিকারাত্মনা চ পরিণামো মৃদাদ্যাসু প্রকৃতি মুপলব্ধম্। স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে"—অর্থাৎ "তদাত্মনাং স্বয়মকুরুত' (তিনি আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন) এই বাক্যের দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্রহ্মই কর্ত্তা, আবার তিনিই কর্ম্মরূপ জগৎ।—সৃষ্টির পূর্ব্বে অবস্থিত সিদ্ধ বস্তু কিরূপে পুনরায় সৃষ্টি ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারে? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে পরিণাম দ্বারা; অর্থাৎ তিনি পূর্ব্ব সিদ্ধ হইলেও শক্তিমত্তা দ্বারা তিনি আপনাকে আপনিই বিকারিত করিয়াছিলেন, মৃত্তিকাদি স্থলেও এইরূপ বিকার দৃষ্ট হয় ("একেন মৃৎ-পিণ্ডেন, সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ—ছান্দোগোপনিষৎ ষষ্ঠ প্রপাঠক। যেমন একই মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞান হইলে মৃন্ময় সমস্ত বস্তুরই বিজ্ঞান হয়)। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন বলাতে, তিনিই নিমিত্ত কারণ ও বটেন, জগতের অন্য কোন নিমিত্ত কারণও যে নাই, তাহা প্রতিপন্ন হইল"—

সৃষ্টি বা বিশ্বজগৎ পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণতা গ্রহণ করিয়া পূর্ণ হইলেও পরব্রহ্মের পূর্ণতা অক্ষয় রহিয়াছে। (২৯)

অতএব স্রষ্টা সৃষ্টিরূপে পরিণামী হইলেও তিনি সৃষ্টির সহিত যে অব্যয়.অক্ষর, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম তাহাই রহিয়াছেন ইহাই তাঁহার বিচিত্র স্বভাব, ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য সৃষ্টি রহস্য। (৩০)

সমুদ্র বিনা তরঙ্গে থাকে না, থাকিতে পারে না—এই প্রত্যক্ষ প্রমাণিত সত্যটি সমুদ্রের স্বভাব ও প্রকৃতিসিদ্ধ ঘটনা। সমুদ্রের স্বভাবেই সমুদ্র তরঙ্গ আপনা আপনি উত্থিত হয় এবং নৃত্য ও ক্রীড়া করে, পরক্ষণে আবার ভাঙ্গিয়া সেই মহান্ সমুদ্র মধ্যেই লীন হইয়া যায়। সমুদ্রের পরিণাম সমুদ্রতরঙ্গ, কিন্তু ঐ বিশাল অখণ্ড সমুদ্র খণ্ডিত সমুদ্রতরঙ্গরূপে পরিণামী হইয়াও এবং অহরহঃ স্বতঃই নানাবিচিত্রে তরঙ্গের সহিত ক্রীড়া করিয়াও যেমন অখণ্ড সমদ্র তেমনিই থাকে। সেইরূপ স্রষ্টাও তাঁহার স্বভাব পরিণামী হইলেও নানা বিচিত্র রঙ্গে অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় লীলা খেলায় প্রমত্ত হইলেও সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-রূপেই আছেন। ইহাই বিশ্বনিয়ন্তার একাধারে মাধুর্য্যময় ও পরম ঐশ্বর্য্যময় অচিন্ত্য 'সৃষ্টি-রহস্য'। 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি' ব্রহ্ম সমুদ্রে ব্রহ্মস্বভাবোত্থিত ব্রহ্ম তরঙ্গমালার আনন্দ-লহরী, চিদানন্দ সমুদ্রে চিদানন্দময়ের বিচিত্র ক্রীড়া, চিৎ সাগরবক্ষে তরঙ্গরূপা চিন্ময়ীপ্রকৃতির অপূর্ব্ব রঙ্গ, অখণ্ড চৈতন্যের নিজ আধারেই আধেয়রূপে বিলাস, কখনও বা বিশ্বময়ের ক্রোড়ে বিশ্বজননীর বিক্ষেপ, কখনও বা প্রেম-সাগর-নীরে ভাবতরঙ্গে রাসবিলাসিনী সোহাগিনী শ্রীমতী রাধার প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসক্রীড়া, আবার কখনও বা মহাকালের বক্ষে মহাকালীর ভয়ঙ্করী নৃত্য,—ইহাই ব্রহ্মের লীলা, এই লীলাই ব্রহ্মের স্বভাব, ইহাই তাঁহার প্রকৃতি, এ স্বভাব ব্যতিরেকে 'ব্রহ্ম' পূর্ণ নহেন, তাহা হই-তেই পারে না। এই স্বভাবই তাঁহার একাংশ, এবং সেই একাংশ লইয়াই ব্রহ্ম পূর্ণ, ইহা বাদ দিলে, 'নেতি' বলিয়া

২৯। ঈশোপনিষৎ—শান্তিপাঠ।

৩০। পরিণাম কাহাকে বলে—"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ" অর্থাৎ "বস্তুর সহিত যে অন্যথা প্রথা কি না অন্যরূপ জ্ঞান, তাহা বিকার—তাৎপর্য্য এই যে, পরিণামবাদীদিগের মতে কারণ বিকৃত বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত অর্থাৎ কার্য্যাকারে পরিণত হয়। সুতরাং কার্য্যবস্তু আছে। দুগ্ধের দধি ভাবাপত্তি প্রভৃতি পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত। দুগ্ধ দধিরূপে, সুবর্ণ কুণ্ডলরূপে; মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং তন্তু পটরূপে পরিণত হয়। অতএব দধি, কুণ্ডল, ঘট ও পট, যথাক্রমে দুগ্ধ, সুবর্ণ, মৃত্তিকা, ও তন্তু হইতে বস্তুগত্যা ভিন্ন ইহা বলা যাইতে পারে না। কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্নই না হইল তাহা হইলে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান ছিল। কারক ব্যাপার অর্থাৎ যে সকল উপায়ে কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া সচরাচর বিবেচনা করা যায়; বাস্তবিক ঐ সকল উপায় বা কারক ব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে। কেন না তাহার পূর্ব্বেও ত কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। অতএব কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে—অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক। অর্থাৎ পূর্ব্বে সূক্ষ্ম ও অব্যক্তরূপে কার্য্য বিদ্যমান ছিল, কারকব্যাপার দ্বারা তাহার স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হয় মাত্র"—মহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রদত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ম লেকাঃ ১ম বর্ষ ১৮৭ পৃঃ।

ব্রহ্মের পরিণাম সম্বন্ধে বেদান্ত সূত্রে শ্রীশ্রীভগবান বেদব্যাস লিখি-য়াছেন—"উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি" ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তদর্শন ২অঃ ১।২৩)···অর্থাৎ "কুম্ভকারস্থলে দৃষ্ট হয় যে বাহ্য উপকরণের সাহায্য ভিন্ন ঘটাদি নির্ম্মিত হয় না; তদ্দৃষ্টে উপকরণ রহিত ব্রহ্মের জগৎ কারণতা নাই বলা যাইতে পারে না; কারণ উপকরণের প্রয়োজন সকল স্থলে দৃষ্ট হয় না। দুগ্ধ স্বতঃই দধিরূপে পরিণত হয়।

"দেবাদিবপি লোকে"—ঐ ২ অঃ ১।২৫—অর্থাৎ "দেবতা ও সিদ্ধ পুরুষগণ স্বীয় সঙ্কল্পমাত্র দ্বারা বিশেষ বিশেষ বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ; তদ্বৎ ঈশ্বরও সঙ্কল্প মাত্রই জগৎ সৃষ্টি করেন।

এক্ষণে আপত্তি তুলিতেছেন—"কৃৎস্নপ্রসক্তিনিরবয়বত্ব শব্দকোপো বা" অর্থাৎ "ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব তখন তাঁহার—কৃৎস্ন প্রসক্তি অর্থাৎ —খণ্ডভাবে ভাগ শ্রুতির বিরোধ হয়"—

এই আপত্তি আবার পর সূত্রে খণ্ডন করিতেছেন—"শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বা অর্থাৎ" উক্ত আপত্তি সঙ্গত নহে, পূর্ব্বোক্ত বিরোধ স্বীকার্য্য নহে; কারণ জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উৎপাদন এই উভয় কারণ, তিনি জগৎ হইতে অতীত থাকিয়া জগদ্রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইবার শক্তি বিশিষ্ট এইরূপ মর্ম্মে বহু সংখ্যক শ্রুতি আছে। যথা "সোঽকাময়ত বহুস্যাং"—তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন; "স্বয়মাত্মানমকুরুত"—তিনি স্বয়ং আত্মাকে সৃষ্টি করিলেন; তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—জগৎ-সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে তথা পুরুষাত্তবতি বিশ্বং" "যেমন উর্ণনাভ জাল সৃষ্টি করে—তদ্রূপ পুরুষ হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হয়; এতদাত্মামিদং সর্ব্বং—এই বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক; "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এতৎ সমস্তই

উড়াইয়া দিলে ব্রহ্মের পূর্ণতা থাকে না। তাই কবি তাহার প্রাণের অন্তর্ণিহিত নাদধ্বনিতে গাহিতেছেন—

রাধাসঙ্গে যদাভাতি তদা মদনমোহনঃ।

অন্যে চ বিশ্বমোহপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥

"সৃষ্টির সহিত স্রষ্টাকে উপলব্ধি"—ইহাই 'প্রেমের' নিগূঢ়তত্ত্ব, ইহা যে বুঝেছে সেই মজেছে, সেই মহাত্মাই জ্ঞানে প্রবুদ্ধ, যোগে পরমাত্মায় যুক্ত, ভক্তিতে ভরপুর, বিশ্ব-প্রেমিকের প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি' এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ মহাতত্ত্বজ্ঞানে প্রেমসাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন। কত যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, মহর্ষিগণ এই আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন কে তাহার ইয়ত্তা করিবে—ইহাই বিশ্বপাতার বিশ্বনিয়ন্তার অচিন্ত্য 'সৃষ্টিরহস্য'।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্ম"—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম জগদতীত হইলেও তিনিই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন, সুতরাং শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধে কেবল তর্কের উপর নির্ভর করিয়া তদ্বিরুদ্ধ মত সকল গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

ভগবান শঙ্কর এই ছত্রের ভাষ্যে বলিয়াচেন—"ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তি রস্তি। কুতঃ? শ্রুতেঃ যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তি শ্রূয়তে এবং বিকার ব্যতিরেকেনাপি ব্রহ্মণোবস্থানং শ্রূয়তে" অর্থাৎ ব্রহ্মরে জগদুপাদানত্ব দ্বারা তাঁহার জগদ্রূপত্ব মাত্র সিদ্ধান্ত হয় না; কারণ শ্রুতি এক দিকে যেমন ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ অপর দিকে বিকার স্থানীয় জগতের অতীত হইয়া ব্রহ্মের অবস্থিতি ও শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীভগবান বেদব্যাস পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার জন্য পরসূত্রে বলিতেছেন "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চহিৎ—অর্থাৎ... সিদ্ধ বা অসিদ্ধ (জীবাত্মারও) ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এবং দেবাদিরও যখন বিচিত্র সৃষ্টির রচনা দৃষ্ট হয়, তখন সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান জগৎ কারণ পরমাত্মার এইরূপ শক্তি থাকা স্বীকারে কি আপত্তি হইতে পারে?

ব্রহ্মের সৃষ্টিরূপ পরিণামে ব্রহ্ম যে জড়ের মত বিকৃত হন না তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইল। ইহাই ব্রহ্মের স্বভাব। ইহাতেই তিনি পরব্রহ্ম। যোগীযাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন "প্রণবেন ব্যাহৃতিভিঃ প্রবর্ত্ততে তমসস্তু পরমজ্যোতিঃ। কঃ পুরুষঃ। স্বয়ম্ভু বিষ্ণুরিতি স স্মৃতি। প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত তমের অতীত পরমজ্যোতিঃরূপ স্বয়ম্ভুবিষ্ণু পুরুষ নিত্যই বিদ্যমান আছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রণব যুক্ত এই প্রণবের (অ,উ,ম) ব্যাহৃতি (utterance) উচ্চারণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য।

বাণী

ভাবি মনে এ জীবনে শুধু যদি বারেকের তরে
জড়িমার গুরুভার ঘুচে যেত এ রসনা পরে,
কি তা হলে কহিতাম? মরমে কি আছে সংগোপনে
হেন বাণী উৎসারিতে চায় যাহা অগ্নি প্রস্রবণে?
কোন্ সত্য অনুভূতি বহ্নি সম পশিয়া অঙ্গারে
দীপ্ত ভাস্বরতা লভি প্রচারিতে চায় আপনারে?
কি পেয়েছি দিতে যাহা বিশ্বজনে ব্যাকুল পরাণ
আত্মনিবেদন তরে খুঁজিতেছে ভাষার সন্ধান?
এ কি শুধু বাচালের অর্ব্বাচীন মুখর কণ্ডূতি
অন্তঃসার লেশ শূন্য বুদ্বুদের উচ্ছ্বাস বিভূতি,
অর্থহীন শব্দজাল, বাক্যারণ্যে বানীর নিধন,
শুধু মিথ্যা তন্তুজালে নাহি যাহা তাহার সৃজন?

দিওনা দিওনা ভাষা রাখ মোরে চির মৌনী করি,
রসনা খসিয়া যাক্, যে সত্য লভিনি চিত্ত ভরি
যদি তারে টানি আনি তার লজ্জা হরিবারে চায়,
থাক্ সে লুকায়ে চিত্তে যেথা তার নিভৃত কুলায়।
হয়ত সে জন্মিয়াছে ডিম্ব সম বিহঙ্গর নীড়ে,
আলোকে তোলেনি মুখ রয়েছে সে রুদ্ধের তিমিরে,
যদি কোনো দিন তার পরিপুষ্ট হয় পক্ষ দুটি,
আপনি সে মুক্ত হবে পক্ষ ভরে আবরণ টুটি।
প্রকাশের শুভ্রালোকে মুক্তপক্ষে উড়িবে গাহিয়া
প্রাণে ভরে পাবে বাণী, পাবে সুর, দিবে উৎসারিয়া।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

ESTD ... CALCUTTA

ভারতে পারস্যাভিযান

(মাজু-সাহিত্য-সম্মেলনে ইতিহাস শাখার অধিবেশনে পঠিত)

যাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁরা সকলেই জানেন যে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত, পঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশ পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই সময়ে পারস্য অভিযানের ফলে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক অবস্থার কি পরিবর্ত্তন ঘটেছিল, সে বিষয়ে বিশেষ কিছু অনুসন্ধান এখনও হয় নি। এ সম্বন্ধে সহায়তা করতে পারে এমন কয়েকটী বিষয়ে সম্প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সেগুলি আজ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করার চেষ্টা করবো। তবে, উপযোগী উপাদানের অভাবে এখনই কোন চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব হবে না।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গন্ধার ও পঞ্জাব পারস্য-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।(১) কয়েক বৎসর পরে (সম্ভবত খৃঃ পূঃ ৫১৮।১৯) পারস্য সম্রাট্ দরায়ুস সিন্ধু নদের উভয় তীর পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে স্কাইলাক্ষ নামক একটী গ্রীক্‌কে নিযুক্ত করেন। তার পরেই সিন্ধুপ্রদেশ তাঁর হস্তগত হয়। তখন আর্য্যাবর্ত্ত বহু খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। তখন মগধের রাজা দর্শক, অবন্তীর রাজা পালক, কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন। এঁরা যে সমসাময়িক সেটা আমরা হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করলেই বুঝ্‌তে পারি। দর্শক ছিলেন অজাতশত্রুর পুত্র। পিতাপুত্রের রাজ্যকাল মৎস্যপুরাণের মতে ৫১ বৎসর, বায়ুপুরাণের মতে ৫০ বৎসর। বৌদ্ধেরা বলেন, বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন খৃঃ পূঃ ৫৪৪। সিংহলের "মহাবংশে" ঘটনাটী ফেলা আছে অজাতশত্রুর অভিষেকের ৭।৮ বৎসর পরে। চীন পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চোয়াং উত্তর ভারতে শুনেছিলেন যে অজাতশত্রুর ৫ম রাজবর্ষে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। সুতরাং খৃঃ পূঃ ৫০০ কিংবা তার ২।৩ বৎসরের মধ্যে দর্শকের রাজ্য-শেষ ধরা যায়। — জৈন-আম্নায়ে বলে, বিক্রমাব্দের ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে (খৃঃ পূঃ ৫২৮) মহাবীরের দেহত্যাগ হয়; এবং ঐ একই দিনে পালক রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। পালকের রাজ্যকাল মৎস্যপুরাণের মতে ২৮ বৎসর। অতএব, খৃঃ পূঃ ৫০০তে পালকের রাজ্যশেষ ধরা সঙ্গত।—কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের দুই মহিষী ছিলেন;—একটী অবন্তীর রাজা প্রদ্যোতের কন্যা, অর্থাৎ পালকের ভগিনী বাসবদত্তা, অপরটী মগধের রাজা দর্শকের ভগিনী, অর্থাৎ অজাতশত্রুর কন্যা পদ্মাবতী।

"মহাবংশে" মগধরাজঃদর্শকের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের উল্লেখ আছে; পৌরবর্গ তাঁকে পিতৃহন্তা ব'লে রাজ্যচ্যুত করে। য়ুয়ান্ চোয়াং মগধে একটী বিহার দেখেছিলেন যার নাম "দর্শক-বিহার"; এবং তখনও জনশ্রুতি এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতাকে বিম্বিসারের শেষ বংশধর বলে' পরিচয় দিত।(২)—"মৃচ্ছকটিক" নামক নাটকে অবন্তিরাজ পালকের শেষ সংবাদ পাই; তাঁর অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে পৌরবর্গ তাঁকে হত্যা করে।—ভারতের ইতিহাসে এ দুটী ঘটনা একটু অসাধারণ। বৈদিকযুগে রাজাকে দেবতুল্য সম্মান দেওয়া হ'ত। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আমরা দেখি যে প্রজার চক্ষে রাজা সে সম্মান হারিয়েছেন। প্রজারা তখন রাজাকে সাধারণ মানুষের পদবীতে নামিয়েছে। তা না হ'লে কি তারা দর্শককে রাজ্যচ্যুত এবং পালককে নিহত করে? আমার মনে হয়, আদর্শের এই পরিবর্ত্তন ঘটেছিল পারস্য রাজনীতির প্রভাবে। পারস্যদেশের রাজা ছিলেন দেবতা নয়, দেবতার প্রিয়; দরায়ুসের শিলালিপিতে বার বার বলা আছে, পারস্য-দেবতা অহুর-মজ্‌দার অনুগ্রহের বলে পারস্যরাজের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। ভারতরাজ অশোকও

(১) Herzfeld—Memoirs of the Archæological Survey of India (No. 34)

(২) Beal—Buddhist Records of the Western World, Pt II, p 102 (BK VIII) য়ুয়ান্ চুয়াংএর Ti-lo-shi-kiaকে Tiladaka করা অসঙ্গত।

তাঁর শিলালিপিতে আপনাকে "দেবানাম্-প্রিয়" বলে' অভিহিত করেছেন। শুধু তাই নয়। অশোক তাঁর পূর্ব্বগামী রাজাদের সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে "রাজা" ও "দেবানাম্-প্রিয়"এই দুই শব্দকে একার্থবোধক ভাবে ব্যবহার করেছেন। এরূপ স্থলে ধরা যায় যে অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদেরও "দেবানাম্-প্রিয়" আখ্যা ছিল। তবে, অশোকের বহুপূর্ব্বে যে এ আখ্যার প্রচলন ছিল, একথা বলা যায় না; বৈদিক বা বৌদ্ধ সাহিত্যে ও-শব্দের ও-অর্থে ব্যবহার পাওয়া যায় নি। কিন্তু কৌটিলীয় অর্থ-শাস্ত্রে বলা আছে যে রাজা ইন্দ্র ও যমের স্থানীয় বা প্রতিনিধি। (··· ইন্দ্র যমস্থানমেতৎ···তস্মাদ্রাজানো নাবমন্তব্যাঃ—ইতি ক্ষুদ্রকান্ প্রতিষেধয়েৎ)। সুতরাং মনে হয়। আখ্যাটীর মূলে যে ধারণা, সে ধারণার উদ্ভব হয়েছিল বুদ্ধদেবের পরে ও চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে। সম্ভবতঃ পালক ও দর্শকের পরবর্ত্তী রাজারা আর দেবতা হিসাবে গণ্য হ'তে না পেরে পারস্যরাজের মতন দেবতার প্রিয় প্রতিনিধি বলেই নিজেদের পরিচিত করেছিলেন।

প্রজাশক্তির যে অভ্যুদয়ের ফলে দর্শক রাজ্যচ্যুত ও পালক নিহত হন, তার মূলেও পারস্যপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সম্রাট্ দরায়ুস নিজের সাম্রাজ্যবিস্তার কার্য্যে আশ-পাশের যথেচ্ছাচারী রাজাদের সাহায্য নিতেন। গ্রীক্‌দের ছোট ছোট পৌর রাজ্যের রাজারা কেউ কেউ নিজেদের উদ্ধত শাসন বজায় রাখ্‌বার জন্যে দরায়ুসের সহায়তা পেতেন। সেই সব রাজাদের হাত করেই পারস্যসম্রাট্ তাঁর সাম্রাজ্য-বিস্তারে কৃতকার্য্য হন। খাস্ গ্রীসে কিন্তু এ নীতি বেশী দিন খাটে নি; খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এথেন্সের লোকেরা সেখানকার রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে' প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলে। রোমেও ঠিক ঐ সময়েই প্রজাবর্গ সেখানকার রাজাকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এ ব্যাপারের জন্যেও পারস্য রাজনীতিকে দায়ী করা সুসঙ্গত। দরায়ুস যেমন সিন্ধুপ্রদেশ জয় করবার পূর্ব্বে সিন্ধুনদের তীর পর্য্যবেক্ষণ করান, তেমনি তিনি ইতালি ও সিসিলির সমুদ্রতীরও পর্য্যবেক্ষণ করিয়েছিলেন।(৩) সুতরাং তাঁর যে রোমকরাজ্য আক্রমণ করার অভিসন্ধি ছিল, এ সন্দেহ সে দেশের লোকেদের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এবং সেই অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করবার অভিপ্রায়ে—হয়তো এথেন্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে'—রোমকরা যে তাঁদের যথেচ্ছাচারী রাজাকে রাজ পদচ্যুত করে প্রজাতন্ত্রের পত্তন করবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তখন কর্কদেশ (কার্থেজ, বর্ত্তমান টিউনিস) পারস্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, একথা দরায়ুসের শিলালিপি পাঠে আমরা অবগত হই। কর্ক থেকে রোম আক্রমণ করা দরায়ুসের পক্ষে সহজসাধ্য হ'ত। এই সময়েই আবার একটী কর্ক-রোমীয় সন্ধির কথা শোনা যায়। (৪) আরও দেখি যে রোমের নব-প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র কতকটা কর্কের শাসন-পদ্ধতির সমতুল্য রোমে একটা রাজার পরিবর্ত্তে দুটী কন্‌সালের প্রতিষ্ঠা মূলতঃ কর্কের দ্বৈরাজ্যের অনুকরণে কল্পিত। এই সব ঘটনা-পরম্পরার যোগাযোগ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, পারস্যসাম্রাজ্য-বিস্তারকে ব্যাহত করবার জন্যেই গ্রীসে ও রোমে প্রজা-শক্তির এই অভ্যুত্থান। ভারতবর্ষেও ঠিক এই সময়েই দর্শক ও পালকের রাজ্যচ্যুতি এবং রাজার বিরুদ্ধে প্রজা শক্তির অভ্যুদয় লক্ষিত হয়। এর মূলেও যে দরায়ুসের সাম্রাজ্য-বিস্তারের অভিসন্ধি বর্ত্তমান ছিল, এ অনুমানকে নিতান্ত অযৌক্তিক বলা যায় না। পারস্যসাম্রাজ্য তখন বিশাল ও বর্দ্ধনশীল; তার শক্তি ও গতিকে রোধ করার চেষ্টা পূর্ব্বে ও পশ্চিমে প্রায় একই প্রণালীতে হওয়া স্বাভাবিক। সে সময়েপূর্ব্ব ও পশ্চিমের সংযোগ যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল সেটা তাঁরাই জানেন, যাঁরা হিন্দু ও গ্রীক্ দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করেছেন। গ্রীক্‌দের চিত্রিত ঘটে ওঙ্কার জ্ঞাপক স্বস্তিক-চিহ্ন দেখা যায়। (৫) পাণিনির ব্যাকরণে যবনানী (লিপি)র উল্লেখ মেলে। মগধের রাজবংশীয়দের মধ্যেও পারস্য-প্রভাব দৃষ্ট হয়। দর্শকের পূর্ব্বপুরুষ শিশুনাক সম্ভবতঃ সুষা-(Susa)-পুরের রাজার বংশজাত ছিলেন। (৬)

(৩) E. Meyer, art. 'Darius' in Encyclopaedia Brittanica (11th-ed.)

(৪) Polybius Histories. III 23.

(৫) JASB 1921, pp 231 ff (লেখকের প্রবন্ধ)।

(৬) JAOS Vol, 42 pp, 195ff, JAOS Vol, 45, pp, 72ff (লেখকের প্রবন্ধ)।—পুরাণে অন্যত্র সুষাপুরের উল্লেখ আছে (সুষাবামথ বারণাম···)।

দর্শকের পিতামহ একটী মদ্র জাতীয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। মহাভারতে কর্ণ-শল্যের বাগ্‌যুদ্ধের সম্যক্‌ আলোচনা করলে মনে হয়, সেকালে হিন্দুরা পারস্যদেশীয় লোকদের 'মদ্র' আখ্যা দিতেন,—যেমন গ্রীক্‌রা প্রায়ই তাঁদের "মীড" নামে অভিহিত করতেন।(৭) মহাভারতের এই অংশ যখন রচিত হয়, তখন পঞ্জাব পারস্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। যে অংশে বলা আছে, অত্যাচারী রাজা হননযোগ্য, সে অংশও সম্ভবত একই সময়ে রচিত। দর্শক ও পালকের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পশ্চাতে একটা রাজ-বিরুদ্ধ কথ—একটা বিপ্লববাদ—নিশ্চয়ই ছিল।

দর্শক ও পালকের রাজ্যচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে আর এক নূতন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধের পর যে সব খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, তাদের মধ্যে একটা সংহতির সূত্রপাত দেখা যায়। আমার মনে হয়, বৎসরাজ উদয়নই এই সংহতির কর্ত্তা।(৮) পূর্ব্বেই বলেছি, তাঁর এক রাণী পালকের ভগিনী, আর এক রাণী দর্শকের ভগিনী। গুণাঢ্যের বৃহৎকথা অবলম্বনে লিখিত 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ও 'কথাসরিৎসাগরে' বলা আছে মগধ ও অবন্তী উদয়নের করতলগত হয়েছিল। কথাসরিৎসাগরে উদয়নের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে পারসীক বিজয়েরও উল্লেখ আছে। কিন্তু এই দিগ্বিজয়-বর্ণনার সঙ্গে রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনার এত সাদৃশ্য যে বোধ হয় কথাসরিৎসাগরকার এ বর্ণনাটীর জন্যে কালিদাসের কাছে ঋণী। বৃহৎকথামঞ্জরীর বৃত্তান্ত বেশী বিশ্বাসযোগ্য; তাতে বলা আছে, (মগধ ও অবন্তী ভিন্ন) কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্তকে জয় করেই উদয়ন "সর্ব্বাশা-বিজয়ী" হলেন। কথাটা কবির কল্পন মনে হয় না, কল্পিত দিগ্বিজয়ের আড়ম্বর বেশী। উদয়ন যে মগধ ও অবন্তীর অধীশ্বর হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পুরাণেও পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে মগধ-রাজবংশকথনে দর্শকের পরই উদয়নের নাম দৃষ্ট হয়। ভাগবত পুরাণে ইনি 'অজয়' বা 'আজয়' নামে উল্লিখিত। বায়ুপুরাণে অবন্তীর রাজবংশ-কথনে পালকের পর 'অজক'-এর নাম দেখি। 'অজয়' নামটীকে 'অজক' নামেরই প্রাকৃত রূপান্তর ধরা যায়। এক্ষেত্রে পুরাণকারেরা যে সংস্কৃত নাম পান্‌ নি তার প্রমাণ রয়েছে। মৃচ্ছকটিক নাটকে পাই যে পালকের পর 'আর্য্যক' রাজা হয়েছিলেন, সুতরাং সং আর্য্যক = প্রা অজক। মগধের রাজবংশ কথনেও যে 'অজয়' বা 'আজয়' নাম বর্ত্তমান, সেটিও সম্ভবত সংস্কৃত নয়, কেন না অজয়ের পরবর্ত্তী রাজা নন্দিবর্দ্ধনকে যে অপত্যপ্রত্যয়াত্মক উপাধি ('আজেয়') দেওয়া আছে, সেটী 'অজয়' শব্দ থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে নিষ্পন্ন করা যায় না। পুরাণে আরও দেখি যে অবন্তীর সিংহাসনে পালকের পর অজক, তারপর 'নন্দিবর্দ্ধন', এবং মগধের সিংহাসনে দর্শকের পর অজয়, তার পর 'নন্দিবর্দ্ধন'। এ অবস্থায় অজক আর অজয়ের অভিন্নতা সহজেই উপলব্ধ হয়। ইনি বিষ্ণুপুরাণে 'উদয়ন' নামে উল্লিখিত, এবং বায়ু-পুরাণে 'উদায়ী' নামে অভিহিত। ইনি আবার মৃচ্ছকটিকে "গোপাল-বালক"-রূপে পরিচিত। নাটক-কার সম্ভবত উদয়নের "বৎস-রাজ" উপাধিটী স্মরণ ক'রে এ পরিচয় দিয়েছেন; পালকের পর প্রকৃতপক্ষেই যদি একটী সামান্য গোপালক সিংহাসন অধিকার করতো তাহ'লে পুরাণে সেকথার নির্দ্দেশ পাওয়া যেত। মহাপদ্ম নন্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোনই শূদ্র রাজা হয় নি—এই কথাই পুরাণে পাই। এই সব এবং আরও অন্যান্য প্রমাণ আলোচনা করলে মনে হয় যে কৌশাম্বী-পতি উদয়ন মগধ ও অবন্তীর অধীশ্বর হয়েছিলেন। তাঁর রণনৈপুণ্যের স্মৃতি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও লোপ পায় নি; একটী শিলালিপি এবিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। তিনি প্রতাপশালী ও প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন; তাই তাঁর নাম আশ্রয় করে এত গল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সমুদ্র পর্য্যন্ত মধ্যভারত তাঁর শাসনাধীন ছিল। এই শক্তি-সমন্বয়ের আয়োজন যে পারস্যরাজ দরায়ুসের রাজ্য-বিস্তার-চেষ্টার বিরুদ্ধে সঙ্কল্পিত, এ অনুমান সমীচীন। গ্রীসেও এর অল্পকাল পরেই ঐ একই উদ্দেশ্যে একই আয়োজন দেখা যায়। ফলে, পারস্য-রাজ ক্ষয়ার্ষ (Xerxes) গ্রীস্‌-বিজয়ের দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিধির বিড়ম্বনা, ক্ষয়ার্ষের পরাজিত সৈন্যদের মধ্যে ভারতীয় সৈনিকও ছিল।

যে প্রজাতন্ত্রের বলে গ্রীস্‌ স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে

(৭) J A.S.B. 1925, pp 205ff (লেখকের প্রবন্ধ)।

(৮) Udayana Vatsaraja, (Calcutta, 1919)। লেখকের এই পুস্তিকায় প্রকাশিত মত শ্রীযুক্ত ভিলেন্ট স্মিথ গ্রহণ করেছেন।

পেরেছিল, সে প্রজাতন্ত্র আরও দেড়শো বৎসর সেখানে স্থায়ী হয়েছিল। ভারতে প্রজাশক্তির প্রভাবে অত্যাচারী রাজা ছুটী গেলেন—রাজা দেবতা ব'লে মান্য না হয়ে দেবতার প্রিয় ব'লে গণ্য হলেন; কিন্তু প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে নি; রাজাদের স্থানে রাজারাই রাজত্ব করতে লাগলেন। ফলে, যদিও পারস্য সম্রাট্ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত জয় করতে সমর্থ হন নি, পারস্য-সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) ভারতকে জয় করেছিল। বৎসরাজ উদয়ন যে রাষ্ট্রসংঘ গঠন ক'রে পারস্য সম্রাটের বিজয় লালসা ব্যাহত করেছিলেন, সেই রাষ্ট্রসংঘ আর এক শতাব্দীর মধ্যে এক-ক্ষত্র সাম্রাজ্যে পরিণত হ'ল। পুরাণে বর্ণিত আছে, মহাপদ্ম নন্দ অন্যান্য "ক্ষত্র" অর্থাৎ সামন্ত নরপতির উচ্ছেদ সাধন ক'রে তাঁদের রাজ্যগুলো নিজের অধীনে নিয়ে এলেন। পুরাণকার বলেন, এই কার্য্যের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের আয়বৃদ্ধি করা ("...ভাবিনার্থেন চোদিতঃ।") ঠিক্ এই উদ্দেশ্যেই পারস্যরাজ দরায়ুসও তাঁর পৈতৃক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি করদ রাজাদের অধীনে না রেখে নিজের শাসনাধীন করেছিলেন। সুতরাং, মহাপদ্মের এই ব্যবহারেও পারস্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মহাপদ্মের সমসাময়িক পারস্যরাজ দ্বিতীয় দরায়ুস ছিলেন তাঁর পিতার জারজ পুত্র; ন্যায্য উত্তরাধিকারীদের হত্যা ক'রে তিনি বলপূর্ব্বক পৈতৃক রাজসিংহাসন অধিকার করেছিলেন। মহাপদ্মও ছিলেন উদয়ন পৌত্র মহানন্দের পুত্র; কিন্তু তাঁর মাতা ছিলেন শূদ্রী। তিনিও পৈতৃক রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না; বলপূর্ব্বক তিনি সিংহাসন অধিকার করেন। এটী ভারতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। মনে হয়, মহাপদ্ম তাঁর সমসাময়িক পারস্য সম্রাটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই স্বয়ং শূদ্রীগর্ভসম্ভূত হ'লেও সিংহাসন লাভে ব্রতী হয়েছিলেন। (৯)

আরও দুটী ব্যাপারে মহাপদ্ম পারস্য রাজের অনুকরণ করেছিলেন। প্রথমত পারস্যরাজ ছিলেন তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভূমি ও উদকের পতি; তাই তিনি যখন জয়যাত্রায় নির্গত হতেন তখন প্রণতির চিহ্ন-স্বরূপ চাইতেন মাটী আর জল। দ্বিতীয়ত, পারস্যরাজ্যে এমন কোন আইন বা শাস্ত্র ছিল না যা রাজার শাসনকে লঙ্ঘন করতে পারতো; রাজার হুকুমই ছিল আইন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের শেষে একটী শ্লোক আছে যাতে বলা হয়েছে যে শস্ত্র, শাস্ত্র এবং ভূ এই তিনটীই নন্দ-রাজের অধিকারে এসেছিল; পুরাণকারও বলছেন, মহাপদ্ম "অনুল্লঙ্ঘিত শাসন" হয়েছিলেন; তাঁর পূর্ব্বগামী কোনও রাজার সম্বন্ধে একথা বলা নেই। মৌর্য্যযুগের রাজা যে ভূমিপতি ছিলেন, একথা গ্রীক্ দূত মেগাস্থিনীস্ বলেছেন। কাত্যায়নেরও উক্তি আছে (১০) রাজা ভূস্বামী ব'লেই সর্ব্বদা পরিচিত—অন্যদ্রব্যের স্বামী তিনি নন্; সেই জন্যেই ভূমিতে উৎপন্ন শস্যাদির ষড়্ভাগ তাঁর প্রাপ্য; অন্যথা—অর্থাৎ যদি তিনি ভূস্বামী না হতেন—এই ষড়্ভাগ তাঁর প্রাপ্য হ'ত না। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের এক টীকাকারও বলেছেন (১১) রাজা যে ভূমি ও উদকের পতি, একথা শাস্ত্রজ্ঞেরা নির্ণয় করে থাকেন; এই দুটী ভিন্ন আর যা কিছু দ্রব্য, তার স্বামী হচ্ছে কৃষকরা। এ নির্ণয়টী মৌর্য্যযুগের পূর্ব্বে, কিন্তু অনতিপূর্ব্বে, হয়েছিল; কারণ, প্রাচীন সাহিত্যে রাজার ভূস্বামিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে যে আম্‌লা তন্ত্র বা ব্যুরোক্রেসির বিস্তৃত বর্ণনা আমরা দেখি, সেটিও খুব সম্ভব পারস্যরাজ্যের অনুসরণে কল্পিত। (১২) ব্যুরোক্রেসি না হ'লে বড় সাম্রাজ্য চলে না। মৌর্য্যযুগে পারস্য প্রভাবের অন্যান্য লক্ষণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা দেখিয়েছেন; সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব।

(৯) Transactions of the First Oriental Conference, Poona (1919). Vol. II, pp 35 iff. (লেখকের প্রবন্ধ)।

(১০) ভূস্বামী তু স্মৃতো রাজা নান্যদ্রব্যস্য সর্ব্বদা।
তৎফলস্য হি ষড়্ভাগং প্রাপ্নুয়ান্নান্যথৈব তু॥

(১১) রাজা ভূমেঃ পতির্দৃষ্টঃ শাস্ত্রজ্ঞৈরুদকস্য চ।
তাভ্যামন্যত্তু যদ্দ্রব্যং তত্র স্বাম্যং কুটুম্বিনাম্॥

(১২) শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেন, অর্থশাস্ত্র হিন্দুদের অন্য শাস্ত্রগুলোর সঙ্গে খাপ খায় না; সুতরাং ওটী যে বাইরের আমদানি, এ সন্দেহ ভিত্তিহীন নয়।

কলির দধীচি

বিলাস-ব্যসনপুষ্ট হে বাঙালী, তিষ্ঠ ক্ষণকাল !
স্থির চিত্তে ভাবো আজি, কি অদম্য আত্ম অভিমান !
জাতীয় মর্য্যাদা লাগি' ক'রে গেল প্রাণ বলিদান !
অটল সঙ্কল্পে তার ভীত স্তব্ধ শমন করাল !
ত্রিষষ্টি দিবস ধরি' কুক্ষি ছিল খাদ্যের কাঙাল !
শিরা-মাংসপেশী গুলি কৃপা মাগে কণিকা প্রমাণ !
সে বীর শোনে নি কাণে, মানে নাই প্রাকৃত বিধান !
জেনেছিল দেহটাকে দাসত্বের দারুণ জঞ্জাল !

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, আর দধীচির পরহিত-ব্রত
হের এ-যতীন্দ্রনাথে, আত্মতেজে গৌরব-উজ্জ্বল !
পঞ্চবিংশ বয়স্কের পদে তাই পৃথিবী প্রণত !
আসমুদ্র হিমগিরি ক্ষোভে দুঃখে অতীব চঞ্চল !
যেই চিতাচুল্লী আজি জ্বলিতেছে অন্তরে সতত,
সে-আলোকে অগ্নিগীতা পাঠ করো, অক্ষম দুর্ব্বল !

এ জগতে হেরিলাম কি বিচিত্র মানব-জীবন !
দেখেছি দ্বিপদ পশু, পশ্বিতর পাপাত্মা পামর,
পরের উন্নতি হেরি পদে হায়্ ভীষণ কামড় !
মুখে মধু হৃদে বিষ, বেশ-ভূষা করে সম্মোহন !
দেবতা-দুর্ল্লভ প্রাণ অন্যদিকে দেখেছি তেমন !
পৃথ্বীহিতে আত্মত্যাগী, ভূমণ্ডলে কেহ নাহি পর !
দীনের পরম বন্ধু, বিপন্নের একান্ত দোসর !
দেখিলে দুঃখীর অশ্রু গলা ধরি মুছায় নয়ন !

হে যতীন্দ্র, তুমি তা-ই ! বিশ্বমাঝে বীরেন্দ্রকেশরী !
বিস্ময়-বিস্ফার-নেত্রে স্মরিতেছি নিয়ত তোমায় !
অপূর্ব্ব মহত্ত্ব তব ক্ষুদ্রচিত্তে কিসে আমি ধরি ?
অসংখ্য হৃদয়-পাত্র পূর্ণ করি' উচ্ছলিয়া যায় !
নিঃশেষ হবে না তবু তোমাতেই রবে তুমি ভরি !
জীবনে মরিয়া ছিলে, মরিয়াই অমর ধরায় !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ।

উপহার

(গল্প)

নিউইয়র্কের একটী পুরাতন বাড়ীতে দরিদ্র দম্পতি জিম্ ও ডেলা বাস করিত। বহুদিনের অসংস্কার বশতঃ বাড়ীটীর দেওয়ালগুলির স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ও চারিধারে 'শেওলা' পড়িয়াছিল। এই বাড়ীর দ্বিতলের কয়েকটী কক্ষ ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। গৃহে সাজ-সজ্জার আড়ম্বর ছিল না। সাজ-সজ্জার মধ্যে ছিল—একটী ছিন্ন-পুরাতন কার্পেট, একটী ভগ্ন কৌচ, একটী ক্ষুদ্র দর্পণ, ভৃত্যদের ডাকিবার জন্য ইলেক্ট্রিক্ বোতাম বিশিষ্ট ঘণ্টা ও একটী জীর্ণ চিঠির বাক্স।

শেষোক্ত দুইটী দ্রব্য তাহাদের কোন কাযে লাগিত না। এই অনাড়ম্বর সাজ-সজ্জাহীন গৃহটীতে দরিদ্র দম্পতির জীবন কোনরূপে অতিবাহিত হইত। পূর্ব্বে জিম্ সপ্তাহে আট ডলার করিয়া উপার্জ্জন করিত কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ ইদানী উহা পাঁচটীতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

খ্রীষ্টের জন্মোৎসব খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের সর্ব্ব প্রধান উৎসব। এই উৎসবে ধনী-দরিদ্র সকলেই তাহাদের সাধ্যমত নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় করিয়া আত্মীয় স্বজনকে উপহার দিয়া নিজেদের শ্রদ্ধা স্নেহ ও ভালবাসা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। আগামী কল্য সেই আনন্দোৎসবের দিন।

কৌচে শুইয়া ডেলা আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। তাহার ভাবনার যেন অন্ত নাই। সমস্ত বৎসর কষ্ট করিয়া নিজেদের এই অল্প আয়ের মধ্যে যাহা বাঁচাইয়াছিল তাহার পরিমাণ মাত্র—দুইটী ডলার। এই দুইটী ডলারে সে তাহার প্রিয়তমের জন্য কি দ্রব্য ক্রয় করিবে? অনেক ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া ডেলা শয্যাত্যাগ করিয়া অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করিতে লাগিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া সে থামিল ও তাহাদের ক্ষুদ্র দর্পণটীর নিকট দাঁড়াইয়া নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! সে তাহার কবরী অসম্বদ্ধ করিল। সুনীল স্বচ্ছ জল-তরঙ্গের উপর সূর্য্য-কিরণ পতিত হইলে যেরূপ দেখায়, তাহার পিঠের উপর স্বর্ণাভ চুলের তরঙ্গ সেইরূপ খেলিয়া গেল। চুলগুলির প্রতি চাহিয়া সে কি ভাবিল—তাহার পর তাড়াতাড়ি কেশ সংযত করিয়া লইল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার মুখের বর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া গেল। চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া সে পুরাতন হ্যাট ও ওভারকোটটি পরিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ডেলা ও জিমের দুইটী গর্ব্বের বস্তু ছিল। একটী—ডেলার স্বর্ণাভ কুঞ্চিত কেশ, ও অপরটী জিমের পিতৃ-পিতামহের আমলের একটি সোণার ঘড়ি। ডেলার এই স্বর্ণাভ কুঞ্চিত কেশগুলি এত সুন্দর ছিল যে, কোনও রাণীর বহুমূল্য রত্নালঙ্কারও তাহার কাছে হার মানিয়া যাইত। আর কোনও রাজা যদি জিমের ঘড়িটী দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ঈর্ষা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ডেলা একেবারে একটী দোকানের নিকট যাইয়া থামিল। দেখিল মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে—Mme. Sofronie. Hair goods of all kinds.

ডেলা তাড়াতাড়ি দোকানটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দোকানের অধিকারিণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়া, আপনি কি আমার চুল কিনিবেন?"

"আমি চুল কিনি। আপনার হ্যাট খুলুন, দেখি কেমন চুল।"

চুলের স্বর্ণাভ তরঙ্গ খেলিয়া গেল। ইতস্ততঃ ভাবে চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে স্বভাব সুলভ ব্যবসাদারী চালে দোকানের অধিকারিণী কহিলেন, "কুড়ি ডলার পর্য্যন্ত দিতে পারি, যদি ইচ্ছা হয় চুল দিতে পারেন।"

"আচ্ছা নিন"—বলিয়া ডেলা তাঁহার দিকে উৎসুকভাবে চাহিল।

চুল দিয়া মূল্য লইয়া দোকান হইতে বহির্গত হইয়া ডেলা ঘণ্টা দুই নিজে ঈপ্সিত দ্রব্যের জন্য নানা দোকানে খোঁজ করিল। শেষে এক দোকানে তার অভীষ্ট বস্তুর সন্ধান মিলিল। তাহার অভীষ্ট বস্তুটী একটী—প্ল্যাটিনাম-ধাতু-নির্ম্মিত ঘড়ির চেন্। চেন্টি তাহার খুব পছন্দ হইল। সে ভাবিল 'এই চেনটি নিশ্চয়ই আমার প্রিয়তমের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এত দোকান খুঁজিলাম এমন চেন্ তো কোথাও পাইলাম না। এই চেনটি তাহার সোণার ঘড়িতে বেশ মানাইবে। সে ইহা পাইলে খুব খুসী হইবে।' একুশটি ডলার দিয়া সে চেন্টি ক্রয় করিল।

চেনটি লইয়া ডেলা যখন গৃহে ফিরিল তখন তাহার উত্তেজনার মোহ কাটিয়া জ্ঞানের সঞ্চার হইল। সে কেশ কুঞ্চন করিবার যন্ত্র লইয়া নিজের বিধ্বস্ত চুলগুলি কুঞ্চিত করিতে লাগিল। প্রায় চল্লিশ মিনিটের মধ্যে তাহার মস্তক ছোট ছোট কুঞ্চিত চুলের দ্বারা আবৃত হইল। দর্পণের নিকট দাঁড়াইয়া নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া সে মনে মনে বলিল—"যদি জিম্ এই দেখে, রেগে আমায় না মেরে ফেলে, তা' হলে সে নিশ্চয়ই বল্‌বে যে আমায় থিয়েটারের সখীর মত দেখাচ্ছে।"

২

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জিমের আসিবার সময় হইয়াছে। ডেলা কফি প্রস্তুত করিয়া—চপ্ তৈয়ারী করিবার জন্য ষ্টোভের উপর কড়াই চাপাইয়া দিয়া, জিম্ যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে সেই দ্বারের নিকট বসিল।

জিমের আসিতে কখনও দেরী হয় না। আজও হয় নাই। নিয়মিত সময়ে সিঁড়িতে তাহার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। শব্দ শুনিয়া ডেলার মুখ কিছুক্ষণের জন্য ভয়ে সাদা হইয়া গেল। পরে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল—"হে প্রভু, সে যেন আমায় অন্য দিনের মতই সুন্দর দেখে।"

গৃহে প্রবেশ করিয়া জিম্ দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। জিমের বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। গৃহে প্রবেশ করিয়া জিম্ ডেলার দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া ডেলা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল না। সে দেখিল ইহা ক্রোধ, বিস্ময়, হতাশা বা ভয়ের চিহ্ন নহে।

ডেলা তাহার কাছে যাইয়া কহিল, "প্রিয়তম জিম্, তুমি অমন ক'রে আমার পানে চেয়ে থেকো না। আমি আমার চুল কেটেছি, কারণ এই খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের দিন তোমায় একটা উপহার না দিয়ে থাক্‌তে পারতুম না। তুমি কিছু ভেব না। আমার চুল শীগ্‌গির আবার বেড়ে যাবে, কারণ আমার চুল বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ে। এই জন্মোৎসবের দিন আনন্দ কর। তুমি জান না, কি সুন্দর জিনিষ আমি তোমার জন্য আমি সংগ্রহ করে এনেছি।"

এতক্ষণে ব্যাপারটা উপলব্ধি করিয়া জিম্ কহিল—"চুল বেচেছ?"

"হাঁ। তাই ব'লে তোমার কি এখন আমায় পছন্দ হয় না? চুল গেছে কিন্তু আমি তো তোমার আছি।"

জিম্ কক্ষের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কি দেখিতে লাগিল।

"কি দেখ্‌ছ প্রিয়তম? আজ খ্রীষ্টের জন্মোৎসবের দিন আমার উপর রাগ কোরো না। এস আমরা আনন্দ করি।"

এই বলিয়া সে দুঃখ মিশ্রিত মধুর স্বরে কহিল, "চুল গেলে চুল আবার হবে, কিন্তু এই জন্মোৎসবের দিন তোমায় উপহার স্বরূপ একটা কিছু না দিতে পারলে চিরকাল আমার দুঃখ থাকতো। চপ্‌চাপাবো কি?"

ওভারকোটের পকেট হইতে একটি প্যাকেট বাহির করিয়া টেবিলে রাখিয়া জিম্ কহিল—"আমায় ভুল বুঝো না ডেল্। সংসারে এমন কোন বস্তুই নেই যা' আমাদের ভালবাসার অন্তরায় হতে পারে। যদি তুমি প্যাকেটটি খোল তা' হলেই বুঝতে পারবে কেন আমি ওরকম করছিলাম।"

ডেলা তাড়াতাড়ি প্যাকেটটি খুলিয়া ফেলিল। খুলিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল ও পরক্ষণেই কাঁদিয়া ফেলিল। সে দেখিল—তিনখানি চিরুণী। দুইটি পার্শ্বের ও একটি পশ্চাতের। এইরূপ সুন্দর চিরুণী ডেলা কতদিন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে। কিন্তু অভাব বশতঃ তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। আজ সেই বাঞ্ছিত দ্রব্য তাহার হস্তগত। কিন্তু হায়! আজ তাহার চুল কোথায়? ডেলা নিজকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিল—"ভাবনা কোরো না তুমি, আমার চুল খুব শীগ্‌গির বেড়ে যাবে। আমি তোমার জন্যে কি কিনে এনেছি, তা তো তুমি দেখনি?" বলিয়া সে তাহার হস্ত প্রসারিত করিয়া সেই প্ল্যাটিনাম ধাতু নির্ম্মিত চেন্‌টি দেখাইল।

"দেখ, এটা কি সুন্দর জিম! আমি এটার জন্যে আজ দু' ঘণ্টা দোকানে দোকানে ঘুরেছি। এটা তোমায় খুব মানাবে। কৈ দেখি তোমার ঘড়ি। দেখি পরলে তোমায় কেমন মানায়।"

জিম কিছুক্ষণ নীরব রহিল। তারপর জিম মুখে ম্লান হাসি আনিয়া বলিল, "আমাদের জন্মোৎসবের দ্রব্যগুলি রেখে দাও ডেল। ওগুলি এত সুন্দর যে এখন ব্যবহার করা উচিত নয়।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে জিম বলিল—"আমি তোমার চিরুণী কেনবার জন্যেই ঘড়িটি আজ বিক্রী করেছি। এখন চপ্‌চাপাও।" বলিয়া জিম সজল নয়নে স্ত্রীকে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করিল। *

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

* ইংরাজি গল্প হইতে।

তুলসী

সেবিয়াছ সযতনে
সুমার্জ্জিত গৃহাঙ্গনে
বেদিকার 'পরে,
ধূপে দীপে সাঁজে ভোরে,
তুষিয়াছ গঙ্গা নীরে
বৈশাখ বাসরে।
প্রতিদান লও তার
আজিকে খেয়ার কড়ি—
পথের সম্বল।
আজি স্নিগ্ধ ছায়া কোলে
মুদ, ভবনদী কূলে
নয়ন যুগল।

আমি, বৎস, হরিপ্রিয়া,
মঞ্জরী অঞ্জলি দিয়া
করি আশীর্ব্বাদ,
কাণ্ডারী ক্ষমুন ত্বরা
তোমার জীবন ভরা
সব অপরাধ।
শুন' নাকো পিছু-ডাকা
মায়ার কাঁদন যত
হাহাকার রোল,
ক্ষীণ কণ্ঠে মনে মনে
বল' বৎস মোর সনে
'হরি হরি বোল।'

শ্রীকালিদাস রায়।

মেটরলিংকের অদৃষ্টবাদ

(সমালোচনা)

মরিস্ মেটরলিংক অদৃষ্ট সম্বন্ধে যে অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার বিবরণ আমরা ইতিপূর্ব্বে * সবিস্তারে এবং তাঁহার নিজের ভাষার প্রণিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার সেই অদৃষ্ট-বাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে অদৃষ্ট সম্বন্ধে তাঁহার মোটামুটি সিদ্ধান্ত-গুলি স্মরণ করিয়া লইলেই চলিবে।

তিনি প্রথমেই, অতীব সঙ্গত ভাবে বলিয়াছেন যে, অদৃষ্ট বলিয়া যদিও কোন-কিছু থাকে, তথাপি আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সুখদুঃখ বিধানে পুরুষকার-শক্তির প্রত্যক্ষ কার্য্যকারিতা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই। আমরা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের শিক্ষা ও অশিক্ষা, উদ্যম ও নিরুদ্যম, ধৈর্য্য ও অধৈর্য্য প্রভৃতিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের অদৃষ্টের বিধাতা-পুরুষ হইয়া দাঁড়াইতেছে। এবং আমাদের স্বকৃত কর্ম্মের ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলকে আমরা প্রচুর ভাবে ইহ-জন্মেই লাভ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি, একমাত্র পুরুষ-কার শক্তি দ্বারাই আমাদের জীবনযাত্রার সুখদুঃখ বিধানের জটিল প্রহেলিকার সার্ব্বাঙ্গীন মীমাংসা হয় না। এবং এমন ঘটনাও আমরা প্রায় দেখিতে পাই যে, অতিবড় উদ্যোগী পুরুষ-সিংহও কদাচিৎ ডুবন্ত জাহাজের সঙ্গে ডুবিয়া যান, পড়ন্ত বাড়ীর তলায় চাপা পড়িয়া মরেন, অকারণে ও বিনা দোষে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়েন, এবং নগণ্য কারণে সর্ব্বস্বান্ত হয়েন। এই সব কারণেই, মানুষের প্রথম জ্ঞানোদয় হইতে আবহমান কাল অদৃষ্ট

* মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভাদ্র, ১৩৩০ দ্রষ্টব্য।

বলিয়াও কোন্ কিছুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু সেই অদৃষ্ট কি এবং স্বরূপতঃ উহা কোন বস্তু? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে ভারতবর্ষীয় আমাদের মনে প্রথমেই জন্মান্তর ও কর্ম্মফলের কথা উঠিয়া থাকে, কিন্তু ইউরোপে জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদের কোনই বালাই নাই। এমন কি আমাদের জন্মান্তরবাদের "প্রচণ্ড বটিকা", অনেক বড় বড় পাশ্চাত্য "স্কলার" গণও গলাধঃকরণ করিতে অক্ষম হইয়া থাকেন। এবং সাধারণ ইউরোপীয় ধাতুতে ইহার যে ছিটে ফোঁটাও বরদস্ত হয়না এ কথা বলাই বাহুল্য। সেই জন্য অদৃষ্ট-বিচার প্রসঙ্গে মেটরলিংক জন্মান্তরবাদের কথা আদৌ বিচারের আমলেই আনেন নাই এবং তিনি বিচারের আমলে আনিয়াছেন দুইটি প্রায়-অপ্রচলিত অদৃষ্টবাদ। তাহার প্রথমটি হইতেছে ইউরোপের মধ্যযুগে বহুধা প্রচলিত গ্রহ নক্ষত্র-ঘটিত ফলিত জ্যোতিষের মত। এবং তাহার দ্বিতীয়টি হইতেছে, বিস্মৃত গ্রীকযুগের মত, যে মতানুসারে আমাদের ভাগ্যবিধান, স্বর্গস্থ দেবগণের অজানা ও খামখেয়ালি ইচ্ছামাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত।

মেটরলিংকের মতে দেবগণ কিংবা গ্রহগণ প্রত্যেক জীবের ভাগ্য বিধাতা হইবার ন্যায় সঙ্গত দাবি করিতে পারেন না। তাহার প্রথম কারণ এই। যে সকল নৈসর্গিক দুর্ঘটনা, যথা ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি, কিংবা যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্ব্যবস্থা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ, তাহা কোনই ব্যক্তি বিশেষের জন্ম-নক্ষত্রের ফলে, কিংবা কোন বিশেষ হতভাগ্যের স্বর্গস্থ অদৃষ্টদেবতার খামখেয়ালি ইচ্ছা অনুসারে হয় না। তাহারা কাহারই দুঃখসংঘটনের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় না। বিশ্বের সুখদুঃখ নিরপেক্ষ বিপুল কার্য্যকারণ নিয়মে এবং সৃষ্টির অতল রহস্যের গর্ভ হইতে ঐ সকল অবস্থা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং তাহারা কোনই অদৃষ্ট দেবতার সৃষ্টি নহে। দ্বিতীয়তঃ মেটরলিংক দেখাইয়াছেন, শুধু মনুষ্য নহে, প্রত্যেক ইতর জন্তুও ন্যায্যভাবে অদৃষ্টের দাবি করিতে পারে। এবং বিশ্বনিখিলের সমগ্র জন্তুর সেই অদৃষ্ট বিরচন করাই যদি গ্রহ-লোক ও দেবলোকের কার্য্য হয়, তবে সেই কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহাদের নিজেদের চসৃকায় তৈলসেক করিবার ফুরসৎ অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। বিশেষতঃ আমাদের তুচ্ছ শুভাশুভ অদৃষ্টের জন্য দেবলোক ও গ্রহলোকের এতই অত্যধিক শিরঃপীড়া উপস্থিত হইবারও বিশেষ কোন কারণও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে তিনি গ্রহলোক ও দেবলোককে বিদায় দিয়া, বলিয়াছেন অদৃষ্ট-ঘটিত মাথা ব্যথা যখন আমাদের নিজের মাথার ব্যথা, তখন সেই ব্যথার কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়া দেবগণের কিংবা শনি রাহু কেতুর মাথা ধরিয়া টানাটানি না করিয়া, আমাদের নিজের মাথার মধ্যেই সেই ব্যথার কারণানুসন্ধান অধিকতর ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত।

অতএব, তিনি বলিয়াছেন অদৃষ্ট-দেবতা বলিয়া যদি কোন দেবতা থাকেন, তবে সে দেবতা আমাদের নিজের মধ্যেই আছেন। এবং সেই দেবতার ভাগ্য-রচনার যদি কোন কার্য্যবিধি থাকে, তবে সে বিধি নিশ্চয়ই ঝড় বৃষ্টি রচনা করা নহে, কিংবা সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্ব্যবস্থার সৃষ্টি করাও নহে, সে কার্য্যবিধি হইতেছে বাহ্য সামাজিক ও নৈসর্গিক অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার মধ্যে দিয়া আমাদের জীবন যাত্রাকে এমন ভাবে চালাইয়া লইয়া যাওয়া, যাহার ফলে আমরা দুঃখকে পরিহার করিয়া সুখ-কেই লাভ করিতে সমর্থ হই।

তবে, আমাদের মধ্যে কোন্ সেই দেবতা আছেন যিনি আমাদের জীবন-পথের পথ নির্দ্দেশক অদৃষ্ট-দেবতা? উত্তরে মেটরলিংক বলিতেছেন, আমাদের অন্তর হইতেও অন্তরতর প্রদেশে এক সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান অন্তরাত্মা বাস করেন, যিনি হইতেছেন আমাদের প্রকৃত অদৃষ্ট-দেবতা। সেই অন্তরাত্ম-পুরুষ হইতেছেন আমাদের চেতনার অতীত অতি-চৈতন্য, আমাদের বুদ্ধি-বোধিত জ্ঞানের অতীত বুদ্ধ্যাতীত জ্ঞান, প্রকাশমান বোধের অতীত, অপ্রকাশ বোধাতীত বোধ। মেটরলিংক এই বোধাতীত অন্তরাত্ম-পুরুষকে নানা নামে অভিহিত করিয়া-ছেন, যথা, "Our veritable Ego," "Our first-born self," Our uuconsciousness", "Our unconscious soul" ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি বলিতেছেন, আমাদের প্রকাশমান জ্ঞানের পশ্চাতে যে এক বিপুল অপ্রকাশ জ্ঞান অবস্থিত রহিয়াছে, এবং যে বিপুল অপ্রকাশ জ্ঞান আমাদের বুদ্ধির বিষয়ীভূত না হইলেও, যে অতি-

চৈতন্য জ্ঞানের আভাস ও ইঙ্গিত, তাহার অস্ফুট ছবি ও ছটা সর্ব্বদাই আমাদের স্ফুট-চৈতন্যের উপর পতিত হইতেছে, সেই অপ্রকাশ ও অতি-চৈতন্য জ্ঞান সত্তাই আমাদের অদৃষ্ট প্রথের পথ নির্দ্দেশক, বাস্তব অদৃষ্ট দেবতা, ও প্রকৃত আত্ম-পুরুষ।

. এই আত্ম-পুরুষ ও অপ্রকাশ চৈতন্য, স্বরূপতঃ কোন্ বস্তু ইহা বুঝাইবার জন্য, আমরা মেটরলিংকের পুস্তক হইতে কয়েক ছত্রের ইংরাজি অনুবাদ উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—"Within us there is a Being that is our veritable Ego, which is immemorial, illimitable, universal and probably immortal. It knows no proximity, it knows no distance, past and future concern it not, nor the resistance of matter. It is familiar with all things, there is nothing it cannot do." অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এমন একটি সত্তা অবস্থিত রহিয়াছে, সে সত্তাই আমাদের প্রকৃত আত্মপুরুষ। সেই আত্মপুরুষের জ্ঞান শক্তি হইতেছে স্মৃতির অতীত, অসীম, সমগ্র বিশ্বের সহিত লব্ধ সম্বন্ধ, এবং সম্ভবতঃ অবিনাশী। ইহার জ্ঞানে কিছুই দুর নহে, কিছুই নিকট নহে, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেই জ্ঞান অব্যাহত গতি, জড়ের ব্যবধানে ও বাধায় তাহা ব্যবহিত ও বাধিত হয় না। ইহা সমস্ত বিষয়কেই নিবিড় ভাবে জানিতেছে, ইহার ঐশ্বর্য্য শক্তিতে কিছুই অসাধ্য নাই।

এই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আত্মপুরুষই আমাদের অদৃষ্ট দেবতা। এবং শুভাদৃষ্ট-সম্পন্ন ব্যক্তিরা দেখিতে পান সেই শুভকামী অদৃষ্ট দেবতার সর্ব্বজ্ঞজ্ঞান—"rises again and again to the surface of external conscious life, intervening at every instant, warning, deciding, counselling and blending with most facts of a career"—অর্থাৎ "সর্ব্বদাই বাহ্য জ্ঞানময় জীবনের উপর পুনঃ পুনঃ ভাসিয়া উঠিতেছে, প্রতি ঘটনায় মধ্যবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইতেছে, সতর্ক করিয়া দিতেছে, মীমাংসা করিয়া দিতেছে, পরামর্শ প্রদান করিতেছে এবং জীবনের উন্নতিপথে অধিকাংশ ঘটনার সহিত মিশিয়া যাইতেছে।"

কিন্তু আমরা সকলেই জানি, জগতের সাড়ে পনর আনা লোক অদৃষ্ট কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত, চিহ্নিত অপরাধী ও হতভাগ্য। এবং তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এক এক পরম শুভকামী সর্ব্বজ্ঞ আত্মপুরুষ বাস করিতেছেন, এবং সৌভাগ্য সম্পন্নগণের প্রতি তাঁহার যে শুভকর ব্যবস্থা, দুর্ভাগ্যগণের প্রতিও তাঁহার সেই ব্যবস্থা। তবে দুর্ভাগ্যগণ কেন সময়মত অদৃষ্টদেবতার সঙ্কেত ও পরামর্শে বঞ্চিত হইয়া দুঃখের পাথারেই ডুবিয়া মরে? কেন তাঁহার শুভকর প্রেরণা সকল তাহাদের জীবন-যাত্রার নিয়ামক হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে মেটরলিংক সাফ্ বলিতেছেন—"Their unconscious soul fails to do its duty"। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মেটরলিংক যাহাকে একবার বলিতেছেন "there is nothing it cannot do," ফের তাহাকেই বলিতেছেন—"It fails to do its duty"। যাহা হউক, সে আপত্তি আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া অবশ্যই আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, হতভাগ্যগণ সম্বন্ধে কোন্ হেতু বশতঃ সর্ব্বশক্তিমানও স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম হইয়া থাকেন? উত্তরে প্রশ্নকর্ত্তা বলিতেছেন—"কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে এই বুদ্ধ্যাতীত তত্ত্ব তাহাদের বুদ্ধির এতই তলায় চাপা পড়িয়া রহিয়াছে যে, সেখান হইতে অন্তরাত্মার শুভকর ইঙ্গিত ও প্রেরণা সকল তাহাদের স্ফুট জ্ঞানের উপর আসিয়া পৌঁছে না। কেবল দুইটি মাত্র অন্তরাত্মার প্রেরণা তাহারা লাভ করিয়া থাকে; একটি হইতেছে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের প্রেরণা, আর দ্বিতীয়টি হইতেছে বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তি।"

ইহা শুনিয়া সকলেই জিজ্ঞাসা করিবেন, আমাদের অন্তর রাজ্যে অন্তরাত্মার সন্নিবেশ ব্যবস্থা জনে জনে এত অসদৃশ ও বিভিন্ন হইল কেন, যাহার জন্য একজনকে শুধু শরীর রক্ষা ও বংশবৃদ্ধি করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইল, আর অন্য জন সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানের সাহায্যে ঘোড়দৌড়ের বাজি জিতিয়া বিনা পরিশ্রমে তালুক মুলুক কিনিয়া রাজার হালে সারা জীবন কাটাইয়া দিল? উত্তরে মেটারলিংক স্পষ্টবাক্যে বলিতেছেন—"This activity obeys rules of which we know nothing. It wouid seem to be purely accidental," ইহার ভাবার্থ হইতেছে —সেটা আমাদের বরাৎ।

মেটরলিংকের এই অদৃষ্টবাদের দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে আমাদের বুঝিয়া রাখা প্রয়োজন যে মেটরলিংক যে সর্ব্বজ্ঞ অন্তরাত্মার কথা বলিয়াছেন, সেই অন্তরাত্মা আমাদের শাস্ত্রে কথিত নিত্য, সর্ব্বগত, সর্ব্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন, অণু হইতেও অণীয়ান্, মহৎ হইতেও মহীয়ান অন্তরাত্মার সহিত কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারেন না। কেন পারেন না, তাহা খুলিয়া বলা প্রয়োজন।

আমরা জানি আমাদের শাস্ত্রের অন্তর্যামী অ রাত্মাকে কোনই প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করেনা—"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।" অতএব সেই অন্তর্যামী দেবতা, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানের সাহায্যে, আমাদের সুখ দুঃখের অদৃষ্ট-জাল বয়নে নিত্য ব্যাপৃত আছেন, এবং কিসে আমাদের অদৃষ্টের খাতায় দুঃখের খরচ কমিয়া গিয়া, সুখের জমা বাড়িয়া উঠিবে, এই তত্ত্বেই তিনি ফিরিতেছেন,—ইহা বলিলে সেই দেবতার পরিপূর্ণ জ্ঞানের অবমাননা করা হয়। একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, সেই দেবতার পরিপূর্ণ ও অভ্রান্ত জ্ঞানে জীবের যাহা চরম মঙ্গল বলিয়া বিহিত হইতে পারে, অন্তরাত্মা সেই চরম মঙ্গলের পথেই আমাদিগকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। কিন্তু সেই চরম মঙ্গল কি? ডার্ব্বি সুইপের বাজি জেতা, না মুষ্টিযুদ্ধে জয়ী হওয়া? আমাদের ভ্রান্ত অদূরদর্শী বুদ্ধি সাধারণতঃ যাহাকে সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহাই যে পরিপূর্ণ ও পরম জ্ঞানেও আমাদের চরম মঙ্গল বা অমঙ্গল বলিয়া অবধারিত হইবে, এমন কোন্ কথা আছে? তাহা যদি হইত তবে কবির সুদূরদর্শিপ্রতিভা কি বলিতে পারিত,

"আমি সুখ ব'লে দুঃখ চেয়েছিনু,
তুমি দুঃখ ব'লে সুখ দিয়েছ।

অতএব যদি পরিপূর্ণ জ্ঞানময় অন্তরাত্মা আমাদের অদৃষ্টের বিধাতা পুরুষ হয়েন, তবে দুর্জ্জেয় হইবে তাঁহার বিধান, যাহাকে শুভাশুভ অদৃষ্ট বলিয়া আমরা অধিকাংশ স্থানেই চিনিতে পারিনা।

এইজন্য কোনও দেশে, কিংবা কোনও কালে কেহই অভ্রান্ত পরিপূর্ণ জ্ঞানকে আমাদের অদৃষ্ট দেবতা বানাইতে পারেন নাই। কারণ আমরা যাহাকে সচরাচর শুভাদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট বলি, তাহা আমাদের মায়া-কল্পিত ও অবিদ্যা-কলুষিত অদূরদর্শী ও সঙ্কীর্ণ ভ্রান্ত দৃষ্টিতে অবধারিত শুভাশুভ মাত্র। এবং সেই শুভাশুভের বিধাতা পুরুষ যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই সর্ব্বজ্ঞ ও পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষ হইবেন না, তিনি আমাদের ন্যায় ভ্রান্ত, সংকীর্ণ, মায়া পরিধির মধ্যেই অবস্থিত পুরুষ হইবেন। সেই জন্য গ্রহাচার্য্য একাদশ বৃহস্পতির প্রভাব বর্ণনা কালে, মিথ্যা মোকদ্দমার জিৎ, ঘুষের দ্বারা টাকা রোজগার, নিরপরাধ বিপক্ষের শিরশ্ছেদ প্র ঙ্গকেও সেই প্রভাবের অন্তর্গত চলিয়া বর্ণনা করেন। এবং সেই গ্রহরাজ যদি প্রকৃত মঙ্গলের নিকষে কষিয়া এবং চরম তত্ত্বজ্ঞানের বাজারে যাচাই করিয়া জাতকের সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেন, তবে এক কালে সেই সেই শুভতম গ্রহ ও সেই গ্রহের শুভানুধ্যায়ী আচার্য্য একত্রে মাটী হইয়া যাইতেন। এবং ঠিক্ এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, আমাদের কর্ম্মবাদ বলিয়াছেন যে অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞনই হইতেছে অ মাদের শুভাশুভ অদৃষ্টের রচয়িত্রী, এবং অবিদ্যা ও মায়ারাজ্যের বাহিরে জীবের কানই শুভাশুভ অদৃষ্ট নাই। কিন্তু কর্ম্মবাদের কথা পরে বলা প্রয়োজন হইবে।

তাহার পরে আমরা দেখিতে পাই, কোনই পরিপূর্ণ ও সত্য জ্ঞানের নিদর্শন অনুসারে মেটরলিংক তাহার সর্ব্বজ্ঞ অন্তরাত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন নাই। এই জন্য তাঁহার অন্তরাত্মার সর্ব্বজ্ঞতা কোনই সত্য ও অবিতথ সর্ব্বজ্ঞতা হয় নাই, তাহা বুদ্ধিবোধিত সসীম জ্ঞানের এক অতীন্দ্রিয় সংস্করণ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু ভ্রান্ত বুদ্ধির অনুরোধী অতীন্দ্রিয় জ্ঞান মাত্রই কখনই সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান হয় না। যে জ্ঞানের মধ্যে কোন ভুল ভ্রান্তিরও অবসর আছে তাহা নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান নহে। কারণ ভ্রান্তি ও মিথ্যা ধারণাই হইতেছে সর্ব্বজ্ঞতার অল্পজ্ঞতা, তাঁহার "Illimitablle"এর limit, তাঁহার universal প্রাদেশিকতা।

ইহা ব্যতিরেকেও, পাঠক দেখিতে পাইবেন, কোনই বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম বিদ্যার নিদর্শনক্রমে তিনি তাঁহার বুদ্ধ্যাতীত অন্তরাত্মার উপলব্ধিতে উপনীত হয়েন নাই। তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার উক্তির মধ্যেই পাইয়া থাকি। "We have given names to the manifestations of the unconscious soul, and

we have called them instinct, unconscious-subconsciousness, reflex action, presentiment, intuition etc." এখন বিচার করিয়া দেখুন, যে জ্ঞানের "manifestations" হইতেছে instinct বা reflex action বা intuition প্রভৃতি, সেই জ্ঞান কি কোনও ন্যায় অনুসারে তাঁহার কল্পিত অদৃষ্ট-দেবতার পদবী গ্রহণ করিতে পারেন? তাঁহার অন্তরাত্ম পুরুষকে অদৃষ্ট-দেবতা হইতে হইলে, তাঁহাকে আমাদের প্রত্যেক খুটীনাটির, প্রত্যেক নৈসর্গিক ও সামাজিক অবস্থা সকলের নিত্য পরিবর্ত্তনের, আমাদের প্রতিদিনের লাভ ও লোকসানের, আমাদের বাসনা ও কামনা সকলের "নিতুই নব" আকাঙ্ক্ষার, এবং প্রতিদিনের পরিবর্ত্তনশীল ফ্যাসান ও আব হাওয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান রাখিতে হইবে। তাহা না-রাখিলে, তিনি কোনও অর্থেই আমাদের অদৃষ্টদেবতার যোগ্য হইবেন না, অর্থাৎ অদৃষ্ট দেবতার যে ধারণা আমাদের মেটরলিংক দিয়াছেন সেই ধারণা অনুসারে তাঁহার অন্তরাত্ম পুরুষের জ্ঞান এক নিত্য বিবেচনক্ষম জ্ঞান—"a perpetually discrimniating knowledge"—অবশ্যই হইতে বাধ্য। কিন্তু সেই জ্ঞানের তিনি যে সব "manifestations" উল্লেখ করিতেছেন instinct, reflex action প্রভৃতি, তাহারা কি সেই জাতীয় বিবেচনক্ষম (discriminating) জ্ঞান? না, তাহারা উলটা ক্রম স্বরূপতঃ অবিবেচনক্ষম জ্ঞান বলিয়াই instinct, intuition প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়া থাকে? মেটরলিংক কদাচিৎ বলিয়াছেন অন্তরাত্মার অসীম জ্ঞান হইতেই আমরা শরীর রক্ষা ও বংশ-বৃদ্ধির প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সেই প্রেরণা কি সর্ব্বদাই আমাদের হিতাহিত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক আমাদিগকে কর্ম্ম প্রণোদিত করিয়া থাকে? তাহা যদি হইত, তবে এক শুভকামী অদৃষ্ট দেবতা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া কামুক কখনই কুৎসিত রোগাক্রান্ত হইত না, কিংবা বালক মৌমাছির কামড় হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া, reflex action দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িত না। অতএব কোনও যে বিবেচনক্ষম অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সর্ব্বদাই আমাদের শুভার্থে আমাদিগকে শরীররক্ষার্থে কিংবা বংশবৃদ্ধি করিতে প্ররোচিত করিতেছে, ইহা বলা যায় না।

শুধু তাই নহে। গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ আত্মপুরুষকে মস্তিষ্কের শিরা-শক্তির মধ্যেও চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"We credit the unconscious soul with the indeterminate and prodigious force contained in those of our nerves that do not directly serve to produce our will and reason"—অর্থাৎ "আমাদের মস্তিষ্কের শিরা-তন্ত্র বিধানের মধ্যে যে সকল শিরাতন্ত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইচ্ছা-শক্তি ও স্ফুট জ্ঞান-ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে, অথচ যে সকল শিরাতন্ত্রর মধ্যে অনির্দ্দেশ্য বিপুল শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, আমরা সেই অনির্দ্দেশ্য শিরা শক্তিকেই অন্তরাত্মার বিপুল জ্ঞানশক্তি ও ঐশ্বর্য্য শক্তি বলিয়া থাকি।" ইহাকে অবশ্যই সম্পূর্ণ অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার বলিতে হইবে। কারণ সসীম মস্তিষ্কের শিরা শক্তিই হইতেছে অন্তরাত্মার অসীম জ্ঞানশক্তি, এবং সেই জ্ঞানশক্তি, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর প্রদেশে, সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া অতীন্দ্রিয় ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিতেছে, কোনরূপ জড়ের ব্যবধানে ব্যহিত হইতেছে না, দেশ কালে সর্ব্বথা অপরাহত ভাবে অবস্থিত হইয়াছে—ইহা বলা অবশ্যই সুন্দর কাব্য হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই কোন বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক-বিদ্যা নহে।

মেটারলিংকের কথিত সর্ব্বজ্ঞ অন্তরাত্মা স্বরূপ অদৃষ্ট-পুরুষের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন-কল্পে আশা করি ইহাই যথেষ্ট।

৩

তথাপি কবি ও মনীষী মেটরলিংক তাঁহার বিপুল প্রতিভার দৃষ্টিতে যতটুকু প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার কোনই অপলাপ হইতে পারে না। কারণ মনীষী যাহাকে তাঁহার নিজের "বোধের" মধ্য দিয়া প্রাপ্ত হয়েন তাহা হইতেছে বিতথ মহাসত্য। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার অবিতথ বোধের উপর নির্ভর করিয়া কোন অভিনব "থিওরি" গড়িয়া তুলিতে চাহেন তখন তাঁহার সেই মন-গড়া "থিওরি" সত্য নাও হইতে পারে।

আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি মেটরলিংক প্রত্যক্ষ ক্রমে অনুভব করিতেছেন যে আমাদের বুদ্ধি-বোধিত ও

দেশ-কালে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মধ্যেও কচিৎ কখনো এক অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায় এবং সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের আভাস ও ইঙ্গিত দ্বারা উপকৃত হইয়া আমরা কখনো কখনো কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হই। এইটুকু মাত্র তাঁহার খাঁটি অনুভব—এবং এই অনুভবের বাহিরে তিনি যে এক সর্ব্বজ্ঞ আত্মপুরুষ ও অদৃষ্টদেবতা ঘটিত কাহিনীর রচনা করিয়াছেন, সেটি তাঁহার কল্পনা-শক্তির ফল।

এ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের কথা আমাদের দেশেও বহুকাল হইতে সুবিদিত। কিন্তু তজ্জন্য কখনই কোন শাস্ত্রকার আত্ম-পুরুষ বা অদৃষ্ট-দেবতাকে উৎপীড়ন ও হায়রাণ করেন নাই। কিংবা এ কথাও কখনও প্রকটিত করেন নাই যে ঐ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হইতেছে একজন লুক্কায়িত অদৃষ্টদেবতার ধার করা জ্ঞান। যোগশাস্ত্রে ঐ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অত্যন্ত সহজ ও সুগম্য কার্য্য-কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—এবং এইখানে সংক্ষেপের মধ্যে সেই কার্য্য-কারণের আভাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে আমাদের বুদ্ধি-সত্তা বা মনের মধ্যেই সর্ব্বজ্ঞতা গুণ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের বুদ্ধি সত্তা এক তমোময় "প্রকাশ-আবরণে" আবৃত বলিয়া সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। যদি কোন কারণে, অথবা জন্মান্তরীণ সংস্কার বশে, ঐ প্রকাশ-আবরণের ক্ষয় হয়, তবে সেই রন্ধ্র পথে অল্প-বিস্তর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের আভাসও আমরা পাইতে পারি। যে সকল মহা যোগিগণের বুদ্ধির প্রকাশ-আবরণের সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত।

পাশ্চাত্য রুচি অনুসারে আমরা পতঞ্জলিকে যদি নাই মানি, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু এ কথা সকলকেই মানিতে হইবে যে যোগশাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন সেটি মানিয়া লইলেই, অদৃষ্ট-দেবতা, আত্মপুরুষ, সর্ব্বশক্তিমানের স্ব-কার্য্য সাধনে অক্ষমতা, অদৃষ্টের পিছনে এক কি-জানি-কি প্রভৃতি ঘটিত এক লোমহর্ষণ উপন্যাস রচনা হইতে আমরা অতি সহজেই নিষ্কৃতি পাইব।

মেটরলিংকের দ্বিতীয় সত্য অনুভব হইতেছে এই আমাদের শুভাশুভ অদৃষ্টের প্রেরণা আমাদেরই অন্তর-রাজ্যের কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতেই উদ্ভূত হইতেছে। কিন্তু এই সত্য অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যে এক পৃথক শুভকামী অদৃষ্ট-দেবতা, তাহার অসীম ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার ক্ষুদ্র সীমা প্রভৃতি লইয়া যে কাব্য-রচনা করিয়াছেন, সে কাব্যের চারিদিকেই "গলদ্" থাকিয়া গিয়াছে।

আমাদের কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর বাদেরও অবিকল তাহাই অনুভব। কর্ম্মবাদের মতে, আমাদের অন্তরের অজ্ঞাত প্রদেশ সঞ্চিত পূর্ব্ব জন্মের শুভাশুভ কর্ম্মই এই জন্মের সুখ দুঃখ ভোগকে নিয়মিত করায়, প্রাক্তন কর্ম্মই আমাদের ইহজন্মের অদৃষ্ট স্বরূপ হইয়াছে। অর্থাৎ মেটরলিংক যে বলিয়াছেন আমাদের শুভাশুভ অদৃষ্টের প্রেরণা আমাদের ভিতর হইতেই আসিতেছে, কর্ম্মবাদও প্রকারান্তরে অবিকল সেই কথাই বলিতেছেন। কিন্তু অবান্তর "থিওরি" কল্পনাতেই উভয়বাদের মধ্যে মারাত্মক প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মেটরলিংক আমাদের অন্তরস্থিত অদৃষ্ট-দেবতার অনুসন্ধান করিতে গিয়া এমন এক পঙ্গু সর্ব্বশক্তিমান আত্মপুরুষ কল্পনা করিয়াছেন, যিনি কষ্টে-সৃষ্টে সৌভাগ্যের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইলেও, দুর্ভাগ্যের বেলায় অক্ষম বলিয়া সাফ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন। আর আমাদের কর্ম্মবাদ, সুখ ও দুঃখ বিধানকে যথাযথ ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহাদিগকে পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম শক্তির দুই পৃথক জাতীয় অভিব্যক্ত ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই দুইটি বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর বিচারসহ তাহা পাঠকের বিচার্য্য।

আমরা বিবেচনা করিয়া থাকি মেটরলিংকের এই অর্দ্ধ সত্য ও অর্দ্ধ মিথ্যা অদৃষ্টবাদের সমীচীনতম খণ্ডন হইতেছে আমাদের কর্ম্মবাদ। সেই জন্য অতি সংক্ষেপে আমাদের দেশের কর্ম্মবাদের বিবরণ দিয়া এই সমালোচনার উপসংহার করিব।

৪

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন হিন্দু-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যতম মেরুদণ্ড কোনটি, তবে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি সেই মেরুদণ্ড হইতেছে জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদ। এবং এই মেরুদণ্ডকে খুলিয়া লইলে ঐ উভয় ধর্ম্মের যাহা

অবশিষ্ট থাকে তাহা অতি সহজেই এক অসম্বদ্ধ প্রলাপ কাহিনীতে ও অপ্রামাণ্য উপন্যাস রচনায় পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়।

এই যে কর্ম্মবাদ ইহা অবশ্যই কোন তর্ককুশল ব্রাহ্মণ কিংবা শ্রমণ তাঁহার চতুষ্পাঠীর চতুঃসীমার মধ্যে বসিয়া বিশুদ্ধ কল্পনা-বলে উদ্ভাবন করেন নাই। ইহাকে ব্রহ্মণ্য ও শ্রামণ ধর্ম্মের সত্যার্থ দ্রষ্টা মহা যোগীশ্বরগণ লোকোত্তর মনীষার প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এবং এই কর্ম্ম-বাদকেই কেন্দ্রীভূত করিয়া সেই সকল মহাপুরুষগণ, দেশ কালে অপরাহত এক সনাতন সত্যধর্ম্মের বিধানকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের পরিধির মধ্যে গীতা প্রভৃতি মহাশাস্ত্র সকলে, নানা ছন্দে-বন্ধে ঐ কর্ম্মবাদেরই সত্য প্রতিজ্ঞা সকল পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে। এবং শ্রামণ ধর্ম্মের মহাগুরু ভগবান তথাগত, বোধিদ্রুম তলে ধ্যানযোগে এই জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদের অবিতথ সত্যকে স্বাধীন ভাবে পুনর্লাভ করিয়া, যে প্রথম বুদ্ধবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা এই জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদেরই কথা। যতদূর অনুমান করা যাইতে পারে, তাহাতে বোধ হয় ভগবান তথাগতের শ্রীমুখচ্যুত এই হইতেছে প্রথম বুদ্ধ-বাণী—

"অনেকং জাতি সংসারং সংধাবিস্সা পুনঃ পুনঃ
গৃহকারক! এষমান ত্বং দুঃখা জাতি পুনঃ পুনঃ।
গৃহকারকো দৃষ্টোঽসি, ন পুনর্গেহং করিষ্যসি।
সর্ব্বে তে পার্শ্বকা ভগ্নাঃ, গৃহকূটং বিসংস্কৃতম্
বিসংস্কারগতে চিত্তে, ইহৈব ক্ষয়ম্ অধ্যগাঃ॥" *

"হে শরীর-রূপ গৃহনির্ম্মাতা (চিত্ত-সত্তা)! বাসনা সঙ্কুল (এষমানঃ) তুমি, অনেক জন্ম ও (গতাগতির) সংসারে পুনঃ পুনঃ সংধাবিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখকে প্রাপ্ত হইয়াছ (জাতি=গালি)। কিন্তু গৃহকারক, এখন তোমার স্বরূপ আমি দেখিয়াছি। তুমি আর গৃহ করিতে পারিবে না। তোমার গৃহের পার্শ্বক (খুঁটী=চিত্তের পরি-পোষক "এষণা" বা "তৃষ্ণা") সকল ভগ্ন হইয়াছে, তোমার গৃহকূট (মটকা=সংস্কার সকল) বিসংস্কৃত (উজাড় করা) হইয়াছে। চিত্তের সংস্কার সকল বিসংস্কৃত বা বিধ্বস্ত হইলে এই খানেই ক্ষয়কে (সংসার-ক্ষয়কে) প্রাপ্ত হও।"

বুদ্ধদেবের এই মহা বাণীই আড়াই হাজার বৎসর ব্যাপিয়া, এবং "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ," নানা ছন্দে বন্ধে সংমূর্চ্ছিত হইতেছে।

শাস্ত্রের নিদর্শন অনুসারে এই জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদকে আমাদের ধারণায় আনিতে হইলে প্রথমে মনে রাখিতে হইবে, জীব বিচিত্র "এষণা" বা বাসনা ও কামনাবশে, শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা নিয়ত যে সকল কর্ম্ম করিতেছে, সেই কর্ম্ম হইতে অজ্ঞাত ভাবে "কর্ম্মাশয়" সকল সঞ্চিত হইতেছে। এই "কর্ম্মাশয়"কে প্রাচীন সাংখ্যজ্ঞানিগণ "বুদ্ধি ভাব" বা "বুদ্ধিধর্ম্ম" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধি-ভাব বলিবার তাৎপর্য্য এই। আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা যাহা মনোরাজ্যের অজ্ঞাত প্রদেশে সঞ্চিত হয়, তাহা স্বরূপতঃ বুদ্ধিরই এক প্রকার "ভাব" (a phenomenon or product of mind), এবং তাহাকে "বুদ্ধিধর্ম্ম" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহা বুদ্ধি সত্ত্বারই একজাতীয় "গুণ" বা "ধর্ম্ম।" অর্থাৎ যে কার্য্য-কারণ-সংঘাতে আমাদের মনঃসত্তা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বিহিত মনোবিধানের এই একটি ধর্ম্ম হইতেছে যে আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মাশয় বলিয়াও কোন কিছুর অদৃশ্য সঞ্চয় মনের মধ্যে থাকিয়া যাইবে, এবং আমাদের কোন কর্ম্মই অকালে মাঠে মারা পড়িবে না। এই কর্ম্মাশয়, বুদ্ধি ভাব প্রভৃতি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অপর নামে অভিহিত হইয়া থাক। আমাদের কর্ম্ম হইতে সঞ্জাত অদৃশ্য মানসিক সঞ্চয় কেন যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিংবা পুণ্য ও অপুণ্য নামেও অভিহিত হইয়াছে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ইহা বুঝিবার জন্য জীবের "সূক্ষ্ম দেহ" বা "লিঙ্গদেহ" কি, তাহার অগ্রে ধারণা করা প্রয়োজন।

প্রাচ্য শাস্ত্র মাত্রেই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে প্রত্যেক

* Von Lecoq মধ্য এসিয়ার মরুবালুকার মধ্যে ভূর্জ্জবল্কলে ব্রাহ্মী অক্ষরে এই লিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পালি গ্রন্থে যাহা প্রথম বুদ্ধবাণী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ইহা তাহারই প্রতিলিপি। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ ব্যাকরণ সঙ্গত সংস্কৃত ভাষা নহে, সম্ভবতঃ পালি ও সংস্কৃতের মধ্যবর্ত্তী ভাষা। পালি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে প্রথম বুদ্ধবাণী হইতেছে "গাথা"। এই শ্লোকের ধ্বনি স্পষ্টই গাথার ধ্বনি। অতএব ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে এই হইতেছে অবিকল প্রথম বুদ্ধবাণী।

জীবের মধ্যেই এক সূক্ষ্ম মনোময় বিধান আছে, যাহা স্থূলদেহের মৃত্যুতে মরিয়া যায় না, যাহা শরীরের নিবৃত্তি হইলেও নিবৃত্ত হয় না। এই চিরন্তন সূক্ষ্মতত্ত্বকে উপনিষৎ কদাচিৎ "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যা ইহাকে "লিঙ্গ" বা "লিঙ্গদেহ" নামেই সাধারণতঃ অভিহিত করিয়াছেন। সাংখ্যগণ দেখাইয়াছিলেন আমাদের অন্তর্গত অবিনাশী সূক্ষ্মতত্ত্বকে "দেহ" বা "লিঙ্গদেহ" বলা ন্যায়ানুসারে সঙ্গত হয় না,—তত্রাচ "লিঙ্গ" নামক সূক্ষ্মতত্ত্ব সাধারণতঃ যে "লিঙ্গ দেহ" নামেই অভিহিত হয় তাহার কারণ এই যে, ঐ সূক্ষ্মতত্ত্ব সর্ব্বদাই কোন না কোন দেহকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত থাকে, এবং তৃণ-জলৌকার ন্যায় এক দেহকে ছাড়িয়া অন্য দেহকে নিয়ত আশ্রয় করিয়া থাকে। এই জন্য, "তদ্বাদাৎ তদ্বারঃ" ন্যায়ানুসারে অশরীরী লিঙ্গের নাম হইয়াছে লিঙ্গ দেহ।

আমরা যাহাকে কর্ম্মসঞ্চয়, কর্ম্মাশয় প্রভৃতি বলিয়া থাকি তাহা বেদান্ত দর্শনের ভাষায় এই লিঙ্গ দেহে "সম্পরিষ্বক্ত" বা সংলগ্ন হইয়া যায়। সেই সংলগ্ন হওয়া কিরূপ ইহা বুঝাইবার জন্য সাংখ্য দর্শন একটি চমৎকার উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। কোন বস্ত্রখণ্ডে সুগন্ধি ফুল বাঁধিয়া রাখিলে সেই বস্ত্রখণ্ড যেমন ফুলের সূক্ষ্ম গন্ধের দ্বারা অধিবাসিত হয়, তেমনি লিঙ্গদেহ আমাদের "বুদ্ধিভাব" বা কর্ম্মসঞ্চয়ের দ্বারা "অধিবাসিত" হইয়া জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রস্থিত হয়।

এখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব আমাদের অদৃশ্য কর্ম্মসঞ্চয় কেন ধর্ম্মাধর্ম্ম নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। "ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাৎ অধর্ম্মেণ"—অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতেছে সেই জাতীয় কর্ম্মসঞ্চয় যে কর্ম্মসঞ্চয়ের প্রভাবে লিঙ্গদেহের দৈবাদি ঊর্দ্ধলোকে গতি হয়। এবং অধর্ম্ম হইতেছে সেই জাতীয় কর্ম্মসঞ্চয় যাহার প্রভাবে মৃত্যুকালে লিঙ্গদেহের তির্য্যগাদি অধোলোকে গতি হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মের ইহাই হইতেছে আমাদের শাস্ত্রের পরিচায়ক চিহ্ন এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিতে এই দুই বিভিন্ন জাতীয় কর্ম্ম সঞ্চয়ই সাধারণতঃ বুঝিতে হইবে।

এই যে অদৃশ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের সঞ্চয়, ইহার শক্তি জীবিত কালে অনভিব্যক্ত (latent) থাকে, কিন্তু মৃত্যুকালে ব্যক্ত (patent) হইয়া তিনটি নির্দ্দিষ্ট প্রকারে তার জন্মের উপর কার্য্যশীল হইয়া থাকে। প্রথমতঃ এই কর্ম্ম সঞ্চয়ের সমবেত শক্তির প্রভাবে, তাহার "জাতি" বা জন্ম নিষ্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রাক্তন কর্ম্মশক্তি দ্বারা সেই জন্মের আয়ু বিহিত হইবার ব্যবস্থা হয়। এবং তৃতীয়তঃ প্রাক্তন ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা জীবের সুখ দুঃখ ভোগ নিয়মিত হয়।

এই জন্য আমরা নিজেই আমাদের ভাগ্য বিধাতা, এবং আমাদের প্রাক্তন কর্ম্ম যেমন অধুনাতন জীবনের সুখ দুঃখ ভোগকে নিয়মিত করিতেছে, তেমনি অধুনাতন কর্ম্মও পরজন্মের সুখ দুঃখ বিধানকে নিয়মিত করিবে। ইহা হইতে অন্য কোন অধিকতর সঙ্গত অদৃষ্টবাদ হইতে পারে কি না, ইহা সুবুদ্ধি পাঠক বিচার করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার

THE BOYS' OWN LIBRARY ESTD 1909. CALCUTTA. YOUNG MEN'S INSTITUTE

মধ্যাহ্ন স্বপ্ন

মধ্যাহ্নে বেণুর কুঞ্জে অব্যক্ত মর্ম্মর ম্লান ভাষা
আমারে জানালো কার সুগভীর মৌন ভালবাসা।
কীচক রন্ধ্রের পুরে
অশ্রুভ-করুণ সুরে
ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিয়া উঠে তারি বুক ভাঙ্গা হা হা
শ্বসিয়া শ্বসিয়া বায়ু বহে যায়—হায় হায় আহা।

তপস্বিনী ধরণীর রুদ্র ?
পূর্ণ ফলে কি অমৃত পুঞ্জীভূত হয় পলে পলে!
জ্বলন্ত বিবর্ণাকাশে
মৃদু মেঘ স্বপ্ন ভাসে
বিরাট স্তব্ধতা মাঝে বাজে কার অনাহত বাঁশী,
নদীতট-বটচ্ছায়ে এলো কোন্ অদৃশ্য উদাসী!
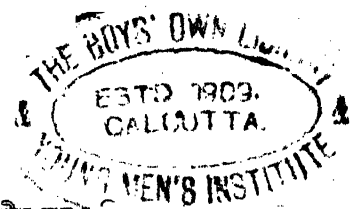
গৃহহীন হে উদাস ! সর্ব্বহারা বিবাগী পাগল !
তোমার সন্তপ্তশ্বাসে খসিয়াছে চিতের আগল।
বিচিত্র বেণুর সুরে
মরমের মণিপুরে
সঞ্চারিয়া দিলে একি সুবিপুল উদাস রাগিণী ?
ঘেরিলো আশ্লেষে ঘন, শব্দহারা সুরের নাগিনী !

স্বপ্ন-কল্পনায় মোর লাগিয়াছে দীপ্ত রবিকর,
ধ্বনিছে শিঞ্জিনী মৃদু শিশুতরু পল্লব-মর্ম্মর !
উজ্জ্বল মেঘের তলে
আবর্ত্তিয়া দলে দলে
সুতীক্ষ্ণ করুণ কণ্ঠে সকাতরে কাঁদে শঙ্খচিল
মৌন বেদনায় স্তব্ধ, প্রজ্জ্বলিত নিদাঘ-নিখিল।

হরিৎ দুর্ব্বার বুকে পতঙ্গের সচঞ্চল ক্রীড়া—
বন্য কণ্টকের কুঞ্জে কুসুমের সুকুণ্ঠিত ব্রীড়া,
দীঘির নিথর জলে
দীপ্ত-নভচ্ছায়া ঝলে,

পল্লব-প্রচ্ছায়ে ঘুঘু-দম্পতীর তন্দ্রালস গীত,
আমার কল্পনা-ভৃঙ্গে নির্দ্দেশিছে বিচিত্র ইঙ্গিত।

আজি মধ্যাহ্নের করে দিবাস্বপ্ন-ভারাতুর মন,
মনে মনে গড়ে অর্ঘ্য, অর্চ্চনার রচে আয়োজন।
দিয়া ব্যথা অশ্রুরাশি
যে পেলো বিদ্রূপ হাসি,
প্রেম মণি বিনিময়ে যে পেয়েছে তীব্র অপমান,
তারে স্মরি গাহে চিত্ত অশ্রু-শিশিরার্দ্র মৃদু গান।

আমার কল্পনা-বধূ শ্লথবেশা উদাস নির্ব্বাক
ভালো যে বেসেছে মোরে, তারি বাতায়ন তলে যাক্।
তাহার তন্দ্রার তলে
কহে যেন স্বপ্নচ্ছলে—
যারে নিত্য স্বপ্নে দেখো নিদ্রার নিতল নীরে মিশি,
তাহারি জাগ্রত স্বপ্ন হয়ে তুমি আছো অহর্নিশি।

শ্রীরাধারাণী দত্ত।

YOUNG MEN'S INSTITUTE CALCUTTA
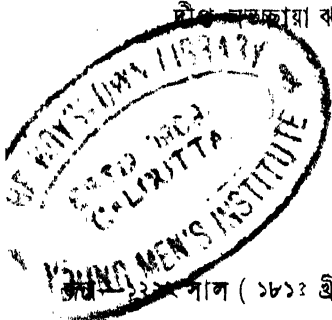
স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার

জন্ম—১২২১ সাল (১৮১৪ খ্রীঃ)
মৃত্যু—১২৬৬ সাল (১৮৫৯ খ্রীঃ) ২৭শে ফাল্গুন

শৈশব-শিক্ষা

মদনমোহনের জনক, নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রাম নিবাসী রামধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত কলেজে পুঁথিলেখকের কার্য্য করিতেন। তাঁহার পর, তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা রামরতন চট্টোপাধ্যায় ঐ পদ প্রাপ্ত হন। ইনিই প্রথমে আট বৎসরের শিশু-ভ্রাতুষ্পুত্র মদনমোহনকে কলিকাতায় আনিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। মদনমোহন ইহার পূর্ব্বে, গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুদিন পড়িয়া টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বালক মদনমোহনের কলিকাতার জলবায়ু সহ্য হইল না, তিনি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া বাটী প্রতিগমন করিলেন এবং দেশের অধ্যাপকগণের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর তিনি ১২৩৩ সালে পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। সহপাঠীরূপে অবস্থান করিয়া, উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য জন্মে। মদনমোহন তিন বৎসর কাল ব্যাকরণ ও দুই বৎসর কাল সাহিত্য-শ্রেণীতে পড়িয়া, সতের বৎসর বয়সে অলঙ্কার শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই সময়

হইতেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তি বিকাশ লাভ করিতে থাকে। অলঙ্কার শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালেই তিনি 'রসতরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কাব্য-শাস্ত্রে অসাধারণ অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপকগণ তাঁহাকে 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি প্রদান করেন। 'তর্কালঙ্কার'-উপাধি তিনি কোথায় লাভ করেন, তাহা প্রকাশ নাই।

দুই বৎসরকাল অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িয়া তিনি কিছুকাল জ্যোতিষ ও দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করেন। ইহার পর তিন বৎসর কাল স্মৃতি-শাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত, একুশ বৎসর বয়সে স্মৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্মৃতিশাস্ত্র পড়িবার সময় তিনি 'বাসবদত্তা' নামক কাব্য রচনা করেন। ১২৫০ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেন।

কর্ম্ম জীবন

সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিয়া মদনমোহন, মাসিক পনের টাকা বেতনে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট পাঠশালার শিক্ষকতা কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইহার পর, বারাসতের গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পঁচিশ টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া, এক বৎসরকাল কার্য্য করেন। এখান হইতে চল্লিশ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এখানে দুই বৎসর কার্য্য করিয়া পঞ্চাশ টাকা বেতনে কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। এক বৎসর পরে ১৮৪৭খ্রীঃ তিনি, নব্বই টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি তিন বৎসর কাল নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু, কলিকাতার জলবায়ু এবারেও তাঁহার অসহ্য হইল।

এই সময় মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে, তিনি তাঁহার শুভানুধ্যায়ী বেথুন সাহেবের সহায়তায়, ১৮৫০ খ্রীঃ মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে ঐ পদ লাভ করেন। ছয় বৎসরকাল ঐ পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি, ১৮৫৬ সাল ১০ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে, মুর্শিদাবাদ সার্কেলের বিভাগীয় জজ-পণ্ডিতের অস্থায়ী কর্ম্ম ব্যতীত, ১৮৫৬ সালের ৫ই ডিসেম্বরের ৩০৮৩ নং গবর্ণমেণ্ট আদেশমত ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন এবং কিছুকাল পরে, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। এই কান্দিতে অবস্থানকালেই তিনি ১২৬৪ সালের (১৮৫৭ খৃঃ) ২৭শে ফাল্গুন তারিখে বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকরূপে অবস্থানকালে তিনি কতকগুলি দেশহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামক মুদ্রাযন্ত্র, মদনমোহনের যত্নেই স্থাপিত হয়। ইহাতে বহু বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। তদানীন্তন শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ মহামতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব, এ-দেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন বিষয়ে প্রধান প্রধান সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে বেথুন সাহেবের সহিত মদনমোহনের আলাপ এবং অচিরেই ঘনিষ্ঠতা হয়। মদনমোহন প্রাণপণে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন বিষয়ে বেথুন সাহেবের সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"—মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ৮ম উল্লাস ৪৭শ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, সাধারণের যাহাতে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহ ও উৎসাহ জন্মে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন।

বেথুন বালিকা-বিদ্যালয়ের ভিত্তি-স্থাপনকালে মদনমোহন উপস্থিত থাকিয়া ভিত্তি ভূমিতে নবরত্ন প্রোথিত করেন। এই বিদ্যালয়ে কেহই প্রথমতঃ বালিকা প্রেরণে সম্মত হন নাই। কিন্তু মদনমোহনই সর্ব্বপ্রথম সমাজচ্যুতির কোন ভয় না করিয়া ভুবনমালা ও কুন্দমালা কন্যাদ্বয়কে, এই নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলে প্রেরণ দ্বারা পথ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতঃপর তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় আপন আপন কন্যা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। এই বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানের ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিতেন।

তখন উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ছিল না, এই নিমিত্ত তিনি পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূরীকরণার্থ তিনখণ্ড

'শিশুশিক্ষা' ও 'নীতিকথা' রচনা করেন। তাঁহার যত্নে প্রচারিত 'সর্ব্বশুভকরী' নামক মাসিক পত্রিকায় তিনি স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত—বামাগণের বিদ্যাশিক্ষা শীর্ষক এমন একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া অনেকেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ওরূপ ওজস্বিনী বাঙ্গালা রচনা তৎপূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক তিনি বহু প্রবন্ধ, এই পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মদনমোহনের এই সকল প্রচেষ্টার কথা, বেথুন সাহেবের অন্তরে সর্ব্বদা জাগ্রত ছিল। এই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া মদনমোহনের জজ-পণ্ডিতের পদপ্রাপ্তি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন।

মদনমোহন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার স্থলে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই শ্রীশচন্দ্রই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আইন (১৮৫৬ সালের ১৫ই আইন) অনুসারে ১২৫৩ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ করেন। মদনমোহন, এই বিবাহের ঘটক ছিলেন। প্রচলিত দেশাচার-বিরুদ্ধ স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ও বিধবা বিবাহ বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য, মদনমোহনের গ্রামস্থ লোক, তাঁহাকে আট নয় বৎসর কাল সমাজচ্যুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে এই সকল কারণ বশতঃ বহু নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হন নাই।

সাহিত্য-সেবা

সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শ্রেণীতে পড়িবার সময়, মাত্র পনের বৎসর বয়সে মদনমোহন, সরল ও সুমিষ্ট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সতের বৎসর বয়সে তিনি অলঙ্কার শ্রেণীতে পড়িবার সময় আদিরসাত্মক কতকগুলি উদ্ভট শ্লোকের সুললিত বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ রচনা করিয়া, "রসতরঙ্গিণী" নামে প্রকাশ করেন। মদনমোহনের ইহাই প্রথম পুস্তক। এই শ্লোকগুলির অনুবাদে ছাত্র মদনমোহনের অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রকাশ হইয়াছিল। অধ্যাপকগণ তাঁহার রচনায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সেই অল্প বয়সেই—'কাব্য-রত্নাকর' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার অনুবাদের আদর্শরূপে দুইটি সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

(১)

কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে।
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে॥
ইতি বিধির্বিদধদে রমণীমুখং।
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥

(অনুবাদ)

নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে॥
দ্বিজরাজ হীনসাজ দিবসের ভাগে॥
ইহা দেখি বিধি কৈল রমণীর মুখ।
দিবারাতি সমভাতি দৃষ্টিমাত্র সুখ॥
অতএব একেবারে বিজ্ঞ হওয়া ভার।
দেখিয়া শুনিয়া হয় নৈপুণ্য সবার॥

(২)

ইন্দীবরেন নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা
কান্তে কথং ঘঠিতবানুপলেন চেতঃ॥

(অনুবাদ)

নয়নে কেবল নীল উতপল
মুখ শতদল দিয়ে গড়িল।
কুন্দে দন্তপাঁতি রাখিয়াছে গাঁথি
অধরে নবীন পল্লব দিল॥
শরীর সকল চম্পকের দল
দিয়ে অবিকল বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে ওলো কি কারণে
পাষাণেতে তব মন গঠিল॥

এই 'রসতরঙ্গিণী' গ্রন্থের অনুবাদ হইতে আরও দুইটি স্থল উদ্ধৃত হইল—

(ক)

হেন লয় মতি বুঝি এ যুবতী
শশধর ভাতি চুরি করিল।

কিংবা সুবদনী কনক বরণী
নলিনীর শোভা হেলে হরিল ॥
নহিলে বল না কেন সে ললনা
করিয়া ছলনা মুখ ঢাকিল।
চুরি করা ধন খলিয়া তখন
বদনে বসন বুঝি ঝাঁপিল ॥

(খ)

সরোবরে বিকশিত কুমুদিনী কুল।
কিবা রূপ মনোহর নাহি সমতুল ॥
রাজহংস অত্যাচারে নাহি আর ভয়।
মৃণাল আসনে বসি গর্ব্ব অতিশয় ॥
কাল পেয়ে হয়েছে কি এত অহঙ্কার।
দিবাগমে পুনঃ তুবে হবে অন্ধকার ॥
অতএব বাড়াবাড়ি কর কার কাছে।
সময়ের গতি প্রতি বিশ্বাস কি আছে ॥
যার তেজে এত তেজ করি নিরীক্ষণ।
সেই শশী হইতেছে ম্লান প্রতিক্ষণ ॥

(২) 'বাসবদত্তা।' স্মৃতি-শ্রেণীতে পড়িবার সময় মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে, (১৮৪৪ সাল) মদনমোহন এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি, প্রাচীন কবি সুবন্ধু-কৃত সংস্কৃত গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা'র মূল উপাখ্যান অবলম্বনে, বাঙ্গালা পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচিত। মূল সংস্কৃত 'বাসবদত্তা' গ্রন্থ—শ্লেষ, যমক, উপমা, অনুপ্রাস, রূপক প্রভৃতি শব্দ ও অলঙ্কারে পূর্ণ। বাঙ্গালা অনুবাদে সেরূপ বৈচিত্র্য সম্ভবপর নহে বুঝিয়া তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করেন নাই। তবে তিনি যে সকল রসভাব যোজনা করিয়া গ্রন্থের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব। মূল উপাখ্যান অংশেও তিনি বহু স্থানে স্বকপোলকল্পিত আখ্যান সংযোগ করিয়াছেন। বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন', যোগমায়ার পূজা, ককারাদি ক্রমে তাঁহার স্তব, হিরণ্যনগর ও হরিহর দর্শন, বাসবদত্তার সহিত কন্দর্পকেতুর বিবাহ প্রভৃতি অংশ মদনমোহনের যোজনা। এই গ্রন্থে পয়ার ত্রিপদী ইত্যাদি প্রচলিত ছন্দ ব্যতীত অনুষ্টুপ, তোটক, পজ্ঝটিকা, একাবলী, দ্রুতগতি, গজগতি, কুসুমমালিকা, দিগক্ষরা প্রভৃতি অনেক নূতন ছন্দ প্রকটিত ও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে তিনি বহু রাগ রাগিণী ও নানাবিধ তাল ব্যবহার করিয়াছেন। যুবক মদনমোহন এই গ্রন্থে অনেক স্থলে, পরিণতবয়স্ক ভারতচন্দ্রের ভাব ও রচনা প্রণালীর অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে সম্পূর্ণরূপ সাফল্যলাভ করিতে না পারিলেও, তাঁহার রচনা যে রমণীয় ও বৈচিত্র্যময় হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাসবদত্তা গ্রন্থের রমণীর রূপ-বর্ণনা হইতে কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল; ইহা পাঠে ভারতচন্দ্রকে স্মরণ হইবে—

কুটিল কুন্তলে কিবা বান্ধিয়াছে বেণী।
কুণ্ডলী করিয়া যেন কাল কুণ্ডলিনী ॥
রমণী স্বরূপ মণি সদা রক্ষা করে।
তার চোরে অপাঙ্গ-ভঙ্গীর বিষে জারে ॥
ভালে ভাল বিলসিত অলকা বিলাসে।
মুখপদ্ম-মধু আশে অলি আসে পাশে ॥
শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখ সুষমা।
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা ॥
ফুলধনু ছাড়ি ধনু দেখিয়া ভ্রূ-ধনু।
অভিমানে হর হুতাশনে ত্যজে তনু ॥
নাসা বংশ নয়ন যুগল মাঝে শোভে।
যেন বৈসে শুকপক্ষী ওষ্ঠ-বিম্ব লোভে ॥
কিংবা নেত্র সুধাসিন্ধু বিভাগের হেতু।
তার মধ্যে বিধি বুঝি বান্ধিয়াছে সেতু ॥
সুদীর্ঘ নয়ন তাতে রঞ্জিত অঞ্জন।
সে চাঞ্চল্য শিখিবারে চঞ্চল খঞ্জন ॥
একে ত অসহ্য শর কটাক্ষ বিষম।
তাহাতে অঞ্জন কটু কালকূট সম।
কি কহিব অধর অধর করে বিম্ব।
অনুমানি ত্রিভুবনে নাহি প্রতিবিম্ব ॥
সে বদন-বিধু অতি পরম বিভব।
অধর-রাগেতে যেন সন্ধ্যা অনুভব ॥
কুন্দ সুকুসুম সম দশনের শোভা।
ঈর্ষ্যায় দাড়িম্ব-বীজ বুঝি শোণ-আভা ॥
হাস্যমুখী সে যখন মৃদু মৃদু হাসে।
পদ্মরাগোপরি কত মুক্তা পরকাশে ॥

শোভে ভুজমৃণাল লাবণ্য সরোবরে।
পাণি-পদ্ম প্রকাশে নখর রবিকরে॥
সুবলনী মধ্যখানি কি বাখানি তার।
আছে কি না আছে অনুমান করা ভার॥

অন্যত্র—

যথা, চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।
যথা, কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে॥
যথা, কমলিনী মলিনী যামিনী যোগে থেকে।
শেষে, দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে॥
হলো, তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়।
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়॥

সংস্কৃত ছন্দে রচিত কয়েকটি কবিতা এই—

পজ্‌ঝটিকা ছন্দঃ

শশিশেখর শিব শম্ভু শিবেশ।
কমলাকর কমলাহিতবেশ॥
পঞ্চানন গরলাসন ভীম।
গোবর্দ্ধন বন বিঘটিত সীম॥
শীতল ধরণীতল জলপাতে।
ছাড়িল বদন দক্ষিণ বাতে॥

অনুষ্টুপ ছন্দঃ

আইল নৃপবালিকা বাজিল করতালিকা।
দোলত ফুল মালিকা সা মনসিজমালিকা॥
মন্মথশিখিজ্বালিকা স্থাণুমনবিচালিকা।
কামবিশিখপালিকা মদন-হৃদয় লালিকা॥

এই স্থানে মদনমোহনের রচিত একটি সুপরিচিত পদ উদ্ধৃত হইল—

কালিয় মর্দ্দন কংস নিসূদন
কেশিমথন কংসারে।
খগপতি বাহন খেচর পালন
খিন্ন-খল বল হারে॥
গোকুল গোলোক চন্দ্র গদাধর
গরুড় বাহন গিরিধারে।
ঘন ঘন ঘুঙ্গুর ঘোষক মন তনু
ঘোর তিমির সংহারে॥
চঞ্চল চম্পক চারু চটুল চর
চীর চতুর্ভুজ বৈদ্য হরে।
ছদ্ম বামন ছিন্ন রাবণ
ছলিত বলি বল শৌরে॥
জগজন জীবন জৈন জনার্দ্দন
জলদ জলজ রুচি চৌরে।
ত্রিভুবন তারক তাপ নিবারক
তরুণ তনুজিত তোয়ধরে॥
দৈত্য দল-বল- দলন দুঃখহর
দুরিত হারক দেব হরে।
নূতন নীরদ নীল কলেবর
নন্দ-নন্দন নরকারে॥
পতিত পাবন পরম কারণ
পীত পটু পট ধারে।
বল্লভ বালক বিপিন বিহারক
বংশীবট তট তীরে॥
ভুবন ভূষণ ভকতি ভাজন
ভীরু ভয় ভব তারে।
মদনমোহন মনসি মোদন
মন্দমধু মুর মান-হরে॥

(৩-৫) 'শিশুশিক্ষা' (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)—মদনমোহন বেথুন সাহেবের বালিকা-বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ এই 'শিশুশিক্ষা' তিন ভাগে রচনা করেন। প্রথম ভাগ 'শিশুশিক্ষা' বেথুন সাহেবের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তৎকালে শিশুগণের পাঠোপযোগী প্রণালীবদ্ধ ভাল পুস্তক ছিল না। মদনমোহনই সর্ব্ব প্রথম নূতন প্রণালীসম্মত এই গ্রন্থগুলি রচনা করিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন। প্রথম ভাগে—অসংযুক্ত বর্ণ এবং দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগের শেষে অসংযুক্ত বর্ণে রচিত প্রসাদগুণ সম্পন্ন—'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' ইত্যাদি কবিতা সর্ব্বজনবিদিত। তৃতীয় ভাগ 'শিশুশিক্ষার' প্রবন্ধের বিষয়গুলি যেমন শিশুশিক্ষার উপযোগী, রচনাও সেইরূপ সুমধুর।

(৬) 'সর্ব্বশুভকরী'—স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে, মদনমোহন ও তাঁহার বন্ধু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উভয়েই, বেথুন সাহেবের যথেষ্ট সহায়তা করিতেছিলেন। এই নিমিত্ত হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল দলের

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ইংরাজী স্বাক্ষর

সংবাদপত্রাদিতে তুমুল আন্দোলন হইতে থাকে। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধু মদনমোহনকে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিয়া প্রবন্ধাদি রচনা ও তৎসমুদয় প্রকাশিত করিতে পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শের ফলে ১৮৫০ খ্রীঃ 'সর্ব্বশুভকরী' মাসিকপত্রের উদ্ভব হয়। এই পত্রের সহিত উভয় বন্ধুই বিশিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু ইহার সম্পাদনভার মদনমোহনের উপর ন্যস্ত ছিল এবং মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির নামে 'সংস্কৃত যন্ত্র' হইতে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইত। পত্রিকার আকার মাত্র আট দশ পৃষ্ঠা পরিমিত ছিল—মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা মাত্র। মদনমোহন জজ-পণ্ডিত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ গমন করিলে, এই পত্রিকখানি লুপ্ত হইয়া যায়। 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রে শৈশব-বিবাহ, বামাগণের বিদ্যাশিক্ষা, সুরা সেবন নিষেধ, গঙ্গাযাত্রা মৃত্যু, চড়ক পূজা ও পার্ব্বণ, মানবগণের সমত্ব প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত মদনমোহনের 'বামাগণের বিদ্যাশিক্ষা' প্রবন্ধের প্রশংসার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

'সুধীরঞ্জন'-পত্র, মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিদ্বয় প্রসঙ্গে, বঙ্গভাষাকে দিয়া, ইংরাজী ভাষার প্রতি গর্ব্ব করিয়া বলাইয়াছেন—

কবির অভাব কিসে দেখিলে আমার।
দুই জন আছে দেশে বিখ্যাত কুমার॥
সুকবি সুন্দর মম মদনমোহন।
পড়িলে কবিতা তার মুগ্ধ হয় মন॥
প্রাণের ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকর কর।
ধরিয়াছে কিবা দিব্য শক্তি মনোহর॥

কিন্তু মদনমোহন এত কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হইয়াও, জজ-পণ্ডিতের পদ-গ্রহণের পর অবধি যে ছয় বৎসরকাল জীবিত ছিলেন, সেই সময় মধ্যে তিনি গ্রন্থরচনার কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই ইংরাজী ভাষা বঙ্গভাষার প্রতি বলিয়াছিল—

ভাল আশা করিয়াছ মনে।
বাড়াবে তোমার মান এরা দুই জনে॥
এতদিন কি গো তুমি করনি শ্রবণ।
মদন কবিতা আর করে না রচন॥
ক্রমে ক্রমে তার বড় বাড়িতেছে পদ।
তোমায় ভাবিছে মনে বালাই আপদ॥
তোমার ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা রচক।
লোকের হিতের হেতু লেখক পুস্তক॥

মদনমোহন অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের সংশোধন ও মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন। যখন এদেশে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার তাদৃশ প্রচলন ছিল না, তখন তিনি গদ্যে ও পদ্যে উৎকৃষ্ট রচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষাতেও অনেক সুমধুর ও সুললিত কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

শেষ

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই মদনমোহন তাঁহার পত্নীকে বলিয়াছিলেন—"তুমি কেঁদো না। তোমার চিরসহায় তোমাকে ফেলিয়া পলায়ন করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার প্রাণসখা ঈশ্বর (পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) তোমায় নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দিবেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তুমি ও তোমার কন্যাগণ কোন কষ্ট পাইবে না। ** আমি তোমাদের নিকট এই ভিক্ষা চাই, যেন প্রশান্তভাবে মরিতে পাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে যেন আমায় শয্যা হইতে নামান না হয়।"

মৃত্যুকালে তাঁহার বৃদ্ধা জননী, পত্নী ও অনেকগুলি সন্তান বর্ত্তমান ছিল। 'আর্য্যদর্শন'-সম্পাদক এবং 'গ্যারিবল্ডি' 'ম্যাট্‌সিনি' প্রভৃতি চরিতাখ্যায়ক স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম-এ মহাশয় মদনমোহনের এক বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।*

শ্রীশিবরতন মিত্র।

* লেখকের অচির-প্রকাশ্য "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" নামক বঙ্গভাষার পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের বর্ণানুক্রমিক চরিতাভিধানের জন্য লিখিত প্রবন্ধ।

পাথর-পুরীর পথে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দেড় মাইল ব্যাপী প্রকাণ্ড পাহাড় খুদিয়া এই বৃহদাকার পাহাড় পুরী প্রস্তুত হইয়াছিল। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন তিনটী ধর্ম্মের বিশেষ বিশেষ লীলা অতীতের স্মৃতি চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মনুষ্যহস্তে ও প্রকৃতির ঝঞ্ঝাবাতে শিল্পবৈভব এখন মলিন। তবুও অবাক হইয়া থাকিতে হয়, ইহা কি সত্যই আমাদের মত মানুষেই প্রস্তুত করিয়াছিল? অজন্তার গুহাশ্রেণী লোকচক্ষুর অন্তরালে, নিভৃত নিরালায় যেন শুধু ভগবৎ-উপাসনার জন্যই সু-উচ্চ পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে গঠিত হইয়াছিল।

ইন্দ্রসভা—ইন্দ্রাণী

কিন্তু ইলোরা যেন শিল্প ঐশ্বর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া মানুষকে মুগ্ধ করিয়াছে, বিস্মিত করিয়াছে, ও আহ্বান করিয়া যেন কহিতেছে, 'মানুষ, তুমি কত শক্তিশালী তাহা ভুলিয়া থাক কেন? তুমি ইচ্ছা করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পার। চাই একতা, চাই নিজের উপর নির্ভরতা।'

হিন্দুধর্ম্মের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-নিকেতন কৈলাস রামেশ্বর ও সীতাকী নহানী কৈলাসের প্রবেশ পথে লক্ষ্মী মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুটী হস্তী কলসী লইয়া জলধারা ঢালিতেছে, লক্ষ্মী দেবী চারিপার্শ্বে কড়ি শাঁখ লইয়া কমলাসনে উপবিষ্টা।

কৈলাস, রামেশ্বর ও সীতাকী নহানীতে পর্ব্বত কাটিয়া স্তম্ভ, মন্দির, তিনতলা দালান, ছাদ গৃহ, পয়ঃপ্রণালী, প্রাঙ্গণ, চত্বর, গেট সকলই প্রস্তুত হইয়াছে। সে বিশাল গগনস্পর্শী শিল্প-ঐশ্বর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। প্রকাণ্ড দালানের ভিত্তিগাত্রে স্থান নাই—পৌরাণিক লীলার নানামূর্ত্তি নানা ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। এই মূর্ত্তিগুলি বৃহদাকারে গঠিত। কৈলাস শিব-লীলায় পূর্ণ। দশ অবতার, শিববিবাহ, রাবণের কৈলাস উত্তোলন প্রভৃতি নানা ভঙ্গীতে গঠিত। পাঁচটী মন্দির একসঙ্গে গঠিত। এই পাঁচটী মন্দির যেন হস্তিযুগল ও সিংহগণ বহন করিয়া আছে। বৃহৎ মন্দির মধ্যে বৃহদাকার শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। মূর্ত্তিটীর অঙ্গে পূজা অর্চ্চনায় ক্ষীণ চিহ্ন এখনও যেন আছে বলিয়া মনে হইল। রক্ষক বলিল সে মহাদেবের নিকট প্রতি রাত্রে দীপ দেয়। কিছু চাহিল, কিঞ্চিৎ দিলাম।

নাটমন্দিরের সিলিংয়ে সুন্দর চিত্রাবলীর চিহ্ন এখনও আছে। অজন্তার মত এখানকার গুহাশ্রেণীও চিত্রভূষিত ছিল, তাহার চিহ্ন প্রত্যেক স্থানেই আছে। বহুস্থান অগ্নিদাহে বিবর্ণ ও ধূম্র-কালিমায় লিপ্ত। দ্বিতলে ৩৬ স্তম্ভ
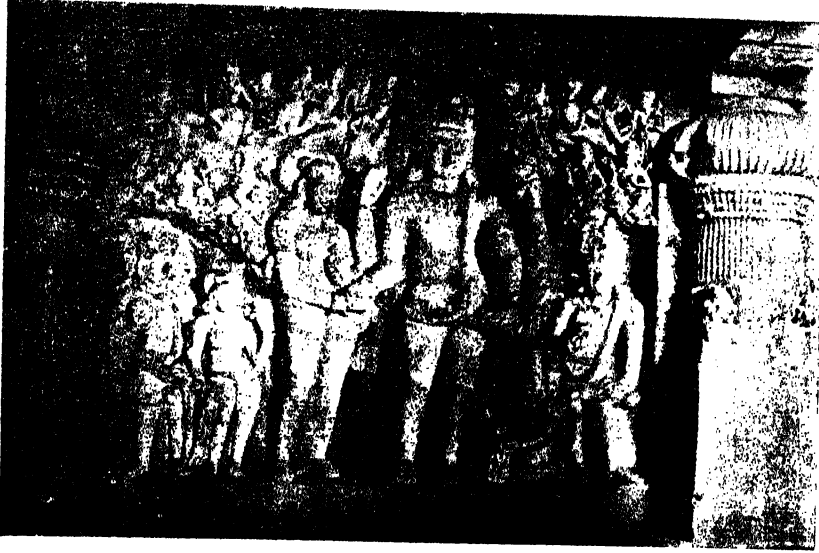
সীতাকী নহানী—হরপার্ব্বতীর বিবাহ

বিশিষ্ট প্রকাণ্ড হল। স্তম্ভগুলির কারুকার্য্য অতুলনীয়। প্রস্তর খোদিত অপ্সরা মাল্য সহ হাত দুইটী বাড়াইয়া দিয়াছে। চারি পার্শ্বে নানা ভঙ্গীর মূর্ত্তি দেখিয়া সেই শৈশব কালের উপকথা মনে হয়—কাহার যেন অভি-সম্পাতে রাজা প্রজা সকলেই প্রস্তর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মনে হয় কে যেন লুকাইল, এখনই বুঝি দেখিতে পাইব। একটা ছমছমে ভাব মনকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। সর্ব্বক্ষণই মনে জাগে, যাহারা ইহাকে
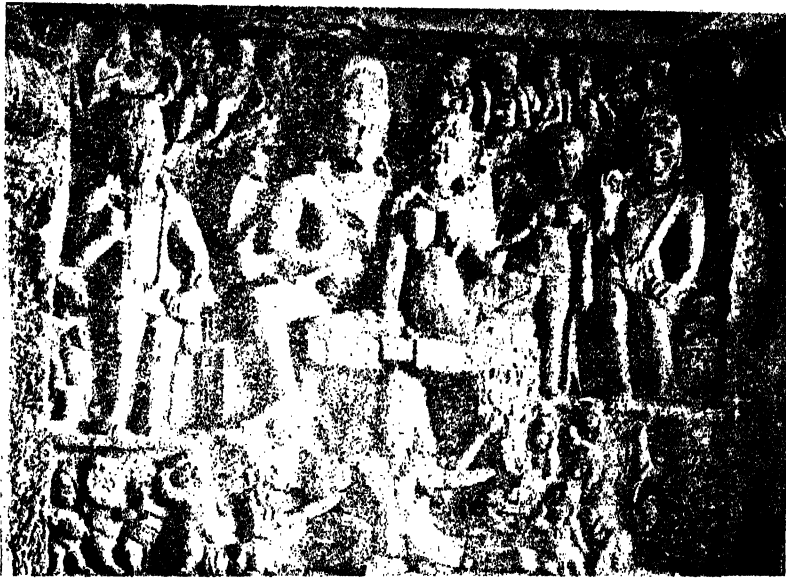
সীতাকী নাহনী—রাবণের কৈলাস উত্তোলন

সীতাকী নহানী—মহাকাল

ছিন্নভিন্ন ধ্বংস করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে, তাহারাই বা কোথায় ? কেহ কোথাও নাই। এই নির্জ্জন গৃহদ্বার, মন্দির কালের প্রতাপ কত শক্তিশালী তাহাই যেন বুঝাইয়া দিতেছে।

বলা বাহুল্য এখানেও মূর্ত্তিসকল অর্দ্ধভগ্ন, বিদীর্ণ, ক্বচিৎ কোন মূর্ত্তি ভাগ্যবশতঃ কোনও রূপে অভগ্ন থাকিয়া গিয়াছে। একটী মন্দিরে বৃহৎ শিবলিঙ্গ উৎপাটিত দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। চারিদিকেই নির্ম্মম
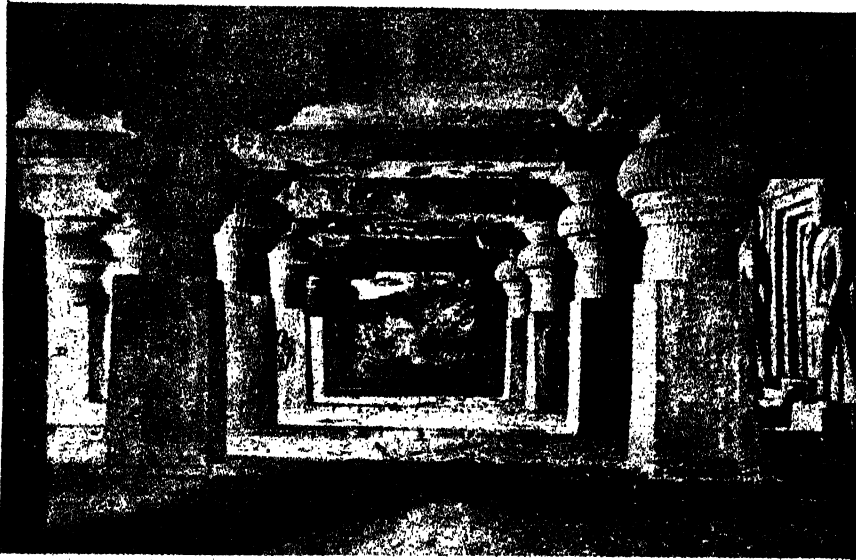
সীতাকী নহানী হল—দক্ষিণ পার্শ্বে শিবমন্দিরের দ্বারপালদ্বয় দেখা যাইতেছে। সম্মুখে জলাধারের অপরপার্শ্বে বন্ধুর পর্ব্বতগাত্র

অত্যাচারের চিহ্ন যেন জ্বল জ্বল করিতেছে। ইলোরার হিন্দুকীর্ত্তির উপর দিয়া বিধর্ম্মীর অত্যাচারের স্রোতটা বেশ প্রবল ভাবেই বহিয়াছিল। আট মাইল দূরে দেবগিরিতে মহম্মদ তোগলক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, আর মূর্ত্তিধ্বংসকারী সম্রাট আওরঙ্গজেবও জীবনের শেষ ভাগ ঔরঙ্গাবাদ ও রওজাতে অতিবাহিত করেন। এই পথটাই ছিল দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিবার পথ। ইলোরার গুহার সহিত একটী করুণ ইতিহাস জড়িত আছে। দেবগিরির শেষ রাজা হরপাল দেবের রাণী দেবলা, স্বামীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর এখানে লুকাইয়া ছিলেন, মুসলমান সৈন্য, গুহা দেখিতে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং তাঁহার জীবন দিল্লীর হারেমে অতিবাহিত হয়।

আমি শুধু ভাবিতেছিলাম সে কোন গুহা, যেখানে এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমরা বিগত ইতিহাসের কতটুকুই বা জানি! জানিনা আরও কত হৃদয়-বিদারক ঘটনা এই স্থানে ঘটিয়াছে। সর্ব্বকালদর্শী ঈশ্বর মাত্র তাহার সাক্ষী। যাক, যাহা বলিতেছিলাম। বহু পরিশ্রমে ও সাধনায় এই কৈলাসের রচনা হইয়াছিল। এখানে শিল্পী শুধু ইঞ্জিনিয়ার নয়, সাধক। এই জন্য আনন্দ, প্রীতি ও ভক্তি যেন সকল দেবমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য

রামেশ্বর—মহাদেবের তাণ্ডবলীলা

ইলোরা—তিনতালার দৌড় বারান্দা— সম্মুখে ও বামদিকে [illegible]রের স্তম্ভ দেখা যাইতেছে
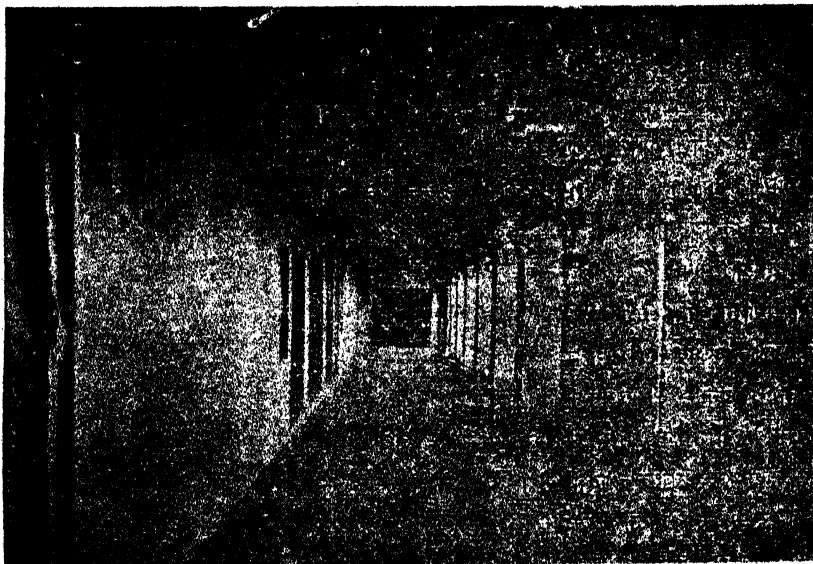
এই স্থানের বর্ণনা করা অতি সুকঠিন। প্রত্যেক মূর্ত্তির বিষয়ে তাহার ভঙ্গিমা তাহার গঠন পারিপাট্য—ইত্যাদির পৃথক পৃথক আলোচনা করিলেও বুঝানো যায় না ইহা কতখানি সুন্দর।

মন্দির গাত্রে একটি মূর্ত্তি আমরা দূরবীণ দিয়া দেখিলাম, গরুড় বিষ্ণুদেবকে বহন করিয়া উড়িয়া যেন কোথায় চলিয়াছে। গরুড়ের সুগঠিত মুখমণ্ডল আনন্দ ও তৃপ্তির হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। পৃষ্ঠাসীন দেবতা যেন বরাভয় ও স্নেহ করুণায় ভক্ত সেবককে ধন্য করিয়া নিজেও ধন্য হইয়াছেন। এখানে প্রস্তরে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আধুনিক চিত্রে তাহা আঁকিতে পারিলেও দেখিবার মত হইত! কৈলাসের সমস্ত মন্দিরটি ভিতরে বাহিরে রঙ ও চিত্র করা ছিল, এখনও সামান্য চিহ্ন অবশিষ্ট আছে। কৈলাস অষ্টম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণ নির্ম্মাণ করেন, এই রূপ কীর্ত্তি পৃথিবীতে আর কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। তাজমহল চমৎকার বটে, কিন্তু অর্থ সময় ও সখ থাকিলে, প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় কৈলাস এখনকার দিনে নির্ম্মাণ করা আর সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

ইলোরার গুহাশ্রেণীর ৩৪টী নম্বর দেওয়া হইয়াছে। কৈলাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম, সীতাকী নহানীতে মূর্ত্তি খুব বেশী নয়, কিন্তু এত বৃহদাকারে গঠিত হইয়াছে যে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এইখানে একটী সোপান-বিশিষ্ট জলাধার আছে, পর্ব্বতের জলধারা ইহাতে সঞ্চিত হইত। এই স্থানে পার্ব্বতীর বিবাহদৃশ্য খোদিত আছে, এবং মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য খোদিত আছে। কিন্তু এই শৈবলীলা নিকেতনের মধ্যে সীতার বিবাহ কল্পনা আমাদের একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমরা উহা শিব পার্ব্বতীর বিবাহ বলিয়াই ধরিয়াছি। স্থানীয় রক্ষক বলিল উহা সীতার বিবাহ এবং ঐ ক্ষুদ্র জলাশয় টুকুতে নাকি সীতাদেবী স্নান করিতেন।

আসল কথা কয়েক শত বৎসর এই সকল কীর্ত্তি চিহ্ন লোকচক্ষুর অন্তরালে বন প্রদেশের অভ্যন্তরে ঢাকা পড়িয়াছিল। বিধর্ম্মীর অত্যাচারে এখানকার ধন ও প্রাণ লুণ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা সেই ধ্বংস কাহিনী আজিও বলিয়া দেয়। তারপর রক্ষক না থাকায় ক্রমে এই বিশাল পুরী বনাকীর্ণ হইয়াছিল। মানুষ তাই এখানকার ইতিহাসটুকুও ভুলিয়া গিয়াছে। কতক গল্প কতক কল্পনা লইয়া নানারূপ নামকরণ তাই সম্ভব হইয়াছে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে এই সকল মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা সেই জন্য সমীচীন নয়।

চৈত্য—বিশ্বকর্ম্মা

এখানে বৌদ্ধ কীর্ত্তির নাম 'বিশ্বকর্ম্মার ঝোপড়া'। এই স্থানে পর্ব্বতগাত্র বহিয়া একটি ঝরণা সশব্দে দ্বিতলের বারান্দায় আসিয়া পড়িতেছে। অজন্তার মত ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি এখানে নয়। উচ্চাসনে পা দুটি ভাঁজ দিয়া বসা, হাত দুইটি যোড় করা মূর্ত্তি।

দ্বিতলে পদ্মাসনে উপবিষ্ট কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে তিনটি অসম্পূর্ণ। ত্রিতলে বৌদ্ধ বিহার ৩৬টি স্তম্ভ বিশিষ্ট প্রকাণ্ড হল। পাহাড়ের সু উচ্চ স্থানে অবস্থিত বলিয়া সেখানে আলোক, বাতাস প্রচুর। চারিদিকের দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, পথ ভুলিয়া বুঝি কোন্ স্বপ্নলোকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

জৈন কীর্ত্তির নামকরণ হইয়াছে ইন্দ্রসভা। পরেশ-নাথের মূর্ত্তি, ও ইন্দ্র শচীর মূর্ত্তি—এই সকল সেখানে আছে, ইহা ক্ষুদ্র আয়তনে গঠিত। কৈলাসের নিকট ইহা পুতুল খেলা বলিলেও চলে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আকাশ নিবিড় নীরদ-মালায় পূর্ণ। আমাদের এইবার ইলোরা দেখা শেষ করিয়া ফিরিবার সময় উপস্থিত। ইলোরার প্রাচীন নাম ইলাপুরী, একটি প্রধান তীর্থস্থান। শুনা যায় ইল্বল দানবের বাসস্থান বাতাপীপুর (এখনকার নাম বাদামী) এখানেই ছিল উহা এখান হইতে বেশী দূরে নয়।

ইলোরার কিঞ্চিৎ দূরে রাণী অহল্যাবাই প্রতিষ্ঠিত একটি জ্যোতির্লিঙ্গ শিবমন্দির আছে। সেই মন্দির অভিমুখে আমরা যাত্রা করিলাম।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীউষা দেবী।

স্বার্থ সাধন

তুমি লও, তুমি মোরে লও!
বিস্ময়ে ব্যাকুল হয়ে
আমার মুখের পানে
কেন চেয়ে রও?
এ নহে ত দান।
আমি ত আসিনি হেথা
তোমারে করিতে অপমান।
এ যে শুধু গান
তোমার তন্ত্রীর বুকে
ঝঙ্কারি তুলিবে মোর প্রাণ।

এ নহে ত দেওয়া—
এ যে শুধু পাওয়া,
নিজেরে নবীন করি'
তোমার অন্তর চাওয়া।
এ শুধু স্বার্থের আবেদন
তোমার পাত্রেতে ভরি'
আমার প্রাণের রস
আমি যে করিতে চাহি পান—
আনিবে সে নব আস্বাদন।

তুমি লও, তুমি লও,
আমার এ বোঝা তুমি লও।
আমার প্রাণের গানে
মরমের কথা তুমি কও।
তোমার কণ্ঠের সুরে
ফুটিয়া উঠুক মোর গান—
মোর প্রাণ
এ পূর্ণিমা রাতে
স্বার্থের সাধনে মোর
দিয়ে সফলতা
আপনার আন অবসান।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ।

পুরুষের ভাগ্য

(গল্প নহে)

বিজয় পিতৃবিয়োগের পর একবারে নিঃসম্বল হইয়া পড়িল। একখানা ইষ্টকালয় আর শাণে বাঁধানো ঘাটওয়ালা পুকুর ছিল, পাকা চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর ছিল, ভূমিকম্পে তাহার অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহা দেখিয়া মনে হয় বিজয়ের পিতৃ-পিতামহের আমলে তাহাদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল।

বিজয় জানিত না কেমন করিয়া তার এরূপ দুরবস্থা হইল।

বিজয়ের মা বলিতেন, "কি দুর্ভাগ্য রে আমাদের! এই দালান ও চণ্ডীমণ্ডপের ভিটা পাকা না হইলে আমরা সেই মাটিতে ডাঁটা বুনিয়া ও তরিতরকারী লাগাইয়া খাইতে পারিতাম!"

বিজয় ভাবিত—ভগবানের উপর হাত নাই, তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।

সামান্য লেখাপড়া সে শিখিয়াছিল। গ্রামের কোন ভদ্রলোক তাকে মাসে ২৲ বেতন দিয়া বাজার সরকার রাখিলেন, তার উপর খোরাকটাও পাওয়া যাইত। ইহাতে বিজয়ের সংসার চলিত না। বিজয় একলা নহে, তার মা আর দুই বোন, আর একটা বালক ভৃত্য ছিল সে তাহাদের গরু চরাইত, তাতে কিছু দুধ পাওয়া যাইত। মা বলিতেন, "গাইটাকে বিক্রী করিয়া ফেল, তাহা হইলে ভৃত্যের বেতন আর খোরাকী বাঁচিয়া যাইবে। তুমি চাকরীর চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়।" সে ভাবিত—কোথা যাইব, কি করিব, কোথায় গেলেই বা চাকরী মিলিবে? বিজয়ের মা প্রতিবেশীর পুরাতন বস্ত্র চাহিয়া পরিত, ঘরে চাউল না থাকিলে পাড়ার লোকের বাড়ীতে গিয়া তা চাহিয়া আনিত। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেকেরই দয়া হইত।

একদিন সত্যই বিজয় বাহির হইয়া পড়িল। তখন রেলের এমন বিস্তার হয় নাই। বিজয় অর্থান্বেষণ বা চাকরীর চেষ্টায় কলিকাতা যাইবে। সঙ্গে পয়সা নাই, তথাপি সে যাইবেই।

গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেল পাতা হইলেও গাড়ী তখন কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত চলিত। গ্রামের পাশের একখানা মাল বোঝাই নৌকায় উঠিয়া বিজয় কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত যাইবে। গোয়ালন্দে গিয়া নৌকা একদিন বিশ্রাম করিল, মাল যদি এখানেই বিক্রী হয়। বিজয় ছিন্নবস্ত্রে, মলিন বেশে পদ্মার তীরে বেড়াইতেছিল। এমন সময় একজন বৃদ্ধ মুসলমান তাহার পরিচয়প্রার্থী হইলেন। তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তিনি কহিলেন, "বাবা তোমার এমন দুরবস্থা হইবার কারণ দেখি না। তুমি বোধ হয় অবগত নও তোমার গুপ্ত ধন আছে। আমি রাজমিস্ত্রী, তোমার বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, আমি জানি তাহাতে বহু স্বর্ণমুদ্রা প্রোথিত আছে। বাড়ী কি আজিও অভগ্ন অবস্থায় আছে? চল তোমাকে লইয়া তোমার বাড়ী যাই।"

বিজয় বলিল, "বাড়ীর অধিকাংশ ভূমিকম্পে পড়িয়া গিয়াছিল। আমার এমন অবস্থা বা পয়সা নাই যে আপনাকে নৌকা করিয়া লইয়া যাইতে পারি।"

মুসলমান কহিলেন, "বাবা, সে জন্য চিন্তা নাই, আমিই খরচ করিয়া যাইব।"

ভীষণ গতিশীল পদ্মা ও অন্যান্য নদী বাহিয়া কয়েক দিনে তাহারা বাড়ীর ঘাটে আসিয়া পঁহুছিল। পথে আসিতে বিজয় কত স্বপ্নই না দেখিতেছিল! বাড়ী পঁহুছিয়া আগন্তুক মুসলমান তাহার জননীর কাছে গুপ্তকথা প্রকাশ করিলে জননী গৃহ হইতে সাবল, কোদালী বাহির করিয়া দিলেন। আগন্তুক ও বিজয় উভয়ে মিলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান ভাঙ্গিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরিশ্রমের পর একটা দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িল, সাবলের গুঁতায় টং চটাস করিয়া একটা শব্দ হইল। আগন্তুক আহ্লাদে কহিলেন, "প্রস্তুত হউন, এখনই তাম্রকলসী বাহির হইয়া পড়িবে।"

কলসী বাহির হইয়া পড়িল। দেখা গেল তাহা বাদশাহী সুবর্ণ আসরফিতে পরিপূর্ণ। আগন্তুক কহিলেন, "চণ্ডীমণ্ডপের পাকা ভিটায় দুই তিন কলসী শিক্কার টাকা পোঁতা আছে, তাহা যে ঠিক কোথায় আছে আমার স্মরণ নাই, সমস্ত ভিটাটা খুঁড়িলেই পাওয়া যাইবে। আজ বিশ্রামের পর আগামী কল্য উহাতে হাত দেওয়া যাইবে।"

দরিদ্র জননীর নিকট আগন্তুকের মর্য্যাদা বাড়িয়া উঠিল। তাহারা ধরাধরি করিয়া তাম্রকলসীটী জীর্ণ পর্ণ-কুটীরে নিয়া তুলিয়া রাখিল। সেই দিন আগন্তুক এক শিকল ও তালা চাবি আনিয়া, ঘরের খুটির সঙ্গে কলসী বাঁধিয়া নিরাপদে রাখিয়া দিল। সেদিন তাহারা তিন জনে রজনীতে কলসীর পাশে বসিয়া পাহারা দিয়া একরূপ বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া দিল।

পরদিন চণ্ডীমণ্ডপের ভূমি প্রায় সমস্ত খোঁড়া হইলে তনটী রৌপ্য কলসী পাওয়া গেল, তাহার ভিতরে কয়েক সহস্র শিক্কা রৌপ্য মুদ্রা। সুবর্ণ মুদ্রার ও রৌপ্য

ঐার কলসগুলি পর্ণকুটীর হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দালানের এক মজবুত ঘরে রাখা হইল। ছুতার মিস্ত্রী আনিয়া দালানের ভগ্ন কবাট সুদৃঢ় করিয়া মেরামত করা হইল। এই প্রচুর অর্থ পাইয়া রজনীতে তাহাদের নিদ্রা লোপ হইয়াছিল—কেবল চিন্তা—কেমন করিয়া তাহা রক্ষা করা যায়!

এই অসংখ্য স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্তি সংবাদ তাহারা প্রকাশ না করিলেও, গ্রামে অপ্রকাশ থাকিল না। সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল, "বিজয় রাতারাতি বড়মানুষ হইয়াছে।" এই কথা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। বিজয়কে দেখিয়া সকলে বিশেষ খাতির করিতে লাগিল। অনেকে আসিয়া বিজয়ের কাছে টাকা ধার চাহিতে লাগিল। বিজয় পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর করিত, "আমি গরীব, টাকা কোথায় পাব?" আগন্তক বিজয়কে বলিলেন, "দেখ বাবা, তুমি যে টাকা পাইয়া ধনী হইয়াছ এ কথা কাহাকেও কহিও না, টাকাগুলি অযথা ব্যয় করিও না; ইহা বাড়াইতে চেষ্টা করিও। অনাড়ম্বরে দিন কাটাইও। অন্যথা ভাগ্যলক্ষ্মী তোমাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবেন।"

বিজয় অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার এই কথাগুলি পালন করিয়াছিল। সাংসারিক জীবনে সে ভয়ানক কৃপণ হইয়াছিল। আজিও সেই মুসলমান পরিবারের সঙ্গে তাহাদের কুটুম্বিতা ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ক্রমে বিজয়ের সংসার স্বচ্ছল হইল। অনেক ভূসম্পত্তি হইল। বাড়ীতে দু' একখানা পাকা ঘর উঠিল। পুষ্করিণী সংস্কার করা হইল। বড় মানুষী চালের মধ্যে দু'টী হাতী হইল, কিন্তু ইহার ভিতরেও বিজয়ের যথেষ্ট কৃপণতা ছিল। দীর্ঘ জীবন এই দরিদ্র বিজয় প্রচুর বিভব উপভোগ করিয়া স্ত্রী, পুত্রাদি রাখিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গেল। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সে কোনও রাজ সরকারে নায়েবী কার্য্য করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহার পুত্রেরা তাহার অভাবে স্বদেশী যুগে পিতার নামে এক স্বদেশী বিদ্যালয় বহু ব্যয়ে স্থাপন করিয়াছিল তাহাতে অদ্যাপি মেট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। পুত্রেরাও পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া অর্থগুলি রক্ষা করিয়াই চলিতেছে।

আগন্তক বিদায় হইবার কালে বিজয়ের সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা তাহাকে দিতে চাহিলেন, কিন্তু সে তাহা হইতে তাহার পাথেয়াদি লইয়া বাকী সব ফেরত দিল, কিছুতেই টাকা লইল না। তার কিছুদিন পরে জননী বিজয়কে সেই মুসলমানের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। বিজয় তথায় তাঁহার বাড়ীর সকলকেই কোন উপায়ে প্রচুর অর্থ দিয়া আসিয়াছিল।

বিজয় জননীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ শ্মশানে দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, উহাও অদ্যাপি বর্ত্তমান।

৺রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

অনাগত

একলা আজি ব'সে ভাবি—
এই জীবনের শেষে,
স্বপন আমার যাবে ধুয়ে
চোখের জলে ভেসে।
দূরের তারা, চাঁদের আলো,
যারা আমার মন ভুলালো,
তাদের আলো ঘোর আঁধারে
করবে বরণ এসে॥

বাজ্‌বে বিদায়-[illegible] বাঁশী
[illegible] সুরে,
জাগ্‌বে কালের পরম পরশ
মৌন মনের পুরে।
ঘরের মায়া, পরের মায়া,
ওরা শুধু শুধুই ছায়া,
স্বপন যে সে রইবে স্বপন—
যাব আর এক দেশে॥

কুমারী মলিনা হালদার।
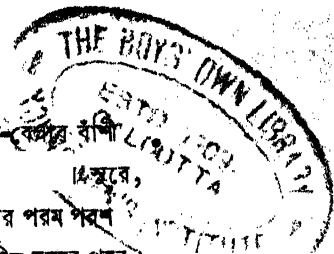
বন্ধ এবং

এই জগতে বন্ধ এবং মুক্তি এই দুইটী বিরোধী ভাব দৃষ্ট হয়। বন্ধের বিপরীত অবস্থা মুক্তি এবং মুক্তির বিপরীত অবস্থা বন্ধ। জীবের এই দুইটী অবস্থা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই দুইটী অবস্থা আপাত-দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলেও এইটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহারা পরস্পর সম্বন্ধ—ইহারা আপেক্ষিক (relative)। ইহাদিগের মধ্যে ক্রম ভাব আছে। যেরূপ শৈত্য বলিলে অল্প উষ্ণতা বুঝায়, তদ্রূপ বন্ধ বলিলে মুক্ত ভাবের হ্রস্ব পরিমাণ বুঝায়। এই জগতে পূর্ণতাও নাই—একান্ত অভাবও নাই। দুইটীর মধ্যে সম্বন্ধ থাকায় এবং দুইটিই 'ভাবের' অন্তর্গত হওয়ায় একটী অপরের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে—দুইটীই অন্যান্য-আশ্রয়ী। এখন দেখিতে হইবে এই দুইটীর মধ্যে প্রাধান্য কোনটীর। যেটীকে আমরা পরিহার করিতে চাই, যাহার নাশ আমাদের কাম্য, সেইটী অপ্রধান নহে কি? যেটির স্থায়িত্ব আমরা কামনা করি, যেটীর জন্য আমরা লালায়িত হই, তাহাই প্রধান নহে কি? সুখ দুঃখের মধ্যে আমরা দুঃখকেই পরিবর্জ্জন করিতে চাই—বন্ধ এবং মুক্তির মধ্যে আমরা বন্ধ হইতেই উমুক্ত হইতে চাই। সুখান্বেষণ যেরূপ স্বাভাবিক, মুক্তি লাভেচ্ছাও তদ্রূপ স্বাভাবিক। প্রকৃতিতে সদসদ্ভাব অর্থাৎ বিমিশ্র ভাব, আপেক্ষিকতা, থাকিলেও প্রকৃতিই আমাদের লক্ষ্য এবং গন্তব্য নিজেই দেখাইয়া দিতেছেন। তিনিই আমাদের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। তাঁহার ইঙ্গিত আমরা বুঝিতে পারি না, অথচ পাণ্ডিত্যের অভিমান করিয়া থাকি।

যদি দুঃখ অপরিহার্য্যই হইত,—যদি বন্ধের অবস্থা আমরা অতিক্রম করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে সুখস্পৃহা এবং মুক্তি কামনা আসিত কি? তাহা হইলে মুক্তির আশা অস্বাভাবিক, এবং মুক্তির চেষ্টা পণ্ডশ্রম হইত। পরম করুণাময় ভগবানের এরূপ ইচ্ছা এবং ব্যবস্থা হইতে পারে না। যাহা অসৎ, অনিত্য, তাহারই নাশ হইয়া থাকে—যাহা সৎ, নিত্য, তাহার বিনাশ নাই। বন্ধই অসৎ, মুক্তিই সৎ, মুক্ত অবস্থার বিপর্য্যয় কেহ আকাঙ্ক্ষা করে না—তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেহ বন্ধকে আলিঙ্গন করিতে চাহে না। বন্ধই যে প্রকৃতির অসৎ বা নঞ্‌ভাব, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। অন্য দিক দিয়া দেখিলেও তাহা প্রতীয়মান হইবে। আমরা কোনও বস্তুর অভাব অনুভব করিলে ঐ অভাব নিরাকরণের ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিয়া থাকি, সুতরাং সুখের অভাব যেরূপ দুঃখ, ঐরূপ মুক্ত অবস্থা হইতে বিচ্যুত হওয়াই বন্ধ। বন্ধই পরাধীনতা, পরের প্রভাব দ্বারা 'স্ব'র অবস্থান্তর ঘটা—মুক্তিই স্বাধীনতা 'স্ব' রূপে স্থিতি, আপনাকে ফিরাইয়া পাওয়া। প্রকৃতিই বন্ধের মূল, পুরুষই স্ব, স্বাধীন। পুরুষের আবদ্ধ অবস্থাই জীবাবস্থা। পুরুষ জীব হইয়াও স্বরূপ পরিত্যাগ করেন নাই, প্রকৃতির মধ্য দিয়া তাঁহার স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সেই জন্য বন্ধ অবস্থা দুঃসহ, বন্ধ হইতে আমরা মুক্ত হইতে চাই—আমরা স্বাধীনতা প্রয়াসী। প্রকৃতি আমাদের অবস্থান্তর ঘটাইয়াছেন, আমাদের ভেদসাধন করিয়াছেন—আমরা পুরুষ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতেই জীবের পুরুষ হইতে ভেদ-কল্পনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ আমরা পুরুষ। জীব এবং পুরুষে অভেদ। অবস্থান্তরই বিকৃতি-উপাধি। উপাধিটী বর্জ্জন করিলেই—খোলস ছাড়িলেই—স্বরূপ উপলব্ধি বা দর্শন ঘটিয়া থাকে। সকল জীবই পুরুষ। পুরুষ সকলেতেই অনুস্যূত হইয়া আছেন। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ।" 'উপাধিগত' হইয়া পুরুষ বহু। বহু রূপ কল্পনা মাত্র। মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির সর্জ্জন শক্তি পুরুষকে বহু করিয়াছেন—এই মায়াই অ-চিৎ অর্থাৎ অ-জ্ঞান বা অ-বিদ্যা। এই অবিদ্যা শক্তিই ভেদের মূল। অবিদ্যার আবরণ শক্তির প্রভাবে পুরুষের স্বরূপ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—আমরা স্বরূপটী ভুলিয়া যাই। অবিদ্যার বিশেষ শক্তির জন্যই আমরা জীব এবং পুরুষের অভেদ বা ঐক্য দেখিতে পাই না। জীব যে পরমার্থ দৃষ্টিতে পুরুষ হইতে অভিন্ন এবং প্রকৃতিতে অর্থাৎ বাহ্যিক জগতে আসিয়া পুরুষ হইতে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইহা না বুঝিয়া আমরা কেবল অজ্ঞানে জড়াইয়া পড়ি।

পূর্ব্বে এই ভেদাভেদ লইয়া কত তর্ক হইয়া গিয়াছে, এবং এখনও সে তর্কের বিরাম নাই। পুরুষ-বহুত্ব সংখ্যশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে (সাংখ্যকারিকা, ১৮)। এই পুরুষ যে জীব অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্যবহারিক জগতে জীববহুত্ব কোন বৈদান্তিকই অস্বীকার করেন না। অথচ এই সূত্র দ্বারাই বেদান্ত এবং সাংখ্যের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সাংখ্যকারিকা ১১ শ্লোকে পুরুষকে স্পষ্টই 'এক' বলা হইয়াছে—গৌড়পাদ সেই অর্থই করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী টীকাকারেরা সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া বৃথা গোলযোগ বাধাইয়াছেন। সাংখ্যকারিকার ১৭ শ্লোকেই "কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ" বলিয়া পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ২ শ্লোকের যিনি 'জ্ঞ', ৩ শ্লোকে তাঁহাকে 'পুরুষ', বলা হইয়াছে। ১১ শ্লোকে তিনি 'পুমান্'। তাঁহাকে ১৯ শ্লোকে সাক্ষী, কেবল প্রভৃতি বলা হইয়াছে। ১৮ শ্লোকে জীবত্বের উল্লেখ করিয়া ১৯ শ্লোকে স্বরূপত্বের বর্ণন করা হইয়াছে। এই পুরুষই পরমাত্মা, নির্গুণ, কেবল (অর্থাৎ এক)। তিনি স্বরূপতঃ 'এক' হইয়া 'বহু' হইয়াছেন (উপাধিযোগে) ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। বেদান্তবিরুদ্ধ কোন কথা ইহাতে নাই। ৬২ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে পুরুষের বন্ধও নাই, মুক্তিও নাই, সংসৃতিও নাই—তাহা হইলে জন্ম মরণ জীবে ভিন্ন কোন্ "পুরুষের" হইতে পারে? পরমাত্মা বহু একথা কুত্রাপি কোন শাস্ত্রে কেহ বলে না? তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মায়ার নিবৃত্তি এবং জীবভাব অপগত হয়, ৬৪ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। "নাস্তি ন মে নাহম্"ই মায়াবাদ। ইহা শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা প্রবর্ত্তিত নহে। উপনিষদেও তাহা আছে—পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রেও আছে—বুদ্ধদেবও তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও জীব বা ব্যষ্টি অহংভাব self, ego) কে বিনাশ এবং ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। সাংখ্য এবং বেদান্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। মুক্তি যে কি, তাহাই দেখান আমাদের উদ্দেশ্য। "স্বাধীন" বলিলে আমরা বুঝি যে যাহার উপর অন্যের কোন প্রভাব থাকিতে পারে না। অপরের সহিত সম্বন্ধ আনিতে গেলেই বন্ধ আসিবে। 'বন্ধ'ই অধীনতা—তাহার মাত্রা অল্পই হউক বা অধিক হউক। 'স্ব'র সহিত 'অন্য' ভাব যুক্ত হইতে পারে না। 'স্ব'র সহিত 'অধীন' শব্দটী ত যোগ করা উচিত নহে—স্বাধীনের প্রকৃত অর্থ স্বরূপ প্রতিষ্ঠা। মুক্তির ইহাই অর্থ—পাতঞ্জল যোগসূত্রে এই জন্য উক্ত হইয়াছে "কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি" (৪।৩৪)। সংখ্যশাস্ত্রেও মুক্তিকে 'কৈবল্য' বলা হইয়াছে (সাংখ্যকারিকা, ৬৪)—স্বরূপ প্রতিষ্ঠাকে 'সুস্থ' বলা হইয়াছে সুস্থই স্বস্থ (সাংখ্যকারিকা, ৬৫)। 'স্ব'স্থ L. suo, self, ego, আত্মা (Gr. antos), অহং। ইহাই "কেবল" (unity, absolute, oneness)। অন্যের কল্পনা আসিতে পারে না বলিয়াই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—দ্বিতীয়ের স্পষ্ট নিষেধ রহিয়াছে। এই 'এক'ই অদ্বৈত। অনেকের বিপরীত নহে, অর্থাৎ relative বা আপেক্ষিক নহে—one opposed to many নহে। এই পুরুষ বা 'স্ব'ই ভূমা—'অস্তি' বলিয়াই সৎ, জ্ঞান বলিয়াই চিৎ (consciousness)। ইনি আনন্দ-স্বরূপও বটেন। 'বন্ধ' হইতে দুঃখ, সুতরাং স্বাধীনতা যে সুখের অবস্থা, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। পুরুষ এই জন্যই 'আনন্দ' স্বরূপ—"রসো বৈ সঃ।" "দুঃখত্রয়ের নাশ"ই সাংখ্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, এবং কৈবল্যই ত্রিতাপের অবসান—"শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" যোগশাস্ত্রেও 'ক্লেশের নাশ'ই কৈবল্য বা মুক্তি। মুক্তি 'সৎ' বলিয়াই অমৃত, অর্থাৎ মরণের অতীত, অমরত্ব। এই অবস্থা হইতে পুনরাবর্ত্তন নাই। ইহা অমৃত, আনন্দও বটে। পুরুষকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইবার আবশ্যকতা নাই। প্রকৃতির সহিত তাঁহার যোগ আছে—তিনি ত প্রকৃতির ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতিতে সৎ, চিৎ, এবং আনন্দের ত বিকাশই রহিয়াছে। প্রকৃতি ত প্রতিপদেই আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন আমাদের লক্ষ্য কি, এবং আমরা কি উপায়ে উন্নতির উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারি। Nature বা প্রকৃতি হইতেই ত Nature's God প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃতি এক দিকে মহামায়া, অবিদ্যা—অন্য দিকে বিদ্যা বা বুদ্ধিরূপিণী, তিনিই ত মুক্তিদায়িনী। (কঠ, ২।৪) কালী একদিকে কালশক্তি রূপে খড়্গ হস্তে জীবের বিনাশ সাধন করিতেছেন এবং মুণ্ডমালিনী সাজিয়াছেন—অন্যদিকে তিনিই বরাভয়প্রদায়িনী—চৈতন্যশক্তির উপর অধিষ্ঠিতা হইয়া জ্ঞান অসি দ্বারা

মোহকে খণ্ডন করিয়া জীবের মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছেন—আমাদিগের পশুভাব বা বদ্ধভাব মোচন করিতেছেন।

সৃষ্টি-ব্যাপার আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভূত সমূহের অতি নিম্নস্তরে শক্তির বিকাশ অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা (activity) অল্প। যতই উচ্চস্তরে উঠিয়াছে, ততই ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্থূল অবস্থাই অচল বা স্থাবর অবস্থা। যতই ক্রিয়াশীলতার হ্রাস, ততই বন্ধনের পরিমাণ অধিক বুঝিতে হইবে। যে স্থলে গতির অবিঘাত ভাব, সেস্থলে বন্ধও অল্প। সৃষ্টির নিম্ন স্তরে চিৎ শক্তির বিকাশ অতি অল্প—উচ্চস্তরে ঐ শক্তির বিকাশ অধিক। চিৎ শক্তির সক্রিয় অবস্থাই will বা ইচ্ছা। চৈতন্যের অধিষ্ঠাতৃত্ব নিবন্ধন যে সমন্বয় শক্তি ব্যষ্টি জীবের স্থায়িত্ব সাধন করে, তাহাকে আমরা প্রাণ নামে অভিহিত করিয়া থাকি।

পুরুষই চৈতন্য, পুরুষই স্ব। যতই চিৎশক্তির বিকাশের মাত্রা বৃদ্ধি হয়, ততই স্বাতন্ত্র্য ভাব, এবং স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। স্বকীয় ইচ্ছা পরিচালনের ক্ষমতাই স্ব-তন্ত্রতা বা স্বাধীনতা। নিজের ইচ্ছাকে চালিত করিতে গেলে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়; প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম বা অপসারিত করার ক্ষমতাও জ্ঞান হইতেই জন্মে। জীবের মধ্যে মনুষ্যই জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনুষ্য যেরূপ প্রকৃতিকে আয়ত্তাধীনে আনিতে পারে, পশুপক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীব সেরূপ পারে না? মনুষ্যের মধ্যেও যাহারা সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারে নাই, তাহাদিগের অপেক্ষা, যাহারা সভ্যতা এবং জ্ঞানে উন্নত, তাহারা প্রকৃতির উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। একই সমাজের মধ্যে যাহারা জ্ঞানে অনুন্নত, তাহাদিগকে অপরের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে হইয়াছে, এবং হইবেই। তাহারা প্রকৃত স্বাধীনতার মূল্য বুঝে না, এবং দাসত্বশৃঙ্খল হইতে আপনাদিগকে উন্মুক্ত করা তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

আমাদিগের প্রারব্ধ এবং সঞ্চিত কর্ম্মের দ্বারা আমাদিগের ব্যষ্টি-অহং (individual selves), এবং ব্যক্তিগত প্রকৃতি এবং চরিত্র গঠিত হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমাদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থারও (environments) যে আমাদিগের উপর প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে, ইহাও অনেকে জানেন। পাশ্চাত্য মনীষিবর্গও তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা দাসখত লিখিয়া দিই নাই। আমরা আমাদিগের অবস্থান্তর ঘটাইতে পারি, নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে প্রতিহত এবং পরাভূত করার শক্তি আমাদিগের আছে, এবং প্রত্যহ তাহা কার্য্যের দ্বারা আমরা প্রতিপন্নও করিতেছি। আমাদিগের অজ্ঞতাই আমাদিগের অধীনতার কারণ। যতই আমাদিগের জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি হইবে, ততই আমরা প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্ব এবং নিয়মগুলি জানিতে পারিব, ততই আমরা দাসত্ব হইতে মুক্ত হইব। যে সকল শক্তির প্রভাব আমরা অনুভব করি, অথচ যাহাদিগের তত্ত্ব আমাদিগের অপরিজ্ঞাত, তাহাদিগকে আমরা 'দৈব' বলি। 'অজ্ঞাত' বলিয়াই 'অদৃষ্ট' বলি। আমরা সীমাবদ্ধ জীব—আমাদিগের ক্ষমতারও সীমা আছে,—এই জন্য দৈব প্রভাব অতিক্রম করা আমাদিগের পক্ষে অনেক সময়ে অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং আমরা দৈবকে দুরতিক্রম" বলি। পাশ্চাত্য প্রভুরাও যখন "circumstances beyond our control" বলেন, তখন সেই কথাই বলেন। কত বৈজ্ঞানিক কৌশলে "টাইটেনিয়া" জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা জলমগ্ন হইল কেন? দৈবের নিকট আমাদিগকে অনেক সময়ই পরাভব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা পুরুষকারের কার্য্যকারিতা অস্বীকার করি না। আমাদিগের সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে পুরুষকারের ভূরি ভূরি প্রশংসা রহিয়াছে, সেই সকল শ্লোক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—"নহীশ্বরঃ প্রবলতর পবন ইব জন্তূন্ প্রবর্ত্তয়তি"—ঈশ্বর প্রবল ঝটিকার ন্যায় পশুদিগকে চালিত করেন না। আমাদিগের শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই আশার বাণী, কুত্রাপি নৈরাশ্যের ক্রন্দন নাই। পূর্ণ স্বাধীনতা বা মুক্তিই আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য বলিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। "স্বাধীন ইচ্ছা" (Freedom of will) আমাদিগের নিকট কবিকল্পনা নহে—ইহা ধ্রুব সত্য। ইহাই পুরুষকার। স্বাধীনতার মূল কি, তাহা অনেক পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিৎ খুঁজিয়াই পান নাই। আমাদিগের পুরুষকার শব্দে ঐ মূলটাই কথিত হইয়াছে। জ্ঞানময়কে

লাভ না করিলে মুক্তিই হইতে পারে না। তিনি মুক্ত, এবং তিনিই মুক্তিদাতা।

সৃষ্টির অভিমুখী প্রকৃতির গতিই বহির্মুখ গতি। ইহা হইতেই বন্ধ। ইহাই প্রবৃত্তি মার্গ। ইহারই প্রভাবে আমাদিগের বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। এই বিষয়সংসর্গ হইতেই শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ অনুভূতি এবং কাম ক্রোধ প্রভৃতি জন্মে (গীতা ২।১৪; ২।৬৩; ৩।৩৪; ৫।২২; কঠ, ৬।৬)। এই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া আমরা রিপুগণের এবং প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ি। এই পথে ধাবিত হইলে আমাদিগের এবং নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের মধ্যে অল্পই প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

এই বিষয়গুলি আমাদিগের বুদ্ধিকে উপরঞ্জিত করিলে আমাদিগের বুদ্ধি কলুষিত হইয়া যায়। আমরা বহির্বিষয় হইতে যে সকল সংস্কার এবং ধারণা লাভ করি, তাহা দ্বারা আমাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ইহাই মোহ নামে অভিহিত হয়। আমাদের সংস্কার প্রভৃতির সহিত বাসনা এবং বেদনা জড়িত রহিয়াছে। বাসনা প্রভৃতির প্রভাবে আমাদের মন সর্ব্বদাই এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হয়। এই চিত্ত বিক্ষেপ (distraction) এবং চাঞ্চল্য নিবন্ধন আমাদের বুদ্ধির স্থৈর্য্য নষ্ট হয়। ইহাই মানসিক দুর্ব্বলতা। মোহ হইতে আমাদিগের বিভ্রম ঘটিয়া থাকে বলিয়াই মনুষ্যমাত্রই ভ্রমশূন্য নহে এই প্রবাদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

আমরা সকলেই নিত্যই অল্পাধিক পরিমাণে রিপুগুলির দ্বারা চালিত হইতেছি, কিন্তু সময়ে সময়ে এগুলি আমাদিগকে এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলে যে আমাদের হিতাহিত বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, এবং আমরা আত্মহারা হইয়া পড়ি। ক্রোধের বশে আমরা অপরকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠা বোধ করি না। কামের উত্তেজনায় সতী রমণীর সতীত্বহরণেও পশ্চাৎপদ হই না ইত্যাদি। এগুলি বুদ্ধিভ্রংশের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, এবং এই অবস্থা যে দুর্ব্বলতার লক্ষণ তাহা সকলেই বলিয়া থাকে। দুর্ব্বলতার নিন্দা সকলেই করিয়া থাকে, তাহাতেই বুঝা যায় যে ঈদৃশ অবস্থা অতিক্রম করার আমাদের শক্তি আছে, রিপু এবং প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করার সামর্থ্য আমাদের আছে এবং তাহাদিগকে দমন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। দমন করিতে গেলে একটী বিরোধী শক্তি আবশ্যক (counteracting force)। এইটী অন্তর্মুখ শক্তি। এইটাই পূর্ব্বোক্ত চিৎ বা জ্ঞানশক্তি। ইহাই আমাদিগকে নিবৃত্তি মার্গে চালিত করে। এই জ্ঞানই আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে আমরা প্রকৃতির অংশ জীবরূপে বিষয়পঙ্কে মগ্ন হইয়া কলুষিত হইয়া গিয়াছিলাম। আমাদিগের দৈব বুদ্ধি এই জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। সে বুদ্ধি বিষয় দ্বারা উপরঞ্জিত, এবং তাহা এই জ্ঞানের দৃশ্য। এই জ্ঞান তাহার উদ্ধারকর্ত্তা। এই জ্ঞানের দ্বারা আমাদের কলুষিত বুদ্ধি আলোকিত হইলে আমাদিগের দুর্ব্বলতা আমরা বুঝিতে পারি। এই জ্ঞানেরই উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। এই জ্ঞানই আত্মা—পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিতে যে আমাদের আত্মবোধ, তাহা অনাত্ম। এই জ্ঞান আমাদিগকে ছাড়িয়া নাই— আমাদিগের মধ্যেই গূঢ়ভাবে অবস্থান করেন।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।" কঠ ৩।১২।
শ্বেত, ১।১৫।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে জ্ঞানের এবং বুদ্ধির পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। তাঁহারা নিত্যই যে ভাষা প্রয়োগ করেন, পরীক্ষা করিলেই নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারেন। আত্মসংযম (self command, self restraint, self-control) শব্দটী দ্বারাই বুঝা যায় যে আমরা আমাদিগের ব্যষ্টি-অহংকে (individval selves) সংযত করিতে পারি। এই 'আমরা' ব্যষ্টি অহং হইতে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। প্রথমটী কর্ত্তা, যে সংযত করে—দ্বিতীয়টী কর্ম্মবাচ্য, যাহা সংযত হয়। কর্ত্তা কখনও কর্ম্ম হইতে পারে না। 'আমরা' শব্দটী বহুবচনরূপে আমাদিগকে প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ এই 'আমরা' এক ইহা জ্ঞানমাত্র। আমাদিগের সকলের মধ্যে এই জ্ঞানই 'এক' হইয়া ব্যাপক হইয়াছেন তজ্জন্যই ভাষায় বহুবচন দিয়া প্রকাশ করিতে হয়। "Self-examination" "know thyself" বলিলে এই স্বতন্ত্র জ্ঞানটী নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

এই জ্ঞানটী উদ্ভাসিত হইলেই আত্মসংযমের ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে—ইহারই ইংরাজী নাম enlightened will। জ্ঞানের সক্রিয় ভাবই will। ইহা বিষয়বাসনা

(desire) নহে। বিষয়বাসনার উচ্ছেদসাধনই এই ইচ্ছার কার্য্য। এই জ্ঞানই বন্ধন হইতে মোচন করেন। (গীতা ১০।১১; ১২।৭; ১৮।৫৮, ৬২; ১৮।৬৬)।

প্রবৃত্তি (impulse) এবং রিপুগুলির (passions) গতি কোন্ দিকে, এবং restraint এর (সংযমের) গতি কোন্ দিকে, তাহা বুঝা কঠিন নহে, তথাপি আমাদের দৃষ্টি নিবৃত্তির দিকে পতিত হয় না। সংযমের উপরই যে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত, এবং সমাজকে সংযম দিয়াই যে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে হইবে, আমরা অধুনা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। পাশ্চাত্য progress শব্দটী আমাদিগকে মোহে অভিভূত করিয়াছে।

"পরাঞ্চি যানি ব্যপমৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যত নান্তরাত্মন্।"—কঠ, ৪।১

জ্ঞানের স্বরূপ নিশ্চয়তা; জ্ঞানই সৎ সত্য,; যাহা সত্য, তাহা স্থির, অটল, ধ্রুব। যতই জ্ঞানে মনুষ্য উন্নত হয়, ততই তাহার দার্ঢ্য, স্থৈর্য্য জন্মে। এই দৃঢ়তাই strength of will। চিৎ শক্তির বিকাশ নিবৃত্তি মার্গেই বুঝা যায়। যাহার ইচ্ছার দৃঢ়তা যে পরিমাণে জন্মিয়াছে, সে সেই পরিমাণে প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিতে সমর্থ হয়। ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তাই মনুষ্যের মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল, ইহা সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

প্রবৃত্তি দমন বহু আয়াস সাপেক্ষ, কারণ প্রবৃত্তির শক্তি অল্প বা সামান্য নহে। এই জন্যই অর্জ্জুন সরলভাবে বলিয়াছেন—

বশং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥
— গীতা ৬৩৪

শ্রীভগবানও তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—

অসংশয়ং মহবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেন তু গৃহ্যতে॥
—গীতা ৬।৩৫; ২।৬০

কামের প্রভাবে মুনি ঋষিগণেরও তপোভঙ্গ হইয়াছে, ইহা আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থে সরলভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি, মাসিক পত্রিকাতে এরূপ দাবী করিয়া থাকি। দম্ভের এবং ধৃষ্টতার সীমা না আসুরিক ক্ষমতার নিকট দেবগণকেও অনেক সময় পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। বুদ্ধিরূপিণী চণ্ডীর কৃপা ব্যতীত জয়লাভের আশা নাই।

ভগবান দুইটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—বৈরাগ্য এবং অভ্যাস। প্রথমে বিষয়ের আকর্ষণ হইতে মনটীকে মুক্ত করিতে হইবে। বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে হইবে, তাহাই বিষয় বিতৃষ্ণা। এইটীই গোলযোগের কথা। পাশ্চাত্য মোহ আমরা এড়াইতে পারিব কি? আমরাও জ্ঞানেরই অহঙ্কার করিয়া থাকি, তাহা হইলে ঐ জ্ঞান দিয়াই দেখা যাউক না প্রকৃত পুরুষার্থ কি? বন্ধ কোন্ দিকে, এবং মুক্তি কোন্ দিকে দেখিলেই ত হয়। দ্বিতীয়, অভ্যাস অবলম্বন। একটী বিষয়ের পনঃ পুনঃ অনুশীলনই অভ্যাস। ইচ্ছা শক্তি হইতে প্রথমে উদ্যম এবং আয়াসের উৎপত্তি হয় (effort)। পুনঃ পুনঃ উদ্যম এবং আয়াস করিলেই (অর্থাৎ, perseverence দ্বারা) কৃতকার্য্য হওয়া যায়। তখন অভ্যাসও দাঁড়াইয়া যায় (confirmed হয়)। Habit, second nature হয়।

ইন্দ্রিয় সাহায্যেই চিত্ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, সুতরাং চিত্তকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিতে হইলে, টানিয়া আনিতে হইলে, ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহার (draw back) করিতে হয়। ইন্দ্রিগুলিকে সংযত করিলেই চিত্ত সংযত হয়, চিত্ত সংযত হইলেই বুদ্ধি স্থৈর্য্য অবলম্বন করে। চিত্তসংযম হইতে একাগ্রতা (concentration) জন্মে। বুদ্ধিকে একাগ্র করিতে পারিলেই ধ্যান, ধারণার যোগ্যতা হয়—বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং সূক্ষ্মতা আইসে, তখন সূক্ষ্ম এবং নিগূঢ় তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। (গীতা, ২।৫৮; কঠ ৩।৫)।

আমাদিগের যুবকবৃন্দ যোগের নাম শুনিলেই ভীত হয়, কিন্তু আমরা পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিলাম, তাহা যোগেরই কথা। যোগ শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীগুলির এবং উচ্চতর স্তরের ধ্যান ও সমাধির বিবৃতি আছে—কোন্ স্তরে কোন্ শক্তি আমরা লাভ করিতে পারি ইত্যাদির বর্ণনা আছে। কঠিন যোগ প্রণালীগুলি আমরা অবলম্বন করিতে না পারিলেও প্রথম সোপানে আমাদিগকে আরোহণ করিতেঃ হইবেই—নিবৃত্তি মার্গ

ব্যতীত আমাদের কোন বিষয়েই উন্নতিলাভ সুদুর-পরাহত। ইহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইতেছি।

ধীরভাবে চিন্তা না করিলে কোন বিষয় বুঝা যায় না? ধীর ভাবই স্থৈর্য্য, অর্থাৎ বুদ্ধিটীকে স্থির করিতে হইবে। বুদ্ধির চাঞ্চল্যের অবস্থায় কখনও কোন বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হইতে পারে না। বুদ্ধিকে স্থির করার অর্থই একটী বিষয়ে তাহাকে প্রয়োগ করা—বিষয়ান্তর হইতে মনকে অপসারিত করা। তাহা হইলেই বুদ্ধি-শক্তির বৃদ্ধি হয়, বিক্ষিপ্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়। এই অবস্থাতেই কোনও প্রশ্ন বা সমস্যার সমধান সহজসাধ্য হয়। প্রশ্ন বা সমস্যা যত কঠিন এবং জটিল হইবে, ততই একাগ্রতার মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে কোনও তত্ত্ব হউক না, সকলেরই তথ্য আবিষ্কার করিতে হইলে এই একই পন্থা—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" জ্ঞানান্বেষী মাত্রেই যোগী। যে নিভৃত স্থানে বসিয়া তিনি যে তত্ত্বালোচনায় নিজ প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন, তাহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, সেই স্থানই তাঁহার তপোবন। ঐ তত্ত্বই তাঁহার দেবতা। ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত ঐ দেবতার ধ্যান করিলেই, তিনি তাঁহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকটিত করেন। তখনই তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এবং তাহার জীবন সার্থক হয়। এখানে আমরা ইঙ্গিতে হিন্দুর দেবতাতত্ত্বেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম।

যাঁহাদের জ্ঞানস্পৃহা আছে, তাঁহারা জ্ঞান উপার্জ্জনের অর্থাৎ সত্যলাভের জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিতেছেন এবং করিয়া আসিয়াছেন। এখন সত্য কি এবং কি প্রণালীতে তাহাতে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই দেখা যাউক। যাহা জ্ঞান, তাহাই সত্য। সত্য এক, ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না। যদি কোন বিষয়ের আলোচনা করিয়া এক ব্যক্তি একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হন, অপর ব্যক্তি অপর একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন বুঝিতে হইবে যে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, অর্থাৎ এখনও অজ্ঞান অবস্থা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। জ্ঞানে অজ্ঞান থাকিতে পারে না—সত্যের সহিত ভ্রমের মিশ্রণ হইতে পারে না। সত্য "একমেব অদ্বিতীয়ম্", তাহাতে "দ্বিতীয়", "অন্য" বা বিরোধের স্থান নাই। সংশয় থাকিলে সত্য পাওয়া যায় না।

> ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়ঃ **
> তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে—মুণ্ডক,২।২।৮,
> গীতা, ২।৪১ ; গীতা ২।৫৬।

সত্যে পঁহুছিলেই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যষ্টিগুলির (objects) বিশেষ বিশেষ গুণ (attributes, properties) আছে, এই গুলিই ভেদের কারণ। ভেদটী উড়াইয়া না দিলে অভেদ আসিবে কিরূপে? কতকগুলি ব্যষ্টির আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহাদের প্রভাব পরিবর্জ্জন করিয়া ঐক্যের সন্ধান পাই। ইহাই "নিয়ম"। যদি এই নিয়ম অপর ব্যষ্টিগুলিতে না খাটে, তাহা হইলে পুনরায় তাহাদের ভেদের মধ্য দিয়া ঐক্যের অনুসন্ধান করি, এবং একটী ব্যাপক নিয়ম আবিষ্কার করি। এইরূপে বিশ্বব্যাপক নিয়ম বা সত্যে উপনীত হই। বিশ্বব্যাপক অর্থ যাহা প্রত্যেক ব্যষ্টিতেই খাটে। এই নিয়ম বা সত্য এক—প্রত্যেক ব্যষ্টিতে প্রযোজ্য বলিয়া আমরা ব্যাপক বলি (universal)। এই নিয়মের কদাপি এবং কুত্রাপি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না (immutable)—একই থাকিয়া যায় বলিয়া uniform, অর্থাৎ ইহার আকারের পরিবর্ত্তন ঘটে না। আমরা যখন বলি 'ক' 'খ' হইতে ভিন্ন, তখন খ, 'ক' নহে বলা হয়, অর্থাৎ not-ক। তাহা হইলে দাঁড়াইল খ = ক + অপর কিছু। এই 'অপর কিছুই not (নঙ্,) ইহাই ভেদের কারণ। ইহাকে মুছিয়া না দিলে 'খ' 'ক' হইতে পারে না। 'ক'-এ 'অপর কিছু'র যোগই প্রবৃত্তি। ঐ 'অপর কিছু' মুছিয়া দেওয়া, রহিত করাই নিবৃত্তি। ঐক্য দৃষ্টি করিতে গেলেই নঙ্ দিয়া যাইতে হইবে।

আমরা যে কথাগুলি বলিলাম, তাঁহা অনেকের নিকট অতি সহজ এবং চর্ব্বিত চর্ব্বণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা এত সহজ নহে। যে জ্ঞান বা সত্যটীর কথা বলা হইয়াছে,তাহা কি আমাদিগের হাতে গড়া—আমরা কি invent করি? আমাদিগের অজ্ঞান অবস্থায় আমরা যাহাকে পাই নাই, যাহাকে বুঝি নাই, আমাদিগের অজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায়, তাহাকে পাইয়াছি, ইহাই কি প্রকৃত ব্যাপার নহে? এই জন্যই আমরা বলি যে সত্যটী

আমরা discover করিয়াছি—যাহা প্রচ্ছন্ন এবং অজ্ঞাত ছিল, তাহাকে আবিষ্কার বা বাহির করিয়াছি। তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, সত্য এবং জ্ঞানের সত্তা পূর্ব্ব হইতেই আছে। আমরা পাই বা না পাই, তাহাতে তাহার যায় আসে কি? তাহার অস্তিত্ব আমাদের উপর নির্ভর করে না। আমাদের বুদ্ধি কলুষিত বলিয়া আজ যেটীকে বিশ্বব্যাপী নিয়ম বলিতেছি, কল্য হয়ত আমাদের বুদ্ধি আরও একটুকু পরিমার্জ্জিত হইলে সেই নিয়মটী বা সত্যটী অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক সত্যের সন্ধান পাইতেছি। নিউটনের নিয়মের পরিবর্ত্তে আইনষ্টাইনের নিয়মটী গৃহীত হইতেছে, কিন্তু তাহাতে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতেছে কি? সত্যের স্বরূপের কোন ব্যাঘাতই হয় না। এ কথা সহজ হইলেও তার্কিকের হস্ত হইতে নিস্তার নাই। তিনি বলিবেন, আমাদিগের বুদ্ধির ক্ষেত্রের অতীত বা বহির্ভূত কিছুই নাই। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান বা সত্য লাভ হইলে আকাঙ্ক্ষার শেষ হইল—যাহার জন্য স্পৃহা, তাহা পাইলে স্পৃহা মিটিল—ইহাই লক্ষ্য,—ইহাই চরম (ultimate)। কিন্তু সৎ এবং জ্ঞান (চিৎ) ultimate দেখা গেলেও কয় জন তাহা স্বীকার করেন? পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে এই সৎ, সত্য, জ্ঞানই ধ্রুব এবং এক কিন্তু Herbert প্রভৃতি কয়েকজন দার্শনিক বহু realityর সত্তা স্বীকার করেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে? Kant ব্যষ্টিগুলির পশ্চাতে ধ্রুব সত্তা আনিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে things in themsleves, transcendental objects বলিতেছেন। যদি objects বা ব্যষ্টিই রহিয়া গেল, তাহা হইলে ধ্রুব হয় কিরূপে? Hartmannও অধ্রুবের পশ্চাতে ধ্রুব আনিতেছেন, কিন্তু সেটী এক কি বহু বলিতে পারেন না। আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে ঐ "জ্ঞান", "সত্য" আদি, এবং তাহার বিকাশ ব্যষ্টিগুলির মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু অসংখ্য দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বলিয়া আসিতেছেন যে জড় হইতে চৈতন্যের উদ্ভব হয়। সাংখ্য এবং বেদান্তে ইহার প্রতিবাদ রহিয়াছে, শুনে কে, বুঝে কে? 'ধ্রুব' বলিলে নিত্য, স্থায়ী, ক্রিয়াবিহীন বুঝায়, নিত্যের বিকাশই শক্তি বা ক্রিয়া (nature), কিন্তু নিত্য, সৎটীকে দেখে কয়জন? Fichteই প্রথমে বলেন being is doing, বহু পরে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন। সত্য সর্ব্বত্র এবং সকল সময়েই অপরিবর্ত্তনীয় থাকে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, ইহা দেশ এবং কালের অধীন নহে। দেশ এবং কালই পরিবর্ত্তনের মূল, এই দুইটী দিয়াই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, দেশ ও কাল হইতেই ব্যষ্টি এবং বহুত্বের জ্ঞান হয়। 'সৎ' বা জ্ঞানের উপর দেশ ও কালের প্রভাব নাই—ইহা দেশকালাতীত। কিন্তু অনেকেই বলিয়া থাকেন যে দেশ ও কালের অতীত বস্তুর জ্ঞানই হইতে পারে না। ঐ 'সত্য' বা 'জ্ঞান' আমাদের জীব বা ব্যষ্টি বুদ্ধি হইতে পৃথক্—আমাদের বুদ্ধি দেশ ও কালে আবদ্ধ, তাহা হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। ঐ 'জ্ঞান' বা 'সত্য'ই intuition। A priori ইহা আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করে বলিয়াই আমরা ইহার দর্শন পাই। অর্থাৎ তিনি নিজেকে নিজে ধরা দেন। আমাদের অভিজ্ঞতা ব্যষ্টি বা সসীম বস্তু লইয়া—আমাদের অভিজ্ঞতা ঐ জ্ঞানে পঁহুছাইয়া দিতে পারে না—ইহা অভিজ্ঞতালব্ধ হইতে পারে না। কিন্তু কয়জন ইহা বুঝিয়া দেখে বা স্বীকার করে।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥"—কঠ,২।২৩

মুণ্ডক, ৩।২।৩; কঠ, ৫।৫; মুণ্ডক, ২।২।১০; শ্বেত, ৬। ৪; গীতা ১৫।৬।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান বা সত্য 'একং' অর্থাৎ অন্যের প্রভাব-বর্জ্জিত, সুতরাং নির্ম্মল। একটী বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সংস্পর্শেই মলিনতা আইসে। সংস্পর্শ না হইলে বস্তুটী স্বচ্ছ:বা নির্ম্মল হইবেই। আমাদের বুদ্ধি বিষয়-সংস্পর্শে মলিন, বিষয় হইতে বুদ্ধিটী আমরা যতই মুক্ত করিতে পারিব, ততই বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে, এবং নির্ম্মল জ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে। বিষয়জনিত সংস্কারগুলির হাত না এড়াইতে পারিলে বুদ্ধি ভ্রমশূন্য হইতে পারে না, এবং

সত্যদর্শনও হইতে পারে না। এই জন্য গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" (৪।৩৮)

কঠ, ৬।৯; শ্বেত, ৩।১৭, কঠ, ২।২০, শ্বেত, ৩।২০; মুণ্ডক, ৩।১।৮, ৩।১।৯।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিলাপ

সাধের তরণী ডুবে গেল মোর
অকূল সিন্ধু-নীরে,
সযতনে গাঁথা কুসুম মালিকা
লুটালো ভূমিতে ছিঁড়ে।

কক্ষে আমার জ্বেলেছিনু দীপ,
অনেক যতন করি
নিবে গেল সেই কনক আলোক,
আঁধার আসিল ভরি।

সুন্দর এক পাখী পুষেছি
সোণার খাঁচায় রাখি,
কাটিয়া শিকল খুলিয়া দুয়ার
উড়ে গেল সেই পাখী।

বেঁধেছিনু তার সোণার বীণায়
গান গাহিবার আশে—
সে তার আমার ছিঁড়ে গেল হায়,
নয়ন সলিলে ভাসে॥

শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত।

ক্ষমার আদর্শ

(গল্প)

সকাল বেলায় মোট ঘাট বাঁধিয়া শ্যামলাল তন্তুবায় যখন হাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন তাহার পত্নী নয়নতারা আসিয়া কহিল, "আজ তুমি হাটে যাইও না। গত রাত্রিতে আমি একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি।"

শ্যামলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কি স্বপ্ন দেখিয়াছ?"

নয়নতারা বলিল, "স্বপ্নে আমি যেন দেখিলাম তোমার সমস্ত চুল শাদা হইয়া গেছে, দু'টী চোখ কোটরে ঢুকিয়াছে, এই সবল সুস্থ শরীর শুকাইয়া শীর্ণ হইয়াছে—তুমি যেন কত বুড়া হইয়াছ। না প্রিয়তম! আজ তোমার কোথাও যাওয়া হইবে না।"

হঠাৎ হাসিয়া শ্যামলাল কহিল, "আজ আমি না হয় যুবা আছি—কিন্তু একদিন তো বুড়া হইব! দূর ভবিষ্যতে আমার চেহারা কেমন হইবে, স্বপ্নে ঈশ্বর তোমাকে তাহাই দেখাইয়া দিয়াছেন। এই কালো চুল একদিন সত্যই তো সাদা হইবে, এই লোহার মত সুদৃঢ় কর্ম্মঠ শরীর জরার আক্রমণে সত্যই তো একদিন কুঁজা হইয়া যাইবে। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার জন্য ভাবনা বৃথা।"

নয়নতারা কহিল, "আমার যেন কেমন আশঙ্কা হইতেছে আজ হাটে যাইলে তোমার অমঙ্গল হইবে। না না, আমার কথা শোন, আজ তুমি হাটে যাইও না।"

শ্যামলাল কহিল, "বারোখানা নূতন কাপড় বুনিয়াছি, আজ বিক্রয় করিতে হইবে। সুতা ফুরাইয়াছে—সুতা আনিতে হইবে। আজ মঙ্গলবার—আগামী শনিবার ছাড়া

আর হাট নাই। এ কয়দিন ছেলে পিলেকে খাইতে দিব কি? ঘরে তো ক্ষুদকুঁড়াও নাই।”

নয়নতারা বলিল, “সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। এ কয়দিন আমি কোন ক্রমে চালাইয়া দিব। কিন্তু আমার মাথার দিব্য, আজ তুমি কোথাও যাইও না।”

শ্যামলাল কহিল, “দূর! মেয়েমানুষের কথা যে শোনে সে গাধা। কি একটা ছাই পাঁশ স্বপ্ন দেখিয়াছে অমনি আদেশ হইল—হাটে যাইও না। কিছুই ভাবিও না আমি স্বচ্ছন্দে ফিরিয়া আসিব।”

বলিয়া প্রকাণ্ড কাপড়ের গাঁঠরী ঘাড়ে ফেলিয়া শ্যামলাল বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

নয়নতারা ঘরে বসিয়া একটা অজানা আশঙ্কায় আকুল হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল এবং দুইহাত যোড় করিয়া ললাটে ঠেকাইয়া বারংবার বলিতে লাগিল—হে ঠাকুর! আমার স্বামীর যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

পথে যাইতে যাইতে পুরাতন বন্ধু হরিদাসের সহিত শ্যামলালের সাক্ষাৎ হইল। সেও হাটে যাইতেছিল। বহুদিন পরে হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় শ্যামলাল নিরতিশয় আনন্দিত হইল। হরিদাসের বাড়ী ভিন্নগ্রামে—সেও কাপড়ের ব্যবসা করে। উভয়ে অতীত জীবনের কথা আলোচনা করিতে করিতে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল।

সমস্ত দিন হাটে কাটাইয়া, কাপড় বিক্রয় করিয়া শ্যামলাল যখন বাড়ি ফিরিবার উপক্রম করিল, তখন হরিদাস কহিল, “শোন ভাই! আজকাল পথে অত্যন্ত দস্যুভয় হইয়াছে। সঙ্গে টাকা আছে, একাকী রাত্রি বেলা পথ চলা নিরাপদ নহে। এস, আজ রাত্রিটা বাজারের কোন হোটেলে কাটাইয়া দেওয়া যাক, সকাল হইলে বাড়ি যাওয়া যাইবে।”

শ্যামলালের পত্নীর কথা মনে পড়িল। সে যদি আজ বাড়ি না ফেরে তাহা হইলে নয়নতারা অতিশয় চিন্তিত হইবে। স্বপ্ন দেখিয়া অবধি তো নয়নতারার মন ভাল ছিল না—তাহাকে এক রকম কাঁদাইয়াই সে হাটে আসিয়াছিল। বাড়ি গিয়া তাহার বিষাদমলিন মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। স্বপ্ন দেখিয়া সে যে অমূলক ভয় পাইয়াছিল, তাহা যে কিরূপ হাস্যকর ইহা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিতে হইবে। নাঃ—আজ আর কোথাও অপেক্ষা করা হইবে না—আজই তাহাকে যাইতে হইবে। কহিল, “না, আজ আমি কোথাও অপেক্ষা করিব না—আজই বাড়ি যাইব।”

হরিদাস কহিল, “পাগল হইয়াছ? দস্যুর হাতে শেষে প্রাণটা দিবে? ও সব পাগলামী ছাড়িয়া দাও। আজ চল একটা হোটেলে গিয়া আশ্রয় লওয়া যাক্।”

অনেক বাদানুবাদের পর শ্যামলাল হরিদাসের কথায় রাজি হইল।

তাহার পর বাজারের মধ্যে গিয়া উভয়ে একটা পরিচিত হোটেলে আশ্রয় লইল। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর, সের দুই চাউলের অন্ন ধ্বংস করিয়া উভয়ে যখন মাদুর আশ্রয় করিল, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। উভয়েই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল—কিছুক্ষণ গল্প গুজবের পর গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

৩

প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিতেই শ্যামলালের নজরে পড়িল হরিদাসের বিছানা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে এবং তাহার অর্দ্ধছিন্ন মুণ্ড খাটের বাজু হইতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এরূপ ভয়াবহ দৃশ্যে তাহার আপাদ মস্তক ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—সে চীৎকার করিয়া হোটেল-স্বামীকে আহ্বান করিল।

তাহার পরের ব্যাপার আর খোলসা করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। বিচারে শ্যামলালের চৌদ্দ বৎসর দ্বীপান্তরের আদেশ হইল। বিচারের সময় শ্যামলাল একটি কথাও বলে নাই—সমস্ত ব্যাপার তাহার কাছে একটা নিদারুণ দুঃস্বপ্নের মত প্রতীয়মান হইতেছিল।

আন্দামানে যাইবার পূর্ব্বে সে বলিল, “আমি একবার স্ত্রী পুত্রের সহিত দেখা করিতে চাই।”

তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। চোখের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে ছোট ছেলেটিকে কোলে লইয়া নয়নতারা যখন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন লোহার গরাদের ফাঁক দিয়া হাত বাড়াইয়া পুত্রকে স্পর্শ

করিতে গিয়া শ্যামলাল বাধা পাইল—পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল রক্তচক্ষু প্রহরী বেত উঠাইয়া জেলের নিয়ম রক্ষা করিতেছে। অশ্রুপূর্ণ লোচনে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া শ্যামলাল কহিল, "নয়নতারা, তোমার স্বপ্ন ফলিয়া গিয়াছে। কেন তোমার নিষেধ শুনি নাই! তোমাদের ছাড়িয়া আজ কোথায় চলিলাম!" বলিতে বলিতে সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নয়নতারা কহিল, "একটা যে বিপদ ঘটিবে তাহা পূর্ব্বেই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু সে বিপদ যে এমন ভয়ানক হইবে এতটা ভাবি নাই। আমি তো তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম—কেন আমার আমার কথা শুনিলে না?"

শ্যামলালের চোখ দিয়া তখনো হুহু করিয়া জল পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া যখন সে একটুখানি শান্ত হইল তখন নয়নতারা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা প্রিয়তম, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বল দেখি, তুমি খুন কর নাই? কেমন করিয়া তোমার হাতে রক্ত লাগিল?"

দেখিতে দেখিতে শ্যামলালের মুখ শ্রাবণ-নিশীথিনীর জলভারস্তম্ভিত মেঘের মতো অন্ধকার হইয়া উঠিল। হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য দুইহাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সে কহিল, "ওঃ! তুমিও আমাকে অবিশ্বাস করিলে? আর আমার কোন খেদ নাই।"

স্বামী স্ত্রীতে আর কোনও কথা হইল না। সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার জন্য প্রহরী আসিয়া নয়নতারাকে বাহির করিয়া দিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নয়নতারাকে দেখা গেল, শ্যামলাল সতৃষ্ণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যথাস্থানে বসিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, যদি বাঁচিয়া থাকি তাহা হইলে আবার দেখা হইবে। কিন্তু দীর্ঘ চৌদ্দবৎসর কাল সুদূর আন্দামানে বাঁচিয়া থাকিয়া খালাস পাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসা অসম্ভব। ততদিন কেহ বাঁচিয়া থাকে না। যে স্ত্রী এইমাত্র চোখের সামনে হইতে সরিয়া গেল, ইহজীবনে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না—এই কথা মনে করিয়া সে নৈরাশ্যে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কাহার পাপে সে এই কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে চলিয়াছে? ভগবানের রাজ্যে এ কি অবিচার! জ্ঞানতঃ সে কোন পাপ করে নাই তবে কেন তাহাকে আজ এই শাস্তি বহন করিতে হইতেছে? ইহা কি পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত?—আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার তাহার একটা জটিল প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যথাসময়ে শ্যামলাল আন্দামানে নির্ব্বাসিত হইল।

সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আর এক বৎসর পরেই শ্যামলাল দেশে ফিরিয়া যাইতে পাইবে। কিন্তু তাহার সে চেহারা আর নাই—তাহার সমস্ত চুল বকের পালকের মতো শাদা হইয়া গেছে, কঠোর পরিশ্রমে এবং মানসিক দুশ্চিন্তায় শরীর ভাঙিয়া গেছে, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে। তের বৎসর পূর্ব্বে যাহারা তাহাকে দেখিয়াছিল, এখন তাহার বর্ত্তমান শোকশীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা কিছুতেই মনে করিতে পারিবে না—এ সেই শ্যামলাল।

সে সর্ব্বদা সৎ পথে থাকিত বলিয়া কারাধ্যক্ষ তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। অন্যান্য কয়েদীদের সহিত সে বড় একটা মিশিত না। কয়েদীরাও তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে খাতির করিয়া চলিত এবং তাহার নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিত বলিয়া সকলেই তাহাকে ধর্ম্ম দাদা বলিয়া ডাকিত। সে অল্প সল্প লেখাপড়া জানিত। দেশ হইতে আসিবার সময় অনেক কষ্টে একখানি বটতলার মলাট ছেঁড়া মহাভারত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। অবসর সময় সেই খানি পড়িত। তাহার মহাভারত পাঠ শুনিবার জন্য অন্যান্য কয়েদীরাও তাহার কাছে আসিয়া বসিত।

এই সময় এক দল নূতন কয়েদী আসিল।

এই দলের মধ্যে একব্যক্তির মুখ দেখিয়া শ্যামলালের মনের মধ্যে কি একটা অস্পষ্ট স্মৃতি স্পষ্ট হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল নবাগত এই লোকটাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছে—কিন্তু কোথায় দেখিয়াছে তাহা কোন মতেই মনে করিতে পারিল না।

একদিন তাহাকে নির্জ্জন স্থানে পাইয়া শ্যামলাল কহিল, "ভাই, কি অপরাধে তুমি এখানে আসিয়াছ ?"

সে কহিল, "এবার যে অপরাধে আমি নির্ব্বাসিত হইয়াছি, বাস্তবিক সে অপরাধ আমার ছিল না। কিন্তু আমি যে অপরাধী নহি সে কথা আমি বলিতে পারিব না। বহুদিন পূর্ব্বে একটা পাপ করিয়াছিলাম, সে মহাপাপ বলিলেও চলে।"

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শ্যামলাল কহিল, "তোমার কথাগুলা হেঁয়ালীর মতো ঠেকিতেছে। কি ব্যাপার স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বল।"

সে বলিল, "একজন বড় জমিদারের বাড়ী ডাকাতি করিতে গিয়াছিলাম। আমাদের দলের এক ব্যক্তি বৃদ্ধ জমিদারের বুকে ছোরা বসাইয়া দিতেই, বাহিরে লোক জমিয়া খুব গোলমাল হইল। সকলেই পলাইয়া গেল, কেবল আমরা তিন জন মাত্র ধরা পড়িলাম। আদালতে প্রমাণ হইল আমিই জমিদারের বুকে ছোরা বসাইয়াছি—অপর দুইজনের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল এবং আমি নির্ব্বাসিত হইলাম। আর কেহই ধরা পড়িল না।"

শ্যামলাল বলিল, "তুমি যদি খুন কর নাই তবে কেন বলিলে—'অপরাধী নহি সে কথা বলিতে পারিব না'—আর, মহাপাপই বা কি করিয়াছিলে ?"

শ্যামলালের মুখের পানে কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়া সে কহিল, "ডাকাতী করিতে গিয়াছিলাম, ইহা কি অপরাধ নহে ? তবে এবার আমি খুন করি নাই।"

চোখ বুজিয়া শ্যামলাল নিজের বুকের মধ্যে ডুব মারিয়া কি বস্তু যেন হাতড়াইতে লাগিল। তাহার মনে হইল—মেঘাবৃত আকাশ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে। কহিল, "এবার কর নাই—তাহা হইলে কখনো না কখনো তুমি খুন করিয়াছ ?"

সে বলিল, "ধর্ম্ম দাদা, তোমাকে মিথ্যা বলিয়া আর কি হইবে ? বারো তের বৎসর পূর্ব্বে যথার্থ আমি একটা নরহত্যা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে যাত্রা আমি ধরা পড়ি নাই। নিরপরাধ এক ব্যক্তি আমার পাপে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল।"

শ্যামলাল নিজের অন্ধকার অন্তরের মধ্যে যে বস্তুটার সন্ধান করিতেছিল তাহা যেন হাতে আসিয়া ঠেকিল। প্রাণপণ বলে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, "সেই লোকটার স্ত্রী পুত্রের কোন সংবাদ রাখ কি ? তাহারা বাঁচিয়া আছে কি নাই—সে সংবাদ কি দিতে পার ?"

অকস্মাৎ শ্যামলালের পায়ের গোড়ায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল, "ধর্ম্ম দাদা ! আমাকে আর লুকাইও না—আমি তোমাকে ঠিক চিনিয়াছি। আমারই পাপের বোঝা তুমি এই সুদীর্ঘকাল বহন করিয়াছ। তোমার বড় ছেলেটি মাতুলালয়ে মানুষ হইয়াছে, কিছু দিন পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছে, উপস্থিত তাহার কোন কষ্ট নাই। কিন্তু তোমার সতী সাধ্বী স্ত্রী ও ছোট কোলের ছেলেটি আর বাঁচিয়া নাই। তোমার শোকে তাহারা মারা গেছে। আমার পাপেই এ সমস্ত ঘটিয়াছে। আমি স্বচক্ষে তোমার বিচার দেখিয়াছি—তোমাকে অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য যখন তাহারা বেত্রাঘাত করিতেছিল—তোমার চামড়া কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল তথাপি তুমি অবিচলিত ছিলে। কিন্তু আজ তোমার মুখের পানে চাহিয়া মনে হইতেছে—ইহাও চেয়ে সে বেত্রাঘাত সহস্রগুণে সহনীয়। সেই হোটেলে সেই ভয়ানক রাত্রিতে তোমাদের সহিত এক জায়গায় আহার করিয়া পাশের ঘরে শুইয়াছিলাম—তার পর মধ্য রাত্রে কৌশলে জানালার গরাদে সরাইয়া তোমাদের কক্ষে ঢুকিয়া, তোমার সঙ্গীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, ছোরা দিয়া কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া জানালা দিয়া পলায়ন করিয়াছিলাম। মনে পড়িতেছে পলাইবার পূর্ব্বে তোমার হাতে খানিকটা টাট্‌কা রক্ত লাগাইয়া দিয়াছিলাম—তুমি তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলে। এখন তুমি বল, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ? আমাকে কি তুমি মার্জ্জনা করিতে পারিবে ?"

অতীতের শত সহস্র স্মৃতি শ্যামলালের মানস পটে ফুটিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল সুদীর্ঘকাল দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে যেন এই মাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে। নয়নতারা নাই—কোলের ছেলেটি নাই—তাহার বাসগৃহ শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আর তো তাহার দেশে ফিরিতে বিলম্ব নাই—কিন্তু দেশে ফিরিয়া সে দেখিবে কি ? জন্মভূমির প্রতি কোনও টান সে অন্তরের মধ্যে

অনুভব করিল না। সে নতজানু হইয়া আকাশ পানে দৃষ্টিপাত করিয়া যোড়হাত করিয়া মনে মনে বলিল—"এ কি শাস্তি! ভগবান, এ কি শাস্তি! জীবনে এ কি কঠোর পরীক্ষায় ফেলিলে প্রভু? যাহার মুখ স্মরণ করিয়া এই কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছি—শাস্তির অবসানের সময় কেন তাহাকে কাড়িয়া লইলে? সেই একটি মাত্র সান্ত্বনার স্থল যাহা আমার অবশিষ্ট ছিল, তাহাও তোমার সহ্য হইল না? পূর্ণ হোক—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"

তারপর উঠিয়া দাঁড়াইতেই নবাগত নির্ব্বাসিতের মুখ তাহার চোখে পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এই সেই লোক, যে তাহার সমস্ত জীবনটা বিফল করিয়া দিয়াছে। ইহাকে কি কখনো ক্ষমা করিতে পারা যায়? শ্যামলালের অন্তরের মধ্যে একটা বন্য হিংস্রজন্তু মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। প্রাণপণ চেষ্টায় সে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। অকস্মাৎ বহুবার পঠিত মহাভারতের একটা শ্লোক মনে পড়িতেই তাহার সমস্ত ক্রোধ জল হইয়া গেল। তাহার মনে হইল—আমি ইহাকে শাস্তি দিবার কে? এ যদি কোনও পাপ করিয়া থাকে তাহা হইলে ঈশ্বর তাহার দণ্ড দিবেন। নিশ্চয় কোন অজ্ঞানকৃত পাপে এ জন্মটা আমার ব্যর্থ হইয়া গেল—আর কেন পাপের বোঝা বাড়াই!

হতভাগ্য নির্ব্বাসিতের মুখের পানে তাকাইয়া শ্যামলালের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। তাহার ডান হাত খানি চাপিয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে বলিল—"ভাই, আমি তোমাকে মার্জ্জনা করিবার কে? ঈশ্বর তোমাকে মার্জ্জনা করুন।" *

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

টাইফয়েড

সকলেই জানেন, টাইফয়েড মারাত্মক ব্যাধি না হইলেও ইহা অতি কঠিন ও কষ্টদায়ক পীড়া। এই পীড়ার ভোগের কালও দীর্ঘ, কোন প্রকার চিকিৎসার দ্বারা ইহার ভোগের কাল কমান যায় না। ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহে না। রোগী যখন জ্বরমুক্ত হয় তখন একেবারে কঙ্কালসার হইয়া যায়। এই সময় রোগীর অল্প অল্প ক্ষুধার উদ্রেক হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় শুশ্রূষাকারীর বিশেষ সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। রোগীর পাকস্থলী এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল, কোনরূপ সারক বা কঠিন পদার্থ জীর্ণ করিবার শক্তি ইহার আদৌ নাই। ধীরে ধীরে এই পাকস্থলীকে কার্য্যক্ষম করা আবশ্যক, অতিরিক্ত ব্যস্ততার দ্বারা রোগীর জীবন বিপন্ন করা এ ক্ষেত্রে মূঢ়তা মাত্র।

যেমন লোক-বিশেষকে টাইফয়েডে আক্রমণ করে, সেই রূপ জাতি-বিশেষকেও টাইফয়েড আক্রমণ করা সম্ভব। ইংলণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স (আমেরিকার টাইফয়েড হয় নাই, সামান্য জ্বর হইয়াছিল বলিতে পারা যায়) গ্রীস, রোম চীন, জাপান, আয়ারল্যাণ্ড—সকলেই এক সময় না এক সময় এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। সকলেই আবার পিতৃ-পুণ্যে বাঁচিয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্স আরোগ্য-মুখে অতিরিক্ত কুপথ্য করায় কিছু অধিককাল রোগ ভোগ করিয়াছিল, —যাহা হউক এখন সে বেশ সামলাইয়া উঠিয়াছে। রোগের ভোগকাল ২১ দিন হউক আর ৪২ দিনই হউক, অথবা ৪০০ বৎসরই হউক অথবা ১০০০ বৎসরই হউক, আরোগ্য-মুখে যদি সাবধানতা না অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে relapse (পুনরাক্রমণ) অবশ্যম্ভাবী।

এ কথা সত্য যে ভারতবর্ষের রোগমুক্তির সময় আসিয়াছে। সকলেই বলিতেছে ৪২ দিন অতীত হইয়াছে, এখন অন্ন-পথ্য দিবার আয়োজন হইতেছে। একথা সত্য যে ডাক্তার বিধান রায়ের বা ডাঃ কিচলুর মত চিকিৎসক যদি কোনও রোগী-বিশেষের জন্য অন্ন ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে তাহাকে অনায়াসে ভাত খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু একটা 'জাতি'র চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহাদের

কি অভিজ্ঞতা আছে? এখানে কি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয় নহে? আর, একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলে ক্ষতি কি? ২০ বা ৫০ বৎসর জাতীয় জীবনের পক্ষে কিছুই নহে। আর, সত্যই কি তাঁহারা এ যাবৎ ভারতবাসীকে একজাতীয়তা সূত্রে গ্রথিত করিতে পারিয়াছেন? পুরাতন রোগীকে অন্ন পথ্য দিবার সময় সকল চিকিৎসকই একটু অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা করিয়া থাকেন। দুই দিন দেরী করিয়া যাঁহারা পথ্য দেন তাঁহাদের তজ্জন্য কখনও অনুশোচনা করিতে হয় নাই। কিন্তু এ কথা সত্য যে ব্যস্ততা সহকারে পথ্য দেওয়ায় অনেক সময়েই কুফল হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পীড়ার কাল অতীত হইয়াছে, এ কথা অনেকে বলিতেছেন—কিন্তু তাহার লক্ষণ কিছু দেখা গিয়াছে কি? যে রোগী সম্পূর্ণ ভাবে রোগমুক্ত হয় সে চিকিৎসকের ব্যবস্থার অপেক্ষা রাখে না, সে নিজেই পাকের ঘর আক্রমণ করে। এ জাতির সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা গিয়াছে কি? ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা হয় নাই এ কথা আমি বলি না। কিন্তু জাতি হিসাবে কোথাও কোন চেষ্টা হইয়াছে এ কথা কেহ বলিতে পারেন কি? কিংবা স্বাধীনতার জন্য সার্ব্বজনীন আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে কি? জন্মে নাই—কেন না এখনও রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয় নাই। রোগী যদি রোগমুক্ত হইত তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধির খদ্দর ও চরকা প্রচলন চেষ্টা নিষ্ফল হইত না। আমি যদি কাহাকেও দেশ-নেতা বলিয়া মানি, এবং তিনি যদি দেশের মঙ্গলের জন্য এবং স্বরাজ প্রাপ্তির জন্য কোন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন, সেই ব্যবস্থা অনুসারে যদি আমি না চলি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দেশের মঙ্গলের জন্য যতটুকু ত্যাগ করা আবশ্যক তাহা আমি করিতে প্রস্তুত নহি—অর্থাৎ মুখে আমি যতই কেন স্বাধীনতার জন্য চিৎকার করি না, যখন কার্য্যক্ষেত্রে সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহা আমি করিতে প্রস্তুত নহি। অর্থাৎ আমার ইচ্ছাটা মুখেই আছে, হৃদয়ে নাই। এমন কোনও ব্যক্তি আছে, যে তাহার স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসে, অথচ তাহাদের জন্য কিছুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে?

বহু কারণে চরকার কথা বা স্বরাজের কথা এখন দেশের লোকের মর্ম্মস্পর্শ করে না। আমি একবার রাজনৈতিক চর্চ্চাটুও খদ্দর প্রচলনের চেষ্টা করিবার ইচ্ছা করিয়া "নিজ বাসভূমে" এক পল্লীগ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া এক আত্মীয়ের বাটীতে উঠিলাম, ঐ স্থানটী কেন্দ্র করিয়া আমি প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিব এইরূপ ইচ্ছা ছিল। বেলা ১১টার সময় সেখানে গিয়া পৌছিলাম। শুনিলাম গৃহকর্ত্তা ডাক্তারখানায় গিয়াছেন, তখনও ফিরেন নাই। বাড়ীর তিনটী ছেলের ও মধ্যম বধূর জ্বর। আমি তাঁহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া স্নান করিবার উদ্যোগ করিলাম। অত বেলায় গঙ্গাস্নানে যাওয়া সম্ভবে না, কাযেই পুষ্করিণীতে স্নান সারিয়া লইতে হইবে। বাড়ীর নীচেই একটা পুকুর, সেটী ডোবায় পরিণত হইয়াছে। জল এমনই কদর্য্য ও মলিন যে তাহা ছুঁইতেও ঘৃণা বোধ হয়। অগত্যা একটু দূরে কালী দীঘিতে স্নান জন্য যাইতে হইল। এ পুষ্করিণীটী মন্দ নহে, বাঁধা ঘাট। পুষ্করিণীটী গ্রামের মধ্যে অবস্থিত থাকায় গ্রামের তাবৎ লোকই সেই পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করে। কাযেই জলের যা অবস্থা তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে এক গলা জল পর্য্যন্ত কেবল তেল ভাসিতেছে। রমণীরা ঘাটে বসিয়া ছেলেদের কাঁথা পরিষ্কার করিতেছে, কেহ কেহ এক হাঁটু জলে নামিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া পানার্থ লইয়া যাইতেছে। কোনমতে স্নান সারিয়া লইলাম। মনে করিলাম, দেশের ম্যালেরিয়া ও জলকষ্ট দূর না করিলে দেশ কোন্ দিন শ্মশানে পরিণত হইবে। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, গৃহকর্ত্তা ফিরিয়াছেন। ফিরিয়াই বিচালী কাটিতে বসিয়া গিয়াছেন। যে কৃষাণ রোজ বিচালী কাটিয়া দিয়া যায় সে আজ আসে নাই। তিনি যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিলেন, আহারের ব্যবস্থাও মন্দ হইল না, কেননা সেদিন হাটবার ছিল এবং গৃহকর্ত্তা 'হাট' করিয়া ডাক্তারখানায় গিয়াছিলেন। বেলা একটার সময় গরু দুটীকে জাব দিয়া গৃহকর্ত্তা চকমকি সাহায্যে নারিকেল ছোবড়া ধরাইয়া তাম্রকূট সেবন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্নান সারিয়া তাঁহার আহার শেষ করিতে বেলা আড়াইটা বাজিল। আহার শেষ করিয়াই তিনি কৃষাণকে ও মাঠের কায দেখিতে ছুটিলেন। বলিলেন ফিরিতে একটু রাত হইতে

পারে। বলা বাহুল্য আমি তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহার নিকট আদৌ দেশোদ্ধারের কথা পাড়ি নাই।

তিনটার পর আমি বাড়ী হইতে বাহির হইলাম—দেখা যাক যদি অন্য কোন বাটীতে বক্তৃতা কেন্দ্র করা চলে। যে বাড়ীতেই যাই সেই বাড়ীতেই, দুইটী তিনটী ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী। সেই জলকষ্ট, সেই হিমালয় পর্ব্বত সদৃশ অজ্ঞানতা। প্রথম দুইদিন এইরূপে স্থান ও পাত্র অনুসন্ধান করিতে কাটি া গেল, তৃতীয় দিনে মরিয়া হইয়া অপেক্ষাকৃত এক বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের কাছে কথাটা পাড়িয়া ফেলিলাম। বলিলাম, "দেখুন, দেশে এত জঙ্গল, এই জঙ্গলের জন্যেই ম্যালেরিয়া হয়। আপনার বাড়ীর পাশের জঙ্গলগুলা কাটিয়ে ফেলান না কেন?"

উত্তর কে কাটাবে বাবা? চাষের জন্যেই মজুর দেশে মিলে না। যাই ৭।৮ ঘর সাঁওতাল এখানে বসতি করেছে তাই চাষের কায একরকম চলে। চাষের কাযের ক্ষতি করে ত মজুর আসবে না।

"কেন, পাড়ার ছেলেরা ইচ্ছা করলেই ত এ জঙ্গল সাফ করে দিতে পারে।"

"আমার কায করতে পাড়ার ভদ্রলোকের ছেলেরা আসবে কেন? আর আমি তাদের বলবোই বা কি ক'রে? এ ত জঙ্গল নয়, বিষ্ঠা বন।"

"আচ্ছা এই ডোবাটা ভরাট করিয়ে একটা কূয়ো করুন না কেন?"

"ডোবা ভরাট করাব বলছো, ভরাট করবার মাটী পাব কোথা? এবং তাও ত জন মজুর সাপেক্ষ। আর ভরাট করা, কূয়া খনন করান, সেও ত খরচ সাপেক্ষ। পাঁচটী শো টাকার কম ত একায হতে পারে না—সে টাকা পাবো কোথা?"

"আচ্ছা স্কুলটীর এমন দুরবস্থা কেন?"

"বাবা, তোমরা থাক বিদেশে, স্কুলের জন্যে বছরে দশটী টাকা দিয়ে খালাস। অন্য সব যাঁরা বিদেশে আছেন তাঁরা তাও দেন না। গ্রামের ত এই অবস্থা দেখছ। সাধারণ চাষী লোকের মেয়েরা ছ'মাসে একখানা কাপড় পায় না, তাদের সাহায্যে কি আর স্কুল চলে?"

এইবার আমি সুযোগ পাইলাম। আমি বলিলাম—"কাপড় ত কতকটা নিজের হাতের মধ্যে। অবসর সময় মধ্যে যদি চরকায় সুতো কাটে তা হলে ত অনায়াসে অন্ততঃ ছ'মাসে নিজের পরণের একযোড়া কাপড়ের উপযোগী সুতো তৈয়েরি করতে পারে।"

"একথা বলছো বটে, কিন্তু আমাদের গাঁয়ে ত তাঁতি নেই। কালনায় দুই একঘর আছে বটে, কিন্তু তারা বিলাতী সুতোয় তাঁত চলায়। তারা বলে খদ্দরের সুতো মাকুতে চলে না। তা ছাড়া আমাদের গাঁয়ে তুলোর গাছও নেই, তুলোর চাষও নেই।"

"পাটের বদলে তুলোর চাষ করিলেই ত হয়।"

"আরে বাপরে! সেকি হয়? পাটই ইল লক্ষ্মী, ঐ টাকা থেকেই মহাজনের দেনা, জমীদারের খাজনা মেটাতে হয়, পাটের চাষ উঠিয়ে দিলে কি চলে? তবে প্রত্যেকে নিজের বাড়ীতে ৪।৫টী ক'রে তুলোর গাছ করতে পারে, তা সেরকম চেষ্টা ত কিছু হয়নি। বিশেষ এরা নিরক্ষর লোক, এদের হাতের কাছে ভাল বীজ এনে পুঁতে দেখিয়ে না দিলে এরা সে সব কাযে হাত দেবে না। তারপর তাঁতি চাই, বা সুতো কেনবার মত গাঁয়ে গাঁয়ে লোক চাই। জিনিষের চাহিদা না হলে লোকে জিনিষ তৈরি করবে কেন? বিলাতে যদি পাট বোঝাই জাহাজ না যেত, তা হলে কি লোকে আজ পাট চাষ করতো?"

আমি একটু সুবিধা বুঝিয়া বলিলাম—"দেশের লোক দেশের শাসন কায চালায়, সেই ভাল নয় কি?"

উত্তরে তিনি বলিলেন, "সে ভাল বইকি বাবা। কিন্তু দেশের লোক বড্ড চুরী করে, ঘুস খায়, আর মিথ্যে কথা বলে। আর মাথার উপর তাদের একজন দেখবার শোনবার লোক না থাকলে তারা দিনে ডাকাতি করে। কাউকে বিশ্বাস করবার জো নাই বাবা, কাউকে বিশ্বাস করবার যো নেই।"

আমি আর তর্ক বাড়াইলাম না, কেননা সেই সময়ে Bengal National Bank ও বঙ্গলক্ষ্মী মিল লইয়া কাগজে খুব হৈচৈ চলিতেছিল। রাজনৈতিক চর্চ্চা বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিলাম।—যাহার এখনও ১০৪ ডিগ্রী জ্বর, তাহার মুখে অন্ন ভাল লাগিবে কেন—হউক না কেন সে কাশ্মীরি চাউলের পলান্ন।

মানুষকে চাহিতে শিখাইতে হয় না। সে আকাঙ্ক্ষা ও আশা লইয়াই জন্মিয়াছে, আর আমরণ আশা ও

আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে ধাবমান থাকে। তবে অবস্থা হিসাবে আশা ও আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে। যখন ১০৪ ডিগ্রী জর তখন রোগী প্রার্থনা করে জর একটু কমুক। আবার জরটা একটু কমিলে প্রার্থনা করে, জরটা একেবারে ছাড়ুক। জর ছাড়িলে উঠিয়া বসিতে চায়। এইরূপে শরীর যেমন যেমন সুস্থ হইতে থাকে, আকাঙ্ক্ষা সেইরূপ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। ভিক্ষুক একমুষ্টি অন্ন পাইলেই সন্তুষ্ট, তাহাকেই আবার সদরালা করিয়া দিলে সে রায়বাহাদুর হইবার জন্য পায়ের জুতা ছিঁড়িয়া ফেলিবে। এই বাঙ্গলা দেশের অজ্ঞানতা দূর করিয়া যদি তাহাকে সম্পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে স্বরাজ জোর করিয়াই লইবে—কাহারও অনুরোধ উপরোধেরও কায নহে। অনুরোধ, উপরোধে যদি রোগী অসময়ে অন্ন পথ্য করে তাহা হইলে তাহার বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী।

১৯২০ সাল হইতে "পল্লী-সংস্কারের" ধুয়া শুনিতে পাইতেছি। "Go back to the village" কথাটা বোধ হয় প্রত্যেক সপ্তাহের বক্তৃতায় শুনা গিয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্যই হয় নাই। সত্য সত্যই কি B. P. C. C'র এমন অর্থবল কি লোকবল নাই যাহাতে তাঁহারা বাঙ্গলা দেশের একটী গ্রামকেও আদর্শ গ্রামে পরিণত করিতে পারেন? একটী গ্রামেরও তাঁহারা ম্যালেরিয়া দূর করিয়া, জলাভাব দূর করিয়া, গ্রামস্থ লোকের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারনে না? গ্রামটী যথাসম্ভব যাহাতে স্বাবলম্বী হয়, বাহিরের সাহায্য যাহাতে প্রয়োজন না হয়, ভারতের বাহিরের কোন পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা না হয়, এইরূপ একটী গ্রাম গঠন করিয়া তোলা কি তাঁহাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব? যদি তাহা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করাও অসম্ভব। কিন্তু এরূপ একটী আদর্শ গ্রাম গঠন করিয়া তোলা ত অসম্ভব নহেই, পরন্তু খুবই সম্ভব। যাঁহারা ১৯১৮ সালের কলিকাতা প্রদর্শনী দেখিয়াছেন, তাঁহাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, যদি কায করিবার উপযুক্ত বুদ্ধিমান লোক থাকে, তাহা হইলে সে কায আপনা হইতেই অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠে, টাকা ভূতে আনিয়া যোগান দেয়। এইরূপ একটী আদর্শ গ্রাম গড়িয়া তুলিতে পারিলে, পাশের গ্রামগুলিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আর বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না, তাহারা আপনা হইতেই আদর্শ গ্রামটীর সুখ সুবিধার পক্ষপাতী হইয়া পড়ে, এবং নিজেরাই চেষ্টা করিয়া গ্রামটীকে আদর্শ গ্রামের সমান করিয়া তুলিতে যত্নবান হয়।

কায অনেক। কাযকে ফাঁকি দিয়া কেবলমাত্র Resolutionএর সাহায্যে স্বরাজ মিলিবে না। Resolutionএর আবশ্যকতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা কাযের আবশ্যকতা ঢের বেশী। মানুষ লইয়াই দেশ, মানুষ না গড়িয়া দেশ গড়িতে যাওয়া বিড়ম্বনা নহে কি?

বাঙ্গলা দেশ এখন দুই দলে বিভক্ত। যদি প্রত্যেক দলই দেশকে স্বরাজ সাধনার পথে লইয়া যাইবার জন্য বদ্ধপরিকর থাকেন, তাহা হইলে তাহার জন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহাদের বক্তৃতা ছাড়া আরও কিছু করা দরকার। তাঁহারা প্রত্যেকে, যে জেলায় বা যে গ্রামে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে, সেই গ্রাম বা জেলাকে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী ও স্বরাজ প্রাপ্তির উপযোগী করিয়া তুলুন। নিজ নিজ আদর্শে গ্রাম গঠন করুন, লোকে যে গ্রামবাসীর সুখ ও সুবিধা অধিক বুঝিবে, সেই গ্রামকে আদর্শ করিয়া নিজ গ্রাম গঠন করিবার চেষ্টা করিবে এবং সেই নেতার অধীন হইয়া পড়িবে। কথাটা যে নূতন তাহা নহে। কথাটা অতি পুরাতন। কিন্তু কথাটা সাধারণের পক্ষ হইতে বলা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এই জন্য যে, যদি আমাদের বাঙ্গলা দেশের নেতারা অবিলম্বে আত্মকলহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশ-সংস্কার-কার্য্যে মনোনিবেশ না করেন, তাহা হইলে দেশের লোকেরা তাঁহাদের উপর যে শ্রদ্ধা আছে তাহা হারাইবে। শুধু তাহাই নহে, কংগ্রেসের উপরও শ্রদ্ধা হারাইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা আছে।

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

কালিম্পং বা বৃটিশ ভুটান

শৈলবিহার করিতে যাঁহারা দার্জ্জিলিং নগরে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কেবল দার্জ্জিলিঙ্গের নাগরিক সৌন্দর্য্যই দর্শন করিয়া আসেন, এবং দার্জ্জিলিঙ্গের বক্ষে দাঁড়াইয়া যতদুর দৃষ্টি চলে প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন। কষ্টস্বীকার করিয়া খুব অল্প সংখ্যক পর্য্যটকই এ অঞ্চলের মফঃস্বলে এবং দুরবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়া থাকেন। সহরের বুকে বসিয়া শিল্পসৌন্দর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ করা যায় সত্য; কিন্তু প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। পার্ব্বত্য শোভা দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে হইলে পার্ব্বত্য প্রদেশের মফঃস্বলে বা অভ্যন্তরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। তথায় নাগরিক কোলাহল নাই, যান বাহনাদির কর্কশ রব প্রকৃতির শান্তিভঙ্গ করিতে পারে না। প্রকৃতির শান্ত ও নগ্ন সৌন্দর্য্য মফঃস্বলে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত।

কালিম্পং দার্জ্জিলিং জেলার একটী মহকুমা। ইহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। দার্জ্জিলিং হইতে প্রায় ৩২ মাইল উত্তরপূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। শিলিগুড়ী হইতে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলের একটী শাখা লাইন 'কালিম্পং রোড' নামক ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই লাইনটী তিস্তা ভ্যালী সেকসন (Teesta Valley Section) নামে পরিচিত। কালিম্পং রোড ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে মোটরে বা অশ্বারোহণে ১২ মাইল পার্ব্বত্য চড়াই অতিক্রম করিয়া কালিম্পং সহরে যাইতে হয়।

দার্জ্জিলিং সহর হইতে কালিম্পং যাইবার দুইটী পথ আছে। ঐ পথে মোটরে, ঘোড়ায় বা পদব্রজেও যাওয়া যায়। এই উভয় পথই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। শিলিগুড়ী হইতে শেভক (Sevok) ষ্টেশন পর্য্যন্ত গাড়ী শস্যশ্যামল বিস্তৃত মাঠের উপর দিয়া চলিতে থাকে। শেভক হইতে গাড়ীর পার্ব্বত্য বনপথ আরম্ভ হয়। এই পথও পর্ব্বতশ্রেণীর গায়ে গায়ে আঁকা বাঁকা হইয়া চলিয়াছে। গাড়ীগুলি দার্জ্জিলিংগামী গাড়ীর মতই ক্ষুদ্রাকৃতি। শেভক হইতে তিস্তা নদীর তীরে তীরে রেলপথ চলিয়াছে। এই পথে চলিবার সময় হৃদয় যুগপৎ হর্ষে ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া থাকে। এক পাশে গভীর ঘন-বন-সমাচ্ছন্ন গগনভেদী পর্ব্বতশ্রেণী, অপর পাশে খরস্রোতা তিস্তা ভৈরব নিনাদে প্রবাহিতা। ইহার কানায় কানায় রেলপথ। দৈবাৎ গাড়ী লাইনচ্যুত হইয়া নদীর দিকে গড়াইয়া পড়িলে আর রক্ষা নাই। তিস্তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়।

বর্ষার সময় কখন কখনও পাহাড় ধসিয়া পড়িয়া রেল পথ বন্ধ হইয়া যায়। এই পথে রীয়াং (Ryang) নামক একটী ষ্টেশন আছে। এই ষ্টেশনের অনতিদূরে একটী লুপ আছে। এই লুপের উপর দিয়া গাড়ী চলিবার সময় অতি রমণীয় দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

তিস্তা পার্ব্বত্য নদী, অল্প পরিসর, কিন্তু অত্যন্ত বেগবতী। ইহার ভৈরব গর্জ্জনধ্বনি নির্জ্জন পর্ব্বতশ্রেণীর কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অপর তীরে গভীর বনাকীর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী ঋজু ভাবে চলিয়াছে। এত খাড়া পর্ব্বত আর কোথাও দেখিতে পাই নাই।

কালিম্পং রোড ষ্টেশন হইতে দুই মাইল আসিলেই তিস্তা ব্রীজ। এই স্থানে তিস্তা নদীর উপর একটী দোলায়মান সুদীর্ঘ সেতু আছে। সেতুটী লৌহ তারে ঝুলিতেছে। এই সেতু পার হইয়াই কালিম্পং, সিকিম, এমন কি তিব্বৎ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। এই সেতুর নামানুসারে এই স্থানটীর নামও তিস্তা ব্রীজ হইয়াছে। তিব্বৎ অভিযানের সময় এই সেতুটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহাকে আরও দৃঢ় ও বৃহদাকারে নির্ম্মাণের প্রস্তাব চলিতেছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এই সেতুর উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটি উন্মাদ লোক আত্মহত্যা করিয়াছিল, বহু অনুসন্ধানেও প্রবল স্রোতের কবল হইতে তাহার মৃতদেহ উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। এখানে একটী বড় ডাকঘর আছে। এই ডাকঘর হইতে সিকিম ও তিব্বতের যাবতীয় চিঠি পত্র ও পার্শেল প্রেরিত হইয়া

থাকে। তিব্বতের সহিত এই আফিসের তারের সংযোগ (telegraphic communication) আছে। এখান হইতে দেড় মাইল দূরে তিস্তার সহিত রঙ্গিৎ নদী আসিয়া মিশিয়াছে। এই স্থানটি অতি মনোরম। প্রতিবৎসর পৌষ মাসে এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে। এই নদীর অপর পার হইতে সিকিমের পর্ব্বত শ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে।

দার্জ্জিলিং হইতে পায়ে-চলার যে পথ গিয়াছে সেই পথেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রচুর। এই পথ ক্রমেই নিম্নাভিমুখ হইয়া তিস্তায় আসিয়া মিশিয়াছে। এই পথের একদিকে পাহাড়ের শ্যামল শোভা ও অপর দিকে সবুজ চায়ের বাগান। মাঝে মাঝে নির্ঝরিণীর মৃদু মধুর কলধ্বনি, বিহগ কুলের সুললিত তান প্রাণে পুলকের সঞ্চার করিয়া থাকে। এই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিলে সেই স্মরণাতীত কালের তপোবনের পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে জাগরিত হয়।

কালিম্পং পূর্ব্বে ভুটান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে ভুটান যুদ্ধে ইহা ব্রিটিশের করতলগত হয়। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল ডালিং পাহাড়। গত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইহাকে কালিম্পং নামে অভিহিত করা হয় এবং এই বৎসরই এখানে মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখানে ভুটান রাজের একজন প্রতিনিধি থাকেন, ভুটান রাজের একটি দরবার এখানে আছে, ভুটান রাজ-জামাতা সোনাম টবগে দর্জ্জি (Sonam Tobgay Darjee) এখানে অবস্থান করেন। ইনিও রাজা উপাধি লাভ করিয়াছেন।

এই স্থানটি উচ্চ পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ ফাঁকা। এখানে বৃক্ষাদি খুব বেশী নাই, চারিদিক খোলা এবং যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল পার্ব্বত্য নগ্ন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রচুর আলোক এই স্থানটীকে এত স্বাস্থ্যকর করিয়া রাখিয়াছে। দার্জ্জিলিং অপেক্ষাও ইহাকে মনোরম বলা যাইতে পারে, কেননা এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ ও অত্যন্ত আরামপ্রদ। দার্জ্জিলিঙ্গের মত এখানে শীতের প্রাবল্য নাই। কলিম্পং উচ্চতায় ৫ হাজার ফিটের অধিক হইবে না। এখান হইতে একদিকে সমতল ভূমির শস্যশ্যামল দৃশ্য, অপর দিকে হিমালয়ের তুষার-ধবল শৃঙ্গরাজি দেখিতে বড়ই মনোরম। কাঞ্চনজংঘা এখান হইতে অতি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

কালিম্পং একটি মিশনরী-প্রধান স্থান। অনাথ খৃষ্টান বালক বালিকাদের জন্য Rev. Dr. Graham এখানে একটী Home প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহা St. Andrew's Colonial Home নামে পরিচিত। বহু খৃষ্টান বালক বালিকা এখানে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইতেছে। কালিম্পংএর উত্তর দিকের পর্ব্বত শিখরে বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া সেই হোম প্রতিষ্ঠিত। ইহাকে গ্রেহাম সাহেবের শান্তি নিকেতন বলিতে পারা যায়। ইহাদের শিক্ষার আদর্শ অতি সুন্দর। কোন প্রকার বিলাসিতা ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। খৃষ্টান বালক বালিকারা এই হোমে অবস্থান কালীন জুতা ব্যবহার করিতে পায় না, নগ্নপদে চলাফেরা করিয়া থাকে।

হোমের অনতিদূরে একটি পর্ব্বতশিখরে এক সুবৃহৎ জলের ট্যাঙ্ক। ঝরণার স্বচ্ছ সলিল এখানে সঞ্চিত হয় এবং এখান হইতে সহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। এই ট্যাঙ্কের ভিতর একখানা নৌকা আছে; সময় সময় নৌকায় চড়িয়া জল পরিষ্কার করা হয়। পর্ব্বতশৃঙ্গে এই প্রকার জলাশয় ও তন্মধ্যে নৌকার দৃশ্য অভিনব।

এখানে একটী বাজার আছে, সপ্তাহে দুই দিন বাজার বসিয়া থাকে। ব্যবসা বাণিজ্যে কালিম্পং একটী প্রধান স্থান। ইহা সিকিম তিব্বতের প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্র। তিব্বৎ হইতে পশম, রেশম, চমরী গরুর পুচ্ছ, চামড়া, হিমালয় বিহারী শৃগাল হরিণ ও ব্যাঘ্র চর্ম্ম প্রচুর পরিমাণে এখানে আমদানী হয়। এখান হইতে এই সকল দ্রব্য বিদেশে চালান দিয়া পেশোয়ারী ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা প্রচুর লাভবান হইতেছে। এখানে নানা প্রকার সুদৃশ্য কম্বল, গালিচা, ভুটিয়া চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যে কালিম্পং দার্জ্জিলিং জেলার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা তিব্বতের প্রবেশদ্বার—এভারেষ্ট অভিযানের নেতৃবৃন্দ সর্ব্বপ্রথম এখানেই পদার্পণ করিয়াছিলেন।

কৃষি ব্যবসায়েও কালিম্পং বেশ উন্নত। এস্থানের ভূমিও খুব উর্ব্বরা। এখানে ধান, ভুট্টা, ইক্ষু ও বিবিধ শাক সব্জী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কমলালেবু, আনারস,

ন্যাসপাতী, পীচফলও এখানে প্রচুর জন্মে। প্রত্যেক গৃহস্থই গৃহসংলগ্ন জমিতে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। শীতের সময় যখন কমলালেবুর বাগানে অসংখ্য লেবু পাকিয়া থাকে তখন সেই দৃশ্য দেখিতে বড়ই মনোহর। কপি, আলু প্রভৃতিও এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। প্রতি-বৎসর শীতকালে এখানে একটী বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়। সেই মেলায় এ দেশের যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্য আমদানি হইয়া থাকে। এস্থানে মাল চলাচলের একমাত্র বাহন অশ্বতর (খচ্চর)। খচ্চরের ব্যবসায়টীও এখানে খুব চলিয়া থাকে।

মাড়োয়ারীদের সংখ্যা এখানে খুব বেশী। ইহারা ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইতেছে। বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম। যাঁহারা আছেন অধিকাংশই এখানে চাকুরী করিতেছেন। দুইজন উকিল ও অল্প কয়জন মাত্র ব্যবসায়ী বাঙ্গালী এখানে আছেন। ইউরোপীয়, চীনা, পেশোয়ারী ও অন্যান্য দেশবাসীও এখানে যথেষ্ট আছে। এখানকার ব্যবসার ক্ষেত্র দিন দিনই বিস্তৃত হইতেছে।

ব্রহ্মদেশের রাজ-জামাতা লাথাকিউ (Lathakiu) সপরিবারে এখানে অবস্থান করিতেছেন। নির্ব্বাসিতের মত তিনি এখানে রহিয়াছেন। রাজনীতি সঙ্গে ইঁহার কোন সম্পর্ক নাই, ধর্ম্মালোচনায় নির্জ্জনে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বহুদিন এখানে অন্তরিণ অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

কালিম্পং আর্ট্স্ এণ্ড ক্রাফ্ট্স্ (Kalimpong Arts and crafts) নামে সাহেবদের একটী শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানকার সর্ব্বপ্রধান দেখিবার জিনিস। এখানে সেলাই, বয়ন, চিত্র কার্য্য, ছুতারের কার্য্য, অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে অতি উৎকৃষ্ট গালিচা ও বিবিধ শিল্প দ্রব্য তৈয়ারি হয়, দামও খুব বেশী। পার্ব্বত্য বালক বালিকারাই এই প্রতিষ্ঠানের কারিকর; ইহারা এখানে নানা প্রকার কায শিখিয়া থাকে। এখানে আসিলে পার্ব্বত্য ও তিব্বতের চারু শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা পার্ব্বত্য বালক বালিকাদের স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের একটী প্রকৃষ্ট পথ।

এখানে মিশনরিদের একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বৃহৎ সরকারী চিকিৎসালয় ও একটী বড় ডাকঘর আছে। পার্ব্বতীয়দের দ্বারা পরিচালিত একটী কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক আছে। দরিদ্র পাহাড়ী বালক বালিকাদের শিক্ষার সুবিধার জন্য স্থানীয় লোকদের চেষ্টায় একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

কালিম্পংএর দক্ষিণ দিকের পার্ব্বত্য অংশ Development area (ডেভেলপ্মেণ্ট এরিয়া) নামে পরিচিত। এখানে নূতন সহর প্রস্তুত হইবে। এই স্থানের অনেক জমিও বসত বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য সাধারণের নিকট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে কালিম্পং সহর বর্দ্ধিত হইয়া এইখানেই নূতন সহরে পরিণত হইবে এরূপ আশা করা যায়। পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগের চেষ্টায় রাস্তা ঘাটের উন্নতি সাধিত হইতেছে। একবার জনরব শুনা গিয়াছিল যে গভর্ণর বাহাদুরের গ্রীষ্মাবাস দার্জ্জিলিং হইতে এখানে স্থানান্তরিত হইবে। কালিম্পংএর এই অংশ অতি নির্জ্জন ও মনোরম, বেড়াইবার উপযুক্ত স্থান বটে।

এখানে একটি সাধারণ পাঠাগার আছে। কিন্তু স্থানীয় বাঙ্গালীদের চেষ্টা ও যত্নের অভাবে ইহার কোন প্রকার উন্নতি সাধিত হইতেছে না। ইহা বড়ই দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে বাঙ্গালী থাকা সত্ত্বেও এই স্থানে একটি পাঠাগার পরিচালিত হইতে পারে না। ইহার উন্নতি-কল্পে প্রত্যেক বাঙ্গালীর সাহায্য ও সহানুভূতি প্রয়োজন। ইহার পাশেই মাড়োয়ারী নবযুবক সমিতির ও নেপালীদের পাঠাগার অতি সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতেছে। এখান হইতে ভুটিয়া ভাষায় লিথোগ্রাফে মুদ্রিত হইয়া 'থারচিন' (Tharchin) নামক একখানা সাময়িক পত্র বাহির হইয়া থাকে।

এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা স্ত্রী পুরুষ সকলেই অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও শক্তিশালী, কিন্তু অতিশয় মদ্যপায়ী ও অসংযত। এই কারণে ইহারা আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং ইহাদের মধ্যে ক্ষয় ও যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী।

সৌন্দর্য্য পিপাসু ভ্রমণকারীদের নিকট এই স্থানটী অতি মনোরম।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্বর্গীয় কবি রমণীমোহন ঘোষের স্মৃতি-তর্পণ

বর্ষ ধীরে এল ফিরে। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত
বিধাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে এল ; আসিল বসন্ত
ছড়ায়ে ফুলের হাসি, বিহগের সুধামাখা গীতি।
চন্দ্রমা ঢালিছে সুধা, বিশ্বভরা শুধু শান্তি প্রীতি!
তুমি নাই! তোমা তরে আসে নাই আশীষ মঙ্গল ;
আমি আনিয়াছি শুধু বুকফাটা নয়নের জল!

আজি তুমি কোন্ দেশে, কোথা বল হে বন্ধু আমার,
কোথায় গাহিছ গান, প্রেমানন্দে পূর্ণ তব প্রাণ।
দীর্ঘ বিরহের পরে তারে পেয়ে হৃদয়ের পরে
ভুলে বুঝি গেছ বন্ধু, মর্ত্তবাসী ভ্রাতারে তোমার?
এস ভ্রাতা, এস বন্ধু, পর গলে সেফালিকা হার,
নয়ন সলিলে আজি করিতেছি তর্পণ তোমার।

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণে রচিত হইয়াছিল। যে সময়ে এই সাহিত্যে অনাড়ম্বর, সহজ সরল গ্রাম্যভাব ও ভাষার মধ্যে অলঙ্কারবহুল সংস্কৃতের ছায়াপাত সবেমাত্র সুরু হইয়াছে, ইহা সেই ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা। এই মঙ্গল কাব্যখানিতে সংস্কৃতপূর্ব্ব যুগ ও সংস্কৃত যুগ এই উভয় যুগেরই স্পর্শ ও ইঙ্গিত প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। চণ্ডীকাব্যকে বিষয়বস্তু করিয়া অনেক কবিই কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন ইহা প্রায় সকলেই জানেন, এবং এই সকল রচনার মধ্যে কবিকঙ্কণ কৃত চণ্ডীকাব্যই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাও বোধ হয় আজ আর নূতন করিয়া কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই সকল বিভিন্ন চণ্ডীকাব্য লইয়া ইতঃপূর্ব্বে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যখানিকে আশ্রয় করিয়া অনেক কিছু মতামত এবং সমালোচনা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও কবিকঙ্কণ চণ্ডী সম্বন্ধে কতিপয় বিষয়ের প্রতি সুধি-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

মুকুন্দরামের স্বলিখিত পুথিখানি এখনও পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে কবিকঙ্কণ স্থাপিত সিংহবাহিনীর মন্দিরে রক্ষিত পুথিখানিই তাঁহার নিজের হাতে লেখা। আবার কেহ কেহ মনে করেন কবির প্রতিপালক আরড়া ব্রাহ্মণভূমির অধিপতি বাঁকুড়া রায়ের বাড়ীতে কবির যে পুথিখানি আছে উহাই সেই পুথি। কাহারও মতে কবির নিজ গৃহের পুথিখানি তাঁহার স্বহস্ত লিখিত নহে ইহা নিশ্চিত। তবে বড় জোর তিনি এই পুথিখানি আর কোন ব্যক্তি দ্বারা লেখাইয়া লইয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে উহা স্বহস্তে সংশোধন করিয়াছিলেন এই মাত্র। এই যুক্তিগুলির কোনও একটি গ্রহণযোগ্য কি না তাহা বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ। অনেকের মতে কবির নিজহাতে লেখা আসল পুথিখানি এখনও পাওয়া যায় নাই। এই মতই বোধ হয় ঠিক। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যের অনেক সংস্করণ ছাপা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পাঠান্তরের অভাব নাই এবং কোন কোনটিতে অর্থ-হীন শব্দেরও প্রাচুর্য্য যথেষ্ট আছে। এমতাবস্থায় এখন কবির নিজের হাতে লেখা চণ্ডীকাব্যখানি খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে আমরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানিতে নানা ধর্ম্মের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। লৌকিক চণ্ডীদেবী এই কাব্যের বিষয়ীভূতা হইলেও ইনি পৌরাণিক চণ্ডীদেবীর সহিত একেবারে মিশিয়া গিয়াছেন। এই কাব্যের স্থানে স্থানে

বৌদ্ধ প্রভাব আছে বলিয়াও অনেকের ধারণা। বুদ্ধদেব ও ধর্ম্মদেবতা অভিন্ন বলিয়া একটি মত এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। মুসলমানগণ বাঙ্গালাদেশে আসিবার পূর্ব্বে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম এই দেশে তান্ত্রিক মত অবলম্বন করিয়াছিল ও ক্রমে ধর্ম্মদেবতার নামের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া ক্রমবর্দ্ধমান হিন্দুধর্ম্মের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার পথ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাই প্রচলিত মত। অধুনা এই মতের বিরুদ্ধে আর একটি মত শুনা যাইতেছে। তাহা এই যে, ধর্ম্মদেবতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দেবতা, ইনি বুদ্ধদেব মোটেই নহেন। এই ধর্ম্মদেবতার পূজার মধ্যে প্রতিপত্তিশালী বৌদ্ধধর্ম্মের কতকটা ছাপ পড়িয়াছিল মাত্র। কতকগুলি বড় ও ছোট ধর্ম্ম এক দেশে এক সময়ে বর্ত্তমান থাকিলে পরস্পরের গুণ ও দোষ পরস্পরের মধ্যে অল্পবিস্তর প্রবেশ করে, ইহা খুব স্বাভাবিক। এই হেতু কোন একটি ধর্ম্মে অপর ধর্ম্মের কিছু লক্ষণ দেখিতে পাইলেই দুইটিকে অভিন্ন কল্পনা করিবার কোন হেতু নাই। কোন্ মতটি যে ঠিক তাহা আমরা জানি না। ইহা লইয়া সম্যক আলোচনা হওয়া উচিত। যাহা হউক কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ধর্ম্মঠাকুর ও বুদ্ধদেব কতখানি প্রভাব স্থাপন করিয়াছেন তাহার নির্দ্ধারণ একান্ত প্রয়োজন। এই দুই দেবতা (যদি প্রকৃতপক্ষে দুই দেবতাই হন) ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মেরও কিছু কিছু চিহ্ন এই কাব্যের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। এই উপলক্ষে হনুমানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ত্রেতাযুগের হনুমানকে দিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণ যত কিছু বলের কার্য্য করাইয়া লইয়াছেন। রামায়ণে হনুমানকে ভক্তবীররূপে দেখি কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহাকে শুধু শারীরিক বলের আদর্শ রূপে দেখিতে পাই। হনুমানের বারংবার উল্লেখ দেখিয়া ভারতের কোন্ অতীত যুগের বানর পূজার কথা মনে পড়ে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত আলোচনার যোগ্য। হনুমান ভিন্ন বিশ্বকর্ম্মার নাম ও তৎপুত্র দারুব্রহ্মার নামও এই কাব্যে পাওয়া যায়। বিশ্বকর্ম্মা পূজা এখনও এই দেশে প্রচলিত আছে। এতদ্ভিন্নও বহু পৌরাণিক দেবদেবীর নাম এই কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাব্য পাঠে বাঙ্গালার অতীত যুগের বিভিন্ন ধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাতের বেশ একটি চিত্র নয়ন সমক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, এই বিষয় প্রণিধান যোগ্য। স্বয়ং কবি মুকুন্দরাম কোন্ ধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন ইহা লইয়াও কথা উঠিয়াছে। কবিকঙ্কণ যখন চণ্ডীকাব্য লিখিয়া শাক্তদিগের দেবীর গুণকীর্ত্তন মুখ্যতঃ করিয়াছেন ও স্বগৃহে তাঁহার বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছেন তখন তিনি যে শাক্ত ছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের হেতু দেখা যায় না। সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি দেখাইলেও তাহা গৌণভাবেই দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে অপরাপর অনেক দেবতার নাম উল্লেখ করিতেও ছাড়েন নাই হিন্দুধর্ম্মে ইহাতে কোনও বাধা নাই, সুতরাং গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব প্রীতি বা অপর ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিলেই কবিকে সেই সব ধর্ম্মের কোনও একটির অন্তর্ভুক্ত মনে করিবার কোন হেতু নাই। এই কাব্যখানিতে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় এই মাত্র। এই বিষয়টিরও চূড়ান্ত মীমাংসা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই সুতরাং ইহাও বিশেষ আলোচনার যোগ্য।

চণ্ডীকাব্যে বর্ণিত স্থানগুলির ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। কলিঙ্গ ও গুজরাট চণ্ডীকাব্যের কালকেতু উপাখ্যানে এবং উজানি, গৌড় ও সিংহল ধনপতি উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উজানি ও গৌড় বঙ্গদেশের অন্তর্গত বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে কোন গোল নাই। সিংহল বঙ্গের বাহিরে অবস্থিত হইলেও ইহা লইয়া কোন গোলযোগ ঘটে নাই। শুধু গোলযোগ কলিঙ্গ ও গুজরাট লইয়া। কলিঙ্গবন নামে বঙ্গের উত্তর অঞ্চলে একটী ভূভাগ ছিল এবং গুর্জ্জর প্রতীহারগণ কোনও সময়ে (অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে) বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই দুই কারণে দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পূর্ব্বোত্তর ভাগের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কলিঙ্গদেশ এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমোত্তর ভাগের সুপ্রাচীন সাগর মেখলা গুজরাটদেশ কবির অজ্ঞাত ছিল বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস আছে। আবার কাহারও কাহারও মতে গুর্জ্জর প্রতীহারগণের নাম হইতে কলিঙ্গ দেশের একাংশ কবিবর্ণিত গুজরাট হইয়া থাকিবে। এই দুইটি স্থান বাঙ্গালার বাহিরে অবস্থিত থাকিয়া যত প্রসিদ্ধিই লাভ করুক ন

কেন, বাঙ্গালার অন্তর্গত অথবা নিকটবর্ত্তী নগণ্য দুইটি স্থান এই দুই নামের সংশ্রবে পাইলে আমাদের বুঝিতে হইবে কবি তাহা ধরিয়া লইয়াছেন এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান দুটিকে তিনি কল্পনাও করেন নাই। এরূপ মনে করিবার কোন সংগত কারণ আছে কি? কলিঙ্গদেশ ও বাঙ্গালা দেশ মুসলমানগণের এতদ্দেশে আগমনের পূর্ব্ব হইতেই সুদীর্ঘকাল রাজনৈতিক, সামাজিক ও বাণিজ্য বিষয়ক নানারূপ সংশ্রবে আবদ্ধ ছিল। গুজরাট সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। মহারাষ্ট্রের উত্তরভাগে গুর্জ্জররাষ্ট্র অবস্থিত। এই ভূভাগের অন্তর্গত সুবিখ্যাত পাটন এক সময়ে বাঙ্গালী বণিকের নিকট একটি প্রধান বন্দর বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহার প্রমাণের অভাব নাই। বাঙ্গালী বণিক এক সময়ে দূর সমুদ্র বাহিয়া নানাদেশে বাণিজ্য সম্ভার লইয়া গমনাগমন করিত এবং ভারতবর্ষে ও তন্নিকটবর্ত্তী যে কয়েকটি স্থান ও বন্দরে তাহারা যাতায়াত করিত তন্মধ্যে সিংহল ও পাটন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাহা কোন সময়ে সত্য ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইত, উহাই কালক্রমে জাতীয় অবনতির যুগে কবির পরিকল্পনার বিষয়বস্তু হইয়া পড়িল। তত্রাচ সেই প্রাচীন গৌরবময় যুগের ক্ষীণ আলোকরশ্মি এই অতিশয়োক্তিপ্রিয় কবিগণের লেখার মধ্যেও থাকিবারই কথা। তাঁহাদের বর্ণিত বণিকরাজগণ যে যে পথ বাহিয়া উপকূলের ধারে ধারে বাণিজ্যতরী বাহিত করিতেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহা কলিঙ্গ, সিংহল, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের সুবিখ্যাত বন্দর সমূহই বটে এবং বর্ণনার পৌর্ব্বাপর্য্যেরও কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। কবি বর্ণনার পক্ষে ইহা শ্লাঘার কথা সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণের এই দুই দেশের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করাই স্বাভাবিক। সত্য বটে কবিকঙ্কণের সময় বাঙ্গালার স্বাধীনতার গৌরবময় যুগ অতীত হইয়াছিল এবং ইহার অধিবাসিগণের দেশবিদেশে জলপথে বাণিজ্য করিতে যাওয়া ও উপনিবেশ স্থাপন করার কথা স্বপ্নে পরিণত হইয়াছিল, তথাপি এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, এই দুই দেশের নামের কথা কবিকঙ্কণের যুগে বাঙ্গালী বিস্মৃত হয় নাই এবং সমুদ্রপথে বাণিজ্যের কথা তৎকালেও বঙ্গবাসীর মনে সুস্পষ্ট অঙ্কিত ছিল। আর একটি কথা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মোগল বাদশাহ আকবরের সমসাময়িক লোক। বাঙ্গালার ন্যায় কলিঙ্গ ও গুজরাট এই উভয় প্রদেশই তখন মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সুতরাং এই দুই প্রদেশের কথা কবির অপরিজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। এই হেতু, এই দু'টী স্থানের নাম কবি ব্যবহার করিলেই চমকিত হইবার কোন হেতু নাই, এবং বাঙ্গালার অভ্যন্তরস্থ অপেক্ষাকৃত নগণ্য স্থানসমূহ অনুসন্ধান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে, এই কথা স্থির যে কবি গুজরাটের বর্ণনাই করুন আর কলিঙ্গের বর্ণনাই করুন—লোকচরিত্র ও দেশের অবস্থা বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে তিনি বাঙ্গালারই করিয়াছিলেন, কারণ বিশেষরূপে বাঙ্গালার অভিজ্ঞতাই তাঁহার ছিল এবং তিনি নিজের চোখে যাহা দেখিয়াছিলেন বা নিজে যে বিষয় সম্যকরূপে জানিতেন তাহার বর্ণনাই সর্ব্বদা কাব্যের মধ্যে করিয়া গিয়াছেন। কবিকল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া তিনি কোনদিন সত্য ঘটনার বিষয় সমূহকে একেবারে নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করেন নাই।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, কবিকঙ্কণ চণ্ডী যে কত মূল্যবান সংবাদের খনি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ও তাহাদের বিভিন্ন স্তরের স্ত্রী পুরুষের গৃহস্থালীর কথা এই পুঁথিতে যেরূপ যথাযথভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য পুঁথিতে তদ্রূপ দুর্লভ। ইহা ছাড়া পশুপক্ষী, গাছপালা ও ফলফুলের বিবরণও ইহাতে যথেষ্ট আছে। বাঙ্গালার গ্রাম্যজীবন ও প্রাকৃতিক সম্পদ এই পুঁথি পড়িলে যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়, অন্য কোন পুঁথি পাঠে তদ্রূপ হয় না। আশা করি বিশেষজ্ঞগণ এই প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিবেন।

শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

শিল্প চয়ন

(শ্রীতরুণকুমার ঘোষ সংগৃহীত)

পল্লীকূপ সমীপে

(রাজপুত চিত্রকলা—অষ্টাদশ শতাব্দী)

বসন্তোৎসব

(রাজপুত চিত্রকলা—অষ্টাদশ শতাব্দী)

বসন্তোৎসব

(রাজপুত চিত্রকলা—অষ্টাদশ শতাব্দী)

সহচরী পরিবৃতা রাজকুমারী
(রাজপুত চিত্রকলা—অষ্টাদশ শতাব্দী)
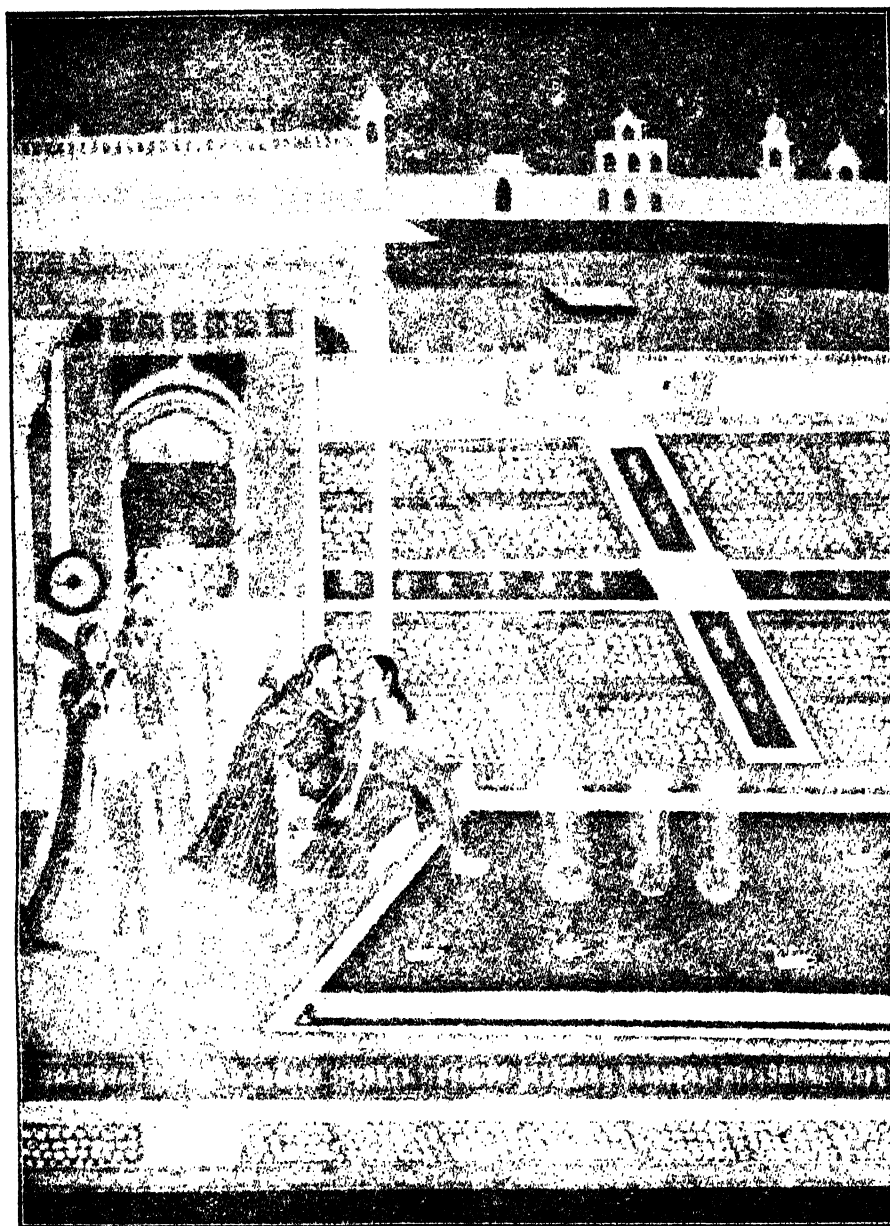
চরস সেবী

(রাজপুত চিত্রকলা—অষ্টাদশ শতাব্দী)

হোলি উৎসব

(দিল্লী চিত্রকলা—অষ্টাদশ শতাব্দী)
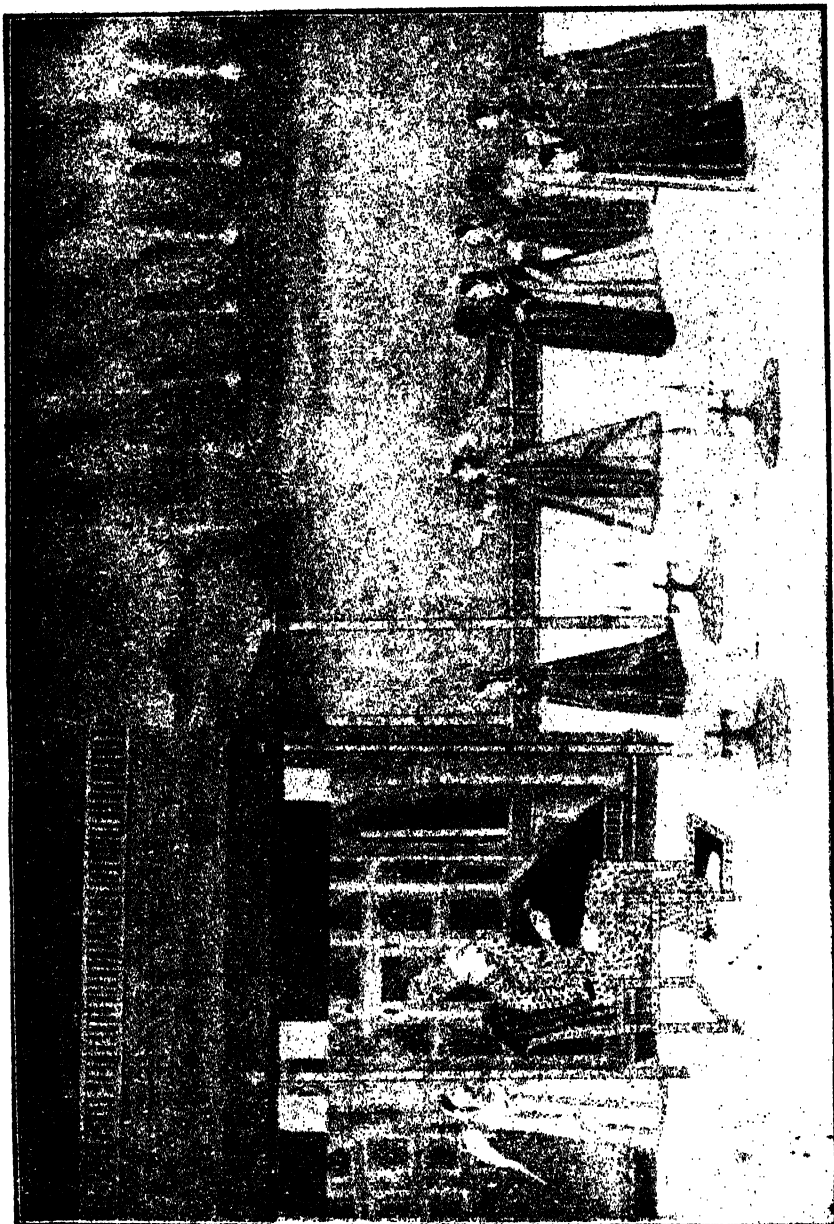
প্রকৃতির খেয়াল

পার্শ্বদেশে যে চিত্রটি প্রকাশিত হইল, উহা একটি কাঁকুড়ের ফোটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। ফোটো খানি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ সেন মহাশয় আমাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই অদ্ভুত কাঁকুড়টি তাঁহারই নিজ বাগানে উৎপন্ন হইয়াছিল।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

সাহিত্য

বিচিত্রা—কার্ত্তিক।

কলা-বিদ্যা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি কল্যা-বিদ্যার কথা বলিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার যোগ্যতা অসাধারণ। কলা বিদ্যার সহিত আমাদের প্রাণের সম্বন্ধটি কত নিবিড় তাহা সুন্দরভাবেই দেখান হইয়াছে। য়ুরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্পর্শে এই কলা-বিদ্যা কিরূপে অবনত হইতেছে তাহা বর্ণনা করিয়া কবি উপসংহারে বলিয়াছেন—"দেশের উদ্বোধনের কথা আমরা আজকাল সর্ব্বদাই বলে থাকি। মনে করি এই উদ্বোধন কেবল রাষ্ট্র-নৈতিক আলোচন সভায়। অর্থাৎ কেবল অভাবের ক্রন্দনে—দরিদ্র্যের প্রার্থনায়। এই আমাদের মজ্জাগত ভিক্ষুকতায় আমরা ভুলে গিয়েছি যেখানে দেশের আপন সম্পদ নিহিত সেইখানে দেশের আপন গৌরব প্রলুপ্ত আছে। এই সম্পদ যতই উদ্‌ঘাটিত হবে, আমাদের গৌরবের ততই উদ্বোধন হবে।" —রচনায় কবি অনেক সাময়িক সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা ইহার প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত সতীশ রায়। লেখক বিশ্বভারতীর বর্ণনা করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের আদর্শ তাহাতে কতটা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু লেখকের ইচ্ছা সফল হয় নাই। যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা 'বিশ্বভারতী'র একটি সামান্য বিজ্ঞাপনমাত্র। লেখক লিখিবার বিষয় বিশেষ কিছু সংগ্রহ

করেন নাই, এই জন্য অল্প কথা তাঁহাকে ফেনাইয়া লিখিতে হইয়াছে। প্রকাশভঙ্গীও সর্ব্বত্র নির্দ্দোষ নয়।

শরৎচন্দ্রের হিউমার—শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার গোস্বামী। হাস্য-রস ও হিউমারের প্রভেদ নির্ণয় করিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন—হাস্যরস শুধু আমাদের সহজবুদ্ধিকে সুড়সুড়ি দিয়ে ঠোঁট চিরে হাসিই বার করে। Humourও হাসির রেখা ঠোঁটের কোনায় ফোটায় বটে কিন্তু তার কারবার আমাদের অনুভূতি আর কল্পনা নিয়েই বেশী। হাস্য-রসের বিনুনীর টানা আর পড়েন দুটোতেই হাসির মাল-মসলা, কিন্তু হিউ-মারের সূক্ষ্ম পরদা বুনতে টানায় যদি দিতে হয় হাসি তো পড়েনে দিতে হয় অশ্রু।" এইরূপ আলোচনা ভারতবর্ষের বিলাতী শিক্ষার মন্দিরে আবদ্ধ থাকিলেই ভাল হয়। লেখক 'হিউমার' কথাটি কতকটা বোঝেন। দৃষ্টান্তসংগ্রহ ও ভাববিশ্লেষণে তিনি রস-প্রিয়তার পরিচয়ও দিয়াছেন। তবে হাস্য-রসটি কি, সে সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা বড়ই অস্পষ্ট। 'হিউমার' একটা ভঙ্গী; তাহা প্রায়ই হাস্য-রসের উদ্বোধক। লেখক শুধু হিউমারের কথাই যদি বলিতেন ভাল হইত। 'সুড়সুড়ি দেওয়া' বা কিছু বাহির করা হাস্য-রসের ধর্ম্ম নয়, শুধু প্রকাশ হওয়াই তাহার ধর্ম্ম। রসসম্বন্ধে তাঁহার কথাগুলি ভ্রমাত্মক হইলেও 'হিউমার' সম্বন্ধে কথাগুলি হৃদয়গ্রাহী।

ভারতীয় যৌবন-আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভিত্তি—শ্রীযুক্ত সুধাংশু-বিকাশ রায় চৌধুরী। তরুণ-আন্দোলনকে উদ্দেশ করিয়া লেখক বলিতে চান—"যে আন্দোলন জাতীয় ইতিহাস ও সৃষ্টির মধ্য হইতে জীবনের রসসঞ্চার করিতে পারে না মৃত্যু তাহার অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্যের বস্তুপ্রাণ আমাদের ব্রাহ্মণ্য প্রাণের সহিত খাপ খাইতে পারে না; কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা বাদ দিয়া বস্তু-প্রতিভাকে আদর্শের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে চাহিতেছি। ফলে এই দুই বিরোধী আদর্শের সংঘাতে সৃজনী শক্তি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে।' ভারতের ইতিহাসেও যৌবনশক্তির স্থান আছে, তবে লেখকের মতে ইহার আদর্শ কি তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকজন তরুণ বীরের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুযুক্তি প্রসূত।

বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারা—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায়। লেখক অল্পের মধ্যে অনেক কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই জন্য বিষয়টি সুন্দর ও সুস্পষ্ট হয় নাই। আলোচনাটি অসম্পূর্ণ, তারপর স্থানে স্থানে এমন মন্তব্যও প্রকাশিত হইয়াছে যাহা ভ্রমাত্মক। ধ্রুপদ সম্বন্ধে লেখক বলেন—"ধ্রুপদে এমন কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয় যাতে রস-সঞ্চারের পদে পদে ব্যাঘাত ঘটে। সুমিষ্ট তান ছোট ছোট কারু-কার্য্যের অভাবে শীঘ্রই একঘেয়ে বোধ হয় এবং এটা আধুনিক রুচির বিরোধী, সুতরাং ভয় হয় যে ধ্রুপদের বৃদ্ধাবস্থা এসেছে এবং শীঘ্রই তার লোপের দিন ঘনিয়ে আসছে। সঙ্গীতশিক্ষার্থীর কাছে তা'র উপযোগিতা থাকলেও শিল্পীর অন্তর এই নীরস গীতে আর সাড়া দেয় না। সর্ব্বত্র ধ্রুপদীর সংখ্যা ভয়ানক রূপে কমতে সুরু হয়েছে। বাঙ্গলা দেশ এককালে ধ্রুপদকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে-ছিল, কিন্তু বাঙ্গলা তরুণদল প্রায় সকলেই এখন খেয়াল ও ঠুংরীর প্রতি মনোনিবেশ করেছেন।"

ধ্রুপদ গানে এমন কোন নিয়মই নাই যাহা মানিতে গেলে রস-সঞ্চারের ব্যাঘাত জন্মে। গানের উদ্দেশ্যই রসসৃষ্টি; সুতরাং এরূপ নিয়ম যদি কিছু থাকে লেখক তাহার উল্লেখ করিলে ভাল হইত। ধ্রুপদকে নীরস গীত বলিয়া তিনি রসবোধের পরিচয় দেন নাই। ধ্রুপদও এক রূপ গীত। ইহার নীরসতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া লেখক সংকীর্ণতা, একদেশদর্শিতা ও গায়ক সমাজের মামুলি দলাদলিকেই প্রশ্রয় দিয়াছেন। রচনায় লেখকের শুধু অসার পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইয়াছে কিন্তু "সারং তু যোগিভিঃ পীতং তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ।" লেখক অন্যত্র বলিয়াছেন—"মানুষ উচ্চ শ্রেণীর আর্টে যদি বীতস্পৃহ হয়ে পড়ে তবে কয়েকজন ব্যথা পাবেন, প্রতিকারও হয়ত করবেন, কিন্তু রোধ করতে পারবেন না। সংসারের গতিচক্র কাহারও মুখাপেক্ষা করে না, হৃদয়ের দাবী তার কাছে বাহুল্য মাত্র এবং সেন্টিমেণ্ট দুর্ব্বলতা ও যুক্তিহীনতার নামান্তর।" —এ সব কথায় যে সত্য নিহিত আছে তাহা অসত্যেরই সামিল, কেননা আমরা অনেকেই জানি, কয়েক জনেরই প্রতিবাদ জগতে অনেক বিষয়ের প্রতিরোধ করিয়াছে এবং সংসারের গতিচক্র প্রধানতঃ হৃদয়ের দাবী ও সেন্টিমেণ্টের জোরেই পরিচালিত হইতেছে।

আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ ও রবীন্দ্রনাথ—শ্রীমতী আশাবতী দেবী। লেখিকা দেখাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ দুঃখবাদকে প্রশ্রয় দেন নাই, তিনি দুঃখকে আনন্দেই রূপান্তরিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় রবীন্দ্রনাথের রচনার যে আলোচনা সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, লেখিকা তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে এমন অনেক কথাও বলিয়াছেন যাহা সাধারণের চিন্তনীয়। কাব্যসম্বন্ধে লেখিকার বিচার-শক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়।

সমস্যা—শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। নারীজাতি সম্বন্ধে যে সব নিন্দা-বাদ প্রচলিত আছে লেখিকা তাহারই প্রতিবাদছলে কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন। নিন্দার মূলে সাধারণতঃ একটা নীচ বৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্য নিন্দাবাদ সব সময়ে সত্য কি না তাহার বিচার আবশ্যক। অনেক চিন্তাশীল লেখক নারীজাতি সম্বন্ধে যে সব নিন্দাবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহার অনুমোদন আমরা করিতে চাই না। লেখিকাও কিন্তু পুরুষজাতিকে দুই চারিটা কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। ব্যক্তিগত সাংসারিক যে কলহ তাহা সাহিত্যে জাতিগত হইয়া উঠিয়াছে।

যুগাবর্ত্তে ভারতের আদর্শ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত। লেখক বলেন আমরা ভারতমাতাকে রাজরাজেশ্বরী মহাকালীর মূর্ত্তিতে দেখিতে চাই। ইহার জন্য সাধনা আবশ্যক। "ভারত আবার স্বাধীন হইবে। কিন্তু সে স্বাধীনতা একটা বিরাট ভাবের চেতনা ও ঐশ্বর্য্য লইয়া

গড়িয়া উঠিবে। উহাই হইবে ভারতের স্বধর্ম্মের উদ্‌যাপন। যে অজ্ঞানতা ও অবসাদ, ভয় ও দুঃখ দেশের বুকে জগদ্দল পাথরের মত আজ চাপিয়া বসিয়াছে, আত্মার অমোঘ 'অভী'র আলোকে তাহা বিদীর্ণ করিয়া জ্ঞানের অস্ত্রে অজ্ঞানতার সহস্র নাগপাশ ছিন্ন করিয়া ভারতকে উঠিতে হইবে জগদ্বিজয়ায়।" ভাব উদার, ভাষা কিন্তু অলঙ্কারের ভারে প্রপীড়িত।

রস কথা—শ্রীযুক্ত প্রভাকর মুখোপাধ্যায়। আলোচনা অগভীর। অবান্তর কথা বাদ দিয়া ও রসিকতার বিফল চেষ্টা না করিয়া লেখক আলঙ্কারিকদের রীতি অবলম্বন করিলে হয়ত বিষয়টি পরিস্ফুট হইত। রচনার ভূমিকায় লেখক পুরাণ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন কথকরা বোধ হয় লিখিতে জানিতেন না—তাই তাঁহাদের মুখের কথাগুলি অনেক বৎসর পরে অরসিক শ্রোতারা ধরিয়া বাঁধিয়া পুরাণ বলিয়া খাড়া করিয়াছে। তাহাতে আপনারা পাইবেন সবই —ছানা, চিনি, সবই আছে, নাই কেবল রসগোল্লা।—লেখক হয়ত রসগোল্লার রস উপলব্ধি করিতে পটু, কিন্তু কাব্যরস সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই।

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনের Political Philosophy of Robindranath পাঠ করিয়া কবি বলিয়াছেন 'আমার প্রতি তাঁর মনের অনুকূল ভাব থাকাতেই আমার মতকে অনেক অংশে প্রচলিত মতের অনুকূল করে সাজিয়ে আমাকে সাধারণের প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন।" গ্রন্থের "অসারতার প্রতি এই ইঙ্গিতের পর কবি আপনার রাষ্ট্রনৈতিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে।" এই বৈশিষ্টটুকু কবি অতি সুন্দর ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যাঁহারা দেশের কথা ভাবেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিবেচ্য। "ইংরেজ আমাদের রাজা কিংবা আর কেউ আমাদের রাজা এই কথাটা তলিয়ে দেখবার সময় নষ্ট না করে, সেবার দ্বারা ত্যাগের দ্বারা নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করতে হবে।" এই কথায় কবি রাষ্ট্রনীতির চরম লক্ষ্য কি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কায নির্ব্বাহ করতে পারব তার পরিচয় স্বরাজ পাওয়ার আগেই দেওয়া চাই।" এ বিষয়ে সম্ভবতঃ কাহারও অমত নাই। তবে সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারেরও প্রয়োজন আছে এ মতও অনেকে পোষণ করেন।

রামমোহন রায় ও রাজারাম—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রবন্ধে লেখক রাজারামের জন্মকথা ও রামমোহনের ব্যক্তিগত জীবনের কলঙ্কের কথা ও তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ উল্লিখিত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, রামমোহন তিনটি পত্নীর পাণিগ্রহণ করিয়াও শৈবমতে এক মুসলমানীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজারাম তাঁহারই গর্ভজাত। সতর্ক ঐতিহাসিক-অনুসন্ধিৎসা প্রবন্ধটিকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

কাবুলিওয়ালা—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। লেখক কাবুলিওয়ালাকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রাশিয়ার গণতান্ত্রিক মতবাদের স্বপক্ষে লেখক অনেকগুলি এমন কথা বলিয়াছেন যাহা আজকাল অনেকেরই বিবেচ্য। লেখক বলেন রাজনৈতিক জীবনের চেয়েও একটা বৃহত্তর আধ্যাত্মিক জীবন আছে। রাজনৈতিক কোলাহলে অনেকের ধারণা হইতে পারে রাজনৈতিক জীবনই সব, আধ্যাত্মিক জীবন একটা অলীক স্বপ্ন। লেখক এই ধারণাটা খণ্ডন করিতে চান্। প্রবন্ধটি সাময়িক। রচনাটি পড়িলে মনে হয় তিনি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। তিনি বলেন "কাবুলিওয়ালা তার বৈশ্য আত্মা নিয়ে তার বৈশ্যবুদ্ধি ও বিশেষ সীমাবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে বড়বাজারে বসে যে কথাই বলুক না কেন, বোলপুরে এসে যেন সে অনধিকার চর্চ্চা না করে।" আধ্যাত্মিক জীবন শুধু বোলপুরেই আবদ্ধ এমন ধারণা নিশ্চয়ই লেখকের নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সব দেশেরই কথা এবং এ কথার সৃষ্টি শুধু বোলপুরেই হয় নাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের কথাই বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। কবির কথা উদার, লেখক কিন্তু তাহা বিশেষভাবে বিবৃত করিতে গিয়া কতকটা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটি সুলিখিত, কিন্তু রচনায় যে ভাবভঙ্গী প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সর্ব্বত্র প্রীতিপ্রদ হয় নাই।

মাসিক বসুমতী—কার্ত্তিক।

ভোলা ময়রা—কবিভূষণ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে বি-এ উদ্ভটসাগর। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য জীবন-চরিত। জানিবার কথা অনেক আছে। লেখক মহাশয় গভীর অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিয়াছেন তাহা হইতে বলিতে পারেন যে বাগবাজারে ভোলানাথের দোকান ছিল। আর তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছেন, যে ভোলানাথ পূর্ব্বে সিমলায় থাকিতেন, কলিকাতাই তাঁহার জন্মস্থান। এই শুনা-কথার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত 'ভোলানাথের জন্মস্থান গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেণীতে তাহার বিবাহ হইয়াছিল' ইত্যাদি কথা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ঈশান বাবুর এই সকল কথা তাঁহার স্বকপোল কল্পিত।" কিন্তু বর্ত্তমান লেখক গভীর অনুসন্ধানেও এমন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই যাহা হইতে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের মত খণ্ডিত হয়।

সতীত্ব—ক্রমশ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ। পূর্ব্বের মতই সুন্দরভাবে চলিতেছে। সতীত্বের ধারণা লেখকের খুব উচ্চাঙ্গের—তাঁহার মতে "স্বামীর তুষ্টি প্রীতিকে সব বিষয়ে বড় করিয়া নিজেকে তাহার মধ্যে বিলাইয়া দিয়া পতিকে নারায়ণ ভাবিয়া সেবা যিনি করেন তিনিই সতী।"

মরু সমুদ্রে—শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ। সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী। সিট্রোন মধ্য আফ্রিকা অভিযান সম্প্রদায় মোটরযোগে দুস্তর সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিয়া যে সকল বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা।

"দপ্তরের" ভিতর প্রথমেই শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় 'শ্রীরাধার প্রেম' সম্বন্ধে অল্প কথায় একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য হইতেছে, "শ্রীরাধা শ্রীভগবানেরই হ্লাদিনী শক্তি, তাঁহারই স্বরূপ। শ্রীরাধা ভগবানেরই অর্দ্ধাঙ্গ। ইচ্ছারূপা রসময়ী, শক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেমই, শ্রীভগবানের প্রেম। এ প্রবন্ধে যুক্তিতর্কের অবতারণা নাই—আছে ভাবের উচ্ছ্বাস। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী বি এ মহাশয় 'ভারতের স্বরূপ' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, তপোবনই আমাদের সভ্যতার উৎপত্তি স্থল, ইহার শ্যামল শোভার ভিতর আর্য্যঋষি একদিন ভগবানের উপলব্ধি করিয়াও মধুর শান্তরসে আত্মহারা হইয়া কত দর্শন কাব্য ধর্ম্মকাহিনীর জন্মদান করিয়াছেন—তপোবনের সেই সরল শিক্ষা ভারতকে ভোগবিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইতে দেয় নাই—মানুষে মানুষে লড়াই ও দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার এই আসুরী শিক্ষা তপোবনের শান্ত আকাশের নীচে ঘটিবার কোন উপক্রম হয় নাই। আর 'ভারতের সত্যস্বরূপ' দেখিতে হইলে তপোবনের সেই শান্তিময় সুন্দর চিত্র কল্পনায় উদ্ভাসিত করিতে হইবে। এই প্রবন্ধেও ভাবের উচ্ছ্বাস অতিমাত্রায় আছে। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্যের নব আবিষ্কৃত প্রাচীন পদসংগ্রহ এখনও চলিতেছে।

বিবাহ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন। এই সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধে অল্প পরিসরের ভিতর বাল্য-বিবাহ ভাল কি যৌবন-বিবাহ ভাল তাহা বিচার করিয়া লেখক বাল্যবিবাহই সমর্থন করিয়াছেন ও বাল্যবিবাহের বিরোধী দলেরা শিশু মড়ক ও প্রসূতি মড়কের প্রাবল্যের কারণ যে ইহাই বলিয়া থাকেন, তাহাও যে যুক্তিসহ নয় তাহা দেখাইয়াছেন।

ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ।

ডিগ্রীর অভিশাপ—আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়। টাঙ্গাইল ছাত্র-সম্মিলনীতে যে মৌখিক বক্তৃতা আচার্য্য দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ শ্রীমান মনোরঞ্জন গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুলিখিত হইয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল প্রমাণ কথা আচার্য্যদেব সর্ব্বত্র বলিয়া আসিতেছেন সকলগুলি এখানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালার যুবকেরা ডিগ্রী পাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন—শুধু যে তাঁহারা হন তাহা নয়, তাঁহাদের অভিভাবকরাও তাহাই চান। ইহার ফলে ছাত্রেরা বি-এ এম-এএর স্বপ্ন দেখেন। তাই তাঁহাদের জীবনটা স্বপ্ন হইয়াই থাকে কর্ম্মে নিয়োজিত হয় না। ফলে দেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত উকিল ব্যারিষ্টারের সৃষ্টি হইতেছে। তাহার পর এই সুচিন্তিত প্রবন্ধে লেখক হাতে কলমে কার্য্য করিবার মনোবৃত্তির অভাবের দরুণ পাশ করা ছাত্রদের অন্ন সমস্যা উত্তরোত্তর যে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। কৃষি ও শিল্প বিদেশ হইতে শিখিয়া আসিয়া ছাত্রেরা কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিতে পারেন নাই তাই দুঃখ করিয়া লেখক বলিয়াছেন—'বিদেশী বিদ্যার কোন ফল লাভ হইতেছে না। ডিগ্রী লাভের উৎকট চেষ্টার-ফলে প্রকৃত বিদ্যালাভ হইতেছে না—পরীক্ষা পাশই হইতেছে। তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন অনেকের ডিগ্রী অজ্ঞতার আবরণ মাত্র, জ্ঞানের পরিচায়ক নয়। ছাত্রগণ মানুষ না হইবার কারণগুলি এই সুচিন্তিত প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে ব্যসন ও সাহেবিয়ানার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া তিনি হাতের কাজের দিকে মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন। এই সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রত্যেক ছাত্রের অবহিত হইয়া পাঠ করা উচিত। তাহাদের আর একটী সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই কর্ত্তব্য। সেটা আচার্য্য দেবের কথায় বলি—ম্যাট্রিক পাস করিয়া 'ছাত্রগণ কলেজে গেলে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করে, সর্ব্বপ্রকার ব্যসনে কালাতিপাত করে। ক্রমে ইহাদের বাসভূমি ও আত্মীয় সজনের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। ইহারা গৃহকর্ম্ম অপমানজনক বলিয়া মনে করে, নিজ স্বার্থে মগ্ন হইয়া আশা করে যে সে কলেজে পড়ে এই দাবীতে সমস্ত পরিবার তাহার সেবা করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবে। এইরূপ বিবেচনা করা কোন মতেই উচিত নয়। পিতামাতা অভিভাবক দিগের যেমন কর্ত্তব্য আছে, তাহাদেরও কি সেইরূপ কর্ত্তব্য নাই ?

উৎসব—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন বি-এ। এই সচিত্র মনোজ্ঞ ভ্রমণ কাহিনীতে বর্ম্মার কয়েকটী উৎসবের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বর্ম্মা দেশের লোকেদের সমগ্র জীবন যেন উৎসবময়। তাহারা এই সকল উৎসবে প্রাণ ভরিয়া আনন্দ করে।

নৃত্য—স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ। এই ক্ষুদ্র সঙ্কলিত প্রবন্ধে য়ুরোপের নৃত্য-কলার ক্রমবিকাশের সামান্য একটু ইতিহাস আছে। পূর্ব্বে সেখানে নৃত্য "শুধু ধর্ম্ম ও প্রণয়-ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল, পরে ব্যবসায়ে দাঁড়াইল।" য়ুরোপীয় 'ক্লাসিক' নৃত্য মিশর দেশ হইতে গ্রীসে ও 'ব্যালে' নৃত্য ইটালীতে সমধিক বিকাশ লাভ করে। মোটামুটি ইউরোপের নৃত্য-কলার পরিচয় দিয়া লেখক ভারতীয় নৃত্য-কলার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু নূতন কোন কথা বলিতে পারেন নাই। ইউরোপে ও ভারতে নৃত্যের তুলনা লেখক এই ভাবে করিয়াছেন—"ইউরোপীয় ও ভারতীয় নৃত্যের আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক। ইউরোপের চারুশিল্পের মত নৃত্যও সেখানে রূপপ্রধান। আমাদের নৃত্যে রূপের সমাবেশ থাকলেও তা ভাব-প্রধান। রূপ-প্রধান ব'লে ইউরোপীয় নৃত্য বিরসের দ্যোতক, ভারতীয় নৃত্য ভাব-প্রধান ব'লে আধ্যাত্মিকতার পোষক। দেহের রূপ সীমাবদ্ধ, সুতরাং ইউরোপীয় নৃত্য সসীম, ভাব অনন্ত, তাই ভারতীয় নৃত্য অসীম।" পরিশেষে লেখক বলিয়াছেন "নৃত্য-কলা কৌশলে মানুষের সীমাবদ্ধ বিক্ষিপ্ত মনকে যিনি অনন্ত ভাবময়ের দিকে নিয়ে যেতে পারেন, তাঁরি নৃত্য সার্থক।" কিন্তু কি ভাবে নৃত্য

করিয়া এই সার্থকতা আনিতে পারা যায় তাহার ইঙ্গিতমাত্রও লেখক এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কোথাও করেন নাই।

গোগল ও রুশ সাহিত্য—শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। গোগলের লেখার আলোচনা অল্প পরিসরের ভিতর লেখক করিয়াছেন। গোগলের বৈশিষ্ট্য হাসিতে কিন্তু তাঁহার উৎসাহদাতা কবিবন্ধু Pushkinএর ভাষায় বলিতে পারা যায়—এই হাসির অন্তরালে এক অদৃশ্য অশ্রু প্রবাহ লুক্কায়িত আছে। ইহার পূর্ব্বে লেখক রাশিয়া দেশের কথা-সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়াছেন, সেও যৎসামান্য, পড়িয়া তৃপ্তিলাভ হয় না। রাশিয়ার তখনকার সমালোচক ব্রায়নস্কি রুশ লেখকগণকে পরস্ব প্রত্যাহার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে উপদেশ দেন। রাশিয়ার সত্যকার ধুলা-মাটি আনন্দ-বেদনায় সহিত পরিচিত না হইলে অনাগত ভবিষ্যতে রুশ-সাহিত্যের আসন প্রস্তুত হইবে না। ফলে গোগলের আবির্ভাব হইল। লেখক বলিয়াছেন—ব্রায়নস্কি ডাক না দিলে হয়ত গোগলের আসা হইত না; গোগল না পৌঁছিলে হয় ত তুর্গেনিফ ও টলষ্টয়ের জন্য আরও কিছুকাল ধরিয়া অপেক্ষায় থাকিতে হইত। বস্তুতঃ গোগল তাঁহার গল্প উপন্যাস ও প্রহসন দিয়া রাশিয়ার সাহিত্যে যে জমী প্রস্তুত করিয়া যা'ন তাহাতেই তুর্গেনিফ করিয়াছিলেন বীজবপন এবং সেই বীজই টলষ্টয় ও গর্কীর হাতে পড়িয়া এমনি ছায়া ও ফলশালী হইয়া উঠিয়াছে।'

মধ্য ভারত—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী। এবারে ইলোরার বর্ণনা আছে। বর্ণনা বেশ সরল ও সরস।

চাই শিক্ষা চাই স্বাস্থ্য—ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়। এই সুচিন্তিত প্রবন্ধে লেখক বলিতে চান, 'বর্ত্তমান সময়ে আমরা "মা-বাপ" ইংরাজের হস্তে আমাদের শিক্ষার পুরা ভার ও চিকিৎসার কতকটা ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। ফলে শিক্ষা-ব্যাপারে আমরা পুরা দস্তুর ইংরাজের অনুবর্ত্তিতা ও অধীনতা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু এরূপ করিলে ত চলিবে না।' শিক্ষার ভার আমাদের লইতে হইবে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যাঁহাদের শারীরিক অথবা মানসিক দীনতার জন্য অপর কোনও উপায়ে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহারই শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হন।' অবশ্য লেখক এ কথা বলেন নাই যে শিক্ষক দিগের মধ্যে মনীষাসম্পন্ন অথবা অনন্ত-সাধক ব্যক্তি নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের সংখ্যা অতীব সামান্য।' যে সকল শিক্ষক কর্ম্মকুশল নন তাঁহারা ছাত্রদের নিকট হইতে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন না। ফলে ছাত্রদিগের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়িয়া চলিতেছে। নির্জ্জীব নিগৃহীত শিক্ষকেরা যখন সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছেন, তখন কি অভিভাবকদের একটা সংঘ গঠিত হইতে পারে না? সংঘবদ্ধ ভাবে অভিভাবকেরা ছাত্রদিগের উপকারের পথ দেখাইয়া দিবার ধৃষ্টতা কি রাখিতে পারেন না, বাস্তবিক এ প্রস্তাব খুব সমীচীন। অতঃপর অভিভাবকদের পক্ষ হইতে লেখক যে কয়টী অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন, শিক্ষকসঙ্ঘ যদি সেগুলির দিকে যদি অবহিত হন তাহা হইলে দেশের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ডাঃ রায় মহাশয় বহুদিন ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের দিকে অবহিত হইতে দেশের লোককে বলিয়া আসিতেছেন কিন্তু তাহার উপদেশগুলি কি অরণ্যে রোদনের মতই নিষ্ফল হইবে?

কবিতা

বিচিত্রা—কার্ত্তিক।

মাঙ্গলিক—শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়। মোটের উপর সরল ও স্বচ্ছ রচনা, তবে রবীন্দ্রনাথের conventionএর মোহে লেখক মাঝে মাঝে রচনার মধ্যে আবিলতা আনিয়াছে। সম্যক পরিপাক শক্তি না থাকিলে সারবহুল ভোজ্য দুষ্পাচ্য হইয়াই ওঠে। জগতের তরুণ তরুণীদের সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন, "বজ্রস্তবক বসন্ত অবনত, মলয়গন্ধী সুরা তোমাদের ঠোঁটে!" "তোমাদের কেহ ঘরে ডাকি জনে জনে আপনা বিলায়ে দিলে দধীচির মতো" এর কিছু অর্থ আছে কি? ওস্তাদের তরবারি আনাড়ির হাতে পড়িলে আনাড়ির হাত কাটিয়া যায়। প্রত্যেক stanzaয় তিন বার করিয়া এই লাইনটি দেখা যায়—"ওগো জগতের তরুণ তরুণী যত।" এই লাইনটিতে এমন কি মধু আছে যে ১২বার এনকোর দিতে হইল? সধবার একাদশীতে মাতাল জামাই ভোলানাথ যেমন প্রত্যেক কথায় ন্যার ন্যার করিয়া লোকের মাথা ধরাইত এও প্রায় তদ্রূপ।

মানুষ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৪টি সনেট, ১৭নং হইতে ২০নং। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" আর কবি বসন্তকুমার লিখিতেছেন—"কর সুরাপান মত্ততা বিবশভ্রান্তি দিবে সত্যজ্ঞান" (১৭নং) সত্যজ্ঞান লাভের এই অতি সহজ উপায়টি বসন্ত বাবু সত্বর পেটেণ্ট করিয়া লউন, বিলম্বে কার্য্যহানি হইতে পারে। যুগাবতার পরমহংসদেব কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, বসন্ত বাবু ১৮নং সনেটে তাহার উত্তর দিতেছেন "অকৃতজ্ঞ তুমি নয় করিছ বর্জ্জন সৃষ্টির এ শ্রেষ্ঠদান কামিনী কাঞ্চন।" ১৯নংও বড় কম যান না—"পরিপূর্ণ ভোগ বিশ্বে মুক্তির নিদান। ত্যাগে মুক্তি? অসম্ভব অলীক বিধান।" ২০নং সনেটের শাণিত অস্ত্র চালিত হইয়াছে যত সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বিধি ও বাধার বিরুদ্ধে। সাধু সাধু! এই রকম করিয়া যে 'মানুষ গড়িয়া উঠিবে', বনমানুষের সঙ্গে তাহা কতটুকু পার্থক্য থাকিবে? —তত্ত্ব কথা প্রচারে যাহাই হউক, রচনা হিসাবে সনেটগুলি সরল ও সবল।

শারদোৎসব—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন শাস্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ ও অনুসরণ। শুধু অনুকরণ হইলে রচনাটিকে ব্যর্থ বলিয়াই মনে করিতাম। ছন্দও পরিপাটি, তবে সত্যেন্দ্রনাথ হইতে পর পর অনেক কবিই এই ছন্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। মূল কবিতাটির চেয়ে প্রস্তাবনাটিই আমাদের ভাল লাগিল, "বাদল দিনের বন্ধ টুটে শরৎ এবার ফুটল ধানে" চমৎকার ব্যঞ্জনাযুক্ত লাইন।

স্রোতের ফুল—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। সাধারণ চলনসই রচনা, তাই মানে বুঝিতে বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু লেখক বেই বুঝিতে পারিলেন যে একটু কায়দা না করিলে একটু বৈশিষ্ট্য না দিলে রচনার

আর সার্থকতা কি, অমনই তাঁহার ঘাড়ে ভূত চাপিল, আর তিনি লেখাটি এই রকমে শেষ করিলেন।

স্রোতে ভেসে আসা, কেন বিমলিন
ঝরা বাসি ফুল—তবু এত দীন ?
প্রণয়-ব্যথার রাঙা হিয়া—হায়
তুমি পরো বেণী মূলে ?

"কেন বিমলিন" মানে কি ? 'তবু'র সার্থকতা কি ? প্রণয় ব্যথায় রাঙা হিয়া কার ?

ছন্দের জন্মকথা—শ্রীমতী লীলা দেবী। ভাবটি বেশ সূক্ষ্ম ও গভীর, কিন্তু প্রকাশের অক্ষমতায় কবিত্ব ঢাকা পড়িয়াছে। মিলের খাতির রাখিতে গিয়া লেখিকা এক টানা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রধান লক্ষ্য রাখিয়াছেন নিখুঁত মিলের দিকে, অর্থের দিকে চাহিলে হয়ত মিল ভেস্তাইয়া যায়। এই দোটানায় পড়িয়া হাবুডুবু খাওয়ার চেয়ে মিলের পাড়ি জমানই সুবিধাজনক বুঝিয়া কবি কাব্য-তরীতে হাল ধরিয়াছেন।

সন্ধ্যায়—শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। স্নিগ্ধ সরল রচনা, ভাব, ভাষা রসের ক্রমবিকাশ সমস্তই সুন্দর। কবির কল্পনা উত্তুঙ্গ গিরি শৃঙ্গে আরোহণ করে নাই, সুগভীর সিন্ধুতলেও গুপ্ত রত্নান্বেষণে নিমগ্ন হয় নাই, কিন্তু সমতল ভূমিতে ধীরপদ-বিক্ষেপে সুখে বিচরণ করিতেছে। ইহাতে বিশেষ বাহাদুরী না থাকিলেও বিপদের আশঙ্কা নাই।

প্রিয়া—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস এম-এ। আরম্ভটা এইরূপ—

সহসা প্রভাতে আজি হেরিনু প্রিয়ারে।
মনে হ'ল কত দিন দেখি নাই তারে
আপন হৃদয় মাঝে।

এ রকম খানিকটা উচ্ছ্বাসের পর রচনাটি শেষ হইল এই রকমে—

কোন সে রহস্যময়ী চির সঙ্গোপনে
রেখেছে প্রিয়ারে ঢাকি রহস্য বেষ্টনে!

প্রিয়াকে লইয়া এই রকম 'কাব্য করা' বাংলা-সাহিত্যে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কবিগুরুর মানস-সুন্দরীর পর এই ধরণের কবিতা লেখা খুবই বিপজ্জনক সন্দেহ নাই—কিন্তু তাই বলিয়া ত লেখা বন্ধ করা যায় না।

স্মৃতির বেদন—শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র মজুমদার। মামুলি প্রথা বজায় রাখিয়া এই 'স্মৃতির-বেদন' জাগিয়া উঠিয়াছে। হরেক রকমের 'ফুল' 'জোছনা, 'চকোর' 'ব্যাকুল বাতাস' প্রভৃতি বিরহের সমুদয় উপাদানেরই আমদানী করা হইয়াছে। অতএব কাব্য হইয়াছে বৈ কি!

রামমোহন—শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার শর্ম্মা। যুগ-প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাম-মোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। কাব্য রস না থাকিলেও সত্য-রস আছে। শেষ লাইনে কবি আর ছন্দের বাধা মানেন নাই, যুক্তির গানে না মানাই ভাল।

রয়েছে দীপ না আছে শিখা—শ্রীযুক্ত বিমল মিত্র। প্রকৃতির মিলনোৎসবের মধ্যে বিরহীর বিষাদ বেশ মনোজ্ঞ ভাষায় উপযোগী ছন্দে ললিত-করুণ ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয়-বস্তু সাধারণ নয়, তবুও দোষের বা ত্রুটির অভাবে কবিতাটি সুখ-পাঠ্য ও সুখ-বোধ্য হইয়াছে। ইহাই যথেষ্ট।

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ।

ঝড়ের যাত্রা—শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চৌধুরী। সরস ও সরল রচনা দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী উৎসাহ ব্যঞ্জক এই কবিতাটি পাঠ করিয়া হৃদয়ে আশার উদ্দীপনা জাগে। তবে রচনাটির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যধিক।

নিশি-ভোর—শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার। কবিতাটির প্রথম দু'লাইন ও শেষ দু লাইন তুলিয়া দিতেছি, ইহা হইতেই কবিতাটির মূল সুরটি ধরা যাইবে।

তুমি এলে, যবে মধুমালতীর কুঞ্জে মোর
মুকুলে মুকুলে ফুলের স্বপন হয়নি ভোর।

*

তুমি গেলে, যবে মধুমালতীর কুঞ্জে মোর
ফুটিল মুকুল—ফুলে স্বপন হ'ল যে ভোর।

শব্দ-যোজনা, ছন্দ, মিল সবই পরিপাটী, কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য আনিতে গিয়া রচনাটিকে কবি স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন।

কালো টুপি-পরা কৃষ্ণা তিথির আধেক চাঁদ
ঝাউবীথি-শিরে দাঁড়ায়ে হেরিছে ছায়ার-ছাঁদ!

চাঁদের মাথায় কালো টুপি উদ্ভট কল্পনা বলিয়া সাধারণ পাঠকের মনে হইতে পারে, কিন্তু কবি বোধ হয় তাঁহার কবিজনোচিত দিব্য-দৃষ্টিতে বুঝিয়াছেন যে অর্দ্ধ-চন্দ্রের মাথায় ঐ কালো টুপি না থাকিলে "ঝাউবীথির শিরে" চন্দ্রদেব "দাঁড়াইতে" পারিতেন না, আর যদিও বা দাঁড়াইতেন "ছায়ার ছাঁদ" কিছুতেই তাঁহার নয়ন-গোচর হইত না। কবি করুণানিধানও আগে "সোণার টোপর" পরাইয়া ছিলেন, পরে 'ভূর্জ্জ-বনানী'কে 'স্বপন' দেখাইয়াছিলেন।

দেখি নাই তার নয়নে ছিল কি নীলিম ক্ষুধা,

নয়নের ক্ষুধা কাজেই 'নীলিম', উদরের ক্ষুধা হইলে বোধ হয় 'রক্তিম' হইত। "অধীর-থির" অর্থাৎ "অস্থির-স্থির"? সাদা-কালো বলিলে যদি ঐ দুই রঙের মাঝামাঝি পাঁশুটে রং বোঝায় তবে 'অধীর থির'ও কি ঐ রকম 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবের একটা কিছু? 'ছায়া'কে 'রূপের ভাতি' বলা হইয়াছে—ভাতি মানে কিন্তু আলো। 'রৌদ্রময়ী রাত্রি'র নজীর কিন্তু এখানে চলিবে না।

'যে-রূপ রাতের স্বপন-সভায় ঝরঝরা!' এও যে আর একটি "হিং টিং ছট্"!

বিশ্ব-কবির সুবিখ্যাত 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতাটির প্রভাব হইতে

নিস্তার পাইবার আশায় ভিন্ন পথে চলিয়া কবি মোহিতলাল এমন বিপদেও পড়িলেন।

ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ।

শিশুর দৃষ্টি—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর। কবিতাটী অবহেলায় রচিত। রচনায় শৃঙ্খলার অভাবে রস-সৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যেটি ৮।১০ লাইনে বলা চলিত সেটী ২৮ লাইনে বলিয়া কবি নিজ পরিশ্রমের লাঘব করিয়াছেন। এর মধ্যে আবার "ব্যাস-কূট"ও আছে :—

সৃষ্টি তোমার বিম্বসম জেগেই গীয়মান

এই লাইনটি বুঝিতে শিশুর পিতামহেরাও এই পৌষের শীতে ঘামিয়া উঠিবে। কবিতাটির প্রথম দু' লাইন এইরূপ :—

শিশু তুমি শিল্পী বড় মোহন তোমার কারু,
যুগে যুগে জগৎ জুড়ে সৃষ্টি তোমার চারু।

অবসর—কুমারী মমতা মিত্র। বৈশিষ্ট্যহীন রচনা। মনের ভাবটি সরল পদ্যে ব্যক্ত হইয়াছে এই মাত্র। কাব্য-রসের অভাব। সব যায়গায় মিলও ঠিক হয় নাই।

ময়নামতীর চর—বন্দে আলী মিয়া। সরল, স্বচ্ছ, রসাল রচনা। উপযুক্ত আব্‌হাওয়ায় সৃষ্টি করিয়া কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। দু' একটি রেখাপাতে অতীতের উজ্জ্বল চিত্রের আভাস দিয়া কবি বর্ত্তমানের ভীষণ চিত্রখানি বেশ দক্ষতার সহিত আঁকিয়াছেন। যেখানে এক কালে হাট ছিল সেখানে এখন শ্মশান হইয়াছে :—

মানুষ যেথায় পায়ে হেঁটে গেছে বিকিকিনি করিবারে
চৌদলে চড়ি আসিছে সে আজ মরণ অন্ধকারে।

নানা রসের মধ্যে আদি রসের ছিটাও আছে, কবি হয়ত ভাবিয়াছেন এটকু না থাকিলে তাঁহার কবিতাটি মাঠে মারা যাইবে, তাই সকলের মুখরোচক করিবার জন্য এই দুই লাইনে একটু আমিষ পরিবেষণ করিয়াছেন :—

চক্‌ মজিদের মোয়াজ্জিনের গুণের ছিল না শেষ
দরগা পীরের বিবিকে লইয়া হলো সে নিরুদ্দেশ।

—মনে হয় এই কবিরই রচিত 'ময়নামতীর চর' নামে একটি কবিতা কোন মাসিক পত্রে পড়িয়াছিলাম।

স্নেহের দাগ (দান ?)—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ। বাহিরে খুঁচিতে দেখিলাম স্নেহের দান, ভিতরে দেখিলাম স্নেহের দাগ। একটি ভাব নানা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান হইয়াছে। ক্লাসে ছাত্রদের কাছে এই রকম দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যক্যটি সুবোধ্যকরার উপযোগিতা থাকিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বত্র এ প্রথা চলে না। যাহা হউক 'দান' হিসাবে ইহার সার্থকতা নাই আর 'দাগ' হিসাবেও ইহা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল—পাঠকের মনের পটে এ দাগ বেশীক্ষণ থাকিবে না। তবে এটি 'স্নেহের' বলিয়াই পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

মাসিক বসুমতী—কার্ত্তিক।

রক্ত-করবী—৺মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ। শব্দ-লালিত্য আছে। পর পর গুটিকতক উপমা সাজাইয়া রক্ত-করবীকে ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে রচনায় কৃত্রিমতা আসিয়া পড়িয়াছে।

রূপের ভাষায় কোন রাগিণীর সুর
ভৈরবী, ললিত, টোড়ী, বাহার, বেহাগ

রক্ত-করবীকে এই সব সুরের মধ্যে পাওয়ার আশা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়।

শেষ সজ্জা—শ্রীমতী সুজাতা ঘোষ। অভিব্যক্তির দোষ ঘটিলে ভাবটি ধরিতে পারা যায় না, আবার ভাবের ধারণা সুদৃঢ় না হইলে সম্যক অভিব্যক্তিও হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ হয় দুইটি দোষেরই সমাবেশ হইয়াছে।

আশা পথ—শ্রীমতী সরোজবাসিনী বসু। আশা নাই।

তুলনা—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। একে ত অতি সাধারণ ভাব, তা আবার রচনার দোষে আরও 'খেলো' হইয়া গেছে। মুনীন্দ্র বাবু ত দেখিতেছি কলম ধরিয়াছেন অনেক দিন হইতে, কলমেরও বিশ্রাম বড় নাই, তবুও রচনায় ছন্দ ও মিল ঠিক থাকে না কেন? এত দিনে যাহা আয়ত্ত হইল না তাহা পরিত্যাগ করাই সুবোধের কার্য্য।

প্রসাধন—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। ললিত-মধুর রচনা। ছন্দ, মিল নিখুঁত। তবে প্রিয়ার প্রসাধন লইয়া এমন অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। কবি বিষয়ান্তরে এই শক্তির প্রয়োগ করিলেই ভাল হইত।

মরুর প্রেম—শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মণ্ডল বি-এ। উদ্ভট কল্পনাবলে কবি একটি সাধারণ শিরোনামার নীচে হরেক রকম ভাবের আমদানী করিয়া রচনাটিকে অসংলগ্ন উক্তির সমষ্টিতে পরিণত করিয়াছেন। ভাবের সামঞ্জস্য বা শৃঙ্খলা নাই।

স্মৃতির স্বপন—শ্রীযুক্ত উমাপদ মুখোপাধ্যায়। বিরহীর বিলাপ, সেই মামুলী একঘেয়ে নাকী সুরে কান্না।

যৌবন-প্রশস্তি—শ্রীযুক্ত বিমল মিত্র। সরল, স্বচ্ছ রচনা। ভাবে ভাষায় প্রকাশ-ভঙ্গীতে কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়টী পাঠকের মনে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়। রচনার সার্থকতা ত এইখানেই।

পথের বাণী—শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ দোষ গুণ বর্জ্জিত চলনসই রচনা। সমস্ত উপাদান সংগ্রহ না করিয়া রস-সৃষ্টির প্রয়াস সফল হয় না।

সত্য ও সুখ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সরকার বি-এল। কবিতা নয়, তত্ত্ব প্রচার। মিল ও ছন্দ ঠিক নাই। পদ্যে কিন্তু এগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে। রস-সৃষ্টি ত দূরের কথা।

কথা-সাহিত্য

বিচিত্রা—কার্ত্তিক।

প্রতিষ্ঠাহীন—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী। গ্রামের কবিরাজ, ডাক্তারের আগমনের পর আপনার প্রতিষ্ঠা হারাইয়া উপহাসের পাত্র হইলেন। এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া লেখিকা পাঠকের অন্তরে করুণ রসের অনুভূতির উদ্রেক করিয়াছেন। দৃপ্ত ডাক্তারের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাহীন কবিরাজের চিত্রটির পার্থক্য অন্তরে আঘাত করে। গল্পের বীজ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু বৃক্ষ ফুলে-ফলে ভরিয়া ওঠে নাই। লেখিকা যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা আংশিক। গল্পটির ধ্বনিত অর্থ যদি কিছু থাকে তাহা গ্রহণ করা পাঠকের অসাধ্য।

নেশা—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন। প্লট সামান্ত। মাতাল স্বামীর নেশা ছাড়াইবার ভার লইল উহার সখী ছবি। স্বামীটি মদ ছাড়িলেন কিন্তু আর একটা নেশা প্রবল হইয়া উঠিল। এ নেশা ছবির প্রতি আসক্তি। অবশেষে দুই সখীর বিচ্ছেদ। গল্পে লেখক যাহা দেখাইতে চান তাহাতে পাঠককে আকর্ষণ করিবার কোন বস্তুই লক্ষিত হয় না। গল্পে যদি কোন মাধুর্য্য থাকে তাহা নেশার মতই ক্ষণস্থায়ী ও অবসাদকর।

প্রক্ষিপ্ত—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। কথোপকথনের ছলে গীতার একটা হাস্তকর আলোচনা লেখক পাঠকের জন্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমরা ইহার হাস্তরস উপভোগ করিতে পারি নাই। বিষয় জটিল ও রসিকতা দীপ্তিহীন। যাহা কিছু লেখা যায় তাহা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেই সাহিত্যের পদ যে অধিকার করিতে পারে না তাহা লেখক নিশ্চয়ই জানেন। তবে মাসিক সাহিত্যের জগতে সম্পাদকের তাড়া ও মুদ্রাযন্ত্রের মোহে সব জ্ঞানী অবিচলিত থাকিতে পারেন না।

জয় ও জয়দা—শ্রীযুক্ত মোহিত দাশ গুপ্ত। এক অনুতপ্ত বিপত্নীকের চিত্র। চিত্রকর রংটা অধিক পরিমাণেই ব্যবহার করিয়াছেন, রচনাগত দোষও আছে। লেখক বিষয়টি গুছাইয়া বলেন নাই —বলিবার ভঙ্গীটিও বিয়োপযোগী নয়। বাজে কথা অনেক, ছোট কথাকে দীর্ঘ করিয়া বলা তাঁহার অভ্যাস। সাহিত্যক্ষেত্রে এ অভ্যাস প্রশংসনীয় এ কথা কেহই স্বীকার করিবেন না।

ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ।

নিশির ডাক—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। যে সব লোক স্ত্রীর সাধ-আহ্লাদ পছন্দ করেন না, নিজে স্বামিদেবতা সাজিয়া পত্নীকে দাসীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহাদের প্রতি একটু শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত এই গল্পে আছে। রচনাটি উপভোগ্য। কিন্তু উপসংহার এতটা বিস্তৃত না করিলেই ভাল হইত। লোক-শিক্ষার জন্ত ব্যস্ত না হইয়া লেখক যদি রচনাটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে শেষের দিকে অধিকতর সংযম প্রকাশ পাইত। বেশী কথা না কহিয়া ইঙ্গিতেও অনেক অর্থ প্রকাশ করা চলে। 'নিশির ডাক' নামটিরও বিশেষ সার্থকতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

যৌথ—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বিপন্ন স্বামীকে প্রত্যাখ্যাত পত্নী অর্থসাহায্যের দ্বারা রক্ষা করিলেন এই বিষয়টি লেখক এই গল্পে বর্ণনা করিয়াছেন। প্লটটি নূতন না হইলেও মর্ম্মস্পর্শী। তবে প্লটের ক্রম-বিকাশে নৈপুণ্য নাই; শেষটা তাড়াতাড়িতে একটু অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে। তারপর, গল্পটাও অনেকটা আজগুবি।

অভিশাপ—শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বসু। মিনতি প্রকৃতির ক্রোড়ে আজন্ম পালিতা। সুদূর আসামের চা-বাগানে হঠাৎ একদিন সিনেমার আবির্ভাব হইল। মিনতি তাহা দেখিতে গিয়া সমীরের দিকে চাহিল এবং তাহাকে ভালবাসিল। সমীর তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায় সে তাহাকে অভিশাপ দিল। পরদিনই সমীর আফিসে ইস্তফা দিয়া চা-বাগান হইতে বিদায় লইল। এখনও সে অশান্ত হৃদয় লইয়া দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কত দিন ঘুরিবে কে জানে।—আমরা গল্পটির কোন মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারি নাই। নৈপুণ্যের অভাবে রচনা অনেক স্থলে কুৎসিত হইয়াছে। Wordsworthএর ভাব লেখক কতকটা ধার করিয়াছেন—হুবহু অনুকরণ করিলে বোধ হয় বিষয়টিকে ফুটাইতে পারিতেন। এ ক্ষেত্রে গল্পটি ব্যর্থ হইয়াছে এবং অন্যের ভাব গ্রহণ করায় একটা অপবাদ হইতেও তিনি নিষ্কৃতি পান নাই।

ছায়া—শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্ন্যাল। গল্পটিও ছায়ার মত—ধরিবার ছুঁইবার কিছু নাই। মাঝে মাঝে এক একটা চিত্র মন্দ লাগে না। তবে সমগ্র রচনাটি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয় নাই। সমাজের কুৎসিত দিকটা ফুটাইয়া তোলাই লেখকের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া তিনি নিন্দাকার্য্যে বিশেষ যত্নের পরিচয় দিয়াছেন, সেই জন্ত গল্প লেখকের শিল্পচাতুর্য্য দেখাইবার অবসর তাঁহার ঘটিয়া ওঠে নাই।

স্বপ্নভঙ্গ—শ্রীযুক্ত নিত্যধন চক্রবর্ত্তী। পারুল যাত্রার দলের কেষ্টর প্রেমে পড়িয়া অকূলে ভাসিল। কেষ্ট কিন্তু অকূলের কাণ্ডারী হওয়া দূরে থাক তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। পারুলের পরিণাম লিপি-কৌশলের অভাবে তেমন মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই।

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ।

নিষ্কণ্টক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। একটি লোমহর্ষণ কাহিনী। যাঁহারা সূক্ষ্ম কলা-কৌশলের পক্ষপাতী তাঁহারা ইহার উপযুক্ত পাঠক হইতে পারেন না। তারপর লেখকের রচনা-ভঙ্গীও ছোট গল্পের উপযোগী নয়। বাক্যবাহুল্য ও অনাবশ্যক বর্ণনা গল্পটিকে বড়ই দীর্ঘ করিয়া তুলিয়াছে। রচনাভঙ্গী নিতান্ত পুরাতন। 'ছোট গল্প' বলিয়া যে ধরণের রচনা বঙ্গ-সাহিত্যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহার

তুলনায় এ রচনা নিষ্প্রভ। এখানে ঘটনা-বৈচিত্র্যের দ্বারা পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম কলা-কৌশল বা রচনা-নৈপুণ্য যাহা ছোট-গল্পের প্রাণ তাহার নিদর্শন নাই বলিলেই হয়। এক একটি দৃশ্যের চিত্রনকার্য্যে যে যত্নের পরিচয় আছে তাহার একাংশও সমগ্র রচনাটিকে সার্থক করিবার অভিপ্রায়ে নিয়োজিত হয় নাই। গল্পটি সত্য সত্যই কতকগুলি দৃশ্যের সমষ্টি—একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্রে গ্রথিত। লেখক ভাবিবার বিষয় অপেক্ষা দেখিবার জিনিষের কথাই অধিক বলিয়াছেন। রচনাটি চলচ্চিত্রে নিবেশিত হইলে হয়ত দর্শকের নিকট ইহার আদর বাড়িতে পারে।

পিতৃঋণ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রচনাভঙ্গী ও মাঝে মাঝে অন্তর্নিহিত হাস্যরসটুকু লেখকের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তবে লেখক অলৌকিক রহস্যের অবতারণায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। রহস্যটি ভয়ানক রসের সঞ্চারে কতকটা সহায়তা করিয়াছে সত্য। কিন্তু প্রচ্ছন্ন হাস্যরস ও অবান্তর বাক্যের বাহুল্য রচনাটির সার্থকতায় পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবুও মোটের উপর গল্পটি চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য।

বনিয়াদী ঘর—শ্রীমতী সীতা দেবী। বনীয়াদী ঘরের নারীর বর্ণনা করিয়া লেখিকা কতকটা সামাজিক গলদই দেখাইয়াছেন। সমাজ-সংস্কারকের নিকট ইহার কতকটা মূল্য আছে। তবে সাহিত্যরস হিসাবে ইহার মূল্য সামান্য। গল্পের উপসংহার ভাগও অস্পষ্ট।

গুঞ্জরি—শ্রীমতী সুখব্রতা রাও। এক ক্রোধী পিতা ও তাহার ক্রোধের পাত্রী কন্যা গুঞ্জরির কথাটি অনাড়ম্বর ও করুণ। গুঞ্জরির ক্ষমাগুণ সরস সুন্দর ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে।

মাসিক বসুমতী—কার্ত্তিক।

গর্ব্ব ও জ্ঞান—শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য। গর্ব্বান্ধ গুরু ও জ্ঞানী শুরুর পার্থক্য এই গল্পে দেখানো হইয়াছে। এই সামান্য বিষয়টুকু ফুটাইতে গিয়া লেখক অলৌকিক ব্যাপারেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। রচনায় সূক্ষ্ম কলা-কৌশলের পরিচয় নাই। তবে যাহাতে ব্যবসায়ী গর্ব্বান্ধ গুরুর দ্বারা লোক প্রতারিত না হয় তাহার উপায় লেখক কতকটা করিয়াছেন।

আসুরফি—শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়। এক অর্থলিপ্সু বাস্তুরসিকের কথা—নানা আজগুবী কথায় পরিপূর্ণ। পাঠক বিস্মিত হইতে পারেন, তবে রস সামগ্রীর আয়োজন কোথাও নাই।

সবজজ ও ইন্দুর—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ। অত্যাচারী ও উদার নৈতিক ইংরাজের পার্থক্য ও সেই সঙ্গে সবজজের অসহায়তা সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া লেখক স্থায়ী রসবস্তু ফুটাইয়া তুলিবার অবকাশ পান নাই। বিষয় সাময়িক, লেখকের উদার দৃষ্টির পরিচয় আছে।

পথের কাঁটা—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু। হিন্দুধর্ম্মের সার কথা, সামাজিক অধঃপতন, ঈশ্বরবিশ্বাস প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া এই গল্পটি রচিত হইয়াছে। অনেক হিন্দুর নিকট ইহার আদর হইবে। তবে ছোট গল্প হিসাবে ইহার আলোচনা করিতে গেলে অনেকেই নিরাশ হইবেন।

রঙের টেক্কা—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। গল্পটিতে বৈচিত্র্য আছে। বায়োস্কোপের চিত্রের মত ইহা পাঠকের নয়নরঞ্জন করিতে পারে। তবে ছোট গল্পের লালিত্য ও সরসতা সামান্য। প্লটের সংগঠনে কোন নৈপুণ্য নাই। লেখক ইচ্ছানুযায়ী ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, সব সময়ে তাহার উপযোগিতা বিচার করিবারও অবসর পান নাই।

মিলন—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতারক জ্যোতিষীর কথা—চিত্তাকর্ষক। তবে মিলনটা বড়ই অস্বাভাবিক।

আবদুল কাদির গীলানী [জীলানী]

ইরাণের উত্তর-পশ্চিম কোণে গীলান বা জীলান একটি ছোট প্রদেশ। এই প্রদেশের প্রসিদ্ধ বিদ্বান, সাধক, উপদেশক ও সাধু, অবদুল কাদির ১০৭৮ ঈশাব্দে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অনেকগুলি অনৈসর্গিক ও অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ অরবী ও পার্সী পুস্তকে পাওয়া যায়। তাঁহাকে লোকে "গওস-আজম," * "পীর-দস্তগীর" ইত্যাদি সম্মানিত উপাধি দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকে। তাঁহার স্থাপিত সাধু বা দরবেশ সম্প্রদায়কে "কাদিরিয়া" বলে।

জীবনী লেখকেরা লিখিয়াছেন, তিনি যখন ৯।১০ বৎসর বয়স্ক বালক, তখন একদিন স্বপ্নে দেখিলেন তিনি কোনও

* গওস—বিশেষ প্রকার সমাধির নাম; অতএব ঐ প্রকার সমাধিতে সিদ্ধ পুরুষকে গওস আজম বলা যায়
মুহীউদ্দীন—ধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা
দস্তগীর—হস্তধারণকারী,সাহায্যকারী, পীর

সাধু বা স্বর্গীয় দূত দ্বারা বাগদাদে গিয়া অধ্যয়ন ও সাধন করিতে আদিষ্ট হইতেছেন। তাঁহার মাতাকে পরদিন সকল কথা বলিয়া বালক যখন বিদায় ভিক্ষা করিলেন, তখন তাঁহার মাতা ঐ স্বপ্নকে ঈশ্বরের আদেশ বিশ্বাস করিয়া ও বালকের আগ্রহ দেখিয়া অমত করিতে পারিলেন না। তিনি ৮০ খানি মোহর দেখাইয়া বলিলেন, তোমার পিতা এই ধন রাখিয়া গিয়াছেন, তোমার আর এক ভ্রাতা আছে, অতএব চল্লিশখানি তোমার। আমার সহিত এ জীবনে আর তোমার দেখা হইবে না, তবে যাইবার সময়ে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর, জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না। বালক ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এক কাফলার (যাত্রীদল) সহিত যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস পরে হমদান নগরের কাছে ষাট জন অশ্বারোহী ডাকাত তাঁহাদের কাফলা আক্রমণ করিয়া লুট করিল। ঐকজন ডাকাত বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাছে কি আছে?"

বালক নির্ভয়ে উত্তর করিল, "আমার ৪০খানি মোহর আছে।" ডাকাত সে কথা বিশ্বাস করিল না, সকলে বালকের কথায় হাসিতে লাগিল। অল্প পরে আর এক জন ডাকাত ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া ঐরূপ উত্তর পাইল। ইহার কিছু পরে যখন ডাকাতের সর্দ্দারের সম্মুখে লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ করা হইতে ছিল, সর্দ্দার বালক নিকটে ডাকিয়া আবার ঐরূপ প্রশ্ন করিল। বালক কিছু বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, "আপনার দুইজন লোককে ইতিপূর্ব্বে ত বলিয়াছি আমার ৪০খানি মোহর আছে, আমার মাতা আমার তুলাভরা বস্ত্র মধ্যে সেগুলি সেলাই করিয়া দিয়াছেন।" সর্দ্দার বালকের কথায় আশ্চর্য্য বোধ করিয়া তাহার জামা ছিড়িঁয়া দেখিতে আজ্ঞা করিলেন। যখন তাহার লুকানো ৪০খানি মোহর বাহির হইয়া পড়িল, তখন সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বালক, তোমার মাতা এত যত্ন করিয়া মোহরগুলি লুকাইয়া কাপড়ের মধ্যে সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন, তবে তুমি সে কথা এমন ভাবে প্রকাশ করিলে কেন? বালক নির্ভয়ে উত্তর করিল, "আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি মাত্র। আমি যে আসিবার সময়ে আমার মাতার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি যে আমি কখনও মিথ্যা কথা বলিব না। আমি এই ৪০ খানি মোহরের জন্য সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিব না।" সর্দ্দার এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কতকক্ষণ চুপ করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বালকের সততা ও পবিত্রতা সকলের মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। সকলের মন শুদ্ধ হইলে সর্দ্দার বালককে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার এত অল্প বয়সে তোমার মাতার কাছে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা রক্ষা করিবার এত জ্ঞান হইয়াছে, আর আক্ষেপের বিষয়, এত বয়সেও দুষ্কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবার জ্ঞান আমার হইল না। তুমি আমার প্রকৃত জ্ঞানদাতা গুরু, আইস তোমার হস্তধারণ করিয়া শপথ করি, জীবনে আর কখনও অন্যায় অত্যাচার ইত্যাদি অসৎ কর্ম্ম করিব না।" সর্দ্দার ঐরূপ শপথ করিয়া লুটের দ্রব্য যাত্রীদের মধ্যে ফেরৎ দিতে আপনার সঙ্গীদের আজ্ঞা করিলেন, ও বলিলেন, "আমি এ ব্যবসায় ত্যাগ করিলাম, তোমরা ইচ্ছামত অন্য সর্দ্দার নির্ব্বাচন করিয়া ব্যবসা চালাইতে পার।" ইতিমধ্যে সাধু বালকের প্রভাবে তাঁহার সঙ্গের ডাকাতদেরও হৃদয় কর্ষিত হইল। তাহারা সর্দ্দারকে বলিল, "তুমি পাপে আমাদের পথপ্রদর্শক প্রভু ছিলে, এখন আমরাও প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, তুমিই আমাদের সাধু পথেরও প্রদর্শক হও।" এই ডাকাতরা সকলেই বালকের হাত ছুঁইয়া শপথ করিল ও সাধু হইয়া তাহাকে নিরাপদে বাগদাদে রাখিয়া আসিল। বালক বিদ্যা অর্জ্জন ও সাধন করিয়া কালে একজন অদ্বিতীয় বিদ্বান ধর্ম্মশিক্ষক ও বক্তা ও সাধু রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ১১৬৬ ঈশাব্দে বাগদাদে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। আরবী ভাষায় তাঁহার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ এখনও ইসলাম জগতে সম্মানিত। তাঁহার স্থাপিত সম্প্রদায়ের সাধু ভারতেও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

ভাব প্রকাশ করিতে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাবের সহিত সমঞ্জস্য রাখিয়া ভাষা চলে—কখনও নাচিয়া, কখনও হাসিয়া, কখনও কাঁদিয়া ; কিন্তু সচরাচর উহা অতি সহজ ভাবেই চলিতে চায়। সাধারণ কথাবার্ত্তায় মানুষের ভাষা ছন্দোময়ী হইয়া উঠে না , কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার অন্তর্বীণায় এমন এক সুর বাজিয়া উঠে, যাহা ভাষাকে নাচাইতে, হাসাইতে এবং কাঁদাইতে পারে। কবি এবং কবিতা সৃষ্টির ইতিহাস উহাই।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিতার নাম বেদ। কেহ কেহ উহাকে 'চাষার গান' বলিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা চাষা ছিলেন—কিন্তু সেই চাষাদের রকম ভিন্ন ছিল। তাঁহারা আর্য্য এবং সরল ছিলেন। প্রকৃতির সুন্দর এবং তাণ্ডব লীলা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইত, অদৃশ্য শক্তির প্রতি সমস্ত মন প্রাণ আকৃষ্ট হইত—তখন হৃদয়ের অকৃত্রিম সরল ভাব মূর্ত্ত হইয়া ছন্দোময়ী ভাষায় ফুটিয়া উঠিত। সেই ভাষায় স্তুতি আছে, কৃতজ্ঞতা আছে, বীরত্বের দৃপ্ত গরিমা আছে।

বেদের ঋষি এই ছন্দোময়ী ভাষায় কথা কহিতেন না। ছন্দ বাদ দিলে যা থাকে, তাহাই ছিল তখনকার কথিত ভাষা। পশ্চিম হইতে ধীরে ধীরে যখন তাঁরা পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন ভাষা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, উহার কারণ জলবায়ু এবং বিজাতীয় অনার্য্য সম্মিলন। এক জাতি আর এক জাতির সঙ্গে যেখানেই মিলিতে চাহিয়াছে, সেখানেই ভাষার আদান প্রদান ঘটিয়াছে। প্রাধান্য যাহাদের বেশী তাহাদের ভাষা বাঁচিয়া রহিয়াছে, কিন্তু একা নহে, মিলিত হইয়া। বৈদিক ভাষা এই প্রাকৃতিক নিয়মে অপভ্রষ্ট এবং মিলন-দুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। সুতরাং 'ব্রাহ্মণে' ব্যবহৃত ভাষা বৈদিক হইতে ভিন্ন। আর্য্য বীরগণ দেশজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। স্থানচ্যুতির ফলে এক ভাষা নানা অপভ্রংশে বিকৃত হইয়া গেল।

কথিত ভাষার ধারা এই ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সকলকে এক করিবার জন্য এবং ব্রাহ্মণাদি রচনার জন্য একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন হইল সংস্কৃত উহার ফল। পুরাণো বৈদিক এবং নূতন অপভ্রংশের সংমিশ্রণে উহা গঠিত। এই গঠনে অনার্য্য শব্দও বাদ পড়ে নাই ; এবং বহুদিন পর্য্যন্ত প্রয়োজন মত দেবভাষায় উহাদের প্রবেশ লাভ ঘটিয়াছিল। অবশ্য প্রবেশের সময় তাহাদিগকে 'শুদ্ধিমন্ত্র' দ্বারা আর্য্য-আকৃতি ধারণ করানো হইত। এই আদান প্রদান কিন্তু অবাধে চলিতে পারিল না , পাণিনি ব্যাকরণের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার ক্রমবর্দ্ধনশীল গতি ভগ্ন হইয়া গেল। নিত্য নব নব সম্পদের ভাণ্ডার-দ্বারও রুদ্ধ হইয়া গেল।

লিখিত ভাষার গঠন স্থিরীকৃত হইল বটে, কিন্তু কথিত ভাষার ধারা অপ্রতিহত গতিতে চলিতে লাগিল। উহা কোনো বাধা মানিল না। যেখানে গতির বেগ শক্তির অভাবে মন্দীভূত হইয়া যাইতে লাগিল, সেখানে পরের কাছ হইতে নিঃসঙ্কোচে শক্তি অর্জ্জন করিতে লাগিল—সে পর দ্রাবিড় কিংবা যে কোন জাতীয়ই হউক না কেন। এই কথিত ভাষাকে প্রাকৃত বলা হইত।

এই প্রাকৃত শীঘ্রই লিখিত ভাষায় পরিণত হইল। মগধে যে প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, বুদ্ধদেব সংস্কৃত ভাষা ছাড়িয়া সেই প্রাকৃত ভাষাতেই জনসাধারণের নিকট নিজের ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আজ্ঞা দিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারকল্পে প্রাকৃতকে লিখিত ভাষার অধিকার দেওয়া হইল এবং ধীরে ধীরে বৌদ্ধ প্রাকৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। প্রথমতঃ সিংহলবাসীরাই মগধ প্রাকৃতকে পালি আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। তাহারা পাটলিপুত্রের (পাঅলিপুত্তের পালিপুত্তের) বৌদ্ধ সাহিত্য পড়িয়া সেই দেশের ভাষাকে সেই দেশের নামানুসারেই আখ্যাত করিয়াছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্ত্তী কালে ঐ নাম এত স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল যে উহার আদিম অবস্থাও মানুষে ভুলিয়া গেল। তাই আজ পালি প্রাকৃত হইতে বিভিন্ন—

একটি আলাদা ভাষা। বস্তুতঃ উহা তাহা নহে; প্রাকৃত সাহিত্যের আদি নিদর্শন খুঁজিতে গেলে পালি সাহিত্যকে বাদ দিলে চলিবে না।

কিন্তু এক মগধের ভাষা দ্বারাই সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচার কার্য্য চলিতে পারিল না, কারণ তখন স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রাকৃতের প্রচলন হইয়াছে। সুতরাং একটি সার্ব্বজনীন প্রাকৃত ভাষার প্রয়োজন হইল। উহা সংস্কৃত হইতে ভিন্ন থাকিবে কিন্তু সাধারণের বোধগম্য হইবে। সংস্কৃত এবং নানা প্রাকৃতের সংমিশ্রণে গাথা ভাষা নামে একটি ভাষা গড়িয়া উঠিল। উহাকে সাহিত্যিক প্রাকৃত (Literary Prakrit) বলা যাইতে পারে। শৌরসেনী প্রাকৃতও ঐ শ্রেণীর। সাহিত্যিক প্রাকৃত হিসাবে ভরত নাট্যশাস্ত্রে উহারই উল্লেখ দেখিতে পাই। (শৌরসেনীং সমাশ্রিত্য ভাষা কার্য্যা তু নাটকে।) ইহার পর মহারাষ্ট্র দেশে এইরূপ আর একটি প্রাকৃতের সৃষ্টি হয়। বররুচির 'প্রাকৃত-প্রকাশে' এই মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সেতুবন্ধ, কর্পূরমঞ্জরী, দশমুখ বধ প্রভৃতি প্রাকৃত পুস্তকও ঐ মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা। ইহাতে বোধ হয়, শৌরসেনী প্রাকৃতের স্থান পরবর্ত্তী কালে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতই অধিকার করিয়াছিল। সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত অংশেও উহার আধিক্য বেশী।

এই সকল লিখিত প্রাকৃতের সঙ্গে সঙ্গে কথিত প্রাকৃতগুলি নিজের পথেই চলিয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ তাহাদিগকে এই অবস্থায় প্রাকৃত অপভ্রংশ আখ্যা দিয়াছেন। হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণে আমরা শৌরসেনী অপভ্রংশের উল্লেখ দেখিতে পাই।

মগধের লিখিত প্রাকৃতের সঙ্গে সঙ্গে একটি কথিত ভাষাও নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া উপরিউক্ত অপভ্রংশ অবস্থায় উপনীত হয়। উহা মাগধী অপভ্রংশ। মাগধী প্রাকৃতের দুইটি বিভাগ ছিল—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য। এই প্রাচ্য মাগধীর অপভ্রংশ হইতে বাঙ্গলা, উড়িয়া, এবং আসামী ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যা বর্ত্তমানে রাজনৈতিক কারণে বিচ্ছিন্ন হইলেও, বহুপূর্ব্বে এক সভ্যতা এবং এক ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনীতে আবদ্ধ ছিল। এই সকল স্থানে বহুদিন পর্য্যন্ত আর্য্য বসতি সংস্থাপিত হয় নাই। বৈদিক প্রাচীনতম গ্রন্থে আমরা ঐ সকল স্থানের নাম পাই না। অথর্ব্ববেদে অঙ্গ এবং মগধ দেশের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু তাহারা অনার্য্য দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকে মগধের সঙ্গে বঙ্গদেশের নাম মাত্র পাওয়া যায়। বৌধায়ন ধর্ম্মশাস্ত্রের আর্য্যাবর্ত্ত সংজ্ঞায় মতান্তরে বঙ্গদেশকে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাংলাদেশে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল; অন্ততঃ একদল লোক সেখানে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় উঁহারা নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন; মতান্তরসংজ্ঞা ইহার সাক্ষ্য দেয়। সর্ব্ববাদিসম্মত উপনিবেশ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সিংহল বিজয়ের কথা কাহারো কাহারো মতে গল্পমাত্র হইলেও ইহা বুঝা যায় যে, খৃষ্ট জন্মের চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেই বাংলা দেশের আর্য্য সভ্যতা বেশ পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং জাহাজ ভরিয়া বিদেশে লোক পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সিংহলী ভাষায় বাংলা শব্দের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

মগধে প্রচলিত পুরাণো প্রাকৃত আর্য্য অধিকৃত প্রাচ্য দেশের কথিত ভাষা ছিল। সেই ভাষা যখন লিখিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভিন্ন নাম এবং রূপ ধারণ করিল, তখন তাহারই পার্শ্বে আর একটী কথিত ভাষা আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। উহাই মাগধী। এই মাগধী ভাষাও কৃত্রিম পোষাক পরিয়া প্রাকৃত হিসাবে সংস্কৃত নাটকে প্রবেশ করিয়াছিল। বাংলা দেশে মাগধী এবং শেষের দিকে উহার অপভ্রংশের প্রচলন ছিল। বাংলা ভাষার জননী এই অপভ্রংশ। পালরাজগণের সময়ে বাংলা দেশে মাগধী সভ্যতা এবং ভাষা বিশেষরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মগধ হইতে বিতাড়িত পাল রাজগণের সাম্রাজ্য কেন্দ্র এক সময় বঙ্গদেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং ভাষা এবং সভ্যতা দান অবাধে চলিয়াছিল। বাংলার সঙ্গে মগধের সম্পর্ক এই। আসামের সঙ্গে মগধের কোন রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল না; বাংলা দেশের ভিতর দিয়াই আসামে মাগধী প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে উড়িয়া, আসামী এবং বাংলা ধীরে সুস্থে স্ব-স্ব আকৃতি ধারণ করিতে অ

করে। ইহার দুই তিন শত বৎসর পরেও ঐ সকল ভাষার পরিবর্ত্তন এত অল্প ঘটিয়াছিল যে এক জায়গায় দাঁড় করাইলে উহাদিগকে ভিন্ন বলিতে সাহস হয় না। মাঝে মাঝে দু'একটি শব্দ এবং ক্রিয়াপদের প্রভেদ। কিন্তু আজ অসম্ভব রকমের হৈ চৈ করিয়া উহাদিগকে আলাদা করা হইতেছে। ভয় হয়, কোন্ দিন শুনিতে হইবে পদ্মার পূর্ব্বপারের ভাষাকে 'বাঙ্গাল' এবং পশ্চিম পারের ভাষাকে 'ঘটি' নাম দিয়া দুইটী বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে

মাগধী হইতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ মনে করা ভ্রম যে অন্য কোনো ভাষার সঙ্গে তাহার আদান মূলক সম্পর্ক ছিল না। বাংলা দেশে আর্য্য বসতির পূর্ব্বে যে সকল অনার্য্যরা বাস করিত তাহাদের মধ্যে দ্রাবিড়ই প্রধান ছিল। আর্য্যগণ যখন বাংলার অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া নিজ আধিপত্য স্থাপন করিলেন তখন কি বিজিত জাতি সমূলে লোপ পাইয়াছিল? তাহা নয়। তাহাদের অনেকেই বিজেতার পদাশ্রিত হইয়া তাহার সভ্যতা এবং ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছিল। একস্থানে থাকার দরুণ নিজেদের জিনিষও যৎকিঞ্চিৎ বিজয়ী প্রভুদিগকে দান করিয়াছিল। এই আদান প্রদানে বাংলার ভাষা এবং সভ্যতার সম্পদ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। দ্রাবিড় ছাড়া মুণ্ডা, ওরাঁও প্রভৃতি শব্দও বাংলা ভাষায় ঢুকিয়াছিল। ইহার পর নানা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া কত রকম ভাষাই যে বাংলা দেশ আত্মস্থ করিতে চেষ্টা পাইয়াছে তাহা একটু ভাবিলেই বোঝা যায়।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলা একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বিশ্ব সাহিত্যের প্রদর্শনীতে দেখাইবার মত অনেক রত্নই এই ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে। কিন্তু আরও সাধনার প্রয়োজন; ভাষার সৌষ্ঠব সম্পদ আরও বাড়ানো দরকার। সংস্কৃত, ইংরেজী, ফরাসী, আর্বী, পার্শী, গ্রীক, লাটিন কোন ভাষাকেই বাদ দিলে আমাদের চলিবে না। প্রয়োজন বোধে উহাদিগের নিকট হইতে শব্দ এবং ভাব সম্পদ হাত পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; লজ্জা করিলে চলিবে না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

রস

অমর কবি শেলি প্রেম কি তারই বস্তু নির্দ্দেশ করতে গিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—"What is love? Ask him who lives what is life; and ask him who worships what is God?"

রস কি, প্রশ্ন করলে—ঐ উত্তর। শুধু loveএর স্থানে 'রস' এই শব্দটি বসিয়ে দিলেই হবে।

অলঙ্কার-শাস্ত্র বলে—রস কাব্যের আত্মা-প্রাণ। সে রস নয় প্রকার। তাদের নাম—আদি, করুণ, হাস্য রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। বৎসল্যকেও কেউ কেউ পৃথক রস বলে থাকেন।

দার্শনিকও দর্পণকারকে সমর্থন করেন। আমি কিন্তু দর্পণের (অলঙ্কার শাস্ত্রের) অথবা দর্শনের মাপকাঠিতে রসকে মাপতে চাইনে।

রসের কথা যতই ভাবি, ততই মনে হয় শ্রেণী-বিভা বুঝি এর চলে না। আলঙ্কারিক আদিরস বলেই ছেড়ে দিতে পারলেন না। তারও আবার ভাগ করলেন সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। তারও নানান্ ভাগ আছে। রসের রূপ এক; কিন্তু তার ভঙ্গি বহু।

"বায়ুর্যথৈকং ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।"

তেমনই রসও মূলতঃ এক—কিন্তু প্রকৃতিভেদে নানা।

রসের স্বরূপ এক—তার প্রকাশ বহু ধারায়। রস অঙ্গী. তার প্রকাশ নানা অঙ্গে—বহু রূপে। রস অব্যক্ত—তাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায় না. তার প্রকাশ ব্যক্ত, আবেগ-চঞ্চল। তখন আপনিই মনে হয়—

"আমি—ঢালিব করুণা-ধারা,

আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।"

অতি সত্য—

"মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
প্রভাত কিরণে পাগল হইয়া
জগৎ মাঝারে লুটিতে চায়।"

রস আনে নির্ম্মল আনন্দ। উপনিষৎ বলেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তে—আনন্দং
প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি।"

আনন্দ হতেই প্রাণী সকল জন্ম-গ্রহণ করে, জন্মে আনন্দেই [illegible] এবং শেষে আনন্দেই লীন হয়। এই আনন্দই রসের প্রচ্ছন্ন অনুভূতি। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের হাতেও রসের ধারায় ঐ আনন্দই প্রকাশ পেয়েছে—

"আনন্দময়ী মূরতি তুমি!
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"

মানুষ আনন্দ পায় তার মানস-বৃত্তির আনুকূল্য হিসাবে। সেই আনন্দ—অপার্থিব তৃপ্তি যে আশ্রয়ে মানুষ প্রথমে লাভ করেছে—তারেই কেন্দ্র ক'রে বর্ণনায় যে রস প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে—সেই রস-ধারাকে আদিরস নাম দিতে মানুষের চিত্ত আনন্দে সাড়া দেয়।

"অনন্ত-সামান্ত কলত্রবৃত্তিঃ
পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ।"

—মানুষ অনুভব করলে। তার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। ভক্তিনত হয়ে সে স্বীকার করে নিলে—এই রস আদি অর্থাৎ আসল ও প্রথম।

অবশ্য তার পরিণতি নাম্‌তে নাম্‌তে অনেক নীচে এসে নেমেছে—যাকে আর ঠিক রস বলা যায় না। তার নগ্নতায় ঘৃণা হয়, আনন্দ থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—কুমার সম্ভবের হর-পার্ব্বতীর শৃঙ্গার বা বিদ্যা-সুন্দরের বিহার বর্ণনা।

কবি সেক্সপিয়রে'র 'ওথেলো'র শেষ অঙ্ক। অবিশ্বাসের জ্বালায় জর্জ্জরিত ওথেলো নিদ্রিত 'ডেস্‌ডিমোনা'র শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে যখন বল্‌ছে—"So sweet was never so fatal" তখন এই মর্ম্মান্তিক অভিব্যক্তি প্রাণে সহানুভূতি মূলক আনন্দ আনে। দেখি—ভাবি—আর সত্য সত্যই আনন্দ পাই—কত খানি জীবন্ত সত্য—কত ভীষণ অভিজ্ঞতা কবির এই বর্ণনায়—

"Where should Othello go ?
Now how thou look now ?
O ill starred wench
Pale as thy smook !
When we shall meet at compt
This look of thine will hurt my
Soul from heaven
And friends will snatc 1 at it.
Cold, cold, my girl,
Even like thy chastity—
O cursed, cursed slave !
Whip me, ye devils
From the possession of this
heavenly sight
Blow me about in winds
Roast me in sulphur !
Wash me in steep down gulf
of liquid fire
O Desdemona ! Desdemona !
Dead ! O ! O ! O !

প্রাণের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে। ব্যাথার আনন্দে বুক আন্দোলিত হয়।

রামচন্দ্রকে লতা-গৃহ দেখিয়ে বাসন্তী যখন বলছে—

"অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্ গোদাবরী সৈকতে।
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দ কুট্‌মলনিভঃ মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ।"

এও ভাল লাগে। অনুভূতি আনে—ভেবে দেখি—আনন্দ আছে। এখানেও রসই দেখা যায়, রসাভাস নয়। আবার—

"হা হা দেবি স্ফুটতি হৃদয়ং স্রংসতে দেহবন্ধঃ

শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিশ্লেষোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যাঃ করোমি।"

এ জীবন্ত করুণও আনন্দ প্রতিফলিত। আমরা তৃপ্তি পাই। এও নির্ম্মল রসের শুদ্ধ-প্রকাশ।

রসের প্রকাশ আনন্দ স্বরূপেই। সেখানে সুখ-দুঃখের প্রভেদ নেই, আলো ও আঁধার ভিন্ন নয়, জীবন-মৃত্যু এক; এ শুধু নির্ম্মল শুদ্ধ রসের বিভিন্ন বিকাশ; আর কিছুই নয়। রসের নির্দ্দেশই যে—

"আনন্দময়ী মূরতি তুমি!
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"

এ অপরিসীম আনন্দ লুটেও যে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। আনন্দের জন্য চাই রূপ। এই জন্য রসেরও রূপ দিতে হয়। তাই বৈষ্ণব কবি গেয়েছিলেন—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয় জুড়ন না গেল।"

কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে প্রাণই হচ্ছে রস। তার অভি-ব্যক্তি—প্রকাশ ভঙ্গী। অন্তর্নিহিত রসের বাহ্যিক বিকাশই সকলকে মুগ্ধ করে। যে বিকাশ—যে অভিব্যক্তির সে মাদকতা আছে—তাই রসসৃষ্টির অনুকূল, আর যাতে সে সম্মোহের অভাব - তা' রসাভাস।

মানবের মন একটি অদ্ভুত জিনিষ। একজন যাতে আনন্দ পায়—একজন যেখানে রসের সন্ধান লাভ করে, আর একজন সেখানে আনন্দের অভাব অনুভব করে—রসের সন্ধান সেখানে সে পায় না। কাব্য, চিত্র প্রভৃতির সমালোচনার বেলাতেও এ কথা খাঁটি সত্য। সেই জন্যই সমালোচনার স্থান শাশ্বত নয়।

রস অতীন্দ্রিয়; দার্শনিক-পরিভাষায় তাকে বলা যেতে পারে ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর। কবি গেয়েছেন—

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

তুমি আমি যো সে নাম কেন নানান্ ছন্দে নানা সুরে কত তাল লয়ে সময়ে অসময়ে কত শুনছি ও শোনাচ্ছি - কিন্তু ক'দিন মরমে পশেছে? রসও তাই। মর্ম্মকে স্পর্শ না করলে সে রস উদ্বুদ্ধ হল কৈ?

বৈজ্ঞানিক সূর্য্যরশ্মির গতিবেগ উত্তাপের ভিতরে রসের সন্ধান পান—রসের স্বরূপদ্রষ্টা ঋষি 'তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্' এর মধ্যেও রসের স্বরূপ অনুভব করেন—যা' সকলে পায় না। কবি হয় ত—

"মন্ত্রণা তব সান্ত্বনা হীন
মোহ যন্ত্রণা দানে
বেদনা গরল ঢালিয়া আমায়
পাগল করেছে প্রাণে।"

এর রসেও মুগ্ধ হন। অথচ সাধারণে ভাবে—এ কাঁদুনির মানে কি?

আমি বোধ হয় রসকে নীরস করে তুলছি। কাযেই শেষ করবো—না হলে ধৈর্য্যচ্যুতি হতে পারে। রসের ব্যাপকরূপ এইটুকু ছোট প্রবন্ধে দেওয়া চলে না - রস ধরা ছোঁয়ার বস্তু নয়। এই জন্য উচ্চশ্রেণীর রস-সাহিত্য অতীন্দ্রিয়মূলক। রসের সম্ভোগ আত্মায় আত্মায়; ইন্দ্রিয় সেখানে নিষ্ক্রিয়, মন স্থির, ভাষা মূক। সেই জন্য মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ লীলারসে বিভোর ছিলেন—যাকে আজও অনেকে অশ্লীল বলে হেসে ওড়াতে চায়।

এই রস ভাষায়, প্রস্তরে, কণ্ঠে যাঁরা মূর্ত্ত করে তুলতে পারেন তাঁরাই ধন্য।

সেই মহানুভবদের চরণে ভক্তি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি—

"এষোহস্য পরমানন্দো যোহখণ্ডৈকরসাত্মকঃ
অন্যানি ভূতান্যেতস্য মাত্রামেবোপভুঞ্জতে।"

অখণ্ড এক রসের স্বরূপ কেবল পরমাত্মা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ নয়। সেই রসময়ই জগতের পরমানন্দ। আর সেই পরমানন্দের কণা মাত্রই প্রাণিগণ উপভোগ ক'রে থাকে। *

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ।

* ইন্দোর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।

গ্রন্থ-সমালোচনা

মেঘদূত

শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত।—প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ; কলিকাতা। মূল্য ৪৲

চক্ষুচিত্তবিনোদন বিচিত্র চিত্র শোভন বাঙ্গালা বই মুদ্রণে কবি নরেন্দ্র দেব ও তাঁর প্রকাশকদের খ্যাতি আছে। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহাদের সেই খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বর্দ্ধিতই হইয়াছে। বাঙ্গালার সাহিত্যজগতে শ্রীমান্ পুস্তকের সমাবেশ করিয়া তাঁহারা বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

কবি নরেন্দ্র দেবের এই কাব্য আমরা উপভোগ করিয়াছি। তাঁর বাক্যযোজনা ও ছন্দোলালিত্য আমাদিগকে তৃপ্তি দিয়াছে। দূরস্থিতা প্রিয়ার কল্পনা, কি সুন্দরভাবে বর্ণিত—

স্পর্শে তোমার কদম কলির
কুঞ্জে যথা তন্দ্রা টুটে
রোমাঞ্চিয়া কেশর কোমল
কিশোর কুসুম উঠ্‌বে ফুটে,
হরিৎ—কপিশ—রংয়ের শোভা
নয়ন লোভা দেখ্‌বে তুমি ;
ভুঁই চাঁপাদের নবীন মুকুল
ভরিয়ে দেবে সজল ভূমি।
স্বাদ পেয়ে তার বনের হরিণ
সিক্ত মাটির গন্ধে মেতে
বাদল-ঢালা তোমার পথে
আস্‌বে ছুটে আনন্দেতে!

কিংবা—

তোমায় দেখে ঘোম্‌টা খুলে
সরিয়ে মাথার ঝাপ্‌টা-চুলে
চাইবে হেসে মুখটি তুলে
বিরহিণীর দল!
দূর প্রবাসী পরাণ বঁধুর
প্রত্যাগমের লগ্ন মধুর
বুঝ্‌বে তারা—নয় বেশী দূর
আশায় সচঞ্চল!

এগুলি লিপিকৌশলে ও বর্ণনা-চাতুর্য্যে মনোরম। কদম-কলির তন্দ্রা যার স্পর্শে টুটিবে, তার স্পর্শে নিশ্চয়ই যাদু আছে, সুতরাং তাহাকে দূত করিয়া প্রিয়ার নিকট পাঠাইবার একটা কারণ অন্ততঃ স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। বিরহিণীর দলের ঘোম্‌টা যাহাকে দেখিয়া মুক্ত হয়, মনের গোপন বাণী প্রকাশ করিবার যোগ্য পাত্র তো সেই!

শ্রীনরেন্দ্র দেবের গ্রন্থের ছন্দ লঘু হইয়াছে, বিরহ ব্যথার গুরু-ভারের মন্থরতা ও গাম্ভীর্য্য তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, একথা অস্বীকার করা চলে না। মাঝে মাঝে অযথা বাক্যযোজনা করা দোষের হইয়াছে। মূলের 'জনকতনয়ার' স্থানে 'জনক রাজার কনক মেয়ে' না লিখিলেই হইত। কারণ 'জনকতনয়া'ই জলের পুণ্যলাভ করিবার কারণ, তিনি যদি 'কনক' না হইয়া 'কৃষ্ণ' হইতেন তাহা হইলেও 'পুণ্য' পুণ্যই থাকিত। 'জনক' আর 'কনক' ধ্বনিতে বেশ মিলিয়াছে কিন্তু 'কনক' অনাবশ্যক। তারপর 'পুণ্যোদকেষু'কে শ্রীনরেন্দ্র দেব করিয়াছেন 'তীর্থ হ'লো তরঙ্গিণী ; ইংরাজীতে থাকে বলে not necessarily—তাই বলিতে চাই। 'পুণ্য' হওয়া আর 'তীর্থ' হওয়া এক নয়। পূর্ব্বমেঘের যাটের স্তবকে "সদ্য-চেরা হাতীর দাঁত" খারাপ লাগিল। হাতীর দাঁত চিরিবার ব্যাপার নূতন বটে!

শ্রীনরেন্দ্র দেবের 'মেঘদূতকে' কালিদাসের 'মেঘদূতের' অনুবাদ বলিয়া না ধরিয়া, উহা অবলম্বনে রচিত একখানি কাব্য বলিয়াই ধরিলাম, কারণ তাহা হইলে মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ বাধে না, বাঙ্গালা কাব্যের মিষ্টত্ব উপলব্ধি করি। শ্রীনরেন্দ্র দেব তো বাঙ্গালা ভাষায় মন্দাক্রান্তার উদাহরণ দিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন নাই।

গ্রন্থের ভূমিকাটী সুলিখিত। কিন্তু কাব্যের রসানুভূতি তাহার উপর নির্ভর করে না, সে জন্য আমরা তাহার আলোচনা করিলাম না।

দুষ্ট গ্রহ

উপন্যাস। শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲

গ্রন্থখানি ঠিক দুই শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। করুণা গ্রন্থের নায়িকা, দুষ্ট গ্রহের প্রকোপে তাহার যে সব দুঃখ ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার করুণরসের অবতারণা করিয়াছেন। এই করুণার জীবন-কথা গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সে আজন্ম দুঃখী—স্কুলে প্রতিপালিতা—বিদ্যা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্য্যন্ত। আঠার বৎসর বয়সে যখন সে বোর্ডিংএ থাকিয়া স্কুলে সামান্য চাকরী করে তখন তাহার পূর্ব্ব সহপাঠিনী লতার মৃত্যু ঘটে। লতার স্বামী অবিনাশ তাহার মেয়েটিকে করুণার নিকট লালন-পালনের জন্য পাঠাইয়া দেন। তারপর অবিনাশের সহিত করুণার বিবাহ;

অবিনাশের অধঃপতন ও রমেনের সহিত করুণার পরিচয়। ক্রমশঃ মন্মথর অত্যাচার, আদালতের ভয় ও অবশেষে ফকীর নামক এক মুসলমান কারিগরের সহিত করুণার বিবাহ।

এখন কল্পনার যুগ নয়, চিন্তার যুগ ; গ্রন্থকারও চিন্তাশীল ; সেই জন্য রচনায় ভাবুকতার পরিচয় খুবই আছে। এই ভাবুকতার প্রভাবে গ্রন্থকার পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। করুণা সামাজিক আবেষ্টনের বাহিরে। সে পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছে। পরপুরুষের অত্যাচার সহ্য করিয়াও সে নারীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাহার শেষ বিবাহটি সমাজসঙ্গত না হইলেও অনেকের কাছে তাহা অনিন্দনীয়। মন্মথর চরিত্রও নূতন।

গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি। সেই জন্য রচনায় হৃদয় অপেক্ষা যুক্তির পরিচয়টি অধিক। চিত্রটি বাস্তব নয়। যাহা হইয়াছে, হইতেছে তাহা লইয়া লেখক ব্যস্ত হন নাই। যাহা হইবে বা হইতে পারে তাহাই অবলম্বন করিয়া লেখক কল্পনার বলে একটা অস্পষ্ট আদর্শকে খাড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। করুণা ও রমেনের চিত্র গ্রন্থকার বিশেষ যত্নের সহিত আঁকিয়াছেন। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও অনেক স্থলে আছে। সামান্য চেষ্টায় মন্মথ ও অরুণার চিত্র ফুটিয়াছে। তবুও আমাদের মতে সাহিত্য হিসাবে এই চিত্রগুলির মূল্যই অধিক।

গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই সুন্দর।

রূপের অভিশাপ

উপন্যাস। শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—রাধহরি শ্রীমানী এণ্ড সন্‌স্‌, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা, মূল্য ২৲

গরীবুল্লার মেয়ে পরী—বয়স চৌদ্দ। তাহার বিবাহ হইল বুড়া কাশিমের সহিত। তবুও পূর্ব্ব প্রণয়ী লতিফ তাহার আশা ছাড়িল না। পরীর রূপ ছিল, এই রূপের অভিশাপই গ্রন্থকারের বর্ণনীয়।

পরীর জীবন-কাহিনী করুণ। কাশিমের তালাক দিবার পর নানা অবস্থার মধ্যে আমরা তাহাকে দেখিতে পাই। সে ভালবাসিত লতিফকে, নানা গ্লানি ও সামাজিক দুর্ঘটনার পর একবার সে লতিফের নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু তাহার ফল হইল লতিফের প্রত্যাখ্যান ও পরীর আত্মহত্যা।

গ্রন্থকার চিত্র আঁকিয়াছেন বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের। এই কার্য্যে তিনি তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতারও পরিচয় দিয়াছেন। তবে যাঁহারা উপন্যাস সাহিত্যে হিন্দু সমাজের চিত্র আঁকাই এ দেশের সনাতন প্রথা মনে করেন, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইবেন না, কারণ গ্রন্থকার স্বাধীনচিত্ত, কোন প্রথার বন্ধন তিনি মানিতে চান্ না—উপন্যাস-সাহিত্যে সকল বিষয়ে একটা নূতন পথ ধরিয়া চলিতে চান্।

এই কার্য্যে তিনি সফলও হইয়াছেন। তিনি হিন্দু সমাজের অন্তর্গত হইয়াও মুসলমান সমাজের চিত্র আঁকিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার উদারতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর মামুলি প্রেমের কথা ছাড়িয়া গ্রন্থকার উৎকট লালসার চিত্র আঁকিয়াছেন, শিক্ষিত সভ্য নরনারী ছাড়িয়া অশিক্ষিত অসভ্য শ্রেণী হইতে নায়ক নায়িকা নির্ব্বাচন করিয়াছেন। তিনি মিলনের দ্বারা বিরহকে সার্থক করেন নাই। চরিত্র চিত্রণে বিশেষ যত্ন লক্ষিত হয় না, কবিত্বেরও একান্ত অভাব। মোটের উপর যে পন্থা ধরিয়া পূর্ব্বতন ঔপন্যাসিকেরা চলিতে অভ্যস্ত, গ্রন্থকার তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ফলে যে রসবস্তু পুরাতন ঔপন্যাসিকদের লক্ষ্য, তাহাও সমালোচ্য গ্রন্থে কতকটা উপেক্ষিত হইয়াছে।

ইহাতে আছে প্রাদেশিক ভাষা, মুসলমানীর পত্যন্তর গ্রহণের কথা, লাঠিয়ালের গোঁয়ার্ত্তুমি এবং শঠতা ও পাশবিক লালসার চিত্র। হতভাগিনী পরীর দুঃখের অন্ত নাই। এত দুঃখের বর্ণনা করিয়াও লেখক করুণরসের অবতারণায় অক্ষম হইয়াছেন। তিনি প্রতিমার জন্য নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু যাহা গড়িয়াছেন তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। উপন্যাস রসের ভাণ্ডার, কিন্তু এখানে ভাণ্ডারটি নূতন ভাবে গড়িবার জন্য শিল্পী এতই ব্যস্ত যে তিনি রস-সঞ্চারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই।

গ্রন্থে বহুদর্শিতার পরিচয় আছে। গ্রন্থের ঘটনাবলী ও চিত্রে বাস্তবতা আছে, সত্য আছে, গ্রন্থকার রূপের অভিশাপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে রূপের কথা আছে, অভিশাপের কথাও আছে। কিন্তু উপন্যাস শুধু যে সত্য কথার সমষ্টি নয় তাহা অনেকেই জানেন।

গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই সুন্দর।

বঙ্কিম-বাণী

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান ৩৮ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, মূল্য ১৲

গ্রন্থে বঙ্কিমবাবুর রচনাবলী হইতে নানা বিষয়ক উক্তি সঙ্কলিত হইয়াছে। 'নিবেদনে' লেখক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—"আজ দেশের বড় দুর্দ্দিন। জাতি-জাগরণের নাম করিয়া আমরা সকলে ইংরাজ হইবার চেষ্টা করিতেছি। যুগ-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ফিরিঙ্গীয়ানা র মন্ত্র করিতেছি। এ ব্যাধির প্রতীকার করিতে না পারিলে আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু বঙ্কিম বিবেকানন্দের বাক্যসমূহ আমাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিলে আমরা সে ব্যাধি হইতে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিতে পারিব, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।"

এজাতীয় গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনেক। যাহারা সঙ্কলয়িতা তাঁহারা কোন বিখ্যাত গ্রন্থকারের রচনায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উক্তিগুলি

সংগ্রহ করেন। এই উক্তিগুলিতে সাধারণতঃ সেই গ্রন্থকারেরই বৈশিষ্ট্য ধ্বনিত হয়। সমালোচ্য গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা দেশের একটা ব্যাধি নিরূপণ করিয়া তাহার প্রতীকারের জন্য ব্যস্ত। সেই জন্য এই সংগ্রহে যাহা উক্ত ব্যাধির ঔষধ নয় তাহা অবজ্ঞাত হইয়াছে।

তবুও গ্রন্থকার বিশেষ যত্ন করিয়া বঙ্কিমের নানা উক্তি একত্র করিয়াছেন। এই কার্য্যেই বঙ্কিমের প্রতি একটা যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা করা হইয়াছে তাহার সামান্য অংশও উচ্ছ্বাসপূর্ণ অগভীর "বঙ্কিম-বন্দনায়" লক্ষিত হয় না। গ্রন্থের এই অংশ পরিত্যক্ত হইলেই ভাল হইত। গ্রন্থখানির সমাদর হইবে। নানা বিষয়ে বঙ্কিমের মত পাঠক অনায়াসেই অবগত হইবেন।

বিবেকানন্দ-বাণী

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান—৬৮নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ৷৷০

এই গ্রন্থে বিবেকানন্দের কয়েকটী বাণী সংগ্রহ করা হইয়াছে। যাঁহারা অনায়াসে নানা বিষয়ে বিবেকানন্দের মতবাদ জানিতে চান্, গ্রন্থখানি তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করিবে। বিবেকানন্দের রচনাবলী প্রফুল্ল পদ্মে পরিপূর্ণ দীঘির মত, সমালোচ্য গ্রন্থটি পদ্মফুলের সাজি। সাজির ফুলে প্রাকৃতিক সজীবতা নাই; কিন্তু তাহাদের কাযে লাগানো যায়, বাজারেও বিকায় সহজে। সেই জন্য গ্রন্থখানির প্রচার হইবে আশা করা যায়।

বিবেকানন্দের কথা অনেক স্থলে কাব্যের মত মধুর আছে। একটা বিশ্বাসজনিতও ওজস্বিতা রচনার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জীয়ন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

গ্রন্থখানির প্রচার আবশ্যক।

পারুল

গল্পগ্রন্থ—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৷৵০

বিভিন্ন পত্রিকায় এই গ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বন করিয়া এগুলি রচিত। তবে লেখকের কৌশলে এগুলি দেশী মালের মতই সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে। লেখক তাঁহার ঋণের কথা মুখপত্রেই স্বীকার করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

বিদেশী জিনিস স্বদেশী পরিচ্ছদে সাজাইলে অনেক সময় তাহা শোভন হয় না। এই জন্য বিষয় নির্ব্বাচনে বিশেষ শক্তির আবশ্যক। লেখক সে শক্তি যে দেখান নাই তাহা আমরা বলি না। তবে স্থানে স্থানে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। সেই জন্য আমাদের মনে হয় লেখক যদি গল্পগুলির শুধু অনুবাদ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে সাহিত্যক্ষেত্রে ইহা অধিক সমাদর লাভ করিত।

তারকার মালা

তারকার মালা,
তোরা যে আলোক ঢালা
আকাশের প্রেমের-আখর।
এক কথা ফিরে ফিরে বলা
যে বাণী অনন্ত কাল অজর অমর
তারি শ্লোক, তারি চিত্রকলা ॥

পাটনা
১৩।৩।২৯ } শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

গ্রাহকগণের প্রতি

পৌষ সংখ্যা প্রকাশে অত্যন্ত বিলম্ব হইল, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত মাঘ সংখ্যা ২০শে ফাল্গুন বা তৎপূর্ব্বে প্রকাশিত হইবে।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"—কার্য্যাধ্যক্ষ।

কলিকাতা ৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট "মানসী ও মর্ম্মবাণী" প্রেস হইতে শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৩৬

২য় খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য ও বেদান্ত

অনেকের বিশ্বাস শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্ম্মে, জ্ঞান-বৃক্ষের সকল রকম ফলই নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই জন্য অনেক বৈষ্ণব ও বাবাজিরা বিচার কিংবা যুক্তি তর্কের নাম শুনিলেই নাসিকাগ্র উত্তোলন পূর্ব্বক 'পাষণ্ডীগণকে' কৃষ্ণপ্রাপ্তির সেই সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত পথটি দেখাইয়া দিয়া বলিয়া থাকেন—'ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদুর'। ফলে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, জ্ঞান-হীন ভক্তির অন্ধ উচ্ছ্বাস অনেক স্থলে কৃষ্ণকে ত' মিলাইয়া দেয়ই না,—অধিকন্তু অজ্ঞ ভক্তির অন্ধ সাধনা অতি শীঘ্রই আখড়া বা মঠের ধূলিকর্দ্দমে মিশিয়া বিষম পঙ্কিল ও কৃত্রিম হইয়া পড়ে, এবং অবশেষে এক অসহ্য গোঁড়ামি-তন্ত্রে চরম পর্য্যবসান লাভ করে।

বলা বাহুল্য স্বয়ং মহাপ্রভু ভক্তিকেই মুখ্য সাধনা বলিয়া প্রচার করিলেও, জ্ঞানযোগের উপর এতটা নারাজ ছিলেন না। শুধু তাই নহে। শ্রীচৈতন্য তাঁহার ভক্তি ধর্ম্মকে যে এক যুক্তিতন্ত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠ করিতে চাহিয়াছিলেন ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ কৃষ্ণদাস কবিরাজে চৈতন্যচরিতামৃতে ও অন্যত্র পাওয়া যায়। এবং কবিরাজ গোঁসাইয়ের প্রমাণ কোনই উপেক্ষণীয় প্রমাণ নহে। তাঁহার প্রমাণের ন্যায় বিশ্বস্ত প্রমাণ শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যে কেন, অন্য সাহিত্যেও দুর্ল্লভ। চরিতামৃত গ্রন্থখানি চৈতন্যলীলার যে একটি অবিকল ইতিহাস ইহা মনে করা কোন মতেই অসঙ্গত নহে।

যিনি মনোযোগ সহকারে চরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন তিনি অবশ্যই ঐ গ্রন্থের পত্রে পত্রে সরল, সত্যনিষ্ঠ, সতর্ক, ভক্ত গ্রন্থকারের ছায়া দেখিতে পাইয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় প্রাচীন বয়সে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এবং গ্রন্থকার যেখান হইতে এবং যাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে এই গ্রন্থের

প্রামাণিকতা সহজেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। কবিরাজ গোঁসাই বলিয়াছেন যে নিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি জন্মভূমি ঝামাটপুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হয়েন। বৃন্দাবনে দীর্ঘকাল বাস করিয়া তিনি বহুতর চৈতন্য পার্ষদ ও চৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব জগতে যাঁহারা "ষড় গোস্বামী" নামে প্রসিদ্ধ, সেই ষড় গোস্বামী হইতেছেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষাগুরু, যথা চরিতামৃতে—

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু সে আমার।

এই ষড় গোস্বামীই হইতেছেন চৈতন্য-ধর্ম্মের বিশ্বস্ত ভাণ্ডারী। বিশেষতঃ রূপ ও সনাতনকে শ্রীচৈতন্য আচার্য্য-রূপে স্বয়ং বৈষ্ণব দর্শন শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যৎ কালের জন্য ঐ দুই ভাইকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের যুগল "সেণ্ট পল" নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের পরম প্রিয় রঘুনাথ দাস, কবিরাজ মহাশয়ের শুধু শিক্ষাগুরু ছিলেন না, দীক্ষাগুরুও বটেন। রঘুনাথ নীলাচলে একদিক্রমে আঠার বৎসর কাল মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে বাস করিয়া তাঁহার অপ্রকট হইবার পরে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। এই ষড় গোস্বামী ব্যতিরেকে, ভাগ্যবান কৃষ্ণদাস আরও একজন চৈতন্যের পরম অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গ পাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম স্বরূপ দামোদর। দামোদর নদীয়া হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গী। নীলাচলে তিনি ছিলেন চৈতন্যের দেহরক্ষক, মর্ম্মজ্ঞ ভক্ত, অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ও নিত্য সহচর। তিনিও চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে গ্রন্থ "কড়চা" লিখিয়াছিলেন। এবং ইঁহারই হইতেছেন চৈতন্য লীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও চৈতন্য বাণীর সাক্ষাৎ শ্রোতা। কবিরাজ মহাশয় ইঁহাদের মুখে শুনিয়া এবং ইঁহাদের গ্রন্থ ও কড়চা হইতে সাবধানে সঙ্কলিত করিয়া আমাদিগকে যে চৈতন্য-বাদ দান করিয়া গিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক মূল্য যে কত বেশি ইহা না বলিলেও চলিবে। অতএব কবিরাজ গোঁসাই যাহা বলিয়াছেন তাহাই যে আদিম ও অকৃত্রিম চৈতন্য-বাদ তাহাতে এতটুকুও সংশয় নাই। আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে সে এই অশীতিপর গ্রন্থকার তরুণ ভক্তির অসংযত উচ্ছ্বাসে ইতিহাসকে কবিকল্পনা দিয়া আচ্ছন্ন করেন নাই। সেই জন্য চৈতন্য-বাদের প্রকৃত মর্ম্ম জানিবার পক্ষে চরিতামৃতের ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থ অল্পই আছে।

(২)

এই চরিতামৃত হইতে জানা যায়, চৈতন্য দুই স্থানে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বিপুল বিচারে অবগাহন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত প্রথম বেদান্ত বিচার হয় নীলাচলে বাসুদেব সর্ব্বভৌমের। দ্বিতীয় বার বিচার হয় কাশীধামে দণ্ডী ও সন্ন্যাসিগণের সভায় প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত। উভয় স্থলেই তিনি শঙ্করের বেদান্ত ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া স্বমত স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং মহাপ্রভুর সেই স্বকীয় বেদান্ত আলোকই তাঁহার ভক্তি-তন্ত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাঁহার অলৌকিক প্রেমের সাধনার পথপ্রদর্শক হইয়াছিল!

অতএব চৈতন্যের বেদান্ত বাদ কি ছিল ইহা জানিতে হইলে অগ্রে শঙ্করাচার্য্যের বেদান্ত বাদের মর্ম্মবাণী উপলব্ধি করা আবশ্যক।

শঙ্করের সহিত চৈতন্যের বেদান্তবাদ লইয়া বিরোধ থাকিলেও, মনে রাখিতে হইবে মূল ব্রহ্মসূত্রের সহিত চৈতন্যের কোনই বিরোধ নাই। তাঁহার মতেও বেদান্ত সূত্র হইতেছে ভগবান প্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র—

প্রভু কহে বেদান্ত সূত্র ঈশ্বর বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ॥

নীলাচলে বাসুদেব সর্ব্বভৌম, তরুণ সন্ন্যাসী চৈতন্যকে সাতদিন যাবৎ বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য বুঝাইয়াছিলেন এবং তিনিও সাতদিন নিরুত্তরে তাহা শুনিয়াছিলেন। অষ্টম দিনে সর্ব্বভৌম ঠাকুর কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—

ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কিম্বা নাহি বুঝ বুঝিতে না পারি॥

তখন চৈতন্য প্রথম মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন —

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে সরণ।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত চিকন॥

শঙ্কর কথিত বেদান্তব্যাখ্যা শুনিয়া চৈতন্যের মন কেন

চিকন হইয়াছিল ইহা বুঝিতে হইলেও শঙ্কর দর্শনের যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রয়োজন।

বেদান্তের শঙ্কর কৃত শারীরক ভাষ্য অস্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ যেন না মনে কারন যে শ্রীচৈতন্যও আধুনিক বৈষ্ণব গণের ন্যায় শঙ্করকে তুচ্ছ বা অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ"—শঙ্কর শিবাবতার। এই জন্য সার্ব্বভৌম সভায় সর্ব্ব প্রথমে তর্ক উঠিয়াছিল শঙ্কর যদি সাক্ষাৎ শিবাবতার, তবে তাঁহার বেদান্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হইতে পারে কিরূপে? গৌরাঙ্গ ইহার উত্তরে পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ড (৬২।৩১) হইতে এই শ্লোকটি পাঠ করিয়াছিলেন—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয়, যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

—অর্থাৎ শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন, হে শিব! আপনি স্বকৃত কল্পিত আগমের দ্বারা মনুষ্যগণকে ভগবদ্বিমুখ করুন এবং ভগবানকে গোপন করুন, তাহা হইলে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সেই জন্য গৌরাঙ্গ বলিয়াছিলেন—

আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বরাজ্ঞা হইল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

কিন্তু বাস্তবিকই কি শঙ্কর "নাস্তিক শাস্ত্র" করিয়াছিলেন? শঙ্কর অবশ্যই এক নির্ব্বিশেষ স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মকে স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই জন্য নিশ্চয়ই শঙ্করবাদকে, চার্ব্বাক বাদের ন্যায় নাস্তিকবাদ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু শ্রীচৈতন্য শঙ্করবাদকে যে নাস্তিক শাস্ত্র বলিয়াছিলেন তাহারও উপযুক্ত কারণ আছে। কারণ শঙ্কর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেও, কোনই সত্য ও উপাস্য ভগবানের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। এবং তাহা স্বীকার করেন নাই বলিয়াই পন্থা ভক্তির চিরদিনই শঙ্করবাদের বিরুদ্ধে এক প্রবল ক্ষোভ থাকিয়া গিয়াছে। কোনও উপাস্য দেবতা বা সত্য ভগবান নাই বলাই হইতেছে শঙ্করের নাস্তিকতা, এবং পদ্মপুরাণের মতে ইহাই হইতেছে "শ্রীভগবানকে গোপন করা।"

এখন দেখা যাউক, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মকে স্বীকার করা সত্ত্বেও শঙ্কর কোন্ যুক্তিবলে উপাস্য দেবতা-স্বরূপ ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। বেদান্ত দর্শনের চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যায় শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহার ন্যায়ানুগত মর্ম্ম এই—

"সমস্ত বেদান্ত বাক্য সমন্বিত তাৎপর্য্যের দ্বারা যে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে সেই ব্রহ্ম হইতেছেন (কেবল মাত্র) সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি লয়ের কারণ। সমন্বয়যুক্ত বেদান্তবাক্য দ্বারা এতদ্-ব্যতিরিক্ত একজন কর্ত্তাস্বরূপ, বা উপাস্য দেবতা-স্বরূপ, ভগবান কথনই প্রতিপন্ন হয় না। ব্রহ্মকে কখনই উপাস্য দেবতা বলা যাইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম হইতেছেন নির্গুণ ও হেয়-উপাদেয় শূন্য। অর্থাৎ ব্রহ্মে এমন কোনই উপাদেয় গুণ থাকিতে পারে না যাহার জন্য তিনি মায়াগত জীবের উপাস্য রূপেও প্রতীয়মান হইতে পারেন।"

শঙ্কর আশঙ্কা করিয়াছিলেন অপর পক্ষ এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম যখন স্বরূপতঃ হেয়-উপাদেয়শূন্য, তখন তেমন নির্গুণ, নির্লিপ্ত, উপাদেয় গুণহীন ব্রহ্মকে লাভ করিলেও জীবের কোন ইষ্ট নাই, আর লাভ না করিলেও কোন অনিষ্ট নাই। অর্থাৎ ঐরূপ নির্গুণ তটস্থ ব্রহ্মের দ্বারা জীবের কোন পুরুষার্থই সিদ্ধি হইতে পারে না।

তর্কযুদ্ধে অপ্রতিরথ সব্যসাচী শঙ্কর এই আপত্তির উত্তরে বলিয়াছেন—"ইহা সত্য। কিন্তু জীবের পরম পুরুষার্থ ব্রহ্মকে লাভ করা নহে, জীবের পরম পুরুষার্থ হইতেছে সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি। এবং ব্রহ্মকে লাভ করা, এই উপায়ের দ্বারা সেই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ জীবের চরম অভীষ্ট সাধনের একটি উপায় মাত্র, এবং সেই উপায়ের উপেয় হইতেছে দুঃখ নিবৃত্তি। অতএব ব্রহ্ম যদি জীবের পক্ষে উপাদেয় গুণ বিশিষ্ট নাই হয়েন তাহাতেই বা ক্ষতি কি,-ফলে তাঁহার দ্বারা জীবের চরম অভীষ্ট লাভ বা সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ত হইয়াই যায়।"

ইহার মধ্যে নিরীশ্বর শাস্ত্রের গন্ধ কেহ যদি না পান তবে তাহা তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু আরও আছে। শঙ্কর বলিয়াছেন—

"ঈশ্বর কোনই উপাসনাযোগ্য দেবতা নাহন, ইহা

বলাতে কেহ কেহ হয়ত আপত্তি করিয়া বলিবেন ঈশ্বর যদি উপাস্য দেবতা না হন তবে বেদান্তে যে উপাসনাপর বাক্য সকল আছে তাহার কোনই অর্থ থাকিতে পারে না। এবং ঈশ্বরোপাসনা বলিয়া কিছুই হইতে পারে না। বাদীগণের এই আপত্তি সমিচীন নহে। কারণ উপাসনা-বিধি-বিশেষ সকল জীবের অজ্ঞান কালের জানাই বিহিত হইয়াছে। কারণ উপাস্য ও উপাসক, এই উদ্ধত বুদ্ধি ব্যতিরেকে কোন উপাসনাই সম্ভব হইতে পারেনা। আমিই ঈশ্বর ইহা জানিয়া কাহারেই পক্ষে ঈশ্বরোপাসনা সম্ভব নহে। কিন্তু দ্বৈত বুদ্ধি মাত্রই হইতেছে ভ্রান্ত বুদ্ধি, এবং উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধে যে ভেদজ্ঞান ও দ্বৈত বুদ্ধি তাহাও অবশ্য মিথ্যা বুদ্ধি। এবং যখন অদ্বৈত জ্ঞানের প্রভাবে জীব ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করে, তখন তাহার পক্ষে উপাসনা অসম্ভব হয় এবং উপাসনার কোন প্রয়োজনও থাকে না। উপাসনার তখন আর প্রয়োজন থাকে না, কারণ অদ্বৈত মুক্ত জীবকে আর ত জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না যাহার জন্য তাহাকে আবার উপাসনায় নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন হইতে পারে।"

ইহা শুধুই যে নাস্তিকবাদ, তাহা নহে। ভক্ত ও ভগবান উভয়ের পক্ষেই এতদপেক্ষা মর্য্যাদাহানিকর অন্য কি সিদ্ধান্ত হইতে পারে তাহা বলা যায় না। কেন না শঙ্কর যা বলিয়াছেন তাহাতে কথাটা ঠিক এই রকম দাঁড়ায়। জীব যতদিন অজ্ঞান থাকিবে ততদিন সে এক কল্পিত ভগবানের পূজা (শঙ্করের ভাষায়,"অধ্যস্ত উপাসনা") করিতে পারে শঙ্কর তাহাতে আপত্তি করেন না। কিন্তু ভক্তকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে সে পূজা তাহার মিথ্যা পূজা এবং সে ভগবান তাহার মিথ্যার পুতুল ভগবান। এবং সেই পুতুল ভগবানের পূজা দ্বারা সে যখন কায "ফতে" করিবে,তখন অনায়াসেই তাহার কল্পিত ভগবানকে অদ্বৈত জ্ঞানের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিতে পারিবে অহং ব্রহ্মাস্মি। অর্থাৎ ভক্তির একমাত্র ন্যায়সঙ্গত দুরভিসন্ধি এই যে ভক্তই অবশেষে ভগবানের সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়া বলিবে সোঽহম্।

শঙ্করাচার্য্যের কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনও নিকৃষ্টতম ভক্তি-সাধকও তাহার ইষ্টদেবতা সম্বন্ধে এই বিদ্রোহী দুরভিসন্ধিকে অন্তরে গোপন রাখিয়া, কদাপি কস্মিন কালে পূজার আসনে উপবেশন করিয়াছে কি না জানি না। ফলে কিন্তু ইহা অপেক্ষা মার্কা মারা কপট ভক্তি আর কিছুই হইতে পারে না।

(৩)

এই রূপে আচার্য্য শঙ্কর ভক্ত ও ভগবান উভয়কেই অবিদ্যার গহন বিপিনে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার কারণ ইহা নহে যে, আচার্য্য এমন একজন পাষণ্ড নাস্তিক ছিলেন যাঁহার দুষ্ট ধাতুতে ভগবান আদৌ বরদাস্ত হয় নাই। উপাসনা ও ভক্তির দিকে শঙ্করাচার্য্যের যে অন্তরিক ঝোঁক্ ছিল তাহা তাঁহার গীতার ভাষ্যে ও অন্যত্র স্পষ্টই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহার অত্যন্ত-অদ্বৈতবাদ ছিল তাঁহার বড়ই নির্দ্দয় মনিব। এবং সেই নির্দ্দয় মনিবকে বিচারে সঙ্গতি দান করিতে গিয়া ভক্তের ভগবানকেও তিনি মায়া রাজ্যে নির্ব্বাসন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীচৈতন্য যাহাকে শঙ্করের নাস্তিক বাদ বলিয়াছিলেন তাহার জন্য শঙ্কর দায়ী নহেন, শঙ্করের অদ্বৈতবাদই দায়ী।

এই অদ্বৈতবাদই হইতেছে শঙ্কর দর্শনের নিয়ামক মধ্য-বিন্দু। তাঁহার সমস্ত দার্শনিক সিদ্ধান্ত এই অদ্বৈতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সংযত হইয়াছে। সমগ্র শারীরক ভাষ্য এই অদ্বৈতবাদের বহু বিস্তৃত যুক্তিকে বহুধা প্রপঞ্চিত করিতেছে। এবং সংক্ষেপের মধ্যে সেই বহু-বিস্তৃত যুক্তির সার মর্ম্ম কথা এই :—

(১) সাধারণ জগৎ-জ্ঞান অনুসারে জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে আমাদের দুই প্রকার জ্ঞান হয়। এক প্রকার জ্ঞান হইতেছে "ভেদ জ্ঞান" বা "দ্বৈত বুদ্ধি" যাহার জন্য আমরা বলিয়া থাকি এটি অশ্ব এবং এটি গো হইতে ভিন্ন বস্তু, কিংবা এটি ঘট রূপ বস্তু, পট রূপ বস্তু নহে। এই যে ভেদবুদ্ধি ও দ্বৈত জ্ঞান, শঙ্করের মতে ইহা হইতেছে ভ্রান্ত জ্ঞান বা অবিদ্যা, কারণ শ্রুতির অভ্রান্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়—"ইহ নানাস্তি কিঞ্চন"—এখানে নানা বলিয়া কোন বিষয়ই নাই।

(২) দ্বিতীয়তঃ জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন "পদার্থ জ্ঞান" হয় যাহার জন্য আমরা বলি ইহার নাম ঘট, ইহার নাম কলস ইত্যাদি। শঙ্করের ভাষায় এই পদার্থ জ্ঞানের নাম হইতেছে "নামরূপে ব্যাকৃত

জ্ঞান"। এই প্রপঞ্চ জ্ঞানও দ্বৈত জ্ঞানের ন্যায়, শঙ্করের মতে মিথ্যা জ্ঞান, কারণ শ্রুতি বলিতেছেন "ব্রহ্মে-বেদং সর্ব্বং"—এ সমস্তই ব্রহ্ম। কিন্তু আমাদের সহজাত দুর্বুদ্ধিবশতঃ এই ভেদাত্মক জগৎ প্রপঞ্চকে, জগৎ প্রপঞ্চ বলিয়াই জ্ঞান হয়, এবং জগৎ দৃষ্টে সাধারণতঃ কাহারই অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান হয় না। অর্থাৎ আজন্ম সিদ্ধ মায়ার ঠুলি চোখে পরিয়া আমরা ব্রহ্মকেই ভ্রমক্রমে নানাত্মক বলিয়া দেখিতেছি। অতএব আমাদের আগাগোড়া জগৎ দর্শন হইতেছে রজ্জুতে সর্পভ্রম, মরুভূমিতে জলভ্রম। এবং এই প্রপঞ্চ জগৎ হইতেছে আমাদের জাগ্রৎ স্বপ্ন।

অতএব শঙ্কর বাদের অব্যভিচারী নির্দ্দয় সর্ত্ত এই যে ব্রহ্মকে সত্য হইতে হইলে জগৎকে অবশ্যই মিথ্যা হইতে হইবে। অর্থাৎ শঙ্করদর্শনের যে পৃষ্ঠায় অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ পঠিত হয়, ঠিক্ তাহার বিপরীত পৃষ্ঠায় মায়াবাদের যুক্তি সকল সমাহিত হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় শঙ্করের শুদ্ধ বুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মেও "প্রতিযোগি সত্তা" হইতেছে "নামরূপে ব্যাকৃত জগৎ"। অতএব শঙ্কর দর্শনকে মায়াবাদ ও অদ্বৈত বাদ উভয় নামেই অভিহিত করা যাইতে পারে।

এবং শঙ্করের দুইটি প্রতিজ্ঞা, ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা—এই দুইটি প্রতিজ্ঞার মধ্যে সূচ্যগ্র অবকাশ নাই। শঙ্কর ঘোর তর্ক করিয়া দেখাইয়াছেন অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত জাগতিক দ্বৈত জ্ঞান, কোনও দিক দিয়া, কোনও মতেই সত্য বা সমঞ্জস হইতে পারে না।

অতএব শঙ্করকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, জাগতিক দ্বৈতভাব-দুষ্ট উপনিষদের ভাষাদ্বারাও অদ্বৈত ও জগদতীত সেই ব্রহ্মকে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তথাপি তিনি বলিয়াছেন জাগতিক দ্বৈত জ্ঞানের বিভ্রান্ত কলকোলাহলের মধ্যেও কল্পনাবলে অদ্বৈত ব্রহ্মের "অনুভূতি" অসম্ভব নহে। এবং সেই 'অনুভূতি' দ্বারাও উপনিষদের প্রমাণ অনুসারে তিনি ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া বলিয়াছেন-"স এষ নেতি-নেতি-আত্মা"—সেই ব্রহ্ম হইতেছেন নেতি নেতি (ইহা-নয়, ইহা-নয়) স্বভাবাত্মক, ও "অশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"—সেই অশরীর সৎ স্বরূপকে কোনই প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করে না। অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্ববিধ শেষ গুণ রহিত নির্ব্বিশেষ স্বরূপ, এবং সেই ব্রহ্মে প্রিয় অপ্রিয় প্রভৃতি কোনই মানসিক গুণ নাই।

(৪)

শঙ্কর এইরূপে যে মায়াবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা যে শঙ্করের সম্পূর্ণ অভিনব মতবাদ ইহা বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। শঙ্করের পূর্ব্বে ও পরে অন্য প্রকার বেদান্ত ব্যাখ্যা যে প্রচলিত ছিল তাহাতে সংশয় নাই। এমন কি শঙ্করের পূর্ব্বতন বেদান্ত ব্যাখ্যাকারদের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, যথা বোধায়ন, দ্রামিড়, গুহদেব প্রভৃতি। ইঁহাদের বেদান্ত ভাষ্য অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু রামানুজ স্বামী বলিয়াছেন যে শঙ্করের পূর্ব্বগামী বেদান্ত ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে কেহই শঙ্করের ন্যায় অত্যন্ত-অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে বেদান্ত ব্যাখ্যা করেন নাই, সকলেই তাঁহার ন্যায় বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যও রামানুজ স্বামীর ন্যায় বিশিষ্ট অদ্বৈত বাদ অবলম্বনে বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যার প্রথার একটি অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষ প্রথাটি নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

চৈতন্য বলিয়াছেন "ব্যাস সূত্রের গম্ভীরার্থ জীব নাহি জানে" এই জন্যই বেদান্তের নানা প্রকার অর্থ সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এমন যদি হয়—

যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থে সকলের হয় জ্ঞান॥

এবং চৈতন্যের মতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছে ব্রহ্মসূত্রকারের সেই স্বকৃত সূত্রের ব্যাখ্যা। ইহা শুধুই গৌরাঙ্গের মত নহে, গরুড় পুরাণেও এই কথা আছে যথা—

অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্ ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী ভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থো পরিবৃংহিতঃ॥

—এই ভাগবত হইতেছে ব্রহ্মসূত্র সকলের অর্থ, ইহাতে মহাভারতের অর্থের বিনির্ণয় হইয়াছে। ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ, বেদের অর্থ ইহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে শ্রীচৈতন্য কাশীর সন্ন্যাসী সমাজে দেখাইয়া দিয়াছিলেন—

যেই সূত্রে সেই ঋক্ বিষয় রচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন ॥

ইহার উদাহরণ যথা—ভাগবত ৮।১।৮—

আত্মাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ কস্য সিদ্ধনং ॥

বলা বাহুল্য ইহার ঋক্ ঈশোপনিষৎ বেদান্ত, ভাগবতে তাহারশ্লোক-নিবন্ধন।

ব্রহ্ম সূত্রের ব্যাখ্যাই যে ভাগবতের মুখ্য অভিসন্ধি ছিল তাহার স্পষ্ট সঙ্কেত পাওয়া যায় ভাগবতের সর্ব্বপ্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকের মধ্যেই। সকলেই জানেন বেদান্ত দর্শন যে সূত্রটির দ্বারা ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই সূত্রটিই হইতেছে বেদান্তের সর্ব্বপ্রধান সূত্র, এবং সেই সূত্রটী হইতেছে—"জন্মাদ্যস্য যত ইতি"। ব্রহ্ম সূত্রের ব্রহ্ম নির্দ্দেশক এই সূত্র হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের প্রথম পাদাংশ, যথা—

"জন্মাদ্যস্য যতো অন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞ স্বরাট্।"

শ্রীচৈতন্য কিন্তু ইহা হইতেও গভীরতর প্রদেশে অবগাহন করিয়া, "আভ্যন্তরীণ" প্রমাণের দ্বারা ভাগবত ও ব্রহ্ম সূত্রের মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ অবধারণ করিয়াছিলেন।

বেদব্যাস কোথা হইতে ভাগবতরূপ মহাবৃক্ষের বীজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহা ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনা এইরূপ—একদা ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইয়া ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু ধারায় বিগলিত হইয়াছিলেন। তাহাতে ভগবান প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। ব্রহ্মা এই বর প্রার্থনা করিলেন—

পরাবরে যথারূপং জানীয়াংতে অরূপিনঃ।

—অর্থাৎ ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন হে নাথ, রূপহীন আপনার যে পর-রূপ ও অবর-রূপ তাহা যেন আমি জানিতে পারি এই বর প্রদান করুন। তখন ভগবান চারিটি শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অরূপের পররূপ ও অবর-রূপ বিষয়ক যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা ব্রহ্মার হৃদয়ে সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাহাই ভাগবতের বীজ স্বরূপ চতুঃশ্লোকী নামে বিখ্যাত। ব্রহ্মা সেই চতুঃশ্লোকী নারদকে বলেন, নারদ ব্যাস হইতে ব্যাস তাহা প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন

ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল ॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যরূপ ॥

ভাগবত-বীজ এই চতুঃশ্লোকী দ্বারা মহাপ্রভু কিরূপে বেদান্ত সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা স্থানান্তরে আলোচ্য।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

হিন্দুর মেয়ে

(উপন্যাস)

ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অসীমদের নৌকা যখন গ্রামের ঘাটে ভিড়িল তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। কাননকুন্তলা পল্লীখানি কুয়াসায় আবৃত। পল্লবঘন আম্রবৃক্ষ কুয়াসার আবরণ ভেদ করিয়া ঈষৎ উঁকি দিতেছে। পত্রপুষ্প হইতে স্বচ্ছ শুভ্র শিশিরবিন্দু শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। শিশির ভেজা সরিষা ক্ষেতের কোমল সুমিষ্ট গন্ধ বাতাস বহিয়া আনিতেছে। বন পথ হইতে রাখালের সাধের বাঁশরীটি বাজিয়া উঠিয়াছে।

পল্লীর শ্যামল সুষমা, শীতের শিশিরস্নাত আকাশ, বিহগের মধুর ঝঙ্কারে পল্লীর গৃহে গৃহে নূতন ধান কোটার শব্দ, নবান্নের উৎসব—সবটা মিলিয়া মিশিয়া অসীমের শীর্ণ

শান্ত প্রাণে মোহন তুলিকা বুলাইতে লাগিল। তাহার মনে হইল—কতদিন পরে কতযুগ পরে যে যেন আজ মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিল। তাহার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্ব্বচনীয় ধ্বনি গন্ধ লইয়া সহসা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

চোখের সম্মুখে তাহাদের চণ্ডী মণ্ডপ, শয়ন গৃহ, গোয়াল, ঢেঁকিশালা একটির পর একটি যেমনি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, আশার আনন্দে তাহার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। ঐ তাহার গৃহ, শান্তিভরা স্মৃতিভরা জন্মভূমি, উহারই অভ্যন্তরে তাহার স্নেহময় পিতা, পুত্রের প্রতীক্ষা করিতেছেন।—আর প্রতীক্ষা করিতেছে সুব্রতা। সুব্রতার কথা মনে হওয়া মাত্র অসীমের হৃদয়ে সন্ধ্যা তারার মত সুব্রতার সজল সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উন্মুখ অন্তর অপরূপ প্রীতির রসে ডুবিয়া গেল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, সম্মুখে তাপসীর সহিত পুত্রকে দেখিয়া তিনি আনন্দে অভিভূত হইলেন। প্রণত পুত্রের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বারম্বার তাহার কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

সুব্রতা প্রাঙ্গণের তুলসী গাছ হইতে পূজার তুলসী তুলিতেছিল। দূর হইতে স্বামীর রোগপাণ্ডুর মুখ তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল। সুব্রতা শিহরিয়া উঠিল। হায়, ওই কি তাহার সেই উজ্জ্বলকান্তি বলিষ্ঠ স্বামী? নিষ্ঠুর রোগ-রাক্ষসীর ক্ষুধার চিহ্ন এখনো যে উহার সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। শ্যামসুন্দর, বড় রক্ষা করিয়াছ,—তোমার এত দয়া, এত করুণা! সুব্রতা ভক্তিভরে শ্যামসুন্দরের উদ্দেশে সেই তুলসী মূলে প্রণাম করিল।

তাপসী তাহার পশ্চাৎ হইতে বলিলেন, "আজ কি তোর তুলসী তোলা হবে না ব্রতা? তোর সাত রাজার ধন মাণিকটিকে আমি কানপুরের পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছি, বোন, তোর জিনিস তুই দেখে নেন। এখন তুলসী রেখে অসীমের মুখ ধোবার জল টল ঠিক করে দে, আর একটু জলখাবার গুছিয়ে রাখ। রোগা মানুষ পথে এ দুদিন ত এক রকম খাওয়াই হয়নি। সকাল সকাল রান্নারও যোগাড় করতে হবে।"

সুব্রতা টাটের উপর হাতের তুলসী পাতা রাখিয়া তাপসীকে প্রণাম করিল।

তাপসী আশীর্ব্বাদের ছলে তাহার চিবুকে হাত দিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "এ কি ব্রতা, তুই এমন হয়ে গেছিস কেন? উঃ এই কদিনে কি রোগাটাই হয়েছিস। না খেয়ে না দেয়ে বড্ড বেশী বেশী ভেবেছিস বলে বুঝি শরীরের এমন ছিরি হয়েছে? এ কি মূর্ত্তি! দেখে যে চিনতে পারাই দায়।"

সুব্রতার চোখের কোণে জল টলটল করিতে লাগিল। সত্যই এ কয়েক দিন সুব্রতার একরূপ অনাহারেই কাটিয়াছে। শ্যামসুন্দরের প্রসাদের সামনে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে সে একবার করিয়া বসিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুই খাইতে পারে নাই। অনিদ্রায়, অনাহারে, প্রার্থনার অশ্রুজলে তাহার দীর্ঘ দিবা দীর্ঘ রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। কত উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও মানসিক যন্ত্রণা যে তাহার এই কয়েক দিনের ইতিহাসের ভিতর নিহিত রহিয়াছে তাহা একমাত্র অন্তর্যামী জানেন। সেই অব্যক্ত যন্ত্রণার একটুখানি ইঙ্গিতে সুব্রতার চোখ জলে ভরিয়া গেল। সে জলটুকু তাপসীকে লুকাইয়া বিষাদের হাসি হাসিয়া সুব্রতা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

অসীমের দ্রব্যাদি তাহার ঘরে সাজাইয়া গুছাইয়া তাহাকে জলযোগ করাইয়া তাপসী সুব্রতাকে লইয়া বসিলেন। মুকুলের উপহারগুলি সুব্রতাকে দেখাইয়া তাহার নিকটে মুকুলের ব্যর্থ জীবনের করুণ কাহিনী বিবৃত করিলেন।

শুনিতে শুনিতে সুব্রতার সুকোমল হৃদয় করুণায় আর্দ্র হইলে। স্বামী ইহাকেই ভাল বাসিয়াছিলেন, সংসারে এমন কে আছে যে অমন দেবী প্রতিমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে? যে ভালবাসার যোগ্য তাহাকে যে সকলেই ভালবাসে। দিদি দুইদিনেই কত ভাল বাসিয়াছেন। সুব্রতা—সেকি আর ভালবাসে নাই?

ভাল যদি নাই বাসিবে তাহা হইলে মুকুলের দুঃখে সুব্রতার হৃদয় আকুল হইতেছে কেন? চোখে জল আসিতেছে কেন?

সুব্রতা যতই মুকুলের প্রদত্ত উপহার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল।

সুব্রতা সেই অমূল্য উপহার মাথায় ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। প্রণামান্তে মনে মনে বলিল, দেবী, তোমাকে আ

দেখিয়া এতদূর হইতে আমিও তোমাকে ভালবাসিয়াছি। তুমি আশীর্ব্বাদ করিও আমি যেন তোমারি মত স্বামীকে ভালবাসিতে শিখি।

মুকুলের কাছে স্বামীকে ভালবাসার আশীর্ব্বাদ চাহিয়াও সুব্রতা অসীমের সহিত সাক্ষাৎ করিল না। রান্না করিয়া অসীমকে ভোজন করাইল। বিছানা পাতিয়া রাখিল। পাণ সাজিয়া দিল, কিন্তু নিভৃতে তাহার সহিত একটি কথাও কহিতে পারিল না।

কণারকের শপথ, অসীমের পত্র—অধিক নহে উভয়ের মধ্যে এইটুকু মাত্র ব্যবধান, কিন্তু এই ব্যবধান টুকু সুব্রতার নিকটে মৃত্যু অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক হইল। স্বামীর অকল্যাণ ভয়ে সুব্রতা ব্যবধান টুকু অতিক্রম করিতে সাহসী হইল না। এত কালের পর স্বামী সুব্রতার কাছে আসিয়াও বহু দূরে রহিলেন। সুব্রতার ক্ষমতাও রহিল না না যে তাঁহার নাগাল পায়, মায়া গণ্ডী মুছিয়া ফেলে। গণ্ডীর বাহিরে থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার জীবন দুঃসহ হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ও সুব্রতার খুঁজিয়া পাইল না।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দু'জনার মাঝ খানে বাক্যে বেদনায় পরিপূর্ণ একটা ব্যবধান যে বিরাজ করিতেছে সেটা অনুমান করিতে তাপসীর বিলম্ব হইল না। এই ছাড়া ছাড়া ভাবে নীরবতায় তাপসী ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে একটা সংশয়ের মেঘ ঘনাইয়া আসিল।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর তাপসী সুব্রতাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিলেন, "ব্রতু তোর এ কি ব্যবহার? এত কালের পর স্বামী ঘরে এলেন, শুধু ঘরে আসা নয়, এত রোগ ভোগের পর তোর কাছে ফিরে এলেন, আর তুই একবার তার সঙ্গে কথা বল্লি না, কাছে গেলি না, এটা যে তার পক্ষে কত কষ্টের তা কি একবার ভেবে দেখেছিস? এখন তো কাযকর্ম্ম রান্না খাওয়া মিটে গেল, এইবার তুই যা বোন, অসীমের কাছে একটু যা, সে তোর ঘরে এসেই শুয়ে রয়েছে।"

তাপসী তাকের উপর হইতে চিরুণী খানা লইয়া সুব্রতার কয়েক-দিনের জটবদ্ধ চুলগুলির সংস্কার করিতে লাগিলেন। সুব্রতা বাধা দিল না। নিঃশব্দে নতমুখে রহিল। মাথা পরিষ্কারের পর মুখ মুছাইয়া সিন্দুরের টিপ পরাইয়া দিয়া তাপসী বলিলেন, "মুকুল তোকে যে শাড়ী গয়না দিয়েছে সেগুলো নিয়ে আয় ব্রতা, পরিয়ে দিই, অসীম দেখলে ভারী খুসী হবে।"

"না দিদি, সে সব আজ থাক।"

"থাকবে কেন ব্রতা, পরবিনে? না পরলি, তোর পরণের ময়লা কাপড়টা ছেড়ে এক খানা ধোয়া কাপড় পর্। অসীম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে বড্ড ভালবাসে। একটু পরিষ্কার হয়ে তার কাছে যা ব্রতু, চুপ করে বসে রইলি কেন?"

ব্রতা করুণ কণ্ঠে কহিল, "কেমন করে যাব দিদি, শ্যামসুন্দর ত আমায় যেতে বলেন নি। যদি অকল্যাণ হয়, অধর্ম্ম হয়? আমি কি করে যাই?"

তাপসী বিস্মিত হইলেন। শ্যামসুন্দর আবার সুব্রতাকে স্বামী সম্ভাষণের কথা কি বলিবেন? সুব্রতা কি পাগল হইয়াছে? অত্যধিক দুর্ভাবনায় তাহার মস্তিষ্কের তো বিকার ঘটে নাই?

তাপসী সুব্রতার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, "কিসের অকল্যাণ ব্রতা, পাগলের মত কি বলছিস? স্বামীই যে হিন্দু স্ত্রীর বড় ধর্ম্ম, তার কাছে যেতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? শ্যামসুন্দর কি করে তোকে যেতে বলবেন, তিনি কি তোর সাথে কথা বলেন?"

"কথা না বল্লেও আদেশ জানান দিদি। অসুখের সময় ভাল হবার কথা শ্যামসুন্দরই আমার মনে মনে বলে দিয়েছিলেন, তাই আমি তোমার সঙ্গে না গিয়েও থাকতে পেরেছিলাম। দিদি তুমি সব জান না, জানলে বুঝতে পারতে।"

"কে বলে জানিনে ব্রতা? অসীমের কাছে আমি সমস্তই শুনেচি, তোর কিছু বলতে হবে না বোন। অসীম তোকে যা বলেছিল সেটা প্রতিজ্ঞা নয়, মিথ্যা অহঙ্কার, অমন অনেকেই ব'লে থাকে।"

"বলে থাকলেও শ্যামসুন্দরের নাম নিয়ে কেউ বলে না দিদি, হিন্দুর একটা বড় তীর্থেও কেউ বলে না।"

"যার শ্যামসুন্দর নেই, সে শ্যামসুন্দরের নাম কোথায় পাবে ব্রতা? যাদের আছে, তাদের সব তাতেই তাঁর নাম মুখে এসে পড়ে। অসীমের মুখে এসেছিল, তোর

মুখে ত আসে নি, তাতে দোষ হয়নি। স্বামী পতিত হলে স্ত্রী পতিত স্বামীর সঙ্গে গেলে কোন কালেও ধর্ম্মে পতিত হয় না। হিন্দুর মেয়ের স্বতন্ত্রতা নেই, স্বামী ভিন্ন ধর্ম্ম নেই। স্বামীই হিন্দুনারীর ধর্ম্ম, সত্য। ওঠ্ ব্রতা আর দেরী করিসনে।"

সুব্রতা বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিল। তাহাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া তাপসী প্রফুল্ল হৃদয়ে পাড়ার দুঃখী কাঙ্গাল দের খবর লইতে চলিয়া গেলেন।

সুব্রতা ধীরে শয়নকক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

বাতাসে ঘরের কপাট এক এক বার মৃদু মন্দ আর্ত্ত স্বর সহকারে খুলিতেছে, আবার বন্ধ হইতেছে।

উঠানে কাঁচামিঠা আমের ডালে বসিয়া ঘুঘু দম্পতি অবিশ্রান্ত গান গাহিতেছে। অদূরের বনভূমি হইতে কাঠ ঠোকরা শব্দের সহিত শুষ্ক বাঁশের পাতা ঝর ঝর করিয়া উঠিতেছে।

সুব্রতা শ্রান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মত কিয়ৎকাল সেই খানে দাঁড়াইয়া ঠাকুরঘরের দিকে ফিরিল।

বিগ্রহের সম্মুখে মেঝের মাথা নামাইয়া প্রণামান্তে সুব্রতা বলিল, "স্বপ্নে কিংবা জাগরণে তুমি ত এ অধমাকে আদেশ করলে না। পাপ পুণ্য দোষ গুণ সব তুমি জান, আমি জানি না। দিদি বলেছেন তোমার নাম নিয়ে শপথ [illegible] দোষ হয় না, অকল্যাণ হয় না। দিদির আদেশ তোমারি আদেশ বলে আমি পালন করতে যাচ্ছি, তুমি তাঁর মঙ্গল কোরো প্রভু।"

সুব্রতা স্বামী সম্ভাষণ করিবার জন্য উঠিল বটে, কিন্তু অসীমের কাছে তাহার যাওয়া হইল না।

হঠাৎ শাড়ীর অঞ্চলটি পায়ে জড়াইয়া সুব্রতা দ্বারদেশে বসিয়া পড়িল। ডান পা খানিতে ভয়ানক আঘাত লাগিল, সাধের শাড়ীর অঞ্চলটি ছিঁড়িয়া গেল।

সুব্রতার মুখ শুখাইয়া এতটুকু হইল। দুই চোখ বহিয়া জল ঝরিতে লাগিল। এ আকস্মিক আঘাত শ্যামসুন্দরের নীরব ইঙ্গিত ছাড়া সুব্রতা আর কিছুই মনে করিতে পারিল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাপসী গৃহে ফিরিলেন। সুব্রতা তখন ভাঙ্গা হৃদয় জোড়া দিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কায করিতেছিল। অসীম নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিল। তাপসী অসীম সম্বন্ধে সুব্রতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না বলিয়া মধ্যাহ্নের ঘটনা দিদির কাছে সুব্রতার বলা হইল না।

অষ্টাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কয়েকদিনের অনিয়ম ও পথশ্রমে তাপসী ভারী শ্রান্ত হইয়াছিলেন। শ্বশুর ও দেবরের আহারের পর রঘুকে খাইতে বসাইয়া দিয়া সুব্রতাকে খাইতে বলিয়া তিনি শয়ন করিতে গেলেন।

সুব্রতা রান্নাঘরের কায সারিয়া আলো নিবাইয়া দিল, কিন্তু নিজে কিছুই খাইল না।

কাপড় ছাড়িয়া ধোয়া কাপড় পরিয়া সুব্রতা আস্তে আস্তে পূজার মন্দিরে প্রবেশ করিল।

নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রি। জানালা-পথে এক রাশি জ্যোৎস্না আসিয়া শ্যামসুন্দরের চৌকীর উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল। জ্যোৎস্নাকিরণে শ্যামসুন্দরের রৌপ্যনির্ম্মিত সুন্দর চক্ষু দুইটি ঝক ঝক করিয়া জ্বলিতেছিল। অধরৌষ্ঠের মৃদু মৃদু হাসিটুকুর উপর জ্যোৎস্না যেন মধুবর্ষণ করিতেছিল। জ্যোৎস্না ধারায় স্নাত শ্যামসুন্দরের কণ্ঠের মালতীর মালার স্নিগ্ধ সৌরভে চারিদিক গন্ধোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

গলবস্ত্রে যুক্তকরে সুব্রতা সেই মনোমোহন মূর্ত্তিটির পানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া কিছুতেই যেন তাহার চোখের তৃষার নিবৃত্তি হইল না। হৃদয়ের নীরব প্রার্থনা কিছুতেই যেন শেষ হইল না। সুব্রতার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া আকাশের চাঁদও যেন সেই মূর্ত্তিটির পানে চাহিয়া রহিল। পুষ্পপাত্রের নির্ম্মাল্য ফুলগুলি সেই দিকে আঁখি মেলিল। নিশীথের গ্রহ-চন্দ্র-তারা-খচিত নিস্তব্ধ গগন, মুক্তাহারের নিবিড় নীল জলরাশি, ঘনকৃষ্ণ বনরেখা সকলেই সেই অনন্ত সুন্দর ভুবনমোহন মূর্ত্তিটির দিকে নির্ণিমেষে চাহিল। সুব্রতার জগতে আর কিছুই রহিল না। সেই মূর্ত্তি, সেই গন্ধ, সেই জ্যোৎস্নায় দিক দিক ভরিয়া গেল।

এক প্রহর, দুই প্রহর; সুব্রতা আর পারিল না। জাগরণে ক্লিষ্টা, উপবাসে ক্লিষ্টা অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা তরুণীর কম-

নীয় দেহলতা শ্যামসুন্দরের পদতলের কঠিন মৃত্তিকা স্পর্শ করিল।

অর্দ্ধনিদ্রায় অর্দ্ধ জাগরণে সুব্রতা অনুভব করিতে লাগিল—দিব্য স্বর্গীয় আলোকে পূজার মন্দির ভরিয়া গিয়াছে। তেমন উজ্জ্বল আলোক সুব্রতা কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই। সেই আলোকিত মন্দিরে মৃদুমন্দ বাঁশরী বাজিতেছে, বাঁশীর স্বর যেমন মধুর তেমনি মর্ম্মস্পর্শী, হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুধার উৎস খুলিয়া দেয়। মন্দির বায়ু অযুত কুসুমের স্নিগ্ধ সৌরভে সৌরভযুক্ত।—সেই অপরূপ মন্দিরে অপূর্ব্ব বেশে তাহারই ধ্যানের দেবতা শ্যামসুন্দর বাঁশী বাজাইতেছেন। বিবশা সুব্রতা কাতর হইয়া তাঁহারই পদতলে লুটাইয়া যেন প্রার্থনা করিল—"আমার পথ নির্দ্দেশ কর শ্যামসুন্দর, আমার পথ নির্দ্দেশ কর।"

শ্যামসুন্দর ঈষৎ হাসিলেন, হাসিমুখে সুব্রতার শয়ন কক্ষের দিকে অঙ্গুলি হেলাইলেন। বাহির হইতে তাপসী যেন উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল, "ব্রতা, যা অসীমের কাছে যা, তোর ধর্ম্ম, সত্য,—সেইখানেই আছে।"

প্রভাত সূচনায় চক্রবাক বধূর উল্লাসধ্বনিতে সুব্রতার তন্দ্রার ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। সহসা কি একটা তড়িৎ-স্পর্শে তাহার সমস্ত অস্তিত্ব একযোগে অসীমের দিকে ধাবিত হইল।

সুব্রতা কোনদিকে চাহিল না, কিছু ভাবিল না। স্বপ্নচালিতের ন্যায় উঠিয়া অসীমের শয়ন কুটীরে প্রবেশ করিল।

সুব্রতা নিদ্রাচ্ছন্ন স্বামীর কাছে গিয়া নত হইয়া দেখিল—তাহার মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কি শুষ্ক মলিন মুখখানি; বেদনার ক্ষীণ ছায়াটুকু নিদ্রাতেও সে মুখ হইতে মুছিয়া যায় নাই।

সুব্রতা স্বামীর পদতলে বসিতেই অসীম চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। পত্নীকে নিকটে পাইয়া তাহার অভিমানের সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইল। অসীম ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "ব্রতা তুমি এসেছ? এতক্ষণে তোমার সময় হল?"

"হাঁ, এতক্ষণে আমার সময় হল! আমার সংশয়ের সমাধান হয়ে গেছে। সত্য যা, ধর্ম্ম যা আমি তা ঠিক চিনি। হিন্দুর মেয়ের অন্য ধর্ম্ম নেই, স্বতন্ত্রতা তার শোভা পায় না। হিন্দুর মেয়ের স্বামীই ধর্ম্ম, স্বামীই সত্য। তুমি শ্যামসুন্দরের নামে শপথ করেছিলে ব'লে আমার মনে সংশয় ছিল আমি তোমাকে স্পর্শ করলে পাছে কোন অকল্যাণ হয়। ভয়ে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হলেও আমি তোমা হতে দূরে থাকতে চেষ্টা করছি। কিন্তু শ্যামসুন্দর স্বয়ং আমার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আর আমার কোন সংশয় নেই, দ্বিধা নেই।" বলিয়া সজলনয়না সুব্রতা অসীমের দুটি পায়ের উপর মাথা রাখিল।

অনুতপ্ত অসীমের অভিমান নিমেষে অন্তর্হিত হইল। অসীম দুই হাত সুব্রতাকে টানিয়া বুকে তুলিয়া লইল। তাহার মুখে কোন কথাই ফুটিল না, অবাধ্য অশ্রুজলের বন্যায় অঙ্গুরীয়ের চিহ্নিত হৃদয়ের মসীরেখা নিঃশেষে মুছিয়া গেল।

সমাপ্ত

শ্রীগিরিবালা দেবী

সাধ

সাজাব তোমারে আজি আপন হাতে
আজিকে জ্যোছনাময়ী মাধবী রাতে।
কুসুম ভূষণে প্রিয়া
খোঁপা দিব সাজাইয়া
মাখাব কুসুম রেণু নয়ন পাতে—
সাজাব তোমারে আজি আপন হাতে॥

যতনে দোলাব গলে ফুলেরি মালা
বাহুযুগে পরাইব ফুলেরি বালা।
ফুলের নূপুর
পরাব যতন
ঢাকিব কনক তনু ফুল মালাতে
সাজাব তোমারে আজি আপন হাতে॥

[illegible]হন সামন্ত।

হস্তাক্ষর ও চরিত্র

আজি কালি মানবতত্ত্ববিদ্‌গণ হস্তাক্ষর আলোচনা করিয়া লেখকের চরিত্র বুঝিতে কিছু কিছু সমর্থ হইতেছেন। চরিত্রের ন্যায় হস্তাক্ষরও দেহ, মন এবং বেষ্টনীর উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। এই হেতুতে হস্তাক্ষর চরিত্রের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এ বিদ্যার এত উন্নতি হয় নাই যে ইহার মীমাংসা-সকল বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ব্যভিচার অনেক পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আশা করা যায় যে অনতিবিলম্বে এ বিদ্যা অধিকতর সফলতা লাভ করিবে।

যে বিদ্যা প্রভাবে হস্তাক্ষর হইতে চরিত্র অনুমিত হইতে পারে সে বিদ্যাকে কলা (Art) এবং বিজ্ঞান (Science) উভয়ই বলা যায়। যাঁহাদিগের চরিত্র জানা আছে তদ্রূপ বহুসংখ্যক ব্যক্তির হস্তাক্ষর তুলনা করা প্রথম কার্য্য। এই তুলনা হইতে চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম সকল আবিষ্কার করা দ্বিতীয় কার্য্য। এতদুভয় কার্য্যকে মিলিত করিয়া বিজ্ঞান অর্থাৎ Science বলা যায়। সাধারণ নিয়ম জ্ঞাত হইবার পর অজ্ঞাত চরিত্র ব্যক্তির হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহার চরিত্র অনুমান করিতে হয়। ইহাই সামান্য বিধির বিশেষ প্রয়োগ। ইহাকে Art বলা যাইতে পারে। যাহা হউক এ বিদ্যা কলাই হউক অথবা বিজ্ঞানই হউক, ইহার পুষ্টিসাধন করিতে পারিলে মানব-সমাজ উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। ইউ-রোপ খণ্ডে এ বিদ্যার অনুশীলন কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এতদ্দেশেও ইহার অনুশীলন আরম্ভ হওয়া উচিত। ইহার অনুশীলন অত্যন্ত আনন্দদায়ক এবং কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য নহে।

বলিয়াছি, হস্তাক্ষর দেহ মন এবং বেষ্টনীর উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। দেহের অবস্থা অথবা মনের অবস্থা কিংবা বেষ্টনীর অবস্থা অজ্ঞাতভাবেও হস্তাক্ষরের পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। অজ্ঞাত ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত আমি এক অভিনব প্রকারে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমার একজন পরিচিত ব্যক্তিকে আমি তিনটী পংক্তি লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম এবং তিনি আমার সমক্ষে তিনটী পংক্তি লিখিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ লিখিত কাগজ লইয়া পংক্তি তিনটী ঢাকিয়া রাখিয়া দিলাম; তিনি আর তাহা দেখিতে পাইলেন না। তৎপর আমি তাঁহাকে বলিলাম, "তুমি ঘোড়দৌড় খেলিয়া এক লক্ষ টাকা পাইয়া জমী-জিরাত, বাড়ী-ঘর, গাড়ী-ঘোড়া করিয়া বড়ই সুখে ও আনন্দে আছ।" এই কথা বলিবার পরই তাঁহাকে পূর্ব্বলিখিত কথাগুলি পুনরায় লিখিতে বলিলাম। তিনি তাহা পৃথক কাগজে লিখিয়া আমাকে দিলে আমি সে কাগজখানিও লইয়া লেখাগুলি চাপা দিয়া রাখিলাম, তাঁহাকে দেখিতে দিলাম না। তৎ-পরে পুনরায় তাঁহাকে বলিলাম, "তোমার মা মারা গিয়াছেন। এখন তোমার গৃহস্থালী একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে।" ইহার পর তিনি পূর্ব্বলিখিত কথাগুলি পুনরায় লিখিলে আমি তিনখানি কাগজই মিল করিয়া দেখিলাম যে অক্ষরগুলি ভিন্ন আকৃতির হইয়াছে; এবং অক্ষরের ছাঁচ ও লিখনভঙ্গী এবং পংক্তিগুলির সমাবেশও ভিন্ন প্রকার হইয়াছে। এ স্থলে দেখিতে হইবে যে তিনি ঘোড়-দৌড়ও খেলেন নাই, তাঁহার মাও মরেন নাই। তাঁহার সুখ দুঃখ উভয়ই কাল্পনিক, কিছুই প্রকৃতপক্ষে ঘটে নাই। লেখকের মনে তাঁহার জ্ঞাতভাবে সুখও হয় নাই, দুঃখও হয় নাই। কিন্তু মাতৃ-বিয়োগের ও ধনলাভের কথায় ভাব পরম্পরাক্রমে তাঁহার অজ্ঞাতে নিশ্চয়ই তাঁহার মনে সুখের এবং দুঃখের ভাব জাত হইয়াছিল। এই নিমিত্তই স্বাভাবিক প্রথম লেখার শেষে দুই বারের লেখার প্রভেদ হইয়াছিল। এরূপ পরীক্ষা আমি বহুবার করিয়াছি এবং সকল বারই লক্ষ্য করিয়াছি যে সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, দয়া প্রভৃতি ভাব মানবের মনে অজ্ঞাতেও ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং সে ক্রিয়ার ফলে হস্তাক্ষরও বিভিন্ন হইয়া যায়।

চরিত্র স্থায়ী এবং অস্থায়ী, এই দুই প্রকার দেখা যায়। যে সচরাচর দয়ালু সে অকস্মাৎ কোন সময়ে নিষ্ঠুরবৎ কার্য্য করিতে পারে। যে সচরাচর ধর্ম্মভীরু সে কদাচিৎ কখনও অধর্ম্ম করিয়া বসিল। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে মানবচরিত্রকে স্থায়ী ও অস্থায়ী, এই দুই ভাগে বিভাগ

করা যায়। হস্তাক্ষরও স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে। যে সচরাচর এক প্রকারে লেখে সে কোন সাময়িক কারণে অন্যপ্রকার লিখিতে পারে। ইহা জ্ঞানকৃত হয় না; অজ্ঞাত ভাবেই হয়। জ্ঞানকৃত হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক জাল করা হইল। কিন্তু জাল না করিয়াও চিরদিনের স্থায়ী হস্তাক্ষর অকস্মাৎ কোন অস্থায়ী কারণ বশতঃ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। এ পরিবর্ত্তনও কদাচিৎ স্থায়ী হইতে পারে; কিন্তু সচরাচর অস্থায়ী হইয়া থাকে।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির যেমন চরিত্র একটা নির্দ্দিষ্ট ধারায় গড়িয়া উঠে এবং সচরাচর সে চরিত্র ঠিকই থাকে, তদ্রূপ তাহার হস্তাক্ষরও একটা স্থায়ী আকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং তাহা সচরাচর প্রায় একরূপই থাকে। বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যেমন কালসহকারে চরিত্র গঠিত হয়, তেমনি বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কাল সহকারে হস্তাক্ষরও গঠিত হইয়া থাকে।

বিভিন্ন ব্যক্তির চরিত্রও বিভিন্ন। সেই প্রকার বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তাক্ষরও বিভিন্ন। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ব্যক্তির চরিত্র যেমন পরিবর্ত্তনের অধীন হইতে দেখা যায়, হস্তাক্ষরও তেমনই হইয়া থাকে।

এক ব্যক্তির লেখার উপর লিখিতে লিখিতে বহু ব্যক্তি লেখা শিখে। এ প্রথা বর্ত্তমান সময়ে নাই কিন্তু আমাদিগের বাল্যকালে ছিল। এখনও এক প্রকার copy book দেখিয়া অনেকে লেখা অভ্যাস করে। তাহা হইলেও সে সকল ব্যক্তির হস্তাক্ষর এক প্রকার হয় না। তাঁহাদিগের চরিত্র যেমন বিভিন্ন, হস্তাক্ষরও তেমনই বিভিন্ন হইয়া যায়। এক আদর্শ দেখিয়া তাহারা সকলেই লেখা শিখিয়াছে, কিন্তু হস্তাক্ষর একরূপ হয় না এ কথা সর্ব্বজনবিদিত।

বিভিন্ন চরিত্রের লোকদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়া থাকে। মানুষকে বায়ু প্রধান, পিত্ত প্রধান ও শ্লেষ্মাপ্রধান এই তিন ভাগে সচরাচর বিভাগ করা হয়। এ তিনেরও দুই দুইটী লইয়া বাত-পৈত্তিক, বাত-শ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ ভাগ করা যায়। এই সকল প্রকারের মানুষ বিভিন্ন চরিত্রের হয়। চরিত্রের এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করা এতদ্দেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। হস্তাক্ষর আমি যতদূর পরীক্ষা করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে কতিপয় বিশিষ্ট লক্ষণ অবলম্বন করিয়া হস্তাক্ষরকে কতিপয় প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং সেই সকল শ্রেণীর পরস্পরের যোগে যৌগিক অথবা মিশ্র হস্তাক্ষরও নির্ণয় করা যায়। হস্তাক্ষরের কতিপয় লক্ষণ দৃষ্টে চরিত্র যে প্রকার অনুমিত হইতে পারে বস্তুতঃ লেখকের চরিত্র তাহা হইতে বিভিন্ন দেখা গেল। ঈদৃশ স্থলে ঐ অনুমানের সহিত লেখকের হস্তাক্ষরের অপর কতিপয় লক্ষণ যোগ করিয়া দেখিলে অনেক সময় তাহার প্রকৃত চরিত্র বুঝা যাইতে পারে। দুই একটী কর্ম্ম দেখিয়া যেমন মানুষের চরিত্র ভালরূপ বুঝা যায় না, তেমনই দুই একটী লক্ষণ দেখিয়াও হস্তাক্ষরের প্রকৃত পরিচয় হয় না। একাধিক কর্ম্ম, এমন কি পরস্পর বিরোধী কর্ম্মও আলোচনা করিয়া চরিত্র অনুমান করিতে হয়। তেমনই একাধিক লক্ষণ এবং পরস্পর বিরোধী লক্ষণও হস্তাক্ষরের প্রকৃত পরিচয় দিয়া থাকে। এই ভাবে বিবেচনা করিলে কোন কোন লক্ষণকে অগ্রগণ্য এবং কোন কোন লক্ষণকে আনুষঙ্গিক মাত্র গণ্য করিতে হয়। হস্তাক্ষর দৃষ্টে চরিত্রের অনুমান এইরূপে করা শ্রেয়। প্রধান চরিত্র ও আনুষঙ্গিক চরিত্র মিলিত হইয়াই মানুষের গোটা চরিত্র গঠিত করে। এই হেতুতেই সচরাচর দুই জনের চরিত্র একপ্রকার হয় না, দুইজনের হস্তাক্ষও একপ্রকার হয় না।

স্ত্রী-পুং ভেদে হস্তাক্ষরও দ্বিবিধ হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর দেখিলেই চেনা যায়। স্ত্রী-চরিত্রে ও পুং চরিত্রে প্রভেদ আছে। সুতরাং স্ত্রী-পুং হস্তাক্ষরেও প্রভেদ আছে।

বিভিন্ন মানবজাতির হস্তাক্ষর বিভিন্ন। ইংরাজের হস্তাক্ষর এক প্রকার, বাঙ্গালীর হস্তাক্ষর অন্য প্রকার, চীনার হস্তাক্ষর উভয় হইতেই বিভিন্ন। এ সকল ভেদ অল্পায়াসেই লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখনও দেখা যায় যে পুরুষের হস্তাক্ষর অংশতঃ স্ত্রীলোকের ন্যায় হইল; এবং কোন বাঙ্গালীর হস্তাক্ষর অংশতঃ ইংরাজের ন্যায় হইল। এ সকল স্থলে হস্তাক্ষর যেমন যৌগিক মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, লেখকও তেমনই মিশ্র চরিত্র প্রাপ্ত হয়। ঈদৃশ লেখা হইতে অনুমান করা যায় যে লেখকের চরিত্র দ্বিবিধ। লেখক পুরুষ হইয়াও চরিত্রে অংশতঃ স্ত্রীবৎ; বাঙ্গালী হইয়াও চরিত্রে অংশতঃ সাহেবী-আনা প্রবেশ করিয়াছে।

এইরূপ অনুমান অনেক স্থলে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সমব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের মধ্যে চরিত্রেরও কোন কোন লক্ষণ এক প্রকার হয়। কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক; চিত্রকর ও সঙ্গীতসেবী; বিচারক, জমীদার, ও পরিবারের কর্ত্তা; সুদখোর মহাজন ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী—ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রত্যেক শ্রেণীর চরিত্রে কতিপয় সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, এই তিনেরই সংযত অথবা অসংযত কল্পনা আছে। চিত্রকর ও সঙ্গীতসেবী, এই দুই শ্রেণীরই সৌন্দর্য্য-প্রীতি আছে। বিচারক, জমীদার ও পরিবারের কর্ত্তার প্রধান লক্ষণ ন্যায়নিষ্ঠা। সুদখোর মহাজন ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর ন্যায়নিষ্ঠার অল্পতা। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে এই সকল প্রধান লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই কথাই অন্যভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে সংযত কল্পনা থাকিলে কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়। সৌন্দর্য্য-প্রীতি থাকিলে সঙ্গীত-সেবী ও চিত্রকর হওয়া যায় ইত্যাদি। তাহা হইলেও সমলক্ষণযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেও কিছু কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের চরিত্রে সাধারণ লক্ষণের সহিত বিশিষ্ট লক্ষণও বিদ্যমান থাকে। এই প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া ঐ সকল শ্রেণীস্থ ব্যক্তির হস্তাক্ষর আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, যাহাদিগের চরিত্র কোন কোন দিকে সমান, তাহাদিগের হস্তাক্ষরও কোন কোন লক্ষণে সমান। সম ভাববশতঃ সমধর্ম্মিগণের হস্তাক্ষরও সমান হইয়া থাকে। কবি ও বৈজ্ঞানিক সমধর্ম্মী, কিন্তু সকল বিষয়ে নহে। সুতরাং এতদুভয়ের হস্তাক্ষরও সমধর্ম্মী, অর্থাৎ প্রধান লক্ষণ সমান; কিন্তু অপরাপর লক্ষণ বিভিন্ন।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে হস্তাক্ষর নির্দ্দিষ্ট এক প্রকারের, অনির্দ্দিষ্ট একাধিক প্রকারের অথবা মিশ্রিত প্রকারের হইতে পারে। মানব চরিত্রেও এই সকল প্রকার লক্ষিত হয়।

সুতরাং হস্তাক্ষরের সহিত চরিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা অনায়াসেই প্রতিপন্ন হয়।

কিন্তু দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদ না করিলে সাধারণ উক্তি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। এ নিমিত্ত বহু হস্তাক্ষর পরীক্ষা দ্বারা যে সকল মূল লক্ষণ ও মিশ্র লক্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সহায়তায় লেখকের মূল চরিত্র ও মিশ্র চরিত্র কিরূপ অনুমিত হইতে পারে তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। হস্তাক্ষর বলিতে অক্ষরের আকৃতি, লিখন ভঙ্গী, অক্ষর সংযোগ অথবা বিয়োগ এবং পংক্তির সমাবেশ বুঝিতে হইবে, কারণ চরিত্র বুঝিতে এ সকলই বিবেচনা করা আবশ্যক।

অনেকেই পংক্তি সমাবেশ করিতে পংক্তিগুলিকে ক্রমে উপরের দিকে অথবা নীচের দিকে উঠাইয়া অথবা নামাইয়া দেন। ইহাকে পংক্তির উর্দ্ধগতি অথবা অধোগতি বলে। এইরূপ পংক্তি উচ্চাশার অথবা তাহার অভাবের পরিচায়ক। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির উচ্চাশা সর্ব্বজনবিদিত। নেলসনের উচ্চাশাও সকলেই অবগত আছেন। ওয়েলিংটনেরও তদ্রূপ। যে যুবক লিপিকররূপে এই প্রবন্ধ লেখকের সহায়তা করিতেছেন, তিনি আর্থিক অবস্থা উন্নত করিবার নিমিত্ত দূর মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার উচ্চাশা আছে ইহা বলিতেই হইবে। এইরূপ নানা ব্যক্তির উচ্চাশা জানা থাকিলে তাঁহাদিগের লিখিত পংক্তির সমাবেশ দৃষ্টি করিতে হয়। এই প্রণালীতে জানা গিয়াছে যে উর্দ্ধগামী পংক্তি উচ্চাশার পরিচায়ক। নেপোলিয়ান, নেলসন্, ওয়েলিংটন্ এবং এই প্রবন্ধের লিপিকর অনেকস্থলে উর্দ্ধগামী পংক্তি লিখিয়া থাকেন।

যেমন উর্দ্ধগামী পংক্তি উচ্চাশা সূচনা করে, তেমনই নিম্নগামী পংক্তি তাহার অভাব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। বিখ্যাত মীরাবো, হতভাগিনী মেরী এন্টোয়ানেট ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। আমার একটী নিকট আত্মীয়ের লিখিত পংক্তিগুলি অনেক সময় নিম্নগামী হইয়া থাকে। আমি জানি তাঁহার চরিত্রে উচ্চাশার অভাব। সে অভাব তাঁহার উত্তম ভবিষ্যৎকে প্রায় অধম করিয়া তুলিল।

আমি যে সকল হস্তাক্ষর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি তাহা অধিকাংশই বাঙ্গালীর হস্তাক্ষর। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে বাঙ্গালীর প্রায়শঃ উচ্চাশা নাই। যুবকশ্রেণী

মধ্যে অনেক স্থলে উর্দ্ধগামী পংক্তির অভাব দেখিয়াছি এবং সেই হেতুবশতঃ উচ্চাশার অভাব জাত হইয়া পরম দুঃখিত হইয়াছি। যুবকগণের এত হৈ চৈ, এত কোলাহল, সকলই কি কেবল অস্থায়ী উত্তেজনার ফল? যদি তাহা হয় তবে দুঃখের সীমা নাই। কখনও কখনও ইহাদিগের লিখিত পংক্তি উর্দ্ধগামী হইতেও দেখা যায়। তাহা সাময়িক উত্তেজনার ফল বলিয়া বোধ হয়।

নিম্নগামী পংক্তি যেমন উচ্চাশার অভাব সূচনা করে তেমনই অস্বাস্থ্য এবং শ্রমবিমুখতা ও মনের অবসাদও জ্ঞাপন করিয়া থাকে। আশার ব্যর্থতা, জীবন অকৃতকার্য্যতা পংক্তিগুলিকে নিম্নগামী করিয়া থাকে।

সরল রেখার ন্যায় সমান পংক্তি স্থিরচিত্ততার পরিচায়ক। কিন্তু সন্তুষ্টির পরিচায়ক নাও হইতে পারে।

আর একটী সাধারণ নিয়ম এই যে, যে লেখার পংক্তিগুলির প্রত্যেকটি অক্ষর জোরে লিখিত এবং প্রত্যেকটী অক্ষরে অতিরিক্ত কালী ব্যবহৃত হয় সে লেখা দ্বারা বিলাসপ্রিয়তা সূচনা করে। এরূপ লেখা দ্বারা লেখকের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাও অনুমান করা যায়। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার সহিত সচরাচর কল্পনাশক্তির যোগ থাকে। সুতরাং ঈদৃশ লেখা কল্পনাশক্তির অন্যতর প্রমাণ।

শব্দের শেষ অক্ষর অথবা শেষ লাইন দ্বারাও লেখকের চরিত্র বুঝিবার সহায়তা হইয়া থাকে। প্রত্যেক অক্ষরই লাইন অর্থাৎ রেখা দ্বারা গঠিত। শব্দের শেষ অক্ষরের শেষ লাইন অনাবশ্যকরূপে সরু হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া যাইতে পারে অথবা ক্ষুদ্র মোটা রেখা হইতে পারে, অথবা অক্ষরের সহিত একটী কোণ গঠন করিয়া সেই কোণে কিছুদূর চলিয়া যাইতে পারে, কিংবা প্রায় নামমাত্র হইতে পারে। যখন অক্ষরের শেষ রেখা উর্দ্ধগামী, দীর্ঘ এবং গোলাকার, তখন উহা দয়া ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। কিন্তু যখন এই রেখা সরল এবং দুই শব্দের মধ্যগত স্থান অধিকার করে, তখন লেখকের দানশক্তির পরিচয় দেয়। অন্যান্য অক্ষরের দ্বারা যদি বিবেচনা শক্তির অভাব বুঝা যায় তাহা হইলে উপরের লিখিত শেষ রেখা হইতে অমিতব্যয়িতা অনুমান হইতে পারে। অমিতব্যয়িতা ক্রমে দণ্ডনীয় অপরাধে পরিণত হইতে পারে।

অক্ষরের শেষ রেখা যদি উর্দ্ধগামী ও ক্ষুদ্র হয় তবে লেখকের ব্যয়কুণ্ঠতা বুঝা যায়। এইরূপ লিখনভঙ্গী অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে লেখককে অত্যন্ত কৃপণ বলা যাইতে পারে। এইরূপে লিখিত পংক্তি যদি উর্দ্ধগামী হয় তবে লেখকের উচ্চাশার সহিত কর্ম্মশক্তি ও দৃঢ়তাও অনুমিত হইতে পারে। অক্ষরের শেষ রেখা যদি গোলাকার হয় এবং যদি কোমল হস্তে ক্ষীণ ভাবে লিখিত বলিয়া বুঝা যায়, তবে লেখকের চরিত্রে কোমলতা এবং সুশৃঙ্খলতা থাকা অনুমান করা যায়। কিন্তু অক্ষরের শেষ রেখার এই সকল লক্ষণের সহিত পংক্তিগুলিরও সমস্ত অক্ষরের লক্ষণ সকল মিলাইয়া লেখকের চরিত্র অনুমান করাই সঙ্গত।

পংক্তির শেষ ভাগে অথবা নিম্নে এক বা তদধিক লাইন থাকিলে লেখকের চরিত্র অনুমান করা সহজ হইয়া উঠে। নাম দস্তখতের নীচে অথবা অপর কোন শব্দের নীচে সরল বা বক্ররেখা অধিক থাকিলে লেখকের অহঙ্কার, আত্ম-প্রশংসার ভাব এবং অপরের প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষা অতিরিক্ত মাত্রায় থাকা বুঝা যায়। উপন্যাস লেখক Dickens এইরূপ নাম দস্তখত করিতেন। কিন্তু রাজ্ঞী এলিজাবেথ নাম দস্তখতের নীচে গোল এবং লম্বা রেখা সকল টানিয়া দিতেন। তাহা হইতে তাঁহার অহঙ্কার থাকাও যেমন বুঝা যাইত, প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষাও তেমন বুঝা যাইত। এই প্রকার লাইন সকল হইতে সৌন্দর্য্য-প্রিয়তাও অনুমিত হইতে পারে। নাম দস্তখতের নীচে একটী মোটা লাইন থাকিলে সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা ও দৃঢ়তা বোধ করে। কিন্তু দুইটী লাইন থাকিলে এবং তন্মধ্যে একটি সরু একটী মোটা লাইন পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকিলে অনেক সময় লেখক-চরিত্রে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার সহিত দুর্ব্বলতারও যোগ থাকে। শব্দের অক্ষরগুলি পরস্পর সংযুক্ত না থাকিলে এবং প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যেই সমপরিমাণ অবকাশ থাকিলে লেখকের বিচারশক্তির পরিচয় দেয় এবং তৎসহ অন্তর্দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ অক্ষরের সহিত যদি শব্দগুলিও সমব্যবধান দেখা যায়, তবে লেখকের ভাবুকতা এবং সমালোচনা শক্তিও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু লিখিত পংক্তির শব্দগুলি এবং শব্দ সকলের অক্ষরগুলি যদি পরস্পর সংযুক্ত হয় এবং একটানা লেখা বলিয়া অনুমান করিবার কারণ থাকে, তাহা

হইলে বুঝিতে হইবে যে লেখকের চিন্তার ধারা দ্রুত এবং লেখক ভাব হইতে ভাবান্তরে অবিলম্বে বিচরণ করিতে পারেন। এরূপ লেখককে কর্ম্মপটু হইতে দেখা যায়। তিনি কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করতঃ তদ্দ্বারা কর্ম্ম সফলতা প্রাপ্ত হইবার অধিকারী হন। তাঁহার চরিত্রের গঠন-প্রিয়তা এবং গঠন ক্ষমতা থাকা অনুমিত হইতে পারে।

অক্ষরগুলি খাড়া এবং সোজা হইলে এবং জোরে লিখিত হইলে লেখককে আত্মনির্ভরপরায়ণ বিবেচনা করা যায়, আত্মসর্ব্বস্ব বিবেচনা করিলেও বিশেষ ভ্রম হয় না। কিন্তু অক্ষরগুলি যদি একদিকে অবনত থাকে তাহা হইলে লেখককে স্নেহপ্রবণ এবং নিন্দাকাতর অনুমান করা যাইতে পারে। প্রায়শঃ গোল গোল অক্ষরের দ্বারা ভদ্রতা ও কোমলতা সূচিত হয়। কিন্তু অক্ষর গুলি যদি কোণ বহুল হয় এবং ঈষৎ অবনত হয় তবে লেখকের চরিত্রে ভাব-প্রবণতা এবং অদ্ভুতের দিকে আসক্তি থাকা বিবেচনা করা যায়। তথাপি তাঁহার আচরণ সাধারণতঃ সঙ্গতই হইবে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, তিনি ঠিক ঠিক কার্য্য করিতে ভালবাসেন।

অনেক মূর্দ্ধণ্য ষ লিখিতে পেট কাটিয়া দেন। কেহবা অর্দ্ধগোলাকার একটী রেখা টানিয়া দেন। যাঁহারা একটী সরল রেখা দ্বারা পেট কাটিয়া দেন তাঁহারা যদি ঐ রেখাটী মোটা ও অধিক কালীযুক্ত করিয়া লেখেন এবং সেই লেখা দৃষ্টে যদি জোর হাতে লেখা বুঝা যায়, তাহা হইলে লেখকের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং মনের বল বুঝিতে হইবে। কিন্তু ঐ পেট কাটা লাইন যদি মূর্দ্ধণ্য ষ-এর মধ্যভাগে না হইয়া উপরের দিকে হয় এবং যদি উহা উর্দ্ধগামী হয় তাহা হইলে লেখকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং বাদশাহী মেজাজ অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু যাঁহারা বক্র রেখা দ্বারা ষ-এর পেট কাটিয়া দেন তাঁহাদিগের চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব অনুমিত হইতে পারে। পেটকাটা রেখা সরল হইলে প্রায়শ নিম্নগামী হয়, কখনও বা সমান ভাবে অবস্থিত থাকে। এই ভাব থাকিলেও যদি অধিক কালীদ্বারা জোরে এই রেখা লিখিত হয় তাহা হইলে লেখকের মনের বল ও দৃঢ়তা প্রকাশ করে।

অক্ষরের নীচে বিন্দু না দেওয়া অনেকের অভ্যাস থাকে। কেহ কেহ বা অক্ষরের উপরে চন্দ্রবিন্দুর বিন্দুটী অনেক সময় দেন না। ঈদৃশস্থলে লেখকের অসাবধানতা ও পর মতে উপেক্ষা অনুমান করা যায়। কোনও স্থলে লেখকের ভাব-প্রবাহ দ্রুতগামী হইলেও এরূপ হইতে পারে।

যে লেখার শব্দগুলির অক্ষর সকল সম-অবয়ব হয়না এবং নানাবিধ অনিয়মে দূষিত হয়, কিন্তু অক্ষর সকল পরস্পর সংলগ্ন এবং একটানা দৃষ্ট হয়, সে লেখা কল্পনার পরিচায়ক। এরূপ লেখা অনেক সময় পড়া কঠিন। কল্পনার দ্রুতগতি বশতঃ এবং ভাব প্রবাহের ক্ষিপ্রতাবশতঃ লেখা দুষ্পাঠ্য হইতে পারে। কিন্তু কল্পনাপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই যে এরূপ হয় তাহা নহে। তথাপি অদ্ভুত আকৃতির অক্ষর বৃহৎ আকারের অক্ষর যদি ক্ষুদ্র অক্ষরের সহিত অথবা নির্দ্দিষ্ট আকারের অক্ষরের সহিত সংযুক্ত হইয়া একটানা ভাবে লিখিত হয় তবে লেখকের কল্পনা-প্রিয়তা, তৎসহ উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অসংযম অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটী লক্ষণ দৃষ্টে কোন অনুমান করা সঙ্গত হয় না, একাধিক লক্ষণ মিলাইয়া লেখকের চরিত্র বুঝিতে হয়। *

শ্রীশশধর রায়।

* এই বিষয়টি প্রথমে 'ভারতবর্ষে' লিখিতে আরম্ভ করি। অল্পাংশ প্রকাশ হইলে পর তাহার পরবর্ত্তী অংশ পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু বহু দীর্ঘকাল প্রকাশিত না হওয়ায় অগত্যাবে এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ESTD. 190
CALCUTTA
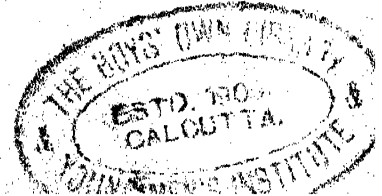
আর্য্য ও আর্য্যনিবাস

১। আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান সম্বন্ধে মতান্তর লক্ষিত হয়। কেহ কেহ পঞ্চনদ প্রদেশকেই আর্য্যগণের আদি বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মধ্য এসিয়া প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের উল্লেখ করেন। কেহ কেহ এরূপ মতও পোষণ করেন যে মেরু প্রদেশই আর্য্যগণের আদি বাসস্থান।

২। পুরাণগুলিই আমাদের প্রকৃত ইতিহাস। কিন্তু উহাতে অনেক রূপক ও অলৌকিক বিষয় সন্নিবিষ্ট থাকায় অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। পুরাণে ভারতীয় নৃপতিগণের ধারাবাহিক বংশতালিকা পাওয়া যায়। এরূপ ধারাবাহিক কল্পিত নাম পুরাণগুলিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ ঐ সকল রাজগণের স্থাপিত রাজধানীগুলি এখনও পূর্ব্বনামেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। হস্তীরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত হস্তিনাপুর, * মনু প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যা, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা, কংসের মথুরা প্রণিধান-যোগ্য। ঐ সকল রাজবংশের সন্তান সন্ততিগণ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

৩। দেখা যায় আর্য্যগণ পঞ্চনদ প্রদেশে বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহারা অন্য কোন স্থান হইতে আসিয়াছিলেন কি না তাহা নিশ্চিতরূপে বলা সুকঠিন। তবে ভারতের আদিম অধিবাসীর বর্ণ ও দৈহিক গঠনের সহিত আর্য্যগণের কোন মিল নাই। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত হিমপ্রধান দেশ হইতে না আসিলে তাঁহাদের শুভ্রবর্ণ সম্ভবপর হইত না। অতএব পঞ্চনদ প্রদেশে আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান ছিল এরূপ মনে হয় না।

৪। তাঁহাদের আর্য্যনাম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ "ঋ ধাতু" গমনার্থ বোধক বলিয়া তাঁহাদিগকে ভ্রমণশীল জাতি বলিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছেন। গমনার্থক ধাতু মাত্রেই জ্ঞানার্থকও বটে, "সর্ব্বে গত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চ" তাঁহাদিগকে ভ্রমণশীল জাতি বলিলে নিতান্তই ছোট করা হয়। বস্তুতঃ তাঁহারা সেরূপ হীন ছিলেন না। তাঁহারা জ্ঞানী ও সদ্বংশজাত ছিলেন বলিয়াই আর্য্য আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

৫। ভারতীয় আর্য্যগণের আদিতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গীরা প্রভৃতি কয়েকজন ব্রহ্মর্ষি বা ব্রাহ্মণকে দেখিতেই পাওয়া যায়। তাঁহাদের হইতেই দেব, দৈত্য, মানব প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে মূলে এক ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি ছিল না। ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করা অধিক আয়াসসাধ্য নহে। যে কোন হিন্দু জাতির গোত্রগুলি আলোচনা করিলেই বুঝা যায় সকলেই কোন না কোন ঋষির বংশধর।

৬। সায়নাচার্য্য "প্রত্নৌকস্" শব্দে স্বর্গকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব আর্য্যগণের আদি বাসস্থানকে যে স্বর্গ বলা হইত তাহাই সম্ভব। স্বর্গ যদি জড়জগতের বাহিরে হইত তবে স্থূলদেহে স্বর্গ গমন একেবারেই অসম্ভব হইত। কিন্তু দেখা যায় ভারতের শক্তিশালী রাজগণ প্রায়ই স্বর্গে গমন করিয়া স্বর্গরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে সাহায্য করিতেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে স্বর্গ পৃথিবীর কোনস্থানে অবস্থিত ছিল এবং ঐ স্থানের রাজাই ইন্দ্র নামে অভিহিত হইতেন। ইন্দ্র কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। যজ্ঞপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া সাতজন ইন্দ্রকে স্বর্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত মর্ত্তের রাজা নহুষ ও যযাতিকেও স্বর্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে দেখা যায় এবং কয়েকজন দৈত্যকেও ইন্দ্রকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে দেখা যায়। তৎ তৎ কালে যে সকল দেশ পরিজ্ঞাত ছিল সেই সকল দেশের রাজগণ যাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন, তিনিই ইন্দ্র নামে অভিহিত হইতেন। এই সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিপাদন জন্য একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত তাহার নাম "অশ্বমেধ"। একটি অশ্বকে সুসজ্জিত করিয়া একে একে সকল রাজার অধিকারের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ঐ অশ্ব কেহ আটক না

* হস্তিনাপুর যদিও এখন দেখা যায় না, তবে বর্ত্তমান দিল্লীর নিকট যে উহা অবস্থিত ছিল তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

করিলে বুঝা যাইত সেই দেশের রাজা যজ্ঞকর্ত্তার সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিলেন। ঐ অশ্ব লইয়া অনেক সময়ে ভীষণ যুদ্ধ বাধিত। যিনি ঐ ঘোটক আটক করিতেন তিনি পরাজিত হইলে যজ্ঞকর্ত্তাকে সার্ব্বভৌম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। পক্ষান্তরে তিনি জয়লাভ করিলে যজ্ঞ পণ্ড হইত। এইরূপ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ ইন্দ্রকে সম্পাদন করিতে হইত, এই জন্য ইন্দ্রের একটি নাম হইত শতক্রতু।

পুরাণাদির বর্ণনানুসারে হিমালয়ের উপরিভাগে স্বর্গের বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়। স্বর্গে নানা জাতির বাস ছিল তন্মধ্যে দেবগণই প্রতিষ্ঠান্বিত। কনখল প্রজাপতি দক্ষের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐস্থান হইতে কাশ্মীরের উত্তরে অবস্থিত সমগ্র উত্তরাখণ্ড ও তৎসন্নিহিত ভূভাগই স্বর্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই প্রদেশে এখনও স্বর্গনদী মন্দাকিনী, অলকনন্দা ও গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন।

৮। পুরাকালে স্বর্গ ও মর্ত্তের বিদ্যমানতা পরিদৃষ্ট হয়, ভারতবর্ষের উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। মহারাজ ভরতের সময় লইতেই এই দেশ ভারতবর্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। হিমালয়ের উচ্চভূমি স্বর্গ ও তন্নিম্ন ভূমিই মর্ত্তনামে অভিহিত হইত, এইরূপই অনুমান করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে নিম্নভূমি সর্ব্বত্র জঙ্গলাকীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং স্বর্গবাসিগণের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে ঐ প্রদেশে বাস করিলেই শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। সম্ভবতঃ এই কারণেই নিম্নভূমিকেই মর্ত্ত ভূমি বলা হইত ইহাই অনুমান করা যাইতে পারে।

৯। ঋগ্বেদের (৯।৩৩।৬ ও ১০।৪৭।২) বর্ণনানুসারে জানা যায় যে পঞ্চনদ প্রদেশ পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং উত্তর দিকেও একটী প্রকাণ্ড স্থল সমুদ্র ছিল। উহাই আর্য্যভূমি। এই আর্য্যভূমির অধিপতি যে ইন্দ্রই ছিলেন তাহাই সম্ভবপর। "রাজতরঙ্গিণী"তে বর্ণিত আছে যে কাশ্মীর প্রদেশে একটি হ্রদ ছিল, কশ্যপ ঐ হ্রদের জল নিষ্কাষণ পূর্ব্বক উহাকে মনোরম জনপদে পরিণত করিয়াছিলেন। কশ্যপের পুত্র হইতেছেন ইন্দ্র। অতএব কাশ্মীর প্রদেশকে স্বর্গের একটি উপনিবেশ বলা যাইতে পারে। ঐ কাশ্মীরের নিম্নে পঞ্চনদ প্রদেশে আর একটী উপনিবেশ স্থাপন করার অভিপ্রায় ইন্দ্রের ছিল তাহা বুঝা যায়। কারণ ইন্দ্র স্বর্গের অপরাধিগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধেও মর্ত্তভূমে যাইবার জন্য অভিশাপ অর্থাৎ নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদান করিতেন। সকল ধর্ম্মেই প্লাবনের উল্লেখ আছে, অতএব জীবধ্বংসী প্লাবন যে একটা হইয়াছিল তাহাই সম্ভব। যখন ঋগ্বেদের উক্ত অংশ রচিত হইয়াছিল তখন কেবল মাত্র পঞ্চনদ প্রদেশই উক্ত প্লাবনের পর জলরাশি হইতে উথিত হইয়াছিল, সেই জন্যই উহার চতুর্দ্দিকে সমুদ্রের উল্লেখ দেখা যায়। খুব সম্ভব আদি আর্য্য নিবাস হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে অবস্থিত থাকায় প্লাবনের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই।

১০। উপরিউক্ত নির্ব্বাসিতগণকে লইয়া যে মর্ত্তরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, উহার শাসন কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন ইন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র মনু (শ্রাদ্ধদেব), মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্য বংশ ও কন্যা ইলা হইতে চন্দ্র বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব সূর্য্য ও চন্দ্র বংশীয় নৃপতিগণ দেবপিতা কশ্যপেরই বংশধর।

১১। মনু উপরিউক্ত মর্ত্তরাজ্যকে সুশাসন দ্বারা এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাই শেষে বহুবিস্তৃত হইয়া মনু-প্রতিষ্ঠিত সুবিশাল কোশল রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। মনুর প্রজাবর্গ মানব আখ্যা লাভ করিল। মনুর রাজ্যে সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া স্বর্গবাসিগণ স্বেচ্ছায় তাঁহার রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান মহর্ষি বশিষ্ঠ। তিনি মর্ত্তে আসিয়া মনুবংশীয়গণের গুরু ও উপদেষ্টা হইলেন।

মনুর পরবর্ত্তিকালে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ ভাগ্যান্বেষণে ভারতের বহির্ভাগে যাইয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাভারত পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে যযাতিপুত্র তুর্ব্বসু পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হন এবং তাঁহা হইতে যবন জাতির উৎপত্তি হয়। অনেকে অনুমান করেন ঐ তুর্ব্বসু হইতেই তুরস্করাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারও ঐ মত পোষণ করিতেন। যযাতির অপর পুত্র দ্রুহ্যুও পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন এবং তদ্বংশীয় প্রচেতার শত সন্তান উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়া-

ছিলেন। (ভাগবত ৯ম স্কন্দ, ২৩শ অধ্যায়)। এই সকল রাজপুত্রগণের দ্বারা মেরু প্রদেশ পর্য্যন্ত আর্য্যগণের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যায়। আরও দেখা যায় যে মনুপুত্র করুষ হইতে উত্তরাপথ-রক্ষক কারুষ নামক ক্ষত্রিয়জাতি উৎপন্ন হয়। (ভাগবত ৯ম স্কন্দ, ২য় অধ্যায়)। এই কারুষ বংশীয় কোন রাজপুত্র হইতে আরবের সুপ্রসিদ্ধ কোরেষ বংশের উৎপত্তি হওয়াই সম্ভব। টিউটনগণ তাঁহাদের পুরারম্ভে মনু (Manu) বংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কান্দাহার প্রভৃতি স্থান এক সময়ে ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা জানা যায়। ভারত সাম্রাজ্য পুরাকালে প্রভূত শক্তিশালী ছিল। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দুগণের উপনিবেশ ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব তাঁহারা যে ভারতের বাহিরে যাইয়া রাজ্য বিস্তার করেন নাই তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সম্ভবতঃ যে সকল রাজপুত্র ভারতের বাহিরে যাইয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরদের সহিত ভারতের কোন সংস্রব না থাকায় ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কালে সম্পূর্ণ পৃথক জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব হইতে পারে। অতএব ভারতের বহির্ভাগে আর্য্যগণের বাসের নিদর্শন পাইলেই সেই সকল দেশ আর্য্যগণের আদি বাসস্থান বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

১৩। মনু ও তাঁহার বংশধরগণ সর্ব্বাংশে স্বাধীন হইলেও ইন্দ্রের আনুগত্য স্বীকার করিতেন। ইন্দ্রও সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন এবং যুদ্ধের সময় তাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত অধীন রাজ্য রূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। যুধিষ্ঠিরের সময়েও দেখা যায় যে অর্জ্জুন স্বর্গে গমন করিয়া নিবাত কবচ বধ করতঃ ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইন্দ্রও তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া বহু অস্ত্র-শস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

১৪। দেবগণ ও আর্য্যগণ যে একই বংশসম্ভূত ছিলেন তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। দেবগণের পিতা কশ্যপ যে ভারতীয় আর্য্যগণের অনেকেরই আদি পিতা তাহা কশ্যপ গোত্রীয় ভারতীয় আর্য্যগণ হইতে অনুমান করা যায়। যে অঙ্গীরার পুত্র বৃহস্পতি দেবগণের গুরু ছিলেন, সেই অঙ্গীরার বংশধরও বহুল পরিমাণে ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যগণ যে দেবর্ষিগণেরই বংশধর তাহা তাঁহাদের গোত্র গুলিই পরিচয় দিতেছে। ব্রাহ্মণগণই দেবগণের গুরু ও উপদেষ্টা ছিলেন এবং ভারতীয় আর্য্যগণেরও গুরু ও উপদেষ্টা আছেন। সেই সোমযাগ, সেই অশ্বমেধ ইত্যাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, একই ভাবে ঋত্বিকগণের নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা উভয়ের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হ ভারতীয় আর্য্যগণ নিম্নভূমিতে বাস করিলেও জেদের দেব বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। নামের শেষে দেবশর্ম্মা বা দেবী লেখার আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে ?

১৫। ইন্দ্রাদির চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহারা কোন অংশেই মানব হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। তাঁহারা মানবগণের ন্যায় অন্নাহারী ছিলেন—"দেবাসুরমনুষ্যাণাং সর্ব্বেচান্নোপজীবিনঃ" ইতি পরাশরঃ। দেবগণের অমরত্বের অর্থ হইতেছে যে তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ ছিলেন। মহাভারত, আদিপর্ব্ব ষট সপ্ততিতম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে দানবগুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে যুদ্ধে নিহত দানবগণকে সঞ্জীবিত করিতেন। কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতি ঐ মন্ত্র অবগত ছিলেন না, সে জন্য যুদ্ধে নিহত দেবগণকে তিনি পুনর্জ্জীবিত করিতে সমর্থ হইতেন না। সেজন্য বৃহস্পতির পুত্র কচ ঐ মন্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য শুক্রাচার্য্য সকাশে প্রেরিত হইয়াছিলে। ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে দেবগণ অমর ছিলেন না।

১৬। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে আর্য্যগণ ও দেবগণ অভিন্ন এবং হিমালয়ের উপরিস্থিত উত্তরাখণ্ড ও তৎসন্নিহিত প্রদেশই আর্য্যগণের আদি নিবাসস্থল। ঐ স্থানের রাজা তৎকালে পরিজ্ঞাত দেশ সমূহের সার্ব্বভৌম ছিলেন, সে কারণ আর্য্য-সভ্যতা সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কালে ঐ প্রদেশ হইতে আর্য্যগণ এই শস্য-শ্যামলা নিম্নভূমির সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া এই ভারতেই বসবাস করিয়াছিলেন এইরূপই বিবেচিত হয়।

১৭। আমার বক্তব্য এই যে উপরিউক্ত স্বর্গের সহিত আধ্যাত্মিক স্বর্গের কোন সংস্রব নাই। উহা জড়দেহে অনধিগম্য। এ বিষয়ের সহিত এই প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই, সেজন্য এ সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য।

শরৎ প্রাতে

সারা　ভুবন ভরিয়া পড়িছে ঝরিয়া
　　সুষমার ধারা অনিবার,
ধরি　শিশিরের রূপ পড়ে টুপ্ টুপ্
　　মেনকা-মেখলা মণিভার।
ধীরে　অবগাহি সেই সুষমা ধারায়
নিখিল আজিকে আপনা হারায়
আমি যেন শুধু আছি পাহারায়
　　তীরে বসি ঢেউ গণিবার॥

উঠে　পাখীর কণ্ঠে কত কলতান,
　　তরুপল্লবে মর্ম্মর,
তুলে　কূলে কূলে নদী কল কল্লোল,
　　কুলু কুলু কুলু কলস্বর।
লাগে　ধানের শীর্ষে বাতাসের দোল,
কদমের শাখে দোলে হিন্দোল,
নীপ বন হ'ল পবন উতোল,
　　কাশবন কাঁপে থর থর॥

নীল　অসীমের কোলে হেলে দুলে চলে
　　মেঘতরী তুলি শ্বেতপাল,
নীচে　ধরণীর বুকে লীলা কৌতুকে
　　আলো ছায়া রচে মায়াজাল।
সিত　শিশির সিক্ত শ্যামল বর্ণ,
তপন ঢালিছে গলিত স্বর্ণ,
তরল রজত শুভ্র বর্ণ
　　জ্যোছনা উজলে ধরা-ভাল॥

এই　শরত প্রভাতে শ্যামল শোভাতে
　　পাগল পরাণ কারে চায়
কার　দরশন আশে বিরহ তরাসে
　　মুহু মুহু মন মুরছায়!
সারা　ভুবন ভরিয়া এত শোভা জাগে,
তৃষিত এ চিত কিছু নাহি মাগে,
শত শরতের পূর্ণিমা রাগে
　　কাহার মূরতি মনে ভায়॥

তার　নয়নের তটে দুটী আঁখি পটে
　　বিম্বিত হেরি নীলাকাশ,
নব　কনক কিরণ করে বিকীরণ
　　তার অধরের মধুহাস।
তার　বর্ণে রবির নব অরুণিমা,
গণ্ডে বসোরা গোলাপ শোণিমা,
চিরতরে ঘিরি তনুর তণিমা
　　নব বসন্ত করে বাস॥

শুধু　তাহারই অঙ্গ-সৌরভ ল'য়ে
　　উতলা পবন ব'য়ে যায়,
তার　মরমের কথা, হৃদয়ের ব্যথা
　　পরাণের কাণে ক'য়ে যায়।
এ যে　শতদিক হ'তে ঘিরি শত পাকে
তারই মোহজাল জড়ায় আমাকে,
তাহারই কণ্ঠ অবিরাম ডাকে
　　স্বপনের লোকে লয়ে যায়॥

আজ　এ কি আনন্দ, এ কি উল্লাস,
　　এ কি আকুলতা প্রাণে মোর,
এ কি　মোহ মদিরার মোহন আবেশ
　　নয়ন জড়ায়ে আনে ঘোর।
একি　শিহরণ জাগে অঙ্গে অঙ্গে,
শিরা উপশিরা নাচিছে রঙ্গে,
শোণিতোচ্ছ্বাস দ্রুত তরঙ্গে
　　হৃদয়ের দ্বারে হানে মোর॥

তারে　সুমরি সুমরি মরমে গুমরি
　　পাগল হবি কি ওরে মন,
তোর　সারা দেহ ভরি উঠে উৎসরি
　　একি অধীরতা অনুখন?
কেন　স্বপনের পায়ে আপনা বিলায়ে
আপনারে নিয়া নিঠুর লীলা এ,
ছবির নয়নে নয়ন মিলায়ে
　　ধেয়ানে রহিবি নিমগন॥

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

চণ্ডীদাস ও সহজিয়া পদ

চণ্ডীদাসের পদাবলীর অনেকগুলি পদ পীরিতি-গন্ধী এবং অনেক পদে সহজ প্রেমের কথাও লিখিত হইয়াছে। অতএব সহজিয়া ধর্ম্মের উৎপত্তির ইতিহাস জানা না থাকিলে, এই সকল পদ বাছাই করা এক প্রকার অসম্ভব কায। এই জন্য এ সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে মাধুর্য্য ভাবের উপাসনার চারিটী ক্রম দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বৈষ্ণবগণ প্রচার করিয়াছেন যে এই চারি ভাবের যে কোন একটি ভাব অবলম্বন করিয়া ভগবানকে লাভ করিতে পারা যায়। চরিতামৃতে আছে—

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর সে শৃঙ্গার।
চারি ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে॥

আদি—৪ পরিঃ।

আবার চৈতন্যদেবের ভক্তগণের মধ্যে কে কোন্ ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের সকলেই যে চৈতন্য দেবের সমান প্রিয় ছিলেন, তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস।
গদাধর জগদানন্দ স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ
এই চারি ভাবে প্রভু বশ॥

মধ্য—২ পরিঃ।

তৎপরবর্ত্তী সহজিয়ারা কিন্তু মাধুর্য্য ভাবের উপাসনা গ্রহণ করিয়াও একমাত্র মধুর রসকেই অবলম্বনীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, যথা—

শ্রীরূপের অনুগত ভজনে সে হয় রত
স্থিতি তার কেবল মধুরে॥
মধুর উজ্জ্বল রস সদা শৃঙ্গারের বশ
ব্রজরাজ নন্দন-বিষয়।
ঐশ্বর্য্য সুগুপ্ত তাতে মাধুর্য্য প্রভাবে যাতে
তাহার আশ্রয় ভক্তচয়॥

রাগানুগভজন দর্পণ, ১২—১৩ পৃঃ।

অতএব দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া সহজিয়ারা একমাত্র মধুর রসের উপাসনাই গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁহাদের বিভিন্নতার ইহাই প্রথম কারণ। রাগময়ী কণাতে আছে—

প্রেম রসের সাগর নায়িকা ভাবেতে। ১০ পৃঃ

এই নায়ক-নায়িকা ভাবের উপাসনাই সহজিয়া ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। বৈষ্ণবগণ প্রচার করিয়াছিলেন সে সকল রস হইতে শৃঙ্গার রসেই মাধুর্য্য অধিক—

তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরি॥

আদি—৪ পরিঃ।

এই শিক্ষাই গ্রহণ করিয়া সহজিয়ারা একমাত্র মধুর রসকেই আশ্রয় করিয়াছেন। এই মধুর রস আবার স্বকীয়া পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে পরকীয়াই শ্রেষ্ঠতর—

অতএব "মধুররস" কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। ইত্যাদি

আদি—৪ পরিঃ।

যেহেতু মধুর রসে পরকীয়াই শ্রেষ্ঠতর, অতএব সহজিয়ারা স্বকীয়া পরিত্যাগ করিয়া পরকীয়াই অবলম্বন করিয়াছেন। পদাবলীতে আছে—

পরকীয়া ধন সকল প্রধান
যতন করিয়া লই।
এবং পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন সার।

চণ্ডীদাসের পদাবলী, ৭৯৫ ও ৭৭১ নং পদ।

ইহাই চূড়ান্ত নহে, স্বকীয়াতে যে রাগের আভাস মাত্রও নাই, একথাও তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন—

পরকীয়া রাগ অতি রসের উল্লাস।
স্বকীয়াতে রাগ নাই, কহিল আভাস ॥

রসরত্নসার, ৬৫ পৃঃ।

এবং পরকীয়া রসে হয় রসের উল্লাস।
স্বকীয়া যে স্বল্প তাহা জানিহ নির্য্যাস।

সুধামৃতকণিকা, ৮ পৃঃ।

বৈষ্ণবদের সঙ্গে তাঁহাদের বিভিন্নতার ইহা দ্বিতীয় কারণ।

বিভিন্নতার এই যে প্রধান দুইটী কারণ নির্দ্দেশিত হইল, এখন আমরা সেই সম্বন্ধেই একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। চরিতামৃতে ঐ যে কথাটি আছে—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥

আদি—৪ পরিঃ।

ইহার অর্থ এই নয় যে ব্রজধামে পরকীয়া চর্চ্চায় দোষ নাই। ব্রজলীলার ভাব লইয়া মাধুর্য্য রসের উপাসনার যে তত্ত্ব চৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গভীরতা ও তীব্রতার জন্য ভগবৎ-প্রেমে পরকীয়া আদর্শ ই গ্রহণীয় ইহাই এখানে বলা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ ই ভাব-রাজ্যের কথা। উদ্ধৃত পংক্তিদ্বয়ের পরেই উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে রাধিকার ভাবের অবধি ॥
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

গৌরাঙ্গদেব এই পরকীয়া ভাব কি প্রকারে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহারও অনেক দৃষ্টান্ত চরিতামৃতে আছে। তন্মধ্যে একটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল-

এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে মন স্থির নহে
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যে বা তুমি সখীগণ বিষাদে বাউল মন
কারে পুছোঁ। কে কহে উপায় ॥
হা হা সখী কি করি উপায় ?
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায় ॥

মধ্য—১৭ পরিঃ।

রাধার এইরূপ বিরহ-উদ্বেগের ভাব লইয়া ভাগবানকে ভালবাসাই পরকীয়া আদর্শ। বৈষ্ণবগণ ইহাই অবলম্বন করিবার পক্ষপাতী।

সহজিয়ারা কিন্তু ভাবরাজ্যের এই আদর্শমাত্র লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, পরকীয়া রমণী লইয়া সাধনার তত্ত্ব তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন। বিবর্ত্তনবিলাসে এমন কথাও লিখিত আছে যে এইরূপ সাধনা ব্যতীত কেহ প্রকৃত রসিক হইতে পারে না।

হেন সাধন বিনে রসিক না হয়। ৮৪ পৃঃ।

কারণ রমণী হইতে দূরে থাকিলে রতি যে কি বস্তু তাহাও জানা যায় না, এবং পীরিতিও লাভ করা যায় না।

বস্তু বৈ দূরে রহে নাহি জানে রতি।
প্রাপ্তি তার কাহা হয় এভাব পীরিতি ॥

বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ১৬৬৯ পৃঃ

অতএব সিদ্ধান্ত হইল—

পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন সার।

চণ্ডীদাস, ৭৭১নং পদ।

সহজিয়াদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের বিভিন্নতার ইহাই সর্ব্বপ্রধান কারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই নীতি অনুসরণ করিতে যাইয়া সহজিয়াদের ধর্ম্মমতে আর একটি বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিল। এ পর্য্যন্ত প্রেম ছিল ভগবানের আরাধনার এক অবলম্বনীয় সূত্র, কিন্তু রমণী লইয়া সাধনায় প্রেমই প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল, তখন সাধনার উদ্দেশ্য হইল প্রেমলাভ। বিবর্ত্তবিলাসে আছে -

সাধনে ভিয়ান করে প্রেমের কারণে। ৮৩ পৃঃ।

অতএব সহজিয়া ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের এই ইতিহাস আমরা পাইতেছি। বৈষ্ণবগণ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া মাধুর্য্য ভাবের উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। মাধুর্য্যের মধ্যে মধুর ভাবটাই শ্রেষ্ঠ ; সেই মধুরের মধ্যে আবার পরকীয়া শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবগণ ভাবের দিক দিয়া আদর্শ

গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সহজিয়ারা পরকীয়া রমণী লইয়া সাধনা আরম্ভ করিলেন, তখন প্রেম হইল উপাস্য এবং পরকীয়া সম্পর্কে তাহার নাম হইল পীরিতি। অতএব এই পীরিতি উপাসনা চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত মাধুর্য্য ভাবের উপাসনার এক অভিব্যক্তি মাত্র। কাযেই বর্ত্তমান সহজিয়া মত যে চৈতন্যের পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোন্ সময়ে যে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল এখন আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। চৈতন্যদেবের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গূঢ়তত্ত্ব সকল গোস্বামীরা প্রথমতঃ বৃন্দাবনে বসিয়া প্রচার করেন। ইহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালের ঘটনা। তাঁহারা যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহা প্রায় সমস্তই সংস্কৃত ভাষায়। বৃন্দাবনের দূরত্ব হেতু এই সকল গ্রন্থাদি সহসা বঙ্গদেশে প্রচারিত হইতে পারে নাই। তবে বঙ্গদেশ হইতে যাঁহারা মধ্যে মধ্যে পুরী বা বৃন্দাবনে গমন করিতেন তাঁহারা ইহার কিছু কিছু সন্ধান জানিতে পারিয়াছিলেন। এই রূপ তত্ত্বজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে কবি কর্ণপূর একজন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন, তাহাতে চৈতন্য তত্ত্বের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বৃন্দাবনদাস তাঁহার চৈতন্য ভাগবতে ইহার বিশেষ কোন সন্ধান দিতে পারেন নাই। একটি দৃষ্টান্ত হইতেই ইহা বেশ বুঝা যাইবে। চৈতন্যদেবের জন্মের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন যে হরিনাম প্রচার করিতে গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরিসঙ্কীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥ আদি ২য় পঃ

চরিতামৃতে এই হরিনাম প্রচার বহিরঙ্গ হেতু বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে এবং প্রেমরস আস্বাদনই অন্তরঙ্গ হেতু বা গূঢ় কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস গোস্বামীদের শিক্ষার সহিত পরিচিত হইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে এই নূতন কথাটা উল্লেখ করেন নাই। জয়ানন্দ এবং লোচনদাসের চৈতন্য মঙ্গলেও দেখা যায় যে এই দুই কবি বৈষ্ণব ধর্ম্মের নূতন তত্ত্বগুলির সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। তার পর ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থাদি বঙ্গদেশে প্রচারের জন্য প্রেরিত হয়। তখন হইতে নূতন বৈষ্ণবমতগুলি সাধারণে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের মতবাদ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে বর্ত্তমান সহজিয়া ধর্ম্মের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী নামে সহজিয়াদের একখানা গ্রন্থ আছে। তাহাতে লিখিত আছে—

আগমসার আগে হয় আনন্দভৈরব তার পর।
ইহার পর অমৃতরত্নাবলী জানিবে নির্দ্ধার॥
ইহার পর অমৃতরসাবলী রসের সমুদ্র।
এ রস সাগরে মগ্ন প্রজাপতি রুদ্র॥ ৩০ পৃঃ।

অর্থাৎ আগমসার বর্ত্তমান সহজিয়া ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। তৎপরে আনন্দভৈরব, অমৃতরত্নাবলী ও অমৃত-রসাবলী লিখিত হইয়াছিল। মুকুন্দদেব নিজে, অথবা তাঁহার নির্দ্দেশ মত তাঁহার কোন শিষ্য শেষোক্ত দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দ ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য, অতএব এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াও বলা যাইতে পারে যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে সহজিয়া ধর্ম্ম সবে মাত্র গড়িয়া উঠিতেছিল।

১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কবিবল্লভ রসকদম্ব রচনা করেন। ইহা একখানি সহজিয়া মতের গ্রন্থ মাত্র। কবিবল্লভের দোষ এই যে তিনি কৃষ্ণের সহিত তাঁহার স্বকীয়া পত্নী রুক্মিণী ও সত্যভামার প্রেম সাধনার তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। সহজিয়ারা ছিলেন পরকীয়া পন্থী, এজন্য তাঁহারা রসকদম্বের আদর্শ গ্রহণ করেন নাই। প্রেম সাধনার কথা আছে বলিয়াও বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। ফলে ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থায় প্রকৃত কবিত্বপূর্ণ একখানা ভাল গ্রন্থ সুগতি প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এই গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যে পরকীয়া আদর্শের উপর সহজিয়া ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, সে আদর্শ ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দেও সুদৃঢ়

রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। যদি পারিত, তাহা হইলে কবিবল্লভ কখনও পুনরায় স্বকীয়া আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করিতে সাহস করিতেন না। মোট কথা, রসকদম্ব বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে সহজিয়া ধর্ম্মের উৎপত্তির সন্ধিক্ষণে লিখিত হইয়াছিল, এজন্যই ইহা ঠিক আদর্শটি গ্রহণ করিতে পারে নাই। তারপর বর্ত্তমান সহজিয়া ধর্ম্মের প্রায় সকল গ্রন্থেই চৈতন্যচরিতামৃতকে আদর্শ স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল নানা কারণে আমরা বলিতে বাধ্য যে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম্ম বর্ত্তমান আকারে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রচারিত হয় নাই।

সহজিয়া ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া চণ্ডীদাসের পদ বাছাই করিবার এই একটি অতি প্রয়োজনীয় সূত্র আবিষ্কৃত হইল। এই আলোচনা হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিতেছি যে পীরিতি গন্ধী সহজিয়া পদের একটীও ষোড়শ সাতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ব্বে (আমরা সময়টা যতদূর সম্ভব পিছাইয়া উল্লেখ করিলাম) রচিত হইতে পারে না। অতএব চণ্ডীদাসের পদাবলীর শেষভাগে রাগাত্মিকা পদ আখ্যায় যে সকল পদ মুদ্রিত হইয়াছে তাহার একটীও বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত নয় ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অনেক পাঠক হয়ত আমাদের এই মন্তব্যে চমকিত হইবেন। কিন্তু চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষত্বের সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন এবং বর্ত্তমান সহজিয়া ধর্ম্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস যাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত নাই, তাঁহারাও ইহা ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না। রজকিনী রামীর সহিত চণ্ডীদাস সহজ সাধনা করিতেন এই প্রবাদ সাধারণে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে এবং অনেক সহজিয়া পদ সেইভাব রচিত হইয়া পদাবলীতে স্থানলাভ করিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের সময়ে প্রেম মার্গীয় সহজিয়া ধর্ম্মের কল্পনাও হয় নাই, অথচ তিনিই রামীর সঙ্গে প্রেম সাধনায় রত রহিয়াছেন এমন অদ্ভুত কথা স্বপ্নের ন্যায় অলীক। বিদ্যাপতিও চণ্ডীদাসের সমসাময়িক কবি, তিনিও নাকি সহজিয়া পন্থী ছিলেন, অথচ তাঁহার পদাবলীর মধ্যে একটীও সহজ সাধনার পদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! তারপর, সহজিয়ারা চৈতন্য দেব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক গোস্বামীর এক একটী প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এইসকল অবান্তর কথায় কেহ বিশ্বাস স্থাপন করেন? যদি তাহাই না করেন তবে চণ্ডীদাস রামীর প্রবাদটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন কোন্ যুক্তি বলে?

মোট কথা ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে বড়ু চণ্ডীদাস রাগাত্মিকা পদ লিখিতে পারেন না। কাযেই পরিষদের পদাবলীতে রাগাত্মিকা পদের মধ্যে যে যে পদে "বাশুলী আদেশে কহে বড়ু চণ্ডীদাসে" এই প্রকার ভণিতা আছে তাহার যে সবগুলিই জাল তাহা ধরা পড়িয়া যাইতেছে। এই জাতীয় পদে আবার রামীকে বেদমাতা. গায়ত্রী বলা হইয়াছে। এই ভাবটা যে সম্পূর্ণই সহজিয়া মতের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাও স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। অথচ এই সকল পদ চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসের রচিত এই বিশ্বাস লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পীরিতিগন্ধী অনেক পদ দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভনিতায় পাওয়া যায়। পরিষদের পদাবলীর ৭৮৩, ৭৮৮, ৭৯৫, ৮০২, ৮০৫ প্রভৃতি সংখ্যাচিহ্নিত পদগুলি ইহার দৃষ্টান্ত স্থানীয়। ইহা ব্যতীত পদাবলীর অন্যান্য অংশে পীরিতি বিষয়ক অনেক পদ ত আছেই, তাহা ছাড়া বহু পদে সহজ পীরিতির কথার ও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ৩৭৩ নম্বরের পদটীর প্রথম ভাগেই আছে—

শিশুকাল হৈতে   শ্রবণে শুনিনু
সহজ পীরিতি কথা।

আবার এই পদটী এইভাবে শেষ হইয়াছে—

পীরিতি ঝুলিটি   কাঁধেতে করিয়া
পীরিতি নগরে ফিরি॥

৩৭৫ নম্বরের পদটীর শেষ দুই পংক্তি এই রূপ

সহজ ভজন   পাইবে সে জন
সহজ মানুষ সে।

"দীন চণ্ডীদাস" চৈতন্য-পরবর্ত্তী কালের কবি। তাঁহার সময়ে সহজিয়া মত প্রচারিত হইয়াছিল, অতএব সহজ ভজনের পদ লেখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে

১৩৩৩ সনের পরিষদ পত্রিকায় আমাদের দীন চণ্ডীদাস শীর্ষক প্রবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ নম্বরের পুঁথি হইতে যে পালা গান প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রারম্ভেই এই পীরিতির উৎপত্তি লইয়া আলোচনা সুরু হইয়াছে। "কেবা নিরমালা এহেন পীরিতি" ইত্যাদি ক্রমে পীরিতি পাড়া নামে যে পালা আরম্ভ হইয়াছে তাহার একটা সংক্ষিপ্তসার আমরা উক্ত প্রবন্ধের ২১৬-১৭ পৃষ্ঠায় প্রদান করিয়াছি। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে দীন চণ্ডীদাসের উপর সহজ ধর্ম্মের প্রভাব পড়িয়াছিল। অতএব তিনি যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী কালের কবি তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ এই যুগে যে একজন পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত পদ দুইটী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

নীলরতনবাবু ১৩১৭ সনের বীরভূমি পত্রিকায় ১৪-১৫ পৃষ্ঠায় দীন চণ্ডীদাসের রচনা হইতে নিম্ন লিখিত পদটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কালার ছটায়ে, কালরূপ ধরে,
এ সব তরুর কুলে।
গৌর দেহেতে, গৌর বরণ,
ধরিয়াছে অবহেলে॥
সখীর রচন, হাসিয়া সঘন,
"সকলি গৌর দেখি।"
আপনার দেহ, দেখল গৌর,
দেখল সকল সখী॥
নিকুঞ্জ ভুবন, সেই ত গৌর,
গৌর কালিয়া কানু।
সকল গৌর, দেখল বেকত,
গৌর আপন তনু॥
সকল গৌর, দেখিয়ে সখিনী,
মনেতে লাগিল ধন্দ।
চণ্ডীদাস কহে, ও নব নাগর,
গৌর হইল কুঞ্জ॥

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন—"এইবার ভক্ত বলুন দেখি, ইহাতে আমাদের প্রেমাবতার গৌরহরির আবির্ভাব সূচনা হইতেছে কি না? ভক্ত চণ্ডীদাস, সাধক চণ্ডীদাস, এইরূপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের একশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রূপ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তাঁহার শুভাগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।"

একশত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ ধ্যান করা যায় কি? কেবল ইহাই নহে, চণ্ডীদাসের রচিত এইরূপ পদ আরও পাওয়া যায়। পরিষদের পদাবলীর ৮২৪ নম্বরের পদটী এই —

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আল।
চূড়াটি বান্ধিয়া কে বা দিল॥
তাহার ইন্দ্রনীল-কান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দসুত কানু॥
* * * *
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন দেশে ছিল॥
* * * * *
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এ রূপ হইবে কোন দেশে॥

রাম না জন্মিতে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, এই কথা যাঁহারা প্রচার করেন, একমাত্র তাঁহারাই বিশ্বাস করিতে পারেন যে ইহা চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কোন চণ্ডীদাসের রচনা। "এরূপ হইবে কোন দেশে" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের জন্ম হইবার পরে ইহা রচিত হইয়াছিল। আমাদের পুরাণাদিতে ভবিষ্যৎ বংশাবলী কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিকগণ তাহা হইতে ঐ সকল গ্রন্থ রচনার কাল কি ভাবে নির্দ্ধারণ করেন তাহা কাহারও জানিতে বাকি নাই। পূর্ব্বোক্ত পদ দুইটীও সেই পর্য্যায়ভুক্ত। অতএব দীন চণ্ডীদাস গৌরাঙ্গের পরে যে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এখন এই দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ ও ২৯৪ নং পুঁথিদ্বয়ে আমরা প্রকৃত পক্ষে তিনখানা পুঁথির সন্ধান পাইতেছি। ২৩৮ নং পুঁথির ১-৫নং চিহ্নিত পত্রগুলিতে যে পালা গান আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই প্রথম হইতে ৬৭টী পদ ২৯৪ পুথিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; অতএব ইহাতে

আমরা একই পালার দুইখানা পুথি পাইতেছি। উক্ত ২৮৯নং পুথিতে আর একখানা পুথির ২০.-৭৫০ পত্রাঙ্ক চিহ্নিত মাত্র ১৬পাতা পাওয় যায়। ইহাতে প্রায় ৪৪টী পদের নমুনা আছে। ৭৫০নম্বরের পত্রে ২০০১ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট পদ পাওয়া যায়, অতএব দেখা যাইতেছে যে দীন চণ্ডীদাস ২০০০ দুই হাজারের অধিক পদ রচনা করিয়াছিলেন। পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ৮৩৯টী, কৃষ্ণকীর্ত্তনে ৪১৯টী, বিদ্যাপতিতে প্রায় ৯০০টী পদ অছে, কাযেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে দীন চণ্ডীদাসের একখানা পুথিতে যতগুলি পদ ছিল, তাহার সংখ্যা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নামে প্রকাশিত পদ সংখ্যার প্রায় সমান। ইহাতেই এই কবির রচনা শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

দীন চণ্ডীদাস একজন সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি নানা পুরাণ অবলম্বন করিয়া তাঁহার আখ্যানবস্তু সঙ্কলন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলার ৪৬ সংখ্যক পদে তিনি লিখিয়াছেন—

এ কথা কহিল আগম পুরাণে
নিখিল ব্যাসের সূত্র।
অষ্টাদশ গ্রন্থ কনখানে আছে
ফুটকে কহিবে * ॥
* • বৈবত্তে লিখন পুরাণে
নবম অধ্যায়ে পাবে।
মহাদেব জুগি আইলা গোকুলে
কৃষ্ণ দরশন লোভে ॥
* * * এ লিঙ্গ পুরাণে
লেখিআছেন ব্যাস বরে।
লিঙ্গে পুরাণে পঞ্চম অধ্যায়
পাইবে মনের সরে ॥
* * * কৃষ্ণ দরশন
আইলা যে সুলপাণি।
আগমে পাইবে এ সব বচন
জে কথা কহিল আমি ॥
দশমে * * * ব্যাস
ভাগবতে কেনে নাহি।
অন্য উপদেশ কহিছে এ সব
আগে জে কহিল তাহি ॥
দশমে * * নহে দরশন
অন্য উপদেশ বানি।
চণ্ডিদাস কহে মধুর বচন
ফুটকে কহিল আমি ॥

ইহা হইতে দেখা যায় যে কবি আগম, অষ্টাদশ পুরাণ যথা বৈবর্ত্তাদি পুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি হইতে তাঁহার মাল মসলা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ইহার অতিরিক্তও কিছু অন্য স্থান হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। আবার ২০৮৯নং পুথির ১৯০৬ সংখ্যক পদে আছে—

গরুড় পুরাণের কথা আর বৈবর্ত্ত।
বিষ্ণুপুরাণ কথা আর শ্রীভাগবত ॥ ইত্যাদি

এখানেও গরুড় পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ও ভাগবতের কথা পাওয়া যায়। কবির অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হইলে বোধ হয় অন্যান্য পুরাণের কথাও জানিতে পারা যাইত। মোট কথা দীন চণ্ডীদাস যে একজন মহাপণ্ডিত লোক ছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

এই সকল পুরাণ বর্ণিত আখ্যান বস্তু ব্যতীতও তিনি অন্য স্থান হইতে মাল মসলা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও তিনি বলিতেছেন। হিন্দুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া পুরাণাদির বর্ণিত বিষয়ের অতিরিক্ত তিনি আর কি লিখিতে পারেন তাহা জানিবার বিষয় বটে। বোধ হয় পীরিতি ঘটিত রসতত্ত্বের সে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা তাঁহার গ্রন্থে প্রচুর পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধেই এই কথা বলা হইয়াছে। চৈতন্যদেব ব্যতীত বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মে নূতনত্ব আর কেহ প্রচার করেন নাই। চৈতন্য পন্থিগণের মতানুবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় কবি এই কথা লিখিয়াছেন।

দীন চণ্ডীদাসের এক বিরাট কাব্যগ্রন্থের দুইসহস্রাধিক পদের এই যে সন্ধান আমরা পাইতেছি, তাহাতে কি কি বিষয় লইয়া কবি পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। ২৩৮৯ নম্বরের পুথির ১০৮০ নং পদে লিখিত আছে—

গৌন রাস কহিল এবে   কহি মহা রাস
শুনহ শ্রবণ পাতি। ইত্যাদি

ইহাতে দেখা যায় যে কবি রাসলীলাটী দুইভাগ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথমতঃ গৌণ রাসের বিষয় বর্ণনা করিয়া, পরে মহা রাসের বর্ণনায় তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। নীলরতন বাবু ১৩০৫ সনের পরিষদ পত্রিকায় যে রাসলীলার পদ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা গৌণ রাসের পদ। মহা রাসের পদ উক্ত ২৩৮৯ পুথিতে কিছু পাওয়া যায়, আর কিছু পাওয়া যায় চণ্ডীদাসের পদাবলীতে। এই বিষয় লইয়া যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে। উক্ত ২৩৮৯ পুথির ১৯০৬নং পদে আছে—

চারি পুরাণ যাটি সখা উক্তি হয়ে।
পূর্ব্বরাগ নবোঢ়ার কথা কহিল নিশ্চয়ে॥
সুবল মিলন আর পূর্ব্বকথা শুনি।
নানামত পুরাণ কথা রসতত্ত্ব আনি॥ ইত্যাদি।

পুনরায়—

পিক কহে শুনিলাঙ পূর্ব্বরাগ কথা।
সখা উক্তি নবোঢ়া-রস রতিগুণ গাথা॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে ১৯০৬নং পদের পূর্ব্বেই পূর্ব্বরাগ, (সুবল) সখা উক্তি, নবোঢ়া রস ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল। এই নবোঢ়া রস অর্থে নবোঢ়া-মিলন বুঝিতে হইবে, কারণ ১৯০৬ সংখ্যক পদে আছে—

চলল সুন্দরী   যথা সহচরী
সুবল যেখানে আছে।
নবোঢ়া মিলন   হইল তখন
মিলি বিনোদিনী কাছে॥

এই পূর্ব্বরাগ সুবল সখার উক্তি। নবোঢ়া মিলন প্রভৃতি সম্বন্ধে গঠিত একটা পালার নমুনাও আমরা পাইয়াছি, তাহা যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

ইহার পরে পিক অনুরোধ করিল—

আর কিছু কহ শুক শুনিএ শ্রবনে।
অমৃত বচন কথা শুনি এক মনে॥

তখন শুক বলিল—

শুক কহে শুন পিক আর এক শ্রেণী।
যুগল মধুর রস অমিঞার কণি॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে ১৯০৬নং পদের পরে যুগল মধুর রস সম্বন্ধীয় পদ আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার প্রথম পদটী "অথ বিপ্রলম্ভ" এই মুখবন্ধের পরে ১৯০৭নং পদে পাওয়া যায়। বোধহয় এইস্থান হইতে বিপ্রলম্ভ, বাসকসজ্জা, মান, খণ্ডিতা প্রভৃতি বিষয়ের পদ ছিল।

উক্ত পুথির ৮২৭নং পদ হইতে ৭২৫নং পদ পর্য্যন্ত আমরা মাথুর রচনার নমুনা পাইতেছি। তাহাতে দেখা যায় যে কৃষ্ণ মথুরা হইতে রাধার নিকট হংসদূত এবং রাধা বৃন্দাবন হইতে মথুরায় কোকিলদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব কাব্যের এই ভাগে মাথুর পদাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। ২৩৮৯নং পুথির ৪৮০ নম্বরের পদ হইতে যে পালা আরম্ভ হইয়াছে তাহাই মাথুর অধ্যায়ের আরম্ভ। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্য লীলার পদ ছিল। অতএব এই মহাকাব্যের অধ্যায় বিভাগ নিম্নলিখিত প্রকারে করা যাইতে পারে।

১—৪৭৯ পদ = শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা বিষয়ক, মথুরায় যাওয়া পর্য্যন্ত।

৪৮০—৭২৬ নম্বরের পদের পরেও আরও কিছুদূর পর্য্যন্ত (পুথি খণ্ডিত বলিয়া ঠিক ধারণা করা গেল না) = মাথুর পদ।

১০৪৫ পদের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ১০৭৯ পদ পর্য্যন্ত গৌণ রাস।

১০৮০—১০৮৪ পরেও কতকদূর পর্য্যন্ত মহারাস।

১৮৬৯ পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০৫ পর্য্যন্ত পূর্ব্বরাগে সুবল সখার উক্তি ও নবোঢ়া মিলন প্রভৃতি। [এই স্থান হইতে বোধ হয় চৈতন্য-প্রবর্ত্তী যুগের ভাব লইয়া রচনা আরম্ভ হইয়াছিল।]

১৯০৭ হইতে—বিপ্রলম্ভ প্রভৃতি যুগল মধুর রস সম্বন্ধীয় পদ।

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী আমরা এই সূত্র অনুযায়ী বিবিধ অধ্যায়ে ভাগ করিয়া সঙ্কলন করিব।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলায় কথাবন্ধের একটা বিশিষ্ট ধারার নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজা পরীক্ষিত শুক-

দেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল তত্ত্ব অবগত হইতেছেন এইরূপ মুখবন্ধের পরে এক একটি উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে, যেমন উক্ত গ্রন্থের ৬২ সংখ্যক পদে আছে

রাজা পরিক্ষিত কহিতে লাগল
সন্দেহ হইলা মনে।
সুনহ গোসাঞি ব্যাসের নন্দন
পুছিএ তোমার স্থানে॥ ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ নম্বর পুথির ১২০৬ সংখ্যক পদে পূর্ব্বরাগ সুবল সখার উক্তি, নবোঢ়া মিলন প্রভৃতি, কবিও পরীক্ষিতকে শ্রোতা ও শুকদেবকে বক্তা করিয়া তাঁহার আখ্যানবস্তু আরম্ভ করিয়াছেন, যেমন

কহিতে লাগিল তবে, রাজা পরীক্ষিত।
কহ কহ মুনিবর আকর্ষিল চিত॥
প্রেমরস কথা শুনি অমৃতের ধারা।
কোন প্রয়োজন উক্তি কহ মুনি সারা॥ ইত্যাদি

দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা বাদ দিলেও এই সকল পালা গানের কবি সে একই ব্যক্তি তাহা এই প্রকার আভ্যান্তরীণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

দীন চণ্ডীদাসের সময়। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে চৈতন্যচরিতামৃত রচনার কালে একাধিক চণ্ডীদাস প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন নাই, অতএব দীন চণ্ডীদাসকে ইহার পূর্ব্বে স্থাপন করা যায় না। ইহাতে এই দাঁড়াইতেছে যে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে দীন চণ্ডীদাস বর্ত্তমান ছিলেন না। অপর পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরু খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত হইয়াছিল; এই উভয় গ্রন্থেই আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত দেখিতে পাই। অতএব ১৬০০—১৭৫০ খ্রীষ্টীয় অব্দের মধ্যে দীন চণ্ডীদাস জন্মিয়াছিলেন ইহা বলা যাইতে পরে। সময়টা অবশ্যই প্রায় ১৫০ বৎসর ব্যাপী বলা হইল। কিন্তু ইহা আরও সংক্ষিপ্ত করার প্রমাণও কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে। অকিঞ্চন দাসের বিবর্ত্তবিলাস একখানা সহজিয়া গ্রন্থ। ইহাতে চণ্ডীদাস ভনিতার অনেক রাগাত্মিকা পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কোন কোনটি দ্বিজ ভনিতায় পরিষদের পদাবলীতেও পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে ঐ বহি দীন চণ্ডীদাসের পদ রচনার পরে লিখিত হইয়াছিল। অকিঞ্চন দাস সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, কাযেই দীন চণ্ডীদাসকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি বলা যাইতে পারে। এই কবির রচিত কোন পুথিরই শেষ পাতা পাওয়া যাইতেছে না। যদি তাহা কোন দিন সংগৃহীত হয়, তবে এই সমন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে।

কেহ কেহ দীন চণ্ডীদাসকে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিতে চান। তাঁহাদের মূল সূত্র নরোত্তম বিলাসের নিম্নলিখিত পদদ্বয়—

জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে॥

এই স্থানে আমরা যে চণ্ডীদাসকে পাইতেছি তিনি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, তার্কিক ও দীন-বন্ধু ছিলেন ইহাই জানা যায়। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের মত একজন কবিকে উল্লেখ করিতে যাইয়া লেখক যে তাঁহার কবিত্ব শক্তি জ্ঞাপক বিশেষণ ব্যবহার করেন নাই ইহাতে সন্দেহ হয়। অতএব এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কবি দীন চণ্ডীদাসকে নরোত্তম-শিষ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় না। আবার দীন-বন্ধু হইলেই যে দীন হইতে হইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। দীন চণ্ডীদাস কর্ত্তৃক নরোত্তম বন্দনার একটী পদও ভারতবর্ষে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা কি ভাবে, কোথায় পাওয়া গিয়াছে তাহা না জানিয়া এক মাত্র ঐ পদের উপর নির্ভর করিয়াও নিঃসন্দেহে কিছু বলা কষ্টকর। হইতে পারে তিনি নরোত্তমের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু এই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত প্রমাণ এখনও অবিষ্কৃত হয় নাই, ইহাই আমরা বলিতে চাই।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যে সকল পদ চণ্ডীদাসের ভনিতায় স্থান পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন পদও আছে যাহা আদৌ কোন চণ্ডীদাসেরই রচিত নহে। অন্য কোন কবির ভনিতায় চণ্ডীদাসের নাম বসাইয়া তাহা চণ্ডীদাসে আরোপ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ পরিষদের পদাবলীর ৩৩৫ নম্বরের পদটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা গেল। ইহার আরম্ভ—

পীরিতি বলিয়া একটী কমল
রসের সায়র মাঝে।

এবং শেষ—

কহে চণ্ডীদাস শুনহে নাগরি
পীরিতি রসের সার।
পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার॥

এই পদটী পদকল্পতরুতেও চণ্ডীদাসের ভনিতায় স্থান পাইয়াছে, বোধ হয় তাহা দেখিয়াই চণ্ডীদাসের পদাবলীতে ইহা সংযোজিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিষদের পদকল্পতরুর পাঠান্তরে (১৫৫ পৃঃ দ্রঃ) নরহরির ভনিতা পাওয়া যায়। এই পদটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৭৬ নম্বর পুথির ৬নং পদে, ৩৪৩৬ নম্বর পুথির ২ নং পদেও পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রত্যেক পুথিতেই নরহরির ভনিতা দৃষ্ট হয়। যখন এতগুলি পুথিতে ইহা নরহরিকে অরোপ করা হইয়াছে, তখন নরহরিই যে ইহার প্রকৃত রচয়িতা তাহা আমরা বিশ্বাস করি। একে ত পদটি পীরিতি গন্ধী হওয়াতে ইহা যে চৈতন্যপূর্ব্ববর্ত্তী কালে রচিত হয় নাই তাহা সহজেই ধরা যায়, তারপর নাগরীর সঙ্গে নরহরির মিল যেমন হয়, চণ্ডীদাসের মিল তেমন হয় না। এইসকল আভ্যন্তরীণ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াও নরহরিকেই এই পদের রচয়িতা বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে।

পরিষদে পদাবলীর ৩৮৫ নম্বরের পদের আরম্ভ

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।

এবং শেষ

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
পীরিতি রসের ভোর।
পীরিতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইবে চোর॥

এই পদটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৬৫ নম্বর পুথির ২নম্বর পদে, এবং ১১১১ নম্বর পুথির ১৮৭ পৃষ্ঠায়ও পাওয়া যায়। এই উভয় স্থানেই তরণীরমণের ভনিতা দৃষ্ট হয়। পরিষদের পদে কেবল মাত্র পী অক্ষরের উৎপত্তি দেওয়া আছে, কিন্তু ২৮৬৫ নম্বরের পুথিতে পী, রি ও তি এই তিনটী অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কাযেই এই পাঠেই পূর্ণ পদটীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে এবং ইহাতে যে ভনিতা আছে তাহাই খাটী ভনিতা বলিয়া মনে হয়। শেষ চারি পংক্তি উক্ত দুই পুথিতে নিম্নলিখিত আকারে আছে

তাহে সুখ দুঃখ সদাই অনুমুখ
সকলি সুখের পারা।
তরনিরমণ করে নিবেদন
মরিলে না জায় ছাড়া॥

২৮৬৫ পুথি

তাহে দুখ সুক হয় পরতেক
সদাই সুখের পারা।
তরনিরমন করে নিবেদন
মরিলে না জায় ছাড়া॥

১১১১পুথি

চণ্ডীদাসের নামে পীরিতি-গন্ধী এই পদটী চালাই-বার জন্য এই চারি পংক্তি পরিবর্ত্তিত আকারে পদাবলীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পরিষদের পদাবলীর ৩১১ নম্বরের পদটী—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধুনু
আগুনে পুড়িয়া গেল। ইত্যাদি

চণ্ডীদাসের ভনিতায় আছে। কিন্তু উহাতে যে দুইটী পাঠান্তর দেওয়া আছে তাহাতে জ্ঞানদাসের ভনিতা দৃষ্ট হয়। পদকল্পতরুতেও এই পদটী জ্ঞান দাসের ভনিতায় পাওয়া যায়। জ্ঞানদাসের পদাবলীতেও ইহা জ্ঞানদাসের ভনিতায় আছে। ইহাতে এই ধারণাই হয় যে এই পদের প্রকৃত রচয়িতা জ্ঞানদাস।

পরিষদের পদাবলীর ৭৪২ নম্বরের পদটি—

বঁধু, কি আর বলিব তোরে ইত্যাদি

চণ্ডীদাসের ভনিতায় আছে। কিন্তু সাহিত্য পরি-ষদের ২০১ নম্বরের পুথিতে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৭ নম্বর পুথিতে এই পদ জ্ঞানদাসের ভনিতায় পাওয়া যায়।

পরিষদের পদাবলীর ৯৯ নম্বরের পদটী—

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন ইত্যাদি

চণ্ডীদাসের ভনিতায় আছে। কিন্তু উক্ত পদের পাঠান্তরে পদকল্পতরুতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৪ নম্বর পুথিতে ইহা জ্ঞানদাসের ভনিতায় পাওয়া যা। এই সকল পদ জ্ঞানদাসের রচিত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

আবার কতগুলি পদ অতিশয় সন্দেহজনক, কারণ ইহারা বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভনিতাযুক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরিষদের পদাবলীর ৭৭৯ নম্বরের পদটীতে চণ্ডীদাসের ভনিতা আছে, কিন্তু পদকল্পতরুতে তাহা বিদ্যাপতির ভনিতায় চলিতেছে। শেষোক্ত গ্রন্থে শেষ চারি পংক্তি নিম্নলিখিত আকারে পাওয়া যায়—

ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথী
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥
পং সং ৩১১ পৃঃ।

আর পদাবলীতে আছে—

বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথি
(তৎপরে পূর্ব্ববৎ)।

উপরে বিদ্যাপতির ভাষার নমুনা মিলিতেছে, তাহা দেখিয়া কেহ ইহা বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন কি? কেহ হয়ত বলিবেন যে ইহা কোন বাঙ্গালী বিদ্যাপতির লেখা। যদি তাহাই হয় তবে বিদ্যাপতির স্থানে "বাশুলী আদেশে" স্থাপন করার উদ্দেশ্য কি? এই জাতীয় সহজিয়া পদ চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কালে রচিত হইতে পারে না তাহা আমরা দেখাইয়াছি। পরবর্ত্তী কালে সহজিয়াগণ নিজেদের সাধন ভজন সম্বন্ধীয় এই প্রকার পদ রচনা করিয়া কেহ চালাইয়াছেন বিদ্যাপতির নামে, আবার কেহ চালাইয়াছেন চণ্ডীদাসের নামে। রাগাত্মিকা পদের অনেক পদই এই জাতীয়। যেমন, পরিষদের পদাবলীর ৭৯৩ নম্বরের পদটী "সহজ সহজ কইয়ে" ইত্যাদি চণ্ডীদাসের ভনিতায় আছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৩৬ এবং ২৫২০ নম্বরের পুথিতে কৃষ্ণদাসের ভনিতা পাওয়া যায়। আবার চণ্ডীদাসের ভনিতার ৪১৯ নম্বরের সহজিয়া পদটী "মানুষ মানুষ সবাই বলয়ে" ইত্যাদি উক্ত ৩৪৩৬ নম্বরের পুথিতে শাস্ত কৃষ্ণদাসের ভনিতাযুক্ত। এইরূপ বহু সহজিয়া পদের ভনিতায় একাধিক কবির নাম পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে এই সকল পদ বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রী...ন্দ্রমোহন বসু।

অন্ধের নিবেদন

ওগো আমি যে আলোক ভিখ
এ ঘোর আঁধারে কে দেখাবে পথ
কে আছে এমন দিশারী!
শুনি কত শোভা গোধূলি গগনে
শারদ পূর্ণচন্দ্র কিরণে
ভূধরে সাগরে কুসুমিত বনে
বরষা জলদ গায়।

না দেখিনু হায় প্রিয়জন মুখ
মিটিল না মোর নয়নের সুখ
আঁধার রাজ্যে চলিতেছি আমি
সাথীহীন অসহায়।

ভগবান—ভগবান,—
নিমেষের তরে এক কণা আলো
কর শুধু মোরে দান।

দেখে লই এই সুন্দর ধরা
ফুল ফল সাজে কত মনোহরা—
তার পরে লও বিনিময়ে প্রভু
এ মোর ব্যর্থ প্রাণ॥

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বন্ধ এবং মুক্তি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাহার বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়াছে সেই ন্যায়পরায়ণ এবং সমদর্শী হইতে পারে। যাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, তাহার নিকট ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, স্ত্রী পুত্র গো হস্তী প্রভৃতিতে ভেদ নাই। একত্বের নিকট ভেদ বিলুপ্ত। যাহার সত্যলাভ ঘটিয়াছে, তাহার ভ্রমও অপনীত হইয়াছে। এ অবস্থা' কয় জনের ঘটিয়া থাকে? অথচ অধুনা আমরা সকলেই সাম্যবাদী। যাহাদের অহঙ্কার পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, যাহাদিগের সাম্প্রদায়িক ভাব তিরোহিত হয় নাই, যাহারা ক্ষমতাপ্রিয় এবং দলাদলি হইয়া ব্যস্ত, যাহারা অহরহ নিজেদের ঢাক বাজাইতেছে, এবং অপরের নিন্দা ও কুৎসা করিতেছে, যাহারা অপরের সদ্‌গুণ দেখিতে পায় না, প্রতি পদে যাহারা পক্ষপাতিত্ব করিতেছে, যাহারা অপরের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, যাহারা অপরের সমালোচনায় অধীর হয়, তাহারাই সাম্যবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কি বিড়ম্বনা!

পূর্ব্বার্জ্জিত ধারণা, কুসংস্কার, রাগদ্বেষ প্রভৃতি হইতে বিযুক্ত না হইলে কি কেহ সদ্বিচারক হইতে পারে? কিন্তু অধুনা কতই বিচার বিভ্রাট ঘটিতেছে,তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নিবৃত্তি পথে না গেলে এইরূপ দুর্দ্দশাত ঘটিবেই।

জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে নীতির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। যাহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, যাহাদিগের বুদ্ধি সংশয়রহিত, তাহাদের আচার এবং চরিত্র নির্ম্মল এবং সাধু হইয়া যায়, সদনুষ্ঠান তাহাদিগের জীবনের অঙ্গ হইয়া যায়। তাহাদের ইচ্ছাশক্তি এত দৃঢ় হইয়া যায় যে, কোন বাহ্যবিষয় তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। তাহারা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া জলমগ্ন ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করে তাহারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া বিপন্ন ব্যক্তিকে সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করে তাহারা প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া দস্যুর হস্ত হইতে সতী রমণীর উদ্ধার সাধন করে। সে সকল ব্যক্তি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নির্ভীকচিত্তে অজ্ঞ স্বদেশবাসীর হস্তে ঘোর নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। যে সকল মনীষী জগতের কল্যাণের জন্য সত্য আবিষ্কার করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং লইতেছেন, তাঁহারা নীতির স্তরে যে কত উন্নত তাহা বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল আদর্শ জগতে বিদ্যমান থাকিতেও যাহারা ইহার স্বাধীন ভাব বুঝিতে পারে না তাহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ভ্রান্ত।

পশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন যে স্বাধীন ইচ্ছা অলীক কথা, এবং আমরা সর্ব্বদা motives দ্বারা চলিত হই। যাঁহারা বুঝেন না যে ব্যতীত একটী ব্যাপক আত্মা (higher self) আছে, পাশবিক প্রকৃতি ব্যতীত একটী দেবপ্রকৃতি আছে, তাঁহাদের মুখে সকল যুক্তিই শোভা পায়। একটুকু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে motives (অভিসন্ধি) নিম্ন স্তরের কথা। ব্যষ্টি আত্মা অর্থাৎ জীব প্রকৃতি প্রবৃত্তির অধীন বলিয়া motivesএর দাস। সুখ দুঃখ, মান অপমান, প্রশংসা নিন্দা, উপহাস বিদ্রূপ প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই আত্মাই অহং, সুতরাং তাহার সহিত স্বার্থের সম্পর্ক ত থাকিবেই। আমাদের যতই নৈতিক উন্নতি হইতে থাকে, ততই আমরা সঙ্কীর্ণ অহংটীকে পরিহার করি। যে যে-পরিমাণে স্বার্থত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহাকে তত উন্নত বলি। বস্তুতঃ স্বার্থত্যাগের মাত্রাই উন্নতির মানদণ্ড। যিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করেন, তিনিই মানবাকারে দেবতা। যাহারা সাধারণতঃ নিজের স্ত্রীপুত্র কন্যা বা জ্ঞাতি পরিজন লইয়াই ব্যস্ত, তাহাদিগের সুখে আনন্দ এবং ক্লেশে দুঃখ অনুভব করে, দীন দুঃখী প্রতিবেশী কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, সকলেই তাহাদিগকে সঙ্কীর্ণচেতা বলিয়া থাকে। যাহারা এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র গ্রামবাসীর

কল্যাণ কামনা করে, তাহারা কি অপেক্ষাকৃত উন্নত নহে? যাহারা গ্রামে আবদ্ধ না থাকিয়া স্বজাতি ও স্বদেশের হিতসাধনে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে, তাহারা তদপেক্ষাও উন্নত নহে কি? পরিশেষে, যাহারা সমগ্র মানব জাতিকে ভ্রাতৃজ্ঞান করে, এবং সর্ব্বজীবে যাহারা সমদর্শী, তাহারা কি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত নহে? নৈতিক উন্নতির সহিত আমাদের সঙ্কীর্ণ অহংএর এইরূপে ক্রমশঃ প্রসার বৃদ্ধি (expansion) হয় এবং অবশেষে ইহা ব্যাপক অহংএ লীন হইয়া যায়। তখন স্বার্থের গন্ধও থাকে না। এই অবস্থাই নিষ্কাম (disinterested) অবস্থা। ইহাতে motivesএর সংস্পর্শ নাই এবং তাহাদের প্রসঙ্গও উঠিতে পারে না। পূর্ব্বে যে জ্ঞানের উল্লেখ আমরা করিয়াছি তাহা এই অবস্থা, তাহাই মুক্ত অবস্থা।

আর একটী কথাও এখানে বলিতে হইতেছে—যদি আমরা একান্ত প্রকৃতির দাসই হইতাম, তাহা হইলে আমাদিগের দায়িত্ব থাকিত কি? তাহা হইলে দণ্ডবিধি প্রভৃতি আইন নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা বা অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করাই উচিত। তাহা হইলে বিদ্যালয়গুলি এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিও ভূমিসাৎ করা উচিত। জ্ঞানের সহিতই কর্ত্তৃত্ব ভাব জড়িত, জ্ঞান হইতেই তাহার উৎপত্তি। আমাদিগের কর্ত্তৃত্ব অভিমান আছে বলিয়াই আমাদের দায়িত্বও আছে। একটী গো বা মহিষ যদি শৃঙ্গাঘাতে কাহারও প্রাণনাশ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা হয় না। আমাদিগকে দণ্ডনীয় হইতে হয়, কারণ আমাদিগের ক্রোধরিপু দমন করা কর্ত্তব্য আমরা বলিয়া থাকি। কর্ত্তব্য বলিলেই করার ক্ষমতা বুঝায়। একটী অপরিণতবয়স্ক বালক বা উন্মাদ ব্যক্তি কাহারও অনিষ্ট সাধন করিলে তাহাদিগকে দণ্ডনীয় হইতে হয় না, কারণ একটীর হিতাহিত বোধ জন্মে নাই, আর একটীর হিতাহিত বোধ লুপ্ত হইয়াছে। আমাদের ইচ্ছাকৃত কার্য্যের জন্য আমরা দায়ী ত বটেই, আমাদের অনবধানতার জন্যও অনেক সময়ে আমাদিগকে দায়ী হইতে হয়। আমরা যদি অবস্থান্তর ঘটাইতে না পারিতাম, তাহা হইলে দীনতা এবং দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতাম। কিন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া কিরূপে বর্ব্বর অবস্থা হইতে সভ্যতার উচ্চশ্রেণীতে আরোহণ করিয়াছি, কিরূপে পশু অবস্থা হইতে জ্ঞানে এবং নীতিতে ক্রমশঃ উচ্চস্তরে উঠিতেছি? আমরা সময়ে সময়ে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াও সফলতা লাভ করি না ইহা সত্য, কিন্তু ইহার কারণ থাকিতে পারে। কখনও বা কারণটী বুঝিতে পারি, এবং পুনরায় চেষ্টা করি। কখনও বা কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না। তাহা বলিয়া সত্যটী স্বীকার করিতেই হইবে। যাঁহারা চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাঁহারা ইচ্ছার স্বাধীনতা কদাপি অস্বীকার করিতে পারেন না। পুরুষকার স্বীকার করিলে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার বিঘ্ন উৎপাদন করা হয় না। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়ই চিরন্তন মার্গ। মুক্তি-ইচ্ছাও স্বাভাবিক। মুক্তিটী higher law, বন্ধ lower law,—দুইটীই নিয়ম। একটী উচ্চ অপরটী নীচ বা ক্ষুদ্র।

যাহাকে আমরা ক্ষুদ্র এবং আংশিক নিয়ম বা সত্য বলি, তাহা ব্যাপক নিয়ম এবং সত্যেরই বিকাশ। অবস্থাবিশেষে এই নিয়মগুলি পৃথক হইয়া দাঁড়ায়, এবং এই পার্থক্য হইতেই ঐক্যে উপনীত হওয়া যায়। আংশিক নিয়ম হইতে ব্যাপক নিয়ম বুঝিতে গেলে ভ্রমে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যাপক নিয়ম দিয়া আংশিক নিয়মগুলি বুঝিতে গেলে বিশেষ আয়াস আবশ্যক হয় না, এবং ভ্রান্তির সম্ভাবনাও থাকে না।

আমরা পূর্ব্বে যে জ্ঞান বা সত্যের কথা বলিয়াছি, তাহা নিরপেক্ষ এবং নিরঙ্কুশ (unconditional)। সেখানে হিতাহিত, শুভাশুভ, ভালমন্দ প্রভৃতি নাই। এগুলি আপেক্ষিক—যখন দ্বৈত নাই, তখন আপেক্ষিকতা কোথা হইতে আসিবে? সেই জন্য গীতা বলিয়াছেন—

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥"—২।৫০
গীতা, ২।৫২, ৫৩; গীতা, ৮।৯।১০; গীতা, ৯।২৮

যখন ব্যষ্টি অহং বা অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়াছে, তখন কর্ত্তৃত্ব অভিমানও নাই। যখন কর্ত্তৃত্বভাব নাই, তখন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, কর্ম্মফলে আশক্তিও নাই। তখন কর্ম্ম করিলেও তাহাকে কর্ম্ম বলা যায় না।

"কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।"
গীতা, ৪।২০; গীতা, ৪।২১, ২২; ৫।৭-১১, ২৮।১৭; ২।৭১।

যে কর্ম্মফল ত্যাগী সেই ত্যাগী (গীতা ১৮।১১) গীতা ১৮।২; ১৮।৯; ৫।১৩।

ঐ জ্ঞানই ব্রহ্ম। ঐ জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তিনি ব্রহ্মগতচিত্ত, তাঁহার নিজের কিছুই নাই, তিনি সকলই ব্রহ্মে অর্পণ করিয়াছেন। কর্ম্মের গুণাগুণ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। গীতা, ৩।৩০ ; ৫।১০ ; ৪।২৪ ; ৯।২৭ ১২।৬, ৭ ; ১৮।৫৬, ৫৭।

এই অবস্থায় "ব্রহ্মার্পিতমনোবুদ্ধি" ব্যক্তির নিজের কোন ইচ্ছাই থাকে না, তাহা ভগবদিচ্ছার সহিত মিলিত হয়। এই অবস্থাই জীবন্মুক্ত অবস্থা।

বস্তুতঃ, যিনি মুক্ত, তিনি নিষ্কাম, তাঁহার প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না, তিনি নিষ্ক্রিয়। গীতা, ১৩।২৯

যিনি মুক্ত, যিনি 'এক' নিরপেক্ষ, তিনি নির্লিপ্ত।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভিঃ ন স বধ্যতে॥

গীতা ৪।১৪ ৫।১৪, ১৫ ; ৯।৯ ; ৯।২৯ ; ১৩।২৭, ২৮, ১৩।৩০।

পরমাত্মার কিরূপ নিশ্চিন্ত ভাব, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। কঠ, ৫।৯—১১

গীতা ১৩।৩২, ৩৩ ; ৯.৬।

যিনি নির্লিপ্ত তিনি নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত।

"অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥"

গীতা ১৩।৩১।

আমরা যাহাকে ব্যক্ত বলি সেগুলি সসীম। পরমাত্মা যদি ব্যক্ত গুলিতে আবদ্ধ এবং লিপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি সসীম হইতেন। একটী ব্যক্ত যেরূপ সসীম, ব্যক্তসমষ্টিও তদ্রূপ সসীম। পরমেশ্বর ব্যষ্টি বা ব্যক্তসমষ্টি (sum total) নহেন। তিনি বহু হইয়াও খণ্ড হইয়া যান নাই—তিনি অখণ্ড বা নিষ্কলই (এক) রহিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপ অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। ব্যষ্টি জ্ঞানের মূলে দেশ ও কাল (space and time) রহিয়াছে, কিন্তু দেশ ও কাল অখণ্ড থাকিয়া যায়। আমরা যে ব্যষ্টিগুলিকে দেখি সেগুলি এক শক্তিরই বিভিন্ন মূর্ত্তি বা রূপ। শক্তি ব্যষ্টি গুলিতে পরিণত হইয়া যায় নাই—শক্তি অখণ্ডই রহিয়াছে। গীতায় এই জন্য কথিত হইয়াছে—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ৭।১২

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ গীতা ৯।৪, ৫।

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥" ২।২৪।

এইটী বুঝিয়া উঠা নিতান্ত সহজ নহে। এইটী বুঝিতে গেলে কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, বণিতে যেরূপ খণ্ডগুলি যোগ করিলে সমষ্টি হয়, পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড সেরূপ সমষ্টি বা সমবায় নহে। দ্বিতীয়তঃ, জগতে অখণ্ডই খণ্ডের মূল, অখণ্ডের ভিতর দিয়াই খণ্ড ফুটিয়া উঠে the part is possible through the whole। ইহা অনেকটা বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব। ইহাতে সর্ব্বাংশের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ এবং সামঞ্জস্য থাকে—একাংশের ক্ষতি হইলে সমগ্রটীরই ক্ষতি হয়, সে ক্ষতির পরিমাণ যতই অল্প হউক। আমাদের জীবদেহ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তৃতীয়তঃ আর এক প্রকার অখণ্ড ভাব আছে যেমন দেশ (space) ও কাল (time) এর। দেশ ও কাল ব্যষ্টির প্রকাশের মূল, কিন্তু ব্যষ্টি গুলির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই। চতুর্থতঃ অখণ্ডের আর একটী উচ্চ ভাব আছে —এই অখণ্ডের একত্ব-নিরপেক্ষ ভাবের সহিত খণ্ডভাব আসিতেই পারে না। অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক এই নিষ্কল তত্ত্বের ধারণাই করিতে পারেন না।

পরমাত্মা সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে বিদ্যমান। তিনি যখন নিষ্কল, তখন ব্যষ্টির পরিমাণ অনুসারে তাঁহার পূর্ণত্বও খণ্ড হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে এক একটী পরমাণুতে এত শক্তি নিহিত আছে যে তাহাতে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইতে পারে। ইহা দ্বারা এই পূর্ণ ভাবের কতকটা ধারণা হইতে পারে। তিনি "সমং সর্ব্বভূতেষু" (গীতা ৯।২৯, ১৩।২৬, ২৮) "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে (শ্বেত ৬।৮ গীতা ১১। ৪৩) তাঁহার তুল্য কেহ নাই তাঁহা অপেক্ষা বড়ও কেহ নাই। "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ" যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ কিছু নাই, ক্ষুদ্র বা বড় কিছু নাই। (শ্বেত ৩।৯)। তিনি অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্—তিনি অণু হইতেও অণু, মহৎ হইতেও

মহান্। তিনি সীমায় আবদ্ধ নন, তিনি এক, অদ্বিতীয়, যখন দ্বিতীয় কিছু নাই, কাহার সহিত তুলনা হইবে? "অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ" (গীতা ১০।২০) আমি ভূতগণের আদি, মধ্য এবং অন্ত—সৃষ্টি স্থিতি লয়-কর্ত্তা। বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ" (গীতা ১৩।১৫) ভূতগণের বাহ্য এবং অভ্যন্তর, স্থাবর এবং জঙ্গম, সকলই তিনি। নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং—তোমার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই। যিনি এক এবং নিষ্কল তিনি ব্যষ্টিতে পরিণত হইতে পারেন না।

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥" গীতা ৭.২৪

গীতার ১৫।৭এ জীবকে "মমৈবাংশ" বলায় তিনি খণ্ডিত হন নাই। "একাংশেন স্থিতো জগৎ" বলায়ও অখণ্ডই রহিয়াছেন।

যিনি এক তিনি নিত্য শাশ্বত, তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। বিকার না থাকায় নির্ব্বিকার অব্যয়। তিনি সৃষ্টির অতীত।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।"

কঠ, ২।১৮, গীতা ২।২০

জন্ম না থাকিলেই "অজ"; মৃত্যু না থাকিলেই অমর বা অমৃত, অবিনাশী।

"অহং"এর ইহাই প্রকৃত স্বরূপ—এই জ্ঞানই "আত্মদর্শন", "আত্মানাত্মবিবেক", "তত্ত্বজ্ঞান", কেবল-জ্ঞান। এই জ্ঞানই অপরিশেষ অবিপর্য্যাদ্বিশুদ্ধ (সাংখ্যকারিকা ৬৪)। আমরা যাহাকে অহং বলি অর্থাৎ আমাদের এই জীব ভাব বা জীবজ্ঞান তাহা অলীক, এই অহং প্রকৃতই নাই। "এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহম্" সাংখ্যকারিকা ৬৪)। বুদ্ধদেবও তাহাই বলিয়াছেন। "ওঁ তৎ সৎ" এই 'তৎ'ই (=আত্মাই) সৎ (একমাত্র সত্য)। "তৎ ত্বমসি" তুমি সেই আত্মা। ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইলেই দেখিবে তুমি সেই আত্মা। 'আমি' 'তুমি' নাই নহে।০ আমি, তুমি, আমার তোমার স্বরূপ ভুলিয়া আছি—'আমি' 'তুমি' সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ভ্রান্ত। মায়া এবং মোহের বশে আমাদের এই ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। মায়া এবং মোহ অন্যরূপ দেখাইতেছে—এই ভেদভাব ঘুচাইতে হইবে। 'তৎ'এর প্রকৃত জ্ঞানই তৎ+ত্ব=তত্ত্বজ্ঞান। 'জ্ঞান'ই দর্শন, সাক্ষাৎকার।

"সসীম" বলিলে, তাহার আদি ও অন্ত আছে, বুঝায়। আদিই উৎপত্তি, অন্তই নাশ। ব্যষ্টি বা ব্যক্তি মাত্রেই সসীম, সুতরাং অনিত্য, জন্ম মৃত্যুর অধীন। যতদিন তাহাদের ব্যষ্টিভাব থাকিবে ততদিন জন্ম মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিবে না।

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবো জন্ম মৃতস্য চ"-গীতা,২।২৭। সকলেই ইহার প্রথমাংশ স্বীকার করেন, দ্বিতীয়টা অনেকেই স্বীকার করেন না। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে "উৎপত্তি হইলেই মরিতে হইবে"—ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে এই দুইটীর মধ্যে একটী অনিবার্য্য নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। একটী অপরটীকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। ইহাই "অপরিহার্য্য অর্থ।" মৃত্যুর পর উৎপত্তি হইবেই, উৎপত্তির পূর্ব্বেও মৃত্যু নিশ্চয়ই ছিল। যেমন দিবা ও রাত্রি—দিবার পূর্ব্বে রাত্রি ছিল, রাত্রির পর দিবা আসিবেই। যখন দিবা থাকিবে না, তখন রাত্রিও থাকিবে না। যখন উৎপত্তি নাই, তখন মৃত্যুও নাই। জন্ম ও মৃত্যু সদসৎ, দিবা এবং রাত্রিও সদসৎ। প্রকৃতি সদসৎ, প্রকৃতির রাজ্যে সর্ব্বত্র সদসৎ ভাব বিদ্যমান। দিবা ও রাত্রি relative। প্রকৃতিতে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি আছে, তাহার ফলে দিবা ও রাত্রি চক্রবৎ ঘুরিতেছে। জন্ম এবং মৃত্যুও চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। 'চিরদিন আছে' এই ভাবটীকে ক্রিয়ার দিক দিয়া দেখিলে ইহাই দাঁড়ায় যে "চিরদিন চলিয়া আসিতেছে", অর্থাৎ যাহা নিত্য তাহার সহিত একটী প্রবাহ বা continuity ভাব আসিবে। Continuityর মূল নিত্য ও একত্ব। নিত্যের প্রকাশ ভাবই continuity। প্রকৃতিই শক্তি। শক্তির প্রকাশ ভাবই ক্রিয়াশীলতা। এই জগৎ বা বিশ্ব ক্রিয়াশীল (in motion)। এই গতির বিরাম নাই, অর্থাৎ বিশ্বে প্রবাহ বা ধারা আছে। যখন মৃত্যু এই বিশ্বের নিয়ম, তখন মৃত্যু শেষ (end) হইতে পারে না। মৃত্যুর পর অবস্থা থাকিবেই। Endই অন্ত। বস্তুতঃ অন্তের পর কিছু না থাকিলে অন্তের জ্ঞানই হইতে পারে না; সীমা বলিলেই তাহার পর কিছু আছে, এই ভাব মনে উদয় হইবেই। সসীম ব্যষ্টি বা ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র রেখার ন্যায়। ঐ রেখার প্রথম বিন্দুটীকে আমরা আদি

বলি, শেষ বিন্দুটীকে আমরা অন্ত বলি। আদিরও একটি পূর্ব্বাবস্থা থাকিতে হইবে। অন্তেরও একটি পর অবস্থা থাকিবেই। অর্থাৎ একটি বড় রেখার একটি খণ্ড পূর্ব্বোক্ত রেখাটি এবং ইহা তাহার মধ্যে অবস্থিত। এই জন্য গীতা বলিয়াছেন—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"—গীতা ২।২৮

ব্যক্তের দুই দিকেই অব্যক্ত রহিয়াছে। যাহাকে আমরা continuity বলিয়াছি, তাহাই লাইবনিজের lex continui। বর্ত্তমান বা ব্যষ্টি অতীত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতের বীজও বর্ত্তমানে নিহিত রহিয়াছে। ব্যষ্টি অনিত্য বা ক্ষণিক বটে, কিন্তু অভাব বা শূন্য হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না, এবং হইতেও পারে না। যে সকল বৌদ্ধ এই শূন্যকে কারণ বলিতে চাহেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। আমরা পূর্ব্বে যে খণ্ড রেখাটীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বড় রেখাটীরই অংশ। বড় রেখাটী পূর্ব্বে অ-খণ্ড, 'এক' ছিল—তাহাতে আদি বিন্দু এবং শেষ বিন্দু যোগ করিয়া অর্থাৎ বিন্দু দুইটী আনিয়া বা বসাইয়া খণ্ড রেখা করা হইয়াছে। বিন্দু দুইটীর দ্বারা 'এক' রেখাটীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বা কাটিয়া খণ্ড রেখাটি বা ব্যষ্টিটি করা হইয়াছে। 'এক' বা অখণ্ড রেখাটিই খণ্ড রেখাটিকে সত্তা দান করিয়াছে, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? এই জন্য গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—২।১৬

এক্ষণে আর একটি কথা বিশেষ মনোযোগের সহিত ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা খণ্ড রেখাটিকে পৃথক ভাবিয়া থাকি, অর্থাৎ খণ্ড রেখাটি অখণ্ড রেখাটি হইতে পৃথক, এবং তাঁহার পৃথক সত্তা আছে মনে করি। কিন্তু তাহা কি সত্য? পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিন্দুর মধ্যে আমরা অপর এবং পৃথক একটি রেখা আনিয়াছি কি? তাহা ত করি নাই। তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে খণ্ড রেখাটির পৃথক সত্তাই নাই—তাহা অখণ্ড রেখাটি হইতেই সত্তা লাভ করিয়াছে। দুইটি বিন্দু কল্পনা করিয়া অখণ্ডের খণ্ড ভাব আনয়ন করিয়াছি মাত্র। খণ্ডের পৃথক ভাব না থাকাই পূর্ব্বোক্ত "নাস্তি ন মে নাহম্।" ইহার স্বরূপ অখণ্ডত্ব বা একত্ব। খণ্ড বা ব্যষ্টি "অনিত্য" (সাংখ্য কারিকা, ১০)। "সৎ কার্য্যম্" (সাংখ্যকারিকা, ৯)। এই দুইটি শ্লোক একত্র পর্য্যালোচনা করিলে "সৎ কার্য্যম্"-এর প্রকৃত অর্থ কার্য্য "সম্‌যক"প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাংখ্যে এবং বেদান্তে কোন বিরোধই নাই। প্রকৃতির সদ্ভাব হইতেই সত্তা, অসদ্ভাব হইতেই নাস্তিত্ব। অসদ্ভাবটিকে শূন্য বলিলে বা ধরিয়া লইলে বৌদ্ধদিগের সহিতও বিরোধ থাকে না। এই নঙ্‌ বা শূন্যটির জন্যই ব্যষ্টির পৃথক ভাব দাঁড়ায় ইহা সত্য কথা; নঙ্‌ই ভেদের কারণ, ইহাই ব্যষ্টি যে অখণ্ড, এক, আত্মা নহে, এই ভাবের জনয়িতা। "শূন্য হইতে ব্যষ্টির উৎপত্তি" ইহার প্রকৃত অর্থ "শূন্য" বা "অসৎ" হইতে ব্যষ্টির পৃথক ভাবের অনিত্য ভাবের উৎপত্তি, বুদ্ধদেবের উপদেশের ইহাই প্রকৃত মর্ম্ম। আমাদের এই ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা যতদিন কেহ না প্রতিপন্ন করেন, ততদিন আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কোন বৌদ্ধ টীকাকার তাঁহার উপদেশ বুঝিতে না পারিয়া তাহার কদর্থ করিয়া থাকিতে পারেন কিন্তু তাঁহার মতই আমরা কেন গ্রহণ করিব? কোন কোন সাংখ্যের এবং বেদান্তের টীকাকার এইরূপ কদর্থ করিয়াছেন—কিন্তু তাহাতে সাংখ্যের এবং বেদান্তের মর্য্যাদার হানি হইবে না।

বিনাশ অর্থ নাস্তি হইয়া যাওয়া নহে—ইহা কারণে লয় মাত্র, এখন সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ব্যষ্টি লইয়াই প্রকৃতির কারবার। মৃত্যুর পর ব্যষ্টিরূপে জন্মিতেই হইবে, সে ব্যষ্টির যে আকারই হউক। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে, সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যতদিন না মুক্তিলাভ হয়, ততদিন জীবকে যে বহুবার জন্ম এবং মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে ইহা বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সত্য।

পূর্ব্বোক্ত বড় রেখাটিতে দুইটী বিন্দু আনায় বা স্থাপন করায় ঐ রেখাটী যেন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম বিন্দুর পূর্ব্বাংশই অতীত, দুইটী বিন্দুর মধ্যাংশই বর্ত্তমান, এবং শেষ বিন্দুটীর পরবর্ত্তী অংশ অনাগত বা ভবিষ্যৎ। অতীত এবং ভবিষ্যৎ এই দুইটীই অব্যক্ত। তাহা হইলে এই তিনটী বড় রেখাটীর ৩টী অবস্থা দাঁড়াইতেছে। এই তিনটী অবস্থার কোনটীই স্থায়ী নহে, এই জন্যই অনিত্য। বড় রেখাটী অখণ্ড, অর্থাৎ খণ্ডের বিপরীত। তাহা

আনন্ত্যেরও বিপরীত সুতরাং নিত্য। পূর্ব্বোক্ত তিনটী অবস্থা এই নিত্যটীরই এবং অখণ্ডেরই অবস্থা। নিত্যটী বা অখণ্ডটী এই তিনটী অবস্থার মূল, এবং সেটী না থাকিলে, এই তিনটীর অনুভূতিও হইত না। পাতঞ্জল যোগসূত্রে এই তিনটী অবস্থাকে "অধ্ব" বলা হইয়াছে (৪।১২)। এই নিত্য ভাবটি লক্ষ্য করিয়াই গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি
নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি
নবানি দেহী"—২।২২।

একটী অখণ্ড, নিত্য, সূত্র বা continuityর অধিষ্ঠান ভিন্ন যে ব্যষ্টিগুলির অস্তিত্ব এবং প্রকাশ অসম্ভব, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে। "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" (গীতা ৭।৭), কিন্তু এই নিত্য ও অনিত্য ভাবটী বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন। পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক দৃষ্টি মিশামিশি করিলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে প্রকৃতি নাই বা থাকেন না—সৃষ্টির কথাই উঠিতে পারে না। ইহা প্রকৃতির অতীত অবস্থা। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" (গীতা ৭, ১৪)।

সৃষ্টির দিক দিয়া দেখিলে আত্মা অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ বা যোগ প্রতীয়মান হয়—তখন আত্মা সগুণ। প্রকৃতিও সদসৎ। পূর্ব্বে আমরা যে অখণ্ড বা 'এক' রেখার কথা বলিয়াছি, তাহা অনেকটা পরব্রহ্মের স্বরূপ ধরিয়া লইলে 'অখণ্ড' বা 'নিষ্কল' বা 'অব্যক্তের' অর্থ দাঁড়ায়—"যাহার কস্মিন্ কালে খণ্ড হইতে পারে না।" ঐটিতে যখন আমরা দুইটি বিন্দু সংযুক্ত করিলাম, তখন ঐটীতে দুইটী ভাব আসিল—(১) একটি, পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড ভাব (২) অপরটি, তাহার সহিত খণ্ডোৎপত্তি-যোগ্যতা ভাব। দ্বিতীয়টিই হইল প্রকৃতি, চৈতন্যের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ রহিল, কিন্তু চৈতন্যটি অপ্রকাশ এবং গূঢ় হইয়া রহিলেন; তাঁহার অস্তিত্ব আমরা অনেকে উপলব্ধিই করিতে পারি না। যোগমায়া তাঁহাকে আবরণ করিয়া রহিলেন। (গীতা, ৭।২৫) প্রকৃতিতে পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিন্দু এরূপ সুপ্তভাবে রহিল যে ঐ রেখাটিকে অখণ্ডই আমরা দেখিলাম, কিন্তু এই অখণ্ডভাব নিরপেক্ষ নহে, অখণ্ডের সহিত খণ্ডোৎপত্তি-যোগ্যতা রহিল। খণ্ডোৎপত্তি যোগ্যতা অর্থ খণ্ডোৎপাদনশক্তি। প্রকৃতিতে এই শক্তি সুপ্ত হইয়া রহিল। এই অবস্থাই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা (equilibrium)। এই যোগ্যতার জন্যই প্রকৃতি প্রসবধর্ম্মী (সাংখ্যকারিকা, ১১) পুমান্, পুরুষ, চৈতন্য, পরব্রহ্ম তাহার বিপরীত। প্রকৃতি অব্যক্ত, কিন্তু ব্যক্তপ্রসূ অব্যক্ত, কিন্তু এই অব্যক্তের অর্থ ব্যক্ত তাহা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না (গীতা, ৭।২৪, গীতা ৮।২০)। প্রকৃতির সহিত আমরা যে সকল বিশেষণ সংযুক্ত করি, সেগুলি পুরুষে প্রয়োগ করিতে হইলে, তাহাদিগের ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা আমাদের শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বোধগম্য হইবে না। প্রকৃতি আপেক্ষিকতার মূল, পুরুষ নিরপেক্ষ একথাটি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে।

সুপ্ত শক্তিটির যখন বিকাশ হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিন্দুর মধ্যাংশ, অর্থাৎ মধ্যস্থিত রেখা, যাহা পূর্ব্বে অস্ফুট ছিল, তাহা পরিস্ফুট হয়। তখন এই রেখাটি ব্যক্ত বা ব্যষ্টি নামধারণ করে, এবং পৃথক বলিয়া প্রতীতি হয়। পৃথক জ্ঞান করিলেই পূর্ব্বোক্ত অখণ্ড রেখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। যদি বিন্দু মধ্যস্থিত রেখাটি ছিন্ন হইয়া সরিয়া আসিয়াছে বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে অখণ্ডটির বিন্দু মধ্যস্থিত অংশ শূন্য হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু প্রাকৃতিতে শূন্যভাব (gap বা vacuum) নাই। তাহা হইলে ভাবিতে হইবে যে অখণ্ডটী খণ্ড বা ছিন্ন হইলেও অখণ্ড থাকিয়া যায়। প্রকৃতির এই অখণ্ড ভাব অখণ্ড চৈতন্য হইতেই আসিতে পারে, চৈতন্য সম্পর্ক ব্যতীত আসিতেই পারে না। ব্যষ্টিটী যদি অখণ্ড রেখাটী হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহাতে সম্বদ্ধ রহিয়াছে ভাবা যায় তাহা হইলেও সেই অখণ্ড ভাব অক্ষুন্ন রাখিয়া পার্থক্য এবং দ্বৈত ভাব আনিতে হইবে। তখনও চৈতন্য-অধিষ্ঠাতৃত্ব আসিবে।

আমরা পূর্ব্বে যে অখণ্ড রেখাটীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহা পরব্রহ্ম বা প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, কারণ রেখাটির রূপ আছে তাহা সৃষ্টির পরেই উপলব্ধ হইতে পারে। রূপই manifestation মহানের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা অপ-রূপ? ব্যক্তেরই রূপ আছে। দৃষ্টান্ত ভিন্ন আমাদের কোন বিষয় বুঝা কঠিন এই জন্য উক্ত রেখাটীর

অবতারণা। দৃষ্টান্ত দিলেই যে সর্ব্বাংশে সেটি খাটিবে এরূপ আশা করাও সঙ্গত নহে।

চৈতন্যের সহিত প্রকৃতির যোগ ব্যতীত যে সৃষ্টি হইতে পারে না তাহা আমাদের সকল শাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে। এখন চৈতন্যকে অথবা প্রকৃতিকে কারণ বা সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইবে তাহা লইয়া বহু বাদানুবাদ চলিয়া আসিয়াছে। প্রকৃতি এবং চৈতন্যের যোগই বড়ই গোলযোগের এবং বিসম্বাদের কারণ হইয়া দাঁড়িয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে চাই না, কারণ তাহা করিতে গেলে দুই তিনটি প্রবন্ধ হয়। এই কথা বলা যাইতে পারে যে সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতিকে কারণ বলা হইয়াছে, বেদান্ত প্রভৃতিতে চৈতন্যকে কারণ বলা হইয়াছে। মহর্ষি কপিল প্রকৃতি অচেতন বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে অচেতনের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, এই জন্য সৃষ্টিকার্য্য চৈতন্যকেও আনিয়াছেন (সাংখ্যকারিকা ১৮–২০)। যদিও তিনি পরে ৫৭ শ্লোকে অচতনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা কেবল চৈতন্যের অকর্ত্তৃত্ব নির্গুণত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে। তিনি যোগটিকে সান্নিধ্যই বলুন বা অপর কিছুই বলুন চৈতন্য ও প্রকৃতির সম্পর্ক একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। প্রকৃতিকে অচেতন, জড় বা দৃশ্য বলিলেই এবং পুরুষকে দ্রষ্টা এবং ভোক্তা বলিলেই সম্বন্ধ আসিল, আপেক্ষকত্ব আনিয়া পড়িল (সাংখ্যকারিকা ১৭ ১৯)। সাংখ্যকরিকা ২০ শ্লোকে বলিতেই হইয়াছে যে পুরুষ সংযোগে অচেতন লিঙ্গ চেতন বিশিষ্টের ন্যায় এবং গুণকর্ত্তৃত্ব সত্ত্বেও উদাসীনকে কর্ত্তার ন্যায় বোধ হয়। ইহাই মায়ার কার্য্য কিন্তু ইহাতে নির্গুণের উপর মায়ার প্রভাব স্বীকার করিতেই হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইবে যে বেদান্তাদির সহিত সাংখ্যের বিশেষ মতভেদ নাই। বৃথা শব্দ লইয়া বিবাদ—মূলতঃ প্রভেদ অতি অল্প বা সামান্য। প্রকৃত কথা এই যে সৃষ্টির দিক দিয়া দেখিলে চৈতন্যের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ স্বীকার না করা বড়ই কঠিন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে চৈতন্যের সহিত কাহারও সম্বন্ধ বা সম্পর্ক থাকিতে পারে না—তাহাই নির্ব্বাণ বা মুক্তি। গীতায় এই সকল মতেরই উল্লেখ আছে এবং পুরুষোত্তম বা নির্গুণ ভাবটিকেই বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে।

"যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥
১৩২৬, ৭ ৪–৬

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৪।৬
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামামিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥
৯।৮, ১৪।৩, ৭, ১০।৮

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয়! জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥
১।১০, ৯।১৮, ১০।৩৯

যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসা স্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ৭ ॥১২
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥
১৩।২৯, ১৪।১৯, ১৮।১৬, ৫।১৪, ৩।২৭, ১৮

পরমাত্মা যে নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, কেবল, নিরঞ্জন, তাহা পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি। নিরপেক্ষতা এবং অপেক্ষিকতার মধ্যে আমরা গোলযোগ করিয়া থাকি। আপেক্ষিক ভাবকে নিরপেক্ষ বিবেচনা করি এবং তর্কেরও পরিসমাপ্তি হয় না। আপেক্ষিক ভাব হইতেই বা দিয়াই আমরা নিরপেক্ষতার অনেকটা উপলব্ধি করি, ইহা সত্য। কিন্তু দুইটিকে অভিন্ন মনে করিলেই ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। সকলেই জানেন যে সৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ, কিন্তু এই সৎ নিরপেক্ষ, ইহা অসতের বিপরীত সৎ, অর্থাৎ আপেক্ষিক সৎ নহে, অভাবে বিপরীত ভাব নহে। ইহা ভাব ও অভাবের অতীত। আপেক্ষিক সৎ সম্বন্ধে গীতা ৯।১৯, ১১।৩৭ দ্রষ্টব্য—নিরপেক্ষ সৎ সম্বন্ধ "সদসত্তৎ-পরঞ্চ সৎ" (১১।৩৭) অনাদিসৎ পরংব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে (১৩।১২) দ্রষ্টব্য। আপেক্ষিক 'অক্ষর' সম্বন্ধে গীতা ১৫।১৬ দ্রষ্টব্য, এস্থলে অক্ষর জীব, কূটস্থ—নিরপেক্ষ অক্ষর সম্বন্ধে গীতা ৮।২১, ১১।১৮ দ্রষ্টব্য। অচল শব্দ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। গীতা ২।২৪এ ইহা দেহী বা জীবাত্মা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা অব্যক্ত নিত্য প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী বলিয়াছেন পরব্রহ্ম 'সাকারও নহেন 'নিরাকার'ও

নহেন, তিনি যাহা তাহাই। তাঁহার কথার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, যদি 'নিরাকার' শব্দ 'সাকারের' বিপরীত অবস্থা আমরা মনে করি, তাহা হইলে পরব্রহ্ম আপেক্ষিকতার মধ্যে আসিয়া পড়েন, তিনি নিরপেক্ষ হইতে পারেন না। আর অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই নিরপেক্ষ সত্তাকে 'শূন্য' বলা হইয়াছে। এই সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "যতো বাম নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" তৈত্তিরীয় ২।৪।

এই নিরপেক্ষ অবস্থাই কৈবল্য বা মুক্তি। এই অবস্থাই oneness, monism, অদ্বৈত। ইহাতে দ্বৈত বা দ্বন্দ্বের সম্পর্ক থাকিতে পারে না, এবং প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

গীতা ২।৪৫, ৪। ২২, ৫।৩ ৭।২৮, ১১।৫৫, ১২।১৩-২০, ১৩।২৮, ১৪।২, ১৯ প্রভৃতি।

উপনিষৎ সংগ্রহ হইতে এতৎ সম্বন্ধে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। উপনিষদের সার কথা গীতাতে আছে।

ইহাই পরম পদ।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

গীতা, ৮।২১ ; ৮।১৬ ; ১৩।২৩, ১৪।২৬ ; ১৫।৬ ; ১৫।৫।

পরব্রহ্মকেই "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" বলা হইয়াছে (শ্বেত, ৩।২০। গীতা, ৮।৯) ; গীতা, ১৩।১৭।

ইহা "প্রকৃতেঃ পরঃ।" প্রকৃতিকে অতিক্রম না করিলে, আপেক্ষিকতা অতিবর্ত্তন না করিলে, সংসৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই।

"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥"

গীতা ৮।১৮, ১৯ ; ৯।৭ ; ১৪।২, ১৯

প্রকৃতি বা অব্যক্ত, কারণ বা বীজাবস্থা। ব্রহ্মলোক হইতেও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় (গীতা ৮।১৬)।

বীজ জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না। (গীতা, ৪।১৯)। ইহাই নির্বীজ সমাধি (পাতঞ্জল যোগসূত্র ১।৫০)। ইহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি।

ইহা যখন নিরুপাধি অবস্থা তখন বিশিষ্টতা, ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে না। উপাধির জন্যই জীবভাব। উপাধি শূন্য হইলে জীবভাব অপগত হয়। তখন জীব ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে। "কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেঃ" (যোগসূত্র ৪।৩৪)। "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" (যোগসূত্র ১।৩)। যখন সৃষ্টিভাব বা প্রকৃতি ভাব লয় হয়, তখন "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ," "দ্বৈতাদ্বৈতাবাদ" প্রভৃতি পরমতত্ত্ব হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। জীবত্বই যখন থাকে না, তখন রসের অনুভূতি থাকিতে পারে না, ভোক্তৃভোগ্য ভাব থাকিতে পারে না। জীব তখন রস-স্বরূপ হইয়া যায়। যখন ক্রিয়াটির লয় হয়, তখন একমাত্র নিরপেক্ষ, নিত্যময়, আনন্দময় সত্তাই থাকে। তখন সকল ভাবেরই অবসান হয়, তখন "শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" বৌদ্ধ শাস্ত্রেও এই অদ্বৈত মহাশক্তির উল্লেখ আছে। সবিকল্প সমাধির অবস্থায় ইহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা তৎপরবর্ত্তী অবস্থা।

অনেকে নিবৃত্তি মার্গের নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন, কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে নিবৃত্তিমার্গ ভিন্ন উন্নতি হইতেই পারে না। উন্নতি না হইলে মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। তাহা বলহীনের লভ্য নহে। সর্ব্ববিধ মুক্তিই মানসিক বলের দ্বারাই লাভ করা যাইতে পারে, তাহার অন্য পন্থা নাই। মানসিক বল অর্জ্জন করিতে গেলেই আত্মসংযম আবশ্যক। তাহা বহু আয়াস-সাপেক্ষ। যাহার আত্মসংযমের মাত্রা অধিক, সেই বীর। পাশব বল সামাজিক হউক আর রাজনীতিকই হউক—তাহাকে এক পদও হটাইতে পারে না। "হাততালি" তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না, বিদ্রূপ উপহাসও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। ইদৃশ বীরেরেই ভগবৎ স্বরূপতা লাভ ঘটিয়া থাকে—বসুন্ধরা ত ভোগ্য বটেই। স্বাধীনতা ভিক্ষা লভ্য নহে, নিজের সামর্থ্যে কাড়িয়া লইতে হয়।

(সমাপ্ত)

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তথাপি বাঁচিতে হবে

যদিও চরণ ক্লান্ত, কম্পমান, নাহিক শকতি
বহিতে বিবশ দেহ, ক্ষীণ দৃষ্টি ক্ষণে বেধে যায়
অনিশ্চিত শঙ্কা অন্ধকারে. থামে যেন দৃষ্টি গতি
শীতের কুয়াসা মাঝে প্রভাতে কি গুমট সন্ধ্যায় !
তন্দ্রাভারে আনমিত শিশুদেহ সম মোর আজ
দেহের বিকল তন্ত্রী। দিনান্তে ভিক্ষুক ক্ষিপ্র যবে—
পথপার্শ্বে চুল্লি জ্বালি সাজ করি নিত্যকার কায
দিবসের ভিক্ষালব্ধ অন্ন পাক করিছে নীরবে,
উন্মুখ হইয়া ফিরে সমস্ত পরাণ মত তার,
যতবার ফোটে জল চিতে বাড়ে ক্ষুধা তত বেগে ;
সংসা ফাটিয়া পাত্র অগ্নিগর্ভে সমাপ্তি তাহার
নিরন্ন আতুর আর্ত্ত স্বপ্ন যেন দেখে জেগে জেগে !
—তথাপি বাঁচিতে হবে—বিনিদ্র রজনী করি ভোর
মহামৃত্যু তোরণের নব সজ্জা রচি অনিবার
স্মৃতির মালিকা গাঁথি দুর্ভাগ্যের এই রুক্ষ ডোর
ভরিতে হইবে নিতি !

সায়াহ্নের চিতাবহ্নি সন্ধ্যামেঘে আঁকিছে আপন
নিরুদ্ধ বক্ষের চিত্র। যতদূর দৃষ্টি যায় চলে—
কি বিরাট বন্ধ্যা মাঠ—নাহি তৃণ, নাহি আচ্ছাদন !
নাহি জনপ্রাণী সাড়া। তারি মাঝে তপ্ত পথতল
আমার নিঃশব্দ যাত্রা ; একাকী নির্জ্জনে অবিরত
কাকুতি সঙ্গীত আর অন্তরের আর্ত্ত হাহাকারে
বাঁচিবার আশা আজ আশঙ্কায় হল পরিণত—
তথাপি বাঁচিতে হবে !

সুষমা যা ছিল বুকে গেছে তাহা গলি অশ্রুজলে
গোলাপ নির্য্যাস সম ; আজি শুধু রিক্ত প্রাণহীন
শীতান্তের শুষ্কপত্র কুহেলির আবরণ তলে
রচিছে মরণ শয্যা সঙ্গোপনে বিশীর্ণ মলিন।
সন্ধ্যা প্রলেপে স্নিগ্ধ দিবসের পাণ্ডুর আকাশ,
তারায় তারায় তার ফুটাইতে হবে মধুহাসি—
শোকতপ্ত ক্লিষ্ট বুকে উদ্বেলিয়া আনন্দ আভাস
বলিতে হইবে নিতি এ জীবন বড় ভালবাসি !

তথাপি বাঁচিতে হবে ? বাঁচিবার কিবা প্রয়োজন ?
হৃদয়ের পঞ্জরেতে আকাঙ্ক্ষার তুষানল জ্বালি
বাসনা-গেরুয়া বাসে সাজাইয়া নবীন যৌবন
ভস্ম লেপি দেহময় ? শৈশবেই করিয়া বৈকালী
প্রভাতে আপনা গড়ি চূর্ণ করি পলকে সন্ধ্যায়
সুনিশ্চিত যাত্রাপথে ছিন্ন কলি সম বার বার—
অসহায় শুষ্ক প্রাণ নিঃশেষিয়া লুটায় ধূলায়,
তথাপি বাঁচিতে হবে ? সহে কার ? বল ! সহে কার ?

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দী কবি বিহারীলাল

[মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৮শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা চৈত্র১৩৩৩। পৃঃ ৩৩-৩৮]

কবি বিহারীলাল সম্বৎ ১৬৯২ [ঈশাব্দ ১৬৩৫] আমেরে আসিয়া রাজসভার কবি ও কুমার রামসিংহের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ও সম্বৎ ১৭১৭ [ঈ ১৬৬০] ২৫বৎসর পরে তাঁহার কাব্য "সৎসঈ" [সপ্তশতী] শেষ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্বৎ ১৭২৩ [ঈ ১৬৬৬] জয়সিংহের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার পরের অনেক ঘটনা কবিতাতে বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ পুস্তক শেষ করিবার পর, নূতন কবিতা যোগ করিয়া পুরাতনের মধ্যে

করিয়া দেখিতে পাইলাম, দুর্গ-অভিমুখে যাইবার সময় ডাহিন দিকের বৃহৎ প্রাচীর হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়া প্রস্তত হইয়াছে। প্রাচীরের গাথুঁনীর মধ্যে কোথাও বুদ্ধ, কোথাও বিষ্ণু, কোথাও গণেশ, কোথাও গরুড় মুর্ত্তি দেখিতে পাইলাম।

বাম দিকে একতলা সমান উচ্চ বৃহদাকার চতুষ্কোণ হাউজ। নামিবার উঠিবার ২২টী করিয়া সোপান শ্রেণী নানা দিকে রহিয়াছে। জল আসিবার প্রণালী-পথ রহিয়াছে। এখন আর ইহাতে জল রাখা হয়না, এই জন্য ভিতরটা অপরিচ্ছন্ন।

কিছু দুর আসিয়া চাঁদামনারের নিকট উপস্থিত হইলাম। চাঁদামিনার ২১০ ফুট উচ্চ। —তাহার বেড় ৭০ ফুট— সময় পাইলে, পরে চাঁদ মিনারে উঠা হইবে ভাবিলাম। দ্বিতায় সিংহদ্বার অতিক্রম কারয়া সিড়ি, তার পর কিছুদুর সমতল। এইরূপে দুর্গের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দুর্গের চতুর্দ্দিকে গম্বুজ বিশিষ্ট দ্বিতায় প্রাচার। প্রাচীরের উপর সৈন্যদের চলিবার ফিরিবার মত প্রশস্ত পথ, এখন কণ্টকবনে আবৃত হইয়া আছে। সেই দুর্গপ্রাকারে ও গম্বুজের উপর অসংখ্য কামান এখনও রক্ষিত আছে।

একটী গম্বুজের উপর উঠিয়া কামান দেখিলাম। ইহা আওরঙ্গজেবের কামান। এক দিকে মেষের মুখ আঙ্কত আছে। এই তোপ মেড়া তোপ নামে পরিচিত। কামানের গাত্রে আবুল হসান মহম্মদ আওরাঙ্গজেব বাহাদুর লিখিত আছে। ইহাও ডাচ কারিকরের হস্তে নির্ম্মিত। ক্রমশ অনেক খানি উচ্চে উঠিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম কারতে বাসয়া পড়িলাম। পুত্র কন্যা বধূ সকলেই দুর্গের উপরে উঠিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে তাহাদের দেখা পাওয়া যাইতেছে। আমি ও উনি একটা ছায়ায় বাসয়া কিয়ৎক্ষণ শ্রান্তিদুর কারলাম। এক পার্শ্বে একটী উচ্চ ক্ষুদ্র প্রাসাদ। ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইহার নাম চিনি মহল। এই মহলে গোলকুণ্ডার রাজাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহাকে নাকি ভিজা ছোলা খাইতে দেওয়া হইত। অন্য পার্শ্বের বৃহৎ প্রাসাদ ভগ্নস্তুপে পরিণত হইয়াছে। প্রকাণ্ড হল বা দরবার গৃহ, উপর তলা ভাঙ্গা পড়িয়াছে। চতুষ্পার্শ্বের ভিত্তি মাত্র দাঁড়াইয়া আছে।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া তৃতীয় সিংহদ্বার পথে প্রবেশ করিলাম। এখন ক্রমেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া চলিয়াছি। পাহাড়ের ধার কাটিয়া এই প্রশস্ত সোপানপথ প্রস্তুত হইয়াছিল। উনি বলিলেন একদিন এই পথ দিয়া কত অশ্বারোহী সৈন্য কত বীর যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে, এবং এই সকল দুর্গ দ্বার রক্ষা করিতে কত শত বীর সৈন্য প্রাণ হারাইয়াছে, এই সকল পথ একদিন মানুষের রক্তধারায় প্লাবিত হইয়াছিল, বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে এই বিশাল দুর্গ শত্রুহস্তে কেহ দেয় নাই।

অতীত কালের চিন্তা করিতে করিতে সোপান শ্রেণী অতিবাহিত করিয়া চলিলাম। সোপান শ্রেণীর পার্শ্বদেশে অশ্বগণের জলপানের জলাধার এখনও দুই একটী গাঁথা আছে। সোপান শ্রেণী এখানে বেশ প্রশস্ত। দশটী করিয়া অশ্বারোহী এক লাইনে নামিয়া যাইতে পারে। চতুর্থ সিংহদ্বারের চিহ্ন পাওয়া গেল, দ্বার নাই, বৃহৎ হুড়কার ছিদ্র-চিহ্ন ও হুড়কার গলিত অবশেষ রন্ধ্রপথে এখনও আছে। পার্শ্বদেশে খিলান দেওয়া বারান্দা, এখানে নাকি বারুদ থাকিত। এই রূপ অনাবৃত স্থানে বারুদ রাখার গল্পটা বিশ্বাস হইল না। এই স্থান হইতে দুর্গ রক্ষকের সহিত আমরা অগ্রসর হইয়া চলিলাম। খানিকটা সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া নামিয়া একটী নূতন কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া অগ্রসর হইলাম। উপরে খাড়া পাহাড়, নিম্নে গভীর পরিখা। রক্ষক কহিল এই স্থানে কিছুদিন পূর্ব্বেও, প্রয়োজন মত তুলিয়া লওয়া যায় এরূপ সেতু ছিল।

পরিখার জল সবুজ রঙের। অতি গভীর, চাহিতে

পরিখায় চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত আছে। প্রাচার এখনও ভগ্ন কিংবা নষ্ট হইয়া যায় নাই, শুধু বনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দুর্গের তৃতীয় প্রাচীর। সেতু পার হইয়া কয়েকটী সোপান অতিক্রম করিয়া একটী অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথের সম্মুখে আসিয়া পঁহুছিলাম। এই স্থানে রক্ষক একটী মশাল প্রজ্জলিত করিল। বৃষ্টিপাতের জন্য সুড়ঙ্গ পথ কর্দ্দমাক্ত হইয়া রহিয়াছে। রক্ষক সাবধানে আমাদের পথ দেখাইয়া চলিল। আমরা তাহার

পশ্চাতে এক অনমুভূত আবেগ পূর্ণ হৃদয় লইয়া অনুগমন করিলাম। একটা বাঁক ঘুরিবার পর আবার সূর্য্যালোক নয়নগোচর হইল।

শুনিলাম কিছুদিন পূর্ব্বে বড়লাট সাহেব এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সুবিধার জন্য সুড়ঙ্গ পথে আলোক আনিবার জন্য রন্ধ্র প্রস্তুত হইয়াছিল। এবং কয়েকটী চূণ বালি নির্ম্মিত সোপানও গঠিত হইয়াছিল। পর্ব্বত গাত্র কাটিয়া যে পুরাতন সোপান শ্রেণী ছিল তাহার কিছু অংশ ভগ্ন হওয়াতে এই সোপান কয়েকটী ধরিয়া উঠিবার জন্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত রেলিং দেওয়া হইয়াছে।

সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করিয়া এইবার আমরা উপরে উঠিলাম। এই স্থানে একটী লৌহ-নির্ম্মিত দ্বার আছে। পূর্ব্বে শত্রু আক্রমণের সময় এই দ্বার ফেলিয়া দিয়া ইহার উপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইত। তখন এই অগ্নিময় দ্বার অপসারিত করিয়া শত্রুপক্ষের প্রবেশ সম্ভাবনা রহিত না। লৌহদ্বার অতিক্রম করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রশস্ত চত্বরটির উপরে বসিয়া পড়িলাম। এখনও অর্দ্ধপথ আসি নাই, কিন্তু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

রক্ষকের মুখে এখনও অর্দ্ধপথ উঠি নাই শ্রবণ করিয়া উনি কহিলেন, "আর কেন? এইবার চল আমরা নীচে নামিয়া যাই।" কিন্তু আমার তাহা মনঃপূত হইল না। শৈশবে পঠিত সেই কবিতাটি মনে পড়িল,—

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘপথ?
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ।

শৈশব হইতে কত দুর্গ কাহিনী কত যুদ্ধকথা পাঠ করিয়া আসিতেছি, এত দিন দুর্গের কল্পনা যাহা মনোমধ্যে ছিল, বাস্তব দর্শনে তাহা কোথায় অপসারিত হইয়া গিয়াছে।

কি চমৎকার পরিকল্পনায় এই সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল! সুড়ঙ্গ পথটি অতি আশ্চর্য্য ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেকালে দেব-গিরির মত দুর্ভেদ্য দুর্গ কমই ছিল। ৮টি প্রাচীর দিয়া দুর্গ ঘেরা, তার উপর গভীর পরিখা, পার হইবার একটি মাত্র সেতু। পরিখার পাশে পাহাড়ের গা কাটিয়া ছুলিয়া ভিত্তির ন্যায় মসৃণ করা হইয়াছিল। ১৫০ ফুট উচ্চতা পর্য্যন্ত এইরূপ। তাহার উপর পাহাড়ের গায়ের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ-পথ পেঁচানো ভাবে তৈয়ারী। সুড়ঙ্গের উপর লৌহদ্বার ফেলিয়া দিলে আর উপরে উঠিবার উপায় রহিল না। যাহারা ইলোরা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এই দুর্গও যে তাহাদের হস্তনির্ম্মিত, তাহা বেশ বোঝা যায়। বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া এই দুর্গ যুদ্ধে জয় করিয়া নেওয়া কোনও দিন সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। ১২৯৫ খৃঃঅব্দে আলাউদ্দীন প্রথম এই দুর্গ অতর্কিত ভাবে আসিয়া জয় করেন এবং তাহার পর বহু রাজার হাতে ইহা ফিরিয়াছে।

এই দেবগিরি দুর্গ প্রথমে হিন্দু হস্তেই নির্ম্মিত হয়, হিন্দু স্থপতি দ্বারা ইহার সকল কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল, ইহা সহজেই মনে হয়। এখন অবশ্য হিন্দু-রাজ্যের সামান্য ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। দুর্গের উপর তলে যে দরবার প্রাসাদ আছে তাহা বাদশাহ আওরঙ্গজেব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

ওঁকে বহুবার উপরে উঠিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু উনি আর অগ্রসর না হইয়া রক্ষকের সহিত নিম্নে নামিয়া গেলেন। আমি অন্য একটি পথ-প্রদর্শকের সহিত ধীরে ধীরে সোপান অতিক্রম করিয়া চলিলাম। পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া এই প্রশস্ত সোপান শ্রেণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে চত্বর প্রাঙ্গণ আছে। এই দুর্গ ৬০০ ফিট উচ্চ।

ক্রমে আমি একটি প্রশস্ত ছাদের মত চত্বরের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি কামান প্রান্তদেশে সাজানো আছে। একটা মকরমুখ কামান, ঘোরানো ফেরানো যায়, চক্রবিশিষ্ট আধারের উপর স্থাপিত আছে। এই স্থানে ছায়ায় বসিয়া আবার কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম।

অর্দ্ধ পথের বেশী উঠিয়াছি। এখান হইতে দৌলতাবাদের শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ বিস্ময়াকুলচিত্তে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছি। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। বনাকীর্ণ অগণিত ভগ্ন গৃহ, মন্দির, সৌধ, বিপণি, পথ জন-মানবহীন নিস্তব্ধ শ্মশানে যেন কিসের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। শকুনির কর্কশ স্বর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। চিলের করুণ চীৎকার, ও ঘুঘুর উদাস ডাক অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। মহাকালের ধ্বংসলীলা মন-প্রাণকে ব্যাকুল বিষাদান্বিত করিয়া তোলে।

প্রায় উপরিতলে উঠিয়া আসিয়াছি, এমন সময়

পুত্র-কন্যাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা নানা কথা আলোচনা করিতে করিতে নামিয়া আসিতেছে। উহারা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "এঁ্যা! মা উঠে এসেছেন?"

আমি ধীরে ধীরে চলা-ফেরা করি বলিয়া, ছেলেদের সহিত আমি কথনই অত উচ্চে উঠিতে পারিব না বলিয়া পূর্ব্বে কথা হইয়াছিল। উহারা আমার হাত ধরিয়া আবার দুর্গশীর্ষে চলিল। আওরঙ্গজেব কৃত বিশাল অষ্ট-কোণ বিশিষ্ট দরবার-গৃহ, বৃহদাকার প্রাঙ্গণ পার হইয়া দেখিতে দেখিতে চলিলাম। অত উচ্চ স্থানেও কূপ আছে।

এক প্রান্তে মন্দিরশীর্ষ দেখিতে পাইলাম। হিন্দু আমলে প্রস্তুত, নামিবার জন্য পুরাতন পথ আছে। কিন্তু আমাদের আর সময় ছিল না, সে জন্য উহা দেখা ঘটিল না।

দুর্গশীর্ষে বৃহৎ কামান রক্ষিত আছে, তাহার একটীর নাম শ্রীদুর্গা। অপরগুলির নাম বালা হিন্দ শা তোপ, ধুল ধান, মগম জীকী নন্দদান, নামজী রুদ্রনাথ ইত্যাদি।

কামানের গাত্রে দেবনাগরী অক্ষর ক্ষোদিত আছে। আমার পঁহুছিবার পূর্ব্বে কামানের পার্শ্বে বসিয়া ছেলে মেয়েরা ফটো তুলিয়াছিল। কালাপাহাড় নামে আর একটি প্রকাণ্ড কামানও এখানে আছে।

অন্য পাহাড়ে বৃষ্টির আরম্ভ দেখিতে পাইয়া আমরা ত্বরিত পদে ফিরিলাম। উঠিতে যে সময় লাগিয়াছিল, তাহার সিকিভাগ সময় মাত্র নামিতে লাগিল।

পথপ্রদর্শকদের পারিতোষিক দিয়া মোটরে আমরা ধর্ম্ম-শালায় ফিরিলাম। আজই আমাদের ফিরিতে হইবে। পথে বৃষ্টিতে যদি পার্ব্বত্য নদীগুলিতে বন্যা আসে, তাহা হইলে, মোটরে যাওয়া কঠিন। আমাদের আহার্য্য প্রস্তুত ছিল। শীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া আমরা ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

ঔরঙ্গাবাদ সহর মালিক অম্বর প্রতিষ্ঠিত। নিকটে আরও গুহা আছে এবং দেখিবার জিনিষ আছে। সময় না থাকাতে আমাদিগকে ফিরিতে হইল।

মোটরে উঠিয়া আবার সেই পথে চলিয়াছি, কিন্তু নিতান্ত অবসন্ন হৃদয়ে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার সেই দুধনা নদীর তীরে। ক্ষীণকায়া নদী বিশাল-কায় হইয়া গভীর জলরাশি উচ্ছলিত করিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নদীতে কানায় কানায় জল, তীর ছাপাইয়া নানা কণ্টক বন বহন করিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া গিরি-দুহিতার সেই অপূর্ব্ব স্রোতের খেলা দেখিলাম। স্থানীয় লোকেরা কহিল আজ তিনদিন বান আসিয়াছে, এখন জল ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, রাত্রের মধ্যে জল কমিলে ভোর বেলা মোটর পার করা যাইতে পারিবে।

নিজাম রাজের পুলিশ থানায় রাত্রে আতিথ্য গ্রহণ করা গেল। থানার সম্মুখে দুটি কামান রক্ষিত আছে। রাত্রে আহারাদি সারিয়া যখন শুইলাম, তখন প্রায় ১২টা। আগতপ্রায় বর্ষার বন্দনা গীতিতে ভেকের দল তখন ঐকতান জুড়িয়া দিয়াছে। তাহার সহিত ঝিঁঝির সুর এক বিচিত্র শব্দঝঙ্কার তুলিয়াছে। বাতাসে থানার পার্শ্বের ঘর হইতে একটা গোঁ গোঁ শব্দ আসিতেছিল ও একটা মধ্যবর্ত্তী দ্বার খট খট শব্দে নড়িতেছিল। দুটি মেয়ে কহিল, মা বোধ হয় ভূত আছে। তাহাদের ওসব বাজে ভয় করিতে নিষেধ করিয়া নিদ্রামগ্ন হইলাম।

ভোর চারিটায় সংবাদ পাওয়া গেল, নদীর জল কমিয়া গিয়াছে। আমরা অন্ধকার থাকিতেই শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলাম। প্রায় ৩০জন লোক মোটরকে নদী পার হইতে সাহায্য করিল। সাহায্য কারীদের বকশিশ দেওয়া গেল। মোটর পূর্ণ বেগে গৃহ পানে ছুটিল। পথে দেওলগাঁয়ে গো-আশ্রম হইতে দুধ কিনিয়া, বাজার হইতে গরম জিলিপি কিনিয়া ছোট বড় সকলেরই জলযোগ হইল। বাড়ীতে আসিয়া যখন মোটর প্রবেশ করিল বেলা তখন প্রায় ২॥টা বাজিয়া গিয়াছে।

সমাপ্ত।

শ্রীঊষা দেবী।

THE BOYS' OWN ... ESTD. ... CALCUTTA.
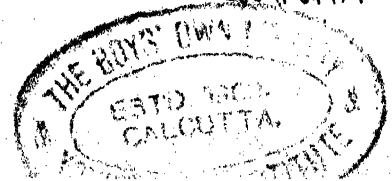
সভা ভঙ্গ

মানস-পটে আঁকা আরতি প্রীতি মাখা
মানসী ভারতীর ঘেরিয়া পদতল
মুগ্ধ মধুব্রত গুঞ্জরিনু কত
করিয়া বিকশিত গানের শতদল।
কত না সুখে দুখে মরম হ'তে টানি'
জানায়েছিনু মা'কে মরম বাণী খানি,
নিভৃতে নিরজনে ভকতিযুত মনে
চরণে দিনু ডালি অশ্রু নিরমল।
ছিল না কলরব, পূজার বৈভব,
মায়েরও আঁখি স্নেহে করিত ছলছল।

হাটের মাঝে আজি বাজনা ওঠে বাজি,
নাট্যশালা হল ছিল যা পূত মঠ,
দেবীর পূজা ছলে দাঁড়াল বেদী তলে
দৈত্য দলে দলে—এ বড় সঙ্কট!
বোধন ঘট ভাঙি, সাধন-পট ছিঁড়ি
অসুর তাণ্ডব পদ্মাসন ঘিরি,
বাণীর তিরোধান, পূজারী হতমান
গণ্ডগোল করে কপটাচারী শঠ,
গুণীর সে সমাজ লুকাল কোথা আজ?
—নাহি সে নটরাজ, গাহিছে নটী নট।

শ্রীহীন সভামাঝে আর কি গাওয়া সাজে
পরাণো খাঁটি সুরে কাফি কি মুলতান?
নবীন মোহে ঘেরা চপল তরুণেরা
চায় না রূপ রস—রঙেরই প্রতি টান;
চটুল ভাঙা সুরে আসর করি মাৎ
গাহিবে হেথা এবে যুবক কাশীনাথ,
এরা যে গানে হায়, উন্মাদনা চায়,
অমৃত ঠেলে পায় গরল করে পান,
বরজলাল তাই বিদায় নিল ভাই,
প্রতাপ রায় নাই—কে শোনে তার গান?

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আর্ট হষ্টেলে ৺সরস্বতী পূজা

নানা সুবিধা অসুবিধার ভিতর দিয়া আমাদের হষ্টেলের ৺শ্রীশ্রী বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা আর একটি বৎসর সফলতার সহিতই অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুত পার্সী ব্রাউন সাহেব ও শ্রীযুত মুকুলচন্দ্র দে মহাশয় উভয়েই এ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমাদের যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন। শ্রীযুত মুকুলচন্দ্র দে মহাশয় পূজার দিন প্রায় সমস্ত দিনটাই আমাদের সহিত থাকিয়া আমাদের সুখ দুঃখের ভাগ লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, আশা করি প্রতিবৎসরই তিনি আমাদিগকে এ বিষয়ে সহানুভূতি দেখাইতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

ইহা ব্যতীত আরও অনেক খ্যাতনামা শিল্পী ও সাহিত্যিক এ উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও আমরা আমাদের প্রতিমার গঠন-সুষমা ও মুখশ্রীর লালিত্য সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট হইতে বহু প্রশংসা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছি। আশা করি জনসাধারণের এ উৎসাহ দান ব্যর্থ হইবে না, এ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরা শিল্প সাধনায় ক্রমশঃ আরও উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইব। দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি ধীরে ধীরে শিল্পের দিকে প্রশংসার সহিত যে ভাবে ফিরিয়া আসিতেছে তাহাতে আশা হয় অচিরেই আমাদের এ সাধন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

আর্ট স্কুলের সরস্বতী মূর্ত্তি

প্রতিমা নির্ম্মাণ আমরা নিজেদের হাতেই করিয়াছিলাম। শুধু প্রতিমা নির্ম্মাণই নহে, এ পূজার প্রতি খুটিনাটি কাযটুকু পর্য্যন্ত নিজেরাই করিয়া থাকি। পূজা, রান্না, প্রসাদ বিতরণ এমন কি গোবর জলে আঙ্গিনা নিকানো পর্য্যন্ত—প্রতিমা নির্ম্মাণ হইতে সুরু করিয়া বিসর্জ্জন দেওয়া অবধি যাবতীয় কার্য্য সমস্তই নিজেদের হাতে করিয়াছিলাম।

এখানে আরও একজনের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। আমাদের প্রধান শিক্ষক এবং হষ্টেলের অধ্যক্ষ শ্রীযুত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুপরিচালনে এবং তত্ত্বাবধানেই কাযটি এমন সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারিয়াছিল। উনি আমাদিগকে সকল দিক হইতে কাযে যথেষ্ট উৎসাহদান এবং যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। এমন কি আমাদের সহিত সমান ভাবে একসঙ্গে বসিয়া তরকারীর কুটনা পর্য্যন্ত কুটিয়াছেন। এ কাযের সফলতার অনেক খানিই তাঁহার উপর নির্ভর করিয়াছে।

শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিয়ের মজা

১

বাপ মাকে বিবাহ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন দেখিয়া গঙ্গারামের উর্ব্বর মস্তিষ্কে এক অতি অদ্ভুত মৎলব জুটিল। সে হঠাৎ একদিন একখানি করাত লইয়া নিজের ঘরে গেল

এবং—করাতের ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দের সঙ্গে মায়ের "ওরে হতভাগা! এ কল্লি কি?" প্রভৃতি গালি গালাজের উত্তরে বলিয়া উঠিল, "একলা মানুষ একধারে পড়ে' থাকবো এত বড় তক্তপোষ আমার কি হবে?"

২

মা, এ একথার অর্থ বুঝিলেন, এবং গুণধর পুত্রকে যাহাতে অতবড় বিছানার একধারে না পড়িয়া থাকিতে হয়, তজ্জন্য ঘটকের সাহায্যে শীঘ্রই একটি টুকটুকে 'দোকলা' আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন। আজ আমাদের গঙ্গারামের সেই বাসর—

কিন্তু ঠান্‌দিদির ঐ মুগদর সদৃশ দুর্ব্বল হস্তের দুই একটি কসরতেই গঙ্গারামের মনে হইল—

"বাসরের এত মজা কে জানিত হায়রে!
কাণের হ্যাঁচ্‌কা টানে মাথা ছিঁড়ে যায় রে।

৩

বৎসরাধিক পরের অবস্থা। অভিমানের অশ্রুবন্যা।
পূজার আব্দার। কিনে দিতেই হবে !—

কাপড়ের দাম শুনিয়াই গঙ্গারামের চক্ষু বড়ক গাছ।

৪

ধারাপাতের শতকিয়া (সট্‌কে) ১একে চন্দ্র আরম্ভ হইল।

গঙ্গারামের আনন্দ আর ধরে না, মা ষষ্ঠীর কৃপায় তাহার ঘরে এখন সাত রাজার ধন এক মাণিক জন্মিয়াছে।

মা ষষ্ঠীর কৃপা ক্রমে যখন, ধারাপাতের গণ্ডাকিয়ায় যাইয়া পৌঁছিল তখন—

অফিসের পথে বাধা; সেজটিও হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া কোঁচার খুঁট ধরিল—'বাবা, পয়থা।' চারিদিক হইতে বাবা পয়সা, বাবা পয়সা। গৃহিণীও এদিকে তখন কোলের কচিটিকে লইয়া মজা দেখিতেছেন।

৬

মাসের শেষ, হাতে একটিও পয়সা নাই; গঙ্গারাম এখন ভ্যাবারাম হইয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছে। সময় বুঝিয়া কয়েকটি মাছি গঙ্গারামের মুখে ও চোখে বসিয়া মহানন্দে খেলা জুড়িয়া দিয়াছে। গঙ্গারাম মুখে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া—.
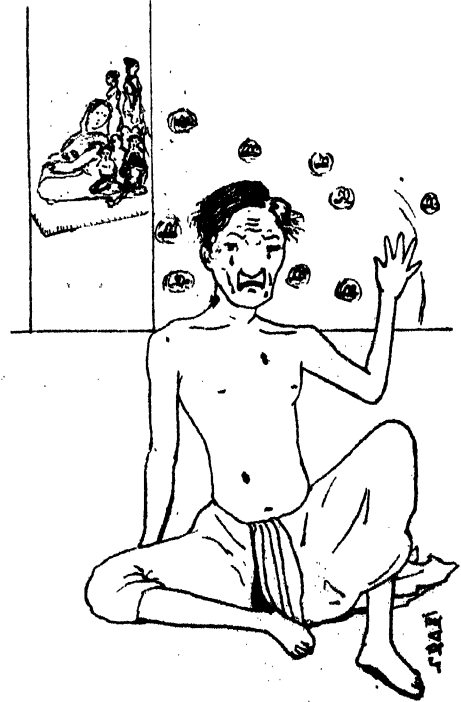
হাপুস্ নয়নে কাঁদিয়া ফেলিল; "উঃ—শা—মাছি! এবার যদি মুখে বসবি ত ধ'রে তোর বিয়ে দিয়ে দেবো।"

হায় গঙ্গারাম, সেই তক্তপোষ কাটার কথা কি এখন মনে পড়ে?

শ্রীনিবেদিতা ভৌমিক।

ব্যঙ্গ-শিল্পী—শ্রীশিবপদ ভৌমিক।

পরলোকে সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র ঘোষ

বাণীর একনিষ্ঠ সেবক, 'চাক্‌মা জাতি', 'চট্টগ্রামের বিবরণী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সতীশচন্দ্র শুধু বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবী কেন, পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজে যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা বা গবেষণা করেন তাঁহাদের অনেকের নিকটই সুপরিচিত ছিলেন।

সতীশচন্দ্র চট্টগ্রামের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ গ্রামে ১৮৮১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র ঘোষের আর্থিক অবস্থা বড় স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া সতীশ-চন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় বিশেষ অগ্রসর হইতে না পারিলেও নিজ চেষ্টায় ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া ছিলেন। ব্রহ্ম, আসামী, ফার্শী, হিন্দী, উর্দ্দু ভাষায়ও তাঁহার বেশ দখল ছিল। তৎপ্রণীত চাক্‌মা জাতি গ্রন্থে চাক্‌মা শব্দের সহিত অন্যান্য ১৫ রকম ভাষার শব্দের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। তিনি বহু বৎসর যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার পরীক্ষক ছিলেন।

১৯০২ খৃঃ সতীশচন্দ্র পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্গত রাঙ্গামাটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। তথায় তিনি ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃত ও ড্রয়িং প্রভৃতি সকল বিষয়ে কৃতিত্বের সহিত শিক্ষা দিতেন। রাঙ্গামাটীতে শিক্ষকতা অবস্থায় সতীশচন্দ্র চাক্‌মা জাতির ইতিবৃত্ত সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে বাহির করেন। তাঁহার কতিপয় সাহিত্যিক বন্ধুর উৎসাহে ১৯১১ খৃঃ তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মাননীয় বিচারপতি ৺সারদাচরণ মিত্র সাহিত্য পরিষদের সভায় বলিয়াছিলেন যে সতীশচন্দ্র পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা জাতির যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিবৃত্তের সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে ভারতের ইতিহাস মন্দিরে একখানি ইষ্টক সংযোজিত হইয়াছে; কালে এইরূপে সমস্ত জাতির ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়া ইহা এক সুবৃহৎ ও সুরম্য অট্টালিকায় পরিণত হইয়া ভারতের জাতীয় ইতিহাসের সুকীর্ত্তি সমস্ত পৃথিবীর নিকট ঘোষিত করিবে সন্দেহ নাই। সারদা বাবুর প্রস্তাব মত 'চাক্‌মাজাতি' পরিষদের ২৬শ গ্রন্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অতঃপর সতীশচন্দ্রকে পরিষদের সহায়ক সদস্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহে 'চাক্‌মা জাতি' উচ্চ প্রসংশায় সমালোচিত হইলে তৎপরে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ এণ্ডার্সন রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটন এণ্ড আয়রলণ্ডের জর্ণালে "চাক্‌মা জাতি"র উচ্চ প্রশংসিত বিস্তৃত সমালোচনা করেন।

সতীশচন্দ্র ঘোষ

তৎপরে উক্ত রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি সতীশচন্দ্রকে পৃথিবীর দশজন অবৈতনিক সদস্যের একজন সদস্য নির্ব্বাচন করেন। আমেরিকার সোসাইটি অব্ আর্ট তাঁহাকে অবৈতনিক সদস্য নির্ব্বাচন করতঃ ঐ পদ গ্রহণ করার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করেন। বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ তাঁহাকে বিদেশে সহায়ক সদস্য মনোনয়ন করিয়া অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত (কতকগুলি ছাপানো খাতা পাঠাইয়া) অনুরোধ করেন।

সতীশচন্দ্রের অগাধ প্রত্নতত্ত্বের পরিচয়ে ইণ্ডিয়ান

রিসার্চ সোসাইটি তাঁহাকে ঐতিহাসিক শাখার বিশেষ সদস্য মনোনীত করেন ও কলিকাতা পণ্ডিতসভা তাঁহাকে প্রত্নতত্ত্ববারিধি উপাধিতে ভূষিত করেন।

সতীশচন্দ্র 'চাকমা জাতি' গ্রন্থের পরেই 'চট্টগ্রামের বিবরণী' নামে চট্টগ্রামের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক তিন খণ্ডে প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া ভৌগোলিক খণ্ডের কতক অংশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পঞ্চবিংশতি বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক অভিধান সঙ্কলন মানসে বঙ্গের বিভিন্ন ভাগের প্রায় ৬ হাজার বাঙ্গালা কথ্য শব্দ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, আর্থিক অনটনে তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

সতীশচন্দ্রের সরল রামায়ণ, মহাভারত এবং গীতা স্কুল ও কলেজে পুরস্কার গ্রন্থ রূপে বহুবৎসর হইতে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পার্ব্বত্য 'চট্টগ্রামের ভৌগোলিক বিবরণী' 'সন্দর্ভলহরী' প্রভৃতি ছয়খানা বহি পাঠ্যরূপে প্রচলিত ছিল।

দেশহিতকর কার্য্যে সতীশচন্দ্রের প্রতিভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জন্মভূমি ফতেয়াবাদ গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন। ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতি-কল্পে ফতেয়াবাদ হিতসাধিনী সমিতির সংগঠনও সতীশ-চন্দ্রের চেষ্টার ফল। সতীশচন্দ্র উক্ত হিতসাধিনী সমিতির ধর্ম্ম শাখার পরিচালক ছিলেন। গ্রামের সকলে বিনা চাঁদায় যাহাতে পুস্তক পড়িতে পায় তজ্জন্য তিনি এক অবৈতনিক পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সকল হিন্দু সমাজ যাহাতে একত্রে একই দেবতার পূজায় যোগ-দান করিতে পারে তজ্জন্য হরিসভা নামে এক বাৎসরিক মহোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার বর্ত্তমানে ৩০শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সম্পাদকতায় চট্টগ্রাম সাহিত্যসম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন ফতেয়াবাদে অনুষ্ঠিত হয়। সতীশচন্দ্র ফতেয়াবাদ মহা-কালী বিদ্যালয়ের ও রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

পবিত্রতা সতীশচন্দ্রের ব্রত, নিষ্ঠা সতীশচন্দ্রের ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম সতীশচন্দ্রের জীবনের লক্ষ্য ছিল। হিন্দুর ধর্ম্মে কর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল বলিয়া তিনি পূজা পার্ব্বণে যাহাতে কোনরূপে অঙ্গহীন না হয় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি স্বহস্তে প্রত্যহ শিব ও কালী পূজা করিতেন। প্রাতঃকাল আহ্নিক, গীতাপাঠ ও পূজায় অতিবাহিত করিতেন। আহ্নিকের শেষে পিতামাতার স্তব ও প্রণাম করিয়া আহ্নিক সমাপ্ত করিতেন। তিনি আহারের সমস্ত দ্রব্যাদি একত্রে উপাস্য দেবতার নামে উৎসর্গ করতঃ পরে সপরিবারে প্রসাদরূপে তাহা গ্রহণ করিতেন।

তিনি অতি মিতব্যয়ী ছিলেন, বিলাসিতা বলিয়া কিছু জানিতেন না। সাধারণ পরিচ্ছন্ন পোষাকেই গভর্ণর প্রভৃতির সহিত দেখা করিতেন। তাঁহার মিতব্যয়িতার ফলে ভাইদের পড়া ও পরিবারের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি একান্নবর্ত্তি পরিবার পরিচালনা সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম করিয়া গিয়াছেন।

গত ৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ৪৮ বৎসর বয়সে জন্মভূমি ফতেয়াবাদ গ্রামে সতীশচন্দ্র বৃদ্ধা মাতা ভাই ভগিনী পুত্র কন্যা ও সহ-ধর্ম্মিণীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন; শ্রীশ্রীভগবান তদীয় আত্মার শান্তিদান ও সদ্‌গতি বিধান করুন ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ।

বৈদেশিকী

১। অসুর বধে দেবী—(ডেট্রয়েটের শিল্পমন্দিরস্থিত চিত্র সংগ্রহ হইতে)।
ইহা সপ্তম শতাব্দিতে পঞ্জাবের অন্তর্গত জম্মুনগরীর এক রাজপুত শিল্প প্রতিষ্ঠানে অঙ্কিত পট।
যুক্ত প্রদেশের শিল্প পরিষৎ উক্ত রঞ্জনের অনুমোদনে বলেন যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও শোভাসম্পদে উহা অতুলনীয়

২। এল্, ডেভিড কর্তৃক অঙ্কিত মারা (Marat-এর) প্রতিকৃতি। ম্যারা ফরাসী বিপ্লবদলের অন্যতম নায়ক ছিলেন এবং দারিদ্র্যের মাঝে বহু প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া প্রকৃত দেশভক্তির পরিচয়ে আত্মোৎসর্গ করা বিপ্লববাদীর মধ্যে কেবলমাত্র মারাতেই সম্ভব ছিল। শারলৎ কর্ দে নাম্নী এক প্রৌঢ়া রমণী শত্রুপক্ষ হইতে তাঁহার হত্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। একদিন সে দুঃস্থ বিধবার বেশে কৌশলে মারার স্নানকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় যাচ্ঞা পত্র পাঠ করিতে দেয়। মারা তাহার অনধিকার প্রবেশে কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই বরং তৎক্ষণাৎ আবেদন গ্রাহ্য করিয়া দলপতির নামে সেই পত্রের উপরেই দুইছত্র লিখিয়া দেন। সেই অবসরেই শারলৎ তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করে। ডেভিডের সুনিপুণ তুলিকায় ইহা মারার সজীব চিত্র বলিয়া খ্যাত।

শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

সাঁলোয়ার প্রেম

(গল্প)

কোনদিন কেহ ছিলনা তা নয়,—কিন্তু আজ কেহ নেই। সকলেই যে যার পথে চলিয়া গিয়াছে—দুনিয়ার সকল দুঃখ শোকের মোট বহিবার জন্যে কেবল রাখিয়া গিয়াছে আশী বছরের বুড়া মঙ্-বাং-লাকে। বুড়া সোজা হইতে পারে না, তবু পর্য্যায়ক্রমে সকল দুঃখের মোট বহিয়া আসিতেছে, শুধু তা'র বারো বছরের নাতনী সাঁলোয়ার মুখ চাহিয়া। এবুড়াও অনেক আগেই অনন্তের পথে যাত্রা করিত; কিন্তু মনে হয় যেন সে সাঁলোয়ার চাঁদপানা মুখখানা দেখিয়াই সকল দৈন্য, সকল ক্লেশের ঝাপটা হাসিমুখে সহ্য করিতেছে!

সাঁলোয়া শৈশবে মাতৃহীনা। সাঁলোয়া যখন আরও বড় হইয়াছে—যখন বুঝিতে পারিয়াছে—তখন সে পাইয়াছে কেবল তা'র বুড়ো ঠাকুর্দা মঙ্-বাং-লাকে—আর কাহাকেও না।

বর্ম্মা দেশের কয়েকটা ছোট বড় পাহাড় পার হয়ে একটা পাহাড়ের গাঁ ঘেঁসে ভীষণ জঙ্গলে ঘেরাও করা সাঁলোয়াদের বস্তিখানা। অতি ছোট্ট বস্তি। বস্তিতে মাত্র কয়েক ঘর লোকের বাস, বাড়ীগুলি সব অনেক দূরে দূরে, আর লতায় পাতায় ঘেরা যেন এক একখানা মুনি ঋষিদের আশ্রম কুটীর!

যে বয়সে সাঁলোয়ার সম-বয়সী খেলার সাথীর দরকার সেই বয়সে প্রায় তাকে একাই কাটাতে হ'ত। সাঁলোয়ার খেলার সাথী, আমোদের বন্ধু, আর দুঃখের দরদী সবই ছিল বুড়ো ঠাকুর্দ্দা!

বুড়ো ঠাকুর্দ্দা সাঁলোয়াকে কাছে বসিয়ে তাঁদের অতীত দিনের সুখ দুঃখের কাহিনী বলিত, সাঁলোয়া একমনে প্রাণ ভরিয়া শুনিত। সুখের কথা, ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিতে শুনিতে সাঁলোয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত;—দুঃখের কথা শুনিলে সাঁলোয়ার চোখের কোণে জলের ফোঁটা মুক্তার ন্যায় টলমল্ করিত—তারপর আরও ভারী হইয়া টপ্ টপ্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া যাইত! বুড়া ঠাকুর্দ্দা দুঃখের কাহিনী বন্ধ করিয়া আবার সুখ সম্পদের কথা পাড়িত, কিন্তু তখন আর সাঁলোয়াকে ফেরানো যাইত না,—সাঁলোয়া আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিত! বুড়া মঙ্-বাঃ-লার চোখের জল নাত্নীর চোখের জলে মিশিয়া বন্যা বহাইয়া দিত। তারপর দুজনে দুজনের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া শান্ত হইত।

মঙ্-বাঃ-লা লাঠি হাতে, নাত্নীর হাত ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত, বনফুল তুলিয়া সাঁলোয়ার মাথায় নিজের পছন্দ মত সাজাইয়া দিত। সাঁলোয়া ছুটিয়া গিয়া দূরে একটা ঝোঁপের পাশে লুকাইয়া থাকিত, বুড়া ঠাকুর্দ্দা অতি কষ্টে তাঁকে খুঁজিয়া বাহির করিত। পাখী গান গাহিত, ঠাকুর্দ্দা কাণ পাতিয়া শুনিত, আর সাঁলোয়া মুখ ভেংচাইয়া পাখীর গান নকল করিত! এম্নি করিয়া এই যক্ষপুরীর দু'টী প্রাণীর দিনগুলি সহস্র ব্যথার মাঝেও কত না সুখে কাটিত।

সাঁলোয়া আরও বড় হইয়াছে, তাহার রূপ-নদীতে বান ডাকিয়াছে,—যৌবন তাহার তীরে!

২

ঠাকুর্দ্দা, রোগ শোক ও দুঃখের বোঝা বহিতে বহিতে এখন বিছানা লইয়াছে। সাঁলোয়া সারা বিকাল একা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বনের ফুল, লতা পাতা কুড়াইয়া সন্ধ্যার আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট কাঠের ঘর খানিতে ফিরিয়া আসে। ঠাকুর্দ্দাকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া একা বসিয়া আপন মনে লতা পাতা ফুলে ডালা সাজাইয়া রাখে,—রাত থাকিতে দুই মাইল পথ হাঁটিয়া ষ্টেশনে গিয়া রেল গাড়ীতে সহরে যায় সেইগুলি বিক্রয় করিতে!—সাঁলোয়ার বয়স কাঁচা। মুখখানা ছিল যেন গভীর বনের নিবিড় কোণে একটী আধ-ফোটা গোলাপ—রঙটাও তেম্নি।

সাঁলোয়াকে সহরে বেশীক্ষণ ঘুরিতে হইত না—নিমেষে তা'র ভরা ডালা খালি লইয়া যাইত। সাঁলোয়া পয়সাও পাইত বেশী, তাই দেখিয়া অপর ফুলওয়ালীর ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত,—যখন সে তা'র খরিদ্দারদের আর জিনিষ দিতে পারিত না তখন তা'রা মনে মনে খুব হাসিত।

ভরা ডালা খালি করিয়া সে সহরে দেরী করিত না। রাস্তায় খাবারের দোকান হইতে কিছু খাবার কিনিয়া গাছ তলায় বসিয়া খাইয়া, ঠাকুর্দ্দার জন্য কিছু খাবার লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া রেল গাড়ীতে যাইয়া আবার সেই তাদের বাড়ীর ধারের ষ্টেশন হইতে দুই মাইল পথ হাঁটিয়া বাড়ী পৌছিত তখন কোন দিন একটা কোনদিন বা দুইটা বাজিয়া যাইত! ঠাকুর্দ্দাকে খাওয়াইয়া একটু জিরাইয়া আবার সে বনরাণীর মত বনজঙ্গলের আনাচে কানাচে, লতা পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলোকের রেখার সহ ঘুরিয়া বেড়াইত—আবার সাঁঝের বেলা ফিরিয়া আসিত। উষা ঘুম হইতে জাগিবার আগেই সাঁলোয়া জাগিত, তার পর প্রতিদিনকার মত ঐ দুই মাইল পথ পায়ে হাঁটিয়া ষ্টেশনে আসিয়া টিকেট কিনিয়া রেলগাড়ীতে সহরে যাইত! এই ছিল তার দৈনন্দিন কায।

সাঁলোয়া যতক্ষণ সহরে থাকিত, বুড়া মঙ-বাঃ-লার কিছুই ভাল লাগিত না। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া যখন আর ভাল লাগিত না, অনেক বেলায় তখন সে জাগিত। চাহিয়া দেখিত সাঁলোয়ার জায়গা খালি পড়িয়া আছে, তখনি সে বুঝিত লতা, পাতা, ফল ফুল ভরা ডালা লইয়া

পেটের জোগাড়ের জন্যই সে রাত না পোহাইতে সহরে চলিয়া গিয়াছে। সাঁলোয়া সহর হইতে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বুড়া ঠাকুর্দ্দা উদাস নয়নে তার পথের দিকে চাহিয়া থাকিত, একটু দেরী হইলে ঠাকুর্দ্দা নানা দুশ্চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিত, চোখের কোণে তার জল দেখা দিত।

৩

বন জঙ্গল ঘুরিয়া লতা পাতা ফল ফুল কুড়াইতে গিয়া একদিন সাঁলোয়া একটি সাথী কুড়াইয়া পাইল। সে তাহাদেরই একটু দূরের অন্য বস্তির ছেলে, সাঁলোয়ার চেয়ে বছর কয়েকের বড়, নাম তার মঙ-লে। একদিন দুইদিন —তিন দিনের দিন সাঁলোয়া আর তাহাকে ধরা না দিয়া পারিল না। সাঁলোয়া বনে ঢুকিবার অনেক আগেই মং-লে তাহার জন্য অনেক করিয়া লতা ফুল পাতা কুড়াইয়া রাখিত, সাঁলোয়া গেলেই তার ডালায় ঐগুলি সাজাইয়া দিয়া সারা সময় ঐ দূরের ছোট গিরি-নির্ঝরিণীর তীরে বসিয়া ভবিষ্যৎ সুখের রঙিন নেশায় মসগুল হইয়া যাইত। মংলে বেহালা খুব ভাল বাজাইতে পারিত, তাহার বেহালা সর্ব্বদা হাতেই থাকিত। মংলে ছোট তটিনীর পাশে বসিয়া তার চিরাভ্যস্ত হাতে যখন বেহালায় তান তুলিত, সাঁলোয়া অবশ নয়নে মংলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, আর এক মনে সেই করুণ রাগিণী শুনিত। তারও সাধ হইত, যদি সেও তেমনি বাজাইতে পারিত। মংলে কত গল্প করিত, কিন্তু সাঁলোয়া একটিও কথা কহিত না, কেবল মংলে রাগ করিলে শতবার সাধিয়াও না পারিলে অভিমান করিয়া রাগ ভাঙিয়া দিত। বিদায়ের আগে যখন মংলে সাধ করিয়া সাঁলোয়াকে বুকে ধরিয়া আদর করিয়া তার রক্তিম দুটি গালে কেবল দুইটি ছোট চুমা দিত, অস্তগামী সূর্য্যের চেয়ে তার গাল দুটি আরও লাল হইয়া উঠিত—তার সারা শরীর যেন অবশ হইয়া পড়িত। তার পর সন্ধ্যার আঁধারে সব ছাইয়া গেলে। সাঁলোয়াকে তার ঘরে পৌছাইয়া দিয়া মংলে তাহার নিজ বস্তিতে ফিরিয়া যাইত। অতি সাধের বেহালা বিবশ হইয়া হাতে পড়িয়া থাকিত, মংলের কিছু ভাল লাগিত না। আর সাঁলোয়ার?

আজ ক'দিন যাবৎ বুড়া মঙ্খ্যাংল্যার রুগ্ন শরীর আরও খারাপ হইয়াছে। মংলে আসিয়া সাঁলোয়ার দুঃখের ভাগ লইল, ব্যথার ব্যথী হইল, সাঁলোয়ার ঠাকুর্দ্দার সেবা শুশ্রূষা আরম্ভ করিল। সাঁলোয়া গভীর আঁধারে আলোর রেখা দেখিয়া অসহায়ে অতবড় সহায় পাইয়া একটু সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

দুই মাইল পথ পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া যে ষ্টেশনে সাঁলোয়া গাড়ীতে উঠিত, সেটি একটি ছোট ষ্টেশন। সেখানের ষ্টেশন মাষ্টার, বুকিং ক্লার্ক, তার বাবু সবই একা বাঙ্গালী বাবু অবনীনাথ। অবনীনাথ ছাড়া সে ষ্টেসনে একজন হিন্দুস্থানী দোকানদার ও একজন বার্ম্মিজ্ কুলিও থাকিত। অবনীনাথ অনেক দিন বর্ম্মাদেশে থাকিয়া বর্ম্মা ভাষাটা বেশ করিয়া শিখিয়া লইয়াছিল, সেদেশের আদব কায়দাও ভালরূপ জানিত।

অনেক দিন আগেই সাঁলোয়ার সাথে অবনীনাথের আলাপ হইয়া গিয়াছে। আরও অনেকের সাথেই তাহার আলাপ ছিল কিন্তু সে ভিন্ন ধারার। অবনীনাথ, সাঁলোয়ার সাজানো ডালার কাছে যেমন যাইত, খালি ডালার কাছেও তেমনি যাইত। পয়সা দিয়া ফুল কিনিয়া সাঁলোয়ার মাথায়ই সাজাইয়া দিত। কোনদিন সাঁলোয়া মুচ্‌কি হাসিত, কোন দিন বা মুখ কালো করিয়া দূরে সরিয়া যাইত। সাঁলোয়াকে আদর করিলে কোন কোন-দিন সে রাগ করিত, কোনদিন বা করিত না। অবনীনাথ দামের চাইতে অনেক বেশী পয়সা দিয়া জিনিষ রাখিয়া সাঁলোয়াকে বাড়ী ফিরাইয়া দিত। সে কোন দিন পয়সা লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিত, কোন দিন বা পয়সা লইত না —বাড়ী না ফিরিয়া সোজা সুজি সহরে চলিয়া যাইত অপর ফুলওয়ালীরা গা' টেপাটেপি করিয়া হাসাহাসি করিত।

আষাঢ় মাস। সারাটা সকাল অঝোর বৃষ্টি। সাঁলোয়া সকালে তার জিনিষ লইয়া সহরে যাইতে পারে নাই। জিনিষ গুলি শুকাইয়া যাইবে, পয়সা না পাইলে ঠাকুর্দ্দার খাবার আসিবে না ভাবিয়া দুপুরের গাড়ীতে সাঁলোয়া যখন সহরে গেল, তখনও আকাশে ঘন মেঘ ছিল। জিনিষ বেচিয়া যখন সাঁলোয়া আসিয়া গাড়ীতে

বসিয়াছে তখন চারিদিক্ কাঁপাইয়া ঝড় আরম্ভ হইল। সাঁলোয়ার মনেও তখন এক ঝড় বহিতেছিল। সাঁলোয়া ষ্টেশনে যখন নামিল, তখনও ঝড় থামে নাই। ছোট্ট ষ্টেশনটীর বারান্দায় সাঁলোয়া শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিছিল, চারিদিক হইতে ঝড়ের জল আসিয়া তাকে আরও ভিজাইয়া দিতেছিল। অবনীনাথের চোখে পড়িতেই, সাঁলোয়কে আদর করিয়া ঘরে ঠাঁই দিল,—সাঁলোয়া সেদিনের সে সোহাগ প্রত্যাখ্যান করিল না।

৫

অনেক দিন আগেই—যেদিন সাঁলোয়ারই মুখে মং-লে অবনীনাথের কথা শুনিয়াছিল, সেই দিন রাগে সে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার চোখ ফুটিয়া রক্ত বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল—ঠোঁট্ কাম্‌ড়াইয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে সে বলিয়াছিল—"কালা।"—সাঁলোয়া ভয়ে পিছাইয়া গিয়াছিল! সেই দিনই হিংসার অনল তাহার মনে জ্বলিয়াছিল, কিন্তু সাঁলোয়াকে কিছু বুঝিতে দেয় নাই।

সাঁলোয়ার ঠাকুর্দ্দার অবস্থা খারাপ এই কথা অবনীনাথ সাঁলোয়ার মুখেই শুনিয়াছিল। আজ অবস্থা আরও বেশী খারাপ শুনিয়া, বিকাল হইতেই অবনীনাথ বৃদ্ধ মঙ-বাঃ-লাকে দেখিতে আসিল। সাঁলোয়া তাহাকে আদর করিয়া বসাইল। শিকার দেখিলে অব্যাহত শর নিক্ষেপের শিকারীর যে প্রকার লোভ হয়, শত্রুকে শত্রু আপন আয়ত্তাধীনে পাইলে প্রতিশোধ লইবার যে রকম পশু প্রবৃত্তি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে—অবনীনাথকে দেখিয়া যুবক মং-লের সেই ভাব হইল। মং-লে ঈর্ষান্বিত হইয়া, হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া পশুবৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিল! মং-লে, অবনীনাথকে হত্যা করিবার জন্য তাহার বড় ছুরি খানা দৃঢ়-মুষ্টিতে ধরিয়া বার কয়েক কি ভাবে ছুরি বসাইবে তাহাই দেখিতে লাগিল।

মং-লের রক্ত-পিপাসু ছুরিকা অবনীনাথের বক্ষোরক্ত পান করিয়া তৃপ্ত হইল,—কিন্তু সাঁলোয়ার নারী-হৃদয় আকুল আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। সাঁলোয়া মং-লেকে ক্ষমা করিতে পারিল না—প্রতিশোধ লইবার নেশায় সে উন্মাদিনী হইয়া উঠিল! মধ্যরাত্রে নীরব নিশীথিনীর বক্ষে সমস্ত বস্তিখানা যখন ডুবিয়া আছে—সাঁলোয়া চোরের মত মং-লের ঘরে ঢুকিল। মং-লের ছুরিখানা খুলিয়া আনিয়া অন্ধকারে একবার হাত দিয়া দেখিল। তারপর অতি ধীরে, চুপে চুপে মং-লের কাছে গিয়া মঙ্গলের ছুরিকা মং লের বক্ষেই আমূল বসাইয়া দিল। আঁধারের বুক চিরিয়া মংলের বক্ষোরক্ত ছুটিল—মংলে অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া গোঙাইতে লাগিল।

সাঁলোয়া পিশাচিনী সাজিল।...ছুরিকার ক্ষত তখনও শুকায় নাই। প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ সবই হইল, বাকী রহিল শেষ কায! সাঁলোয়া গভীর অব্যক্ত বেদনায় উন্মাদিনী হইয়া উল্কার মত ছুটিল, কিছুদূর গিয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল। আবার উঠিল, আবার পড়িয়া গেল—তার পর মং-লের আদরের ছুরিকার বুকে বুক মিশাইয়া দিয়া চিরদিনের মত ঘুমাইয়া পড়িল। মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অস্ফুট্ স্বরে একটা মাত্র ধ্বনি করিল-'আম্-মা"——নিশীথিনী নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বনানীর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি উঠিল—'আম্-মা'!

* * *

বুড়া মঙ-বাঃ-লার জন্যই বুঝি মংলে বাঁচিয়া উঠিয়াছিল। সে পুত্রের ন্যায় দিনের পর দিন মাসের পর মাস, মাং-বাঃলার শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিল। মঙ্ বাঃ-লা যেদিন জীবনের পরপারে যাত্রা করিল, তারপর হইতে আর কেহ মং-লেকে সেই অঞ্চলে দেখে নাই।

শ্রীঅযোধ্যানাথ দেব।

THE BOYS' OWN ... ESTD 1903 CALCUTTA ... INSTITUTE
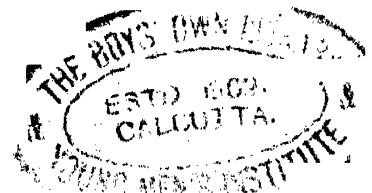
নিরানন্দ

কে পারে আনন্দ দিতে এ চিত্তে আমার ?
কোন্ দৃশ্য, কোন্ সুখ, সঙ্গ বা কাহার ?
বর্ষাস্নাত বন 'পরে চন্দ্রের কিরণ,
উদাত্ত উন্মত্ত ব্যাপ্ত সমুদ্রনর্ত্তন,
প্রেয়সীর মুখ, আর পুত্রের ভাষণ,
চিত্তে তৃপ্তি আনে কিছু, কিন্তু শিহরণ
নাহি আনে হর্ষ আনন্দের। ক্ষণে হাসি,
চিত্তে মোর হেরি পুনঃ বিষাদের রাশি
পুঞ্জীভুত পাষাণ সমান। হায়, হায়,
কিসে তৃপ্তি, কিসে সুখ, আনন্দ কোথায় ?
মৌন নীল নভস্তল চিত্তে বিস্তারিয়া,
চন্দ্রের অমৃতে চিত্ত গলিত করিয়া
নাহিক আনন্দ মোর, নাই, সুখ নাই।
হর্ষের জীবন স্পর্শ কোথা গেলে পাই ?

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

কথাসাহিত্যে ৺মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ৺মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় মানসীর পাঠক পাঠিকার নিকট বিশেষ রূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার অনেক গুলি উপন্যাস মানসীতে দীর্ঘকাল যাবৎ ধারাবাহিক রূপে বাহির হইয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। মনোমোহন বাবুর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় ছিল না। তবে তাঁহার লেখা পড়িতে আমার বড় ভাল লাগিত। তাঁহার ভাষা ছিল সংস্কৃত-শব্দবহুল—'থালা' না লিখিয়া 'স্থালী' এবং 'সিঁড়ি না লিখিয়া 'অধিরোহণী' লিখিতেন —সে জন্য স্থানে স্থানে কিছু খটমট বোধ হইত। তাহা হইলেও তাঁহার লেখার ভাষা অতি সুন্দর, তাহা মৃদু কৌতুকরসে উদ্ভাসিত, পড়িতে কোথায়ও অবসাদ আসে না, বরং পাঠক পাঠিকার মনে পরের ঘটনা জানিবার জন্য কৌতুহলের উদ্রেক হয়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি হালফ্যাসনের অনুরোধে সুনীতির উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া আর্টের সেবা করেন নাই। আর্ট সুন্দরী তাহার আপাত-মনোরম সৌন্দর্য্যের ছটায় ভুলাইয়া তাঁহাকে ধ্যানভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার উপন্যাস গুলি প্রায়ই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, যেমন তাহাতে রজোগুণ-প্রধান আর্টের কারিকরি নাই, আবার "জঘন্য-গুণবৃত্তি" তমোগুণ-প্রধান প্রেম নামধারী কামের লীলাখেলাও নাই। যে উপন্যাসে আর্টের চমৎকারিত্ব নাই তাহাকে অবশ্য উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বলা যায় না। তাহা হইলেও বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনে যে সকল উচ্চাদর্শের আবশ্যক, মনোমোহন বাবু তাহা প্রচুর পরিমাণে দিয়া গিয়াছেন।

মনোমোহন বাবু অনেক গুলি উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার 'অপরাজিতা', 'মোক্ষদা', 'অক্রুকুমার', 'পূর্ণিমা', 'স্বপ্নময়ী', 'মানদা' এই কয়খানি উপন্যাস এবং 'পূর্ণিমা' ও 'পঙ্কজ' নামা দুইখানি গল্পের বই পড়িয়াছি। এই সকল গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, আমি সংক্ষেপে ইহার প্রত্যেক খানি পুস্তকের কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

অক্রুকুমার।—এখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বই—এই ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ উপন্যাস ঘটনা বৈচিত্র্যে ও লেখকের লেখার গুণে সুখপাঠ্য হইয়াছে। একটি পল্লীবাসী-দরিদ্র যুবক অক্রুকুমার কি প্রকারে কলিকাতা

বাসী ক্রোরপতি যক্ষ ঘোরতর কৃপণ তাহার জ্যেষ্ঠতাত কেদারেশ্বর ওরফে একাদশী চক্রবর্ত্তীর উইল অনুসারে তাঁহার অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, একাদশীর প্রতিবেশী এক ডেপুটী বাবুর পরমা সুন্দরী পৌত্রী সৌদামিনীকে বিবাহ করিল এবং উভয়ে নানা সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া সেই ধনের সদ্ব্যবহার করিল ইহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তবে সংসারের সকল প্রকার কার্য্যেই নানা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এস্থানেও একাদশীর তিনটি শ্যালক যদু খানসামার নিকট ভুল সংবাদ শুনিয়াছিল যে একাদশী সৌদামিনীকেই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়াছেন। তাহারা সেই সম্পত্তির লোভে হরিহরপুরের জমিদার পুত্র সাজিয়া সৌদামিনীকে তাহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার অঙ্কলক্ষ্মী করিবার দুরভিসন্ধিতে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ দিন কতক জলের মত ব্যয় করিতে আরম্ভ করিল, এবং বিবাহ হয় হয় এমন সময় ডেপুটী বাবুর এক বৃদ্ধ বন্ধুর চেষ্টায় সেই তিন শ্যালকের জাল জুয়াচুরি ধরা পড়িল পল্লীবালক অক্রুকুমার তাহার জ্যেষ্ঠতাতের অন্বেষণে কলিকাতায় আসিয়া ডেপুটী বাবুর গৃহদ্বারে সৌদামিনীকে দেখিল, সৌদামিনী তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল (প্রেমে পড়িল ঠিক বলা যায় না), কিন্তু তাহার কৌতুক করিবার দোষে অক্রুকুমার নানা বিপদে পড়িল—এমন কি গাড়ীর তলায় পড়িয়া জীবন হারাইবার মত হইয়াছিল। 'এলেক্‌জান্দ্রা' এই ইংরেজী নামধারিণী, বিলাত ফেরত ডাক্তার দত্তের স্ত্রী, এক বাঙ্গালী যুবতী অক্রুকুমারকে তুলিয়া লইয়া নিজ গৃহে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইল, আবার তাহার প্রেমেও পড়িল। কিন্তু অক্রুকুমার অবশেষে সৌদামিনীকেই বিবাহ করিল, এবং আলেক্‌জান্দ্রা তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর অক্রুকুমার ও সৌদামিনীর সহিত মিলিত হইয়া সৎকার্য্য করিতে করিতে একটি রাস্তার স্ত্রীলোককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া সৌদামিনীর ক্রোড়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

এই উপন্যাসের স্থানে স্থানে কিছু কিছু দোষ আছে। সৌদামিনী তের চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে, সে এতদূর আক্কেলশূন্য যে সে অবলীলাক্রমে তাহার বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার দাড়ি গোঁপ নাপিত ডাকিয়া কামাইয়া দিল। উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা 'এলেক্‌জান্দ্রা' তাহার স্বামী ডাঃ দত্তকে ভালবাসিতে পারিল না কারণ সে নিজে ব্রাহ্মণ কন্যা আর ডাঃ দত্ত সোণারবেনে, তবে তাঁহাকে জানিয়া শুনিয়া বিবাহ করিয়াসি ল কেন? একাদশী চক্রবর্ত্তীর শ্যালকত্রয় শুধু যদু খানসামার কথার উপর নির্ভর করিয়া সৌদামিনীকে লাভ করিবার জন্য তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিল কেন? এতদ্ভিন্ন প্লটের মধ্যেও কিছু কিছু দোষ আছে। তাহা সত্ত্বেও এই গ্রন্থ সুখপাঠ্য হইয়াছে এবং একাদশীর তিন শালার চক্রান্ত বিফল হওয়ায় বৃত্তান্ত খুব কৌতুহলজনক।

মানদা। অক্রুকুমারের ন্যায় এই উপন্যাসের নায়ক গদাধরও দরিদ্র পিতামাতার সন্তান, প্রথমে পল্লীগ্রামে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পরে কলিকাতায় আসিয়া উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছিল এবং হাইকোর্টের উকীল হইয়া বহু ধন উপার্জ্জন করিয়া নানা সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিল। কিন্তু সে আদর্শ চরিত্র হইলেও তাহার জীবন নিতান্ত দুঃখময়। সে তাহার পল্লীগ্রামের শিক্ষক প্রগাঢ় বিদ্বান ও মনস্বী কৃষ্ণবিহারী বাবুর বিদুষী কন্যা অম্বিকাকে ভালবাসিয়াছিল, অম্বিকাও তাহাকে ভালবাসিত, কিন্তু বিধির বিপাকে তাহাদের বিবাহ হইল না; অম্বিকা আজীবন কুমারী ছিল, ইহাই নাকি তাহার কোষ্ঠীর ফল। গদাধর এক ধনী জমিদারের কন্যা মানদাকে আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিল, কিন্তু মানদা তাহার স্বামী গদাধর অপেক্ষা তাহার গহনা বেশী ভালবাসিত, এমন কি তাহার শিশুপুত্রটিও মাতার অবহেলায় মৃত্যুশয্যায় জল জল করিয়া মারা গেল। মানদা তখন অন্য বাড়ীতে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল, সেখানে তাহার কাপড়ে হঠাৎ আগুন ধরিয়া সে মারা গেল। এ দিকে অম্বিকাও জলে ডুবিয়া মারা গেল। সে একবার জলমগ্ন গদাধরকে জলে ঝাঁপ দিয়া উদ্ধার করিয়াছিল, আর একবার ভ্রমবশতঃ গদাধর জলে ডুবিতেছে মনে করিয়া, তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া নিজে জলে ডুবিল। গ্রন্থকার এইরূপে গদাধর বেচারার উপর দুঃখের পর দুঃখের বোঝা চাপাইয়া তাহার প্রতি নিতান্ত অবিচার করিয়াছেন। গ্রন্থকার

বোধ হয় একখানা ট্রাজেডি লিখিবার অভিপ্রায়ে এরূপ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে poetic justice রক্ষা পায় নাই। যাহা হউক গদাধরের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় আদর্শ চরিত্র বঙ্গসাহিত্যে খুব বিরল। কিন্তু গ্রন্থের নাম গদাধর না হইয়া মানদা হইল কেন? গ্রন্থকার দেখিতেছি গ্রন্থের নামকরণে স্ত্রীলোকের নামেরই অধিকতর পক্ষপাতী।

স্বপ্নময়ী। এই উপন্যাসে আর একটি জিতেন্দ্রিয় আদর্শ পুরুষ চরিত্রকে নায়করূপে কল্পনা করা হইয়াছে; তাহার নাম আনন্দ। গদাধরের ন্যায় সেও একটি বড় উকীল হইয়াছিল। কিন্তু সে বিবাহ করে নাই। সে স্বপ্নে একটি পরমা সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সেই স্বপ্নময়ী ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার প্রতিবেশী প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার হৃদয়নাথ বাবুর প্রতিভা নাম্নী ঠিক সেইরূপ একটি মেয়ে ছিল; হৃদয় বাবু যখন তাহার সহিত আনন্দের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন আনন্দ মেয়ে না দেখিয়াই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। এ দিকে প্রতিভাসুন্দরী আনন্দকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছিল। কিন্তু আনন্দ যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল তখন সে গড়বাথানের জমিদার পত্নী হইতে আপত্তি করিল না। বিবাহের পরেও সে আনন্দকে ভুলিতে পারে নাই। সে তাহার স্বামীর দ্বারা আনন্দকে তাহাদের জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করাইল। আনন্দ যখন চাকুরি করিতে গেল, তখন সে গোপনে আনন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রেম নিবেদন করিল। আনন্দ সেই স্বপ্নময়ীকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, কিন্তু সেখান হইতে পলাইয়া গিয়া ওকালতী আরম্ভ করিল। আনন্দ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া প্রতিভা তাহার স্বামীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। আনন্দর ওকালতীতে ক্রমে পসার বৃদ্ধি হইল, সে প্রতিভার পিতা ও স্বামীকে দুইটি বড় মোকদ্দমায় প্রাণপণে সাহায্য করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার করিল; সে জন্য এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিল না। প্রতিভা এক দিন কম্পিত হৃদয়ে তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে এক ছড়া হীরক হার উপহার দিতে গেলে আনন্দ তাহা প্রত্যর্পণ করিল। গ্রন্থকার প্রতিভাকে পাপের পিচ্ছিল পথ হইতে অতি সাবধানে রক্ষা করিয়াছেন।

মোক্ষদা। এই উপন্যাসেও আর একটি আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। করুণ ও অরুণ নামক দুইটি জমিদারের পুত্রকে এবং তাহাদের দুইটি ছেলে কৃষ্ণকিশোর ও রাধাকিশোরকে পাশাপাশি ধরা হইয়াছে। করুণ সচ্চরিত্র, বিদ্বান, বুদ্ধিমান; তাহার মৃত্যুর পরে তাহার বিধবা পত্নী অতি দক্ষতার সহিত স্বামিত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুত্রকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিয়া বিবাহ দিলেন। অরুণ অসচ্চরিত্র, মূর্খ, বিলাসী,—তাহার পুত্র রাধাকিশোরও তদ্রূপ। অপব্যয়ে তাহাদের সম্পত্তি নষ্ট হইল। কৃষ্ণকিশোরের বিবাহ হইল কলিকাতার এক ডাক্তারের কন্যা মোক্ষদার সঙ্গে। তাহাদের বিবাহের সম্বন্ধ চলিতেছিল এই সময়ে মোক্ষদা পিতা মাতার কষ্ট অসহ্য হওয়ায় ছাদের উপরে উঠিয়া "স্নেহলতা"র ন্যায় কাপড়ে কেরাসিন মাখাইয়া আগুন ধরাইতেছিল, ঠিক এই সময়ে কৃষ্ণকিশোর তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী ছাদ হইতে দেখিতে পাইয়া লাফ দিয়া আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য কৃষ্ণকিশোর তাহাকে পূর্ব্বে দেখিতে পাইয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার মাতা যে তাহার অজ্ঞাতসারে এই বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছিলেন সে তাহা জানিত না। যাহা হউক তাহাদের বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল এবং এই ফাঁকে গ্রন্থকার একটা romantic ব্যাপার বর্ণনা করিবার অবসর পাইলেন। কৃষ্ণকিশোরের মাতা একটি আদর্শ হিন্দু বিধবা গৃহিণী।

অপরাজিতা। এই উপন্যাসখানি আগাগোড়া romantic পড়িতে বেশ আমোদ লাগে। কিন্তু লেখক ইহার নায়ক সুশীলকুমারকে একটি অসাধারণ fool (বোকা) বানাইয়াছেন। "Brevity is the soul of wit"—লেখক এই সত্যটি ভুলিয়া গিয়া practicul joketা এত দূর চালাইয়াছেন যে তাহা অনেকটা অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। এই উপন্যাসের নায়ক সুশীলকুমার খুব

বাল্যকালে বিবাহিত হইয়াছিল এবং বিবাহের পরে মাত্র একবার তাহার বালিকা স্ত্রীকে কালীঘাটের রাস্তায় খেলা করিতে দেখিয়াছিল। পরে সে সন্ন্যাসী হইয়া হরিদ্বারে যাইয়া বিঠুর বাবাজী নামক এক সাধু মহাত্মার শিষ্য হইল। কয়েক বৎসর পরে সে সেখানে অপরাজিতা নামক এক সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, তাহার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম কোথায় উড়িয়া গেল। পরে তাহাকে লইয়া পলায়ন করিয়া কাশীতে আসিতেছিল, পথে রেলের গাড়ীতে নিজের নাম ভাঁড়াইয়া অজ্ঞাতসারে একজন স্বদেশী ডাকাতি মোকদ্দমায় পলাতক আসামীর নামে আত্ম-পরিচয় দেওয়াতে সে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইল। পরে কলিকাতা হাইকোর্টে তাহার বিচার হইল, অপরাজিতার আত্মীয় স্বজন ব্যারিষ্টার লাগাইয়া তাহাকে বিচারে খালাস করিল। অবশেষে সে জানিতে পারিল অপরাজিতাই তাহার বিবাহিতা পত্নী। কিন্তু সে অপরাজিতাকে পরস্ত্রী মনে করিয়াই তাহার সঙ্গে পলাইয়া আসিয়াছিল। এখানে অপরাজিতার আত্মীয়-স্বজন তাহার সহিত অপরাজিতার বিবাহ দিবে একথাও সে বিশ্বাস করিয়াছিল! অপরাজিতার পিতামাতাই অপরাজিতাকে জামাই ধরিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া হরিদ্বারে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু বিঠুর বাবাজীর মত একজন সাধু পুরুষ কেন এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া সুশীলকে এতদিন পর্য্যন্ত বোকা বানাইয়া রাখিলেন ইহা বুঝা যায় না। যাহা হউক অপরাজিতা চরিত্রটি বেশ চিত্তাকর্ষক এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যের জন্য গ্রন্থখানি মোটের উপর সুখপাঠ্য হইয়াছে।

সুকুমারী। এই উপন্যাসেও practical jokeএর পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে এবং তাহা স্বভাবের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। মিঃ গুপ্ত ব্যারিষ্টার, ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী মিঃ দত্তের কন্যা সুকুমারীকে বিবাহ করেন। সুকুমারী তাঁহার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া কথায় কথায় প্রতিজ্ঞা করেন যে দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাঁহার স্বামী মারা পড়েন, তবে তিনি কখনও আবার বিবাহ করিবেন না। তিনি নিজের গহনা বিক্রয় করিয়া স্বামীকে স্বাস্থ্যলাভের জন্য সমুদ্র যাত্রায় পাঠাইলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার স্বামীর খানসামা আসিয়া প্রকাশ করিল যে মিঃ গুপ্ত জাহাজে কলেরা হইয়া মারা গিয়াছেন, মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রীকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন—"তুমি বিবাহ করিয়া সুখী হও।" মিঃ গুপ্তের এক আজীবন বন্ধু মিঃ পি, কে, বসু ওয়ালটিয়ারে ডাক্তারি করিতেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করিতেন। তিনি সমুদ্রকূলে মিঃ গুপ্তের মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। দুই বন্ধুর মধ্যে একদিন তর্ক হইতে হইতে ডাঃ বসু বলিলেন সুকুমারী যে আবার বিবাহ করিবে না ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। মিঃ গুপ্ত সুস্থ হইয়া কলিকাতায় আসিলেন কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর কোন সন্ধান পাইলেন না, পরে তাঁহাকে ভারতবর্ষের নানা স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এদিকে সুকুমারী পতিশোকে অধীর হইয়া তাহার পিতা-মাতার সহিত নানা তীর্থস্থানে বেড়াইয়া ওয়ালটেয়ারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে ডাক্তার পি, কে, বসুর সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হয়, ক্রমে তাহা খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। সুকুমারীকে পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তার বসু প্রকাশ করেন না যে তাহার স্বামী জীবিত, অধিকন্তু তিনি নিজে সুকুমারীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। সুকুমারী এক অসংবৃত মুহূর্ত্তে সেই বিবাহে সম্মত হয়। বিবাহের দিনস্থির হইলে প্রাণতোষিণী নামক সুকুমারীর এক সখী আসিয়া ডাঃ বসুর উপরে রূপের সৌন্দর্য্য ও চিত্তের মাধুর্য্য বিস্তার করিয়া বসিলেন। ডাঃ বসু বিবাহের দিন সংবাদ দিয়া মিঃ গুপ্তকে আনাইলেন সুতরাং সুকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ না হইয়া প্রাণতোষিণীর সহিত হইল। সুকুমারী তাহার দুর্ব্বলতার জন্য চিরদিনের জন্য স্বামীর নিকট লজ্জিত হইয়া রহিল। ডাঃ বসু একজন উচ্চ শিক্ষিত লোক হইয়া কি প্রকারে তাঁহার বন্ধুপত্নীকে এরূপ স্বামীর নিকট অপদস্থ করিলেন, ইহাই কি তাঁহার বন্ধুপ্রীতির নিদর্শন? বাস্তব জীবনে practical joke এতদূর গড়াইতে পারে না। উপন্যাস খানি মোটের উপর খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

পূর্ণিমা। একখানি গল্পের বই, ইহাতে চারিটি গল্প বা ক্ষুদ্র উপন্যাস আছে—"পূর্ণিমা", "মনিয়া", "অন্নদা" ও "ভামিনী"।

পূর্ণিমা এক জমিদারের পুত্রবধূ হইয়া বিধবা হইল। তাহার বাল্যকালের সখা যোগেশ বিলাত হইতে আসিয়া তাহার ম্যানেজার হইল, কিন্তু পূর্ণিমা প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। পরে চিনিতে পারিয়া তাহার পূর্ব্বপ্রেম স্মরণ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিল।

অন্নদা এক ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের মেয়ে, তাহার স্বামী তাহার তাচ্ছিল্যে নিরুদ্দেশ হওয়ায় তাহার পিতা জামাতাকে মৃত জ্ঞানে তাহার পুনর্ব্বার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু সেই বিবাহ সভায় তাহার স্বামী ফিরিয়া আসাতে বিবাহ বন্ধ হইল, অন্নদা স্বামীর পদ ধারণ করিয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

মনিয়া একটি পশ্চিমে মেয়ে, গৃহ পলাতকা বঙ্কুবিহারী হাজারিবাগে তাহাকে বিবাহ করিল; পরে সে দেশে ফিরিয়া আসিয়া অন্য একটি যুবতীকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে দার্জ্জিলিঙ গেল। মনিয়া পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া দার্জ্জিলিঙ গিয়া বঙ্কুর বাসায় চাকর হইল। বঙ্কু শীকার করিতে যাইয়া তাহাকে গুলি করিল, কিন্তু সে বাঁচিয়া উঠিল। বঙ্কু অন্য যুবতী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া এবং মনিয়ার পরিচয় পাইয়া তাহাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

ভামিনী এক জমিদারের কন্যা, তাহার পিতা ঋণগ্রস্ত হইয়া তাঁহার সম্পত্তি একজন হাইকোর্টের উকিলকে বিক্রয় করিলেন, এবং ভামিনীকে সেই উকিলের এম ডি পাশকরা ছেলে শরতের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। শরতের এক বাল্যসখী ছিল, তাহার নাম প্রভা। তাহার সঙ্গে মেলামেশা করাতে, গোবর্দ্ধন নামক ভামিনীর পিতার দেওয়ান পুত্র ধূমকেতুর ন্যায় আসিয়া তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল ও ভামিনীকে লইয়া চম্পট দিল। তখন শরৎ প্রভাকে বিবাহ করিল। ভামিনী গোবর্দ্ধন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, ও হৃতসর্ব্বস্ব হইল। অবশেষে তাহার সন্তানের মায়ায় বহু কষ্টে আসিয়া শরতের বাড়ীর চাকরাণী হইল। সেই শিশু সন্তানটি তাহার ক্রোড়ে মারা গেল, সে নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহার মৃত্যুকালে শরৎ তাহার চিকিৎসা করিল কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

পঞ্চরত্ন। আর একখানি গল্পের বই, ইহাতে পাঁচটি গল্প আছে—কুলীনকুমারী, প্রণয় পরীক্ষা, ভ্রান্তির পরিণাম, সত্যের জয় ও বারুণী।

কুলীনকুমারী গীতার বিবাহের সম্বন্ধ প্রথমে যুগলকিশোর নামক এক জমিদার পুত্রের সহিত হইয়াছিল, কিন্তু বর অকুলীন বলিয়া গীতার পিতা তাহাতে সম্মত হন নাই। পরে ঘটনাচক্রে পড়িয়া যুগলকিশোরই তাহাকে বিবাহ করিল।

প্রণয়পরীক্ষা—হেমেন্দ্রনাথ নামক এক এম-এ বি-এল পাশ করা পেস্কারের স্ত্রী সুলেখা, তাহার এক বাল্যসখী, সবজজের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী সুরমার পরামর্শে স্বামীর প্রণয় পরীক্ষা করিল। পরীক্ষায় হেমেন্দ্র অবশ্য পাশ ই হইল। যে এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করিয়াছিল, সে এই সামান্য পরীক্ষায় ফেল হইবে কেন?

ভ্রান্তির পরিণাম—নব্যযুবক মোহনলাল কলিকাতার একটি একাদশ বর্ষীয়া কনেকে বিবাহ করিয়া তাহার পিতার সহিত হাওড়া ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠিল। সেই গাড়ীতে মিরজাপুরের এক বুড়া ডেপুটী তৃতীয় পক্ষে প্রমীলা নাম্নী এক কিশোরীকে বিবাহ করিয়া ফিরিতেছিলেন। মোহনলালের পিতার চেহারা কতকটা সেই বুড়া ডেপুটির চেহারার মত ছিল এবং উভয়ে এক রকমের গায়ের কাপড় ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই জন্য ভুল ক্রমে দুইটি কনের অদল বদল হইল। মোহনলাল বাড়ী পৌছিয়া সেই ভুল বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ী বর্দ্ধমানে গিয়া বৌয়ের অদল বদল সারিয়া আসিল। ইহার বহু বৎসর পরে মোহনলাল হাঁসপাতালে প্রমীলার পরিচয় পাইল—প্রমীলা তখন বিধবা, কিন্তু সে তখনও মোহনলালের প্রতি প্রেমাসক্ত।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (শেষ বয়সের ছবি)

সত্যের জয়—গল্পটিতে একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সত্যনিষ্ঠা ও একজন অত্যাচারী জমিদারের হিংস্র স্বভাব দেখান হইয়াছে। পরে ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠার প্রভাবে সেই হিংস্রজন্তুও বাধ্য হইয়া তাহার পুত্রের সহিত ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিল।

বারুণী—বি-এ পাশকরা নবীন যুবক পুণ্ডরীকাক্ষ তাহার সুন্দরী ষোড়শী স্ত্রী সুশীলাকে লইয়া বড় সুখে ছিল। কি কুক্ষণে তাহারা গঙ্গাসাগর স্নানে যাইয়া একটী ক্ষুদ্র জলমগ্ন বালিকাকে উদ্ধার করিয়া ঘরে আনিল। তাহার নাম হইল বারুণী এবং কালক্রমে সে যৌবন প্রাপ্ত হইয়া পুণ্ডরীকের মন হরণ করিল। সুশীলার সন্তান না হওয়ায়, সে ই উদ্যোগ করিয়া বারুণীর সহিত স্বামীর বিবাহ দিয়া নিজে বিষ খাইয়া মরিল — ঠিক সূর্য্যমুখী যেমন নগেন্দ্রনাথের সহিত কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিয়া গৃহত্যাগিনী হইয়াছিল; আবার নগেন্দ্রনাথের ন্যায় পুণ্ডরীকও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "সুশীলা কেন তুমি এ কায করিলে?"

মনোমোহন বাবু এত গুলি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বাহাদুরি এই যে ইহার কোনটি ঠিক অন্যটির মত হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থ গুলিতে সমাজ-সমস্যা প্রকটন, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, আর্টের নামে ক্রমাগত পাপ-চিত্রোদ্‌ঘাটন প্রভৃতি নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেক গুলি আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত থাকাতে তাহারা পাঠক পাঠিকাগণকে পুণ্যের পথ প্রদর্শন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল আনন্দ প্রদান করে। প্লট যাহাই হউক, রচনা সর্ব্বত্র সরস ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট, পড়িতে কোথাও ক্লান্তি আসে না। বর্ণনাগুলির অনেক স্থলে হাস্যরসে মনোরম। মনমোহন বাবু বঙ্গসাহিত্যে একজন সুরসিক লেখক বলিয়া গণ্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

অক্ষয়কুমারের স্মরণে

("ঢাকা সাহিত্য সমাজ" ও "ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঐতিহাসিক সমিতি"তে প্রদত্ত বক্তৃতা।)

গত পরশ্ব, ৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৩৬—রাজসাহীতে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের অনাথবন্ধু প্রমুখ পুত্রগণ অক্ষয়কুমারের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া পিতার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার নিবেদন করিয়াছেন। পরলোকগত পিতার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা নিবেদন হিন্দুদের ধর্ম্মক্রিয়ার অঙ্গ, উহাতে দিন ক্ষণ মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োজন হয়। অক্ষয়কুমারের গুণমুগ্ধ বন্ধু বান্ধবগণের, শিষ্য প্রশিষ্যগণের, শিষ্যাভিমানীগণের এই পরলোকগত পুরুষ সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ঐকান্তিক মর্ম্ম ক্রিয়ার অন্তর্গত; বৎসরের সকল দিন সমস্ত তিথি সর্ব্বক্ষণ তাহার জন্য প্রশস্ত। হে আকাশস্থ নিরালম্ব পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই সভায় সমবেত জনমণ্ডলীর পুঞ্জীভূত অকপট বেগবতী শ্রদ্ধা ভোগবতীর উৎসের মত ঊর্দ্ধে উচ্ছ্রিত হইয়া তুমি যেখানেই থাক তোমাকে স্নপিত করুক।

বন্ধুজনকে বিদায় দিবার সময় আমরা "যাও" বলি না, "এস" বলি। আমরা সর্ব্বদা কামনা করি তাঁহাদের গমন যেন পুনরাগমনায় হয়। আপনার বন্ধু আমার বন্ধু দেশের বন্ধু পুরুষ সিংহগণ এই যে দেশ হইতে একে একে বিদায় লইয়া যাইতেছেন, ইঁহাদিগকে বিদায় দিবার সময় কি সেই একই কথা বলিয়া বিদায় দিব না? ক্লান্ত হইয়াছিলে ভাই, যাও দুদিন বিশ্রাম কর। শরীর রোগে জর্জ্জর হইয়াছিল, তাও জীর্ণ বস্ত্রের মত রোগ দৌর্ব্বল্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া অদম্য স্বাস্থ্যের নবীন বসনে ভূষিত হইয়া নব বলে বলীয়ান হইয়া আসিয়া আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। তোমাদের

কর্ম্ম জীবনের অবসান এবং ফিরিয়া নবীন কর্ম্ম জীবনের আরম্ভ ইহাদের মধ্যে ২০।২৫ টা বছরের ব্যবধান বইত নয়! আমরা পাদশতাব্দীর এই বিরহ সহিব, কিন্তু তাহার অন্তে তোমাদিগকে চাই, তোমাদিগকে না হইলে চলিবে না।

অবিশ্বাসী বলিবেন, ইহা মনকে চোখঠারা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমি তর্ক করিব না। এই যে আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ, জগদিন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রকুমার, অক্ষয়কুমার, এবং আরও দেশের কত সুসন্তান যেন ষড়যন্ত্র করিয়া দুর্দিন আগে পাছে চলিয়া গেলেন, ইঁহারা জন্মভূমিকে কেমন ভাল বাসিতেন? যেমন কোলের শিশু মা'কে ভালবাসে তেমনি তদ্‌গত ঐকান্তিকতার সহিত। জন্মভূমির প্রতি এই যে ঐকান্তিকী প্রীতি, জীবনে তাহাই তাঁহাদের কর্ম্মপ্রেরণা ছিল। বাষ্প যেমন করিয়া এঞ্জিনকে চালায়, এই প্রীতিই তেমনি তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মে শক্তি যোগাইত। সারা জীবনের সাধনায়ও কিন্তু তাঁহারা জন্মভূমিকে দিকে দিকে বিজয়শ্রীমণ্ডিত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা তাঁহাদের একান্ত ভালবাসার এই দেশকে ফেলিয়া এক জীবনের কর্ম্মের অবসানেই কর্ম্মত্যাগী হইবেন, এ প্রস্তাব যেন নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়! তাঁহাদেরই ঐকান্তিক সাধনার দারুণ দুঃস্বপ্নের তিমির রজনী প্রভাত হইয়া আসিয়াছে—পূর্ব্বাকাশে আলোকের আভাস দেখা যাইতেছে। কিন্তু কালচক্রের গতিরোধ করিতে আলোকের আভাসটুকু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিতে কত ঝঞ্ঝা, কত মেঘ যে উদ্যত হইয়া আছে, তাহা তাঁহাদের অপেক্ষা আর কে ভাল জানে? তাঁহারা যেন ইহা ভাল মতই বুঝিয়াছেন, বুঝিয়াছিলেন যে রুদ্ধগতি কালচক্রকে সচল করিতে একবার চক্রনেমিতে সমবেত ভাবে স্কন্ধ প্রয়োগ করিতে হইবে। তাই তাঁহারা যেন পরামর্শ করিয়াই চলিয়া গিয়াছেন— দল বাঁধিয়াই আবার ফিরিবেন।

আমাদের দেশে সকলেরই বিশ্বাস, কামনা সম্পূর্ণ থাকিতে মুক্তি নাই, হাতের কায না ফুরাইতে ছুটি নাই। অক্ষয়কুমারের কামনা যে কেমন অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালার ইতিহাস লইয়া যাঁহারাই একটু নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তাহা ভালমত জানেন। গৌড়রাজমালার উপক্রমণিকায় তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে তাঁহার সঙ্কলিত "গৌড় বিবরণ" আট ভাগে বিভক্ত হইবে। যথাঃ—রাজমালা, শিল্পকলা, বিবরণমালা, লেখমালা, গ্রন্থমালা, জাতিতত্ত্ব, শ্রীমূর্ত্তিতত্ত্ব ও উপাসক সম্প্রদায়। সকলেই জানেন, তাঁহার সঙ্কলিত এই বিরাট গৌড়বিবরণের অনেক অঙ্গের বিবরণ প্রকাশেরই তিনি ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। শুধু গৌড় বিবরণই নহে, ভারত মহাসাগরে ও তাহার কূলে অবস্থিত বৃহত্তর ভারতের ভারতীয়, বিশেষতঃ বাঙ্গালীগণের প্রভাব বিস্তারের ইতিহাস সংগ্রহের সঙ্কল্পও তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। "সাহিত্যে"র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁহার "সাগরিকা" বেলাভূমির ফেনোচ্ছ্বাস মাত্র। অথচ আমরা সকলেই জানি যে গভীর নীল স্থির বারিধিও তাঁহার পক্ষে দুরবগাহ ছিল না। আজ বৃহত্তর ভারত পরিষৎ তাঁহার সেই সঙ্কল্পিত কার্য্যভার নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন। অদ্যকার সভার সভাপতি এই ক্ষেত্রের একজন প্রধান কর্ম্মী। কিন্তু এই বিষয়ে প্রাণের দরদ অক্ষয়কুমার অপেক্ষা কোন বাঙ্গালীরই বেশী ছিল না ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। বাঁচিয়া থাকিলে অক্ষয়কুমার প্রবল অনুরাগের সহিত এক্ষেত্রে কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন ইহা দৃঢ়তার সহিতই বলা যায়।

এইরূপে অক্ষয়কুমারের অনেক সঙ্কল্পই কার্য্যে পরিণত হয় নাই, অনেক কামনাই অপূর্ণ রহিয়াছে। অথচ আমরা সকলেই বলি যে সারা জীবনের সাধনায় তিনি এই সকল কর্য্যের জন্যই অসাধারণ ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রয়োগের অবসর আর পাইলেন না। সংসারের দারুণ নিষ্পেষণে রোগজর্জ্জর দেহের অক্ষমতায় তিনি মনের সাধ মনেই লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। যত অকথিত বাণী, অগীত গান, বিফল বাসনা রাশি তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসরকে নিশ্চয়ই তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বে শক্তির অপচয় নাই, সাধানার বিনাশ নাই তাঁহার কায তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল, ফিরিয়া আবার তাঁহাকেই করিতে হইবে।

পণ্ডিতগণ বলেন, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধিই প্রতিভা। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার বুদ্ধির আশ্চর্য্য নব নব উন্মেষ দেখাইয়াছেন। যেখানে অনুসন্ধেয় আর কিছু নাই বলিয়া দশজনে অনুসন্ধানের

শেষ করিয়া রাখিয়াছে, অক্ষয়কুমারের প্রতিভা সেইখানেই ফিরিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীর উল্লেখ করিতে পারি। Holwell লিখিয়া গিয়াছেন "আমাদের ১৪৬ জনকে এই এত খানি লম্বা এত খানি চৌড়া ঘরের মধ্যে সারা রাত আট্‌কাইয়া রাখিয়াছিল, গরমে সবাই মরিয়া গেল, কেবল আমরা ২৩জন বাঁচিয়া রহিলাম।" ইহার সহিত আবার অসহ্য গ্রীষ্ম কষ্ট পাইবার এবং একে একে সঙ্গিগণের মৃত্যুর এমন মিল্টনোচিত বর্ণনা তিনি দিলেন যে ঐতিহাসিকগণ মনেই করিতে পারিলেন না যে উহার উপরও আবার কোন কথা চলে! অক্ষয়কুমার উকীলের জেরার মুখে ফেলিয়া Holwellএর এমন হৃদয় বিদারক বর্ণনাকেও কিন্তু উড়াইয়া দিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন যে Holwell কথিত অন্ধকূপের আয়তন যদি ঠিক হয়,—যদি উহা অত হাত লম্বা, অতহাত চৌড়াই হইয়া থাকে, তবে ১৪৬ জন লোক কোন মতেই উহাতে ধারিতে পারে না—পিঠাপিঠি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিলেও নহে!

বাঙ্গালা দেশে প্রত্নচর্চ্চা হইয়া আসিতেছে আজ অনেক দিন। সেই ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্স্‌ কর্ত্তৃক কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর হইতে ভারতের প্রত্নচর্চ্চার ধারা বাঙ্গলা দেশেই খরবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রামদাস সেন সেই ধারার বেগ বর্দ্ধিত করিতে কম সহায়তা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রেরও কৃতিত্ব এই ক্ষেত্রে কম নয়। তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রকে অনেক ঐতিহাসিকই তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের পরে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও এ ধারা সজীব রাখিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালায় প্রত্নচর্চ্চার স্কন্ধে যখন সংশয়পূর্ণ কুলপঞ্জিকা-জীবী "জাতীয় ইতিহাস" চাপিয়া বসিল এবং প্রমাণ স্বরূপ সে কল্পিত ঘটকের পুঁথী হইতে কল্পিত শ্লোক আওড়াইতে লাগিল—তখন পাথুরে প্রমাণের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিবার কল্পনা অক্ষয়কুমারের মস্তিষ্কেই উদিত হইয়াছিল। সেই কালের রাজসাহীর মত দুরধিগম্য সহরে বসিয়া এই তরুণ প্রত্নপ্রেমিক আইনজীবী এমন সাহস কেমন করিয়া করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া নিতান্তই বিস্মিত হইতে হয়। সাধু যাহার উদ্দেশ্য ভগবান তাহার সহায়। দেখিতে দেখিতে অষ্টবজ্র সম্মিলন সঙ্ঘটিত হইয়া গেল। চুম্বক যেন অচিরেই কাঁচা লোহাকেও চুম্বকের গুণবিশিষ্ট করিয়া তোলে, অক্ষয়কুমারের সংস্পর্শে আসিয়া কর্ম্মিগণের কর্ম্ম ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ তো তেমনি পাইলই, শক্তিমান অলসগণও আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। কুমার শরৎকুমার রায় শুধু রৌপ্যপ্রেরণা জোগাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না—বরেন্দ্রীয় পল্লীতে পল্লীতে অক্ষয়কুমার-প্রমুখ কর্ম্মিগণকে লইয়া অক্লান্তকর্ম্মা হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নব প্রতিষ্ঠিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি দিনে দিনে নব নব শ্রীমণ্ডিত হইতে লাগিল।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের "গৌড়রাজমালা" যখন বাহির হইল তখন আমরা সদ্য কলেজ হইতে বাহির হইয়াছি মাত্র। কি আনন্দে কি আবেগের সহিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানিকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম, তাহা আজ আপনারা অনুমানই করিতে পারিবেন না। ভিখারীর সহসা কোহিনুর কুড়াইয়া পাওয়া, জ্যোতিষামোদীর সহসা নব জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার, মহাসাগরে নাবিকের সহসা নব ভূখণ্ড দর্শন ইত্যাদির উপমা দিয়াও ঐ আনন্দ বুঝাইতে পারিব না! অক্ষয়কুমারের সম্পাদনে এই গৌড়রাজমালা বাহির হয়, উহারই ভূমিকায় সম্পূর্ণাঙ্গ গৌড়বিবরণ কি প্রকৃতির হইবে, অক্ষয়কুমার তাহা আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন।

গৌড়রাজমালা বাহির হইবার পুর্ব্বে বাঙ্গালার ইতিহাস দুই চারিখানা ছিল যথা—পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী কৃত গৌড়ের ইতিহাস ইত্যাদি। রামচরিতের ভূমিকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও বাঙ্গালার প্রাগ্‌মুসলমান যুগের ইতিহাসের এক চমৎকার রেখাচিত্র আঁকিয়াছিলেন। ইহাদের কোনটারই মূল্য কম নহে। এ যেন শিল্পীর প্রতিমা গড়িবার চেষ্টা—কোনও চেষ্টাই সম্পূর্ণাঙ্গ হইল না, কোন প্রতিমারই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল না। গৌড়রাজমালা বাহির হইবামাত্রই সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে এতদিনে শিল্পীর চেষ্টা সফল হইয়াছে। প্রতিমা সম্পূর্ণ হয় নাই বটে, তবে উহাতে

প্রাণ আসিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। আর পাথরে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রস্তর প্রাসাদ—ধুলা বালির উপাদানে গঠিত ইহা খোলা ঘর নহে। ঘটক-কারিকার জীবীভুত পুঞ্জীভূত এত প্রস্তর দেখিয়া সভয়ে সরিয়া পড়িল!

ইহার পরে গৌড়লেখমালা বাহির হইয়াছে। গৌড় গ্রন্থমালারও দুই চারি খানা বাহির হইয়াছে। অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা শ্রীমূর্ত্তি সংগ্রহে চিত্রবিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। সকলেরই মূলে অক্ষয়কুমারের প্রেরণা। তাঁহার সহচর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকের কর্ম্মশক্তি এবং কুমার শরৎকুমার রায়ের শুধু কর্ম্ম-শক্তি নহে, ঐকান্তিক শারীরিক পরিশ্রম। এই সহকারী সম্পর্ক বিবর্জ্জিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালা দেশে এক বিস্ময়কর ঘটনা। শক্তিশালী ডাইনামোর মত অক্ষয়কুমার চারিদ্দিকে কতখানি শক্তি জাগাইতে পারিতেন ইহা তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহার পরে সরকারী সাহায্যে ঢাকায় চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; রাঢ়ে নামসর্ব্বস্ব "রাঢ় অনুসন্ধান সমিতি" এবং বীরভূমে কথঞ্চিৎকর্ম্মা "বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের সকল গুলিরই মূলে প্রেরণা রহিয়াছে ঐ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির আদর্শ। নিঃস্বার্থ কর্ম্মী, এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত, প্রত্নপ্রেমিক মহাজন—এই দুইএর সমবায় ভিন্ন এই আদর্শকে জীবন্ত রাখা যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আজ সারা দেশেই এই দুইএরই অভাব অনুভূত হইতেছে, এমন কি অক্ষয়কুমারের অত সাধের বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিও এই রাহুর দশার প্রভাব এড়াইতে পারিতেছে না।

কর্ম্মজীবনে অক্ষয়কুমারের সহিত বহুবার আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, সকল বারেই তাঁহার নিকট হইতে কিছু না আহরণ করিয়াই লইয়া আসিয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে মূর্ত্তি সম্বন্ধে আমার একখানা বহি বাহির হইয়াছে। গত পূজার বন্ধে বহিখানি অক্ষয়কুমারকে উপহার দিয়া ধন্য হইয়াছি—নিয়ে লিখিয়াছিলাম "শিষ্যাভিমানী নলিনীকান্ত"। ইহা বিনয় নহে, ইহা আমার অন্তরের কথা। তাঁহার শিষ্য হইবার যোগ্যতা এবং সুযোগ লাভ করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রভাব আমার এই লাঞ্ছিত জীবনে যতখানি কায করিয়াছে, অত আর কাহারও নহে। আজ তাঁহার এই শিষ্যাভিমানী অনুরক্ত ভক্ত "পুনরাগমনায় চ" বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিতেছে।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

যৎকিঞ্চিৎ

এই সবে কা'ল সন্ধ্যার পরে 'রবি-বাসরে'র কয়েকজন সুধী, সহৃদয়, সাহিত্যিক আমাকে ধ'রে বস্‌লেন যে, আজকার এই বাসরে আমাকে একটা প্রবন্ধ পাঠ করতে হবে; অর্থাৎ, হয় তাঁরা মনে করেন আমি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত, আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী দেবীর মৌরসী আসন, আমি কলম নিয়ে বস্‌লেই প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবন্ধ যা হয় একটা লিখে ফেল্‌তে পারি, আর তাতে আমার বেশী সময় দরকার হয় না; আর না হয়, তাঁরা ধ'রে নিয়েছিলেন, আমার মত নিরেট মূর্খ বৃদ্ধকে উপলক্ষ করে একটু আমোদ করবেন বা একটু রহস্য করবেন। হয়ত তাঁদের মধ্যে এমনও কেউ আছেন, যাঁরা আজকের নির্দ্দিষ্ট লেখক নীলমণিকে না সংগ্রহ করতে পেরে এই ঝুটো মণিকে দিয়ে, যাকে বলে 'দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানো'' সেই রকম একটা কিছু করবেন। তাঁরা যাই মনে করে আমার উপর এই পঞ্চর ঘন্টার নোটিস দেন না কেন, আমি তাঁদের এই নিগ্রহ মাথা পেতে নিতে বাধ্য, কারণ তাঁরা সকলেই আমার বিশেষ স্নেহভাজন এবং আমার অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়েই অধিকতর কৃতি।

তাঁদের আদেশ উপেক্ষা করবার স্পর্দ্ধা আমার নাই, তাই 'তাই ত' 'তাই ত' বল্‌তে বল্‌তে তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে বাড়ী আসা পর্য্যন্ত সারা পথটা শুধু ভাবতে

ভাবতে এলাম, তাই ত, কি লিখি? কলিকাতার এই আলোক-দীপ্ত রাজপথ আমার এ ভাবনার কোন সমাধানই করতে পারল না।

বাসায় এসে মনে করলাম, দেখি ত আমার পুরাতন কাগজগুলো নেড়ে-চেড়ে, তার মধ্যে যদি আমার এই আসন্ন বিপদ-ভঞ্জন কেহ থাকেন।

আমার কাগজ-পত্র থাকেন দুই তিনটা ঝুড়ি বোঝাই হয়ে—বাক্স, পেটরা, দেরাজ, আলমারীর কোন বালাই আমার নেই, বিশেষ এই সুদীর্ঘ জীবনে এমন কিছুই সঞ্চয় করি নি বা সযত্নে বাক্স আলমারীতে তুলে রাখা যেতে পারে। আমার সেই ঝুড়িগুলোকে আজকালকার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন C. I. D. দের মত Search করতে করতে হায়-রাণ হয়ে পড়লাম, রবি-বাসরের সদস্যদের পাতে পরিবেশন করবার মত কিছুই যে পাইনে—সুধু ছেলেমেয়েদের বিয়ের হিসাবপত্র, ভাউচার, দোকানের ফর্দ্দ আর ছেলেদের A, B, C, D লেখা কপিবুক। অবশেষে একটা ঝুড়ির এক কোণে একখানি Palgraveএ ইংরজী কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক পাওয়া গেল। তার মধ্যে পেন্সিলে লেখা খান পাঁচ-সাত কাগজ। পেন্সিল দিয়ে লেখা, আর সে লেখা যে কতদিন আগেকার তার জন্ম-নক্ষত্র কোষ্ঠী ঠিকুজি আমি সংগ্রহ করতে পারলাম না। সেই কাগজ কয়খানি নকল করে এনে আজকের এই দুর্ব্বহ ভার কাঁধ থেকে নামাবার সঙ্কল্প করেছি।

এইখানে আমার ব্যক্তিগত কথা আরও একটু না বললে আমার এই খুঁজে পাওয়া প্রবন্ধের স্বরূপ নির্ণয়ের সুবিধা হবে না।

আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে আমি খেয়ালের বশে সব করি, কি বিষয় কর্ম্ম, কি সাহিত্য-সেবা সবই আমার খেয়াল। জীবনে কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা আমি অনুসরণ করতে পারিনি। এই সাহিত্য-সেবাই ধরুন। যখন যা মনে হয়েছে, তা করেছি। এ রকম খেয়াল যে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় না, এ কথা আপনাদের কাছে আর বল্‌তে হবে না। তার ফল এই হয়েছে যে, ইংরাজীতে যাকে বলে Jack of all trades, master of none আমরাও তাই হয়েছে; আমি পল্লবগ্রাহী হয়ে বসে আছি।

এই খেয়ালের বশে আমি কখনো সাহিত্য, কখনো ইতিহাস, কখনো উপনিষদ, কখনো বেদান্ত, কখনও বা কাব্য চর্চ্চা করেছি; আর সে চর্চ্চা খেয়ালের বশে দু চার মাস পরেই ছেড়ে দিয়েছি, কোনটাই অভিনিবেশ সহকারে দীর্ঘ দিন আলোচনা করা হয় নি। সুতরাং সে সব পড়া বল্‌তে গেলে না-পড়ারই সামিল হয়েছে—কোন ফলই হয় নি। এই অবস্থায় একবার খেয়াল চাপল যে গীতি কবিতা, ইংরাজিতে যাকে বলে 'লিরিক্' তাই পড়ব। মাস কতক ঐ লিরিকই ধরে থাকলাম। তার পরে যেমন হয়ে থাকে, ও পাঠ ছেড়ে দিলাম। সেই খেয়ালের বশে যখন যা পড়তাম, সেই সম্বন্ধে তখন যা মনে উঠ্‌ত, তা লিখে রাখ-তাম। তা হলেই বুঝতে পারছেন, কোন বিষয় পড়বার সময় খেয়ালের বশে যা যেমন-তেমন করে নোট ক'রে রাখতাম, তা আমার সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত। তখন যা লিখ্‌তাম, পরবর্ত্তী সময়ে বা আবহমান কাল যে সেই মতই আমি পোষণ করে আস্‌ছি, একথা বল্‌লে; নিজের উপর অবিচার করা হবে; বিশেষতঃ, যাঁরা সত্যসত্য সাহিত্য-রসিক, তাঁদের অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন ও অধিকতর আলোচনার ফলে অনেক সময়ই পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তিত, এমন কি পরিবর্জ্জিতও হয়ে থাকে।

আমি যখন 'লিরিকে'র আলোচনা করতাম, সেই সময় পেন্সিল দিয়ে যা-তা কাগজে দুই চারটে কথা লিখে রেখেছিলাম। কাল রাত্রিতে দপ্তরের ঝুড়ি নাড়তে-চাড়তে Palgraveর কবিতা-সংগ্রহের মধ্যে এই রকম নোট-লেখা খানকয়েক কাগজের টুকরা পেয়ে গেলাম। সেই টুকরাগুলো আমার মেয়ে কে দিয়ে নকল করিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির করছি। আমার সৌভাগ্য, আর আপনাদের দুর্ভাগ্য যে, আজ এই রবিবাসরে আমার সেই পুরাতন পচা, হয়ত অখাদ্যও, পরিবেশন করবার স্পর্দ্ধা আমার হয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এ ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না, তা আমার শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে যাঁরই যে ধারণা থাকুক না কেন। সুতরং আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বা নোট যে গীতি কবিতা সম্বন্ধেই লিখিত, তা আপনারা বুঝতে পারছেন। এখন আমার সেই বিক্ষিপ্ত নোটগুলো আপনাদের শুনিয়ে দিই।

কবিতা কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়।

বস্তুতঃ এক কথায় গীতি-কবিতার সংজ্ঞা এবং স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব।

প্রাচীনকালে যে কবিতাগুলি সঙ্গীত রূপে ব্যবহৃত হইত, অথবা যে গুলি বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে গীত হইত, সেগুলিকে 'লিরিক' অর্থাৎ গীতি-কবিতা বলা হইত। এই ভাবে সঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত বা গীতি-ধর্ম্মাত্মক ও কথ্য বা বাক্যাত্মক এই দুই শ্রেণীর কাব্য ছিল। প্রথমটীকে গীতি-কাব্য ও শেষোক্তটীকে বাক্য-কাব্য বলা যাইতে পারে। এক কথায় গান ও কবিতা দু'য়ে মিলে গীতি-কবিতা। নামহীন রূপহীন ভাবাবেগের সুরময় বিকাশই গান, আর সেই আবছায়া ভাব যখন কথার মূর্ত্তি ধরে তখন তাহা কবিতা। মূলতঃ ইহাই গীতি-কবিতার জন্মকথার আদিকাণ্ড।

কিন্তু অধুনা এত বিবিধ প্রকারের কবিতা রচিত হইয়াছে এবং লিরিক সংজ্ঞায় এমন অনেক কবিতা চলিতেছে যেগুলি মৌলিক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নহে। কোন্‌টি ঠিক গীতি-কবিতা এবং কোনটি নয়, তাহা সম্যক্ রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। তবুও কতকগুলি কবিতাকে গীতি-কবিতা বলা হয়। যে কবিতায় কেবল একটি কথা বা কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছে, সেগুলি গীতি-কবিতা নহে। যে কবিতায় কেবল কোন একটি বিষয় বর্ণিত হইতেছে, বর্ণনাত্মক ছন্দোময়ী সেই কবিতাকে আমরা গীতি-কবিতা বলিতে পারি না; দৃশ্য-কাব্য যে গীতি-কাব্য নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। অমিত্রাক্ষর অথবা হাস্য-রসাত্মক কবিতাকে এই শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায় না। ফলতঃ ছন্দোবদ্ধ ক্ষুদ্র কাব্য হইলেই তাহা গীতি-কবিতা নহে। কবির চরিত্র, বাসনা, প্রতিভা, সাধনা, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি ভেদে আজকাল খণ্ডকাব্যেরও অসংখ্য আকৃতি প্রকৃতি ভেদ হইতেছে, নানা রূপে নানা রসে কবির স্বকীয় প্রকাশ-ভঙ্গিমা লইয়া খণ্ড-কাব্য বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। তাহারা সকলেই লিরিক নহে। আমরা শুধু নেতি নেতি করিয়া যাইতেছি। গীতি-কবিতা তবে কি?

হৃদয়ের মধ্যে যখন একটা নিবিড় ভাব জাগরূক হয়, তখন সেই প্রেরণার আবেশে ভাবপ্রবণ কবি যে কাব্য লেখেন, তাহাই গীতি, এই মানসিক উত্তেজনার, এই হৃদয়াবেগের সৃষ্টিগুলিই প্রকৃত গীতি-কবিতা। গীতি-কবিতায় চিন্তা বা বিচারের বিশেষ আবশ্যক নাই, যত প্রয়োজনীয়তা এই অনুভাবের, এই হৃদয়ের আকুতির। সকল কবিই সত্যের সাধক। গীতি কবিতায় কিন্তু রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য, সত্য নিরূপণ করিবার জন্য বিচার ও ন্যায়ের ধার ধারিতে হয় না। সহৃদয় কবি আপনার হৃদয়ের সহজাত ধর্ম্মের বলে স্বতঃই যাহা নির্ণয় করেন তাহা সত্যের বিরোধী হয় না। এই যে সহানুভূতি, এইযে সহৃদয়তা, লিরিক রচয়িতার তাহা থাকা চাই, কারণ তিনি হৃদয়বৃত্তির কবি। পরকে আপনার মধ্যে এবং আপনাকে পরের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া চাই। মানুষকে ভালবাসিতে না পারিলে কবি হওয়া যায় না। মনুষ্য-জীবনের প্রতি দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায় তরঙ্গিত মানব-জন্মের প্রতি সহানুভূতি থাকা চাই। গীতি-কবিতার মূলে প্রেমের প্রেরণা। প্রেমই পৃথিবীর সকল বড় কাব্যের উৎস।

কবিতা শুধু কবির ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা নহে, তিনি যাহা বলিতে চান, তাহা শুধু তাঁর নিজের কাছে সত্য নহে, তাহা বিশ্বের—প্রত্যেক মানবের কাছে তার একটা সার্থকতা আছে। শুধু একজনের মনের ভাব হইলে সে কবিতার কোন মূল্য থাকিত না। সকল মানুষের মনের সঙ্গে তার একটা যোগ থাকা চাই। সাহিত্য শাশ্বত ভাবেরই অভিব্যক্তি। প্রকাশের আদিতে হল ভাবৈশ্বর্য্য। গীতি কবিতা এই ভাব স্পন্দনের কথা-

গীতি-কবিতা কবির স্বকীয় মানসসিদ্ধ, তাঁহার নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করা।

জীবনের তপশ্চর্য্যায় যিনি যতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছেন, ঐশী শক্তিতে আর্য নয়নে জীবনের রস, জগৎ-তত্ত্বের মূল কথা দেখিতে পাইয়াছেন, তিনি ততখানি মৌলিকতা রাখিয়া গিয়াছেন। এই Subjective অর্থাৎ কবির আপন হৃদয়ের অনুভূতি—নিজ কল্পনার ফল—তাঁহার স্বাধীন মানসিকতাই গীতি-কবিতার লক্ষণ। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, কবির ব্যক্তিগত অথচ সার্ব্বজনীন চিন্তা-উপলব্ধি আশা-নিরাশা ব্যথা বেদনার যে গান তাহাই গীতি-কবিতা। অনেকের মতে এইটেই এই জাতীয় কবিতায় প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিমেষের আবেগকে উপলক্ষ

করিয়া একটি পরিস্ফুট ও গভীর সংগীত, একটি মৃত্যুহীন শব্দ কবি-হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়া অনন্ত অজানার পথে প্রয়াণ করিতেছে।

দুটি কথায় সময়ে সময়ে গীতি-কবিতায় সংক্ষেপে একটি অনুপম ভাব ইসারা বা সঙ্কেতে রঙে বা রেখায় ফুটিয়া উঠে, যাহা আমাদের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত, বিহ্বল করিয়া তোলে—পাঠকের মন অনন্ত অজানার সন্ধান পাইয়া আত্মহারা হইয়া যায়। জগতের সৌন্দর্য্য সুষমার রাণী অবগুণ্ঠিতা হইয়া আছেন। কবি আনন্দের আবেগে জীবনের সুখকর মুহূর্ত্তে সময়ে সময়ে এই লাবণ্যময়ীর সামীপ্য লাভ করে। অবগুণ্ঠিত এই অরূপ রূপসীর আবরণ বিমোচনই কবির কর্ত্তব্য

আর এক কথা। গীতি-কাব্যে শুধু একটি মাত্র ভাব, একটি মাত্র অবস্থা এবং শুধু একটি অবেগোচ্ছাস ফুটে উঠ্‌বে। গীতি-কবিতার উদ্দেশ্য হইতেছে যে কবি মাস-সের ভাব পাঠকের মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া। সে রচনা পাঠে বা শ্রবণে মনে একটা অনির্ব্বচনীয় ভাব জাগিয়া উঠিবে—স্থায়ী-রসের উদ্রেক হইবে। কবির সুখ, দুঃখ, অশ্রু-হাসি, আশা-আকাঙ্ক্ষা পাঠকেরও অন্তরের জিনিস হয়ে ওঠা চাই।

ভাবুকতা, তাত্ত্বিকতা এই গীতি-কবিতার বৈশিষ্ট্য—উহাতে নিসর্গ প্রকৃতির অথবা পার্থিব বস্তু বিষয়ের সম্পর্ক অত্যল্প। গীতি-কবিতার কাছে বস্তুটা বড় নয়, সেই বস্তু কবির মনে যে ভাব জাগিয়ে দেয়, সেই ভাবটি যত বড়। এই ভাবই গীতি-কাব্যের প্রাণ। বাস্তবের চেয়ে অবাস্তব কল্পনা তাই গীতি-কাব্যে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। গীতি-কবি ভাবপ্রবণ। কাল্পনিক আবেগ উচ্ছ্বাসের স্রোতে মনস্তত্ত্বের জোয়ারে তাঁহার কুল কিনারা পাওয়া যায় না। তিনি কখনো স্বর্গে, কখনো মর্ত্তে, ত্রিভুবন ঘুরিতেছেন। এই জগতের শোভা-সুষমায় জলে স্থলে আকাশে বাতাসে যেখানে যা কিছু আনন্দ উপভোগ্য আছে কবির কাছে সে সকল ধরা দেওয়া, পৃথিবীর মাটির মানুষ প্রজ্ঞা ও প্রতিভা বলে যা কিছু অনুভব, যা কিছু অসম্ভব সৃষ্টি করিতে পারে গীতি-কবি তাহাই করেন।

কাব্যের আত্মা হইতে এবার আমরা কাব্যের শরীরে আসিলাম। গীতি-কবিতার ভাষা এমন সুন্দর হওয়া চাই, যাহাতে কবি-মনের অনন্ত ভাব-বৈচিত্র্য সুচারু রূপে প্রকাশ পায়। ভাষাকে ভাবের অনুরূপ বাহন করিতে হইবে। কবিতার রীতি, ভাষা ছন্দ, ভঙ্গি, ধ্বনি, ঝঙ্কার কবির ভাব-প্রকাশের সুযোগ্য হওয়া দরকার। গীতি-কবিতার শব্দ-সম্পদ সত্য ও সৌন্দর্য্যের উপাদান, শিল্পের চারুতা, পদের মাধুর্য্য ও পদ্য-স্তবকের কারুকার্য্য থাকিবে। কবি-হৃদয়ের সকল প্রকার ভাবেরই রূপ যেন সেই ভাষার নিগড়ে ধরা পড়ে। হর্ষ, বিষাদ, শোক, ব্যথা, বেদনা, বর্ব্বতা, অশ্রুহাসি, বিস্ময়, উল্লাস, উন্মাদনা, মহানন্দ—কবি যখনই যে ভাবের ভাবুক হইবেন, ভাষাও যথাযোগ্য হইবে। আত্মার কথা থাক, বাহ্যরূপ দেখিয়াই যেন আমরা নিঃশংশয়ে বলিতে পারি—এটি গীতি-কবিতা।

আমার নোট এখানেই শেষ হয়েছে। এর উপর টীকা টিপ্পনী, বা এর রদ-বদল করবার আমার সময় নেই, আর সময় থাক্‌লেও এখন তা পারতাম না, কারণ এ 'লিরিকে'র ব্রহ্মদৈত্য অনেক দিন হোলো আমার স্কন্ধ থেকে নেমে গিয়েছেন। এ অবস্থায় আমার ঐ নোট গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করবার অধিকার আমার লোপ পেয়েছে। আমি বল্‌তে গেলে, ও প্রসঙ্গটা একেবারে ভুলেই গিয়েছি; অন্যান্য বিষয়ের খেয়াল যেমন আমার স্মৃতিপথ থেকে এক রকম অন্তর্হিত হয়েছে, গীতি-কবিতার আলেচনারও সেই দশা হয়েছে। এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের মধ্যে ভাল কবি ও কবিতা-রসজ্ঞ আছেন। আমি তাঁদের দরবারে আমার সেই অনেক-কাল আগের নোট দাখিল করে দিচ্ছি। এতে আর কিছু না হোক, আজকার এই 'রবিবাসরে' তাঁদের আলোচনার একটা পথ আমি নির্দ্দেশ ক'রে দিলাম। এর বেশী আর আমার বল্‌বার কিছু নেই। তবে গীতি-কবিতার আলোচনা অপেক্ষা এই শীতের অপরাহ্ণে এক পেয়ালা চা যে অধিক উপাদেয়, এ কথা আমি না বলে থাক্‌তে পারছিনে। *

শ্রীজলধর সেন।

* 'রবিবাসরে'র ৫ম অধিবেশনে পঠিত।

জোর্ডিণো ব্রুণোর দার্শনিক মত

জোর্ডিণো ব্রুণো ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপল্‌সের নিকট নোলা (Nola) নগরে জন্মগ্রহণ করতঃ অতি শৈশবেই ডমিনিক্ ভিক্ষু সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিকোলাস্ কুজা (১), রেমণ্ড লালী (২) ও টেলেসিউসের(৩) গ্রন্থ পাঠে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তিনি প্রকৃতির প্রতিও প্রগাঢ় অনুরক্ত ছিলেন। এই সকল কারণে সন্ন্যাস ধর্ম্ম, ক্যাথলিক কিংবা প্রটেষ্ট্যাণ্ট কোন ধর্ম্মেই তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। তিনি প্যারী, লণ্ডন এবং জর্ম্মানির কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণান্তর পুনরায় ইটালীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ভেনিস নগরে কারারুদ্ধ হন।

ব্রুণোর জীবনকাল অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধকে ইউরোপের পক্ষে এক সঙ্কট কাল বলা যাইতে পারে। ঐ সময়ে সর্ব্বত্রই রিফর্ম্মেশনের স্রোত বহিতেছিল। একদিকে রোমান্ ক্যাথলিকদিগের সহিত প্রটেষ্ট্যাণ্টদিগের মনোমালিন্য, অপর দিকে ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্ট্যাণ্ট উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত বৈজ্ঞানিকদিগের মতবিরোধ লইয়া আন্দোলন চলিতে থাকে। ইন্‌কুইজিশনের (Inquisition) তাড়নায় সময় সময় ঐ আন্দোলন যে কি বিষময় ফল প্রসব করিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। ব্রুণোও ঐ আন্দোলনের আবর্ত্তে পড়িয়া আত্মদান করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাসে ব্রুণো আধুনিক যুগের প্রবর্ত্তক বলিয়া গণ্য। তাঁহার মৃত্যুর বৎসর অর্থাৎ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ঐ যুগের গণনা করা হয়। ব্রুণোই সর্ব্বপ্রথম কোপার্ণিকাসের হেলিওসেণ্ট্রিক্ (Heliocentric) সৌরমণ্ডলের ধারণাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার বিবেচনায় অ্যারিষ্টটল-প্রবর্ত্তিত স্বর্গ ও মর্ত্তের ধারণা সম্পূর্ণ অলীক; স্বর্গ ও মর্ত্ত বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বিভাগ নাই, অ্যারিষ্টটল-কল্পিত স্বর্গের স্তরগুলিও পৃথিবীর মতই কতকগুলি গতিশীল বস্তু এবং পৃথিবী হইতে সেগুলির ব্যবধান কোন দুর্লঙ্ঘ্য কারণ বশতঃ কেবল পুণ্যাত্মা ব্যক্তি, দেবদূত অথবা দেবতার বাসের জন্যও নিরূপিত হয় নাই। যে বস্তুগুলিকে অ্যারিষ্টটল্ স্বর্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহাদের প্রত্যেকেই পৃথিবীর মত এক একটি গ্রহ বিশেষ। শুধু তাহাই নয়, ব্রুণো আরও বলেন যে, তথাকথিত স্বর্গ অনন্ত বিশ্বেরই এক অংশ এবং আমরা নগ্ন দৃষ্টিতে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহাদের প্রত্যেকেই এক একটি সূর্য্যস্বরূপ, প্রত্যেকের পৃথক পৃথক উপগ্রহও আছে। পৃথিবীও জগতের কেন্দ্র নয়। পৃথিবীকে যদি জগতের কেন্দ্র বলিতে হয়, তাহা হইলে সূর্য্যকেই বা তদ্রূপ কোন জগতের কেন্দ্র বলা না হইবে কেন? উভয়েই ত গ্রহ।

ব্রুণোর ন্যায় একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বিশ্বের বিশালতা সম্বন্ধে যখন এইরূপ উদার ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার দার্শনিক মতও যে তদনুরূপ উদার হইবে; তাহা সহজেই অনুমানযোগ্য। ব্রুণো বলিলেন, বিশ্ব যদি অসীম ও অনন্ত হয়, তবে ত তাহা এক এবং অদ্বিতীয় হইতেও বাধ্য। কেন না, দুইটি অসীম ও অনন্ত বস্তুর একত্র অবস্থান অসম্ভব, তাহা হইলে একের দ্বারা অপরে খণ্ডিত না হইয়া পারে না। বিশ্বকে যদি অনন্ত বল, তাহা হইলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই অনন্ত নহেন। তবে কি ঈশ্বর সান্ত ও সসীম? অসম্ভব কথা। আসল কথা এই যে, দুই-ই এক। যে বিশ্ব, সেই-ই ঈশ্বর। কিন্তু এ স্থলেও ত গোল বাধে। যে বিশ্ব সেই যদি ঈশ্বর হয়, তবে বিশ্বের বিকাশ হয় কিরূপে? আপনা-আপনি? সৃষ্টির অনন্ত নৈপুণ্য, অলঙ্ঘ্য নিয়ম, অসীম সৌন্দর্য্য—এই সকল ব্যাপার তাহা হইলে আসে কোথা হইতে? এই সকল ক্রিয়ার অভ্যন্তরে কি অনন্ত ইচ্ছার সূচনা হয় না? ব্রুণো বলেন, হয় না

(১) ইনি মধ্যযুগের একজন খ্রীষ্টীয় দার্শনিক। স্বয়ং "কার্ডিন্যাল" হইয়াও ইনি খ্রীষ্টীয় দর্শন শাস্ত্রের ভ্রম দর্শাইয়াছিলেন। অ্যারিষ্টটলের মতের বিরোধী হইয়া নিকোলাস্ রহস্যবাদের চর্চ্চা করিতেন।

(২) ত্রয়োদশ শতাব্দীর দার্শনিক। ইনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। সহস্রাধিক গ্রন্থের লেখক। ইনি মনে করিতেন যে যাবতীয় প্রাকৃতিক রহস্য বিচারবুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত।

(৩) বার্ণার্ডিণো টেলেসিউস্ অভিজ্ঞতা-মূলক প্রকৃতিবাদের পক্ষপাতী ছিলেন।

একথা ত বলি নাই। অবশ্যই হয়। তবে কথা কি?—এই যে "ইচ্ছা," ইহা বাহিরের বস্তু নয় ইহা বিশ্বেরই অন্তর্লীন ভাব। ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্তার বিকাশ, অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বিভাবে বিরাজ করিতেছেন;—এক দিকে ঈশ্বর বিরাট্‌রূপে স্বয়ং, অপর দিকে তদ্ভাব-প্রসূত জগৎ। আধ্যাত্মিক ভাবে তিনি বিশ্বের কারণ, নিয়ন্তা, এবং শাসক; লৌকিক ভাবে তাঁহার বিকাশ, যাহা সৃষ্টি বলিয়া উক্ত হয়। এই দুইটি ভাবকে ব্রুণো যথাক্রমে natura naturans এবং natura naturata বলিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ব্রুণোর মতে ঈশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা কিংবা প্রথম সঞ্চালক নহেন. বস্তুতঃ তিনি বিশ্বের আত্মা-স্বরূপ, স্পিনোজা (Spinoza) যাহাকে সৃষ্টির অভ্যন্তরীণ কারণ বলিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি একাধারে জড় (matter) এবং রূপ (form) উভয়েরই কারণ; তাঁহার ভাবের বহির্ম্মুখীন প্রবাহে জগতের সৃষ্টি হইতেছে, আর অন্তর্ম্মুখীন প্রবাহে তিনি ঐ সকল ব্যাপারকে আয়ত্তাধীন রাখিয়াছেন। সৃষ্টবস্তু মাত্রই সান্ত, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অনন্তত্বের হানি হয় না। ঈশ্বর unfolds himself অর্থাৎ আপনাকে আপনি ব্যক্ত করিতেছেন এবং তাহারই ফলে, সৃষ্টির অভ্যন্তরে, শ্রেণী ও জাতির নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্তর্ম্মুখীন ভাবে তিনি স্বয়ং সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন (Absolute) থাকিয়াও বহির্ম্মুখীন ভাবে নিখিল জগতে অনুপ্রবিষ্ট, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্ব ভূতের অস্তিত্ব, সর্ব্বজীবের জীবত্ব। তিনি তৃণ দলে বিদ্যমান, বালুকণায় বিদ্যমান, সূর্য্যকিরণে ভাসমান, অণুকণায় বিদ্যমান; আবার একাধারে অনন্তেও বিরাজমান। (৪) অনন্ত এক সর্ব্বভূতে বিদ্যমান বলিয়াই না জগতের সজীবতা। অনন্ত একের সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা হেতু প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুই সজীব, কিছুরই বিনাশ নাই; মৃত্যুও জীবনের স্তর পরিবর্ত্তন মাত্র। (৫)

ব্রুণো জড়কে গ্রীক দার্শনিক কিংবা খ্রীষ্টীয় দার্শনিকদিগের ন্যায় অসত্তা (me on) বলেন নাই, পরন্তু জড়ের স্বকীয় অস্তিত্বই স্বীকার করিয়াছেন; জড় রূপেরই মত ঈশ্বরের আদি ভাবের সহিত অভিন্ন। তাহা বাহিরের বস্তু নয়, অথবা রূপের উপরও নির্ভরশীল নয়, অর্থাৎ তাহা ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি। তিনি পরাও বলেন, এই যে যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহাই মূলতঃ নিখিল সৃষ্টির বীজরূপে অবস্থিত হইয়া নানা রূপে এবং নানা ভাবে প্রকটিত হইতেছে। (৬) ব্রুণো বীজের নানা ভাবে প্রকাশ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল—

বীজকে যদি প্রথম ধরা যায়, তাহা হইলে বীজ হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে শস্য, শস্য হইতে অন্ন, অন্ন হইতে অন্ন-রস, অন্ন-রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে শুক্র, শুক্র হইতে ভ্রূণ, ভ্রূণ হইতে মানব-শিশু, মানব শিশু হইতে হইতে পূর্ণাবয়ব মানব এবং তাহা হইতে শব দেহের উৎপত্তি হইয়া মৃত্তিকায় মিলিত হয়। অতএব প্রথমে যাহা বীজ ছিল, তাহাই [illegible] পুনরায় মৃত্তিকায় প্রত্যাবৃত্ত হইল। আমরাও ত বলিয়া থাকি, মাটির দেহ মাটিতে মিশায়। ব্রুণোও সেই কথাই বলিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, মৃত্তিকার বস্তু মৃত্তিকায় মিশিলেই তাহার নিবৃত্তি হয় না, তাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ নব দেহ ধারণ করিয়া উদ্ভিদাদি জীবস্তর অতিক্রম করিতে হয়। অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে জগতে এমন কোন বস্তু নিত্য বিদ্যমান, যাহা কোটি

(৪) ব্রুণোর দার্শনিক মতের সহিত হিন্দু দর্শনের স্থলে স্থলে আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। সময় সময় মনে হয় তিনি যেন গীতায় ধৃত শ্রীভগবানের উক্তিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বরের সর্ব্বভূতে বিদ্যমানতা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য—

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥৯ ইত্যাদি ৭ম অধ্যায়।

(৫) মৃত্যুসম্বন্ধে ব্রুণো যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সংসারতাপদগ্ধ শোককাতর হিন্দুর একমাত্র ভরসাস্থল গীতার সেই অমর শ্লোকটিও মনে পড়ে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২, ২য় অঃ

(৬) গীতা, ৭ম অধ্যায় ১০ শ্লোক,—
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

কোটি রূপে প্রকাশিত হইয়াও মূলতঃ একই থাকে। সেই বস্তুকে জড় বা matter বলিলেও তাহা শাশ্বত এবং অতীন্দ্রিয় এবং তাহাই যাবতীয় রূপ ও অবয়বের আধার রূপে আত্মসত্তা হইতে অনন্ত প্রকৃতির উৎপাদন করিতেছে। জীব মাত্রেরই মৃত্যু নব জীবোৎপত্তির হেতু। যখনই আমরা জীব বিশেষের মৃত্যুর কথা বলি, তখনই আমাদের বুঝা উচি যে, উক্ত জীবের স্থলে এক বা একাধিক জীবের জন্ম হইল। ব্রুণো মানবাত্মাকে পার্থিব জীবনের সর্ব্বোত্তম এবং চরম অভিব্যক্তি বলিয়াছেন। যে শক্তি প্রভাবে যবগুচ্ছ হইতে মানব জন্ম সম্ভবপর, সেই শক্তি প্রভাবেই সহস্র সহস্র জীবনের সারাংশ হইতে মানব আত্মার উৎপত্তি হইয়াছে।

জীব মাত্রই দেহ এবং আত্মা বিশিষ্ট। প্রত্যেকেই এক একটি শক্তিকেন্দ্র বা শক্তি-মণ্ডল (a living monad)। যাবতীয় শক্তিমণ্ডলের আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের ফলে যে এক মহান্ অদ্বিতীয় শক্তিমণ্ডলের (Monad of all monads) উদ্ভব হইয়াছে, তাহাই বিশ্বরূপ ভগবান। প্রত্যেক মণ্ডলে সঙ্কোচন ও প্রসারণ রূপ দুইটি প্রবাহ বিদ্যমান থাকায় জন্ম ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। প্রসারণ কালই জীবন; সঙ্কোচন মৃত্যু।

ব্রুণোর দার্শনিক মতগুলি আলোচনা করিলে তন্মধ্যে বহু বিভিন্ন মতের নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি স্বয়ং সে সকল মতের বিশ্লেষণ না করিলেও লাইবনিজ, ডিডিরো, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক তাহাদের যথাযথ পুষ্টিসাধন হইয়াছে। মোটের উপর ব্রুণোই আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত, আদর্শ এবং জড়, কল্পনা এবং অবধারণ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাব সকলের সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এই সমন্বয় বা ঐক্য সম্পাদনই বর্ত্তমান যুগের দার্শনিক মীমাংসার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী।

অ-বাক্

ওগো, নীরবেই থাকো
চোখের ভাষায় ব'লেছ যা সখী
এ জীবনে কভু তাহা ভুলিব কি
হৃদয়ের মাঝে যে আলো চমকি
উঠেছে, নিবিবেনাকো।
চাহিনা মুখের বাণী
সোহাগে কণ্ঠে জড়ায়েছ পাণি
অধরে অধর মিলায়েছ রাণি!
সেই সুখ সদা সুধাসম মানি
স্মরিব আননখানি।

নহে ক্ষণিকের প্রীতি
অন্তরে তব লিখেছি প্রতিমা
সুষমার তার নাহি নাহি সীমা
তব প্রণয়ের পুণ্য মহিমা
ভাস্বর রবে নিতি।
হোক্, তবে তাই হোক্;
শুধু নয়নের মিলনে মোদের
শুধু অনুভবে স্নেহ আদরের
ঝরিয়া পড়ুক উৎস রসের
রচিয়া স্বর্গলোক।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

জীবন-সমস্যা

অমর কবি তো হাসিতে হাসিতে গাহিয়া গিয়াছেন "প্রাণ রাখিতে হই যে প্রাণান্ত"—আর আমরা আজীবন মর্ম্মে মর্ম্মে তাহার যাথার্থ্য কাঁদিতে কাঁদিতেই অনুভব করিতেছি! দণ্ডধর রাজাধিরাজ হইতে অক্ষম বিকলাঙ্গ পঙ্গু পর্য্যন্ত সকলেরই এই দশা—প্রাণ রাখিতে সকলকেই প্রাণান্ত হইতে হইতেছে। মুমূর্ষু রোগীর যে নাভিশ্বাস তাহার মধ্যেও এই প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত চেষ্টারই স্ফুরণ। শ্বাসযন্ত্র বিকল, হৃৎপিণ্ড হাপর টানিতে ফাঁপরে পড়িয়া গিয়াছে, তবুও দেহীর চেষ্টা সজোরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালাইয়া প্রাণটাকে যদি বাঁধিয়া রাখিতে পারে।

যোগী সন্ন্যাসিগণ যে পাহাড় পর্ব্বতে নির্জ্জন গুহায় ধ্যান তপস্যাতে পর্ণাদ বা পবনাশন হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর কাটাইয়া দিতেছেন তার মধ্যেও এই প্রাণ রাখিবার প্রাণান্ত চেষ্টাই পরিস্ফুট। তবে তাঁহাদের লক্ষ্য উচ্চতর। তাঁহারা প্রাণটাকে ইহলোকে সহস্রবৎসর রাখিয়াই খুসী নহেন, পরলোকেও যাহাতে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ধ্রুব কি এমনি একটা সুবিধামত লোকে প্রাণটাকে কায়েমি মৌরসি বন্দোবস্তে রাখিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের এত প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা!

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বসিয়া প্রাণান্ত হইতেছেন যাহাতে প্রাণটাকে আরও বেশী সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারে রাখিতে পারা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনে। যুধিষ্ঠিরের মত দেহ সহিত প্রাণটাকে লইয়া লোকান্তরে ভ্রমণ করিবার পন্থা আবিষ্কার চেষ্টারও ত্রুটি নাই তাহা সকলে প্রত্যক্ষই দেখিতেছেন; আরও কত দেখিবেন!

আয়ুর্ব্বেদ এই প্রাণটাকে সুস্থ সবল ভোগক্ষম করিয়া দীর্ঘকাল অব্যাহত ভাবে রাখিবার জন্য আসব অরিষ্ট মোদক রসায়ন বাজীকরণ যোগাদির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। শত চেষ্টা সত্ত্বেও যখন সুঠাম দেহ শিথিল হতে থাকে, যখন দন্ত পড়িল, চুল পাকিল, যৌবনে ভাটি পড়িল তখন মনে আগেকার প্রশ্ন জাগিয়া উঠে "গোঁসাই কোন্ রংএ বেঁধেছ ঘর এ যে মিছে ভঙ্গ বাজি" তখনও ষড়্গুণ বলিজারিত সহস্র পুটিত মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাস, কেশকল্প, মৃতসঞ্জীবনী! তার উপরও টেক্কা দিলেন এক ডাক্তার সাহেব বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে নব যৌবন দিবার প্রলোভনে বানর বিশেষের গলদেশস্থ পেশী বিশেষ নরের পেশীর স্থনে বদল করিয়া অথবা জোড় কলম বাঁধিয়া দিয়া! এ কি কম প্রলোভন? ডাক্তারের প্রাঙ্গণে দলে দলে বৃদ্ধ বৃদ্ধার ভিড় লাগিয়া গেল!

আহা বেচারা টাইথোনাস্ এখন কোথায়? এই সুযোগে সে নিজের বোকামির দোষটা শোধন করিয়া লইতে পারিত, অমর হইয়াও মরার জন্য আগ্রহ ও আক্ষেপ আর করিতে হইত না!

যাক্, ও-সব বড় বড় কথা—আমরা ক্ষুদ্র আদার ব্যাপারি মানোয়ারী জাহাজের খবরে আর কায কি? তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রাণ রাখিবার প্রাণান্ত চেষ্টাটাই কি কম? চারিদিকে নানা শত্রু মুখব্যাদান করিয়া আছে—ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বসন্ত, টাইফয়েড, ক্ষয়, যক্ষ্মা, কলেরা, কর্কট—ইঁহারা সব তো সংখ্যায় অগুন্তি। সাপ আছেন, বাঘ আছেন, কুমীর আছেন, বরাহ আছেন, ধনিক আছেন বণিক আছেন, ইঁহাদের কবল হইতে প্রাণটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে কি বেগটাই যে পাইতে হয় তা সরকারী কাগজ-পত্রেই প্রকট!

তারপর মেঘনাদের মত আকাশস্থ অদৃশ্য শত্রুর দলও তো কম নয়। ব্যাক্‌টিরিয়া, ব্যাসিলাস, ইঁহাদের গোষ্ঠীর তো অন্ত নাই, সন্তান সন্ততিও অসংখ্য! সর্ব্বঘটে ইঁহাদের অধিষ্ঠান! ইঁহারা হাওয়ার মধ্যে বেমালুম মিশিয়া থাকেন, জলের সঙ্গেও গলাগলি ভাব, খাদ্য দ্রব্যাদিতেও ইঁহাদের সর্ব্বদা সদ্ভাব! শাস্ত্রে যে সব ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতির কথা আছে—যে তাঁরা সুবিধা পাইলেই ঘাড় মট্‌কে মানুষের রক্তপান করেন—তাঁহাদিগকে আজ-কালকার অবিশ্বাসের দিনে মিছা কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু আসলে তাঁরা এরাই! আমি বলিতেছি তাই আপনারা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, কিন্তু কাল ডক্টর ডালেলড্রাক, কি মিচেনকফ যদি একটু ইঙ্গিত করেন তাহলেই দেখা যাইবে সকলেই তন্ত্রশাস্ত্র

ঘাঁটিয়া এঁদের পূজার ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতে থাকবেন আর কত esoteric অর্থই নিষ্কাসন করিবেন। যেমন সূর্য্য ঠাকুরের বেলায়। শাস্ত্র তে যুগযুগান্তর ধরিয়া বলিয়া আসছেন "আরোগ্যং ভাস্করা দিচ্ছেৎ" কিন্তু কেহ কি সে সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন কথায় কাণ দিয়াছেন? ছোট ছোট শিশু দিগকে আগে আভাং করে তেল মাখিয়ে পিঁড়িতে করে রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখা হইত। পশ্চিমে হাওয়া তখন উল্টা বহিতেছে সুতরাং সেটা অশিক্ষিতা অসভ্যা অমার্জ্জিতরুচি নারীগণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়ে দেওয়া হইল। কর্ম্মের ফেরে এই আবার হাওয়াটা ফিরিল; পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান নিষ্ণাত মহাত্মগণ ব্যক্ত করিলেন সূর্য্যঠাকুর ধন্বন্তরিকল্প বৈদ্য বটে। সৌর কিরণ-স্নানে অনন্ত কোটি ফল—অমনি পাশ্চাত্য ভাবে সৌর পূজার প্রার্ত্তন হতে লাগিল। Ultra violet ray ছাঁকিয়া লইবার জন্য যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল তদ্দ্বারা সৌর কিরণের shower bath দেওয়া হইতে লাগিল। হয়ত একদিন শিশি বোতল ভরিয়া পশ্চিম দেশ হইতে সৌর কিরণ পূর্ব্বের উদয়াচলের দেশে আসিতে আরম্ভ করিবে এ দেশের লোকের প্রাণ রাখিবার জন্য!

সুতরাং দেখুন আমাদের প্রাণ রাখার অন্তরায় কি কম? নানা জনে নানা রকমে আমাদের এই প্রাণবস্তু-টাকে গ্রাস করিবার জন্য চারিদিক হইতেই সর্ব্বদা প্রস্তুত। শঙ্কা সর্ব্বত্র।

এ সঙ্কটে উপায় কি? বিষ্ণুশর্ম্মার বেচারা কপোত কি কম দুঃখে বলেছিল "শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তমন্নং পানঞ্চ ভূতলে; প্রবৃত্তিঃ কুত্র কর্ত্তব্যা জীবিতব্যন্ কয়ং নু বা?" বড় খাঁটি কথা! কপোত বাবাজিকে কাছে পাইলে তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইয়া নিয়া বল্‌তাম "সাবাস বাবাজি! ঠিক্ বলেছ! কিই বা খাই আর বাঁচিই বা কি করে?"

প্রাণটা রাখা তো দরকার বটে—সেটা রাখিতে হইলেই দেহ-পিঞ্জরটাও চাই, কারন দেহ-বিহীন প্রাণটা ইহলোকে তো দেখা যায় না—শোনা যেটা যায় সেও বড় সুবিধার কথা নয়, প্রেতত্ব প্রাপ্তিরে সেটা নাকি ঘটে—আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ অবস্থা পূরক পিণ্ড দানের পরে শ্রাদ্ধান্তে ষোড়শ পিণ্ডদানে তবে তাহা হইতে মুক্তি!

দিনকাল যেরূপ পড়িয়াছে আর লোকের মনের যেরূপ অবস্থা—তাতে জীবিত কালেই পুত্রগণের নিকট অশ্রদ্ধার এক মুষ্টি অন্ন পাওয়াই দুষ্কর—তা জীবনান্তে প্রেতত্বে শ্রদ্ধার এক পিণ্ড প্রাপ্তিরই সম্ভাবনা কোথায়?

আর সেটা বুঝেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় রসিক বন্ধু কেদার বাবু কোষ্ঠির ফলাফলের সঙ্গী জয়হরি! কি লোকটাকেই দশ জনের সামনে চিত্রিত করিয়াছেন—একেবারে আদি ও অকৃত্রিম। "ভাব সেই একে"র উপাসক। সার বস্তু সেই বুঝিয়াছে! যেমন পেয়ারায়—তেমনি পেঁড়ায়!

কপোত ভায়ার সমস্যার কথা বলিতেছিলাম—আর আমার সমস্যাটাও সেই রকমই এ আভাসও দিয়াছি, সেটা ভাঙ্গিয়া বলিবার পূর্ব্বে আপনাদের দৃষ্টি কপোতের উক্তির ধ্বনিটির দিকে একটু আকর্ষণ করিতেছি।

অবস্থাটা বিবেচনা করুন। বৃদ্ধ দলপতির নেতৃত্বে তরুণ কপোত দল আকাশ পথে চলিতেছে! সকলেই শ্রমখিন্ন, ক্ষুৎ পিপাসাতুর। যাইতে যাইতে অধোমুখে যেমন দৃষ্টি-পাত অমনি তণ্ডুলকণা দর্শন। যেমন দর্শন, অমনি রসনা-লোল্য—উহা উদরসাৎ করিবার জন্য আগ্রহ! সহজেই অনু-মেয় যে এ আগ্রহটা তরুণ দলেরই, কারণ তাহারা বয়ো-ধর্ম্মে ভাবপ্রবণ, চিত্তবৃত্তি নিরোধে অক্ষম। স্বভাবতঃই তাহারা প্রবল প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যাইতেই প্রস্তুত! ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির অভাব তাহাদের মধ্যে বেশী! সুতরাং তাহারা তৎক্ষণৎে সংকল্প করিল—চল ভাই নেমে পড়া যাক্। এমন সুন্দর রসনার রসোৎপাদক তণ্ডুল-কণা পরিত্যাগ করা যায় না। দলপতি বৃদ্ধ অনেক ঠেকেছেন, অনেক শিখেছেন, সর্ব্বদাই বিচার বিতর্কশীল। গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "উঁহু—কথমস্মিন্নির্জ্জনে বনে তণ্ডুলকণানাং সম্ভবঃ। তন্ন ভদ্রং পশ্যামি!" নিশ্চয়ই এর মধ্যে আশঙ্কার কারণ গুপ্ত আছে। লাগ্‌লো নবীন আর প্রবীনে সংঘর্ষ—সবুজ কাঁচার সঙ্গে হলদে পাকার দ্বন্দ্ব! তরুণ কপোত তখন বড় রেগে দলপতির উপর কটাক্ষ ক'রে বিদ্রোহের নিশান খাড়া করলে। প্রবীণের ভীরু স্বভাবের প্রতি ইঙ্গিত করে তীব্র স্বরে বলে উঠ্‌লো, "পায় পায় অত বিধি নিষেধের শিকল পরে চল্‌তে গেলে কি আর কায চলে মশায়? আপনাদের তো কেবল সকল কাযেই বাধা

দেওয়ার ঝোঁক! ভয় ভয় করেন, এ দুনিয়ায় ভয় নাই কোথায়? আকাশে ভয়, বাতাসে ভয়, জলে ভয়, স্থলে ভয়, খাদ্যে ভয় পানীয়ে ভয়। সব মেনে চলতে গেলে বলুন তো কোনদিকেই বা যাই আর কি করেই বা বাঁচি?"—এটা তরুণের বড় অভিমান পূর্ণ অনুযোগ প্রাচীনের প্রতি! কল্পনা নেত্রে দেখিতে পারেন তরুণ কপোত কেমন করিয়া ঘাড় গলা ফুলাইয়া আরক্ত নয়নে কর্কশ ভাবে ঠোঁট নাড়িতে নাড়িতে কথা গুলি বলিতেছে! তাহার এই অভিমানের এই বিদ্রোহের ধ্বনিটা ঐ কথা গুলির মধ্যে কেমন প্রচ্ছন্ন আছে সেইটা একটু দেখাইবার জন্য এই ভাষ্য টুকু দ্বারা আপনাদিগকে ক্লিষ্ট করিলাম। এই ব্যাপারে সে বৃদ্ধের কথা গ্রাহ্য হয় নাই, তরুণ দলের মতই জয়যুক্ত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাহার উদর্ক বা উত্তর ফলটাও বিচার করিবেন। জালে আবদ্ধ হইয়া প্রাণনাশ। এই নবীন প্রবীণের সংঘর্ষটা কপোত ছাড়া হইয়া মানবের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছে, আর সেটা নানা দিক দিয়া নানা ভাবে বর্ত্তমান সময়ে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সমাজ ও সাহিত্য ইহা হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। সংঘর্ষের স্রোতোবেগ নানা আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া নির্ম্মল জল ঘোলা করিয়া তুলিতেছে—কাদা পাঁক ছোড়া ছুড়ির বাঁকি নাই! অবান্তর হইলেও প্রসঙ্গত এদিকেও আপনাদিগের একটু দৃষ্টি করিতে অনুরোধ করি। বয়োধর্ম্ম এবং দেশকাল পাত্র ভেদে ভাব ও মতের অনৈক্য হওয়াটা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে বরং সেইটাই স্বাভাবিক-কিন্তু Differ but bear and forbear এই কথাটা মনে রাখিয়া চলিলে অনেক গোলমালের সহজে নিষ্পত্তি হইয়া যাইতে পারে।

যাক্, এখন প্রস্তুতার্থে প্রবৃত্ত হই। আমি বলিতেছিলাম যে কপোত সমস্যা বিভীষিকায় আমিও অস্থির—তাই আজ আপনাদের কাছে সেটা উপস্থাপিত করিতেছি। স্বয়ং মাননীয় বিচারপতি সভার সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছেন, সাহিত্য সরোবরের নানা কলহংসকারণ্ডবাদি প্রাজ্ঞগণের সমাবেশে সভার শোভা বর্দ্ধিত—এখানে একটা কিছু সমাধান হইবেই যাহাতে প্রাণটা রাখিতে পারি।

প্রাণ রাখতেই তো নানাদিক দিয়া প্রাণান্ত হ'তেছে—বিশেষতঃ আজকালকার এই জীবন দুর্ম্মূল্যতার দিনে, আর ভেজালের ভেলকির দাপটে। তার পর আবার গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটক এই সব ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক প্রভৃতির দল! এই শেষেরাই আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন! তাই বলছি!

প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনের আশায় এক ছিলিম তামাক লইয়া বসিয়াছি, আর মে নেত্র নিমীলন করিয়া ধূমপান করিতেছি, ইতোমধ্যে ডাক্তার রায়ের জলদ গম্ভীর স্বর কাণে বাজিল—"ও মশায়, ও কি করছেন? বুড়োকালে তামাকুটা heartকে বড়ই affect করে; ওটা ছেড়ে দিলেই ভাল হয়! কি বলেন?" বলব আর কি? আমি তো অবাক্! ডাক্তার বলেন কি? ঘেটের কোলে ঘাইটে পৌঁছিতে চলেছি, মাতৃ-স্তন্যের সঙ্গেই বোধ হয় গড়াধর চণ্ডের মত তামাকও টানিয়া আসিতেছি—কারণ তামাক হীন জীবনের কথা তো স্মৃতির চোরা-কুঠরি খুঁজেও পাই না—আর তখন হইতে তামাকের practical পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে with distinction পাশ হইয়া আসিতেছি, কখনও তো হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্য টের পাই নাই। আর ডাক্তারবাবু বলেন ওটা ছেড়ে দিতে! এত কালের নিত্য সঙ্গী, সুখে দুঃখে একমাত্র নির্ভর, শোকাপনোদনের একমাত্র রামবাণ প্রিয়তম তাম্রকূটকে বর্জ্জন করিয়া প্রাণ ধারণ চেষ্টা! পথের সাথী একটা কুকুরকে ফেলিয়া যুধিষ্ঠির স্বর্গসুখও তুচ্ছ বোধে উপেক্ষা করিলেন, আর আমি কি এতই কৃতঘ্ন যে চির জীবনের সাথী তাম্রকূটকে হার্ট অ্যাফেক্ট করবে বলে এই জীবন-সায়াহ্নে পরিত্যাগ করিব? আর আমার কি তেমন হার্ট নাকি? সংসারে যে হৃদয় উপর্য্যুপরি শোক শেলাঘাত খাইয়াও ভাঙ্গা দূরে থাকুক একটু টোলও খায় নাই সে কি আজ তামাকের ধূমেই বিকল হয়ে যাবে? কিন্তু কে শোনে সে কথা! ডাক্তারদের গোঁ টা জীব বিশেষের গোঁ-এর মত, সুতরাং কি করি বলুন?

তারপর আজ-কাল সংসার তো ধর্ম্ম-কর্ম্মহীন। পূর্ব্বে মা-লক্ষ্মীরাই ও-দিকে একটু দৃষ্টি দিতেন, পূজা, অর্চ্চনা, বার, ব্রত, প্রভৃতি করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণটা আসটাও মিলিত। আর তাঁরা তখন স্বহস্তে নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য পানীয়, পায়স পিষ্টকাদি

প্রস্তুত করিতেন, সে যেন অমৃত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে যুগধর্ম্মের আবহাওয়ায় তাঁদেরও ও-সব বলাই গিয়াছে। তাঁহারা এখন অন্নপূর্ণার বেশ পরিত্যাগ করিয়া রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে মাসিকপত্র ক্ষেত্রে পুরুষদলন কার্য্যে ব্যাপৃতা। সুতরাং মাদৃশ উদরপরায়ণ মোদকপ্রিয় ব্যক্তির বড়ই মুস্কিল হইয়াছে। যদি বা কালে ভদ্রে একটা ফলারের নিমন্ত্রণ জুটে, তাই কি ছাই প্রাণভরিয়া উপভোগ করিবার সুবিধা আছে? হয়ত পাঁচ গণ্ডা মাত্র সুরসাল রসগোল্লা গলাধঃকরণ করিয়া ছয়গণ্ডার দিকে হাত চালাইতেছি অমনি উদ্যতশর দুষ্মন্তের প্রতি ঋষিকুমারদের 'ন হন্তব্য' নিষেধের মত ক্যাপটেন মুখার্জ্জি সাহেবের সতর্ক বাণী হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—"করেন কি মাষ্টার মহাশয়! মারা যাবেন যে!" যেন চিরকাল বেঁচে থাকতেই এ দুনিয়ায় আসা গেছে! 'উত্থিত কৃপাণ কর হইল অচল।' রসগোল্লা রক্ষা পাইল, কিন্তু বুঝলাম না কি অপকর্ম্মটা করিলাম। কেন বাপু, না বাঁচার কাযটা কি করলাম। বাঁচার চেষ্টাই তো কাঁচিয়ে করছি! তদুত্তরে ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "আরে বেশী মিষ্টি খেলে যে এই বুড়ো কালে blood pressure বেড়ে যাবে বেজায়! শেষে দুপুর রাত্রে ডাকাডাকি করাবেন!" বেশী মিষ্টি? মোটে তা পাঁচগণ্ডা মাত্র খেয়েছি তাই বেশী? আবার হুমকি blood pressure! সে আবার কি বাবা! বাতাসের pressureএর কম বেশীতে ঝড়ঝঞ্ঝা সাইক্লোন আদি প্রলয় কাণ্ড ঘটে বটে, গিন্নির pressureএ পড়িয়া অকাল কুষ্মাণ্ড লালাবাবুদের গতি বড়বাবুরা করিয়া দেন শুনিয়াছি বটে, কলেক্টর সাহেবের pressureএ পড়ে ঘটিরামেরা রামের বদলে শ্যামকে ধরে জেলে পুরেন এ সব জানা আছে। রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়েও এমন প্রলয়কাণ্ড কি ঘটে তা জানা ছিল না—আজ-কাল শুনছি বটে তরতাজা জোয়ান মদ্দ ছেলেগুলো পড়ছে আর মরছে—কি? না blood pressure—মাথায় রক্ত উঠে গেছে! দেখুন দেখি কি হরিষে বিষাদ—বাসরে কাঁসর বোধনে বিসর্জ্জন! কোথায় পাতে পতিতগণের গতির সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল নয়নে অন্যান্য রকমের হাঁড়ির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করছি, আর কি না ক্ষান্ত হও! এতে কি মনে হয় বলুন তো আপনারা! Blood pressure আছে ভাল, বেড়ে যায় তো এমন সব রাজসাহীর রসাল ঘিওর, ক্ষীরের পানতুয়া, বাগ বাজারের রসগোল্লা, ভীম নাগের সন্দেশ, দ্বারিকের দধি, নাটোরের কাঁচা গোল্লা, মুড়োগাছার ছানার জিলিপি, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা, ধনেখালির খৈচুর, জয়নগরের মোয়া, বহরমপুরের ছানা বড়া, মানকরের কদমা, কুমারখালির মটকা, ঢাকার পাতক্ষীর, কৃষ্ণনগরের সরভাজা সরপুরিয়া, গড়ের সন্দেশ, পুঠিয়ার অম্বিকা, মথুরার পেড়া প্রভৃতির সম্মিলিত pressure এর জোরে কি সেটা দাবিয়ে দেওয়া যায় না? দীঘাপতিয়ার রাজবাড়ীতে পূর্ব্বে ঝুলন রাস প্রভৃতি উৎসবে নাটোরের গোল্লার শিলা বৃষ্টি হইত! একেবারে অষ্টপ্রহরী দিন রাত বিরাম নাই। পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন—

পরান্নং প্রাপ্য দুর্ব্বুদ্ধে মা শরীরে দয়াং কুরু।
পরান্নং দুর্লভং লোকে শরীরং জন্মজন্মনি!

কি সরস আশার মোহন বেণু! শুনলেই প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। আর তার বদলে দেখুন দেখি আহারের সময় সংহারের ধমক—Blood pressureএর হুমকি! প্রাণান্ত হয়েও যে প্রাণ রাখিবার ভরসা করতে পারি না!

আর এক নম্বর শুনুন!

সন্ধ্যার পর পতিপ্রাণা গৃহিণী কর্ত্তার সহিত বাজারের জিনিষ পত্র লইয়া তীব্র আলোচনা করিয়া রান্না ঘরে দুধ ঘন জ্বাল দিতেছেন। পাশে এক খানা থালাতে কানপুরি ময়দার সাদা ধবধবে ফুলকো লুচি কয়েক খানি, বেগুন ভাজা, খোলা ছাড়ান আলু ভাজা, খোলা ছাড়ান আলুর দম, ফুলকপির তরকারী, চাটনি, মর্ত্তমান কলা একটু মোহন ভোগ প্রভৃতি সাজান। দুধ মরিয়া ক্ষীর হইয়াছে, চামচে করিয়া তাহা বাটিতে তুলিতেছেন, এমন সময় বিদেশ প্রত্যাগত সদ্য এম্-এস-সি ছাপ মারা কাষ্ঠ কেলাস খাদ্য-তত্ত্ব গবেষণায় নিযুক্ত পুত্র সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া বাসাতে আসিয়া ডাকিলেন "মা!" জননী রান্নঘর হইতেই উত্তর দিলেন "কি বাবা! এইযে ওঁর জল খাবারটা করে দিচ্ছি!"

পুত্র সেখানে উপস্থিত হইয়া খাদ্যগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এ যে সবই অখাদ্য মা! বিষ! বাবাকে কি এই সব খাইয়ে মেরে ফেলবে?"

তিনি সেকেলে অশিক্ষিতা নারী মাত্র! তাঁহার তো জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা চক্ষুরুন্মীলিত হয় নাই, তার

উপর আবার চাল্‌সে ধরেছে- চসমা ও পড়েছে-সুতরাং কেমন করিয়া তাঁর সযত্ন প্রস্তুত খাদ্যটা যে পুত্রের চক্ষে বিষবৎ প্রতিভাত হইল সেটা তিনি বুঝিলেন কিরূপে?- তাই তিনি চিত্রার্পিতারন্ত হইয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে পুত্রের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন।

পুত্র তখন মৃদুহাসোদ্ভাসিত বদনে বলিলেন,"তোমাদের চোখে ওগুলো সুখাদ্য হলেও আসলে ওগুলো-সবই অখাদ্য! সার বস্তু ওতে কিছু নাই! ওতে শরীরের উপকার তো নাইই বরং অপকারই যথেষ্ট।"

গৃহিণীর বিস্ময়ের গ্রাম পঞ্চম হইতে সপ্তমে চড়িল! কি শুন্‌ছি এসব! লুচি, ক্ষীর, সর, আলু, কপি প্রভৃতি খেলে শরীরের উপকার নাই বরং অপকার?

পুত্র বলিল, "সত্যিই • ঐ ধব ধবে লুচিগুলো দেখ্‌তেই বেশ সুন্দর, লোভনীয় বটে, কিন্তু সার কিছু নাই, বেরিবেরি রোগের আকর। আলুর খোসাতেই ওর সার থাকে, তা ফেলে দিলে থাক্‌বে কি? তার উপর আবার তা রীতিমত ভাজা। বেগুনেরও সেই দশা। ফুলকপিকে সিদ্ধ ক'রে ওর সার উড়ে গেছে। ঘন দুধ খেতে বেশ বটে, কিন্তু দুধের গুণ ওতে মোটেই নাই। সুজিরও হালুয়া ক'রে ওর দফা শেষ করে ফেলেছ—মিছে কতক গুলো অকেজো বাজে জিনিষ খেলে শরীর কি কোরে থাক্‌বে? আমরা বাঙ্গালীরা খেয়েই মরছি—খাওয়ার পারিপাট্যটা সবার চেয়ে আমাদের বেশী, তাতে পয়সাও ঢের বেশী খরচ, অথচ সে খাবারগুলো মুখপ্রিয় করার জন্যে এমন করে তৈয়ার করি যে তার সার—মোটেই থাকে না। বাবুগিরির জন্য চালগুলো ছেঁটে ছেঁটে তো সাদা ক'রে তার সার পদার্থ ফেলে দিই, তার পর আবার তা সিদ্ধ করে ফেনটাও ফেলে দিই—যেন আমের রসগুলো নিংড়ে ফেলে আঁটির আঁস গুলিই কেবল চিবিয়ে মরি আর ভাবি যে আম খাচ্ছি!"

গৃহিণী গালে হাত দিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে সার বস্তুটা কি বাবা?"

পুত্র বলিলেন, "মাসিক পত্রগুলিতে পড় নাই এখনো কিছু? তা পড়্‌বেই বা কোথা থেকে, তোমরা ত গল্প ছাড়া আর কিছু পড়বে না!—সার বস্তুটা হচ্ছে 'ভিটা-মিন্।'

গৃহিণীর মাথা ঠিক রাখাই কঠিন হইল। 'ভিটামিন' আবার কি বাবা? তোদের ওসব ইংরেজি কথা কি বুঝতে পারি? একটু বুঝিয়ে বল্‌তো, বুঝি!"

পুত্র তখন তাহার খাদ্য তত্ত্ব গবেষণার পরিচয় জননীকে দিতে আরম্ভ করিলেন —"ভিটামিনের বাঙ্গলা কোন নাম তো নাই, তবে খাদ্যবস্তুর সার ভাগই হচ্ছে ভিটামিন্। উহাই শরীরকে পোষণ করে, সবল করে। এ পর্য্যন্ত উহার পাঁচ ভিন্ন ভিন্ন রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের নাম ইংরাজি বর্ণমালানুসারে এ, বি, সি, ডি, ই—(A, B, C, D, E) প্রথম তিন প্রকারের ভিটামিনের বিষয়ই বেশী জানা গেছে, তাদের প্রকৃতি ও গুণাগুণের সম্বন্ধেও বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ধানের খোসা অর্থাৎ তুঁষ, গমের চোকর বা ভুষি। লাল চাল, লালচে জাঁতায় ভাঙ্গা আটা, খোসা সুদ্ধ আলু প্রভৃতিতে ৩নং ভিটামিন প্রচুর। মাখন, কড্‌মাছের তেল, কাঁচা দুধ, পালংশাক, বিলাতি বেগুন, প্রভৃতিতে শরীর পোষণের উপযোগী ভিটামিন্ প্রচুর আছে, কিন্তু অগ্নির উত্তাপ অধিক পাইলেই ঐ সব ভিটামিনের অস্তিত্ব থাকে না, তাহারা উবিয়া যায়। মল্লিকা ফুলের মত ভাত, সাদা কাগজের মত রুটী বা লুচি, ঘন দুধ বা ক্ষীর, বেশী সিদ্ধ করা কপি, আলু প্রভৃতি, খোলা ছাড়ান আলু—এ সবের মধ্যে ভিটামিন্ নাই, বেরি বেরি রোগের নিদান খুব আছে! টাটকা নানা প্রকারের ফল কাঁচা অবস্থায় খুব উপকারী। কমলালেবু, কাগজিলেবু, রাঙ্গাআলু, শাকআলু, আঙ্গুর আদিফল শরীরের পক্ষে বেশ উপকারী। ভিটামিন্ খুব আছে! আমাদের রান্নার দোষে সব খাদ্যই অসার হয়ে যায়। মাংস, ডিমের কুসুম প্রভৃতিও ভিটামিনে ভরা কিন্তু—"

গৃহিণী আর হজম করিতে পারিলেন না, ছেলের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "কিন্তু কাঁচা খাওয়া চাই! এই তো? আসল কথা হচ্ছে তোমার এই যে ভিটামিন্—ইনি বুঝি আজ কালকার মেয়েদের দলের? আগুনের আঁচ বুঝি তাঁর সয় না? তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে রান্না করে খাওয়াটাই দোষের আকর। গরু, ছাগল, বানর, ভেড়া প্রভৃতির মত এখন সব কাঁচা কাঁচা খেলেই শরীরের খুব পুষ্টি হবে! প্রাচীনকালে একযুগে নাকি এমন ছিল যে লোকে রাঁধ্‌তে

জানতো না,কাঁচা ফল মূলাদিই খেতো! তাই বুঝি তারা সব খুব সুস্থ ও বলিষ্ঠ ছিল? হাজার হাজার বছর বাঁচতো, আর এই সব বেদ বেদান্ত তাদেরই কীর্ত্তি! তাই না হয় তোরা আরম্ভ কর, কিন্তু উনি বুড়ো মানুষ, চিরকাল এই সব খেয়ে মানুষ, ভালও বাসেন এ সব খেতে, ওঁকে আর এ সব কাঁচা কাঁচা খাইয়ে কষ্ট দিস্ নে বাবা। দিন কালে আরও কি ই যে শুনবো! এত কাল তো শুনে আসছিলাম এই সব গুলোই পুষ্টিকর ভাল খাদ্য—লুচি, হালুয়া, ঘি, মাখন, ক্ষীর, ছানা, সর ইত্যাদি। কিন্তু আগুনে না জ্বালিয়ে এ সব কি ক'রে তৈয়ার করা যায় তাতো জানিনে! আর সন্দেশ, রসগোল্লা, খাজা, গজা, জিলিপি প্রভৃতি ভাল ঘি, ময়দা, ছানা চিনি দিয়ে তৈরি হলে যদি বিষই হোতো, তাহলে একাল পর্য্যন্ত তো মানুষ অনেকই মরে যেতো! তোদের ভিটামিন তো এতদিন দর্শন দেন নি! যত সব সায়েবদের অনাছিষ্টি কথা—যাঃ! এখন কাপড় জামা ছাড় গিয়ে!"

পুত্র মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

আমি পাশের ঘরেই ছিলাম। এই সব নূতন আবিস্কারের খবর শুনিয়া তো একেবারে বসিয়া গেলাম! হায় রে, শত্রু কেবল বাহিরে নয়; ঘরের মধ্যেও! তবে গৃহিণীকে মনে মনে খুব বাহবা দিলাম তবু দুকথা জবাব তো দিয়েছেন! আমি হলে প্রিয় খাদ্য বস্তুজাতের আসন্ন বিরহের আশঙ্কায় এতই অভিভূত হয়ে পড়তাম যে মুখে কোন উত্তরই ফুটতো না।

সত্য সত্যই যদি এ প্রকার অবস্থা, তাহলে পথ্যাচারই তো ঢের ভাল। বহু কালের একটা কথা মনে হল! আমি ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে গোয়ালন্দ হইতে চা বাগান ফেরৎ একটা হিন্দুস্থানী চাকর পেয়ে বাড়ীতে রেখে এসেছিলাম। আমার বাড়ীর সম্মুখে দক্ষিণে এবং পূর্ব্বে সুবিস্তৃত মাঠ, তাতে ধান, মটর, সরিষা কলাই, পাট প্রভৃতি জন্মান হয়। তখন পৌষ মাস। আমি যখন ১০।১২ দিন পরে আবার বাড়ী গেলাম তখন ঐ সব ক্ষেত্রের কৃষকগণের নিকট নালিস পাইলাম যে এত কাল ক্ষেত রাখিবার জন্য গবাদি পশুই তাড়াইতে হইত, কিন্তু আমার কৃপায় এখন মানুষও তাড়াতে হচ্ছে। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলাম আমার নব নিযুক্ত হিন্দুস্থানী চাকরের মটরের খেতের উপর লোভ গবাদির চেয়েও বেশী। তখন সেটা হেসে উড়িয়ে ছিলাম। এখন দেখছি নিজেরই সেই পথে দাঁড়াতে হচ্ছে! লুচি, পুরী, কচুরি, সিঙ্গাড়া, রসগোল্লা, পান্তুয়াদি পরিত্যাগ করে কাঁচা শাকপাতা, কাঁচা মাংস, বৃক্ষত্বকাদির দ্বারাই কি শেষটা প্রাণ রাখিতে হইবে? আবার বিষ্ণুশর্ম্মা ঠাকুরকে মনে পড়ল—স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে! তাই তো! দুশ্চিন্তা এত প্রবল হইল যে ভাবিতে ভাবিতে কখন নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছি, তাহাও জানি না!

নিদ্রিতাবস্থাতে স্বপ্ন দেখিলাম যে খাদ্যতত্ত্ব গবেষণার ধুম খুব চলিবার ফলে পতিপ্রাণা গৃহিণী বৃদ্ধ স্বামীকে পুষ্ট ও সবল করিয়া যৌবন ফিরাইয়া আনিবার জন্যই বোধ হয় ভিটামিনের কবলে পড়িয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে আমার খাদ্য তালিকার নানারূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। পিতৃভক্ত বৈজ্ঞানিক পুত্রের পরামর্শ এবং মাসিক পত্রাদির প্রবন্ধাদি তাঁহার এ কার্য্যে সহায় হইয়াছে নিশ্চয়।

স্বপ্ন দেখিলাম যেন প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপনের পর গৃহিণী কিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন করিয়া আনিলেন। দেখিলাম যেন তাহাতে ক্ষীর সর আদির আর স্থান নাই। অর্দ্ধপিষ্ট কলানে ভিজে ছোলা ও আদা লবণ (কারণ দন্তহীনের পক্ষে চর্ব্বণ কষ্টকর), কিছু পালং শাক বাটা, একটু মাখন, একটা পাথরের বাটিতে কিছু কাঁচা বিলাতী বেগুনের রস এবং কিছু ধানের খোষা অর্থাৎ তুষের গুঁড়া—আর ক্লোরোফেনের গন্ধযুক্ত জল এক গ্লাস।

দেখেই তো পিত্ত জলে গেল। গৃহিণী কাতর ভাবে সাধ্য সাধনা করছেন, "শরীটা রাখতে হবে তো! যা খেলে প্রাণটা বাচে" ইত্যাদি। রাগে অভিমানে চোখ কাণ বুজে গালে ফেললাম, গলাধঃকরণেরও চেষ্টা করলাম কিন্তু "যে মুখে দিয়েছি তুলে ক্ষীর সর ননী, সে মুখে কি রোচে কভু কাঁজির আমানি?" উদর দেব তাহা গ্রহণ করিলেন না। ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে অপ্রচুর তত্ত্ব আসিলে বক্রতুণ্ডা গৃহিণীর পদে তাহার যে দুর্দ্দশা হয়, উদর দেবতা সেইরূপ মুখ করিয়া তাহা ছিটকাইয়া ফেলিয়া দিলেন! গৃহিণী বড় বিষণ্ণা; পার্শ্বে সন্নিসন্না হইয়া বক্ষে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "দ্বিপ্রহরের কিরূপ ব্যবস্থা হয়েছে?" গৃহিণী বলিলেন, "এই

দেখাচ্ছি " বলিয়া বাহিরে গেলেন এবং অনতিবিলম্বে এক খানা স্বহস্ত লিখিত তালিকা লইয়া আসিলেন। তাহাতে প্রেস্কৃপসন এইরূপ ছিল—দ্বিপ্রহরে দেশের বড়ন ধান্য (ইহার চাউল ও ভাত লাল হয়), মৃদুতাপে অর্দ্ধসিদ্ধ বা সিকি সিদ্ধ। (দন্তের জোর থাকিলে বোধ হয় অসিদ্ধই অবস্থা হইত!) মাঠা ওয়ালা অর্দ্ধগলিত মাখন বা কাঁচা মাখন। পালংশাক কাঁচা হইলেই ভাল, অন্ততঃ অর্দ্ধ সিদ্ধ। কাঁচা ডিমের হলুদ অংশ মাখন ও বিলাতী বেগুনের রসে ফোটান। খোসা শুদ্ধ আলু বেগু, পটোল, কাঁচকলা পোড়া, কড মাছের তেলে মাখা, অভাবে ইলিশ মাছের তেলেও চলিতে পারে। অর্দ্ধসিদ্ধ ডাল, কাঁচা দুধের দই, কাগজি লেবু কাটা ৪।৫ খণ্ড, আকের রস (কাঁচা), পাকা কলা ২।৪টা। বৈকালের জলখাবার সাময়িক কাঁচা ও পাকা ফল, আঙ্গুর, কিসমিস মনক্কা বাঁটা, বাদাম বাঁটা, কাঁচা দুধ ইত্যাদি। রাত্রিতে,—গমের ভুষির মোলায়েম রুটি, মাখন দিয়ে পালংশাক বাঁটা, বিলাতী বেগুনের চাটনি, পাকা কলা, আম, পেয়ারা আদি সাময়িক ফল, কাঁচা দুধ, আখের গুড়—আরও বা কি কি ছিল কিন্তু তাহা দেখিবার প্রবৃত্তি আর হইল না—যাহা দেখিলাম তাহাতেই উদরদেব অন্তরে নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে আমার পুত্রস্থানীয় পেল্লায় ডাক্তার লাহিড়ী বাবাজি একটা টিনের কৌটা আনিয়া বলিলেন, "এই শুনুন কাকাবাবু, আমেরিকা থেকে প্রচুর ভিটামিনযুক্ত এক রকম নূতন খাদ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার একটু খেলেই সাধারণ খাদ্যের শতগুণ কায হবে। একটা টিন আপনার জন্যও নিয়ে এসেছি।"

গৃহিণীর নবোদ্ভাবিত খাদ্যের হাত থেকে পরিত্রাণ পাইবার আশায় সাগ্রহে টিনটা লইয়া খুলিয়া ফেলিলাম—ও হরি! তার মধ্যেও দেখি তাওয়াতে ঝলসাইয়া লওয়া গমের ভুষির মতই একটা কিছু জিনিস। গন্ধটাও কতকটা সেই রকমেরই! "একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং তাবদ্‌ দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে!" তবে কৌটাটির বাহিরের দিকটা চিত্রে বর্ণে ও আকারে বড় লোভনীয়! দেখিয়াই মনে পড়িল "হাঁ! এরাই তো মানুষ! উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" টাকা কেমন করে ঝেঁটিয়ে বের করে নিতে হয় তা এরাই জানে! ভিটামিনের গুণ ও নাম লোকে জানিতে না জানিতেই ভিপূর্ণ খাদ্যের আমদানী আরম্ভ! আমাদের দেশের লোকগুলার ধাত এরা ভাল করেই বুঝে নিয়েছে! গ্লাক্সো, এলেনবরি, বেঞ্জার, হরলিক্‌, সানাটোজেন, ওভালটাইন, মেলিন্সফুড, গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ ইত্যাদি শত সহস্র অগ্রজগণ তো এসে আড্ডা গেড়ে বসেই আছেন, অবশেষে ভিটামিনও পৌঁছিলেন। এখন আমাদের ভিটা লীন করিতে আরও কতরূপে কত মীন, দীন, হীন শুভাগমন করিবেন তার স্থিরতা কি? সবুর করুন কিছুদিন, তারপর মার্কিং ইঙ্কের মত জোড়া জোড়া শিশিতে ভিটামিন এ বি সি আসিবেন—স্বর্গের অমৃতের চেয়েও সঞ্জীবন,—একটা গ্লাসে এক ফোঁটা এ-শিশি থেকে, এক ফোঁটা ও-শিশি থেকে ঢেলে জলে গ্লাস পূর্ণ করে খেয়ে ফেললে অন্ততঃ সাতদিন আর ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই থাকিবে না—এইরূপ তার গুণ বর্ণনা বড় বড় লেজওয়ালা ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক খাদ্যরসাভিজ্ঞ দ্বারা উচ্চ কণ্ঠে সমর্থিত! একেবারে ইয়ুনান সাহেবের উচ্চক্রমের হোমিও গুলি—অব্যর্থ! আর জাহাজ থেকে মাল নাম্‌তেই সাবাড়—advance sale—গুদামজাত কর্ত্তেও হবে না। আমাদের দেশের বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক রসায়নিকদের মাথায় এ সব ফন্দি খেলে না কেন?

এই সব কথা সদ্য প্রাপ্ত টিনটি হাতে ক'রে ভাবছি—ডাক্তার বাবাজি আমার ভাব-গতিক দেখে যেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাক্‌লেন—"কাকাবাবু ও কাকাবাবু!" সেই স্বর কাণে গিয়ে চম্‌কে উঠে চোখ খুলে গেল। তাকিয়ে দেখি গৃহিণী পাশে দাঁড়িয়ে—আর ছোট নাতিটি গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাক্‌ছে—"দাদু ও দাদু ওঠো খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল! নিদ্রিত পতিদেবতাকে স্বয়ং জাগ্রত করা পতিব্রতার পক্ষে মহাপাপ কি না, তাই গিন্নি শাস্ত্র বাঁচিয়ে এই রকমে জাগানের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তখনও আমার স্বপ্নের ঘোর কাটে নাই, মাথার মধ্যে গৃহিণীর খাদ্য তালিকাই ঘুরছে, সুতরাং বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"নিয়ে যাও তোমার ভুষির রুটি আর টমেটোর রস। না খেয়ে মরি সেও ভাল, তবু তোমার ঐ সব বল-বর্দ্ধক ভিটামিনের অখাদ্য গুলো খেয়ে পেট ছেড়ে দিয়ে মরতে পারবো না। যাও নিয়ে যাও!"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, 'ঘুমের ঘোরে কি স্বপ্ন দেখে উঠলে? এগুলি কি ভুষির রুটি আর টমাটোর ঝোল?

চেয়েই দেখ ছাই!" তাই শুনে চেয়ে যা দেখলাম তাতে মুখে বিরক্তির বদলে আসক্তি ফুটে উঠলো। তার তালিকা দিয়ে আর কায নাই আপনাদের কাছে, কারণ তাহলে রসনা শুষ্ক রাখা মুস্কিল হবে।

তবেই দেখুন আমার সমস্যাটা জটিল হয়ে উঠছে কি না। এই যে আধুনিকতম ভিটামিনের গুণ ও আবিস্কার এবং ইহার প্রতি ডাক্তার মহাশয়দের এবং বৈজ্ঞানিক রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণের আত্যন্তিকী প্রীতি দর্শনে Blood pressure আদির আতঙ্ক অপেক্ষাও বেশী আশঙ্কা হইয়াছে যে শেষে নর পর্য্যায় হইতে পাছে বানরের কোটাতেই বা নামিতে হয় সব কাঁচা জিনিস খেয়ে খেয়ে। ব্যাকটিরিয়া ব্যাসিলাস ত আছেনই, তার উপর যদি ভিটামিন্ ভর করেন তাহলে রাবড়ী ক্ষীর পানতুয়া সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতির কথা তো ছেড়েই দিন, লুচি খেতে পাব না, ঘি খেতে পাব না, জ্বালান দুধ খেতে পাব না—তবে খাব কি ঐ প্র দৃষ্ট তালিকা বর্ণিত অখাদ্য গুলি?

প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত হইবার কি শেষ পরিণাম কাঁচা ঘাস, ধানের তুষ এবং কুঁড়ো, গমের ভুষি প্রভৃতি খাওয়া? কবি মনোমোহন বসু বাঁচিয়া থাকিলে তাঁকে বোধহয় "দেশের লেকের ভাগ্যে খোসা ভুসি শেষে" এই উক্তিটীর পরিবর্ত্তন করিতে হইত—করণ খোসাভুষিই যে এখন সার শস্য! হায় রে কপাল!

বলি শরীরের নাম যে মহাশয় যা সহাবে তাই সয়—তবে এত কাল বা সয়ে এল এখন তা সইবেনা এ কোন্ যুক্তি তাই শুনি!

এই সব নব নব আগন্তুক বৈরির অশ্রুতপূর্ব্ব বিভীষিকায় আমি বড় বিব্রত হইয়া আজ সুধিগণ-সমাজে এই কাতর নিবেদন জানাইতেছি, আপনারা দয়া করিয়া আমার উক্তি গুলির মর্ম্মবোধ করিয়া এ সমস্যার সমাধান করুন।

প্রাণ রাখিতে সহস্রবার প্রাণান্ত হইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এত করিয়াও যাহাতে রাখিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠগণ আশীর্ব্বাদ দ্বারা এবং বয়ঃকনিষ্ঠগণ মঙ্গল কামনা দ্বারা অভয় দান করুন যে আমাদের জীবনের সর্ব্ব সমস্যার যেন সুসমাধান হয়, তাহার অন্তরায় স্বরূপ বৈরি দল যেন আমাদের উপর জয়যুক্ত না হইতে পারে, পঙ্গপাল দল বিনষ্ট হয়। অমাদের মায়ের চরণে কৃপাপ্রার্থী হইয়া কাল ভৈরবের নাম স্মরণ করিয়া শ্বেত শর্ষপ ছড়াইতে ছড়াইতে সকলে বলুন—

"অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতাঃ বিঘ্নকর্ত্তারঃ তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।" ইতি সন ১৩৩৫ সাল, ৭ই পৌষ, শনিবার রাত্রি ১টা।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থ-সমালোচনা

যোগাযোগ

উপন্যাস। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ২৷৹ বাঁধাই ২৸৹

এই উপন্যাস "বিচিত্রা" পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

ইহার আখ্যানাংশ এক দিকে সরল ও সামান্য। দুইটি বিরোধী জমীদার বংশের মিলন বা যোগাযোগের কথাই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই বংশের বর কন্যার বিবাহ, তাহাদের বংশগত মর্য্যাদা বোধ পরস্পর বিরোধ ও মিলনের চিত্রে কবির কলানৈপুণ্য পাঠককে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

কবি প্রথমে এই উপন্যাসটির নাম দিয়াছিলেন 'তিন পুরুষ'। এই নামে কয়েক মাস বিচিত্রায় প্রকাশিত হইবার পর ইহার বর্ত্তমান নাম প্রকাশিত হয়।

প্লট সামান্য। কুমুদিনী বা কুমু কবির মানসী কন্যা, শুধু ধ্যানের সামগ্রী—কল্পনার বস্তু। প্রাচীন আদর্শে অনুপ্রাণিতা এই শিক্ষিতা বধূটি কবির অভিনব সৃষ্টি। এই বধূর সহিত ধনদৃপ্ত মধুসূদনের

সম্বন্ধটার স্বরূপ ও তাহার ক্রমশ পরিবর্ত্তনের বর্ণনায় যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য লক্ষিত হয় তাহা শুধু রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব।

এই উপন্যাসে কবির চিত্র-কল্পনা চরম পরিণতিলাভ করিয়াছে। পুরাণো ধনীর ঘর, রাজাবাহাদুরের জাঁকজমক, ঘটক, জ্যোতিষী ঘর দুয়ার মধুসূদনের বাড়ীর নূতন ও পুরাতন অংশ প্রভৃতি বাহিরের বিষয় নিপুণ চিত্রকরের তুলিকাস্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তার পর মানসিক ব্যাপারের ক্ষেত্রেও কবির সমান প্রতিপত্তি। এমন নিখুঁত বর্ণনা, বাহ্যিক ও মানসিক বিষয়ের এমন সরস অভিব্যক্তি সাহিত্যে বিরল।

উপন্যাস লিখিতে বসিয়া আজকাল অনেক লেখকই বাস্তব চিত্র আঁকিবার ভান করিয়া অনেক বাজে কথা পাড়িয়া বসেন। পল্লী, সহর, আদব কায়দা চালচলন প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া তাঁহারা পাঠকের কাছে একটা বিশিষ্ট দেশ ও কালকে ফুটাইয়া তুলিতে চান। ইহাতে পাঠক চলচ্চিত্র দেখার আনন্দ হয়ত কতকটা অনুভব করেন কিন্তু রসানুভূতির আনন্দে বঞ্চিত হন। তাঁহাদের রচনায় শুধু মাঝে মাঝে রসের সন্ধান পাওয়া যায়। কবি কিন্তু শুধু রসের পথেই চলিয়াছেন—তিনি রসের সাধক—রসের উদ্বোধনই তাঁহার লক্ষ্য। কোথাও বাজে কথা নাই—গ্রন্থখানি প্রকৃত পক্ষে একটি গদ্য কাব্য। রবীন্দ্রনাথ সমালোচ্য গ্রন্থে বাস্তব চিত্র অনেক আঁকিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাইয়াছেন যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বাস্তবতার একাধিপত্যও অসম্ভব।

বাস্তবতার মধ্য দিয়া কবি পাঠককে এমন একটি ভাবের জগতে আকর্ষণ করেন যাহা কাল্পনিক। এই কল্পনার জগতে পাঠক অভিনব রসের আনন্দে মাতিয়া ওঠেন। এ জগৎ বাস্তব জগতের উচ্চে। অন্যান্য লেখক যে বাস্তবতার মোহে আবিষ্ট, কবি তাহার উচ্চে উঠিয়াছেন।

কুমুর চরিত্র-চিত্রণে আদর্শের প্রতি কবির নিবিড় শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। বিপ্রদাস ও হাবলুর কথায় এবং অন্যান্য স্থলেও গভীর দার্শনিকের চিন্তা রসাত্মক বাক্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের প্রতিভা মিলিত হইয়া গ্রন্থটিকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে।

তবে উপন্যাসটি পূর্ব্বভাগে যেমন শুদ্ধ পবিত্র ও সরস, উত্তর ভাগে তেমন নয়। শ্যামাসুন্দরীকে একটু জোর করিয়াই টানিয়া আনা হইয়াছে। গল্পের উপসংহারভাগ পাঠককে এমন একটা চমক লাগাইয়া দেয় যাহা রসানুভূতির সহায়ক নয়। ভ্রাতা ও ভগিনীর শেষ মিলনচিত্রের গম্ভীর করুণ রসের ধারায় কবি পাঠকের ক্ষুব্ধ চিত্তকে কতকটা প্রশমিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাকে পরিতৃপ্ত করেন নাই। উপসংহারের দিকে রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিকের পথ ছাড়িয়া দিয়া বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের পথে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আদর্শনিষ্ঠ কুমুর পরিণাম ও শ্যামাসুন্দরী ও মধুসূদনের অবৈধ সম্বন্ধ বিজ্ঞান-সম্মত হইতে পারে কিন্তু সাহিত্য হিসাবে সুন্দর হয় নাই।

আমাদের মনে হয় গ্রন্থের ত্রুটি এইখানে। রবীন্দ্রনাথ যে পরিণত শিল্পচাতুর্য্যের সহিত যে উন্নত সাহিত্য এই গ্রন্থে রচনা করিয়াছেন তাহার তুলনায় এই ত্রুটি অবশ্য সামান্য। ইহার বর্ণনাংশ সুন্দর—কবিত্বের অন্ত নাই, ভাষার অলঙ্করণ, শব্দ ও বাক্যের শক্তি ও ব্যঞ্জনা উপভোগ্য, তবে বিষয় নূতন নয়। ইহার সহিত "ঘরে বাইরের" আকারগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। দুইটি গ্রন্থেরই নায়িকা দোটানার মাঝখানে বিব্রত। দুটি গ্রন্থই যেন একই ছাঁচে নির্ম্মিত। কুমু হালদার গোষ্ঠীর বধূকে বিপ্রদাস নিখিলেশকে ও মধুসূদন সন্দীপকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে শিল্পীর অসাধারণ কৌশলে পুরাতনও নূতনে রূপান্তরিত হইয়াছে।

গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই সুন্দর।

পরিত্রাণ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ৸৹

এই গ্রন্থে কবি তাঁহার বৌঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কতকগুলি নূতন বিষয় পুরাতন গ্রন্থের গল্পাংশে সংযোজিত করিয়া কবি যে প্লট অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে কোন বিশেষত্ব আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। পাত্র ও পাত্রী সবই কবির পূর্ব্বরচনাবলী হইতে গৃহীত। কবি রাজ্য ও সমাজের উপর একটা বিরাট আধ্যাত্মিক জগতের কল্পনা করিয়াছেন, ধনঞ্জয় বৈরাগীর গানে তাহার আভাস পাওয়া যায়। তবে সে জগৎ রহস্যময়। কবি হয়ত তাহার সন্ধান পাইয়াছেন কিন্তু সাধারণ পাঠকের নিকট তাহা উহা সরসভাবে প্রতিফলিত হয় নাই। কবি দেখাইয়াছেন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ সেই জগতেই আছে, কিন্তু এজগৎ শুধু ধনঞ্জয় বৈরাগীর। তাহার গানে যতটুকু ইহার আভাস পাওয়া যায় তাহা বৈরাগীর উপভোগ্য হইতে পারে, সাহিত্য-রসপিপাসু তাহার কতটা সন্ধান পাইবেন বলিতে পারি না। পাত্রপাত্রীর চরিত্রচিত্রণে নিপুণতা নাই, অনেক চরিত্রই অপূর্ণ ও প্রাণহীন। বৌঠাকুরাণীর হাটের এরূপ রূপান্তর আমাদের কাছে হৃদ্য ও মনোরম হয় নাই।

যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম এস প্রণীত। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ২৲

যক্ষ্মারোগ আমাদের সমাজমধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় সকল লোকেরই আত্মীয়বন্ধুমধ্যে এই রোগ দেখা যায়। যক্ষ্মা নাম শুনিলেই আমরা শিহরিয়া উঠি এবং যাহার এই রোগ

হয় তাহাকে খরচের মধ্যে লিখিয়া রাখি। বাস্তবিক এই ধারণাটি ভুল। আমাদের মধ্যে যাহারা সহরতলীতে বাস করি তাঁহাদের অধিকাংশ লোকই কোন না কোন সময় যক্ষ্মাবীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি। তবে বেশী লোকের মধ্যেই ইহা অন্তর্নিহিত হইয়া থাকে বাহিরে প্রকাশ পায় না। যক্ষ্মা সমস্যাটি অতি জটিল। আমাদের সকলেরই ইহার বিষয় কিছু কিছু জানা উচিত। আজকাল আমাদের মধ্যে santitary conscience জাগিয়াছে। এই পুস্তকখানি তাহারই বহিলক্ষণ। উপেন বাবু বহু চিন্তা এবং অনুসন্ধানের পর এই পুস্তকখানি লিখিয়াছে। ইহাতে মোটামুটী যক্ষ্মা সম্বন্ধে সকল তত্ত্বই আছে। প্রথম অধ্যায়ে যক্ষ্মাবীজাণুর স্বরূপ, ইহা দ্বারা শরীরে কি কি রোগ উৎপন্ন হয় এবং তাহার লক্ষণসমূহ সহজ ভাষায় বিবৃত হইয়াছেন। রোগীর থুতু ও কফ যে কতদূর অনিষ্টকারী তাহা তিনি আমাদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। বাল্যবিবাহ এবং অবরোধপ্রথার প্রতি বিশেষ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। এই অধ্যায়টি পাঠকদিগকে খুব মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই অধ্যায়টি বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলে সমস্ত পুস্তকখানি সহজবোধ্য হইবে।

লেখক দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই রোগের কয়েকটি উপসর্গের সহজ প্রতিকারের বিষয় বলিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে রোগীর বিবাহ করা উচিত কি না এ বিষয়ে কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। সমস্যাটি সমাধান করা একেবারেই সহজ নয়। উপেন বাবু বলেন, যদি আক্রমণের দুই চারি বৎসর পর পর্য্যন্ত যক্ষ্মার কোন লক্ষণ না থাকে তাহা হইলে আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিবাহ করিতে বাধা নাই। ইহা পুরুষ রোগী সম্বন্ধে কতকটা সত্য হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীরোগীর পক্ষে নহে। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে গর্ভধারণের পর এই ব্যাধি পুনরায় ভীষণ আকার ধারণ করে। তবে উভয় পক্ষ যদি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা গর্ভধারণ নিবারণ করিতে পারেন তবে ভয় অনেক কমিয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে পথ্যাপথ্যের বিচার আছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে আধুনিক চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লেখক বলিয়াছেন। বিষয়টি অতি কঠিন এবং সাধারণবোধ্য নয়। কোথা কোথা Sanatorium আছে এবং কত খরচ পড়ে এ বিষয় অনেক খবর দিয়াছেন। ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যায়ে ক্ষয় বিস্তারের কারণ এবং বিস্তার নিবারণের উপায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাতে অনেক কাযের কথাও আছে।

পুস্তকখানি বেশ সহজ ভাষায় লিখিত। ২০৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রসিদ্ধ ডাক্তার রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। সাতখানি ছবি আছে তন্মধ্যে যক্ষ্মাবীজাণুর প্রতিকৃতি উল্লেখযোগ্য। পুস্তকখানির চাহিদা হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

সনাতন ধর্ম্ম ও সাধনা

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমজ্জগন্নাথাশ্রম প্রণীত। বর্দ্ধমান হইতে শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲

অদ্বৈত ব্রহ্মবাদই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, একমাত্র বৈরাগ্যবান ব্রাহ্মণের শাস্ত্রে অধিকার, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কেন্দ্রচ্যুত হইলে যোগফল লাভ হয় না, যোগের মূল বেদশাস্ত্র তাহাতেই ইহা উপদিষ্ট ইত্যাদি সাধনমার্গের ব্যাপার লইয়া পুস্তকখানি রচিত। ষোলটি অধ্যায়ে সরল ও সুলিখিত ভাষায় গ্রন্থকার এই সকল ও ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নানাবিষয় সনাতন ধর্ম্মের দিক হইতে বিবৃত করিয়াছেন। মুক্তিকামী সাধকরা এই গ্রন্থ পড়িয়া যোগের অনেক গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

হুন্দাদার

রায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু বাহাদুর সি-আই-ই প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, মূল্য ১।০

হুন্দাদার ছাব্বিশ রকম হুন্দায় বিভক্ত। অনেকগুলি হুন্দা সচিত্র। সমাজের বিভিন্ন রকমের চিত্র পাঠক ইহাতে দেখিতে পাইবেন। চিত্রগুলি সরসভাবে অঙ্কিত। রসজ্ঞ পাঠক পাঠ করিলে ছবিগুলি চোখের সামনে জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

সমাজে বিভিন্ন স্তরের সহিত সুদীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা-মেশায় রায় বাহাদুর যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন আলোচ্য কাব্য গ্রন্থখানিতে তাহাই তিনি বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি সুন্দর। প্রচ্ছদপটের রঙ্গিন চিত্রগুলি পুস্তকের সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছে।

শতদল

শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—২২ বি ঈশ্বর গাঙ্গুলীর লেন, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য ১৲

এখানি গীতিকাব্য। এক শত গীত এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তবে সুর ও তাল নির্দ্দেশ করা হয় নাই। গানগুলি ঈশ্বর বিষয়ক। অনেক স্থলে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষা অনুকৃত হইয়াছে। রচনাগত দোষও অনেক স্থলে আছে। আমরা গ্রন্থখানির কোন বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই নাই। রবীন্দ্রনাথের এরূপ ব্যর্থ অনুকরণ প্রকাশ না করিলেও কোন ক্ষতি ছিল না।

নিরঞ্জন

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১।০

সাধুপ্রকৃতি নিরঞ্জনের চিত্র এই উপন্যাসগ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে। বালবিধবা পার্ব্বতীকে বিনোদ বিবাহ করিতে চায়—তাহার যুক্তি

তর্ক আজকালকার অনেক সমাজ সংস্কারকের মত। নিরঞ্জন তাহার যুক্তিতর্ক খণ্ডন করিয়া বিজ্ঞান ও আস্তিকতার সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তবে চার্ব্বাক মত অন্যান্য দর্শনের দ্বারা খণ্ডিত হইলেও যেমন তাহা চিরকালই মনোরম, সেইরূপ বিনোদের কথাও নিরঞ্জনের দার্শনিক মত অপেক্ষা সহজ গ্রাহ্য। উপন্যাস খানির উদ্দেশ্য সামাজিক শিক্ষা। শিক্ষাদান করিতে গিয়া লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন তিনি ঔপন্যাসিক এবং রসের বিকাশই তাহার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাস্তবাদীদের বাগাড়ম্বরের দিনে এই গ্রন্থখানি কতকটা সংযমশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে, কিন্তু উপন্যাস হিসাবে ইহার মূল্য সামান্য।

মঞ্জুষা

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সরকার বি এল, কবিশেখর প্রণীত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস কলিকাতা পৃঃ ১১০ মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই ১৲

কবিতার বই তিন খণ্ডে বিভক্ত ১ ব্যথা, ২ দেশ, ৩ গান। কবিতাগুলির প্রথম ও প্রধান গুণ ইহাদের ভাষার সরলতা ও ভাবের স্বচ্ছতা। কোন কবিতাই উচ্চাঙ্গের কবিত্বপূর্ণ নয়, কোথাও সুদূর প্রসারী কল্পনা নাই কোথাও মানবমনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নাই, পাঠকের হৃদয়স্তম্ভকারী ঘাতপ্রতিঘাত নাই—অর্থাৎ রচনাগুলি অসাধারণ নয়। সুতরাং যাঁহারা কবিত্ব বা প্রতিভার আশা করিয়া কবিতাগুলি পড়িবেন তাঁহারা হতাশ হইবেন। কিন্তু যাঁহারা সাধারণ চলনসই রচনায় সন্তুষ্ট তাঁহারা ইহাতে প্রীতই হইবেন। কবির নিজস্ব বস্তু বেশী না থাকিলেও তিনি অনেক জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন এবং বেশ শৃঙ্খলার সহিত পরিবেষণ করিয়া পাঠকের কাব্য-ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন। দেশ খণ্ডের কবিতাগুলি, ব্যথা খণ্ডের কবিতাগুলির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। এক্ষেত্রে কবির অনুভূতি যেমন সত্য প্রকাশও তেমনি সুন্দর। অনেক কবিতাই বেশ উপাদেয়। গানখণ্ডের কবিতাগুলি সঙ্গীত হিসাবে কেমন হইয়াছে সঙ্গীতজ্ঞেরাই বলিতে পারেন—তবে কাব্যহিসাবে খুবই সাধারণ। মিল ও ছন্দের ত্রুটি স্থানে স্থানে চোখে পড়িল, কবি কি এগুলিকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না? কাগজ ছাপা মন্দ নয়, বাঁধাই চলনসই।

শ্রীরামচরিত

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত। এলবিয়ন প্রেস, কলিকাতা। পৃঃ ১৪০ মূল্য ১৷৽

এখানি নাটক। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন মহাকবি ভবভূতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই এই নাটকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ ভূমিকা হইতে আরও জানা যায় যে দুই একটি অঙ্ক গ্রন্থকারের নিজস্ব। যাহা হউক গ্রন্থখানিতে সাহিত্যের রস বড় একটা পাইলাম না। গ্রন্থখানি পড়িয়া ভবভূতির মূল নাটকের সহিত কিছু পরিচয় হয় এইটুকুই সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে লাভ। ভাষা নিতান্তই একঘেয়ে শুষ্ক ও খঞ্জ। বাংলা সাহিত্যে নাটকের অপরিসীম দৈন্য সত্ত্বেও এরকম নাটক অচল। কাগজ ছাপাও প্রায় অচল। শুদ্ধিপত্রের বহর কিন্তু মন্দ নয়।

শ্রীবৎস

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় এম এ প্রণীত। ভারতবর্ষ প্রিণ্টিংওয়ার্কস পৃঃ ১৪০ মূল্য ১৲

নাটকখানি পড়িয়া প্রীত হইলাম। শ্রীবৎসের উপাখ্যান আমাদের দেশে সুপরিচিত। তবে সে পরিচয় ছিল প্রধানতঃ পুরাণের মারফৎ। আজকাল নব্যসম্প্রদায়ের কাছে পুরাণের সে আদর নাই, তাই পুরাণনিহিত অনেক পুণ্যকথা বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে। ইহা কিন্তু সমাজের সৌভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক! নবীনদের রুচিকর করিয়া যদি পুরাণ-প্রসঙ্গ সাহিত্যের আসরে আনা যায় তবে পুরাণতথ্য আর অপ্রচলিত থাকে না। সুধী নাট্যকার এই প্রথা অবলম্বন করিয়া শ্রীবৎসরাজের পুণ্যকাহিনী সাধারণ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। নাটকের ভাষা বেশ সরল, হৃদয়গ্রাহী ও উপযোগী হইয়াছে। নন্দিনী ও রাখালের চরিত্র চিত্রণে বিশ্বকবির প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও তাহা প্রশংসার যোগ্য। মালিনীর চরিত্র ও কথাবার্ত্তা বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। গ্রহরাজ শনিও সুচারুরূপে। শ্রীবৎসরাজের গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য যেমন রাজোচিত, নন্দিনীর সহিত তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা ও নিঃসন্তান প্রৌঢ়ের সুপ্ত পিতৃ হৃদয়ের স্নেহপ্রবণতা তেমনই মনোমুগ্ধকর। এই সুবৃহৎ নাটকখানিতে যে তা বলিয়া একেবারে ক্লান্তিকর কথোপকথন নাই বা কোনও একটু দোষ ত্রুটি নাই এমন কথা আমরা বলিতেছি না। মাঝে মাঝে রচনা আরও একটু সংযত হইলে ভাল হইত। তবুও নাটকখানিকে আমরা মোটের উপর প্রশংসার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। ছাপা কাগজ মন্দ নয়।

স্বপ্নছায়া

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। শ্রীসরস্বতী প্রেস কলিকাতা, পৃঃ ১৩৬ মূল্য ১৲

কবিতার বই। স্বপ্নই, অনেক সময় এলোমেলো হয়, তার উপর এ আবার স্বপ্নের ছায়া, সুতরাং এটা যে কি মারাত্মক বস্তু তা সহজেই অনুমেয়। লেখক অবতরণিকায় বলিয়াছেন কবিতাও তাই অচেতন সুধী অতি চেতনের স্বপ্নছায়ার কবির উপযুক্তই বটে। শীতের দিন শীর্ষক একটী রচনা হইতে এক লাইন তুলিয়া দিতেছি তাহা হইতেই লেখকের কবিত্ব শক্তির ও রচনামাধুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া

যাইবে—শীতত চল্‌লো…চললো ..নগর গ্রাম এমন কি বনটারে ছোড় দিয়ে এমন নিঠুর।

পাড়িয়া ছন্দকেও হার মানাইয়াছে এই গোহাড়িয়া ছন্দ।

হিসাবী

শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীনলিনীনাথ দে, মাধবী প্রেস মেদিনীপুর। মূল্য ॥০

চয়টি ছোট গল্প এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে কোথাও কোন আড়ম্বর নাই। লেখক সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন সমস্যা উত্থাপন করেন নাই। ভাষা বা লিখিবার ভঙ্গীতে কোন বাহাদুরী দেখাইবারও চেষ্টা নাই। তবুও রচনা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। রচনায় বৈচিত্র্য আছে। লেখক অনেকস্থলে হাস্যরসটি সুন্দর ভাবেই ফুটাইয়াছেন। আজকালকার কৃত্রিমতার দিনে পাঠক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া ইহার রস উপভোগ করিবেন। লেখক কোন গভীর রহস্যময় দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হন নাই। সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার সারল্য আছে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই চলনসই।

আশ্চর্য্য দ্বীপ

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায় প্রণীত। প্রকাশক এম সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য ১।০

প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্প লেখক জুল ভার্ণের Mysterious Island নামক গল্প অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। বিষয় অল্পবয়স্ক পাঠক পাঠিকাদের চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। বঙ্গ ভাষায় এ ধরণের পুস্তক নাই বলিলেই চলে, সুতরাং বালক বালিকার নিকট ইহার আদর হইবেই। তবে অনুবাদে ইহা এদেশের উপযোগী করিয়া লেখক ইহার আদর বাড়াইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। ভাষা অনুবাদের মতই প্রাণহীন, বলিবার ভঙ্গীও দেশকাল পাত্রের উপযোগী নয়।

এইরূপ গ্রন্থ রচিত হওয়া আবশ্যক। অনুবাদ দেশ কালপাত্রের উপযোগী হইলে চলিতে পারে। আমরা কিন্তু অনুবাদক চাই না, চাই জুলভার্ণের মত লেখক। তিনি এদেশের বালক বালিকাদের কাছে এইরূপ বিচিত্র কথার অবতারণা করিয়া তাহাদের কল্পনা বুদ্ধি ও জ্ঞানের উন্নতি সাধন করুন।

ব্রজের লীলা

শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—১৩ নং নেপাল ভট্টাচার্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য রাজসংস্করণ ১৷০ টাকা সাধারণ সংস্করণ ১৲

কয়েকটি ফটো তুলিয়া গ্রন্থকার ভাবের বাহ্যিক নিদর্শন দেখাইয়াছেন। ফটোগুলি একটি কথাসূত্রের দ্বারা গ্রথিত। কথাটি হাস্যরসাত্মক, চিত্রগুলিও সেইরূপ। পাঠক গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রগুলি দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন। গ্রন্থকার গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ছাপা কাগজ বাঁধাই মনোরম। পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য দৃশ্য দ্রব্যের নানা অভিনব আয়োজন সকল হইয়াছে।

কাব্যকাহিনী

শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাসগুপ্ত, প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—জে কে শর্ম্মা এণ্ড কোং ৩১ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা। মূল্য ৸০

পুস্তকে মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়রের কয়েকখানি প্রধান নাটক গল্পাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সেক্‌স্‌পীয়রের গল্প বঙ্গসাহিত্যে নূতন নয়। তবুও লেখকের যত্ন প্রশংসনীয়, কারণ মহাকবিদের রচনা যত প্রকাশ হয় ততই ভাল। রচনার বৈশিষ্ট সামান্য হইলেও ইহা অনেক বাঙ্গালী পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিবে। পুস্তক খানি সাধারণ পাঠককে একজন ইউরোপীয় মহাকবির সহিত পরিচিত করিয়া দিবে। তবে পাঠক শুধু গল্পটুকুই উপভোগ করিবেন।

গল্পের শিরোনামাগুলি লেখক ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এ কার্য্যটি না করিলেই ভাল হইত, কেননা মহাকবি প্রদত্ত নামগুলি পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার আমাদের নাই।

জগন্মাতা

শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান রায় চৌধুরী এণ্ড কোং ১৩২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ।০

শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী দাক্ষিণাত্যনিবাসিনী বিদুষী। শ্রীমতী আনিবেসেন্ট বিশ্বাস করেন যে মান্দ্রাজ প্রদেশের শ্রীমৎকৃষ্ণমূর্ত্তি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবকের দেহে জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি আরও বলেন অদূর ভবিষ্যতে জগতে মাতৃশক্তি প্রাধান্য লাভ করিবে এবং ভারতে ও জগতের অন্যান্য স্থানে এই শক্তির নেতৃত্ব প্রচারের জন্য জগন্মাতা শ্রীমতী রুক্মিণীদেবীকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বেসান্টের জগন্মাতার আহ্বান ও রুক্মিণী দেবীর শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রতি বঙ্গভাষায় অনুদিত হইয়াছে। অনুবাদকর্ত্তা শ্রীযুক্ত হরিকুমার রায় চৌধুরী। তিনি বলেন এক সময় রুক্মিণীদেবীর সম্পাদিত World Mother নামক ইংরাজী পত্রিকা পাঠ করিয়া তিনি বিশেষভাবে আনন্দিত হইতেন। সেই আনন্দ হইতেই এই পুস্তকখানির উদ্ভব। পুস্তকখানির উদ্দেশ্য মহৎ। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। অনুদিত রচনাগুলি কবিতা। অনুবাদক অমিত্রাক্ষর বিষম ছন্দে তাহাদের অনুবাদ

কার্য্য শেষ করিয়াছেন। রচনাগুলি অনেকের প্রীতি উৎপাদন করিবে।

ফুলঝুরি

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সরকার বি-এল প্রণীত। পাবনা সারদা প্রেস পৃ; ৩২ মূল্য ৵০

ইহাতে ছোট ছোট ৩৪টি কবিতা আছে। বিষয়বস্তু বা ভাব লইয়া বিচার করিলে সবগুলিই প্রশংসার যোগ্য। তবে কবিতাগুলির মধ্যে কবির নিজস্ব ভাব বড় একটা পাইলাম না। ভাব প্রকাশের ভঙ্গীর মধ্যেও অভিনবত্ব নাই। মিলগুলি মাঝে মাঝে শুদ্ধ হয় নাই, ছন্দপতনও পাওয়া যাইবে। রচয়িতা একটু অবহিত হইলেই এ দোষটি ঘটিত না। তবুও পুস্তকখানি সুপাঠ্য। রবীন্দ্রনাথের "কণিকা"কে আদর্শ রাখিয়া কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে। অনেকস্থলে আদর্শের মহত্ব ও উচ্চতা সমালোচ্য কবিতাগুলিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। মানস পূজা ভাঙ্গা, গড়া, বন্ধন, ফুলঝুরি প্রভৃতি কবিতাগুলি ভাল লাগিল। কাগজ ছাপা ভাল।

আনন্দলহরী

শ্রীযুক্ত সুকুমারী দেবী প্রণীত। শ্রীসরস্বতী প্রেস কলিকাতা। পৃঃ ৭৯ মূল্য ।০

কবিতার বই। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিষয়ের কবিতাই বেশী, অন্যবিধ কবিতাও আছে। দুঃখের বিষয় কবিতাগুলিতে কবিত্বের একান্ত অভাব। লেখিকার প্রাণে যখন যে ভাব জাগিয়াছে তাহাই তিনি অকপটে সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কলাকৌশল নাই, কাটছাঁট নাই, আভাস ইঙ্গিত নাই, সমস্তই স্পষ্ট। আধুনিক কাব্যকলার প্রভাব এড়াইয়া লেখিকা সেই পঞ্চাশ বৎসর আগে প্রচলিত কাব্য-রীতি আয়ত্ত করিলেন কিরূপে? ছন্দ মিলও অনেক স্থানে দুষ্ট। তবে সরলতা ও স্বভাবের জন্য লেখিকার সুখ্যাতি করিতে হয়। কাগজও ও ছাপা ভাল।

বেনলানা সনেট্‌স

মৌলভি আসাদ উল্লাহ প্রণীত। বিশ্বভাণ্ডার প্রেস কলিকাতা, পৃঃ ৫২+৯ মূল্য দেখিতে পাইলাম না।

নিবেদনে প্রকাশ—"আমি কবিতা লিখিতে পারি এ বিশ্বাস কোন কালেই আমার হয় নাই। তরুণ জীবনে ভালবাসার প্লাবন লাগিল। হিজিবিজি কবিতা রচনা চলিল। সনেটগুলি এক সপ্তাহের মধ্যে লিখিত হইয়াছে, চার পাঁচ দিনের মধ্যে ছাপার কার্য্য শেষ। বন্ধুবর মৌলভী মেহেরউদ্দীন আহম্মদ বি এ সাহেব গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।" ইত্যাদি অনেক কথাই নিবেদন ও ঐ ভূমিকা পাঠে জানা গেল। কিন্তু আমরা সনেটগুলি পড়িয়া বিশেষ আশান্বিত হইতে পারিলাম না। প্রথম সনেটে দেখিতে পাই "বড়রিপু শুন্য হই" "বাতাস মুখর করে তার গন্ধ বাস" "সম্মিত মালা" "স্নিগ্ধ পরায়ণা"। দ্বিতীয় সনেটে দেখি—সুবিপুল হরষণে তুমি দিলে শিষ (!) দিশ এর সঙ্গে শিষ মিলিয়াছে ভাল, কিন্তু মানে? জন্মে জন্মে তুমি মোর চির পথ বালা (!) এই রকম অধিকাংশ সনেটেই ভাবের ও ভাষার বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। কল্পনা অনেক স্থলেই উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল। আনাড়ির হাতে লাগাম থাকিলে ঘোড়া প্রথমটা খুব ছোটে বটে, কিন্তু পরে আরোহী শুদ্ধ গাড়ী লইয়া খানায় পড়ে। এখানেও স্থানে স্থানে সেই রকম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

খোকন বাবু

প্রথমভাগ। শ্রীধনঞ্জয় দত্ত বি এ প্রণীত। মূল্য ।৵০

নূতন ছড়া

শ্রীধনঞ্জয় দত্ত বি এ প্রণীত। মূল্য ।/০

উভয় পুস্তক বালক বালিকাদের জন্য রচিত। "খোকন বাবু" ক খ শিখিবার বই। "নূতন ছড়া"র বিষয়বস্তু নামেই প্রকাশ। উভয় পুস্তকই প্রচুর চিত্রে ভূষিত। বহি দুইখানি শিশুচিত্তের পক্ষে লোভনীয় হইয়াছে।

ওমর খৈয়াম

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত কবি ওমর খৈয়ামের জীবনী ও কাব্য পরিচয়। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ১৩৪ পৃঃ মূল্য লেখা নাই।

সুরেশ বাবু বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত নন। তিনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত, পারসিক কবিগণের পরিচয় ও কাব্য সমালোচনা করিয়া বহুদিন হইতেই বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ কবি শেখ শাদী ইতিপূর্ব্বে যথাযোগ্য জনাদর লাভ করিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে অধুনা ওমরের কাব্যানুবাদ লইয়া বিষম প্রতিযোগিতা লাগিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫।৬খানি সচিত্র ও অচিত্র ওমরখৈয়াম বাহির হইয়াছে, কিন্তু ওমরের নিখুঁৎ ইতিহাস বা কবির সত্য পরিচয় কেহই দেন নাই। সুরেশ বাবু সেই অভাবটি পূর্ণ করিলেন।

পারস্যভাষায় সুপণ্ডিত ইতিহাসাচার্য্য স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় আলোচ্য পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"জগতের জন্য ইসলাম কি করিয়াছে, তাহা জানিতে হইলে —শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীর ওমরখৈয়াম এই হিসাবে বিশেষ মূল্যবান।

ইহাতে ওমরের কাব্যের লালিত্য ও দর্শনের স্নিগ্ধতা প্রভৃতি বিষয়ের বিচার আছে বটে ··· কিন্তু এই পুস্তকে আবার সভ্যতার বিকাশ, জ্ঞানের বিভাগগুলি এবং প্রত্যেক বিভাগে পূর্ব্ব পরের কি সম্বন্ধ তাহার বর্ণনা ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এবং নবীনতম ও প্রামাণিক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকগুলির তথ্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া লেখক বঙ্গভাষায় ইতিহাস বিভাগের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। মধ্য যুগে পশ্চিম এসিয়ার সভ্যতার ইতিহাস হিসাবে এই পুস্তকখানি বঙ্গভাষায় নবীনতম সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ।"

ওমরখৈয়াম, ওমরের জন্মভূমি, বিদ্যাশিক্ষা, তাঁহার গুরুর পরিচয়, তাঁহার বন্ধুগণ ও পৃষ্ঠপোষকের কথা, গণিত শাস্ত্রের জ্যোতির্বিদ্যায়, দর্শনে ও কাব্যে ওমরের জ্ঞান ও মুসলিম দর্শন গ্রীক প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে দ্বাদশটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রত্যেকটী অধ্যায়ে লেখকের পাণ্ডিত্য প্রবেশ ও পরিশ্রমের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকের ভাষাটি প্রাঞ্জল ও কবিত্বপূর্ণ। যে অধ্যায়ে সুরেশ বাবু ওমরের কবিপ্রভার পরিচয় ও সমালোচনা করিয়াছেন সেটি পড়িয়া ঐতিহাসিক সুরেশ বাবুকে অতিনিপুণ কাব্য সমালোচক রূপে দেখিতে পাই।

স্বদেশ মঙ্গল

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এরিয়ান্ লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸০

বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির ধারা কোন্ সময় হইতে কি ভাবে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে লেখক তাহাই গ্রন্থের অন্তর্গত কয়েকটি প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্রের রচনা পর্য্যন্ত কোথাও আধুনিক দেশপ্রীতির নাম-গন্ধ নাই একথা গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন ইংরাজি আমলে এবং ইংরাজের নিকটেই আমরা স্বদেশের ও স্বাধীনতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে শিখিয়াছি। ইহার প্রথম ও প্রধান দীক্ষা-গুরু ডিরোজিও। ডিরোজিও হইতে চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত মনীষিগণ স্বদেশপ্রীতির কথা যে ভাবে বলিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে একত্র করা হইয়াছে। এই কার্য্যে লেখক যথেষ্ট শ্রম ও যত্নের পরিচয় দিয়াছেন। তবে একটা কথা এখানে আমরা বলিতে চাই; লেখক তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। ইউরোপের স্বদেশপ্রীতি—কষ্টি পাথরে যাচাই করা হইয়াছে। টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ বিদেশীয় স্বদেশবাৎসল্যে যে সংকীর্ণতা আছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশের আধুনিক স্বদেশ-বাৎসল্য কিভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে ও ইহার চরম উদ্দেশ্য কি, কোথাও বিদেশীয় সংকীর্ণতাকে আমরা প্রশ্রয় দিয়াছি কিনা, তাহা লেখক বিচার করেন নাই। ইংরাজের আমলে এবং ইংরাজের নিকট যাহা আমরা শিখিয়াছি তাহা স্বদেশে কিরূপে সহজ পরিণতি লাভ করিতে পারে তাহা বিশেষভাবে চিন্ত্য। ইংরাজ ইহার মধ্যেই স্বদেশপ্রীতির গানের সুর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। লেখক যদি দেখাইয়া দিতেন আমাদের সুরের একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং বিদেশীয় পথ অনুসরণ করিয়া আমরা একটা সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইব না, তাহা হইলে পাঠকের অন্তরে তিনি অনেকটা সাহসের সঞ্চার করিতে পারিবেন।

যাদুকরী

(গল্প)

নদীয়া জেলার একটি বিখ্যাত পল্লীগ্রামের উপকণ্ঠে একটি সাধারণ দ্বিতল অট্টালিকা। দ্বিতল গৃহের জানালা হইতে চূর্ণী নদী দেখা যায়, ঘরখানিতে নদীবক্ষের উন্মনা স্নিগ্ধ বাতাস খেলা করিয়া বেড়ায়।

সেই ঘরের জানালার ধারে একখানি নেয়ারের খাটের উপরে উপাধানের উপর দেহভার বিন্যস্ত করিয়া একটী যুবক তন্ময় চিত্তে একখানি মোটা বাঁধানো পুস্তক পাঠ করিতেছিল। ঘরখানি যুবকের শয়ন ও পাঠাগার। কিন্তু জিনিষ পত্র চতুর্দ্দিকে এমনই অবিন্যস্ত ও ছড়ানো যে দেখিলেই মনে হয়, কোন দুরন্ত শিশু এখনই বুঝি এ সমস্ত লণ্ড ভণ্ড করিয়া গিয়াছে।

গৃহের অপর প্রান্তে টেবিলের উপরে কতকগুলা, বাঁধানো বই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। তা ছাড়া দোয়াত কলম পেনসিল চিঠিলেখার প্যাড ও কতকগুলা এক্‌সারসাইজ বুকের সহিত চায়ের কাপ ও কুলের আচার টেবিলটীর উপরে শোভা পাইতেছিল। জলের কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া খাওয়ার চিহ্ন স্বরূপ, খানিকটা জল গৃহের মধ্যে ঢেউ খেলিতেছিল।

এমন সময় "মঞ্জু আছিস নাকি?" বলিয়া তাহার জননী প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার দৃষ্টি প্রথমেই পড়িল, পুত্রের বিশৃঙ্খল টেবিল-খানির উপরে। তিনি টেবিলখানি গুছাইয়া পরিস্কার করিতে করিতে বলিলেন, "হ্যাঁরে মঞ্জু চিরকাল কি তোর এই রকম এলোচণ্ডী হয়ে কাটবে? কিছুর ঠিক নেই, ঘরখানা কি ক'রে রেখেছিস বল দেখি?"

পুস্তক হইতে একবার মুখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া মঞ্জুভূষণ হাসিল, তার পর বলিল, "রাণীটা সারা-দিন কি কাযে ব্যস্ত থাকে, বল তো মা? আমার টেবিলটা কি একটু গুছিয়ে দিতে পারে না?" মা বলিলেন, "সকালবেলা তো একবার তাকে সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে দেখেছি এরই মধ্যে যে এখান দক্ষযজ্ঞ ঘটেছে, তা কে জানবে বল!"—রাণী, মঞ্জুর বোন।

মঞ্জু হাসিমুখে কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহার ছোট ভাই মৌলিভূষণ একটা টেলিগ্রাম হাতে গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, "দাদা তোমার নামে টেলিগ্রাম এসেছে, আমি দস্তখৎ করে নিয়েছি।"

জননী উদ্বেগ-জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "টেলিগ্রাম আবার কে দিলে? কোথা হতে এল রে?"

মঞ্জু টেলিগ্রামখানি ছিঁড়িয়া পাঠ করিল, ও হাসি-মুখে জননীর দিকে চাহিয়া বলিল, "মা যে একেবার ভয় পেয়ে গেলে! বর্ম্মা কলেজে একটা প্রোফেসারি খালি ছিল, তাই দরখাস্ত করেছিলাম, আমার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, জানিয়ে সুপ্রকাশ টেলিগ্রাম করেছে। সুপ্রকাশ গণিতের প্রোফেসার হয়ে সেখানে দু বছর আছে কিনা!"

মার মুখে হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। মলিন মুখে কহিলেন, "বর্ম্মা! সে যে অনেক দূর বাবা!"

মঞ্জু হাসিয়া কহিল, "দূর আর কি? এখানে তো আর কায পেলাম না, তাই ভেবে চিন্তে বর্ম্মাতে দরখাস্ত দিয়েছি। আজকাল রেলে জাহাজে দূরও নিকটে হয়েছে। সাহেবরা আমাদের দেশে চাকরী করতে আসে কেমন ক'রে? এ তো মাত্র চারদিনের পথ মা!"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মা কহিলেন, "চারদিন কি আর অল্প সময় বাবা? তা আর কি করবো, কিন্তু একটা কথা— বর্ম্মায় যাওয়ার আগে বিয়ে করে তবে যেতে পাবি। আর তোর কথা আমি শুনছি নে!"

যথাসময়ে মঞ্জুভূষণ বর্ম্মা ইং ... সাহিত্যের প্রোফেসার হইবার নিয়োগপত্র পাইল। মনে তার বরাবরই ঝোঁক ছিল, একটী সুন্দরী ও বিদুষী মহিলার পাণিপীড়ন করিবে। তাহার অগাধ পাণ্ডিত্যের উপযুক্ত সমঝদার একজন তাহার চাই-ই।

বহু অন্বেষণ হইল, এমন কি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইল, কিন্তু মনের মত পাত্রী সমগ্রমত মিলিল না।

তাহার নিজের কোন কুসংস্কার ছিল না, সে যে কোন জাতির নারীকেই পত্নীত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত। অসবর্ণ বিবাহে তাহার কোন আপত্তি ছিল না।

কিন্তু তাহার জননী সে সুখে বাদী হইলেন, কাঁদিয়া রাগ করিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন। মঞ্জু তাহার মাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিল না যে, যে তাহার জীবনসঙ্গিনী হইবে, তাহার কিরূপ হওয়া প্রয়োজন।

তাঁর সেই এক কথা, "তুই আর আপত্তি করিসনে বাবা। চাকরী পেলি, বয়স ও হয়েছে, আমার একটা সাধ পূর্ণ কর! অনেকদিন হতেই মেয়েটীকে দেখে পছন্দ করে রেখেছি, শুধু তোর আপত্তির জ্বালায় এতদিন বিয়ে হয়নি। ঐ মেয়েটীকেই বিয়ে কর, দেখিস তুই একটুও অসুখী হবিনে। মেয়েটীকে দেখে যতদূর জানি, খুবই বুদ্ধিমতী ব'লেই মনে হয়। আর মুখখানিও বড় সুন্দর।"

মঞ্জু বলিল, "কিন্তু লেখাপড়া তো বড় জোর কথা-মালা, আর পদ্যপাঠ! রবি ঠাকুরের নামও কখনও শুনেছে কিনা সন্দেহ।"

মা বলিলেন, "তোর বউ কি ঠিক তোর মত পণ্ডিত হবে?"

"তা আর হওয়া কি খুব আশ্চর্য্য কথা মা? এখন কত মেয়ে লেখাপড়া ভাল করে শিখছে, তোমাদের পুরাণো সময় আর এখন নেই!"

"তা হোক্, কাযকর্ম্ম জানে, সাধারণ লেখাপড়া জানে, এই হলেই ঢের হল।"

"তাই ব'লে, একটা ছিঁচকাঁদুনীও আমি সহ্য করতে পারবো না!"

"ছিঁচকাঁদুনী আবার কেন হতে যাবে? তোর

মত সব অনাসৃষ্টি কথা। মায়ের একটা কথা শুনলে তোদের যেন পাপ হয়। মা আবার কে!"

মঞ্জু মাতার প্রবল দুঃখ ও অভিমান পূর্ণ কথা শুনিয়া শেষটা বলিল, "আচ্ছা তোমার যখন অত জেদ তখন আমি বিয়ে করছি, কিন্তু তোমার কাছেই রেখ!"

মা মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাই রাখবো। কথাটা যেন মনে থাকে।"

২

মাঘ মাসের শুভ বসন্তপঞ্চমী তিথিতে মঞ্জুর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। নববধুর নাম অনসূয়া।

বিবাহে মঞ্জুর মত ছিল না, মনে দারুণ বিরক্তি লইয়া সে এই বিবাহে সম্মত হইয়াছিল, মাতার অনুরোধ সত্বেও সে ভাবী বধূকে দেখিতে যাইতে সম্মত হয় নাই।

বিবাহ রাত্রির উজ্জ্বল আলোক ও হুলুধ্বনি শঙ্খ-ধ্বনির মধ্যে সকলের অনুরোধে শুভদৃষ্টির জন্য যখন সে নিতান্ত দায়ে পড়িয়া চাহিল, দেখিল একটী সুন্দর মুখ তাহার লাজনম্র মধুর দৃষ্টি মেলিয়া তাহারই দিকে চাহিয়া আছে।

একটা নিমেষ মাত্রে সকলের অজ্ঞাতে এমন কি স্বয়ং মঞ্জুভূষণেরও অজ্ঞাতে সে চন্দনচর্চ্চিত সুন্দর মুখখানি তাহার হৃদয়ের লুকানো স্থানটীতে মুদ্রিত হইয়া গেল। মঞ্জুভূষণের মনে হইল—বাঃ মন্দ নয় তো!

সাত পাক ঘুরাইয়া কন্যা সম্প্রদান হইল। নূতন অলঙ্কারে সাজানো, সুগঠিত কমনীয় দুটী করপল্লবের সহিত যখন পুরোহিত মহাশয় তাহার ডাম্বেল ভাঁজা কঠিন হাত দুখানি পুষ্পমাল্য দ্বারা বাঁধিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছিলেন, উজ্জ্বল আলোকে মঞ্জুভূষণ এই দুটী হস্তের অসমতা অনুভব করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

কুশণ্ডিকার হোম করিবার সময় নববধুর সপ্তপদী গমন—ছোট ছোট অলক্তকমণ্ডিত চরণক্ষেপ, তাহার কঠিন হৃদয়ে পুলক সঞ্চার করিল। অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সে বধূর সীমন্তে যখন প্রথম সিন্দুররেখা অঙ্কিত করিয়া দিল, পুরবাসিনী মহিলারা সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো বর, বউটীকে পছন্দ হয়েছে?"

মঞ্জুকে তখন স্বীকার করিতে হইল যে বধূ মনোমত হইয়াছে।

যজ্ঞান্তে পুরোহিত মহাশয় বধূকে কহিলেন, "মা প্রণাম কর। ইনিই তোমার ইহপরকালের সাক্ষাৎ দেবতা।" নববধূ তাহাকে প্রণাম করিল।

মঞ্জু আবেগ-কম্পিত হৃদয়ে অনুভব করিল একটী কোমল আশ্রিতা লতা আজ একান্ত ভাবে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া ধরিয়াছে। সেই শুভ মুহুর্ত্তের অমৃত-ক্ষণে মঞ্জুর মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

বিরস বদনে যে সন্তান বিবাহ করিতে গেল, সে যখন বধূসহ নিজ গৃহে ফিরিল তখন জননী আনন্দের সহিত অনুভব করিলেন, আর কোন ভয় নাই, পুত্রের মানস-তরণী এখন সুবাতাসে পাল তুলিয়াছে। ছোট বোন রাণী আসিয়া শুধু একবার হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদা, বউ পছন্দ হল?"

উত্তরে মঞ্জু তাহাকে এক ধমক দিয়া কহিল, "যা যা আর জ্যাঠামো করতে হবে না।"

৩

প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। মঞ্জু বর্ম্মায় প্রোফেসারী করিতেছে।

ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে ডবল অনার্সে উত্তীর্ণ প্রোফেসার মঞ্জুভূষণ এখন সেই কথামালা পড়া মেয়েটার পত্রের প্রত্যাশায় দিন গণে।

অনসূয়া দেবীর পত্রে সাহিত্য-রসের প্রাচুর্য্য থাকে কি না তাহা মঞ্জুভূষণই জানে এবং যদি তার কোন চিঠি-চোর থাকে তবে সেও বলিতে পারে। আমাদের সে সংবাদ জানিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

মঞ্জুভূষণের জননী দিন দুই হইল মঞ্জুর পত্র পাইয়াছেন, তাহার আহারাদির বড় কষ্ট যাইতেছে, চাকরগুলা বড় পাজি, চুরি খুব করে, দুধে জল মিশায়, আরও কতরূপ অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া সে জননীকে বধূসহ বর্ম্মায় যাইতে আহ্বান করিয়াছে।

আসল কথাটী বুঝিতে জননীর বিলম্ব হয় নাই। তাঁর যাওয়া কঠিন, ঘরে নারায়ণ আছেন, তাঁর সেবার ব্যাঘাত ঘটিবে। আর সেই মগের মুল্লুকে গিয়া অনাচারের ভিতর

তাঁর দিন কাটানো অসম্ভব। পাঁজিতে ভাল দিন দেখাইয়া মঞ্জুভূষণের কাকার সহিত পুত্রবধূকে পাঠাইবার তিনি ব্যবস্থা করিলেন। ও তাহাকে পুত্রের বিশৃঙ্খল ভুলো-স্বভাবের কথা স্মরণ করাইয়া পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিলেন। বিদেশে ছেলেমানুষ তারা, যেন সাবধানে থাকে, তাহা বহুবার বলিয়া দিলেন।

সেই সুদূর সাগর পারে প্রবাস-বাসে অনসূয়া স্বামীর নিকট যাইয়া পঁহুছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফুলের বাগান ঘেরা একটী নব নির্ম্মিত কাঠের তৈয়ারী সুন্দর বাংলো, তাহাতেই মঞ্জুভূষণ সংসার পাতিয়াছিল।

একটী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ রান্না করে। একটী ভৃত্য ঘরের কায করে, ফুল-বাগানের তত্ত্বাবধানের জন্য একটী মালী আছে।

ব্রাহ্মণটী আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া নূতন গৃহিণী অনসূয়াকে দিয়া গেল। হলুদহীন মৎস্যের ব্যঞ্জন ও ডালের ধরা গন্ধে রান্নার অবস্থা ভাল রূপে অনুভব করিয়া অনসূয়া শয়নগৃহে বিশ্রামের আশায় প্রবেশ করিল।

বিবাহের পরে স্বামীর সহিত তাহার কয়েক দিন মাত্র দেখা হইয়াছে,— তাহাদের উভয়ের আলাপ পরিচয় চিঠি-পত্রেই যা কিছু হইয়াছিল।

শাশুড়ীর নিকট শুধু সে স্বামীর আত্ম-ভোলা উদাসীন স্বরূপই জানিয়াছে। তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল, লজ্জা-কম্পিত হৃদয়ে সে গৃহে প্রবেশ করিল।

মঞ্জু পোষাক পরিয়া কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, অনসূয়াকে দেখিয়া স্মিত-হাস্যে কহিল, "খাওয়া হয়েছে? আচ্ছা একটু বিশ্রাম কর, আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি, কোন ভয় নেই। কাকাবাবু পাশের ঘরে নীচে চাকর মালী সর্ব্বদা থাকে।"

[illegible] মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। মঞ্জু বাহির [illegible]ল, ও ভাবিল, আজ ছুটী লইয়া রাখিলেই ঠিক হইত, আগে এ কথাটা মনে হয় নাই, যাক।

সে চলিয়া গেলে অনসূয়া গৃহখানির চারি দিকে দৃষ্টি বুলাইল ও বিস্ময় কৌতুকের সহিত দেখিল, স্বামীর শয্যার উপরে ও টেবিল সেলফ যা কিছু আছে তাহাতেই বই আর কাগজ ছড়ানো। টেবিলটীর ক্ষুদ্র বক্ষটী সমাকীর্ণ করিয়া বিস্তর বাজে জিনিষ সেখানে জড়ো হইয়াছে, তাহার ভিতর চায়ের কাপ ও বিস্কুটের টিনও শো[illegible] পাইতেছে। সে নিজে নিজেই বলিল, "যা ঘর হয়ে আ[illegible] ঘুমোব কেমন ক'রে? বিছানার ওপরে তো দেখছি এক গা[illegible] বই, এগুলো কাছে নিয়ে শুয়ে থাকেন বুঝি?" তাহা[illegible] অত্যন্ত হাসি পাইল। সে ক্ষিপ্রহস্তে বইগুলি সেলফের উপর সাজাইয়া দিল, ও ক্রমে টেবিলটী পরিষ্কার করিয়া বিছানার চাদর প্রভৃতি ময়লা দেখিয়া, পরিবর্ত্তনের জন্য চাদর টানিয়া তুলিতেই, কতকগুলি টাকা ও ভাঙানো পয়সা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এবং বালিসের তল হইতে তাহার লেখা এক গোছা চিঠিও আবিষ্কৃত হইল।

চেয়ারের উপরে ধোয়া কাপড়ের গোছা রাখা ছিল, তাহা হইতে বাছিয়া নিয়া সব পরিবর্ত্তন করিয়া ঘরখানি পরিষ্কার করিল। তারপর জানালার ধারে দাঁড়াইয়া এই সুদূর দেশের নর-নারীর বিচিত্র বেশভূষা বিস্মিত নয়নে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মঞ্জুভূষণ দু'ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিল। গৃহে প্রবেশ করিতেই অনুভব করিল, যেন ঘরখানির শ্রী নূতনতর হইয়া উঠিয়াছে। সে সহাস্যে অনসূয়ার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল "হলা সহি অনসূয়ে! বাঃ এরই মধ্যে সব সাজিয়ে ফেলেছ দেখছি!"

৪

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে, নব-দম্পতীর দিনগুলি বেশ হাসি আনন্দের ভিতর দিয়া কাটিতেছিল। অনসূয়া তার ভুলো স্বামীর বিশৃঙ্খল কার্য্যগুলি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করে। এবং তাহাই যেন তাহার আনন্দের খোরাক যোগায়।

মঞ্জুর ভুলের অন্ত ছিল না। দিনের মধ্যে বহুবার তাহার চশমা, পেনসিল, পুস্তক অনসূয়াকে খুঁজিয়া দিতে হইত। সোণার বোতাম, চোখের চশমা, পকেটের টাকা পয়সা ও হাতের আংটীর খবরদারী তার নিত্য কার্য্য ছিল।

একটী জিনিষ হাতের নিকট না পাইলেই মঞ্জু অসহায়ের মত অনসূয়াকে বলিত, "দেখতো অনু এই এখনি কিছুক্ষণ আগে কলমটা এখানে রেখেছি, আর এরই

মধ্যে নেই! সব খুঁজে দেখেছি—এ নিশ্চয় চাকর বেটাদের কায। যখন তুমি ছিলে না, তখন ওরা মনের সুখে চুরী চালিয়েছিল, তুমি এসে ওদের উপরি রোজগার এক রকম বন্ধ। কিন্তু সুবিধা পেলেই ওরা যা পাবে, তাই চুরি করবে।"

অনসূয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "সাবধানী লোক দেখেই ওরা সুবিধা নেয়। ওদের আর দোষ কি? নিত্য নূতন চাকর বদলও ভাল নয়। মংলু নূতন এসেছে, ঠিক এখনও ধরতে পারি নি ছোঁড়াটা চোর কি সাধু। কিন্তু ফাউনটেন পেন নিয়ে ওরা কি করবে? ওর সাতপুরুষেও তো জিনিষটার ব্যবহার জানে না।"

"দামী কলম, বিক্রী করে দেবে!"

"আচ্ছা আমি একবারটী খুঁজে দেখি।" এই বলিয়া এদিক ও-দিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া খাটের তলা হইতে ফাউনটেন পেনটী কুড়াইয়া আনিয়া হাসিয়া বলিল, "সাহেব, বখশিষ?"

মঞ্জুভূষণ অপ্রতিভের মতন ফস করিয়া পকেটের তলা হইতে একটি পাই পয়সা বাহির করিয়া অনসূয়ার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। অনসূয়া হাসিতে হাসিতে পয়সাটী তাহার লক্ষ্মীর কৌটায় তুলিয়া রাখিল।

এখন মঞ্জুভূষণের কিছুই আর অমিল বলিয়া মনে হয় না। অনসূয়া রসগোল্লার সহিত রবি ঠাকুরের কবিতা সমভাবে তাহাকে পরিবেষণ করে। রবি ঠাকুরের কবিতার এমন একান্ত ভক্ত ও সমঝদার বোধ হয় মঞ্জুর পাওয়া দুর্লভ ছিল।

মঞ্জু এখন বিস্ময়ের সহিত অনুভব করে, তাহার পত্নীর সম্বন্ধে তাহার যেরূপ আদর্শ কল্পনা ছিল, অনসূয়া যেন তাহাই। সে বিদেশী পণ্ডিতগণের লেখার সহিত পরিচিত না হউক, দেশের শ্রেষ্ঠ কবি ও চিন্তাশীল লেখকগণের সহিত সে সুপরিচিত। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা সে যাহা কিছু দেখে শোনে, তাহাই আয়ত্ত করিয়া লয়। সে এরই মধ্যে কায চালাইবার মত কিছু বর্ম্মিজ ভাষাও শিখিয়া ফেলিয়াছে।

৫

সেদিন তাহারা শোয়েডাগন প্যাগোডা দেখিতে গিয়াছিল, মাঝে মাঝে ছুটীর দিনে তারা ওখানে বেড়াইতে যায়। মোটরে আরও নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া উভয়ে গল্প করিতে করিতে ফিরিয়া আসিতেছে। মঞ্জু অনসূয়ার কোমল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া মৃদু স্বরে বলিতেছিল, "আমার হাতের চেয়ে তোমার হাত দুখানি কত ছোট, না অনু? আর রঙও বেশী ফর্সা।"

অনসূয়া নিমেষ মাত্র চাহিয়া দেখিয়া লজ্জিত হইয়া নিজের হাত টানিয়া লইল, ও সেই মুহূর্ত্তেই চমকিয়া কহিল, "এ কি তোমার বিয়ের সময়ের সে হীরের আংটীটা আঙুলে নেই তো?—খুলে রেখেছ নাকি?"

স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া চমকিয়া মঞ্জুভূষণ নিজের অঙ্গুলির দিকে চাহিয়া কহিল, "কৈ খুলে রেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"তা হলে কোথায় রাখলে?"

"বাথরুমে রেখেছি হয়তো?"

"তবে তো বড় ভাবনার কথা, চাকরদের হাতে পড়লে কি আর ফিরে দেবে?"

মঞ্জুভূষণ অপ্রস্তুতের মত কহিল, "ঘরে টেবিলের উপরও রেখে থাকতে পারি।"

অনসূয়া একটু হাসিল, কিন্তু উভয়ের মনই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

শুক্লা চতুর্দ্দশীর রাত্রি, আকাশে পূর্ণচন্দ্র অমিয়া ঢালিতেছে, জ্যোৎস্নায় ধরণীপৃষ্ঠে যেন রজত শুভ্র ঢেউ তুলিয়াছে। ধরণীর অপরূপ রূপ। আরও কিছুক্ষণ তাহারা বেড়াইত, কিন্তু তাহা আর ভাল লাগিল না, অবিলম্বে তাহারা গৃহের দিকে ফিরিল।

অনসূয়া গৃহের প্রত্যেক দ্রব্য তোলপাড় করিয়া [illegible] দেখিল। মঞ্জু চাকরদের ডাকিয়া কহিল, [illegible] পাইয়াছেন, [illegible] করগুলা বড় খুঁজে পাবে, পাঁচ টাকা বখশিষ।"

কিন্তু কোথাও তাহা পাওয়া গেল না। [illegible] ও কুতরূপু [illegible] মোনা ও বিবাহের শুভ যৌতুক হারাইয়া যাওয়াতে অশুভ আশঙ্কায় তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। তাহার মনে হইল আজ যদি তারা ভ্রমণে বাহির না হইত তাহা হইলে হয়তো এই লোকসানটি ঘটিত না।

পরদিন মঞ্জু কলেজে গিয়াছে, অনসূয়া সারা দ্বিপ্রহর

আংটীর বৃথা অন্বেষণে এদিক ওদিক ঘুরিয়া শয্যার উপরে অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল।

মনে তাহার চিন্তার বিরাম ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে মনে মনে সে একটা বুদ্ধি আঁটিয়া চাকরদের ডাকিয়া বলিল, "যা এই পয়সা দিয়ে ধূপ সিন্দুর চন্দন নিয়ে আয়, পূজো করবো।"

অবিলম্বে সিন্দুর চন্দন ফুল দুর্ব্বা থালায় সাজাইয়া ধূপ দীপ জ্বালিয়া গরদের শাড়ী পরিয়া সে পূজার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

দেওয়ালের গায়ে সিন্দুর দিয়া দুটী পুতুল আঁকিয়া লইয়া, চাউলে রক্তচন্দন ও চিনি মাখাইয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া নানা রূপ মন্ত্র আওড়াইয়া গম্ভীর মুখে সে পূজা শেষ করিল। পূজাশেষে রক্তচন্দন ও চিনি দিয়া মাখা সেই চাউল প্রসাদ ভৃত্যদের ডাকিয়া বিতরণ করিল। বলিল, "আমার সমুখে এই প্রাসাদ খাও। এই প্রসাদের গুণ, যদি কেউ কিছু চুরি ক'রে থাকে, এ খেলে, চোর তিন দিনের মধ্যে জিনিষটী ফিরিয়ে দেবে, আর যদি লোভে প'ড়ে ফেরত না দেয়, মুখে রক্ত উঠে ম'রে যাবে।"

প্রত্যেক ভৃত্য আপত্তি করিয়া প্রসাদ মুখে দিল। নূতন চাকর মংলু কম্পিত হস্তে মুখের মধ্যে চাউল গুলি নিক্ষেপ করিয়া ভীত কণ্ঠে কহিল, "মা আপনি চোর ধরা মন্ত্র জানেন?" অনসূয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "জানি বৈ কি।—আমাদের বাড়ী ঠাকুর আছেন কি না, ভারি জাগ্রত ঠাকুর, কত সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করতে আসেন। আমায় একজন সাধু দু'বছর আগে চোর ধরা মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। তোরা বোধ হয় জানিস নে সোণা হারানো খুব পাপ, যে সোণা চুরি করে তার ... কত বেশী পাপ তার ঠিক নেই। সোণা হেন ... কায কি আর সহজ কথা, বল দেখি।"

... জন ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সকলের ... চক্ষে এক এক বার চাহিয়া দেখিয়া অনসূয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কলেজের ছুটী হইতে মঞ্জুভূষণ গৃহে ফিরিল। পত্নীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

অনসূয়া সোণা হারাইয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় বিষণ্ন হইয়া রহিয়াছে। মঞ্জুর সে কুসংস্কার নাই, তবুও দামী জিনিষটা হারাইয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছে।

দুই চারিটী কথা বলিয়া মঞ্জু এক খানা পুস্তকে ... সংযোগ করিল। নীরবে সময় অতিবাহিত হইয়া রাত্রি আসিয়া পড়িল। যথা সময়ে আহারাদি শেষ করিয়া উভয়ে শয়ন করিল।

পরদিন অতি প্রত্যূষেই অনসূয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া ...। সে নিঃশব্দে একাই শয্যা ত্যাগ করিল। মঞ্জু তখনও নিদ্রিত।

অনসূয়া বাহিরের বারান্দাটীতে আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বাকাশ সিন্দুর বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তরুণ তপন উদয় হইতেছেন। সে হাত যোড় করিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্র... করিল, ও মনে মনে বলিল, "ঠাকুর তুমি সব অমঙ্গল ... ক'রে দাও, আমার স্বামীর হাতের সোণা হারিয়েছে তাঁ... যেন কোন অমঙ্গল না হয়।"

কিছুক্ষণ চোখ দুটী বন্ধ করিয়া সে নীরবে প্রার্থনা করিল।

এমন সময় মৃদু কণ্ঠে মা ডাক শুনিয়া সে চমকিয়া চাহিল দেখিল, নূতন ভৃত্য মংলু মলিন মুখে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া। অনসূয়া বলিল, "কি হয়েছে তোর?"

সে কাতর কণ্ঠে কহিল, "জ্বর হয়েছে মা। আর— আর বড় দোষ করেছি, বাথরুমের জানালার উপরে আং... পেয়েছিলাম, বড় লোভ হল। এবারকার মত মা... করুন।" এই বলিয়া যে অনসূয়ার পায়ের কাছে আং... রাখিয়া দিয়া ঢিপ ঢিপ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল।

অনসূয়া বলিল, "আচ্ছা দেখিস আর এমন কা... কখন করবি নে তো? দেখছিস তো মন্ত্রের গুণ!"

মাটীতে মাথা ঠুকিয়া বার দুই তিন প্রণাম করি... মংলু কহিল, "আর কক্ষনো এমন কায করবো না মা... এখন কি আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌বে? আ... আমার মায়ের যে একমাত্র ছেলে।" বলিতে বলি... তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

অনসূয়া ঈষৎ হাসিল। তার পর বলিল, "নাঃ আ... কোন ভয় নেই, যা শুয়ে থাক গিয়ে।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। হাসিতে হাসিতে অনসূয়া গৃহে... করিল, মঞ্জু তখন নিদ্রাভঙ্গের পরে ...

গিয়াছে। কৌতুকময়ী পত্নীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "অনু ব্যাপার কি? সকালে উঠেই যে হাসি ধরে না।"

অগ্রসর হইয়া মঞ্জুর অনামিকায় অঙ্গুরীয়টি পরাইয়া দিয়া অনসূয়া কহিল, "মন্ত্রের চোটে আংটী আবার ফিরে এসেছে। খবরদার আর কোনও দিন যেন হারিও না।"

সেই দিন হইতে মঞ্জু মাঝে মাঝে অনসূয়াকে যাদুকরী বলিয়া ডাকে, কিন্তু তাহার ভুলো স্বভাবটীর বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

শ্রীউষা দেবী।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

সাহিত

বিচিত্রা—অগ্রহায়ণ।

সীমা ও অসীমতা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই ভাবঘন দার্শনিক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—'সীমাই' সৃষ্টি। সীমারেখা যতই সুবিহিত সুস্পষ্ট হয় সৃষ্টি ততই সত্য ও সুন্দর হতে থাকে।' 'অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে' এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করতে থাকে। সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরুদ্ধ করে দেখি তবে মানুষের ধর্ম্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হয়ে পড়ে। মানুষের ধর্ম্ম মানুষকে বলে যে তুমি আপনার সীমাকে পেলেই অসীমকে পাবে। তুমি মানুষ হও, সেই মানুষ হওয়ার মধ্যেই তোমার অনন্তের সাধনা সফল হবে।' "সীমার সঙ্গে অসীমের যোগ্যতা আনন্দের যোগ অর্থাৎ প্রেমের যোগ। সীমাও অসীমের পক্ষে যতখানি, অসীমও সীমার পক্ষে ততখানি; উভয়ের উভয় নইলে নয়।" এবং "মানুষ যখন জানতে পারে সীমাতেই অসীম তখনই মানুষ বুঝতে পারে এই রহস্যই প্রেমের রহস্য; এই তত্ত্বই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।"

আলোচ্য প্রবন্ধে অল্প পরিসরের মধ্যে যে সকল দার্শনিক তথ্যে লেখক মহাশয় উপনীত হইয়াছেন তাহা সহজ সরল ভাবে বুঝান নাই; কাজেই সাধারণ পাঠকের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী, এম-এ। এই সুচিন্তিত প্রবন্ধে লেখক সুন্দরভাবে সভ্যতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে সকল গুণ সভ্যতার প্রকৃষ্ট জ্ঞাপক নহে, তাহাদের নির্দ্দেশ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "যে জাত মানুষের মানসিক অভাব যত মেটাতে পেরেছে তার মানসিক সুখ যে পরিমাণে বিধান করতে পেরেছে সেই জাতই তত সভ্য বলে গণ্য হয়েছে।" "প্রকৃত মানবাত্মার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি ... সুসমঞ্জস পরিণতি। সভ্যতাপ্রাপ্ত জাতি বা মানব পরমত-সহিষ্ণু হন, আতিশয্যের অভাব তাহাতে পরিলক্ষিত হয়। সভ্য মানব কখনও অত্যুক্তি করে না, আনন্দে উন্মত্ত হয় না, বিপদে হতাশ হয় না। তাহার মানসিক বৃত্তির সর্ব্বাবয়ব সুঠাম বিকাশ সাধিত হয়।" তৎপরে লেখক দেখাইয়াছেন সভ্যতা ঠিক জাতীয় নয়, বিশ্বজনীন। সভ্যতা যখন মানসিক অবস্থা তখন মনেরর কার্য্যকলাপ দেখিয়া ও তার গুণের আদর (sense of values) দেখিয়া ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।' তৎপরে লেখক পাশ্চাত্য সভ্যতা বলিতে কি বুঝাইবে তাহার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে ইউরোপীয় সভ্যতা বুঝিতে গেলে তিনটি মহা-জাতির সভ্যতার ধারা বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে গ্রীক জাতি, উত্তরে ও পশ্চিমে জার্ম্মানিক জাতি ও দক্ষিণে লাতিন জাতি।' ইহাদের প্রত্যেকের সভ্যতার প্রকৃতি, মর্য্যাদা ও জ্ঞানভাণ্ডারে দান বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে ও তাহার পর তুলনামূলক সমালোচনা করিতে পারা যাইবে। সেইরূপ সমালোচনার মাপ কাটিতে বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রাচ্য ভারতীয় সভ্যতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ছিল।

বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় কাব্য সাহিত্যে দেশাত্মবোধের বাণী—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ। সচিত্র প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে লেখক বঙ্গ ইংলণ্ডীয় কাব্য-সাহিত্যে দেশাত্মবোধের বাণী কি ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে কাশীপ্রসন্ন ঘোষ ...ছেন, বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শশিচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ... গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, রমি ... ঘোষ), রমেশচন্দ্র দত্ত, তরু দত্ত, অরু দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ... ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ ও সরোজিনী নাইডুর দেশাত্মবোধক ... অনুবাদ স্বয়ং করিয়া বা স্থল বিশেষে অন্যের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই সকল মনীষীদের রচনায় প্রগাঢ় দেশাত্ম-বোধের পরিচয় যথেষ্ট আছে।

অতীতের স্মৃতি—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল।